"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

কালি-কলম

সচিত্র মাসিক-পত্র

—সম্পাদক—

রলীধর বসু　　　শৈলজানন্দ মুখোপা

দ্বিতীয় বর্ষ

১৩৩৪ সাল, বৈশাখ হইতে চৈত্র।

বরদা এজেন্সী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

সূচী

রাখাল ছেলে

[প্রবাসীর সৌজন্যে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

কালি-কলম

২য় বর্ষ] বৈশাখ, ১৩৩৪ [১ম সংখ্যা

চিত্রবহা

শ্রী সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সোনার বাংলা

'আমি পরের ঘরে কিনব না তোর ভূষণ বলে' গলার ফাঁশি'—রাত্রে নিরালা ঘরে শুইয়া শুইয়া সন্ধ্যায়-শোনা গানের পদগুলা বারবার অমরের মনে পড়িতেছিল। তার মনের দুয়ারে আজ অকস্মাৎ অসংখ্য দিনের অসংখ্য ভাবনা এমন ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে যে তাদের লইয়া সে যে কি করিবে কিছু ঠাহর পাইতেছে না।

সে ভাবিতেছিল—ঠিকই ত! পরের ঘরের ভূষণ গলার ফাঁশি ছাড়া আর কি? পরের ঘর বলিতে যে বিশেষ করিয়া বিলাতকে বুঝায়, আর কোনো দেশকে নয়, সে সম্বন্ধে তার মনে কোনো সংশয় ছিল না। বিলাতী অসন, বিলাতী ভূষণ, বিলাতী বসনই বাংলার সাত কোটি সন্তানের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে এবং করিতেছে। অথচ এই কথাটা একদিনের জন্যও ত সে ভাবে নাই! কত দিন ধরিয়া স্কুলকলেজে কত কেতাব মুখস্ত করিল, কত খবরের কাগজ পড়িল, অথচ অসনে বসনে ভূষণে সর্ব্ববিষয়ে এই যে তাদের পরনির্ভরতা, এই চিন্তা আর কখনো তার মনের দুয়ারে এমন করিয়া আঘাত করে নাই, আজ যেমন করিতেছে। একজামিন পাশ করিয়া হাসি-খেলা করিয়া সময় কাটিয়াছে কিন্তু একদিনের তরেও ত জন্মভূমি বাংলাদেশের কথা মনে পড়ে নাই! আর তার বাপমা, আত্মীয়স্বজন, স্কুলের শিক্ষক, বন্ধুবান্ধবও ত কেহই কখনো স্বদেশ সম্বন্ধে তাহাকে কিছুই বলে নাই!

এমনিতর নানা চিন্তা ঝড়ের বেগে তার চিত্তকে আলোড়িত করিতে লাগিল, সে দিশাহারা হইয়া গেল। এই যে দেশের ভাবনা, এই যে দেশের প্রতি মমতা, এই যে দেশের অপমানে ব্যথা বোধ করা—এ অনুভূতি একেবারে নূতন, অপূর্ব্ব।

সেদিন অপরাহ্নে অমর কবির বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিল। সেই সভার ছবি তার মনে ভাসিয়া উঠিল। বিপুল জনতার মাঝে কবি দাঁড়াইয়া, যেন আগাছার বনে

বিরাট বনস্পতি! যেন পুরাণের কোনো দেবতা, সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান! যেন মানুষ নয়! গানের মত তাঁর বাণী উৎসুক জনতা স্তব্ধ হইয়া যেন পান করিতেছিল। সে বাণী দেশের প্রতি অবিচারের প্রতিবাদে কখনো তীব্র জ্বালাময়ী, আবার কখনো দেশের দুঃখদুর্দ্দশা দেশের ভয়বিমূঢ়তার বর্ণনায় কোমল করুণ অশ্রুসজল। অনর্গল অবলীলায় উহা নিঃসৃত হইতেছে, যেন বৃষ্টিধারা! কখনো আঘাত করিতেছে অগ্নিবানের মত, আবার কখনো তাহা হইতে মমতার সুধা ঝরিতেছে জননীর বক্ষসুধার মত!

ভাষার ইন্দ্রজালে এমন করিয়া মানুষকে যে মুগ্ধ অভিভূত করা যায় অমরের তা জানা ছিল না। বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে তার রক্তধারা চঞ্চল হইয়া উঠিল। দেশকে জানিবার জন্য বুঝিবার জন্য, দেশের প্রতি অন্যায় অবিচার নিবারণের জন্য তার মনে একটা তীব্র আকাজ্ক্ষা জন্মলাভ করিল। মনে হইল তার যেন নবজন্ম হইয়াছে, সে একটা নূতন আলোর সন্ধান পাইয়াছে, যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে এতকাল অচেতন ছিল।

বক্তৃতা অন্তে গান সুরু হইল। বাংলার অতি পুরাতন ও পরিচিত বাউলের সুরে বালকের দল যখন গাহিতে সুরু করিল, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি··· তখন কথায় ও সুরে বাংলার যে অনির্ব্বচনীয় মধুর রূপ ফুটিতে লাগিল সে রূপ অমর কখনো স্বপ্নেও দেখে নাই। মন্ত্রমুগ্ধের মত সে শুনিতে লাগিল, মনপ্রাণ যেন সুরসুধা-ধারায় আপ্লুত হইয়া গেল, তার চোখে জল আসিল।

গান যখন শেষ হয়-হয়, তখন জনসমুদ্র ভাবাবেগে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, স্থান কাল ভুলিয়া গেছে। প্রথম সারি শ্রোতৃবৃন্দ বালকদলের সঙ্গে গাহিতে সুরু করিয়া দিল, তারপর দ্বিতীয় সারি ধরিল, তারপর তৃতীয় সারি, তারপর যে যেখানে ছিল সকলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাংলার সেই অপূর্ব্ব স্তবগীতি গাহিতে লাগিল। কেহ নাচিতে লাগিল, কেহ দুলিতে লাগিল, কেহ কাঁদিতে লাগিল, মনে হইল সমস্ত লোক যেন সুরাপানে মত্ত হইয়াছে।

শুইয়া শুইয়া অমরের মনে পড়িল ছেলেবেলা স্কুলে পড়িবার সময় সে কংগ্রেসের নাম শুনিয়াছিল। প্রতি বৎসর বড়দিনের সময় যখন কংগ্রেসের বৈঠক বসিত তখন ইংরেজি খবরের কাগজে বড় বড় বাঙালী বক্তাদের বক্তৃতা পড়িয়া সে মনেমনে তাদের ইংরেজি ভাষায় দখলের তারিফ করিত, এবং সে-ও একদিন বড় হইয়া অমনি ইংরেজি বক্তৃতা দিয়া সকলকে বিস্মিত করিবে এমনিধারা একটা সাধ তার মনের কোণে উঁকি মারিত। তখন তার ইংরেজি জ্ঞান এমন ছিল না যে সে কংগ্রেসের সমস্ত ব্যাপারটি ভালো বুঝিতে পারে, তবে সে এইটুকু বুঝিত কংগ্রেসের উদ্দেশ্য দেশের উপকার করা। কিন্তু দেশ বলিতে কি বুঝায়, কিরূপেই বা তার উপকার করা সম্ভব, সে সম্বন্ধে তার কোনো ধারণাই ছিল না। স্বদেশ ছিল তার কাছে একটা অস্পষ্ট ছায়ার মত।

দুই মাস পূর্ব্বে সে যখন টাউনহলে বঙ্গভঙ্গ-প্রতিবাদ সভায় বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিল তখন দুইটি শব্দ বিশেষ করিয়া তার কানে বাজিয়াছিল—বয়কট ও বন্দেমাতরং। বন্দেমাতরং গানটি বহুদিন আগে অমর পড়িয়াছিল। সে যখন স্কুলে পড়ে, নিতান্ত বালক, তখন গ্রীষ্মের ছুটিতে, দ্বিপ্রহরে, পিতা কর্ম্মস্থলে চলিয়া যাইবার পর, বাড়ির লাইব্রেরি হইতে, বাংলা উপন্যাস ও গল্প, হাতের কাছে যা পাইত, তাই লইয়া পড়িতে বসিত। হুহু করিয়া ঝড়ের মত পড়িয়া যাইত, সব জায়গা বুঝিত না, তবুও মূল গল্প অনুসরণে কোনো ব্যাঘাত ঘটিত না। পড়িতে পড়িতে সে তন্ময় হইয়া যাইত, মাঝে মাঝে কৌতূহলের আতিশয্যে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই শেষের পাতা উল্টাইয়া দেখিয়া লইত, যে দুজন নরনারী পরস্পরের প্রেমে বাঁধা পড়িয়াছে তারা শেষ পর্য্যন্ত সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করিতে লাগিল কি না। পড়ার নেশায় অগোচরে দিন শেষ হইয়া আসিত, সহসা পিতার গাড়ির শব্দে সচকিত হইয়া তাড়াতাড়ি বইখানি আলমারিজাত করিয়া সে সরিয়া পড়িত।

এইরূপে চুরি করিয়া পড়িবার সময় বন্দেমাতরং গানটি

একদা অমরের চোখে পড়িয়াছিল, কিন্তু তার প্রতি সে মনোযোগ দেয় নাই, তার তাৎপর্য্যও বুঝে নাই। আজ নিশীথে কোন্ অপরূপ অজ্ঞাতপূর্ব্ব রসের আস্বাদ সে পাইল যার ফলে সেই পুরাতন গানের অর্থ পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গেল? তার মনে হইল, সত্যই ত, এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলার কি তুলনা আছে? বাংলার সাতকোটি সন্তান ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারে?

সপ্তকোটির কণ্ঠনিনাদ যাঁহার গগন ছায়,
চৌদ্দটা কোটি হস্তে যাঁহার
চৌদ্দটা কোটি ধৃত তরবার,
এত বল তাঁর তবু মা আমার অবলা কেন গো হায়? *

আশ্চর্য্য! এত দিন সে কি ঘুমাইতেছিল? একথা তো এতদিন মনে হয় নাই! আর তারই বা দোষ কি? তার বয়স আর এমন কি হইয়াছে, তার শিক্ষাই বা কতটুকু? বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষিত গুরুজনেরাও ত এ সম্বন্ধে কখনো কোনো আলোচনা করেন নাই! স্কুলে দেশ-বিদেশের ভূবৃত্তান্ত মুখস্থ করিয়া মরিল, মানচিত্রে বাংলা-দেশের আকৃতিমাত্র দেখিয়াছে, কিন্তু তার আসল রূপ কেহ দেখায় নাই, যেমন সে আজ দেখিতে পাইয়াছে! আজ সে বুঝিয়াছে তার মাতৃভূমি কয়েকটা রেখা ও ও কয়েকটা নামের সমষ্টিমাত্র নয়, তা এমন কিছু যা অনুভবের যোগ্য কিন্তু অনির্ব্বচনীয়।

ধেনুচরা তোমার মাঠে
পারে যাবার খেয়া ঘাটে
সারাদিন পাখীডাকা, ছায়ায় ঢাকা
তোমার পল্লীবাটে! †

অমর যে কখনো মাঠে গরু চরিতে দেখে নাই তা নয়, খেয়াঘাটে সে কতবার নদীপার হইয়াছে, পাখীর ডাকও সে শুনিয়াছে, কিন্তু সে সব ত তাকে কখনো এমন করিয়া মুগ্ধ করে নাই! আজ কবি শব্দের মায়াতুলিকায় সোনার বাংলার যে-ছবি আঁকিয়া দেখাইলেন, সে ত ভুলিবার নয়! চিরদিনের জন্য তা অমরের চিত্তলোকে অক্ষয় হইয়া রহিল।

২

শৈশবে

তেরবছর আগের কথা। বাংলার পল্লীগ্রামে এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যা। মুখুজ্যেদের বাড়ির সদর ঘরে মেঝের উপর সতরঞ্চি বিছানো। তার উপর বসিয়া ভাইবোনে পড়া মুখস্থ করিতেছিল। সম্মুখে পিতলের পিলসুজের উপর মৃৎপ্রদীপের স্তিমিত আলো কাঁপিতেছে. তারই পাশে অনুমান পঁচিশ বৎসর বয়সের এক যুবক বসিয়া স্নেহ-স্নিগ্ধনেত্রে ছাত্র ও ছাত্রীর পাঠাভ্যাস লক্ষ্য করিতেছিল। বালকের বয়স সাত, তার নাম অমর। বালিকার নাম সুকুমারী, সে অমরের চেয়ে বছরখানেকের ছোট। ভাই-বোনে এমনি সুন্দর, মনে হয় যেন একবৃন্তে দুটি ফুল।

বাহিরে নির্জ্জন পল্লিপথে বৃষ্টির রিমিঝিমি, বাতাসের সনসনি, আর ক্ষণে ক্ষণে আকাশে বাদলের মাদলের গুরু-গম্ভীর ধ্বনি এবং ঘরের ভিতরে বর্ণপরিচয়ের বানান-সমুদ্রে দিশাহারা দুই শিশু। তাদের চিত্ত 'নিক্বণে' মুগ্ধ হইতেছে না, 'চিক্বণে' তাদের নয়ন তৃপ্ত হইতেছে না, ঐ জাতীয় শব্দকে সপরিবারে নরকস্থ করিতে পারিলে তারা যেন বাঁচে। তাদের যন্ত্রণা দিবার জন্যই যে শব্দগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল সে সম্বন্ধে তাদের অনুমাত্র সংশয় নাই।

কিছুক্ষণ পড়া করিয়া বিব্রত মুখখানি তুলিয়া অমর বলিল, মাষ্টারমশাই! একটা গল্প বল না!

সুকুমারী বলিল, হ্যাঁ মাষ্টারমশাই! বিষ্টির সময় পড়া যায় না!

---

* সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ। † রবীন্দ্রনাথ।

অভিমানের সুরে অমর বলিল, এত বানান মুখস্ত করা যায় বুঝি!

ঈষৎ হাসিয়া যুবক অমরকে কোলের উপর টানিয়া লইল। বলিল, থাক, আর পড়তে হবে না। আজ তোমাদের ছুটি।

সুকুমারী বলিল, মাষ্টারমশাই! তুমি ইকড়ি-মিকড়ি খেলতে পারো?

যুবক বলিল, দেখিয়ে দিলে পারি

দুইহাতে যুবকের গলা জড়াইয়া অমর বলিল, আমি খেলতে জানি। আমি দেখিয়ে দেব।

সুকুমারীর পানে ফিরিয়া কহিল, আয় সুকু খেলবি!

তিনজনে চক্রাকারে বসিয়া ইকড়ি-মিকড়ি খেলিতে লাগিল।

দ্বার ঠেলিয়া পাচক যখন যুবকের রাত্রের আহার লইয়া উপস্থিত হইল তখন তারা খেলা থামাইল। তিনি আহার সুরু করিবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া অমর কহিল, মাষ্টারমশাই! আমি একটু আলুরদম খাবো!

যুবক একটু আলু ভাঙিয়া ভাইবোনের মুখে পুরিয়া দিল। হাসিমুখে শিশুদুটি আলু চিবাইতে লাগিল।

আহারান্তে পান মুখে দিয়া যুবক আসিয়া বসিলে অমর বলিল, মাষ্টারমশাই! দোলা দেবে না?

দাদার পিঠে একটু ঠেলা মারিয়া সুকুমারী বলিল, ধ্যেৎ! রোজ রোজ কি! তারপর মৃদুমৃদু হাসিতে লাগিল।

যুবক উঠিয়া গিয়া ঘরের অপর প্রান্তে রচিত শয্যার উপর হইতে একখানি মোটা কম্বল লইয়া আসিল। তার উপর শিশুদুটিকে বসাইয়া দুই হাতে কম্বলের দুই প্রান্ত ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া ধীরে ধীরে দোলাইতে লাগিল। উচ্ছ্বসিত কৌতুকে ভাইবোনে পরস্পরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

এমন সময় অন্দর-মহল হইতে নারীকণ্ঠে কে ডাকিল, ঘরে আয়রে!

শিশুদুটি সচকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, ঐ! ঝি-মা ডাকছে! যাই মাষ্টারমশাই!

বাহিরে আসিয়া বামা-ঝির দুই কোলে দুজনে চড়িয়া বসিল। ঝি হাতের গামছাখানি লম্বা করিয়া শিশুদুটির মাথা ঢাকিয়া দিয়া অন্দর-অভিমুখে যাত্রা করিল।

ভাইবোনের পড়া ও খেলা একই সঙ্গে এমনি করিয়া প্রত্যহই চলে। পিতামাতা প্রবাসে, পল্লীভবনে পিতার বৃদ্ধা ঠাকুরমার কাছে শিশুদুটি বাস করিতেছিল।

বগলে ছোট একখানি মাদুর, একহাতে ধারাপাত বর্ণপরিচয় ও পাততাড়ি, অন্যহাতে ভূসার কালির মাটির দোয়াত ঝুলাইয়া রোজ সকালে তাহারা পাঠশালে যায়। সেখানে নিজ নিজ মাদুরের উপর বসিয়া সরের কলম দিয়া তালপাতার উপর হস্তাক্ষর রচনা করে এবং দাগা বুলায়, তারপর ছুটির আগে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া কড়ানে, শটকে এবং নামতা আবৃত্তি করে।

বাড়ির কাছেই গুড়ের কারখানা। শীতের সকালে কখনো কখনো সেখানে গিয়া তারা হাজির হয়। বড় বড় মাটির গামলায় খেজুররস জ্বাল দিয়া গুড় তৈরি হয়, বাতাসে তার সুগন্ধ ভাসিতে থাকে। সুন্দর শিশুদুটির প্রসারিত করপুটে ঈষৎ তপ্ত গুড় তারা ঢালিয়া দেয়। পরম তৃপ্তির সহিত সেই গুড় চাটিতে চাটিতে তারা বাড়ি ফিরিয়া আসে।

ফাল্গুনে পাঠশালার সুমুখের আমবাগান মুকুলের গন্ধে আকুল হয়। তারপর গাছে গাছে যখন কচি আমের ছড়াছড়ি তখন তারা সহপাঠীদের সঙ্গে কাঁচা আম কুড়াইয়া দাঁত দিয়া ছাড়াইয়া নুন মাখাইয়া সশব্দে পরমানন্দে ভক্ষণ করে। আবার কখনো কোনো সাহসী বালক নোনা বা গাবগাছে উঠিয়া পাকা ফল নীচে ফেলিয়া দেয়, সাথীদের মত তারাও গাছের তলায় কোঁচড় পাতিয়া উহা সংগ্রহ করে।

চৈত্রমাসে গাজনের সন্ন্যাসীর দল পথে পথে ঘুরিয়া

বেড়ায়। পালকগোঁজা বড় বড় জয়ঢাক পিটিয়া খররৌদ্র-তপ্ত চৈত্রের আকাশ প্রকম্পিত করিয়া তারা মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া উঠে, তারকনাথের সেবা লাগি...মহাদেব! গৈরিকে ভূষিত রুক্ষকেশ শীর্ণকায় সন্ন্যাসীদের দেখিয়া অমরের ভয়-ভয় করে, হঠাৎ যখন তারা মহাদেব বলিয়া হাঁক দেয় তখন তার বুকের ভিতরটা দুরুদুরু করিতে থাকে।

চড়কপূজার দিন বাজারের ধারে অমর কাঁটাঝাঁপ দেখিতে যায়। উঁচু ভারার উপর হইতে সন্ন্যাসীরা কাঁটার উপর বঁটির উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, অমরের চোখদুটি মুদিয়া আসে, তবুও সে ভাবে সে বড় হইলে অমনি করিয়া ঝাঁপ দিতে শিখিবে! তখন তার মোটেই ভয় করিবে না!

ঝাঁপ দেখিয়া মেলায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে চিনির মঠ, গুড়ের মোয়া, সোলার পাখী, কাঠের বাঁশি, আদুরী পুতুল এমনি কত কি কেনে; তেলেভাজা ফুলুরি বেগুনি খায়; শেষে তৃপ্তমনে শ্রান্তদেহে সন্ধ্যার পর মাষ্টারমহাশয়ের কোলে চড়িয়া বাড়ি ফিরিয়া আসে।

এমনি করিয়া ভাইবোনের দিন কাটে।

সেবার বাড়িতে প্রথম দুর্গাপূজা। মাসখানেক থাকিতে কুমোরেরা আসিয়া ঠাকুর গড়িতে সুরু করিল। খড়ের আঁটির উপর কাদার তাল কুমোরের হাতে কেমন ক্ষিপ্রতার সহিত দিনে দিনে প্রতিমা হইয়া উঠিতে লাগিল তাহা দেখিয়া ভাইবোনের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। দশভূজা দুর্গা, কমলাসনা লক্ষ্মী, বীণাবাদিনী সরস্বতী, শুণ্ডধারী নাদুসনুদুস গনেশদাদা, ভীষণদর্শন অসুর, রণমত্ত কেশরী ও ময়ূরবাহন দেব-সেনাপতি কার্ত্তিক একটু একটু করিয়া যেদিন পূর্ণাবয়ব হইয়া উঠিল, যেদিন তাহাদের গায়ে রঙ চড়িল, বসনভূষণ উঠিল, পরিশেষে যখন চিত্রবিচিত্র করিয়া চালচিত্র রচনা চলিতে লাগিল তখন তারা আহার নিদ্রা ভুলিয়া গেল।

পূজার কয়েকদিন পূর্ব্বে অমরের পিতামাতা আসিয়া পৌছিল, আত্মীয়স্বজনেরা আসিল, বাড়ি একেবারে গমগম করিতে লাগিল। আর আসিল কয়েকটি ছাগশিশু। ভাইবোনে তার মধ্যে একটিকে পালিবার ভার গ্রহণ করিল। কখনো তাহাকে কচিকচি পাতা সংগ্রহ করিয়া খাওয়ায়, কখনো তার দড়ি ধরিয়া মাঠে চরাইয়া ফেরে, কখনো পুকুরে লইয়া গিয়া তাহাকে স্নান করায়। রাত্রে মায়ের নিকট মিনতি করিয়া ছেঁড়া কাপড় চাহিয়া লইয়া তার শয্যা রচনা করিয়া দেয়। সে যেন তাদের ছোট ভাই, তার পরিচর্য্যা করিয়া, তাহাকে আদর করিয়া ভাল বাসিয়া যেন আর আশ মিটে না।

ছাগশিশুগুলি কেন আসিয়াছে, তাদের লইয়া কি হইবে সে সম্বন্ধে তাহাদের কোনো ধারণা ছিল না। বড়দের মুখে দু'একবার শুনিয়াছিল বটে, বলি হইবে, কিন্তু তা যে কি তাহারা জানিত না। পাঁঠাটির সেবা করিয়াই তাহারা তুষ্ট ছিল, আসন্ন পূজার উত্তেজনার মধ্যে আর কিছু ভাবিবার তাহারা অবসর পায় নাই।

সপ্তমীপূজার দিন। ভাইবোনে দেখিল তাদের পাঁঠা-টিকে স্নান করাইয়া পূজার দালানে ঠাকুরের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে। গলায় জবাফুলের মালা, কপালে সিঁদুরের তিলক, পাঁঠাটিকে বেশ দেখাইতেছে। পুরুত-ঠাকুর তার দিকে ফিরিয়া কি যেন বলিতেছে।

ঠাকুরদালানের সমুখের উঠান লোকে লোকারণ্য। তার মাঝে ভাইবোনে দাঁড়াইয়া আছে। উঠানের মাঝে একটা মাটির ঢিপি, তার মাঝে হাড়িকাঠ। তাহাই দেখাইয়া ছেলেরা বলাবলি করিতেছে, ঐ হাড়িকাঠ, ওখানে পাঁঠাবলি হবে। শুনিয়া একটা অজানা ভয়ে ভাইবোনের বুক কাঁপিয়া উঠিল।

মালকোঁচাবাঁধা একটা জোয়ান লোক খালি গায়ে মস্ত একখানা খাঁড়া হাতে লইয়া হাড়িকাঠের পাশে আসিয়া

দাঁড়াইল। আর একজন লোক অমনি তাদের পাঁঠাটিকে কোলে করিয়া পূজার দালান হইতে সেইখানে আসিয়া নামাইয়া দিল। সহসা সে একহাতে পাঠার সামনের দুইপা তার গায়ের দুইধার দিয়া টানিয়া পিঠের উপরে চাপিয়া ধরিয়া তার গলাটা হাড়িকাঠের মধ্যে পুরিয়া তার উপর খিল গুঁজিয়া দিল। পাঁঠাটা আর্তনাদ করিয়া উঠিল। তখন সে অন্যহাতে তার পিছনের পাদুটা শক্ত করিয়া টানিয়া ধরিল। জোয়ান লোকটা হাঁটু গাড়িয়া বসিল, দুইহাতে খাঁড়া উপরে তুলিল, নিমেষের জন্য খরধার খড়্গ শূন্যে ঝলসিয়া উঠিল। কারা সব চীৎকার করিয়া হাঁকিল, খুঁটি-খাঁটা ছেড়ে দাও···জয় মা! তারপর তুমুলরবে কাঁশর ঘণ্টা ঢাকঢোল বাজিয়া উঠিল। ভাইবোনে দেখিল তাদের পাঁঠাটির মুণ্ড ধড় হইতে বিচ্যুত হইয়াছে এবং সেখান থেকে রক্তধারা ফিনকি দিয়া ফোয়ারার মত ছুটিতেছে।

অমর এতক্ষণ ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া ছিল, এখন আর স্থির থাকিতে পারিল না, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সুকুমারী তার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বাহিরে লইয়া গেল।

অমরের কান্না আর থামে না। সুকুমারী ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। রুদ্ধকণ্ঠে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিল, কেঁদনা দাদা! চুপ করো! চুপ করো! আর কখনো আমরা পাঁঠা পুষব না!

তারপর সে-ও উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

স্বামী-স্ত্রী

চব্বিশ বৎসর বয়সে সম্মানের সহিত আইন-পরীক্ষা পাশ করিয়া চন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় বিহারের এক শহরে ওকালতি সুরু করিলেন। তারই বছর দুই পরে পিতার ইচ্ছানুসারে তাঁর বিবাহ হইয়া গেল। পত্নী কাত্যায়নীর বয়স তখন এগারো বৎসর মাত্র।

যে বৃহৎ বনেদি পরিবারে কাত্যায়নীর জন্ম হইয়াছিল সেখানকার গৃহিণীরা তার বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ সমাপ্ত হইতে না হইতে ভয়ানক শোরগোল তুলিয়াছিলেন—মেয়েমানুষের এত লেখাপড়া ভালো নয়! জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইলেই মেয়েদের বৈধব্য না কি অনিবার্য্য!

ফলে প্রথমভাগের সঙ্গেসঙ্গেই কাত্যায়নীর শিক্ষার সুরু এবং সমাপ্তি হইয়াছিল।

ভাগ্যদেবীর অনুগ্রহে চন্দ্রবাবু বছর দশেকের মধ্যেই কর্ম্মস্থানের সেরা উকিল হইয়া উঠিলেন। সেখানে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি ও ঐশ্বর্য্যের সীমা রহিল না। দেশেও দেখিতে দেখিতে বাড়িঘর পুকুর বাগান জমিজমা করিয়া ফেলিলেন। তাঁর অসাধ্যসাধনে সকলে বিস্ময় মানিল।

তিনি কেবল স্ত্রীটিকে মানুষ করিতে পারিলেন না। সে যেমনটি গিয়াছিল ঠিক তেমনিই রহিল। বয়োবৃদ্ধি, মাতৃত্ব, অর্থ ও মর্য্যাদা কিছুতেই তার বুদ্ধির গোড়ায় জল পড়িল না।

বিবাহের পর শাশুড়ীর আদেশে সে কুলগুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহারই শিক্ষায় সে স্থানে অস্থানে বাড়ির সর্ব্বত্র, এমন কি আসবাবপত্র ও শয্যাতেও অশুচিতা দেখিতে পাইত। নিতান্ত পীড়িত না হইলে সে একদণ্ড স্থির থাকিতে পারিত না। ঝকঝকে মাজা বাসনে আপাতদৃষ্টিতে যেখানে ধূলিকণা পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইত না, তার মাঝ হইতে সে শকড়ি বার করিবার চেষ্টায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিত, তারপর যখন তার মনে হইত ঐ অশুচি পদার্থটি আবিষ্কারে সফল হইয়াছে, তখন সেই বিশেষ বাসনখানি এবং সঙ্গে সঙ্গে স্পর্শদোষদুষ্ট বাসনের ভাঁই প্রচুর জল ও খড়িকার সাহায্যে শুদ্ধশুচি করিতে বসিয়া যাইত। তারপর শকড়ি ঘাঁটার দরুণ পরিহিত বস্ত্র অশুদ্ধ হওয়াতে শীতগ্রীষ্মবর্ষা নির্ব্বিশেষে প্রচুর জল ঢালিয়া অঙ্গ এবং বস্ত্র প্রক্ষালন করিত। তারপর দাঁত এবং হাতপায়ের নখ খুঁটিয়া কাল্পনিক অশুচিতার হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের চেষ্টায় দেহমনকে ক্লান্ত পীড়িত এবং বিরক্ত করিয়া ছাড়িত।

চন্দ্রবাবু পত্নীর ঠিক বিপরীত। তিনি শিক্ষিত সুপুরুষ এবং সৌখীন লোক ছিলেন। গানবাজনা খেলাধুলা পড়া-শুনা সবেতেই তাঁর প্রচুর অনুরাগ। তিনি ছিলেন আসল বৈঠকী মানুষ। বাড়ীতে প্রায়ই বন্ধু-সম্মিলন হইত। গায়ক বাদক কেহ আসিলে ত কথাই নাই। সেরূপ ক্ষেত্রে স্থানীয় ভদ্রলোকেরা সকলেই নিমন্ত্রিত হইতেন। তাঁহাদের শ্রবণ ও রসনা পরিতৃপ্তির আয়োজনের ত্রুটি হইত না।

কেতাদুরস্ত চালচলন, খেলাধূলায় পারদর্শিতা এবং তাঁর আকৃতি ও প্রকৃতির জন্য ইংরেজ-মহলেও চন্দ্রবাবুর খুব খাতির ছিল। চা ও টেনিস-পার্টিতে প্রায়ই তাঁর নিমন্ত্রণ হইত।

প্রথম প্রথম তিনি পত্নীর আব্রু ঘুচাইবার জন্য একটু চেষ্টা করিয়াছিলেন। দু'চার দিন সন্ধ্যার পর পত্নীকে পাশে বসাইয়া ডগকার্ট হাঁকাইয়া হাওয়া খাইতে বাহিরও হইয়াছিলেন কিন্তু মুক্তি জিনিসটা কাত্যায়নীর ধাতে সহিল না, সে বিদ্রোহ করিয়া বসিল। লজ্জাসরম খোয়াইয়া সে বিবি সাজিতে স্বীকার পাইল না! চন্দ্রবাবু বিরক্ত হইয়া সে চেষ্টা ছাড়িলেন। জেদি মানুষ হইলেও এ ক্ষেত্রে তার পরিচয় পাওয়া গেল না।

চন্দ্রবাবুর আশা ছিল পত্নীকে গড়িয়া পিটিয়া একটু মানুষ করিয়া তুলিবেন—অন্তত সে যাহাতে তাঁর ইংরেজ বন্ধুদের আদর আপ্যায়ন করিতে পারে—অভ্যাগতদের সঙ্গে দুটা কথা বলিতে পারে। সে আশা পূর্ণ হইল না। ফলে কাত্যায়নী যে-পরিমাণে অন্দর আশ্রয় করিল তিনিও ঠিক সেই পরিমাণে সদর-ঘেঁষা হইয়া পড়িলেন।

আহারাদি সম্বন্ধে চন্দ্রবাবুর উদারতা ছিল অসীম। বাবুর্চ্চির রাঁধা কুক্কুটমাংস পরম তৃপ্তির সহিত তিনি নিয়মিত ভক্ষণ করিতেন এবং বড়দিনের সময়, তাঁরই মত উদারচিত্ত হিন্দু ও অহিন্দু বন্ধুবান্ধবের সহিত, বিরাট ভোজের আয়োজন করিয়া কুক্কুটমাংসের চেয়েও গুরুতর পদার্থ উদরস্থ করিতেন।

বলা বাহুল্য, এ সমস্ত ব্যাপার সদর বাড়িতেই ঘটিত। শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে চন্দ্রবাবুকে কাপড় ছাড়িয়া গঙ্গাজল মাথায় দিতে হইত। তাহাতে তাঁর কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না।

তিনি সন্ধ্যা-আহ্নিকের ধার-ধারিতেন না, তবে ক্রিয়া-কর্ম্ম উপলক্ষে পট্টবস্ত্র পরিয়া আঙুলে পৈতা জড়াইয়া খুব ঘটা করিয়া নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের মতই গুরু-উচ্চারিত মন্ত্র আবৃত্তি করিতেন। প্রবাস যাত্রাকালে গুরু পাঁজি দেখিয়া যে দিনক্ষণ ব্যবস্থা করিতেন তাহাতে অসুবিধা হইলে বলিতেন, দেখুন ঠাকুরমশাই! অমুখ তারিখে গেলে ত আমার চলবে না! আমি পরশুই যেতে চাই!

গুরু তখনি বলিতেন, হ্যাঁ হ্যাঁ তা পারো, যেতে পারো বৈকি! যে দিন তোমার সুবিধে সেই দিনই শুভ দিন। তুমি যেয়ো, আমি অনুমতি দিচ্ছি!

দক্ষিণহস্তের ব্যাপারটা বড়ই বেয়াড়া ব্যাপার, উহা যাহাতে অক্লেশে সমাধা হয় তারই চেষ্টা করা বুদ্ধিমান জীবের কর্ত্তব্য, একথা চন্দ্রভূষণের কুলগুরু ভালই বুঝিতেন। তাই তিনি শাস্ত্রকে যত না ডরাইতেন ধনী শিষ্যের অসন্তোষকে ভয় করিতেন তার চেয়ে ঢের বেশি।

নবনির্ম্মিত পল্লীভবনে প্রবেশ উপলক্ষে চন্দ্রবাবুর পিতা আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়িতে দুর্গোৎসব করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। চন্দ্রবাবু পিতার ইচ্ছা কোনদিনই অমান্য করেন নাই, এবারও করিলেন না।

পূজার কয়দিন নিমন্ত্রিত সকলেই চন্দ্রবাবু ও তাঁর পত্নীর প্রচুর আদর আপ্যায়ন ও আতিথেয়তায় তুষ্ট হইল, ছোটবড় নির্ব্বিশেষে পরিবারের সকলেই উৎকৃষ্ট বসন-ভূষণ উপহার পাইল এবং গ্রামের ধনীদরিদ্র সপ্তাহকাল ভুরিভোজনে পরিতৃপ্ত হইল।

সকলেই ধন্য ধন্য করিয়া বলিতে লাগিল চন্দ্রবাবুর লেখাপড়া শেখা সার্থক হইয়াছে। চন্দ্রের স্ত্রী যে পয়মন্ত মেয়েদের সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ রহিল না।

বনার্জ্জি-সাহেব

ধরণীর মুখে কুয়াশার গুণ্ঠন। তারই মাঝ দিয়া, অবগুণ্ঠিত নারী-আঁখির অস্পষ্ট আলোর মত, প্রতিহত সূর্য্যালোক একদা প্রভাতে আত্মপ্রকাশের জন্য আকুলি-বিকুলি করিতেছিল।

এক নাতিপ্রশস্ত কক্ষের মধ্যে তক্তপোষের উপর র‍্যাপার মুড়ি দিয়া বসিয়া অমর ও সুকুমারী পাঠাভ্যাসে রত, পাশে এক যুবক গভীর মনোযোগের সহিত একখানি বিরাটকায় বাংলা সাপ্তাহিক পড়িতেছে। সহসা সে হো-হো করিয়া হাসিয়া আপনমনে বলিল, ওঃ জুতো যা মেরেছে!

ভাইবোনে উৎকর্ণ হইয়া উঠিল আর কিছু শুনিবার আশায়, কিন্তু যখন তারা দেখিল শিক্ষক-মহাশয় নীরবে পুনরায় কাগজের মধ্যে ডুবিয়া গেলেন তখন অসহ্য কৌতূহলে তারা আর স্থির থাকিতে পারিল না। সুকুমারী জিজ্ঞাসা করিল, কে দাদা? কাকে জুতো মারলে?

যুবক কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়া মাথা নাড়িয়া গম্ভীরভাবে বলিল, আছে!

তাহারা আবার পড়িতে সুরু করিল। ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধচিত্তে অনুযোগ করিতে লাগিল, কাহাকে জুতা মারিল, কে মারিল এবং কেন মারিল তাই যদি না বলিবে তবে অনর্থক কথাটা বলাই বা কেন? এ বড় অন্যায়!

চন্দ্রবাবুর পল্লীভবনের সন্নিকটে আগাছাবেষ্টিত এক জীর্ণ পোড়োবাড়িতে বামাপদ বাস করিত। পল্লীসম্পর্কে সে চন্দ্রবাবুর খুড়া, তাই অমর ও সুকুমারী তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকিত। গ্রামের স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া সে বাড়িতেই বসিয়া ছিল। গ্রামের আর পাঁচজন নিষ্কর্ম্মার মত দুঘণ্টা ধরিয়া তেল মাখিয়া, তাস পিটিয়া, মাছ ধরিয়া, দিবানিদ্রা দিয়া, পরচর্চ্চা করিয়া, হিন্দু-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া সে পরম উদাসীন ও নিশ্চিন্তমনে কালক্ষেপ করিতেছিল, এমন সময় চন্দ্রবাবু পূজা-উপলক্ষে বাড়ি আসিয়া তাহাকে বিহারে যাইবার জন্য আহ্বান করিলেন। সে তাঁর বাড়িতে থাকিয়া ছেলেমেয়েকে পড়াইবে আহার, বাসস্থান ও কিছু কিছু হাতখরচার বিনিময়ে। তদুপরি চন্দ্রবাবু প্রতিশ্রুত হইলেন কাছারিতে তার একটি চাকুরি জুটাইয়া দিবেন। তাঁর আহ্বান বামাপদ প্রত্যাখ্যান করে নাই।

নূতন দেশ অমর ও সুকুমারীর বেশ লাগিল। মস্ত বড় বাড়ি, চারিদিকে শ্যামল তৃণমণ্ডিত অবারিত খোলা মাঠ। বড় বড় আমের বাগান। আশপাশে কয়েকঘর বাঙালীর বাস। তাহাদের ছেলেমেয়েকে খেলার সাথী-রূপে পাইয়া ভাইবোনে খুসি হইল।

মাঠের ওপারে সাঁওতালদের বস্তি। তাহাদের কি সুঠাম সুন্দর নিটোল পরিপূর্ণ দেহ, মনে হয় যেন কালো পাথর কুঁদিয়া কোনো নিপুণ শিল্পী তাহাদের গড়িয়াছে! কাজ আর খেলার মধ্যে তাদের যেন কোনো ব্যবধান নাই। কাজের মাঝে একটু অবসর পাইলেই তারা নাচ গান সুরু করিয়া দেয়। হাতে হাত ধরিয়া স্ত্রীপুরুষে চক্রাকারে মাদলের তালে তালে নাচিতে থাকে, দেখিয়া ভাইবোনে মুগ্ধ হইয়া যায়।

পল্লীর পানাপুকুর, বাঁশবন, ঝোপঝাড় আর দুরন্ত মশার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তাহারা পরিতুষ্ট হইল। মুস্কিল বাধিল কেবল ভাষা লইয়া, সেটা তারা চটপট আয়ত্ত করিতে পারিতেছিল না। মাঝে মাঝে মফস্বল হইতে বিহারী মক্কেলরা ছইতোলা গোযানে চড়িয়া সদল-বলে আসিয়া পৌঁছিত চন্দ্রবাবুর আস্তাবলের ধারে তাহারা আড্ডা গাড়িত। তাহারা কি বলে এবং কি করে জানিবার জন্য ভাইবোনের কৌতূহলের আর অন্ত থাকিত না।

স্নানান্তে যখন তারা কলাপাতার উপর ভিজা চিঁড়া, দৈ ও চিনির ফলার সশব্দে খাইতে বসিত বা জলেমাখা ছোলার ছাতু গুড় অথবা লঙ্কা সহযোগে উদরস্থ করিতে

করিতে দুর্বোধ ভাষায় কথাবার্তা কহিত তখন তারা দুজনে নির্বাক বিস্ময়ে দেখিতে থাকিত। আবার যখন তারা নথিপত্র লইয়া পিতার আপিসঘরে বসিয়া তাঁহাকে মকর্দ্দমা বুঝাইতে বসিত এবং কোপনস্বভাব চন্দ্রবাবু তাঁর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না পাইয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া চীৎকার করিয়া কাগজপত্র দূরে নিক্ষেপ করিতেন, তখন ভাইবোনে সভয়ে দূরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বিহারীদের মুখের বিব্রত ভ্যাবাচাকা ভাব দেখিয়া হাসিবে কি কাঁদিবে ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিত না।

বামাপদ মাঝে মাঝে ছাত্র ও ছাত্রীর কাছে এক একটা আশ্চর্য্য কথা বলিয়া তাহাদের কৌতূহল উদ্রিক্ত করিয়া নীরবতা অবলম্বন করিত। তার সেই সব কথাবার্ত্তা ভাইবোনের কাছে ভারি রহস্যময় ঠেকিত, তাদের শিশুচিত্ত সেই সব রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রহস্য রহস্যই থাকিয়া যাইত।

একদিন পড়ার সময় ভূমিকম্পের কথা উঠিল। বামাপদ তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিল, ও আর এমন কি! আমায় কেউ পাঁচটাকা দিলে আমি ভূমিকম্প করিয়ে দিতে পারি!

ভাইবোনে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেমন করে' দাদা? কি করে'?

বামাপদ মাথা নাড়িয়া বলিল, আছে!

বামাপদ সর্ব্বদাই চাটুয্যে-মশায়ের গল্প করিত। লোকটি না কি বামাপদর ভগ্নীপতি। জগতের যা কিছু আশ্চর্য্য অভিনব ব্যাপার তিনি করিতে পারেন! তাঁর বাড়িতে একবার এক ভদ্রলোক বেড়াইতে গিয়া বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন এমন সময় চাটুয্যে-মশাই ঘরে প্রবেশ করিলেন—দু'হাতে দুইটা বাঘের কান ধরিয়া টানিতে টানিতে! এমন সহজে যেন দুইটা বিড়ালছানা! দেখিয়া ভদ্রলোক ওরে বাবারে বলিয়া লাফাইয়া উঠিয়া একেবারে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিলেন! চাটুয্যে-মশাই যত বলেন, মশাই পালাবেন না, ভয় নেই, পোষা বাঘ, কে কার কথা শুনে! চাটুয্যে-মশাই হাসিয়াই অস্থির!

চাটুয্যে-মশাই কি বলেন, কি করেন, কি খান, তাঁর কত টাকা, কত বড় বাড়ি, কয়খানা গাড়ি, ইত্যাকার নানাবিধ সংবাদ বামাপদ নিয়ত বিস্ময়বিমূঢ় ছাত্র ও ছাত্রীকে শুনাইত। শুনিতে শুনিতে চাটুয্যে-মশাই নামক অদৃশ্য ব্যক্তিটি তাহাদের চিত্তলোকে আরব্য-উপন্যাসের কোনো সৌখীন অদ্ভুতকর্ম্মা দৈত্যের মতই জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

বিহারে পৌঁছিবার বছরখানেক পরে একদিন অপরাহ্নে অমর বাড়ির সম্মুখের প্রাঙ্গণে লাটিম ঘুরাইতেছে, এমন সময় হ্যাটকোটধারী বিশালকায় এক ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত। প্রচুর দাড়িগোঁফে ঢাকা ঠোঁটের মধ্যে মস্ত এক জলন্ত বর্ম্মা-চুরুট। তাহাকে দেখিয়া অমর ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল। ঈষৎ হাসিয়া 'কি রে এদিকে আয়' বলিয়া ভদ্রলোক যেই তার দিকে হাত বাড়াইয়াছেন সে অমনি তীরবেগে ছুটিয়া অন্দরমহলে উপস্থিত হইল। ভীতকণ্ঠে কাত্যায়নীকে বলিল, মা একটা মস্ত বড় সায়েব আমাকে ধরতে এসেছিল! ঐ দেখনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুরুট খাচ্ছে!

কাত্যায়নী জানালা দিয়া আগন্তুককে সাবধানে নিরীক্ষণ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। কহিল, ওমা! ও যে তোর পিসেমশাই! সায়েব হতে যাবে কেন!

এস্‌-বনার্জ্জি-এস্‌কোয়ার শুভক্ষণে বিশ-বিদ্যালয়ের জাঁতাকল পরিহার করিয়া ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিয়াছিল। দশ বারো বৎসরে সে একজন পাকা দালাল হইয়া উঠিল, এবং পোশাকে পরিচ্ছদে পানাহারে এবং ইংরেজি বুলিতে খাঁটি সাহেবকেও পরাস্ত করিল। বাড়িতে সে খালি গায়ে মোটা পৈতা ঝুলাইয়া একেবারে কুলীন-সন্তান আর বাহিরে সাহেবী পোশাকে নিষিদ্ধ মাংস ভোজনে এবং হুটলাণ্ডের সোমরস সেবনে সম্পূর্ণ বিজাতীয়

জীব। তখন তাহাকে ব্রাহ্মণসন্তান বলিয়া চেনে কার সাধ্য।

বেহারাকে কেমন করিয়া তালিম করিয়াছে কাত্যায়নীর অনুরোধে সাহেব একদিন দেখাইল। বেহারাকে বলিয়া দিল, সাহেব ডাকবাঙলাতে আছেন ইহাই বুঝিয়া রাখ্।

বেহারা বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল।

সাহেব বাঁকা সুরে ডাকিল, বেয়ারা!

বেহারা তৎক্ষণাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া সিধা হইয়া দাঁড়াইয়া মিলিটারি ষ্টাইলে সেলাম ঠুকিয়া উত্তর দিল, সাব্!

বেহারা আবার বাহিরে গেল।

সাহেব বলিল, এবার আর সাহেব নই, বাবু। বাড়িতে আছি। মনে রাখিস!

বাবু ডাকিল, নিকুঞ্জ!

বেহারা ভিতরে আসিয়া জোড়হাতে ত্রিভঙ্গমুরারি হইয়া দাঁড়াইয়া ভেতো বাঙালীর সুরে উত্তর দিল, আজ্ঞে বাবু!

প্রতিদিন সন্ধ্যা একটু অগ্রসর হইবার পর সাহেব বোতল ও গেলাস লইয়া নিভৃতে একটি ছোট ঘরে গিয়া বসে। বোতল নিঃশেষ হওয়ার আগে আর স্থানত্যাগ করে না।

প্রথম যেদিন কাত্যায়নী নন্দাইয়ের জন্য নানাবিধ সুখাদ্য প্রস্তুত করিয়া খাইতে দিল তখন সে তার গুণের পরিচয় পায় নাই। খাইতে বসিয়া সাহেব একটু-আধটু মুখে দিয়া হঠাৎ জড়িতকণ্ঠে বলিল, এ কি বৌদি' সাবান দিয়েছ? বলিয়াই কাত্যায়নী কিছু বুঝিবার আগেই কচুরি লইয়া গেলাসের জলে ডুবাইয়া তার নগ্ন ভুঁড়ির উপর ঘষিতে লাগিল। সেটা যে সাবান নয়, কচুরি, তাহা কাত্যায়নী বারম্বার বলিয়াও বুঝাইতে না পারিয়া অবশেষে রাগে দুঃখে অপমানে সে-স্থান ত্যাগ করিল। বেহারা তখন তার বিবস্ত্রপ্রায় জ্ঞানহীন প্রভুকে কোনমতে তুলিয়া শয্যায় ফেলিয়া দিল।

পরদিন বেলা নয়টার আগে সাহেবের ঘুম ভাঙিল না। তারপর অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সহিত বেহারার সাহায্যে স্নান সারিয়া বেশভূষা করিয়া চা ও জলযোগ সারিয়া চুরটমুখে সে যখন বাহির হইয়া গেল তখন কে বুঝিবে সেই লোকটাই পূর্ব্ব রাত্রে মদ খাইয়া কেলেঙ্কারির একশেষ করিয়াছিল।

ঘণ্টাদুই পরে সাহেব ফিরিল। পোশাক ছাড়িয়া ধুতি পরিয়া দিব্য ভালমানুষটির মত খাইতে বসিয়া হাসির গল্প বলিয়া সে কাত্যায়নীর পেটে খিল ধরাইয়া ছাড়িল। সুরাপানের জন্য অনুযোগ করিলে সে খপ্ করিয়া কাত্যায়নীর পা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, এই তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি গাললুম বৌদি'—ও ছাই আর ছোঁব না! কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় আর সে-কথা স্মরণ রহিল না। সাহেব হাকিল, বেয়ারা! পেগ্ লেয়াও!

যাহাকে দেখিয়া প্রথম দিন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল কয়েকদিনের মধ্যেই তার সঙ্গে অমরের খুব ভাব হইয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল পিসেমহাশয় অতি সহৃদয় লোক, এবং তাঁর বেহারা রাঁধে চমৎকার। প্রায়ই সে প্রভুর জন্য নানাবিধ ইংরেজি ও মোগলাই খানা প্রস্তুত করিত। সাহেব হুকুম করিলেন, সে- খানার অংশ অমরও পাইবে। ষ্টু, কারি, কাটলেট, রোষ্ট, কোপ্তা, কোর্ম্মা ইত্যাদির সহিত দিনে দিনে অমরের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। রসনা-পরিতৃপ্তির এমন সুযোগ ইতিপূর্ব্বে তার ভাগ্যে কখনো ঘটে নাই।

বাহিরে যাইবার আগে বেহারার সাহায্যে সাহেব যখন পোশাক পরিত অমর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিত। দেখিয়া তার বিস্ময়ের অন্ত থাকিত না। পোর্টম্যান্ট্-ভরা পোশাক, কত রঙের, কত রকমের। একটি পোশাক সাহেব একদিনের বেশি পরে না। সার্ট, কলার, টাই, ড্রয়ার্স, কোট, ভেষ্ট, ট্রাউসার্স, সক্স্, হ্যাট প্রভৃতি পোশাকের বিভিন্ন অংশের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া অমর জানিয়া লইল। সে ইহাও জানিল মাথার টুপি হইতে পায়ের জুতা পর্য্যন্ত সমস্তই ইংরেজের দোকানে কেনা,

খাস বিলাতে প্রস্তুত। ভাল জিনিস ইংরেজের দোকানে ছাড়া পাওয়া যায় না, এ কথা সাহেবের মুখে বারবার শুনিয়া বিলাতি জিনিসের উপর অমরের ভারি একটি শ্রদ্ধা জন্মিল। সে ভাবিতে লাগিল বড় হইয়া সে যেদিন পিসে-মহাশয়ের মত সাহেব সাজিতে পারিবে সেদিন কি গৌরবের দিন!

মাসখানেক পরে বিদায়কালে সাহেব অমরকে আশ্বাস দিয়া গেল, এবার যখন আসিবে, তখন তাহাকে দার্জ্জিলিং বেড়াইতে লইয়া যাইবে। দার্জ্জিলিং হিমালয়ের উপর, সেখানে ভারি শীত, তবে সেজন্য কোনো ভয় নাই! সেখানে পৌছিয়া অমরকে হোয়াইটএওয়েলেড্‌ল'র দোকান হইতে ফ্লানেল সার্ট্‌ ও উলেন সক্‌স্‌ কিনিয়া দিবে!

পিসেমহাশয় চলিয়া গেল। বালক অমর সাহেব-বাড়ির পোশাক এবং অভ্রভেদী তুষারকিরীটী হিমালয়ের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

৫

কলিকাতা

সুকুমারী সেই সবেমাত্র দশে পা দিয়াছে।

আহারাদির পর চন্দ্রবাবু পাশবালিস জড়াইয়া ঘুমের প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় কাত্যায়নী ডাকিল, শুন্‌ছ? ঘুমুলে না কি?

চন্দ্রবাবু নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, প্রায়।

কাত্যায়নী বলিল, বলি শোনো। ঘুমিয়োনা।

আসন্ন নিদ্রার ব্যাঘাতে মনে মনে বিরক্ত হইয়া চন্দ্রবাবু বলিলেন, বল না কি বলবে।

কণ্ঠে যথেষ্ট ঝাঁঝ পুরিয়া কাত্যায়নী বলিল, বলবো কি আর ছাইমাথা মুণ্ডু! বলছি কি, মেয়ে যে ধিঙ্গি হয়ে উঠলো, তার একটা বিয়ে-থাওয়ার জোগাড় দেখতে হবে তো!

চন্দ্রবাবু বলিলেন, এখন তো ছেলেমানুষ, এত ব্যস্ত হবার কারণ কি? একটু লেখাপড়া করচে, করুক না!

কাত্যায়নী খ্যাঁক্‌ করিয়া উঠিল। নেকাপড়া! নেকা-পড়া শিখে মেয়ে চাকরি করবে না কি?

বোবার শত্রু নাই ভাবিয়া চন্দ্রবাবু মৌনাবলম্বন করি-লেন, কিন্তু কাত্যায়নী থামিবার পাত্রী নয়। নিজের বক্তব্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সে অনর্গল বকিতে লাগিল।

চন্দ্রবাবু কোর্টে গিয়া অনেক উকিলের সহিত বাক্‌যুদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু পত্নীর বাক্যস্রোতের সম্মুখে তিনিও আপনাকে অসহায় বোধ করিতে লাগিলেন।

কয়েকদিন ধরিয়া পত্নীর বক্তৃতা শুনিয়া শুনিয়া তাঁর এমন অবস্থা ঘটিল যে, সন্ধ্যা হইলেই, অচির ভবিষ্যতে শয্যার আশ্রয়ে আবার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে ভাবিয়া তাঁর বুকটা দুরুদুরু করিতে থাকিত। পত্নী-সম্ভাষণ ব্যাপারটি আদৌ রোমান্টিক মনে হইত না।

এই বিভীষিকার হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের আশায় শেষ পর্য্যন্ত তিনি হার মানিলেন। কলিকাতায় দর্জ্জিপাড়ায় বাড়ি ভাড়া করিয়া পরিবারবর্গকে সেখানে পাঠাইয়া দিলেন। স্থির হইল সেখানে নানাদিক্‌দেশাগত বরপক্ষীয়দিগকে কন্যা দেখানো হইবে। আর তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর ফণীভূষণ সেখানে থাকিয়া সকলের খবরদারি করিবে।

কলিকাতা শহর অমরের কাছে বিরাট বিপুল দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যময়। সে ইহার সম্বন্ধে কিছুই জানে না, অথচ কত কথা তার জানিবার সাধ হয়। এ শহরের সহিত তার পরিচয় বাড়ির ছাদের উপর হইতে, কারণ সে ছেলেমানুষ, তার পথে বার হওয়া মানা। অপরাহ্নকালে ছাদের উপর উঠিয়া দিকে দিকে সে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেয়। দেখে গৃহচূড়া দূর দূরান্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছে অনন্ত পারাবারের মত। মাঝে মাঝে এক একটা থামের মত চিম্‌নি গৃহ-চূড়ারও ঊর্দ্ধে উঠিয়া নিরন্তর ধূম উদ্গীরণ করিতেছে। আকাশে ছোট বড় নানা রঙের ঘুড়ি, তারও উপরে চিলের

দল ক্রমাগত ঘুরপাক খাইতেছে। ঐ ঘুড়িগুলা কে কোন্ বাড়ি হইতে উড়াইতেছে জানিতে পারিলে বেশ হয়, কিন্তু জানিবার উপায় নাই। এত যে-সব বাড়ি দেখা যায় সে-সব বাড়িতে কারা থাকে, তারা কি করে, কোন্ পথ দিয়া গেলে সেখানে পৌছানো যায়, সেখানকার লোকেরা অমরদের বাড়ির ছাদ দেখিয়া কি ভাবে, সে-সব বাড়িতে তার মত ছোট ছেলে আছে কি না, এ-সব কথা জানিবার তার সাধ হয়। সন্ধ্যাগমে বাড়ির ছাদের উপর দিয়া উনানের ধোঁয়া উঠে, পশ্চিম দিগম্বরালে রক্তমেঘে সূর্য্য ডুবিয়া যায়, তারপর ধীরে ধীরে একটি দুটি করিয়া তারা ফুটিয়া উঠে, তারপর কখন অগোচরে অনন্ত নীলাকাশ নক্ষত্রে খচিত হইয়া যায়। বারবার সে তারাগুলি গুণিবার চেষ্টা করে, গুণিতে পারে না। ভাবে, কেহ কি তারা গুণিতে পারে ?

অমরের একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছে। তার বয়স বেশি নয়, সে কলেজের ছাত্র। তারই কাছে অমর সন্ধ্যার পর পড়িতে বসে। রাস্তায় ঘর্ঘরশব্দে গাড়ি চলে। অমর পড়িতে পড়িতে ভাবে, গাড়িখানা তাহাদের বাড়ি দাঁড়াইবে না কি ? তারপর হয়তো কুল্‌ফি বরফওয়ালা হাঁকিয়া যায়, চাই বরেফ্, বরেফ্! অমর ভাবে, কুল্‌ফি বরফ বড় ভালো জিনিস। সে যদি এখন কিনিয়া খাইতে পারিত! ভাবিতে ভাবিতে এক একদিন ভুলিয়া যায় শিক্ষকের সুমুখে বসিয়া সে পড়া মুখস্থ করিতেছে। ভাবে বরফওয়ালা তাহাকে যেন জিজ্ঞাসা করিল, কি খোকা, বরফ চাই ?

অমর সত্যসত্যই বলিয়া ফেলে, আমার তো পয়সা নেই।

শিক্ষক অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করে, কি বল্লে ?

অমরের তখন চৈতন্য ফিরিয়া আসে, সে লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি বলে, নাঃ কিছু নয়!

মধ্যাহ্নে যখন খররৌদ্র খাঁখাঁ করে, কাত্যায়নী আহার সারিয়া শয়নকক্ষের আশ্রয় লয়, অমর তখন বাহিরের ঘরে বসিয়া বসিয়া পথের পানে চাহিয়া থাকে। পাড়া নিস্তব্ধ, পথ নির্জ্জন। গাড়ির শব্দও বড় একটা পাওয়া যায় না। ক্বচিৎ কখনো চুড়িওলা হাঁকিয়া যায়, বেলোয়ারি চুড়ি চাই, বালা চাই, কাঁচের খেলানা চাই-এ! কি জানি কেন ঐ ডাক শুনিলে অমরের বুকের ভিতরটা যেন ফাঁকা-ফাঁকা বোধ হয়, তার কান্না আসে। তপ্ত নির্জ্জন বাথাতুর মধ্যাহ্নের সঙ্গে ঐ চুড়িওলার ডাকটা মিলিয়া মিশিয়া মনের মাঝে এমন একটা হতাশার সৃষ্টি করে যেটা অনুভব করা যায় মাত্র, বুঝানো যায় না।

অনেক রাত্রে এক একদিন ঘুম ভাঙিয়া অমর শুনিতে পায় গঙ্গার উপর হইতে জাহাজের বাঁশি ভোঁ-ভোঁ করিয়া বিলম্বিত গুরুগম্ভীর স্বরে বাজিতেছে। তার মনে হয় বাঁশি যেন তাহাকে ডাকিয়া বলিতেছে, এস এস বাহিরে এস! নদী সমুদ্র পাড়ি দিয়া নব নব অজানা দেশে যাত্রা কর। অমর বিছানায় শুইয়া শুইয়া নিদ্রা ও জাগরণের মাঝে ভাবিতে থাকে কোথায় যায় ঐ সব জাহাজ, সে কোন্ দেশে, কত দূরে ?

দর্জ্জিপাড়ার বাড়ির সুমুখে কম্পানির বাগান। ছোট ছেলেমেয়েদের সেখানে খেলা করিতে দেখিয়া একদিন সকালবেলা অমর বাগানের প্রবেশপথে গিয়া দাঁড়াইল। লোহার ঘোরানে ফটকের উপর এক পা দিয়া অন্য পা মাটিতে ঠুকিয়া ঠুকিয়া একটি বালক ঘুরপাক খাইতেছিল। অমর প্রশংসমান সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া রহিল।

বালকের দৃষ্টি বোধ করি অমরের উপর পড়িয়াছিল এবং তার মনোগত ইচ্ছাটাও সে বুঝিতে পারিয়াছিল।

ফটক-ঘুরানো থামাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, ঘুরবি ?

অমর ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলে সে তাহাকে হাত ধরিয়া ফটকে চাপাইয়া ঘুরিবার কায়দাটা শিখাইয়া কহিল, এমনি করে' ঘোরা। ভয় করবে না ?

অমর বলিল, না।

তারপর বালক কখন বাগানের মধ্যে চলিয়া গেল নূতন খেলার আনন্দে অমর দেখিতে পাইল না।

হঠাৎ রুক্ষকণ্ঠে কে যেন বলিল, এই ছোঁড়া থাম্!

সভয়ে খেলা থামাইয়া অমর দেখিল তিনটি ছেলে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহারা তার চেয়ে অনেক বড়।

একজন বলিল, ঘুরছিলি যে বড়ো?

এ প্রশ্নের কি উত্তর দিবে ভাবিয়া না পাইয়া অমর চুপ করিয়া রহিল।

অপর একজন জিজ্ঞাসা করিল, থাকিস কোথা?

অমর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বাড়ি দেখাইয়া দিল।

তখন প্রথম ছেলেটি বলিল, ফের যদি কখনো ঘুরিস দেখতে পাবি মজা! তাহলে দর্জ্জিপাড়ার ঠোকাঠুকি, জানিস ত!

এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে তিনজনে বাগানে প্রবেশ করিল।

দর্জ্জিপাড়ার ঠোকাঠুকি ব্যাপারটি কি অমর বুঝিল না, কিন্তু সে ইহা বিলক্ষণ বুঝিল যে অতঃপর আর সেখানে থাকা যুক্তিসঙ্গত নয়। তাই সে এদিক-ওদিক চাহিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ভীতিবিহ্বলমুখে ছুটিয়া বাড়িতে ঢুকিতে গিয়া একেবারে খুড়ামহাশয়ের গায়ের উপর পড়িয়া সঙ্কুচিতভাবে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

ফণীভূষণ ক্ষণকাল তার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি রে, কি হয়েছে?

অমর সাহস পাইয়া আদ্যোপান্ত সব কথা বিবৃত করিল।

ফণীভূষণ বলিল, আয় আমার সঙ্গে। ছেলেগুলোকে দেখিয়ে দিবি চল্!

অমর মনেমনে খুব খুসি হইল। এইবার বদ ছেলে-গুলার শাস্তি হইবে!

বাগানের ভিতরে অগ্রসর হইয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া অমর বলিল, ঐ বলেছিল, দর্জ্জিপাড়ার ঠোকাঠুকি!

ছেলের দল কি হইয়াছে বুঝিবার আগেই ফণী খপ্ করিয়া নির্দ্দিষ্ট ছেলেটির কান চাপিয়া ধরিয়া তার মাথায় প্রবল ঝাঁকানি দিয়া রুষ্টস্বরে কহিল, কেন একে গাল দিয়েছিস?

ইতিমধ্যে ব্যাপার দেখিয়া ছেলেটির সঙ্গীদ্বয় সভয়ে দূরে সরিয়া গিয়াছিল। অপ্রত্যাশিত আক্রমণে ধৃত ছেলেটি একেবারে বেকুব বনিয়া গেল। আমতা-আমতা করিয়া বলিল, আজ্ঞে, ও ছেলেমানুষ, ওর সঙ্গে আমাদের ঝগড়া কিসের—

ফণীভূষণ হাঁক দিয়া বলিল, চোপ্ রও! আর একটি কথা বলেছ কি কানটা ছিঁড়ে ফেলবো!

কিছুকাল পরের কথা। সকাল সাড়ে আটটার সময় রান্নাঘরের সুমুখের দালানে ফণীভূষণ আহার করিতেছিল। অদূরে ঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া মাথায় আধ-ঘোমটা টানিয়া কাত্যায়নী চাপাস্বরে পাচককে পরিবেশনে তৎপর হইবার জন্য তাগিদ দিতেছিল।

সুক্তা খাওয়া শেষ করিয়া ফণী হাঁকিল, কৈ হে ঠাকুর! আর কিছু দেবে, না না?

আজ্ঞে হ্যাঁ যাই, বলিয়া পাচক দ্রুতগতি বাহির হইয়া ফণীর থালার পাশে মাছের ঝোলের বাটি রাখিয়া গেল।

বাটি উঠাইতে গিয়া উঃ করিয়া ফণী উহা ফেলিয়া দিল। চীৎকার করিয়া ডাকিল, ঠাকুর! এদিকে এস!

লোকটি অল্পদিন এ-বাড়িতে কাজ করিলেও ফণীকে ভালই চিনিত। সে মনে মনে প্রমাদ গণিল। নবমীপূজার পাঁঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে বাবুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

হুঙ্কার করিয়া ফণী বলিল, এত গরম বাটি আমায় কে দিতে বলেছে?

পাচক আমতা-আমতা করিয়া বলিল, আজ্ঞে তাড়াতাড়ি করছি, আপিসের বেলা হয়ে গেছে, ঝি বাজার থেকে এখুনি এল…

কথা আর শেষ হইল না। ফণী সহসা দাঁড়াইয়া পাচকের গালে ঠাস্ করিয়া চড় কশাইয়া দিল। পাজি হারামজাদা! এমনি করে' রাঁধতে এয়েছ! সঙ্গে সঙ্গে তার পদাঘাতে ভাতের থালা ও মাছের ঝোলের বাটি উঠানে গড়াইয়া পড়িল

শৈশব হইতেই ফণীভূষণ দজ্জাল-প্রকৃতি. তার ক্রোধ অপরিসীম, রাগিলে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। জিনিসপত্র ভাঙিয়া চুরিয়া লোকজনকে মারিয়া ধরিয়া বিকট চীৎকার করিয়া মুহূর্ত্তে লঙ্কাকাণ্ড বাধাইয়া তুলে। কাত্যায়নীর উপর তার একটা জাতক্রোধ ছিল, তাহা কাত্যায়নীর অবিদিত ছিল না, যদিও তার কারণটি তার বুদ্ধির অগম্য। লোকটি নিতান্ত দুর্মুখ, ভুলিয়াও একটা মিষ্টকথা বলিতে পারিত না।

চন্দ্রবাবু তার জন্য কত যে করিয়াছেন বলিয়া শেষ করা যায় না। নিজ সন্তানের এতটুকু অপরাধ যিনি সহ্য করিতেন না, নির্ম্মমভাবে তাহাদিগকে শাস্তি দিতেন, তিনিই কনিষ্ঠ ভ্রাতার সর্ব্ববিধ অশিষ্টতা বর্ব্বরতা ও জুলুম নীরবে সহ্য করিতেন। তার সামনে যেন কেঁচো হইয়া থাকিতেন। কাত্যায়নী অনুযোগ করিলে বলিতেন, ওর মা নেই, ও আমার ছোট ভাই, ও দোষ করলেও আমায় সইতে হবে! ও আমার প্রতি যতই অশিষ্ট ব্যাভার করুক, আমি আমার কর্ত্তব্য করে' যাব!

ফণী সদাগরি আপিসে কাজ করিত। কম্মটি চন্দ্র-বাবুই জুটাইয়া দিয়াছিলেন। লেখাপড়া বেশি না শিখিলেও ফণীর বুদ্ধি ছিল যথেষ্ট। খাটিবার ক্ষমতাও ছিল অসীম। ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে একাই মনখানেক ময়দা মাখিয়া, নেচি কাটিয়া, লুচি ভাজিতে পারিত। সারাদিন চরকির মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া তদারক করিয়া পরিবেশন করিয়া হাঁকডাক করিয়া সকলকে তাক লাগাইয়া দিত। তার দাপটে যোগানদারেরা তটস্থ হইয়া থাকিত, পারতপক্ষে তার সম্মুখীন হইত না, কোথায় কি তুচ্ছ ত্রুটির জন্য লাঞ্ছনাভোগ হইবে কে জানে!

দেবরের সহিত বাক্যালাপে বাধা না থাকিলেও তার অভব্য স্বভাবের জন্য কাত্যায়নী তার সঙ্গে কথা কহিত না। নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই ছেলেপুলে লইয়া এমন লোকের সহিত বসবাস করিতে হইতেছে নহিলে তার মুখদর্শন করিবারও তার ইচ্ছা ছিল না। কলিকাতা পৌঁছিয়াই ছেলেমেয়েকে সে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল, কোনক্রমে তারা যেন খুড়ার বিরাগভাজন না হয়। নিজেও সে ফণীর সন্তোষসাধনের জন্য নিয়ত ব্যস্ত থাকিত। সবচেয়ে বড় মাছের মুড়া তারই পাতে পড়িত, ঘি-ও পড়িত তারই ভাতে সব চেয়ে বেশি। রুটি লুচি একখানি একখানি করিয়া ভাজিয়া ভাজিয়া তার পাতে দেওয়া হইত এবং তার ভাতের উষ্ণতা একচুল কম না হয় সেদিকে কাত্যায়নী বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিত। ফণীর আহার বা অন্যবিধ সুখসুবিধার পাছে কোথাও ত্রুটি হয় এই চিন্তায় তার উদ্বেগের সীমা ছিল না।

দুই ভাই

কলিকাতার স্কুলের নিম্নশ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়া অমরের বিস্ময়ের আর অন্ত নাই। মস্ত বড় চকমিলানো দোতালা বাড়ি। তার কত ঘর, ঘরে ঘরে কত আসবাব। স্কুলে কত শিক্ষক, কত বেহারা দরোয়ান! একটা স্কুলে যে এত ছেলে পড়িতে পারে ইতিপূর্ব্বে অমর কখনো তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই। সে চুপচাপ থাকে, কাহারও সহিত আলাপ করিতে তার সাহসে কুলায় না, অপরিচিতের সহিত কি করিয়া যে ভাব করিতে হয় তা-ই সে জানে না। টিফিনের ছুটির সময় স্কুলের মাঠে ছেলের হল্লা করিয়া একটা মস্ত ফাঁপানো বল পা দিয়া যথেচ্ছ

মারিয়া ধাক্কাধাক্কি ছুটাছুটি করিয়া খেলিতে থাকে। অমর শুনিল, খেলার নাম ফুটবল-খেলা।

স্কুলে ভর্ত্তি হইবার কয়েকদিন পরে একদিন টিফিনের ছুটির সময় অমর বারান্দার এককোণে দাঁড়াইয়া একমনে ছেলেদের ফুটবল-খেলা দেখিতেছিল, বাড়ির ঠাকুর তখন তাহাকে দুধ খাওয়াইয়া চলিয়া গেছে। এমন সময় তার ক্লাশের একটি ছেলে একমুখ পান খাইয়া ঠোঁট লাল করিয়া সহসা তার পিঠে এক চাপড় মারিয়া বলিল, কি রে! তোর নাম কি?

অমর অপ্রতিভভাবে বলিল, আমার নাম অমর।

ছেলেটি বলিল, আমার নাম কুঞ্জ। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, তুই নতুন ভর্ত্তি হয়েছিস্ না?

অমর বলিল, হ্যাঁ।

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল, খাবার খাবিনি?

অমর বলিল, খেয়েছি।

সে জিজ্ঞাসা করিল, কি খেলি?

অমর বলিল, দুধ।

ছেলেটি হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, তুই এখনো দুধ খাস? তারপর চীৎকার করিয়া ডাকিল, ওরে নীলু শুনেযা, শুনেযা, খোকাবাবু দুদু খেয়েছে!

ডাক শুনিয়া নীলমাধব ছুটিয়া আসিল। ফর্শা ধপধপে নাদুশ-নুদুশ চেহারা, ধোপদেওয়া মিহি কাপড়জামা পরা, গলায় সোনার সরু চেন দোলানো একটি ছেলে আসিয়া দাঁড়াইল। স্নিগ্ধ কৌতুকভরা দৃষ্টি অমরের পানে ফিরাইয়া সে বলিল, তোর দুধ খেতে ভাল লাগে?

অমর বলিল, না।

তবে খাস কেন?

মা যে খেতে বলে!

নীলু বলিল, আয় খাবার খাবি আয়। বলিয়া অমরের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তার হাত ধরিয়া তাহাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

অমর চলিতে চলিতে বলিল, আমার কাছে তো পয়সা নেই।

নীলু বলিল, আরে তার জন্যে তোকে ভাবতে হবে না। সে হবে'খন।

টিফিন-রুমে ছোট বড় মাঝারি কালো ফর্শা মোটা রোগা হরেক রকমের ছেলের দল কোলাহল করিয়া খাবার খাইতেছিল। খাবারওলা নানারকম খাবার লইয়া বসিয়াছে। কোনো কোনো ছেলে বেহিসাবী রকমের খাইয়া চলিয়াছে, যা খুসি যত খুসি খাইতেছে। অমর ভাবিল, ইহারাই সুখী, হিসাব করিয়া ইহাদের খাইতে হয় না! সে হতভাগ্য, দুধ ও সন্দেশ রোজ রোজ খাইয়া তার পেটে চড়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে! দুধ খাইতে অমরের শৈশবকাল হইতেই ঘোরতর আপত্তি ছিল অথচ তাহাকে ঐ জিনিসটাই নিয়মিত এখনো খাইতে হয়। দুধ কে সৃষ্টি করিয়াছিল সে জানে না, কিন্তু যেই করুক, সে মনে মনে তাহাকে নিয়ত অভিসম্পাত দিত।

নীলুর কৃপায় সেদিন অমর প্রাণ ভরিয়া নানাপ্রকার মুখরোচক খাবার খাইয়া পরিতৃপ্ত হইল। বাড়ির চেয়ে স্কুল যে কত ভালো জায়গা সে দিন সে প্রথম উপলব্ধি করিল। বাড়িতে সদাই ভয় কখন খুড়ামহাশয় হুঙ্কার দিয়া উঠিবেন, সেখানে নীলুর মত সহৃদয় বন্ধু কোথায়?

একদিন অপরাহ্নে স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিয়া অমর দেখিল পিতা আসিয়াছেন। সেদিন সন্ধ্যায় যখন সে বাহিরের ঘরে পাঠাভ্যাসে রত ছিল তখন চন্দ্রবাবু ও ফণী সেই ঘরে আসিয়া বসিলেন। দু'চার কথার পর চন্দ্রবাবু বলিলেন, আজ কি খাওয়া যাবে রে ফণী? অনেক দিন একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া হয়নি!

দাদার পানে মুখ ফিরাইয়া ফণী বলিল, খাওয়া? ছ' মাস ধরে' যা হচ্ছে তাই হবে—শাক আর ভাত! তোমার পরিবার কি কিছু খেতে দিয়েছে?

শুনিয়া চন্দ্রবাবু স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কোনো কথা কহিলেন না।

কথাটা কিন্তু চাপা রহিল না। অমরের মুখে কাত্যায়নী

সব শুনিল। শুনিয়া অসম্বরনীয় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। পরদিন দুপুরবেলা যখন চন্দ্র ও ফণী দুজনেই অনুপস্থিত, তখন কাত্যায়নী মুখ খুলিল—কেন আমি ওর কি করেছি, আমার সঙ্গে এতবড় বেইমানি! বলে কি না শাক আর ভাত খাইয়ে রেখেছি! মিথ্যেবাদী, মুখে পোকা পড়বে না! আমি কি না ছেলেমেয়েগুলোকে খেতে না দিয়ে ভাল মাছ ভাল তরকারি কাঁড়ি কাঁড়ি গিলিয়ে রাক্ষসের পেট ভরিয়েছি —তার পিরৃতিশোধ এমনি করেই দিচ্ছে! চিরটা কাল হাড় জ্বালিয়ে এল গা! আমি কি ওর খাই না পরি যে যা বলবে সব সয়ে থাকবো? আমার নামে নাগানো, কেন? আমি কি ওর বাড়াভাতে ছাই দিয়েছি?

এমনি করিয়া কাত্যায়নী উচ্চকণ্ঠে বকিয়া চলিল, রাগ হইলে সে আত্মসংবরণ করিতে পারিত না। কথা-গুলা সমস্তই কাত্যায়নীর ইচ্ছানুরূপ ফণীর অর্দ্ধাঙ্গিনী মোক্ষদার কানে পৌছিল। ফণীর হাতে অনেক দিনের অনেক অপমান ও লাঞ্ছনার কথা মনে পড়িয়া কাত্যায়নীর মাথায় খুন চাপিয়া গিয়াছিল। সে স্থির করিয়াছিল, আর নয়! একটা এস্‌পার-ওস্‌পার হইয়া যাক্‌!

সন্ধ্যার পর রান্নাঘরের দালানে অমর ও সুকুমারী আহার করিতেছে, কাত্যায়নী সম্মুখে বসিয়া আছে। উপরে রুদ্ধদ্বার ঘরের মধ্যে দুই ভাইয়ে অনেকক্ষণ কি সব কথা হইতেছিল, কেহ শুনিতে না পাইলেও সকলে মনে মনে একটা আসন্ন ঝড়ের প্রতীক্ষা করিতেছিল। ভাই-বোনের মনে মনে আশঙ্কা হইতেছিল না জানি কি হইবে, কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত খুড়া কি করিতে কি করিয়া বসিবে! কাত্যায়নীর মনে ভয় ছিল না। সে ভাবিতেছিল, কতক্ষণে দুর্ব্বৃত্ত দেবরের মুখের উপর বেশ করিয়া দুকথা শুনাইয়া দিতে পারিবে!

এমন সময় সহসা উপরে হুড়কা-খোলার শব্দ হইল। চন্দ্রবাবু হাঁকিয়া বলিলেন, সুকু! তোর মাকে ওপরে প্যাঠিয়ে দে!

কাত্যায়নী উপরে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। সুকুমারী আর স্থির থাকিতে পারিল না, ভাত ফেলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাউহাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, ও বাবা! মাকে মের না! বাবা, মাকে মের না!

কাত্যায়নী আধঘোমটা টানিয়া উপরে উঠিয়া নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। দ্বারে স্বামী দাঁড়াইয়া ছিলেন। দুই দিকে দুইটা ঘর মাঝে ছোট দালান। অপর দিকে ঘরের দ্বারে ফণী দাঁড়াইয়া এবং ঘরের মধ্যে তার অর্দ্ধাঙ্গিনী। ফণী যখন দেখিল কাত্যায়নী আসিয়া পৌছিয়াছে তখন সে বাড়ি কাঁপাইয়া চীৎকার করিয়া হাঁকিল, জিজ্ঞেস করো তোমার পরিবারকে আমায় গাল দিয়েছে কি না?

কাত্যায়নী স্বামীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বেশ উচ্চকণ্ঠেই বলিল, আমার নামে মিথ্যে নাগাতে পারো, আমি বলবো না? বেশ করেছি বলেছি! আমি কি মিথ্যে বলেছি?

ফণী হাঁকিল, শুনলে একবার ছোটলোকের বেটির আস্পর্দ্ধা!

কাত্যায়নী জবাব দিল, তুই কত বড় ভদ্দর তা আর আমার জানতে বাকি নেই!

তারপর ফণী বড়ভায়ের সুমুখে দাঁড়াইয়া তাঁরই পত্নীকে যে-ভাষায় আপ্যায়িত করিতে সুরু করিল তা ভদ্রলোকের অশ্রাব্য। তাহাতেও সানাইল না। কাত্যায়নী যেই একটা কথার জবাব দিয়াছে অমনি সে চটিজুতা হাতে করিয়া, জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দোব বেটির, বলিয়া তার দাদার ঘরের দিকে ছুটিয়া আসিয়া একেবারে চন্দ্রবাবুর ঘাড়ের উপর পড়িল। তিনি তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া কেবল ধীরভাবে বলিলেন, তুই কি পাগল হয়েছিস?

দুর্যোগ থামিলে ভাইবোনে নীরবে বিছানায় শুইয়া পড়িল। সে বালক, সে দুর্ব্বল, সে অক্ষম, সেই জন্য সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মায়ের অপমান দেখিল, তার শোধ লইতে পারিল না, এই দুঃসহ চিন্তা অমরের সুকুমার চিত্তে কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তার চোখে ঘুম আসিল না।

ক্রমশ—

স্মর-গরল

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

আমি মদনের রচিনু দেউল—দেহের দেহলী 'পরে
পঞ্চশরের প্রিয় পাঁচফুল সাজাইনু থরে-থরে।
দুয়ারে প্রাণের পূর্ণ কুম্ভ,—
পল্লবে তার অধীর চুম্ব,
রূপের আবীরে স্বস্তিক তায় আঁকিনু যতন-ভরে।

মধু-ঋতু সাথে মাধবের সখা দাঁড়াল দুয়ারে মোর,
অনঙ্গ পুনঃ অঙ্গ ধরিল—বরবেশে এল চোর।
ধ্বজ-পতাকায় অম্বর ছায়,
রাগ-রাগিণীরা বন্দনা গায়,
নাচে চারিভিতে কলা-বধূদল—পায়ে বাজে পাঁয়জোর।

হেরিনু তাহার কলঙ্ক শোভে কুঞ্চিত কালো কেশে,
মধুর অধরে মঞ্জু পিপাসা মিলাইয়া যায় হেসে।
অঙ্গদে স্ফুরে বিদ্যুদ্দাম,
ধনুখানি তার আজও উদ্দাম—
বুকে আছে তবু বিভূতির রেখা দাহনের অবশেষে।

নব তনু তার নেহারি' নেহারি' আঁখি হ'ল অনিমেষ,
সারা যৌবন জপিনু তাহার অপরূপ যোগীবেশ।
হর-নয়নের বহ্নির কণা
দেহ হতে তার আজও ঘুচিল না।
তাই মদনের হাসিমুখে একি বেদনার উন্মেষ।

সেই সে মূরতি ধেয়াইনু যবে স্বপন-সোপানে বসি'—
একে একে মোর মনের নিশীথে উল্কারা গেল খসি'।
বাঁশিতে বাজিল ব্যথার সোহিনী,
রতি হ'ল রাধা চির-বিরহিণী,
কেলি-কদম্ব-মূলে বিরাজিল উদাসীর বারাণসী।

স্মর-গরলের জ্বালা হ'ল তার বুকের নীলাম্বরী—
মোর কাম-বধূ বিধিমতে জাগে বিয়োগের বিভাবরী।
নীবি বাঁধা বটে মণি-মেখলায়,
বিজুলি ঝলকে আঁখি-চপলায়—
ফুল-বিছানায় তবু সে যে মোর চিতানল-সহচরী।

ওগো দুখহীন সুখ-লম্পট। সুরতের কৌতুক
তোমাদেরি বটে, সে লীলা-রভসে নহি আমি উৎসুক।
মোর কাম-কলা, কেলি-উল্লাসে
নহে মিলনের মিথুন-বিলাস—
আমি যে বধূরে কোলে করে কাঁদি, যত হেরি তার মুখ।

দুই ভুরু মাঝে বিন্দুসমান আলো জ্বলে অনিমিখ।
রূপোন্মাদের তৃতীয় নয়নে হারায় দিগ্-বিদিক্।
পরশ-লালসে মদালস তনু—
ভেঙ্গে কুটি-কুটি করি ফুল-ধনু,
তারি টঙ্কার-ঝঙ্কারে রচি রতি-বিলাপের ঋক্।

আপনারি দেহ-শবাসনে বসি' শ্মশানের বিভীষিকা
নিবারিয়া জ্বালি অমার আঁধারে অলকার দীপশিখা!
অঙ্গারে আর অস্থি-মালায়
অতি অপরূপ রূপ উথলায়—
হেরি, দিকে দিকে খুলে যায় চোখে জীবনের যবনিকা।

দেহ-অরণিরে মন্থন করি' লভি যে অগ্নি-কণা—
সেই দহনের মিঠা-বিষে মোর মদনের আরাধনা।
এই সুগঠন দেহ-উদূখলে
কঠিন মর্ম্ম দলি' কুতূহলে,
আমি নিদাঘের দাব-দাহে রচি হিন্দোল-মূর্চ্ছনা।

আঁমার পীরিতি দেহ-রীতি বটে, তবু সে যে বিপরীত-
ভস্মভূষণ কামের কুহকে ধরা দিল স্মরজিৎ।
ভোগের ভবনে কাঁদিছে কামনা—
লাখ লাখ যুগে আঁখি জুড়াল না!
দেহেরি মাঝারে দেহাতীত কার ক্রন্দন-সঙ্গীত।

আর সে বিষাণে প্রলয়-নিনাদ তুলিবে না শঙ্কর—
রূপলক্ষ্মী যে বিরূপাক্ষের ভরিয়াছে অন্তর।
দেহ-লাবণ্যে হোমানল-জ্বালা—
কর-কমলের জপ-বীজমালা
শ্মশানেশ্বরে করেছে উতলা—সুধা-বিষ-জর্জ্জর।

ত্যাগ-ধর্ম্ম

শ্রী অরবিন্দ ঘোষ

আত্মত্যাগের প্রতিভা সকল দেশের কি সকল ব্যক্তির সাধারণ সম্পত্তি নয়। এ বস্তুটি যেমন বিরল, তেমনি মহামূল্য। মানবজাতির নৈতিক জীবনে যে ক্রমোন্নতি তাহারই পরিণতি এইখানে, আমরা যে অহং-সর্ব্বস্ব পশুত্ব হইতে অহং-শূন্য দেবত্বের দিকে ক্রমে উঠিয়া চলিয়াছি তাহার প্রমাণ এই এখানে। যে মানুষ আত্মত্যাগ করিতে জানে, তাহার আর যে পাপই থাকুক না কেন, সে পশুকে অনেক পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে; তাহারই মধ্যে ভবিষ্যতের বৃহত্তর মানুষতার বীজ উপ্ত হইয়াছে। যে জাতি সমষ্টিগতভাবে একটা কিছু আত্মত্যাগ করিতে পারিয়াছে, সে জাতি আপন ভবিষ্যৎকে নিঃসন্দেহে বাঁচাইয়াছে।

জীবন ধারণ করিতে হইলে কোন না কোন প্রকারের আত্মত্যাগ আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে, তাহা অনিচ্ছাকৃত হউক আর স্বার্থপরতার আবরণে আবৃত হউক। এই আত্মত্যাগের বৃত্তি মানব-সমাজে ক্রমে ক্রমে বিকাশ পাইয়াছে। গোড়ায় সব আত্মবলিই স্বার্থজনিত হইয়া থাকে—তখন তাহার অর্থ নিজের উন্নতির জন্য অপরকে বলি দেওয়া। তারপর ক্রম-বিকাশের প্রথম পদক্ষেপ হইতেছে যখন দেহজ আকর্ষণের বশে মাতা তাহার শিশু-সন্তানের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়, যখন রক্ষণের প্রবৃত্তি পুরুষকে স্ত্রীর জন্য জীবন দিতে উদ্‌যুক্ত করে। আত্মবলির প্রবৃত্তি দেখিয়াই আমরা বুঝিতে পারি যে আমিত্বের বোধ প্রসার পাইয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত "আমি"র জ্ঞান কেবল নিজের শরীর ও শরীরজ কামনার মধ্যে আবদ্ধ থাকে, ততদিন জীবের হইতেছে প্রাকৃত ও পাশব অবস্থা। তারপর "আমি"র পরিধি বিস্তৃত হইয়া যখন স্ত্রীকে ও সন্তানদিগকে আপনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয় তখন হইতেই ক্রমোন্নতির সম্ভাবনা আরম্ভ। ইহাই গোড়ার মানব-অবস্থা ; কিন্তু এখানেও পাশব ভাবের অবশেষ রহিয়া গিয়াছে দেখিতে পাই—কারণ, স্ত্রীকে ও সন্তানকে এখানে তৈজস-পত্রেরই মধ্যে গণ্য করা হয়, নিজের সুখের সামর্থ্যের মর্য্যাদার উপকরণরূপে তাহাদের ব্যবহার করা হয়। তবুও পরিবার যখন এই ভাব দিয়া গঠিত, তখনই সভ্য-জীবনের সূত্রপাত, সামাজিক জীবন যে সম্ভব হইয়াছে তাহার মূলও এইখানে। কিন্তু মানুষের মধ্যে যে ভগবান তাঁহার প্রকৃত প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে আরও পরে, যখন নিজের জীবনের অপেক্ষা নিজের পরিবার এত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে যে তাহার জন্য মানুষ আত্মবলি দিতে পারে, তাহার পোষণের ও রক্ষণের জন্য নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারে। পরিবারের জন্য নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দেওয়া—এই পর্য্যন্ত উন্নতি সকল মানুষেরই এক রকম হইয়াছে। পত্নীর ধর্ম্মরক্ষার জন্য, শত্রুর হাত হইতে ঘর বাঁচাইবার জন্য জীবন দান মানুষের মধ্যে একটা উচ্চতর প্রকৃতির পরিচয়—ব্যক্তিগত হিসাবেই মানুষের এই ক্ষমতা আছে, সমষ্টিগতভাবে নাই। পরিবারের উপরে হইতেছে গোষ্ঠী—মানুষের নিজত্ব-বোধ আরও কিছু বিস্তৃতি লাভ করে যখন দেহের মধ্যে নিজত্ব-বোধ ছাড়াইয়া, পরিবারের মধ্যে নিজত্ব-বোধকে অতিক্রম করিয়া মানুষ গোষ্ঠীর মধ্যে নিজত্ব অনুভব করে। পরিবারের অপেক্ষা গোষ্ঠীর দাবি বড়—এই বোধ যখন হয় তখনই সামাজিকতার আরম্ভ, এই বোধ ছাড়া কোন সামাজিক জীবন থাকিতেও পারে না। এই অবস্থাতেই কুলের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া tribeএর উদ্ভব হইয়াছে, নানা রকম গোষ্ঠীগত প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠু-রূপে গঠিত হইয়াছে—আমাদের "পল্লী-সমাজ" (village community তাহারই আদর্শ নিদর্শন। এই ক্ষেত্রেও, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন পাইতে হইলে সকলের প্রথম প্রয়োজন পারিবারিক স্বার্থকে গোষ্ঠীর (জনপদের) বৃহত্তর স্বার্থের কাছে বলি দিবার জন্য সকলের প্রস্তুত থাকা। মানুষের অন্তরাত্মা প্রসারিত হইতে হইতে যখন গোষ্ঠী-

বোধে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন যে ভাগবত বৃত্তি তাহার মধ্যে স্ফূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহা গোষ্ঠীর সেবায় এই প্রাণদানের সামর্থ্য। অন্তরাত্মার আরও বৃহত্তর প্রসার হইয়াছে জাতি বা দেশবোধের মধ্যে। মানবজাতির ক্রমোন্নতির জন্ম বর্ত্তমান যুগে এই দেশ বা নেশনের বিকাশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান প্রয়োজন। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা, পারিবারিক স্বার্থপরতা, শ্রেণীগত স্বার্থপরতা অতীত সংস্কারের বলে এখনও অনেকখানি বলীয়ান—এ সকলকেই দেশের বিশালতর সত্তার মধ্যে ডুবাইয়া দিতে হইবে, নতুবা মানবজাতির মধ্যে ভগবানের ক্রমবিকাশ থামিয়া যাইবে। সেই জন্মই স্বাদেশীকতা হইতেছে বর্ত্তমানের যুগধর্ম্ম—ভগবান আজ দেশমাতারূপে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত। নেশন বা স্বদেশ গড়িবার প্রথম চেষ্টা যে হয় তাহার উদাহরণ গ্রীকদের নগরী, সেমাইট বা মোঙ্গলদের রাজতন্ত্র, কেল্টিকদের গোষ্ঠী (clan) ও আর্য্যদের কুল বা জাতি। এই সকল আদর্শ মিশাইয়া মধ্যযুগের জাতি বা নেশন গড়িয়া উঠিয়াছিল ও আধুনিক যুগের দেশগত জনসঙ্ঘ দেখা দিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্ষেত্রের মত এখানেও, দেশের বা নেশনের মধ্য দিয়া মানব-জাতির স্বার্থকতা সম্ভব হইয়াছে তখনই যখন দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কাছে মানুষ তাহার নিজের স্বার্থ, পরিবারের স্বার্থ ও শ্রেণীর স্বার্থকে বলি দিতে প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে; দেশের জন্ম প্রাণ দিয়া দেশের সহিত আমাকে একীভূত করিয়া দেওয়াই এখানে আমার ব্যক্তিগত সত্তার চরম বিকাশ ও সার্থকতা। ইহারও উপরে আছে আর একটি বিশালতর সার্থকতা, কিন্তু সেইটির জন্ম খুব অল্প মানুষই বর্ত্তমানে প্রস্তুত—তাহা হইতেছে নিজত্বকে প্রসারিত করিয়া সমস্ত মানবজাতিকে আলিঙ্গন করিয়া ধরা। অবশ্য, বিশ্ব-মানবকে আদর্শ করিয়া তাহার সেবায় দুই চারিজন আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন; এবং তাঁহাদের এই প্রয়াস মানবজাতির উন্নতির লক্ষণ সন্দেহ নাই; তবুও জগতের সকল মানুষের বৃহত্তর স্বার্থের জন্ম নিজের দেশের স্বার্থ বিসর্জ্জন দেওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে এখনও সম্ভব হয় নাই। ভগবান ধীরে ধীরে আগে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া চলেন, অকালেই যাহাতে গাছে ফল ধরে সে জন্য ব্যস্ত হইয়া তিনি কিছুমাত্র চেষ্টা করেন না। সময় আসিলে মানুষ মানবজাতির জন্য অবহেলায় জীবন দান করিবে; কিন্তু সে সময় এখনও আসে নাই। তা ছাড়া, নিম্নতর স্তরের সাধনা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মানুষ যদি এই উর্দ্ধতর সাধনার প্রয়াস করে, তবে তাহা কল্যাণকর হইবে না; কারণ তাহা হইলে বাধ্য হইয়া মানুষকে এক সময়ে নীচে নামিয়া আসিতে হইবে, যে স্তরের সাধনা সে ছাড়িয়া গিয়াছে বা অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছে তাহা আবার পাকা করিয়া গাঁথিয়া তুলিতে হইবে। মানবজাতি ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে অব্যর্থভাবে চলিয়াছে; সুতরাং পিছনের প্রধান ঘাঁটি-স্থান কোথাও ফেলিয়া গিয়া খুব দূরের একটা লক্ষ্য আগেভাগে গিয়া দখল করিয়া বসায় বিশেষ কোন লাভ হয় না।

দেশের যে আমিত্ব তাহা হয়ত অনেক সময়ে

সমষ্টিগত স্বার্থপরতা ছাড়া আর বেশী কিছু নয়। আমি আমার ধনসম্পত্তি আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিতে যে প্রস্তুত থাকি, তাহার অর্থ হয়ত শুধু এইটুকু যে আমার ধন-দৌলত আমার যশ আমার পদ-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে তখনই যখন আমার দেশ স্বাধীন সমর্থ সমৃদ্ধ। এ সবই, আরও অনেক জিনিষ আমি দেশের জন্য ত্যাগ করিতে পারি, কারণ দেশ রক্ষা পাইলে আমার নিজের ঘরবাড়ীও রক্ষা পায়। দেশের জন্য আরও বেশী আমি ত্যাগস্বীকার করিতে প্রস্তুত; কারণ দেশের উন্নতি ঐশ্বর্য্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আমার দলের বা শ্রেণীর উন্নতি ঐশ্বর্য্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আনিয়া দিবে। এমন কি, দেশকে বড় করিয়া তুলিবার জন্য আমি আমার বলিয়া যাহা-কিছু আছে সবই বিসর্জ্জন দিতে পারি; কারণ আমার দেশে আমার গৌরব, আমার দেশকে আমি সকল দেশের মাথার উপরে রাজ-চক্রবর্ত্তী হইয়া বসিতে দেখিতে চাই। যে বৃহত্তর জীবনের উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষকে স্বার্থপরতা হইতে মুক্ত করিয়া তোলা, তাহারও মধ্যে স্বার্থ-পরতার এই সকল নানারকমফের মানুষকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। এই স্বার্থপরতার জের টানিয়া চলিয়াছে বলিয়াই আধুনিক সকল নেশন নানা রোগে জর্জ্জরিত—যেমন, ধনীদের প্রভুত্ব, অন্য দেশের উপর আধিপত্য। দম্ভ, অন্যায়, অবিচার প্রভৃতি যাহা কিছু একটা নেশনকে তাহার অভ্যুদয়ের অবস্থায় পাইয়া বসে, সেই সমস্তেরই মূল এইখানে। যে অনিবার্য্য অবনতির ধারায় মানুষ তখন চলিতে থাকে তাহা প্রাচীন গ্রীকেরা বড় সুন্দর ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন—সম্পদের পর অবিচার অত্যাচার, অবিচার অত্যাচারের পর "এটি" (Ate), সেই অন্ধ-মোহ যাহাকে ধরিয়া বিধাতাপুরুষ ব্যক্তির ও জাতির ধ্বংস-সাধন করিয়া থাকেন। এই যে রিপুটি মানুষের সঙ্গে সঙ্গে বরাবর চলিয়াছে তাহা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে প্রয়োজন দেশকে সমগ্র মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া ধরা, বিশ্বমানবের মহামিলন ক্ষেত্রে একটি কেন্দ্ররূপে দেখা—এই ভাবেই দেশের আবশ্যকতা ও সার্থকতা, দেশকে 'ইহার বেশী কিছু করিয়া দেখিতে গেলেই গোলমালের সূত্রপাত।

একটা দেশের জীবনে দুইটি অবস্থা আছে—এক, যখন সে গড়িয়া বা নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে; আর যখন সে গঠিত, সুনিয়মিত, শক্তিমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথম অবস্থাতেই স্বাদেশীকতা দেশবাসীর উপর ব্যক্তিগত হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে দাবিদাওয়া করে—আর তাহা ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় সেই দাবির পরিমাণ হ্রাস হওয়া উচিত—নিজের সার্থকতা লাভ করিয়া দেশের কর্ত্তব্য বিশ্বমৈত্রীর মধ্যে আপনাকে বাঁচাইয়া রাখা। ব্যক্তি যেমন আপনাকে পরিবারের মধ্যে বাঁচাইয়া রাখিতেছে, পরিবার যেমন শ্রেণীর মধ্যে, শ্রেণী যেমন দেশের মধ্যে আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিতেছে—অনর্থক নিজের ধ্বংস-সাধন করে নাই, কিন্তু নিজের হইতে বৃহত্তর কিছু স্বার্থের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে—সেই রকম দেশও জগতের সেবায় নিজের নিজত্ব জিয়াইয়া রাখিবে। অবশ্য একটি পরাধীন দেশ

যেমন নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয় তখন বৃহত্তর স্বার্থটি দূর-ভবিষ্যতের আদর্শরূপেই সে দেখিতে পারে, তাহা স্বদেশ-সেবারই উদার উচ্চতর অনুপ্রেরণা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। তখন বৃহত্তর স্বার্থের জন্য দেশের পক্ষে কোন আত্মত্যাগই সম্ভব নয়; কাবণ দেশকে আগে রক্ষা পাওয়া চাই, তবেই না সে তাহার নিজে স্বার্থ বৃহত্তর স্বার্থের কাছে বলি দিতে পারে।

আমরা আজ ভারতবর্ষে প্রথম স্তরে, আমাদের দেশ এখন সবে গড়িয়া উঠিতেছে; এই অবস্থায় দেশের আহ্বানের উপরে আর কোন আহ্বান নাই। আমাদের দেশের যে আপদকাল উপস্থিত, তাহা হইতে উদ্ধার পাইয়া যদি সে কেবল বাঁচিয়া বর্ত্তিয়াও থাকিতে চায় তবে প্রথম ও একমাত্র প্রয়োজন হইতেছে দেশের ব্যক্তিরা, পরিবারবর্গ, শ্রেণী সকলে দেশকেই পরম ইষ্টরূপে ধরিয়া আপন আপন স্বার্থ বলি দিয়া চলিবে। দেশের নব অভ্যুত্থানের প্রত্যেকটি তরঙ্গ কষ্ট-স্বীকারের, আত্মদানের জন্য আহ্বান ছাড়া আর কিছু নয়। স্বদেশী, সালিসী, জাতীয় শিক্ষা এবং সকলের উপরে "নিরস্ত্র প্রতিরোধ" (passive resistance)—ইহাদের প্রত্যেকটি এই রকমের এক এক আহ্বান। যদি দেশের স্বার্থের জন্য আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ও পরিবারগত স্বার্থ বিসর্জ্জন না দিতে পারি, তবে ঐ কাজের কোনটিই সফল হইবে না। এখন আবার আর একটি নূতন ডাক আস্তে আস্তে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে—তাহা উচ্চতর শ্রেণীদের জন্য; জাপানের 'সামুরাই' শ্রেণী যাহা করিয়াছিল, নিম্নতর শ্রেণীদের উত্তোলনের জন্য আমাদের উচ্চতর শ্রেণীদের তাহাই করিতে হইবে। ভারতকে যদি 'নেশন'রূপে গড়িয়া তুলিতে হয় তবে গোড়াপত্তন করিতে হইবে দেশ-বাসী সকলের মধ্যে একটা অকুণ্ঠ আত্মত্যাগের উৎসাহ ছড়াইয়া দিয়া। এই সত্যটির প্রমাণ পাইবার জন্য বেশী কষ্টস্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না। আমরা দেশসেবাকল্পে যে আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করিয়াছি, তাহার বিশেষ ধরণটির দিকে নজর দিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিব। তা ছাড়া ইতিহাস ও অভিজ্ঞতাও ঐ একই কথা বলিতেছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আত্মত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ইতিহাস ও অভিজ্ঞতার কষ্টি-পাথরে বিচার করিয়া দেখা উচিত—অনেক সাবধানী এই উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের কাছে এ রকম উপদেশের কোন সার্থকতা নাই। আমরা দেশ-সেবকের দল আমাদের দীপ্ত আদর্শের, আমাদের ত্যাগস্বীকারের দ্বারা দেশের হৃদয়কে জয় করিয়াছি; আবার ঠিক সেই রকমে অতীত ইতিহাস বা বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রমাণ দিয়া দেশের বুদ্ধিকেও তৃপ্ত করিয়াছি। প্রত্যেক ব্যক্তির সম্বন্ধে, প্রত্যেক অবস্থায় সমস্ত সমস্যাটি যে আবার আগাগোড়া বিচার করিয়া লইতে হইবে—এই দাবি অত্যধিক ও অসম্ভব বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। মোটামুটি যদি আমরা আত্মত্যাগেব সার্থকতা বুঝিয়া থাকি এবং ব্যক্তি-গত জীবনে যদি সেই আত্মত্যাগের প্রেরণা অনুভব করিয়া থাকি—তবে তাহাই যথেষ্ট। আমাদের মনে রাখা উচিত, যে জাতি সংগঠিত, স্বাধীন ও বর্দ্ধিষ্ণু তাহার অবস্থা দিয়া যে জাতি

দীন পরাধীন, সবে উঠিতে চেষ্টা করিতেছে তাহার বিচার করা সঙ্গত নয়। স্বাধীন দেশে ব্যক্তি হিসাবে আত্মত্যাগ করিবার জন্য ঘন ঘন কিছু ডাক আসে না—সেখানে দেশ যে আত্মত্যাগ চাহে, তাহা সাধারণ গোষ্ঠীগত জীবনের ধরা-বাঁধা নিয়মের অন্তর্ভুক্ত, তবে প্রয়োজনের সময়ে বিশেষ আত্মত্যাগের জন্য সকলকে প্রস্তুত থাকিতে হয়; পরাধীন দেশে কিন্তু বিশেষ আত্মত্যাগটাই নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজন—সেই অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেকটি সাহসের ও আত্মত্যাগের কাজ কি উপকার দিল বা না দিল তাহার হিসাব চাওয়া সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। কর্ম্মের বিধাতা যখন পরাধীন দেশের নিকট হইতে স্বাধীনতার মূল্য চাহিতেছেন তখন দেশের লোকেরা বলিবে কি, "আমাদের প্রত্যেকটি ত্যাগ গণিয়া লও, তাহার পরিবর্ত্তে আমরা চাহি এই পরিমাণ লাভ —তোমার কি সর্ত্ত তাহা আগে আমাদিগকে জানাও; এক পয়সা মূল্যের আমাদের যে কষ্ট, তাহাও তোমার কাছে আমরা বাকী ফেলিয়া রাখিব না?" এই ধরণের মানুষের দ্বারা, এই ধরণের মনোভাবের দ্বারা কোন দিন কোন পরাধীন দেশ স্বাধীন হয় নাই।

অনুবাদক—শ্রী নলিনীকান্ত গুপ্ত

রাজু-পণ্ডিত

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

রসরাজ নামের সহজ-সংক্ষেপ, রাজু। ভাষাতত্ত্বের কোন্ নিয়ম অনুসারে "রস" শব্দটির লোপ হইয়াছিল, বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ আলোচনা করিয়া দেখিবেন। রসিক-পাঠক, রাজু-পণ্ডিতের চরিত্র আলোচনা করিয়া হয়ত' শেষে আমাদের মতে মত দিয়া বলিবেন, 'রস' কথাটির তিরোভাব ভালই হইয়াছিল।

কেননা রসরাজের মেজাজটি ছিল কঠোর, তীব্র এবং উগ্র। সেখানে 'রস' কথাটির প্রয়োগ যে একান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

—বিশ্বকর্ম্মা একজন ওস্তাদ কারিকর! তবুও শাস্ত্রে আছে, মুনিদেরও মতিভ্রম হয়। অনুমান, রসরাজের চরিত্রের ফর্দটিতে 'পাইন' দিবার সময়, বিশ্ব-কর্ম্মার মতি-ভ্রম ঘটিয়াছিল।

ইহা হইতে প্রমাণ হইল যে শাস্ত্র অভ্রান্ত।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন তাহাতে লাভ হইল কি?

লাভ অনেক। প্রথম, শাস্ত্রে মতি-গতি অটুট রাখিতে হইলে—তাহা অভ্রান্ত প্রমাণ করিতে হয়।

শাস্ত্রে ভুল থাকিলে কি হয়?

ভবিষ্যপুরাণ অপর একটি শাস্ত্র;—তাহার মতে যেদিন শাস্ত্র ভুল হইবে—সেইদিন প্রলয় অবশ্যম্ভাবী!

প্রলয়ের কথা শুনিয়া কাহার না কলেবর কম্পিত হয়? কিন্তু ভয় নাই। স্বয়ং ব্রহ্মা বেদ বলিয়াছেন। তাহা অব্যয় এবং অমর। অতএব বেদ থাকিতে পৃথিবীর ধ্বংস হইবে না।

এই সকলের সহিত 'রস' শব্দের সম্পর্ক কি?

বেদ বলিয়াছেন রসই ব্রহ্ম এবং এই বিশ্বে ব্রহ্ম-বিহীন কিছুই নাই।

অতএব 'রসরাজের' 'রসে'র লোপে কোন কিছুরই ইতর-বিশেষ হইল না।

তাহার পর, মেজাজ জিনিষটার একটু আলোচনা করা যাক্। মেজাজ কোন বস্তু বা জিনিষ নয়, কিন্তু ভাষাতে ঐরূপ ব্যবহার চলিয়া গিয়াছে। আমরা জলকেও জিনিষ বলি, আবার প্রাণ, ধর্ম্ম, আত্মা ইত্যাদিও ঐ নামেই অভিহিত হইয়া থাকে।

মেজাজের পিছনে যদি টাকার লম্বা বহর থাকে তাহা হইলে তাহাকে মানুষ সহিয়া লয়। গোক্ষুরের গর্জ্জন এবং চক্র দুই শোভন; কারণ তাহার দাঁতের বিষটাকে অবহেলা করিবার উপায় নাই। কিন্তু হেলে কি ঢোঁড়ার ফোঁস কিম্বা ফণা, দুই আমাদের কাছে অসহ্য এবং তাহার ঔষধ লাঠি!

রাজুর ছিল মেজাজটি কড়া এবং তাহার উপর, অবস্থার কোনই জুৎ ছিল না; কাজেই ঘরে-বাহিরে সকলের সঙ্গে তাহার কলহ বাধিয়াছে।

কলহের মধ্যে শান্তিও নাই আরামও নাই। তবুও কলহ কেন মানুষে করে তাহা বলা কঠিন। অন্য মানুষের কথা জানি না; কিন্তু রসরাজকে এই প্রশ্ন করিয়া উত্তরে যাহা শুনিয়াছিলাম গোচরার্থ পাঠকদিগের কাছে নিবেদন করিতেছি। তাঁহারা ইহার সত্যাসত্য যুক্তি অযুক্তি বিচার করিয়া লইবেন।

সত্যের উপর, কম্-বেশী প্রায় সকল মানুষের লোভ থাকে। তাহার দাবীটা আমরা অন্যের কাছেই বিশেষ করিয়া করি। শিশু-পাঠ্য পুস্তকে দেখা যায় শিশুকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে, সদা সত্য কথা বলিবে। শিশু আপনার বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে সত্যের ব্যবহার করে। সে যখন দেখে যে সত্য বলিলেই বাবার ক্রোধের সঞ্চয়; এবং পাঠশালার গুরুমহাশয়ের বেত্রটা তাহারই পিঠের দিকেই ধাবিত হয় তখন সে বুদ্ধির ব্যবহার করিতে শিখিয়া মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে।

মানুষ ত' সব সমান হয় না। ভীরু কাপুরুষের মধ্যে দুই একটি বীরের অবতারও দেখিতে পাই। আমাদের রাজু-পণ্ডিত বোধ করি এই বীর-জাতির মধ্যে আসিয়া পড়ে!

ছেলে বয়স হইতে রাজুর সত্যের প্রতি নিষ্ঠা ছিল অসামান্য। সে সত্য বলিত, এবং সকল সময়ে অপ্রিয় সত্যই বলিত। ভাগ্য-দোষে চাণক্যের "মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" কথাটি তাহার মনে লাগে নাই। রাজু মনে মনে বলিত, সত্য বলিব, সর্ব্বদাই সত্য বলিব, তাহার পর অদৃষ্টে যাহা ঘটে ঘটুক।

রসরাজের অদৃষ্টে এই বীর-বুদ্ধিতার ফলে কি কি ঘটিয়াছিল তাহা অনুসন্ধান করিয়া বলিবার ইচ্ছা আমাদের রহিল। এখন পাঠকের ধৈর্য্য থাকিলেই হয়।

নিজেদের গ্রামের পাঠশালার সীমা অতিক্রম করিয়া রসরাজের অন্য গ্রামের উচ্চ স্কুলে প্রবেশ লাভ করিবার সময় বয়সটা কিছু বেশী হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার জন্য সেই সম্পূর্ণ দায়ী ছিল না। প্রথমতঃ একটু বেশী বয়সে সে গ্রামের পাঠশালায় আসে। সেখানে সর্ব্ব বিষয়ে সর্দ্দারি করিতে পাইয়া তাহার দিন আনন্দে কাটিত।

দৈহিক বলে পাঠশালায় তাহার জোড়া ছিল না। তার পাঠশালার বৈকুণ্ঠ গুরুমহাশয়ের শাসন ব্যাপারে সে সহযোগী ছিল। তাহা ছাড়া, গুরুদেবের জন্য

ইন্ধন সংগ্রহ প্রভৃতিতে (অর্থাৎ বৈদিক ছাত্রগণের কর্ম্মে) সে অতিশয় দক্ষ ছিল। এমন কি রসরাজ কোন কারণে পাঠশালায় না আসিলে বৈকুণ্ঠ চক্ষে অন্ধকার দেখিতেন। রাজুরও বাড়ীর চেয়ে পাঠশালা ভাল লাগিত ; তাই সে গুরুদেবকে প্রায়ই কোন বিপদে পড়িতে দিত না।

বৈকুণ্ঠ-গুরু জেলা বোর্ড হইতে মাসিক সাড়ে চার টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতেন। এইটিকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার বহু উপদেবতার পূজা করিতে হইত। সার-কেল প[ণ্ডি]তদের রসদ-সংগ্রহ ব্যাপারে রাজু ছিল অদ্বিতীয়। পাকা আম, পাকা পেয়ারা, আক্, কলা-মূলো দিয়া সে নিমেষে এমন অপূর্ব্ব নৈবেদ্যের ডালি সাজাইয়া দিতে পারিত যে দেবতা চলিয়া গেলে বৈকুণ্ঠ রাজুকে ধন্য ধন্য করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতেন। কাজেই রাজুর উৎসাহ বাড়িয়া উঠিত।

তাহার আর একটি উল্লেখ-যোগ্য গুণ ছিল ; সে পাঠশালায় বেশী দিন থাকার জন্য প্রায় সকল শ্রেণীর পাঠগুলি তাহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। ইহার জন্য সে সময়ে সময়ে উত্তম গুরুগিরি করিতে পারিত এবং গুরু-মহাশয়ের পরীক্ষার দিনে—তাঁহার পাঠদানের সাক্ষ্যরূপে থাকিয়া—তাঁহাকে কর্ত্তৃপক্ষের কঠোর সমালোচনার হাত হইতে উদ্ধার করিত।

এইরূপ নানাবিধ কারণে বৈকুণ্ঠ-গুরুর স্নেহপাশ হইতে মুক্তি লাভ করিতে তাহার কিছু বিলম্বই ঘটিয়াছিল। গৃহে একমাত্র বিধবা জননী ; তিনি লেখাপড়ার বিশেষ কিছু জানিতেন বা বুঝিতেন না। অনুযোগ করিলে বৈকুণ্ঠ বুঝাইয়া বলিতেন, বুঝেছ রাজুর মা, তোমার ছেলেকে এম্নি তৈরী ক'রে দেব যে বড় ইস্কুলে গিয়ে সে টকাটক্—বছরে দুটো ক'রে কেলাশ নেবে।

রসরাজ বহুদিন এই কথায় বিশ্বাস করিয়া ছিল ; কিন্তু হঠাৎ একদিন গুরু-দেবের চাতুরী যেন সে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, পণ্ডিতমশাই; আমি আর এ পাঠশালে পড়বো না।

বৈকুণ্ঠ রাজুকে ভাল করিয়াই চিনিতেন ; তাই আর কোন আপত্তি তুলিলেন না।

নূতন স্কুলে গিয়া রাজু একবার ডবল-প্রমোশন পাইল। কিন্তু সেই তাহার শেষ। নূতন শ্রেণীতে উঠিয়া সে ইংরাজি ভাষার এই প্রথম সাক্ষাৎ লাভ করিল। এই দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতের পাদমূলে বৎসরের পর বৎসর, ব্যর্থতার অঞ্জলি দান করিয়া যখন, নিরাশায় তাহার মন-প্রাণ তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে তখন এমন একটি ঘটনা ঘটিল যাহাতে সেই স্কুলে আর তাহার কিছুতেই থাকা চলে না।

প্রধান শিক্ষক রাজুর ইংরাজির উত্তর-পত্র পরীক্ষা করিয়া তাহাকে এক ক্লাশ নামাইবার প্রস্তাব করিলেন। রাজু এই সংবাদ পাইয়া নির্ভয়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, কয়েকটা কথা ব'লতে চাই।

স্কুলের কোন ছাত্র এমন ভাবে তাঁহার কাছে যাইতে সাহস করিতে পারে—তাহা তিনি কল্পনা করিতে পারেন নাই। এই নির্ভীক যুবকটির বীরোচিত সম্ভাষণ শুনিয়া প্রধান শিক্ষকের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত রাগে প্রকম্পিত হইল। তিনি আর সকলই সহ্য করিয়া—ছাত্রগণকে মার্জ্জনা করিতে পারিতেন ; কিন্তু এই পরাধীন জাতির এত বড় বীরোচিত প্রগতিকে তিনি ঔদ্ধত্য ছাড়া আর কিছুই মনে করিতে পারিলেন না। এখানে মার্জ্জনার এক বিন্দুও ঠাঁই ছিল না।

উত্তরে তিনি বলিলেন, তুমি কে ?

রসরাজ নিজের নাম বলিল।

প্রধান শিক্ষক বলিলেন, তোমার সঙ্গে আমার কোন প্রয়োজন আছে ব'লে ত' জানিনে। কার হুকুমে তুমি আমাকে বিরক্ত করতে এসেছো ?

রাজু একটু থতমত খাইল বটে, কিন্তু দমিল না, বলিল, প্রয়োজন আমার আছে আপনার সঙ্গে। আর, আপনার সঙ্গে দেখা করতে হ'লে কার হুকুম নেব ? আপনিই ত' স্কুলের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় !

উত্তরের প্রথমাংশের আঘাত দ্বিতীয়াংশের প্রলেপে চাপা পড়িল না।

শিক্ষক বিদ্রূপ এবং বিরক্তির কণ্ঠে বলিলেন, বটে? কি তোমার দরকার শুনি, ডেঁপো ছোক্‌রা?

রাজুর মাথাটা রাগে চন্ করিয়া ঘুরিয়া গেল, তথাপি সে আত্ম-সম্বরণ করিয়া বলিল, অযথা গাল দিচ্চেন কেন? আমি জানি, কোন অপরাধ করিনি—আপনার কাছে।

ইহার পর কি হইয়াছিল ঠিক করিয়া জানা যায় নাই। রাজু স্কুল ত্যাগ করিল। অন্য স্কুলে প্রবেশের পথ প্রধান শিক্ষক তাঁহার অমিত শক্তিবলে বন্ধ করিয়া দিলেন।

তাহার পর, ঘরে বসিয়া রসরাজের দিনগুলি বেকার বহিয়া যাইতে লাগিল।

৩

হঠাৎ একদিন বৈকুণ্ঠ-গুরু আসিয়া রসরাজের দ্বারস্থ হইলেন। রাজু তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিয়া তামাক সাজিয়া দিল। তিনি একটি ছোট টুলের উপর বসিয়া নিবিষ্ট মনে তামাক খাইতে আরম্ভ করিলে রাজু তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, খবর কি পণ্ডিত মশাই? আপনাকে এত কাহিল দেখায় কেন?

বৈকুণ্ঠ কণ্ঠের কাশি কষ্টে চাপিয়া বলিলেন, তাই বল্‌তেই তোমার কাছে আসা বাবা। অনেক ছেলে মানুষ করলুম; কিন্তু তোমার মত গুরু-ভক্তি জন্মে দেখিনি, রসরাজ!

কাশি আর চাপা রহিল না; স্তবকে স্তবকে উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল।

মিনিট পাঁচেকের পর বৈকুণ্ঠ একটু সাম্‌লাইয়া বলিলেন, এই কাশি আর বিকেলের ঘুস্‌-ঘুসে জ্বরে শরীরখানাকে জেরে ফেল্লে; তাই মনে করছি, দিনকতকের জন্মে হাওয়া বদলাতে যাই। কিন্তু......বুঝেছত' বাবা......

পণ্ডিতমহাশয়ের কণ্ঠে একটি মিনতির সুর জড়িত ছিল; রাজুর মন অনেকখানি নরম হইল।

রাজু বলিল, আমায় কি আজ্ঞা করচেন?

বৈকুণ্ঠ বলিলেন, জানো ত' বাবা, কত যত্নের আমার এই পাঠশালটি—এর জন্যে আজীবন দেহ-পাত করেছি। তাই চাইনে যে আমি বেঁচে থাক্‌তে এটি উঠে যায়। তোমার একটা কিছু বিহিত করতে হবে।

বৈকুণ্ঠ একটু দম লইয়া আবার কহিলেন, মনে করে-ছিলুম দিনকতকের জন্যে তোমার হাতে দিয়ে যাই; কিন্তু শুন্‌চি...পণ্ডিতমশাই এবার বলিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

কি শুনেছেন পণ্ডিতমশাই?

সত্যি-মিথ্যে কিছুই জানিনে বাবা, তবে লোকে বলে যে ও-ইস্কুল থেকে তোমাকে নাকি "রাস্‌কেল" ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে।

রাজু মুখ টিপিয়া হাসিল।—একেবারে রাস্টিকেট করেনি ··তবে অন্য ইস্কুলে ঢোকার পথ বন্ধ।

বৈকুণ্ঠ একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, সেই কি কম বাবা! আমি জানি ও-লোকটা চিরকেলে পাজি! উঃ, কি হিংসেই না করে এই আমাদের পাঠশালের ওপর! এখেন থেকে যে যাবে তাকে বিষ-নজরে দেখ্‌বে! সাধে লোকে ভয় করে ঐ ইংরেজি জানা বি-এ এম-এ কে?.. ...আচ্ছা, তোর কোন্ পাকা ধানে মই দিয়েছি আমি? যে তুই আমার ছাত্তর দেখ্‌লেই তার সর্বনাশটি ক'রে ছেড়ে দিবি?

রাজু বলিল, এক রকম ভালই হয়েছে পণ্ডিতমশাই; ইংরেজি বোধকরি আমি শিখ্‌তে পারতুম না... ..

বৈকুণ্ঠ আবার উত্তেজিত হইলেন, কি বলিস্ রে তুই! দেখতিস্, জান্‌তো বৈকুণ্ঠপণ্ডিত ইংরিজি তো তোকে,—কোথায় লাগেরে এম-এ-বি-এ!

রাজু আবার হাসিতে লাগিল।

শেষদিকে বৈকুণ্ঠ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহলে তোমাকে ওরা আমার কাজ করতে আটক করতে পারবে না?

রাজু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, বাঃ, তা কেমন ক'রে পারবে?

বৈকুণ্ঠ বলিলেন, জানিস্ তো—ঐ সারকেল পণ্ডিত গুলো কম নয়; একে চায় তো আরে পায়! ওদের নিয়েই ত' মুস্কিল। ইনেস্‌পেক্টর মেকৃটরকে—আমি কি তোয়াক্কা রাখি?

রাজু এবারেও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না।

কিন্তু সকল কথার পরও বৈকুণ্ঠ-পণ্ডিতের আসল কথাটি বলা হয় নাই।

পণ্ডিত-মহাশয় দেহ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারেন; কিন্তু মাসিক সাড়ে চারটি টাকা ত্যাগ করা শক্ত! ছেলেদের বাড়ী হইতে সিধা আসে সত্য; কিন্তু তাহাতে চাকুরির মজা নাই, তারিফ্ নাই। বৈকুণ্ঠ যে-কয়টা দিন বাঁচিয়া থাকেন ঐ টাকা কয়টি হইতে বঞ্চিত না হন, এই তাঁর মনের বাসনা!

কিন্তু রাজুও ত' বসিয়া আছে! তাহারো অভাব; সে যদি ছাড়িয়া না দেয়? তবে রাজু ছেলেমানুষ আর এক সময়ে ছেলেও ভাল ছিল; কিন্তু সেও ত দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসর হইয়া গেল!

রাজু আবার তামাক সাজিয়া দিয়া বলিল, হাওয়া বদল করতে যাবেন, মনে করচেন?

তাই তো ভাবি বাবা, সেও ত' সহজ ব্যাপার নয়। যদি জেওঘরে যাই ত' পয়লা ভাড়া লাগ্‌বে, সাড়ে চারের ত' কম নয়। তারপর কুটুমের বাড়ি থাকা, দুধ-জল-খাবার তো নিজেরই করতে হবে; সেও কোন মাসে সাড়ে চার টাকার কমে হয়! তাইতো ভাবচি এত!

রাজু এবার মনে-মনে হাসিল। পৃথিবীতে যত-কিছু খরচ-পত্র সকলই সাড়ে চারের পরিমাণে চলিয়াছে!

রাজু বলিল, কিন্তু আমি কাজ করলে, ওই সাড়ে চারের দরুণত তো আমাকেই দিতে হবে?

তাতো হবেই, তাতো হবেই, বলিয়া বৈকুণ্ঠ একটি হতাশার শ্বাস ফেলিয়া হুঁকায় টান্ দিয়া কাশিতে লাগিলেন।

রাজুর তাঁহাকে দেখিয়া দুঃখ হইল এবং তাঁহার কপটতার জন্য রাগও হইল। সে বলিল, পণ্ডিতমশাই, মাসে মাসে আমি আপনাকে ও টাকাটা পাঠিয়ে দেব।

বেঁচে থাকো বাবা, বলিয়া পণ্ডিতমহাশয় উৎসাহ ভরে আবার কাশিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, বাবা, একটা কথা কাণে কাণে বলি, ওই সারকেল পণ্ডিত বেটা যেন ঘুণাক্ষরেও এটা না জানতে পারে; অহ্'লেই রাস্‌কেলির ফেঁকড়া তুলে তোমাকে সরিয়ে দেবে। তুমি হাজার হলেও আমার ছাত্তর; আর কেউ এলে......তিনি রাজুর হাত ধরিয়া ফেলিলেন, বুঝেছ বাবা, শুকিয়ে মরে যাবো; উপুস করতে হবে!

রাজু গম্ভীর হইয়া বলিল, পণ্ডিতমশাই অত ভবিষ্যৎ ভাবতে গেলে মানুষ কিছু ক'রে উঠতে পারে না!

এইবার বৈকুণ্ঠ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন, জানো ত' রসরাজ—আমরা পণ্ডিত কিনা, বিজ্ঞ; আমাদের চোখ চলে শকুনের মত ভাগাড়ে ভাগাড়ে!

কথাটা বলিয়াই বৈকুণ্ঠ বুঝিয়াছিলেন যে তুলনাটা মোটেই ভাল হইল না; তাই তাহাকে মেরামত করিবার চেষ্টায় বলিলেন, অর্থাৎ কিনা......

কথা শেষ করিবার পূর্ব্বে কাশির লহর আবার দেখা দিল।

৪

বৈকুণ্ঠ রাজুকে পাঠশালার ভার বুঝাইয়া দিয়া ঘরে গেলেন। তাঁহার সাড়ে চারের ধুক্-পুকানি আর গেল না! মানুষ কি এত নির্লোভ হয়! রাজু যদি দেয় ত' নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে সে কিছু কম পড়াশুনা করিয়াছে বলিয়া! পাশ করিলেই পাঁশে দাঁড়ায়!

বিদ্যার পূজারির বিদ্যার উপর কত বড় আস্থা!

রাজু সশস্ত্রে পাঠশালার সিংহাসন জুড়িয়া বসিল। সেইদিন হইতে বোধ করি তাহার রাজু-পণ্ডিত নাম।

কিন্তু ছাত্রদের সে পণ্ডিত বলিয়া ডাকিতে দিত না; বলিত, দূৎ, আমি কি পণ্ডিত মশাই বলার মত উপযুক্ত লোক, আমাকে বল্ মাষ্টার মশাই।

ছেলেরা ভুলিয়া পণ্ডিত বলিলে কানমলা খাইত; কন্যা একখানা থান-ইট মাথায় করিয়া একবেলা নীল্-ডাউন হইত। ভুল যাইতে বহুদিন লাগিল।

সকল দেশের পাঠশালায় ছেলে এবং মেয়ে এক সঙ্গে পড়িয়া থাকে। আমাদের দেশে হঠাৎ মেয়েরা যখন বড় হইয়া উঠে তখন তাহারা পাঠশালের মুক্ত প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিয়া ঘরে বসিয়া গৃহিনী হইবার পাঠ গ্রহণ করে।

রাজুর মনে ছিল যে পণ্ডিত মহাশয় মেয়েদের পক্ষ টানিয়া চলিতেন। তাহারা আদর পাইত বেশী, মার খাইত কম। ইহার কি কারণ, ছেলেরা জানে না, এবং জানিবার কোন ধারও ধারে না; কিন্তু মনে মনে পণ্ডিত মশাইএর অবিচারে চটিয়া থাকে।

রাজু তাই নিরপেক্ষ হইবার সঙ্কল্প করিয়া বসিল। সে জানিত যে এই কোমলাঙ্গীগণ সয়তানিতে লোহার কার্ত্তিকদের চেয়ে একটুও কম নহে। কলহে তাহাদের সঙ্গে যখন আর কিছুতেই পারিয়া উঠে না তখন ছেলেরা দুই এক ঘা বসাইয়া দেয়। মারামারি আরম্ভ হইলে মেয়েরা পিছাইয়া ভাল মানুষ সাজে; বিচার হয় মারামারির, শাস্তি পায় ছেলেরা।

রাজুর ইহার বেশী জানিবার উপায় ছিল না। পণ্ডিতের আসনে বসিয়া বুঝিতে পারিল যে পক্ষপাত অবশ্যম্ভাবী। মেয়েরা যে সিধা আনিত—তাহাতে বুদ্ধির পরিচয় প্রচুর; দেবতা প্রসন্ন হন, মানুষের কা কথা!

আরো একটি কথা উপলব্ধি করিয়া তাহার আনন্দ এবং বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

যেমন করিয়াই হউক বালকদের মস্তিষ্কে এই ধারণা স্থান পায় যে, যে বিদ্যা তাহারা অর্জ্জন করিতে আসিয়াছে তাহা অর্থাগমের উপায়স্বরূপ। অর্থই মানুষের কাম্য; বিদ্যা নহে।

বালিকারা কিন্তু শিক্ষালাভ করিবার জন্য বিদ্যার্জ্জন করিতে আসে; তাই তাহাদের চেষ্টা, অভিনিবেশ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ছুটি পাইলে বালকগণ নৃত্য করিতে করিতে জয়োল্লাসে বাহির হইয়া যায়; কিন্তু বালিকারা উৎফুল্ল না হইয়া, লুকাইয়া দুই এক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকে।

আরো কিছু বিশেষত্ব ছিল কিনা রাজু বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই; কিন্তু তাহার আপনা হইতেই বালিকাদিগকে পড়াইতে ভাল লাগিত। সে-কথা সে মুক্ত কণ্ঠে প্রকাশ করিয়া বলিত,—আয় তোরা আয়, যারা প'ড়তে চায় তাদের পড়িয়ে সুখ; আর ঐ বাঁদরের দল, ওদের না আছে মতিস্থির—না আছে পড়াশুনার ইচ্ছা—যা, দূর হ' তোরা!

বাঁদরের দল খুসী হইত।

বোধকরি, কাশ-রোগে বৈকুণ্ঠ পণ্ডিতের রস-কষ সব শুকাইয়া গিয়াছিল। পড়ুয়াদের দাঁত-খিঁচুনি এবং মার ভিন্ন আর কিছুই তিনি করিতে পারিতেন না।

রাজু শনিবারের শেষের ঘণ্টায় যখন সকলকে ডাকিয়া রামায়ণের গল্প বলিত—তখন শিশু-হৃদয়গুলি পুলকে আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিত। হনুমানের ল্যাজের লম্বা বহর কল্পনা করিতে যেমন তাহাদের কৌতুক বোধ হইত, আবার সীতার পায়ে বনের কাঁটা ফুটিয়া রক্ত পড়িতেছে চিন্তা করিয়া তাহাদের মন করুণায় পূর্ণ হইয়া উঠিত!

একজন জিজ্ঞাসা করিত, আচ্ছা মাষ্টার মশাই, মন্থরা অত দুষ্টু ছিল কেন?

রাজু হাসিয়া বলিত, বুড়ী, ওই তার স্বভাব ছিল।

দেখচিস্ তো একজন দুষ্টু হ'লে—কতজন ভাল লোক কষ্ট পায় ?

একজন বলিত, আচ্ছা আপনি রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারেন ?

দূর, পাগলা ; রাম-লক্ষ্মণ যা পারতেন—আমি কি তাই পারি ?

অপর একজন বলিল, ঠিক তাই, জটায়ু কি পারলে রে ?

একদিক হইতে শব্দ উঠিল, মাষ্টার মশাই ভূতো মিত্তির পালিয়েছে।

রাজু বলিল, কোথায় সে ? কোথায় গেল ভূতো ?

সকলে ভয়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

রাজু সর্দ্দার পড়ুয়াকে ডাকিয়া বলিল, যাতো মানুকে, ভূতোকে খুঁজে নিয়ে আয়।

কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতো আসিল।

কোথায় গিছ্‌লি ?

হাগ্‌তে।

ছুটি নিয়ে যাস্‌নি যে ?

বড্ড পেট কামড়েছিল, মাষ্টার মশাই।

তারপর ?

ব'সে ব'সে দেখ্‌লুম, যেদোদের গাছে খুব প্যায়রা পেকেচে।

তারপর ?

দুটো পেড়েছি।

রাজু বলিল, কাজ ভাল করিসনি ভূতো ; কিন্তু সত্যি বলেছিস্ তাই পার পেলি। পরের জিনিষ না ব'লে নিতে আছে ?

একটি ছোট ছেলে বলিল,—দেখলিনে ঐ রাবণ, না ব'লে সীতাকে নিয়ে—শেষকালে প্রাণ দিতে হ'লো !

ভূতো মার না খাওয়াতে ছেলেরা খুসী হইয়াছিল।

এই পেয়ারা চুরির গল্প অধর কুণ্ডুর আট-চালায় সেই সন্ধ্যাতে বিশেষ ভাবে আলোচনার পর সকলে একবাক্যে স্বীকার করিল, রাজু পণ্ডিত পাঠশালাটা একেবারে গোল্লায় দিলে। চুরির শাস্তি নেই ! হলো কি ? ঘোর কলি !

—ক্রমশ
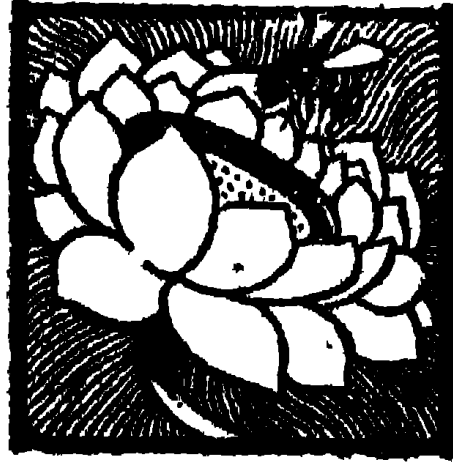
সমালোচক

শ্রী অতুলচন্দ্র গুপ্ত

সৃষ্টির ক্ষমতা যাঁর আছে তিনি সৃষ্টি করেন, যাঁর রসবোধের শক্তি আছে তিনি আস্বাদন করেন; এর মধ্যে সমালোচক লোকটি আবার কে? ইনি ঠিক লেখকও নন, আবার শুধু পাঠকও নন, অথচ একাধারে পাঠক ও লেখক। আর সেই দ্বৈত ভাবের জোরে পাঠককেও চোখ রাঙান, লেখককেও শাসন করেন। এই গুরুগিরির ফলে এঁর ধারণা জন্মে, আর সরল লোকেরও বিশ্বাস হয়, যে ইনি পাঠকদের চেয়ে অনেক উঁচু, আর লেখকদের চেয়েও খাটো নন। এ মিথ্যা জ্ঞান নিরাশের এক উপায় 'সমালোচক' সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা।

সমালোচনার মূলতত্ত্ব বোঝা কঠিন নয়। সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও রসের অনুভূতি সকল পাঠকের সমান নয়। এ অনুভূতি কারও সূক্ষ্ম, কারও মোটা; কারও ব্যাপক, কারও সঙ্কীর্ণ। বেশীর ভাগ পাঠকেরই সাহিত্যের বোধ সূক্ষ্ম ও ব্যাপক নয়। কিন্তু অনেক পাঠকের এটুকু শক্তি আছে যে দেখিয়ে দিলে তারা দেখতে পায়। সমালোচনার কাজ এই দেখিয়ে দেওয়ার কাজ। যাঁর অনুভূতিতে সাধারণ দৃষ্টির অতীত সুষমা ও রসের উপলব্ধি হয়, তাঁর যদি অপরকে তা দেখিয়ে দেবার শক্তি ও প্রেরণা থাকে তবে তিনিই সমালোচক। সাহিত্যের জগতে সমালোচক হচ্ছেন দ্রষ্টা ও দর্শয়িতা।

'কুমার সম্ভব' কাব্যের প্রথম শ্লোকটি সকলেরই জানা আছে।

> অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
> হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
> পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য
> স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥

আমরা সাধারণ পাঠকেরা কাব্যের এই প্রথম শ্লোকের কাছে বেশী আশা করি না। কারণ এর কাজ কাব্যের বিষয়ের অবতারণা মাত্র। তবুও এই হিমালয় বর্ণনার বিষয়োচিত গাম্ভীর্য্য আমাদেরও দৃষ্টি এড়ায় না, এবং আমাদের কান ও মন দুইই যে এতে বেশ খুশী হয়ে ওঠে তাও বুঝতে পারি। এই 'খুশী' হওয়ার তত্ত্বটা আলঙ্কারিক-দের চোখে ধরা পড়েছে। অনেকগুলি পদ নিয়ে এ শ্লোক, কিন্তু এর এক পদের সঙ্গে অন্য পদ, তাজমহলের পাথরের মত, এমনি চমৎকার মিলে গেছে যে মাঝের জোড়া আর দেখা যায় না, মনে হয় এর সব পদ নিয়ে সমস্ত শ্লোকটা যেন একটি মাত্র পদ। আমাদের কান যে এ শ্লোকে খুশী হয় তার প্রধান কারণ এর এই "মসৃণত্ব"। আলঙ্কারিকেরা আরও ধরিয়ে দিয়েছেন যে এ শ্লোকের সমস্তগুলি পদ, শব্দে ও ভাবে, ঠিক এক পথে চলেছে, হিমালয়ের প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যকে ফুটিয়ে তোলার দিকে; সে "সমতা" কোথায়ও ভঙ্গ হয় নি। এবং এতেই মনকে খুশী করে' তোলে। আলঙ্কারিকেরা নিজেদের সমালোচক বলতেন না। কিন্তু কালিদাসের এই শ্লোকের 'মসৃণত্ব' ও 'সমতার' দিকে পাঠকের যে দৃষ্টি আকর্ষণ তা হচ্ছে যথার্থ সমালোচকের কাজ। দেখিয়ে না দিলে অনেক পাঠককেই তা এড়িয়ে যায়, এবং একবার চোখে পড়লেই রসানুভূতি পূর্ব্বের চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে।

এর পাশাপাশি এমনি 'সমালোচনার' একটা আধুনিক দৃষ্টান্ত তোলা যাক্।

"পয়ার আট পায়ে চলে বলে তাকে যে কত রকমে চালানো যায় মেঘনাদ বধ কাব্যে তার প্রমাণ আছে। তার অবতারণাটি পরখ করে দেখা যাক্। এর প্রত্যেক

কবি ইচ্ছামত ছোট বড় নানা ওজনের নানা সুর বাজিয়েচেন কোনও জায়গাতেই পয়ারকে তার প্রচলিত আড্ডায় এসে থামতে দেন নি। প্রথম আরম্ভেই বীরবাহুর বীর মর্য্যাদা সুগম্ভীর হ'য়ে বাজ্‌ল—"সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি বীরবাহু"—তার পরে তার অকাল মৃত্যুর সংবাদটি যেন ভাঙা রণ-পতাকার মত ভাঙা ছন্দে ভেঙে পড়ল—"চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে"—তারপরে ছন্দ নত হয়ে নমস্কার কর'ল, "কহ হে দেবী অমৃত-ভাষিণি," তার পরে আসল কথাটা, যেটা সব চেয়ে বড় কথা—সমস্ত কাব্যের ঘোর পরিণামের যেটা সূচনা, সেটা যেন আসন্ন ঝটিকার সুদীর্ঘ-গর্জ্জনের মত এক দিগন্ত থেকে আর-এক দিগন্তে উদ্ঘোষিত হ'ল—"কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি পদে পাঠাইলা রণে পুন রক্ষঃ কুলনিধি রাঘবারি।"

(রবীন্দ্রনাথ। "ছন্দ"। 'সবুজপত্র,' চৈত্র ১৩২৪।)

আলঙ্কারিকদের উপর সুবিচার করতে হ'লে রবীন্দ্রনাথের 'সমালোচনায়' যেটুকু মহাকবির প্রকাশভঙ্গী তাকে বাদ দিয়ে তুলনা করতে হবে। এবং তা করলে বোঝা যাবে যে প্রাচীন ও নূতন—এই দুই 'সমালোচনা' এক জাতীয়। উভয়েই কাব্য-কৌশলের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও তার প্রকাশ।

কিন্তু এমন 'সমালোচনা' ইচ্ছা থাকলেই লেখা যায় না, যেমন ইচ্ছা করলেই কবি হওয়া যায় না। কিন্তু অকবি লোকেও কাব্য লেখে, আর যার কোনও রকম সাহিত্যিক সূক্ষ্মদৃষ্টি নেই সেও সমালোচক হয়। স্বভাবতই তাদের সমালোচনায় আলো থাকে না, থাকে শুধু উত্তাপ। কোনও নূতন সৌন্দর্য্য কি রস তারা পাঠকদের দেখাতে পারে না, কারণ তা তাদের নিজের চোখেই পড়ে না; সুতরাং তারা রোজামুল্লি সাহিত্যের বিচারক হ'য়ে বসে' ডিক্রি ডিস্‌মিস্ এর রায় দিতে থাকে। এবং ডিক্রির চেয়ে যে তাদের ডিস্‌মিসের রায় হয় অনেক বেশী তার কারণ এতে সহজেই প্রমাণ হয় যে তাদের সাহিত্যিক আদর্শটা ভারি উঁচু, এত উঁচু যে বেশীর ভাগ সাহিত্যই তার সিকিরও নাগাল পায় না। 'কিছু-হচ্ছে-না' বল্লেই ইঙ্গিতে জানানো হয় যে 'হওয়া-যাকে-বলে' তার ধারণাটা আমার কত বড় তা তোমরা সাধারণ লোকেরা ধারণাই করতে পারবে না!

সাহিত্যের এই হাকিম-সমালোচকেরা সচরাচর নবীন সাহিত্য ও নূতন লেখকদের সমালোচনা করেন। কালের কষ্টি-পাথরে যে সাহিত্য সোণা বলে' প্রমাণ হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা কঠিন কাজ। তাকে 'কিছু নয়' বলা চলে না, 'খুব ভাল' বল্‌লে কিছু বলা হয় না। অন্য লোকে সে সম্বন্ধে যা বলেছে তার অতিরিক্ত কিছু চোখে পড়লে তবেই তা নিয়ে আলোচনা করা যায়। কিন্তু সমালোচক নাম নিলেই চোখে দৃষ্টি আসে না; সেটা বিধাতার দান। নবীন লেখকদের সমালোচনায় এ সব আপদ নেই। সেখানে নির্ভয়ে হাকিমী করা চলে। চোখের দৃষ্টির প্রয়োজন নেই, ঘুষির জোর থাকলেই যথেষ্ট। অথচ নবীন সাহিত্যের সমালোচনায় রসবেত্তা সমালোচকেরাও যুগে যুগে কতই না অদ্ভুত কথা বলেছে। সেক্‌স্‌পীয়েরের যশ অচল হ'য়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে কতদিন? শেলী যে বায়রণের চেয়ে বড় কবি এ কথা প্রথমে ইংলণ্ডের কোনও সাহিত্য-সমালোচক বলেনি, বলেছিল একজন ন্যায়শাস্ত্র ও অর্থনীতির পণ্ডিত—নাম জন ষ্টুয়ার্ট মিল! কিন্তু সমালোচকদের বিশ্বাস যে সমসাময়িক নবীন লেখকদের সম্বন্ধে তাদের ভাল মন্দ লাগাটা বড় ছোটর একেবারে নির্ভুল মাপকাঠি!

এই সমালোচকেরা ভাবেন যে তাঁদের নিন্দাপ্রশংসা সাহিত্যের বড় হিতকর। তাঁদের প্রশংসায় সু-সাহিত্য উৎসাহ পায়, আর অ-সাহিত্য ও কু-সাহিত্য লজ্জায় মুখ ঢেকে সাহিত্য-সমাজ থেকে বিদায় হয়। এর কোনটাই ঘটে না। সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা রসগ্রাহী পাঠকের অপেক্ষা রাখলেও, সমালোচনার কোনও অপেক্ষা রাখে না।' আর সাহিত্যের সংসারে অসাহিত্য টি'কে থাকে রুচি-বুভুক্ষু পাঠকদের কৃপায়। তারা যতদিন আছে, এবং তারা

চিরকাল থাকবে, ততদিন সমালোচকের লাঠি তার কিছুই করতে পারবে না। সাহিত্যের জগতে সমালোচক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কিছুই নয়। সাহিত্যের সৃষ্টি, কি পালন, কি সংহারে তার কোনও হাত নেই। যে সমালোচক মনে করে যে সাহিত্য-সৃষ্টির কাজে তার সহায়তা আছে, তার ভুলটা ঠিক সেই রকমের, যদি জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত মনে করত যে গ্রহের চলাফেরার রাস্তা আবিষ্কার করে' তার গতির সহায়তা করা হচ্ছে। বিশ্বের রহস্য কবির মনে যে প্রকাশের আবেগ আনে তা থেকে কাব্যের সৃষ্টি হয়। সাহিত্যের বিশ্ব তত্ত্বদর্শী রসজ্ঞের মনে যে আনন্দের আবেগ আনে 'সমালোচনা' তার অভিব্যক্তি। ইন্‌সপেক্‌টরি করা সমালোচকের কাজ নয়, তা 'স্যানিটেরিই' হোক্ আর 'লিটেরেরিই' হোক্। সাহিত্যের হিতেচ্ছায় যে সব সমালোচনা তা অনেক পরহিতৈষণার মত শুধুই পীড়াদায়ক।

একটি......দু'টি

শ্রী জগদীশ গুপ্ত

বিভূতি নেহাৎই নূতন জামাই নয়।

সন ১৩২৬ ও ২৭ সালের দুই জামাই-ষষ্ঠীতে সে শ্বশুরালয়ে হাজিরা দিয়া গিয়াছে; আর একবার আসিয়াছিল দিদিশাশুড়ীর শ্রাদ্ধে; চতুর্থ পদার্পণ এই।

জামাই সম্পর্কে চঞ্চল অকূল সতর্ক ভদ্রতা আপ্যায়ন ও সোহাগের স্তর উত্তীর্ণ হইয়া এখন সে আপনজনের কেন্দ্রের মধ্যে পড়িয়াছে; দ্বিতীয়তঃ তাহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী শুনাইবার লোক পাইলেই নিজের মনের ব্যথার কথাটি তাহাকে শুনাইয়া হৃদয়ভার লঘু করিতে ভালবাসেন।

বলিতেছিলেন,—মুখপোড়াদের বেহায়াপানা দেখে' ইচ্ছে করে মুখে তাদের ঝাঁটা মারি দশ ঘা।—বলিয়া তিনি ঝাঁটার পরিবর্ত্তে নিরস্ত্র দক্ষিণ হস্ত এবং দশবারের পরিবর্ত্তে শুধু হাতই দু'বার ক্রুদ্ধভাবে আকাশে আস্ফালিত করিয়া গতর স্ফীত এবং হৃদয়ভার লঘু করিয়া ফেলিলেন।......

তারপরে বলিলেন,—বল্‌ব কি তোমায়, বাবা, বল্‌তে ঘেন্নায় লজ্জায় ধিক্কারে মরে' যেতে ইচ্ছে করে মেয়ে পেটে ধরেছি বলে; ইচ্ছে করে—

কিন্তু মনের ইচ্ছাটা তখনই প্রকাশ না করিয়া তিনি ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।—

বিভূতি সেই অবসরে পুনরায় জলযোগে মন দিয়াছে এবং "জ্যোতির্ম্ময়ী" নামে পরিচিত মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের "আমকলা" নামক সন্দেশের একটুক্‌রা ভাঙিয়া লইয়াছে। এমন সময় জলদবরণী পুনরায় বলিয়া উঠিলেন,—বলে কি শুনবে বাবা? দশজন লোকের সাম্‌নে মুখপোড়া মেয়েকে বলতে পার্‌লে, তখন সে-কথা তোমায় বল্‌তে আমার বাধা কি?

তাহাতে অপ্রত্যক্ষ বাধা কিছু আছে কি না তাহা বিভূতি জানিত না, কিন্তু প্রত্যক্ষ জলযোগে তার বাধা

পড়িয়া গেল।—আমকলার টুক্‌রা হাতে করিয়া পুনরায় মুখ তুলিয়া সে শাশুড়ী ঠাকুরাণীর মুখের দিকে মনোযোগের ভাণ করিয়া চাহিয়া রহিল। তিনি বলিতে লাগিলেন,—তোমার শ্বশুর উপস্থিত, ও-বাড়ীর মেজঠাকুর আছেন, অম্বিকে আছে, অতগুনো বুড়' বুড়' লোকের সাম্‌নে ভানীকে বল্‌লে—

বিভূতি ও-বারান্দায় ভানীর দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার মুখ আর দেখা যাইতেছে না; কড়াইযে চায়ের জল অল্প অল্প ধোঁয়া ছাড়িতেছে।

—আগে ত' অনেক কথাই শুদিয়েছে, কি কি রাঁধতে জান? একপো চালে ঠিক্ কতটুক্ জল দিলে ভাতে মাড় থাকে না? বালি কতক্ষণ সেদ্ধ করতে হয়? খিঁচুড়ীতে কি মস্‌লা দিতে হয়?—এই সব ঢের ঢের কথা আগে ত শুদিয়েইছে; শেষকালে বল্‌লে, তোমার শ্বশুরের সাম্‌নে, কলসী কাঁখে দিয়ে আমার দিকে পেছন ফিরে হেঁটে যাও দেখি—পার্‌বে? শুন্‌লে কথা? দেখ্‌লে মানুষের আক্কেল? ভদ্দর ঘরের ঝি বৌ কি তা' পারে? —তখন মনে হ'ল না; এখন হলে দিতাম সেই হারামজাদার মুখে ঝাঁটার নোড়া গুঁজে।—

জলদবরণীর দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণের শব্দ বিভূতি স্পষ্ট শুনিতে পাইল।

পুনরায় ফাঁক পাইয়া বিভূতি "আমকলা" শেষ করিল......

ব্যাপার এই—

ভানী বিভূতির শ্যালিকার নাম, পুরা নাম নিভাননী। ভানী বিবাহযোগ্যা। বিভূতির শ্বশুরের আহ্বান অনুসারে অনেক অবিবেচক ব্যক্তি ভানীকে দেখিতে আসিয়া, কলসী কাঁখে লইয়া হাঁটিলে ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কুমারীকে পশ্চাদ্দিক্ হইতে কেমন দেখায় তাহাই স্বচক্ষে দেখিয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিল।

তবু ত' নাচিতে বলে নাই—

তবু উহাতেই কন্যাপক্ষায় ব্যক্তিগণ গররাজি হইয়া বিবাহের উদ্দিষ্ট প্রস্তাব অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। সেই কথাটাই এবং তজ্জনিত মনোবেদনা জলদবরণী এখন প্রকাশ করিতেছেন।—

সেই অনুপস্থিত রসিক ব্যক্তির প্রতি জলদবরণীর ক্রোধের উপশম সহজে না হইবারই কথা।......তাহার মুখগহ্বরে ঝাঁটার নোড়া গুঁজিয়া দিবার উৎকট প্রণালীটা তিনি হাতের ভঙ্গীর দ্বারা প্রকট করিতেছেন এমন সময় বাহির হইতে গলার শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিবার একটা তুমুল শব্দ আসিল, এবং তৎপরে প্রশ্ন আসিল,—তোদের চায়ের কত দেরী রে ভানী?

ভানী ভগিনীপতির সম্মুখে না চেঁচাইয়া তাহাকেই বলিল,—ডাক্তারবাবু এসেছেন, বসতে বলুন। বলিয়া ফুটন্ত জলে খানিকটা চা ফেলিয়া দিল।

বিভূতি উঠিয়া গেল।

বলিল,—বসুন। চা হয়েছে।

ডাক্তারবাবু বলিলেন,—বসছি। তারপর কৈফিয়ৎ দিলেন,—বৈকালিক চা-টা আমি রোজই এইখানেই খাই। তুমি—

সঙ্গে প্রশ্নের একটি সুর তুলিলেন।

বিভূতি বুঝিল; বলিল,—আমি এ বাড়ীর জামাই। বড়—

– তাই বল, বিদেশী লোক। কিন্তু তোমাকে আমি দেখেই বুঝেছি যে তুমি জামাই;—বেশভূষা, চুল ইত্যাদি বেশ সুসঙ্গত। কেমন? বলিয়া ডাক্তারবাবু বিভূতির পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিতে লাগিলেন।

...বিভূতি লক্ষ্য না করিয়া পারিল না যে, মুখের হাসি চোখে সংক্রামিত হইয়া যে একটি সৌষমান্বিত সামঞ্জস্যের আনন্দকর স্ফূর্তি হয়, ডাক্তারবাবুর বাম চক্ষুটায় তার একান্ত অভাব, এবং ঐ অভাবটার দরুণ যেন একটা অহেতুকী শঙ্কার উদয় হয়।...চক্ষুটির পলক পড়ে; কিন্তু

নির্ব্বাপিত নিঃসঙ্গ ও সৃষ্টি-শৃঙ্খলার বহির্ভূত একটা বিরাট পদার্থের মত তাঁর সেই চক্ষুটি সমগ্র সচল সজীবতার পাশে অত্যন্ত করুণ ও কাঙ্গাল।...

ডাক্তারবাবু বলিতে লাগিলেন,—তুমি ঋষির জামাই, তোমার উচিত আমার পায়ের ধূলো নে'য়া।

বিভূতি একটু হাসিয়া তাঁর পায়ের ধূলো নিল।

—যেচে কেন তোমায় পায়ের ধূলো দিলাম তার কারণটাও তবে শোনো। তুমি চা আনতে' এখনই বাড়ীর ভেতর গেলেই তোমার শাশুড়ী ঠাকরুণ শুদোতেন, ডাক্তারবাবুকে প্রণাম করেছিলে? তুমি নিশ্চয়ই বলতে, না করিনি। তা' হ'লেই তিনি তোমাকে মনে মনে একটা বেকুব ঠাউরে, আমার পায়ের ধূলো নিতেই তোমাকে আবার ফেরত পাঠিয়ে দিতেন। তাই কাজ এগিয়ে রেখে দিলাম। হাঃ হাঃ হাঃ।—

এবারেও বিভূতি তাঁর বাম চক্ষুটাই লক্ষ্য করিল।

প্রাণের আনন্দনির্ঝরের মুক্তির নিজস্ব ঐ দ্বারটি একেবারে রুদ্ধ হইয়া গেছে।......মানুষের দেহের অতটুকু অংশের নিষ্ক্রিয় বিকৃতি যে তাহাকে এত হীন ও ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়া দূরত্ব ও অপরিচয়ের একটা অস্বস্তিকর আবরণ তার সমস্ত সচেতন সত্তাটির উপরই নিক্ষেপ করিতে পারে তাহা বিভূতির জানা ছিল না।......

ভানী চা দিয়া গেল।

ডাক্তারবাবু অন্যমনস্কের মত কেবলি চায়ের হাল্কা ধোঁয়ার উপর ফুৎকার দিতে লাগিলেন; বলিলেন,—ধোঁয়া জিনিষটা আমি বড় অপছন্দ করি; এই আছে এই নেই; যেন—

বলিয়া তিনি কি যেন ভাবিতে ভাবিতে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলেন।

বিভূতি বলিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ।

নিঃশব্দে চা-পান শেষ করিয়া ডাক্তারবাবু মুখ তুলিয়া বলিলেন,—তুমি আমার বাঁ চোখটা লক্ষ্য করছিলে, তা' আমি টের পেয়েছি।

বিভূতি লজ্জিত হইয়া মাথা নোয়াইল।—অকারণ খুঁৎ ধরার মত ঐ চোখ লক্ষ্য করায় একটা চপল অসৌজন্য প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই তাহার মনে হইল।

ডাক্তারবাবু বলিলেন,—এ চোখটায় আমি দেখতে পাইনে; একটি চোখ দিয়েই আমাকে সব দেখতে হয়। ভগবান চোখ দিয়েছেন দু'টো শুধু দেখতে নয়, একটা চোখেই প্রচুর দেখা যায়; একটা চোখ দিলে, সেই একটা হঠাৎ অকেজো হ'য়ে গেলে সব অন্ধকার হ'য়ে যাবে, কাজেই আর একটাকে হাতে রেখে দুটো দে'য়া বাক্—এ-রকম মতলবও বিধাতার ছিল না। তিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কিনা, তাই দেখতে সুন্দর হবে বলে' মানানসই করে' দুটো চোখ তিনি সবাইকে দিয়েছেন।... তার একটা জ্যোতিঃহীন বলেই তার অসৌন্দর্য্যটা তোমার চোখে পড়েছে, তা' আমি বুঝেছি।—বলিয়া তিনি একটু হাসিলেন। হাসিটি বড় বিষণ্ণ। বিভূতি মনে মনে বলিল,—আহা।......

প্রকাশ্যে বলিল,—চোখটা গেল কিসে?

—শুনবে তা'?

বিভূতি ঘাড় নাড়িল—শুনিতে সে ইচ্ছা করে।

আয়োজন দেখিয়া বিভূতির মনে হইল, চোখ যাওয়ার পশ্চাতে একটা ক্ষুদ্র মধুর গল্প আছে—

দৈবদুর্ঘটনা, কি বাল্যকলহ, কি এমনি একটা কৌতুককর কিছু সেই গল্পের প্রধান উপজীব্য; এবং সেই গল্পটাই ডাক্তার বাবু নিঃশব্দে সাজাইতেছেন।........কিন্তু ডাক্তার বাবু হঠাৎ চোখ খুলিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন একেবারে অপ্রত্যাশিত অন্যভাবে; এবং তার সবটাই দুর্ব্বোধ্য। বলিলেন,—মানুষ অবিশ্বাস করে' অনেক দুঃখ দুর্ভোগ নিজের ওপর টেনে আনে—এ-কথায় যার সন্দেহ আছে সে আমার কৃপার পাত্র।—

বলিয়া তিনি যেন মানসিক উত্তেজনা দমন করিবার জন্যই থামিলেন।

বিভূতি মনে মনে বিস্মিত হইয়া সবিনয়ে বলিল,—যে আজ্ঞে। আমি কিন্তু কাউকে হঠাৎ অবিশ্বাস করিনে।

—তোমার কথা, মানে ব্যক্তিবিশেষের কথা আমি বল্‌ছিনে; সামাজিক সম্বন্ধে কি দৈনন্দিন জীবনে পরস্পরের বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথাও বল্‌ছিনে, সে তারা বুঝে নেবে, আমি বল্‌ছি, যেমন ভগবানে অবিশ্বাস, পরলোকে পুনর্জন্মে অবিশ্বাস—এই সব। অতিশয় হতভাগ্য তারা যারা মনে করে যে, তারা বুদ্ধির দ্বারা, কি আত্মানুভূতির সাহায্যে সব বুঝে শেষ করে বসে আছে, তাদের বুদ্ধিশক্তির অনধিগম্য যা' তা' স্বপ্নের মত মিথ্যা। কিন্তু তা' নয় ত'।......ভগবান আছেন, ইহলোকের মত পরলোক আছে, পুনর্জ্জন্ম আছে, আর একটা জিনিষ আছে—যা' শুধু আছে নয়, কাজ করছে। আমার এই একটি চোখ সাম্‌নে যা' দেখছে, সে থাকা অবিকল তারই মত সত্য।......

চোখ যাওয়ার সম্পর্কে এই চরম তর্কের বিষয়বস্তু, অর্থাৎ পরলোক, পুনর্জ্জন্ম প্রভৃতির অবতারণা, বৃদ্ধ বয়সের মরণভীতির দরুণ স্বাভাবিক অস্বাচ্ছন্দ্য মনে করিয়া মনে মনে ডাক্তারবাবুকে ক্ষমা করিয়া বিভূতি ভাবিল,—দেখা যাক্ কোথাকার পাণি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। সায় দিয়া বলিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ, বলেছেন; চোখের বাইরেও এমন সব জিনিষ আছে যা প্রত্যক্ষবৎ সত্য, যেমন প্রেতাত্মা—

বিভূতির মুখের কথা তখনও নিঃশেষ হইয়া ফুরায় নাই—

কিন্তু ঐখানেই ডাক্তারবাবু যেন অতর্কিত মর্ম্মান্তিক আঘাতে তন্দ্রা ভাঙিয়া চম্‌কিয়া তাহার মুখের সম্মুখে একেবারে খাড়া হইয়া উঠিলেন, এবং উভয়ের অবান্তর আলাপের মধ্যে যে একটা নিরবচ্ছিন্ন মৃদুমন্দ ঋজু গতি ছিল, বিভূতির মনে হইল, তাঁহার এই উগ্র ব্যগ্রতায় তাহাও যেন সহসা সংক্ষুব্ধ শাণিত হইয়া উঠিল

বিভূতি একটু উস্‌পিস্ করিয়া খানিকটা সরিয়া বসিল।

ডাক্তারবাবু বিভূতিকে প্রাণপণে ছাঁকিয়া ছাঁকিয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্রশ্ন করিলেন,—কি করে' জান্‌লে তুমি? দেখেছ কখনো?

—আজ্ঞে না, দেখিনি, তবে আছে বলে আমি খুব বিশ্বেস করি।

—শুনে' সুখী হ'লাম। কিন্তু তাদের অস্তিত্ব গ্রহণ কর্‌তে হবে অসাধারণ ভাবে। জ্যোতির্ব্বিদের চোখে গ্রহতারার দূরত্ব গতিবিধি উদয়াস্ত হ্রাসবৃদ্ধি যেমন করে' ধরা পড়ে, তেমন করে' ধরা তারা দেয় না, তারা দূরের জিনিষ নয়, আমি ভেবে দেখেছি।......আমাদেরই অন্তরের সহানুভূতির মধ্যে তাদের প্রকাশ; তারা আমাদেরই অন্তরলোকবাসী, সেইখানেই তাদের অস্তিত্বের বিকাশ হয়, অর্থাৎ আমরাই তারা,—কেবল স্থান ভেদে আর অবস্থাগুণে কি সংস্থানবশে তারা সচরাচর চোখ এড়িয়ে যায়।... ..

কিছু না বুঝিয়াই বিভূতি বলিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বিজ্ঞান বলে, প্রমাণ দাও। সেটা শুধু বিদ্যা। ক্ষিতি অপ্ তেজ্ মরুৎ ব্যোম্—এরা যেমন আছে, তেমনি একটা অদৃশ্য শক্তি কি নিয়ন্তা রূপে তারাও আছে, মানুষের ভাগ্যের খেলায় তাদের হাত আছেই আছে—একথা খুব খাঁটি।......প্রমাণও খুব কাছেই আছে। বলি শোনো।—

.. .. পঞ্চান্ন বৎসর আগেকার কথা, তখন আমার এই চোখ দুটি, যাদের চোখ্ দুটোই আছে, তাদেরই মত ছিল, ভাল মন্দ কু জ চোখে যা' বিম্বিত হয় তা' কেমন হ'য়ে দেখা দিত তা' জানিনে; তবে „একটি অন্ধকার হয়ে থাকার বীভৎসতা তখন ছিল না।—

......পশ্চিমে তখন ডাক্তারী করি। কেবল থাকি

দি'। রোগ ধরতে পারিনে, তবু চিকিৎসা করে' যাই, আন্দাজে।......মৃত্যু অদৃষ্টের লেখা, লোকে বলে; কিন্তু চিকিৎসার দোষে লোক যে অকালে মরে এ-টা আমি মানি।—তবে অভ্রান্ত কেউ নয়, আর পয়সার প্রয়োজন সবারই; কাজেই শেষ মুহূর্ত্তে ভুল বুঝতে পেরে মনে যে আঁচ লাগে সে দিকে বেশিক্ষণ দৃক্‌পাত করা ঘটে' ওঠে না।......

মনের গোচরে নানাবিধ পাপ ঘটতে থাকলেও, সুচিকিৎসক বলে' একটা নাম কি করে' রটে গেল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে লোকের অজস্র স্তুতিবাদে আমার অযোগ্যতার আন্তরিক লজ্জা আর কুণ্ঠা কেটে, মানুষের অনুমানটি আমার অন্তরের কাছেও একান্ত সত্য হ'য়ে উঠল।......মানুষ নিজের কাছেই যে কত অপরিচিত এ-টা তারই প্রমাণ, কিন্তু এই অজানার দূরত্ব কমিয়ে আনা যায় অনুশীলনের দ্বারা।......

তবে তপস্যা বলে' সেটা বড় কষ্টকর বলেই আমার বিশ্বাস।—

সে-যাই হোক্, লক্ষ্মী আর ষষ্ঠীর কৃপায় দিন স্বচ্ছন্দে যায়।

একদিন হাসপাতালের বারান্দায় বসে' পটাপট্ রুগী বিদায় করছি—

হঠাৎ আহত জন্তুর গর্জ্জনের মত একটা শব্দে কেঁপে উঠে দেখ্‌লাম, বাঁ হাত দিয়ে বাঁ চোখ টিপে ধরে' একটি লোক বসে আছে।......চেয়ে দেখ্‌লাম, তার মুখের শব্দটা বন্ধ হ'য়ে গেছে বটে, কিন্তু তার সর্ব্বাঙ্গ যেন আমার ওপর এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে, এম্‌নি হিংস্র তার দাঁত, মুখ আর একটা চোখের চেহারা।—মনে হ'ল, লোকটা কাফিরিস্তানী।

হাতের রুগীটিকে তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিয়ে তাকে কাছে ডেকে নিলাম,—ব্যাপার কি?

সে বললে,—চোখ্ যায়।—

হাত সরালে দেখলাম,—চোখে অসুখের বহিলক্ষণ কিছু নেই, কেবল তারার চারদিকে গোল হ'য়ে লাল একটা সরু রেখা পড়ে গেছে।

ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলাম, সে চলে' গেল।

কি অসুখ তার চোখে হয়েছিল তা ধরতে পারিনি; চোখের স্নায়ুবিন্যাস বিবিধ রোগের ধারা—কিছুই ভাল জান্‌তাম না, কিন্তু তাকে ভরসা দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে বলে দিলাম, ভাল হ'য়ে যাবে।...কথাটা আমি অকপটে বলেছিলাম কি না, এখন তা' মনে নেই, কিন্তু মনে হয় কপটতা ছিল না।—

পরদিন লোকটি আবার এল।

বললে,—যন্ত্রণা কিছু কম।

কিন্তু আমি দেখ্‌লাম, যন্ত্রণার সঙ্গে দীপ্তিও কিছু কম। ...তখনই তাকে আমার ছেড়ে দে'য়া উচিত ছিল; ছেড়েই দিতাম যদি মনে দ্বন্দ্ব থাকত, কিন্তু হাসপাতালের রুগী নিয়ে ডাক্তারের মনে দ্বন্দ্ব ঘটলে কাজের ক্ষতিই হয়। কাজেই তাকে রুটিন মত পুনরায় আস্‌'ত বলে দিলাম।

প্রত্যহ সে আসে যায়।—

চোখে ওষুধ লাগিয়ে চলে যায়, কে লাগিয়ে দেয় জানিনে, সাতদিনের দিন আমার অবসর হ'ল; নিজেই তার চোখের বাঁধন খুল্‌লাম, আর, খুলেই আমার সন্দেহ রইল না যে চোখটি গেছে, তিল তিল করে যন্ত্রণা কম্‌তে কম্‌তে যন্ত্রণার সঙ্গে তিল তিল করে দৃষ্টিও গেছে।

ভাঙ্গা পুস্তু আমি জানি।

তাকে বল্‌লাম,—চোখ তোমার কানা হ'য়ে গেছে। হাসপাতালে চোখের চিকিৎসা করাতে আর আমার দরকার নেই।—

'ইয়া খোদা' বলে' আকাশে হাত তুলে' সে কি তার আর্ত্তনাদ!......এখনও সে আর্ত্তনাদ যেন নিঃশেষ হয়ে নিঃশব্দ হয়ে যায়নি। তার নিশ্বাস সেই আর্ত্তনাদের জের আজও আমার কাণের ভেতর, বুকের ভেতর,

মগজের ভেতর বাজ্ছে। কিছুদিন অবশ্য ভুলে ছিলাম, কিন্তু সে এ ঘটনার পরের কথা।

অত বড় মানুষটা—

মাটিতে লুটিয়ে লুটিয়ে ভগবানকে ডেকে ডেকে সে কি তার কান্না! তারপর উঠে বসে বল্লে,—কিন্তু এ ত' হ'তে পারে না। চোখ আমার চাই।

উপস্থিত সকলেই তাকে বুঝিয়ে বল্লে,—মানুষের আর হাত নেই, যা গেছে তা গেছে; বাকি জীবনটা ঐ একটি চোখ নিয়েই তাকে চল্তে হবে।

সে বল্লে,—কিন্তু খোদার কাছে আমি এই অসম্পূর্ণ দেহ নিয়ে কেমন করে দাঁড়াব?

কে একজন বল্লে,—আরো বহুৎলোক অসম্পূর্ণ দেহ নিয়ে সেখানে থাক্বে; তোমার একার জন্যে তাঁর নতুন কিছু নিয়ম নেই।

কিন্তু সে তা বুঝ্লে না; আমার দিকে চেয়ে বল্লে,—বাবুজি, তোমার ঐ বাঁ চোখটি আমায় দিতে হবে।

চম্কে উঠে বল্লাম,—আমার?

বুক শুকিয়ে উঠ্ল।

সে বল্লে,—হ্যাঁ। তুমিই নিয়েছ, তোমার কাছ থেকেই আমি নেব। বলে' সে চলে' গেল।

কেউ তার উদ্দেশে বল্লে,—পাগল!

কেউ বল্লে, ডাকাত!

আমার সহকারী বল্লেন, হাম্বাগ্!

কিন্তু, কবে এই দুর্দ্দান্ত পাঠানের ছুরির ঘায়ে আমার চোখ যায় এই ভয়ে আহার নিদ্রা ঢের কমে গিয়ে চাক্রীর উপরই আর আমার মমতা রইল না।—

দিনকতক ত' অবিরাম চোখের সাম্নে দেখ্তে লাগ্লাম, তার সেই বিনষ্ট চক্ষুটি, আর তার কোণে স্বচ্ছ

ছুটি নিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম

জীবনে আর সে দিকে পা দেই নি।

কিন্তু সে যা বলে' গিয়েছিল, তাই ঘট্ল—আমার এই চোখটি সেই নিলে। বলিয়া ডাক্তারবাবু কম্পিত তর্জ্জনীটা তাঁর দৃষ্টিহীন চক্ষুটির দিকে তুলিলেন।

বিভূতি বলিল,—বাপ্রে! আচ্ছা প্রতিহিংসা-পরায়ণ ত!

কিন্তু সে দেখিয়াও বোঝে নাই যে, চোখে ছুরি বসাইয়া দিবার চিহ্নও নাই; চোখ তেম্নি চাহিয়া আছে —কেবল ভিতর হইতে আলোটুকু অন্তর্হিত হইয়াছে।—

ডাক্তারবাবু বলিলেন,—হ্যাঁ, প্রতিহিংসাপরায়ণ বৈ কি, কিন্তু শোধ নিলে বহুবর্ষ পরে।

পেন্সন্ নিয়ে বসে' আছি—

ভুলে' গেছি তার কথা—

সাময়িক একটা অত্যাচারের ভয়েই তখন তখন ব্যাপারটা বড় হ'য়ে উঠ্লেও, বেশিদিন আতঙ্কটা মনের পেছনে ঘোরে নি। কিন্তু হঠাৎ একদিন তার কথা আর তার চোখের কথা মনে পড়ে' গেল বড় আশ্চর্য্য শোচনীয় ভাবে।

তখন আমি কলকাতায়।

বড় ছেলে হেমাঙ্গ ডাক্তারী করছে; আমি নাতি নাৎনীর বাহন হ'য়ে বসে' আছি; সুখ অগাধ…

এমন সময় একদিন ভোরবেলা ঘুম ভেঙেই আমার অগাধ সুখ এক নিমেষেই নিবে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।…ঘুমের ঘোরেই মনে হচ্ছিল, মাকড়সার মত একটা বহুপদ প্রাণী অসংখ্য সরু সরু পায়ের চট্চটে স্পর্শ দিয়ে দিয়ে বাঁ চোখের পাতার উপর সুস্থির করে' হেঁটে বেড়াচ্ছে। ঘুম ভেঙে চোখের পাতার উপর হাত বুলিয়ে উঠে' বসে' দেখি, রাত্রি নেই—

আর চোখের যন্ত্রণায় ডাক্ ছেড়ে চেঁচাতে ইচ্ছে কর্ছে।…যেন চোখের ভিতরকার পেশী মাংস স্নায়ু শিরা সাঁড়াশী দিয়ে কে চেপে ধরে' ছেড়ে' ছেড়ে' দিচ্ছে, এম্নি দপ দপ্ যন্ত্রণা।—

লোকে দেখে বল্লে,—তারার চারিদিকে খুব সরু আর গোল একটা রক্তবর্ণ রেখা দেখা দিয়েছে। দপ্ করেই মনে পড়ে গেল সেই লোকটার কথা। তারও চোখের তারার চারিদিকে তিরিশ বছর আগে লাল সূক্ষ্ম রেখা দেখেছিলাম। ত্রিশ বছর আগেকার দেখা চোখ সমেত সেই মূর্ত্তিটা যেন চোখের সাম্‌নে জলে' উঠ্‌ল।··· আমার বুকের ভেতর থেকে উঠে পাঁজরে ঘা দিতে লাগল, তার সেই গভীর আর্ত্তনাদ।—

ছেলেদের ডাকে ডাক্তাররা ছুটে' এল

যন্ত্রণার লাঘব হ'তে লাগ্‌ল—

কিন্তু ভোরবেলায় রোজ রোজ সেই অনুভূতিটা—যেন কি আল্‌গোছে হেঁটে বেড়াচ্ছে চোখের পাতার ওপর—সেটা ঠিক্ একই মুহূর্ত্তে কাঁটায় কাঁটায় ঘটতে লাগ্‌ল; লক্ষ্য রেখে দেখা গেল, সেটা কেবল আমার অনুভূতি মাত্রই, সত্যিই কিছু বেড়ায় না।

যন্ত্রণা কমতে লাগল—

ঠিক্ তেম্‌নি করে সেই ঘটনারই যেন পুনরভিনয় ঘটল; যাবতীয় ডাক্তারের কৌশল অভিজ্ঞতা চেষ্টা ব্যর্থ করে, যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে, তেল পুড়্‌তে পুড়্‌তে যেমন দীপ নিবে যায়, তেম্‌নি করে' নিব্‌তে নিব্‌তে, সাত দিনের দিন, চোখের দৃষ্টি একেবারে নিবে গেল।

খানিক নিঃশব্দে থাকিয়া ডাক্তারবাবু বলিতে লাগিলেন,—

গলা কাঁপিতে লাগিল,—অসম্পূর্ণ দেহ নিয়ে সে খোদার কাছে যায়নি, এ-কথা ঠিক্; আমারই চোখের দৃষ্টি নিয়ে সে নিজের দৃষ্টি সম্পূর্ণ ক'রে নিয়ে গেছে, সে-ও ঠিক্।······আমি স্বচক্ষে দেখেছি

বিভূতির চোখে মুখে শঙ্কা আর উৎকণ্ঠা মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিল।—

ডাক্তারবাবু বলিতে লাগিলেন,—সাতদিনের দিন, যেদিন চোখ একেবারে গেল, সেদিন তাকে স্পষ্ট সাম্‌নে দেখ্‌লাম—এক মুহূর্ত্তের জন্য ...এক মুহূর্ত্তেই দেখে নিলাম, ছায়ায় দুটো চোখের দৃষ্টিই জল্ জল্ করছে।—দেখা দিয়েই সে মিলিয়ে গেল।······

বাউলের গান

সহজ পথে রাগের বাতি জ্বেলে চল্‌রে মন
বাঁধবে না আর কাঁটা খোঁচা, দেখ্‌তে পাবি রূপের কিরণ।
সহজ পথে সহজেতে যেতে হয় মন যোক্তে-বাক্তে
মদন আর কন্দর্পেতে খুঁজে পায় না তার অন্বেষণ।
সহজ পথের ফটক খোলা
তালার উপর আছে তালা
তার উপরে নিত্যলীলা করছে বসে মানুষ-রতন।

সপ্তম তালার ঊর্দ্ধেতে পথ
সহজ মানুষের গতাগত্
মাধবচাঁদের এই খোলা বাত্ বেন্দা জেনে করবি সাধন ॥

দিতে মরতে বাঞ্ছা আছে কার—
এই দু'কথা বেদের পার।
যে দিতে পারে সে মরতে পারে
তার কাছে লীলা চমৎকার।
আমি খুঁজে খুঁজে দেখলাম ত্রিভুবন
যার মাথায় কালো চুল উদর হয় কখন,
সে উপরোধে ঢেঁকি গেলে,
কুটিল মন তার হীরের ধার।
যেম্নি দান তার তেম্নি দক্ষিণে
রাজার ছেলে বসে আছে গন্ধমাদনে—
সর্ব্বাঙ্গ তার সুন্দরকান্তি, মুখখানি তার কদাকার।
গোঁসাই হরি পদয় ডেকে কয়,
রুগির মতন চোখ বুজে তার পাচন খাওয়া নয়,
পদর মতন জন চার হ'লে ডাঙ্গাতে দিতো সাঁতার ॥

এ ভাঙা ঘরেতে টিক্‌বি কি রসের মানুষ আর
—আমার ঘর হয়েছে অনাচার।
দৈব মায়া আছে যার সঙ্গে
নারকেলে জল কোন্ সময় হয় কে বা তা জানে—
যেমন গুটি পোকায় গুটি করে আপনার মরম করে সার।
আমার সঙ্গে একটা ভুলকো বাগিনী
আমি মনের সাথে দুগ্ধ দিয়ে পুষলাম কালফণি—
সে ছাড়ছে নিশ্বাস বিষের বাতাস আমায় খায় কি রাখে
ভাব্‌ছি তাই।

ছ'টা ইঁদুর কাট্‌ছে মাটি যার
চৌদিকে তার বইছে হাওয়া ঘরের আলগা নয় দুয়ার,
সে তার তীর ধরে নীর ছেঁচতে নদীর ঝরণা বেয়ে হয়
সাঁতার।

গোঁসাই হরি বলে, শোন্ পদ নচ্ছার,
ওরে শুতে গিয়ে মূলে চুরি করলি রে গোঙার,
ও তোর মস্তকে দংশেছে ফণি, কোথায় ধন্থি বাঁধবি
আর ?

সংগ্রাহক—শ্রী সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

চয়নিকা

গান

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী,
একা একা করি খেলা।
আনমনা যেন দিক্ বালিকার
ভাসানো মেঘের ভেলা।
যেমন হেলায় অলসছন্দে
কোন্ খেয়ালীর কোন্ আনন্দে
সকালে ধরানো আমের মুকুল
ঝরানো বিকাল বেলা।
একা একা করি খেলা॥
যে-বাতাস নেয় ফুলের গন্ধ,
ভুলে যায় দিন শেষে,
তার হাতে দিই আমার ছন্দ
কোথা যায় কে জানে সে।
লক্ষ্যবিহীন স্রোতের ধারায়
জেনো জেনো মোর সকলি হারায়,
চিরদিন আমি পথের নেশায়
পাথেয় করেছি হেলা।
একা একা করি খেলা॥

—আনন্দ বাজার পত্রিকা, ৪ঠা চৈত্র '৩৩।

রূপ ও রস

শ্রী প্রমথ চৌধুরী

একটি ফরাসী কবি বলেছেন যে The visible universe exists for me. অর্থাৎ আমার কাছে দৃশ্যবিশ্ব বলে একটা বিশ্বের অস্তিত্ব আছে। এ কথা শুনে হঠাৎ মনে হয় যে, কথাটা এত জোর করে বলার কি প্রয়োজন ছিল ? এ বিশ্ব যে দৃশ্য, এ সত্য আর কার কাছে

অবিদিত! কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায় যে, মুখফুটে এ কথা বলায় টেওফিল গোটিয়ে অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। দৃশ্যবিশ্বের অস্তিত্ব মেনে নেওয়াটা জ্ঞানীদের মতে ছেলেমানুষ। আমাদের দার্শনিকদের মতে জগৎ মিথ্যা, অতএব তার রূপও অধিকন্তু মিথ্যা। আর ইউরোপীয় দার্শনিকদের মতে দৃশ্যবিশ্বের বাইরে কোনও অস্তিত্ব নেই, ও বস্তু আছে মানুষের সুধু চোখের ভিতর। মানবদেহের অন্তর্মুখী নাড়ির কম্পনকে মূর্খলোকেই সুধু বহির্জগৎ বলে। তার পর আমাদের নৈতিক গুরুরা বলে থাকেন যে, দৃশ্যবিশ্ব আছে কি নেই, এ প্রশ্ন নিয়ে বকাবকি করে যত নিষ্কর্ম্মা লোকে। এ পৃথিবীতে মানুষ সুধু হাঁ করে বিশ্বরূপ চেয়ে দেখবার জন্যে আসে নি, এসেছে সুধু সদুপায়ে খেতে আর পরতে। মানুষের কাছে এ বিশ্বটা একটা ছবি নয়, এটা হচ্ছে তার কর্ম্মক্ষেত্র। মানুষ সংসার নাটকের অভিনেতা, দর্শক নয়। সুতরাং যিনি বলেন যে আমার কাছে দৃশ্যবিশ্ব আছে—তিনি নিজ মুখে স্বীকার করেন যে তিনি বিশ্বের একজন রূপদর্শক মাত্র, অর্থাৎ immoral. ধার্ম্মিকও এ কথায় ঘোর আপত্তি করবেন। রূপ জিনিষটে আমি মানি, এ কথা বলায় স্বীকার করা হয় যে আমি একজন ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোক, কারণ দৃশ্যবিশ্ব হচ্ছে ইন্দ্রিয়গোচর। দৃশ্যবিশ্বের অস্তিত্ব স্বীকার করা হচ্ছে প্রকারান্তরে পরমাত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা, কারণ ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম না করলে আত্মার সাক্ষাৎকার পাওয়া যায় না।—ও সাক্ষাৎকার লাভ হয় সুধু ধ্যানে, আর ধ্যান করতে হয় চোখ বুজে। বিশ্বের রূপ হচ্ছে তার স্বরূপের রঙচঙে আবরণ। অতএব মানুষের কর্ত্তব্য ও আবরণ ছিঁড়ে ফেলা। কাজেই লোকের মত এই যে, দৃশ্যবিশ্বের অস্তিত্ব আমি মানি, এ কথা যে বলে সেই প্রমাণ দেয় যে সে যুগপৎ নির্বোধ, অসচ্চরিত্র ও নাস্তিক। টেওফিল গোটিয়ে যে এ কথা সাহস করে বলেছিলেন, তার কারণ তিনি ছিলেন প্রথমে আর্টিষ্ট, পরে হয়েছিলেন লেখক।

এখন আমার বোধ হচ্ছে এই যে, প্রতি আর্টিষ্ট এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলতে বাধ্য, এবং তার জন্য জ্ঞানী সাধু ও ধার্ম্মিকের কাছে লাঞ্ছনা গঞ্জনা সইতেও বাধ্য। এতে যিনি ভয় পান, তিনি শুধু art critic হবারই উপযুক্ত।

২

দার্শনিক, নৈতিক ও ধার্ম্মিক লোকদের কথায় কিন্তু ভীত হবার কোনই প্রয়োজন নেই। রাম শ্যাম যদু হরির মনে যে ভাবটা অস্পষ্ট অবস্থায় রয়েছে, জ্ঞানীপুরুষ সাধু-পুরুষ ও ধার্ম্মিক-পুরুষরা সেই মনোভাবকেই সুধু স্পষ্ট করে সাকার করে তোলেন। সাধারণ লোকের মনের খনিতে সোনা রূপো যাই থাক্ না কেন, তা আর পাঁচ জিনিষের সঙ্গে জড়িত হয়েই থাকে। যা জড়ানো তাকে ছাড়িয়ে নেওয়া, যা মিশ্র তাকে শুদ্ধ করে তোলাই হচ্ছে জ্ঞানীর ও কর্ম্মীর কাজ। আর সাধারণত পৃথিবীতে মানুষের দেহ মনের অপর কোনও কাজ নেই।

এখন এই দৃশ্যবিশ্বের পাশাপাশি যে একটা অদৃশ্য বিশ্ব আছে, তা রামও জানে, শ্যামও মানে, যদুও জানে, হরিও জানে। যে বিশ্বের আমরা গন্ধ পাই, শব্দ শুনি, যে বিশ্ব নিয়ে আমরা নাড়াচাড়া করি ও যার দৌলতে পেট ভরাই, সে বিশ্ব যে অদৃশ্য, তা কে না জানে? অন্ধের কাছেও একটা বিশ্ব কিন্তু সে পালায় পালায়। এক মুহূর্ত্তেও দুই ব্যক্তি একত্রে বাস করিতে পারে না। আজকাল আমাদের জাত মহা Spiritual হয়ে উঠেছে, সুতরাং আমার বক্তব্যটা দার্শনিক ভাষায় ব্যক্ত না করলে কারও মনস্তুষ্টি হবে না, তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আর্ট আর ফিলজফি হচ্ছে Spiritএর দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন moment। এ moment শব্দের অর্থ জানতে চান ত দর্শন পড়ুন। দৃশ্যজগৎ যে রূপজগৎ, তার যথার্থ কারণ এই যে দৃশ্যবিশ্বের Form আছে, যা স্পর্শের নেই, রসের ও গন্ধের নেই, শব্দেরও নেই, বরঞ্চ সঙ্গীতের আছে! রূপ ধরতে হয় অন্তরেন্দ্রিয় দিয়ে, কর্ম্মেন্দ্রিয় দিয়ে নয়।

এখন এটা নিতান্তই দুঃখের বিষয় যে, দৃশ্যজগৎ আমার কাছে সত্য, এ কথা এ দেশে কেউ বলেন না। এর কারণ কি এই যে, রূপলোকের সন্ধান এ দেশে এ যুগে কেউ পান নি? আর সেই জন্যই কি কামলোকের যে আদিম ও মুখ্য বস্তু অর্থাৎ রস—তাই নিয়েই কাঙালীরা আজ মাখামাখি ও মাতামাতি করছেন? যাঁরা আর্টিষ্ট—অর্থাৎ যাঁরা রূপের দ্রষ্টা ও স্রষ্টা—তাঁদের এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলতেই হবে যে, দৃশ্যবিশ্ব আমার কাছে সত্য। আর যিনি রূপের সন্ধান পেয়েছেন, তাঁকে সেই সঙ্গে এ কথাও বলতে হবে যে, রূপের সঙ্গে রসের তিলমাত্র সম্পর্ক নেই—সে কথা শুনে রসনাসর্ব্বস্বের দল যতই পাণ্ডিত্যের সাধুতার ও ধর্ম্মের আস্ফালন করুন না কেন।

—অয়ন, শ্রাবণ, ১৩৩০।

মাটির রাজা

—পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর—

শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

তিন দিন পরে মেলা হইতে রায়-জির ফিরিবার কথা।

মেলা অবশ্য—থাকে পনর দিন।

খেলা-তামাসা ভাল যদি চলে, বেশিদিন থাকিতেও পারেন।

মা বলিলেন, "ভালই চলছে, কি বল বৌমা? তা নইলে আসতো তোমার শ্বশুর।"

টুনু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হুঁ—।"

এমন সময় শান্তি কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল। আসিয়াই বলিল, "মা, আমি মেলা দেখ্‌তে চললাম।"

ঠাকুরপোর সঙ্গে একটু খানি রহস্য করিয়া টুনু বলিল, "চল দুই-ঠাকুর, আমিও যাই তোমার সঙ্গে।"

শান্তি বলিল, "ধেৎ, মিছে কথা।"

ঘাড় নাড়িয়া টুনু বলিল, "মিছে নয় সত্যি।"

ছোট ছেলের অবিশ্বাসের আর কিছু থাকে না। বলে, "তবে দেখে আসি যাই, গাড়ী-টাড়ি যায় যদি কারো।"

শান্তির খুশী আর ধরে না।

ছুটিয়া সে গাড়ীর সন্ধানে বাহির হইতেছিল।

মা বলিলেন, "না রে না, বৌমা যাবে না। তোরও যেয়ে কাজ নেই।"

কান্তি ঘরে ছিল না। শান্তি বলিল, "টিনের একটা লাট্টু আনতে হবে যে! আমি যাবই।"

বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মেলাটার সময় ভাল। নূতন ধান-চাল বছরের এ-সময়টায় সব ঘরেই প্রায় কিছু-কিছু থাকে।

গাঁয়ের মেয়ে-ছেলে অনেকেই যায়; কেহবা গরুর গাড়ীতে,—আবার কেহবা পায়ে হাঁটিয়াই।

সঙ্গীর প্রয়োজন হইল না। পথে তখন লোক চলা-চলের বিরাম নাই।

শান্তি মেলার পথ ধরিয়া চলিতে থাকে।

চলিতে চলিতে বনের কাছে আসিয়া পৌঁছিল। শাল-মহুয়ার প্রকাণ্ড বন।

বনে তখন পাতা-ঝরার সময়। নতুন নতুন কচি কচি

পাতা গজায় আর পুরোনো পাতা আপনা হইতেই ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ে। সাঁওতালের মেয়েরা দল বাঁধিয়া পাতা কুড়ায়। বনের ভিতর শুক্‌নো পাতা জড়ো করার শব্দ ওঠে। শাল-মহুয়ার গন্ধে ভরা বাতাস বয়।

বনের ভিতর দিয়া সরু এক ফালি আঁকা-বাঁকা পথ। দুপাশে গাছের সারি। মাঝে মাঝে দু-একটা পলাশ-শিমুলের বড় বড় গাছ,—বনটাকে যেন আলো করিয়া আছে। গাছের নীচে রাঙা রাঙা ঝরা-ফুলের বিছানা পাতা।

মখমলের মত একমুঠা রাঙা ফুল কুড়াইয়া লইয়া পথের উপর ছড়াইতে ছড়াইতে শান্তি মেলার দিকে আগাইয়া চলে।

দূরে কোথায় যেন গাড়ীর চাকার শব্দ ওঠে। কাঁকর-পাথরের রাস্তার উপর মেলার ফেরৎ গাড়ী আসে। চাকার লোহায় আর পথের কাঁকরে সংঘর্ষ বাধে। বহুদূরাগত সেই একঘেয়ে শব্দ ক্রমাগত কানে আসিয়া বাজে।

সন্ধ্যা হইতে আর দেরী নাই। শান্তির ভয় হয়। পশ্চিমের আকাশ তখন বিচিত্র বর্ণে রঙিন্ হইয়া উঠিয়াছে। দূরে একটা দীঘির পাড়ে অনেকগুলা তাল গাছের সারি দেখা যায়, তাহারই ফাঁকে টক্‌টকে লাল সূর্য্যের আলো—পিচ্‌কারি দিয়া কে যেন সারা বনের গায়ে ছিটাইয়া মারিতেছে। কচি পাতার সবুজ বন—খানিকটা নীল, খানিকটা ধূসর ; মাথার উপর আকাশেও যেন ঠিক তাহারই ছাপ ধরিয়াছে।

ইহারই ভিতর দিয়া শান্তি শুধু এদিক ওদিক তাকায় আর চলে। কি রঙের একটা লাট্টু কিনিবে তাহাই ভাবে।

ঘন গাছগুলা ক্রমশঃ পাৎলা হইয়া প্রকাণ্ড একটা ঢালু প্রান্তরের উপর গিয়া শেষ হইয়াছে।

সাঁঝের হাল্‌কা বাতাস তখন মিষ্টি মিষ্টি গায়ে আসিয়া লাগে। দূরে একপাল ভেড়া দেখা যায়। রাখাল দুজন গান ধরিয়াছে। একজন গান গায় আর একজন ধুয়া ধরে। অসমতল প্রান্তরের উপর গলার আওয়াজটাকে তাহারা যেন লুফালুফি করে।

কিন্তু এতগুলা ভেড়া—তাহাদের লছ্‌মি টিকুরামের মত একটিও নয়।

রঙ-বেরঙের বকমারি পাখীগুলা কোথা হইতে উড়িয়া উড়িয়া ডাঙায় আসিয়া বসে, আবার তাহার চোখের সুমুখেই ছায়াবাজির মত হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়।

বনের গাছে গাছে নিশ্চয়ই তাহাদের ঘর আছে, সবুজ পাতার আড়ালে ফুল দিয়া ঢাকা ছোট ছোট ঘর।—আচ্ছা, অন্ধকার রাত্রে ওই একটা মা-পাখী যদি বনের ভিতর তাহার ঘরের পথ হারাইয়া ফেলে তাহা হইলে কি হয়·…?

শান্তির ভাবনা আর বেশী দূর অগ্রসর হয় না। অত বড় জঙ্গলের ভিতর পথ হারাইলে আর নিস্তার নাই।

এম্‌নি সব নানান্ কথা ভাবিতে ভাবিতে শান্তি যখন মেলার কাছাকাছি আসিয়া পৌছিল সন্ধ্যা কি রাত্রি—কিছুই তখন ঠিক বুঝিবার উপায় নাই।

দোকানে দোকানে আলো জ্বলিয়াছে, কোথাও ছোট কোথাও বড়, কোথাও ভাঙা, কোথাও ফুটা, কিন্তু দূর হইতে অতসব কিছুই নজরে পড়ে না। মনে হয়, প্রশান্ত এই প্রান্তরের উপর অবিন্যস্ত একটি আগুনের মালা তামসী নিশীথিনীর কটিদেশ বেষ্টন করিয়া আছে।

দিবসের দুর্নিবার জনস্রোত তখন যেন একটুখানি শ্রান্ত হইয়া আসিয়াছিল।

কিন্তু তবু তাহাদের ছোট তাঁবুখানি শান্তি কোন প্রকারেই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না।

হতাশ হইয়া একবার দাঁড়ায়,—আবার চলে। আবার চলে।

ভাবে, আছে ঠিক্ যেখানে হোক্।

তাম্বু অনেক। বায়স্কোপ থিয়েটার ত' আছেই,—তাহার পর কত রকমের কত খেলা। বাঘের খেলা। পাখীর খেলা।

...টিয়া-পাখী জল তোলে, আর চড়ুই পাখী গাড়ী টানে!

খুশীতে শান্তি যেন লাফাইয়া উঠিল। তাঁবু হারানোর কথা তাহার আর মনে রহিল না। এক পয়সায় একখানি টিকিট কিনিয়া তাড়াতাড়ি সেইখানেই সে ঢুকিয়া পড়িল।

এদিকে খেলা ভাঙিয়া রায়-জির গাড়ী তখন বনের পথে চলিতে সুরু করিয়াছে।

বোঝাই গাড়ী,—দুর্ব্বল গরু দুইটা টানিতে পারে না। রায়-জি পায়ে হাঁটিয়া চলেন। গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকায়।

রায়-জির একহাতে লণ্ঠন, একহাতে লাঠি, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, বাব্‌রিচুলের উপর মাথায় এক প্রকাণ্ড পাগড়ী। জনি কুকুরটা কখনও বা আগাইয়া চলে,—

রায়-জি বাড়ী ফিরিলেন।

মা জাগিলেন, টুনু জাগিল; কিন্তু শান্তির কোনও খবর পাওয়া গেল না। রায়-জির সঙ্গে তাহার দেখাই হয় নাই।

রায়-জি বলিলেন, "বেশত'। হয়েছে কি তার?"

মা কিন্তু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।—"ওগো যাও তুমি আর একবার, দেখে এসো মেলায়!"

সাপের ঝাঁপিগুলা রায়-জি গাড়ী হইতে নিজের হাতেই নামাইয়া রাখিতেছিলেন, বলিলেন, "কেন? এত কেন?"

তাহার উপর আর কথা চলে না। মা চুপ করিয়া রহিলেন।

টুনু বলিল, "তাহ'লে কি হবে?"

রায়-জি হাসিয়া রহস্য করিয়া বলিলেন, "শান্তি আর ফিরবে না—এই হবে।"

রায়-জির মুখে হাসি দেখিয়া মা বলিলেন, "হাসি যে কেমন করে' আসে কে জানে!"

টুনু হাসিল। বলিল, "বাবাকে চেনো মা! তার চেয়ে একটা লোক পাঠিয়ে দাও।"

রুপী বাঁদরটাকে কদমগাছের একটা ডালের উপর তুলিয়া দিয়া রায়-জি সাপের একটা ঝাঁপি তুলিয়া বলিলেন, "সাদা গোখরোটা না খেয়ে খেয়ে কেমন যেন মন-মরা হয়ে যাচ্ছে দিন-দিন। কাল আমি একে ছেড়ে দেবে।" বলিয়াই তিনি সযত্নে ডান হাত দিয়া সাপটাকে তুলিয়া ধরিলেন।

গাড়োয়ান গাড়ীর জিনিসপত্র নামাইতে লাগিল।

মা বলিলেন, "দেখ্‌ছ মা টুনু, ওর কি আর ছেলে বলে মনে আছে এখন?"

টুনু বলিল, "সত্যি, ভারি অন্যায় বাবা তোমার।"

সাপটাকে নাড়াচাড়া করিতে করিতে রায়-জি হাসিলেন। বলিলেন, "অন্যায়!—আচ্ছা তুমি যখন বলছ মা, কাল সকালে আমি এনে দেব তোমার শান্তিকে কেমন?"

কিন্তু মায়ের মন মানা মানে না। ঘুম আর সারারাত্রি তাঁহার চোখে আসিল না। অতি প্রত্যূষে রায়-জিকে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, "আমি চা করে' দিচ্ছি, খেয়ে তুমি যাও একবার দেখে এসো ছেলেটাকে।"

রায়-জি কান্তিকে তামাক সাজিতে বলিয়াছিলেন; কান্তি লেপ ঢাকা দিয়া চুপ করিয়া শুইয়াছিল। কথাটা যেন সে শুনিতেই পায় নাই!

রায়-জি ডাকিলেন "টুনু!"

মা চা ঢালিয়া দিতেছিলেন, টুনু চা খাইতেছিল,—হাসিতে হাসিতে চায়ের পেয়ালাটি হাতে লইয়াই সে আসিয়া দাঁড়াইল।

রায়-জি একটা টাকা হাতে লইয়া বাজাইতে বাজাইতে বলিলেন, "ডাকো তোমার মাকে ডাকো!—ভানু কই, ভানু?"

ভানুও নিষ্কর্ম্মা বসিয়া ছিল না, মায়ের দেখাদেখি সেও তখন চা তৈরী করিতেছিল। কেট্‌লির পরিবর্ত্তে গাড়ুর মুখে খানিকটা জল একটা খাটির উপর ঢালিতে ঢালিতে বলিল, "চা কচ্ছি যে!"

টুনু বলিল, "না লো না চা করে না,—আয় তুই দেখ্‌সে মজা!"

মজা দেখিবার জন্য চা ফেলিয়া ভাদু ছুটিয়া আসিল।

টুনু ডাকিল, "তুমি এসো মা! মা!"

শান্তির খোঁজে রায়-জিকে পাঠাইবার জন্য মা কিন্তু অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। বলিলেন, "দেখ মা তোমরাই দেখ।"

রায়-জি কিন্তু সেকথায় কর্ণপাত করিলেন না। হাতের টাকাটা টিং টিং করিয়া বাজাইতে বাজাইতে বলিলেন, "ধর ত মা টুনু, টাকাটা রাখ ত' আঁচলে। এই একটা নতুন খেলা ঠিক করেছি দেখ—!"

টুনু আঁচল পাতিল।

আঁচলটা থলির মত করিয়া তাহার মুখে হাত ঢুকাইয়া টাকাটা তিনি আঁচলের মধ্যে রাখিয়া দিলেন।

টুনু বলিল, "আর এম্‌নি পাঁচটা হলেই বাস্‌—খড়ের দাম হয়ে গেল। খড়ের দাম কখন দিতে হবে মা?"

মা বলিলেন, "খড় ত' দিয়ে গেছে মা, যখন-হোক্ এবার এলেই হলো।"

উঠানের উপর একগাদা খড় জড়ো করা ছিল, রায়-জি বলিলেন, "ওই বুঝি?"

টুনু ঘাড় নাড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আর পাঁচটা—!" বলিয়া সে তাহার আঁচলের দিকে তাকাইল।

রায়-জি তাঁহার শূন্য হাত দুইটা উপরের দিকে তুলিয়া ধরিয়া তৎক্ষণাৎ আবার মুঠা খুলিয়া দেখাইলেন—দুইহাতে দুইটা টাকা হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া জড়ো হইয়াছে।

এমনি করিয়া প্রতিবারে হাতের মুঠা খুলেন আর দুইটা করিয়া টাকা আসিয়া জমে।

টুনুর আঁচল দেখিতে দেখিতে ভর্ত্তি হইয়া ওঠে।

রায়-জি মাঝে মাঝে নাড়িয়া চাড়িয়া ঝম্ ঝম্ করিয়া দেখাইয়া দেন।

টাকার ঝম্‌ঝমানি শুনিয়া মা আর থাকিতে পারেন না, উঠিয়া আসিয়া বলেন, "তবে যে বললে লাভ কিছু হয়নি মেলায়? আঁচল থেকে ছ'টা টাকা আমায় দাও ত' বৌমা!"

বৌমা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। রায়-জি নিষেধ করিলেন, বলিলেন, "দাঁড়াও কি হবে? টাকা কি হবে শুনি?"

"দেখছ না, পশু এসেছে খড়ের দাম নিতে।"—উঠানের একপাশে দশ বারো বছরের একটি ছেলে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ হইতে অবাক্ হইয়া রায়-জির এই টাকার খেলা দেখিতেছিল, আঙুল বাড়াইয়া মা তাহাকেই দেখাইয়া দিলেন।

বৌমার আঁচলের ভিতর আরও দুইটা টাকা ফেলিয়া দিয়া রায়-জি আঁচলটা তাহার আরও বারকতক ঝম্‌ঝম্ করিয়া নাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "দাও বৌমা, এবার দাও তোমার মাকে—সব টাকা গুলি দিয়ে দাও।"

মা আঁচল পাতিলেন।

কিন্তু বৌমা তাহার আঁচলের টাকাগুলা ঢালিয়া দিতে গিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।—অতগুলা টাকা হঠাৎ যে কেমন করিয়া কোন্ দিক দিয়া উড়িয়া গেল কেহ কিছুই ঠিক-ঠাহর করিতে পারিল না। দেখা গেল, আঁচলের তলায় মাত্র একটা গোল পাথরের ঢেলা পড়িয়া আছে।

রায়-জি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

মা বলিলেন, "হাসি যে কেমন করে' আসে বাপু কে জানে!"

রায়-জি ডাকিলেন, "পশু, শোন্!"

উঠান হইতে পশু তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

"টাকা নিবি?"

পশু বলিল, "হ্যাঁ গো, দাম নিতেই ত' এলেছি।"

রায়-জি বলিলেন, "কিন্তু এ টাকা নিলে অম্‌নি আবার উড়ে যাবে, তা জানিস্ ত?"

পশু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না বাবু সে রকম টাকা চাইনে তবে।"

রায়-জি বলিলেন, "কাকাকে তোর বল্‌গে যা—টাকা নেই। টাকা যদি দেরিতে দিলে চলে ত' থাক্, আর নইলে খড়গুলো বরং আর কোথাও বিক্রি করগে যা! বয়ে আনার দাম দেব।"

মা বলিলেন, "বর্ষার দিনে চালের অবস্থা কি হবে একবার দেখেছ ত' চোখে ?"

"খুব দেখেছি।" বলিয়া রায়-জি তাঁহার চালের ফুটাগুলার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আবার হাসিতে লাগিলেন।

হাসি শুনিয়া রুপী বাঁদরটা কোথা হইতে ছুটিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া চুপ করিয়া বসিল।

শান্তিকে আনিতে যাইবার কথাটা মা একটি মুহূর্তের জন্যও ভুলিতে পারেন নাই, বলিলেন, "যেখানে যাচ্ছিলে তার কি হলো ? যাও এবার।"

"হুঁ" বলিয়া বাঁদরটাকে রায়-জি দুই হাত দিয়া তুলিয়া ধরিয়া উপরের দিকে সজোরে ছুঁড়িয়া দিলেন।

রুপী অত্যন্ত দক্ষতার সহিত শূন্যের উপর চক্রাকারে ডিগবাজি খাইতে খাইতে নীচে নামিতে লাগিল।

বিমুগ্ধনেত্রে রায়-জি সেইদিক পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন।

ভাদু খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বাহির হইবার কথা রায়-জি সম্ভবত আবার ভুলিয়া গেলেন। বলিলেন, "দেখ্ আর একটা ভারি মজার খেলা দেখাই—দেখ্।"

ক্রমশঃ—

বেহালা

শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু

বৌদি তার ভ্রমরের মত কালো ভ্রূ বাঁকিয়ে হীরার মত জলজলে চোখ কাঁপিয়ে বল্লে,—না।

আবার বল্লুম, বৌদি আর সাধতে পারি না, একটা গান শোনাবে কি না ?

বৌদি তার রাঙা অধর ফুলিয়ে সোনার চুল দুলিয়ে সাপের কুণ্ডলীর মত সুন্দর খোঁপাটা নেড়ে বল্লে,—না।

বল্লুম, আচ্ছা, শোন বৌদি একটা গল্প বলছি, এ শুনে দেখি তুমি কেমন গান না গাও !

বৌদি তার পানে-রাঙা ঠোঁট থেকে হাসির আবীর ছড়িয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে মুক্তার মালা একটু বাজিয়ে বল্লে, হাঁ, ভাই, বলত একটা গল্প, এই ত বেশ, তা নয় খালি গান আর গান।

ধীরে বল্লুম, গেল বছর আমার ভারি মজার অসুখ করেছিল, শুনেছ ?

আলতা-মাখা পা-দুটি দুলিয়ে ইজি-চেয়ারে দেহ দুলিয়ে, ছোট একটি 'না' বলে, বৌদি আমার গল্প শুনতে লাগল।

খদ্দরের শাড়ীর আঁচলটা ঘাড় থেকে ফেলে ব্লাউসের কয়েকটা বোতাম খুলে চেয়ারটা কাছে টেনে নিয়ে আমি গল্প বলতে লাগলুম।

এই রকম রাত্তির বেলা। সমস্ত দিন অসহ্য গরম গেছে, রাত্তিরে একটু ঠাণ্ডা হয়েছে। বিছানায় শুয়ে কিছুতেই ঘুম আসছে না। এই ইজি চেয়ারটা তখন আমার ঘরে থাকতো। একটা নভেল নিয়ে ইজি চেয়ারটায় শুলুম। বিচ্ছিরি গল্পটার সুরু। প্রথমেই স্ত্রীর মৃত্যুশোকে স্বামী আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে। নভেলটা রেখে দিয়ে ভাবলুম একটু বেহালা বাজাই। বাক্স খুলে বেহালা বের করে দেখি, ছড়িটা আবার ঠিক নেই। টেবিলের উপর বেহালাটা রেখে দিয়ে ইজি চেয়ারটা বারান্দায় টেনে শুয়ে পড়লুম। সপ্তমী কি নবমী তিথি হবে, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না, তারাগুলো হীরের টুকরোর মত জলজল করছে, ফুরফুরে মিষ্টি হাওয়া বইছে, চোখে মুখে সমস্ত দেহে জ্যোৎস্না ঝরে পড়তে লাগল। কত কি যে হাবিজাবি হিজিবিজি মনে পড়তে লাগল! এই জ্যোৎস্নার কথা কবিরা কত রংএ রসে ভাবে ছন্দে বলেছে, কত যুগের কত প্রেমিকার বিরহের দীর্ঘশ্বাস এতে মেশান, আরও কত কি কথা। জ্যোৎস্নায় যেন ভিজে সমস্ত দেহমন ঝিমিয়ে আসতে লাগল, ঠিক ঘুম নয়, চোখ বুজি, কালো পর্দার ওপর যেন কত কালো অদ্ভুত মূর্ত্তি নেচে বেড়াচ্ছে; চোখ মেলি, অতি সূক্ষ্মতন্তুময় ওড়নার মত জ্যোৎস্নার আলো আমার ওপর বাতাসে কাঁপছে। দেখ ভাই, মদ কি আফিম কখনও খাইনি, কিন্তু মনে হল যেন একটা নেশা করেছি; কবিরা যে বলে চাঁদের আলোয় কি একটা মায়া আছে, মোহমন্ত্র পড়ে লোককে মাতাল করে তোলে তা খুব সত্যি। জ্যোৎস্না যেন দেহের প্রতি লোম-কূপ দিয়ে রক্তের সঙ্গে মিলে গেল, সমস্ত দেহ ঝিম ঝিম করছে, যতরকম অসম্ভব কথা, আজগুবি কল্পনা মাথায় আসতে লাগল। এক আফিমখোরের গল্প পড়েছিলুম মনে হল ঠিক তার মত অবস্থা। একটু ভয় হল কিন্তু নেশাটায় ধীরে ধীরে মসগুল হয়ে যাচ্ছি।

চোখ বুজে রইলুম। একটা গানের সুর কানে এসে বাজল, বহুদূর হতে একটা করুণসুরের রেশ, স্তব্ধ নিশীথে অন্ধকার পথের ধারে একটি বেণুর মর্ম্মরধ্বনির মত,—যেন Marsএ বসে কে বেহালা বাজাচ্ছে, তারি অতি ক্ষীণ ঝঙ্কারধ্বনি কানে এসে লাগছে।

সুরটা কাছে আসছে, মনে হচ্ছে তারালোক থেকে নয়, পৃথিবীর বুক থেকে, এই অন্ধকার ঘুমন্ত বাড়ীর ভিৎ দিয়ে উঠে আসছে, একটি করুণ মধুর বেহালার ঝঙ্কার। আরও কাছে আসছে,—না, মাটি থেকে উঠছে না, এ সুর যেন কোন অজানা দেশ থেকে সাগর পার হয়ে দক্ষিণ বাতাসে ভেসে আসছে। আরও কাছে, হাঁ, এই বাড়ীতে, আমার ঘরের মধ্যে বসে কে বেহালা বাজাচ্ছে!

চোখ চেয়ে উঠে বসলুম, মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিলুম, কান চুলকলুম। হাঁ, আমার ঘর থেকে ত বেহালার ঝঙ্কার আসছে, অতি মৃদু, অতি মিষ্টি, একটি তার কেঁপে কেঁপে বাজছে।

অন্য সময় হলে হয়ত ভয়ে মূর্চ্ছা যেতুম, কিন্তু এ সুর কোন্ সোনার স্বপ্নের মত এত মিষ্টি যে কোন ভয় হলনা। তাছাড়া কোন্ নেশার ঘোরে যেন বাহিরের জগৎ ভুলে গেছলুম।

এবার বেহালার সব তারে ঝঙ্কার উঠছে, যেন একটা গিরি-ঝর্ণা নুড়ির মল বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে চলেছে। কত রকমের গান, কত সুর বেজে উঠছে। কখনও দক্ষিণ বাতাসে বসন্তের পুষ্পবন উতলা হয়ে উঠছে, কুহু ডাকছে; কখনও গ্রীষ্মমধ্যাহ্নে তপ্ত বাতাসে ঝরা-পাতার দীর্ঘশ্বাস, ক্লান্ত কপোতের করুণ কণ্ঠ, কখনও শ্রাবণের অবিরল বারি-ঝরার ঝরঝরানি গান; বেহালা যেন সুরে কেঁপে উঠেছে, মেঘ ডাকছে, বজ্র হাঁকছে, জল কলকল বয়ে চলেছে, ধীরে ধীরে তারাগুলি কেঁপে কেঁপে স্তব্ধ হয়ে আসছে, প্রেমিকের মৃদু গুঞ্জনের মত।

এতক্ষণ সুরের মায়ালোকে ভুলেছিলুম, বেহালা বাজান থামতেই গা যেন সির সির করতে লাগল, সুরগুলো যেন ঘুরে ঘুরে হিমশীতল আঙুলের ডগা দিয়ে গায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, কাঁপতে লাগলুম, সে বেহালা-বাদক তো আমার ঘরেই বসে আছে।

চুপ করে চেয়ারে বসে রইলুম। ঘরের স্তব্ধ অন্ধকার যেন হাঁ করে আছে। একবার ঢোক গিলে বল্লুম—কে? কোন উত্তর নেই।

জোর করে বলতে চাইলুম, কে বেহালা বাজাচ্ছিলে, ঘর থেকে বের হয়ে এস, কিন্তু গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, কোনও স্বর ফুটল না। ঘরটা নিঝুম, একটুও শব্দ নেই। ভাবলুম, হয়ত আমার মনেরই ভুল, কিন্তু বেহালা ত স্পষ্ট শুনলুম, এখনও তার সুর কানে বাজছে। মরিয়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পা টিপে দরজার গোড়ায় এসে তাড়াতাড়ি সুইচ্‌টা টিপে আলো জ্বালালুম। কেউ ঘরে নেই, বেহালাটা টেবিলের উপর অতি শান্তশিষ্ট নির্দ্দোষী ছেলের মত স্থির হয়ে পড়ে আছে। টেবিলের উপর থেকে একটা বাঁধান শক্ত বই হাতে নিয়ে তক্তার তলা ঘরের কোণ সব দেখলুম। কেউ কোথাও নেই।

মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল। কি আশ্চর্য্য! সত্যি কেউ ঘরে বসে বেহালা বাজাচ্ছিল, না, আমি কি স্বপ্নে বেহালা শুনলুম? বুকে হাত দিয়ে দেখলুম, বুকটা একটু দ্রুত তালেই ধুক্‌ধুক্ করছে। এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে, মাথায় চোখে মুখে জল দিয়ে শুয়ে পড়লুম।

সারারাত ঘুম ভেঙে যেতে লাগল, ভাল ঘুম হল না, সেই বেহালার সুরগুলো যেন সাপের মত আমায় জড়িয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। সকালের আলো ঘরে আসতেই মনটা হাল্কা হয়ে গেল, রাতের কথা একেবারে ভুলে গেলুম।

কিন্তু সন্ধ্যা হতেই ভয় হতে লাগল। যতক্ষণ বেহালা বাজে বেশ শুনতে লাগে, কিন্তু তারপর!

রাতে খেয়ে আর একা ঘরে যেতে সাহস হল না। খোকাকে বল্লুম, খোকা গল্প শুনবি আয়। খোকাকে ঘরে টেনে নিয়ে এলুম। তার সঙ্গে তাস্ খেলতে খেলতে তাদের ইস্কুলের মাষ্টারের গল্প, ছেলেদের গল্প, খেলার গল্প করতে করতে খানিকক্ষণ কাটল। দশটা বাজলেই সে বলে উঠল, দিদি বড় ঘুম পাচ্ছে। অগত্যা তাকে ছেড়ে দিলুম। বেহালাটা ভাল করে বাক্সে বন্ধ করে ঘরের কোণে রেখে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লুম। বারান্দায় জ্যোৎস্নায় গিয়ে বসতে আর সাহস হল না।

একটু তন্দ্রা এসেছে, ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। গুমরে গুমরে কান্নার মত অতি করুণ এক সুর ঠিক আমার তক্তার তলা থেকে আসছে। যে কোণে বেহালার বাক্স রেখেছি, সেই কোণ থেকে ক্ষুব্ধ বেদনার হাহাকারের মত বেহালার একটা তার কোন্ রুদ্ধ আবেগে কেঁপে কেঁপে যেন এই ছিঁড়ে যাবে, অন্ধকার ছোট গর্ত্তে বন্দী পাখীর মত বেহালাটা যেন বাক্সের মধ্যে ছট্‌ফট্ করছে; ক্ষুব্ধ রোষে আর্ত্তনাদ করে উঠছে।

বিছানায় উঠে বসলুম। তারের কাঁপনের সুরের সঙ্গে আপন বুকের স্পন্দন ধ্বনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। একটা শব্দ হল, বেহালার বাক্সের ডালাটা যেন খুলে মেঝেতে পড়ল, বেহালার তারে তারে আনন্দের ঝঙ্কার উঠল।

ভীত বিস্মিত চোখে কোণের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলুম। অদ্ভুত অন্ধকারের রংটা, ঠিক কালো নয়, কালোর ওপর স্নিগ্ধ নীলের পর্দ্দা কাঁপছে, সেখান থেকে কত রাগ রাগিণী নটীর মত সুরের নূপুর বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে কোথায় চলে যাচ্ছে, অন্ধকারটা ঝিম্ ঝিম্ করছে। অন্ধকারটার দিকে চেয়ে যেন কোন্ মন্ত্রশক্তিতে বিমুগ্ধ হয়ে স্থির হয়ে বেহালা বাজান শুনতে লাগলুম।

কতক্ষণ বেজেছিল বলতে পারিনা, মুমূর্ষু হংসের শেষ-গানের মত করুণ সুরে বেহালার গান থামল। ঘরের অন্ধকার কাঁপতে লাগল। গা সির্ সির্ করতে লাগল। মনে হল অন্ধকার কোণে বসে যে এতক্ষণ বেহালা বাজাচ্ছিল সে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্ধকারের দেওয়াল হাৎড়ে আমার তক্তার পেছন ঘুরে মাথার কাছে আসছে। গা ছম্ ছম্ করতে লাগল। চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, কে?

আসার উসখুস্ শব্দ যেন থামলো, বেহালার একটি তার অতি মৃদু কেঁপে মিষ্টি সুরে বলে উঠল, আমি।

চেনা গলা, অনেক দিন আগে যেন শুনেছি। সাহস করে বল্লুম, কে তুমি?

বেহালা আবার বেজে উঠল, আমি অসিত।

অসিত? অমিয়ার দাদা?

হাঁ। আমি আর এখন অমিয়ার দাদা নেই, এক মাস হল আমি দিল্লীতে নিউমোনিয়ায় মারা গেছি।

পাশ বালিশটা আঁকড়ে ধরে কাঁপতে লাগলুম। নিরুপায় হয়ে বল্লুম, আপনি কেন এখানে এসেছেন?

তোমাকে বেহালা শোনাতে। তুমি একবার আমায় বেহালা বাজাবার জন্যে অনুরোধ করেছিলে, মনে আছে?

হাঁ, অমিয়া সেদিন আমার কাছে দিনটা কাটাতে এসেছিল, আপনি যখন তাকে বাড়ীতে নিয়ে যেতে এলেন, আপনাকে বেহালা বাজাতে বলেছিলুম বটে।

অনেক রাত হয়েছিল বলে তখন বাজাতে চাইনি, বলেছিলুম, আর একদিন এসে বাজাব। তারপরেই দিল্লীতে চাকরীটা পাওয়ায় কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হল।

দিল্লী যাবার আগের দিন দেখা করতে এসেছিলেন, সেদিনও বাজাতে বলেছিলুম বটে।

হাঁ, আমি বলেছিলুম, দিল্লী থেকে ছুটির সময় এসে শোনাব। সেই কথাটা রাখতে এসেছি।

এখন আপনি—

আমি এখন Spirit, তোমার কোন ভয় নেই।

বিছানার চাদরটা সর্ব্বাঙ্গে মুড়ি দিয়ে শুয়ে বল্লুম, আচ্ছা, এখন আপনি যান।

আর বেহালা বাজাব?

চাদরের ভেতর থেকে কোন মতে বল্লুম, না।

তোমাকে বলেছিলুম বেহালা শোনাব, তাই এসেছিলুম,—আর এসে শোনাতে হবে?

অস্ফুটস্বরে বল্লুম, না। তারপর আপাদমস্তক চাদরে ঢেকে বালিশে মুখ গুঁজে পড়লুম।

আচ্ছা Kreutzer Sonataটা শুনিয়ে যাই।

আবার বেহালার ঝঙ্কার উঠল, সুরগুলো নটীর নূপুরের মত ঘরে ঘুরে ঘুরে বেজে জুঁই ফুলের মত আমার বিছানার উপর ঝরে ঝরে পড়তে লাগল, তক্তা, লেপ, চাদর, বালিশ সব সুরে কাঁপতে লাগল। যতক্ষণ বেহালা বাজছিল, যেন কোন্ সুধার স্রোতে ভেসে যাচ্ছিলুম, কিন্তু যেই থামল, সমস্ত দেহ আবার সির্‌সির্ করে কাঁপতে লাগল।

অসিত বল্লে, চল্লুম, নমস্কার।

তাকে কোন উত্তর দিতে পারলুম না, বেহালার সুর ধীরে বাহিরে ভেসে যেতে লাগল,—দূরে আরও দূরে চলে যেতে লাগল, অতি করুণ ক্ষীণ হয়ে দিগন্তে মিলিয়ে গেল, তারালোকে মিশিয়ে গেল।

বেহালা থেমে গেল কিন্তু ঘরের অন্ধকার বাহিরের পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় বেহালার গানের সুরে ঝিম্‌ঝিম্ করছে, সারা রাত বিছানায় চুপ করে চোখ বুজে পড়ে রইলুম, মাথার সুরগুলো রিম্‌ঝিম্ করতে লাগল।

তার পরের রাত থেকে অবশ্য আর কেউ বেহালা বাজাতে আসেনি।

আমি চুপ করলুম। বৌদি তার খোপাটা খুলে কোঁকড়া চুলগুলি মেলে দিয়ে উঠে বসে বল্লে, হয়ে গেল গল্প? মজার অসুখটা কি হল?

ও, মজার অসুখটা? এর পর থেকেই মাথাটা কেমন ধরত, সব সময়ে সেই বেহালার সুরগুলো মাথার মধ্যে রিম্‌ঝিম্ করছে। ভয় হল মাথাটা খারাপই হয়ে যাবে নাকি। বাবাকে একদিন চুপে চুপে সব কথা বল্লুম। তখন দাদার এক বন্ধু নতুন ডাক্তারি পাশ করে বেরিয়েছেন। বাবা একেবারে তাঁকে আমার কাছে এনে সব কথা বলে দিলেন। আমি ত লজ্জায় মরি। তবে প্রেস্‌কিপ্‌সনটার জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ দিতে হবে। তখন ইয়োরোপের খুব বড় এক বেহালাবাদক কলকাতায় এসেছিলেন। নতুন ডাক্তারের উপদেশ হল, রোজ তাঁর বেহালা বাজান শুনে আসতে হবে। আশ্চর্য্য, দিন চার তাঁর বেহালা বাজান শুনে আমার মাথার দপ্‌দপানি সেরে গেল। কি মজার অসুখ না?

বৌদি তার কালো চোখে হাসি-কৌতুকের বিদ্যুৎ ঠিকরে বল্লে, ও, সেই ডাক্তারটির সঙ্গেই বুঝি ৭ই—

মুখ রাঙা করে বল্লুম, যাও, আচ্ছা এখনও গান শোনাবে না?

তার দুখানি সুডোল বাহু দিয়ে আমায় জড়িয়ে, লাবণ্যশিখার মত আঙ্গুল দিয়ে আমার গাল টিপে আদর করে বৌদি বল্লে, বিরহের গান শুনতে ভারি ইচ্ছে করছে? আচ্ছা, একটা শোনাচ্ছি, ভাই। আমি বলছি, তোর বাসর-ঘরে সারা রাত গান গাইব। ভয় নেই রে, তোর বিয়ের লুচি না খেয়ে মরছি না, যে আবার ভূত হয়ে গান শোনাতে আসব। আর এখন ত আর একা নস্, ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে। ভয় কি? *

---

* অধুনালুপ্ত অয়ণ হইতে।

একদিন খুঁজেছিনু যারে—

শ্রী জীবনানন্দ দাশগুপ্ত

একদিন খুঁজেছিনু যারে
বকের পাখার ভিড়ে বাদলের গোধূলি-আঁধারে,
সোঁদালের ভিজাঝাড়ে—কদমের তলে
নিঝুম ঘুমের ঘাটে,—কেয়াফুল—শেফালীর দলে।
—যাহারে খুঁজিয়াছিনু মাঠে মাঠে শরতের ভোরে
হেমন্তের হিমঘাসে যাহারে খুঁজিয়াছিনু ঝর'ঝর'
কামিনীর ব্যথার শিওরে,
যার লাগি ছুটে গেছি নির্দ্দয় মস্সুদ চীনা তাতারের দলে
আর্ত্ত কোলাহলে
তুলিয়াছি দিকে দিকে ব্যথা বিঘ্ন ভয়,—
আজ মনে হয়
পৃথিবীর সাঁজদীপে তার হাতে কোনোদিন জ্বলে নাই
শিখা!
—শুধু শেষ-নিশীথের ছায়া-কুহেলিকা,
শুধু মেরু-আকাশের নীহারিকা তারা
দিয়ে যায় যেন সেই পলাতকা চকিতার সাড়া।

—মাঠে ঘাটে কিশোরীর কাঁকণের রাগিণীতে তার সুর
শোনে নাই কেউ,
গাগরীর কোলে তার উথলিয়া ওঠে নাই আমাদের
গাঙিনীর ঢেউ।
নামে নাই সাবধানী পাড়াগাঁর বাঁকাপথে চুপে চুপে
ঘোমটার ঘুমটুকু চুমি'।
মনে হয় শুধু আমি,—আর শুধু তুমি
আর ঐ আকাশের পউষ-নীরবতা
রাত্রির নির্জ্জনযাত্রী তারকার কাণে কাণে কতকাল
কহিয়াছি আধো আধো কথা।
—আজ বুঝি ভুলে' গেছ প্রিয়া
পাতাঝরা আঁধারের মুসাফের-হিয়া
একদিন ছিল তব গোধূলির সহচর,—ভুলে' গেছ তুমি।
এ মাটির ছলনার সুরাপাত্র অনিবার চুমি'
আজ মোর বুকে বাজে শুধু খেদ,—শুধু অবসাদ।
মহুয়ার,—ধুতুরার স্বাদ
জীবনের পেয়ালায় ফোঁটা ফোঁটা ধরি'
দুরন্ত শোণিতে মোর বারবার নিয়েছি যে ভরি'।
মসজেদ-সরাই-শরাব
ফুরায় না তৃষা মোর,—জুড়ায় না কলেজার
তাপ।
দিকে দিকে ভাদরের ভিজা মাঠ,—আলেয়ার শিখা।
পদে পদে নাচে ফণা,—
পথে পথে কালো যবনিকা।
কাতর ক্রন্দন,—
কামনার কবর বন্ধন।
কাফনের অভিযান,—অঙ্গার সমাধি।
মৃত্যুর সুমেরু-সিন্ধু অন্ধকারে বারবার উঠিতেছে
কাঁদি'।

মর্‌'মর কেঁদে ওঠে ঝরাপাতাভরা ভোররাতের পবন,—
আধো আঁধারের দেশে
বারবার আসে ভেসে'
কার সুর !—
কোন্ সুদূরের তরে হৃদয়ের প্রেতপুরে ডাকিনীর মত
মোর কেঁদে মরে মন

সংগ্রহ

গোর্কি

গ্রামখানি ছোট।—নাম স্যাঁ আঞ্জেলো। সরেন্তোর কাছাকাছি। সূর্য্যের আলো সেখানে প্রচুর

...এম্‌নি একটা জায়গায় গোর্কির নির্ব্বাসনের দিনগুলি কাটিতেছে। সেইখানেই তাঁহার দেখা পাই

বয়স হইয়াছে, অথচ বৃদ্ধ হইবার এখনও অনেক দেরী। —লম্বা ছিপ্‌ছিপে চেহারা, শিরালো ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক। দেখিলে মনে হয়, শরীরে ক্ষমতা আছে, অথচ তাহার ভিতর কঠোরতা নাই। চোখা মুখ, ভ্রূ দুইটি উঁচু, চোয়াল দুইটা উপরে ঠেলিয়া উঠিয়াছে—মুখের চারিদিকে গভীর খাদ। চোখ দুইটি নীল, অকপট। হাতের মুঠা-বাঁধিবার ভিতর বেশ একটি নিজস্ব ভঙ্গী আছে। আমায় দেখিয়াই একটু হাসিলেন; সেই হাসির সঙ্গে সঙ্গেই যেন আমরা পরস্পরকে চিনিয়া ফেলিলাম—মনে হইল, আমি তাঁহাকে আগে হইতেই বেশ ভালো করিয়াই চিনিতাম। সংসারের পোড়-খাওয়া মানুষের হাসি—দৃঢ়, অথচ সলজ্জ-মধুর।

*
* *

রাজনীতি সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে তিনি নারাজ। কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন, "রিকভ্‌,—সে এক জন খাঁটি শ্লাভ, পাকা 'ম্যাক্সিম্যালিষ্ট'।" কথাটা নূতন, অর্থ জানা ছিল না। তাঁহাকে অর্থ জিজ্ঞাসা করিতেই বলিলেন, "পরিপূর্ণতার প্রতি মানুষের তীব্র আকাঙ্খা, তার নামই 'ম্যাক্সিম্যালিজম্‌'—মানুষকে ও জগৎকে এক পরম সুন্দর অবস্থায় দেখবার প্রবল ইচ্ছা।" বুঝিতে পারিলাম, কেন রুষিয়ার পলিটিক্সে গোর্কির আস্থা নাই। তিনি বলিতে লাগিলেন, "মানুষের অন্তরে আজও মহত্ব-গুণটা একেবারে মরে যায় নি—তাই, যে নিজেকে মেনে চলে, তাকে এই গুণটা যাতে স্বাধীনভাবে বিকাশ পায়, তার দাবী করতেই হয়। সেখানে সমাজের স্বার্থকে সে পায়ে দলে চলে। রাষ্ট্রকে সে ততটুকুই মানে যতটুকু সে তার চিন্তা ও কর্ম্মের স্বাধীনতা এনে দেয়।"

*
* *

তারপর সে নানা কথা। জিজ্ঞাসা করিলাম "আচ্ছা, এই যে নীচের মানুষগুলি আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে,

এদের মধ্য থেকে আবার আভিজাত্যের সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা আছে, না ও-কথাটা একেবারে উঠে গেছে?" তিনি উত্তর করিলেন, "পুরানো আভিজাত্য আজ মরে গেছে বটে, কিন্তু আজ যে নূতন দল উঠছে, তা অর্থের নয় প্রাণের।" জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই যে প্রাণের কথা বলছেন, তা কি বিপ্লবেরই ফল?" তিনি বলিলেন, "ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য আপনি জাগে আপনি চলে—এক অবিচ্ছিন্ন ধারায়। বিপ্লব তার চলার গতিকে বাড়িয়ে দেয়, আর তার প্রয়োজনটাকে বড় করে তোলে। রুসিয়ায় যে স্বাতন্ত্র্যের সাড়া জেগেছে তা সাহিত্যে বিজ্ঞানে নূতন নূতন যে নামগুলি চোখে পড়ে, তা থেকেই বেশ বোঝা যায়।"

*

* *

ঠিক এই কথাটাই কিছুদিন পূর্ব্বে নেপল্‌সের একখানা কাগজে দেখিতেছিলাম। রচনাটি গোর্কির, রুষিয়ায় যে নবীন সাহিত্যিক সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিতেছে, তাঁহাদের লইয়া লেখা। যুদ্ধের পূর্ব্বে যাহারা মূকের মত মুখ বুজিয়া পড়িয়া ছিল তাহাদেরই মধ্য হইতে আজ বহু সংখ্যক প্রতিভশালী কবি ও ঔপন্যাসিকের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। Soschenko নামে এক অভিজ্ঞ সৈনিক একটি ছোটগল্পের বই বাহির করিয়াছেন, তাহার বর্ণনাভঙ্গি যেমন উজ্জ্বল, অন্তর্দৃষ্টিও তেমনি সুগভীর। আর একজন দিন মজুর নাম —Vsevolod Ivanov—তাঁহার "The Blue Sands" এ সাইবেরিয়ার অন্তর্বিপ্লবের কাহিনী অতি নিখুঁত ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। Kasin—তিনি ও একজন মজুর—তাঁহার ভিতরেও অদ্ভুত কাব্যশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে —অথচ তিনি ভালো করিয়া লেখা পড়াও শেখেন নাই। Leo Leuz এক গরীব কম্পাউণ্ডারের পুত্র—তাঁহার নাটক "Outside the law" লইয়া রুষ-সাহিত্য-সমাজে তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে। গোর্কি বলিলেন, "রুসিয়ার এই যে নবীন সাহিত্য, তা প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের ফল হ'লেও পুরাতন রুষ সাহিত্যের পদাঙ্কই অনুসরণ করে চলেছে। বাস্তবের উপরেই তার প্রতিষ্ঠা। জীবনে সত্যই যা ঘটে তার ওপর মিথ্যা কল্পনার রং ফলিয়ে তাকে বাড়িয়ে তোলবার অনর্থক প্রয়াস সেখানে নেই, যেটি যেমন সেটি ঠিক তেম্‌নি করেই আঁকা হয়। বরং তার সঙ্গে থাকে তারই একটা অতি তীব্র সমালোচনা।"

*

* *

গোর্কির নিজের লেখার কথা উঠিল। কোথায় যেন পড়িয়াছিলাম, গোর্কি একখানি উপন্যাস লিখিতেছেন, তাহার ঘটনাস্থল ইংলণ্ড। জিজ্ঞাসা করায় তিনি একটু মজা অনুভব করিলেন, বলিলেন, "গুজবটা বোধ হয় সত্যি নয়। উপন্যাস ত লিখছি না এখন, সে সব ভবিষ্যতের কথা—তবে সম্প্রতি একখানি ছোট গল্পের বই শেষ করেছি।"

"আচ্ছা, আপনার নিজের বইয়ের মধ্যে সব চেয়ে কোন্ বইখানা ভালো বলে আপনার মনে হয়?"

"আমার নিজের? সব চেয়ে ভালো বই? সে ত আজও লেখা হয় নি।"

"আজকাল জীবিত লেখকদের মধ্যে সব চেয়ে কাকে বড় বলে মনে করেন?"

"ইউরোপে আজ দুই জন অদ্ভুতশক্তিশালী লেখক বর্ত্তমান, রমঁ্যা রলাঁ ও নুট্ হাম্‌সুন্। হাম্‌সুনের বই "Growth of the soil," আর "The women of the well" কথা-শিল্পে নিখুঁত সৃষ্টি!—পঁচিশ বছরের মধ্যে এমনটি দেখি নি।"

* *

*

গোর্কি চিরদিনই কথাশিল্পে বিভোর হইয়া আছেন। তাঁহার জীবনস্মৃতিতে দেখিতে পাই, একটি তরুণ ছাত্র, অন্তরে তাহার অপরিসীম জ্ঞানের তৃষ্ণা, কেবলই বইয়ের পর বই পড়িয়া চলিয়াছে—মঁন্তপ্যাঁ হইতে গোগোল, পুশ্‌কিন্ হইতে বেরাজেঁ, স্কট্ হইতে বাল্‌জাক্, ডিকেন্‌স্ হইতে Goncourt Brothers—কিছুই তাহার বাদ নাই।

বিশেষ করিয়া ডিকেন্‌স্‌ ছিল তাঁর সব চেয়ে প্রিয়। তিনি লিখিয়াছেন, "এই সব বইগুলি এই ধরার বিপুলতাকে আমার চোখের সুমুখে প্রসারিত করিয়া দিত—ধরিত্রীকে তাহা বৃহৎ বিচিত্র নগরী ও সুন্দরী রমণীবৃন্দ দিয়া সাজাইয়া তুলিত। তারই মধ্যে পুরুষ! পুণ্যে ও পাপে সমান প্রতিভা তাহাদের—অথচ বীর সবাই। যতই পড়িতাম, ততই আমার এই শূন্য, নিরর্থক জীবনটা নিজের কাছে দুর্ব্বহ হইয়া উঠিত।

*   *

*

উঠি-উঠি করিতেছি, এমন সময় মনে পড়িল, শুনিয়াছি গোর্কি মাছ ধরিতে ভালোবাসেন। এই নির্ব্বাসিত মানুষটির অবসর-বেলা মাছ ধরিয়াই কাটে কি না জিজ্ঞাসা করিলাম।

আবার তেম্‌নি জোরালো জবাব, "কোনও প্রকারের কুঁড়েমি বিলাসই আমার ভালো লাগে না। আমার শেষ গল্পগুলির মধ্যে এক জায়গায় নায়কের সম্বন্ধে বলেছি; "মাছ ধরতে সে ভালোবাসত। বেশী করে এই কাজটাই মানুষকে, সে যে কে, এবং কোথায়, তা ভুলিয়ে দেয়; কেনই বা সে এখানে এসেছে তার ভাবনা হতেও সে নিষ্কৃতি পায়।" কিন্তু আমি যে কে, এবং কোথাকার মানুষ তা ভোল্‌বার ইচ্ছা আমার নেই—এবং কেনই বা আমি এখানে এলুম সে প্রশ্নকেও আমি এড়িয়ে চলতে চাই না।"

—এডওয়ার্ড এগুেন জুয়েল। The Nation, জুন, ১৯২৫।

ভিসান্তে ব্লাস্কো ইবানেস্‌

স্পেনের সাহিত্যিক, কবি ও দার্শনিক ব্লাস্কো ইবানেসের নাম আজ সভ্য জগতে অবিদিত নয়। তাঁহার "The Four Horsemen of the Apocalypse," "The Enemies of women," "Blood and sand," "Our sea," "Flor de Mayo" সুপরিচিত।

ইবানেস্‌ মানুষটি অদ্ভুত রকমের। তাঁহার কাজ হইতেছে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ানো। বয়স ষাটের কাছাকাছি, প্রাণটি শিশুর মত। অতীত ও বর্ত্তমানের গরিমার মধ্যে ইবানেসের দৃষ্টি আবদ্ধ নয়; তাঁহার প্রাণ ভবিষ্যতের দিকে উন্মুখ হইয়া বসিয়া আছে। —যে জীবন চলিয়া গিয়াছে, এবং চলিতেছে তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিবার অবসর এ মানুষটির নাই। স্পেনের এই অদ্ভুত লেখকটি আজও ঠিক করিতে পারিলেন না, তাঁর লেখার মধ্যে কোনটি সব চেয়ে ভালো। বলেন, "তা আজও লেখা হয় নি।"

*   *

*

ইবানেসের সাহিত্য নর-নারী ও সংসারকে লইয়া।—তাহার ভিতর নারীর অন্তরটিকে নানাদিক্‌ হইতে নানাভাবে দেখিবার ভঙ্গীটুকু ভারী চমৎকার। ইবানেসের সাহিত্য পড়িয়া মনে হয়, নারী চিররহস্যময়ী,—অথচ পুরাকালে পুরুষই তাহার একখানি পাঁজর খসাইয়া নারীকে সৃষ্টি করিয়াছিল!

*   *

*

ইবানেস্‌ যখন ভূপর্য্যটনে বাহির হইতেছেন, সেই সময় প্যারী সহরে Lola de Laredoর সহিত তাঁহার দেখা হয়। এক ধূসর সন্ধ্যায় প্যারী নগরীর বুকে একখানি বাড়ীর জানালার ধারে এক নারীর সুমুখে বসিয়া তিনি যে কয়টি কথা বলিয়াছিলেন, তাহার মূল্য বড় কম নয়। বিলাতের Royal Magazineএ Lolaর সহিত তাঁহার কথোপকথনের বিশদ বিবরণ বাহির হইয়াছে। কয়েকটি কথা এখানে তুলিয়া দিতেছি।

"জীবনে গলদ কোন্‌ খান্‌টায়?—তা' আমাদের মনে। কারণ বেশীর ভাগ লোকই জীবনটাকে দেখে ভুল দিক্‌

থেকে। আমরা সুখ চাই না, প্রেম চাই না, চাই ক্ষমতা, চাই স্বেচ্ছাচারিতা। স্ত্রী ও পুরুষের ভেতর যে সম্বন্ধ, তা চিরন্তন—যেমন ধরিত্রীর সঙ্গে সূর্য্যের। জীবনের ভিত্তি-টাই যে পরস্পরের সম্বন্ধের ওপর দাঁড়িয়ে! স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ,—আধ্যাত্মিক, মানসিক দৈহিক সব দিক্ দিয়ে।

*

* *

"আজ যে চারিদিকে নানা কথা শোনা যাচ্ছে, স্ত্রী-স্বাধীনতা স্ত্রীপুরুষের সমতা ইত্যাদি—তা সামাজিক উন্নতির ফল। যতদিন না এসব কথা কোনও প্রাকৃতিক নিয়মকে অতিক্রম করে, ততদিন এ বিষয়ে আমার নিজের কোনও আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু তারা যখন প্রকৃতির আইনকে লঙ্ঘন ক'রে চলে তখনই দুঃখ হয়। আজকাল দেখতে পাই, স্ত্রী ও পুরুষ অনেক স্থলেই বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ, এবং বহুক্ষেত্রে ঐ দুঃখ-দুর্ভাবনাহীন বন্ধুত্বটুকুই যথেষ্ট, প্রেমের প্রবেশ সেখানে নিষেধ।

*

* *

"আমার কিন্তু মনে হয় আগের চেয়ে নারী আজ অনেক অংশে সুন্দর ও উন্নত। জীবনকে তারা আজ বুঝতে শিখেছে, প্রেমের মর্য্যাদাও দিতে শিখেছে। কিন্তু এইখানে একটি কথা বলতে হচ্ছে, নারীকে আজ ভুললে চলবে না যে, যে-রূপ দিয়ে সে আর একজনকে আকৃষ্ট করে তা আজও তাদের সবচেয়ে বড সম্পদ। সংসারে পুরুষের সঙ্গে রেষা-রেষি করে তার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে তাকে আজ তার নিজস্ব সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যটুকু হারিয়ে ফেললে চলবে না।

*

* *

"অনেকের ধারণা, পুরুষের কাজ করতে হবে বলে, নারীকে আজ সব দিক্ দিয়ে পুরুষের অনুকরণ করতে হবে।—তাই তারা জীবনসংগ্রামে সবচেয়ে যা দরকারী।—দেহের লাবণ্য, তাকে জলাঞ্জলি দিয়ে বসে

এই ধরণের নারীরাই যে সমালোচনার পাত্রী হয়, তাতে আর বিচিত্র কি? নারীর মধ্যে পুরুষ যা চায়, তা তার আপনার অংশ যা বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে, তার প্রতিধ্বনি নয়। যখনই সে দেখে নারী আজ তার নিজেরই একটি বিকৃত অনুকরণ তখনই সে বিরক্ত হয়ে ওঠে।

*

* *

"জীবনের সকল মাধুর্য্য, সকল সৌন্দর্য্য বাঁচিয়ে রাখতে হবে—এই ত বেঁচে থাকবার উপায়। যে নারী আপনার দেহের সৌন্দর্য্যকে বলি দিয়ে মনের সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করতে চায়, সে তার জীবনের উদ্দেশ্যকে নষ্ট ক'রে ফেলে। যে নারী আপনার নারীসুলভ সৌন্দর্য্যকে অটুট রেখে মনের সৌন্দর্য্যকে বাড়াতে পারে তাকেই বলবো বুদ্ধিমতী মেয়ে।

পুরুষের কাজে নারী যদি প্রতিভার পরিচয় দেয়, ভালো কথা।—তার চেয়ে ভালো, যদি সে পুরুষের কথা আপনার বুদ্ধি দিয়ে শোনে।—এবং সবচেয়ে ভালো সে যদি পুরুষকে, ঐ যে চিরন্তন কথা গুলি মানুষের আবেগের স্রোতে ভেসে বেড়ায়, তা তাকে দিয়ে বলাতে পারে। বিধাতার এই যে সবুজ পৃথিবী, এর ভেতর অন্তরের সেই অতি প্রাচীন বাণী—"ভালোবাসি"—এর থেকে নারীর শোনবার আর কি ভালো কথা থাকতে পারে?

*

* *

"মানুষের যতগুলি আবেগ, তার মধ্যে প্রেমই শ্রেষ্ঠ।—কারণ প্রেমের স্পর্শেই স্বার্থের কদর্য্য লোলুপতা নষ্ট হয়। কাল্পনিক ও আধ্যাত্মিক প্রেম সুন্দর সন্দেহ নেই—কিন্তু যে প্রেমকে কবি ও শিল্পী অমর করে রেখেছে, তা এমন একটি দিব্য বস্তু যা এই পৃথিবীর সমস্ত সুন্দর ব্যাপারকে আরও সুন্দর করে তোলে এবং দিকে দিকে এই প্রাণ-প্রবাহকে আরও বিচিত্র ও গভীর করে দেয়।"

শ্রী হিরন্ময় ঘোষাল

জাগ্রত ভগবান

শ্রী লেখরাজ সামন্ত

এক-নামের দু'জন লোক একই গাঁয়ে।

একজন ছোট গোঁসাই।

আর একজন বড় গোঁসাই।

গোঁসাই উপাধি নয়—গোঁসাই নাম।

গল্প ছোট গোঁসাইএর; বড় গোঁসাইএর কথা না হয় আর-একদিন বলিব।

জয়রামের ভিটের পাশে প্রকাণ্ড একটা বহুদিনের ন্যাড়া বেল গাছ,—আর সেই বেলগাছের নীচে গাঁয়ের লোক মাঝে মাঝে পূজা-অর্চ্চনাদি করে। কখনও কেউ-বা দু'টা গাঁজার কলিকা দিয়া যায়, কেউ-বা মাটির মালসায় শুকনো চারটি চিঁড়ার ভোগ রাখিয়া পূজা করে, আবার কেউ-বা দু'টা ফুল-বেলপাতা ছুঁড়িয়া দিয়া বলে, "বাবা আমাদের এতেই সন্তুষ্ট।"

জনপ্রবাদ নাকি গেরুয়া-চিম্‌টাধারী একজন সন্ন্যাসী গোঁসাই ওই গাছের উপর অলক্ষ্যে বহুকাল ধরিয়া বসবাস করিতেছেন। কেহ কোনোদিন তাঁহাকে দেখিতে পায় না, কিন্তু তাঁহার অলৌকিক কার্য্যকলাপ গ্রামের প্রায় সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

একদা এক মুসলমান আমিন্ জমি জরিপ করিতে আসিয়া চামড়ার জুতা পায়ে দিয়াই বেলগাছের তলায় দাঁড়াইয়া জরিপের চেন্ ধরিয়াছিল। লোকের নিষেধ সে শোনে নাই। বলে,

"হুঁঃ! দেবতা না আরও কিছু...!"

বাস্!—অনেকদিনের কথা হইলেও মুরুব্বি মাতব্বরেরা সব এখনও বলাবলি করে, "ভাঁহা দেখা আমাদের পিত্তক্ষি চোখে,—মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ করে' রক্ত উঠলো, আর বাস্—ওইখানেই, গোঁসাই-বাবার ওই বেল-তলাতেই...চ্যাং-দোলা করে' তুলে নিয়ে যেতে হলো রাজার কাছারিকে, তারপর তেরাত্রি আর পেরোলো না বাছাধন,—খতম্!"

এমনি সব প্রত্যক্ষ চোখে-দেখা এবং কানে শোনা আরও অনেক আশ্চর্য্যের কাহিনী গ্রামের ভিতর প্রচলিত আছে।

কিন্তু এ-সব গেল ছোট কথা।

সব চেয়ে বড় ব্যাপার হইতেছে এই, যে, বন্ধ্যা নারী সে গ্রামে কোথাও কেহ নাই। কিছু মানৎ করিয়া গোঁসাই-বাবার পূজা দিলেই বন্ধ্যা নারী সন্তানসম্ভবা হইয়া থাকে।

বড় গোঁসাই আর ছোট গোঁসাই তাঁহারই দেওয়া।

গোঁসাইএর দেওয়া ছেলে, কাজেই গোঁসাই ছাড়া ভাল নাম আর তাহাদের কিই-বা হইতে পারে!

এই ত' গেল নামের ইতিহাস।

বড় গোঁসাই বড় হইয়া দিব্যি সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করিতেছে,—নাতি-পুতি, ধন-দৌলত,—অভাব কিছুই নাই।

কিন্তু ছোট গোঁসাইএর কেন যে এমন হইল কে জানে!

বিঘা দুই-তিন জমি, তাও আবার ভাগ-জোতের চাষ,—না আছে গরু, না আছে গাড়ী। দুরবস্থার একশেষ।

সাদা ধুতি জল্‌দি জল্‌দি ময়লা হইয়া যায়, শতচ্ছিন্ন জর্জ্জরিত ধুতি-জোড়াটি তাই সে রং করিয়া পরে, মাথায় একমাথা চুল রাখিয়াছে, মাঝে-মাঝে খড়ম পায়ে দেয়,—আর দিবারাত্রি গুন্ গুন্ করিয়া গানের সুর ভাঁজে।

আবার গাঁজাও টানে।

এদিকে অভাবের মাত্রা তাহার দিনে দিনে বাড়িয়াই চলে।

মেয়েটার বিবাহ দিয়াছিল,—ষোড়শী মেয়ে বিধবা হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

বৌ বলে, "বেটা ছেলে ঘরে বসে' থাকলে অভাব ঘোচে না। বেরোও তুমি ঘর থেকে।"

কিন্তু ঘর হইতে বাহির হইবার প্রথা তাহাদের বংশে কখনও ছিল কিনা কে জানে!

গোঁসাই বসিয়া বসিয়া ঝিমায় আর ভাবে……

আবাল্য পরিচিত এই গ্রামখানির বাহিরে—অপরিচিত ওই গ্রাম ও প্রান্তরের পশ্চাতে কোথায় কি আছে কিছুই তাহার জানা নাই।

সন্ধ্যা নামে।—দিগন্তের নীলকান্তি ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারে ঢাকা পড়ে। বাহিরের জগৎটা ভয়াবহ ভীষণকায় একটা দৈত্যের মত পড়িয়া থাকে। গোঁসাই ভাবে, একাকী ও-পথে পদক্ষেপ করা বোধকরি নিরাপদ নয়। সঙ্গীর প্রয়োজন।

কিন্তু সঙ্গী মিলে না।

বীরু রায় প্রত্যহ নিয়মিত তাহার কাছে আসে বটে, কিন্তু সে অন্য প্রয়োজনে।

গোঁসাই তাহার মনের কথা কাহাকেই বা জানায়!

রাত্রির অন্ধকারে এক একদিন তাহার মনে হয়, বেল গাছের ওই গোঁসাই-বাবার সঙ্গে দৈবাৎ যদি কোনদিন তাহার সাক্ষাৎ মিলে ত' তাহার কাছে কৈফিয়ৎ চাহিয়া বসিবে। জিজ্ঞাসা করিবে, দুনিয়ার এই অজস্র অনটনের মাঝে কেনই বা তাহাকে পাঠানো,—আর পাঠাইলই যদি ত' তাহার প্রতিকারের কোনও উপায় করিয়া রাখিয়াছে কিনা……

বেলতলার দেবতা-গোঁসাইএর কাছে মানুষ-গোসাঁই-এর ঘন ঘন যাওয়া-আসা চলে।

দেখা মিলে না, তবু দিন নাই রাত্রি নাই বেলতলার সেই অসংখ্য মাটির ভাঙা মালসাগুলা সরাইয়া কোন রকমে একটুখানি জায়গা করিয়া লইয়া ছোট-গোঁসাই চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া সেইখানে বসিয়া থাকে।

বীরু রায় আসে। আসিয়া ফিরিয়া যায়।

ডাকে। ডাকিয়া সাড়া পায় না।

এমনি করিয়া তিনটি দিন ধরিয়া তাঁহা উপবাস!

রাত্রির অন্ধকারে পুকুরে কোথাও জল খাইয়া আসে কিনা কে জানে!

বিধবা মেয়েটা ডাকিতে আসে। বলে, "খাবে এসো।"

লোকজন থাকিলে জবাব দেয় না।

না থাকিলে বলে, "ভাগ্—"

গ্রামের সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া যায়,—ছোট-গোঁসাইএর উপর নাকি গোঁসাই-বাবার ভর হইয়াছে।

বীরু রায়ের ভয় হয়। ভাবে, সব চেয়ে বেশি অন্তরঙ্গ তাহারই। সর্ব্বপ্রথমে হয় ত' তাহাকেই মনে পড়িতে পারে। গোঁসাই-বেহ্মদত্যি বড় ভীষণ দেবতা!

বীরু তাড়াতাড়ি নূতন মালসায় দুধ-চিড়ার ভোগ সাজায়, গাঁজা কিনিয়া আনে, ধূপদানিতে ধূপ জ্বালায়, তাহার পর ঢাকী ডাকিয়া ঢাক বাজাইয়া মহাসমারোহে বন্ধু-গোঁসাইএর পূজা করিতে চলে।

ঢাকের শব্দে গ্রাম ভাঙিয়া লোক জড়ো হয়।

ধূপের ধোঁয়ায় জায়গাটা একেবারে অন্ধকার হইয়া ওঠে। গোঁসাইএর মাথার ভিতরটা কেমন যেন রিম্ ঝিম্ করিতে থাকে।

বীরু ক্রমাগতই আগুনের উপর ধূপ ছিটায়।

গোঁসাই উন্মাদের মত একবার চাহিয়া দেখে, ধূপের ধোঁয়ার ভিতর দিয়া দ্বিপ্রহরের রৌদ্র এবং একটা জনতা ছাড়া আর কিছুই তাহার নজরে পড়ে না,—তাহার পর চুলওয়ালা মাথাটা তাহার ঘন ঘন নড়িতে সুরু করে। মনে হয় এ বড় চমৎকার সুযোগ।

বীরু ভাবে, এইবার বুঝি চৈতন্য হইতেছে,—প্রধূমিত ধূপদানিটা আরও নাকের কাছে খানিকটা আগাইয়া

যায়। ঢাকের উপর আরও জোরে-জোরে বাড়ি পড়িতে থাকে।

কিন্তু চৈতন্য হওয়া দূরে থাক্—মত্ততা তাহাতে যেন আরও বাড়িয়াই চলে।

দেখিতে দেখিতে ঝাঁকড়া চুলওয়ালা মাথাটা তাহার নাড়িতে নাড়িতে লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া গোসাঁই-বাবা মুহূর্তেই সেখানে এক প্রলয় কাণ্ড বাধাইয়া তোলে।

গ্রামের দশ পনর জন জোয়ান্ লোক তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না।

অলৌকিক দৈবশক্তি প্রভাবে নিতান্ত হীনবল মানুষের শরীরেও মত্ত হস্তীর বল জোগায়—এই কথাটা ইসারায় ইঙ্গিতে সকলেই তখন বলাবলি করিতে থাকে।

গোঁসাই তখনই জলে গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে, আবার লোকগুলাকে টানিয়া আনিয়া সেই বেলতলায় গড়াগড়ি দেয়। বলে,

"ডাক্! ডাক্ সেই বেটা ছোট-গোঁসাইকে ডাক্!"

গ্রামের লোক সব হাত জোড় করিয়া দাঁড়ায়।

বীরু বলে, "বাবা, ছোট গোঁসাই ত'—"

"ধেৎ!"

ধমকানির সে কি জোর!

ভয়ে তরাসে বীরু খানিকটা পিছু হাঁটিয়া হাত জোড় করিয়া দাঁড়ায়।

তাহার পর ছোট-গোঁসাই আবোল-তাবোল বকিতে সুরু করে।

"গাঁয়ে এত লোক থাকতে আমি পড়ি উপোস্! তিরিশ সালে ঘর পুড়েছিল, এইবার গাঁ পুড়বে। গাঁয়ের মেয়েগুলো এই যে সব ছেলে-ছেলে করে মরে—কে দেয় ছেলে?—ছেলে কে দেয় শুনি? ছেলে মেয়ে ত' সব আমারই দেওয়া! নাঃ, এইবার পুড়িয়ে মারব সব—সব পুড়িয়ে মেরে দেব—ছট্ফট্ করে কেঁদে কঁকিয়ে সব... বাস্—শেষ, একদম শেষ!—চল্!"

ছোট-গোঁসাই উঠিয়া দাঁড়ায়, প্রচণ্ড এক ঝাঁকানি দিয়া সবেগে জনতার ভিতর পথ কাটিয়া বাহির হইয়া যায়। ছেলে বুড়া সকলেই তাহার পিছু-পিছু ছুটিতে থাকে—

আর ঢাক বাজে।

ছুটিতে ছুটিতে হায়রাণ হইয়া ছোট গোঁসাইএর বাড়ীর কাছে প্রকাণ্ড একটা বটগাছের তলায় গিয়া সে চুপ করিয়া বসে। বসিয়াই চুল দুলাইয়া মাথা নাড়িতে সুরু করে। বলে,

"ডাক্ সব গাঁয়ের লোক ডাক্! বেলতলা ছেড়ে এইখানেই এলাম। ছোট গোঁসাইকে ছেড়ে থাকতে পারি না যে! ছোট গোঁসাইকে দেওয়াও যা, আমাকে দেওয়াও তা।—ডাক ছোট গোঁসাইকে!"

বুড়া রামতারণ হাত জোড় করিয়া বলিল, "কিন্তু ছোট গোঁসাই যে—"

"ধেৎ—!"

আবার সেই ধম্কানি!

হাত জোড় করিয়া রামতারণ কাঁপিতে থাকে।

গোঁসাই বলে, "পদ্মপুরের বাবুদের বাড়ী আমায় যেতে হয় রোজ। রোজ সেখানে খেয়ে আসি। ভারি ভালবাসে। ওদের বাড়-বাড়ন্ত হবে খুব। আর তো-বেটারা?—এ্যাক্ থু—!"

গোঁসাই থুতু ফেলিয়া বলে, যাবি জহন্নামে,—যাবি অধঃপাতে! সারা গাঁ'টাকে পুড়িয়ে তছ্‌নাচ্ করে' চলে যাব সেই পদ্মপুরে,—তখন বুঝবি।"

তাহার পর মাথা দুলাইয়া কি যে সব বলে—আর কিছুই বুঝা যায় না।

বাবাজির রাগ দেখিয়া বুড়া রামতারণ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গলায় কাপড় দিয়া সটান্ লম্বা হইয়া শুইয়া পড়ে।

তাহার দেখাদেখি আরও অনেকেই গড়াগড়ি দেয়।

মেয়েগুলার চোখ দিয়া ত' দর্ দর্ করিয়া জল ঝরে।

গোঁসাই মাঝে মাঝে চেঁচাইয়া ওঠে।—"পদ্মপুর, পদ্মপুর,—বাস্! পদ্মপুরের নিমতলা!"

ঝীরু আবার নূতন করিয়া ধূপদানিতে আগুন লইয়া আসে। ধূপের ধোঁয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বটগাছের কচি নাবালগুলিকে বেষ্টন করিয়া উর্দ্ধে উঠিতে থাকে।

কাঁদিতে কাঁদিতে রামতারণ মুখ তুলিয়া চায়, গোঁসাই এর পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া বলে, "তাহ'লে আমাদের উপায় বাবা?"

সজোরে পা দুইটা ছাড়াইয়া লইয়া গোঁসাই আবার উঠিয়া দাঁড়ায়, বিড় বিড় করিয়া কি যেন বলে, বলিয়াই আবার ছুটিতে সুরু করে।

গ্রামের বাহিরে পদ্মপুরের রাস্তা হইতে আবার কয়েকজন লোক গিয়া তাহাকে ধরিয়া আনে।

এদিকে তখন দুধ, দই, চিড়ে, কলা, চাল, ডাল পয়সা থালায়-থালায় সাজাইয়া—যাহার যেমন সঙ্গতি, একে একে আনিয়া হাজির করিতে থাকে। দেখিতে দেখিতে বাবার ভোগের আয়োজনে বটতলাটা ভরিয়া ওঠে।

মনে-মনে গোঁসাইএর তখন খুশী যেন আর ধরে না। বলে, "রোজ দিতে কি হয়?...মেয়েরা ছেলে চায়, আমিও দিতে কসুর করি না, কিন্তু তারপর আমার কথা আর কেউ ভুলেও ভাবে না। ভোগেও তেম্‌নি। একে-একে কেড়ে নেব যেদিন—সেইদিন টের পাবে।"

বলিয়াই দড়াম্‌ করিয়া সে উপুড় হইয়া পড়ে। পড়ে কিন্তু আর ওঠে না।

ছোট ছোট ছেলে মেয়ে কোলে লইয়া গ্রামের দু'-তিনটা মেয়ে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বাবাকে প্রণাম করিয়া যায়। বলে, "মনে আছে বাবা, খুবই মনে আছে আমাদের। মানৎ আমরা কালই শোধ করব।"

গোঁসাই তেমনি উপুড় হইয়া পড়িয়াই থাকে।

সারাদিনের পর সন্ধ্যার প্রারম্ভে তাহার চৈতন্য হয়। উঠিয়া বসিয়া বোকার মত ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া এদিক-ওদিক তাকায়। একটুখানি দূরে সরিয়া আসিয়া গড় হইয়া একটি প্রণাম করিয়া বলে, "কী, কী এ-সব?"

গোঁসাইএর সঙ্গে কথা কহিতে তখনও লোকের কেমন যেন ভয়-ভয় করে।

ভোগের আয়োজনগুলি দেখাইয়া দিয়া বলে, "তুমি একবার নিবেদন করে' দাও গোঁসাই-বাবাকে।"

ছোট-গোঁসাই মন্ত্র আওড়াইয়া জল ছিটাইয়া পূজা ও নিবেদন করিয়া দেয়।

তাহার পর তাহাকে আর কিছুই করিতে হয় না। বুড়া রামতারণ ছোট-গোঁসাইএর বিধবা মেয়েটিকে ডাকিয়া বাবার ভোগের জিনিসগুলি ঘরে লইয়া যাইতে বলে।

ছোট গোঁসাই আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, অত্যন্ত পরিশ্রান্তের মত কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িয়া বলে, "কেন, কেন? আমার ঘরে কেন?"

রামতারণ বলে, "বাবার হুকুম।"

তাহারপর প্রতি শনি ও মঙ্গলবার ছোট-গোঁসাইএর উপর বাবা-গোঁসাইএর ভর হয়। তেম্‌নি প্রচণ্ডভাবে মাথা নাড়িয়া ঝাপান্‌ চলে, তেম্‌নি পূজার ধূম পড়িয়া যায়, ঢাক বাজে, ঢোল বাজে, কাঁসর ঘণ্টা সবই আসিয়া জড়ো হয়,—ধূপের ধোঁয়ায় সারা গ্রামটা একেবারে আমোদিত হইয়া উঠে।

ছোট-গোঁসাইয়ের বৌ আর তাহাকে ঘর হইতে বাহিরে যাইবার জন্য অনুরোধ করে না।

কথাটা কেমন করিয়া না জানি পদ্মপুরের বাবুদের কানে গিয়া ওঠে।

*

শনিবার প্রাতে পদ্মপুর হইতে একখানি গরুর গাড়ী ছোট গোঁসাইএর বাড়ীর দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

বটতলায় তখন গোঁসাইএর ঝাপান্‌ চলিয়াছে।

গাড়ী হইতে একজন বর্ষিয়সী মহিলা ও একটি দশ

বারো বছরের ছেলের সঙ্গে বাবুদের মেজ-বৌ নামিলেন।

ছোট গোঁসাইএর স্ত্রী ও বিধবা কন্যা সাদরে তাঁহাদের ঘরের ভিতর লইয়া গেল।

বৌটি অত্যন্ত লাজুক। বয়স্থা মেয়েটি বুঝাইয়া বলিলেন, মেজ-বৌমার ছেলে হইবার বয়স হইয়াছে; অথচ ছেলে হয় না। বাবার দয়ায় ছেলে কি মেয়ে—যা হোক্ যদি একটা কিছু হয়,ছোট-গোঁসাইএর অভাব কিছুই থাকিবে না।

সেদিন আর বেশিক্ষণ সেখানে তাঁহারা থাকিলেন না। দশটি টাকা প্রণামী দিয়া ছোট গোঁসাইএর পায়ের কাছে মেজ-বৌ একটি প্রণাম করিয়া আসিলেন।

যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, গোঁসাই-বাবার পূজার জন্য প্রতি শনিবার একটি করিয়া টাকা তিনি লোক মার্ফৎ পাঠাইয়া দিবেন। তাহার পর ছেলে হইলে যাহা দিবেন—সেকথা স্বতন্ত্র।

গ্রামবাসীদেরও ভোগের আয়োজন সেদিন মন্দ হয় নাই।

ঝাপানের জের সেদিন আর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলিল না। বেলা দু'পহরের আগেই বাবাজির মূর্চ্ছা ভাঙিয়া গেল। গাঁয়ের মেয়েছেলে রোদের চোটে তখন নাকাল হইয়া পড়িয়াছে।

চোখ মেলিয়া ছোট গোঁসাইএর নিজেরই তাক্ লাগিয়া যায়। এমনটি যে হইতে পারে,—তাহা সে নিজেও কোনোদিন ভাবিয়া দেখে নাই।

চলে,—

এম্নি করিয়াই ঝাপান্ চলে,—হপ্তার পর হপ্তা, মাসের পর মাস।

কে যে কত দেয়—এখন আর তাহার কিছু হিসাব নিকাশ থাকে না।

গ্রামের লোকের দেওয়া এখন কিছু কমিয়াছে। গরীব লোক! দেওয়া বড় শক্ত।

কিন্তু ভিন্ন গ্রাম হইতে 'পূজার' আসে, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে গুলাকে আনিয়া বটতলার ধুলা মাখাইয়া লইয়া যায়।

মা-সোহাগী ছোট ছোট মেয়েগুলা আসিয়া সন্তান কামনা করে।

ছোট গোঁসাই আজকাল চলে ভাল—বলেও ভাল।

বলে, "কি জানি বাবা, তখন যে কি-রকম করে' যে কি-সব হয়ে যায়—কি যে কই, আর কি যে বলি..."

গ্রামের দু'একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কৌতূহল জাগে। ডাকিয়া শুধায়,—"আচ্ছা বল ত' গোঁসাই, চব্বিশ ঘণ্টা কি তোমার ওই গোঁসাই-গোঁসাই ভাব থাকে নাকি?"

ঘাড় নাড়িয়া ছোট গোঁসাই বলে, "হ্যাঁ—। চব্বিশ ঘণ্টাই মনে হচ্ছে,—দিই পুড়িয়ে সব ছারখার করে'—। দিই সব মেরে'-ধরে' তাড়িয়ে গাঁ থেকে! মহামারি, কলেরা, বসন্ত ত' হুকুমের অপেক্ষা! চব্বিশ ঘণ্টা কানে-কানে বলছে—গোঁসাই, দাও হুকুম! আমি বলি—উহুঁক্! সেটি হচ্ছে না বাবা।"

গোঁসাইএর চুল, মাথা, একসঙ্গে দুলিতে থাকে।

লোকের ভয় হয়।

বলে, "জাগ্রত গ্রাম্-দেবতার অবহেলা করা যে মহা পাপ!"

ছোট-গোঁসাই আর সেখানে থাকিতে চায় না। বলে, কথা কইলাম্ তোমাদের সঙ্গে, এরই মধ্যে মাথাটা কেমন যেন ঘুরছে।"

কেউ কেউ বলে, "ধরে-ধরে' দিয়ে আসব নাকি ঘর পর্য্যন্ত?"

গোঁসাই ঈষৎ প্রীতির হাসি হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলে, "না, না, থাক্ বাবা থাক্!"

ইহাকে লইয়া লোকজনের আলোচনা চলে।

বলে, "কোনও কুটিলতা নেই যে অন্তরে! লোক খুব ভাল।"

"তা নইলে মানুষের উপর দেব্‌তার ভর সহজে হয় না।"

তাহার অবস্থাটির দিকেই লোকজনেরনজর পড়ে বশি।

বলে, "তা বেচারার অবস্থাটি আজকাল......"

করালী বলে, "তোমার-আমার দোয়াতে কিছু হয় না দাদা,—দেব্‌তা-টেব্‌তা যখন দেয়, তখন ঠিক অম্‌নি করেই দেয়।"

দুক্রোশ দূরের বাজার হইতে গোঁসাই-গিন্নির পান আসে, জর্দা আসে।

চিবায় আর বলে, "এমন জ্বালা যেন আর-কারও না হয় মা! রাত-বিরেতে একা-দোকা শুয়ে থাকে,—ভয় হয়। খালি খালি চম্‌কে-চম্‌কে ওঠে। আগুন আগুন করে' চেঁচায়! চপ্‌ করে' হাত দুটো গিয়ে ধরি। বলি "থামো!"

হাত দুইটি কপালে ঠেকাইয়া গোঁসাই-বাবার উদ্দেশে অভয়া সেইখান হইতেই বারকতক প্রণাম করিয়া বলে, "রক্ষে করো বাবা, তুমিই রক্ষে করো!"

আবার বলে, "আগুন-পানিকে বড় ডরাই মা, আগুনের নাম শুনলে গা ছম্‌ ছম্‌ করে' ওঠে।"

বটতলাটাকে বটতলা আজকাল কেউ আর বলে না। 'গোঁসাই-তলা' তাহার নাম হইয়া গেছে।

গোঁসাই-তলার ধুলা-মাটির এম্‌নি গুণ যে, কিছুকাল ধরিয়া কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া রাখিলে কাপড়ের উপর রক্তের মত দাগ পড়ে।

অন্ধকার রাত্রে ত' সে পথ দিয়া লোকজনের হাঁটা দায়!

প্রকাণ্ড একটা অজগর সাপ নাকি ওই বটগাছের কোটরে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে। দূর হইতে অনেকক্ষণ ধরিয়া কান পাতিয়া থাকিলে ক্রমাগত একটা ভীষণ গর্জ্জনের শব্দ আসে,—আর কেমন যেন একটা বোট্‌কা-বোট্‌কা গন্ধ......

সাপের মাথার মণি জ্বলে,—কিন্তু সে এক ছোট গোঁসাই ছাড়া আর-কাহারও নজরে পড়ে না।

বটগাছের একটি কচি নাবাল চুলে বাঁধিয়া রাখিলে প্রসূতির রোগ-বালাই ত' সারেই, এমন কি ছেলেমেয়ের যে কোনো ব্যাধি অতি অল্পদিনের মধ্যেই নির্ম্মূল হইয়া যায়।

এতদিন ধরিয়া তাহাই হইতেছিল।

কিন্তু তাহারও একদিন ব্যতিক্রম ঘটিল।

কুড়ুলজুড়ির একটা কালোপানা অত্যন্ত রোগা মেয়ে বহুকাল হইতেই এ গ্রামে যাতায়াত করিত। গোঁসাই-বাবার আস্তানা তখন সেই পুরানো বেলতলায়।

মেয়েটা আসিত, 'পূজার' দিত—আবার চলিয়া যাইত। —এমন কিছু মনে করিয়া রাখিবার মত ঘটনা নয়। কিন্তু তবু মেয়েটাকে লোকের মনে থাকে।

তেমন মেয়ে সচরাচর নজরে পড়ে না।

শুষ্ক তোপ্‌ড়া কালো একটি জামের মত—শ্রী-সৌন্দর্য্য কোথাও কিছু নাই; জরাগ্রস্ত যৌবন যেন তার কঙ্কালসার

কাঠামটিকে ছাড়িয়া জ্বলন্ত দুটি চোখে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

অম্‌নি চিরকাল!

আসে আর যায়।

গোঁসাই-বাবার ঠিকানা-বদলের খবরটাও সে জানে।

দু'দিন আসিয়াছিল। একদিন একা। আর-একদিন দেখা গেল—কোলে একটা ছেলে।

ছেলেও ঠিক্ তেম্‌নি। কাঠির মত পাৎলা—নিতান্ত দুর্ব্বল, বিকৃত, কদাকার,—সহসা দেখিলে মানব শিশু বলিয়া মনে হয় না।

পাখীর মত ঠোঁট মেলিয়া চিঁ চিঁ করে। ভাঙা বাঁশীর ফুটা দিয়া যেন বাতাস বাহির হয়। কাঁদিতে কাঁদিতে ককাইয়া হঠাৎ থামিয়া যায়,—আবার হয়ত সর্দ্দির ঘড়ঘড়ানির সঙ্গে গলার আওয়াজটা একটুখানি সরস হইয়া উঠে।

মাও কাঁদে।

চোখ দিয়া শুধু দর্ দর্ করিয়া জল ঝরে, মুখে কিছুই বলে না,—ডান হাত দিয়া ধূলামাটি কুড়াইয়া লইয়া মৃত প্রায় সেই শিশুটির গায়ে অনবরত মাখাইতে থাকে।

ছোট-গোঁসাইএর তখন ঝাপান্ চলে। কাঁসর বাজে, ঘণ্টা বাজে,—সে দিক পানে ফিরিয়া তাকাইবারও অবসর পায় না। বিড়্ বিড়্ করিয়া কত কথাই না বলিয়া যায়!

মেয়েটা কান পাতিয়া শোনে।

কিন্তু তাহার সম্বন্ধে একটা কথাও না!

ঠ্যাঙ্গার মত দেহটা তাহার হঠাৎ খাড়া হইয়া ওঠে, গোঁসাইএর দিকে কেমন যেন সে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে চায়,—তাহার পর খুঁট হইতে একটি আনি বাহির করিয়া গোঁসাই এর পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া দিয়া পুকুরের ঘাটে গিয়া নামে।

ভিজা আঁচল নিঙড়াইয়া ছেলের মুখে জল দেয়—

তাহার পর পুকুরের পাড়ের উপর দিয়া গাছের ছায়ায় ছায়ায় কুড়ুলজুড়ির পথ ধরে।

সেই যে যায়, হপ্তাখানেক মেয়েটা আর আসে না।

যেদিন আসিল, ছোট গোঁসাইএর ঝাঁপানের দিন সেদিন নয়; সেদিন বোধ করি রবিবার।

গোঁসাই তখন বটতলায় বসিয়া আছে। চারিদিকে এক থাতা লোক!

পাগলের মত মেয়েটার উদাস দৃষ্টি,—কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ দুটা রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

মেয়েটা একেবারে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

কোলের উপর ছেলেটি তাহার আঁচল দিয়া ঢাকা। পাঁকাটির মত সরু একখানা পা দেখা যায়।

গোঁসাই অবাক্! ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকে, কিন্তু কোনও প্রশ্ন করিতে পারে না।

আঁচলের ঢাকা খুলিয়া ছেলেটাকে সে তাহার পায়ের কাছে রাখিয়া দিয়া বলে, "বাঁচাও বাবা!"

লোকগুলা হাঁ হাঁ করিয়া ছেলের মাকে ঠেলিয়া দিয়া ছেলেটাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়।

ছেলের হাত পা তখন টানিয়া খিঁচিয়া জড়ো হইয়া গিয়াছে। মৃত্যুর হয় ত আর বেশি দেরি নাই। শুকনো বুকের ওই ক'টা পাঁজ্‌রার নীচে এতটুকু জীবন তখনও কোথায় যেন ধুক্ ধুক্ করে।

সবাই বলে, "হাঁ বাবা বাঁচাও—!"

"বাঁচাও বাবা!"

"মানুষ বাঁচাও!"

"আমরা দেখি।"

দেখিবার জন্য সকলেই যেন ওৎ পাতিয়া থাকে।

মেয়েটার গলা তখন শুকাইয়া গেছে, চেঁচাইয়া কাঁদিতে পারে না, পথের ধূলায় আছাড়ি-পাছাড়ি খাইয়া গড়াগড়ি দেয়,—আর মাঝে-মাঝে এক একবার গোঙাইয়া ওঠে।

মিনিটখানেক সকলেই চুপ!

গোঁসাই ধীরে-ধীরে উঠিয়া দাঁড়ায়।

বলে, "আসি।"

ছেলেটার গলা ঘড়্ ঘড়্ করিতে থাকে, নাকে-মুখে বুজ্‌বুজে খানিকটা সর্দ্দি আসিয়া জমে, চোয়াল দু'টা বার-কতক্ নাড়ে—

তাহার পর অতগুলা লোকের চোখের সুমুখেই চোখ দুইটা উল্টাইয়া দিয়া ছেলেটা হট্ করিয়া কাৎ হইয়া পড়িয়া যায়।

লোকে বলে, "মরুক্ না,—বাঁচবে ঠিক্!"

বলিয়াই একসঙ্গে অতগুলা সাগ্রহ দৃষ্টি মেলিয়া গোঁসাইএর জন্য সকলে পথ চাওয়া-চাওয়ি করে।

গোঁসাই কিন্তু আসে না!

ছেলেটা শুকাইয়া শুকাইয়া কাঠ হয়।

দিনের পর দিন যায়...

হপ্তার পর হপ্তা.........

গোঁসাই নিরুদ্দেশ!

ঝাপান্ বন্ধ থাকে।

গোঁসাই-তলা অন্ধকার!

মাঝে একদিন পদ্দপুর হইতে একজোড়া গরুর আসিয়াছিল।

গাড়োয়ান বলে, "গোঁসাই-বাবাকে নিতে এসেছি।"

বাবুদের মেজ-বৌ নাকি সন্তান সম্ভবা!

ফাঁকা গাড়ী ফিরিয়া যায়।

গোঁসাই-গিন্নি দুয়ারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখে—।

প্রাচীন আসামী হইতে—

শ্রী প্রমথনাথ বিশী

মৃণাল-রুচির তব উন্মুখ অধরে
যদি বা অঙ্কিত করি অবলীলাচ্ছলে
বঙ্কিম চুম্বন রেখা—জেনো প্রিয়তম
মুহূর্ত্তে তা মিলাইবে ইন্দ্রধনু সম
ক্ষুণ্ণ গগনের কোণে। অয়ি অসহায়
মৃত্যুর ইঙ্গিত তীক্ষ্ণ ছুরিকার প্রায়
কুন্ঠিত গ্রীবায় তব অধরের রেখা
সে তো শুধু অস্তনভে ক্ষণিকের লেখা
মুমূর্ষু মণিকা এক। যাহা থাকিবার
আপনি তা থাকে—কেবা খোঁজ রাখে তার।

প্রাচীন আসামী হইতে—

ত্রিবলী সোপান আঁকা ক্ষীণ মধ্যতব
নিয়ে যাবে উচ্চে মোরে যেথা অভিনব
অপূর্ব্ব মন্দির আছে ; তবু আজি এই
সোপানেরে ভালবাসি—তার বেশি নেই

ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রধনু ও তনু তোমার
তাই তারে বারম্বার করি নমস্কার ॥
অফুরন্ত সুধাপাত্র ও তনু তোমার
ফুরায়েও চিরপূর্ণ করি নমস্কার ॥
ও তনু মৃণাল পরে বিশ্বের বিস্তার
তাই তারে বারম্বার করি নমস্কার ॥
কনক বলয় তব মুগ্ধ চেতনার
অপার দিগন্ত রেখা—করি নমস্কার ॥
নিটোল বাসনা সম ও বক্ষ তোমার
প্রণয়ের চির বেদী—করি নমস্কার ॥
আমার দর্পন তুমি অস্তিত্ব আমার
তাই সখি তব পায়ে করি নমস্কার ॥
অলোকসম্ভব তনু সব তীর্থসার
তাই তোমা বারম্বার করি নমস্কার ॥

বিচিত্রা

আমাদের দেশে বর্ত্তমানে যে নির্ব্বাচন ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা জাতীয়তার দিক হইতে দেখিতে গেলে অতি নিকৃষ্ট ব্যবস্থা। বর্ত্তমানের ব্যবস্থা—সম্প্রদায় বিশেষ তাহাদের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধিকে নির্ব্বাচন করিবেন।

এই যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধিকে সম্প্রদায় বিশেষ নির্ব্বাচন করিতেছেন, ইহাতে প্রতিনিধি এবং ভোটারদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চেতনাই সংক্রামিত হইতেছে, সাধারণ নির্ব্বাচন ব্যবস্থার মধ্যে যে অসাম্প্রদায়িক সুস্থ জাতীয়-দায়িত্বের অনুভূতি রহিয়াছে, তাহা ব্যহত হইতেছে।

সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন বর্ত্তমানে মুসলমানরাই কায়েম করিয়া রাখিতে চাহেন।

জাতীয়তার দিক হইতে সাধারণ নির্ব্বাচনই প্রশস্ত—একমাত্র নির্ব্বাচন ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলেই নির্ব্বাচনে দাঁড়াইতে পারেন এবং—সদস্য পদপ্রার্থীদের মধ্যে যাঁহার ভোট (তিনি যে জাতি বা ধর্ম্মেরই লোক হউন না) বেশী হইবে, তিনিই প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেন।

তবে মন্দের ভাল হিসাবে, সম্মিলিত নির্ব্বাচন ব্যবস্থাও প্রচলিত হইতে পারে। সেই ব্যবস্থায় সাধারণ নির্ব্বাচনের বাহিরে, সম্প্রদায় বিশেষের জন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধির ব্যবস্থা থাকিবে। তবে বর্ত্তমানে যেমন উক্ত সম্প্রদায় বিশেষই ভোট দিয়া তাহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন, এ ব্যবস্থায় তাহার পরিবর্ত্তে সম্মিলিত অর্থাৎ সকল সম্প্রদায়ের ভোটাররাই তাঁহাদের নির্ব্বাচন করিবেন। বলা বাহুল্য সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে বলিয়া ব্যাপক প্রতিযোগিতায় যোগ্যতম লোকও যেমন নির্ব্বাচিত হইবেন না, তেমনি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার খুঁটিতে সাম্প্রদায়িক অসুরও বাঁধা থাকিবে।

যাহাই হউক মিঃ জিন্না প্রভৃতি এই সম্মিলিত নির্ব্বাচন ব্যবস্থার প্রস্তাব করিয়াছেন।

*

* *

মিঃ জিন্না শুধু প্রস্তাব করেন নাই, সেই সঙ্গে সর্ত্ত ও দিয়াছেন মিঃ জিন্নার সর্ত্তে হিন্দু সমাজ রাজী হইলেই তবে তিনি তাঁহার প্রস্তাবগুলি মুসলমান সম্প্রদায় দ্বারা অনুমোদন করাইয়া লইবেন—।

ভারতের জাতীয়তার জন্য হিন্দু মুসলমানের মিলন আমরা চাই, আর তাহা চাই বলিয়াই—হিন্দু মুসলমানের মিলনের ভিত্তিকে মিথ্যা বৈষম্য বা ফাঁকির আবর্জ্জনায় ভরিতে চাহি না।—

মিঃ জিন্না কতকগুলি সর্ত্ত দিয়াছেন, যে সর্ত্তে তিনি সম্মিলিত নির্ব্বাচনে স্বীকৃত হইতে পারেন। এবার দেখা যাক্, সর্ত্তগুলি কি?

তাঁহার সর্ত্ত, সিন্ধু প্রদেশকে বোম্বাই প্রদেশ হইতে তফাৎ করিয়া নূতন প্রদেশে পরিণত করিতে হইবে। সিন্ধুতে মুসলমান সংখ্যা অধিক। সুতরাং সিন্ধুকে একটি মুসলমান প্রধান প্রদেশে পরিণত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করিতে পারে। মিঃ জিন্নার সম্মিলিত নির্ব্বাচন ব্যবস্থার গোড়ায় যেখানে সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রেরণা বর্ত্তমান তখন তার মধ্য ও অন্তে কতটা সাম্প্রদায়িক মতলব আছে তাহাও সহজে বুঝা যাইবে। তাঁহার সর্ত্ত, যে সব প্রদেশে মুসলমান সংখ্যা কম তাহারা সংখ্যার অনুপাত হইতে কিছু বেশী প্রতিনিধি পাইবে। সেই অনুপাত কেমন হইবে, তাহা সিন্ধু প্রদেশ নির্দ্দিষ্ট করিবে। অর্থাৎ হিন্দু প্রধান প্রদেশে পাছে মুসলমানের অনুপাত কমিয়া যায়, তাই—মুসলমান প্রধান সিন্ধু প্রদেশ চাই। যেন চোখ রাঙ্গাইয়া মুসলমান প্রধান সিন্ধু প্রদেশ হিন্দু প্রধান প্রদেশ গুলিকে শাসাইবে। তা' বেশ, সংখ্যায় অল্প সম্প্রদায়গুলি যদি সংখ্যার অনুপাতে কিছু অধিক ভোট পায়—পাক্। কিন্তু মিঃ জিন্না ভাবিয়া নিয়াছেন, জাতীয়তার তাগিদ হিন্দুর, তাঁহাদের নহে, রাষ্ট্র-সাধনার বাপের শ্রাদ্ধ হিন্দুর, তাই রাষ্ট্র-সাধনায় যদি হিন্দু মুসলমানকে চায় তাহার বিনিময়ে মুসলমানের কিছু লাভ হওয়া ত চাই। তাই বাংলা ও পাঞ্জাবের জন্য তাহার সর্ত্ত আলাদা রকমের অন্যান্য প্রদেশে মুসলমান সংখ্যা কম, সুতরাং সংখ্যার অতিরিক্ত প্রতিনিধিত্ব তিনি চাহেন। কিন্তু এই প্রথা সর্ব্বত্র চলিলে, সংখ্যায় অল্প বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী হিন্দুরাও সংখ্যার অনুপাত হইতে কিছু অধিক প্রতিনিধিত্ব পাইতে পারিতেন,—কিন্তু মিঃ জিন্নার সর্ত্ত এ যাত্রা ভিন্ন পথে গিয়াছে, বাংলা ও পাঞ্জাবে একেবারে খাঁটি সংখ্যার অনুপাতে নির্ব্বাচন হইবে; যেহেতু বাংলায় পাঞ্জাবে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য। এতগুলি বৈষম্যের

দ্বীপে কোন মিলনই স্থায়ী হয় না। সমগ্র ভারতে একই প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

*

* *

আমরা সাধারণ নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্র ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় নহে। বর্ত্তমান ভারতে যে রকম সাম্প্রদায়িক চেতনা বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন তুলিয়া দিয়া সাধারণ নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তন সহজ নহে তাহাও স্বীকার করি; কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক চেতনা আছে বলিয়াই যতই শক্ত হউক, এই সাধারণ নির্ব্বাচন ব্যবস্থাকেই প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। এই পথ আজ যতই শক্ত ও বিপদসঙ্কুল মনে হউক, কাল এই পথই সহজ ও সত্যকার জাতীয়তার একমাত্র পথ বলিয়া গণ্য হইবে।

* *

মিঃ জিন্নার প্রস্তাবিত সম্মিলিত নির্ব্বাচন—জাতীয়তার পথে জাতিকে আগাইয়া দিবে না। এই নির্ব্বাচনের প্রবর্ত্তনে মুসলমানেরা খুসী হইয়া হিন্দুর হাত ধরিয়া স্বরাজ সংগ্রামে অগ্রসর হইবে, তেমন সম্ভাবনাও নাই,—মুসলমানেরাও মিঃ জিন্নার প্রস্তাবে সম্মত নহে; তাহাদের খাঁই আরো বেশী! সুতরাং মুসলমানদের তুষ্ট করার উপায়ও যখন ইহাতে নাই, তখন এমন বৈষম্যপীড়িত, সর্ত্ত কবলিত সম্মিলিত নির্ব্বাচনের মিথ্যা আয়োজন করিয়া জাতির লাভ? তারপর, কোন কিছুর খাতিরেই অন্যায় আবদার রক্ষা করিয়া সম্প্রদায় বিশেষের লুব্ধতাকে বাড়ানো কর্ত্তব্য নহে। তাহার ফলে অন্যায় ও বৈষম্যের সুযোগকেই তাহারা ন্যায্য দাবী বলিয়া ভুল করিয়া বসে। মানুষকে মানুষের সঙ্গে সাম্যের পথেই মিলিতে হইবে এ পথেই অভ্যস্ত হইতে হইবে। বর্ত্তমান নির্ব্বাচন ব্যবস্থা নিকৃষ্ট, আর মিঃ জিন্না প্রস্তাবিত সম্মিলিত নির্ব্বাচন মন্দের ভাল হইয়াও বৈষম্যে কুব্জ—কুৎসিৎ। সুতরাং ভারতের জাগ্রত দেশাত্মবোধ, অসাম্প্রদায়িক সাধারণ নির্ব্বাচনের জন্যই প্রস্তুত হইবে। আজিকার সমস্যাকে কোন রকমে জোড়াতালি দিয়া মীমাংসা করিবার লোভে ভবিষ্যতের জাতীয় জটিল সমস্যাকে যেন আমরা সৃষ্টি না করি।

এ সম্পর্কে পরে আরো কথা বলিব—।

শ্রী নলিনীকিশোর গুহ

পত্র

১০৩/২ লেক রোড,
ঢাকুরিয়া
৭ই এপ্রিল ১৯২৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

'কালি- কলমে'র এক বছর সম্পূর্ণ হ'ল। এই এক বছর নামে সম্পাদক থাকলেও শরীরের অসুস্থতা ও অন্য নানা- কারণে আমি কলকেতায় উপস্থিত থেকে 'কালি-কলমে'র কোন কাজ দেখতে পারি নি। তার জন্যে সত্যই আমি লজ্জিত। আমি ভেবে দেখলাম যে এবছরও আমার কলকেতায় থাকা সম্ভব হবে না। সুতরাং কোন কাজ না করে শুধু নামে সম্পাদক থাকতে আমি ইচ্ছা করি না। আসছে বছর থেকে তাই জন্যে আমি সম্পাদক হিসাবে কালি-কলমে থাকতে চাই না। তবে 'কালি-কলমের' প্রতি আমার টান এর জন্যে আমার কমে গেছে ভাববেন না। আমার যথা সাধ্য আমি 'কালি-কলম'কে সেবা করব। আমার মনে হয় আগের বছর নামে সম্পাদক হয়ে কাজে কিছু করতে না পারায় মনে যে সঙ্কোচের কাঁটা ছিল সেটা দূর হয়ে যাওয়ায় আরো ভালো করেই কাজ করতে পারব। আপনারা আমার এ পদ-ত্যাগের ভিন্ন অর্থ করবেন না ও অন্য কোন গুজব শুনলে বিশ্বাস করবেন না। সম্পাদকী ও অন্যান্য সমস্ত সর্ত্ত থেকে মুক্তি চাইলেও আমাকে 'কালি-কলম' কে নিজের কাগজ মনে করতে দিতে আপনাদের বোধ হয় আপত্তি নেই। নমস্কার—

বিনীত
শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র

শ্রী শিশিরকুমার নিয়োগী কর্ত্তৃক, ১এ, রামকিষণ দাসের লেন, নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস হইতে মুদ্রিত ও
বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

আনন্দ বাজার পত্রিকার সৌজন্যে।

কালি-কলম

২য় বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪ [২য় সংখ্যা

লেখা

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সব লেখা লুপ্ত হয়, বারম্বার লিখিবার তরে
নূতন কালের বর্ণে। জীর্ণ তোর অক্ষরে অক্ষরে
কেন পট রেখেছিস্ পূর্ণ করি ? হয়েছে সময়
নবীনের তুলিকারে পথ ছেড়ে দিতে। হোক্ লয়
সমাপ্তির রেখা-দুর্গ। নব লেখা আসি দর্পভরে
তার ভগ্নস্তূপরাশি বিকীর্ণ করিয়া দূরান্তরে
উন্মুক্ত করুক পথ, স্থাবরের সীমা করি জয়,
নবীনের রথযাত্রা লাগি। অজ্ঞাতের পরিচয়
অনভিজ্ঞ নিক্ জিনে। কালের মন্দিরে পূজাঘরে
যুগ-বিজয়ার দিনে পূজার্চ্চনা সাঙ্গ হ'লে পরে
যায় প্রতিমার দিন। ধূলা তারে ডাক দিয়ে কয়,—
"ফিরে ফিরে মোর মাঝে ক্ষয়ে ক্ষয়ে হ'বিরে অক্ষয়,
তোর মাটি দিয়ে শিল্পী বিরচিবে নূতন প্রতিমা,
প্রকাশিবে অসীমের নব নব অন্তহীন সীমা।"

১১ চৈত্র
১৩৩৩

—লেখা, বৈশাখ,
১৩৩৪

* * * পয়োমুখম্"

শ্রী জগদীশ গুপ্ত

কলাপ সমাপ্ত হইয়া গেছে, মুগ্ধবোধ আরম্ভ হইয়াছে।

ভূতনাথের কথা বলিতেছি—

ভূতনাথ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে; কিন্তু কলাপই বলুন মুগ্ধবোধই বলুন, পাঠে তেমন ভক্তি কি আগ্রহ তার নাই।...মাঝে মাঝে সে ঠোঁট উল্টাইয়া মুখ বিশ্রী করিয়া ব্যাকরণের দিকে চাহিয়া চুপ্‌চাপ্ বসিয়া থাকে।...

ভূতনাথের পিতা কবিরাজ শ্রী কৃষ্ণকান্ত সেনশর্ম্মা কবিভূষণ মহাশয় স্বয়ং পুত্রকে শিক্ষাদান করিতেছেন।

কিন্তু আরম্ভে একটু বিলম্ব ঘটিয়া গেছে—

ভূতনাথের বয়স গত অগ্রহায়ণে অষ্টাদশ উত্তীর্ণ হইয়া ঊনবিংশে পদার্পণ করিয়াছে।

......সন ১৩০১ সালে তার জন্ম।

ভূতনাথের মেধা কোনোদিনই তার নিজের অলঙ্কারের কি গুরুবর্গের অহঙ্কারের বস্তু হইয়া ওঠে নাই—

তা' না হোক্......

মেধা মানবজাতির পৈত্রিক সম্পত্তি নয়; আর, ভগবান গৃহ-বিবাদে সালিশী করিতেও বসেন নাই যে, মাম্‌লা বাঁচাইতে, ভাণ্ডারের সমস্ত মেধা সবাইকে নিক্তির তৌলে সমান করিয়া মাপিয়া দিবেন! কিন্তু মেধা না থাকার পিছ্‌টানটা যাহার দ্বারা কাটাইয়া উঠিয়া মানুষের গতি-বেগ আর হৃদয়াবেগ সম্মুখের দিকে বাড়ে সেই অধ্যবসায়ও ভূতনাথের নাই বলিলে অযথা বেশী বলা হয় না।

......তাই ষোলো-সতর বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে তানানানা করিয়া কাটাইয়া সর্ব্বাপেক্ষা সহজ বিদ্যা আয়ুর্ব্বেদ আয়ত্ত করিতে বদ্ধপরিকর সে নিশ্চয়ই হয় নাই—সম্মত হইয়াছে।......

শুভস্য শীঘ্রম্—

সেই দিনই কাঠের সিন্দুক খুলিয়া কৃষ্ণকান্ত কলাপ আর মুগ্ধবোধ বাহির করিয়া রৌদ্রে দিলেন।

ভূতনাথ বই দু'খানাকে চিনিত—

তাহাদিগকে উঠানের রৌদ্রে পিঁড়ির উপর স্থাপিত দেখিয়া সে আর যাহাই হউক খুসী হইল না।—

......বই দু'খানির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ভূতনাথ ফস্ করিয়া যে কথাটি বলিয়া ফেলিল, তার মান কেহ রাখিল না।......

কথাটা কানে যাইবার পর কৃষ্ণকান্ত বক্র দৃষ্টিতে একবার ভূতনাথের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন—

ভূতনাথ সরিয়া গেলেই গৃহিণীকে গল্পটা শুনাইয়া দিবেন।...

এবং সে অবসর তখনই মিলিল।......

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন,—তোমার ছেলের বুদ্ধি শেষ পর্য্যন্ত বলদ দিয়ে টানাতে হবে দেখ্‌ছি—ঠিক্ সেই রকম।—বলিয়া গম্ভীর হইয়া গেলেন।

মাতঙ্গিনী বলিলেন,—কি রকম?

—এক ছোঁড়াকে পাঠিয়েছে—

—কে?

—কোনো গেরস্ত। একটা গল্প বল্‌ছি। পাঠিয়েছে দোকানে এক পয়সার বাতাসা আন্‌তে। দোকানী দিলে; ছোঁড়া গুণে বল্‌লে,—মোটে পাঁচখানা?—দোকানী ক্ষেপে' উঠে' বল্‌লে,—পাঁচখানা নয় ত' কি পঁচিশখানা দেবে? ঘিয়ের দর জানিস্ আজকাল?... ছোঁড়া লজ্জা পেয়ে চলে' এল।......বাড়ীতে বল্‌লে,—

কিরে, মোটে পাঁচখানা বাতাসা এনেছিস্ এক পয়সায়? ছোঁড়া বল্‌লে,—তাই দিলে, মা। বল্‌লুম, তা' দোকানী তেড়ে' উঠ্‌ল'; বল্‌লে,—ঘিয়ের দর জানিস্ আজকাল? ...শুনে গিন্নির হাত গালে উঠে' গেল; অবাক্ হ'য়ে বল্‌লেন,—কি বজ্জাত্ দোকানী গো! ঘিয়ের দর বেড়েছে তাতে বাতাসার কি!...বলিয়া তুমুলশব্দে খানিকটা হাসিয়া লইয়া কৃষ্ণকান্ত বলিলেন—তোমার ভূতোর বুদ্ধি সেই ছোঁড়ার মত, কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ-জ্ঞান একবারে নেই।

কিন্তু মাতঙ্গিনী হাসিতে পারিলেন না—

পুত্রের অজ্ঞানতার উদ্দেশে স্বামীর এই বিদ্রূপে বিমর্ষ হইয়া কহিলেন,—কি, করেছে কি?

—বল্‌ছে, পড়্‌ব কব্‌রেজী, তাতে ব্যাকরণের কি দরকার?

কৃষ্ণকান্ত না হাসিয়া বলিলেন,—আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র গোটা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত...ব্যাকরণের পর সাহিত্য, কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায় প্রভৃতি; তারপর শাস্ত্র—

ভূতনাথ মনে মনে বলিল,—কচু।

কৃষ্ণকান্ত অন্তর্যামী নন্—ভূতনাথের কচুর কথাটা টের পাইলেন না; বলিতে লাগিলেন,—কাজেই সংস্কৃত হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে হ'লে ব্যাকরণের ব্যুৎপত্তি হওয়া আগে দরকার। ইত্যাদি।

দরকারী কথার কত ভাগের কত ভাগ কানে গেল তাহা ভূতনাথ নিজেই জানিত পারিল না।—ঘাড় গুঁজিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কৃষ্ণকান্তের মুখের শব্দ বন্ধ হইতেই সেদিক্‌কার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে মনে করিয়া সে আপন কাজে গেল।... . ...

কিন্তু ভূতনাথ মাঝে মাঝে মায়ের কাছে নালিশ করে,—এ-গাছের পাতা, ও-গাছের মূল, এ-টার ছাল, ও-টার কুঁড়ি, এই নিয়ে ত' কবরেজের কারবার; তা' কর্‌তে মুগ্ধবোধ পড়ে' কি হবে? বলিতে বলতে অত্যন্ত মানসিক শ্রান্তির লক্ষণগুলি তার সর্ব্বশরীরে প্রকাশ পায়—

মাতঙ্গিনী বলেন,—আমি ত' কিছু জানিনে রে।...

যাহা হউক, শাস্ত্রাধ্যয়নের উপক্রমণিকা অনাসক্ত গয়ংগচ্ছভাবে চলিতে লাগিল;—এবং পবিত্র শাস্ত্র-সৌধের প্রথম সোপানে দাঁড়াইয়া সে জীবনের এমন একটা দরকারী কাজ শেষ করিয়া আনিল যাহার ফল প্রতিফল দুটোই নিরেট।...দুস্তর কলাপের প্রস্তর চর্ব্বণের চাইতে তা' ঢের সংক্ষিপ্ত ও সরস;—

উদ্দেশ্যও উচ্চদরের—

শুধু সনাতন শাস্ত্রীয় প্রথার নরকনিবারক পুত্রলাভ।... ভূতনাথ বিবাহ করিল; তখন তাহার বয়স সতর' বৎসর কয়েকমাস মাত্র—

স্ত্রী মণিমালিকা ন' বছরের—

পণ সর্ব্বসাকুল্যে সাতশত টাকা মাত্র।

কলাপের সঙ্গে পাত্রের নিষ্ঠাহীন আলাপচারীতে পরের ঘরের অতগুলি টাকা আদায় হয় না......

বিবাহের পূর্ব্বে কৃষ্ণকান্ত কিঞ্চিৎ বিষয়বুদ্ধির আশ্রয় লইলেন......বৈবাহিক মহলে প্রচার করিয়া দিলেন, ভূতনাথ কলিকাতার বিখ্যাত প্রবীণ কবিরাজ শ্রী গোলক কৃষ্ণ দত্তগুপ্ত মহাশয়ের প্রিয়তম ছাত্র......ব্যাকরণ ও সাহিত্য প্রভৃতি সমাপ্ত করিয়া মূলশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে।......আরো বলিলেন,—দু'তিনটা পাশকরা ছেলের মূল্য এখন মাসিক বিশ বাইশ টাকার অধিক নয়; আয়ুর্ব্বেদের দিকে দেশের নাড়ীর টান যথার্থই ফিরিয়াছে; সুতরাং পশার দাঁড়াইয়া যাইতে বিলম্ব হইবে না; দু'তিন বছরেই—ইত্যাদি।......

তাই সাতশত টাকা পণ।

কৃষ্ণকান্ত নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভূতনাথকে দিয়া

ঔষধ প্রস্তুত করান—তৈল, ঘৃত, রসায়ন, অরিষ্ট, আসব ......বিবিধ রোগাধিকারের শাস্ত্রোক্ত বিবিধ ঔষধ। কৃষ্ণকান্ত কাছে-কিনারায় যখন রোগী দেখিতে যান তখন ভূতনাথকে সঙ্গে লইয়া যান।......পথে আসিতে আসিতে বুঝাইয়া দেন—রোগলক্ষণ; কোন্ রসাধিক্য কোন্ রোগের হেতু, কি ভাবে তার বিস্তৃতি ও নিবৃত্তি। .....পিত্ত শ্লেষ্মা বায়ুর কোন্‌টা কুপিত হইয়া এই রোগীর রোগ কি ভাবে জটিল করিয়া তুলিয়াছে।...... এমনি সব ভূয়োদর্শনের কথা।—

ভূতনাথ গাছ গাছ্‌ড়া ফল মূল কিছু কিছু চিনিয়াছে; তাহাদের গুণাবলী ও প্রয়োগ বৈচিত্র্যের সঙ্গেও কিছু কিছু পরিচয় ঘটিতেছে।......

ভূতনাথের ছোট ভাই দেবনাথ ঘরে ঢুকিয়া বলে,—তুমি বৌদি না ছাই। বলিয়া বুড়ো আঙুল দেখায়।

মণি কথা কহে না।

দেবনাথ বলে,—বললুম, দু'টো আম ছাড়াও নুন লঙ্কা মেখে খাই; তখন কথাই কওয়া হ'ল না। এখন দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছে আর সোয়াগের হাসি হ'চ্ছে। এই বয়েসেই শিখেছ ঢের!—

মণির কিন্তু মনেও আসে না যে, এই বয়সেই দেবনাথ ও শিখিয়াছে ঢের।... ..

—বেশ, বেশ, চলো দিচ্ছেগে। বলিয়া মণি লাফাইয়া ওঠে।

মণি ছোট্টটি—

স্বামীর সঙ্গে তার ভাব হইয়াছে।

ভূতনাথ মণিকে রাগায়, কাঁদায়, আবার খিল্ খিল্ করিয়া হাসায়ও।......মাঝে মাঝে মণি যখন বাপের বাড়ীর কথা ভাবিয়া মুখ ভার করিয়া থাকে তখন তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া সদুপদেশও দেয়; বলে,—এই তোমার আপন বাড়ী—

কিন্তু অবুঝ মণি হঠাৎ অতটা উদার হইয়া উঠিতে পারে না; বলে,—ধেৎ। এত তোমাদের বাড়ী। আমাদের বাড়ী—

ভূতনাথ বলে,—তা' বটে। কিন্তু তুমি যখন বড় হবে তখন বুঝ্‌বে, সে-বাড়ী তোমার দাদা বৌদির, এই বাড়ীই তোমার; তারপর ছেলেপিলে হ'লে—

মণি এবার লজ্জা পাইয়া হাসে... ..

বলে,—ধেৎ।

মণির দুবারকার দুটি ভৎসনায় কত তফাৎ ভূতনাথ তা' বোঝে—

খুসী হইয়া উঠিয়া যায়।

মণির জ্বর হইল—

উজ্জ্বল মণি ম্লান হইয়া গেল।......

কৃষ্ণকান্ত নাড়ী দেখিয়া বড়ি দিলেন; তাহাতে জ্বর ছাড়িল বটে, কিন্তু প্রাণরক্ষা হইল না......

শেষরাত্রি হইতে হঠাৎ ভেদ আরম্ভ হইয়া বেলা দু'টার সময় মণির নাড়ী ছাড়িয়া গেল।.........সীঁথাভরা সিঁদুর লইয়া, লালপেড়ে সাড়ী পরিয়া, আল্‌তায় পা রঞ্জিত করিয়া খেলার পুতুল একরত্তি মণি কাঠের আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।—

মাতঙ্গিনী চোখের জল মুছিয়া স্বামীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন,—হ্যাঁ গা, এক ফোঁটা ওষুধও ত' দিলে না......

কৃষ্ণকান্ত বড় বিজ্ঞ; তাই গৃহিণীর দিকে চাহিয়া ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন,—দিলেও ফল হ'ত না, বুঝেই দিইনি। যম যে ব্যাধি পাঠায় তাকে আমরা দেখেই চিনি।—

আয়ুর্ব্বেদের এই চরম দিব্য দৃষ্টির বিষয় মাতঙ্গিনী কৃষ্ণকান্তের এত দিনের স্ত্রী হইয়াও বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না।......চোখে আঁচল দিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

মণির স্মৃতি মুছিবার নয়……

এখনো যেন সে মাটিতে আঁচল লুটাইয়া উঠানময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে……

'মা মা' বলিয়া আপন পেটের মেয়েটির মত অনুক্ষণ সে পায় পায় ঘুরিত।……সে যে ছেলেমানুষ ইহা কেমন করিয়া ভুলিয়া যাইয়া তিনি মণির কাজের ভুল ধরিয়া ধমক দিতেন……মণির মুখখানি বিষণ্ণ হইয়া উঠিত……এই ম্লান এই উজ্জ্বল……পরক্ষণেই সে 'মা' বলিয়া ঘেসিয়া আসিত……

মাতঙ্গিনীর বুক ফাট্ ফাট্ করে।—

ভূতনাথও কাঁদিল বিস্তর; কলাপ কিছুদিন রোগীর প্রলাপের মত অসহ্য হইয়া রহিল।……

সংসারে শোকতাপ আছেই-

আবার "ভগবদেচ্ছায়" মানুষ শোকতাপ ভুলিতেও পারে।……দিন দিন দূরত্ব বাড়িতে বাড়িতে মণির শোক কৃষ্ণকান্তের "ভগবদেচ্ছায়" গৃহ হইতে একেবারে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। ……

ভূতনাথ পুনরায় কলাপে মন দিল।—

কৃষ্ণকান্ত ভূতনাথের পুনরায় বিবাহ দিলেন। বলিলেন,—স্বয়ং শিব দু'বার বিবাহ করিয়াছিলেন…… কিন্তু অশৌচমুক্তির পর অষ্টাহের মধ্যে শিবের পাত্রী স্থির হইয়া গিয়াছিল কি না তাহা তিনি উল্লেখ করিলেন না।—

এবার পণ, পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা……কিছু লোকসান গেল।

মণি মরিয়া পাত্রহিসাবে ভূতনাথের জীবনে খাদ মিশাইয়া দিয়া গেছে, বৈবাহিক মূল্যের কিছু লাঘব হইয়াছে; তাই কৃষ্ণকান্তের দুইশত টাকা—

কিন্তু বৌটি এবার আরো ভালো……

চমৎকার একটা সুহসিত প্রসন্ন লক্ষ্মীশ্রী অনুপমার মুখপদ্মে বিরাজ করিতেছে—

যেন "বালার্কসিন্দুরশোভিত" ঊষা;……সেইদিকে চাহিয়া মাতঙ্গিনীর চোখের পলক্ পড়িতে চাহে না…… অনুপমা শ্বশ্রূর দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসে।—

মাতঙ্গিনী ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া বধূর মুখের উপর একবার করিয়া চোখ বুলাইয়া লইয়া যান……যেন তাঁর চতুর্দ্দিকেই খর রৌদ্র……তার ঝাঁঝে চক্ষু পীড়িত হইয়া ওঠে……তাই বধূর রূপের শীতাঞ্জন তিনি বারম্বার চোখে মাখাইয়া লইয়া যান।

কিন্তু অদৃষ্টে তাঁর দুঃখ লেখা ছিল—

তাই একদিন আহ্লাদে গদ গদ হইয়া মাতঙ্গিনী মনের কথাটাই বধূকে বলিতে গেলেন; কিন্তু কথাটা সুস্পষ্ট না হওয়ায় ফল উল্টা দাঁড়াইয়া গেল। ……

বৌমার খাস্‌কামরায় যাইয়া মাতঙ্গিনী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—বৌমা, তোমার আর বাপের বাড়ী যাওয়া হবে না বাপু।

—অর্থাৎ তোমার ঐ মুখখানাকে আর চোখের আড়াল করছিনে……

কিন্তু বৌমা অন্তর্য্যামিনী নয়।—

শাশুড়ীর অভিলাষ শুনিয়া অনুপমা তার অনুপম চক্ষু দু'টি তুলিয়া সোজা মাতঙ্গিনীর দিকে চাহিল, এবং মাতঙ্গিনীর আশা আকাঙ্ক্ষা আহ্লাদ ঘূর্ণী বায়ুর মত আবর্ত্তিত হইতে হইতে কোথায় মিলাইয়া গেল, তার চিহ্নও রহিল না।……সে দৃষ্টির অর্থ যে কি… ..প্রাণভরা কিন্তু অপ্রকাশিত আশার পরেই এ যে কত কঠিন নিরাশ্বাস ……উগ্র মনের কতখানি উত্তাপ যে ঐ মুখখানির স্নিগ্ধ আবরণ ছাপাইয়া নিষ্পলক দৃষ্টির পথ ধরিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে……তাহা শুধু অনুভব করে মানুষের অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ প্রাণপুত্তলী।—

মাতঙ্গিনীর প্রাণ বধূর সেই দৃষ্টির অগ্নিবর্ষণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল··

মাতঙ্গিনী সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিলেন,—কিছু মনে া না, মা; তোমার মুখখানি—

কথা কয়টি উচ্চারিত হইয়াই অশ্রু-বেদনায় তাঁর কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া গেল

একান্ত আপনার জ্ঞানে নূতন বধূর প্রতি এই তাঁর প্রথম অসঙ্কোচ মুক্তপ্রাণ সম্ভাষণ।

বুকভরা সোহাগের আরো কত কথা বলিবার ছিল—পাষাণী তাহা বলিতে দিল না।

মাতঙ্গিনীর মনে হইল, আশাভঙ্গের এই ব্যথাটা তিনি জন্মান্তরেও ভুলিতে পারিবেন না।......কিন্তু ভুলিলেন; এবং ভুলিতে তাঁহাকে জন্মান্তরে পৌছিতে হইল না।······ দিন তিনেকের মধ্যে তাঁর মাতৃহৃদয় অজ্ঞান সন্তানের সুকঠিন অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাহাকে পুনরায় তার উদার অঙ্গনে বরণ করিয়া লইল

ভূতনাথ কলাপ সমাধা করিয়া এখন মুগ্ধবোধ আরম্ভ করিয়াছে।···পিত্ত বায়ু কফ—ইহাদের কোন্‌টার প্রাবল্য কোন্ নাড়ীতে প্রকট হয় পিতার উপদেশে তাহাও যেন সে অল্প অল্প হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে।—

কিন্তু অনুপমা নাক সিট্‌কায়—

বলে,—কব্‌রেজী পড়ে' কি হবে শুনি?

ভূতনাথ বলে,—কব্‌রেজী ত' আজকাল বেশ মানের কাজ হয়েছে। পয়সাও—

—তা' জানি। ক'ল্‌কেতায় গিয়ে বস্‌তে' পারবে?

ভূতনাথ যেন অপ্রস্তুতে পড়ে, বলে—দেশেও ত' বেশ পয়সা আছে।

—আমাদের সেই বনমালী কবরেজের মত কব্‌রেজ হবে তু? তার ত নেংটি ঘোচে না। আমরা তাকে বলি বোক্‌রেজ মশায়।—বলিয়া অনুপমা খিল্ খিল্ করিয়া হাসে।

ভূতনাথ মর্ম্মাহত হয়—

কবিরাজীকে সে নিজেও বড় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না; জঙ্গল কাটা আর শুক্‌নো কাঁচা জঞ্জাল জড়ো করা কবিরাজী যে হালফ্যাসনের খুব বড় একটা গর্ব্বের জিনিষ ইহাও সে মনে করে না; তবু কবিরাজই সে হইবে······অদৃষ্টের লিখন তাই—

তাই নিজের স্ত্রীর মুখে সেই কবিরাজীর প্রতিই অপার অবজ্ঞার কথা শুনিয়া সে সত্যকার ক্লেশই পায়।

কিন্তু অনুপমা মণি নয়—

অনুপমাকে ধমক্ দিলে ধমকের প্রতিধ্বনি যাহা সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিবে তাহা মূলধ্বনিকে বহু নিম্নে রাখিয়াই আসিবে তাহা সে বেশ জানে।······

অনুপমা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া থাকে; ভূতনাথ চলিয়া আসিতে পা তোলে।···অনুপমা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে,—তোমার নাম রেখেছিল কে?

—বাবা রেখেছিলেন।

—নামের মানে ত মহাদেব, নয়? বলিয়া অনুপমা হাসিয়া আকুল হইয়া যায়।······

সম্মুখে হাসির মুক্তধারা—

উদ্ভিন্ন নিটোল যৌবন—

মুক্তামালার মত দন্তপাঁতি—

আরক্ত গণ্ডতট—

ফুল্ল অধরপুট......

কিন্তু ভূতনাথ ঘামিয়া অস্থির হইয়া ওঠে।···

ঠিক্ সে ধরিতে পারে না, কিন্তু তাহার মনের দুয়ারে কেমন একটা দুঃসংবাদ আসিয়া পৌছায়···অন্তরের অতি সুকোমল স্থানে সুতীক্ষ্ণ কাঁটার মত একটা ব্যথা ফোটে··· কাহার প্রচ্ছন্ন কায়ার নিষ্ঠুর একটা কালো ছায়া বুক জুড়িয়া পড়ে...চারিদিক্ অশ্রু-কলঙ্কে মলিন হইয়া ওঠে···

ভূতনাথ উঠিয়া পড়ে; বলে,—আসি এখন।

অনুপমা বলে,—দন্তচূর্ণ পাকে চড়িয়ে এসেছ বুঝি? তা' এস।

মাতঙ্গিনী ছেলের কাতর মুখ দেখেন—

তাঁর সর্ব্বজ্ঞ মাতৃহৃদয়ের কাছে ভিতরের অনন্ত দুঃখের বার্ত্তাটি ষোলো আনাই আসে...

মনটি তাঁর লুটাইয়া লুটাইয়া ভগবানের পা ধরিতে ছোটে।......

কৃষ্ণকান্ত একদিন প্রকাণ্ড এক টাকার তোড়া সিন্ধুকে তুলিয়া মাতঙ্গিনীকে ডাকিয়া বলিলেন,—বৌমাকে বিশেষ যত্ন-আত্তি করো। ওঁর লক্ষ্মীর অংশ প্রবল।

মাতঙ্গিনী টাকার তোড়াটা দেখেন নাই; হঠাৎ কথাটা বুঝিতে না পারিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন,—এবার পাটে দু'হাজার টাকা মুনোফা হয়েছে।......তাঁর তখনকার তৃপ্তিটুকু উপভোগের জিনিষ।—

দেবনাথ সেখানে উপস্থিত ছিল, মাতঙ্গিনী কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সে বলিয়া উঠিল,—মণি-বৌই ছিল ভাল, এ একটা কি এনেছ দাদাকে বিয়ে দিয়ে! ভুরু তুলেই আছে! দেমা—

কৃষ্ণকান্তের হাতের এক চড় খাইয়া দেবনাথের অনধিকার চর্চ্চা বন্ধ হইয়া গেল।

পুত্রবধূতে লক্ষ্মীর অংশ প্রবল হইলেও কৃষ্ণকান্তর মুনাফার টাকা পর বৎসরই ঐ পাটের টানেই বাহির হইয়া গেল।...

অনুপমার জ্বর হইয়াছে—

জ্বর অল্পই......

কিন্তু অনুপমা লাথি ছুঁড়িয়া, কিল ছুড়িয়া, কাঁদিয়া, বায়না লইয়া, বাটী আছড়াইয়া, ঔষধ পথ্য ফেলিয়া দিয়া এমন কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল যেন লজ্জা সরম আর সহিষ্ণুতা বলিয়া সংসারে কোনো জিনিষই নাই।......তাহার কাছে ধমক্ না খাইল এমন লোক নাই......মাতঙ্গিনী পথ্য দিতে আসিয়া অকথ্য অপমানিত হইয়া গেলেন...ভূতনাথ চড় খাইতে খাইতে বাঁচিয়া গেল......দেবনাথের দিকে ত সে পা-ই তুলিল।—

যাহা হউক, বহু তাণ্ডব কাণ্ড দেখাইয়া জ্বর ছাড়িয়াছে, অনুপমা অন্নপথ্য করিয়াছে, কিন্তু সেইদিনই ভোররাত্রে ভেদ আরম্ভ হইয়া বিকাল নাগাদ্ তার ধাত্ বসিয়া গেল...অনুপমা মণিমালিকার অনুগমন করিল।

মণি মরিয়াছিল, বৈশাখের কাঁচা আম খাইয়া; অনুপমা মরিল, অজীর্ণরোগের উপর জিদ্‌বশে অতিরিক্ত গুরুপাক দ্রব্য উদরস্থ করিয়া।...মাতঙ্গিনী কাঁদিলেন, ভূতনাথ কাঁদিল, দেবনাথও কাঁদিল; কৃষ্ণকান্ত প্রতিবেশীগণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বারম্বার চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া শোকচিহ্ন গোপন করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—বড় জেদী এক-গুঁয়ে মেয়ে ছিল, ভাই......

ভূতনাথ নূতনতর একটা আঘাত পাইল, মণির মৃত্যুতে যাহা সে পায় নাই।

মণি তার যৌবনের সহচরী হইয়া ওঠে নাই...সে ছিল খেলার সামগ্রী, স্নেহের জিনিষ, মিষ্ট দৌরাত্ম্যের পাত্রী।—

অনুপমার নিরুপম রূপ-দীপালির চতুর্দ্দিকে যৌবনের যে রাস-আয়োজন দিন দিন অপর্য্যাপ্ত নিবিড় হইয়া উঠিতেছিল, তাহারই আবেদন তাহার বুকে রক্তে ভুনিব'র জাগরণ আনিয়া দিয়া গেছে।...অনুপমার সমস্ত অকারণ নির্ম্মমতা অতৃপ্ত তৃষ্ণার খরতাপে বাষ্প হইয়া দেখিতে দেখিতে ভূতনাথের মনোরাজ্য হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইত...চক্ষুর সম্মুখে জ্বলিতে থাকিত তার দেহখানা—ইন্দ্রজালের আলোকোৎসবের মত রূপ, আর চির-বিলসিত বসন্তের কুসুমোৎসবের মত যৌবন...তাহাদের অভাবে

ভূতনাথের ভূত ভবিষ্যত আর বর্ত্তমানের দিগন্ত পর্য্যন্ত একেবারে রুক্ষ শুষ্ক কর্কশ হইয়া গেছে।......

ভূতনাথের কলাপ মুগ্ধবোধ এবং পরবর্ত্তী অন্যান্য গ্রন্থ তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া আল্‌মারীতে যাইয়া উঠিয়াছে।...এখন সে পূরাপূরি একজন কবিরাজ।—

কিন্তু বিবাহে তার আর ইচ্ছা নাই।—

কৃষ্ণকান্ত পুত্রের আচরণে দিন দিন অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছেন; এই ভাবে আর কিছুদিন চলিলেই সংসারের উপর তাঁহার আর কিছুমাত্র মার্জ্জনার ভাব থাকিবে না—এ ভয়ও তিনি স্পষ্টই দেখাইয়া বেড়াইতেছেন।...

...স্ত্রীই হইয়াছে আজকালকার লোকের যেন মহাগুরুর সেরা; একটির নিপাতেই সে-সম্পর্কে আর কাহাকেও যেন গ্রহণ করা যাইতে পারে না।...

আগেকার টা?—সেটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়।

...চলাচলম্ ইদং সর্ব্বম্—মরিবে ত' সবাই, দু'দিন আগে দু'দিন পরে।...মূর্খ আর বলে কাকে!...স্ত্রী মারা গেলে তার ধ্যানেই যাবজ্জীবন কাটাইয়া দিতে হইবে—ইহা কোন্ শাস্ত্রের কথা!...এই সৌখীন সন্ন্যাসের ভাণ আধুনিকতার ফল, যেমন ব্যাপক তেম্‌নি অসহ্য।...মানুষ মরে বলিয়াই ত' পৃথিবীতে মানুষের স্থান হয়; নতুবা এতদিন মানুষকে দলে দলে যাইয়া সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইত!......

কিন্তু ভূতনাথ একেবারে নিস্পৃহ।

ধিক্কারে ভর্ৎসনায়, অভিযোগে, অনুযোগে, দোহাইয়ে, আজ্ঞায়, অনুনয়ে কৃষ্ণকান্ত ভূতনাথকে ঘন ঘন নাস্তানাবুদ করিয়া ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন।—

প্রত্যুত্তরে ভূতনাথ বলে,—বাবা, আমায় মার্জ্জনা করুন; বিবাহে আমার আর রুচি নেই; বরং দেবনাথকে ধরুন; সেই সকল বিষয়ে আপনাদের সাধ আশা পূর্ণ করবে।...

কৃষ্ণকান্তকে এ-সব কথা বলা বাহুল্য; কাহার দ্বারা তাঁহাদের সাধ আশা পূর্ণ হইবে তাহা তিনি পরিষ্কার জানেন।...তবে কথা এই যে, ভূতনাথকে ছাড়িয়া দিয়া দেবনাথকে ধরিতে তাঁর আপাততঃ তেমন আগ্রহ নাই—নানা কারণে।......দেবনাথের বিবাহের পরই ভূতনাথের বিবাহোদ্যম এ-ক্ষেত্রে সুস্পষ্টতঃ দৃষ্টিকটু না হইলেও, ভূতনাথই অবশেষে আপত্তির এই অতিরিক্ত কারণটা দেখাইয়া যখন তখন বিরুদ্ধ দিকে জোর করিতে পারিবে।...

তারপর, এই কারণেই, পাত্রের বয়স খুবই অল্প হইলেও, কন্যার দিক হইতে বয়স সম্বন্ধেই সন্দেহের একটা কথা উঠিতে পারে।...দুইটি স্ত্রী মারা গিয়াছে, তারপর কনিষ্ঠের বিবাহ হইয়া গেছে, তারপর জ্যেষ্ঠের জন্য এই উদ্যোগ...বয়স বেশী না হইয়াই যায় না; এই সূত্র ধরিয়া পণকে আরো খাটো করিবার জন্য একটা টানাটানি চলিতে পারিবে।...

সুতরাং কৃষ্ণকান্ত প্রকাশ্যে বলিলেন,—জ্যেষ্ঠ অকৃতদার অর্থাৎ বিপত্নীক অবস্থায় থাকতে কনিষ্ঠের বিবাহ সংস্কার শাস্ত্র এবং লোকাচার দুইয়েরই বিরোধী প্রচণ্ড অকল্যাণকর একটা ব্যাপার।—

তারপর বলিলেন,—এ ত' নির্ব্বোধেও জানে।

দ্বিতীয়তঃ ভূতনাথের গর্ভধারিণীর স্বাস্থ্য আজকাল ক্রমশঃই যেরূপ দ্রুতবেগে খারাপের দিকে যাইতেছে, তাহাতে তাঁহাকে এই বেলা একটা সহকারী না দিলে তাঁর মৃত্যু ঘটিতেও পারে।...

তৃতীয়তঃ শ্মশানবৈরাগ্য যৌবনের অপরিহার্য্য একটা ধর্ম্ম হইলেও, সেইটাকেই জীবনে স্থায়ী করিয়া লইয়া প্রাণ-পণে তাহাকে পালন করিয়া যাইতে হইবে এ-ব্যবস্থা গো-মূর্খেও দিবে না।...

চতুর্থতঃ,—যাক্, উহারাই কি যথেষ্ট নহে?—

মাতঙ্গিনী কিছু বলেন না

যম তাঁহাকে দু' দু'বার দাগা দিয়াছে—

তাঁর বধূ-জীবন আর মাতৃ-জীবনের চির-লালিত আকাঙ্খাটি সেই নিষ্ঠুর উপ্‌ড়াইয়া লইয়া পায়ে দলিয়া দিয়াছে…সেই বিবর্ণ অকালে হৃদয়চ্যুত প্রিয়তম বস্তুটির দিকে চাহিয়া তাঁহার বুক কাঁপে।…নিজের ক্লেশ ভুলিয়া তিনি পুত্রের কথাই ভাবেন…সে বুঝি অসুখী হইবে!…

সেদিকে নিস্তার পাইয়াও ভূতনাথ পিতৃদেবের অবিশ্রান্ত তাড়নায় মরিয়া হইয়াই একদিন বলিয়া দিল,—যা' ইচ্ছে করুন…

বলিয়া সে বোধ হয় কাঁদিতেই উঠিয়া গেল।

উল্লাসের বিস্তৃত হাসিতে কৃষ্ণকান্তের মুখমণ্ডল ভরিয়া

পণ ও পাত্রী ঠিকই ছিল—

দু' দশদিন অগ্রপশ্চাৎ কৃষ্ণকান্ত দু'টিকেই ঘরে তুলিলেন।…

পণ আটশত টাকা।

ভূতনাথের বৈবাহিক জীবনে আরো খানিকটা খাদ মিশিলেও, পাত্রীর রং ময়লা বলিয়া খাদের কথা ও-পক্ষকে কৃষ্ণকান্ত বিন্দুমাত্রও তুলিতে দিলেন না।—

বীণাপাণির রং সুবিধার নয়, কালোই। সুবিধার মধ্যে তার চক্ষু দু'টি আর ভ্রূযুগল; ভুরু দু'টি টানা টানা; চক্ষু দু'টি আবেশে ভরা।—

মাতঙ্গিনীর নিজের সুখ দুঃখ কোনোদিনই তাঁর অন্তরের একান্ত নিজস্ব জিনিষ হইয়া উঠিতে পারে নাই,… জলের উপর পদ্মপত্র যেমন ভাসে তেম্‌নি করিয়া মাতঙ্গিনীর সর্ব্বান্তঃকরণ সংসার-পাথারের বুকের উপর ভাসিয়া বেড়ায়…পাথারে ঘা লাগিলেই তাঁর বুক দুলিয়া উঠে।—

মাতঙ্গিনী চোখে জল আসিতে দিলেন না—

স্বামী তৃপ্ত হইবেন,

পুত্র প্রীত হইবে,

অম্লানবদনে তাই তিনি বীণাপাণিকে তেম্‌নি সোহাগে বরণ করিয়া লইলেন; এবং তাঁহারই হৃদয়ের গাঢ় রসে নববধূ নূতন ভূমিতে পল্লবিত হইয়া উঠিতে লাগিল।…

কৃষ্ণকান্ত বলেন,—বৌ কেমন হয়েছে গো?

মাতঙ্গিনী বলেন,—লক্ষ্মীটি।

কৃষ্ণকান্তের মনে পড়ে—বিগত দু'টির সম্পর্কেও মাতঙ্গিনী ধনধান্যদায়িনী ঐ দেবীটিরই নামোল্লেখ করিয়াছিলেন।…একটা গল্প তাঁর মনে পড়িয়া যায়—

কোথাকার এক তাঁতি…

কিন্তু গল্পটি তাঁর বলা হয় না……মাতঙ্গিনীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসের ছোট্ট একটি অস্ফুট শব্দ তাঁর কানে আসে।—

দেবনাথ বলে,—এই বৌদিই আসল বৌদি। আগের দুটো ভালো ছিল না।…একটু থামিয়া আবার বলে,—প্রথমটা ছিল নেহাৎ ছোট, গরজ বুঝত না। তারপরেরটা ছিল বদ্‌মেজাজী। এইটে বেশ…

মাতঙ্গিনীর প্রাণ ছাঁৎ করিয়া ওঠে; বলেন,—বেশ কিসে রে?

—কথায় বার্ত্তায় আলাপে আদরে বেশ।

শুনিয়া, প্রখর মধ্যাহ্নের উপর মেঘের চঞ্চল ছায়ার মত, মাতঙ্গিনীর বুকের ভিতর দিয়া কিসের একটা সুখকর সুশীতল মৃদুস্পর্শ ভাসিয়া যায়।…কিন্তু পরক্ষণেই তিনি চম্‌কিয়া ওঠেন।…সারাজীবন ভরিয়া শুধু মানুষকে আপন করিয়া তুলিয়া তিনি দিনান্তের বহু পূর্ব্বেই তাহাকে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছেন…তবু আপন করিয়া লইবার মহালোলুপতা তাঁর আজিও তেম্‌নি জাগ্রত…মাতৃ-হৃদয়ের সে-ক্ষুধা যম হরণ করিতে পারে নাই।…প্রাণপণে সেই ক্ষুধাটিকে দমন করিবার চেষ্টা তাঁর আসিয়াছে।…কিন্তু এ যে কথায় বার্ত্তায় আলাপে আদরে বেশ!—

ভূতনাথ মণিকে হাত ধরিয়া টানিয়া কাছে লইত—
তার ঘোম্‌টা লইয়া কাড়াকাড়ি করিত—
কত খেলা, কত আমোদ, কত কৌতুক।…

অনুপমাকে সে লুকাইয়া দেখিত, হঠাৎ দেখা দিত; নিজেকে সহস্র চতুর অভাবনীয় উপায়ে তৃপ্ত করিবার লালসায় সে ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়াইত।…

কিন্তু বীণাপাণির কাছে সে আসে শান্ত হৃদয়ে…ঝড়ের পর ঢেউ আপ্‌নি থামিয়া স্রোতের অন্তর ব্যাপিয়া শুধু একটা নিঃশব্দ ক্ষিপ্রতা রহিয়াছে।—

বীণাপাণি জানে, স্বামী পূর্ব্বে দু'বার বিবাহ করিয়াছিলেন; স্ত্রী দু'টিই সুন্দরী ছিল।—

সে কালো।—

মাতঙ্গিনী দুরু দুরু বুকে ভাবেন, ছেলে অসুখী না হয়।

তাঁর মনের দুশ্চিন্তা মনেই পরিপাক পাইতে পাইতে সহসা এক সময় দুঃসহ হইয়া শুধু একটি প্রশ্নেই আত্মপ্রকাশ করিতে চায়।…বলেন,—সব জানো ত' বৌমা, আগেকার

বীণাপাণির বুঝিতে কিছুই বাকি থাকে না। বলে,—জানি, মা।…তারপর মনে মনে বলে, আমি যে কালো।—

মাতঙ্গিনী তার মনের কথা কি করিয়া টের পান বীণাপাণি তা' জানে না; তার মুখচুম্বন করিয়া বলেন,—মা আমার কালো; কিন্তু কালোতেই কেমন মানিয়েছে।

এটা সান্ত্বনার কথা—

শাশুড়ীর এই মমতাদ্র্র ছলনায় বীণাপাণি একটু হাসে; হাত বাড়াইয়া শ্বশ্রূর পায়ের ধূলা লইয়া বলে,—তুমি ভেবো না, মা…

মাতঙ্গিনী অবাক্‌ হইয়া যান্‌—

তাঁর লুকাইত উদ্বেগ কি করিয়া বধূর কাছে ধরা পড়িল।…

আশীর্ব্বাদ করেন,—জন্ম এয়োতি হও।

মণি শাশুড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত ঘুরিত—কতক ভয়ে, কতক কৌতুকে; মনের কথা সে বুঝিত না; কাজ পণ্ড করাই তার দস্তুর ছিল, দৈবাৎ উৎরাইয়া যাইত।… মাতঙ্গিনী বকিয়া ঝকিয়া পরক্ষণেই তাহাকে কোলের ভিতর টানিয়া লইতেন।…মণিকে তিনি আপন পেটের অবোধ সন্তানের মত ভালবাসিয়াছিলেন।—

…অনুপমা প্রকাশ্যে একেবারে কাগজে-কলমে পায়ে না ঠেলিলেও, আমল প্রায়ই দিত না।…দরদ বোঝা আর বুঝিয়া দেখা তার বড় ছিল না।…তবু মাতঙ্গিনী তাহাকে ভালবাসিয়াছিলেন—পুত্রের প্রিয়তমা বলিয়া।…অলক্ষ্যে থাকিয়াই তিনি বুঝিতে পারিতেন, বধূকে পাইয়া পুত্র একহিসাবে চরিতার্থ হইয়াছে।—

কিন্তু বীণাপাণি একেবারে অন্যরকম—

অতিশয় শান্ত, অথচ এমন তীক্ষ্ণধী যে মাতঙ্গিনীর বিস্ময়ের অন্ত থাকে না—কি করিয়া অতটুকু মেয়ে তাঁর মনের সুদূরতম প্রান্ত পর্য্যন্ত একেবারে যেন স্পষ্ট দেখিতে পায়!—

মাতঙ্গিনী পরের হাতের সেবা কখনো পান নাই। সেবা কি মধুর সামগ্রী সে স্বাদ তিনি বীণাপাণির হাতে প্রথম পাইলেন।

—অলক্ষ্যে থাকিয়াই মাতঙ্গিনীর সর্ব্বান্তঃকরণ অশেষ সুখের সঙ্গে অনুভব করে, পুত্রের মন বসিতেছে।…এ বসায় কলরব নাই, উদ্দামতা নাই, বিক্ষোভ নাই; জয় পরাজয়ের শঙ্কার নিঃশ্বাসে তাহা উত্তপ্ত নহে…এ বসা শুধু একটা রসঘন নির্ম্মল মধুরতার মাঝে নিষ্কম্প শান্ত আত্মসমর্পণ।—

ভূতনাথের পসার হইয়াছে—

কিন্তু সব জিনিষেরই "মূল্যাদি" অত্যধিক বাড়িয়া

দাওয়ায় সংসারের 'নাই নাই' রবটা যেন থামিয়াও থামে না।···

মাঝে মাঝে কৃষ্ণকান্তের নামে মণিঅর্ডারে টাকা আসে; কে পাঠায়, কেন পাঠায় কে জানে; কৃষ্ণকান্ত সাবধানে লুকাইয়া টাকাটি গ্রহণ করেন।

কিন্তু হঠাৎ একদিন কিছুই লুকান রহিল না।···

দূরের এক রোগীর লোক আসিয়া কৃষ্ণকান্তকেই চাহিয়া বসিল—তাঁহার পরিবর্ত্তে তরুণ কবিরাজ ভূতনাথকে সে কিছুতেই মঞ্জুর করিল না...রোগ বড় কঠিন।—

কৃষ্ণকান্ত অতীব অনিচ্ছার সহিত পাল্কীতে যাইয়া উঠিলেন; এবং তাঁহার পাল্কীও দৃষ্টির বহিভূত হইয়া গেল, মণিঅর্ডারও আসিয়া পড়িল।—

বীণাপাণির পিতা পাঠাইয়াছেন, দশটি টাকা—।

ভূতনাথের বুদ্ধি কলাপ অধ্যয়ন কালেই স্থূল ছিল; কিন্তু আজকাল অন্ততঃ বহিরাবরণ ছিন্ন করিবার মত ধারালো হইয়াছে।···টাকা দশটি পুরোভাগে রাখিয়া হুঁকায় দু'টি টান দিতেই সমগ্র ব্যাপারটি তাহার কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।···রঙের অপরাধে পুত্রবধূর পিতাকে মাসে মাসে জরিমানা দিতে হইতেছে।—

···এবং এই ব্যাপারের সুরুর সুদূর ইতিহাসটাও তার অজ্ঞাত রহিল না।······অপরাজিতাটিকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি পুনরায় গোলাপ আহরণ করিয়া আনিবেন যদি—

ঐ এক কথাতেই বিষম ভয় পাইয়া কালো মেয়ের বাপ ছেলের বাপকে সংযত রাখিতেছেন।······

আরো একটা নিদারুণ অতি ভয়ঙ্কর সন্দেহ ধীরে ধীরে ভূতনাথের মনে স্থিতিলাভ করিতেছিল।······কি হেতু অবলম্বন করিয়া এই অসহ্য সন্দেহের উদ্ভব তাহা তাহার নিজের কাছেই একটা দুরূহ হেঁয়ালির মত; অথচ সন্দেহটা যে আদৌ অমূলক নয় এ বিশ্বাসও অনিবার্য্য, যেন নিজেই তৈরী হইয়া উঠিয়াছে।···

কৃষ্ণকান্তের পাল্কী অনেক বেলায় উঠানে আসিয়া নামিল; এবং তিনি বিশ্রামের জন্য অন্দরে না যাইয়া হাঁসফাঁস্ করিতে করিতে বাহিরের ঘরে ঢুকিয়া এমন ভাবে থম্‌কিয়া গেলেন যেন চুরি করিতে আসিয়া অন্ধকারে একেবারে পাহারাওয়ালারই ঘাড়ে পড়িয়াছেন।—

ভূতনাথের কোলের কাছেই দশটি টাকা সাজান' রহিয়াছে, এবং তাহার শ্বশুরের নাম সম্বলিত কুপনখানাও রহিয়াছে···তাহারাই এই মন্ত্রৌষধির কাজ করিয়াছে।

ভূতনাথ টাকা দশটির দিকে চাহিয়া বলিল,—শ্বশুর আপনাকে দশটা টাকা পাঠিয়েছেন। কেন?

কৃষ্ণকান্ত সহসা প্রগল্‌ভ হইয়া উঠিলেন— তর্ তর্ করিয়া বলিয়া গেলেন,—তোমাকে বোধ হয় সাহায্য করেছেন। অতি অমায়িক সজ্জন তিনি। একখানা চিঠিতে একবার লিখেছিলাম তোমার কথা, যে শ্রীমানের বড় টানাটানি; তাই বুঝি তিনি মেয়ে জামাইকে—

বলিতে বলিতে কৃষ্ণকান্ত অমায়িক সজ্জন প্রেরিত টাকা দশটি তুলিয়া লইয়া পুত্রের সম্মুখ হইতে পালাইয়া যেন বাঁচিলেন।

কিন্তু মানুষের দুষ্কৃতি অত সুলভে নিষ্কৃতি পায় না—

ভূতনাথের পিতৃভক্তি যেন পিতাকেই পদে পদে তেম্‌নি সবেগে অনুসরণ করিয়া নিঃশেষ হইয়া বাহির হইয়া গেল।······তাঁহার উচ্চারিত মিথ্যা কথাগুলির বিনাশ কিন্তু অত সহজে ঘটিল না······তাদের ধ্বনি, আর প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনি জাগিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া দুর্ভাগ্য ভূতনাথের কর্ণ-বিবরে আবর্ত্তিত হইতেই লাগিল।

ভূতনাথের শ্বশুর আর টাকা পাঠান না; ভূতনাথ অভয় দিয়া নিষেধ করিয়া তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছে। সুযোগ পাইয়া, অর্থাৎ জামাতাকে নিজের তরফে পাইয়া, বলরাম বাবু কৃষ্ণকান্তকে স্পষ্টভাষায় ধাপ্পাবাজ, অর্থপিশাচ প্রভৃতি কুকথা না বলিলেও, পত্রে

যাহা বলিয়াছেন তাহা, লাঠি উল্টাইয়া ধরিলে কোঁৎকার মত, ঐ একই জিনিষ।—

কৃষ্ণকান্ত পুত্রের সঙ্গে বাক্যালাপ একপ্রকার বন্ধ করিয়াই দিয়াছেন।... জন্মদাতা পিতার অপেক্ষা কন্যা-দাতা পিতা সম্পর্কে হইল বড়—আর তারই স্বার্থ হইল বড়!... অমন ছেলের—ইত্যাদি।... অসহ্য হইয়া সংস্কৃত এক শ্লোকই তিনি আওড়াইয়া দিলেন—

মূর্খ পুত্রের জন্মদাতার যত কষ্ট সব সেই শ্লোকের অক্ষরে অক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে।—

বীণাপাণির জ্বর।

জ্বর অল্প; কিন্তু তাহাতেই মাতঙ্গিনীর বুকের ভিতর পৃথিবীর দুশ্চিন্তা দাবাগ্নির দাহ লইয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে ... আকুলিব্যাকুলি কেবলি মধুসূদনকে ডাকিয়া ডাকিয়া উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে তাঁর জিহ্বা শুকাইয়া অনড় কাঠ হইয়া গেছে।...

আর দুটি এম্‌নি করিয়াই মায়া কাটাইয়াছিল।

কিন্তু এবার মধুসূদন তাঁহার ডাকে বিচলিত হইয়া প্রাণরক্ষক দূত পাঠাইয়া দিলেন।

সন্ধ্যার পর বীণাপাণি একলাটি শুইয়া আছে; মাতঙ্গিনী এতক্ষণ তাহাকে কোলের কাছে করিয়া বসিয়াছিলেন; তাহাকে পথ্য দিয়া এই মাত্র উঠিয়া গেছেন।

—বৌমা, কেমন আছ? বলিয়া কৃষ্ণকান্ত আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বীণাপাণি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল,—ভালই আছি, বাবা।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন,—কিছু খেয়েছ?

—খেয়েছি।

—কখন?

—এখুনি খেলাম।

—তবে কিছুক্ষণ বাদে এই ওষুধটা খেয়ে ফেলো'।—বলিতে বলিতে কাপড়ের খুঁটের আড়াল হইতে খল বাহির করিলেন। বলিলেন,—জ্বর যদি আবার আসে তবে ছেলেমানুষ বড় কষ্ট পাবে; আগে থেকেই সাবধান হওয়া ভালো। এই খাটের পায়ার কাছেই রইল কাগজ ঢাকা; নিজেই উঠে খেয়ে ফেলো।

বীণাপাণি কহিল,—আচ্ছা।

ভূতনাথ কোথায় ছিল কে জানে—

কৃষ্ণকান্ত বাহির হইয়া যাইতেই সে শশব্যস্তে ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—বাবা এসেছিলেন দেখ্‌লাম। তিনি কি ওষুধ দিয়ে গেলেন?

বীণাপাণি বলিল,—হ্যাঁ। কেন?

স্বামীর কণ্ঠস্বরের অর্থটা সে বুঝিতে পারিল না।

—খাওনি ত'?

বীণাপাণি নিরতিশয় বিস্মিত হইয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল।... এ ব্যাকুলতার অর্থ কি?... বলিল,—না। কেন বল না?

—কোথায় সে ওষুধ?

—খাটের ঐ পায়ার কাছে ঢাকা রয়েছে দেখ।

ভূতনাথ ঔষধের খল লইয়া বাহির হইয়া গেল।

কৃষ্ণকান্ত কবিরাজ তাকিয়ায় ভর দিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় পরম তৃপ্তির সহিত চোখ বুজিয়া সট্‌কা টানিতে-ছিলেন—

কিন্তু এ-সুখ তাঁর অদৃষ্টে টিকিল না।...

মানুষের পায়ের শব্দে চোখ্ খুলিয়াই তিনি সাম্‌নে যেন ভূত দেখিলেন—এম্‌নি অপরিসীম ত্রাসে তাঁর সর্ব্ব-

শরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া মুখ দিয়া কেবল একটি অর্দ্ধোচ্চারিত স্বল্পজীবী আর্ত্তনাদ বাহির হইয়াই কণ্ঠ নিঃশব্দ হইয়া রহিল।...

ভূতনাথ সেদিকে দৃক্‌পাতও করিল না; একটু হাসিয়া বলিল,—এ বৌটার পরমায়ু আছে, তাই কলেরায় মরল' না, বাবা। পারেন ত' নিজেই খেয়ে ফেলুন।.....বলিয়া সে ঔষধসমেত হাতের খল আড়ষ্ট কৃষ্ণকান্তের সম্মুখে নামাইয়া দিল।

ক্রমবিকাশের ধারা

শ্রী অরবিন্দ ঘোষ

ক্রমবিকাশের কোন একটি বিশেষ পর্ব্ব যখন শেষ হইতে চলিয়াছে তখন দেখা যায় তাহার ভিতর হইতে যে সব জিনিষ চলিয়া যাইবেই, ঠিক সেই গুলিই নূতন বল সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃতির নিয়মই এই যে, মানুষের ব্যষ্টিগত বা গোষ্ঠীগত কোন গভীর সংস্কার বা তীব্র প্রেরণাকে তাড়াইতে হইলে, আগে সে জিনিষটি ভোগের দ্বারা নিস্তেজ করিয়া আনিতে হয়, তারপর নিগ্রহের দ্বারা বশীভূত করিতে হয়, এবং শেষে সংযমের দ্বারা অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান ও উদাসীনতার দ্বারা তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া দিতে হয়। নিগ্রহ ও সংযমের মধ্যে পার্থক্য আছে। নিগ্রহ যেখানে সেখানে যে প্রবৃত্তিটি নিগ্রহ করিবার চেষ্টা হয় তাহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই তোলা হয় না—তাই সেখানে থাকে দমন করিবার, চাপিয়া রাখিবার, এমন কি পিষিয়া মারিবার একটা উগ্র প্রয়াস। কিন্তু সংযমের পথে, প্রবৃত্তিটিকে মৃত বা মুমূর্ষু বলিয়াই দেখা যায়; মাঝে মাঝে সেটি ফিরিয়া আসে বটে, কিন্তু প্রথমে তাহাতে হয় ঘৃণা, তারপর একটা অস্বস্তি এবং পরিশেষে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য;—এককালে যাহা বাস্তব ছিল তাহারই যেন প্রেতমূর্ত্তি, পদচিহ্ন বা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি বলিয়া জিনিষটিকে মনে হয়, কিন্তু তখন আর তাহার কোনই অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রকৃতির লীলায় কোন একটি শক্তি যখন অনাবশ্যক হইয়া পড়ে ও ক্রমে লোপ পাইতে থাকে, তখন সম্পূর্ণ লোপ পাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহা আবার যে ফিরিয়া দেখা দেয়—এই নিয়ম প্রকৃতির ক্রিয়া-পদ্ধতিরই একটা অঙ্গ।

অবশ্য যখন কোন শক্তি, গুণ বা বৃত্তি সবে মাত্র জাগিয়াছে এবং পূর্ণ বলে বলীয়ান, যখন সে তাহার প্রাপ্য ভোগ পায় নাই এবং কর্ম্মের জের শেষ করে নাই, তখন সংযমের চেষ্টা বৃথা, সংযমের সময় তখনও হয় নাই। একটা জিনিষ যদি জন্ম গ্রহণই করিল, তবে

তাহার যৌবন ও পরিণতি, ভোগ ও আয়ুকাল, এবং শেষে ক্ষয় ও মৃত্যু থাকিবেই। প্রকৃতি যখন কোন বস্তুকে সৃষ্টি করিয়া জীবনের পথে ছুটাইয়া দেয় তখন সেই বস্তুর গতি-বেগ আপনা হইতেই ক্রমে মন্দীভূত হইতে হইতে যতক্ষণ শেষ হইয়া না যাইতেছে ততক্ষণ সে চলিবেই—ইহাই হইল প্রকৃতির বিধান। জবরদস্তি করিয়া অসময়ে জিনিষের গতি বা বাড় থামাইয়া দেওয়া হইতেছে নিগ্রহ; সাময়িক ফল তাহাতে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সে ফল স্থায়ী হয় না। গীতা তাই বলিতেছে, সব জিনিষই আপন আপন স্বভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, নিজের নিজের প্রকৃতি আশ্রয় করিয়াই সকলে চলে, সুতরাং নিগ্রহে কোন ফল হয় না। কারণ আসল ব্যাপারটি এই —অসময়ে গলা টিপিয়া যে জিনিষটি মারিয়া ফেলা হয়, বাস্তবিক পক্ষে তাহা মরিয়া যায় না, প্রকৃতির মধ্যে শুধু তাহা কিছুকালের জন্য আপনাকে গুটাইয়া রাখে; তারপর আবার প্রকৃতিই তাহাকে বাহিরে টানিয়া আনে এবং তখন যে ভোগ তাহাকে করিতে দেওয়া হয় নাই, তাহারই চরিতার্থতার জন্য বিকট ক্ষুধা লইয়া বিপুল বেগে সে ছুটাছুটি করিতে থাকে। যোগ সাধনার প্রথম অবস্থায় যখন কোন রিপু বা খারাপ সংস্কারের হাত হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য আমরা চেষ্টা করি তখন এই ধরণের একটা জিনিষ প্রায়ই ঘটে দেখিতে পাই। ধরা যাক্, ক্রোধ যেন আমাদের প্রকৃতিতে একটা প্রবল রিপু; আমরা জোর জবরদস্তি করিয়া সেটি দমনে রাখিতে চেষ্টা করি এবং বলি, এই হইতেছে আত্ম-সংযম; কিন্তু ফলে দেখি, হঠাৎ কোন্ সময়ে অজ্ঞাতে সেই রিপুটি আশ্চর্য্য বলে বলীয়ান হইয়া সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, আমাদিগকে কবলিত করিয়াছে। কোন রিপুর দাসত্ব হইতে যথার্থত মুক্তি পাইবার দুইটি উপায় আছে। প্রথম, সেই রিপুর যে বিপরীত বৃত্তি তাহাকে তৎস্থানে স্থাপনা করিয়া—যেমন, ক্রোধ উৎপন্ন হইলে তখন ক্ষমা বা প্রীতির উপর ধ্যান দিতে হয়, লালসা জাগিলে পবিত্রতার শরণ লইতে হয়, অহংকার হইলে নিজের দীনতার দিকে নজর দিতে হয়। ইহাই হইল রাজযোগের পথ।—কিন্তু এ পন্থা কঠিন, মন্থর, অনিশ্চিত। কারণ, প্রাচীন কালের অনেক উদাহরণ হইতে এবং আধুনিককালেও অনেকের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে বহুকাল ধরিয়া যে-যোগীরা আত্ম-সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাও হঠাৎ প্রবৃত্তির দুর্দ্দমনীয় আক্রমণে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন, যে-রিপু সম্পূর্ণ মৃত বা চিরকালের জন্য বশীভূত বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল তাহাই আবার দ্বিগুণ বলে ফিরিয়া আসিয়াছে। তবুও প্রকৃতির কাজের মধ্যে এই উপায়েরও ব্যবহার আছে দেখি। এই উপায়—অজ্ঞানে ও অর্দ্ধজ্ঞানে—আশ্রয় করিয়াই মানুষের স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে, জীবন হইতে জীবনান্তরে, এমন কি একই জীবনের গণ্ডীর মধ্যে ক্রমবিকাশ লাভ করিতেছে। কিন্তু বৃত্তির বীজ এই ভাবে নষ্ট হয় না, আর যোগের দ্বারা বীজই যদি পুড়িয়া ভস্মসাৎ না হইল তবে সে বীজ যখন তখন আবার অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতে পারে, শাখা পল্লব লইয়া বিরাট মহীরুহে পরিণত হইতে

পারে। দ্বিতীয় উপায় হইতেছে, রিপুকে ভোগের দ্বারা চরিতার্থ করা, যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র তাহার হাত হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। অতিরিক্ত ভোগের দ্বারা তৃপ্ত চরিতার্থ হইলে রিপুর বেগ কমিয়া যায়, তাহা নিস্তেজ হইয়া পড়ে; তখন প্রতিক্রিয়ার ফলে কিছু কালের জন্য তাহার বিপরীত গুণ বা প্রেরণা সেখানে স্থান পায়। যোগী ঠিক সেই শুভ মুহূর্ত্তে যদি নিগ্রহ অবলম্বন করেন এবং এই রকম সুযোগ ধরিয়া বার বার নিগ্রহ অভ্যাস করেন তবে ক্রমে বৃত্তিটির জীবনীশক্তি এতখানি হ্রাস পায় যে শেষে সংযম প্রয়োগের সুবিধা তাঁহার হয়। এই যে ভোগ ও বৈরাগ্যের পন্থা, ইহাও প্রকৃতির ক্রিয়াবলীর একটা সাধারণ ধর্ম্ম; কিন্তু শুধু এইটিকেই ধরিয়া চলিলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না। বিশেষত যে সকল বৃত্তি সনাতন বা স্থায়ী সে গুলির উপর ইহার প্রয়োগ করিলে দোলাচল বৃত্তির সৃষ্টি হয় মাত্র অর্থাৎ একবার বৃত্তিটি আবার তাহার বিপরীত বৃত্তি পর্য্যায় ক্রমে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতে থাকে, তাহাদের শেষ কখন হয় না। অবশ্য এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার চিরন্তন খেলা প্রকৃতির কাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, কিন্তু মানুষের পক্ষে আত্মজয়ের দিক হইতে ইহার কোন অর্থ নাই, কোন মীমাংসায় ইহার দ্বারা পৌঁছান যায় না। এই উপায়টির সাথে সাথে যদি সংযমের ব্যবহার করা যায়, তবেই সম্যক ফল পাওয়া যায়। যোগী বৃত্তিকে দেখেন প্রকৃতির অঙ্গ হিসাবে, তাহার সহিত তাঁহার নিজের কোন সম্বন্ধ নাই, তিনি শুধু দ্রষ্টা; কাম হউক, ক্রোধ হউক, কিছুই তাঁহার নিজের নয়, সবই মাতৃরূপিণী শক্তির, শক্তিই আপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বৃত্তিকে জাগাইতেছেন আবার শান্ত করিয়া ধরিতেছেন।[1] অবশ্য বৃত্তিটি যখন সবল সতেজ অক্ষত, তাহার আধিপত্য যখন অটুট, তখন সত্য সত্য এই রকম ভাব রাখা যায় না; প্রাণে অনুভব না করিয়া, শুধু চিন্তায় ধারণা করিবার চেষ্টা হইতেছে "মিথ্যাচার", অসত্য আচরণ বা আত্ম-প্রবঞ্চনা। পুনঃ পুনঃ ভোগের ও নিগ্রহের দ্বারা যখন একটা বৃত্তি কথঞ্চিৎ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে তখনই কেবল প্রকৃতি তাহার নিজের সৃষ্টিকে পুরুষের আজ্ঞা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। এই নিয়ন্ত্রণের প্রথম ধাপ হইতেছে বৈরাগ্য—যে বৈরাগ্যের অর্থ দারুণ ঘৃণা। এত উগ্র একটা আবেগ অবশ্য কখন স্থায়ী হইতে পারে না, তবুও সেই আবেগের ভিতরে ভিতরে রহিয়াছে তাহার কারণটিকে উচ্ছেদ করিবার যে ইচ্ছা, তাহাই স্থায়ী লাভ; এমন কি রিপুটি ফিরিয়া যখন আবার রাজত্ব করিতে থাকে তখনও সে ইচ্ছা একেবারে লোপ পায় না। তারপরের ধাপে রিপুর প্রত্যাবর্ত্তন একটা অস্বস্তি আনিয়া দেয় বটে, কিন্তু তাহা অসহ্য কিছু বলিয়া বোধ হয় না। শেষের ধাপ হইতেছে পরম নির্ব্বিকার ভাব, উদাসীনতা। তখন সাধক শুধু দেখিয়া যান কি রকমে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের বশেই বৃত্তিটি আস্তে আস্তে দূর হইয়া যাইতেছে। তখনই সাধক হইতেছেন প্রকৃত সংযমী, কারণ এই জ্ঞান তাঁহার তখন হইয়াছে যে তিনি দ্রষ্টা পুরুষ, তিনি যদি কোন বৃত্তি হইতে

আপনাকে পৃথক করিয়া ধরেন তবে সে বৃত্তি আপনা হইতেই স্তব্ধ হইয়া যাইবে। পরিণামে লাভ হয় মুক্তি—মুক্তি অর্থ লয় বা নির্ব্বাণ হইতে পারে অর্থাৎ বৃত্তি যেখানে চিরকালের জন্য নিঃশেষ লোপ পাইয়াছে। অথবা মুক্তি অর্থ হইতে পারে জীবের সেই ব্যবস্থা যখন সৃষ্টিকে ভগবানের লীলা বলিয়া তাহার জ্ঞান হয়, এবং কোন্ বৃত্তি ভগবান ফেলিয়া দিবেন অথবা আপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাখিয়া দিবেন তাহাও ভগবানেরই উপর সে ছাড়িয়া দেয়। এই শেষের পথটিই কর্ম্মযোগীর। কর্ম্মযোগী ভগবানের হাতে আপনাকে তুলিয়া দেয়, কর্ম্ম করে তাঁহারই জন্য, কারণ সে জানে যে তাহার ভিতর দিয়া ভগবানের শক্তিই কর্ম্ম করিতেছে। এই আত্ম-সমর্পণের ফলে, ভগবান সকল ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন; গীতায় তিনি যে কথা দিয়াছেন তদনুসারে, তাঁহার সে সকল ভক্তকে সকল পাপ হইতে অশুদ্ধতা হইতে মুক্ত করিয়া দেন। বৃত্তিগুলি তখন কাজ করে কেবল শারীর যন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া, অন্তর পুরুষকে স্পর্শ করে না, আর কাজ করিবার জন্য দেখা দেয় শুধু যখন আপন উদ্দেশ্যের জন্য ভগবান তাহাদিগকে ডাক দেন। ইহারই নাম নির্লিপ্ততা, লীলারই মধ্যে থাকিয়া পরম মুক্তি লাভ।

ব্যষ্টির পক্ষে যে বিধান, গোষ্ঠীর পক্ষেও সেই একই বিধান। যাঁহাদের একটা সূক্ষ্ম দৃষ্টি আছে তাঁহারা দেখিয়াছেন ও বলিয়া গিয়াছেন যে মানব সমাজে ক্রমোন্নতির ধারা হইতেছে মানুষের মধ্যে শ্বাপদের ও বন্য মানবের প্রকৃতিকে ক্ষয় করিয়া করিয়া উঠিয়া চলা। এক সময় ছিল যখন মানুষের সমাজে নিষ্ঠুরতা, লাম্পট্য, ধ্বংসলিপ্সা, উৎপীড়ন, নির্ব্বুদ্ধিতা, পাশবিকতা, ঘোর অজ্ঞ[illegible] প্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিত। তারপর এই অতিভোগের ফলে যখন একটা বিতৃষ্ণা ও অনিচ্ছা জন্মাইল তখন ধর্ম্মের ও দানের উৎকর্ষের সাথে সাথে এই সব বৃত্তিগুলিকে কতক শুদ্ধতর বৃত্তিতে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইবার, কতক বা দমন করিয়া রাখিবার একটা প্রয়াস আসিল। ইউরোপে খৃষ্টীয় যুগের গোড়া পত্তন অনেকটা এই ভাবেই হয়। কিন্তু এ পথের যে নিয়ম বা ধর্ম্ম তাহার ব্যত্যয় এখানেও হয় নাই। বৃত্তিগুলি কিছুকালের জন্য সুপ্ত বা সংযত থাকিয়া বারে বারে ন্যূনাধিক পরিমাণে আবার উঠিয়া দেখা দিয়াছে, এবং কম বেশি আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। ক্রমে যখন উনবিংশ শতাব্দি আসিল তখন মনে হইল এই সকল প্রাকৃত শক্তির কতকগুলি অন্ততঃ তৎসময়ের জন্য যেন ক্ষয় পাইয়া গিয়াছে, যেন সংযমের, প্রকৃতির ক্রমোন্নতির পথ হইতে তাহাদের সম্পূর্ণ নিরাকরণের সময় আসিয়াছে। এই রকমের আশা অনেকবারই হয় এবং পরিণামে আশা পূর্ণও হয় বটে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে একটা শেষ ধাক্কা আবার দেখা দেয়। মানুষ যে আবার পাশব স্তরের মধ্যে নামিয়া পড়িতেছে তাহার নিদর্শন আজকাল খুবই স্পষ্ট—বিশেষতঃ ইউরোপে ও আমেরিকায়,—বিজ্ঞান, শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতা, বিশ্বমৈত্রী প্রভৃতি বাহিরের মনোহর সাজ সজ্জার পিছনে দানবেরই জন্ম হইতেছে; আর আজ যে দুর্লক্ষণ সব দেখিতেছি তাহার

অপেক্ষা আরও অনেক দুর্লক্ষণ অব্যবহিত ভবিষ্যতে ঘনাইয়া আসিতেছে।*

আমরা যে নিয়মের কথা বলিলাম তাহার ক্রিয়া মানুষের সমাজে ও রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়। মানব-জাতির মধ্যে রাষ্ট্রনীতিক ক্রমোন্নতি কতকগুলি বিশেষ ধারায় চলিয়াছে। তাহাদের আধুনিকতম রূপের সূত্রটি ফরাসী বিপ্লব কয়েকটি কথায় বাঁধিয়া দিয়াছে—স্বাধীনতা, সাম্য, সৌভ্রাত্র্য। কিন্তু পুরাতন জগতের শক্তি সব,—প্রভুত্বের অত্যাচার, জন্মগত অধিকারের আধিপত্য, স্বার্থের জন্য কলহ ও রেষারেষি, নিজের লাভের জন্য অপরকে শোষণ, ইত্যাদি সমস্তই সদাসর্ব্বদা পৃথিবীর রাজতক্তে আপন আসন পাতিবার জন্য বিপুল চেষ্টা করিতেছে। বহুদেশেই তাই আজকাল বিপরীত দিকে একটা গতি স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। যে ইংলণ্ড একদিন সকলের উন্নতি ও স্বাধীনতাই তাহার আদর্শ বলিয়া মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিল, ঠিক সেই খানেই বোধ হয় প্রতিক্রিয়ার শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা বলীয়ান। তবে পুরাতন সংস্কারকে সম্পূর্ণরূপে ধুইয়া মুছিয়া দিতে হইলে আগে এই রকমেই অব্যর্থ ভাবে ক্ষয় করিয়া আনিতে হয়। এই জন্যই বারে বারে তাহার মধ্যে ফিরিয়া যাইয়া তাহার ভোগ শেষ করিতে হয়। পুনঃ পুনঃ তাহা মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় পুনঃ পুনঃ ভাঙ্গিয়া ধ্বসিয়া পড়িবার জন্যই। অন্য দিকে, সাম্যের গণশক্তির প্রেরণায় এখনও ক্ষয় ধরে নাই, এখনও তাহা পূর্ণ পরিণত হইয়া উঠে নাই, তাহার ভোগের কাল বেশি অতিবাহিত হয় নাই, এখনও তাহা সতেজ, অতৃপ্ত, সার্থকতাপ্রয়াসী। অতীতে এই তরুণ শক্তিকে যতবার দমন করিবার চেষ্টা হইয়াছে ততবারই পরিণামে তাহাতে দমনকারী শক্তিই পর্য্যুদস্ত হইয়া গিয়াছে; গণতন্ত্রের শক্তি তাহাতে আরও ক্রুদ্ধ বুভুক্ষিত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে,—"সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা" তাহার এই কল্যাণকর মন্ত্রের শেষে জুড়িয়া দিয়াছে, "নতুবা মৃত্যু।" অবশ্য স্বাধীনতার সেবক যে প্রত্যেকের স্বেচ্ছাচারের স্বাধীনতা চাহিতেছেন (এনার্কিজম্) সাম্যের সাধক যে সকলকে একই ছাঁচে ঢালিয়া একাকার করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন (সোসিয়ালিজম), অথবা সৌভ্রাত্র্যপ্রয়াসী যে জগৎজোড়া কর্ম্মীসঙ্ঘ (কমিউনিজম) গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছেন—গণতান্ত্রিক প্রেরণার এই সব চরম স্বপ্ন অব্যবহিত ভবিষ্যতে কিছু ফলিবে না। কিন্তু এই বৃহৎ আদর্শ একটা কিছু সমন্বয় অদূর ভবিষ্যতে সৃষ্টি করিবেই। প্রাচীন জগতের শক্তি যে প্রভুত্বের অত্যাচার, যে অসাম্য, যে অবাধ প্রতিযোগিতা, তাহারা আবার যখন একবার ভূতলশায়ী হইয়া পড়িবে, তখন তাহাদের সংযমের ক্রিয়া আরম্ভ হইবে। এই সংযমের পথে আমরা দেখিব আর তাহাদের সে প্রাণ নাই, অতীতের প্রেতমূর্ত্তি তাহারা দেখিতে দেখিতে মিলা যাইতেছে; তখন কোন রকম জোর করিয়া নিগ্রহ করিবার প্রয়োজন কিছু থাকিবে না, তাহারা নিজেরাই ধীরে ধীরে অথচ অব্যর্থ ভাবে প্রকৃতির লীলা ক্ষেত্র হইতে লোপ পাইয়া যাইবে।

অনুবাদক—শ্রী নলিনীকান্ত গুপ্ত

* কথা কয়টি ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের চারি বৎসর পূর্ব্বে লেখা হইয়াছিল—অনুবাদক।

চিত্রবহা

—পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর—

শ্রী সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্বশুরবাড়ির সুখ

কালীকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বহু বৎসর ইংরেজের আদালতে [illegible]মি করিয়া পেন্‌সন লইয়া সম্প্রতি পৈতৃক ভিটা হালশি-কাটিতে আসিয়া বসিয়াছেন। মস্ত বড় জমিদার। ধানের গোলা, জমিজমা, বাড়ি, বাগান, পুষ্করিণী, কিছুরই অপ্রতুল নাই। গৃহিণী ছেলেপুলে নাতি নাতিনী লইয়া তাঁর প্রকাণ্ড সংসার।

কালীকিঙ্কর ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইয়াও হিন্দুর আচার-ব্যবহার সমস্তই মানিয়া চলিতেন। বাড়িব বাহিরে কোথাও তিনি আহার করিতেন না, বাজারের খাবার খাইতেন না, কাছারি হইতে ফিরিয়া স্নান করিয়া মাথায় গঙ্গাজল ছিটাইয়া তিনি সারাদিনের স্পর্শ-দোষের পাপ ক্ষালন করিতেন। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বা অন্য কোনো সাহেবের বা অহিন্দুর বাড়ি পার্টিতে নিমন্ত্রিত হইলে উপায়ান্তর না থাকায় তিনি একবার সেখানে ঘুরিয়া আসিতেন বটে, কিন্তু বাড়ি ফিরিয়া স্নান ও গঙ্গোদকে শুদ্ধ হইয়াও ম্লেচ্ছসংস্পর্শহেতু বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর গা ঘিনঘিন করিতে থাকিত। রেলপথে ভ্রমণের সময় তিনি জলস্পর্শ করিতেন না। দেশে তাঁর ভারি সুনাম ছিল। লোকে বলিত, দেখেছ একবার, ইংরিজি শিখেও হিন্দু আচার-বিচারের একচুল এদিক ওদিক হয় না। সার্থক লেখাপড়া শিখেছে।

কালীকিঙ্করের সাত পুত্র এক কন্যা। পুত্রেরাও অনেকেই শিক্ষিত। কেহ ডেপুটি, কেহ উকীল, কেহ মুনসেফ, কেহ ডাক্তাব।

পঞ্চমপুত্র বৈদ্যনাথ বিপত্নীক ও অপুত্রক। সে কয়েকবার বি-এ পরীক্ষায় ফেল হইয়া এখনো পাশ করিবার আশা ত্যাগ করে নাই পিতাব আচারনিষ্ঠা ও শাস্ত্র-জ্ঞানের সে বিশেষ ভক্ত

বৈদ্যনাথের মাথায় একটি ছোট্ট টিকি। কলিকাতার কলেজ-হোষ্টেলে যখন থাকে তখন সে টিকিটি বুরুশ দিয়া বেমালুম চুলের সঙ্গে মিলাইয়া দ্যায়, নহিলে নাস্তিক শহুরে ছেলেগুলো বড় ঠাট্টা করে। দেশের বাড়িতে সেই টিকি মাথার চুলের উপর তার স্বতন্ত্র মহিমায় উগ্র হইয়া উঠে।

বৈদ্যনাথের দেহ সবল নয়। তার বিশ্বাস সে অসুস্থ, যদিও কি যে অসুখ তা সে নিজে ধরিতে পারে না, এমন কি তার ডাক্তার-দাদাও পারে না। অগত্যা সে সনাতন বৈদ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। বৈদ্য বলিয়াছেন, অসুখ আছে, জগতে কে-ই বা সম্পূর্ণ সুস্থ? তিনি দুই-প্রকার বটিকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেই বটিকা প্রাতে ও সন্ধ্যায় বিবিধ অনুপানসহ খলের উপর মাড়িয়া বৈদ্যনাথ সেবন করে। এই ঔষধ মাড়িয়া খাইতে তার অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়। তা হোক, বৈদ্যনাথের মনে হয় সে ভালো হইতেছে। তার ডাক্তার-দাদা হাসে। বৈদ্যনাথ মুখে কিছু বলে না, মনে মনে ভারি চটে। ভাবে, দাদা চিকিৎসা-শাস্ত্রের কিই বা বোঝে, ডাক্তার হইলেই হয় না। কেবলমাত্র নাড়ি টিপিয়া যাহারা সর্ব্ববিধ

ব্যাধির প্রকার নির্দ্ধারণ করিতে পারে, এমন যাদের আশ্চর্য্য ক্ষমতা, রোগতত্ত্ব তাহারা বুঝিবে না ত বুঝিবে কে?

পেন্‌সন লইয়া কালীকিঙ্করের ধর্ম্মে অনুরাগ শতগুণ বাড়িয়াছে। দিবস ও রাত্রির অধিকাংশ সময় তিনি রক্তবর্ণ চেলির জোড় পরিয়া কপালে সিঁদুরের তিলক কাটিয়া রুদ্ধদ্বার ঠাকুরঘরে জপতপ আরাধনা করেন। গ্রামের লোকে নিভৃতে বলাবলি করিত তিনি না কি সিদ্ধ হইবার চেষ্টা করিতেছেন। অমানিশার অন্ধকারে নির্জ্জন শ্মশানে গিয়া তিনি শবসাধনা করেন এবং করোটির পাত্র হইতে চুমুকে চুমুকে কারণ-সলিল পান করিয়া থাকেন! কেহ কেহ বলে তিনি সিদ্ধ হইয়াছেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তির কর্ণমূলে মুখ লাগাইয়া অস্ফুটস্বরে জানায় জপ করিতে করিতে তাঁর আসন দুই হাত শূন্যে উঠিয়া যায়, ইহা সে স্বচক্ষে না দেখিলেও এমন লোকের কাছে শুনিয়াছে যার পক্ষে মিথ্যা বলা কদাপি সম্ভব নহে।

সে যাই হোক, কালীকিঙ্করের কৃষ্ণকায় মাংসল খর্ব্ব দেহ, বেঁটে বেঁটে হাত পা, গোলাকার মুখে মস্ত একজোড়া বাঘের মত গোঁফ, ভাঁটার মত দুটা উজ্জ্বল চোখ, স্কন্ধ কাঁধ ও প্রকাণ্ড ভুঁড়ির দক্ষিণধার বেড়িয়া বিলম্বিত পৈতার গুচ্ছ এবং পূজার বেশ দেখিলে তাঁহাকে তান্ত্রিক বলিয়া মনে হওয়া বিচিত্র নয়।

কালীকিঙ্করের কনিষ্ঠ পুত্রদুটির বয়স অল্প কিন্তু পরিপক্কতা কম নয়। তাহারা লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়াছে। আহার ও শয়নের সময় ছাড়া বাড়িতে তাদের দেখা পাওয়া দুষ্কর। গ্রামের প্রান্তে লখা-কৈবর্ত্তর খোড়ো ঘরে জনকয় ছোটলোকের ছেলের সঙ্গে তারা একটা ক্লাব স্থাপনা করিয়াছে। সেখানে ধান্যেশ্বরী হইতে সুরু করিয়া আবকারি বিভাগের যাবতীয় মালেরই পরম সমাদর। ভাঙা তবলায় চাঁটি মারিয়া কলিকাতার থিয়েটারি গানের চেষ্টাও চলে।

বৈদ্যনাথের ঠিক পরেই করুণা—কালীকিঙ্করের একমাত্র কন্যা। সে বালবিধবা। বিবাহের পরে শ্বশুরালয় হইতে পতির সহিত জোড়ে ফিরিবার সময় রাত্রে একস্থানে বাহকেরা পাল্‌কি নামাইয়া বিশ্রাম করিতেছিল। সেই সুযোগে কালসর্প করুণার নিদ্রিত পতিকে দংশন করিয়া তার ভবলীলা সাঙ্গ করে। মেয়ে-জামাই জোড়ে ফেরার পরিবর্ত্তে নহবতমুখর জমিদার-বাড়িতে যখন সদ্য-বিবাহিতা কন্যা বিধবার বেশে একাকিনী ফিরিয়া আসিল তখন হালশিকাঠিতে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। সে অনেকদিনের কথা। করুণার বয়স তখন মাত্র আট বৎসর। এখন সে ষোড়শী।

দাসদাসী ও বধূবহুল সুবৃহৎ সংসারের গুরুভার করুণার স্কন্ধে চাপাইয়া তার আরাম ও অবসরের সকল রন্ধ্রগুলিই তার পিতা রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। বিধবা কন্যার অন্তরে যে যুবতী নারী সুপ্তিমগ্না, পাছে তার ঘুম ভাঙে, পাছে সে বিপ্লব বাধায়, বোধ করি সেই ভয়েই তিনি তাহাকে নিরবসর কর্ম্ম ও তপশ্চরণের মরুমর্ম্মে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন।

পিতার দেওয়া ভার যে কতবড় ভার তা জানিত করুণা আর তার অন্তর্যামী। রাত থাকিতে উঠিয়া স্নানা-হ্নিক সারিয়া, সে সংসারের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হয়। ঝি-চাকরকে কাজ বুঝাইয়া বামুন-ঠাকুরকে ভাঁড়ার বার করিয়া দিয়া সে পিতার পূজার আয়োজনে লাগে। সে-কাজ বড় সামান্য নয়। পূজার বাসন মাজা, ঘর ধোওয়া, ফুল তোলা, ধূপধুনা জ্বালানো, সব কাজই সে করে। দুপুরের দিকে খাওয়ানর পালা। বাবুরা নিজ নিজ সুবিধা ও অভিরুচি অনুসারে যখন-তখন আসিয়া আহারে বসেন, করুণা উপস্থিত থাকিয়া তদ্বির করে। পিতার আহার চুকিতে বেলা দুটা বাজে। তারপর করুণার রান্না খাওয়া সারিতে বেলা শেষ হইয়া যায়।

দিনের পর দিন এমনি চলে। মেয়েরা বলে, পোড়া কপাল ওর! কাজেকর্ম্মে যেটুকু ভুলে থাকে সেই ভালো। কালীকিঙ্কর বলে, বিধবার কঠিন নিয়মপালনই আমাদে

ঋষিরা ব্যবস্থা করে' গেছেন! ব্রহ্মচারিণীর আবার দুঃখ-কষ্ট কি? দুঃখকষ্টের সে ঢের ওপরে! সে ত সাধারণ মানুষ নয়—সে যে দেবী!

কালীকিঙ্করের উকীল-পুত্র ওকালতি পাশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু একদিনের জন্যও আদালতে যায় নাই। সে বলিত, ইংরেজিতে বক্তৃতা দেওয়া তার পোষাইবে না! এবং এতদিন গাধা-খাটুনি খাটিয়া এতগুলা পরীক্ষা পাশ করিল, আবার সে যে কেতাব ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া আইনের কূটতর্ক শিক্ষা করিবে তাহা সে পারিবে না! তাহা হইলে বলিলেই হয়, সারাজীবন সে শিখিতেই থাকুক, খাটিতেই থাকুক, তাহার আর নিশ্বাস ফেলিয়া কাজ নাই! বছরকয় আগে কলিকাতার চোরাবাজার হইতে সে একখানি পুরানো বেহালা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। দোতালায় নিজ শয়নকক্ষে বসিয়া বসিয়া সে বেহালার উপর ছড়ি টানিয়া কালক্ষেপ করিত। আজ কয়েক বৎসর সে এই যন্ত্র বাজাইতেছে, অথচ প্রথম দিন যেমন বাজাইয়াছিল আজও ঠিক তেমনি বাজায়, একচুল তফাৎ নাই। সকালে বিকালে দুপুরে একটু স্থির হইয়া শুনিলেই তার বেহালার আর্ত্তনাদ শুনা যায়।

এই নামসার উকীলের মেজাজটি ছিল সৌখীন। সে দাড়ি ছাঁটিত ফ্রেঞ্চকাট ষ্টাইলে, সকালে উঠিয়া নিয়মিত ষ্টোভে জল গরম করিয়া নিষিদ্ধ ডিম-সহযোগে চা খাইত, খুব মিহি সুতার জামা কাপড় ও কালো বার্নিশের পাম্পসু পরিত, বড় একটা উপর হইতে নামিত না, লোকজনের সহিত মোটেই মেলামেশা করিত না। তাহার স্ত্রী বৎসরান্তে নিয়মিত একটি করিয়া সন্তান প্রসব করিত। একবার কেবল এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়া সে যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছিল। সেবার সে পতির কাছে একটু ক্ষীণ অনুযোগ করিয়াছিল, আর সে সন্তান ধারণ করিতে পারে না, তার দেহ একেবারে ঝাঁঝরা হইয়া গেল! পতি উদাসীনভাবে বলিয়াছিল, তোমার ছেলে হয় সে কি আমার দোষ? বিয়ে করলে ছেলে-পুলে ত হবেই!

কালীকিঙ্কর এই সৌখীন পুত্রকে মাঝে মাঝে বলিত, বাবাজি দাড়ি ছাঁটাতে যে সময়টা ব্যয় করো তা যদি পরকালের চিন্তায় ব্যয় করতে তা হলে এতদিনে তরে' যেতে!

পুত্র ভ্রূক্ষেপ করিত না।

এই পরিবারে সুকুমারী বিপত্নীক বৈদ্যনাথের নবোঢ়া পত্নীরূপে আসিয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া গেল। পিত্রালয়ে খাওয়া শোওয়া পড়া সবই একটা নিয়মে চলিত, সব কাজেরই একটা নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল। এখানে কিছুই নির্দ্দিষ্ট নয়, সবই অনির্দ্দিষ্ট অপরিচিত।

সকালবেলা এখানে চা পাওয়া যায় না, ক্ষুধা নিবারণেরও উপায় নাই। বাড়িতে এতকাল বেলা দশটায় ভাত খাইত, এখানে পুরুষদের খাওয়া চুকিতেই বারোটা কখনো একটা বাজে, তারপর মেয়েরা খায়। ক্ষুধার জ্বালায় সুকুমারীর পেটের নাড়ি হজম হইবার উপক্রম হয়। যখন খাইতে বসে তখন ক্ষুধা থাকে না, আহারে রুচি হয় না। বাড়িতে রাত দশটায় তার এক ঘুম হইয়া যাইত, এখানে আহার সারিয়া শয়ন করিতে বারোটা বাজে। শুইতে গিয়াই কি শান্তি আছে! সুকুমারীর বর এমন অসভ্য যে থাকে থাকে তাহাকে জড়াইয়া ধরে, তাহার কাপড় ধরিয়া টানে। সুকুমারী বলে, অমন করিলে সে চীৎকার করিয়া বাড়ির লোক জড়ো করিবে। তবে বৈদ্যনাথ নিরস্ত হয়।

আর একটা কষ্টের কারণ ঘটিয়াছে। এখানে সুকুমারীকে একবস্ত্রে থাকিতে হয়। যে-দিন এখানে পৌঁছিল সে-দিনই শাশুড়ী বলিলেন, ও সব জামা সেমিজ এখানে চলবে না, ওগুলো খুলে রাখো! তারপর চিবাইয়া চিবাইয়া শ্লেষের স্বরে বলিলেন, বেইমশাই দেখছি মেয়েকে খাস বিবি করে' তুলেছেন!

জামা সেমিজ খুলিতে গিয়া সুকুমারী দুঃখে ও লজ্জায়

কাঁদিয়া ফেলিল, ছি ছি এক কাপড়ে কি থাকা যায়? কিন্তু যতই ক্লেশকর হোক সে শাশুড়ীর আদেশ পালন করিল। আসিবার সময় তার মা বলিয়া দিয়াছিলেন, শাশুড়ী যা বলবে সব করবি, মুখ বুজে থাকবি, যে যা বলুক সব শুনে যাবি, কথাটি কইবি নি! শ্বশুরবাড়ি বড় কঠিন ঠাঁই, মনে থাকে যেন!

কত যে কঠিন সুকুমারী তাহা প্রতি মুহূর্ত্ত মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে লাগিল।

৮

মন্ত্রবল

বামাপদ ঘরে ঢুকিয়া বলিল, হ্যাঁ, জোয়ান বটে! সাবাস বাঙালী! বলিয়া পাঠরত অমর ও সুকুমারীর পাশে গিয়া বসিল।

বামাপদর আভাসে ইঙ্গিতে কথা বলা শুনিয়া শুনিয়া ভাইবোনে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাই তারা কথাটা শুনিয়াও তার অর্থ জানিবার জন্য কোনো আগ্রহ প্রকাশ করিল না তাহারা বইয়ের উপর চোখ নিবদ্ধ করিয়া রহিল।

বামাপদ, তারা কি জিজ্ঞাসা করে শুনিবার জন্য, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। যখন দেখিল তাহারা কথা বলে না, তখন বলিল, আচ্ছা কার কথা বলছি বল্ দেখি!

ছাত্র ও ছাত্রী তবুও নিরুত্তর রহিল।

অন্যদিন বামাপদ যাহাদের বোকা বানায় আজ তাহাদেরি কাছে নিজে বোকা বনিয়া গিয়া তাহা ঢাকিবার জন্য বলিল, শহরশুদ্ধ লোক জানে, আর তোরা জানিস না! আরে, শম্ভু-বাঁড়ুয্যের কথা বল্‌ছি! শম্ভু বাঙালী, বুঝেছিস্? বাঘের সঙ্গে লড়াই করে, তায় আবার যে সে বাঘ নয়, সোঁদরবনের বাঘ! বুঝেছিস্? গায়ে একেবারে অসুরের মত ক্ষেমতা! এখনি তার কাছ থেকে আসচি! তার হাতের গুলো, ঠিক যেন লোহার তৈরি! টিপে টিপে দেখে এলুম! বুঝলি? চল্ তোদের একদিন শম্ভু-বাঁড়ুয্যের সার্কাস দেখিয়ে আনি! দেখবি একবার বাঙালীর বুকের পাটা!

এমনিভাবে বামাপদ অনর্গল বকিয়া চলিল, অমর ও সুকুমারী নীরবে শুনিতে লাগিল বটে, কিন্তু আনন্দে আর গৌরবে তাদের বুক ফুলিয়া উঠিল। বাঙালী দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য নয় তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য, সম্প্রতি তারা ব্যাকুল হইয়া ছিল, কিন্তু কেমন করিয়া প্রমাণ করিবে তাহা জানা ছিল না। আজ সে উপায় জানিতে পারিয়া তাদের মনের ভার অনেকটা লাঘব হইল।

বামাপদ বলিতে লাগিল, দুটি বাঙালী দেখলুম, শম্ভু-বাঁড়ুয্যে আর আমার চাটুয্যে-মশাই! চাটুয্যে-মশাই যে সার্কাসের দল খুল্লেন না, নইলে তিনিও এমন সব খেলা দেখাতে পারতেন! তাঁর গায়ে কি কম ক্ষেমতা ছিল!

অমর মনে মনে ভাবিল, তা অসম্ভব নয়। কান ধরিলে যে কি রাগ আর অপমান বোধ হয় তা অমরের জানা ছিল। হিংস্র শার্দ্দূল যে-ব্যক্তির হাতে কানধরার নিদারুণ অপমান নীরবে সহ্য করে, সে-ব্যক্তির কি কিছু অসাধ্য থাকিতে পারে? বাঘের কান মলিয়া নিস্তার পাওয়া বড় যে সে কথা নয়!

বিবাহের পর অল্পকাল শ্বশুর-ঘর করিয়া সুকুমারী পিতার সহিত বিহারে চলিয়া আসিয়াছিল। বৈদ্যনাথের পরীক্ষা আসন্ন, পাছে বধূমাতা থাকিলে পুত্রের পাঠাভ্যাসের ব্যাঘাত ঘটে, সেই ভয়ে, সুকুমারীর শাশুড়ী তাহাকে পিত্রালয়ে ফিরিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। তবে তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন, পুত্রের পরীক্ষা শেষ হইলেই বধূমাতাকে লইয়া আসিবেন। তার এখনো প্রায় ছয়মাস দেরী, তাই সুকুমারী পিত্রালয়ে আসিয়া কিছুকাল নিশ্চিন্ত হইবার অবসর পাইয়াছে। আবার সে পূর্ব্বেকার মত অমরের সহিত নিয়মিত পাঠাভ্যাসে রত হইয়াছিল।

সেবার তাহারা বিহারে পৌঁছিয়া দেখিল তাহাদের পাশের বাড়ি অধিকার করিয়াছে একজন হিন্দুস্থানী সব-ডেপুটি। সে-বাড়ির পাশে খানিকটা পোড়ো জমি। তার একদিকে একটা প্রকাণ্ড আমগাছ, অন্যদিকে ঘোড়ার আস্তাবল। আস্তাবলের সঙ্গে একটানা খানকতক ঘর। তার মধ্যে থাকে ডেপুটি-বাবুর একদল লোক-লস্কর। তারা সবাই অবশ্য হিন্দুস্থানী।

লোকগুলার বিশেষ কিছু কাজকর্ম্ম ছিল না। ডেপুটি-বাবু সফরে বার হইলে ত একেবারে পোয়াবারো। দিন-রাত হল্লা, রাতদিন ছুটাছুটি হুটোপাটি। কুস্তি, লাঠিখেলা, আমগাছের ডালে দোলনা টাঙাইয়া হুসহুস করিয়া দোল খাওয়া, খচমচ খঞ্জনি বাজাইয়া বিকট চীৎকার করিয়া গান গাওয়া, এমনি কত কি আমোদে তারা মাতিয়া উঠিত।

অমর ও সুকুমারী দূরে দাঁড়াইয়া তাহাদের খেলা দেখিত। দেখিতে দেখিতে ভাবিত উহাদের মত দোল খাইতে, লাঠি খেলিতে বা খঞ্জনি বাজাইতে পারিলে কত আনন্দই না হইত! সে কথা হিন্দুস্থানীদের বলিতে সাহসে কুলাইত না।

কিছুকাল পরে একটু একটু করিয়া হিন্দুস্থানীদের সঙ্গে তাহাদের ভাব হইল। মহরম আসন্ন, এমন সময় একদিন তারা দেখিল হিন্দুস্থানীরা বড় বড় লাঠি ঘুরাইতেছে। সেগুলির প্রান্ত বলের মত গোলাকার। ঘূর্ণিত লাঠির গায়ে জড়ানো বিচিত্রবর্ণ কাগজের উপর সূর্য্যালোক ঝিকমিক করিতেছে।

দৃশ্যটা চমৎকার। ভাইবোনে পায়ে-পায়ে অগ্রসর হইয়া খেলোয়াড়দের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

একজন খেলোয়াড় জিজ্ঞাসা করিল, লাঠি ঘোরাতে পারো?

তাহারা বলিল, না।

তখন সে ঈষৎ হাসিয়া তাহাদের পানে ফিরিয়া যাহা বলিল, তাহার অর্থ এই—গায়ে জোর থাকা চাই! চিংড়ি-খেকো বাঙালীর কর্ম্ম নয়!

কথাটা শুনিয়া তাহাদের ভারি অপমান বোধ হইল। চিংড়িমাছ খাওয়ার সঙ্গে গায়ের জোরের কি সম্বন্ধ? বড় হইলে তারা লাঠি ঘুরাইতে পারিবে না, তাই বা কে বলিল? ঘি, দুধ, আটা, মাংস কত জিনিসই তো তারা খায়, অথচ হতভাগারা কেবল চিংড়িমাছের নাম করে কেন? যেন চিংড়িমাছ ছাড়া তারা আর কিছুই খায় না! যারা ছাতু খায়, দহিচুড়া খায়, আনাজের খোসাভাজা খায়, তারা আবার পরকে বলিতে আসে! ভাইবোনে ভাবিতে লাগিল, যদি তারা বড় হইত, যদি তাদের গায়ে জোর থাকিত, তাহা হইলে...

তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া আসিল।

তদবধি অমর ও সুকুমারী দূরে দূরে থাকে, হিন্দু-স্থানীদের পানে ফিরিয়াও চাহে না। বারান্দায় তাহাদের দেখিতে পাইয়া এক একদিন তাহারা ডাকে, কি খোঁকা! কি খোঁকি!

ভাইবোনে নিরুত্তর রহে। ভাবে, বয়ে' গেছে উত্তর দিতে! ছাতুখোর! ভূত কোথাকার!

শম্ভু-বাঁড়ুয্যের কথা শুনিয়া অবধি তাহাদের কেবলি মনে হইতে লাগিল, হুঁ! বাঙালীর গায়ে জোর নেই! বাঙালী চিংড়িমাছ খায়! কেমন এইবার!

একদিন সন্ধ্যার পর তাহারা সার্কাসের মস্ত গোল তাঁবুর মধ্যে গিয়া বসিল। চারিদিকে কাতারে কাতারে লোক, তাঁবুর ভিতর আলোয় আলো।

বাজনা বাজিয়া উঠিল, সার্কাস সুরু হইল। ঘোড়ার নাচ, বাঁদরের চা খাওয়া, জিমন্যাষ্টিক, সরু তারের উপর ছাতা মাথায় দিয়া হাঁটা, এমনি কত আশ্চর্য্য খেলা হইতে লাগিল। কিন্তু ভাইবোনে ভাবিতেছে কতক্ষণে শম্ভু আসিবে। বহুক্ষণ পরে শেষে যখন শম্ভু আসরে আসিয়া দাঁড়াইল তখন তাহারা তার দিক থেকে চোখ ফিরাইতে পারিল না। লম্বা-চওড়া কী সুন্দর তার চেহারা! তার বুকের উপর ছোট বড় মাঝারি অসংখ্য সোনার মেডেল

ঝুলিতেছে। লোকে বলিল, দেশবিদেশে খেলা দেখাইয়া সে ঐ সব মেডেল পাইয়াছে।

বৃত্তাকার সার্কাস-ভূমির মাঝে শম্ভু একখানা চেয়ারে পা ও একখানায় মাথা রাখিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। দেহের মধ্যভাগ শূন্যে রহিল। প্রকাণ্ড একখানা চৌকা পাথর অনেক লোকে অনেক কষ্টে গড়াইতে গড়াইতে লইয়া আসিল। সকলে বলিল, তার ওজন আট মণ। সার্কাসের ম্যানেজার দর্শকবৃন্দকে উঠিয়া আসিয়া পাথরখানা পরখ করিয়া দেখিতে বলিল, কোনোপ্রকার জাল-জুয়াচুরি আছে কি না। অনেকে উঠিয়া গেল, পাথরখানা পরীক্ষা করিয়া বলিল, ঠিক আছে। তখন সেই গুরুভার পাথরখানা শম্ভুর বুকের উপর তুলিয়া দেওয়া হইল। তবুও তার দেহ একটুও বাঁকিল না, একটুও কাঁপিল না, সে যেমন সোজা শুইয়া ছিল ঠিক তেমনি রহিল। তারপর সার্কাসের ম্যানেজার আবার দর্শকবৃন্দের পানে ফিরিয়া বলিল, আপনাদের মধ্যে যার খুসি উঠে এসে পাথর ভাঙুন।

জনকয় জোয়ান লোক উঠিয়া গিয়া সুরকি-ভাঙা হাতুড়ির মত বড় বড় হাতুড়ি লইয়া পাথরের উপর দমাদ্দম ঘা মারিতে সুরু করিল। লোহা ও পাথরে ঠোকাঠুকির ফলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে দেখিয়া ভাইবোনে সভয়ে চোখ বুঁজিল। তারপর বিপুল জয়ধ্বনি ও করতালির মধ্যে চোখ মেলিয়া দেখে পাথরখানা দুটুকরা হইয়া ভাঙিয়া গেছে এবং শম্ভু হাসিমুখে নিতান্ত সহজ মানুষের মত সকলকে নমস্কার করিতেছে।

পরদিন প্রভাতে হিন্দুস্থানীরা আমগাছের তলায় জটলা করিতেছিল। এমন সময় ভাইবোনে তাদের সুমুখে গিয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইল।

তাহাদের পানে ফিরিয়া তাচ্ছিল্যের স্বরে অমর জিজ্ঞাসা করিল, শম্ভুবাবুর সার্কাস দেখেছিস?

তাহারা বলিল, হ্যাঁ দেখেছি?

অমর জিজ্ঞাসা করিল, বুকে পাথর ভাঙা দেখেছিস?

তাহারা বলিল, হ্যাঁ

অমর বলিল, তবে যে বলেছিলি বাঙালীর গায়ে জোর নেই—তারা চিংড়িমাছ খায়?

তাহারা বলিল, বলেছিলুম ত!

অমর বিজয়গর্বে বলিল, গায়ে জোর নেই ত বুকের ওপর আট মণ পাথর ভাঙে কেমন করে'?

তাহারা একটু হাসিল। একজন মাথা নাড়িয়া বলিল, বিনা যাদু সে নেহি হোনে সেক্‌তা। গায়ের জোরে আর হতে হয় না। মন্তর জানে—মন্তর।

৯

বামাপদর বিদায়

কন্যার বিবাহ দিয়া কাত্যায়নীর মেজাজ সুস্থ হইয়াছিল। ধাড়ি আইবুড় কন্যা ঘরে পুষিতেছেন বলিয়া কেহ আর তাহাকে খোঁটা দিতে পারিবে না, সেটা কি কম লাভ? তবে কাত্যায়নীর না কি শান্তি পাইবার জো নাই, তাই তার নূতন বিপদ হইয়াছে হিন্দুস্থানী পাচক লইয়া। বাঙালী পাচক ছুটি লইয়া বাড়ি গিয়াছে, তাই এই দুরবস্থা।

হিন্দুস্থানী পাচক আসিয়া যখন কাজে ভর্ত্তি হয়, কাত্যায়নী জিজ্ঞাসা করে, রান্নার কাজ জানো ত?

সে বলে, হাঁ মাইজী।

কাত্যায়নী জিজ্ঞাসা করে, কি কি রাঁধতে পারো?

সে বলে, সব কুছ জান্‌তা! দাল, ঝোল, চরচরি, ভাজি, সব কুছ জান্‌তা!

তারপর, কাজে ভর্ত্তি হইলেই কাত্যায়নী আবিষ্কার করে, কড়ার উপর মাছখানি উল্টাইবারও যোগ্যতা তার নাই, তার সঙ্গে বকিয়া বকিয়া কাত্যায়নীর মাথা ধরিয়া যায়। তাও কি ছাই হেঁসেলে ঢুকিবার জো আছে! প্রথম দিন কাত্যায়নী রান্নাঘরে পা বাড়াইবার উপক্রম করিতেই পাচক হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল। বলিল, যা বলিবার জোর-

গোড়া থেকেই বলো, নহিলে চৌকা ছোঁয়া যাইবে, হাঁড়ি ফেলিতে হইবে! রান্নাঘরের চৌকাট পার হইলে হেঁসেল অপবিত্র হইবে, একথা পরম নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণকন্যা কাত্যায়নীকে যে কেহ বলিতে পারে, ইহা তার ধারণার অতীত ছিল—তাও শুনিতে হইল ছাতুখোর মেড়ুয়াবাদীর মুখে! রাগে কাত্যায়নীর মন রি-রি করিয়া উঠিল, কিন্তু নিরুপায় ভাবিয়া সে-বিরক্তি ও ক্রোধ দমন করিতে হইল।

অহোরাত্র বকুনি খাইয়া খাইয়া পাচকের রন্ধন-বিদ্যা যেই একটু আয়ত্ত হয় অমনি সে দুর্ব্বোধ হরফে লেখা একখানি পোষ্টকার্ড হাতে লইয়া বিষণ্ণমুখে আসিয়া দাঁড়ায়, বলে, বাড়িতে মা বাবা বা ছেলে বা এমনি কোনো অতি প্রিয়জনের দারুণ পীড়া, অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, আজই তাহাকে দেশে যাইতে হইবে! অগত্যা বেতন চুকাইয়া লইয়া সে চলিয়া যায়। আর একজন পাচক তার জায়গায় ভর্ত্তি হয়। সে আসিয়াই বলে, হেঁসেলের হাঁড়িকুঁড়ী ফেল, ও-সব ছোঁয়া গেছে! তারপর কাত্যায়নী তাহাকে সেই সব প্রশ্নই করে যাহা সে তার পূর্ব্ববর্ত্তীকে করিয়াছিল, প্রশ্নের সেই একই উত্তর পায়, তারপর কাজের বেলা দেখে

রাত্রে একদিন মহা গোলযোগ। চোর চোর শব্দে সকলে জাগিয়া উঠিল। শুনা গেল আশপাশের বাড়ি থেকে ভদ্রলোকেরা চন্দ্রবাবুকে ডাকিতেছেন। চন্দ্রবাবুর এক মক্কেল তাহাকে একটি মোটা বাঁশের লাঠি উপহার দিয়াছিল। প্রতিদিন স্নানের সময় তিনি সেই লাঠিতে বেশ করিয়া সরিষার তেল মাখাইয়া উহা শয্যার শিয়রে দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া দিতেন। পাড়ায় চোর আসিয়াছে বুঝিতে পারিয়া তিনি লাঠিটি লইয়া দ্বার খুলিয়া বাহিরের দিকের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন পড়শিরা অনেকেই হারিকেন হাতে লইয়া রাস্তায় নামিয়াছে। বারান্দার মেঝের উপর সজোরে লাঠি ঠুকিতে ঠুকিতে চন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কি মহেন্দ্র বাবু! ও ভবানী বাবু মোআশায়, ব্যাপার কি? কোথায় চোর?

জানা গেল সেই পাড়াতেই তিনটি বাড়িতে চোরে একই সময়ে সিঁদ দিতেছিল। এক বাড়িতে চুরি হইয়াছে, অন্য দুই বাড়ির সিঁদ কাটা সম্পূর্ণ না হইতেই গোলযোগ ঘটায় চোর পালাইয়াছে। একটা সিঁদকাঠি তারা ফেলিয়া গিয়াছিল।

কাত্যায়নী সব শুনিয়া বলিল, ও মা! এ আবার এক নতুন আপদ জুটলো! মুখপোড়ারা মাছ ওল্টাতে পারে না আবার চুরিবিদ্যে শিখেচে, দেখো একবার! ছেলে-পুলে নিয়ে বাস করি, এই মেড়ুয়াবাদীর দেশে বরাতে কি যে আছে কে জানে বাপু...

প্রতিরাত্রেই কোনো না কোনো পাড়ায় চোরের উপদ্রব হইতে লাগিল। একই সঙ্গে একাধিক বাড়িতে চুরি হয়, তাই চোর যে একজন নয়, একদল, তা বেশ বোঝা গেল। পাড়ার লোকে পালা করিয়া রাত জাগিয়া পাহারা দিতে সুরু করিল।

চন্দ্রবাবু কাত্যায়নীর বিশেষ অনুরোধে এবং ঘুমের ব্যাঘাত হইতে পরিত্রাণ লাভের আশায় এক দারোয়ান নিযুক্ত করিলেন। তার গোঁফ গালপাট্টা এবং দেহের বহর দেখিয়া অমর ও সুকুমারী মনে মনে নিরাপদ বোধ করিল।

দারোয়ানের বাড়ি পশ্চিম দেশে। তার সম্পত্তির মধ্যে এক কম্বল, একটি লোটা এবং পিতল-বাঁধানো মস্ত একটি লাঠি। সে-লাঠির তুলনায় চন্দ্রবাবুর বাঁশের লাঠি অতি তুচ্ছ। সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্বহস্তে পাক করিয়া মোটা মোটা রুটি দারোয়ান অড়রডাল সহযোগে খাইত। তারপর রাত্রে ভিতর-বাড়ির দেউড়িতে খাটিয়া পাতিয়া শুইত এবং মাঝে মাঝে উঠিয়া আলো হাতে লইয়া বাড়ির চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চোরের সন্ধান করিত।

হঠাৎ একদিন রাত্রে সুকুমারী অমরকে ঠেলা দিয়া বলিল, ঐ শোনো!

অমর একটা ভুমভুম শব্দ শুনিতে পাইল। মনে হইল দ্বারের উপর কে যেন লাঠির আঘাত করিতেছে। তার বুক দুরদুর করিয়া উঠিল।

সে বলিল, বোধ হয় চোর এসেছে, না রে?

সুকুমারী ফিসফিস করিয়া বলিল, চোর নয় ডাকাত। কারণ সে জানিত, চোর সিঁদ কাটিয়া চুপি চুপি আসে, আর ডাকাত আসে সোরগোল করিয়া মশাল

কথাটা শুনিয়া, বাড়িতে যে ডাকাত পড়িয়াছে সে সম্বন্ধে অমরের মনে আর সংশয় রহিল না।

রুদ্ধনিশ্বাসে ভাইবোনে শুনিতে লাগিল ভিতর-বাড়ির দেউড়ির দ্বারের উপরই লাঠির ঘা পড়িতেছে। সহসা ভিতরের ঘর হইতে চন্দ্রবাবু হাঁকিলেন, হীরা-সিং। নবনিযুক্ত দারোয়ানের নাম হীরা-সিং।

ভুমভুম লাঠি ঠোকাব সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রবাবু হাঁকিতে লাগিলেন, হীরা-সিং, হীরা-সিং, হীরা-সিং। অমর হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। যাক, তাহা হইলে দ্বারের গায়ে লাঠি ঠুকিতেছে তার বাবা, ডাকাত নয়।

বহুক্ষণ লাঠি ঠোকাঠুকি এবং হীরা-সিংকে ডাকা-ডাকির পর রুদ্ধ দ্বারের বাহির হইতে হো ও-ও শব্দে একটা সাড়া পাওয়া গেল। অমনি রুক্ষমেজাজ চন্দ্রবাবু তাহাকে ভ্যাংচাইতে সুরু করিলেন, হো, হো, হো। ভাই-বোনে নিম্নস্বরে বলাবলি করিতে লাগিল, অমন করলেই ও আর থেকেছে! কালই চলে' যাবে, তখন চোর এলে মজা দেখবেন'খন!

হীরা-সিঙের মত জোয়ান বাড়িতে থাকায় কি কম সাহস ছিল! সেই হীরা-সিংকে এমন করিয়া ভ্যাংচানো যে বাবার কত বড় অন্যায় ভাইবোনে তাহাই আলোচনা করিতে লাগিল। হীরা-সিং চলিয়া গেলে চোর-ডাকাতেব হাতে কিরূপে তাহারা পরিত্রাণ পাইবে সেই ভাবনায় তাহাদের মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। এমন সময় ভিতরের ঘরের ছড়কা-খোলার শব্দ পাওয়া গেল। রুষ্টস্বরে চন্দ্রবাবু হীরা-সিংকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমায় এত ডাকছি শুনতে পাও না? এমনি করে পাহারা দেবে?

অনেক হাঁকডাকের পর হীরা-সিং ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল। তখন সে বলিল, আজ্ঞে আমি যে কালা! কানে ভালো শুনতে পাই না।

পরদিন হীরা-সিঙের জবাব হইল।

কয়েকদিনের মধ্যেই এক নূতন লোক নিযুক্ত হইল। তার হাতে যে লাঠি সেটিকে ভীমের গদা বলিলেও চলে—সে লাঠির তুলনায় হীরা-সিঙেব লাঠি তুচ্ছ।

কাত্যায়নী তাহাকে গোড়াতেই জিজ্ঞাসা করিল, কানে শুনতে পাও ত? কালা নও?

দারোয়ান হাসিয়া উত্তর করিল, কালা হইলে কি আর দেউড়ির খবরদারী করা যায়?

সকলে নিশ্চিন্ত হইল, যাক এবার ঠিক লোক পাওয়া গেছে।

নূতন দারোয়ান ভারি ফুর্তিতে থাকে। ডালরুটি খায়, দুপুরবেলা সুর করিয়া হিন্দি রামায়ণ পড়ে, বিকালে নানারকম লাঠিখেলা দেখাইয়া অমর ও সুকুমারীকে তাক লাগাইয়া দ্যায়।

দিনকত পরে চন্দ্রবাবু কথাচ্ছলে তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, কি দরোয়ানজি, রাত্তিরে পাহারা দাও ত?

সে বলিল, হ্যাঁ হুজুর! পাহারা দিই বৈ কি! রাত্তিরে ত আমি জেগেই থাকি, তবে ..

চন্দ্রবাবু বলিলেন, তবে কি?

সে বলিল, আজ্ঞে কাল রাত্তিরে আমার সেই লাঠিটা চুরি গেছে।

চন্দ্রবাবু বলিলেন, কি রকম? চুরি গেল কেমন করে'? এই না বল্লে জেগে থাকি? মিথ্যে কথা?

সে বলিল, আজ্ঞে মিথ্যে নয় হুজুর, সত্যি জেগেই থাকি। তবে কি না, রাত্তিরে আমি চোখে দেখি না—আমি যে রাতকানা!

চন্দ্রবাবু সরোষে চীৎকার করিয়া বলিলেন, আগে সে কথা বলিসনি কেন রে ব্যাটা ?

সে ধীরভাবে বলিল, আপনি জিজ্ঞেস করেননি ত!

দ্বিতীয় দারোয়ানেরও জবাব হইল।

ইহার কিছুদিন পরে কার্য্যোপলক্ষে চন্দ্রবাবুকে কয়েক দিনের জন্য বাহিরে যাইতে হইল। কাত্যায়নী ভাবিয়াই অস্থির এ কটা দিন কেমন করিয়া কাটিবে ? চোর ডাকাতের চরেরা প্রতিদিন কানা খোঁড়া ভিখারী ও সন্ন্যাসীর বেশে বাড়ি বাড়ি ঘুরিতেছে, তাহাদের আর কি জানিতে বাকি থাকিবে যে বাবু মফস্বল গিয়াছেন এবং তাঁর পরিবারবর্গ অসহায় অবস্থায় রহিয়াছে ? এমন সুযোগ কি তারা অবহেলা করিবে ? অনেক চিন্তার পর স্থির হইল অমর ও তার গৃহশিক্ষক বামাপদ সদরঘরে শুইবে, ভিতর-ঘরে শুইবে কাত্যায়নী আর সুকুমারী। দুই ঘরের মাঝের দরজা খোলা থাকিবে।

একদিন রাত্রে সুকুমারী ধড়মড় করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। দেখিল একটা লোক টপ্ করিয়া তার পায়ের তলায় খাটের আড়ালে বসিয়া পড়িল। আস্তে আস্তে ঠেলা দিয়া মাকে তুলিয়া সে বলিল, মা! ঘরে চোর ঢুকেচে! তারপর নীরবে ইসারা করিয়া পায়ের কাছে মেঝের দিকে দেখাইয়া দিল।

কাত্যায়নী ঝুঁকিয়া দেখিল একটা লোক মাথা নীচু করিয়া বসিয়া আছে। পরক্ষণেই দেখিতে পাইল সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া দ্রুতপদে মাঝের দরজা দিয়া বাহিরের ঘরে চলিয়া গেল।

কাত্যায়নী সুকুমারীকে বলিল, তোর দাদাকে চেঁচিয়ে ডাক্ দেখি।

দাদা! দাদা! শীগ্‌গির ওঠ!—বলিয়া সুকুমারী ডাকিতে লাগিল।

অনেকবার আহ্বানের পর বামাপদ শশব্যস্তে ঘরে ঢুকিয়া লণ্ঠন লইয়া খাটের তলা ও ঘরের কোণগুলি গভীর মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিয়া বলিল, কৈ, কিছু ত দেখতে পাচ্ছি না!

বামাপদ ঘরে গিয়া শুইল। কাত্যায়নী উঠিয়া মাঝের দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

পরদিন চন্দ্রবাবু ফিরিয়া আসিলেন।

সন্ধ্যার সময় অমর ও সুকুমারী পড়ার ঘরে পড়িতেছিল এবং বামাপদ গম্ভীরমুখে বসিয়া ছিল। এমন সময় চন্দ্রবাবু আসিয়া বলিলেন, বামাপদ একবার এদিকে এস! বামাপদ উঠিয়া গেল। ঠিক তারপরেই কাত্যায়নী আসিয়া বলিল, আজ আর পড়তে হবে না, আমার কাছে বসবি চল্।

সন্ধ্যাবেলাটা পাঠাভ্যাস হইতে অব্যাহতি পাইয়া অমর খুব খুসি হইল, কিন্তু মাতার এই শুভবুদ্ধির কোনো সন্তোষজনক হেতু খুঁজিয়া পাইল না।

পরদিন সকালে সুকুমারী পড়িতে গেল না, মা'র কাছে বসিয়া রহিল। অমর পড়িতে গিয়া দেখিল বামাপদ তখনো দ্বার খোলে নাই, পিতা আপিস-ঘরে বসিয়া মকদ্দমার কাগজ পড়িতেছেন। তখন সে হৃষ্টচিত্তে আস্তাবলে গিয়া সহিসের সঙ্গে আলোচনা করিতে লাগিল, আর কত বড় হইলে সহিস তাহাকে ঘোড়ায় চড়া শিখাইতে পারে। চন্দ্রবাবু ঘোড়ায় চড়িতে পারেন বটে কিন্তু তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেই অমরের ভয় হয়, তাঁহাকে এমন অনুরোধ করা ত দূরের কথা।

মধ্যাহ্নে আহারের সময়ও বামাপদ আসিল না, অথচ তাহাকে বাদ দিয়া সকলে খাইতে লাগিল। চন্দ্রবাবু বা কাত্যায়নী কেহই তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন না। কাল সন্ধ্যা হইতে বামাপদর কি যে হইল অমর কিছুই বুঝিল না, অথচ তার মনে হইতে লাগিল একটা কিছু নিশ্চয়ই ঘটিয়াছে।

আহার সারিয়া বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতেই অমর দেখিল একখানা ভাড়াটে গাড়ি সশব্দে চলিয়া

যাইতেছে। গাড়ির ছাদের উপর মোটমাটরা ও বিছানা এবং ভিতরে বসিয়া ছিল বামাপদ। ব্যাপারটা এতই বিস্ময়কর যে অমর ছুটিতে ছুটিতে ভিতরে আসিয়া পিতাকে বলিয়া ফেলিল, বাবা! বাবা! দাদা জিনিস-পত্তর নিয়ে গাড়ি করে' চলে' গেল যে!

চন্দ্রবাবু এই সংবাদে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া উদাসীনভাবে বলিলেন, যাকগে!

পিতার ঔদাসীন্যে অমরের কৌতূহল দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। তার মনে হইল এ সম্বন্ধে সুকুমারীর সঙ্গে আলোচনা করিলে হয় তো ব্যাপারটা খোলসা হইতে পারে। তাই নিভৃতে ডাকিয়া তাহাকে বলিল, সুকু! দাদা যে চলে' গেল!

সুকুমারী বলিল, জানি।

অমর জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

সুকুমারী বলিল, ও যে খারাপ লোক! রাত্তিরবেলা আমার পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল!

তাঁহাকে বিষম ভয় করিত। মনের উপর হইতে ভয়ের চাপ অপসৃত হইতেই তার মন শরতের মেঘের মত হাল্কা হইয়া উঠিল। উপরন্তু গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ গণ্ডমূর্খদের স্তুতিবাদ শুনিয়া শুনিয়া নিজের উপর তার শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল।

নীচের ঘরে অমর আস্তানা গাড়িয়াছিল। সে ঘরে আলমারিতে বিবিধ ইংরেজি ও বাংলা বই ছিল। ইচ্ছামত বই বাহির করিয়া সে পড়িতে সুরু করিল। পরীক্ষার পড়া আর সখের পড়ায় অনেক তফাৎ। পাঠ্য কেতাবে আনন্দ নাই, সখের পড়ায় যা পুরামাত্রায় আছে।

অমর 'আইভ্যানহো' ও 'কেনিলওয়ার্থ'-এর রোমান্সে মুগ্ধ হইল, 'পিক্উইক্' পড়িয়া প্রচুর হাসিল। ওয়াশিংটন, গারফীল্ড ও লিংকনের জীবনী পড়িয়া তাঁদের প্রতি তার মন শ্রদ্ধায় অবনত হইল—যাঁহারা স্বচেষ্টায় দীনহীন অবস্থা হইতে সার্থকতার সমুচ্চ শিখরে আরোহন করিয়াছিলেন। তার কল্পনাপ্রবণ মনের সুমুখে যেন একটা অজ্ঞাত রহস্যাবৃত নূতন জগতের দ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইতে লাগিল।

১০

যৌবন-বেদনা

বছর ছয় সাত পরের কথা। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর মাতার সঙ্গে অমর পল্লীভবনে আসিয়াছিল। চন্দ্রবাবু কর্ম্মস্থানেই ছিলেন। স্থির হইয়াছিল, অতঃপর কলিকাতায় বাড়ি ভাড়া করিয়া সকলে থাকিবে। পরীক্ষা পাস করিলে অমর কলেজে ভর্ত্তি হইবে, চন্দ্রবাবু হাইকোর্টে ওকালতি করিবেন।

পল্লীভবনে আসিয়া অমর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। অনেকদিন আর পড়াশুনা বা পরীক্ষার তাড়া নাই। অখণ্ড অবসর, আহার নিদ্রা ও ভ্রমণ, তার উপর চন্দ্রবাবু অনুপস্থিত।

চন্দ্রবাবুর কাছে অমর মনমরা হইয়া থাকিত, স্বচ্ছন্দ হইতে পারিত না। তাঁর কোপন স্বভাবের জন্য অমর

পল্লীভবনে আসিয়া কাত্যায়নী গ্রামান্তর হইতে এক দূরসম্পর্কীয়া ননদিনীকে আনাইল। তার নাম নীরদা। নীরদা অত্যন্ত দুর্ভাগিনী। বিবাহ তাহার এককালে হইয়াছিল। বিবাহের কিছুকাল পরেই পতিদেবতা কোনো অজ্ঞাত কারণে সংসারে বীতরাগ হইয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, আর বাড়ি ফেরেন নাই। বালিকাবধূ নীরদাই অবশ্য এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী সাব্যস্ত হইল, কারণ স্বামীকে সামলানো ত তাহারই কাজ! ফলে শাশুড়ী তার উপর খড়্গহস্ত হইল।

নীরদার পিতৃকুলে এমন কেহ ছিল না, তার দুরবস্থায় যাহাদের ব্যথা বোধ হইতে পারে। অগত্যা শ্বশুরালয়ের লাথিঝাঁটা খাইয়া সে নারীজন্মের সার্থকতা অনুভব

করিতেছিল, এমন সময় চন্দ্রবাবু তাহাকে উদ্ধার করিলেন।

নীরদা শ্যামাঙ্গী, মুখশ্রী মন্দ নয়। তার সর্ব্বাঙ্গে যৌবনের জোয়ার উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছিল। তার সুগোল হাতে দুইগাছা শাঁখা ও সিঁথিতে সিন্দুরের রক্তরেখা প্রমাণ করিত যে সে সধবা—তার পতিদেবতা এখনো ইহলোক পবিত্র করিতেছেন।

নীরদাকে দেখিয়া অমরের বড় ভালো লাগিল। এ পর্য্যন্ত সে নারীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে একপ্রকার উদাসীন ছিল, কিন্তু নীরদাকে দেখিয়া তার মনে একটা অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। তাহাকে দেখিবার তাহাকে কাছে পাইবার তার সঙ্গে আলাপ করিবার ভারি ইচ্ছা হইত। অমরের মনের গভীর গোপনে ধীরে ধীরে একটা চঞ্চলতা জাগিয়া উঠিতে লাগিল। তার নাম সে জানে না, কারণ সে-চঞ্চলতা ইতিপূর্ব্বে সে অনুভব করে নাই।

ঘরের সুমুখের দালানে নীরদা যখন গৃহকর্ম্ম করিয়া ফিরিত, অমর তখন তক্তপোষের উপর বসিয়া কোলের উপর উপন্যাস খুলিয়া তার নিটোল ও পরিপূর্ণ দেহের চঞ্চল ভঙ্গিমা একমনে নিরীক্ষণ করিত। সেই দেহের প্রতি তার মন আকৃষ্ট হইত, সেই দেহকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিবার একটা অদম্য কৌতূহল তার মনে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইত। মাঝে মাঝে অমরের মনে হইত নীরদা যেন মাথা না ফিরাইয়াও তাহাকে দেখিতেছে। কখনো কখনো মনে হইত নীরদার অধরে যেন ঈষৎ একটু হাসির রেখা চকিতে উঠিয়া চকিতে মিলাইয়া গেল।

একদিন মধ্যাহ্নে আহারের পর অমর অভ্যাসমত তাকিয়া ঠেস দিয়া একখানা বই হাতে করিয়া পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিল জানে না। গলা শুকাইয়া যাওয়ায় হঠাৎ সে জাগিয়া উঠিল। নিকটে কাহারও সাড়াশব্দ নাই। অমর বুঝিল, আহারাদি সারিয়া সকলে উপরে বিশ্রাম করিতে গেছে। দালানে জলের কুঁজা থাকিত। জল লইবার জন্য সে ঘর হইতে বাহির হইল। বাহির হইয়াই দেখিল দ্বারের পাশে নীরদা শীতল মেঝের উপর আঁচল বিছাইয়া বাহুর উপর মাথা রাখিয়া মুদিতনয়নে শুইয়া আছে। তার ছড়ানো ভিজা এলো-চুলের প্রান্তে একটা গিরো বাঁধা, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, বুকের কাপড় একটু সরিয়া গেছে।

অমর আর অগ্রসর হইল না, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। একবার মনে হইল কাজটা বোধ হয় ভালো হইতেছে না, কিন্তু সে কিছুতেই চোখ ফিরাইতে পারিল না। নিশ্বাসের ছন্দে স্পন্দমান অনাবৃত নারীবক্ষের সৌন্দর্য্য চুম্বকের মত তার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল, স্তব্ধ দ্বিপ্রহরের নির্জ্জনতায় তার মন মাতাল হইয়া উঠিল। লোভ হইতে লাগিল ধীরে ধীরে গিয়া সেই পূর্ণবিকশিত যৌবনমঞ্জরী একবার স্পর্শ করে। কিন্তু তার সাহস হইল না। যদি কেহ আসিয়া পড়ে, যদি কেহ দেখিতে পায়?

দাঁড়াইয়া থাকিতে ভয় করে, চলিয়া যাইতেও পা সরে না, এমনি অবস্থায় কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। তারপর কি মনে করিয়া হঠাৎ সে ঘরে ঢুকিয়া একটুকরা কাগজ পাকাইয়া আনিয়া সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়া নীরদার কানে পুরিয়া দিল। নীরদা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া অমরের পানে চাহিয়া কৃত্রিম কোপে বলিল, এ কি হচ্ছে? লজ্জা করে না?

অমর বিষম অপ্রস্তুত হইল। কি বলিবে খুঁজিয়া পাইল না।

তার ভাব দেখিয়া নীরদা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, যাও ঘরের ভেতর যাও! তুমি বড় দুষ্টু! আমি ভাবতুম ভালমানুষ ছেলে! কি দেখা হচ্ছিল শুনি? বলিয়া সে বুকের কাপড়টা টানিয়া দিল।

অমর নীরদার মুখের পানে চাহিয়া বুঝিল সে রাগ করে নাই। তখন তার মনের সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। সে ধীরে

ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, এতদিন এসেছি, আমার কাছে আস না কেন ?

মুচকি হাসিয়া নীরদা বলিল, ভয় করে! কি জানি যদি রসগোল্লার মত টপ করে' আমায় গালে পুরে দাও ?

সাহস পাইয়া অমর বলিল, তা ইচ্ছে যে হয় না তা বলতে পারি না।

নীরদা বলিল, সত্যি ?

অমরের পানে সে একটা দৃষ্টিবাণ হানিল।

সেদিন নির্জ্জনে বসিয়া যৌবনপীড়িত নর-নারীর মধ্যে বহুক্ষণ বাকযুদ্ধ চলিল। তাহার মধ্যে অমর কখন যে নীরদার পাশে গিয়া বসিয়া তার কোমল হাতখানি নিজের দুই হাতের মধ্যে বন্দী করিয়াছিল তা তার মনেই ছিল না। যে-ইচ্ছা বাক্যে প্রকাশ করিতে বাধ-বাধ ঠেকিতেছিল তাহা সে কামনায়-ভরা দৃষ্টি দিয়া কেবলি বলিতে লাগিল।

ঢের হয়েছে! এইবার লক্ষ্মীছেলের মত ঘরে গিয়ে বই পড়গে—বলিয়া নীরদা উঠিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

অমর ঘরের মধ্যে উঠিয়া গিয়া আরব্য-উপন্যাস পড়িতে পড়িতে ভাবিতে লাগিল, উপন্যাস তাহলে মিথ্যা নয়!

ক্রমশঃ

কালি ও কলম

শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী

কালি ও কলমে আঁকি মোরা আলো,
মন্দভালোর রঙে,
হাসিকান্নার তুলি টেনে যাই
নিত্য নূতন ঢঙে!
কোথাও সোনালি কোথা ঘন নীল,
কোথাও অরুণ লিখা,
তিমিরের কালো চিরিয়া বসাই
তারকার দীপ-শিখা!
ছায়াপথে তাই আঁধার মিলায়
আকাশ-প্রদীপ জ্বলে,
পথ চিনে সবে নামে ধরণীতে
অতীতেরা দলে দলে!

কালি-কলম

অগাধ অতল জলধি-সলিল
লেখনীরে দিল কালি ;
উতলা প্রাণের যত কথা আছে
তারি মুখে দিব ঢালি।
মানস পথের মরালেরে বাঁধি
এনেছি কলমখানি,
মনের বাসনা, হে কমলাসনা
রচিব নূতন বাণী !
কালি ও কলমে তাই জাগে আলো
মন্দে-ভালোয়-মেশা,
কিছুতে মেটে না অফুরাণ এই
কেবলি লেখার নেশা !
যেন চকিতের বিজুলির লেখা
ক্ষণিকের শুধু আলো,
অসীম তবুও অবারিত চোখে
তাই এত লাগে ভালো !
কলমে কালিতে হবে যে বলিতে
নিয়ত নূতন কথা,
কত কিছু তার হাসির কাহিনী
দুখের কত না ব্যথা !

চয়নিকা

লেখা

শ্রী প্রমথ চৌধুরী

লেখা জিনিষটে আমার অতিশয় প্রিয়। যদি তা না হত তাহলে আমি একজন লেখক হয়ে উঠতুম না। কারণ লেখবার প্রবৃত্তি না থাকলে লেখক হওয়া যায় না। আর অপর দেশে যাই হোক বাঙলাতে আজও সুধু ঐ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যই লোকে লেখে। এই কারণে নতুন লেখকের আবির্ভাবই আমার মনে উৎসাহের সঞ্চার করে।

বাঙলা ভাষা আমরা সকলেই ভালবাসি এবং সেই কারণে সকলেই চাই যে তার শ্রীবৃদ্ধি হোক্। এ উন্নতি সাধন করা পাঠকের সাধ্য নয়, সাধ্য এক মাত্র লেখকের। পাঠকের দলের কাছে ভাষা যে তার শ্রীবৃদ্ধির জন্য দায়ী নয় তার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে আমরা ইংরাজী লেখা বই দেদার পড়ি; কেননা তা পড়তে বাধ্য হই, অথচ এ দাবী আমরা কেউ করতে পারি নে,—যে আমরা ইংরাজী ভাষার উন্নতি সাধন করছি।

আমরা যাকে উন্নতি বলি তাও আসলে সৃষ্টির একটা অঙ্গ। যাকে আমরা সৃষ্টি বলি তার কর্ত্তা যে, হয় প্রকৃতি নয় পুরুষ আর তার উন্নতির কর্ত্তা মানুষ—এ রকম কথা এযুগে কোনও দার্শনিকই বলেন না। সৃষ্টির ধারা খণ্ড খণ্ড নয়, অনন্ত এবং এক। সুতরাং ভাষার উন্নতি-সাধনের অর্থ হচ্ছে তাকে নব কলেবর দান ক'রে তার প্রাণ রক্ষা করা। কথাটা দার্শনিক হলেও সত্য।

এখন ভাষার নব কলেবর দান করতে পারেন কে? অবশ্য পাঠক নন—লেখক। কারণ পাঠক হচ্ছেন সাহিত্যের ভোক্তা মাত্র, তার কর্ত্তা হচ্ছেন লেখক। ইকনমির ভাষায় বলতে হলে লেখককে producer বলতে হয় আর পাঠককে consumer. আর লেখক যা produce করবে পাঠক তাই consume করতে বাধ্য—কারণ কোন কিছু produce করা তার ধর্ম্ম নয়। ভাষাকে নব কলেবর দিতে পারে সুধু নতুন লেখক। লেখক হিসেবে নতুন হলেই তার লেখা নতুন হয় না। নতুনের প্রধান পরিপন্থী অতীত নয় বর্ত্তমান। কারণ যে অতীত বর্ত্তমানে রূপান্তরিত হয় নি তারও কোনও শক্তি নেই—কেননা তা মরা অতীত। এ কথা বলার উদ্দেশ্য নতুন লেখকদের এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে বর্ত্তমান পুরোনো লেখকদের মায়া কাটাতে না পারলে তাঁরা নতুন লেখক হতে পারবেন না। ধরুন আমাকে যদি পাঁচজন লেখক বলে মান্য করে তাতে অবশ্য আমি নিজেকে সম্মানিত মনে করি। কিন্তু আমি এ মনোভাবের সাক্ষাৎ পেতে চাই পাঠকের মনে—লেখকের মনে নয়। যে লেখক মনে মনে আমাদের লেখক হিসেবে বাতিল করে দিতে না পারেন তাঁর লেখায় তাঁর স্বধর্ম্ম ফুটে উঠবে না; আর তার ভিতর ভাবের ও ভাষার নূতন চেহারা দেখতে পাব না। নূতন লেখকের জপমন্ত্র হওয়া উচিত সোহং। যে লেখকের মনে এ ধারণা নেই, তিনি সাহিত্যের আসরে হবেন সুধু দোহার, মূল-গায়েন নয়। আর যার মনে এ ধারণা আছে তিনি হবেন হয় নূতন লেখক নয় অ-লেখক। অ-লেখক হবার ভয় যার আছে তাঁর কলম ধরা উচিত নয়।

আমার কথা যে ঠিক্ তার প্রমাণ স্বরূপ সমাজের আর একটি ক্ষেত্র থেকে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। সাহিত্য বস্তু যে কি তা সকলে জানুন আর নাই জানুন পলিটিকস্ যে কি আবালবৃদ্ধবণিতা জানে। আর এ ক্ষেত্রে নব পলিটিসিয়ানরা যদি সুরেন্দ্রনাথকে বাতিল করে দিতে না পারতেন তাহলে তাঁরা এ যুগের সব বড় বড় পলিটিসিয়ান হতে পারতেন না। আর পুরোনো পলিটিসিয়ানদের সঙ্গে

নতুন পলিটিসিয়ানদের প্রভেদ কোথায়? একমাত্র কথা কইবার ভঙ্গীতে। অর্থাৎ নব পলিটিসিয়ানরা, পলিটিক্সের একটা নবরীতির অর্থাৎ styleএর সৃষ্টি করেছে। এর থেকে অনুমান করা যায়, যে নূতন লেখকরা পুরোনো লেখকদের বাতিল না করে দিলে সাহিত্যের নবরীতির সৃষ্টি করতে পারবে না। আর নবরীতি গড়তে পারলে পাঠকেরও অভাব হবে না। তেড়েফুঁড়ে লিখতে পারলে পাঠক সমাজ বলবে, "জীতা রও তোম্‌ভি মিলিটারি"। আমার কথা আমি স্পষ্ট করে বলতে পেরেছি কি না জানিনে। কিন্তু আসল বক্তব্য এই যে নূতন লেখকদের কাছ থেকে এই আশা করি যে তাঁরা বাঙলা সাহিত্যের একটি নব পর্য্যায়ের সৃষ্টি করবেন, কারণ তাঁরা যদি তা না করেন তাহলে বঙ্গ সরস্বতী যেখানে আছেন সেইখানেই থেকে যাবেন, এক পাও অগ্রসর হতে পারবেন না।

নূতন লেখকেরা পুরোনো লেখকদের মুখাপেক্ষী না হলেই যথার্থ নূতন লেখক হয়ে উঠবেন।

—লেখা, বৈশাখ, ১৩৩৪

আপন কথা

সাইক্লোন

শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এটা জানি তখন—দিন আছে রাত আছে আর তারা দুজনে এক সঙ্গে আসে না আমাদের তিন তলার ঘরে! এও জেনেছি বাতাস একজন ঠাণ্ডা, একজন গরম, কিন্তু তাদের দুজনের কারো একটা করে ছাতা নেই গোল-পাতার—রোদে পোড়ে, বর্ষায় ভেজে ওদের গা!

এও জেনে নিয়েছি যে একটা একটা সময় রোদ অনেকগুলো বাইরে থেকে ঘরে এসেই জানলাগুলোর কাছে একটা একটা মাদুর বিছিয়ে রোদ পোহাতে বসে যায়; কোনদিন বা রোদ একজন হঠাৎ আসে খোলা জানলা দিয়ে সকালেই—তক্তপোসের কোণে বসে থাকে সে, মানুষ বিছানা ছেড়ে গেলেই তাড়াতাড়ি গড়িয়ে নেয় রোদটা একবার বালিসে তোষকে চাদরে আমার খাটেই—তারি পর চট্ করে রোদ বিছানা ছেড়ে দেওয়াল বেয়ে উঠে পড়ে কড়ি-কাঠে—ধরা পড়ার ভয়ে! ছাতের কাছেই আল্‌সের কোণে দুটো নীল পায়রা থাকে, জানি আলো হলেই তারা দুজনে পড়া মুখস্ত করে—পাক্ পাখম্ সেজ্‌দী মেজ্‌দী।

বন্ধ খড়খড়ির একটু ফাঁক পেয়ে জানি রাতে আসে এক এক দিন একফোঁটা সাদা প্রজাপতির মতো আলো, মাথার বালিসে ডানা বন্ধ করে ঘুমোয় সে, হাত চাপা দিলে হাতের তলা থেকে হাতের উপরে উঠে বসে—এমন ছোট্ট এমন চটুল যে বালিস চাপা দিলেও তাকে ধরে রাখা যায় না বালিসের উপরে চট করে উঠে আসে, চিৎ হয়ে তার উপর শুয়ে পড়িতো দেখি পিঠ ফুঁড়ে এসে বসেছে সে আমারি নাকের ডগায়, উপুড় হয়ে চেপে পড়লেই মুস্কিল বাধে তার—ধরা পড়ে যায় একেবারে এটা

নিশ্চয় করে নিয়েছি তখন! পড়তে শেখার আগেই, দেখতে শুনতে চলতে বলতে শেখারও আগে ছেলেদের গ্রহনক্ষত্র, জলস্থল, পশুপক্ষী, আকাশ বাতাস, গাছপালা, ফুলফল, দেশ বিদেশ ইত্যাদির কথা বেশ করে জানিয়ে দেবার জন্তে বইগুলো তখন ছিলই না—বই লিখিয়েও ছিল না—কাযেই খানিক জানি তখন নিজে নিজে, দেখে কতক ঠেকে কতক শুনে কতক ভেবে ভেবেও কতক বা জানি! আমিই দিচ্ছি পরীক্ষা তখন আমারি কাছে, কাযেই পাশই হয়ে চলেছি জানার এবং শোনার পরীক্ষাতে! আমাদের শান্তিনিকেতনের জগদানন্দ বাবুর পোকমাকড় বলে বই কোথায় তখন? কিন্তু মাকড়সার জাল আমি মাকড়সাকে শুদ্ধু দেখে নিয়েছি আর জেনে ফেলেছি—মাকড় মরে গেলে ধোকড় হয়ে খাটের তলায় কম্বল বোনে রাতের বেলায়। মাছের কথা পড়া দূরে থাক মাছ খাবারই উপায় নেই তখন কাঁটা বেছে না দিলে, কিন্তু এটা জেনেছি যে ইলিশ মাছের পেটে এক থলিতে থাকে একটু সতীর কয়লা, অন্য থলিটাতে থাকে ঘোড়ার খুর, একটুকরো বামুণের পৈতে টিকৃটিকির ল্যেজ এমনি সব নানা খারাপ জিনিষ যা মাছ কোটার বেলায় বার করে না, ফেলে দিলে মুস্কিল বাধায় খাবার পরে মাছটা পেটে গিয়ে! জেনেছি সব রুই মাছগুলোই পেটের ভিতরে একটা করে ভুঁই-পটকা লুকিয়ে রাখে, জলে থাকে বলে পটকাগুলো ফাটাতে পারে না, ডাঙ্গায় এলেই মাছ মরে যায় পট্‌কা ফাটাতে পায় না, তাই তাদের দুঃখু থাকে, কোটার বেলায় পেট চিরেই পট্‌কাটা মাটিতে ফাটিয়ে দিতে হয়, না হলে মাছ রাগ করে ভাজা হতে চায় না, দুঃখে পোড়ে নয় তো গলায় গিয়ে কাঁটা বেঁধায় হঠাৎ! ফলের বিচি খেলে গাছ বার হয় মাথা ফুঁড়ে! জোনাকি সে আলো খুঁজতে পিদুমের কাছে এল তো জানি লক্ষণ খারাপ—তখন তারা বল্লেই জোনাকি পালায় দোষও কেটে যায় ঘরের হাওয়ার ফুস্‌মন্তরে! বটতলায় ছাপা হাজার জিনিসের বইখানার চেয়েও মজার একখানা বই, তারি পাণ্ডু-লিপির মাল-মসলা সংগ্রহ করে চলেছে বয়েসটা। আমার তখন বড় হয়ে ছাপাবার মৎলবে কিম্বা সর্ট হেণ্ড রিপোর্টারের মতো সাঁট অক্ষরে টুকে নিচ্চে সব কথা এ মনেই হয় না! আজও যেমন বোধ করি যাকিছু সবই এরা আমাকে আপনা হ'তে এসে দেখা দিচ্ছে, ধরা দিচ্ছে।এসে এরা, খেলতে আসার মতো আসছে, নিজে থেকে তাদের খুঁজতে যাচ্ছিনে, নিজের ইচ্ছা মতো তারাই এসে চোখে পড়ছে আমার এবং যথাভিরুচি রূপ দেখিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে খেলুড়ির মতো খেলা শেষে; সে পঞ্চাশ বছর আগে তখনও তেমনি বোধ হতো—দেখছি না আমি, কিন্তু দেখা দিচ্ছে আমাকে সবাই, আর এই করেই জেনে চলেছি তাদের নির্ভুল ভাবে। রোদ বাতাস ঘর বাড়ি ফুল পাতা পাখি এরা সবাই তখন কি ভুল বোঝাতেই চল্লো অথবা স্বরূপটা লুকিয়ে মন ভোলানো বেশে এসে সত্যি পরিচয় ধরে দিয়ে গেল আমাকে তা কে ঠিক করে বলে দেয়? এ বাড়িটা তখন আমাকে জানিয়েছে মাত্র তেতলা সে, তেতলার নিচে যে আর একটা তলা আছে দোতলা বলে যাকে এবং তারও নিচে একতলা বলে আর একটা তলও আছে এ কথা জানতেই দেয়নি বাড়িটা, কিন্তু সে জলে বা হাওয়ায় ভাসছে এ মিছে কথাটাও তো বলেনি বাড়িটা, অসত্য রূপটাও তো দেখায়নি! আপনার খানিকটা রেখেছিল বাড়ি আড়ালে খানিকটা দেখতে দিয়েছিল, তাও এমন একটি চমৎকার দেখার এবং না দেখারও মধ্যে দিয়ে যে তেমন করে সারা বাড়ির ছবি ধরে কিম্বা ইঞ্জিনিয়ারের প্লান ধরে অথবা আজকের দিনে সারা বাড়ি খানা ঘুরে ঘুরেও দেখা সম্ভব হয় না। আজ-কের দেখা এই বাড়ি, সে একটা স্বতন্ত্র বাড়ি বলে ঠেকে; যেটা সত্যিই এখনো দেখা দেয়নি আমাকে কিন্তু সে দিনের সেই একতলা দোতলা নেই এমন যে তিনতলা সে এখনো আমার কাছে জানা তিন তলা! নিজে থেকে জানা শোনা দেখা ও পরিচয় করে নেওয়া এ আমার ধাতে নেই এখনো, তখনও ছিল না—কেউ কাছে এলো তো

হলো, ভাব কেউ কিছু দিয়ে গেল তো পেয়ে গেলেম—পড়ে পাওয়া জিনিষের আদর বেশি এখনো আমার কাছে, খুঁজে খুঁজে খেটে খুটে বুদ্ধি খাটিয়ে ধরা জিনিসের বড় একটা মূল্য নেই বল্লেই হয় আমার কাছে! আমি যদি সাহেব হতেম তো অবিবাহিতই থাকতেম, কেননা কোর্টসিপটা চলতো না বেশিক্ষণ আমার দ্বারায় কারো-সঙ্গেই! দাসীটা চলে গেল তার যেটুকখানি ধরে দিবার ছিল ধরে দিয়ে হঠাৎ, এমনি হঠাৎ একদিন উত্তর পুব কোণের ছোট ঘরটাও তার যা কিছু দেখাবার ছিল দেখিয়ে যেন সরে গেল আমার কাছ থেকে! শীত গ্রীষ্ম বর্ষা এসব কিছুই ছিল না এক সময় আমার কাছে! ছোট ঘরে হঠাৎ এক দিন সকালে জেগেই দেখলেম লেপের মধ্যে থাকতে থাকতে কোন্ এক সময়ে শীতকাল গিয়ে গরমকাল এলো! আজ সকালে আমার কপালটায় ঘাম দিয়েছে, আজই দাসীরা বিছানার তলায় লেপটাকে তাড়িয়ে দেবে, আজ রাতে খোলা জানলায় দেখা যাবে আকাশে তারাগুলো জ্বলছে আর আমাকে একটা সুতোর জামার উপরে আর একটা সুতোর জামা পরে নিতেই হবে না, সকাল থেকে মোজা পায়ে দিয়ে কর্ম্মভোগ ভুগতেও হবে না জেনে ফেল্লেম সবই হঠাৎ! সেই ছেলেবেলা থেকে আজ পর্য্যন্ত না-জানা থেকে হঠাৎ-জানার সীমাতে পৌছনোর বেলা একটা কোনো নির্দ্দিষ্ট ধারা ধরে অঙ্কের যোগ বিয়োগ ভাগ ফলটার মতো এসে গেল জগৎ সংসারের যা কিছু তা হ'ল না তো আমার বেলায়, কিম্বা ঘটা করে আগে থাকতে জানান দিয়ে ঘটলো ঘটনা সমস্ত তাও নয়—হঠাৎ এসে বল্লেও তারা বিস্ময়ের পর বিস্ময় জাগিয়ে—আমি এসে গেছি! চমকী দেবী বলে নিশ্চয় জানি একজন আছেন, কাযই যাঁর চমক ভাঙ্গিয়ে দেওয়া গোড়া থেকেই। দেখার পুঁজি জানার সম্বল তিল তিল খুঁটে ভরে তুলতে কত দেরী লাগতো যদি চমকী না থাকতেন! কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের ছাত্রের মতো ষ্টেপ্-বাই-ষ্টেপ্ পড়তে পড়তে চলতে দিলেন না দেবী আমাকে—হঠাৎ-না পড়া হঠাৎ পড়া দিয়ে শিক্ষা করলেন সুরু তিনি! যে সময় এক খিদে পাওয়া ছাড়া আর কিছুকে পাচ্ছিনে পেতেও চাচ্ছিনে—তখন একদিন সে বহুকাল আগের একটা ঝড় পাঠালেন আমাকে দেখাতে চমকী দেবী। ঝড়টা এসেছিল রাতের বেলায় এটুকু মনে আছে, ঝড়ের আসার পূর্ব্বের ঘটনা—ঘনঘটা বজ্র বিদ্যুৎ বৃষ্টি বন্ধ ঘর অন্ধকার কি আলো কিছুই মনে নেই! ঘুমিয়ে পড়েছি তখন হঠাৎ উঠলো তেতলায় ঝড়—কেবলি শব্দ কেবলি শব্দ, বাতাস ডাকে, দরজা পড়ে, সিঁড়িতে ছুটোছুটি পায়ের শব্দ ওঠে দাসী চাকরদের। হঠাৎ দেখে ফেল্লেম চিনেও ফেল্লেম—দুই পিসিমা দুই পিসে মশায় মা বাবা মশায় সবাইকে যেন প্রথম সেইবার! তিনতলার এঘর ওঘর সেঘর সব কটা ঘরই যেন ছুটোছুটি করে এসে একসঙ্গে একবার আমাকে দেখা দিয়ে পালিয়ে গেল! এর পরেই দেখছি বড় সিঁড়ির মাঝে একেবারে চৌতলার ছাত থেকে মোটা একগাছ শিকলে বাঁধা লোহার একটা গির্জ্জের চূড়োর মতো কর্ত্তার আমলের পুরাণো লণ্ঠন—যেটা ঝোলে এখনো—সেটাকে নিয়ে শিকল শুদ্ধ বিষম দোলা দিচ্ছে ঝড়। নন্দ ফরাস লণ্ঠনটাকেই ভালবাসে—সন্থু একগাছা শণের দড়ি দিয়ে কোনো রকমে শিকল শুদ্ধ লণ্ঠনকে টেনে সিঁড়ির কাঠরায় বেঁধে ফেলতে চাচ্ছে—তুফানে পড়লে বজরাকে যেভাবে মাঝি চায় ডাঙ্গায় আট্‌কে ফেলতে ঠিক তেম্‌নি ভাবটা তার! কোন দিন এর আগে জানিয়েছিল শিকল লণ্ঠন সিঁড়ি ও ফরাস আপন আপন কথা আমাকে তা একটুও মনে নেই, কিন্তু এটা বেশ মনে হচ্ছে সেই প্রথম গিয়ে পড়লেম দোতলায় বৈঠকখানার মাঝের বড় ঘরটাতে! কে যে আমাকে নামিয়ে আনলে—হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে আনলে কিম্বা কোলে করে আনলে—তাও মনে নেই, কেবল মাঝের ঘর মনে আছে—সেখানে সারি সারি বিছানা কৌচ টেবেল সরিয়ে মাদুরের উপরে পেতে দিতে ব্যস্ত চাকর দাসীরা, হলদে রংএর বড় বড় কাঠের দরজা সারি সারি সব কটাই বন্ধ হয়ে গেছে, ঘরে বাতাস আসতে পারছে না, চাকরাণীগুলো দুধের বাটি জলের

ঘটি পানের বাটা পিতলের ডাবর ঝন্ ঝন্ করে এনে জমা করছে ঘরের কোণে, এরি মাঝে মাদুরে বসে দেখছি—মাথার উপরে সাদা গেলাপ মোড়া একটার পর একটা বড় ঝাড়, দেয়ালে দেয়ালে দেয়ালগিরি ছোট বড় সব অয়েল পেন্টিং বাড়ির লোকের, জানছি ঝড় যেন একটা কী জানোয়ার, গর্জ্জন করে ফিরছে বন্ধ বাড়ির চারিদিকে, দরজা গুলোয় থেকে থেকে ধাক্কা দিয়ে কেবলি পথ চাচ্ছে ঘরে ঢোকবার! এক সময় হুকুম হল ছেলেদের শুইয়ে দেবার। দক্ষিণ শিয়রে মায়ের কাছে সেদিন মেঝেতে পাতা শক্ত বিছানায় মুড়ি দিয়ে শুয়ে নিলেম কিন্তু ঘুমিয়ে গেলেম না অনেক রাত পর্য্যন্ত, শুনতে থাকলেম বাতাস ডাকছে, বৃষ্টি পড়ছে, আর দুই পিসি পান দোক্তা খেয়ে বলাবলি করছেন এমনি আর একটা আশ্বিনে ঝড়ের কথা। সেই রাতে একটা ইংরিজি কথা জানলেম—সাইক্লোন! ঝড়ের এক ধাক্কায় যেন বাড়ির অনেকখানি, বাড়ির মানুষদের অনেকখানি, সেই সঙ্গে ঝড়ই বা কি সাইক্লোনই বা কাকে বলে জানা হয়ে গেল! এক রাত্তিরে যেন মনে হল অনেকখানি বড় হয়ে গেছি, জেনেও ফেলেছি অনেকটা ঘরকে—বাইরেকেও।

—বঙ্গবাণী, বৈশাখ, ১৩৩৪।

বদ্রেজিন্

ম্যাক্সিম্ গোর্কি

কানা বদ্রেজিন্ মুর্দ্দাফরাসের কাজ করে। মাটি কাটে আর কবর খোঁড়ে।

অনেকদিন হইতে তাহার একটি কন্সার্টিনা বাঁশির বড় সাধ! আমি তাহাকে একটি কিনিয়া দিয়াছিলাম। বুড়ার সেদিন খুশী যেন আর ধরে না! আনন্দে আত্মহারা হইয়া স্তিমিত শান্ত চোখদুটি বুজিয়া বুড়া তাহার হাতদুটি বুকের উপর চাপিয়া একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে। বলে,—"আঃ!"

একেবারে যেন ছেলে মানুষ!

তাহার পর আবেগটা একটুখানি শান্ত হইয়া আসিলে ন্যাড়া মাথাটা নাড়িয়া সে বিড় বিড় করিয়া একটানে বলিতে থাকে,—"আচ্ছা, আচ্ছা,…তা…আমি—বুঝলে? এর প্রতিদান আমি দেব এলেক্সি ম্যাক্সিভিচ্! তুমি যখন মরবে…তোমার কেমন যত্ন নিই—দেখো বাঁশিটি যেন তাহার সঙ্গী।

কবর খুঁড়িতেছে,—তখনও সঙ্গে; আবার কাজ যখন তাহার শেষ হইয়া আসে,—বদ্রেজিন্ ধীরে ধীরে একটুখানি দূরে গিয়া চুপ করিয়া বসে, বাঁশিটি বাহির করিয়া পল্‌কা-নাচের সুর বাজায়।

বাজাইতে জানে সে মাত্র ঐ একটি সুর।

কখনও বলে, "ট্রাং-ব্র্যাং বাজাই।"

আবার কখনও বলে, "ডার্ণ ব্লার্ণ।"

যখন যা খুশী!

একটি শবদেহ আসিয়াছে। পুরোহিত কাজ করিতেছেন। বেশি দূরে নয়—কাছে বসিয়াই বদ্রেজিন্ তখন তাহার বাঁশি লইয়া পাগল!

কাজ শেষ হইল। পুরোহিত তাহাকে কাছে ডাকিয়া খুব খানিকটা তিরস্কার করিয়া দিলেন।

"মৃত ব্যক্তির অপমান করা হয়—জানিস্? শুয়োর কোথাকার! এমন করে' আর বাজাস্ টাজাস্‌নে কোনোদিন!"

বস্রেজিন্ আমার কাছে আসিয়া নালিশ জানাইল।

বলিল, "জানি। জানি—আমার অন্যায়েই হয়েছে না হয় ধরে নিলাম। কিন্তু মরা লোকটার যে দুঃখু হলো—তা ও জানলে কেমন করে' বল ত?"

বস্রেজিনের দৃঢ় বিশ্বাস—নরক বলিয়া কোথাও কিছু থাকিতে পারে না।—আছে শুধু স্বর্গ,—পবিত্র একটি স্বর্গ মাত্র! তাহার মতে, আত্মা চলিয়া যায়, আত্মাকে কেহই ধরিয়া রাখিতে পারে না। পুণ্যবান আত্মা যায় স্বর্গে,—আর পাপী যাহারা, তাহাদের আত্মা দেহটিকে জড়াইয়া কবরেই পোঁতা থাকে, তাহার পর মাটি ও পোকায় দেহটা ধীরে ধীরে খাইয়া ফেলে; মাটি তখন আত্মাকে আর সেখানে থাকিতে দেয় না, জোর করিয়া বাতাসে উড়াইয়া দেয়—আর বাতাস তাহাকে ধূলি ও আবর্জ্জনার মধ্যে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়া তাহার কাজ শেষ করে।

"বাস্!" বস্রেজিন্ বলে, "এই ত' নিয়ম

নিকোলাভার বয়স মাত্র ছয়। আমারই মেয়ে বড় ভালবাসিতাম।

মেয়েটি হঠাৎ সেদিন মারা পড়িল।

দেহটি তার কবর দিতে আসিয়াছিলাম।

কাজ শেষ হইলে লোকজন সব চলিয়া গেল। কস্তুটিয়া বস্রেজিন্ কোদাল্ দিয়া কবরের উঁচু মাটিগুলি টানিয়া টানিয়া সমান করিতেছিল। আমাকে একটুখানি সান্ত্বনা দিবার জন্যই বোধ করি সে কাজ করিতে করিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিল,

"ভাবছ কি,—ভেবো না, ভেবো না।"

বলিল, "মরে' ওরা এখান থেকে বেশ ভালই থাকে। ভাল জায়গায় যায়,—ভাল ভাল কথা বলে। আমরা যেমন করে' কথা বলি তার চেয়ে আরও সুন্দর, আরও চমৎকার হয় ত'!—আর···আর···আমার মনে হয় কি জানো? হয়ত কথাই বলে না,—দিনরাত হয়ত বেহালাই বাজায়।"

এই সুরের প্রতি তাহার একটা অদ্ভুত অনুরাগ দেখিয়াছি।

সুর শুনিলে লোকটা যেন একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়ে,—দুনিয়ার সব কিছু ভুলিয়া যায়।

হয়ত কোথাও যুদ্ধের বাজনা বাজে, হয়ত বা রাস্তায় কেহ কিছু বাজাইয়া পার হইয়া যায়,—অম্‌নি সে সচকিত হইয়া উঠে। শব্দটা যেদিক হইতে আসে, কাণ খাড়া করিয়া গলা বাড়াইয়া সেইদিকে সে ঘন ঘন তাকায়,—হয়ত বা উঠিয়া দাঁড়ায়—হাত দুইটি পিছনের দিকে জড়ো করিয়া স্তব্ধ নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে; স্থির নিবদ্ধ কালো চোখের পাতা যেন আর পড়ে না,—মনে হয়, চোখটা যেন তাহার ঠিক্‌রাইয়া পড়িবে,—মনে হয়, ওই একটি অনিমেষ নয়নের একাগ্র দৃষ্টি দিয়া সুরটিকে সে তাহার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে।

কোনো কোনোদিন রাস্তার উপরেই হয়ত বা সে অম্‌নি করিয়া দাঁড়াইয়া পড়ে।

এম্‌নি আত্মহারা বিহ্বল হইয়া যায় যে, কোনো বিপদের আশঙ্কাই তাহার মনে থাকে না, কাহারও নিষেধ বারণ তখন তাহার কানে গিয়া পৌঁছে না।

এম্‌নি করিয়া বস্রেজিন্ দু'দুবার ছুটা ঘোড়ার মার খাইয়াছে আর মোটর-ওয়ালার চাবুক,—সে ত' কতবার!

সে বুঝায়। মনের কথা বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করে।

বলে, "এই গান-টান যখন শুনি আমি, তখন আমার মনে হয় কি জানো?—মনে হয় যেন কোনো

জলে ডুবে গেছি—একেবারে নদীর তলায়—যেন তলিয়ে যাই।"

বস্রেজিনের আর একটি গোপন ব্যথার সন্ধান আমি জানি।

গির্জ্জার একটি ভিখারিণী মেয়ে। সরোকিনা তার নাম।

গির্জ্জার প্রাঙ্গনে বসিয়া সে ভিক্ষা করে। বয়স কম নয়।

বস্রেজিন্ চল্লিশের পারে,—মেয়েটির বোধকরি কিছু বেশিই হইবে।

একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম. "একাজ তুমি কেন কর বস্রেজিন্?"

একটুখানি থামিয়া এদিক-ওদিক তাকাইয়া সে জবাব দিল "কেন জানো?—মেয়েটার নিজের বলতে কেউ নেই ত্নিয়ায়। সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই ম্যাক্সিভিচ্।"

বস্রেজিন্ একটা ঢোঁক গিলিয়া কহিল, "আর·· এই কাজটা আমি যেন ভালবাসি ভাই। মনে হয়, সান্ত্বনা দিই,—যাদের কেউ নেই ত্নিয়ায়, তাদের বুঝিয়ে বলি···

"আমার নিজের কোনও ত্বঃখু নেই,—বুঝলে? কিন্তু ···আচ্ছা···তোমার কি মনে হয়,—মানুষের ত্বঃখু কি একটুও কমানো যায় না?"

প্রকাণ্ড একটি বার্চ্চ-গাছ। তাহারই নীচে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিলাম। জুন মাসের বোধ করি মাঝামাঝি।

হঠাৎ বৃষ্টি নামিল।

বস্রেজিনের টাক-পড়া খুলির উপর ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে!

বৃষ্টি পড়ারও যেন একটা সুর আছে!

বেচারা তাইতেই খুসী।

হঠাৎ বলিয়া উঠিল,

"আচ্ছা ম্যাক্সিভিচ্;—মুছে দেওয়া যায় না?—একেবারে শুকিয়ে দেওয়া যায় না?"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি?—"

বলিল, "ওদের ওই চোখের জল?"

বলিয়াই ঘন কুয়াসাচ্ছন্ন বৃষ্টিধারার দিকে বস্রেজিন্ তাহার উদাস দৃষ্টি মেলিয়া ধরিল!

একটিমাত্র ভোঁতা চোখের সে কি তীব্র ধার!

বৃষ্টিধারা ভেদ করিয়া চলে।

জানিতাম তাহার পেটের ভিতর একটা নালী-ঘা হইয়াছে।

ডাক্তারেরা বলেন, ও ব্যথা নাকি সারে না।

মড়ামানুষের মত গায়ে একটা বিশ্রী গন্ধ ওঠে!—বেচারা কিছু খাইতে পারে না, খাইলেও বমি হয়।

কিন্তু তবু সে তাহার কাজ করিয়া চলে।

কাজ করে আর হাসে।

হঠাৎ একদিন শুনিলাম, বস্রেজিন্ মরিয়াছে।

মরিয়াছে চমৎকার!

আরও ত্ব'জন মুর্দ্দাফরাসের সঙ্গে সে নাকি তখন তাস খেলিতেছিল।

শ্যালট-বাসিনী

(আলফ্রেড লর্ড টেনিসন)

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

১

নদীতীরে ক্ষেতগুলি যব সরিষার
ঢেকে আছে সারা ভুঁই এপার-ওপার—
যেন ছুঁয়ে আছে দূর আকাশ-কিনার,
একটি সে পথ গেছে মাঠের মাঝার
ক্যামেলট-শহরের পানে ;
প্রবাসী পথিক কত যায় আর আসে,
চেয়ে চেয়ে দেখে যেথা 'লিলি'গুলি হাসে,
শ্যালট নামে সে দ্বীপ—তারি চারিপাশে,
দ্বীপটি নদীর মাঝখানে।

'আস্‌পেন্‌' শিহরায়, 'উইলো' খনে-খনে
শাদা হয়ে যায় মৃদু বায়ুর বীজনে,
জলতলে কাঁটা দেয় কালো ঢেউ সনে,
বহে নদী নিরবধি আপনার মনে—
যেইদিকে ক্যামেলট-পুরী।
চারিটি দেউড়ি আর চারিটি প্রাচীর
সমুখে একটু জমি, ফুলেদের ভিড়—
নিবসে সেথায় সেই শান্তি-সুনিবিড়
দ্বীপটিতে শ্যালট-সুন্দরী।

'উইলো'-বনে-ঢাকা তীর, কিনারাটি দিয়ে
বড় বড় ভারী ভরা যায় বেয়ে নিয়ে

গুণ-টানা ঘোড়া ; কভু পান্‌সীর নেয়ে
ফুলায়ে চিকণ পাল, দ্রুত তরী বেয়ে
চলে' যায় ক্যামেলট পানে।
কেহ কি দেখেছে কভু হাতখানি তাঁর—
বাতায়নে দাঁড়াইতে শুধু একবার ?
শ্যালট-বাসিনী যিনি—সারা দেশটার
কেউ তাঁর পরিচয় জানে ?

শুধু যবে কৃষাণেরা বিহান-বেলায়
শীষে-ভরা যবগুলি কেটে থাক্ ছায়,
শোনে গান—জলে তার মাধুরী লুটায়,
নিরমল স্রোতখানি যবে বয়ে যায়
ঘুরে ঘুরে ক্যামেলট পানে ;
দিনশেষে উঁচু মাঠে সাঁজের হাওয়ায়
আঁটিগুলি সাজাইতে চাঁদিনী-বেলায়,
'শ্যালটের পরী বুঝি ওই গান গায়'—
শুনে তারা কয় কানে কানে।

২

সেইখানে বসে' সারা দিবস-রজনী
রঙীন সুতায় বোনে মায়ার বুননি,
শুনেছে কি শাপ আছে—কিসের অশনি
পড়িবে তাহার শিরে, চাহিবে যেমনি—
যেই দিকে ক্যামেলট-পুরী।
কি যে সেই অভিশাপ কিছু জানা নেই,
তাই বসে' বসে' বোনে আপন মনেই,

নাই আর কাজ কোনো,—একা থাকে সেই
ঘরটিতে শ্যালট-সুন্দরী।

বারোমাস টাঙানো সে দেয়ালের গায়—
মুখোমুখি একখানি বড় আয়নায়
বাহিরের যত ছবি চমকিয়া যায়;
তারি মাঝে পথখানি দেখিবারে পায়—
ক্যামেলট পানে গেছে মাঠ ঘাট বেয়ে;
তারি মাঝে পাক খায় ঘূর্ণী নদীর,
তারি মাঝে চোখে পড়ে চাষাদের ভিড়,
তারি মাঝে রাঙা-বাস গ্রামবাসিনীর
ফুটে ওঠে, হাটে যায় পসারিনী মেয়ে।

যুবতীরা চলে' যায়—প্রাণে কত সুখ,
মোহান্তর ঘোড়া ওই হাঁটে টুগবুগ্।
কভু বা কোঁকড়া-চুল রাখালের মুখ,
মাথায় বাব্রি, গায়ে লাল টুক্টুক্
জামা-পরা চাকরেরা ক্যামেলটে ধায়
কখনো সে আয়নার নীলাকাশ তলে
ঘোড়া চড়ি' যায় বীর যুগলে যুগলে—
আহা, কোনো বীর কভু নারীপূজা-ছলে
রাখিবে না মনখানি তার দুটি পায়!

তবু সে বুনিতে সদা সাধ হয় বটে
আয়নার ছায়া-ছবি, যবে নদীতটে
শব লয়ে যায় রাতে দূর ক্যামেলটে—
সাথে কত রোশ্নাই, আকাশের পটে
মুকুটের চূড়া সারি সারি;

কিম্বা যবে চাঁদ ওঠে মাথার উপর,
বিজনে বেড়াতে আসে নব বধূ-বর,
"ছায়া আর ছায়া দেখে প্রাণ জরজর !"
—কেঁদে কয় শ্যালট-কুমারী।

৬

ঘর হ'তে এক রশি—যেথা নদীপারে
পড়ে আছে যবগুলি কাটা ভারে ভারে,
ঘোড়া চড়ি' ল্যান্সেলট তাহারি মাঝারে
চলেছেন, ছু'পায়ের কবচে ছু'ধারে
ঝলসিছে খর রবিকর।
হলুদ মাঠের বুকে ঢালখানি জ্বলে—
নারী এক আঁকা তায়, তারি পদতলে
যুবক সন্ন্যাসী-বীর শুধু পূজাছলে
জানু পাতি' আছে নিরন্তর।

ঘোড়ার লাগামখানি মণি-মুকুতায়
ঝলকিছে—ছায়াপথে আকাশের গায়
যেমন তারার মালা চিকি-মিকি চায়।
সোনার ঘুঙুরগুলি বাজিতেছে তায়—
চলে বীর দূর ক্যামেলটে।
কাঁধ হ'তে ঝুলে আছে কোমরে তাঁহার
ভারী এক রণভেরী, সবটা রূপার ;
সাঁজোয়ার সাজগুলি বাজে বারবার,
—শোনা যায় সুদূর শ্যালটে।

মেঘহারা নিরমল নীল নভোতলে
জড়োয়া জিনের 'পরে আলোক উছলে,
মুকুট, মুকুট-চূড়া এক সাথে জ্বলে—
একখানি শিখা যেন দিনের অনলে,
ধায় বীর দূর ক্যামেলট ;
উড়ায়ে আলোক-শিখা উল্কা যেন ধায়,
তারাময় নভোতলে লোহিত নিশায়,
পিছে পিছে আগুনের রেখা টেনে যায়,
—নদীবুকে ঘুমায় শ্যালট।

উদার ললাটে এসে পড়ে রবিকর,
ঝক্‌ঝকে খুর ঘোড়া চাপে ভূমি'পর,
মুকুটের তলে যেন মসীর নিঝর
ঢেউ-তোলা চুলগুলি পড়ে থরে-থর,
বীরবর ধায় ক্যামেলটে।
সহসা ঝলসি' ওঠে মুকুর-তিমিরে
সেই ছবি ছুই হ'য়ে, তীরে আর নীরে,—
'তা-রা লা-রা' ল্যান্সেলট গায় নদীতীরে,
শ্যালটের অতি সে নিকটে।

বুনানি ফেলিয়া বালা তাঁত ছেড়ে উঠে'
তিন পা বাড়ায়ে এল বাতায়নে ছুটে,
দেখিল সে জলতলে 'লিলি' আছে ফুটে,
দেখিল মুকুট, আর পালক মুকুটে,
আঁখি-পাখি ক্যামেলটে ধায়।
অমনি বুনানি ছিঁড়ে' উড়িল বাতাসে,
আয়না ছুখান হয়ে ফাটিল ছু'পাশে,

'এতদিনে'—কহে বালা প্রাণের হুতাশে,
'সেই বাজ পড়িল মাথায় !'

———

৪

অতি বেগে পূবে-হাওয়া স্বনিছে শ্বসিছে,
পীত-পাণ্ডু পাতাগুলি কাননে খসিছে,
কূলে কূলে কালো নদী কেঁদে উছসিছে,
নত-মেঘ ক্যামেলটে ঘন বরষিছে,
বাজপুরী যেন উদাসিনী।
একখানি তরী বাঁধা 'উইলো'-তরুতলে,
ধীরে ধীরে নেমে বালা তারি পানে চলে,
লিখিল আপন হাতে তরণীর গলে—
'শ্যালট-বাসিনী'।

যথা হেরে যোগাবেশে মহাযোগীবর
আপনারি নিয়তির কঠিন নিগড়,
সেই মত,—থির-আঁখি, পাথর-অধর—
বিপুল নদীর দূর সীমারেখা'পর
চাহিল বারেক বালা ক্যামেলট পানে।
দিন-শেষে এল যবে বিদায়-গোধূলি,
শুইয়া তরণী 'পরে রশ্মি দিল খুলি'
বিশাল নদীর বুকে তরী দুলি' দুলি'
ভেসে গেল স্রোত-মুখে বাতাসের টানে।

ধবধবে শাদা সেই বসন তাহার
এদিক ওদিক উড়ে' পড়ে বারবার,

টুপ্ টাপ্ ফেলে পাতা তরু সারে-সার,
রিনি-রিনি করে রাত্তি, স্তব্ধ চারিধার,—
ক্যামেলট পানে হের ভেসে যায় তরী।
'উইলো'-ঘেরা উঁচু পাড়, ক্ষেত-খোলা দিয়ে,
তরী চলে এঁকে বেঁকে ঘুরে ঘুরে গিয়ে,
দুই তীরে যত লোক শোনে চমকিয়ে—
শেষ গান গায় আজ শ্যালট-সুন্দরী।

কে যেন গভীর সুরে করে স্তবগান—
কভু উচ্চ কণ্ঠ তার, কভু মৃদু তান।
ক্রমে রক্ত হিম হ'ল, দেহটি অসান,
আঁধার আঁধার হ'য়ে এল দু'নয়ান,
তখনো তাকায়ে আছে ক্যামেলট পানে।
এখনো তরীটি তার পড়েনি সাগরে,
প্রথম যে বাড়ীখানি জলের উপরে,
সেইখানে পহুঁছিতে হ'ল না শহরে,
প্রাণটুকু শেষ হ'ল গানে।

দালান খিলান ছাদ গম্বুজ প্রাকার
সারি সারি বেড়িয়াছে নদীর কিনার,
তারি তলে মৃত্যু-পাণ্ডু তনুখানি তার
ক্যামেলট পানে ভেসে চলে অনিবার—
কালো জলে শ্বেত সরোজিনী।
ছুটে আসে নর-নারী নদীর সোপানে,
আসে ধনী, আসে মানী, চাহে তরীপানে,
গায়ে তার লেখা কি যে পড়ে সাবধানে—
'শ্যালট-বাসিনী'

একি হেরি ? কেবা এই ? আসিল কেমনে ?—
শতদীপ-আলোকিত রাজার ভবনে
থেমে গেল হাসি-গান, সভাসদ্‌গণে
সভয়ে দেবতা-নাম স্মরে মনে মনে,
—যত বীর রাজ-অনুচর।
বীরবর ল্যান্সেলট কি ভেবে না জানি,
কহিলেন অবশেষে—"বেশ মুখখানি !
বিভুর কৃপায় যেন শ্যালটের রাণী
শান্তি পায় মরণের পর।"

উল্‌কির মেলা

শ্রী প্রবোধকুমার সান্যাল

উল্‌কির মেলায় ভিড় সেবার খুব !

রথ-যাত্রার মেলা। মহা সমারোহ !

শহর হইতে মাল আনিয়া দোকান-বাজার বসিয়াছে, কাপড়-চোপড়, মসলা-পাতি, মনোহারী,—এমনি আরও কত কি ! খাবার দোকানের ত কথাই নাই। তেলে-ভাজা ঘিয়ে-ভাজা খাবারের গন্ধে নাকে কাপড় দিয়া রাস্তা পার হইতে হয়।

দূর দূরান্তরের গ্রাম হইতে স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা সমেত—এক একটি দল বাঁধিয়া কেহ পায়ে-পায়ে আসিয়াছে, কেহ গরুর গাড়ীতে, আবার অবস্থা যাঁহাদের একটুখানি শাঁসে-জলে, তাঁহারা এক-আধখানা ঘোড়ার গাড়ীও মোতায়েন করিয়া ফেলিয়াছেন।

মেলার খবর পাইয়া ও-পাড়ার একদল বেকার ছোক্‌রা সেদিনকার অল্প বেলাটুকুর মধ্যে ছেঁচা-বাঁশের বেড়া আর তেরপল খাটাইয়া একখানা চায়ের দোকান করিয়া বসিল। সাদা আমকাঠের বেঞ্চি আসিল, উনুন আসিল, শ-দুয়েক মাটির ভাঁড় কেনা হইল,—চাও আসিল, চিনিও আসিল ; এবার কেবল খদ্দের আসিলেই হয়।

রথের মেলা বলিয়া দূরের চটকল হইতে একদল উড়িয়া হাতে এক-একগাছি দড়ি লইয়া হল্লা করিতে করিতে একেবারে ভিড়ের মাঝখানে আসিয়া পড়িল।

জড়ের মধ্যে প্রাণ যখন হঠাৎ জাগে, তখনই বোধ করি এম্‌নি ভয়ঙ্কর হইয়া ওঠে !

বেটারা যেন দেখিতেই পায় না ! ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে এবং স্ত্রীলোকদের ঘাড়ের উপর দিয়াই বুঝি চলিয়া যাইতে চায়।

"আ মর ! রকম দেখ মুখ-পোড়াদের ! চোখের মাথা খা।"

"হাতের দড়ি গলায় তুলে দে—বাতব্বোলে বেটারা !"

কিন্তু কে কাহার কথা শোনে!—উড়িয়ারা তখন 'জগড়-নাথের গান ভাঁজিতে ভাঁজিতে দৌড়াইয়া চলিয়াছে। হাঁক্-দৈ মানে না।

রথ টানিবার সময় তখন আসন্ন অগণন মানুষের কোলাহলে কানে বুঝি তালা লাগে।

ছেলেয়-বুড়োয় একদল ক্ষুধার্ত্ত লোক রাস্তার আশে-পাশে, খাবারের দোকানের সুমুখে, ভিড়ের মধ্যে,—হ্যাংলা কুকুরের মত কিল্‌বিল্ করিয়া বেড়াইতেছে।

রসমণির হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের দলটি আসিয়া প্রকাণ্ড একটি আসর জুড়িয়া বসিয়াছে।

পায়ে হাঁটিয়াই সাকরাইলে যাইতেছিলাম। পথের মাঝে উল্‌কির মেলা। কতবার দেখিয়াছি, তবু একবার ভাবিলাম দেখিয়া যাই।

সূর্য্য ডুবিয়া গেল।

পশ্চিমে একখানা কালো মেঘ মাথা চাড়া দিয়া য়াছে। এখনই হয়ত সারা আকাশটা ছাইয়া ফেলিবে!

চায়ের দোকানে আসিয়া উঠিলাম দোকানে তখন খদ্দেরের ভিড় জমিতেছে।

কাহারও কোনোদিকে তাকাইবার অবসর নাই। গরম চায়ের দোকানে আলোচনা তখন গরম হইয়া উঠিয়াছে। আলোচনার কোনও মাথামুণ্ড নাই। যাহার যাহা খুশী!

একটি লোককে চিনিলাম। সে আমাদের গেরুয়া-ধারী হাত-খোঁড়া পঞ্চানন।

এই খোঁড়া হাতের একটুখানি ইতিহাস আছে। কিছু কিছু আমি শুনিয়াছি বটে, কিন্তু সবটুকু সে বলে নাই; খানিকটা চাপিয়া রাখিয়াছে।

বলে, "আছে ভায়া, রগড় আছে কিছু আরও। ছেলে মানুষ তুমি।"

আমার মনে হয়, পাছে সে তাহার বৈচিত্র্য এবং আকর্ষণ আমার কাছে হারাইয়া ফেলে, এই কারণে তাহার সব ইতিহাসটুকু বলে নাই।

তবে এটুকু জানি—সে বৈরাগী। এবং গেরুয়া ধারণের পর হইতে স্ত্রীলোকের ছন্দাংশেও থাকে না।

ভুরু তুলিয়া সে বলিল, "খবর কি ?"

"এম্‌নি! মেলা দেখতে এলাম।"

আর কিছু কাহারও বলিবার প্রয়োজন ছিল না!

একটা দাড়িওলা লোক ফিস্ ফিস্ করিয়া পঞ্চাননের সহিত এতক্ষণ কথা কহিতেছিল। লোকটার চেহারায় একটা কর্কশ রুক্ষতা যেন আঁকে-আঁকে দাগ কাটিয়া বসিয়াছে। কেমন যেন কাঠ-খোট্টা শক্ত শক্ত হাড়! দাড়ির খানিকটা কাঁচা, খানিকটা পাকা।

চোখ দুইটা আবার আরও ভয়ঙ্কর! মণি ঝক্‌ঝক্ করিয়া অন্ধকারে যেমন জ্বলে, লোকটার কোটর-প্রবিষ্ট ছোট ছোট চোখদুটাও যেন ঠিক্ তেম্‌নি!

চাহিলে তাহার চোখ দুটাই যেন আগে দেখিতে হয়। বলে, "রোজগার-পাতি অনেকদিন হয়নি ভাই।"—চোখ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া চারিদিকে সে তাকায়।—কি যেন খোঁজে।

পঞ্চানন একটুখানি হাসে। হাসিবার ভাণ মাত্র, তাহা বুঝিতে পারি।

আশ-পাশের লোকগুলি তখন চীৎকার করিতে সুরু করিয়াছে।

লোকটা বলিল, "এলাম এতদূর থেকে, বাগিয়ে কিছু নিয়ে যেতে হবে ত! তোমার মতন আল্‌খাল্লা একখানা থাকলেও বা কিছু…" বলিয়া বেঞ্চির তলায় হাত গলাইয়া পঞ্চাননের গায়ে চিম্‌টি কাটিয়া সে একটুখানি রসসৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিল।

"যার পয়সা আছে সে ওড়াবে আর নেই যার সে ভিক্ষে করবে!—এ কেমন ধারা ?"

ছোট ছোট চোখের দৃষ্টি তাহার আবার ঝক্‌ঝক্

করিয়া ওঠে। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্ত। আবার তখনই সে হাসিয়া বলে, "পয়সা-কড়ি সব সমান সমান ভাগ করে' নেয়া উচিত, নৈলে কি হার্ত-পা কামড়ে খাবো আমরা ?"

বলিয়া এক হাতে সে আপনার দাড়িতে হাত বুলায় আর এক হাতে—বেশ দেখিতে পাই, বেঞ্চির তলায় অন্ধকারে একখানি চক্‌চকে ধারালো কাঁচি সে মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরে।

হঠাৎ গা'টা আমার কেমন যেন ছম্‌ছম্‌ করিয়া ওঠে।

কিন্তু লোকটা আর বসে না। এক কাপ চা খাইয়া কি যেন লক্ষ্য করিতে করিতে বাহির হইয়া যায়।

নির্ব্বিকার পঞ্চাননের কাছে আর কোনো প্রসঙ্গ নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া চায়ের দুটি পয়সা চুকাইয়া দিয়া আমিও বাহির হইয়া পড়ি।

ভিড়ের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে এক জায়গায় থমকিয়া দাঁড়াইলাম।

ছিন্ন জীর্ণ অসংযত বস্ত্রে একটি স্ত্রীলোক বুক চাপড়াইয়া চীৎকার করিতেছে। কাছে গিয়া বুঝিলাম সে ভিখারীও বটে, পাগলিও বটে। দু'-তিনটা ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে তাহার আশে পাশে ঘুরিতেছে—তাহারাও ভিক্ষা চায়।

পাগ্‌লির বয়সও বেশী নয়, কুরূপাও নয়। ছেলে-মেয়ে-গুলা বোধকরি তাহারই।

ভিক্ষা দিলাম।

হাত পাতিয়া পয়সা দুটি লইয়া সে চোখের জল মুছিল। একটুখানি ম্লান হাসি হাসিল। সে হাসি উভয়ের কাছেই নিরর্থক!

চোখের জল—সেটুকু অভিনয়; তথাপি মুখখানি তাহার দেখিয়া মনে হইল, আশীর্ব্বাদ করিবার মত ভাষা তাহার তখন ফুরাইয়া গেছে।

আবার যখন সে বুক চাপ্‌ড়াইয়া তেম্‌নি অঙ্গভঙ্গী সুরু করিল—আমি আর দাঁড়াইলাম না।

কিন্তু মুখ ফিরাইতেই সেই দাড়িওলা লোকটি আমার পাশ ঘেঁষিয়া স্ত্রীলোকটির কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

দেখিনা কি করে!

জনস্রোতের ভিতর কে কাহার তল্লাস রাখে!

দেখিলাম,—বড় একটা পাঁপর-ভাজার দোকানের পাশে দুইজনে সরিয়া গেল। মেয়েটি হাসিতে হাসিতে ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া লোকটাকে কি সব কথা বলিল, কি একটা জিনিষ লইয়া দুইজনে কাড়াকাড়ি করিল, তারপর তাড়াতাড়ি লোকটাই আগে বাহির হইয়া আসিল।

পিছন হইতে ছোট ছেলেটা 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া আসিতেছিল। বোধকরি বা ভিক্ষা চায়।

লোকটা হঠাৎ পিছন ফিরিয়া কটমট করিয়া তাহার দিকে তাকাইল।

ছেলেটা আর আগাইতে পারিল না।

চলিতে চলিতে ভাবিলাম, মেয়েটা পাগল নয়—! পাগল নয়! পাগল সাজিয়া থাকে। উন্মাদের মত অভিনয় করিয়া লোকের কাছে ভিক্ষা চায়!

আর ওই দাড়িওলা লোকটা ···?

মনে হয় যেন সেই তাহাকে পাগল করিয়াছে!

আকাশ তখন মেঘে-মেঘে ভরাট্‌!

ঝড় উঠিল।—

মেলার লোক হৈ-চৈ করিতে সুরু করিয়াছে। অনেক দূরে উড়িয়াদের চীৎকার আর রথের ঘর্ঘরধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

ঝড়ের বেগে তখন রাস্তা-ঘাট ধূলায় ধূলায় অন্ধকার হইয়া গেছে। কোথাও কিছু দেখা যায় না।

দোকান-পাট্‌ বুঝি-বা সব ওলোট-পালট হইয়া যায়।

মাল উল্টাইল, হাঁড়ি-কুঁড়ি ভাঙ্গিল। বাঁশের বেড়া কাৎ হইল। তেরপল উড়িয়া গেল।

খাবারের দোকানগুলি একেবারে লণ্ডভণ্ড!

ঝড়ের দেবতা, মানুষগুলাকে যেন একেবারে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতে চায়।

চড়্ চড়্ শব্দে বৃষ্টি নামিয়াছে।

পলায়ন-তৎপর লোকগুলি আশ্রয় চায়।

যেখানে হোক!—যে কোনও আস্তানায় একটুখানি মাথা গুঁজিবার স্থান!

রাস্তা ধরিয়া বোঁ বোঁ করিয়া ঝড়ের বেগে ছুটিয়া চলিয়াছি। মাথার উপর গাছের সারি। জলটা তবু যেন একটুখানি আট্‌কায়। কিন্তু কতক্ষণই বা! পথের ধারে একটা খোলার ঘর। দাওয়ায় উঠিয়া দাঁড়াইলাম। স্থানটা একটু দূরে, সুতরাং এধারে লোকজন বিশেষ কেহ আসে না।

...সুমুখে অবিরাম এই বারিধারার সশব্দ পতনের দিকে চাহিয়া অনেক দিনকার অনেক কথাই যেন হুড়-মুড় করিয়া মনের ভিতর তাল পাকাইয়া ওঠে! সমস্ত পৃথিবীটিকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিতে ইচ্ছা করে।

......হঠাৎ একটি মেয়ে পিছন হইতে আমার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে এসে বসুন না?"

বৃষ্টির ঝাপ্‌টা গায়ে লাগিতেছিল—আপত্তি করিলাম না। ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

"বসুন ওইখেনে—ওই চৌকির ওপর, চেপে বসুন ভাল ক'রে'!"—বলিয়া সে অদূরে একখানা ভাঙ্গা তক্তা দেখাইয়া দিল।

তক্তার উপরে জীর্ণ দুইখানি কাঁথা ছড়ানো, বসিতে ইচ্ছা হইল না। ইটের ক্ষুরো-দেওয়া নড়্‌বড়ে একটা ছোট জল-চৌকীর উপর আস্তে আস্তে গিয়া বসিলাম।

এ মেয়েটি কে এবং কোথায় আসিয়াছি ভাবিতে-ছিলাম। পুরুষ মানুষ কাহাকেও দেখি না, একটা ছেলে পর্য্যন্ত না। মনে কেমন যেন একটা সন্দেহ জাগিতেছিল, কিন্তু...হোক্ না!

জিজ্ঞাসা করিলাম, "নাম কি তোমার খুকি?"

খুকি সে নয়! একটুখানি হাসিয়া বলিল, "পারুল"।

শীর্ণ কঙ্কালসার হাত-পা ক'খানিতে সে কাপড়খানি টানিয়া টানিয়া ঢাকা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। গলাটি তাহার নখে করিয়া ছিঁড়িয়া আনিতে পারা যায়। —এমনি দুর্ব্বল!

তবু লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, বালিকা তাহার সেই জীর্ণদেহখানিকেই ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া যথাসম্ভব সুঠাম এবং সৌষ্টবসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে।

আমি যে তাহাই লক্ষ্য করিতেছি মেয়েটা কেমন করিয়া না জানি টের পাইল। আমার দিকে চাহিয়া অত্যন্ত সলজ্জ ভাবে কহিল, "বড্ডো অসুখ হয়েছিল আমার। এই সেদিন মাত্র রোগ থেকে উঠেছি।"

বলিলাম, "কে আছে তোমার?"

"থাকবে আর কে বলুন? কেউ নেই।"—বলিয়াই সে আমার অত্যন্ত সন্নিকটে সরিয়া আসিয়া কেমন যেন ভয়সঙ্কুচিত ভাবে ধীরে ধীরে আমার ভিজা জামার উপর হাত রাখিয়া বলিল, "এই...আপনারাই ধরুন...জামাটা ভিজে গেছে যে!"—বলিয়া সে একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ওই চেষ্টাই করিল—হাসির পরিবর্ত্তে তাহার সেই তোব্‌ড়ানো শুক্‌নো মুখখানির ভিতর দিয়া কেবল দাঁতগুলিই বাহির হইয়া পড়িল।

আমার সন্দেহের আর কোথাও কিছু অবশিষ্ট রহিল না। চুপ করিয়া তাহার পাদুইটির পানে তাকাইয়া রহিলাম। বলিল, "রাগ হল আমার ওপর?"

এবার হাসিলাম। এ হাসির অর্থ হয়ত সে বুঝিল, হয়ত বুঝিল না। কিন্তু তাহার বিবর্ণ বিকৃত মুখখানি হেঁট হইয়া গেল।

রাগ!...অতর্কিতে আমার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া ভালবাসার অভিনয় করিলেও বোধকরি রাগ করিতাম না। ঘৃণায় সর্ব্বশরীর হয়ত' রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত, লজ্জায় হয়ত মাথা হেঁট করিতাম, কিন্তু রাগ করিব কেমন করিয়া?

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার মা আছে?"

সে কথা কহিল না। উঠিয়া একটা চৌকির নীচে অন্ধকারে কি যেন সে হাতড়াইতে লাগিল। একটুখানি পরে মাটিতে বসিয়াই ঘাড় বাঁকাইয়া একটা ঢোক গিলিয়া কহিল, "পান খাবেন?"

বলিলাম, "না।"

পান আমি খাই না।

হঠাৎ একটা ভয়ানক গোলমাল শোনা গেল। পাশের বস্তি হইতে অনেকগুলা লোক যেন একসঙ্গে হৈ-চৈ চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে!

তাড়াতাড়ি উঠিতে গিয়া চৌকির কিনারে পারুল মাথা ঠোকাইল।

লাগিল নিশ্চয়ই...

এবং বোধকরি বেশ ভাল করিয়াই লাগিল।

আমি হইলে হয়ত সেইখানেই বসিয়া পড়িতাম!

কিন্তু মেয়েটি বসিল না। মাথায় হাত দিয়া সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে গোলমাল শুনিয়া ভয় হইতেছিল। উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বৃষ্টি ধরিয়াছে, কিন্তু আকাশ তখনও মেঘলা। হয়ত আবার নামিতে পারে!

পারুল ছুটিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল, আবার ছুটিয়াই ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

খপ্ করিয়া আমার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "যাও! পালাও এখান থেকে! পালাও!—"

উর্দ্ধশ্বাসে তাহার ভয়চকিত কণ্ঠস্বর বুঝিবা রুদ্ধ হইয়া যায়!

ব্যাপার কিছুই বুঝিলাম না, কিন্তু পলায়নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে অধিক বিলম্ব হইল না।

পথে নামিয়া পিছন ফিরিয়া দেখি, পারুলের দরজা তখনও বন্ধ করা হয় নাই, দুইহাতে দুয়ার ধরিয়া সে আমারই পানে তাকাইয়া আছে।

ভিতরের গোলমাল তখনও থামে নাই। আধখানা দরজার ফাঁকে জলে-ধোয়া কাদা-চকচকে উঠান পর্য্যন্ত নজর চলিতেছে। জন চার-পাঁচ মেয়ে-পুরুষের মাঝখানে একটা লোককে মাত্র ভাল করিয়া দেখা যায়।

মেঘ-ছায়ার ঝাপ্‌সা আলোয় গেরুয়াধারী হাত-খোঁড়া পঞ্চাননকে হঠাৎ চিনিয়া ফেলিলাম।

না চিনিলেই বোধ করি ভাল হইত!

পারুলকে দিবার জন্য পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া আবার আমি দরজার কাছে আগাইয়া আসিয়াছিলাম!

পারুল তাহা কেমন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল জানি না। হাত হইতে টাকাটা সে যেন আমার ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইল।

মুখের পানে তাকাইতে গেলাম, কিন্তু মুখখানা তাহার দেখিতে পাইলাম না। কালো একখানি শীর্ণ হাত মাত্র দেখিতে পাইলাম। কঙ্কালসার সেই হাতখানি দিয়াই দরজার ফাঁকটুকু সে তখন বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

সশব্দে খিল্ দিবার শব্দ শুনিলাম।

তখন আমি আবার রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।

ওই রাস্তা দিয়াই তাড়াতাড়ি আসিতেছিলাম।

পথের ধারেই আবার আর একটা গোলমাল! কাছে গিয়া দেখি—এই বৃষ্টিতেই দু' তিনটা লোক আর-একটি লোককে চাপিয়া বেদম প্রহার করিতেছে।

আসামীকে চিনিলাম। সেই দাড়ীওলা লোকটি! আলোয় নজর করিয়া দেখি, থুঁত্‌নি হইতে তাহার এক মুঠি দাড়ি ছিঁড়িয়া যাওয়ায় দরদর করিয়া রক্ত পড়িতেছে।

"দেখত বাবু দেখত! মিছামিছি আমায়···বুড়ো-মানুষ···যদি মরে যাই?"

লোক দুইটা তাহার কথায় কান দেয় না। অশ্লীল গালাগাল দেয়, আর প্রহার করে।

তাহাদের মধ্যে কাহার পকেট কাটিয়া লোকটা নাকি একটি টাকা বাহির করিয়া লইয়াছে।

মারিয়া মারিয়া লোকটাকে ততক্ষণে তাহারা বিকল করিয়া আনিয়াছিল।

বুক পকেটে আর একটিমাত্র টাকা ছিল—তাহাই তাহাদের একজনের হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিলাম, "ছেড়ে দাও ওকে, আর মারবার দরকার নেই! যাও!"

লোকগুলা টাকা পাইয়া অনেক বাক্-বিতণ্ডার পর ঠাণ্ডা হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। লোকটা তখন পলাইতে পারিলে বাঁচে! তবু একবার সে আমার দিকে তাহার স্তিমিতপ্রায় চোখদুটি তুলিয়া বলিল, "দিলে বাবু তুমি টাকাটা?"

"হ্যাঁ,—দিলাম। কিন্তু করেছ কি শুনি?" কথা কয়টা রাগিয়াই বলিয়াছিলাম।—"পাজি কোথাকার!"

লোকটা আর কোন কথা বলিতে পারিল না। কথা তাহার গলার কাছে বোধকরি আট্‌কাইয়া গিয়াছিল। মুখের দিকে কেবল সে চাহিয়া রহিল।

এ চাহনির কোনো ভাষা নাই! যন্ত্রণা-কাতর প্রহার-জর্জ্জরিত দেহটির অন্তরালে যাহার ভগবান নিঃশেষে মরিয়া গেছে—এ চাহনি যেন কতকটা তারই মত!

সরিয়া আসিতেছিলাম—পিছন হইতে শব্দ আসিল, "ওরা মাল্লে মা অমনি করে বাবাকে?"

ভিখারিণী—সেই পাগলি মা বলিল, "বেশ করেছে! হাতবশ হয়নি,—কচি খোকা! ধরা পড়িস্ ত' যাস্ কেন মরতে?"

ঘটনা দুইটা আমার জন্য কে যেন সাজাইয়া রাখিয়াছিল। এ যেন কাঁচা-হাতের গল্প! এ যেন উপন্যাস!

রথতলা অন্ধকার!

লোকের ভিড় কমিয়া গেছে। একদিনের মেলা!

অদূরে দোকানীরা তখন দোকানপাট তুলিয়া গাড়ী-বোঝাই করিতেছিল।

অনেক দূর রাস্তা—। এক জায়গায় আসিয়া বসিলাম। দিনান্তের এই ম্লান অশ্রুসজল অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ভাবি, মানবাত্মাকে দলিয়া পিষিয়া মানুষ এই যে আত্ম অপমানের কলঙ্ক আপনার ললাটে লেপিয়া দিতেছে—এ অপমান হইতে সে নিষ্কৃতি পাইবে কবে? কবে এই বেদনার আঁধার চিরিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী উষার রক্তালোকে অবগাহন করিয়া মানুষ পবিত্র হইয়া উঠিবে?

কবে, সেদিন—কবে!

সে কোন্ যুগ-যুগান্তের পরপারে কে জানে! তবু মনে হয় স্বচক্ষে একবার দেখিয়া যাই!

ভাঙা হাটেও ভিখারীর দল তখনও ঘুরিতেছে। বাড়ী যাইবার মুখে ছোট একটি ছেলে একটা অন্ধ বৃদ্ধের হাত ধরিয়া এই দিকে আসিতেছিল। আমায় দেখিয়া হাত পাতিল, "বাবু মশাই! একটি পয়সা—বাবু মশাই! রথ যাত্রার দিনে বহুৎ পুণ্যি হবে বাবু!"

বুড়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "রাধাবল্লভজি আপনার মঙ্গল করবেন বাবু!"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া বুক-পকেট হাতড়াইলাম। কিছুই নাই! নীচের পকেটে হাত দিতেই জামা ফুঁড়িয়া হাতটা বাহির হইয়া পড়িল। চমকিয়া উঠিলাম!

পাইবার কিছু আশা নাই দেখিয়া ছেলেটা আর দাঁড়াইল না! বৃদ্ধের হাত ধরিয়া আবার সে অগ্রসর হইয়া গেল।

কখন্ এবং কে যে আমার পকেট কাটিয়াছে তাহা বুঝিতে আর দেরী হইল না।

কিন্তু এ অন্যায় যে করিয়াছে তাহার জন্য ব্যথাই পাইলাম। সে পাপী বলিয়া নয়, পাপের যূপকাষ্ঠে আপনাকে বলি দিয়াও যে কৃতকার্য্য হয় নাই তাহার সেই কাতর দীন এবং হতাশায় ক্ষুব্ধ মুখখানি মনে করিয়া আমার চোখে জল আসিল। নীচের পকেটে আমি কিছুই রাখি নাই, কিন্তু অন্ততঃ একটি পয়সাও রাখিলে যেন ভালই করিতাম!

রাজু-পণ্ডিত

—পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর—

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৫

সরকার বাহাদুরের আইন-সংহিতার সংবাদ রাখা সাধারণ মানুষের ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত; কিন্তু একটি আইনের কথা দেশের আবাল-বৃদ্ধ, আপামর-সাধারণ—বোধ করি, শিশু মাতৃ-জঠর হইতে পৃথিবীতে আগমন করিয়াই শিখিয়া ফেলে! সেটি বাঙ্গালী-জীবনের একটি স্বতঃসিদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পঁচিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেলে মানুষ নাকি এমন অথর্ব্ব অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে যে তাহার পর আর সংসার-অর্ণব পার হইবার এই সৌভাগ্যের সুবর্ণ-সুযোগ মিলিবার কোন আশাই থাকে না! চাকর, চাকুরি, এই সকল শব্দ বাঙ্গালী-জীবনে ক্রমেই গৌরব-দ্যোতক হইয়া উঠিতেছে। সরকারি চাকুরি—সোণায় সোহাগা।

এই কারণে একদিন দেশের লোক কিছুতেই পঁচিশের বেড়া পার হইতে চাহিত না। জনার্দ্দন সরকার একবার একটা মারামারির মামলায় পড়িয়া সাক্ষী দিতে গিয়াছিল। তখন তাহার বয়স কত তাহা স্থির করা কঠিন, তাই হাকিম বলিলেন, তোমার বয়স কত? উত্তর, আজ্ঞে বাইশ। হাকিম বিস্মিত হইয়া বলিলেন, সে কি হে? তোমার দাড়ির বয়সই ত বাইশ। মৃদু হাস্য করিয়া জনার্দ্দন বলিল, আজ্ঞে এ যে আমার দাড়ি নয়; মা মানৎ করেছিলেন, এ বাবা তারকনাথের দাড়ি;—আমার বয়স বাইশ। জনার্দ্দন সেই বয়সেও সরকারি চাকুরির মোহ ত্যাগ করিতে পারে নাই।

এই পঁচিশের ভেল্‌কিতে বৃদ্ধ চুলে কলপ দিত, প্রৌঢ় গোঁফ-দাড়ি কামাইয়া নটবর বেশে বিচরণ করিত। আর, অভিভাবকগণের দূরদর্শিতার আর অবধি ছিল না। তাঁহারা এমন পাকা হিসাব করিয়া পাঠশালার খাতা-পত্রে ছেলে-পুলের বয়স লিখাইতেন যাহাতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সেকেলে খাম-খেয়ালির ঝড়ে বার পাঁচ-সাত ওলট-পালট খাইয়াও শ্রীমানেরা চাকুরির উমেদারি করিতে গিয়া অনায়াসে বলিতে পারিত, আরো দু' বছর পরে পঁচিশে পা দেব!

নিশ্চয়ই রাজু-পণ্ডিতের জন্মান্তর দুষ্কৃতির ফলে বিশ্ব-বিদ্যালয়, পরীক্ষার্থিগণের বয়স সম্বন্ধে একটা অচিন্ত্য-পূর্ব্ব অদ্ভুত নিয়ম জারি করিয়া বসিলেন। ষোল বৎসর পূর্ণ না হইলে প্রবেশিকা পরীক্ষার ত্রিসীমানায় যুবকগণকে আসিতে দেওয়া হইবে না; এই নিয়মে বঙ্গের অভি-ভাবকের দল কতখানি উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা স্থির করা কঠিন। তবে এ কথা ঠিক, যে ইহাতে দেশের কোন কল্যাণ হইতে পারে ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। চাকুরির পথে বাধা সৃষ্টি করিবার অভি-প্রায় ইহার প্রতি অবয়বে দেখিতে পাইয়া তাঁহারা ফলে একান্ত সতর্ক হইয়া উঠিলেন।

এই নিয়মের ফলে আমাদের এই ক্ষুদ্র পাঠশালাটি কিরূপ বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল তাহাই দেখা যাউক।

সারকেল পণ্ডিত মহামান্য শম্ভুচরণ দাশগুপ্ত পাঠশালাটি পরিদর্শন কালে বয়সের হিসাবের খাতাখানি চিত্রগুপ্তের চেয়ে সমধিক সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়া এমন সব

কঠোর নিয়ম জারি করিলেন যাহা রক্ষা করিয়া চলিতে গেলে রাজুর গ্রামের লোকের সহিত নিত্য-নিয়ত হাতাহাতি করিতে হয়।

রাজু-পণ্ডিত পশ্চাদ্‌পদ হইবার লোক নহে। সত্য এবং ন্যায়ের ব্যাপারে ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনা তাহার স্বভাব!

অধর কুণ্ডু জাতিতে ছোট হইলেও অর্থে গ্রামের সকলের চেয়ে বড়। দৌহিত্রের নাম লিখাইতে স্বয়ং জামাতা বাবাজি শ্রীমান্ হরেকৃষ্ণ রায়ের সেদিন পাঠশালায় শুভাগমন হইয়াছিল।

সকলেই জানে সূর্য্যের অপেক্ষা বালির উত্তাপ অসহ্য। শ্বশুরের প্রতাপে দৃপ্ত হরেকৃষ্ণের মাটিতে পা যেন আর পড়ে না!

হরেকৃষ্ণ সশব্দে পাঠশালা গৃহে প্রবেশ করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, ওহে পণ্ডিত, শীগ্‌গির নিমাইএর নামটা লিখে নাও, আমার সময় নেই।

রাজু আঁক বুঝাইয়া দিতে ছিল, ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, একটু অপেক্ষা করতে হবে, হাতের কাজটা সেরে নি।

হরেকৃষ্ণ অধীর হইয়া বলিল, হবে হে, আঁক ত চিরকালই বুঝিয়ে দেবে……আমার সময় নেই!

কথাগুলি হয়ত তেমন মারাত্মক কিছুই নয়; কিন্তু হরেকৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের মধ্যে এমন একটা দুর্ব্বিনীত দম্ভের পরিচয় ছিল যাহাতে মানুষের রক্ত গরম হইয়া উঠে!

রাজু কিন্তু তাহাও সামলাইয়া লইল।

অধর কুণ্ডুর কন্যা মেনকার সহিত রাজু এক সঙ্গে বহুদিন পাঠশালায় কাটাইয়াছে। তাই তাহার পুত্র নিমাইকে সে ভাল করিয়াই জানিত।

হরেকৃষ্ণ বলিল, নিমায়ের বয়েস পাঁচ।

রাজু অবিশ্বাসের কঠিন হাসি হাসিয়া তাহা লিখিয়া দিল; কিন্তু অনুমিত বয়সের ঘরে সে লিখিল সাত।

হরেকৃষ্ণ বলিল, ওখেনেও তোমাকে পাঁচ লিখতে হবে।

গম্ভীর হইয়া রাজু উত্তর করিল, তা কি ক'রে হয়? তা' আমি পারবো না;—আমি জানি, যে মেনকার বড় ছেলের বয়স সাতের এক কাণাকড়িও কম নয়।

হরেকৃষ্ণ বলিল, তুমি আমার চেয়ে বেশী জান, পণ্ডিৎ? আমি যে তার বাপ!

রাজু বলিল, ক্ষমা কর ভাই, তুমি যা বলেছ তাও ত লিখেছি। এটা যে আমার অনুমানের ঘর, এর সঙ্গে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

হরেকৃষ্ণ যেন আরো উত্তেজিত হইয়া বলিল, অনুমান? তোমার অনুমানটা আমার কথার চাইতে বড় হবে?

রাজু পণ্ডিত বলিল, কি করবো ভাই, সত্যের খাতিরে, ন্যায়-ধর্ম্মের জন্য আমি আমার বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ কিছুতেই করতে পারবো না।

হরেকৃষ্ণ আরো উত্তেজিত হইয়া তুই-তোকারি আরম্ভ করিল, বল্ না সোজা কথায় যে তুই আমাকে মিথ্যেবাদী বল্‌তে চাস্।

রাজুর দুই কাণ সিন্দুরের মত লাল হইয়া উঠিল—কিন্তু সে কোন কথার উত্তর দিল না।

তাহার মৌনীতে হরেকৃষ্ণের রাগের আর সীমা রহিল না; প্রচুর অন্ন মাংসে পুষ্ট ধনীর বদ-মেজাজি কুকুরের মত সে ক্রোধে দাঁত খিঁচাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল,—শালা সাড়ে চার টাকার চাকর—তোর আবার ধর্ম্মোজ্ঞান কিরে?

রাজু ধীর হস্তে খেজুরের ছড়িটি তুলিয়া লইয়া, হরেকৃষ্ণের পিঠে ঘা-কতক বসাইয়া দিয়া বলিল, বার হ'য়ে যাও পাঠশালা ঘর থেকে, তোমার মত অসভ্য অভদ্র লোকের এই উচিত বিধান!

হরেকৃষ্ণের রাগে মুখ দিয়া ফেণা বাহির হইল, এবং দুই রক্তবর্ণ চক্ষু ঘুরাইয়া কহিল—আচ্ছা শালা, দেখে নেবো, আজ তোরই দিন, না আমারই দিন…এই কথা বলিতে বলিতে সে নিমেষে উধাও হইয়া গেল।

এক সঙ্গে সেই রাত্রে রাজুর বসত বাড়ি এবং পাঠশালা ঘরে আগুন লাগিল।

বৃদ্ধা মাতাকে ঘর হইতে বাহির করিতে গিয়া রাজুর দুই হাত পুড়িয়া গেল। মাতার কাপড়ে আগুন ধরিয়া গিয়াছিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া পুত্রের কোলে চিরদিনের চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

গ্রামে রাজু পণ্ডিতের দুর্গতিতে সহানুভূতি করিবার লোক ছিল; কিন্তু তাহার দুঃখে মজা উপভোগ করিবার লোকেরও অভাব ঘটিল না!

পোড়ার ঘা লইয়া সে কায়-ক্লেশে সংসার নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

পাঠশালা ঘর মেরামত করিতে অধিক বিলম্ব হইল না; অধর কুণ্ডু সে বিষয়ে একটু বেশী রকম মন দিল।

এদিকে হরেকৃষ্ণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল না। সে অবিরত সার্কেল পণ্ডিতের বাড়ি হাঁটা-হাঁটি করিতে লাগিল।

এই সময়ে রাজুকে 'রাস্কেল' করার গল্প শম্ভুচরণের কর্ণগোচর হইল। আসল কথাটা কি তাহা তাহার জানা ছিল, তাই শম্ভু খুব খানিকটা হাসিয়া লইয়া হরেকৃষ্ণকে বলিল, যাই হোক্‌গে, সে কেমন কাজ করছে—তা দেখতে আমি শীগ্‌গির যাবো;—তার মধ্যে কিন্তু বাড়ি মেরামতটা দেখ্‌তে চাই! অধর পয়সার জোরে পুলিশকে শান্ত করিয়াছিল; কিন্তু মনে ভয় ছিল যে—শম্ভু যদি খুঁচাইয়া তোলেন্‌তো শেষ পর্য্যন্ত ঘর পোড়ানর দায় তাহার কাঁধ অবধি পৌঁছিতে পারে।

হরেকৃষ্ণ রটাইয়া দিল যে শীঘ্রই রাজুর চাকুরি যাইবে। সে কথা শম্ভুচরণ তাহাকে বারবার তিনবার বলিয়াছে।

একথা রাজুর কাণে আসিতে দেরি হইল না। সে একদিক দিয়া যেমন একটা নিশ্চিন্ততা বোধ করিল, অপর দিকে তাহার চিন্তার সীমা রহিল না। যদি তাহার জন্য বৈকুণ্ঠকে ফিরিয়া আসিতে হয়—তাহার চেয়ে বড় দুঃখের কথা কি থাকিতে পারে?

হঠাৎ একদিন প্রবল প্রতাপ শম্ভুচরণের শুভাগমন হইল। সেদিন কি জানি কেন শম্ভুচরণের মেজাজটা অতিরিক্ত ভাল ছিল। রাজুর কাজ কর্ম্ম পরীক্ষা করিয়া শম্ভু একটা বক্র হাস্য করিয়া বলিল, শুনচি তুমি বৈকুণ্ঠকে বৃত্তির টাকাটা পাঠিয়ে দাও নাকি?

মাথা অবনত করিয়া রাজু বলিল, তাঁর শরীর বড় অপটু;—টাকা নইলে বিদেশে চলে কেমন করে?

বেশ, বেশ, বলিয়া শম্ভুচরণ মন্তব্যের বহিতে এমন সব কথা লিখিল—যাহা রাজুর স্বপ্নেরও অতীত। শেষে, সে বৃত্তিটাকে দশটাকা করিয়া দিবার জন্য জোর-কলমে সুপারিশও করিল।

যাইবার সময় শম্ভুচরণ বলিল, যাতে আস্‌চে মাস থেকেই তুমি—ঐ টাকাটা পাও তার চেষ্টা আমি করবো রসরাজ, আমি বড় সন্তুষ্ট হয়েছি তোমার কাজ কর্ম্মে।

গ্রামে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। হরেকৃষ্ণ বলিল, ব্যাটা ঘুষ খেয়ে—হয়কে নয় করে দিয়ে গেল। আচ্ছা, আচ্ছা, ওপরে সাক্ষী রইলেন ভগবান, দেখি তাঁর কি বিচার!

সেদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছিল।

পাঠশালার অকালে ছুটি দিয়া রাজু আপনার শ্রীহীন ঘরটিতে বসিয়া আস্তে আস্তে হুঁকায় টান দিল। অপ্রত্যাশিত অবকাশ ভালও লাগে, আবার কর্ম্মহীনতার জন্য বর্ষার দিনের ভারি চাকা যেন কিছুতেই চলিতে চায় না; দিনের উপর সন্ধ্যার পাংশু ডানাদুটি ডিমে তা দেওয়ার মত অচল হইয়া সমস্ত দিনটাকে যেন ঢাকিয়া রাখিল।

সংসারে আর দ্বিতীয় লোক নাই; গৃহ-কর্ম্ম সে নিজেই করে। একদিন ছিল, যার কাছে কত আদর-আব্দার

করিয়াছে, আজ সেকথা মনে করিয়া মনে মনে বলে, তখন কি ছাই বুঝতুম কিছু?

পদীর মা বুড়ী, মার বন্ধু; রাজু তাহাকে ঝি মনে করে না। জানে যে, স্নেহেই পদীর মা যা কিছু করে। সিধা-পত্রের গোছ-গাছের ভার সে নিজেই লইয়াছে। মাসে একটি দুটি টাকার জন্য কি কেউ এত কাজ করিয়া দেয়!

সেদিন পদীর মা সকাল-সকাল আসিল, বুড়ো মানুষ—ঝড় জলের দিন, সকাল সকাল কাজ সারিয়া চলিয়া যাইবে। দিনটা বড় বিশ্রী!

পদীর মা নিজেই বক্-বক্ করিতেছে—আর কাজ সারিতেছে। রাজু ছোট জানালার পাশে বসিয়া হুঁকায় টানের উপর টান দিয়া ঘরটা বাহিরের মতই ধোঁয়াতে ধোঁয়াটে করিয়া দিয়াছে।

পদীর মা হঠাৎ এক সময় ঘরে আসিয়া তাহার বাঁকা পা, বাঁকা কোমর সোজা করিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল।

রাজু তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি, খরচ চাই নাকি?

পদীর মা উত্তরে বলিল, তাই বলে কি আমার ভীমরতি হয়েছে রাজু? এই পাঁচদিনও যায়নি, আবার টাকা চাইব!

রাজু যেন একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল। তবে? তবে, কি চাও মাসী?

পদীর মা আঁচল হইতে কি একটা বাহির করিতে করিতে বলিল, ড্যাক্‌রাকে বলেছিলুম যে বাপু আমি বুড়ো-মানুষ ভুলে যাই। পথে পড়ে কি না? তাই আমাকেই চাপিয়ে দেয়;—বলে তুই তো দুবেলা যাচ্ছিস্। —আমি ছাই, যাই ভুলে, এই তিন দিন থেকে—আসার সময়—খেয়ালই থাকে না—বলিতে বলিতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া দিল।

রাজু চিঠি পড়িতে লাগিল—পদীর মা নিজের মনে পোষ্টাপিসের ভোদ্‌কা হাজরার উপর গালি পাড়িতে পাড়িতে চলিয়া গেল।

চিঠি পড়া শেষ করিয়া রাজু কোঁচায় খুঁট দিয়া চোখ দুইটি মুছিয়া ফেলিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল।

হুঁকাটা রাখিতে রাখিতে আপন মনে বলিল, যাক, সব শেষ হ'য়ে গেল! এই তো জীবন, এই তো স্থায়িত্ব।

তাহার পর খানিকক্ষণ চৌকির উপর পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। দৃষ্টি সুদূর আকাশে নিবিড় ঘন মেঘের উপর—বিদ্যুতের পিছনে পিছনে—আলোর রেখার পথে পথে যেন কি খুঁজিয়া বেড়ায়! সবই যেন রহস্যের নিবিড়তায় সমাচ্ছন্ন! এ কেবল আজ নহে, যুগে যুগে এই; তবুও মানুষ,—মানুষ।

গুরু বলিয়া নহে, নীতির ধার হয়ত সে বড় বেশী ধারিত বলিয়াও মনে হয় না, তবুও সে বৈকুণ্ঠ-গুরুকে ভাল বাসিত; কোথায় যেন একটা ঐক্যের বন্ধন দুইজনের মধ্যে ছিল। কিন্তু সে কি এবং কোথায়, রাজু তাহা জানিত না।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া উঠিল। রাজু যেখানে বসিয়া ছিল সেইখানে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল। কিছুই করিতে মন চায় না। বাহিরের অন্ধকারের মত মনের উপরেও একটা কালো ছায়া যেন কেমন করিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে!

পদীর মা জানিত, বেশির ভাগ দিন, রাত্রে রাজু গুড়-মুড়ি খাইয়া কাটাইয়া দেয়। একটা বড় বাটিতে একটু বেশী করিয়া মুড়ি গুড় ভরিয়া দিতে দিতে সে বলিল, বলেছিলুম সইকে যে, রাজুর বে দে; কোন্‌দিন ম'রে যাবি,—তার পর? তোর ছেলের হবে কিনা? যা বলেছি তাই ...দোরটা বন্ধ ক'রে দেয় এমন লোকটিও নেই!—ও তো এতক্ষণ ঘুমিয়ে ন্যাতা হয়ে পড়েছে!

যাইবার সময় বলিল, ও রাজু, রাজু, শুন্‌চিস্?

অন্ধকার হইতে শব্দ উঠিল, হুঁ।

দোর দিতে ভুলিস্‌নি—বলিতে বলিতে পদীর মা চলিয়া গেল।

তখনো বৃষ্টি টিপ্ টিপ্ করিয়া পড়িতেছে। জল পড়ার

অবিশ্রান্ত চাপা শব্দের মধ্যে—ব্যাঙের আনন্দ চীৎকার —ক্যাক্‌কোঁক্‌ !

এই অবসরে ঘুম রাজুর চোখের উপর চুপি-চুপি নিঃশব্দ চরণে কখন আসিয়া মৃত্যুর মত ছায়া বিস্তার করিয়া বসিল।

৭

আকাশে একটিও তারা নাই। বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। গাছের মগডালের কচি পাতার মায়া ত্যাগ করিয়া দুরন্ত হাওয়া যেন কিছুতেই বিদায় লইতে পারে না! নিষ্ঠুর পীড়নে যে কি করিবে তাহা সে ভাবিয়া পায় না; তাই একবার চলিয়া যায়; আবার ফিরিয়া আসে! সেই একই যাওয়া আসা, সাদা মেঘের পাংশুটে আলোর মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়াছে। এও কি প্রেমিকের প্রগলভ দাপাদাপি!

মেনকা এক পা আগু বাড়ায় ত' তিন পা পিছাইয়া যায়! পথের গর্তের মধ্যে জল দাঁড়াইয়াছে, ভুল করিয়া তাহার মধ্যে পা পড়িয়া যায়। দুই পা পিছাইয়া মেনকা ভাবে, এ আমার হলো কি?

আবার সে সাবধানে চারিদিক দেখিয়া তাড়াতাড়ি অনেকখানি পথ অগ্রসর হইয়া যায়। ভয়ে বুকের মধ্যে দুড়দুড় করে; আপনার নিঃশ্বাসে সে আপনি চমকিয়া উঠে!

মেনকা মনে মনে বলে, থাক্‌গে, গিয়ে কাজ নেই। দ্বিধায় এক নিমেষের জন্ম পথের উপর দাঁড়াইলেই বুকের মধ্যে ভয় উচ্ছ্বসিত হইয়া বলে, চল্‌ চল্‌, মানুষের প্রাণ নিয়ে খেলা—একি সোজা কথা?

আবার মেনকা চলে।

রাজু আর উঠে নাই।

বৈকুণ্ঠ চলিয়া গেলেন, এখন দশটাকা বৃত্তি লইয়া সে কি করিবে তাই ভাবিতে ভাবিতে কখন নিদ্রায় অচেতন হইয়া গিয়াছিল।

ঠাণ্ডা দুখানি হাতের কোমল স্পর্শে রাজুর ঘুম ভাঙিল। সে একটুও বিস্মিত হইল না, একটুও ভয় পাইল না। ধীরে হাত-দুখানি ধরিয়া বলিল, মেনকা এসেছিস্‌ বুঝি?

মেনকার দুই ফোঁটা অশ্রু তাহার বুকের উপর পড়িয়া রাজুর তপ্ত হৃদয়খানিকে যেন নিমেষে শীতল করিয়া দিল। সে চাপা গলায় বলিল, কাঁদচিস্‌?

মেনকা মাথা নাড়িয়া জানাইল, না। কিন্তু কান্নায় তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ ছিল।

রাজু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ফিরিয়া শুইতে শুইতে বলিল, না আবার, আমি যেন বুঝতে পারি নে।

মেনকা তাহার পিঠের পাশে বসিল। কাপড়ের স্থানে স্থানে ভিজিয়া গিয়াছিল, তাই রাজু চমকিয়া উঠিয়া বলিল, উঃ ভিজে যে রে—সারা রাত জলে ভিজ্‌ছিলি কেন? হরেকৃষ্ণ ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে?

মেনকা এবার কথা কহিল, শ্লেষ্মায় তাহার স্বরটি ভারি। রাজুর গালের উপর নিজের গালখানি রাখিয়া বলিল, সে আজ ঘরে নেই।

রাজু জিজ্ঞাসা করিল, গেল কোথায় রে? বাড়ী গেছে?

না।

তবে?

মেনকা একটু কি ভাবিল, তাহার পর বলিল, সে বড় ব্যস্ত, ভগা ডোমের বাড়িতে……

তাহার পর ঝর ঝর করিয়া দুই চোখ বাহিয়া জল পড়িতে লাগিল।

রাজু ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া মেনকার মাথাটা দুই হাতে জড়াইয়া বলিল, লক্ষী আমার, দিদি আমার, কি হয়েছে ভাই?…

মেনকার কান্না আর কিছুতেই থামে না।

রাজু অন্ধকারের মধ্যে হাৎড়াইয়া কি যেন খোঁজে; মেনকা চোখের জল মুছিয়া বলিল, খোঁজ কি?

দেশলাই, মিনি।

মেনকা বলিল, আমার কাছে আছে; কিন্তু আলো এখন জেল না।

কেন রে?

পরে বলবো।

রাজু ফিরিয়া আসিয়া চৌকির উপর বসিতে মেনকা তাহার হাতে দেশলাই দিয়া বলিল, আমি চ'লে যাওয়ার পর আলো জালতে ইচ্ছা হয় জেলো। নইলে বিপদ হবে।

এতক্ষণ পরে রাজুর যেন চমক ভাঙ্গিল, সে বলিল, তাইতো মেনকা, তুই এত রাতে কক্ষনো তো আসিস না... আজ তোর কি হয়েছে বল্—

কথাটাকে এড়াইয়া যাইবার জন্যই বোধ হয় মেনকা বলিল, রাত তো বেশি হয় নি...

তবুও, রাজু বলিল, হরেকৃষ্ণ জান্‌তে পারলে তোকে আস্ত রাখ্‌বে?

মাকে যে বলে এসেছি!

সে কথা কি সে বিশ্বাস করবে রে ভাই? যা পাজি শালা।

সে কথা একশো বার সত্যি—বলিয়া মেনকা অন্ধকারের মধ্যে হাসিল।

কিছুক্ষণ তাহার পর স্তব্ধ ভাবে কাটিল।

মেনকা রাজুর দুখানি হাত নিজের কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, রাজুদা, আমার একটা কথা রাখবে বল?

রাজু বলিল, মিনি, তোকে আমি ছোট বেলা থেকে কত ভালবাসি, তোর কথায় তো কখ্‌খনো না করি নি··· বল্ না তোর কি কথা—ভাই?

আনন্দের সুরে মেনকা বলিল, তুমি আর এখেনে থেক না।

এই!

মেনকা আবার বলিল, না তুমি জান না, তোমার প্রাণ নেবার জন্যে লোকেরা কি কাণ্ডটাই না ক'রচে।

তাচ্ছিল্যের সহিত রাজু বলিল, লোকেরা মানে ত' সেই তোমার লোকটি?

ও একাই একশো!

বটে? তোর যে দিন দিন পতি ভক্তি বেড়ে উঠলো। মিনি এ তো পুরোণো খবর—নতুন কিছু আছে? না, না?

সত্যই নূতন খবর ছিল; কিন্তু মেনকা তাহা কিছুতেই আর বলিতে পারে না। মানুষের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতার কি সীমা নাই? মানুষের কদর্য্য হীনতার শেষ কোথায়? মেনকা সকর্ণে যাহা শুনিয়াছে—তাহা কেমন করিয়া অবিশ্বাস করে? হরেকৃষ্ণ যে কত বড় অপদার্থ তাহা সে জানিত। কিন্তু দুষ্কর্ম করিবার প্রবৃত্তিও তাহার মধ্যে এতবড় প্রবল যে সেখানে তাহাকে একটুও অবিশ্বাস করা চলে না। সে অবসরই বা কোথায়? হয়ত এতক্ষণে তাহারা চারিদিক দিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিল। আর দেরি করা চলে না, তবুও সে কথা আর কিছুতেই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহে না!

ব্যাকুল-বিহ্বলতায় মেনকার মনটা সমাচ্ছন্ন। আসন্ন বিপদের উদ্যত বজ্রাগ্নির তলায়, হায়! সে যদি নিজেকে লুটাইয়া দিতে পারিত! তাহার ছোট্ট মনটি তাহারও কোন পথ দেখিতে পায় না; তাই যে মরিয়া হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে বিপদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে! তাহাও কিন্তু সহজ—কিন্তু সে কথা মুখে বলিতে গিয়া মেনকার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে

অধীর প্রতীক্ষায় রাজু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিল, মেনকা, কথা কইচিস্ না কেন?

মেনকা উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আমি পারবো না বল্‌তে—সে কথা তোমায়—রাজুদা, তোমার পায়ে পড়ি, আর একদণ্ডও তুমি এখেনে থেক না, এই ঘরে, তোমার পায়ে পড়ি···বলিয়া সে রাজুর পায়ের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

রাজু তাহাকে আদর করিয়া সান্ত্বনা দিয়া মাটি হইতে তুলিয়া বলিল, কি হয়েছে মিনি? তুই যদি আমায় না বলবি ত' আমি কিছুতেই এ ঘর থেকে এক পাও বাইরে যাবো না। তোকে বল্‌তেই হবে মিনি!

অশ্রু এবং ভয়ের বিহ্বলতার মধ্যে মেনকা যাহা বলিল তাহা হইতে এইটুকু বুঝা যায়;—সন্ধ্যার পর ঘাটে যাইতে যাইতে বাঁশ ঝাড়ের তলায়, বেতবনের পাশে ভগার সহিত হরেকৃষ্ণের নিদারুণ পরামর্শ শুনিয়া অবধি তাহার আর ধড়ে প্রাণ নাই। সেই রাত্রে ভগা রাজুর বিছানায় বাঁশের চোঙের মধ্য দিয়া একটা আঝাড়া কেউটে ছাড়িবে

রাজু হাসিয়া বলিল, ভয় কি মিনি? আজ রাত্রে ভগা কেউটে পাবে কোত্থেকে?

মিনি বলিল, তুমি জান না, আজ সে একটা কেউটে আমাদের বাড়িতে খেলাতে এনেছিল।

রাজু আবার হাসিল, তা জানিস্ নে? যে সাপ তারা খেলায় তার বিষ দাঁত ভেঙ্গে দেয়?

মেনকা অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, ও তুমি আমাকে বোকা-বোঝাচ্চ রাজু দাদা

একান্ত গম্ভীর ভাবে রাজু কহিল, না মেনকা, তুমি আমায় বিশ্বাস কর;—কথায় বলে, সাপের লেখা; কপালে লেখা না থাকলে—কিম্বা বামুনের অভিসম্পাত নইলে, ঠিক জেনো, মানুষকে সাপে খায় না।

মেনকা এবার আব্দার করিল, না তবুও...

রাজু ব্যস্ত হইল, বলিল, ভারি বিপদ করলি যে তুই ..? এই জল ঝড়ে কোথায় যাই বল্‌ত?

মেনকা বলিল, তা জানিনে, জল ঝড় থেমে গেছে কখন।

রাজু তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, আচ্ছা, আচ্ছা তোর ভাবনা নেই—আমি সমস্ত রাত জেগে বসে পড়বো।

মেনকা বুঝিল যে রাত্রে কোথাও যাওয়া শক্ত, বলিল, আমার মাথায় হাত দিয়ে বল ঘুমিয়ে পড়বে না।

নারে পাগলি না—বলিয়া রাজু একটা দেশলাইএর কাঠি জ্বালিতেই—মেনকা ছুটিয়া ঘরের কোণে আশ্রয় লইল।

রাজু বিস্ময়ের সহিত তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল যে, ভয়ে তাহার মুখখানি আধখানা হইয়া গেছে...

গলা চাপিয়া মেনকা বলিল, ওকি, রাজুদা, আলো নিবিয়ে দাও

সহাস্য বিস্ময়ে রাজু জিজ্ঞাসা করিল, কেন রে?

দেশলাইএর কাঠি নিবিয়া গেল। মেনকা কাছে আসিয়া বলিল, ওরা হয় ত তোমার কানাচে এসে বসে আছে।

দূৎ, তোর যত বাজে ভয়, চল্ তোকে দিয়ে আসিগে।

তুমি!

তাতে কি?

আর তর্ক করিবার সময় ছিল না। মেনকা ক্ষিপ্রপদে নিমেষে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাজুর রাতটা কাটিল ভাল। সে প্রথমে খুব খানিকটা হাসিল, বলিল, দেখো একবার অদৃষ্টের পরিহাস! হরে-কৃষ্ণ আমায় মারবে—আর মেনকা আমায় বাঁচাবে! নিজে নিজে বলিল,

মারে হরি রাখে কে?
রাখে হরি মারে কে?

তাহার পর সে নিজেকে জিজ্ঞাসা করিল, এখন কি করি? হঠাৎ একটা কথাম নে পড়াতে সে উৎসাহে হাসিতে লাগিল। এ যে পরীক্ষিত রাজার অবস্থা, শিয়রে মৃত্যু সমাগত! বেশ, তবে আজ ভাগবৎ খানা প'ড়ে ফেলা যাক না।

মহাভারতখানা কোলের উপর রাখিয়া প্রদীপের সলিতা উস্কাইয়া দিয়া রাজু পাঠে মন দিল।

মনের নিগূঢ় নিভৃতে বিস্ময় বেদনায় কিন্তু বার বার মেনকার কথাই জাগে। প্রদীপের শিখার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া একবার সে বলিল, কি কপাল তোর মিনি! সত্যি!

সুরের রাখী

শ্রী নিরুপম গুপ্ত

চৈত্র পূর্ণিমা—

জ্যোৎস্নার মায়ায় এই বিশ্বজগৎটা যেন স্বপ্নের মত মিলাইয়া যাইতে চায়। ছাতে শুইয়া থেই-হারা খেয়ালের স্রোতে মনকে ভাসাইয়া দিয়াছি।

সেই সন্ধ্যাবেলা হইতেই ওই পাশের বাড়ীর বেসুরো এস্রাজটার আর্ত্তনাদ শুনিতেছিলাম। প্রতিদিনের অভ্যাসে মানুষের মন তীব্র যাতনাকেও অনুভবের বাহিরে ঠেলিয়া রাখিতে পারে। তাই ওই বেসুর কানে আসিয়াও যেন আসিতেছিল না।

কিন্তু যাহাকে বেসুর বলিয়া জানি তাহাই যে একদিন সুরের মায়া জাগাইয়া তুলিবে তাহা তো জানিতাম না। অকস্মাৎ যেন আমায় চমক লাগিয়া গেল। মনের মধ্যে কিসের ব্যথা আমাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

ওই অশিক্ষিত হাতের টানে এস্রাজটা এতদিন যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতেছে বলিয়া মনে হইতেছিল তাহার মধ্যে সেদিন এক নিমেষে ওই মেয়েটির সবখানি রূপ ফুটিয়া উঠিল দেখিলাম। কোথাও আর অসামঞ্জস্য রহিল না, বেসুর রহিল না। ওই মেয়েটির অন্তর সুরে রূপায়িত হইয়া উঠিল বোধকরি তাহারো অজ্ঞাতে। তাই বোধকরি বহু দিনের অভ্যাসে যে অবহেলা তাহার ওই প্রয়াসের দিকে আমার মনের বাতায়নকে রুদ্ধপ্রায় করিয়া তুলিয়াছিল, আজ সেই অবহেলা টিঁকিল না; চকিত হইয়া বাতায়ন খুলিয়া বসিতে হইল।

এতদিন যে আমি তাহাকে এত দেখিয়াছিলাম—তাহার চুল বাঁধার উদাস ভঙ্গীটি, তাহার চলার শিথিল ছন্দটি, তাহার দৃষ্টির ক্লান্ত ঔদাস্যটি, প্রতিদিনের ছোট ছোট তুচ্ছ ব্যাপার পর্য্যন্ত—তাহা আমারো অজ্ঞাত ছিল কেমন করিয়া ভাবিতে আশ্চর্য্য লাগে।

ওই সুরের মাঝে তাহার বিগত দিনের সবখানি ইতিহাস যেন ধরা দিয়াছে। তাই সব মনে পড়িয়া গেল, আর মনে হইল উহাকে আমি চিনি, আমি জানি!

কি ক্লান্ত ওই সুরটা, কেবলি আপনাকে আপনি জানায় 'ভাল লাগে না, আর ভাল লাগে না!' ওই পশ্চিমের বিশাল বিস্তীর্ণ শূন্য প্রান্তরটার মতই যেন এই জীবনটা ভবিষ্যতের দিকে নিরর্থক আপনাকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। তাহারি মাঝ দিয়া ওই যে শীর্ণ শুষ্ক খালটি অতি জীর্ণ জলধারাটুকু বুকে লইয়া অচল হইয়া পড়িয়া চলার স্মৃতিকে ব্যক্ত করিতেছে, এই জীবনের চাওয়ার ধারাটিও যেন ঠিক তেমনি। কাঁদিবার মত প্রাণের শক্তিও যেন নাই; একটা অতি ক্লান্ত যাতনা গোঙায়। পঁচিশ বছরের ওই বিধবা মেয়েটি জীবনে এ কোন্ রিক্ততা লইয়া দিন কাটায়!

কত দিন ভোরের আলোয় উহাকে দেখিয়াছি ওই পশ্চিমের প্রান্তরটার পানে ক্লান্ত করুণ চোখ দুটা মেলিয়া চাহিয়া থাকিতে। ও যেন ভোর বেলাকার পূরবী; জীবনের কোন্ ভোরেই যেন উহার সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে, তাই যেন ও কেবলি ওই পশ্চিম দিগন্তটার দিকেই চাহিয়া থাকে। ও যেন কোন্ চৈত্রের শুকাইয়া-যাওয়া সরোবরে ম্লান মূর্চ্ছিত কমল-কলিকা, একটিবার ফুটিতেও পাইল না। ও যখন চোখ তুলিয়া চায়, মনে হয় যেন দুর্নিবার ঘুমে চোখের পাতা দুটি নামিয়া আসিতেছে।

কচি কচি শ্যামল পাতার সরস সবুজ মাধুর্য্যে ওই পথের পাশের অশথ্ গাছটার প্রবীণতা এমন করিয়া ঢাকিয়া গেছে যে, তাহাকে দেখিয়া তাহার বয়স কিছুতেই কৈশোরের উপরে টানিয়া আনা যায় না। ওই দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া মেয়েটির পানে চাই আর বেদনায় বুকটা কেমন করিয়া উঠিতে থাকে। ও যেন ওই বাড়ীর দেয়ালের মালতী গাছটার মত, গ্রীষ্মের দহনে সবগুলি পাতা ঝরিয়া গেছে; শীর্ণ লতানো ডালগুলিও শুকাইতে সুরু করিয়াছে। বসন্ত উহাকে স্পর্শ করিল না। একটি ফুলও কি ও কখনো ফুটায় নাই?

সমুখের এক-হাঁটু-ধুলো ওই পথটা দিয়া মধ্যাহ্ন রৌদ্রে ইট-বোঝাই গাড়ীটা কোনো রকমে টানিয়া লইয়া ম্রিয়মাণ গরু দুইটা চলিয়াছে; ভাবিয়া পাই না কেমন করিয়া ওই মাঠটা পার হইয়া ওরা ওপারের গ্রামে গিয়া পৌঁছাইবে। ওই গরুর গাড়ীর চলার ছন্দের সঙ্গে ওই মেয়েটির চলার মিল নাই। কেমন করিয়া দুর্ব্বহ জীবনের বোঝাটাকে ও পশ্চিমের অন্ধকারে টানিয়া লইয়া ফেলিবে তাহাই ভাবি। ইটের বোঝা বহিয়া ওই গরুগুলার কোন্ সার্থকতা? তবু পথের মাঝখানে ওই বোঝা নামাইয়া দিয়া ছুটি লইবার অধিকার তো কাহারো নাই।

একটা ঘুঘু কোথায় বসিয়া বসিয়া এই সারাটা সকাল উদাস কান্না কাঁদিতেছে। ও যেন কোন্ পুত্র-হারা মা; আজো যেন শোক থামিল না; তাই এই অনন্ত বিশ্বব্যাপ্ত শূন্যতার মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া হুতাশ ক্রন্দনের ক্ষীণধ্বনি-টাকে দীর্ঘনিশ্বাসের মত প্রেরণ করিতেছে। এই অসীম বিশ্বারণ্যে হারাইয়া-যাওয়া সন্তানকে ওই কান্না কেবলি ডাকে। ওই পাশের বাড়ীর মেয়েটি মাঝে মাঝে কথা বলে, আমি তাহার কণ্ঠে ওই শোকার্ত্ত কপোতের হতাশ বিলাপ শুনি। কবে কাহাকে সে হারাইয়া ফেলিয়াছে?

•

কদিন হইতে অনেক কালের উপেক্ষিত বেহালাটাকে আবার বাজাই। সন্ধ্যাবেলা যখন ওই প্রান্তর ঘিরিয়া আঁধার নামে, ওই মেয়েটি চুপ করিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকে বহুক্ষণ। বোধকরি ওই সন্ধ্যাতারার পানে চাহিয়া থাকে। হয়ত যে কথা আমি বলিতে চাই তা' কিছু বুঝিতে পারে। বাজাই আর কাঁদি; অন্ধকার ঘরে আমার চোখে অশ্রু ঝরে! ওই মেয়েটি আমার কে হয়? বেদনায় ব্যাকুলতায় আমার বেহালাটা পাগল হইয়া উঠিতে চায়। ও কি আমার কোন্ মাতৃহারা মেয়ে? ওই রুক্ষ এলোমেলো চুলের মাঝে আঙুল বুলাইয়া দিতে ইচ্ছা যায়। ও যেন কোন্ ভাঙা দেউলের উপেক্ষিত অজ্ঞাত দেবতা, একটি শ্যামল পাতা দিয়া পূজা করিবার কেউ নাই। কেমন করিয়া পূজা করিতে হয় জানি না, জানিতে ইচ্ছা করে শুধু উহারি বুকের বুভুক্ষু দেবতার জন্য!

ভোর বেলা ওই মাঠটায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম। শুষ্ক রুক্ষ মাটির বুকে ঘাসগুলিও শুকাইয়া উঠিয়াছে, তবু উহার মাঝেও দেখিলাম কয়টি অতি ক্ষুদ্র ঘাসফুল ফুটিয়াছে, অনেকক্ষণ চাহিয়াছিলাম। সমস্ত বুক নিঙড়াইয়া এক ফোঁটা রস দিয়া ধরণী যেন উহাদের ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ওই মেয়েটির কথা মনে পড়ে, দূর হইতে ওই বাড়ীটার পানে চাহিয়া থাকি।

বাড়ী ফিরিয়াই শুনি, একটা চঞ্চল কলরব পাশের বাড়ীতে। ওই অশথ্গাছ হইতে একটা কচি পাতা অকস্মাৎ কেমন করিয়া ওখানে অতিথি হইল? ছোট্ট পাঁচ বছরের একটি শিশু কোথা হইতে আসিয়া মেয়েটিকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। মাঝে মাঝে বারান্দায় ছুটিয়া আসে, সমুখের বিস্তীর্ণ মাঠের অসীম রহস্য তাহার সর্ব্বাঙ্গকে কৌতূহল আর ঔৎসুক্যে অধীর করিয়া তোলে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন! মাসিমা তার কটা প্রশ্নের মীমাংসা করিবে?

সারাদিন ওই বাড়ীটার পানেই কান পাতিয়া থাকি! ছেলেটি কেবলি ডাকে, 'মাসিমা, ও মাসিমা!' কি সুন্দর ডাকে! আনন্দে আমার চোখ দিয়া জল পড়ে।

বেহালা লইয়া বাজাইতে বসি আজও। ভোরের হাওয়া ওই অশথগাছের কচি পাতার সঙ্গে যে খেলা খেলে সেই সুরে বেহালা আমার বাজিতে চায়!

মেয়েটি বারান্দায় আসিয়া বসে, কিন্তু শিশু তাহাকে চঞ্চল করিয়া তোলে, সে ছাতে যাইবে। দুজনের বার্ত্তা-লাপ শুনি।

'মাসিমা, ওঠো বলচি ও-ঠো।'

'নারে পাগলা, এখন ছাতে যায় না। ওই শোন্ বাজনা হবে।'

'কি বাজনা, কোথায়?'—ছেলেটি উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে। আমি আর একটু চুপ করিয়া থাকি। অধীর শিশু বলে, 'কই, বাজে না তো। চল ছাতে।'

'অমন করলে কি বাজাবে? চুপটি ক'রে বসো'—বলিয়া জোরকরি শিশুটিকে কোলে টানিয়া লয়।

'কে বাজাবে মাসিমা?

'তোমার মামা'—মেয়েটি খুব ধীরে বলে। আমার পরিচয় শুনিয়া একটু হাসি আমি!

'মামার কাছে নিয়ে চল না, মাসিমা? ওইখানে তো। ডাক দিই মামাকে?'

'আরে না না, ডাকিস্ না, রাগ করবে তা হলে। এখন বাজনা হবে শোন্।'

আর চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। বাজাইতে থাকি। ও যেন আমার ব্যথাহতা বোন্, আমার কোলে মাথা রাখিয়া সান্ত্বনা চায়। বাজাই—আনন্দ আর বেদনায় সুর কেমন কাঁপিতে থাকে। যখন থামি তখন আর শিশুর কোনো সাড়াই পাই না। বুঝি কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

ভোর বেলা উঠিয়া দেখি দুরন্তকে লইয়া বারান্দায় মেয়েটি দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে দেখিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া মেয়েটি আড়ালে গিয়া দাঁড়ায়, অঞ্চলের অংশটুকু দেখিতে পাই। ওই নিমেষের চোখো-চোখির মধ্যে কি হয় কে জানে! দুরন্ত কিন্তু পালায় না। আমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলে,

'বাজাবে না?'

'আমার এখানে এসোনা?'—আমি বলি।

'তুমি বাজাও তো?'

'তুমি না এলে বাজাব না।'

'কি ক'রে আসব?'

নীচে নামিয়া যাই। মাসিমা দোর খুলিয়া পাশে দাঁড়ায়। খোকাকে বলে, 'দেখিস্ গিয়ে দুষ্টুমী করিস্‌নি যেন।'

'করলেই বা'—বলিয়া আমি তাহাকে লইয়া আসি।

বলি, 'খোকনমণি, তোমার নামটি কি বলত?'

বলে, 'ভোলা।'

আমি মনে মনে বলি, 'পথ-ভোলা, কোথা থেকে আজ পথ ভুলে এলি তুই?'

এমনি করিয়া ভোলার সঙ্গে বন্ধুত্ব জমিয়া ওঠে। বলে, 'তুমি আমার মামা হও, না?'

আমি হাসিয়া বলি, 'কি করে জানলে?'

বিজ্ঞের মত ভোলা বলে, 'মাসিমা তো বলেচে।'

লোভ রসনাকে দুরন্ত করিয়া তোলে, বলি, 'আচ্ছা, আমি তোমার মামা হই, তোমার মাসিমা আমার কি হয় বল দেখি?'

তেম্‌নি বিজ্ঞের মত ভোলা বলে, 'জানি, মাসিমা হয়।'

হাসিয়া উঠি, বলি, 'কিচ্ছু জান না তুমি, তোমার মাসিমা আমার দিদি হয়।'

বলিয়া ফেলিয়া লজ্জিত হইয়া উঠি, বারান্দার পানে তাকাই, অঞ্চলের আভাস পাই কি না। তাহাকে দিদি বলিয়া ডাকিতে আমি আমারো অজ্ঞাতে যে এতখানি লুব্ধ হইয়া উঠিয়াছি তাহা কি আগে জানিতাম! মনে মনে কেবলি ডাকি, 'দিদি, দিদি, দিদু!' ডাক যে এত মধুর তাহা জীবনে এই প্রথম বুঝিলাম।

দিদির সঙ্গে রোজই একটু আচমকা দেখা হইয়া যায়। ভোলাকে লইয়া আমার সকাল বিকাল বেড়ানো। সেই সূত্রে ভোলার দিদিমার সঙ্গে একটু আলাপ হইয়া গেছে। বেশ মানুষটি, সাদা মন। দিদি মাথায় কাপড় দিয়া সামনা-সামনি না হইলেও একটু কাছে আসে। আমি দিদি বলিয়া ডাকিতে পারি নাই, দিদিও ভাই বলিয়া ডাকে নাই।

তবু দিদিকে যে আমি দিদি বলিয়া ডাকি ভোলা তাহা নিশ্চয়ই অব্যক্ত রাখে নাই। দিদির চোখের চাওয়ায় সেই কথাটা আমি স্পষ্টই যেন পড়িতে পারি। আমিও জানি সেই প্রথম দিন হইতেই দিদি আমাকে ভাই বলিয়াই পরিচয় দিয়াছে।

কদিন পর একদিন ভোরে ভোলা আর ছুটিয়া আসিয়া মামা বলিয়া গলা জড়াইয়া ধরিল না।

ভোলার বিষম জ্বর। দিদিমা ভিতরে ডাকিয়া লইয়া যান। আমি ঘরে ঢুকিতেই দিদি একটু সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়।

আমিও ঘরের বাহিরেই থমকিয়া দাঁড়াই।

দিদিমা বলেন, 'এসো বাবা। লাবণ্, অজিতকে দেখে লজ্জা করিস্‌নি, ও তোর ছোট ভায়েরই মত। নরেশ থাকলে তো ওই অজিতের মতটিই হতো আজ। দেখতো বাবা, বড় বিপদেই পড়লাম।'

দিদি একটু সঙ্কুচিত ভাবেই ভোলার শিয়রে বসিয়া হাওয়া করে।

'মামা কেমন আছ?' বলিয়া ডাকি।

কথা বলিবার শক্তি নাই। চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে।

ডাক্তার ডাকিয়া আনি।

তিনি শঙ্কিত কণ্ঠে বলিয়া যান, 'বসন্ত'।

সাতটি দিনরাত্রি মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ। আমিও জাগি, দিদিও জাগে। বিপদ আসিয়া অপরিচয়ের সব কুণ্ঠা, সব ব্যবধান অপসারিত করে।

দিদি বলে, 'এত জাগলে অসুখ করবে,' এখন একটু ঘুমোও।'

আমি বলি, 'আপনারই বেশি বিশ্রামের প্রয়োজন, দিদি, যান একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন।'

ঘুম কি আর হয়? ওই বারান্দাটায় গিয়া দিদি বোধ করি বসিয়া থাকে। শঙ্কায় উদ্বেগে ওই মুখখানি কি হইয়া গেছে! বুকে যাহাকে সে ব্যাকুল স্নেহের আবেগে জড়াইয়া ধরিয়াছে মৃত্যু আসিয়াছে তাহাকে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করিয়া কাড়িয়া লইতে। একা একা ওই অন্ধকার রাত্রির নীচে ওই নিস্তব্ধ প্রান্তরটার পানে চাহিয়া চাহিয়া বুকের ভিতর কেমন দম বন্ধ হইয়া আসিতে চায় বোধ হয়। মিনিট পনেরো পরেই দিদি ফিরিয়া আসে, বলে, 'আমি বসচি, তুমি যাও, শুয়ে পড়গে।'

কেন ঘুম হইল না জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই। আমারো ঘুমাইতে যাইতে ইচ্ছা করে না। বলি, 'এখন তো ঘুম আসবে না দিদি, ভোর বেলাটায় ঘুমিয়ে নেব'খন।' বলিয়া চুপ করিয়া বারান্দাটার দিকে দোর গোড়ায় বসিয়া ওই নিস্তব্ধ প্রান্তরের পানে চাহিয়া থাকি। কতকগুলি অদৃশ্য ছায়ামূর্ত্তি যেন আশেপাশে উদ্‌গ্রীব হইয়া ফিরে; কেমন শিহরিয়া উঠি। ওই অশত্থগাছটার ঝিরঝিরানি কানে আসিতে থাকে।

দোরে ঠেস দিয়া বসিয়াই কখন চোখে চোখ লাগিয়া গিয়াছিল। অকস্মাৎ দিদির আর্ত্ত আহ্বানে চমকিয়া উঠিলাম। 'ভাই অজিত, ভোলা যেন কেমন করচে!' কেমন আর করিবে! পথ-ভোলা আবার পথ ভুলিয়া কোথায় গেল কে জানে! ও যেন আঁধার-ঘরের ফাঁক দিয়া একটি জ্যোৎস্না-রেখার মত ওই দিদির মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল; আমাকে দেখাইয়া দিয়া আবার ফিরিয়া গিয়াছে!

দিদি রুদ্ধকণ্ঠে ডাকে 'ভোলন, আমার ভোলন রে!'

তার পর অল্পদিনই সেখানে ছিলাম। কলেজ খুলিয়াছে, বোর্ডিংএ ফিরিয়া আসিয়াছি। ওই প্রান্তরের নিঃসঙ্গ নির্জ্জনতা যেন আমাকে এখানেও ঘিরিয়া আছে।

প্রত্যহই দিদির ওখানে যাইতাম। ওই কয়টি দিবসের স্মৃতি দিয়া ভোলা ও বাড়ীর প্রত্যেকটি বস্তুকে শোকাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। সেই বিষণ্ণ মৌনতার মধ্যে দিদির চিত্ত যেন ডুবিয়া গিয়াছে। সব উৎসব ভোলা শেষ করিয়া চলিয়া গেছে! তবু এই শোকাচ্ছন্ন দিনগুলির মধ্যে দিদির নিঃশব্দ সাহচর্য্যে যেন অপরূপ মাধুর্য্যের আস্বাদ পাইয়া আসিয়াছি।

দিদি একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিল, 'ভোলা যেন এসেছিল তোমাকে আমার কাছে দিয়ে যাবার জন্তেই, দুটো দিনও তার পর আর সবুর সইল না। ও যেন ঠিক স্বপ্নে আমার কাছে এসেছিল।'

জীবনের সবটাই যে এমনিধারা স্বপ্নের আসা-যাওয়া নয় কে বলিতে পারে! এক এক সময় এই অদ্ভুত স্বপ্ন-কারা ভাঙিয়া সত্যের উন্মুক্ততায় জাগিয়া উঠিতে প্রাণটা ব্যাকুল হইয়া উঠে!

আজ দিদির পত্র পাইলাম!

"....ভোলন আমায় নিত্যকালের জন্য ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেছে! যাবার বেলা একটু আদরও তাহার করিতে পারিলাম না। বাছা আমার কি নিদারুণ দুঃখই পাইয়া গেল! ভাই, তোমাকেও সেদিন নিঃশব্দে বিদায় দিয়াছি। কি জানি কেমন ভয় করে, ভাই!

দিন তো বসিয়া থাকে না, তাই কোনো রকমে দিন কাটাইতেছি। কাঁদিয়া কোনো ফল নাই, সবই বুঝি, তবু মানুষের মন যে বড় অবুঝ! এক একবার মনে হয়, পারিব না, আর আমি এমনি করিয়া দিন ঠেলিতে পারিব না। ওই সামনের মাঠের অন্ধকার যেন আমাকে গ্রাস করিতে আসে!

প্রতিদিন তোমার ওই দিদি ডাকটুকুর প্রতীক্ষা লইয়া পথের পানে চাহিয়া থাকি। ওই ডাকটুকু না পাইলে বুঝি আর বাঁচিতে পারিব না। ভাই, ভুলে যাবে না তো এই অভাগী দিদিকে?

কতদিন ওই বারান্দায় বসিয়া তোমার বাজানো শুনিয়াছি, আমার কত ব্যথার সান্ত্বনা! এখনো সন্ধ্যা বেলা বসিয়া থাকি একাটি। তোমার কথা ভাবি, হয়ত ওখানে এমনি সময় বসিয়া বসিয়া বাজাও!

দিদির কথা তখন মনে পড়ে কি?......"

পড়ে বই কি দিদি! ওই বেহালাটা রোজ বাজাই আর চোখ বুজিয়া বুজিয়া মনে হয়, ওই বুঝি পাশের বারান্দাটায় তুমি বসিয়া আছ। আসার বেলাকার আমার প্রণত মাথার প'রে তোমার স্নেহের ব্যাকুল স্পর্শটি আমি বিস্মৃত হইতে পারি কি? আমার এই সুদূর নিঃসঙ্গ জীবনের উপর তোমার স্নেহের মাধুর্য্যচ্ছটা পড়িয়া যে আমার সব বেদনাকে উজ্জ্বল মধুর করিয়া তুলিয়াছে আমি তো তাহা জানি দিদু!

সংগ্রহ

কাঁচি !

আনোতাল্ ফ্রাঁস্

খ্রীষ্টের জীবনী-রচয়িতা রেনাঁ যাহা-হয় কিছু-একটা লিখিয়াই ছাপাখানায় পাঠাইয়া দিতেন। প্রুফ আসিত, —তিনি সংশোধন করিতেন,—একবার, দুইবার, তিনবার···। পাঁচবারের বার সেটিকে কতকটা রেনাঁর বলিয়া চিনিতে পারা যাইত।······আমার কিন্তু আবার ছয়বার, কখনো বা সাতবার ;—আটবার হইলেই যেন ভাল হয়। উপায় কি ? আমার সব চেয়ে দরকারী হাতিয়ার,—আঠার শিশি ও কাঁচি।

কাঁচি! হায়, সাহিত্যে তার প্রয়োজনের সত্যকার মূল্য কয়জন দেয় ? লেখকের ছবি আঁকিতে গেলেই সবাই আঁকে,—একটি মানুষ, আঙুলের ফাঁকে তার পালকের কলম। ঐ তার অস্ত্র, ঐ তার গৌরব। কিন্তু আমি চাই,—আমার ছবি হইবে,—হাতে একটি কাঁচি, ঠিক যেন দর্জি। এই কাঁচি-চালানো অভ্যাস—ইহাকে আমি অন্তরের বিকাশের দিক্ দিয়াও কল্যাণকর মনে করি ; মানুষের অহমিকা ঘুচাইতে এমনটি আর নাই।

লেখার আবেগ ত নয় যেন আগুন!—সে-আগুন যখন জ্বলে লেখকের তখন দিশা-হারা হইবারই কথা। অবশ্য আমার কথা স্বতন্ত্র। আগুনের আঁচ আছে,—কিন্তু সে বড় অল্প। পাত্রটিকে সর্ব্বদা উত্তপ্ত রাখিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

যাঁহার আছে—রসনা তাঁহার প্রিয় রচনাটিকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না—সুমিষ্ট বস্তুর মত বারে-বারে লেহন করিতে থাকে। প্রতিটি ছত্র তিনি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আবৃত্তি করিতে থাকেন। নিজের রচনায় একেবারে মোহিত হইয়া ওঠেন। নিজের লেখা কাগজখানির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ—চোখে যেন তাঁহার ধাঁধাঁ লাগাইয়া দেয়। তখন সত্য মিথ্যা সহজ ও দুর্ব্বোধ্যের বিচারটুকু নিঃশেষে ঘুচিয়া যায়।

কিন্তু ব্যবচ্ছেদ-গৃহের নিষ্করুণ আলোকে কাঁচি আপনার কাজ করিয়া চলে,—অবান্তর নিষ্প্রয়োজনীয় অংশটুকু ফেলিয়া দিয়া তাজা মাংসটুকু সযত্নে রক্ষা করাই তাহার কাজ।

এরূপ অস্ত্রোপচার নির্ম্মম, কিন্তু অপরিহার্য্য !.

মাটির রাজা

—পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর—

শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শান্তির সন্ধানে রায়-জি ঘর হইতে বাহির হইলেন।

তখনও তিনি মুচিপাড়া পার হইয়াছেন কিনা সন্দেহ, এমন সময় দূরের পোষ্টাপিস হইতে বুড়া পিয়ন আসিয়া টুনুর নামে একখানি চিঠি দিয়া গেল। হাতের লেখা দেখিলেই বুঝা যায়—চিঠি শ্যামলের।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "টাকা আসেনি পিয়ন ?"

• বুড়া পিয়ন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না মা, থাকলে ত' তক্ষুনি দিয়ে যাই।"

জবাব শুনিয়া মার মুখখানা কেমন যেন ভারি হইয়া উঠিল। কাহাকেও আর কোনও প্রশ্ন না করিয়া তিনি রান্নার ব্যবস্থায় বসিলেন।

মাটির দো-তলা। সিঁড়ির উপরে একখানি মাত্র ঘর তখনও অনেক চেষ্টার পরেও অর্দ্ধসমাপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে। চিঠিখানি লইয়া নিভৃতে সেইখানে পড়িবে ভাবিয়া টুনু সিঁড়ি ধরিয়া উপরে উঠিয়া যাইতেছিল।

শুনিল, কান্তি বলিতেছে, "মা, মুড়ি দাও!"

মা বলিলেন, "মুড়ি আর খেতে হবে না বাছা,—পোড়া মুড়ি, তাও হয়ত কপালে জুটবে না শেষে

টুনু থমকিয়া দাঁড়াইল

মা কিন্তু স্পষ্ট করিয়া আর বিশেষ-কিছু বলিলেন না; যাহা বলিলেন, তাহাও ভাল শোনা গেল না; আপন মনেই কি যেন বলিতে বলিতে কান্তিকে মুড়ি দিবার জন্যই বোধকরি শিকল খুলিয়া ঘরে ঢুকিলেন।

উপরের সেই ভাঙা-ঘরের জানালার ধারে বসিয়া চিঠিখানি টুনু একবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল। দু' মাস পরে শ্যামলের এই চিঠি! বাহিরে গেলে ঘর বলিয়া তাহার যেন আর মনে থাকে না। কোথায় যে কেমন করিয়া তাহার দিন কাটে তাহারও কোনও হদিশ্ পাইবার উপায় নাই। কি যে তাহার লক্ষ্মীছাড়া স্বভাব তা' সে-ই জানে!

টুনু কাঁদে। কাঁদিয়া-কাটিয়া চিঠি লিখিয়া পাঠায়। লেখে, "বাঁচা মরা আমার দুই-ই সমান। তুমি আসিও।"

জবাব আসে। শ্যামল হয়ত লিখিয়া পাঠায়,— "চলিলাম।"

হয়ত কত আদর করিয়া কত ভালবাসিয়া লেখে, "লক্ষ্মীটি আমার, সোনা আমার, মাণিক আমার, রাগ করিও না,—আমি যাইতেছি।"

লেখে, কিন্তু আসে না। টুনুর বুকের ভিতরটা কেমন যেন খাঁ খাঁ করিতে থাকে, আতকণ্ঠে চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া আসে। কি যে হয় কিছুই ভাল বুঝিতে পারে না...

আর্শীখানা তুলিয়া লইয়া নিজেরই মুখখানি সে বারে-বারে দেখে, চুলগুলা পিঠের উপর এলাইয়া দেয়, চাবি-বাঁধা শাড়ীর আঁচলটা হয়ত মাটিতে লুটায়,—তাহার পর বালিসের উপর হুম্ড়ি খাইয়া পড়িয়া পড়িয়া কাঁদে। ভাবে, বিষ খাইয়া মরিলেই যেন ভাল হয়। মরিবার নানা সহজ উপায় সে মনে মনে ঠাওরাইতে থাকে।

কিন্তু আবার চিঠি আসে! মরিবার কথা সে আবার ভুলিয়া যায়।

শ্যামল একদিন বলিয়াছিল, "ভালবাসা যার-তার সঙ্গে হয় না টুনু।"

কথাটা টুনু ভাল বুঝিতে পারে নাই, হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "কার কার সঙ্গে হয়?"

শ্যামল আর জবাব দেয় নাই, আদর করিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া বলিয়াছিল, "তোমার হাসিটি বড় চমৎকার!"

ছোট আর্শীখানি মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া টুনু একবার ফিক্ করিয়া হাসে। হাসিটি চমৎকার কিনা নিজেই একবার যাচাই করিয়া দেখিতে চায়। কিন্তু আর-একবার হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলে। ঠোঁট দুইটি থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া ওঠে, চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইয়া আসে।

কোথায় যেন কিসের গরমিল রহিয়াছে, কিন্তু সে গরমিল যে কোথায় তাহা সে ঠিক ধরিতে পারে না। টপ করিয়া একফোটা চোখের জল বন্ধ-চিঠির খামের উপর আসিয়া পড়ে, শাড়ীর আঁচলে জলটুকু মুছিয়া লইয়া টুনু এইবার চিঠিখানি খুলিয়া পড়িতে বসে।

না আসিবার কারণ সে কোনোদিন কিছু লেখে না; লেখে, আসিবার জন্য মন তাহার ছট্ ফট্ করিতেছে, সুযোগ পাইলেই আসিবে। এবারেও সে তাহাই লিখিয়া-

ছিল। লিখিয়াছিল—'অর্থাভাবে তোমাদের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার কলটা কোথায় যেন বিগড়াইয়া গেছে, উপার্জ্জনের তাগিদ পাই না। যতটুকু পাই ততটুকু করি। একটা সংসারের পক্ষে যথেষ্ট নয়;—তাহাও জানি। এই মাসের শেষের দিকে একশ'টি টাকা আমার পাইবার কথা আছে। তাহারই অপেক্ষায় রহিয়াছি। পাইবামাত্র নিজে লইয়া যাইব। অনেকদিন তোমায় দেখি নাই।'

গত কয়েকদিন হইতে এই কথাটাই টুমুর যেন সব চেয়ে বেশি করিয়া মনে হইতেছিল। সংসারে কষ্টের অবধি নাই। মা শুধু কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরেন। উনানে কাঠ দিতে গিয়া কাঠ পান না। মুড়ির হাঁড়ি দেখিতে দেখিতে উজাড় হইয়া যায়। সকলের খাওয়ার শেষে ঘরের ভিতর খিল বন্ধ করিয়া নিজে খাইতে বসেন।

শ্বশুর ত ওই ক্ষ্যাপা-কালা মানুষ। খেয়াল আর খুশী লইয়া দিন কাটে। বুড়া বয়সেও ছেলে-মানুষি ঘুচে নাই। বলিতে গেলে চেঁচাইয়া ওঠেন, হয়ত-বা হাসিয়া হাসিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়।

মা ত' মা! কথা শুনিলে মরা-মানুষও হাসিয়া ওঠে!—

মাও হাসেন।

অত দুঃখেও হাসিতে হাসিতে বলেন, "অপরাধ হয়েছে আমার, ক্ষমা কর!—দেখলে বৌমা?"

টুমুর উচ্ছ্বসিত হাসি সহসা বন্ধ হইয়া যায়। দেখিতে গিয়া সে বহুদূর পর্য্যন্ত দেখিয়া ফেলে।…ঢেউ উঠিয়াছে। এ ঢেউ যে কোথায় গিয়া থামিবে—কোথায় কোন্ তট-প্রান্তে হুমড়ি খাইয়া কূল ভাঙিবে—তাহাও যেন সে স্বচক্ষে দেখিতে পায়।

বুকে বড় বাজে।

বালিসে চোখ মুছিয়া টুনু এইবার উঠিয়া বসে। চিঠি-খানির জবাব লিখিতে হয়। কত কথা লিখিবার থাকে,—কিন্তু লিখিতে গিয়া সব যেন ঘুলাইয়া যায়।

শ্যামলের চিঠিখানির উপরেই হাতের লেখার মক্স লেখে—

'ওগো,

তুমি এসো। আর যে আমি পারি না গো,—তুমি এসো!'

কিন্তু ওইখানেই শেষ। কলম যেন আর চলিতে চায় না।—

সুমুখে জানালার ধারে টুনু একটুখানি আগাইয়া গিয়া বসে। জানালা ঠিক বলা চলে না। দরজা-কপাট কিছুই এখনও বসে নাই। ভবিষ্যতে কোনোদিন বসাইবার আশা হয়ত আছে।

বাহিরে শীত-প্রভাতের রৌদ্র তখন অত্যন্ত প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। দূরে বিস্তীর্ণ ওই মাঠগুলার ওপারে তাঁতি-পাড়ার ঢালু পথ বনের পাশ দিয়া শাল-নদীর শুভ্র বালুচরে গিয়া মিশিয়াছে। ওই পথ দিয়াই রায়-জি শান্তিকে খুঁজিতে গিয়াছেন,—ওই পথ দিয়াই বহুদূরের ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণ ধরিতে হয়,—ওই পথ দিয়াই সে আসে! আবার ওই পথ দিয়াই চলিয়া যায়!

চোখ বুজিয়া হাতের উপর মাথা রাখিয়া ভাবে, সে যেন আসিয়াছে। চুপি-চুপি পিঠের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই হাসি,—সেই সব!

মুখ টিপিয়া হাসে, চুপ করিয়া বসে, কিন্তু কথা কয় না।

টুনু তাহার নিজেরই একখানি হাত আর-একখানি হাতের উপর ধীরে ধীরে বুলায়।

চট্ করিয়া চাহিয়া দেখিতে ভরসা হয় না। ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া একটু একটু করিয়া চায়—!

• জানে কেহ নাই, তবু একবার পিছন ফিরিয়া দেখে। দেখে, স্নানের সময়,—বুড়া তেঁতুল গাছটার তলা দিয়া মেয়েরা পুকুরে যায়। অজস্র তেঁতুল ধরিয়াছে, আর সেই কাঁচা-তেঁতুলের লোভে রাজ্যের যত মুখপোড়া হনুমানের দাপাদাপি!

বাঁদর তাড়াইবার জন্য ছোট ছোট ছেলের দল প্রাণপণে চেঁচায় আর ভাঙা টিনের ক্যানেস্তারা পিটাইতে থাকে।

এদিকে মেলা পর্য্যন্ত রায়-জিকে আর পৌঁছিতে হইল না।

গ্রাম হইতে বেশি দূরে নয়,—মোড়ল্-ডির চাষাদের সব্জী-ক্ষেতগুলা পার হইয়া রায়-জি তখন নদীতে গিয়া নামিয়াছেন। ছোট নদী। বর্ষায় মাত্র পারাপার বন্ধ হয়,—তা ছাড়া প্রায় সব সময়েই শুক্‌নো বালির এক প্রান্তে স্বচ্ছ স্নিগ্ধ একটি শীর্ণ জলধারা ঝির্ ঝির্ করিয়া বহিতে থাকে।

শান্তি সেই জলের উপর পা রাখিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।—গায়ে একটা টক্‌টকে লাল জামা,—জলের উপর তাহার ছায়া পড়িয়াছে; রায়-জি কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন।

আচম্‌কা চাহিয়াই শান্তি একটুখানি অপ্রস্তুত হইয়া গেল।

"বাঃ! তোমরা চলে এসেছ,—বাঃ!"

রায়-জি সহাস্যে কহিলেন, "বলিহারি ছেলে বাবা তুমি! রাত কোথায় কাট্‌লো শুনি?"

শান্তি বলিল, "ময়রাদের দোকানে।"

বলিয়াই সে জল হইতে উঠিয়া আসিল।

"ওরা বললে কি জানো বাবা? বললে, আমরা চিনি তোমার বাবাকে। তুমি থাকো।"

ছোট ছেলে। বালির উপর দিয়া হাঁটিতে পারে না; ঘন ঘন পা ডুবিয়া যায়।

রায়-জি তাহাকে কোলে তুলিয়া লইতে গেলেন।

কিন্তু কোলে তুলিতে গিয়া হঠাৎ একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

শান্তি হাও-চাও করিয়া বুক হইতে নামিতে চায়!—রায়-জি হতচকিত হইয়া গেলেন। ব্যাপার কি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

শান্তি তাহার লাল-জামার পকেট হইতে কাঁচা শাল পাতায় মোড়া একটি ঠোঙা বাহির করিল। দেখা গেল, ঠোঙায়-মোড়া দুইটি রসগোল্লা।—হাতের চাপে চুপ্‌সিয়া একেবারে এতটুকু হইয়া গেছে।

শান্তিরও মনে ছিল না, রায়-জি কেমন করিয়াই-বা জানিবেন!

সুতরাং দোষ কাহারও নাই।

পাতার ঠোঙাটি রায়-জিকে ধরিতে দিয়া শান্তি ছুটিয়া আবার জলে গিয়া নামিল।—"জামাটা ধুয়ে নিই বাবা, দাঁড়াও তুমি!"

এ দুটি সে যে নিজে না খাইয়া কাহার জন্য আনিয়াছে, স্নেহের নাড়ীতে কোথায় যে তাহার টান্ পড়িয়াছে—রায়-জির মনে হইল, ছেলেটাকে একবার শুধাইয়া দেখেন। কিন্তু শুধাইতে গিয়াও তাঁহার আর শুধানো হইল না। আনন্দের নির্ঝরিণী বহিয়াছে ত' সে নিঃশব্দেই বহুক্! শব্দ কোলাহল করিলে হয়ত বা অন্যথা ঘটিতেও পারে।

ধীরে ধীরে রায়-জি তাহাকে পিঠের উপর তুলিয়া নদী পার করিয়া দিলেন।

উঁচু পাড়ের উপর কয়েকটা কাঁঠাল গাছের তলা দিয়া সরু পথ। কাঁঠালের ফুল দেখা যায় না, মিষ্টি অথচ উগ্র একটা গন্ধের ঝাঁঝ্ মানুষের একেবারে মগজে গিয়া ঠেকে। বোধকরি বা এই ফাগুনেই তাহাদের ফল ফলিবে!

পিঠ হইতে নামিয়া শান্তি হাঁটিতে সুরু করিল।

বাড়ী পৌঁছিতে বেশি দেরি হইল না।

আসিবার পথে পাঁকওয়ালা একটা পুকুরের গাবা হইতে রায়-জি কয়েকটি ব্যাঙ্ ধরিয়া আনিয়াছিলেন,—

তিনি আর ঘরে ঢুকিলেন না, গোয়ালের কুলুঙ্গি হইতে সাপের ঝাঁপি তিনটি হাতে লইয়া বাহিরে গিয়া বসিলেন।

গত বর্ষায় রান্নাঘরখানি পড়িয়া গেছে। ঘরেরই চালার একপাশে তখন রান্না চলিতেছিল। শান্তি মার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

মা তাহার আপাদমস্তক একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। তাহার এই মেলায় যাওয়া-আসা এবং একাকী সেখানে রাত্রি কাটানো সম্বন্ধে একটি কথাও তিনি তাহাকে বলিলেন না। বলিবার প্রথা সেখানে নাই।

উনানের উপর ভাতের হাঁড়িটা চাপাইয়া দিয়া মা বলিলেন, "ডাক্ ত শান্তি বৌমাকে! সকাল থেকে উপরে উঠেছে···এখনও নাম্‌ল না কেন—দেখে আয় ত বাবা।"

সেইখান হইতেই শান্তি ডাকিল, "বৌদি!"

টুনু জাগিয়া ছিল, তবু সাড়া দিল না।

উঠানের উপর কয়েকটা কলাগাছের ছায়ায় বসিয়া ভাদু খেলা করিতেছিল, শান্তির গলার আওয়াজ পাইয়া সে ছুটিয়া আসিল।

সিঁড়ি এবং উপরের সেই ঘরখানির মাঝখানে কাঠের কয়েকটি পাটাতনের সেতুর উপর দিয়া অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে যাওয়া-আসা চলে। সেখান দিয়া যাওয়া-আসা ভাদুর পক্ষে নিরাপদ নয়, কাজেই মা তাহাকে ধরিয়া রাখিলেন, শান্তি একাই উপরে উঠিয়া গেল।

টুনু তখন বালিসের উপর মাথা রাখিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া ছিল, শান্তি তাহার কাছে গিয়া চুপি-চুপি ডাকিল, "বৌদি!"

টুনু মুখ তুলিয়া একবার তাকাইয়াও দেখিল না, যেমন পড়িয়া ছিল তেমনি নীরবে পড়িয়াই রহিল।

শান্তি ভাবিল বৌদি হয়ত তাহার সঙ্গে একটুখানি রহস্য করিতেছে, পকেট হইতে শালপাতার ঠোঙাটি বাহির করিয়া বলিল, "দেখ বৌদি,—এই নাও ধর একটা জিনিস···"

ঠোঙাটি শান্তি তাহার হাতের মুঠায় ধরাইয়া দিতে গেল। কিন্তু টুনু একবার ভুলিয়াও তাকাইল না, চুড়ি-পরা হাতখানা তাহার সজোরে ঝাঁকানি দিয়া সরাইয়া লইল।

ধাক্কা খাইয়া শান্তির হাত হইতে ঠোঙাসমেত রসগোল্লা দুইটি তখন গড়াইতে গড়াইতে ধূলায়-মাটিতে একাকার হইয়া এ পাশের দেওয়ালে আসিয়া ঠেকিয়াছে।

শান্তির মুখ দিয়া আর কোনও কথা বাহির হইল না। ধীরে-ধীরে অতি সন্তর্পণে সে-দুটি কুড়াইয়া লইয়া আবার তেমনি ঠোঙায় মুড়িয়া সে নীচে নামিয়া গেল।

মা অপেক্ষা করিতেছিলেন। বলিলেন, "এলো না?"

"না।"—কথাটা কোন রকমে ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়া দিয়া শান্তি সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল।

উনানে তখন ভাত চড়িয়াছে। ভাদুকে কোলে লইয়া মা নিজেই উপরে উঠিয়া গেলেন। টুনু তখনও তেম্‌নি নীরবে চোখ বুজিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া ছিল।

নিঃশব্দে কোল হইতে ভাদুকে নামাইয়া দিয়া মা তাহার পাশে গিয়া চুপ করিয়া বসিলেন। তাহার এই রাগ ব্যাপারটা আজিকার নূতন নয়; কতবার সে এমনি রাগ করিয়া পড়িয়া থাকে, কতদিন কত সাধ্য-সাধনা করিয়া তাহার রাগ ভাঙাইতে হয়,—ভাদুও তাহা জানে।

মা কোনও কথা বলিলেন না। ভাদু তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ডাকিল, "বো-ডি!"

অতটা সিঁড়ি বাহিয়া কাঠের মাচানটা পার হইয়া ভাদু যে একা আসে নাই টুনু তাহা চোখ বুজিয়াই টের পাইল। বলিল, "ফের্ বৌদি বল্‌চিস্ আমায়?"

ভাদু তাড়াতাড়ি তাহার ভ্রম সংশোধন করিয়া লইয়া বলিল, "না, না, বোডিমুণি! বোডিমুণি!"

টুনু তেমনি ঘাড় গুঁজিয়াই হাত বাড়াইয়া ভাদুকে তাহার পাশে শোয়াইয়া দিয়া বলিল, "বেশ, তবে চুপ করে শো এইখানে। মা ডাক্‌লে সাড়া দিস্ নে যেন। রাগ করেছি আমরা।"

ভাদুও তাহার কচি হাতখানি বাড়াইয়া টুনুর গলা

জড়াইয়া শুইয়া পড়িল, বলিল, " টুমি বোডিমুণি—আল্—আমি ?"

টুনু বলিল, "তুমি ?—তুমি ভাদুমণি।"

আনন্দের উচ্ছ্বাস ভাদু যেন আর সামলাইতে পারিল না, খিল্ খিল্ করিয়া একগাল হাসিয়া মাথা তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি ভাডুমুণি,—মা ! আমি ভাডুমুণি।"

বোকা মেয়েটা সব ফাঁস্ করিয়া দিল ; মার আর গোপন থাকা চলিল না ; টুনুর মাথাটা তাড়াতাড়ি তাঁহার কোলের উপর টানিয়া আনিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিলেন, "রাগ করেছিস্ মা টুনু ? ডাক্‌লে সাড়া দিবিনে ? কেন ? কেন ? কেন শুনি—?"

গলার আওয়াজ ক্রমশ উচ্চতর হইয়া সহসা থামিয়া গেল। মা ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

টুনু আর না পারিল মুখ তুলিয়া চাহিতে, না পারিল কথা বলিতে, মাত্র তাহার হাত দুইটি বাড়াইয়া মার পা দুইটা সে জড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অন্ধকারে হাত্‌ড়াইয়া না পাইয়া মার একখানি হাত সে তাহার বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া অত্যন্ত ব্যথা-কাতর কণ্ঠে ডাকিল, "মা !"

মাথা হেঁট করিয়া মা তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কহিলেন, "কি মা ?"

টুনু একটা ঢোঁক গিলিয়া একটুখানি থামিয়া বলিল, "লিখেছে—আস্‌বে…"

কথাটা যে কেমন করিয়া কোথা হইতে কত কষ্টে বাহির হইয়া আসিল, মা তাহা বুঝিলেন, এবং বুঝিলেন বলিয়াই একটি কথাও তিনি আর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। দূরে শ্যামলের চিঠিখানি পড়িয়া ছিল, সেই দিক পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

আরও খানিক্ থামিয়া টুনু ধীরে ধীরে বলিল, "লিখেছে…একশ' টাকা নিয়ে…যাব।"

কথাটা শুনিবামাত্র হঠাৎ তিনি অত্যন্ত রুক্ষ হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "চাইনে, চাইনে মা,—পোড়াই, আগুন জ্বালাই আমি ওদের টাকায়—।"

টুনু মাথাও তুলিল না, কথাও কহিল না,—হাতের মুঠার মধ্যে মার হাতখানা আরও একটুখানি জোর করিয়া চাপিয়া ধরিল মাত্র।

মা বলিলেন, "লোকে বলে, সৎ-মা মাগী রাক্ষুসী,—টাকা টাকা করে চেঁচায় আর কাঁদে।…কিন্তু কেন যে কাঁদি…"

গলার আওয়াজটা হঠাৎ তাঁহার অত্যন্ত ভারি হইয়া উঠিল, একটুখানি থামিয়া বলিলেন, "শ্যামলকে আমি পেটে ধরিনি সত্যি, কিন্তু কি আর বল্‌ব মা, বলবার কিছু নেই আমার !…সৎ-মা, আমি সৎ-মাই ত'…"

টপ্ করিয়া এক ফোঁটা চোখের জল টুনুর হাতের উপর আসিয়া পড়িতেই টুনু ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।

ভাদু এতক্ষণ একটি কথাও বলে নাই, চুপ করিয়া শুইয়া শুইয়া অবাক্ হইয়া এই সব কাণ্ড দেখিতেছিল। বলিল, "বোডিমুণি, মা কান্‌চে।"

টুনু হাসিয়া কি যেন তাহাকে বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় নীচে হইতে কান্তি হঠাৎ ভীত ব্যাকুল কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "মা, মা, শীগ্‌গির নেমে এসো, শীগ্‌গির দেখে যাও—বাবা একটা লোককে মেরে খুন করে' দিলে …"

মার বুকের ভিতরটা সহসা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, রায়-জির পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়। টানিয়া হিঁচ্‌ড়াইয়া ভাদুকে তিনি তৎক্ষণাৎ কোলে তুলিয়া লইলেন, টুনু তাহার বিস্রস্ত বস্ত্রাঞ্চল তাড়াতাড়ি গায়ে মাথায় জড়াইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং হুড়মুড় করিয়া সশব্যস্তে তাহারা নীচে নামিয়া আসিল।

ক্রমশ—

বিচিত্রা

রাজবন্দী সুভাষচন্দ্রকে গবর্ণমেণ্ট বিনা সর্ত্তে মুক্তি দিয়াছেন। সুভাষচন্দ্র বন্দী অবস্থা হইতে মুক্তি পাইয়াছেন ইহাতে দেশবাসীর আনন্দিত হইবার কথা। কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে যে অবস্থায় সরকার ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহাতে দেশবাসীর আনন্দিত হইবার কারণ দেখি না, উৎকণ্ঠিত হইবার কারণ যথেষ্ট উপস্থিত হইয়াছে।

* *

*

সুভাষচন্দ্রকে গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দোষী বলিয়া স্বীকার করিয়া ছাড়েন নাই—অর্থাৎ একজন নির্দ্দোষী লোককে আটক করিয়া রাখায় এবং সেজন্য তাঁহার স্বাস্থ্যহানি ঘটায় সরকারের যে ভাবে অনুতপ্ত হওয়া সঙ্গত ছিল তাহা হন নাই। সরকার সুভাষচন্দ্রকে দোষী বলিয়া আটক করিয়াছিলেন। দেশবাসীর ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত। সরকারের অভিযোগ যে সত্য কোন আদালতে তাহা প্রমাণিত হয় নাই,—ইহাতে দেশবাসীর ধারণা যে নির্ভুল সে বিষয়ে দেশবাসী একমত। সরকার 'প্রেষ্টিজের' খাতিরেই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, সুভাষচন্দ্রকে এতকাল ছাড়েন নাই ; দোষী বলিয়া প্রমাণ করিতে না পারিলেও 'দোষী' বলিয়াছেন। সুতরাং মনে যাহাই থাকুক, সরকার সুভাষচন্দ্রকে আটক করিয়া ভুল করিয়াছিলেন, ইহা কাগজেপত্রে স্বীকার করিতে সরকারী 'প্রেষ্টিজ' নারাজ।

* *

* *

সুভাষচন্দ্রকে যদি ছাড়িতে হয়, তবে একমাত্র medical groundsএ ছাড়া যায়—অর্থাৎ তাহাতে করিয়া রোগীর যাহাই হউক ডাক্তারের হাত-যশ বজায় থাকে। সুভাষচন্দ্রকে আজ medical groundsএ ছাড়া হইয়াছে। দেশবাসীর দাবী ছিল, সুভাষ নির্দ্দোষ তাঁহাকে মুক্তি দেও —অথবা প্রকাশ্য আদালতে বিচার করিয়া তাঁহাকে শাস্তি দেও। সরকার দেশবাসীর সে চাওয়ায় কর্ণপাত করিয়া 'প্রেষ্টিজ্' খাটো করেন নাই। সুভাষচন্দ্রের মুক্তিতে আমাদের জাতীয় 'প্রেষ্টিজ্' একবিন্দু রক্ষিত হয় নাই, জাতি আনন্দ করিবে কেমন করিয়া? তবে সুভাষচন্দ্র জাতির আদরের শ্লাঘার গৌরবের, তাঁহার আটক অবস্থা হইতে বাহির হওয়ায় আত্মীয়জনের, বন্ধুজনের, প্রিয়জনের মুক্তির আনন্দ তাঁহারা পাইয়াছেন। সরকারকে কিন্তু এজন্য ধন্যবাদ দেওয়া শক্ত। কারণ সুভাষচন্দ্রকে যেরূপ অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে দেশবাসীর স্বতঃই মনে হইতে পারে, সরকার "মর, তবে একটু সরিয়া মর"—তোমার ঘরে গিয়াই মর—নীতির অনুসরণ করিয়াই, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

* *

*

এই কথা মনে করিবার কারণও দেশবাসীর যথেষ্ট আছে। রোগ মুক্তি দিলে সারিবে, ইহাই যদি কথা, তবে সুভাষচন্দ্রকে আরও পূর্ব্বে মুক্তি দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল, কারণ সুভাষচন্দ্র যে কঠিন পীড়াগ্রস্ত এবং দিন দিনই যে তাহা খারাপের দিকে যাইতেছিল, জেলের বাহিরের আবহাওয়া যে, তাঁহার স্বাস্থ্যলাভের সহায়ক তাহা ডাক্তাররা পূর্ব্বেও বলিয়াছেন। কিন্তু সরকার আজ ছাড়িয়া দিয়াছেন, এই জন্য যে, জেলে সরকারী চিকিৎসায় আর তাঁহার আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা ছিল না, আর দেরী করিলে কিই না জানি হয়। তবে বর্ত্তমান গবর্ণরের

এতে যদি কিছু হাত থাকে, তাহা হইলে তিনি প্রশংসা পাইতে পারেন। কারণ মৃত্যু পর্য্যন্ত জেলে রাখিলেই বা কে কি করিতে পারিত? তাহা ছাড়া সরকারকে অধিকতর অপ্রিয় হইবার কারণ হইতে রক্ষা করিবার সুবুদ্ধি যদি তিনি দেখাইয়া থাকেন, সেজন্যও সরকারের যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষীদের তাঁহাকে প্রশংসা করা সঙ্গত।

* *

*

সরকার সরকারী কার্য্য পরিচালনায় অসংখ্য ভুল করেন; সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দিয়া দেশবাসীকে সন্তুষ্ট করিবেন, ইহা যদি তাঁহারা ভাবিয়া থাকেন, তাহাও এমনি আর একটি ভুল। সুভাষচন্দ্র ত্যাগী, দেশবৎসল, দেশবাসীর প্রিয়; কিন্তু বাংলার যে সকল যুবক আজও অন্তরীণে জেলে কাল কাটাইতেছেন তাঁহারাও তেমনি ত্যাগী—দেশগত প্রাণ—বাংলার প্রিয়। প্রকাশ্য আদালতে বিচার করিয়া হয় তাঁহাদের সাজা দেও, নয় তাঁদের মুক্তি দেও, ইহাই দেশবাসীর চাওয়া। সুভাষচন্দ্রের মত ইহারাও নির্দ্দোষী, ইহাই দেশবাসীর সিদ্ধান্ত। Medical groundsএ সুভাষচন্দ্রকে ছাড়িলে জীবনলাল, পূর্ণচন্দ্র, হরিকুমার চক্রবর্ত্তী, কিরণ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিষ ঘোষ প্রভৃতি আরো অনেককে ছাড়িতে হয়। যখন সরকারী চিকিৎসায় ও ব্যবস্থায় আর আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না, তখনই সুভাষচন্দ্রের মত "মর—একটু সরিয়া মর" নীতির অনুসরণ করিয়া তাঁদের ছাড়া হইবে কিনা জানি না; তবে, ইহা সত্য, সরকারের এই দয়ায় দেশবাসীর আনন্দিত হইবার কারণ নাই। বরং শঙ্কিত হইবার কারণ আছে। সে কারণ বড় দুঃখের—তাহাও বলিব।

* *

*

সুভাষচন্দ্রের আত্মীয়-স্বজন অর্থশালী। তাঁহার ব্যয়-বাহুল্য চিকিৎসা সম্ভব। কিন্তু জীবন প্রভৃতি দরিদ্র। আজ হঠাৎ তাঁহাদের ছাড়িয়া দিলে তাহাদের সুচিকিৎসা চলা শক্ত। অবশ্য এ কারণে সরকার তাঁহাদের আটক রাখুন, বলিতেছি না। সরকারী কর্ম্মফলে এই সকল কর্ম্মীদের ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়া পৌছিয়াছে তাহাই বলিতেছি। এই সকল যুবক দরিদ্র, কিন্তু জেলে থাকিয়া তাঁহারা যে রোগ আয়ত্ত করিয়াছেন, তাহা বড়। বাহিরে থাকিলে এ রোগ তাঁহাদের না হইবারই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আজ তাঁহাদের সরকার রোগজীর্ণ দেহে বাহিরে ছাড়িয়া দিলেও, চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চয় করিবেন না; কিন্তু দরিদ্রের রোজগার করিয়া অর্থ সংগ্রহের উপায় স্বাস্থ্যটি সরকারী ব্যবস্থায় নষ্ট হইল। দেশবাসী তাঁহাদের সাহায্য করিলে তবেই তাঁহাদের চিকিৎসার ও পথ্যের ব্যবস্থা হইবে; তবে সে ব্যবস্থা করাও যে কত শক্ত তাহা ভুক্তভোগী বলিয়াই ত কিছু কিছু জানি। সরকারের medical ground এ ছাড়িয়া দেওয়া যে কোথায় ছাড়িয়া দেওয়া সে বিষয়ে দেশবাসীকে একটু সচেতন করার জন্যই এ কথাগুলি বলিতে হইল।—

* *

*

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি মিঃ জিন্না প্রমুখ মুসলমান নেতৃবর্গের প্রস্তাবিত মিশ্র-নির্ব্বাচন ব্যবস্থা মানিয়া লইয়াছেন। মিশ্র-নির্ব্বাচন সম্পর্কে যে সকল সর্ত্ত মিঃ জিন্না প্রভৃতি দিয়াছিলেন তাহাও মানিয়া লইয়াছেন, অর্থাৎ সিন্ধুকে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করা, সীমান্ত প্রদেশে 'রিফর্ম' প্রবর্ত্তিত করাও স্বীকার্য্য হইয়াছে। এই সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মিশ্র-নির্ব্বাচন বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন ব্যবস্থা হইতে ভাল স্বীকার করি। কিন্তু মিশ্র-নির্ব্বাচনের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সংখ্যা নির্দ্দেশ করা থাকিলে তেমন ব্যবস্থা যে জাতীয়তার অনুকূল ব্যবস্থা নহে, তাহাও আমরা বলিয়াছি। সুতরাং এই ব্যবস্থাকে ভাল বলিয়া ত গ্রহণ করিতে পারিই না, বরং এই ব্যবস্থায় জাতীয়তার পথকে আমরা স্বেচ্ছায় বন্ধুর করিয়া তুলিতেছি জানিয়া, এই ব্যবস্থাকে অভিসম্পাত

করি।—সাম্প্রদায়িক সদস্য-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট না রাখিয়া সাধারণ নির্ব্বাচন ব্যবস্থা বর্ত্তমানে এদেশে সাম্প্রদায়িক রেশারেশি বাড়াইতে পারে, কিন্তু আখেরে একমাত্র এই পথেই যে জাতীয়তা জয়লাভ করিবে ইহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। যাহা সত্য ও জাতীয়তার অনুকূল, তাহা শক্ত হইলেও জাতিকে তাহাতেই অভ্যস্ত করিয়া তুলিতে হয়, জাতীয় নেতাদের ত ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রনেতারা এ দিকে দুর্ব্বল চিত্ত। তাঁহারা সত্যকে খাটো করিয়া মিথ্যার সঙ্গে রফা করিতে চান, মহৎ উদ্দেশ্যে;—অর্থাৎ যদি তেমন মিথ্যা রফার বহর দেখিয়া আমাদের যোগ্যতার মূল্য যাঁহারা দিবেন সেই ইংরেজ রাজনীতিকরা আমাদের যোগ্য ভাবিয়া আর এক দফা স্বরাজ দেন 'রয়াল কমিশন' আসিতেছে, সুতরাং united front দেখাইতে হইবে—কিন্তু মিথ্যার ফাঁকিতে 'রয়াল কমিশন' ভুলিলেও জাতির ভগবান ভোলেন না।

আমাদের দেশে বিবাহযোগ্যা কন্যাকে বরপক্ষ দেখিতে আসেন। কন্যাপক্ষ জানেন, কন্যার জানা কিছু জানা নহে, কন্যার সৌন্দর্য্য কন্যার জানায় হয় না, বরপক্ষ যদি কন্যার রূপের গুণের, লেখা-পড়ার মূল্য কিছু ঠিক করেন তবেই মূল্য আছে, নৈলে কিছুই নাই। কন্যা-পক্ষও তাই বরপক্ষের চোখে পড়িবার মত করিয়া সাজ-সজ্জা করেন, রং মাখিয়া ফরসা হন, কত কি করেন। মিথ্যার সাজে এক দিনের জন্যও কন্যার সত্যকার রূপ গুণকে ঢাকিয়া যদি বরপক্ষের 'পাশ' সার্টিফিকেট পায়, সেই চেষ্টা চলে। কন্যাপক্ষের এই আত্মাবমাননা ও দৈন্য ব্যক্তিগত বিবাহ-ব্যাপারে সার্থক হইতেও পারে, কিন্তু জাতির স্বরাজলাভের যোগ্যতার মাপকাঠি যে সত্যই জাতির হাতে, রং মাখিয়া জাতীয় যোগ্যতা অর্জ্জন করা যে চলে না, 'রয়াল কমিশন' দিলেও চলে না, ইহা আমাদের বুঝা দরকার। রাজনীতিক নেতারা 'রয়াল কমিশনের' সম্মুখে হাজির হইবার তাগিদে আজ হিন্দু-মুসলমান ঐক্য চাহিতেছেন বলিয়াই সমস্যাটাকে তাড়া-তাড়ি গোঁজামিল দিয়া সারিতে ব্যস্ত হইয়াছেন; জাতির দিক, জাতির অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের দিকটিই এক মাত্র লক্ষ্য থাকিলে মিলনের জন্য এমন গোঁজামিল দিতে চাহিতেন না।

* *
*

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি হিন্দু-মুসলমান সমস্যা মিটাইবার জন্য যতটা ব্যস্ততা দেখাইয়াছেন, তদপেক্ষা বেশী ব্যস্ততা দেখাইয়াছেন 'রয়াল কমিশনের' মুখে কেমন করিয়া মান বাঁচাইয়া চলিবেন। ভগবানের কাছে যাদের মান বাঁচিল না, 'রয়াল কমিশন' তাদের মানের দাম আর কত দিবেন? হিন্দু-মুসলমানে মারামারি আজ মসজিদের সম্মুখে বাজনা লইয়া চলিয়াছে। এই সম্পর্কে সরকারের ব্যবস্থা ভাল নহে; নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কর্ত্তব্য ছিল এই সম্পর্কে তাদের সিদ্ধান্ত দেশবাসীকে জানানো এবং সেই সিদ্ধান্তই যে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রব্যবস্থায় বলবৎ থাকিবে তাহা ঘোষণা করা। কিন্তু রাষ্ট্র-নেতারা তাহা করেন নাই। বাজনা সমস্যার আলোচনা নাকি এখনো পাকে নাই। কিন্তু এ কথা সত্য হিন্দু-মুসলমানে ব্যাপক বিদ্বেষ বাজনাকে আশ্রয় করিয়াই চলিয়াছে। মিশ্র বা অমিশ্র নির্ব্বাচনে বা কত সংখ্যক সদস্য-সংখ্যা বাড়িল কমিল তাহাতে সাধারণ মুসলমান-হিন্দু মাথা ঘামায় না। সদস্য-সংখ্যা লইয়া কাহারা মাথা ঘামায়, কেন ঘামায় তাহাও আমরা জানি, সুতরাং যাহাদের স্বার্থসিদ্ধি হইবে না, (অনেকেরই হইবে না) তাহারা বাজনার ধুয়া ধরিয়া হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের লড়াই বাধাইবার চেষ্টায় থাকিবে; এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হইবে, এমন সম্ভাবনাও আছে।

* *
*

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলি গড়িয়া উঠিলে আমাদের

আপত্তি নাই। কিন্তু শ্রীহট্ট ভাষার দিক হইতে বাংলায় আসিতে পারে। শ্রীহট্টের দাবী কংগ্রেস পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়াছিল; শ্রীহট্ট সম্পর্কেও একটা ব্যবস্থার কথা থাকিল না কেন? বাংলার সদস্যরা ও কথায় জোর দেন নাই। বাজনা-সমস্যাই যে বাংলার ব্যাপক হিন্দু-মুসলমান-সমস্যার হেতু এ কথা বাংলার সদস্যরা জোর করিয়া বলিলে এবং এই সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত করাইতে পারিলে ভাল করিতেন।

ভোটারের সংখ্যা হিন্দুই বেশী। সুতরাং যে সকল মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার দৌলতে আজ নেতা হইয়াছেন, তাহারা এই মিশ্র-নির্ব্বাচন ব্যবস্থায় সুখী হইতে পারিবেন না। পারেন নাই যে, বাংলার অনেক মুসলমান নেতার মুখে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহারা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াইবেন। আর বাজনা প্রভৃতির সূত্র ধরিয়া তাহার বিস্তৃতি সম্ভব করিবেন; এ দিকে আমরাই যাচিয়া কিন্তু মিশ্র-নির্ব্বাচন ব্যবস্থা সরকার হইতে মাগিয়া লইলাম। ইংরেজ যাহা দেয়, নিরুপায়ে তাহা মানিয়া লই, কিন্তু যাহা নিজেরা চাহিব তাহা নির্দ্দোষ হইবে না কেন?—

বরিশালে মুসলমানদের কন্‌ফারেন্সে গুর আবদার রহিম যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতেও তাঁহার প্রকৃত স্বরূপটি প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার স্ব-সমাজের উপর দরদও যে কত মেকী, আর হিন্দু-বিদ্বেষ যে তার কত খাঁটি তাহা বক্তৃতায় প্রকাশ পাইয়াছে। হিন্দু বা মুসলমানই হউন, যে সমাজহিতৈষী নেতা স্ব-সমাজের দোষ দেখিয়াও দেখেন না, স্ব-সমাজের ব্যভিচারকে ধিক্কার না দিয়া পর-সমাজ-বিদ্বেষ বশতঃ অথবা স্ব-সমাজের লোকের অপ্রিয় হইবার আতঙ্কে তাহার প্রশ্রয় দেন, তিনি শুধু নেতার অযোগ্য নন্—তিনি স্ব-সমাজের শত্রু। হিন্দু সমাজের নেতারা, সংস্কারকরা হিন্দুর সামাজিক দুর্নীতি, ব্যভিচারকে যত কষাঘাত করিয়াছেন, তেমন কষাঘাত হিন্দু সমাজের শত্রুও করিতে পারে নাই। সমাজের পাপ এমন করিয়াই পরিশুদ্ধ হয়। কিন্তু রহিমী মতি-গতি-ই আলাদা, তাহা স্ব-সমাজের কল্যাণের পথেও চলে না, চলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সঙ্কীর্ণ পুতিগন্ধময় কদর্য্য-পথে।

বাংলায় নারী-নির্যাতন যে ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীর মস্তক লজ্জায় দৈন্যে নুইয়া পড়িবার কথা। নির্যাতিত নারী অধিকাংশ হিন্দু—নির্যাতনকারী অধিকাংশ মুসলমান।

মুসলমান গুণ্ডারা নারী-নির্যাতন করে, পাশবিক মতি-গতির বশবর্ত্তী হইয়া—কামুক পিশাচ বলিয়া। কেবল যে হিন্দু-নারী নির্যাতন করে তাহা নহে, মুসলমান নারীও মুসলমান গুণ্ডারা নির্যাতন করে। এই সকল গুণ্ডাকে মুসলমান বলিয়া বিশেষ করিয়া দেখিবার কোন প্রয়োজন নাই, গুণ্ডা বদমায়েস সকল সমাজেরই শত্রু। কিন্তু আজ বাংলার আকাশ বাতাস এমনই দূষিত হইয়া উঠিয়াছে যে, মুসলমান গুণ্ডারা নারী-নির্যাতন করিয়া তাহাতে সাম্প্রদায়িক রং মাখাইয়া হিন্দু-মুসলমান মনোমালিন্যের সুযোগ গ্রহণের চেষ্টায় আছে। হিন্দুনারী হরণ করিয়া, পাশবিক অত্যাচার করিয়া আজ বদমায়েসেরা স্ব-সমাজের সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির সহানুভূতি লাভের চেষ্টা করে—ও কৃতকার্য্য হয়। মুসলমান সমাজের নেতাদের ইহা ভাবিবার বিষয়। লম্পট বদমায়েস হিন্দু সমাজেও আছে। কিন্তু হিন্দু-সমাজ সমাজ হিসাবে তাহাদের প্রশ্রয় দেয় না বলিয়া হিন্দু-সমাজে ইহাদের প্রভাব কম। মুসলমান নেতারা মুসলমান কামুকদের এ পর্য্যন্ত তেমন ধিক্কার দেন নাই; কামুকের দল, কেবল হিন্দু নহে, অবসর পাইলে, স্ব-সমাজের কন্যা-ভগিনীকেও নির্যাতন করিয়াছে

করিতেছে। যেখানে দেখা যাইতেছে নারী নির্যাতন-কারী অধিকাংশ মুসলমান সেখানে মুসলমান সমাজের নেতাদের কর্ত্তব্য নহে কি, স্ব-সমাজের গুণ্ডাদের বিশেষ ভাবে নিন্দা করা? তাহা করা হয় না, তাই গুণ্ডারা এ কথাও ভাবিতে পারে যে, হিন্দুনারী নির্যাতনে জাত-ভাইদের সমর্থন পাইব।—পাইয়াছেও। স্যর আবদার এ বিষয়ে বিদ্বেষে অন্ধ হইয়াই স্ব-সমাজের দোষ দেখেন নাই।

* *
*

মুসলমান গুণ্ডাদের দ্বারা নারী-নির্যাতনকে স্যর আবদার রহিম স্ব-সমাজের তেমন কোন দোষ নয় বলিয়া, সামান্য sexual irregularities, আর দশ জনের মতই বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন। মুসলমানদের গুণ্ডামী লইয়া যে সংবাদ-পত্ররা মাথা ঘামায় এ নিয়া তিনি যেন অতি কষ্টে হাস্য-সম্বরণ করিয়াছেন। চমৎকার! কাগজে-কলমে যদিও দেখা যায় যে মুসলমান পুরুষ অধিকাংশ স্থলে নারী নির্যাতনকারী তথাপি রহিমী মতে তাহা সম্ভব নহে—কারণ তিনি ঘোষণা করিতেছেন—"ইস্‌লাম ধর্ম্ম-গ্রন্থে পাশবিক ইন্দ্রিয় লালসাকে যেমন ঘৃণা করে এমন আর কোন ধর্ম্মে করে না। এই শ্রেণীর অপরাধীরা যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউক না কেন, তাহাদের এমন ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা অপর কোন ধর্ম্মে আছে বলিয়া আমি জানি না।"

ইস্‌লাম শাস্ত্রে পাশবিকতাকে ঘৃণা করা হইয়াছে, রহিম সাহেবের এই উক্তি ইস্‌লাম শাস্ত্র না পড়িয়াও আমরা বিশ্বাস করিয়া লইতেছি। কিন্তু এই শাস্ত্র অনুসরণ করিয়া বাংলার মুসলমান সমাজ চলিতেছেন, ইহা এত সব বিরুদ্ধ প্রমাণ উপস্থিত থাকিতে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। পরমহংস দেব বলিতেন, 'পাঁজিতে অত হারা জল হইবে লেখা আছে, কিন্তু ঐ পাঁজি নিংড়াইলে কি এক ফোঁটা জলও পাওয়া যায়?' —শাস্ত্রে ভাল কথা থাকিলেই হয় না, সমাজকে ঐ ভাল কথা মানিয়া চলিতে হয়। বাংলায় যে সকল কামুক মুসলমান নারী হরণ করিয়াছে, তাহারা নারীকে এক বাড়ী হইতে অপর বাড়ী, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে লইয়া ফিরিয়াছে। মুসলমান সমাজের লোকেরা তাহাদের ঘৃণা করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ নাই, কিন্তু পুলিশের হাতে যাহাতে কামুকেরা ধরা না পড়ে, নির্যাতিতা নারীর উদ্ধার সম্ভব না হয়, তজ্জন্য নির্যাতনকারীদের ও নির্যাতিতা নারীকে লুকাইয়া রাখিয়াছে, আশ্রয় দিয়াছে, প্রশ্রয় দিয়াছে—তাহার প্রমাণ আছে। এই জঘন্য পাশবিক ইন্দ্রিয় লালসা ব্যাপারে আসামীদের আত্মীয়-স্বজন এমন কি নারীরা পর্য্যন্ত সাহায্য করিয়াছে, ধর্ষিতা নারীকে লুকাইয়া রাখিয়াছে, পাপ পথে মতি ফিরাইতে চেষ্টা করিয়াছে—এত বড় সামাজিক দুর্নীতিকে রহিম সাহেব উপেক্ষা করিবেন করুন, আমরা ভিন্ন সমাজের হইয়াও লজ্জায় মরিয়া যাই—কারণ এ লজ্জা জাতির—মানুষের। ইস্‌লামী ধর্ম্ম গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করিলে এ সব সামাজিক পাপ যায় না—ইহা দূর করিতে হয়—নির্ম্মম শাসনে, সমবেত সামাজিক নিশ্চিত ঘৃণা প্রকাশে। হিন্দু সমাজেও কামুক আছে, কিন্তু একজন পুরুষ হিন্দুই হউক বা মুসলমান নারীই হউক, তাকে হরণ করিয়া আনিবে, আর সেই কামুক পুরুষের বাপ, কাকা, শ্বশুর, সম্বন্ধী, পুরোহিত, ভ্রাতৃজায়া, মা-জেঠিমা, স্ত্রী, ভগ্নি সে কার্য্যে সহায় হইবেন এমন জঘন্য পাপ হিন্দু সমাজে নাই। থাকিলে, হিন্দু সমাজের নেতারাই তাহাদের সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বতোভাবে ধিক্কার দিতেন। সমাজের ঐ গলদ দূর করিতে ব্যগ্র হইতেন।

কামুক গুণ্ডাকে আমরা গুণ্ডা বলিয়াই দেখি। কিন্তু যে সমাজে গুণ্ডার প্রাদুর্ভাব অধিক—সে সমাজের নেতা-

দের কর্ত্তব্য অপরিসীম। আর মুসলমান গুণ্ডারা গুণ্ডামী করিয়া তাহা সাম্প্রদায়িকতার রংএ রঙ্গাইয়া সাম্প্রদায়িক সহানুভূতি লাভের চেষ্টা করিতেছে, ইহাতেও নেতাদের অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। এই সম্পর্কে স্যর আবদার রহিম স্ব-সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করেন নাই—হিন্দুর কথা নাই তুলিলাম।

শ্রী শিশিরকুমার নিয়োগী কর্ত্তৃক, ১এ, রামকিষণ দাসের লেন, নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস হইতে মুদ্রিত ও

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

জন্ম—২৯ মাঘ, ১২৮৮। মৃত্যু—১০ আষাঢ়, ১৩২৯

কালি-কলম
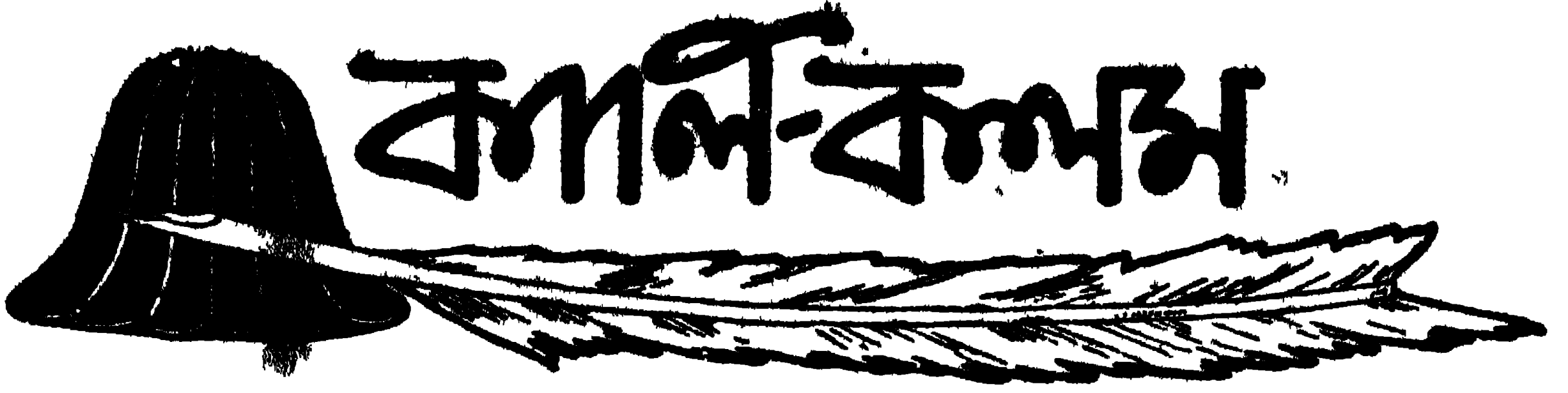
২য় বর্ষ] আষাঢ়, ১৩৩৪ [৩য় সংখ্যা

রুদ্র-বোধন

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

বজ্র কোথায় লুকাইয়া আছে নির্মেঘ নীল গগন-তলে ?
ধূর্জ্জটি ! যোগ-মগন তোমার নয়নে কোথায় অনল জ্বলে ?
এযে চারিদিকে কঙ্কাল আর শায়িত শব !
এর মাঝে কোথা ফেলিবে চরণ, হে ভৈরব ?
শ্মশান-বাহিনী নদী চলে ওই কল্লোল-হীন অশ্রুজলে—
বজ্র তবুও লুকাইয়া আছে পাথর-মিথর গগন-তলে !

*   *   *

চিতার ভস্ম ভালবাস, তাই ধূর্জ্জটি ! তুমি শ্মশান-চর,
চারিদিকে শব, তারি মাঝে, শিব ! আসন তোমার শবান্তর !
ধুতুরার বিষে ঘূর্ণিত আঁখি, কণ্ঠ নীল !
জটায় গঙ্গা বীচি-বিভঙ্গে নৃত্যশীল !
পিনাক তোমার ধূলায় লুটায়, কোথা গজাজিন, দিগম্বর ?
কবে ধ্যান ভাঙি' দাঁড়ায়ে উঠিবে 'হর হর'-রোলে, হে শঙ্কর !

সংহার-সুখে কবে, মহাকাল! আধেক মুদিবে অক্ষিতারা?
সারাদেহময় আলোড়ি' ছুটিবে অধরে-রুদ্ধ হাস্য-ধারা!
তাণ্ডব-তালে ফেলিয়া চরণ—তুলিয়া ধরি,'
বামে ও ডাহিনে আকাশ ছানিয়া দু'বাহু ভরি'—
নিমেষে নিমেষে শত রবিশশী উড়ায়ে অসীমে কক্ষহারা,
কবে, মহাকাল! ঊর্দ্ধ-পলকে আধেক মুদিবে অক্ষিতারা?

কোটী বরষের জরা-জর্জ্জর ধরা-বধূ হবে স্বয়ম্বরা—
হরি' লবে বুঝি মালাখানি তার ছয়-ঋতু-ফুলে বয়ন-করা
ঘুচে যাবে তার যৌবন-ছলা উন্মাদনী,
পলিত অলকে দু' আঁখি ঢাকিবে পলকে ধনী,
অঙ্গ শিথিল—লোল পয়োধর না বাঁধি' বসনে বসুন্ধরা—
সুন্দরী নয়, সতীবেশে হবে দিগম্বরের স্বয়ম্বরা!

আর সে রূপসী পরিবে না রাতে তারা-ঝল্‌মল্ যামিনী-চেলি,
দিনে দহিবে না পুরুষের মন, আলোক-সিনানে বক্ষ মেলি'।
ঘুচে যাবে রূপ, ঘুচে যাবে তার অঙ্গরাগ,
ঘুচে যাবে কায়া—কামনার এই ব্যর্থ যাগ,
ঘুরিবে না আর মর-মরুপথে প্রাণের দেবতা পাথর ঠেলি'—
কবে দেখা দিবে কঠিন কুলটা ভ্রূকুটি-ভীষণ দশন মেলি'?

জাগো মহাকাল! রুদ্র-দেবতা! বর্ণবিহীন বিভূতিময়!
দাও খুলে' তব গ্রন্থিল জটা, ব্যোমকেশ! কর সৃষ্টি লয়!
ফেটে যাক্ নীল নভোবুদ্বুদ—রঙের হাট!
মেদিনীর এই বেদী ভেঙে যাক্—রূপের ঠাট!
সুন্দরে হানো সত্যের শূল, টুটাও স্বপন হে নির্দ্দয়!
নিত্য-মরণ হরিয়া দাও গো নিত্য-জীবন শূন্যময়।

সৃষ্টির ভরা ভারি হয়ে এল, ভেঙে যায় বুঝি রূপের চাপে।
তবু রূপ চাই স্নায়ু চিরে চিরে, আয়ু যে ফুরায় তাহারি দাপে।
রূপ নয় আর প্রিয়েরি লাগিয়া প্রেমের ছলা,
সে যে নিজতরে কামনা-নটীর নৃত্যকলা!
সে ত' নহে আর হৃদয়েরি দান—তারে পেতে হয় অশেষ পাপে।
মিথ্যার ভারে ভারি হ'ল ধরা, চূর্ণ কর গো চরণ-চাপে।

এই মিথ্যারে মন্থন করি' কালকূট পুন করিবে পান—
কবে অমৃতের শুভ্র ফেনায় নীল-অম্বুধি করিবে স্নান?
এ যে চারিদিকে কঙ্কাল আর শায়িত শব,
কোথা অনুচর?—কারে নিয়ে হবে মহোৎসব?
কারে জাগাইবে? কোন্ মৃতজনে জীয়াইয়া তুলি' করিবে দান
মহা-মারণের মন্ত্র ভীষণ, কারে কালকূট করাবে পান?

মন্বন্তরে মারীমুখে বুঝি দূর হবে যত আবর্জ্জনা?
শুষ্ক-শবের মূর্দ্ধজে ধূপ-দীপ করি' হবে পূজার্চ্চনা?
নরপশুদের হিহি-হাহাকার মন্ত্ররব,
নারী-শিশুদের ছিন্নকণ্ঠে গীতোৎসব,
উদ্বন্ধনে করিবে নৃত্য শূন্য-মঞ্চে রসিক-জনা,—
ঘূর্ণী-ঝড়ের চামর ঢুলায়ে হবে কি তোমার পূজার্চ্চনা?

*　　*　　*　　*

ভেবে নাহি পাই, কবে কোন্ ঠাঁই ঊষর ধরার উরস-মুখে—
শৈল-চুচুক বিদারি' ছুটিবে আগুনের স্রোত সকল বুকে।
তারি মাঝে দিক্-পিশাচেরা করে ডমরু-নাদ,
রবি মুছে যায়, কালো হ'য়ে চায় আকাশে চাঁদ।—
কবে সেই দিন উদিবে হেথায়—মমতাবিহীন মরণ-সুখে
নর-কঙ্কাল উঠিবে হাসিয়া লোহ পান করি' লৌহ-বুকে।

ব্যষ্টির মহত্ত্ব

শ্রী অরবিন্দ ঘোষ

সকল আন্দোলনের, মানুষের সকল রকম বৃহৎ প্রয়াসের মধ্যে যুগের ধর্ম্ম আপনাকে প্রকাশ করিয়া ধরিতেছে—ইউরোপ ইহাকেই বলে 'জাইটগাইষ্ট', ভারতবর্ষ বলে "কাল"। নামেই জিনিষটির সম্যক পরিচয়। 'কালী', বিশ্বের জননী, বিশ্বের ধ্বংসকর্ত্রী যিনি, তিনি হইতেছেন শক্তি —অর্থাৎ যে শক্তি মানবজাতির হৃদয়-কন্দরে কাজ করিয়া চলিয়াছে, ব্যক্তির প্রতিষ্ঠানের আন্দোলনের নিত্য উত্থান-পতনের ভিতর দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে; আর 'মহাকাল' হইতেছেন ভিতরের পুরুষ, তাঁহারই তপোবল শক্তির মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, জগতের প্রগতি, জাতির ভাগ্য গড়িয়া তুলিতেছে। মহাকালেরই প্রেরণা কালের ধারায় সার্থক ও সফল হইতেছে। একবার একটা আন্দোলন যদি সচল হইয়া উঠিল, তবে অন্তর-পুরুষের প্রেরণা, কাল আর শক্তি তাহার ভার গ্রহণ করিবেই, তাহাকে গড়িয়া, পরিণত করিয়া, পূর্ণ করিয়া তুলিবেই। যুগধর্ম্ম, কালের ধারায় মূর্ত্ত ভগবান যখন একটা বিশেষ দিকে চলিতে সুরু করিয়াছে, তখন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় শক্তি সম্মিলিত হইয়া সেই স্রোতকে উপচিত করিয়া ধরিবে, পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট গন্তব্যেরই দিকে সজোরে তাহাকে চালাইয়া লইবে। স্বেচ্ছায় যাহারা সাহায্য করিবে তাহারা ত স্রোতের গতি বাড়াইয়া তুলিবেই, যাহারা বাধা দিবে তাহারাও দ্বিগুণ বাড়াইয়া তুলিবে। বাত্যাবিক্ষুব্ধ সাগরের বুকে তরঙ্গের মত, নিভৃত উৎসের প্রেরণা একবার উঠিতেছে আর একবার পড়িতেছে—এই বিজয়ের ঋদ্ধির সমুচ্চ শিখরে আরূঢ়, এই আবার পরাজয়ের হতাশার গহ্বরে নিমজ্জিত—তবুও সে অব্যর্থভাবে আপন অনিবার্য্য সিদ্ধিরই দিকে ছুটিয়া চলিতেছে। মানুষ তাহাকে সাহায্য করিতে পারে, মানুষ তাহাকে বাধাও দিতে পারে, কিন্তু কালের গতি সকলকে আপন কুক্ষিগত করিয়া অভিষ্ট কর্ম্ম যথেচ্ছ করিয়া চলিয়াছে।

এই মহাসত্যটির একটা গভীর উপলব্ধি যে মানুষের অন্তরে আছে তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাই গীতায়, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ আপনার বিশ্বরূপ প্রকট করিয়া বলিলেন, তিনি হইতেছেন "লোকক্ষয়কারী কাল"। অর্জ্জুন যখন তাঁহার গাণ্ডীব ফেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মানুষকে, ভাই-বন্ধুকে, গুরুজনকে হত্যা করা—কি মহাপাপে আমি লিপ্ত হইতেছি; আমার দ্বারা এ কার্য্য হইবে না," শ্রীকৃষ্ণ তখন প্রথমে বিচারের পথে তাহার ভুল দেখাইয়া দিলেন, তারপর একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত সেই অদ্ভুত বিশ্বরূপ দর্শনের দ্বারা অর্জ্জুনের মানসপটে জগতের আসল সত্য কি তাহা গভীরভাবে অঙ্কিত করিয়া দিলেন। ভগবানের মুখনিঃসৃত সেই রুদ্রবাণী বলিতেছে—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্
সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে যেঽবস্থিতাঃ
প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥
তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্
ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধং।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব
সব্যসাচিন্॥

"কাল আমি, বিশ্বের ধ্বংস-সাধন আমার কার্য্য। এই যে পূর্ণ শক্তিতে আমি প্রকাশিত হইয়াছি, যাবতীয় লোক কবলিত করিয়া চলিয়াছি। তোমার সহায় ব্যতিরেকেও, যত দেখিতেছ যোদ্ধারা দলবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সম্মুখীন তাহাদের কেহই থাকিবে না। তবে উঠিয়া দাঁড়াও, যশ অধিকার কর, শত্রুকে জয় কর, সমৃদ্ধ রাজ্য উপভোগ কর। ইহাদের সকলকে আমি পূর্ব্ব হইতেই নিহত করিয়াছি—হে সব্যসাচী, তুমি শুধু হও নিমিত্ত।"

কালের মন্থর গতিধারারূপে শ্রীকৃষ্ণ এখানে প্রকটিত হন নাই; বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া যে কাজ নিভৃতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে তাহাকে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে শেষ করিয়া ধরে যে কালপুরুষ সেই মূর্ত্তি লইয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের দারুণ বিপর্য্যয় ঘটাইবার জন্যই সমস্ত অতীত একমুখী হইয়া চলিয়াছিল। মানুষে তাহা জানিতে পারে নাই; সেই বিপদ নিবারণ করিবার জন্য যাহারা হয়ত সব কিছু করিতে প্রস্তুত ছিল, তাহারাও তাহাদের উদ্যোগের ভিতর দিয়া, এমন কি তাহাদের নিশ্চেষ্টতার ভিতর দিয়াই অনিবার্য্যকে ডাকিয়া আনিয়াছে। ভবিতব্যকে যাহারা অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইয়াছিল, তাহারা বৃথাই কালচক্রের গতিকে থামাইয়া রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর কর্ত্তব্যবোধে ফলাকাঙ্খাশূন্য হইয়া সেই নিষ্ফল চেষ্টায় হস্তিনাপুরে দৌত্যকার্য্য করিতে গিয়াছিলেন। ঘটনার পরে তবে সকলের চক্ষু ফুটিয়াছিল, তাহারা দেখিল, নদনদী যেমন সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া চলে, পতঙ্গ যেমন বহ্নিশিখার দিকে উড়িয়া চলে, সেই রকম তখনকার যুগের সেই গরিমাময় শক্তিমান দাম্ভিক ভারতখণ্ড, তাহার রাজন্যবর্গ, রথরথী, সৈন্য সামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র সমস্ত লইয়া কালপুরুষের ব্যাদিত আস্যে কবলিত করাল দ্রংষ্ট্রায় চর্ব্বিত হইবার জন্যই ধাইয়া চলিয়াছে। ভগবানের লীলায় একটা ধারা যেমন সুন্দর মধুর, আর একটা ধারা আবার তেমনি ক্রূর ভীষণ। বৃন্দাবনের রাসলাস্যকে সম্পূর্ণ করিয়া ধরিয়াছে কুরুক্ষেত্রের প্রলয় তাণ্ডব। উভয়ে মিলিয়া তবে সৃষ্টির ধারায় সে বৃহৎ সে মহান সমন্বয় সাধন করিয়া চলিয়াছে। জগতের ক্রমোন্নতি অর্থই দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া ঐক্যে পৌঁছান, দ্বেষ ও হিংসার ভিতর দিয়া প্রীতি ও মিলনে পৌঁছান—ক্রমোন্নতির পূর্ণ সার্থকতা আসিবে তখন যখন পাপ দুঃখ দৈন্য রূপান্তরিত হইয়া উঠিবে, তাহাদের পরিবর্ত্তে আসিবে কল্যাণ, আনন্দ, সৌন্দর্য্য—"শিবং শান্তং শুদ্ধং আনন্দং"।

কালপুরুষের উদ্দেশ্যে কে বাধা দিবে? সেই যুগের ভারতবর্ষে শক্তিমান পুরুষ শত শত ছিল—

মহা দার্শনিক ও যোগী, সূক্ষ্মবুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞ, মানুষের নেতা, চিন্তার কর্ম্মের বীর ছিল অগণিত; একটা বিরাট শিক্ষা ও দীক্ষা তাহার পূর্ণ প্রতিভা লইয়া বিকশিত; তখনকার মানুষ যেন এক একজন দিক্‌পাল। দেখিয়া মনে হয়, ইহাদের কয়েক জনা যদি এদিকে না চলিয়া একটু ওদিকে ঘুরিয়া চলিত তবে আর কুরুক্ষেত্রের প্রলয়কাণ্ড কিছুই ঘটিত না। অর্জ্জুন ঠিক এই কথা ভাবিয়াই তাঁহার ধনুঃশর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। পাণ্ডবদের তিনিই একমাত্র ভরসা, তাঁহাকে বাদ দিয়া জয়লাভ একটা স্বপ্ন, যুদ্ধ করাও বাতুলতা মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য্য! কালপুরুষ বাছিয়া বাছিয়া তাঁহারই কাছে জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিল, অতি বড় বলীয়ান যে তাহারও কোন ক্ষমতা নাই, বিধির বিধান নিষ্পন্ন হইবেই হইবে। "তুমি যদি সরিয়াই দাঁড়াও, তবুও এই যত দেখিতেছ যোদ্ধারা ব্যূহবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সম্মুখীন তাহাদের একজনও রক্ষা পাইবে না।" কারণ, এই সব মানুষ কেবল শরীরেই বাঁচিয়া আছে; কিন্তু পিছনে যে শক্তি বর্ত্তমান, যাহাই সার্থকতা চাহিতেছে তাহার কাছে ইহারা সকলেই মৃত। ভগবান যাহাকে রক্ষা করিতেছেন, কে তাহাকে মারিতে পারে? ভগবানই যাহাকে মারিয়া রাখিয়াছেন, তাহাকে রক্ষা করিবে বা কে? যে মানুষ হত্যা করে সে নিমিত্তমাত্র, যন্ত্রমাত্র—তাহাকে অবলম্বন করিয়া যবনিকার অন্তরালে যে ঘটনা নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে তাহাই আবার যবনিকার এই দিকে নিষ্পন্ন ঘটনা হইয়া দেখা দেয়। কুরুক্ষেত্রের বিরাট ধ্বংসকাণ্ডে যে সত্য পাই, তাহা এই জগতের যে কিছু কাজ, বিশ্বলীলার অন্তর্গত সমস্ত সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

বীর যাহারা তাহাদের জন্যই এই বীরভাবের সাধনা। বিপুল কিছু পরিবর্ত্তন ঘটাইবার জন্যই যাহাদের পৃথিবীতে আবির্ভাব, তাহারা কালপুরুষের শক্তিতে শক্তিমান। কালী তাহাদের অধিকার করিয়াছেন; যে মানুষকে কালী অধিকার করিয়াছেন সে সম্ভব বা অসম্ভব, যুক্তি বা তর্কের কোন তোয়াক্কা রাখে না। কালী হইতেছেন প্রকৃতির শক্তি, যে শক্তি শিশুর হস্তে বন্দুকের মত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে তাহাদের আপন আপন কক্ষে ঘুরাইয়া লইয়া চলিয়াছে; সে শক্তির কাছে অসম্ভব কিছু নাই। তাহা "অঘটন-ঘটন-পটীয়সী"—অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পরম দক্ষ; তাহা "দেবাত্ম-শক্তি স্বগুণৈ র্নিগূঢ়"—আপন কর্ম্মধারার বিভিন্ন ভাবের মধ্যে লুকাইয়া আছে ভগবানেরই যে শক্তি। আপন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সে শক্তির এক সময় ছাড়া আর কিছুই প্রয়োজন হয় না। কালীর গতি কালের মধ্য দিয়া—সে গতি আপনা হইতেই আপন সার্থকতার দিকে চলিতেছে, নিজের উপায় সৃষ্টি করিতেছে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে। একজন মানুষকে ভর করিয়া তিনি কাজ করিয়া চলিয়াছেন, আর এক জনকে তিনি ভর করেন নাই—ইহা শুধু অকারণ খেয়াল মাত্র নহে। উপযুক্ত আধার বোধেই বিশেষ ব্যক্তিকে তিনি বরণ করিয়াছেন; আর একবার যাহাকে তিনি বরণ করিয়াছেন তাহাকে তিনি ছাড়িয়া যান না বা ছাড়িতেও দেন

না—যতক্ষণ তাঁহার উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ না হইতেছে।

তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

যদহংকারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি॥

—"অহংকারের আশ্রয় লইয়া তুমি যে ভাবিতেছ 'আমি যুদ্ধ করিব না', মিথ্যা তোমার এই সঙ্কল্প; প্রকৃতি তোমাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেই করিবে।" যখন দেখা যায় কর্ম্মী তাহার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার অর্থ সে কর্ম্মীর কাজ শেষ হইয়াছে, কালী তাহাকে ছাড়িয়া আর এক জনার কাছে চলিয়াছেন। কোন বৃহৎ কর্ম্ম করিয়াছে এমন মানুষ যদি শেষে ধ্বংস পায়, তবে বুঝিতে হইবে তাহার কারণ অহংকার—অহংকারের বশবর্ত্তী হইয়া ভিতরকার শক্তির অপব্যবহার করিয়াছিল বলিয়া শক্তি তাহাকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। মহাবীর নেপোলিয়ানকেও শক্তি এই ভাবে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল, চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। কোন যন্ত্রকে যত্নে বাঁচাইয়া রাখা হয়, কোন যন্ত্রকে আবার টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়—কিন্তু সকলেই যন্ত্রমাত্র। মহাপুরুষের মহত্ব এইখানে—নিজেদের সামর্থ্য দিয়া যে তাহারা বিরাট ঘটনাবলী কিছু নিয়ন্ত্রিত করে, এমন নয়; কিন্তু বিরাট ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত করে যে মহাশক্তি তাহারই ব্যবহারে আসিবে বলিয়া তাহার নিজের হাতের গড়া যন্ত্র তাহারা। মিরাবো ফরাসী বিপ্লবকে সৃষ্টি করিতে যতখানি সাহায্য করিয়াছিলেন, এমন আর কেহ করে নাই। কিন্তু তিনি যখন বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন, রাজতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক হইয়া বিপ্লবের চক্র পিছনে টানিয়া ধরিতে চেষ্টা করিলেন, তখন ফরাসী দেশের বীরশ্রেষ্ঠের এই কার্পণ্যের জন্য ফরাসী বিপ্লব কি থামিয়া রহিল? কালীর পদভার মিরাবোর উপর পড়িল—মিরাবো অপসৃত হইলেন। বিপ্লব কিন্তু তেমনি অগ্রসর হইয়া চলিল—কারণ সে বিপ্লব কালপুরুষের প্রকাশ, স্বয়ং ভগবানের ইষণা।

সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে ইহাই হইতেছে। গোড়ায় একটু কিছু হাত আছে বলিয়া যাহারা গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিয়া মনে করে ঘটনাবলী তাহাদেরই সৃষ্টি, তাহারা কালের গহ্বরে তলাইয়া যায়, তাহাদের ছিন্ন-ভিন্ন খ্যাতিকে পদদলিত করিয়া দিয়া নূতন মানুষ অগ্রসর হইয়া চলে। অন্তর্নিহিত কালীর প্রেরণা যাহাদিগকে ছুটাইয়া লইয়াছে, যাহারা নিয়তির সহিত কোন প্রকার বখরাই করে না, একমাত্র তাহারা শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকে। ব্যষ্টির মহত্ত্ব হইতেছে ব্যষ্টির অন্তরস্থ মহাশক্তির মহত্ত্ব।

অনুবাদক—শ্রী নলিনীকান্ত গুপ্ত।

চিত্রবহা

—পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর—

শ্রী সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১১

পুকুরঘাটে

বেলা দুইটা। আকাশে চৈত্রের চিতা ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছে। উদাসী তপ্ত হাওয়া বহিতেছে। সরোবরের শানবাঁধানো ঘাটে বটের ছায়ায় ছিপহাতে জলের উপর ফাতনার দিকে চাহিয়া অমর বসিয়া ছিল। পরপারে নারিকেল-তরুশ্রেণী, তার পশ্চাতে আম্রকাননের ভিতর থেকে রহিয়া রহিয়া অব্যাহত নীরবতা ভেদ করিয়া একটা ক্লান্ত কোকিল কুহুধ্বনি করিতেছে।

স্বচ্ছ জলের ধারে অমরের শুভ্রসুন্দর সুঠাম দেহ নিপুণ ভাস্করখোদিত মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া আছে। তার সর্ব্বাঙ্গে তরুণ যৌবনের আভা উচ্ছলতা, অধরোষ্ঠ তাম্বূল-রাগে রঞ্জিত। ওষ্ঠের উপর নীলাভ ঈষৎ একটু গুম্ফরেখা, দীর্ঘায়ত স্বপ্নজড়িত আঁখি, মাথার কেশ ও ভ্রূযুগল অন্ধকারের মত কালো—পঞ্চশর যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সরোবরের জলে আপন ছায়া দেখিয়া আপনি মুগ্ধ হইয়া গেছে!

এমন সময় নীরদা ঘাটের উপরে আসিয়া দাঁড়াইল। বহুক্ষণ সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে অমরের পানে চাহিয়া রহিল। তারপর চারিদিক ভালো করিয়া দেখিয়া ধীরে ধীরে পা টিপিয়া নীচে নামিতে লাগিল।

মুখে একটু কৌতুকের হাসি, সোপানাবতরণের ছন্দে বসনের তলে তার পীন পয়োধর দুলিতেছে, গুরু নিতম্ব নাচিতেছে, তার সর্ব্বাঙ্গে হিল্লোল জাগিয়াছে সমীরণের স্পর্শনে সরসীর জলের মত।

অমরের ঠিক পশ্চাতে দাঁড়াইয়া একবার পিছন ফিরিয়া সে দেখিয়া লইল, তারপর দুইহাতে খপ্ করিয়া তার চোখদুটা চাপিয়া ধরিল। হাতের ছিপ ফেলিয়া দুইহাত পিছনে দিয়া নীরদার বাহুযুগল চাপিয়া ধরিয়া অমর কহিল, বলি?

নীরদা কথা কহিল না।

অমর বাড়ির শিশুদের নাম একে একে বলিতে লাগিল। কে যে চোখ টিপিয়াছে বিলক্ষণ বুঝিলেও এই সুখস্পর্শ হইতে সহসা বঞ্চিত হইবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, তাই সে মিথ্যা কহিয়া স্পর্শনের মদিরা প্রাণ ভরিয়া পান করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে নীরদা হাত তুলিয়া লইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু অমর তার হাত ছাড়িল না। সে তখন চাপা গলায় বলিল, ছেড়ে দাও লক্ষ্মীটি, এখনি কেউ এসে পড়বে!

অমর মুখে বলিল, আসুক গে! কিন্তু সে হাত ছাড়িয়া দিল।

নীরদা অমরের পানে একটা বাঁকা দৃষ্টি হানিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কত মাছ ধরলে?

অমর বলিল, খুব একটা বড় মাছ ধরেছি।

নীরদা বলিল, কৈ দেখি।

তার নিটোল কপোলে তর্জ্জনী দিয়া মৃদু আঘাত করিয়া অমর বলিল, এই যে!

নীরদা বলিল, থাক আর রঙ্গ করতে হবে না!

অমর ছিপগাছা হাতে তুলিয়া লইল। নীরদা তার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া তার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া

ঘাটের উপরপানে চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সুখাবেশে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া বসিয়া কিছুকাল কাটিলে অমর মুখ না তুলিয়াই বলিল, ভালো লাগে না কিছু!

নীরদা বলিল, কেন? এত দুঃখ্যু কিসের?

অভিমানের সুরে অমর বলিল, জান না যেন! বলিয়া মুখ তুলিয়া নীরদার পানে চাহিল।

নীরদা কথা কহিল না। মৌনমুখে আঙুল দিয়া অমরের চুল লইয়া খেলা করিতে লাগিল।

হঠাৎ সে ফিসফিস করিয়া বলিল, চল্লুম, কে আসছে! রাগ কোরো না।

বলিয়া তড়তড় করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

অমর ফাতনার পানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল।

ক্ষণকাল পরে ঘাটের জলে নাড়া লাগিল। অমর চোখ ফিরাইয়া দেখিল তার মা গামছা ঘটি ও গোটাকত বাটি গেলাস লইয়া জলে নামিবার উদ্‌যোগ করিতেছে। অমরকে দেখিয়া বলিল, এই কাটফাটা রোদ্দুরে বসে' বসে' মাছ ধরা কেন বাপু? এ তোর কি বাই হল? দুপুর বেলা ত একটু ঘুমুলে হয়!

অমর বলিল, তুমিও ত তাই করতে পারো! কর না কেন?

কাত্যায়নী বলিল, ওমা! ছাখো একবার! আমি ত এই মাত্তর উঠে আসচি!

অমর ছিপ গুটাইয়া লইয়া পুকুরের পাড় ধরিয়া ভিন্ন পথ দিয়া ধীরে ধীরে সদরবাড়ির দিকে চলিয়া গেল।

১২

স্বপ্ন নয়

মাছ ধরিতে বসিয়া অমর নীরদাকে ইঙ্গিতে তার মনের কামনা জানাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। নীরদা মুখে হাঁ না কিছুই না বলিলেও অমরের মনে হইয়াছিল, সে যেন তার চাহনি দিয়া বলিয়াছিল, আচ্ছা। তাই সেদিন অমর অধীর আগ্রহে রজনী-সমাগমের প্রতীক্ষায় রহিল।

সন্ধ্যা হইয়াছে। সকলে উপরে গিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিবার এখনো অনেক দেরী। অমরের কিন্তু তর সয় না। তার কেবলই মনে হইতে লাগিল রাত্রের আহারাদি শেষ হইতে সেদিন যেন অনাবশ্যক বিলম্ব হইতেছে। যতই এই কথা ভাবে ততই তার বাড়িসুদ্ধ লোকের উপর বিরক্তি বাড়িয়া যায়। ঘন ঘন উঠিয়া সে ঘড়ি দেখিতে লাগিল, সময় যেন আর কাটে না! ইচ্ছা হইতেছিল, ছুটিয়া গিয়া ঘড়ির কাঁটা ঘুরাইয়া দিয়া সকলকে বলে, নাও, সময় হইয়াছে, এইবার উপরে যাও!

অনেক কষ্টে দীর্ঘকাল অপেক্ষার পর যখন সকলে উপরে গেল তখন রাত এগারোটা। অমর আলো নিবাইয়া শুইয়া পড়িল। ঘুম আর আসে না, মাথাটা যেন গরম হইয়া গেছে। বিছানায় শুইয়া শুইয়া কেবলি সেদিন-কার কথা মনে পড়িতে লাগিল। নীরদার দেহের ভঙ্গী চলার ছন্দ যেন তার চোখের সুমুখে ভাসিতেছে!

কতক্ষণে নীরদা আসিবে কে জানে! সে যে আসিবে সে বিষয়ে অমরের সন্দেহ নাই। সে উৎসুক হইয়া অন্ধকারে নীরদার পা টিপিয়া আসার শব্দ, তার আঁচলের খসখস শব্দের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। খুট করিয়া কোথাও শব্দ হয়, অমরের বুক দুরুদুরু করিয়া উঠে; মনে হয় এই বুঝি আসিতেছে। এখনি তার সুখস্পর্শ অনুভব করিবে। কিন্তু নীরদা আসে না। এমনি করিয়া রাত বাড়িতে লাগিল, নিষুপ্ত বাড়িতে স্তব্ধতা গভীর হইয়া উঠিল।

অমরের মনে একটু সন্দেহ জাগিল, তবে কি নীরদা আসিবে না? তবে সে চোখের ইঙ্গিতে আসিবে বলিল কেন?

নীরদার উপর তার রাগ হইতে লাগিল, অভিমান হইতে লাগিল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল আজ যদি নীরদা না আসে, তবে তার সঙ্গে আর কোনো সম্বন্ধ

রাখিবে না। নিষ্ঠুর! আশা দিয়া এমন করিয়া নিরাশ করা!

কিন্তু ও কি? ওই ত তার আঁচলের খসখস শব্দ পাওয়া যাইতেছে! এইবার নীরদা আসিতেছে নিশ্চয়! নীরদার উপর সে অনর্থক রাগ করিতেছিল! তার আসা কি সহজ? সকলে ঘুমাইলে তবে ত সে আসিতে পারে? তারপর, আসিবার সময় যদি কেহ দেখিতে পায়, তাহা হইলে কি আর নীরদার এ বাড়িতে স্থান হইবে? অমর ভাবিল, সে বড় স্বার্থপর! নিজের সুখের আশায় সে নীরদার সুবিধা অসুবিধার কথা মোটেই ভাবিতেছে না! তার দুঃখ হইল। না, সে নীরদার উপর রাগ করিবে না! এই ত সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসার শব্দ হইতেছে, অতি মৃদু, অতি মৃদু পদক্ষেপ, এবার আর সন্দেহ নাই যে সে আসিতেছে! অমর কম্পিত বুকে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ কাটিল, কিন্তু কেহই আসিল না। দালানের বড় ঘড়িটা টকটক টকটক করিয়া বিকট শব্দে রাত্রির বুকে হাতুড়ি ঠুকিয়া তার আয়ু শেষ করিতেছে, সময় পাখা মেলিয়া পালাইতেছে, অথচ নীরদার দেখা নাই!

অমর উঠিয়া পড়িল, শয্যা তার কাছে বিষ হইয়া উঠিয়াছে। ঘরের বাহির হইয়া দালান দিয়া গিয়া উপরের সিঁড়ির পানে চাহিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। সিঁড়ির দরজা বন্ধ। তার ইচ্ছা হইতে লাগিল লাথি মারিয়া রুদ্ধ দ্বার ভাঙিয়া উপরে উঠিয়া নীরদাকে তুলিয়া লইয়া আসে।

সহসা ঘড়িটা বাজিয়া উঠিল। এক দুই করিয়া অমর মনে মনে গুণিল চারিটা। বিরলতারকা আকাশের পানে চাহিয়া দেখিল স্বচ্ছ অন্ধকারের মাঝ দিয়া ঊষার অঞ্চলের ক্ষীণ আভাস পাওয়া যাইতেছে। জাগরণজনিত ক্লান্তি ও আশাভঙ্গের নিরাশা লইয়া সে আসিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছিল।

সকালে তার ঘুম ভাঙিতে অনেকটা বেলা হইয়া গেল। প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠিয়া সে বেড়াইতে যায়, সেদিন তার ব্যতিক্রম দেখিয়া কাত্যায়নী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আজ এত বেলা হল উঠতে, অসুখ করেনি ত?

অমর সংক্ষেপে উত্তর দিল, না।

কিন্তু তার অসুখ সত্যই করিয়াছিল, দেহে মনে তার স্বস্তি ছিল না। রাগে দুঃখে অভিমানে সে নীরদার পানে ফিরিয়াও চাহিল না। প্রতিদিনের মত নীরদা ক্ষিপ্রপদে গৃহকর্ম করিয়া ফিরিতে লাগিল। অমরের দ্বারের সুমুখ দিয়া কতবার যাতায়াত করিল, কিন্তু অমর একবারও তার পানে নেত্রপাত করিল না। কোলের উপর একখানা বই খুলিয়া নিরতিশয় মনোযোগের সহিত সে পড়িতে লাগিল। দু' একবার তার যেন মনে হইল নীরদা গতি সংযত করিয়া তার পানে করুণনয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছে। ঈপ্সিতার পানে তাকাইবার জন্য চিত্ত লোভাতুর হইয়া উঠিলেও সে প্রাণপণ বলে আপনাকে সম্বরণ করিয়া আনতনয়নে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। তার মনে হইতেছিল, নীরদা যেমন গতরাত্রে তাহাকে আশায় আশায় রাখিয়া নিরাশ করিয়াছে, সেও তেমনি নীরদাকে বুঝাইয়া দিবে, তাহাকে না হইলেও তার চলে, সে কারও কৃপার ভিখারী নয়। কিন্তু তার এবম্বিধ প্রতিজ্ঞা সত্বেও তার দুরন্ত অন্তর ক্ষণে ক্ষণে বিদ্রোহী হইবার উপক্রম করিতে লাগিল। তার রক্তের নবজাগ্রত ক্ষুধা কিছুতেই তাহাকে স্বস্তি দিল না, তার চিত্ত অধীর উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। এ ভাবে বসিয়া থাকিলে পাছে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা সম্ভব না হয়, সেই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি বই ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল।

দুই দিন দুই রাত্ত দারুণ ক্লেশে কাটিল। অধিকাংশ সময় অমর বাড়ির বাহিরে থাকে। ছিপগাছা ঘরের কোণে পড়িয়া পড়িয়া ধূলায় ধূসর হইতে লাগিল, পুকুরের টোপলুব্ধ মাছগুলার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অমর ভুলিয়া গেল। বাড়ির কেহ তার সঙ্গে কথা বলিতে আসিলে সে বিরক্ত হইয়া উঠে, আহারে তার রুচি হয় না, রজনী বিনিদ্র কাটিয়া যায়।

বর্ষাশেষের রাত্রি। অসহ্য গুমট পড়িয়াছে। আহারের পর অমর জানালার নিকট দাঁড়াইয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিল। আকাশে চন্দ্রতারকার জ্যোতি অবলুপ্ত, মসী-বরণ অন্ধকার আকাশ ও ধরণীর মাঝে নিস্পন্দ হইয়া আছে। কোথাও একটু পাতা নড়ার শব্দ পর্য্যন্ত শুনা যায় না।

এই স্তব্ধতা ও অন্ধকার অমরের চিত্তকে অধিকার করিয়া বসিল। তার মনে হইল, বসুন্ধরা যেন কার আগমন-প্রতীক্ষায় উৎসুক হইয়া রহিয়াছে! যেন তার পদধ্বনি এখনি শুনা যাইবে! সহসা বিদ্যুতের ক্ষণিক আলোকে সে দেখিল বেণুশাখা দুলিতে সুরু করিয়াছে, আম্রপল্লব থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। মৃদু মর্ম্মরধ্বনি তার কানে পৌঁছিল—নারিকেলের শাখায় দোলা লাগিল। তার-পর একটা ধাবমান শব্দ—দূরাগত ট্রেণের শব্দের মত। সেই শব্দ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া শেষে হুহুঙ্কারে আসিয়া পৌঁছিল। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা অমরের চোখে মুখে আসিয়া আঘাত করিল, কিলবিল করিয়া কতকগুলা আগুনের সাপ মহাশূন্যে অন্ধকার ভেদিয়া ছুটিয়া গেল, তার-পর তাহাকে সচকিত করিয়া একটা বজ্রনির্ঘোষ বিরাট বিপুল আর্ত্তনাদের মত ধ্বনিয়া উঠিল। মুষলধারে বৃষ্টি নামিল, বাতাস শ্বসিতে লাগিল, গাছের শাখাপ্রশাখাগুলা ব্যগ্র ব্যাকুলতায় পরস্পরের গায়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া রঙ্গে মাতিয়া উঠিল। অমর জানালা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। তারপর কালবৈশাখীর কলরোলের মধ্যে কখন যে গভীর ঘুমে অচেতন হইল কিছুই বুঝিল না।

যে-কামনা অন্তরের গভীর গোপনে থাকিয়া মানুষের জাগরণের মুহূর্ত্তগুলি বেদনার বিষে ভরিয়া তুলে, দিবা-লোকে যে আশা দুরাশা বলিয়া মনে হয়, নিশীথ রাত্রে ঘুমের আড়ালে তারাই স্বপ্নসেতু বাহিয়া সম্ভবের কূলে আসিয়া পৌঁছে। মগ্নচৈতন্যের মায়ালোকে কখনো কখনো ক্ষণিকের জন্য আমাদের হৃদয়ের সাধ মিটিয়া যায়।

কয়েকদিন হইতে নীরদাকে পাওয়ার আশা অমরের মনে ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। সেই হতাশার পীড়নে তার জাগ্রত মুহূর্ত্তগুলি নিরানন্দ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আশা যতই ক্ষীণ হইতেছিল, নীরদাকে পাইবার কামনা তার মনে ততই বাড়িয়া চলিয়াছিল।

অমর স্বপ্ন দেখিতে লাগিল—নীরদা তাহার পাশে আসিয়া বসিয়াছে! অমর তার হাত ধরিয়া তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইল, কিন্তু সে আপত্তি করিল না! অমর তাহাকে চুম্বন করিবার জন্য তার মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল! আবেগে তার সারা দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, ঘুমের মধ্যেই তার মনে হইল, না, এত সুখ সম্ভব নয়, সে নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখিতেছে! অথচ তার হাতের মধ্যে নীরদার কোমল হাতের স্পর্শ এত স্পষ্ট যে তাহা মিথ্যা হইতেই পারে না!

অমরের ঘুম ভাঙিয়া গেল। তার মনে হইল যেন কার উষ্ণ নিশ্বাস তার মুখের উপর ঘন ঘন পড়িতেছে! কিন্তু এ যে আশার অতীত! অমরের সন্দেহ হইল, এখনো সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে? পরক্ষণেই, বুকের উপর শীতল নিটোল কোমলতার স্পন্দন অনুভব করিয়া, সে-সন্দেহ নিমেষে টুটিয়া গেল। স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন নয়! অন্ধকারে অধীর আগ্রহে সে হাত বাড়াইয়া দিল সেই নগ্ন নশ্বর তনুলতার উপর। অমনি ধীরে ধীরে দুখানি শঙ্খ-বলয়িত বাহু নিবিড় বেষ্টনে তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল।

এই ঘটনার পর নীরদার সঙ্গে বাক্যালাপ করা দূরের কথা, অমর তার চোখে চোখে তাকাইতে পর্য্যন্ত পারিত না। একটা নিদারুণ লজ্জা ও সংকোচের ভারে তার মন পীড়িত হইয়া উঠিল। সে বিধিমতে নীরদাকে এড়াইয়া চলিতে লাগিল, এমন কি শয়নকালে দ্বার রুদ্ধ করিয়া শুইত, পাছে নীরদা আবার আসে।

যথাসময়ে কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য অমর কলিকাতা যাত্রা করিল। চন্দ্রবাবু তখনো বিদেশে, কলিকাতায় বাড়ি ভাড়া করা হয় নাই, অগত্যা অমর কলেজ-হোষ্টেলে গিয়া উঠিল। সেখানে নিত্য নূতন বন্ধুর সাহচর্য্যে এবং শহরের জীবনের নানা উত্তেজনার মধ্যে নীরদার কথা আর মনে রহিল না।

মাসদুই পরে কি একটা ছুটি উপলক্ষে বাড়ি গিয়া অমর নীরদাকে দেখিতে পাইল না। শুনিল, সে শ্বশুরবাড়ি গেছে। যে গ্রামে তার শ্বশুরবাড়ি, সেখানে এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইয়াছে। মাতব্বরেরা অনুমান করিতেছে, সে-ই নীরদার বিবাগী পতি—নহিলে এত জায়গা থাকিতে সেই গ্রামেই সে আস্তানা নিল কেন? নীরদার শাশুড়ী পুত্রকে চিনিতে না পারুন—কিন্তু পাঁচজনের কথারও ত একটা মূল্য আছে! তাই তিনি বধূকে স্বামী সনাক্ত করিবার জন্য আহ্বান করিলেন! নীরদার যাইবার তেমন আগ্রহ ছিল না, কিন্তু স্ত্রীলোকের পতিই পরম এবং চরম গতি ধার্য্য করিয়া কাত্যায়নী তার আপত্তি গ্রাহ্য করেন নাই।

১৩

স্বদেশীর ঝড়

১৯০৫ সাল। শহরের বাঙালী-পাড়া সরগরম। প্রতিদিন সন্ধ্যায় স্বদেশী সভা লাগিয়াই আছে। ধনীর প্রশস্ত গৃহপ্রাঙ্গণে, খোলা মাঠে বা বাগানের মধ্যে সভা বসে। হাজার হাজার লোক ঘণ্টার পর ঘণ্টা তীর্থের কাকের মত বসিয়া বসিয়া বক্তৃতা শুনিতে থাকে। তাহাদের ধৈর্য্যের সীমা পরিসীমা নাই। ছেলে বুড়ো সকলেরই ঐ এক নেশা—দেশাত্মবোধের প্রবল বন্যায় সকলেই ...কছে। চন্দ্রবাবুর ও অমরেরও সমান দশা।

সকালে ... গেল। প্রত্যহ বাক্স বেঞ্চি বা টেবিল, যাহোক একটা কিছুর উপর দাঁড়াইয়া বক্তারা তারস্বরে বক্তৃতা করেন। শ্রোতারা ঘাসের উপর কাতারে কাতারে চক্রাকারে বসিয়া তাহাই শুনে। উপলক্ষ যাই হোক, সভা বসিলেই ইংরেজের শ্রাদ্ধ হয়। যেমন—ইংরেজ ইঞ্জিনীয়ারিং কম্পানির কুলিরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে। তদুপলক্ষে আহূত সভায় বক্তা কুলিদের উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, মাঠের ঘাস খাও, গাছের পাতা খাও, তাও ভালো—ও গোলামখানায় আর ফিরিয়ো না! পায়ের জুতা ছিঁড়িয়া খাও, তাও ভালো, কিন্তু ওখানে আর নয়! অন্যত্র আর এক বক্তা বলিলেন, যদি বঙ্গের জারজ সন্তান না হও তাহলে বিলাতি কাপড় পরিত্যাগ করো!

কলিকাতার কোনো বিখ্যাত কলেজের ইংরেজ অধ্যাপক বাঙালী ছাত্রদের মেশ পরিদর্শন করিয়া তাদের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা করায় ছাত্রমহলে তার ঘোর প্রতিবাদ চলিতেছিল। স্বদেশী সভায় একদিন কয়েকজন বাঙালী যুবক ব্যারিষ্টার সাহেবী পোশাকের বদলে ধুতিচাদরে সাজিয়া বাংলা ভাষায় উক্ত অধ্যাপকের চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার করিয়া দিল। একজন বলিল, আমাদের দেশে আসিয়া হেঁজিপেজি ইংরেজেরও লাট-সাহেবী মেজাজ হইয়া যায়! তাহারা ভাবে তারা যা খুসি তাই বলিতে ও করিতে পারে! অথচ এই সব ইংরেজ ইংলণ্ডে যে কি অবস্থায় থাকে তাহা ত তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে!

সে-অবস্থাটা কি প্রকার অনেক শ্রোতা জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করায় বক্তা একটু হাসিয়া বলিলেন, বেশি আর কি বলবো, মেমসাহেবরা সেখানে আমাদের পাই-খানা সাফ করতো!

নির্ব্বাক স্তম্ভিত শ্রোতৃবর্গকে সম্বোধন করিয়া অপর এক বক্তা বলিতে লাগিল, বাঙালী ছেলেদের নৈতিক চরিত্রের সমালোচনা করার আগে ইংরেজদের নিজেদের ছাত্রদের চরিত্রের কথা ভাবা উচিত!

বক্তা একটি গল্প সুরু করিল—কোনো এক বিলাতী

য়ুনিভার্সিটি-টাউনে কোনো এক বোর্ডিংএ ঘরের মধ্যে এক যুবক ছাত্র এক যুবতীর সঙ্গে প্রেমচর্চ্চায় লিপ্ত ছিল। এমন সময় দ্বারে করাঘাত হইল। যুবক মেয়েটিকে তাড়াতাড়ি জানালার ধারে একটা দেরাজের আড়ালে ঠেলিয়া দিয়া সম্মুখের পর্দ্দাটা টানিয়া দিল। তারপর দ্বার খুলিল। আগন্তুক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলিলেন, আমি ছাত্রাবস্থায় এই বাড়িতে এই ঘরটিতে বাস করিয়াছিলাম। কার্য্যগতিকে বহুকাল পরে এখানে আসিয়াছি। আমার যৌবনের স্মৃতি-বিজড়িত ঘরটি আর একবার দেখিবার সাধ হইয়াছে। আপনার আপত্তি না থাকিলে ইত্যাদি।

কি আর করে, ভদ্রতার খাতিরে যুবক না বলিতে পারিল না। অথচ তার আশঙ্কারও অন্ত নাই, পাছে গুপ্তকথা প্রকাশ হইয়া পড়ে!

আগন্তুক ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘরটি দেখিতে লাগিলেন। যুবক তাঁর পাশে পাশে রহিল, তাঁহাকে সেই বিশেষ জানালাটির পাশে ঘেঁষিতে না দিবার অভিপ্রায়ে।

ভদ্রলোক চলিতে চলিতে দেয়ালের গায়ে কোনো বিশেষ ছবি দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়ান, ভাবাবেশে আপন মনে বলেন, Ah! the same old picture! কখনো বা হঠাৎ একটা টেবিলের পানে চাহিয়া বলেন, Ah! the same old table! এমনি করিয়া কত জিনিস কত দৃশ্য তাঁহাকে তাঁর অতীত যৌবনের মাঝে ফিরাইয়া লইয়া গেল।

ক্রমশ তিনি আনমনে সেই বিশেষ জানালাটির পানে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যুবক প্রমাদ গণিল, তার বুক দুরুদুরু করিয়া উঠিল।

ভদ্রলোক চলিতে চলিতে সহসা পর্দ্দায় হাত দিলেন। যুবক শশব্যস্তে তাঁহাকে বাধা দিতে গেল, কিন্তু পারিল না। তিনি পর্দ্দা সরাইয়া ফেলিলেন। তারপর অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন, মুখে আর বাক্য সরিল না। যুবক লজ্জায় সঙ্কোচে থতমত খাইয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, Oh! she...she is my cousin! আগন্তুক একবার যুবকের পানে একবার যুবতীর পানে তাকাইয়া হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, Ah! the same old cousin!

একদিন এক বক্তা বলিলেন, পথে ঘাটে দুর্ব্বল বাঙালীকে যারা অপমান করে, সেই সব ইংরেজ হল 'ব্যুলি'! 'ব্যুলি' ততক্ষণই অত্যাচার করে যতক্ষণ আমরা কাপুরুষের মত তা হজম করি! কিন্তু যদি কেউ ফিরে দাঁড়ায়, তাহলে সে 'ব্যুলি' কি করে?

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বক্তা একটু থামিলেন। তারপর শ্রোতৃবর্গের পানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তাহলে 'ব্যুলি' কি করে? তাহলে 'ব্যুলি' কি করে? ভিড়ের মাঝ থেকে একজন বলিয়া উঠিল,—ফেলে! বক্তা তখন পরমোল্লাসে বলিতে লাগিলেন, ঠিক বলেছো, ঠিক বলেছো! আমি ও-কথাটা লজ্জায় বলতে পারছিলুম না!

একদিন সভাভঙ্গের পর বাড়ি ফিরিবার পথে অমর দেখিল পথে জনতা হইয়াছে। নিকটে অগ্রসর হইয়া দেখিল ফুটপাতের উপর ভিড়ের মাঝে আগুন জ্বলিতেছে। শুনিল, এক ভদ্রলোক দোকানে বিলাতি কাপড় কিনিতে গিয়াছিলেন। কয়েকটি বাঙালী ছেলে দোকানের সুমুখে দাঁড়াইয়া 'পিকেটিং' করিতেছিল। তারা ভদ্রলোককে হাত জোড় করিয়া বিলাতি কাপড় কিনিতে মানা করিল। তিনি তা সত্ত্বেও বিলাতি কাপড় খরিদ করায় ছেলের তাঁর হাত হইতে কাপড় ছিনাইয়া লইয়া তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিয়াছে। লোকেরা ভিড় করিয়া মজা দেখিতেছে এবং উল্লসিত কণ্ঠে ঘনঘন বন্দে-মাতরম্ ধ্বনি করিতেছে। ব্যাপার শুনিয়া অমরের মনে হইল, যে সব দুরাত্মা অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও দেশদ্রোহিতা করে তাহাদের এরূপ শাস্তি দেওয়া অন্যায় নহে!

বাড়ি পৌঁছিয়া বসিবার ঘরে ঢুকিয়াই তক্তপোষের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অমর স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল

ছোট বড় মাঝারি এক বস্তা বিলাতি শাড়ি ও ধুতি মুখ ভ্যাংচাইয়া তাহাকে যেন বিদ্রূপ করিতেছে। ক্রোধে আগুন হইয়া সে কাত্যায়নীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। কাত্যায়নী তখন জামাতা বৈদ্যনাথের আহারের তদ্বির করিতেছিল। অমর বলিল, মা! এ সব কি?

কাত্যায়নী বলিল, কিসের কি? কি বলচিস?

অমর বলিল, আমাদের বাড়িতে বিলিতি কাপড় কিনলে কে?

কাত্যায়নী বলিল, খুকুর ছেলেমেয়েদের কাপড় ছিঁড়ে গেছলো। বদ্দিনাথকে দিয়ে তাদের জন্মে কাপড় আনিয়েচি।

অমর বলিল, কাপড় আনিয়েছ, বেশ করেছ। কিন্তু বিলিতি কাপড় কেন? তারপর বৈদ্যনাথের পানে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল, আজকের দিনে বিলিতি কাপড় কিনতে আপনার লজ্জা হল না?

বৈদ্যনাথের মুখের মধ্যে একটা মস্ত লেডিকেনি, সুতরাং সে চট করিয়া জবাব দিতে পারিল না। সেটাকে কথঞ্চিৎ আয়ত্ত করিয়া সে বলিল, চিরটা কাল যাদের খেয়ে পরে' মানুষ তাদের তৈরি কাপড় কিনতে লজ্জা কিসের?

অমর বলিল, আমরা ইংরেজের খাই না পরি?

বৈদ্যনাথ জিজ্ঞাসা করিল, তবে কার?

অমর বলিল, আমার নিজের! ইংরেজই বরং আমাদের খেয়ে পরে' মানুষ! দেশ আমাদের, ইংরেজ ত অনধিকারী!

বৈদ্যনাথ বলিল, অনধিকারী তো এখানে রয়েছে কেমন করে'?

অমর বলিল, রয়েছে, তার কারণ আপনার মত বাঙালী দলে ভারি!

বৈদ্যনাথ টপ করিয়া একটা মিহিদানা মুখে ফেলিয়া দিল। সেটি চিবাইতে চিবাইতে বলিল, তোমরা কি ভাবো তোমরা পাঁচজনে বিলিতি কাপড় না পরলেই ইংরেজ একেবারে মারা যাবে?

অমর বলিল, না, পাঁচজনে নয়। দেশের বেশির ভাগ লোক যদি বিলিতি কাপড় স্পর্শ না করে তাহলে ইংরেজ আমাদের পায়ের তলায় মাথা খুঁড়বে, বলবে, কি চাও বলো এখনি দিচ্ছি! অনাহারে মেরো না, দয়া করো!

বৈদ্যনাথ বলিল, কিন্তু দেশের লোক বেশি দাম দিয়ে স্বদেশী কাপড় কিনবে কেন?

অমর বলিল, দেশের মঙ্গলের জন্মে বাঙালী প্রতিজ্ঞা করেছে, তারা ক্ষতি স্বীকার করেও স্বদেশী জিনিস কিনবে —They will buy swadeshi goods even at a sacrifice! কেন, না তাহলে একদিন দেশে স্বদেশী জিনিস তৈরি হবে এবং তা বিলিতির চেয়ে সস্তাও পাওয়া যাবে। তবে গোড়ায় বেশি দাম দিয়ে কিনতে হবে বৈ কি!

বৈদ্যনাথ বলিল, তোমরা ত খুব বিদ্বান বুদ্ধিমান! শস্তা ভালো জিনিস ফেলে বেশি দাম দিয়ে রদ্দি মাল কেনা কোন্ রকম বুদ্ধি?

অমর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, আপনি মাংস খান?

বৈদ্যনাথ বলিল, খাব না কেন?

অমর বলিল, কিসের মাংস?

বৈদ্যনাথ প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল। অমর বলিল, বলুন না কিসের মাংস খান?

বৈদ্যনাথ বলিল, কিসের আবার? পাঁটার!

অমর বলিল, বেশ। তার দাম কত?

বৈদ্যনাথ বলিল, দশ বারো আনা সের।

অমর বলিল, চার আনায় এক সের গোমাংস পাওয়া যায়, তা ফেলে তার ডবল তিনগুণ দাম দিয়ে পাঁটার মাংস খাওয়া কি রকম বুদ্ধি?

বৈদ্যনাথ কথা কহিল না। কাত্যায়নী বলিল, ছি ছি অমর, তোর মুখে কি কোনো কথা বাধে না? ও-সব কি কথা? বদ্দিনাথ এতদিন পরে এল, তার সঙ্গে এমনি

করে' ঝগড়া করতে লাগলি ? ওর কি দোষ ? ওকে ত আমিই কাপড় আনতে বলেছিলুম !

অমর বলিল, বেশ, আমি এ বাড়িতে আর জলগ্রহণ করবো না ! যে-বাড়িতে বিলিতি কাপড় কেনা হবে সে বাড়ির সঙ্গে আমার কোনো সংশ্রব নেই !

কাত্যায়নী বলিল, দ্যাখো একবার কথা ! বিলিতি কাপড় কিনতে নেই তা কি একদিনও আমায় বলেচিস ? এই আজ শুনলুম, এর পর কিনলে তখন তার কথা ! দেশের লোকে যে প্রিতিজ্ঞে করেচে সে কথা ত বলতে হয় ! আমরা মেয়েমানুষ, আমরা অতশত কি বুঝি ?

অমর তখন কাত্যায়নীকে সবিস্তারে স্বদেশীর ব্যাপার বুঝাইতে বসিল। ইত্যবসরে চন্দ্রবাবু আসিয়া পৌছিলেন। কি ঘটিয়াছে অনুমান করিয়া অমরের উদ্দেশে বলিলেন, Don't ! You can never convince women ! It's an impossible task !

পত্নীর সাক্ষাতে তার সম্বন্ধে অপ্রিয় আলোচনা করিতে হইলে চন্দ্রবাবু ইংরেজি-ভাষার আশ্রয় লইতেন।

১৪

বিদায়-উপহার

হেমন্তের প্রভাত। ছাদের উপর করুণা বড়ি দিতেছিল এবং আসন্নপ্রসবা সুকুমারী ননদিনীর পাশে বসিয়া তাহাই দেখিতেছিল। সুকুমারী এখন অনেকগুলি সন্তানের জননী। বৈদ্যনাথের সন্তান-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অর্থ উপার্জ্জনের ইচ্ছা মন হইতে লোপ পাইতেছিল। সে শেষ পর্য্যন্ত বি-এ পাশ করিতে পারে নাই। চাকুরির উমেদারি করার চেয়ে চুপচাপ বাড়ি বসিয়া থাকা ঢের বেশি আরামদায়ক ইহা আবিষ্কার করিয়া বেশ নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটাইতেছিল। সে মাঝে মাঝে কলিকাতা ঘুরিয়া আসে, বাড়িতে ক্রিয়াকর্ম্ম উপস্থিত হইলে বাজারের ফর্দ্দ করে, ভোজের সময় কোমরে গামছা বাঁধিয়া পরিবেশন করে, কোনো কর্ম্মের সন্ধান আসিলে তাহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলে, অত কম মাইনেতে কি কাজ করা যায় ! একটা মান সম্ভ্রম আছে ত !

সেদিন প্রভাতে বড়ি দিবার সময় সুকুমারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র একখানা চিঠি হাতে করিয়া আসিয়া কহিল, দেখ ত মা ! দাদ'বাবুর হাতের লেখা মনে হচ্ছে !

সুকুমারী চিঠি খুলিয়া পড়িতে পড়িতে বলিল, হাঁ, বাবারই চিঠি। চিঠি পড়া শেষ হইলে সে বলিল, বাবা লিখেছেন এই মাসের শেষে দাদা জাপানে পড়তে যাবে ! জাহাজে এক মাসের পথ !

করুণা বলিল, তোমার বাবা অতদূরে ছেলেকে কেমন করে' পাঠাবেন ?

সুকুমারী বলিল, তা দিদি, বেটাছেলের ঘরের কোণে বসে' থাকলে তো চলে না ! লেখাপড়া শিখে যাতে মানুষ হয় বাবা সেই চেষ্টাই করছেন ! বাবা লিখেছেন অমর এখানে এসে দিনকত থাকবে !

করুণা বলিল, অমরকে সেই ছেলেবেলা তোমার বিয়ের পর একবার দেখেছিলুম। এখন কত বড় হয়েছে, কত লেখাপড়া শিখেছে, একবার দেখতে ইচ্ছে হয় !

সুকুমারী যখন স্থায়ীভাবে শ্বশুর-ঘর করিতে আসিয়াছিল সে আজ অনেকদিনের কথা। একদিন দ্বিপ্রহরে বাক্স গুছাইবার সময় করুণা তার পাশে বসিয়াছিল। বাক্সের মধ্যে কয়েকখানি বই দেখিয়া করুণা নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতে লাগিল।

সুকুমারী জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা দিদি ! তুমি কি মোটেই পড়তে পার না ?

ছোট ননদ হইলেও বয়সে বড় বলিয়া করুণাকে সুকুমারী দিদি বলিয়া ডাকে।

করুণা বলিল, না। ক্ষণেক থামিয়া বলিল, আচ্ছা, লেখাপড়া শেখা কি ভারি শক্ত ?

সুকুমারী বলিল, শিখলে এমন কিছু শক্ত নয়।

বইগুলা দেখাইয়া করুণা জিজ্ঞাসা করিল, এসব কি বই ?

সুকুমারী বলিল, এখানা স্বর্ণলতা উপন্যাস। ও-দুখানা রৈবতক আর কুরুক্ষেত্র কাব্য—মহাভারতের গল্প। এখানার নাম কাব্য-কুসুমাঞ্জলি—কবিতার বই। একজন বাঙালী মেয়ের লেখা।

করুণা কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, বাঙালীর মেয়ে বই লিখেচে ? সত্যি ?

সুকুমারী বলিল, হ্যাঁ, কেন পারবে না ? লেখাপড়া ভালো করে' শিখলেই পারে !

এতকাল করুণা জানিত লেখাপড়া করা পুরুষের কাজ, বই পুরুষেই লেখে, মেয়েমানুষ বড় জোর বাংলায় একখানা চিঠি লিখিতে পারে। আজ চোখের সম্মুখে বাঙালী মেয়ের লেখা ছাপার হরফের বই দেখিয়া সে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল।

ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ সে বলিল, আচ্ছা ভাই ! তুমি আমাকে পড়তে শেখাবে ?

সুকুমারী বলিল, বেশ ত ! আমি যেটুকু জানি তোমাকে শেখাব।

এমনি করিয়া দুজনে বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়। তারপর অমরকে লিখিয়া সুকুমারী বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ হইতে সুরু করিয়া অনেক বই-ই আনাইয়াছে। দ্বিপ্রহরের অবসরে ননদিনী ও ভ্রাতৃজায়ার পাঠ ও আলোচনা চলিত। আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল অমর।

আস্তে আস্তে করুণা বইয়ের পর বই শেষ করিতে লাগিল। আজকাল সে অনেক কিছু জানে। স্বদেশী আন্দোলন সুরু হইবার পর অমর নিয়মিত বাংলার নব যুগের কাগজ পাঠাইত, মধ্যে মধ্যে বিস্তারিত চিঠিতে তার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপনার কথা লিখিত। দেশ-মাতৃকার যে-মূর্ত্তি মানস-নয়নে দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছিল, সেই মাতৃমূর্ত্তি শৈশবের সঙ্গিনী প্রিয় ভগ্নী সুকুমারীকে দেখাইবার চেষ্টা করিত। সে সকল পত্রই সুকুমারী সগৌরবে করুণাকে পড়িয়া শুনাইত। শুনিয়া করুণার মনের আঁধার জ্ঞানালোকের স্পর্শে ধীরে ধীরে অপসৃত হইতে লাগিল। দূরবর্ত্তী অমর ও নিত্যসঙ্গিনী ননদিনী ও ভ্রাতৃজায়া এই তিন প্রাণীর মধ্যে একটি নিবিড় মানসিক অন্তরঙ্গতা দিনে দিনে গড়িয়া উঠিতে লাগিল।

স্বদেশীর উৎসাহে চন্দ্রবাবু যখন পুত্রকে শিল্পশিক্ষার জন্য জাপানে পাঠানো স্থির করিলেন তখন তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা এবম্প্রকার নির্বুদ্ধিতার জন্য তাঁহাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। তাহারা বলিল, চন্দ্রবাবুর মাথা খারাপ হইয়াছে। ব্যারিষ্টার নয়, ডাক্তার নয়—শিল্পশিক্ষার জন্য ছেলেকে বিদেশে পাঠানো—এমন মূঢ়তার কথা কেহ কখনো শুনিয়াছে কি ? তবুও বিলাত হইলে কথা ছিল না, কিন্তু জাপান ? বিলাত ছাড়া আর কোথাও যে কিছু শিখিবার থাকিতে পারে, তা অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালী কল্পনাই করিতে পারিত না।

চন্দ্রবাবু পুত্রের মত জানিতে চাহিলেন। অমর বলিল, জাপান ছাড়া কোথাও নয় ! জাপানের প্রতি তার মনে গভীর শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। জাপানের পদতলে বসিয়াই বাঙালীর শিক্ষা পাওয়া উচিত—যে-জাপান শক্তিমত্ত পশ্চিমের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া এশিয়ার মুখরক্ষা করিয়াছে ! যে-জাপান রুশিআকে স্থলেজলে পরাজিত করিল, তার বিদ্যা বুদ্ধি ও শৌর্য্যের কি সীমা আছে ? গুরুর আসন দিতে হয় তাহাকেই দিব !

হালশিকাঠিতে অমর আসিবে শুনিয়া অবধি তাহাকে দেখিবার জন্য করুণার আগ্রহের সীমা ছিল না। এই মানুষটির সম্বন্ধে সুকুমারী ও করুণার মধ্যে নিয়তই এত আলোচনা হইত যে করুণার মাঝে মাঝে মনে হইত তাহাকে যেন সুমুখে দেখিতে পাইতেছে। স্বদেশ

আন্দোলন শুরু হইবার পর হইতে এই আলোচনা বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

অনেক দিন আগেকার কথা করুণার মনে পড়িত। অমর তখন বালক মাত্র। সেই বালক আজ যুবক হইয়াছে, কত বিদ্যাবুদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছে, দেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে। করুণার লজ্জা করিতে লাগিল, অমর আসিলে সে তাহার সহিত কি কথা কহিবে? সে যে বড় অজ্ঞ, অমর তাহাকে দেখিয়া কি ভাবিবে? নিজের উপর এবং সকলের উপর তার রাগ হইতে লাগিল, কেন সে মূঢ়তার অন্ধকারে এতদিন বাস করিতেছিল?

করুণার আশঙ্কা যে অমূলক তাহা অমর পৌঁছিবার পরই সে টের পাইল। তার সঙ্গে ক্ষণকাল বাক্যালাপ করিয়াই করুণার মন হইতে সমস্ত সঙ্কোচ দূর হইয়া গেল। এই পরম প্রিয়দর্শন যুবক তার প্রাণের প্রাচুর্য্য, বুদ্ধির প্রখরতা এবং অসাধারণ বাকপটুত্ব লইয়া করুণাকে মোহিত মুগ্ধ করিল। অমরের সজীব কথাগুলি এমনি নিঃসংশয়ে মুখ দিয়া বার হয় যে তাহা মানিয়া না লইয়া উপায় নাই। মনকে তা যেন চুম্বকের মত আকর্ষণ করে। বাড়িতে নরনারী অনেককে করুণা কথা কহিতে শুনিয়াছে, কিন্তু সে-সব কথা অতি তুচ্ছ ও নিরর্থক, তা শ্রুতিমূলে পৌঁছায় কিন্তু মর্ম্মে প্রবেশ লাভ করে না। একই কথা একই রকমে সকলে বারবার বলে—কি রান্না হইল, কি খাওয়া হইল, কার বিবাহে কে কত ভরি গহনা পাইল, কাহার নীচু ঘরে বিবাহ হইল, কাহার বধূ বা কন্যাকে ভূতে পাইল, কে অম্বলের ব্যারামে ভুগিতেছিল, কাহার মাদুলি পরিয়া সে নিরাময় হইল! কাহার চরিত্রদোষ ঘটিল, কে পড়িয়া পড়িয়া স্বামীর অকথ্য অত্যাচার সহ্য করিয়া সতীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইল—দিনের পর দিন মাসের পর মাস বহু বৎসর ধরিয়া করুণা এই সব আলোচনাই শুনিয়া আসিতেছিল। সেই সব জরাজীর্ণ পুরাতন কথা তাহাকে পীড়া দিত, অথচ না শুনিয়াও উপায় ছিল না।

সুকুমারীর সঙ্গে আলাপ জমিবার পর হইতে অবসরকালে করুণা ভ্রাতৃজায়ার কক্ষ আশ্রয় করিয়া খোড়বড়ি-খাড়ার অত্যাচার হইতে অনেকটা নিস্তার পাইয়াছিল। সেখানে যে-আলোচনা ও পাঠ চলিত তাহাতে জানিবার ও বুঝিবার ক্ষুধাটা দুজনেরই অসম্ভব রকম বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই ক্ষুধার অন্ন লইয়া অমর উপস্থিত হইল।

অমরের কথার ফাঁকে ফাঁকে বাহিরের বিচিত্র বিপুল জগতের যে অস্পষ্ট ছবি করুণা মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইত, তাহার তুলনায় গৃহ-সীমাবদ্ধ নিত্যকার জগতের তুচ্ছতা দিনে দিনে তার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। আজন্মের সংস্কার ও শিক্ষার ফলে যার অস্তিত্বও এতকাল অনুভব করে নাই, মনের নিভৃতলোকে অকস্মাৎ কোথা দিয়া এক ঝলক মুক্তির হাওয়া ঢুকিয়া সেই বন্ধন-বেদনাকে প্রকাশ করিয়া দিল।

সেদিন তিন জনে বসিয়া গল্প করিতেছিল। করুণা বলিল, তুমি এলে ভাই, তাই স্বদেশীর কথা শুনতে পাচ্ছি, নইলে আমরা ত খাঁচার পাখী, বাইরের খবর ত পাই না!

অমর করুণার পরিহিত রেলির থানের দিকে তাকাইয়া পরিহাসচ্ছলে বলিল, বিলিতি খোলসটা কিন্তু আপনার ত্যাগ করা উচিত!

কথাটা বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া করুণার মুখের পানে তাকাইতেই অমরের হাসি মিলাইয়া গেল। করুণার মুখে যে-বেদনার ছায়া ঘনাইয়া উঠিল তাহা যেন তাহাকে তীব্র কষাঘাত করিল। কি বলিবে কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া অপরাধীর মত সে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইল।

সুকুমারী লজ্জায় ও ক্ষোভে কাঁদকাঁদ হইয়া বলিল, দাদা, তুমি জানো না, তাই অমন কথা বলছো!

অমর অনুতপ্ত স্বরে বলিল, আমায় মাপ করুন দিদি! আমার অন্যায় হয়েছে! সত্যি বলছি, আপনার মনে ব্যথা দেওয়া আমার ইচ্ছে ছিল না!

করুণা ম্লান হাসিয়া বলিল, মাথা নেই তার মাথা

ব্যথা! আমাদের মন বলে' একটা জিনিস আছে আজ এই তোমার মুখে প্রথম শুনলুম! আর জন্মে বোধ হয় অনেক পাপ করেছিলুম, তাই বাঙালীর ঘরের বিধবা হয়েছি—আমাদের কি আর মনে ব্যথা পেলে চলে? আমরা পরের কথায় উঠি, পরের কথায় বসি, দিনান্তে এক মুঠো খাই, পুরুষমানুষে হাত তুলে যে কাপড় দেয় তাই পরি! আমাদের সাধ থাকলেই কি আর সাধ্য আছে ভাই?

অনুশোচনায় দগ্ধ হইয়া অমর কহিল, আমায় মাপ করুন! ও-কথা বলা আমার অন্যায় হয়েছে, খুবই অন্যায় হয়েছে!

করুণা বলিল, যাক ভাই, হয়েছে! মাপ চাইতে হবে না! তারপর কপট ভৎসনার স্বরে হাসিয়া বলিল, তুমি কোন্ দিশী পুরুষ? মেয়েমানুষের কাছে মাপ চাইতে লজ্জা করে না?

ক্রমে হালশিকাঠি হইতে ফিরিবার সময় আসন্ন হইয়া আসিল। একদিন কথাপ্রসঙ্গে করুণা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, জাপান যেতে হলে কি করে' যেতে হয়?

অমর বলিল, কেন, জাহাজে।

করুণা বলিল, কতদিন লাগে?

অমর বলিল, এক মাস।

করুণা বলিল, এক মাস? ও মা, সে কতদূর!

অমর বলিল, সে অনেক দূর, হাজার হাজার ক্রোশ

করুণা ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা সেখানে কতদিন থাকতে হবে?

অমর বলিল, বছর পাঁচেক।

করুণা বলিল, এতদিন? কেন তার কমে হয় না?

অমর বলিল, পাঁচ বছর আর এমন বেশি কি? দেখতে দেখতে কেটে যাবে!

করুণা বলিল, আচ্ছা, তোমার মন কেমন করবে না?

অমর বলিল, কেন?

করুণা বলিল, এই ধরো তোমার বন্ধু, মা বাবা বোন সবাইকে ছেড়ে থাকতে হবে ত?

অমর একটু হাসিয়া বলিল, তা একটু মনে হবে বৈ কি। তার আর উপায় কি!

তারপর সেদিন আর কোনো কথা হইল না। করুণা কার্য্যান্তরে উঠিয়া গেল। সুকুমারী দু' একবার কথা কহিতে গিয়া দেখিল, অমর কি যেন ভাবিতেছে, কথা কহিবার তার বিশেষ প্রবৃত্তি নাই।

অমর করুণার কথা প্রায়ই ভাবে। তার মনে হয় করুণার জীবনের ব্যর্থতা ও শূন্যতা সে যদি কোনোক্রমে, অন্তত কতক পরিমাণে দূর করিতে পারিত, তাহা হইলে বেশ হইত। বিদায়ের দিন যতই সন্নিকট হইতে লাগিল ততই তার মনে হইতে লাগিল যাত্রাকালটা আরো কিছু কাল পিছাইয়া গেলে মন্দ হয় না! যেদিন করুণা প্রশ্ন করিয়াছিল সেদিন অমর ততটা অনুভব করে নাই, কিন্তু ক্রমশ সে অনুভব করিতে লাগিল, করুণাকে ছাড়িয়া যাইতে তার মন কেমন করিতেছে। অমরকে করুণার যে ভালো লাগে সে-কথা সে বুঝিতে পারে, তবে সেই ভালোলাগার প্রকার এবং পরিমাণ সম্বন্ধে সে একেবারেই অজ্ঞ। তাহা বুঝিবারও সে কোন দিন চেষ্টা করে নাই, কিন্তু সে এটা নিশ্চিত বুঝিতেছিল তাহার সান্নিধ্যে ও সাহচর্য্যে করুণা সুখী হইয়াছে। করুণার দুর্ভাগ্য জীবনে সুখ ও সান্ত্বনা আনিবার জন্য কি করা যাইতে পারে, অমর তাহা প্রায়ই ভাবিত কিন্তু ভাবিয়া কূল পাইত না। এক একদিন অমর লক্ষ্য করে কথার মাঝে করুণা উদাস ও গম্ভীর হইয়া পড়ে, তার চোখের কোণে যেন একটু অশ্রুর আভাস দেখা যায়, কি তার ভাবনা কিসের তার দুঃখ জানিবার জন্য অমরের বড় ইচ্ছা হয়, কিন্তু এ সব কথা জিজ্ঞাসা করিতে তার সাহসে কুলায় না, কি জানি করুণা কি ভাবিবে!

অমরের চলিয়া আসার দিন সুকুমারীর শরীর খারাপ থাকাতে সে উঠিতে পারিল না। করুণা প্রতিদিনের মত

সেদিনও তার আহারাদির তত্ত্বাবধান করিল। আহারের সময় বিশেষ কথাবার্ত্তা হইল না। অমর অন্যদিনের মত সহজে গল্প করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া হাল ছাড়িয়া দিল। করুণাও মামুলি-ধরণের দু'চারিটি কথা ছাড়া আর কিছু বলিল না।

যাত্রার আয়োজন করিতে দিন কাটিয়া গেল। আহারাদির পর মাঝরাতে রওনা হইয়া ভোরের গাড়ি ধরিতে হইবে। সন্ধ্যার সময় অন্তত করুণার সহিত আলাপের অবসর হইবে, এমনি একটা আশা অমরের মনে মনে ছিল, কিন্তু সুকুমারীর উকীল-ভাসুর সে আশার মুখে ছাই দিল। অপরাহ্নে অমরকে পাকড়াও করিয়া সে বেহালা শুনাইতে বসিল। তারপর সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা সুরু করিয়া দিল। উক্ত শাস্ত্রে নিজের অজ্ঞতা প্রমাণ করিবার বহু চেষ্টা করিয়াও অমর সফল হইল না। উপরন্তু উকীল-মহাশয়ের দৃঢ় ধারণা হইল, অমর একজন রীতিমত রসিক লোক। তার সঙ্গে যে এতদিন ভাল করিয়া আলাপের অবসর হয় নাই সে জন্য সে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। সারা সন্ধ্যাটা মাটি করিয়াও তার তৃপ্তি হইল না, শেষে সে আবদার ধরিল, রাত্রের আহারটাও অমরের সঙ্গে সমাধা করিবে।

উকীল-মহাশয়ের স্নেহের অত্যাচার হইতে অমর যখন পরিত্রাণ পাইল তখন রাত অনেক, যাত্রার আর বিলম্ব নাই। বহির্ব্বাটীর ফটকে গো-যান আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ক্রমে তার মধ্যে খড়ের উপর সতরঞ্চি বিছাইয়া শয্যা রচিত হইল। জিনিসপত্র তুলিয়া দিতে যখন ভৃত্যেরা ব্যস্ত, অমর তখন সুকুমারী ও তার শাশুড়ীর সহিত দেখা সারিয়া নীচে নামিয়া আসিল। করুণার কাছে বিদায় লওয়া হইল না, কারণ তার কোনো চিহ্ন দেখা গেল না। ক্ষুণ্ণ মনে অন্দর ছাড়িয়া একটা দীর্ঘ গলিপথ অতিক্রম করিয়া সে বাহিরে আসিয়া পড়িল। সেখান থেকে বাড়ির ফটক বেশি দূর নয়।

জ্যোৎস্নার ম্লানালোকে অমর আনমনে চলিতেছিল। একটা গাছের তলায় পৌঁছিতেই হঠাৎ দমকা হাওয়ার মত এক ঝলক শিউলির গন্ধ তাহাকে সচেতন করিয়া দিল। আর তারই সঙ্গে যেন সঙ্গতি রাখিয়া সেই গাছের আড়াল হইতে ত্বরিতপদে এক শুভ্রবসনা মূর্ত্তি বাহির হইয়া আসিল। অমর কিছু বুঝিবার আগেই সে দুই হাতে তার একখানা হাত তুলিয়া ধরিয়া অধরের উপর চাপিয়া ধরিল। শুধু একটি নিমেষ—পরক্ষণেই, সে যেমন ঝড়ের মত আসিয়াছিল, তেমনি করিয়াই চকিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

—ক্রমশ

'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে—'

শ্রী নিরুপম গুপ্ত

শ্রাবণ রাত্রি—

অবিশ্রান্ত বর্ষণে পথ-ঘাট ভাসিয়া যায়। উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়া সুমুখের মাঠের জলস্রোত আর গাছের পাতায় বর্ষণের শব্দ ভাসিয়া আসে। সমস্তটা কালো আকাশ মুখ থুবড়িয়া কাঁদিতে লাগিয়াছে।

হাওয়ার ঝাপটায় আলোটা নিবিয়া গিয়াছে কখন। রাত্রি একটা হইবে। সবাই বুঝি ঘুমায়। নির্ম্মলের ঘুম আর আসে না কিছুতেই। ওই আকাশের বুক-ভাঙা কান্নার মত কি একটা তাহার বুকেও জাগে, আলোড়ন তোলে। কান পাতিয়া হাওয়ার গর্জ্জন শোনে, মনে হয় যেন তাহারই

গৃহহীন জীবনের ক্ষুব্ধ আক্ষেপ ওই আঁধার রাতের সীমা-হীন প্রান্তরে আপনাকে আছাড়িয়া মারিতে চাহিতেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝিলিক মারে, যেন কোন্ নির্দ্দয় বিধাতার উপহাসের মত জ্বালাময়। চোখ বুজিয়া অন্ধকারে নির্ম্মল আপনাকে ডুবাইয়া দিতে চায়, ছটফট করিয়া পাশ ফিরিয়া শোয়।

কখন ঘুমাইয়া পড়ে কে জানে! স্বপ্নে হারানো-রেবার মুখখানি জাগিয়া উঠে। যে ক'টি কথা বুকে লইয়া এই তাহার ভবঘুরে জীবনের উদ্দেশ্যহীন চলা, রেবা যেন সেই ক'টি কথা চোখের জলে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে নিবেদন করিতেছে!

এক পাড়ার সাথী, কৈশোরের সঙ্গিনী। অপরাধ আর কিছুই নয়—ভালবাসা। কত মান, অভিমান, রাগারাগি, দুদিন মুখ না দেখিয়া সরিয়া থাকিয়া চোখের জলে ভাসিয়া যাওয়া, কত সুখের দুঃখ দেওয়া আর দুঃখ পাওয়া! কিন্তু ভালবাসা যে কি নিদারুণ তা তখনো তো তারা বুঝিতে পারে নাই!

উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে রেবার বিবাহ হইয়া গেল। কি যে হইল তাহা রেবাও বুঝিল না, নির্ম্মলও না। তাহাদের সেই দুঃখ দেওয়া-নেওয়ার পথে কেন যে একটা নিষ্ঠুর প্রাচীর আসিয়া দাঁড়াইল কে তাহা বলিবে! নির্ম্মল বুঝিল, তাহার ভালবাসার সেই সহজ অধিকারের অবসান ঘটিয়াছে; চোখের দেখাকেও কে যেন চোখ রাঙাইয়া আজ শাসন করে। রেবাও চোখ তুলিয়া চাহিতে যেন সাহস পায় না। সেই সহজ ডাকাডাকি, সেই ঝগড়া-ঝাটি, সেই মুখ ভার করিয়া থাকা,—সব যেন স্বপ্ন-কথা। অত্যন্ত গম্ভীর দৃষ্টি তাহার মাটির দিকেই লাগিয়া থাকে।

একদিন নিরিবিলি দেখা হইল

'রেবা!—এমন করে' ভুলে গেলি কি করে'?'

'স্বচ্ছন্দে! মনে রাখবার এমন কি-ই বা আছে!'—বলিয়া রেবা যাইতে উদ্যত হয়।

নির্ম্মলের ভিতরটা জ্বলিয়া উঠে, বলে, 'দাঁড়াতে বুঝি আজকাল বড় কষ্ট হয়?'

'কেন হবে না? তোমার সঙ্গে আমার বাজে কথা বলবার এত সময় নেই।'

'তা তো বটেই! আমার বুক খাখ্ হয়ে যাক্, তাতে তোর কি রাক্ষুসী—তাতে তোর কি!'—বলিয়া নির্ম্মল ছুটিয়া চলিয়া যায়।

মাথা নীচু করিয়া রেবা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকে, কি ভাবে কে জানে! চোখের জল গড়াইয়া পড়ে। কে আসিতেছে দেখিয়া চোখের জল মুছিয়া গম্ভীর মুখে সে গৃহকর্ম্মে মন দেয়।

নির্ম্মল আর রেবাদের বাড়ীর পথ মাড়ায় না ক'দিন। রেবার দু'টি চোখ বেদনার অশ্রুভারে টলটল, নাড়া পাইলেই বুঝি অশ্রু ঝরিয়া পড়ে। ম্লান বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া পাশের বাড়ীর পুষ্প হাসিয়া গলা জড়াইয়া জিজ্ঞাসা করে, 'কিরে মুখে যে হাসি নেই একেবারে? দু'দিনেই 'দূর হইল নিকট বন্ধু—হিমাংশু-বিরহে যে মুখখানা শুকিয়ে গেছে! মনে হচ্ছে বুঝি হারিয়েই গেল!'

রেবার উত্তর দিতে ইচ্ছা করে 'হ্যাঁ ভাই, একেবারেই হারিয়ে গেছে!' কিন্তু কিছুই বলিতে পারে না, চুপ করিয়া থাকে, চোখের কোণে শুধু অশ্রু জমে!

পুষ্প বলে, 'ছি ভাই, কাঁদিস কেন? দু'দিন পরেই তো যাবি, তোর বরও বুঝি আসার সময় খুব কাঁদল?'

রেবা কোনো কথাই বলিতে পারে না।

সেদিন রাতের বেলা ওই পাশের নির্জ্জন গলি-পথটা

দিয়াই নির্ম্মল চলিয়াছিল রেবা কি ওই পথটার পানেই দিনরাত চোখ মেলিয়া চাহিয়া থাকে ?

'নীরুদা !—'

নির্ম্মল দাঁড়ায়। উদাস কণ্ঠে জিজ্ঞাস করে 'কেন ?'

'রাগ করেচ ?'

'আমার অত মিথ্যে রাগের সময় কই ?'—বলিয়া নির্ম্মল চলিতে চায়, তবু পা দু'টা চলে না।

হাতে একটুকরা কাগজ দিয়া রেবা চলিয়া যায়।

চিঠিতে লেখা চোখের জলে অস্পষ্টপ্রায় এই ক'টি কথা—

আমার মত অসহায়ের উপর তুমি এত নিষ্ঠুর হতে পার ? ভুলে যাওয়া এতই সহজ, না, নীরুদা ? কাকে ভুলবো আমি ? আমি ভুলে গেছি একথা কি করে' ভাবতে পার তুমি ? প্রতি নিমেষের চিন্তায় তুমি জেগে আছ আমার এই বেদনাময় অন্তরে, একথা মুখে বলে' জানাবার প্রয়োজন তো এত দিন হয় নি ! নীরুদা, সেদিন অভিমান করে' তোমায় ব্যথার আঘাত দিয়েচি—আমায় তুমি ক্ষমা কর। তোমায় যে আমি কত ভালবাসি সে কথা কি জান না তুমি ! এ জীবনে তোমায় কখনো ভুলতে পারবো না, নীরুদা, বিশ্বাস করো। সর্ব্বমুহূর্ত্তে তোমার মঙ্গল-চিন্তা আমার বুকে জেগে থাকবে। তোমায় আমায় দেখা তবু আর বোধ হয় তেমন সহজ ভাবে হবে না কখনো—কেন তা জানি না। কিছুই বুঝি না, তবু এই দু'দিনেই বুঝেচি, তোমার আমার ভালবাসাকে সংসার বুঝবে না, শুধু অপমান আর সংশয় করবে।

এই বিচ্ছেদের ব্যথা কি করে' বইব জানি না। তবু নীরুদা, মিনতি আমার, তুমি অমন নিষ্ঠুরের মত ভুল বুঝে আমায় আঘাত করো না। আমি যে তোমার ছোট। আমার অপরাধ মার্জ্জনা করো। বিদায় নেই, তবু বিদায় চাই।

তোমার স্নেহের—রেবা

সেদিন আকাশে শ্রাবণের বর্ষণ নামে নাই, সেই রাতে বিপুল অশ্রু-বন্যা নির্ম্মলের বুকে-চোখে প্লাবন আনিয়াছিল। সেদিনও সারারাত নিদ্রাহীন চোখে নির্ম্মল নদীতীরে পড়িয়া ছিল। তাহার নির্ব্বোধ নিষ্ঠুরতার লজ্জাকে অতিক্রম করিয়া সেদিন সার্থক ভালবাসার গৌরব তাহাকে আনন্দে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছিল।

তার বছর খানেক পরে রেবাদের বাড়ীতে মৃত্যুর শোকধ্বনি উঠিল আকাশকে বিদীর্ণ করিয়া। একটি মৃত সন্তান প্রসব করিয়া রেবা তাহার শেষ-মুহূর্ত্তে কি যেন খুঁজিতে খুঁজিতে কোন্ অন্ধকারের দেশে চলিয়া গেল !

নির্ম্মল সেই পথখানি খুঁজিতে বাহির হইল। সে পথের কোনো সন্ধানই সে পায় না। কেমন করিয়া এমন নিরুদ্দেশ হইয়া গেল সে, তাহা যেন সে কিছুতেই বুঝিতে পারে না। মাঝে মাঝে মাথাটা দু'হাতে চাপিয়া ধরে, মনে হয় বুঝি সে পাগল হইয়া গেছে। তাহা না হইলে, কি হইয়াছে সে কিছুই বুঝিতে পারে না কেন ? এই বিশ্ব-সংসারের বস্তুরাশি—ওই গাছপালা, ওই বাড়ীগুলা, ওই আকাশের তারা আর তাহার চারিদিকের মানুষ, একটা জটিল রহস্যের মত তাহার দিকে কেমন একরকম করিয়া নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহাকে যেন পাগল করিয়া তুলিতে চায়।

মাঠের মাঝখানে চৈত্রমাসের সন্ধ্যা বেলা দাঁড়াইয়া ডাকিয়াছে, 'রেবা, রেবা !' মাঠের হাওয়া তাহার রুক্ষ উদাস চুলগুলা নাড়ে-চাড়ে, যেন রেবাই তাহার কপালে হাত বুলায় ! পশ্চিমাকাশের উজ্জ্বল তারাটার পানে চাহিয়া ডাকে, 'রেবা, আমার রেবা !' তার মনে হয় যেন ওই তাহার রেবার শান্ত বেদনাস্নিগ্ধ দৃষ্টি তাহার পানে চাহিয়া আছে, তাহাকে যেন কত সান্ত্বনা দিতে চায় !

এমনি করিয়া পথে পথে পরশ-পাথর খুঁজিয়া বেড়ায় সে !

স্বপ্ন দেখিতেছিল, সেই রেবা তাহার শিয়রে বসিয়া

তাহার মাথাটি কোলে লইয়া যেন বলিতেছে 'ভুলিনি, বন্ধু, তোমায় ভুলিনি।' সেই বেদনাময় চিরপরিচিত দৃষ্টি

অকস্মাৎ ঘুম ভাঙিয়া চমকিয়া উঠে, বলে, 'এসেচ ?' —বলিয়া বেবার গলা জড়াইয়া ধরে। অস্পষ্টভাবে তাহার মনে হয় সে ঘুমাইতেছে, আর একটু স্পষ্ট মনে হয় বেবা তাহার নাই, তবু ওই মধুর স্বপ্নকে সে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চায়। এই স্বপ্নটি কোনো রকমে চিরন্তন করিয়া রাখিতে চায় সে।

ঘুম আর থাকে না, নির্ম্মল জাগিয়া উঠে। কিন্তু অদ্ভুত লাগে, স্বপ্ন তাহার যায় না তো! সত্যই সে কার গলা জড়াইয়া আছে? কেমন তাহার ভয় করিতে থাকে...কাহার তপ্ত নিশ্বাস তাহার মুখে আসিয়া লাগে, কাহার বুকের স্পর্শ তাহার বুকটাকে কাঁপাইয়া তোলে, সর্ব্বাঙ্গে যেন কাহার কোমল স্পর্শ। কার অঙ্গগন্ধ তাহাকে বিস্মিত বিভ্রান্ত করিয়া তুলিতে থাকে?

আলোটা কখন নিবিয়া গেছে। অন্ধকারে তব তাহার হঠাৎ মনে হয়, হাতের পরশটা যেন সে চেনে চমকিয়া উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'কে?'

'আমি।'

'আপনি? ছোড়দি। এখানে এত রাত্তিরে। কি ভয়ানক, কি করে' এলেন আপনি। যান যান এক্ষুনি।'

ঝড়ো বৃষ্টির হাওয়া জানালা দিয়া হুহু করিয়া ঢোকে, ওই পাশের গাছটাকে যেন ভাঙিয়া চুরিয়া পিষিয়া ফেলিতে চায়।

ছোড়দি বলে, 'কি করে' এলাম? তুমি আমায় আর থাকতে দিলে না, তাই এলাম।'

'ছোড়দি, এ সব কি বলচেন, আমি কিছুই বুঝতে পারচি না'—নির্ম্মল বলে, কিন্তু সবই যেন চকিতে সে বুঝিতে পারে।

'বুঝতে পারচ না, সত্যি বলচ।'

'হয় ত পারচি, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারচি ন

কথা শেষ হইতে পায় না, আবেগ উদ্বেলিত বুকে ছোড়দি নির্ম্মলকে আকর্ষণ করে, বলে, 'বিশ্বাস কর, অবিশ্বাস করো না—' বলে আর উন্মাদ চুম্বনে তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতে চায়। এ যেন কালবৈশাখী, ভাবিবার চিন্তা করিবার অবসর না দিয়া একেবারে এক নিমেষে বিহ্বল করিয়া দেয়। ধড়-মড় করিয়া উঠিয়া ছোড়দি ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইতে চায়, আবার দুয়ার হইতে ফিরিয়া আসে। চকিতে নির্ম্মল উঠিয়া দাঁড়ায়। নিমেষমাত্র প্রতীক্ষা না করিয়া ছোড়দি পুনরায় চলিয়া যায়।

বর্ষণ থামিয়া আসিল শেষ রাত্রে, হাওয়ার দুরন্ত তর্জ্জন, আকাশের গোঙানি সব থামিয়া গেল। বিনিদ্র শয্যায় উদ্‌ভ্রান্ত নির্ম্মল বসিয়া বসিয়া ভাবে, কি যে ভাবে তাহা সেও জানে না। বিপুল ঝড়ে যেন তাহার তরণীখানি কোন্ নির্দ্দেশহীন অকূলে আসিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে দোল খাইয়া চলিয়াছে। ভোর হইল, কিন্তু ভোরের আলো আসিল যেন এক পোঁচ অন্ধকার মুখে মাখিয়া।

সকালবেলা ছোড়দির ভাই-পো দু'টি নির্ম্মলকাকার নিকট পড়িতে আসে। কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই নির্ম্মলকাকার উত্তর পাওয়া যায় না অন্যদিনের মত। নির্ম্মল তাহার এই পাল-ছেঁড়া হাল-ভাঙা জীবন-তরীখানি কেমন করিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে এই পরিবারের তক-মূলে আসিয়া ঠেকিয়াছিল সেই কথাটা বিস্ময়ের সঙ্গে কেবলি ফিরিয়া ফিরিয়া ভাবে।

ছোড়দির দাদাই তাহাকে ছেলেদের মাষ্টার নিযুক্ত করিয়া বাড়ীতে আশ্রয় দিয়া অসঙ্কোচে তাহাকে তাহার পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার সুযোগ দিয়াছেন। ছোড়দির আদর-যত্ন, ছোড়দির বিছানা করিয়া দেওয়া ইত্যাদি তাই সে সহজেই গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে।

গত রাত্রির ঝড়ো হাওয়া আসিয়া যে সত্যকে আবরণ মুক্ত করিয়া গেল তাহার সহিত তাহার আর কখনো সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত হয় নাই। তাই দিনের বাস্তবতার মধ্যে সে কিছুতেই গত রাত্রির উপলব্ধিকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

বাহিরে বাদল। বাড়ীতে বসিয়া থাকা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ছোড়দির সঙ্গে চোখোচোখি করিবার সাহস যেন তাহার নাই। বাহির হইয়া এই বর্ষণের মাঝেই সে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

রেবার সেই চিঠিখানি বাহির করিয়া সে দেখে আর বুকে চাপিয়া ধরে।···

ছোড়দিকে সে ভালবাসে। এই বাল বিধবার ব্যর্থ জীবনের কথা ভাবিয়া মাঝে মাঝে তাহার মনে ব্যথা জাগে। কিন্তু গত রাত্রে সে কি দেখিয়া আপনাকে ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে? মাঝে মাঝে ভাবে, সে হয় ত নিতান্তই অনুচিত এবং মিথ্যা ধারণাই করিয়া বসিয়াছে। হয় তো একটি অতি ব্যাকুল স্নেহ কাল তাহাকে এমন করিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছিল।

আর যদি স্নেহ না-ই হয়, যদি উহা ছোড়দির বঞ্চিত ক্ষুধিত অন্তরাত্মার ব্যাকুল ভালবাসাই হয়?

বেলা-শেষের আকাশে দিগন্তকালো মেঘ জমাট ভ্রূকুটির মত লাগে। নির্ম্মল চারিদিকে অন্ধকারের ভ্রূকুটি দেখিয়া কেমন করিতে থাকে। যদি সত্যই ভালবাসিয়া থাকে, ব্যর্থ তার সেই ভালবাসা। কেন মানুষ এমন ভুল করিয়া ভালবাসে, কেন তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়? পথ চলিতে চলিতে আকাশের ফাঁক দিয়া একটি তারা জল্-জল্ করিয়া উঠে। নির্ম্মল আপন মনে বলে, 'ওগো আমার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তারা, আমার চিরকালের প্রিয়া!'

একি মানুষের ভুল করিয়া ভালবাসা! ব্যথায় তাহার চোখে জল আসে। 'ছোড়দি, তোমার ভালবাসাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করচি, কিন্তু তুমি ভুল করেচ।'

রাত্রি আসিতে থাকে। আজও হয় তো তেমনি ঝড় আসিবে আকাশ ভাঙিয়া, আজও হয় তো তেমনি···নির্ম্মল কুণ্ঠিত হইয়া উঠে, আবার ভাবে, 'না আসুক, আজ স্পষ্ট করে' বোঝাপড়া চাই।'

আকাশ মাতাল হইয়া উঠিল। আজ বুঝি সব নিঃশেষে ভাঙিয়া চুরিয়া গ্রাস করিতে চায় ওই উন্মাদিনী ঝটিকা! সারা বাড়ীর লোকগুলা যেন ঘুমের মাঝেই মরিয়া হিম হইয়া গেছে, আর সে যেন একা ওই বাড়ীটার মাঝে জাগিয়া আছে! রেবার শবশয্যাখানি চোখে ভাসিয়া উঠে, তারপর জাগিয়া উঠে বিগত রাত্রির সেই স্বপ্নসঙ্গিনী রেবার করুণ ম্লান কাতর দৃষ্টি।

হঠাৎ মনে হইল, বুঝি বর্ষার দুকূল-ভাঙা কোন্ নদী তাহার উপর দিয়া বন্যা বহাইয়া দিল, তাহাকে বুঝি আর স্মৃতির জড় আঁকড়াইয়া থাকিতে দিবে না কিছুতেই। সর্ব্বগ্রাসী আলিঙ্গন বুঝি তাহাকে একেবারে কোন্ সর্ব্বনাশের অতলে তলাইয়া লইয়া যাইবে!

প্রাণের ব্যর্থ পিপাসার নিদারুণ রূপখানি দেখিয়া নির্ম্মলের চোখ বুজিয়া আসে, করুণায় তাহার চোখ দু'টি স্নেহ-কোমল হইয়া উঠে।

ধীর কণ্ঠে ডাকিল সে, 'ছোড়দি!'

নিঃশব্দে কাটে, নির্ম্মল ছোড়দির গায়ে হাত বুলায়।

ছোড়দি কিছুক্ষণ পরে অকস্মাৎ প্রশ্ন করে, 'তোমার বয়স কত?'

'চব্বিশ।'

'আমার আটাশ'—বলিয়া কেমন একটা হাসি। 'সুতরাং আমাকে স্নেহ করতে হবে, ছোড়দি হতেই হবে, না?'

কোমল কণ্ঠে নির্ম্মল বলে, 'না, তা বলচি না, ছোড়দি, কি হতে হবে না হবে বয়েসের হিসেব দিয়ে তার নিয়ম বাঁধা চলে না, সে আমি জানি।'

'তবে কেন আমায় ছোড়দি বলে' ডাকচ?'

'ছোড়দি বলে' মনে করি, তাই।'

'না, আমি ছোড়দি নই। ওই বুকটার মাঝে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে চাই, মিলিয়ে যেতে চাই। ওই বুকটা সব-খানি আমার—আমার করে' পেতে চাই।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলে, 'এ জীবনে তো কোথাও কিছু পাইনি, এই বুকটা একেবারে খালি, খালি। এমন পাগল তো আর কখনো হইনি।'

কথাগুলি শুনিয়া নির্ম্মলের বুকটা সমবেদনায় কেমন করিয়া উঠে। নিস্তব্ধ হইয়া চোখ বুজিয়া স্থির হইয়া থাকে, মনে হয়, যেন নিশ্বাসও তাহার থামিয়া গিয়াছে। ছোড়দি কোনো সাড়াই পায় না। নোঙর-ছেঁড়া নৌকার মত যাহাকে আপন বেগে স্রোতের মুখে দুনিবার টানে টানিয়া লইয়া যাইতে চায় সে একটা পাথরের পিণ্ডের মত অসাড় অচল হইয়া পড়িয়া থাকে। ব্যর্থতা নাগিনীর মত ফুঁসিতে থাকে, বিষদন্ত ফুটাইয়া দিতে চায় ওই বুকে।

'ছোড়দি!—কি চাও তুমি আমি বুঝতে পারচি না।'

ছোড়দি কেমন পাগলের মত হাসে, হাসিয়া বলে, 'বুঝতে পারচ না? ছোড়দি হতে চাই না।'

'ছোড়দি হলেও কি ভাই বলে' আমায় পেতে পার না?'

'না, না, সে আমি চাই না। আর কোনো ভাবে আমি চাইতে পারব না, একটুও না।'

'তবে আমিই বা কি করে মিথ্যা অভিনয় করবো তোমার সঙ্গে তাও তো বুঝতে পারচি না দিদি। আমি তো তোমায় সে-ভাবে নিতে পারি না।'

'ক্ষতি কি? তোমার তো কোনোই ক্ষতি নেই। এই বুকটা যদি তোমাকে পেয়ে ভরে তাতে কি তোমার একটুও আনন্দ নেই?'

'যদি পারতাম আনন্দ দিতে নিজেকে ধন্য মনে করতাম। কিন্তু সে হতে পারে না ছোড়দি।'

'কেন পারবে না, খুব পারবে।'

'না, নিতে হলে যে দিতেও হয়। আমি কি দেবো? আমার তো কিছুই নেই। সব যাকে দিয়েছিলাম সে তা ফেলে চলে' গেছে, অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। সেই অন্ধ-কারে তাকে আজও খুঁজে চলেচি...'

দীর্ঘ নিশ্বাসে কথা মিলাইয়া যায়। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটে। হঠাৎ ছোড়দি একটু হাসিয়া বলে,

'যাক্‌গে, তোমার অতীত জেনে আমার কোনো প্রয়োজন নেই, আমার বর্ত্তমান চাই, এই আমার পর্য্যাপ্ত।'

নির্ম্মল সহসা উঠিয়া বসে, বলে, 'কি বলচ তুমি ছোড়দি! তোমার অতীত চাইনে? আমারও এই বর্ত্তমান চাইনে। অতীতকে বুকে নিয়েই আমার এই জীবন। আমায় তুমি বৃথা লুব্ধ করচ। আমি কিছু দিতে পারব না, অসম্ভব।'—কণ্ঠস্বর অতি কঠোর শোনায়।

'মনে করচ কি ভিক্ষা চাইতে এসেচি? এত ছোট মনে করো না আমায়!'—উত্তেজিত হইয়া ছোড়দি উত্তর দেয়।

'মাপ কর, ছোড়দি, আমি চললাম'—বলিয়া নির্ম্মল লাফ দিয়া উঠে। রাস্তার দরজা খুলিতে যায়।

হাত ধরিয়া ছোড়দি বলে, 'যেও না বলচি নির্ম্মল, পাগলামি করো না।'

'তুমি ওপরে যাও দিদি, কেউ জানতে পারবে'—বলিয়া নির্ম্মল বাহির হইয়া যায়।

সমস্ত আকাশের কান্না ওই পথিকের মাথায় ভাঙিয়া পড়ে।

সত্যেন্দ্র-স্মরণে

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

এমনি প্রহর-দীর্ঘ আষাঢ়ের অমানিশা-শেষে
মৃত্যু আসি দাঁড়াইল, তোমারে লইতে একদিন—
চেয়েছিলে মুখে তার, তুমি কবি, ক্লান্ত উদাসীন ?
মুদিলে মেঘের রবে আঁখিদুটি ম্লান হাসি হেসে ?
বেদনার অর্ঘ্য রচি' নিবেদিলে যাহার উদ্দেশে
আজীবন,—পথের পাথর মাজি' মণি-অমলিন
রচিলে যাহার লাগি'(দৃষ্টি ক্রমে হয়ে এল ক্ষীণ !)
বিদায়ের কালে সে কি ললাটে চুমিল ভালোবেসে ?

বাহিরে বিদ্যুৎ-ঘটা, নব-মেঘে মেদুর অম্বর,
কেতকী ফুটিছে বনে, জ্যৈষ্ঠী-মধু শীতল সুরভি,
হৃদয়ে গুমরে গীতি—ছন্দহারা ক্ষুব্ধ হাহা-স্বর,
আর্দ্র বায়ু শ্বাসে কাঁদে সুনির্জ্জন ভবন-বলভি !—
'আর নয় !'—কহে দেবী, বীণা হ'তে ছিনাইয়া কর,
'এবার আমার পালা !— আমি গাই, তুমি শোন, কবি !'
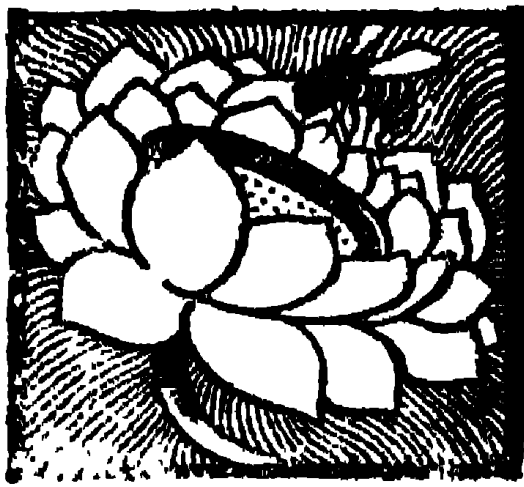
রাজু-পণ্ডিত

—পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর—

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

রাজুর বাড়ি হইতে মেনকা ক্ষিপ্র পদে বাহির হইয়া পড়িল।

পুব আকাশের মেঘের বোঝা প্রচণ্ড জোর হাওয়ায় পশ্চিমের তটে ছুটিয়া চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে এক-একটা তারা অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া জল্ জল্ করিয়া উঠে; আবার মেঘে ঢাকা পড়ে, আবার কখন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে!

মেনকা তাহাদের উপর আপনার দৃষ্টি ফেলিয়া কেমন যেন বুঝিতে পারিল যে সেই রাত্রে তাহারও চক্ষু দিয়া মনের আগুন তেম্‌নি করিয়া বাহির হইতে চায়! তাহারো মনের দুঃখ যেন কোথায় কোন্ তটের মুখেই ছুটে!

রাজুর সহিত কথা কহিয়া মন একটুও হাল্কা হয় নাই, সেখানকার ব্যথার বহ্নি আরো প্রদীপ্ত!

পথ চলিতে চলিতে সে নিজে নিজেই বলিল, আশ্চর্য্যি মানুষ; গোঁয়ার, ডান্‌পিটেটা; একটুও কি ভয় ওর নাছে?

বাঁশ-ঝাড়ের নীচের অন্ধকারটায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া মেনকা যেন কত কি ভাবে! যে নিজের মরণকে ভয় পায় না, সে কেমন ধারা মানুষ! রাগ হয় না তার ওপরে? কিন্তু সে রাগ পেছ্‌লা পথে পায়ের মত দাঁড়াতেও ত পারে না!

মেনকার বাড়ি ফিরিতে ইচ্ছা করে না, যেন কত বড় একটা কাজের ভার তাহার মাথার উপর ঝুলিয়া আছে তবুও এক-এক পা করিয়া বাড়ি ফিরিল।

হরেকৃষ্ণ ফিরে নাই। এমন দেরিত তাহার রোজই হয়। দাবার আড্ডা,—খেলা জমিলে রাতের ঠিক-ঠিকানা থাকে না।

মেনকা মার ঘরে গেল। মা পরিশ্রান্ত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছেন। সে ধীরে ধীরে তাঁর হাত পা মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, মা নন্তর পেটটা ত কিছুতেই ধরচে না, তাকে নিয়ে আরত' পারিনে, সমস্ত রাত একবারের জন্যে বিরাম নেই পেট ঝরার।

মা বলিলেন, ভগার মাকে বলেছিলুম নন্তার নেজ দিয়ে আস্‌তে, ভুলে গেল মাগী বুঝি? বলিয়াই তিনি তন্দ্রিত হইলেন।

ভগার নাম শুনিয়া মেনকার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। একটা প্রচণ্ড টান বুকের মধ্যে। যাওয়া যায় না কি তাদের বাড়িতে? এমনি বা কি রাত হয়েছে?

জানালা দিয়া সে দেখিল চাঁদ উঠিয়াছে—চারিদিক ফুট্-ফুটে পরিষ্কার।

সে মাকে ডাকিল, মা, এদিকে, আস্‌তে তো অনেক দেরি, বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, আমি চট্ ক'রে গিয়ে নিয়ে আসি গে না?

তিনি ঘুমের ঘোরেই বলিলেন, তা যা না……

মেনকা উঠিল।

বাহিরে আসিয়া কি মনে করিয়া আবার ঘরে ফিরিল।

আঁচল হইতে চাবির রিং লইয়া হাত বাক্স খুলিয়া কয়েকটা টাকা পেট-কোঁচড়ে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, কিন্তু বেশী দেরি ক'রবো না, যাবো আর আস্‌বো।......

বাড়ির বাহিরে আসিয়া মনে মনে একটু হাসিয়া বলিল, লোকে ঠিক বলে—যার বে তার মনে নেই, পাড়াপড়্‌শির ঘুম নেই। রাজুর উপর মনে মনে রাগ করিল ;—কেন বাপু, জানতো সব, একটু সাবধান হ'লে কি একেবারে মহাভারত অশুদ্ধ্ হ'য়ে যায়?

মেনকা গিয়া চুপি চুপি ডাকিল, ভগার মা, ও ভগার মা।

ভগা ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল, একি দিদিমণি! তুমি এসেছ? জামাই বাবু পাঠিয়েছে বুঝি?

মেনকা সে কথার উত্তর না দিয়া উঠানের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, ভগা একটা কাঁচা বাঁশের লম্বা চোঙ করিয়া তাহার একদিকে শিক তাতাইয়া ফুটো করিতেছে।

সে খুব সহজ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কি হবে রে এ দিয়ে ভগা?

ভগা চাপা গলায় বলিল, জামাই বাবুর হুকুম।

এই রাতে সাপ কোথায় পেলি রে?

ভগা উৎসাহভরে বলিল, কেন দিদিমণি, দেখনি? আজ তো নিয়ে গেছ্‌লুম তোমাদের বাড়িতে খেলাতে!

তার তো বিষ দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছিস্?

না, না, দিদিমণি, সেটা একেবারে আঝাড়া। ইস্, কে তার ভাঙবে বিষ-দাঁত!

মেনকার কাণের মধ্যে ভগার কথাগুলি সূচ ফুটাইল,—একেবারে অসহ্য।

সে বলিল, দেখ্ ভগা, নন্তর বড় পেট নামাচ্চে, তোদের শনিবারে মারা নতার নেজ নেই?

ভগা আলো লইয়া রান্নাঘরের চাল হইতে লেজের টুক্‌রো বাহির করিয়া আনিয়া তাহার হাতে দিল। আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে মেনকা বলিল, কত টাকা তোকে জামাই বাবু কোব্‌লেছেরে, ভগা?

ভগা ডান হাতের সব আঙুলগুলি দেখাইল।

মেনকা জানিত হরেকৃষ্ণ কৃপণ, তাই একটু বিস্মিত হইল; কিন্তু পরক্ষণেই সে বিস্ময় তাহার মন হইতে চলিয়া গিয়া একটা তিক্ত কালো রসের ক্ষরণ হইল।

মেনকা ডাকিল, ভগা!

কি দিদিমণি?

তুই চিনিস্ না ওকে?

কেমন আন্‌মনা হইয়া ভগা বলিল, চিনি; কিন্তু উনিরা আমাকেও বেশ চেনে···

মেনকার ওষ্ঠে একটা মলিন হাসি ফুটিয়া উঠিতে উঠিতে মিলাইয়া গেল।

মেনকা আবার ডাকিল, ভগা!

এবার ভগা উত্তর দিল না, দুইটা ডাগর চোখে মেনকার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

মেনকা বলিল, ভাগু, টাকাই কি সবচেয়ে বড় রে?

এই ছোট্ট প্রশ্নটি ভগার মনে যেন চকিতে বজ্র হানিয়া গেল। নিমেষের মধ্যে ইহার বিরাট অর্থের কাছে সে নিজেকে ক্রিমির চেয়ে অধম বলিয়া বিবেচনা করিল। উত্তরে সে একটিও কথা বলিতে পারিল না। লজ্জায় তাহার জিহ্বা অসাড় হইয়া গেল।

মেনকা এবার শান্ত মৃদু কণ্ঠে বলিল, ছিঃ ভগা, টাকার জন্তে নরকের পথে অমন ক'রে বোকার মত চ'লে যাস্‌নি।

মেনকার স্বরের মধ্যে মিনতির চেয়ে কাকুতি ছিল বেশী।

ভগার ঘাড় আপনি নত হইয়া গেল, আর কিছুতেই মেনকার দিকে সে চোখ ফিরাইতে পারে না!

মেনকার দুই চক্ষু হইতে হঠাৎ কিসের একটা অমিত দীপ্তি বাহির হইয়া আসিল, সে স্নিগ্ধ অথচ দৃঢ় কণ্ঠে

ভগাকে ডাকিয়া বলিল, তোকে বলচি, শোন্ ভগা, আজ এই ভরা-রাতে যে কথা আমার মুখ থেকে বার হবে, তার একটা অক্ষরও মিথ্যে হবে না……পরের ক্ষতি করলে, নিজের সর্ব্বনাশ হয়। তুই যদি ও-কাজ করিস ত' তোর বংশে বাতি দেবার কেউ থাকবে না……

ভগার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। সে মেনকার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া—হাত দুখানা তাহার পায়ের উপর রাখিয়া বলিল, সত্যি বলচি, মেন্‌কা দিদি, একাজ আমি কোন মতেই আর কোরবনা, আমরা মুক্‌খু, এত কি জানি!

পেট-কোঁচড় হইতে নিঃশব্দে টাকা কয়টা মাটির উপর রাখিয়া দিয়া মেনকা বলিল, তুই গরীব, তোর টাকার ক্ষেতি আমি হ'তে দেব না; এইনে ধর্!

ভগা যন্ত্র-চালিতের মত তাহা গ্রহণ করিল।

একটা দম্‌কা বাতাস মেনকার কপালের উপর দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। মেনকা কপালে হাত দিয়া দেখিল, সেখানে বড় বড় কয়েক ফোঁটা ঘাম জমিয়া গেছে!

ভগা খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু দিদিমণি, জামাই বাবুকেই বা কি বলি?

মেনকা দৃঢ়-স্বরে উত্তর দিল, বল্‌বি? সাহস কর্ মনে, ভগা; বল্‌বি? তোর মনের যা সত্যি কথা তাই বল্‌বি, এত বড় অন্যায় কাজ, তুই কিছুতেই করতে যে পারিলুনে। অসম্ভব, ভগা, একেবারে অসম্ভব।

ভগা আবার খানিকটা ভাবিয়া বলিল, কিন্তু আমি কথা দিয়েছিলুম, আমাকে মেরে খুন করবে।

মেনকা স্তব্ধ হইয়া উঠানের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল।

ভগা সে সাপটা কোথায় রে? মেনকা প্রশ্ন করিল।

উত্তরে ভগা আঙুল দিয়া কোণের হাঁড়িটা দেখাইয়া দিল।

সরা-চাপা মস্ত হাঁড়ি।

মেনকা বলিল, চল্ ওটা নিয়ে আমার সঙ্গে মাঠে। ওটা তোকে ছেড়ে দিতে হবে আজ।

ভগা হাঁড়ি মাথায় করিয়া যাইতে যাইতে বলিল, ছাড়লে চলবে না দিদি, হয় তোমাকেই খাবে, নয় আমাকেই খাবে।

তবে? মেরে ফেল্।

ভগা বলিল, এযে জাত সাপ, এ আমাদের মারতে নেই।

তবে, কি করবি?

কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ভগা বলিল, তাইতো ভাবি……

পুকুরের ধারে আসিয়া মেনকা বলিল, রাখ্‌তো এখেনে দেখি।

ভগা হাঁড়িটা রাখিল।

মেনকা নিজের আঁচলের কতকটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, বাঁধ্ জোর ক'রে ওই হাঁড়ির মুখে এই নেকড়াটা।

ভগা জোর করিয়া বাঁধিয়া দিয়া, অবাক্-বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মেনকা জিজ্ঞাসা করিল, হয়েছে ঠিক? এবার তুই সরে যা ওখেন থেকে।

ভগা দুই পা পিছাইয়া আসিতেই মেনকা এক নিমেষে হাঁড়িটা তুলিয়া পুকুরের জলের মধ্যে ফেলিয়া দিল।

হাঁড়িটা শব্দ করিতে করিতে ডুবিয়া গেল।

মেনকা ফিরিয়া বলিল, এবার ম'রবে তো?

সাপের দুঃখে ভগার চোখে জল আসিল।

মেনকা আবার ডাকিল, দেখ্, ভগা, তুই এক কাজ কর্ আজ। আজ রাতেই চ'লে যা তোর শ্বশুর বাড়ি; যেদিন ফিরে আস্‌বি, সেদিন তোকে আরো পাঁচ টাকা দেব আমি।

আনন্দে ভগার সমস্ত দাঁতগুলি বাহির হইয়া পড়িল।

আর আমার বৌকে কি দেবে?

একখানা নীলাম্বরী।

ভগার বৌএর রং ফর্সা, তাই নীলাম্বরী মনে মনে বড়ই পছন্দ করিল।

ফিরিতে ফিরিতে মেনকা বুঝিতে পারিল পৃথিবী তাহার পায়ের তলা হইতে সরিয়া যাইতেছে। সে কোন-মতে নিজের ঘরের মধ্যে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। তাহার পর, তাহার মনে হইল যে পরম স্বস্তির পঙ্ক-কুণ্ডে সে যেন পলে পলে ডুবিয়া যাইতেছে। সংজ্ঞার শেষ আলোতে সে অস্পষ্ট দেখিতে পাইল, একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে, তাহার তলায় একখানা মোটা বইএর পাতা উল্টাইয়া কে সুর করিয়া পড়িয়া চলিয়াছে। সেই ধ্বনির রেশ মিলাইয়া যাইবার আগেই তার জ্ঞানটি একেবারে মুছিয়া গেল।—

দাবার আড্ডায় যাইবার সময় হরেকৃষ্ণের মনটি ছিল বড় ভাল।

—রাজুকে তার ভাল লাগে না, তাই রাজুর শেষ দেখিতে চায়। এই তো সোজা কথা। রাজু আগুনে পোড়ে না; কিন্তু এবার? যতই বল, বিষধরের কালকূট! শুধু ছোঁয়ার অপেক্ষা!

হরেকৃষ্ণ আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সে মনে মনে বলিল, দেখ্‌বো কত বড় খেল্‌ওয়াড় ঐ পাঁচ্‌-কড়েটা! আজ হরেকেষ্টোর কপাল খুলেচে!

দেরি দেখিয়া পাঁচকড়ি হরিশকে লইয়া বসিয়া গিয়াছিল।

হরেকৃষ্ণ অধীর চাঞ্চল্যে অপেক্ষা করিল।—যদি পাঁচকড়িকে একদান হারাইতে পারে তো? নিঃসন্দেহ, নিঃসন্দেহ, নিঃসন্দেহ। বুক-ভরা সয়তানির হাসিতে মুখখানা তাহার জুড়িয়া গেল।

হরিশের বাজি চটিয়া গেল।

একের পর এক করিয়া তিন বাজি হারিলে, পাঁচকড়ি হাসিয়া বলিল, ভেড়ে, তোর হলো কি আজ?

মুখ গোম্‌ড়া করিয়া হরেকৃষ্ণ উত্তর দিল, মনটার সুখ নেইরে পেঁচো, মাইরি বল্‌চি।

পাঁচকড়ি বিদ্রূপ করিয়া বলিল, যা, যা, রাত হয়েছে, মাগের কাছে শুতে যা, মন ভাল হবে। অত পেচু টান থাক্‌লে কি দবা খেলা যায়!

হরেকৃষ্ণ হরিশকে ডাকিল।

সে কাঁচা খেল্‌ওয়াড়, তাই তার উৎসাহ অদম্য, সে আগাইয়া আসিল।

কিন্তু এবারেও হরেকৃষ্ণ হারিল।

আড্ডা হইতে বাহির হইয়া যে-যার বাড়ি চলিয়া গেল। হরেকৃষ্ণর বড় ইচ্ছা একবার ডোম-পাড়ায় যায়, কি করলে ভগা বেটা!

চাঁদ উঠিয়া গেছে; কিন্তু একখানা কালো মেঘে চারিদিক আলো-আঁধারে।

বাঁশঝাড়ে দম্‌কা হাওয়া লাগিয়া বাঁশগুলা একবার মাটিতে ঠেকে—আবার সহস্র বাহু তুলিয়া আকাশময় নাচিয়া ফেরে। এখানে তার গা ছম্‌ ছম্‌ করে। লোকে বলে, গলায় দড়ি দেওয়ার পর ঘেন্না এখেনেই আছে।

হরেকৃষ্ণ এক পা এক পা করিয়া বাড়িই ফিরিল।

মনে করিয়াছিল, কাজ ফতে করিয়া ভগা টাকার জন্ত বসিয়া আছে। রাগ করিয়া মনে মনে ভগাকে তিরস্কার করিল, বেটা, তুই কি আমাকে যে সে পেয়েছিস্, চাল্

নেই, চুলো নেই, রাতারাতি তোর টাকা নিয়ে পালিয়ে যাবো?

কিন্তু ভগাকে না দেখিয়াও ভাল লাগিল না। ভাবিল, তাইতো, গেলেই হতো একবার!

ক্ষুধার তেমন তাড়া ছিল না। কিন্তু সে কিসের যেন একটা তাড়া! তাই মেনকাকে না দেখিয়া সবটাই যেন বেসুর বাজিল।

লণ্ঠনের বাতি উঁচু করিয়া দিয়া খাইতে বসিল সে। এমন একলা অনেকদিনই খায়। কিন্তু আজকে একটা চাপা অভিমান মনের প্রায় সবটাই চাপিয়া ধরিয়াছে। তাই একান্ত সহজকেও মন বাঁকাইয়া দেখে!

বড়লোকের মেয়ে। ঘর জামাই। মনের অপর দিক মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, তাতে কি? দেবতা নয়? শাস্ত্রে বলে কি?

কিন্তু ক্রোধের উত্তেজনা জমাট বাঁধিতে চায় না। ফিকে ফুর-ফুরে দক্ষিণা হাওয়ায়—যেন কোন্ অজানা সমুদ্রের সোহাগ উষ্ণতা বহন করিয়া আনে। যা অপ্রিয়, যা অপ্রীতির সেটা থাক্ না কেন চাপাই! সে আলোচনার জন্ম আছেই মানুষের দিন-দুপুর।

হরেকৃষ্ণ বিছানায় গিয়া শুইল। কাছেই ছেলেদের বিছানা, তার একধারে মেনকা শুইয়া আছে, কাছেই। একটা ঢেকুর তুলিল, উস্‌খুস্; এধার ওধার। একটু কাশিল। মেনকার আঁচলের চাবিটা ঝুলিয়া ছিল, চুপি চুপি খুলিয়া লইয়া বালিশের তলায় রাখিতে রাখিতে বলিল, একটা মজা করা যাক্।

কিন্তু মেনকার ঘুম আর ভাঙ্গে না। গায়ে ঠেলা দিয়া তুলিতে ইচ্ছা যায় না। মাথা বেড়িয়াই নাক ধরা যে এই খেলার রীতি! ক্রমেই পুরুষ অধীর হইয়া উঠে। শেষকালে, শুনছো, দেখো।

কেই বা শোনে, কেই বা দেখে! কেমন একটা সন্দেহে, আশঙ্কায়—হরেকৃষ্ণ উঠিয়া পড়িয়া আলো আনিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

মেনকার মাথার বালিশ রক্তে ভিজিয়া গেছে, সে সংজ্ঞাহীনা।

হরেকৃষ্ণের চীৎকারে মা ছুটিয়া আসিলেন। বলিলেন, কেষ্টো, ছুটে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আন, কেঁদে ফল কি?

হরেকৃষ্ণ বালকের মত কাঁদিতে লাগিল, মা আমি ছেড়ে যেতে পারবো না আমার মনুকিকে... ..

মা রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

অধর কুণ্ডু ডাক্তার লইয়া ঘরে ঢুকিলে জামাতা বাবাজি প্রকৃতিস্থ হইল।

ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিল, বোধ করি তীব্র ভাবনায়, কিম্বা মনের অসুখে নাকের কাছাকাছি মগজের শিরা ছিঁড়ে গেছে।

মেনকার মাথায় বরফের ব্যাগ দিয়া—ঔষধ লিখিয়া ডাক্তার চলিয়া গেল। বলিয়া গেল যে রাত্রেই ঔষধটা দিতে হইবে।

হরেকৃষ্ণকে তখন পথে বাহির হইতে বাধ্য হইতে হইল।

তখনো রাজুর ঘরে আলো জ্বলিতেছে। কি জানি হরেকৃষ্ণ ভয়ে ভয়ে দূর দিয়া চলিয়া গেল। ভগা কোথায় ছেড়ে গেছে সাপটা। তেড়ে এসে পদে পদে সে চমকাইয়া উঠে, ঐ বুঝি তাকেই কামড়ায়।

ঘণ্টাখানেক পরে সে আবার সেই পথ দিয়া ভয়ে ভয়ে ফিরিল। রাজু তখনো জাগিয়া আছে।

আকাশে আবার মেঘ জমিতেছে, হাওয়ার বদল হইয়া পশ্চিমের মেঘ আবার ছুটিয়াছে পুবের দিকে

হরেকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি চলিয়াছে, প্রাণটি হাতে লইয়া। সে বেশী দূর যায় নাই—হঠাৎ তাহার পা পড়িল কিসের উপর! একটা শব্দ করিয়া—সেটা হরেকৃষ্ণের পায়ে কামড় দিতেই সে লণ্ঠন ফেলিয়া সশব্দে রাস্তার উপর পড়িয়া গিয়া কাঁদিয়া উঠিল, ওরে বাপ্‌রে, আমাকেই খেয়েছে রে! ওরে কে আছিস্ রে.........

রাজু বাহিরে আসিয়া হরেকৃষ্ণকে তুলিল। তাহার পায়ে গোটা চারেক বজ্র-বাঁধন দিয়া বলিল, বাড়ি চল।

হরেকৃষ্ণ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তুমি আমার আর জন্মে ভাই ছিলে নিশ্চয়।

রাজু বিনা বাক্যে পথের উপর হইতে মেনকার ঔষধের শিশিটি তুলিয়া লইয়া অধর কুণ্ডুর বাড়ির দিকে চলিল।

হরেকৃষ্ণ প্রলাপ বকিতে বকিতে—তাহার কাঁধের উপর ভর করিয়া চলিতে লাগিল।

বাড়িতে আসিয়া—হরেকৃষ্ণ কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। পরীক্ষার জন্য লোকে তাহাকে নুন খাইতে দিলে বলিল, চিনি;—চিনি খাইয়া বলিল—নুন।

সাপের রোজা আসিল। বাহিরের বাড়িতে সমারোহ পড়িয়া গেল।

হরেকৃষ্ণকে কিন্তু ছুঁচোয় কামড়াইয়াছিল।

রাজু ভিতরে আসিয়া শান্ত হইয়া মেনকার কাছে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঔষধ খাওয়াইল;—মাথায় ব্যাগ দিয়া সেবা করিল।

তখনো সূর্য্য উঠে নাই। ধীরে ধীরে মেনকা চোখ খুলিয়া পরম তৃপ্তির সহিত রাজুর মুখের পানে চাহিয়া বলিল, রাজু দাদা তুমি?

সে পাশ ফিরিয়া শুইয়া রাজুর দুই হাতের মধ্যে আপনার হাতখানি গুঁজিয়া দিয়া চোখ বুজিয়া রহিল।

তাহার ঘরে রাজু কেমন করিয়া আসিল—তাহা ভাবিয়া বাহির করিবার তাহার বড় সাধ গেল; কিন্তু কিছুতেই একটা ঠিকের মধ্যে আসিতে আর পারে না! মনে হইল হয়ত বা কোন দেবতার বরে হরেকৃষ্ণ রাজু হইয়া গেছে!

—ক্রমশ

পঞ্চশরের পঞ্চ শর

শ্রী কালিদাস রায়

ওগো অনঙ্গ, তোমার পঞ্চ কুসুম শরের হউক জয়,
তারা—করেছে প্রিয়ার দেহে নবরূপ সৃষ্টি,
অলিগুঞ্জিত 'চূত মঞ্জরী' কণ্ঠে বিঁধিয়া ব্যর্থ নয়
সে যে—প্রিয়ার বাণীতে মধুধারা করে বৃষ্টি।

প্রিয়ার নয়ন লভি অপাঙ্গে তোমার ধনুর 'নীলোৎপল,'
হলো—আরো মদায়ত মানস হরণে দক্ষ,
অধরে বিঁধিল 'চন্দ্রমল্লী'—হাস্যে ঝরিছে অনর্গল,
বুঝি—ভাঙিয়া দন্তে এক শর হলো লক্ষ।

'অরবিন্দ'টি বিঁধিয়া বদনে দুইভাগে হলো ভগ্ন,
দেখ—ভাগাভাগি ফুটি রহিয়াছে দুটি গণ্ডে,
'অশোক' শায়ক চরণে বিঁধিয়া চির অনুরাগে লগ্ন,
তথা—লাক্ষা হয়েছে ভেঙে গিয়ে শত খণ্ডে।

ওগো অনঙ্গ, তোমার পঞ্চ কুসুম শরের হউক জয়,
হোক্—ভরপূর পুন তোমার ও-তূণ-ভাণ্ড,
মৃগের মতন নয়ন বলিয়া মৃগ ভ্রমে তুমি, হে রসময়,
তারে—মৃগয়া করিতে হের' কি করেছ কাণ্ড?

দেয়াল-ভাঙ্গা

মে মাসের সকাল বেলা; বেশ গরম পড়িয়াছে। ঢালু মাঠগুলির উপর আলিপনা দেওয়ার মত 'আনিমনি' ফুল ফুটিয়াছে। পাহাড়তলীর শেষ দিকটা যেখানে অস্পষ্ট দেখাইতেছে সেইখানে চারিটা কোকিল পরস্পরে পাল্লা দিয়া ডাকিতে শুরু করিয়াছে। 'এল্‌ম' গাছের সারির মধ্যে একটা 'ম্যাগপাই' পাখী বাসা বাঁধিতেছে, আর অনবরত বাজনার মত শব্দ করিতেছে।

এ হেন সময়ে কেজিয়া আন্‌উইন্ ও-পাড়ার বড় গিন্নি মিসেস্ পার্সম্লোভের জন্য একটা ঝুড়িতে করিয়া কয়েকটা উৎকৃষ্ট হাঁসের ডিম ভেট লইয়া চলিয়াছে। তার বাপের হাঁস প্রভৃতি পাখী পালন করার যে ব্যবসায় ছিল তার সুনামের কারণ কেজিয়ারই বুদ্ধি ও পরিশ্রম, এজন্য সারা অঞ্চলটায় সকলেই তাহার নিকটে এ বিষয়ে পরামর্শ লইত। ইহা হইতে যাহা কিছু রোজগার হইত তাহা সঞ্চয় করিবার প্রয়োজন ছিল না, কারণ সে ধনী বাপের একমাত্র কন্যা। সে তাই দিয়া ভালো ভালো পোষাক

কিনিত। তার দেখাদেখি গ্রামের চাষাদের মধ্যে এ বিষয়ে রুচির উন্নতি হইয়াছিল।

আজ তার পরণে একখানি ফিকা-নীল রঙের অতি সুন্দর সূতী গাউন—তার ছিপ্ ছিপে দেহটি বেশ করিয়া বেড়িয়া রহিয়াছে, কোন খানে একটি খাঁজ নাই। গলার নীচে বুক পর্য্যন্ত একখানি চওড়া শাদা লেস্। তার মাস্তুত বোন 'সারা' শহরে একখানি পোষাকের দোকান করিয়াছে—সে তাহাকে একটি প্যারিসের তৈরী হ্যাট উপহার পাঠাইয়াছে, সেইটি সে আজ পরিয়াছে। সেটিকে দেখিলে মনে হয় যেন এক গোছা আপেল ফুল গাছ হইতে খসিয়া সবুজ জমির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে।

এমন সুন্দরী পাত্রীর জন্য যে অনেক বর জুটিবে, ইহা ত' খুবই স্বাভাবিক। অনেক গ্রাম্য যুবক সন্ধ্যার সময় তাহাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিতে লাগিল,—কেজিয়ার বাপের মুখে সেকালের সব গল্প শুনিতে! আসল উদ্দেশ্যটা অবশ্য তার যুবতী কন্যার সঙ্গসুখ ভোগ করা, আর ভেড়ার মত জুল্‌জুল্-চোখে তাহার পানে কেবলই চাহিয়া থাকা। সে অনেকের বিবাহ প্রার্থনা শুনিয়াছে এবং না-মঞ্জুর করিয়াছে। কেমন করিয়া তীব্র পরিহাস অথবা নির্দ্দোষ রসিকতার সাহায্যে হবু-প্রণয়ীর প্রেম একেবারে নষ্ট করিতে হয় তাহা সে এতদিনে বেশ শিখিয়া লইয়াছে। জন্ হ্যান্‌কক্ নামে একটি ছোক্‌রার একবার কি দশা হইয়াছিল তাহা পাড়ার লোকে এখনও বলিয়া থাকে। কেজিয়া নিজে সে কথা কাহাকেও বলে নাই, কিন্তু সেই হতাশ প্রেমিকটি একদিন পাড়ার আড্ডা ঘরে বসিয়া মদের মুখে হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিয়া কথাটা ফাঁস করিয়া ফেলিয়াছিল। একবার দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ কেজিয়াকে কিছুক্ষণের জন্য একা পাইয়া সে ক্ষীণ গদ্‌গদ কণ্ঠে তাঁহাকে নিজের মনোভাব জানাইয়াছিল। সেই কথা শুনিয়া কেজিয়া যেন ভয়ানক ভয় পাইল, কিন্তু অতি কষ্টে বুদ্ধি স্থির রাখিয়া সে আস্তে আস্তে উঠিয়া এক বাল্‌তি ঠাণ্ডা জল আনিয়া হতভাগার মাথায় ঢালিয়া দিয়াছিল। ছোক্‌রা যখন প্রকৃতিস্থ হইল, তখন, পাছে পুনরায় বেসামাল হইয়া পড়ে, এ জন্য এই কঠিন কথাগুলি তাহাকে শুনাইয়া দিল—"বাবা! বাঁচলাম। বাছা আমার!—আমি বলি, বুঝি তোমার হঠাৎ ফিটের ব্যামো হ'ল!"

কেবল একবার তার প্রাণে যেন কেমন একটু লাগিয়াছিল, সে যখন—পাশের গ্রামের এক ছোক্‌রা, রেফ্ পারামুর, তার কাছে ঐ কথাটাই পাড়িয়াছিল। তারা ছুটিতে এক সঙ্গে স্কুলে পড়িত, তারপরেও অনেকদিন তার সঙ্গে বেটাছেলের মত করিয়া নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইত, পাখীর বাসা ভাঙ্গিতে যাইত। কেজিয়ার প্রাণটা যেন অজ্ঞাতে তার দিকে একটু ঝুঁকিয়াছিল, কিন্তু তাহার মুখে ঐ কথা শুনিবামাত্র এমন নিদারুণ ঠাট্টা করিয়াছিল, যে সে আর কখনও তার দিকে ঘেঁসে নাই। ছোক্‌রা মনে করিয়াছিল, তার অবস্থা খারাপ বলিয়াই কেজিয়া রাজী হইল না, কিন্তু সেই অবধি তাহার ভালোবাসা বাড়িয়াই গিয়াছিল। তবু দেখা হইলে সে যেন কেজিয়াকে গ্রাহ্যই করিত না।

বড় রাস্তার মোড়ে যেখানে 'হর্যর্ণ' গাছগুলি খুব ঘন হইয়া উঠিয়াছে সেইখানে দাঁড়াইয়া সে ভাবিতে লাগিল। সোজা রাস্তা দিয়া চলিলে তাহাকে এখনও মাইল দুই হাঁটিতে হইবে, কিন্তু যদি একটু বাঁকিয়া, বেড়ার ভিতর দিয়া, চুণে-পাথরের দেয়াল ডিঙ্গাইয়া সে পথটা সংক্ষেপ করিয়া লয়, তবে বড় গিন্নির বাড়ী পৌঁছিতে সিকি ঘণ্টাও লাগিবে না।

"তাই করি, যা' হয় হবে। সাম্‌নের জমিগুলো ত' রেফ্ পারামুরের! তা' সে কি আজ এইখানেই বসে' আছে? থাকে থাকুগে, আমি আর পারিনে, গরমে মরে' গেলাম!"

এই বলিয়া সে ঝুড়িটা মাটির উপর নামাইল, তার পর গাছের আঁকা-বাঁকা গুঁড়িগুলার ফাঁক দিয়া কোনও

রকমে গুড়ি মারিয়া চলিতে লাগিল। মিনিট খানেকের মধ্যেই সে একটি ছোট নদীর ধারে আসিয়া পড়িল, তার ধারে ধারে অজস্র নানা রঙের ফুল ফুটিয়াছে। নদীটির উৎপত্তি-স্থানে একটা প্রকাণ্ড বেলে-পাথরের তলা হইতে ঝরণার জল লাফাইয়া উঠিতেছে। সেইখানে আসিয়া সে মোড় ফিরিয়া একটি ফটকের দিকে চলিল। ফটক খুলিলেই একটি সবুজ যবের ক্ষেত। সেই ক্ষেতের পাশ দিয়া খানিক দূর চলিয়া সে, সেই প্রথম, একটি উঁচু দেয়ালের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

এই দেয়াল পার হওয়া সহজ নয়। তাহার ও দিকের জমি এ দিকের চেয়ে উঁচু; তার মাথা আল্‌গা করিয়া গাঁথা এবং তাহা কেজিয়ার হ্যাটের সব চেয়ে উঁচু ফুলটাকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কেজিয়ার বয়স এখনও কাঁচা, দেহখানিও খুব চপল ও চটুল, তাই সে ভয় পাইল না। ডিমের ঝুড়িটা একটা শক্ত জায়গায় রাখিয়া সে দেয়াল ধরিয়া উঠিতে লাগিল। যতটা ভাবিয়াছিল, সত্যকার বিপদ তার চেয়ে বেশি, তার পায়ের চাপে চুণে-পাথরের গা যেন পর্দ্দায় পর্দ্দায় ধ্বসিয়া যাইতে লাগিল।

প্রায় দেয়ালের মাথায় উঠিয়া বসিয়াছে, এমন সময় তাহার বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল, কারণ তখন তাহার দেহের ভারে দেয়ালটা দুলিতে সুরু করিয়াছে। ও পাশের উঁচু জমির নরম ঘাসের উপর লাফাইয়া পড়িতেই, প্রায় ছয় হাত গাঁথুনি সবুজ যব ক্ষেতের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল।

সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। ভয় পাইলেও তাহার আরক্ত মুখ দুষ্টামীর খুশীতে ভরিয়া উঠিয়াছে। সে বলিয়া উঠিল, "বেশ হয়েছে! ও টুকু গেঁথে তুল্‌তে রেফ্‌ বেশ একটু জব্দ হবে! আর কারো হ'লে নিজেই গিয়ে বল্‌তাম যে, ও আমারি কাজ, এই নাও মেরামত করবার খরচা দিচ্ছি। কিন্তু এ যখন সেই মুখপোড়ার, তখন ভালোই হয়েছে, আমার গায়ের ঝাল অনেকটা মিট্‌বে।"

হঠাৎ সে সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, কারণ, দেখিল—প্রায় ছোঁয়া যায় এত কাছে, রেফ্‌ পারামুর, একটি ফুলে-ভরা 'ক্র্যাব' গাছের তলায় বসিয়া ঘরের চালার জন্য কাঠের পেরেক ছুলিতেছে। সে মুখ বিকৃত করিয়া হাসিতেছিল—সে যেন একটা দৈত্যের মত বসিয়া আছে।

সে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "কেজিয়া, যা বল্‌লে তা' শুনেছি। কথাগুলো মোটেই ভদ্র নয়। যাই হোক, আমাদের একটা নিয়ম আছে, দেয়াল যে ভাঙ্গে তাকেই তুলে দিতে হয়। তোমাকে ওটা তুলে' দিতে হবে।"

কেজিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া, যেন গ্রাহ্যই করে না এমন ভাবে বলিল,

"আমি পার্‌ব না!"

"কিন্তু পার্‌তে যে হবেই, আমি যে ছাড়ব না!"

কেজিয়ার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল—বলিল,

"এ পর্য্যন্ত কেউ আমাকে একবার 'না' বল্‌লে 'হ্যাঁ' বলাতে পারে নি—তোমার ত' আস্পর্দ্ধা কম নয়! সর, পথ ছাড়,—আমাকে যেতে দাও বল্‌ছি!"

"সে আমি পারব না। তুমি পরের জমিতে ঢুকেছ—সে হুঁস্ আছে? ওই যে কাঠখানায় লেখা রয়েছে "অনধিকার প্রবেশের জন্য অভিযুক্ত করা যাইবে"—তা' কি তোমার চোখে পড়ে নি?"

কেজিয়া প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "আমি এবার চেঁচাবো কিন্তু! তা' হলেই কেউ না কেউ এসে পড়বে।"

"সেটি মনেও কোরো না, কেউ শুন্‌তে পাবে না। তার চেয়ে ভালোয় ভালোয় কোমর বেঁধে কাজে লেগে পড়।"

"তুমি আমাকে আজ ভারি বাগে পেয়েছ—না! আমি সাতজন্মে যে কাজ করি নি, তাই আজ আমাকে দিয়ে করিয়ে নিতে চাও?—নির্দ্দয় পশু কোথাকার!"

রেফ্‌ পারামুর কেমন একটা অর্থহীন স্নেহ-দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল,

"এতে তোমার উচিত শিক্ষা হবে, কেজিয়া। একদিন তুমি আমার বড় অপমান করেছিলে, আজ আমি তার শোধ তুল্‌ব। ওই বড় পাথরগুলো আগে তুল্‌তে হবে— নাও, চট্‌পট্‌ লেগে পড়।"

সেই বিবাহ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার পর আজ এই প্রথম কেজিয়া তাহার চোখে চোখ তুলিয়া চাহিল। রেফ্‌ তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলাইয়া লইয়া শক্তভাব ধারণ করিল। সে যে সত্যই এত সুন্দর তাহা যেন কেজিয়া এতদিন জানিত না—আজ তাহার সেই জ্যাকেট ও ওয়েষ্টকোট্‌-খোলা দেহের উপর শাদা ধব্‌ধবে ঘর্ম্মসিক্ত শার্টখানি দেখিয়া কেজিয়া বুঝিতে পারিল, আশপাশের সকলগ্রামের মধ্যে পুরুষ-নামের উপযুক্ত যদি কেহ থাকে, তবে সে এই!

সে তখন তাহার দুই হাতের হলুদ-রঙের দস্তানা খুলিয়া ফেলিল। তাহার ঠোঁট দুখানি ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল, সে কাঁপুনির অর্থ বুঝা দুষ্কর—সে হাসিবে কি কাঁদিবে নিজেই ঠিক করিতে পারিল না, তাহার চোখ দুইটি যেন জ্বলিতেছে!

একবার অস্ফুট স্বরে বলিল, "তোমাকে আমি দু' চক্ষে দেখ্‌তে পারি নে! আচ্ছা, যদি করতেই হয়, তবে না হয় করি। কিন্তু এত পরিশ্রমে আমি বাঁচ্‌ব না।"

শুনিয়া রেফ্‌ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "সে পাপের বোঝা আমি বইতে চাইনে। কাজটার মধ্যে যেটুকু বেশী মেহন্নৎ, সে না হয় আমিই করব। বড় বড় পাথরগুলো আমিই তুলবো 'খন, তুমি যে গুলো সব চেয়ে ছোট সেই গুলোই তুলে দিও।"

তাহারা নীরবে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। রেফ্‌ দেখিয়া খুশী হইল যে, কেজিয়া যে পাথরগুলা আনিতেছে তাহা আপেল ফলের চেয়ে বড় নয়, এবং এক একটি আনিতে তাহার পাঁচ মিনিট লাগিতেছে। প্রথম দুই সারি গাঁথা না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ কোনও কথা বলিল না।

অবশেষে রেফ বলিল, এমন ঢিমে-তেতালায় কাজ করলে কাজ সারা হতে যে সন্ধে হয়ে যাবে! এখনই ত' খাবার সময় হ'ল। আমার সঙ্গে রুটি পনির ও বিয়ার মদ আছে—খাবে? ওই গাছ তলায় রেখেছি—চল, ভাল করে খাওয়া যাক্‌।"

কেজিয়া অতি মৃদু স্বরে বলিল, "লোকে শুনলে বলবে কি? আমি সে কিছুতেই পারব না।"

রেফ্‌ অতি দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "পারতেই হবে! আমি কাউকে বলে দেব না।"

সুতরাং তাহাকে বাধ্য হইয়া খাইতে হইল। রুটি ও পনির তাহার গলায় বাধিতে লাগিল, বিয়ার সে খাইল না বলিলেই হয়! সে তখনই আবার কাজ করিবার জন্য উঠিতে গেল. রেফ্‌ তাহাকে ধরিয়া আরও কিছুক্ষণ পাশে বসাইয়া রাখিল।

"খাওয়ার পরে একটু পাইপ না খেলে আমার চলে না। ততক্ষণ বসে' বসে' ছেলেবেলাকার গল্প করি এস। একবার একটা 'হার্ণ' পাখী মেরে তার ঝুঁটিটা কেটে তোমায় দিয়েছিলাম—মনে পড়ে? পাখীটা গাছে আটকে গিয়েছিল—হ্যাসপ্‌ বাগানের সব চেয়ে উঁচু গাছের মগ্‌ডালে উঠে' আমি সেটাকে নামিয়ে এনেছিলাম।"

কেজিয়া অতিশয় ক্রোধভরে বসিয়া রহিল—এই সব মন-ভুলানো কথা তাহার আদৌ ভাল লাগিতেছিল না। একটু পরেই সে জোর করিয়া উঠিয়া আবার পাথর কুড়াইতে লাগিল, এবার সে আরও মন দিয়া কাজ করিতে লাগিল। কিন্তু যে কারণেই হোক, কেজিয়া যতই তাড়াতাড়ি করে, রেফ্‌ ততই কাজে ঢিল্‌ দেয়! বেলা যখন চারিটা বাজিল তখন গর্ত্তটার অর্দ্ধেক মাত্র সারা হইয়াছে!

এবার সে সত্য সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল—শুনিতে পাইয়া রেফের নিশ্বাস আরও দ্রুত পড়িতে লাগিল। সে অতি কোমল কণ্ঠে বলিল,

"কেজিয়া, ভাই, তোমাকে বড্ড খাটিয়ে নিয়েছি! আচ্ছা, তুমি তবে যাও, বাকিটুকু আমি একাই সেরে ফেল্‌তে পার্‌ব।"

সে কথায় কাণ না দিয়া কেজিয়া তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া আরও শীঘ্র শীঘ্র পাথর তুলিতে লাগিল। তার এই জিদ দেখিয়া রেফ্ও হাত চালাইয়া দিল। আর দুই ঘণ্টার মধ্যেই দেয়াল গাঁথা শেষ হইল।

তখন কেজিয়া তাহার ঝুড়িটা তুলিয়া লইয়া বাড়ীর দিকে চলিল। তাহার মুখে আর বাক্য ছিল না, মাথাটি যেন সম্মুখে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। রেফের ভয় হইল, বুঝি সে একটু বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছে। সে জন্য সে প্রাণে বড় দুঃখ পাইল।

সে দ্রুতপদে তাহার পিছু লইল এবং ফটক পার হইবার পূর্ব্বেই তাহার পার্শ্বে আসিয়া পৌঁছিল।

সে আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "কেজিয়া, আমায় ক্ষমা কর!" কেজিয়া ঝুড়িটি মাটিতে নামাইয়া নিজের হাত দু' খানি তাহাকে দেখাইল,—স্থানে স্থানে নোনছা পড়িয়াছে, আঙুলের মুড়িগুলায় রক্ত পড়িতেছে! রেফ্ চক্ষে অন্ধকার দেখিল।

"কি দুঃখই তোমায় দিয়েছি, কেজিয়া! আমায় ক্ষমা কর,—করবে না?"

হঠাৎ কেজিয়ার মুখখানা প্রসন্ন হইয়া উঠিল,—বাধ-বাধ কণ্ঠে বলিল,

"তুমি একটি পাষণ্ড! তবু তোমায় আমি ক্ষমা করলাম। আর কখ্খনো তোমার দেয়াল আমি ভাঙবো না।"

রেফ্ আরও নিকটে আসিয়া তাহাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া ফেলিল। বলিল,

"তোকে ভালোবাসি বলেই ত' এ কাজ করেছি, নইলে করতাম কি?"

"আচ্ছা, আচ্ছা, রেফ্! তোমারই জিৎ।" বলিয়া কেজিয়া তাহার মুখে চুম্বন করিল। রেফ্ তাহার সঙ্গে সঙ্গে পথ দেখাইয়া চলিল। *

অনুবাদক—শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

* ইংরাজী হইতে

বিস্মরণী *

প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যখন মোহিত-বাবুর প্রথম কবিতা গ্রন্থ 'স্বপন-পসারী' প্রকাশিত হয় তখন রসিক-সমাজে তাহার বিশেষ আদর হইয়াছিল। কবিযশপ্রার্থী মোহিত-বাবু উপহসিত হইয়া ফিরেন নাই—গুণীজন-সমাজে তাঁহার আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কোন বিশেষ সময়ে ঘটনাচক্রে সুনামার্জ্জন হয়ত অনেকের পক্ষেই সম্ভব, কিন্তু চেষ্টায় ও চারিত্র্যে তাহা অক্ষুণ্ণ রাখাই সুকঠিন। গত ফাল্গুনে প্রকাশিত তাঁর দ্বিতীয় কাব্য-গ্রন্থে কবি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন অবলীলায়। কবিজনোচিত বিনয়ে যে-কবিতাগুচ্ছকে তিনি বনফুল আখ্যা দিয়াছেন, তাহা স্বচ্ছন্দজাত হইলেও সযত্নপালিত—সুনির্ব্বাচিত সে-ফুলে-রচা মালা রূপ ও সৌরভের আধার।

* বিস্মরণী—শ্রী মোহিতলাল মজুমদার প্রণীত ও প্রবাসী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২॥০।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের মোহিত-বাবু নাম দিয়াছেন নামকরণের একটা বিশেষ সার্থকতা আছে—রচয়িতার মনের পরিচয় যেন তাহার ভিতর দিয়াই আভাষে ইঙ্গিতে ধরা পড়ে। মানুষ স্বপ্ন দেখে, ত্রিযামা যামিনী বিস্মরণী মণির খোঁজ করিয়া ফেরে তখনই, যখন বাস্তব জীবনের শোক দুঃখ পরাজয় লাঞ্ছনার বিষম রূঢ়তায় অনুভূতি-প্রাণ সূক্ষ্ম মনটি বিরস তিক্ত হইয়া যায়—ক্ষুদ্র, খর্ব্ব, সঙ্কীর্ণ সংসারের গণ্ডীর মাঝে প্রাণের সুবিপুল আকুতি যখন অবরুদ্ধ গতিপথে নিজের মধ্যে গুমরিয়া মরে—যখন যাহা কিছু সম্ভব, সার্থকতার সকল আয়োজন সত্ত্বেও, যেন না ঘটিয়াই অকস্মাৎ থামিয়া যায়। স্বপ্ন দেখার ইহাই তো কৈফিয়ৎ। স্বপ্নবিহ্বলতা দোষের হইতে পারে, তা বলিয়া স্বপ্নমাত্রই কিছু অবহেলার সামগ্রী নয়। বনস্পতির বীজ-রূপের মত জীবনের বহু সার্থকতাই তো স্বপ্নরূপী। মানুষের এই সভ্যতা সম্ভব হইয়াছে, সার্থকতার পথে চলিয়াছে, সে শুধু দেশ বিদেশের বহু মনীষী ও কর্ম্মীর স্বপ্ন দেখিবার উপায় ও সাহস ছিল বলিয়াই।

কবির স্বপ্ন দেখিবার ভঙ্গীটি বড় বিচিত্র! রূপকথার রূপসন্ধানী অন্যমনস্ক রাজপুত্র জলখেলার অবকাশে কোন্ গোপন রহস্যের টানে সাগরতলে পাতালপুরীতে নামিয়া যায়—স্ফটিকে মুক্তার গঠিত সে এক বিচিত্র পুরী; আর মণি-শতদলের মাঝখানে বসিয়া কুঁচবরণ কোন্ এক অপরূপ রাজকুমারী, যেন তাহারই প্রতীক্ষা করে! বাহিরের কলহ-রোলে দীর্ণচিত্ত কবি-প্রাণ বুঝি নিজের মানস গহনে অন্যমনে এমন করিয়াই তলাইয়া যায়—মানস লক্ষ্মীর কোন্ নিগূঢ় আকর্ষণ-রভসে।

> সেথা সুখ নাই, দুখ নাই সেথা
> —দিবা কি নিশা,

সেথায় এক অপূর্ব্ব প্রদোষের আলো-অন্ধকারে রূপের আরতি চলে, কত বিরহের বেদনা, মিলন-সম্ভাবনার কত রাঙা উৎসব ঘনাইয়া উঠে, আর

> তাহারি আবেশে উথলিল সুধা-
> মন্থন অম্বুধি!

মিলনমাত্রই সৃষ্টি-গর্ভ। অলখ-আলোকে সে নারী-অপ্সরীর মিলন-রভসে প্রেরণা জাগে—সর্ব্ব দেহ মন, সকল কামনা ও শক্তি সংহত সংযত হইয়া গানের মধ্যে ফুটিয়া উঠে—

> যে রূপ নেহারি' আমি রৌদ্রদীপ্ত নীলাম্বরে
> ফুকারিব সৃজনের গান
> সর্ব্বদেহে সঞ্চারিবে আদিম আহ্লাদভরে
> বিধাতার প্রয়াস মহান্!
> ছায়া যত কায়া হয়ে বিহরিবে ধরণীতে,
> চেতনার পূর্ণ অবতার—
> মানস নিখিলে কোথা অনালোক সরণিতে
> করিবে না বিদেহ-বিহার।

এই সাধ, এই ধ্যানে

> ......অঙ্গে মোর জাগিল যে
> স্ফুরৎ কদম্ব শিহরণ
> দেহ হতে দেহান্তরে বাঁধিলাম কি সহজে
> প্রীতি-প্রেম-সেতুর বন্ধন।

কিন্তু এ মিলন-বাসর তো স্থায়ী হয় না। দিনান্ত-বরষায় অকাল সন্ধ্যার ছায়ায় সব কিছু অস্পষ্ট হইয়া পড়ে, প্রাণভরা গানে হিমেল হাওয়া লাগে—বুকের আগুন জুড়াইয়া যায়। সবই যেন স্বপ্ন বলিয়া কত দ্বিধা কত সংশয় মনের ভিতর ভিড় করিয়া আসে; আত্ম-অবিশ্বাসের সেই দুর্দ্দিনে বারে বারে মনে হয়

> এসেছিনু পথ ভুলে'—
> নয়নে ভরিতে নিশার নিদালি
> আতপ উৎস-কূলে...

প্রাণ ভরা গানে সন্দেহ জাগে

> হয়ত' মনের এ মকরন্দ
> সত্যের সুধা নয়—

সকল পাওয়ার মাঝখানে এই যে হারাইয়া ফেলা, সৃজনের মধ্যে ধ্বংসের এই নিষ্ঠুর দুঃখ দ্বন্দ্ব নিরাশা—ইহাই তো মানবের চিরন্তন ব্যথা!

কিন্তু নূতন পথে চলার যে দুর্দ্দম সাহস, স্বপ্নকে সার্থক

করিবার যে সুবিপুল শক্তি, সকল বঞ্চনার মধ্যে প্রাণে বাসা বাঁধিয়াছে যে আশার নেশা, তাহার আলোকে

রাখীটির মত রাঙ্গা হয়ে উঠে
জীবনের ক্ষতি ক্ষয়।

গানের সুরে ব্যথার বোঝাও বুঝি হাল্কা হইয়া যায়। চিত্তশতদলবাসিনী যে নারী-অপ্সরী বাহির ভুবনে ধরা দিল না, গানের আড়ালে নূতন করিয়া তাহার সাড়া মেলে। সুরের প্রেরণা বুঝি তাই মরিয়াও মরে না। গানের উৎস খুলিয়া যায়, আর তাহারই মধ্যে সন্ধান মেলে বিস্মরণী মণির! প্রাণের আশ্বাসে কবিচিত্ত উন্মুখ হইয়া উঠে, নিজের হৃদয়-ভাব অপরের করিয়া তুলিতে ইচ্ছা হয়, কারণ তাহারই মধ্যে মেলে সুমধুর সান্ত্বনা, সুমহৎ গৌরব। এ গান শুধু মুগ্ধ করে না, মমতা জাগায়—সহানুভূতির নিগূঢ় সূত্রে শিল্পী ও দরদী বাঁধা পড়ে। মনে হয় কূলহারা সাগরে নিরুদ্দেশ-যাত্রী দুইখানি তরণী যেন কোন্ শুভক্ষণে মুহূর্তের মত কাছাকাছি আসিয়া ঠেকে, আর বিভিন্ন যাত্রা-পথে ক্ষণিকের সে স্পর্শ-স্মৃতি চিরকালের হইয়া যায়!

বিভিন্ন সময়ে ও মানসিক অবস্থায় রচিত হইলেও একটি কেন্দ্রগত ধারণা, একটি বিশিষ্ট অনুভূতি মণিমালার মধ্যে সূত্রের মত এই খণ্ড কবিতাগুলিকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে একটি সুষমাগাঢ় বন্ধনে, বহু বিচিত্রকে বিধৃত করিয়াছে একটি সুবলয়িত সামঞ্জস্যে।

বুদ্ধি ও কল্পনায় যাহা তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন, অন্তরের রসে যাহা শোধন করিয়াছেন, প্রকাশ ভঙ্গিমায় যাহা বিচিত্র করিয়াছেন, সে মূল ধারণা, সে বিশিষ্ট অনুভূতি হইতেছে কবির জীবন-প্রীতি। জীবনকে যৌবনকে তিনি ভালবাসিয়াছেন নির্ব্বিচারে। লাভ ক্ষতি, জন্ম মৃত্যুর সমস্ত ঘাত প্রতিঘাত, দুরপনেয় সকল বিক্ষোভ-দাহনের মধ্যেও জীবনের প্রতি প্রীতি তাঁর অচলা—

জীবন সৌভাগ্য তোর নাম পরমায়ু
আনন্দ বিহ্বল বিধি একবার নির্ব্বিচারে করিয়াছে দান—
ওরে ভাগ্যবান!

অনেক অজানা ও অনিশ্চিতের মাঝখানে একমাত্র নিশ্চিত জানিয়া মুগ্ধ শিশু যেমন অদক্ষিণা জননীকেও পরম নির্ভরে আত্মসমর্পণ করে; মজ্জমান ব্যক্তি যেমন অঙ্গুলিমাত্র ধারণক্ষম মাটিটুকুকেই পরম শরণ জ্ঞানে দেহ-মনের সমস্ত শক্তিতে আশ্রয় করে, ধরণীকে কবি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তেমনি নির্ভরে, জীবনকে আশ্রয় করিয়াছেন তেমনি আশ্বাসে!

ধরণীর স্তবগানে কবি মুখর। তাহার শ্যাম মুখখানি ঘিরিয়া তাঁহার ব্যথার আরতির আর শেষ নাই—

যত সে কাঁদায় তত বুকে বাঁধি, তত তারে ভালবাসি
ধরণীর এই শ্যাম মুখখানি, আঁধার অলকরাশি।
জয়ের স্বপন এত দেখি, তবু চাহি না তো নিশি-ভোর,
ভাঙ্গে না যে ঘুম-ঘোর!
ঢলে পড়ি যবে বিষ-হাসি হাসে রূপসী সর্ব্বনাশী!'

নরলীলার এ মাতৃঅঙ্ক, এই প্রত্যক্ষ ভুবন—

একমাত্র সত্য এ যে!—ধরণীর এই দ্বীপ মিথ্যা পারাবারে—
মুক্তি তীর্থ মৃত্যু-কারাগারে!'

কোটি-জীব-কল্লোলিত এ ধরণীতে মানুষ বুঝি মানুষের গৌরব ভুলিয়া গেছে, অসংখ্য জন্মমৃত্যুর ভিড়ে নরজীবন বুঝি সুলভ হইয়াছে! কবি কিন্তু ভুলিতে পারেন নাই—

আলোকে পড়িল ছায়া, কত কল্প নিরাকার থাকি'!—
অনঙ্গ লভিল অঙ্গ, এড়াইয়া সংহারের আঁখি!'

দেহের উপর তাই কবির অখণ্ড প্রীতি অসীম মমতা—

হায় দেহ!—নাই তুমি ছাড়া কেহ—
জানি তাহা প্রাণে-প্রাণে,
মুরতি-পাগল মনের মমতা
তাই ধায় তোমা পানে।
তোমারি সীমায় চেতনার শেষ,
তুমি আছ তাই, আছে কাল দেশ
দুঃখসুখের মহা পরিবেশ!—

—একবার হলে গত
এ ছায়া আলোকে আর গড়িবে না
কান্নাখানি তার মত।

মরণ তাই কবিচিত্তে এক একবার শঙ্কা জাগায়—

ভয়, পাছে থেমে যাই গতিহীন অবশ চরণে

। হারাই যদি।—যদি মরি সুচির মরণে।

জীবনের উদ্যানে মরণের ফুল যে বড় হইয়া ফুটিয়া আছে! কে জানে

এই চির সুন্দরের রূপ-হর্ম্যে ফিরিব আবার?
কক্ষে কক্ষে সবিস্ময়ে খুলিব কি ইন্দ্রিয়-দুয়ার?

তাই বুঝি দণ্ডদুই দেহ ধরিয়া পূর্ণ অবতার হইবার দুর্লভ কামনায়

জীব যেন শিবেরও অধিক!

এ শঙ্কা, এ সংশয় থাকিলেও কবি মৃত্যু-ভীত নহেন। দেহহীন, স্নেহহীন, অশ্রুহীন বৈকুণ্ঠে অমৃতের লোভ তাঁহাকে বিচলিত করে না; বরং সে অন্তহীন আয়ুর তুলনায় মৃত্যুও শ্রেয়, কারণ তাহারি মধ্যে জাগিয়া আছে 'নব-জনম-আশ্বাস'। স্থলে জলে অন্তরীক্ষে নিয়ত সহস্র সংগ্রামের মধ্যে নূতন করিয়া ফুটিবার উন্মাদনায় জীবাণুরা যেন মরণ-পাগল!

সহস্র মৃত্যুর 'পরে জীবনের উড়িছে নিশান
মৃত্যুর নাহিক শেষ, দুঃখময় জীবনের নাহি অবসান—

নাই থাক্। ব্যথা-নিরাশায়, দুঃখে ও মৃত্যুতে মানবের যাত্রাপথ বন্ধুর কণ্টকময় হউক, মানুষের দুর্বোধ্য নিয়তি অন্ধকার রাত্রির মত ঘনাইয়া থাক্, তবু যেন মর্ত্ত্যে এই 'আনন্দের ক্ষণ-অধিকার' মানুষের পরম সৌভাগ্য!

তিনি বুঝিয়াছেন—'এ জীবনে সত্য শুধু কামনাই'—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের বিরাট চলাচলের মধ্যে তিনি দেখিয়াছেন কামনার দুর্ব্বার দুর্জ্জয় লীলা—'লোকে লোকে কল্পে কল্পে কামনার দৃপ্ত অভিযান'! এ কামনায় শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই—আছে শুধু জ্বালা আর ব্যথা—

চিরদিন মধু করে মধুর বঞ্চনা!
করাঙ্গুলি ক্ষত হয়.........

যাহাকে রোধ করা চলে না, অস্বীকার করিবার উপায় নাই, তাহাকে মানিয়া লইতে হয়, তাহার সঙ্গে আপোষ করিতে হয়। তবু তাহারই মধ্যে কি সান্ত্বনা মেলে না?

সে বেদনা কণ্ঠে মোর গীত হয়ে বাজে
ব্যথায় বৃহৎ হয়ে সে ফুল বিরাজে!
অশ্রুজলে আর্দ্র হয় জীবনের এ মরু-সাহারা
প্রাণের পিরীতি মোর হয় নিরঞ্জনা।

আপাত বিফলতার বুক জুড়িয়া এ এক বিপুল সার্থকতা! তিনি জানিয়াছেন—

..................প্রাণের খেলায়
দুঃখেরে ডরে না কেহ, দুঃখে তবু হাসিছে সংসার!

কিন্তু একদল মানুষ, যাহারা এই প্রাণের খেলা হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিল, কামনার লীলাকে নিয়তির ক্রূর পরিহাস বোধে জন্মজরাকূপ এড়াইবার প্রয়াস পাইল, কোন্ ভবিষ্য লোকে অন্তহীন আয়ুর লোভে কত কৃচ্ছ্র সাধন করিল, চির-মরণ-পিপাসায় এ জীবনে উপবাসী থাকিয়া গেল, তাহাদের উপর কবির কোন শ্রদ্ধাই জাগিল না। মানুষ হইয়া জন্মিয়া বুঝি মনুষ্যত্বের পূর্ণ গৌরব হইতে তাহারা বঞ্চিত হইয়া রহিল!

বড়ই বিচিত্র যে সুদূর অতীতে বাংলার এই শ্যামল প্রাঙ্গণে এক সুরসিক কবি-কীর্ত্তনীয়া মানুষের জয়গান করিয়াছিলেন মুক্তকণ্ঠে—মানুষকে ঠাঁই দিয়াছিলেন সবার উপরে। তারপর কত শতাব্দীর সূর্য্য অস্ত গেল—এদেশে মানুষ যেন মানুষের গৌরব ভুলিয়া গেল। গুরু-পণ্ডিত, পাণ্ডা পূজারীর অজ্ঞতার অত্যাচারে, শাস্ত্র ও সংহিতার অন্যায় বিধি নিষেধের জঞ্জালে মানুষের আত্মা খর্ব্ব হইল, সামান্য হইয়া গেল। যাহারা বা জানিল বুঝিল তাহারাও বুঝি স্পষ্ট করিয়া সে কথা বলিবার সাহস পাইল না। কিন্তু চিন্তার তো মৃত্যু নাই—আত্মার মত ভাব যে কাল-জয়ী। বহুদিনের হারানো সেই প্রাচীন কবির সহজ-উপলব্ধি বাংলার কবি ও সন্ন্যাসী মনীষা ও সাধনায় মন্ত্রের মত নূতন করিয়া লাভ করিয়াছেন—নরের মধ্যে নারায়ণের চিরন্তন লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মানুষের

গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহাই হইল এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণী।

কবি এই যুগেরই মানুষ। এই ভাবের আবহাওয়ার মধ্যে তিনি বর্দ্ধিত হইয়াছেন—এই মন্ত্রে তিনি প্রেরণা পাইয়াছেন। যুগকে তিনি অতিক্রম করেন নাই, যুগ-ধর্ম্মকে তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। এ যুগের বাণী তাই নূতন সুরে অপূর্ব্ব ছন্দে বারে বারে অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার কবিতায়, নিজস্ব ভাবানুভূতির বিচিত্র রসে নানা ব্যঞ্জনায় অলঙ্কারে হিল্লোলিত হইয়াছে তাঁহার প্রতি ছত্রে।

যে কোন শিল্পের সহজ পরীক্ষা হইতেছে ভাব-সঞ্চারের সফলতায়। শিল্পীর যে অনুভূতি ভাবরসে লক্ষণা-ব্যঞ্জনায় রংয়ে রেখায় প্রতীক মূর্ত্তিতে রূপ ধরিল, দরদী শ্রোতা পাঠক বা দর্শকের মনে যদি যথাযথ সেই অনুভূতি জাগে, তবে নিঃসন্দেহ বলিতে হইবে যে শিল্প-সৃষ্টি সার্থক হইয়াছে। গণপ্রিয় মানুষ নিঃসঙ্গ থাকিতে ভালবাসে না, থাকিতে পারেও না; আচারে ব্যবহারে ভাষায় শিল্পে মানুষ মানুষের সহানুভূতির কাঙ্গাল। এক-জনের কাছে যাহা সত্য বা মিথ্যা, দুঃখ বা সুখ, অপর পাঁচজনের কাছে তাহা যাচাইয়া লইবার মানুষের কি বিপুল প্রয়াস! শিল্পের জন্মকথা এই প্রয়াসের মধ্যেই নিহিত। আত্মায় আত্মায় এমন মিলন বুঝি আর কিছুতেই সম্ভব নয়, তাই যুগে যুগে মানুষ এমন করিয়া নিজের ভাব প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছে, যাহাতে দেশ-কালের সকল ভেদ বাধা দূর করিয়াও পরের কাছে তাহা যথার্থ বলিয়া অনুভূত হইতে পারে। মানুষের এ চেষ্টা যে সার্থক হইয়াছে তাহা তো সবায়ের জানা কথা।

ভাব সঞ্চারে মোহিত-বাবুর চেষ্টাও স্থানে স্থানে অনিন্দ্য—জীবনের লীলা-বৈচিত্র্যে তিনি মুগ্ধ—

> নিঃসঙ্গ হিমাদ্রি-চূড়ে জ্বলিয়াছে হর-কোপানল,
> মদন হয়েছে ভস্ম, রতি কাঁদে গুমরি' গুমরি'!
> উমা সে গিয়েছে ফিরে, অশ্রু-চোখ ম্লান ছল-ছল—
> ফুলগুলি ফেলে গেছে ঈশানের আসন-উপরি;
> আঁখিতে আঁকিয়া গেছে অধরোষ্ঠ—পক্ব বিম্বফল!
> শ্মশানে পলায় যোগী তারি ভয়ে ধ্যান পরিহরি'—
> বধূর দুকূলে তবু বাঘছাল বাঁধা পল—আহা মরি মরি!

নারীর রমণীত্বের উপাসক কবি এক নিশাশেষে জায়ার মধ্যে জননীর মহিমা নূতন করিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন—

> ঘুম-ভাঙ্গা আঁখি হেরিছে স্বপন
> অনিমেষে
> স্বরগ সুধার রসাবেশে!
>
> বধূ ও জননী পিপাসা মিটায়
> দ্বিধাহারা
> রাধা ও ম্যাডোনা একাকারা!
> অধরে মদিরা, নয়নে নবনী
> এ কি অপরূপ রূপের লাবনি!
> সুন্দর! তব এ কি ভোগবতী
> মরম পরশী
> রসধারা!
>
> বধূ ও জননী পিপাসা মিটায়
> দ্বিধাহারা।

চিত্র ও সঙ্গীতের অপূর্ব্ব সমন্বয়ে ভাব কি বিচিত্র হইয়াই ফুটিয়াছে! সাহিত্যের এই দুই উপকরণ মোহিত-বাবু সুকৌশলে আয়ত্ত করিয়াছেন। চিত্র যেমন তাঁহার ভাবকে সুস্পষ্ট ও সুচারু আকার দিয়াছে, সঙ্গীত তেমন তাহাকে গতি দিয়াছে, তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে—প্রতিদিনের পরিচিত কত আপাত-সামান্যকে অসামান্য করিয়া তুলিয়াছে।

কবি-কর্ম্মে মোহিত-বাবুর যে কোন ত্রুটি নাই এমন কথা বলিতে পারি না—ত্রুটি আছে, অসম্পূর্ণতা আছে।

মনের গহনে যখন মানস লক্ষ্মী 'পা টিপে বেড়ায়' তখন হাস্য সম্বরণ কঠিন হইয়া উঠে, 'কলজেখানাকে

কাবাব' বানাইবার 'বদ্‌লেয়ারী' (Baudelaire) বীভৎস চেষ্টায় মন বিরস হইয়া পড়ে, শব্দাড়ম্বর পদ-যোজনা কর্ণ-পীড়া দেয়, অপ্রচলিত বিদেশী শব্দের অনাবশ্যক সমাবেশে বিরক্তি জাগে...রুধির-ধর্ম্মের ব্যাখ্যানে যৌবনের দুরন্ত ক্ষুধা যেন মাঝে মাঝে প্রকট হইয়া পড়ে.........। কিন্তু এ অসম্পূর্ণতাকে বৃথা বড় করিয়া দেখিয়া লাভ কি? ব্রণটাকে বড় করিয়া দেখিলে আকাঙ্ক্ষিত রূপ দর্শনে অন্তরায় ঘটিবার সম্ভাবনাই বেশী!

বহিঃসৃষ্টি যেমন তাহার ভালোমন্দ অসম্পূর্ণতা লইয়া চিরদিন ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে, বিশ্ব সৃষ্টির সহিত মানুষের মনের নিগূঢ় সম্বন্ধের বিপুল রহস্যময় কথাটিও তেমন অন্তরের বাহিরে আসিবার অনন্ত প্রয়াস পাইতেছে। আলোচ্য কাব্যে এই সম্বন্ধের পুলক, বিস্ময়, ব্যথা, অনুভূতির আন্তরিকতায় ও প্রকাশ-সৌন্দর্য্যে যে-পরিমাণে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে কবি-কর্ম্মে সেইটুকুই কৃতিত্ব—মোহিত-বাবুর কবিত্ব সম্বন্ধে সেইটুকুই সত্য।

শ্রী আনন্দসুন্দর ঠাকুর

নারীমেধ

শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

গুরুদেব তখন বাঁচিয়া ছিলেন—

গুরু-মা বলিতেন, "তোমার অবর্ত্তমানে...বলতে নেই...আমায় কিন্তু পথে দাঁড়াতে হবে, বুঝতে পারছি।"

হইলও তাই। গুরুদেব হঠাৎ মারা গেলেন। মাস-খানেক্ পরেই গুরু-মা তাঁহার ছোট ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া ভিক্ষায় বাহির হইলেন।

ভিক্ষান্নেই দিন চলে।

সে বছরও অমনি বাহির হইয়াছেন। পথেই বর্ষা নামিয়া পড়িল। বাড়ী ফিরিতে হইলে প্রকাণ্ড একটা নদী পার হইতে হয়। ভীষণ খরস্রোতা নদী। বান না কমিলে নৌকা চলে না। গুরু-মা গুরুতর সমস্যায় পড়িয়া গেলেন।

মনে পড়িল, বাঁকুলিয়া গ্রামের পরাশর ঘোষালের স্ত্রী তাঁহাকে একখানি চিঠি লিখিয়াছিল। লিখিয়াছিল বহুদিন পূর্ব্বে। কাজেই কথাগুলা এখন আর তাঁহার ঠিক মনে নাই। মেয়েটির নাম নয়নতারা।

মেয়েটি বন্ধ্যা; তাহার জন্য খানিকটা আক্ষেপ ত' ছিলই, তাহার উপর একটি ভাইকে সে তাহার কাছে আনিয়া রাখিয়াছে, বিবাহ দিয়াছে,—সুন্দরী বৌ, কিন্তু বরাত এমনি, যে, তাহারও গতিক বেশ ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে না, ছেলেপুলে তাহারও বোধ করি কিছু আর হয় না। এম্‌নি সব নানান্ কথার পর লিখিয়াছিল, ইহার উপায় কি হইতে পারে বলিয়া দিন। দয়া করিয়া একবার পায়ের ধূলা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলে বড় ভাল হয়।

পথের একটা লোককে গুরু-মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাঁকুলিয়া এখান থেকে কতদূর বাবা?"

লোকটা যাহা বলিল, তাহাতে মনে হয় নিতান্ত কাছে।

বলিল, "বেশি দূর্ লয় মা-ঠাক্‌রাণ, কাছেই বেটে!"

বলিয়াই সে আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া দিল, "হুই

যে তালগাছ—হোইখানে একটো গাঁ; তা বাদে হোই যে কয়লা-খাদের ডাগর-ডাগর চিম্‌নি,—ওইখানে বাঁকুলা।”

বলিল বটে, কিন্তু পথ যেন আর ফুরাইতে চায় না।

কয়লা-কুঠির দেশ। চারিদিকে রেলের লাইন, লোহা-লক্কড়ের যন্ত্রপাতি, চিমনি আর ধোঁয়া,—অসমতল প্রান্তরের উপর মাঝে-মাঝে এক-একখানি গ্রাম। গুরু-মা কয়েকবার এখানে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পায়ে-চলার অজানা পথে—এই প্রথম।

বৈকালের দিকে আকাশে আবার মেঘ উঠিল। বাতাস ভারি হইয়া উঠিয়াছে।

বহু দূরের গ্রামগুলা পর্য্যন্ত এতক্ষণ নজর চলিতেছিল; এইবার দৃষ্টির পরিধি ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে।—অন্ধকার!

কিন্তু বাঁকুলিয়া গ্রাম আর বেশি দূরে নয়।

বহুকালের পুরাতন কয়েকটা কয়লা-কুঠি। কোনোটা চলিতেছে, কোনোটা বা বন্ধ।

বন্ধ খাদের চতুঃসীমানায় পা বাড়াইবার উপায় নাই। স্থানে স্থানে ধ্বস্ ছাড়িয়া উপরের মাটি বহু নিম্নে পাতাল-পুরীর অতল গহ্বরে তলাইয়া গেছে। প্রয়োজনের দিনে ইহার চারিদিকে কাঁটা-তারের বেড়া দেওয়া ছিল, রাত্রে লাল রঙের বাতি জ্বলিত,—আজকাল আর সে সব কিছুই নাই। খুঁটি-সমেত তারগুলা খুলিয়া লইয়াছে, বাতিও আর জ্বলে না,—লোভের ও লাভের সংগ্রাম শেষ হইয়া গেছে, ধরিত্রীর বুকটাকে ফোঁপ্‌রা করিয়া দিয়া নিষ্ঠুর ব্যবসায়ীর দল উধাও হইয়াছে।

ছোট-খাটো কয়েকটা ঝোপ-জঙ্গলের মাঝখানে খোয়া ইটের স্তূপ আর ভাঙা চিম্‌নির নিশান দেখা যায়।

তাহারই পাশ দিয়া সরু একটি পায়ে-চলার কাঁচা পথ অত্যন্ত সাবধানে আঁকিয়া বাঁকিয়া উঁচু একটা ডাঙ্গার উপরে গিয়া উঠিয়াছে।—ডাঙ্গার অপর প্রান্তে বাঁকুলিয়া গ্রাম। পরাশরের সাদা ধপ্‌ধপে দালান-বাড়ীখানি সর্ব্ব-প্রথমেই নজরে পড়ে।

কোন রকমে তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া গুরু-মা গ্রামে পৌঁছিলেন। আকাশের মেঘ তখন কাটিয়া গিয়া আবার চারিদিক ফর্সা হইয়া উঠিতেছে। পশ্চাতে কোথায় যেন বৃষ্টি হইয়া গেল। ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল।

গুরু-মা একা ছিলেন না। সাত-আট বছরের ছেলেটি ত’ ছিলই,—সঙ্গে আর একটি মেয়ে,—বয়স প্রায় কুড়ির কাছাকাছি;—চমৎকার চেহারা।

সদর দরজাটা পার হইয়া আসিয়া উঠান হইতে গুরু-মা ডাকিলেন,—

“পরাশর!”

কিন্তু কাহারও সাড়া পাওয়া গেল না।

উপরের ঘরে মনে হইল কাহারা যেন কথা কহিতেছে। ঘর ঝাঁট্ দেওয়ার শব্দ পাওয়া যাইতেছিল।

গুরু-মা আবার ডাকিলেন, “নয়নতারা!”

কথাবার্ত্তা হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল।

“কে গা?”

কিন্তু আর দ্বিতীয় প্রশ্নের প্রয়োজন হইল না, জানালার পথে একবার উঁকি মারিয়া দেখিয়াই নয়নতারা দুম্ দুম্ করিয়া সিঁড়ি ভাঙিয়া নীচে নামিয়া আসিল।

আসিল বটে, কিন্তু তাড়াতাড়ি অতগুলা সিঁড়ি ভাঙিতে গিয়া বেচারা একটুখানি কাৎ হইয়া পড়িল। মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না,—হাঁশ্-ফাঁশ্ করিতেই দম যায়।

কিন্তু আগন্তুকদের অভ্যর্থনার ত্রুটি কিছুই হইল না, পিছন দিক হইতে আর একটি মেয়ে আসিয়া আসন আগাইয়া দিল এবং হাত পা ধুইবার জল আনিবার জন্য তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল।

নয়নতারা ইতিমধ্যে অনেকখানা সামলাইয়া লইয়াছিল। চাবিবাঁধা আঁচলটা গলার কাছে এক ফের্‌তা ফিরাইয়া লইয়া প্রথমেই গুরু-মাকে একটি প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় ঠেকাইল।

গুরু-মার সঙ্গে যে মেয়েটি আসিয়াছিল নয়নতারা

তাহাকে কোনোদিন দেখে নাই; ভাবিল বুঝি গুরু-মার মেয়ে। কিন্তু তাহাকে প্রণাম করিতে গিয়া রীতিমত অপ্রস্তুত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। জিব কাটিয়া দরজার কাছ হইতে মেয়েটি ত' খানিকটা সরিয়া গেলই, গুরু-মাও হাঁ হাঁ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।—"কর কি কর কি নয়নতারা,—চাষার মেয়ে মা, ও চাষা।"

চাষা!

কিন্তু চাষা বলিয়া চিনিবার জো নাই। নয়নতারা অবাক্ হইয়া একবার তাহার মুখের পানে চাহিয়াই ডাকিল, "মায়া!"

মায়া তখন উঠানের একপাশে ঘড়্ঘড়ি-দেওয়া কূয়ায় দড়ি-বালতি নামাইয়া জল তুলিতেছে।

নয়নতারা বলিল, "ওই দেখ মা, আক্কেল দেখ মেয়ের! ভক্তি নেই শ্রেদ্ধা নেই, গুরু-মা এলেন—পেন্নাম কর্, পায়ের ধুলো নে আগে, তা না জল তুলতে গেলেন! এতে কি আর ছেলেপুলে হয় কখনও?—আমার না হয় হলো না, কপাল পুড়েছে; তোদের নিয়ে এলাম, বলি, আহা, ভাইটার হোক্, আমার তবু দেখে সুখ!···না মা, ওকে নিয়ে আর হলো না দেখছি, ভাইএর আবার বিয়ে দেব।"

বাহিরে জল রাখিয়া মায়া ঘরে ঢুকিল।

নয়নতারা বলিল, "এসো! পেন্নাম কর! ভক্তি করে' পায়ের ধুলো নিতে হয় আগে, তাও জানো না কচি খুকি!"

গলায় কাপড় দিয়া হাঁটু গাড়িয়া মায়া একটি প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

তাহার পর যে ভুল নয়নতারা করিয়াছে মায়াও সেই ভুল করিতে যাইতেছিল, নয়নতারা নিষেধ করিল। বলিল, "ওকে নয়, ও চাষার মেয়ে।"

মেয়েটিকে সে আগেই লক্ষ্য করিয়াছিল, চাষার মেয়ে বলিতে আর-একবার চাহিয়া দেখিল।

নয়নতারা বলিল, "দেখছ কি, বসো!" বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে গুরু-মার পায়ের কাছে বসাইয়া দিল, নিজেও বসিল; বলিল, "এই দেখ মা বৌ দেখ!"

ঘোমটাটি মায়ার মাথার উপর দু' ফেরৃতা করিয়া তোলাই ছিল, নয়নতারা আরও খানিকটা তুলিয়া দিয়া বলিল, "কানের এই দুল জোড়াটি, মাথায় ফুল, চিরুণী, কাঁটা, আর গলার এই পাটি-নেক্লেস্ হার,—এই ক'টি আমি দিয়েছি। বাইশ ভরি সোণা, তার আবার বানি আছে।...তবে দিলে কি হবে, বৌএর গুণ কিছু নেই।"

গহনার ঐশ্বর্য্য দেখানো শেষ হইলে মায়া তাহার মাথার ঘোমটাটা আবার তুলিয়া লইল।

গুরু-মা বলিলেন, "বেশ বৌ!"

"যার জন্যে আনা তাই যখন হলো না,—বেশ আর কি করে মা? পঞ্চুর আবার বিয়ে দেব।"

মায়ার সুন্দর মুখখানির পানে গুরু-মা একদৃষ্টে তাকাইয়াছিলেন, নয়নতারার কথা শুনিয়া চোখের পাতা-দুইটি তাঁহার সহসা ভারি হইয়া নীচের দিকে নুইয়া পড়িল।

গুরু-মা সস্নেহে তাহার পিঠের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, "না, বেশ বৌ!"

বলিয়াই তিনি অন্য কথা পাড়িলেন, "পরাশরকে দেখছি না ত? গেছে নাকি কোথাও?"

নয়নতারা তাহার ঠোঁট দুইটি উল্টাইয়া বলিল, "আ—। থাকে নাকি কোনদিন? কয়লা কয়লা করে' ছুটে' বেড়ায়। কারবারী মানুষ। থাক্‌লে চলেও না।"

মায়া এইবার মুখ তুলিল। নয়নতারার কানের কাছে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "ওঁদের জল-খাবার করিগে যাই?"

নয়নতারা বলিল, "তাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, বলি, বলে কি না দেখি।"

মায়া উঠিয়া গেল।

তখনও দরজা পর্য্যন্ত গিয়াছে কি না সন্দেহ, নয়নতারা বলিল, "অন্য বৌ হলে এতক্ষণ কোন্ ছ্যাকে উঠে যেত্তো!"

চাষার মেয়েটি দরজার কাছে বসিয়াছিল। গুরু-মা বলিলেন, "যা মা ছবি, তুইও যা বৌমার সঙ্গে, হাতে-পাতে করে নিগে যা!"

ছবি—!

নামটি বেশ। চেহারার সঙ্গে মানায় ভাল।

নয়নতারা বলিল, "বেশ মেয়েটি। অমনি একটি পেতাম আমি,—মাইনে ভাত কাপড় দিয়ে রাখতাম তাহ'লে।"

কথাটা শুনিয়া গুরু-মা যেন একটুখানি খুশীই হইলেন। বলিলেন, "লোক চাই তোমার? তা বেশ, ওকেও রাখতে পার।"

নয়নতারাও অনেক দিন হইতে একটি ঝি খুঁজিতেছিল। বলিল, "বেশ মা, ভালই হলো। মাইনে ঠিক করে' তুমি ওকে রেখে যাও তাহ'লে।"

রাস্তা হাঁটিয়া পায়ে এক-পা ধূলা জমিয়াছিল, কথায় কথায় গুরু-মা এতক্ষণ উঠিতে এইবার উঠিলেন। জল ভর্ত্তি ঘটি বাল্‌তি দুয়ারের কাছে নামানো ছিল। গুরু-মা দেখিলেন, শান-বাঁধানো প্রকাণ্ড চত্বর, এক পাশে লোহার ঘড়্‌ঘড়ি দেওয়া মস্ত কুয়া, কুয়া-মূলে এক গাদা পায়রা আসিয়া নামিয়াছে, ষষ্ঠীচরণ ইহারই মধ্যে সেইখানে ছুটিয়া গিয়া হাততালি দিয়া পায়রা উড়াইতেছিল।

নয়নতারার সবুর সহিতেছিল না, বলিল, "চল মা চল তুমি ওই মেয়েটিকে এক্ষুণি বলবে চল—!"

বলিয়া মেঝেতে হাত পাতিয়া তৎক্ষণাৎ সে উঠিতে যাইতেছিল, গুরু-মা ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন; বলিলেন, "ও আমার এক রকম বলাই আছে মা, মেয়েটা কম বয়সে বিধবা হলো,—আমার ঘরের কাছেই ঘর।"

গামছা দিয়া পা মুছিতে মুছিতে তিনি আবার বলিতে সুরু করিলেন, "ঘরে ওর কেউ নেই। একটা ভাই আছে, বারো মাস বিদেশেই থাকে। বোনের খোঁজ-খবর নেওয়া দূরে থাক্, নাম-চিন্তেই করে না। কষ্টের আর অবধি ছিল না মেয়েটার। কেঁদে আমার কাছে এসে পড়লো। বললাম, থাক্। এখান-ওখান যাওয়া-আসা ত' করি—ভাল ঘর-টর দেখে রেখে যদি দিতে পারি কোথাও, ত' থাকবি।"

নয়নতারা আশ্বস্ত হইল। কথায় কথায় আসল কথাটাই এতক্ষণ তাহার মনে ছিল না; জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ মা, গুরু-ঠাকুর মরবার সময় তোমায় কিছু বলে' যান্ নি?"

গুরু মা বলিলেন, "কেন বল ত? কি কথা?"

কথাটা বলিতে নয়নতারার একটুখানি লজ্জা করিতেছিল, খানিক্ থামিয়া বলিল, "ওই জন্যেই ত চিঠি লিখেছিলাম······আমায় একটি কবচ দেব বলেছিলেন। সে কবচ নিলে নাকি পড়্‌তি বয়সেও......হবার ত' আশা-ভরসা কিছুই দেখছিনে মা, তবু একবার নিয়ে দেখতাম।"

নয়নতারার মনের কথাটা এতক্ষণে তিনি বুঝিতে পারিলেন। ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "কবচ··না মা, কবচের কথা ত, কিছু বলে' যান নি। তবে আমাদের ষষ্ঠীতলার ফুল একটি তোমায় আমি পাঠিয়ে দেব গিয়ে।"

নয়নতারার চোখ দুইটা সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিল, "ষষ্ঠী? তোমার ষষ্ঠীচরণ বুঝি ওই......তা কবে দেবে? কেমন করে' পাঠাবে? কি করে' খেতে হয়?"

হঠাৎ এতগুলা প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়া গুরু-মা একটুখানি বিব্রত হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, "খেতে হয় না মা, একটি মাদুলির ভেতর নিয়ে ভক্তি করে' ধারণ করো। মায়ের কৃপা যদি হয় ত' হতেও পারে।"

এমন সময় ষষ্ঠীচরণ ঘরে আসিয়া ঢুকিল। মায়ের কাছে আসিয়া কানে কানে বলিল, "আমার ঘুম পাচ্ছে মা, ঘুমোব।"

ছোট ছেলে, অতখানি পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে, ঘুম পাইবারই কথা। গুরু-মা বলিলেন, "ঘুমোও ওইখানে! বলিয়া তিনি ঘরের মেঝেটা দেখাইয়া দিলেন।

"সে কি!"—নয়নতারা কিছুতেই তাহাকে ঘুমাইতে

দিল না, বলিল, "যেমন হয়েছে দু'খানা খেয়েই ঘুমোক্। চল মা, দেখি ওরা কি করছে। চল।"

নয়নতারা তাহাদের লইয়া রান্নাঘরে উঠিয়া গেল।

সাঁই সাঁই করিয়া 'ষ্টোভ্' জ্বলিতেছিল।

কলের উনান দেখিয়া ষষ্ঠীচরণের ঘুমাইবার কথাটা আর মনে রহিল না।

হালুয়া তৈরী হইয়া গেছে, ছবি হেঁটমুখে বসিয়া বসিয়া লুচি বেলিতেছিল, মায়া তখন ঘিয়ের কড়াইটা চড়াইবার উদ্যোগ করিতেছে।

নয়নতারা বলিল, "খান্-কয়েক ভেজে আগে ষষ্ঠী-চরণকে খাইয়ে দাও ত গা। ঘুম পেয়েছে ওর।"

গুরু-মা বসিলেন। বলিলেন, "না মা, তাড়াতাড়ি করো না। কলের উনোন দেখে ঘুম ওর ভেঙে গেছে।"

ষষ্ঠীচরণ উঠিয়া গিয়া গুরু-মার কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "হ্যাঁ মা, কেমন করে' জ্বালে ওটা ?"

গুরু-মা নিজেই জানিতেন না। বলিলেন, "কেমন করে জানব বাছা,—আবার জ্বালবে যখন তখন দেখো।"

নয়নতারা বলিল, "জ্বেলে আমি দেখাব এখন। এ-সব আমার ভাইএর সখ। বললে, দে দিদি কুড়িটা টাকা, একটা আশ্চয্যি জিনিষ আনিয়ে দিই। তারপর বিলেত থেকে না কোত্থেকে আনালে এইটা।"

বলিয়াই সে একবার ছবির দিকে একবার গুরু-মার দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইতে লাগিল। ইচ্ছা, যে, এখনই তিনি তাহাকে এখানে থাকিবার কথাটা বলেন।

গুরু-মা টের পাইলেন, বলিলেন, "ছবি তুই থাক্ এইখানে। খাবি পরবি, তিন চার টাকা মাইনে পাবি। মন্দ কি ?"

ছবি তাহার কালো ঢলঢলে' হরিণের মত চোখ দুটি তুলিয়া গুরু-মার মুখের পানে একবার তাকাইল, তাহার পর ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া হেঁটমুখে আবার তাহার কাজ করিতে লাগিল

আলো আনিতে গিয়া মায়া হোঁচট্ খাইল। নয়ন-তারা কিছুই বলিল না।

ষষ্ঠীচরণকে খাওয়াইয়া দিয়া বলিল, "যাও, তোমরা দোতালায় যাও! ষষ্ঠীচরণকে শুইয়ে দিয়ে বিছানা করে' নাও গে।"

মায়া একা গেল না, ছবিও সঙ্গে গেল।

ষষ্ঠীচরণকে নিজের খাটের উপর শোয়াইয়া দিয়া ছবিকে লইয়া মায়া পাশের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

অনেক দিন পরে মায়ার মুখে আজ হাসি ফুটিল বলিয়া মনে হয়। হাসিয়া বলিল, "বেশ হলো ভাই, থাকো তুমি। তবু মাঝে-মাঝে কথা কয়ে বাঁচব।"

ছবিকে সে যেন দাসী চাকরাণী বলিয়া ভাবিতেই পারিল না।

ছবিও হাসিল। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "থাক্‌ব।"

আলাপ পরিচয় জমিয়া উঠিতে বেশি দেরি হইল না। অনেক দিনের পর কথা কহিতে পাইয়া মায়া আজ অনেক কথাই বলিয়া ফেলিল। সে যে গরীব লোকের মেয়ে, বড়লোকের বাড়ী সুখে থাকিবে ভাবিয়া বাবা তাহার এখানে বিবাহ দিয়াছিলেন,—এই কথাটাই ছবিকে সে অনেক রকম করিয়া বুঝাইয়া বলিল। বলিল, "ভাত-কাপড়ের সুখ আর চাইনে ভাই, স্বামীর সুখও যথেষ্ট পেয়েছি,—এইবার একবার ছাড়া পেলেই বাঁচি।"

ছবি কিন্তু একটি কথাও কহিল না। জানালার কাছে তাহার পায়ের গোড়ায় হেঁটমুখে বসিয়া রহিল মাত্র।

কথার শেষে চোখ দুইটি তুলিয়া সে একবার মায়ার মুখের পানে তাকাইল, কিন্তু বাহিরে তখন মেঘাবৃত

সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার ক্রমশ জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে, মুখখানিও বেশ ভাল করিয়া দেখা গেল না।

সিঁড়ির উপর চটি জুতার শব্দ শুনিয়া মায়া বলিল, "বাবু এলেন।"

ছবি ধড়মড় করিয়া উঠিতে যাইতেছিল, মায়া তাহার হাতে ধরিয়া নিরস্ত করিল। চুপি চুপি বলিল, "বসো। আসবে না। ও-ঘরে আলো আছে।"

কিন্তু চটির শব্দ ও-ঘরে ঢুকিয়াই আবার বাহির হইয়া আসিল। এ-ঘরের সুমুখ দিয়াও একবার পার হইয়া। খাটের আড়ালে অন্ধকারে যে মানুষ বসিয়া আছে, বাহির হইতে কিছুই সে টের পাইল না।

খানিক বাদে পঞ্চু পাশের ঘর হইতে 'দিদি দিদি' করিয়া চেঁচাইতে লাগিল।

রান্নাঘর হইতে দিদি বলিল, 'যাই—।"

গুরু-মাকে সেইখানেই বসাইয়া রাখিয়া হাঁশ্-ফাঁশ্ করিয়া নয়নতারা উপরে উঠিয়া আসিল।

কিন্তু ঘরে ঢুকিয়া দেখে, সাদা ধপ্‌ধপে বিছানার উপর কালো অঙ্গ বিছাইয়া হাত পা ছড়াইয়া পঞ্চু তাহার ভুঁড়ি নাচাইতেছে, আর খাটের এক পাশে মেঝের উপর দুই কানে দুইটা হাত দিয়া ষষ্ঠীচরণ নীরবে দাঁড়াইয়া আছে।

দিদি ঘরে ঢুকিয়াই ষষ্ঠীচরণের দুরবস্থা দেখিয়া একটুখানি সশব্যস্ত হইয়া উঠিল।—"এ কিরে? এ কি? এ যে......"

পঞ্চু বলিল, "বিছানার ওপর শুয়েছিল—কে এ ব্যাটার-ছেলে নবাব?"

"ওরে থাম্ থাম্—গুরুঠাকুরের ছেলে আমাদের। গুরু-মা এসেছেন। আয়, আয়, পেন্নাম করবি—আয়, পায়ের ধুলো নিবি আয়!"

"পায়ের ধুলো? কাল নিলে হবে না?—এই!"

নয়নতারাকে দেখিয়া ষষ্ঠীচরণ তাহার হাত দুইটি কান হইতে সরাইয়া লইয়াছিল, কিন্তু আবার অতর্কিতে আর-এক চড় খাইয়া ভয়ে-ভয়ে সে তাহার হাত দুইটি কানের কাছে তুলিতে গেল; নয়নতারা তাহাকে সরাইয়া দিয়া বলিল, "বৌটার মত বজ্জাত মেয়ে আমি দেখলাম না দুনিয়ায়। কেন বাপু, জানিস্ তুই—পঞ্চু আমাদের রাগী মানুষ,—তবু ইচ্ছে করে'......কেন, ওইখানে আর-একটা বিছানা করে' দিলেই ত হতো। বৌ! বৌ! অ বৌ! কোথায় গেলেন তাঁরা?"

নয়নতারা আবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "একটি ঝি রাখলাম পঞ্চু, দেখবি?—বেশ ভাল মেয়ে—গুরু-মার সঙ্গে এসেছে,—চাষার মেয়ে।"

নয়নতারার ডাক শুনিয়া ছবিকে সঙ্গে লইয়া মায়া তখন ও-ঘর হইতে বাহির হইয়া চুপি চুপি নীচে নামিয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছে।

নয়নতারা ডাকিল, "ছবি! শোনো ত' মা!"

অন্ধকার বারান্দার উপর ছবি থমকিয়া দাঁড়াইল।

নয়নতারা তাহার হাতে ধরিয়া ঘরের ভিতর টানিয়া আনিয়া পঞ্চুর সুমুখে দাঁড় করাইয়া দিল। বলিল, "এই দেখ্—!"

ঝি না ঝি,—পঞ্চু প্রথমে ততটা গ্রাহ্য করে নাই, কিন্তু আড়চোখে ছবির মুখখানা দেখিবামাত্র সে তড়াক্ করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। আঙুল বাড়াইয়া বলিল, "দে ত' দিদি সিগ্রেটের বাক্সটা—ওই যে ওই সাদা জামাটার পকেট থেকে!"

তাহার পর একটি সিগারেট মুখে দিয়া টানিতে টানিতে বলিল, "দোকানদার বেটা বলে কি জানিস দিদি, বলে, দু'পয়সায় একটি সিগ্রেট্—এ এক আপনি ছাড়া এ গাঁয়ে আর কেউ খায় না।"

বলিয়াই সে একবার নয়নতারার দিকে একবার ছবির দিকে তাকাইয়া ফ্যা ফ্যা করিয়া হাসিতে লাগিল।

ঘোড়ার মত মুখ, কিম্ভূত কিমাকার চেহারা,—নয়নতারার ভাই বলিয়া চেনাই যায় না,—মায়ার স্বামী বলিয়া ভাবিতে কষ্ট হয়।

মায়া বোধ করি বাহিরের অন্ধকারে তখনও দাঁড়াইয়া ছিল, ঝুন্ করিয়া চুড়ির শব্দ হইতেই ছবি তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল।

পঞ্চু বলিল, "চল্ দিদি চল্, দেখি তোর গুরু-মা কেমন, একটা পেন্নাম্ ঠুকেই আসা যাক্—চল্

দিন দুই পরে সংবাদ পাওয়া গেল, নদীর খেয়াঘাট খুলিয়াছে, নৌকা চলিতেছে এবং সম্প্রতি আশঙ্কার কোনও কারণ নাই।

চারটি টাকা প্রণামী দিয়া নয়নতারা গুরু-মার পায়ের ধূলা লইল।

পঞ্চু বলিল, "হাতীর মত গরু আমাদের, ঘোড়ার মত উড়িয়ে নিয়ে যাবে।—কতক্ষণ!"

গরুর গাড়ী দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল।

গুরু-মা বলিলেন, "ষষ্ঠী-মায়ের ফুল আমি গিয়েই পাঠিয়ে দেব।"

ছবিকে কাছে ডাকিয়া কহিলেন, "কোনও ভয়-ভাবনা নেই মা তোর, ভাল করে' থাকিস্ যেন। মাঝে-মাঝে চিঠি-পত্তর দিস্।"

ছবি প্রণাম করিতেই গুরু-মা গাড়ীর উপর উঠিয়া বসিলেন। ষষ্ঠীচরণ আগেই তাহার জায়গা দখল করিয়াছিল

পথের বাঁক্ ফিরিতেই গাড়ীখানা আর দেখা গেল না। হাতীর মত গরু বোধকরি ঘোড়ার মতই উড়াইয়া লইয়া গেল। গুরু-মা বিদায় হইলেন।

এইবার গল্প সুরু

পঞ্চু মুখে কিছু বলে না, আড়-চোখে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসে, আর জানোয়ারের মত ছোট ছোট চোখ দুইটা তুলিয়া মিট্ মিট্ করিয়া তাকায়।

এ-সব যে একেবারে নিরর্থক তাহা নয়, ছবি সবই বুঝিতে পারে; হয় সেখান হইতে পালায়, নয় ত' পিছন ফিরিয়া বসে।

উপরের বারান্দায় ছবি সেদিন ঝাঁট দিতেছে, পঞ্চু খালি পায়ে উপরে উঠিয়া আসিয়া তাহার পাশ দিয়া হাঁটিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। ছবি সরিয়া যাইতেছিল, পঞ্চু বলিল, "সরতে হবে না, ভাসুর নই!"

বলিয়াই হাসিল। হাসিয়া সে তাহার ঘরের দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া গিয়া মাথার চৌকাঠটা ডান হাত দিয়া ধরিয়া আবার পিছন্ ফিরিল। বলিল, "বিয়ে হয়েছিল,—তোর গয়না কই ছবি? দেয়নি বুঝি?"

তাড়াতাড়ি ঝাঁট দিতে দিতে বাঁ হাত দিয়া পিঠের কাপড়টা ভাল করিয়া টানিয়া লইয়া ছবি শুধু হেঁটমুখে নীরবে একবার ঘাড় নাড়িল।

পঞ্চু বলিল, "আমার ঘরটা ঝাঁট দিয়ে দিসে দেখি! —এই! এই ছবি!"

ঝাঁটাটা সেইখানে ফেলিয়া দিয়া ছবি তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল।

নয়নতারা চৌকির উপর বসিয়া তোলা-উনানে দুধের কড়াই নাড়িতেছিল, ছবি মুখ ভারি করিয়া কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিল, "দেখ দিদি, পঞ্চু বাবু—"

কথাটা তাহার শেষ হইতে পাইল না, নয়নতারা চোখ দুইটা তাহার বড় করিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, "পঞ্চুবাবু কি লা, পঞ্চুবাবু কি! দাদাবাবু বল্!"

কিন্তু আর কোনও কথা না বলিয়া চুপ করিয়া ছবি দাঁড়াইয়া রহিল দেখিয়া নয়নতারা বলিল, "কি—?"

ছবি বলিল, "দাদাবাবু আমায় যা-তা বলছে—।"

নয়নতারা সজোরে বারকতক ঘাড় নাড়িল।—"উঁহু! নাঃ! পঞ্চু সে ছেলেই নয়।"

সিঁড়ি পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া পঞ্চু বোধকরি কথাগুলা শুনিতেছিল। এইবার সাহস পাইয়া সেইখান হইতেই সে বলিয়া উঠিল, "দেখ্‌লি দিদি, ঝাঁট দিচ্ছিল, বললাম, ঘরটা নোংরা হয়েছে, যাবার বেলা আমার ঘরেও একহাত দিয়ে যাস্‌। যেই বলা, আর দুম্‌ দুম্‌ ক'রে সিঁড়ি ধরে' নেমে এলো।"

ছবি তখনও হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া ছিল, নয়নতারা বলিল, "যা, আর বেশি বাড়াবাড়ি করিসনে। রান্না-ঘরে বাঁটাঘষা করে' দিগে যা!"

মায়া রান্না করিতেছিল। উনানে তখন তরকারি চড়িয়াছে।

দিন সাত-আট পরে, সেদিন বৈকালে মায়ার হঠাৎ কম্প দিয়া জ্বর আসিল।

নয়নতারা বলিল, "এই ছুতো নিয়ে কদ্দিন যে পড়ে থাকবেন তার ঠিক-ঠিকানা নেই। তার চেয়ে ডাক্তার ডাক্‌ পঞ্চু!"

গাঁয়েই ডাক্তার। বিদেশী মানুষ। ছোক্‌রা বয়সে কয়লা-কুঠির ডাক্তার হইয়া আসিয়াছিলেন। এখন বয়স হইয়াছে। মেয়ে ছেলে আনিয়া এই গ্রামেই ঘর বাড়ী তুলিয়া সংসার পাতাইয়াছেন।

পঞ্চু তাঁহাকে ডাকিয়া আনিল।

ডাক্তারবাবু রোগী দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। কপালে অডিকোলন্‌ আর জলের পটি দিতে হইবে সারারাত,—আর চার প্রহরে চার দাগ ঔষধ।

লোকের অভাবে সেদিন আর হাঁড়ি চড়িল না। অতি-কষ্টে একটা তরকারি করিয়া খানকতক্‌ লুচি ভাজিয়া নয়ন-তারা একেবারে নাকাল হইয়া পড়িল। নিজে খাইয়া, পঞ্চুকে খাওয়াইয়া, ছবিকে বলিল, "খেয়ে নিস্‌। আমি আর পারিনে বাবা, শুইগে যাই।"

কিন্তু শুইবার আগে নয়নতারা একবার মায়াকে দেখিতে আসিল। গায়ে মাথায় হাত দিয়া বলিল, "তোরা দুজন রইলি, ওষুধপত্র ঠিক ঠিক খাওয়াস্‌ পঞ্চু! কালকেই যেন চাঙ্গা হয়ে ওঠে।"

বলিয়াই সে পান চিবাইতে চিবাইতে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। হাঁকিয়া বলিল, "দরকার হলে জাগাস্‌!"

পঞ্চু ত' করিল সবই! ঘুমাইল না, কিন্তু ঘরের এক কোণের দিকে মাদুর বিছাইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। রাত্রি জাগিয়া ছবিই মায়ার শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

ঘড়িতে তখন প্রায় দুইটা বাজিয়াছে। ঘুমের ঘোরে ছবি ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়িতেছিল, পঞ্চু তড়াক্‌ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "যা তুই—ঘুমোগে যা, এবার আমি বসি।"

ছবি ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

নয়নতারার ঘরে খিল পড়িয়াছে, নীচের ঘরগুলা চাবিবন্ধ, কাজেই বারান্দা ছাড়া আর উপায় নাই।

বারান্দাটাও অন্ধকার। জ্যোৎস্না অনেকক্ষণ ডুবিয়া গেছে। ঘুমে তখন তাহার চোখদুইটা জড়াইয়া আসিয়াছিল।

ভাবিল, আসুক্‌ ঘুম, তবু সে চোখ রগ্‌ড়াইয়া কোন রকমে জাগিয়া থাকিবে। রাত্রি আর কতক্ষণই বা আছে! কিন্তু ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঝর্‌ঝরে সিমেণ্ট-দেওয়া মেঝের উপর শুইয়া অতরাত্রে জাগিয়া থাকাও দায়।

সহসা তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। কিন্তু নিরুপায়...!

নিস্তব্ধ রাত্রি—

চারিদিক অন্ধকার—

ঘরের ভিতর হইতে রোগীর আর্ত্তকণ্ঠ শোনা যায়...

চেঁচাইবার উপায় নাই। মুখে কাপড় চাপা!

এ কি নৃশংস অত্যাচার!

নিঃসহায় নারী, আর ক্ষুধার্ত্ত জানোয়ার !

ছবির সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল।

সমস্ত অঙ্গ তাহার ধীরে-ধীরে শিথিল হইয়া আসিতে-ছিল

তাহার পর—

আর কোনও কথা নয়।

রক্ত-মাংসের মানুষ। পুরুষ ও নারী···

দিনের পর দিন গড়াইয়া চলিতে লাগিল

মায়া সারিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু শরীরটা যে তাহার কেন ভাঙিয়া গেল কে জানে !

মাঝে-মাঝে জ্বর হয়। ঔষধ খাইতে চায় না। বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করে। আবার ঝাড়াঝুড়ি দিয়া সারিয়া ওঠে। উঠিয়াই স্নান করিয়া হেঁসেলের কাজে লাগিয়া যায়। শরীরের উপর অযথা অত্যাচার চলিতে থাকে।

পঙ্কু হাসে। বলে, "দিন দিন চেহারা যে তোমার..."

মায়া কথা বলে না।

নয়নতারা বলে, "পঙ্কু একটু ভালবাসে তাই, নইলে কোন্‌দিন ভাইএর আবার বিয়ে দিতাম।"

মায়া এবার আর চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। মুখের উপর না বলিলেও আড়ালে গিয়া তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া জবাব দেয়, "দাও না, বারণ ত' করিনি।"

রাগে নয়নতারা কট্‌মট্‌ করিয়া তাকায়। বলে, "সোয়ামীর আদর-সোহাগ পেয়ে পেয়ে গরব তোর বাড়লো দেখছি।"

পরাশর দু'চার দিনের জন্য গ্রামে আসে। পাৎলা খিড়্‌খিড়ে হাড্ডিসার মানুষ

টাকা টাকা করিয়া আসে, আবার টাকা টাকা করিয়া চলিয়া যায়।

বলে, "চুথিয়া মাড়োয়ারী-বেটারা কি বজ্জাত! পাঁচটি হাজার টাকা আদায় করতেই পাঁচটি মাস।"

নয়নতারা বলে, "তুমি বলেই পার, আর-কেউ হলে · "

"আর কেউ হলে—" পরাশর হাসিতে হাসিতে বলে, "সাত ঘাটের জল খেতো।"

পরাশর বলে, "পঙ্কুর বৌএর শরীর ত' দেখছি···কই, জ্বর-জ্বালা ত' আগে ওর হতো না।"

নয়নতারা বলে, "ওর কথা আর বলো না। তাও ভাগ্যিস্‌ ওই চাষার মেয়েটি রেখেছিলাম, নইলে খেটে খেটে আমিও হয়ত আধখানা হয়ে যেতাম।"

না খাটিয়া সে যে কতখানি হইয়াছে পরাশর তাহার বপুখানির দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখে বলে, "ঝরুক্‌ না একটুখানি।"

হাসিয়া সোহাগ করিয়া নয়নতারা তাহার গায়ের উপর ঢলিয়া পড়ে। হাড় ক'খানা শক্ত তাই ভাঙে না। বলে, "খাওয়া ত' এক রকম ছেড়েই দিয়েছি। কি করব বল ! ভগমানের হাত।"

মায়া চা তৈরী করিয়া ছবির হাত দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল। দরজার কাছে গলার শব্দ করিয়া ঘরে ঢুকিয়া হেঁট মুখে চায়ের পেয়ালা দু'টি নামাইয়া দিয়া ছবি বাহির হইয়া গেল। পরাশর একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

নয়নতারা বলিল, "দেখ্‌ছ কি ? চা খাও !"

পরাশর হাসিয়া একবার নয়নতারার মুখের পানে তাকাইয়া চায়ের বাটিটা তুলিয়া লইল।

গাঁয়ে-ঘরে প্রতিবেশী দু'চারজন আসিয়া বসে। কোনও কাজ না থাকিলে—অন্তত কোনও কথা খুঁজিয়া না পাইলেও, ইহার উহার মিষ্টি-মধুর দু'চারটা নিন্দাবান্দাও করিয়া যায়। কিন্তু নয়নতারার অতবড় ঘর, তবুও কেহ আসিতে চায় না। আড়ালে আব্‌ডালে কানাঘুষা করে। বলে, "চামার মাগী ; কার জন্যে যে ধন যোগাচ্ছে মা কে জানে!"

ঘরখানা দিনরাত ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। নয়নতারা অত সব গ্রাহ্যও করে না। ভা'জ বৌকে লইয়া উড়ন্-পাড়ন্ চলে।

ছ'টি মাস দেখিতে দেখিতে জলের মত কাটিয়া গেল।

ছবির রূপ আজকাল যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ফাটিয়া পড়ে। যৌবনের সে চটুলতা আর নাই। স্নিগ্ধ শান্ত একটি অনবদ্য সৌন্দর্য্য যেন তাহার সমস্ত দেহটিকে ধীরে-ধীরে জড়াইয়া ধরিয়াছে।

মায়াকে নয়নতারা যখন তখন বলিতে সুরু করিয়াছে, "দেখ্‌লো দেখ্! আমার ঘরের ভাত কাপড়ের গুণ দেখ! আর তোকেই কি না সুখে খেতে ভূতে কিলোলো!"

এক একদিন মায়া দেখে—

সদ্য স্নান করিয়া আসিয়া কালো কালো এক পিঠ চুল এলাইয়া দিয়া বারান্দার রেলিং ধরিয়া ছবি দাঁড়াইয়া থাকে। প্রভাতের রৌদ্র আসিয়া গায়ে-মুখে যেন ঠিক্‌রাইয়া পড়ে।

মায়া একদৃষ্টে গোপনে ঘরের ভিতর হইতে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে।

অনেকদিন হইতে সে আর তাহার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা বলে না। তবু একবার ইচ্ছা করে ডাকিয়া শুধায়।

ভাত কাপড়ের অভাব ত' অনেকেরই থাকে না, রূপের গৌরবও ত অনেকেই করিতে পারে, কিন্তু,—ওই খানেই কি শেষ? জীবনের মূল্য কি আর কোথাও কিছুই নাই?

মুখে রোদ লাগিতেই ছবি হঠাৎ মুখ ফিরাইল।

মুখের উপর কেমন যেন একটা ব্যথার ছাপ।

ইহাই যেন সে দেখিতে চাহিয়াছিল। ডাকিল, "ছবি!"

ছবি ধীরে-ধীরে শুষ্কমুখে অপরাধীর মত ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

মায়া বলিল, "অমন মন-মরা হয়ে দাঁড়িয়ে আছিস্ যে?"

ছবি মুখ তুলিয়া কথা বলিতে পারিল না। হেঁট মুখে খাটের এক পাশে দাঁড়াইয়া বিছানার চাদরটা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "আমি একবার বাড়ী যাব। তাই ভাবছি।"

"বাড়ী? বাড়ীতে তোর কেউ নেই বলেছিলি না?"

ছবি বলিল, "দাদা আছে। আমি যাব।"

শেষের কথাটা সে এমনি ভাবে উচ্চারণ করিয়া মুখ নামাইল, মনে হইল এখনই যেন সে কাঁদিয়া ফেলিবে।

মায়া আর কোনও প্রশ্ন করিল না। কেন যাইবে, কখন যাইবে, কতদিনের জন্য যাইবে, অন্য সময় হইলে এ-সব কথা মায়া তাহাকে একবার জিজ্ঞাসাও করিত। কিন্তু এখন আর নিজের দিক্ দিয়া কাহাকেও কোনও প্রশ্ন করিবার স্পৃহা তাহার নাই। যে থাকে সে থাক্,—যে যায় সে যাক্,—নিজের বঞ্চনার দুঃখ তাহাতে এতটুকুও কমিবে বলিয়া তাহার মনে হয় না।

এখানে যখন তাহার বিবাহ হইয়াছিল মা না থাকিলেও বাবা তাহার বাঁচিয়া ছিলেন। বলিয়াছিলেন, মেয়ের আমার রূপ আছে, গুণ আছে, বড় লোকের বাড়ী বিবাহ দিলাম, ভাত কাপড়ের অভাব কোনোদিন হইবে না, আর কি চাই?

নয়নতারাও সেইকথা বলে।

ছবিও যে বলিবে—তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি!

আরও দশ জনের মুখে ওই এক-কথাই সে বলিতে শুনিয়াছে।

হয়ত তাই।

কিন্তু অসুখের দিনে প্রচুর অবসর পাইয়া এই কথাই সে অনেক রকম করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছে,—মন তাহাব কোনও রকমেই তাহা স্বীকার করিতে পারে নাই।

ছবি তখনও দাঁড়াইয়া ছিল, মায়া বলিল, "ভিজে মাথায় দাড়িয়ে থাকিসনে ছবি, চুলগুলো শুকিয়ে নিগে যা।"

বলিয়াই তাড়াতাড়ি সে একটা বালিস টানিয়া লইয়া খাটের কিনাবে তল্‌পেটটা চাপা দিয়া উপুড় হইয়া পড়িল।

অসুখেব পব হইতে মাযার এই একটা নূতন ব্যাধিব সৃষ্টি হইয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া পেটে একটা অসহ্য ব্যথা ওঠে, ব্যথাব যন্ত্রণায় অস্থিব হইয়া তখন সে এমনি কবিযাই হাতেব কাছে যাহা পায়, তাহাই চাপিয়া ধবিয়া যাতনাটা সাম্‌লাইবাব চেষ্টা করে।

ছবি ছাড়া আব কেহ তাহা জানিত না। অত্যন্ত কাতব কণ্ঠে ধীবে-ধীবে সে কহিল, "দিদিকে ডেকে দেব?"

প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া পাগলের মত মায়া চীৎকাব করিয়া উঠিল, "না, না, না, না,—ওঃ!"

বলিয়া সে তাহাব দুই হাতের দশটা আঙুল দিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া প্রাণপনে বিছানাব চাদবটাকে টানিয়া টানিয়া জড়ো কবিতে লাগিল।

ছবি বলিল, "আমি বাড়ী যাব দিদি!"

আর কিছু সে বলিতে পাবিল না, গলাব আওয়াজটা ভাবি-ভাবি ঠেকিল।

নয়নতাবা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? বাড়ী কেন হঠাৎ?"

ছবি বলিল, "হুঁ, আমি যাব।"

পঙ্কু বোধকবি সিঁড়ি দিয়া উপব হইতে নীচে নামিতেছিল, অন্ধকারে হঠাৎ পিছন হইতে বলিয়া উঠিল, "তাই যাস্ বাপু যাস্। ফিরবি কবে?"

ছবি তাহার দিকে না তাকাইয়া বলিল, "পাঁচ দশ দিন..."

পঙ্কু ছুটি মঞ্জুর করিয়াছে, তাহার উপর আর কথা চলে না; তবু নয়নতারা একবার বলিয়া দেখিল, "কিন্তু হাঁ রে পঙ্কু, এ সময় মায়ার শরীর অম্‌নি, তার ওপর ও-ও যদি চলে যায়—"

পঙ্কু সিগারেট টানিতে টানিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "মায়াব আবাব হয়েছে কি? কিস্‌সু হয়নি। ক'টা দিন নাও কোনবকমে চালিয়ে—আহা, ছ'মাস বাড়ী যায়নি, মন কেমন কবে ত?"

আনন্দে ঈষৎ হাসিয়া নয়নতাবা বলিল, "পঙ্কু কারও কষ্ট দেখতে পাবে না; জানি যে, ও আমাদের গুষ্টির স্বভাব।"

পঙ্কু জিজ্ঞাসা করিল, "তা তুই যাবি কাব সঙ্গে?"

সকলেই কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

ছবি বলিল, "আপনি যদি এই খেয়াঘাট পর্য্যন্ত—তারপর আমি একাই—"বলিয়া জানালার একটা শিক্ ধরিয়া নিতান্ত অসহায়ের মত ছবি একবার পঙ্কুর মুখের পানে তাকাইল।

পঙ্কু বলিল, "আমি—তা আমি—আমায় কেন বাপু, আর-কেউ—আচ্ছা, দেখা যাবে তাই সময় যদি পাই ত'—আচ্ছা দেখা যাবে।"

বলিয়া কথাটাকে তেমন আমল না দিয়াই চটি চটুপট্ করিয়া সিগারেটেব ধোঁয়া উড়াইয়া পঙ্কু তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

কয়েকদিন হইতে বৃষ্টি একেবাবে বন্ধ হইয়া গেছে।

সেদিন দুপুরবেলা পঙ্কু তাহাব চোখে একটা কালো বঙেব ঠুলি-দেওয়া ডাগর চশমা পরিয়া ছাতা হাতে লইয়া বলিল, "চল্!"

ছবি প্রস্তুত হইয়াই ছিল, নয়নতারার দেওয়া বারোটি টাকা খুঁটে বাঁধিয়া তৎক্ষণাৎ সে তাহার পিছন ধরিল।

পঞ্চু কিন্তু বাড়ী ফিরিল রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের পর।

মায়া কোনও কথাই জিজ্ঞাসা করিল না।

নয়নতারা বলিল, "এত দেরি যে?"

পঞ্চু বলিল, "বাপ রে বাপ্! দিয়ে এলাম সে খেয়াঘাট পেরিয়ে অনেক দূর।"

"তাইত রে—অতখানা পথ" নয়নতারা বারে-বারে বলিতে লাগিল, "অত বড় সোমত্ত মেয়ে—একা যাবে—!"

পরদিন বেলা তখন প্রায় একটা বাজে।

কয়েকদিনের অনাবৃষ্টিতে মাটি আবার তাতিয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে আগুনের হল্কা বহিতেছিল। উন্মুক্ত মাঠের উপর রৌদ্রের ঝিলিমিলি।

ঘোড়ায় চড়িয়া ডাক্তারবাবু ভিন্ন গ্রামের ডাকে গিয়াছিলেন। কাঁকর পাথরে হোঁচট্ খাইয়া খাইয়া ঘোড়াটা একেবারে হয়রাণ হইয়া পড়িয়াছে। লোহার শিকল-পরা মুখের দুই চোয়াল বাহিয়া সাদা সাদা ফেনা গড়াইতেছিল।

ডাঙ্গাল-পাড়ার কোঁড়াদের কয়েকটা ছেলে পথের মাঝেই ডাক্তারকে আট্‌কাইয়া ফেলিল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য ডাক্তারবাবু ঘোড়া হইতে নামিয়া পথের পাশে প্রকাণ্ড একটা নিম গাছের ছায়ায় গিয়া দাঁড়াইলেন।

ছেলেগুলা জানাইল, তাঁহাকে একবার এই পথেই একটা রোগী দেখিতে যাইতে হইবে। বেশি দূরে নয়—ওই যে অদূরে মাঠের মাঝখানে পুরানো কয়লা-খাদের ভাঙা চিম্‌নি আর ইঞ্জিন-ঘরটা দেখা যাইতেছে, তাহারই পাশে কয়েকটা শ্যাওড়াগাছের নীচে একজন রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ছটফট্ করিতেছে, এতক্ষণ বাঁচিয়া আছে কি না সন্দেহ। তাঁহাকে যাইতেই হইবে। ঘোড়া যদি তাঁহার না চলে, তাহারা এই ক'জনে মিলিয়া তাঁহাকে কাঁধে-পিঠে করিয়া লইয়া যাইতেও প্রস্তুত, এবং সেজন্য তাহারা নাকি রোগীর কাছ হইতে নগদ একটি টাকা বক্‌শিশ্‌ও পাইয়াছে।

ডাক্তারবাবু ভাল মানুষ। সহজেই রাজি হইলেন। ঘোড়ার উপর আবার চড়িয়া বসিয়া বলিলেন, "চল্!"

ঘোড়ার আগেই ছেলেগুলা মাঠের উপর দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া ছুটিয়া সেইখানে গিয়া হাজির হইল।

রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের উপর আল-মাঠ ডিঙাইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ডাক্তারবাবু পশ্চাতে গিয়া পৌঁছিলেন।

কিন্তু ঘোড়া হইতে নামিয়াই তাঁহার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। যাহা দেখিলেন তাহাতে বিস্মিত হইবারই কথা।

দেখিলেন, আলুলায়িতকেশা পরমা সুন্দরী এক নারী—দেখিলে ভদ্রঘরের মেয়ে বলিয়াই মনে হয়—অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় সেই ছায়ালেশহীন শুক্‌নো পাথরের ডাঙ্গার উপর গড়াগড়ি দিয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। কাঁকরে পাথরে সর্ব্বাঙ্গ তাহার ছড়িয়া গেছে, সাদা ধপ্‌ধপে গায়ের চামড়ায় আঁচড় লাগিয়া রক্ত ফুটিয়া জায়গায় জায়গায় লাল হইয়া উঠিয়াছে।

ডাক্তারবাবু কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। জল! জল! বলিয়া পাগলের মত মেয়েটা একবার চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং গড়াইয়া গড়াইয়া একটুখানি আগাইয়া আসিয়া ডাক্তারবাবুর পা দুইটা সে দু'হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া কাতরকণ্ঠে কহিল, "বাঁচান! বাঁচান আমায় বাবু!"

দেখিলে কষ্ট হয়। ডাক্তারবাবু বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "কি হচ্ছে মা তোমার?"

"আমার?" মেয়েটি উপুড় হইয়াছিল, মুখ তুলিয়া চাহিল; শ্যাওড়াগাছের তলায় যে ছায়াটুকু পড়িয়াছিল সেটুকু ছায়াই নয়; তবু সে গরম মাটি হইতে সেইদিকে একটুখানি সরিয়া গিয়া বলিল, "জ্বলে গেল—ভেতরটা আমার পুড়ে গেল বাবু।"

কিন্তু ইহার কারণ যে কি হইতে পারে, এবং মেয়েটি এই জনশূন্য মাঠের মাঝখানে আসিলই বা কেমন করিয়া, কোথায় বাড়ী, কেন আসিয়াছে,—কিছুই না বুঝিতে পারিয়া ডাক্তারবাবু একটুখানি মুস্কিলে পড়িয়া গেলেন।

মেয়েটি হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "ওই দেখুন!···দেখে এসো ওইখানে!"

বলিয়াই সে হাত বাড়াইয়া অদূরে কি যেন দেখাইয়া দিল।

ডাক্তারবাবু এতক্ষণ দেখিতে পান নাই, সেইদিক পানে চাহিতেই নজরে পড়িল, কাছেই একটা পাথরের পাশে কি যেন পড়িয়া রহিয়াছে। উঠিয়া কাছে গিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, বিড়ালের ছানার মত কি একটা জিনিষ—শুকাইয়া কাঠ হইয়া পড়িয়া আছে; সর্ব্বাঙ্গে তাহার পিপড়া ধরিয়াছে। জুতা দিয়া একটুখানি নাড়িয়া দিতেই পিপড়াগুলা সরিয়া পড়িল। তখন স্পষ্ট দেখা গেল, নিতান্ত খর্ব্বাকৃতি অপরিণত একটি মানবশিশু,—একান্ত অনিচ্ছায় নিতান্ত অবেলায় হত্যা করিয়া মাতৃগর্ভ হইতে টানিয়া বাহির করা হইয়াছে; চার-পাঁচ মাসের বেশি নয়; ভ্রূণের মধ্যে মুখ-চোখ আকার-প্রকার তখনও ভাল করিয়া গড়িয়া উঠে নাই।

ডাক্তারবাবুর সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। বুঝিতে তাঁহার আর কিছু বাকি রহিল না।

কণ্ঠস্বর সহসা তাঁহার একটুখানি রুক্ষ হইয়া উঠিল। মেয়েটির কাছে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে,—কে করলে এ কাজ শুনি? কোত্থেকে এলে তুমি?"

মেয়েটি কাঁদিতেছিল। মুখ তুলিয়া অতিকষ্টে কাপড়-চোপড় সামলাইয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, কাঁপিতে কাঁপিতে আবার তেমনি শুইয়া পড়িয়া বলিল, "পঞ্চুবাবু—ও-ই করেছে···এ সব্বনাশ আমার···পঞ্চুবাবু···"

জিব দিয়া ঠোঁট দুইটা একবার চাটিয়া লইয়া মেয়েটি আবার বলিল, "ঝি ছিলাম—ওদের বাড়ী ঝি ছিলাম। ছবি···ছবি...আমার নাম।"

ছবি থামিল না। যন্ত্রণায় কাতর হইয়া ছটফট করিতে করিতে অস্পষ্ট ভাবে একে একে সব কথাই বলিয়া ফেলিল। ডাক্তারবাবু শুনিলেন।

বলিল, যাহা হউক একটা কিছু প্রতিকার করিতে বলায় পঞ্চু নাকি কাল বৈকালে তাহাকে এইখানে লইয়া আসে। জীবনে কোঁড়া আর এক-মাগী ধাইএর সঙ্গে আগে হইতেই কথাবার্ত্তা সব ঠিক হইয়াছিল।

ওই যে ওখানে, পুরানো কয়লা-খাদের ভাঙা একটা ইঞ্জিন-ঘরের তিন পাট দেওয়াল এখনও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহারই ভিতর কি কষ্টে যে তাহাদের গত রাত্রিটা কাটিয়াছে তাহা একমাত্র সে-ই জানে। জীবনে কোঁড়া ও ধাই-মাগী টাকা লইয়া ঔষধ দিয়া ছেলেটাকে নষ্ট করিয়া বাহির করিয়া দিয়াছে; আর-কিছুই তাহারা করিতে পারে নাই।

পঞ্চুও কাল অনেক রাত পর্য্যন্ত এখানে ছিল। সকালে আসিব বলিয়াও আর আসিল না। রাত্রে যন্ত্রণা যখন তাহার খুব বেশি হয়, ছবি নাকি ডাক্তারকে খবর দিবার জন্য পঞ্চুর হাতে-পায়ে ধরিয়াছিল; পঞ্চু কিন্তু রাজি হয় নাই। চোখ রাঙাইয়া বলিয়াছিল, "খবরদার! জানাজানি করবি ত' এই ধ্বস্-ছাড়া খাদের মুখে ঠেলে দেব।" ভয়ে সে আর কিছু বলিতে পারে নাই।

তাহার খুঁটে ছিল বারোটি টাকা। তার মধ্যে দশটি টাকা জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া ধাই-মাগী পালাইয়াছে; আর জীবনে কোঁড়া সেই যে রাত্রে কখন চলিয়া গেছে তাহার পর আর ও-পথ মাড়ায় নাই।

সকালে অতিকষ্টে ওই মরা ছেলেটাকে হাতে লইয়া কোন রকমে সে এইখানে চলিয়া আসে। কোঁড়াদের ছেলেগুলা তখন গরু চরাইতেছিল।

ডাক্তার ডাকিবার জন্য তাহাদের সে একটি টাকা দিয়াছে।

আর একটি টাকা—

ছবি তাহার খুঁট হইতে খুলিয়া ডাক্তারের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিল।

"যা করতে হয় করুন বাবু! বাঁচব না তা জানি। তবে এক গ্লাস জল...কাঁচা জল...তা হোক্।"

ডাক্তারবাবু উঠিলেন।

কোঁড়াদের ছেলেগুলা তখনও দাঁড়াইয়া ছিল। টাকাটা তাহাদের হাতে দিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, "ডাক্ ত' জীবনকে!"

ডাঙ্গাল-পাড়া সুমুখে দেখিতে পাওয়া যায়,—বেশি দূরে নয়। কিন্তু ছেলেগুলা সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "ঘরে ত' নাই। উ পালাঁইছে বাবু।"

পালানোই উচিত।

কিন্তু মেয়েটাকে কোথাও একটুখানি ছায়ায় লইয়া যাইতে পারিলে ভাল হয়। ডাক্তারবাবু এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিলেন, কাছাকাছি গাছ কোথাও নাই।

ছবি তখন দাঁতে দাঁত চাপিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস টানিতেছে।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "থাক্, আমি ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

বলিয়া কোঁড়াদের ছেলেগুলাকে কাছে ডাকিয়া কহিলেন, "আয় আমার সঙ্গে।"

ডাক্তারবাবু ঘোড়ায় চড়িলেন।

ছবি আর একটি প্রশ্নও মুখে আনিল না।

একে একে প্রত্যেকটি প্রাণী তাহার কাছ হইতে দূরে সরিয়া গেল।

আসন্ন মৃত্যু—

জনহীন উত্তপ্ত প্রান্তর—

পিপাসার্ত্ত কণ্ঠে দারুণ যন্ত্রণায় ছবি ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

ঔষধ লইবার জন্য ভিন্ন গ্রামের রোগী আসিয়াছিল।

অত বেলায় স্নানাহার করিয়া রোগী বিদায় করিতেই বেলা পড়িয়া গেল।

কোঁড়াদের ছেলেদের হাতে ছবির জন্য ডাক্তারবাবু এক গ্লাস গরম দুধ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

পরাশরবাবুর দরজায় গিয়া তিনি এত ডাকাডাকি করিলেন, কিন্তু পঞ্চুর সাড়া মিলিল না। ঘরে আছে কি জীবনে কোঁড়ার মত পলায়ন করিয়াছে তাহাও কেহ বলিতে পারিল না।

অগত্যা ডাক্তারবাবুকে আবার একাই সেই মাঠের মাঝখানে ছুটিতে হইল।

গিয়া দেখেন, কোথাও কেহ নাই। মেয়েটা যেখানে পড়িয়া ছিল সেখানে মাত্র তাঁহার দুধের গ্লাসটা কাৎ হইয়া পড়িয়া আছে, আর ভিজা মাটি ও গ্লাসের উপর কালো কালো কতকগুলা পিপ্‌ড়া আসিয়া জমিয়াছে।

শ্যাওড়া-গাছটার এদিক-ওদিক তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিলেন, ঢালু মাঠের নীচে খানিকটা নামিয়া গেলেন, কিন্তু মেয়েটার কোনও চিহ্নই তিনি সেখানে দেখিতে পাইলেন না।

ছেলেগুলা ধরাধরি করিয়া হয়ত তাহাকে ডাঙ্গাল-পাড়ায় তুলিয়া লইয়া গেছে।

কাছেই ডাঙ্গাল-পাড়া। কোঁড়াদের ছোট ছোট বস্তিগুলি সুমুখে দেখা যায়। ডাক্তারবাবু ধীরে-ধীরে সেই দিকে আগাইয়া চলিতেছিলেন, সহসা মনে হইল, পুরানো-খাদের ভাঙা ইঞ্জিন-ঘরটার পাশে কাহারা যেন কথা কহিতেছে।

ফিরিয়া দেখিলেন। সত্যই তাই। স্বচ্ছ দিবালোকে স্পষ্ট পরিষ্কার দেখা গেল, দু'ধারে দু'জন,—এক ধারে পঞ্চু, আর এক ধারে কোঁড়াদের সেই ছেলেটা—ধ্বসিয়া-পড়া খাদের মুখে মেয়েটাকে তুলিয়া ধরিয়াছে। কালো চুলের গোছা সমেত মাথাটা ঝুলিয়া পড়িয়া মাটিতে লুটাইতেছে,—বেশি উঁচু করিয়া তুলিতে পারে নাই,—কোমরের কাছটা যেন ভাঙিয়া পড়িয়াছে। মেয়েটাকে যে খাদের

নীচে ফেলিয়া দিবার বন্দোবস্ত চলিতেছে, দেখিলেই বুঝা যায়। কিন্তু পঞ্চুকে বিশ্বাস নাই, জীবন্ত অবস্থাতেই তাহার এই সমাধি হইতেছে কি না জানিবার জন্য ডাক্তার-বাবু উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিলেন। হাতের ইসারা করিয়া চেঁচাইয়া বলিলেন, "থাম্! থাম্, ওরে থাম্।"

কোঁড়াদের ছেলেটা পা দুইটা ধরিয়াছিল, চীৎকার শুনিয়া সহসা মুখ ফিরাইয়া হাত দুইটা সে ভয়ে ভয়ে ছাড়িয়া দিল। ভারি দেহ পঞ্চু একা ধরিয়া রাখিতে পারিল না, সেও ছাড়িয়া দিতেই ধপ্ করিয়া ঘাড় ডুম্ড়াইয়া মেয়েটা আবার মাটিতে পড়িয়া গেল। হাত দুইটা তেমনি উপরের দিকে তোলাই রহিল।...মরিয়াছে নিশ্চয়ই।

ডাক্তারবাবুকে দেখিয়া পঞ্চু কি যে বলিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না।

কোঁড়াদের এই ছেলেটার হাতেই তিনি দুধ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

তাঁহাকে দেখিবামাত্র ছেলেটা মহা উৎসাহে বলিয়া উঠিল, "এলম্ যখন, তখন উ হয়ে গেইছিল ডাক্তর।"

হইয়া যাইবে তাহা তিনি জানিতেন, কিন্তু এই কি তাহার পরিণাম নাকি? কাপড়টা পর্য্যন্ত ভাল করিয়া পরাইয়া দিতে পারে নাই। কাঁকর-পাথরের ডাঙ্গার উপর পায়ে ধরিয়া এমনি করিয়া তাহাকে টানিয়া আনা হইয়াছে, যে, অমন সুন্দর লম্বা কালো চুল ইহারই মধ্যে ধূলায় একাকার হইয়া জট্ পাকাইয়া গেছে, আসন্নপ্রসবা মাতার অনুন্নত সুন্দর শুভ্র দুটি স্তনে তখন দুধ জমিয়া জমিয়া বোঁটা দুইটি কালো হইয়া উঠিতেছিল, সাদা চামড়ার নীচে মোটা মোটা সবুজ শিরাগুলি পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়,—কিন্তু প্রাণহীন নিস্পন্দ সে দেহটার উপরেও অত্যাচার লাঞ্ছনার কোথাও কিছু অবশিষ্ট আছে বলিয়া মনে হয় না। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে উপুড় হইয়াই হয়ত সে মরিয়াছিল, তেমনি করিয়াই অতখানা পথ ঘষিয়া ঘষিয়া তাহাকে টানিয়া আনিতে গিয়া মুখ হইতে বুক পর্য্যন্ত ধারালো পাথরের কুচিতে মৃতদেহটাকে কাটিয়া ছিঁড়িয়া একাকার করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু তবুও সে তাহার চিরবদ্ধ চোখ দুইটি খুলে নাই। মুখের উপর কেমন যেন একটা নিষ্কৃতির প্রশান্ত ছায়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হইতেছিল। জীবনে যাহা বুঝিতে পারে নাই, অভাগী মরণে তাহা বুঝিল কি না কে জানে!

আর দেরি নয়। ডাক্তারবাবু বোধকরি সেই কথাই বলিতে যাইতেছিলেন। পঞ্চুর আর সবুর সহিল না, বলিল, "বাস্, আর দেখতে হয় না,—ধর্!"

দু'জনে আবার তেমনি বরাবরি করিয়া বার-কতক দোলা দিয়া মৃতদেহটাকে খাদের 'চানকের' মুখে ছুঁড়িয়া দিল।—গভীর খাতের নীচে মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় যে সেটা তলাইয়া গেল কে জানে। পতনের শব্দটি পর্য্যন্ত কানে আসিয়া পৌঁছিল না।

পঞ্চু এতক্ষণে বোধ করি পরম শান্তি লাভ করিল। স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বাস্! কিন্তু ডাক্তার, ভাবি অন্যায় তোমার গাঁয়ে সব জানাজানি হয়ে গেছে।"

ডাক্তার নীরবে শুধু একবার তাহার মুখের পানে তাকাইলেন।

চোখ দুইটা লাল। সম্ভবত মদ খাইয়া আসিয়াছে।

প্রত্যুত্তরে তিনি একটি কথাও বলিলেন না।

কোঁড়াদের ছেলেটা পঞ্চুর কাছে হাত পাতিয়া কি যেন চাহিতেছিল। পঞ্চু বলিল, "আবার? দু'টাকা পেয়েছিস বললি,—আবার?"

"সে ত বত্না, ভগা, টেবো,—ওই ডাক্তরকে শুধো 'দেখ না' হলে তুমি—"

"ভাগ্!" বলিয়া পঞ্চু তাহাকে এক ধমক দিতেই ছেলেটা চলিয়া যাইতেছিল, ডাক্তারবাবু নিজের পকেট হইতে একটি টাকা তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "যা,—গোলমাল করিস্‌নে, যা।"

"গোলমাল—না বাবু—ছোটলোক বাবু—আমরা হো মাঠে—গরু চরাই বাব—"

আনন্দে অধীর ছেলেটা তাহার কথার খেই হারাইয়া ফেলিল।

ডাক্তারবাবু অন্য পথ ধরিলেন।

"মাইরি আর-কি!" পঞ্চু তাঁহার হাতের মুঠায় একটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "পঞ্চু গাঙ্গুলীর দেনা-পাওনা হাতে হাতে বাবা—।" বলিয়া সে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল।

টাকাটি পকেটে ফেলিয়া দিয়া ডাক্তারবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "যাও!"

"যাব আর কোথা?"—দিনের আলো তখন সবে মাত্র ডুবিয়া আসিতেছে; পঞ্চু এদিক-ওদিক তাকাইয়া বলিল, "চল—তোমার সঙ্গেই যাই।"

বুঝা গেল, শ্যাওড়াগাছটার তলা দিয়া এখন আর সে একা পার হইতে চায় না।

ডাক্তারবাবু আগে-আগে চলিতেছিলেন, পঞ্চু কেবলই তাঁহার গা ঘেঁসিয়া অনর্গল বকিতে বকিতে পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেছিল।

"......মেয়েটার চেহারা ছিল খাসা,—কি বল ডাক্তার? কিন্তু অম্‌নিই হয়। ও-সব বজ্জাত মেয়ের শেষ কালটা ঠিক অম্‌নিই—মাঠে-ঘাটেই প্রাণটা হারায়। ......তাও ভাগ্যিস্ খবর পেলাম। নইলে আবার পুলিসের হাঙ্গাম-ট্যাঙ্গাম......তার চেয়ে এ বরং—"

পঞ্চু একটুখানি গর্ব্বের হাসি হাসিল।

বলিল, "আচ্ছা, তুমি কেমন করে' টের পেলে বল ত' ডাক্তার? তখন, পেরায় শেষ—কি বল? কথা-টথা কইতে-টইতে পারেনি...কি বল?"

ডাক্তারবাবু অন্য কথা পাড়িলেন। বলিলেন, "আমি একটা রুগী দেখে' এই দিক হয়ে একটু ঘুরে যাব পঞ্চু, তুমি বাড়ী যাও।"

"হ্যাঃ! কী এমন লাখ টাকার রুগী রাত্তির বেলা দেখতে যাবে! চল না দাদা আর-একটু......এই ত' এসে গেছি......গল্প করতে করতে......এই আর কতক্ষণ!"

ডাক্তারবাবু চলিলেন।

পঞ্চু আবার বলিতে লাগিল, "তা ছুঁড়ী যদি আমায় আগে জানাতো, তাহ'লে না হয় তোমাকে বলে-কয়ে গোপনে গোপনে......। আর এ ব্যাপারটা কার দ্বারা হয়েছে বুঝতে পারছ?"

বলিয়া সে ডাক্তারের কানের কাছে মুখখানা একটুখানি আগাইয়া আনিয়া বলিল, "আমার ওই ভগ্নিপতিটি ত' আর কম নয়! ওই যে পরাশর—পাৎলা খিট্‌খিটে লোকটি—ওই যে চুপ করে' করে' থাকে, আর মাঝে-মাঝে দু'একদিন আসে......ওরই কম্ম। আমি চিনি যে! আমি ওকে বহুৎ দিন থেকে চিনি।"

হাসিবেন কি কাঁদিবেন ডাক্তারবাবু কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না।

লোকটা অনর্গল মিথ্যা কথা বলিতেছে না বেদ পাঠ করিতেছে বুঝিবার জো নাই।

ঘরের দুয়ারে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। এবার সে আর একটি কথাও বলিল না। ঘরে ঢুকিয়া ডাক্তারের মুখের উপরেই সদর দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

"আলো—আলো কই? দিদি,—আলো?"

অন্ধকারে দাঁড়াইয়া পঞ্চু চীৎকার করিতেছিল।

লণ্ঠন লইয়া নয়নতারা ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল।—"পঞ্চু! হাঁরে সেই কখন্ বেরিয়েছিলি—!"

পঞ্চু ঘরে ঢুকিলে নয়নতারা বলিল, "হাঁরে, কি যেন শুনছি পঞ্চু, ওর নাম করে' বলছে সব......ওই-বাবুর বাড়ীর ঝি নাকি কোথায়—"

আরও কি যেন বলিতে যাইতেছিল, পঞ্চুর হাসির চোটে আর বলিতে পারিল না।

"দেখ্ দেখি লোকের কেমন কথা! এই ত' আসছি আমরা সব! সেই শুনেই গিয়েছিলাম—আমি, ডাক্তার-

বাবু,—আরও এক গাদা লোক! কোথা পাবি! তন্ন তন্ন করে' খুঁজে' দেখে এলাম, কোথাও এতটুকু চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই।"

"তাই হোক্—!" মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নয়নতারা বলিল, "গুজব তাহ'লে!"

গোপন করিয়াছিল ভয়ে। ভয় লজ্জা হইবারই কথা! কিন্তু দোষ তাহার একবিন্দু নাই। অপরাধ যে কাহার তাহা সে জানে।···

মায়া কিন্তু গুজবটা অবিশ্বাস করিতে পারে নাই।

সে তখন দোতালার ঘরে জানালার উপর বসিয়া বসিয়া বাহিরের অন্ধকারের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া তাহার কথাই ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল, তাহার সেই রূপের কথা। সে রূপ যে নারীর নয়, সে রূপ মায়ের—তাহা সে তখনই সন্দেহ করিয়াছিল, কিন্তু মুখে কিছুই বলিতে পারে নাই।

যাবার বেলা একটি প্রণাম করিয়া বলিয়া গেল, "আবার ফিরি ত দেখা হবে বৌদি—!"

সহসা পঞ্চুকে সেই ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অন্ধকারে অদ্ভুত কিছু দেখিলে মানুষ যেমন করিয়া আতঙ্কে চীৎকার করিয়া ওঠে, মায়াও তেমনি হঠাৎ অজ্ঞাতে চেঁচাইয়া উঠিল।

পঞ্চুর রাগ হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

এমনি ভাবে সে তাহার দিকে আগাইয়া গেল, মনে হইল ইহার জন্য তাহাকে সে ভয়ঙ্কর কিছু শাস্তি দিবে—হয়ত বা মারিয়াই ফেলিবে, কিন্তু মারিল না, শাস্তিও দিল না, প্রবল বেগে মায়াকে বুকের উপর টানিয়া আনিয়া সোহাগ করিয়া সজোরে একটি চুমা খাইল মাত্র।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

১৩২৯ সালের আষাঢ় মাসে কবি সত্যেন্দ্রনাথ অতিশয় অতর্কিতে আমাদের জগৎ হইতে অপসৃত হন। আজ ১৩৩৪ সাল, আবার সেই আষাঢ় মাস আসিয়াছে। যে নিদারুণ বিয়োগ-বেদনা সেদিন অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা এখনও কালের প্রভাবে মন্দীভূত হয় নাই, বরং যখনই তাঁহাকে স্মরণ করি, তখনই সেই স্মৃতি সদ্যশোকের মত বেদনাময় হইয়া উঠে। ইহার কারণ আছে। তাঁহার তিরোধানে যে স্থানটি শূন্য হইয়াছিল ঠিক সেই স্থানটি পূরণ করিবার মত আর একজনও বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে এ পর্য্যন্ত দেখা দিলেন না, অথচ সাহিত্য-সমাজের অবস্থা দিন দিন এমনই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে, যে, একজন ইংরাজ কবি তাঁহার সমসাময়িক সমাজের নিদারুণ অধঃপতনে ব্যথিত হইয়া কবিবর মিল্‌টন্‌কে স্মরণ করিয়া যে উক্তি

করিয়াছিলেন, আজ, ঠিক সমভাবে না হইলেও, অনেকটা সেই ভাবে, সত্যেন্দ্রনাথকে স্মরণ করিয়া, আমাদের এই ক্ষুদ্র সাহিত্য-সংসারের দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া, সেই কথাই একটু বদল করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—

Satyendra ! thou shouldst be living at this hour,
Bengal hath need of thee

সত্যেন্দ্রনাথের তিরোভাবে সাহিত্য-সমাজের পক্ষ হইতে এই যে শোক,—ইহা সত্য, এবং যতদিন অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইতেছে ততদিন যাঁহারা সাহিত্য-প্রেমিক ও যাঁহারা সত্যেন্দ্রনাথকে চিনিয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্তরে সেই সত্যব্রত সাহিত্য-বীরের মূর্ত্তি দিন দিন প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

নতুবা, কবির জন্য শোক অকারণ। কবিগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব প্রতিদিনকার ঘটনার মত নয়, সে ঘটনা সাধারণ জন্ম-মরণ ব্যাপারের মত লাভ-ক্ষতি বা শোক-আহ্লাদের হিসাবে গণনীয় নয়। যিনি যে প্রয়োজনে আসিয়াছিলেন তাঁহার তিরোধানে সে প্রয়োজন শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে, যাঁহার শক্তির যেটুকু বিকাশ যে যুগে প্রয়োজন, তাঁহাকে দিয়া যুগ-দেবতা সেইটুকু সাধন করাইয়া লন ; তাহাতে, আমাদের মনোমত প্রয়োজনসিদ্ধির হিসাব করিয়া শোকার্ত্ত হওয়া উচিত নয়। এই যুগ-প্রয়োজনে অনেকেরই ডাক পড়ে, কিন্তু অল্প ব্যক্তিকেই কাজে লওয়া হয়। সত্যেন্দ্র-নাথ সেই অল্প সংখ্যার একজন, এবং তাঁহার কার্য্য তিনি সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্র-নাথের অলৌকিক প্রতিভায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি বঙ্গবাণীর যে অঙ্গটির প্রসাধনের ভার লইয়াছিলেন তাহা অতিশয় মূল্যবান, এবং সেই প্রয়োজনের ভারটি যে শক্তি, ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত তিনি বহন করিয়াছিলেন তাহাতে বাংলা কাব্যের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে তাঁহার স্থানটি অক্ষয় হইয়া রহিল। রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরবর্ত্তী যে কয়জন লেখক বাণীমন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষা দীক্ষা ও ঐকান্তিকী নিষ্ঠায় সত্যেন্দ্রনাথ অগ্রণী ছিলেন, একথা বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভা অনুযায়ী চরিত্রশক্তি ছিল ; অথবা সেই চরিত্রই তাঁহার প্রতিভার মূল-শক্তি ছিল। এই শক্তি বলেই তাঁহার জ্ঞানপিপাসাকে তিনি চির জাগ্রৎ রাখিয়াছিলেন ; এবং যাহা—অধ্যয়ন, প্রত্যক্ষ-দর্শন, বিচার ও অনুভূতির দ্বারা তিনি নিরূপণ করিয়া লইতেন, তাহা হইতে মনে-প্রাণে কখনও বিচ্যুত হইতেন না। দেশের প্রতি তাঁহার অসীম মমতা ছিল, এবং বঙ্গভাষাই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র প্রেয়সী। তাঁহার সমগ্র কাব্যগুলির আলোচনা করিলে তাঁহার কাব্যপ্রেরণার এই দুই মূল সূত্র চোখে পড়ে। দেশকে ভালবাসিতেন বলিয়া তাহার অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তাঁহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, দেশকে জানিবার যত কিছু উপায় আছে—দেশের প্রকৃতি, সাহিত্য, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব—তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সহকারে আজীবন সন্ধান করিয়াছিলেন। সে ভালবাসায় অন্ধ হৃদয়াবেগ ছিল না ; তিনি পারিপার্শ্বিক বর্ত্তমান জগতের মাঝখানে রাখিয়া তাঁহার দেশের সত্যকার গৌরব, তাহার অতীত কীর্ত্তি ও বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি-অবনতির যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া, তাহাকে অন্য সকলের সহিত সমান, এমন কি, বড় করিয়া দেখিতে চাহিয়াছিলেন—

শ্মশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী,
তাহারি ছায়ায় আমরা মিলাব জগতের সাতকোটী।

দেশের অতীতের প্রতি তাঁহার যে শ্রদ্ধা ছিল তাহা শাস্ত্র-সংস্কারের বা হিন্দুয়ানীর অন্ধতা নয়, চিন্তাশীল ও চক্ষুষ্মান্ ভাবুকের আত্মসম্মান-জনিত অনুরাগ। দেশের সাহিত্য-ইতিহাস ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের খুঁটিনাটি ধরিয়া এই দেশানুরাগ কেমন দৃপ্ত-সহজ ও সপ্রতিভ ছিল, তাহা তাঁহার অসংখ্য কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে। বর্ত্ত-মানের যাহা কিছু অধর্ম্ম ও অসত্য, যাহা কিছু ভীরুতা ও জড়তা, তাহাকেই ধিক্কার ও বিদ্রূপ করিতে গিয়া

তাঁহার বাণী বেদনার জ্বালায় বিষাক্ত হইয়া উঠিত, আবার যাহা কিছু মহান্ ও সুন্দর বলিয়া তাঁহার প্রাণ স্পর্শ করিত, তাহার বন্দনাগানে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। এই রাগ-দ্বেষের মধ্যে তাঁহার যে মূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে কাব্যকল্পনা অপেক্ষা, তাঁহার প্রাণের সত্যকার আবেগ ও আকুতি, তাঁহার ব্যক্তিগত ধ্যান ধারণা ও বিশ্বাস, সত্যনিষ্ঠা ও বুদ্ধি-বিচার খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাই তাঁহার মধ্যে, কবি বা আর্টিষ্ট ও মানুষ —এই দুয়ের লুকাচুরী প্রায় কোথাও নাই, কবি-সত্যেন্দ্র ও মানুষ-সত্যেন্দ্র এক—তাঁহাকে বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না।

সত্যেন্দ্র-চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যই, তাঁহার এই আত্ম-প্রত্যয় ও দুর্দ্দম সাহসই বর্ত্তমান বাংলা কাব্যে স্বাস্থ্য সঞ্চার করিয়াছে, বাঙালী জীবনের বাস্তব-আদর্শের দিকটি পরিপুষ্ট করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে,—মানুষের ব্যক্তিগত সত্য-ধারণার দার্শনিক মূল্য যাচাই করিতে যাওয়া বৃথা, কারণ কোনও জাগতিক সত্যই নিরপেক্ষ সত্য নয়। সত্য মানুষের হৃদয়ের মধ্যেই অবস্থান করে, তাহার মূল্য সেই-মানুষের আন্তরিক বিশ্বাস ও প্রাণ-মনের ঐকান্তিকতা দ্বারা বুঝিয়া লইতে হয়। শাস্ত্রীয় বা দার্শনিক বিচারে সত্যের যে মূল্য তাহা জগতের পক্ষে অর্থহীন। মানুষের প্রাণে তাহার যেটুকু স্পর্শ ঘটে—তাহা যেমনই হোক—তাহাকে যখন মানুষ সারা প্রাণ দিয়া মানিয়া লয়, তখন সে অজেয় শক্তির অধিকারী হইয়া তাহাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে এবং সেই প্রয়াসের ফলে রাষ্ট্রে সমাজে ও সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত হয়। অতএব সত্যের তত্ত্ব অপেক্ষা সত্যের এই ব্যবহারিক শক্তির মূল্য অনেক বেশি। সত্যেন্দ্র-নাথের সাহিত্যসেবায় এমনি একটি নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা ছিল, সেই সত্যের নিকট তিনি হৃদয়ের মমতা, আত্ম-প্রসাদ, আপনার সুখ-সুবিধা সকলই বিসর্জ্জন দিয়া-ছিলেন। তাঁহার আদর্শ ছিল বাস্তব ও বিজ্ঞান-সম্মত—সেই আদর্শকে তিনি তাঁহার কবি-হৃদয়ের অনুভূতি দ্বারা ভাষা ও ছন্দে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অতি উচ্চ সূক্ষ্ম কল্পনা বা অবাস্তব সৌন্দর্য্যের মোহে তিনি এই বাস্তব হইতে কখনো দূরে যান নাই। তিনি তাঁহার সরস্বতীকে, মানবের বাস্তব ইতিহাসের সর্ব্বাঙ্গীন প্রগতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বন্দনা করিয়াছেন।—

> ভূলোকে ভ্রমর-গর্ভ শুভ্র-নীল পদ্ম-বিভূষণা ;
> হংসারূঢ়া—ময়ূর-আসনা !
> তুমি মহাকাব্য-ধাত্রী ! মহা কবিকুলের জননী !
> কখনো বাজাও বীণা, কভু দেবী ! কর শঙ্খধ্বনি,—
> উচ্চকিয়া উদ্দীপিয়া, চক্রশূল ধর ধনুর্ব্বাণ,
> হল-বাহী কৃষকের ধরি' হল কভু গাহ গান,—
> পুলকি' পরাণ !—
> সর্ব্ব-বিদ্যা-বার্ত্তা-বিধি দেখিতে দেখিতে
> গড়ি' উঠে গীতে !
>
> দুর্লভের গূঢ়-তৃষা দীপ্ত রাখ প্রাণের জল্পনা ;
> অয়ি দেবী মহতী কল্পনা !
> নক্ষত্র-অক্ষরে লেখ 'ক্ষত ত্রাণ' 'ক্ষতি অবসান' ;
> বন্দী মোচনের হর্ষে তিন লোক হোক্ স্পন্দমান।
> দুর্গমের দুঃখ হর'—জগতের জড়ত্বের নাশ
> কর তুমি মহাবাণী ! হোক্ বিশ্বে পূর্ণ পরকাশ
> দীপ্ত তব হাস।
> সিদ্ধির প্রসূতি তুমি ঋদ্ধি আরাধিতা !
> হে অপরাজিতা !

সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রেরণার আর একটি দৃঢ় সম্বল ছিল—মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার অসীম, 'অন্ধ' অনুরাগ। তিনি যাহাকে খাঁটি বাংলা বলিয়া বুঝিয়াছিলেন তাহার দৃষ্টান্ত তাঁহার অধিকাংশ কবিতায় পাওয়া যাইবে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও প্রচলিত ভাষা হইতে আশ্চর্য্য অধ্যবসায়ের সহিত তিনি এই খাঁটি বাংলা 'বুলি'কে উদ্ধার করিয়া তাহাকে তাহার নিজস্ব ধাতুতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে যে শব্দরাশি সংগ্রহ করিয়া অদ্ভুত অবলীলার সহিত তাঁহার কাব্যগুলির মধ্যে ছড়াইয়া রাখিয়াছেন তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কেবল সংগ্রহ নয়, সেগুলিকে

আবশ্যকমত সুমার্জ্জিত করিয়া, নূতন করিয়া সাজাইয়া এবং অতি যথার্থ ও নিপুণ ভাবে প্রয়োগ করিয়া তিনি তাঁহার মাতৃভাষাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও সর্ব্বাভরণা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এবং সেই ভাষার ধ্বনিকে অফুরন্ত ছন্দঝঙ্কারে বাজাইয়া তুলিয়া, তাহার জন্য নূতন ছন্দ-বিজ্ঞান সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। সে কৃতিত্বের নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। এই ভাষা ও ছন্দের সৃষ্টিই তাঁহার কবিপ্রতিভার সর্ব্বাপেক্ষা মৌলিক কীর্ত্তি, ইহারি বলে তিনি রবীন্দ্রনাথের দীপ্ত প্রতিভার তলে পড়িয়াও সমসাময়িক বাংলা কাব্যে একটি বিশিষ্ট আসন আদায় করিয়া লইয়াছিলেন।

এই যে দেশ তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল, এবং দেশ-ভাষার সেবায় তিনি সর্ব্বসমর্পণ করিয়াছিলেন—সেই সজ্ঞান কর্ম্মযোগ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যে তাঁহার কবি-চিত্ত যখন অবকাশ বা আরাম চাহিত, তখন কবির অন্তরের অন্তস্তলে যে রং রেখা ও সুরের খেলা জাগিত, তাহার আবেগে তিনি অতি বিচিত্র চিত্র ও সুন্দর সুর-লহরী রচনা করিতেন। এইরূপ গান ও কবিতার মধ্যে কোনও সমস্যা বা চিন্তার সংস্পর্শ থাকিত না ; এইগুলির মধ্যে, নগ্ন প্রকৃতির নিখুঁত চিত্রাঙ্কণ, নগ্ন প্রাণের নির্জ্জন নিশীথের গীতোচ্ছ্বাস, অথবা কোনও একটি ভাবের খেয়াল লইয়া খেলা—পাঠকের মনোহরণ করে। তাঁহার এই জাতীয় কবিতাগুলির মধ্যে (নিছক ছন্দ-উল্লাসের কবিতা-গুলি বাদ দিয়া) 'গর্‌বা গান' কবিতাটি একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এইখানে চিত্রাঙ্কণের কয়েকটি উদাহরণ দিব।

হাওয়ার তালে বৃষ্টিধারা সাঁওতালী নাচ নাচ্‌তে নামে,
আবছায়াতে মূর্ত্তি ধরে, হাওয়ায় হেলে ডাইনে বামে।
দিঘির জলে কোন্ পোটো আজ আঁশ ফেলে কী নক্সা দেখে,
শোল্-পোনাদের তরুণ পিঠে আলপনা সে যাচ্ছে এঁকে!

মেঘের সীমায় রোদ জেগেছে,
আলতা-পাটি শিম।

জলের কোলে ঝোপের তলে
কাঁচপোকা রং আলোক জ্বলে,

পেয়ারা-ফুলের রেশ্‌মী মিঠাই
ছড়ায়ে পড়েছে দখিণে বাঁয়ে

ঘন ভুরু জিনি' যব-শীষ যত
শিহরি' উঠেছে সুখে,

*　　　　　*

পথের শেষে থম্‌কে হঠাৎ চম্‌কে দেখি মাঝ-গগনের কাছে
রাত্রি-দিবার সন্ধি-রেখার অবাক্-চোখে সে চাঁদ চেয়ে আছে—
চেয়ে আছে তুষার-রুচি শ্বেত-ময়ূরের পারা,—
হিমে-হানা, কুণ্ঠিত-কায়, শীর্ণ-শিথিল পাখ্‌না, পেখম-হারা।

ঊষার আভাস জাগ্‌ল কি রে? দিনমণির খুল্‌ল মণি-কোঠা?
শুকতারাটির শিউলি-ফুলে লাগ্‌ল কি রে অরুণ-রঙের বোঁটা?
পূব্-তোরণে চিড়্ খেল কি দিগ্‌বারণের নিবিড় দন্তাঘাতে?
ধুৎরো-ফুলের ডালি মাথায় তুষার-গিরি জাগ্‌ছে প্রতীক্ষাতে!
মুক্তাফলের লাবণ্য কি আমেজ দিল মুক্ত নীলাম্বরে?
দিগ্‌বধূরা চামর করে আকাশ-আলোর বিরাট হরিহরে?

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব না। আধুনিক পাঠকের অনেকেই তাঁহার কবিতাগুলির সহিত সুপরিচিত। এইবার সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমার চাক্ষুস পরিচয়ের কথা বলিব।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি মানুষ-সত্যেন্দ্র-নাথ সম্বন্ধেও তাহাই বলিতে হয়। তাঁহাকে কবে প্রথম দেখিয়াছিলাম, মনে নাই। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন কলিকাতায় আসিলে তাঁহারা কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিক একবার করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতেন, হয় ত সেইখানে তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াছিলাম, অথবা, কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের বাসায় তাঁহাকে প্রথম দেখিয়া থাকিব। প্রথম দর্শনেই তাঁহাকে একটি মিতভাষী, বিনয়ী অথচ আত্মস্থ যুবক বলিয়া মনে হইয়াছিল, এবং

সেই ধারণা উত্তরকালে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্যেও পরিবর্ত্তন করিতে হয় নাই। পরে, যখন তদানীন্তন 'ভারতী' সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক-বৈঠকে সত্যেন্দ্রনাথকে ভালো করিয়া দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল, তখনকার কথাই বলিব। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন সেই বৈঠকের নিত্য-মনোনীত সভাপতি, যত কিছু মতা-মতে তাঁহার সম্মতি না পাইলে কাহারও মনঃপূত হইত না। দেখিতাম, তিনি গায়ে-পড়া হইয়া কিছু বলিতেন না, প্রসঙ্গ উঠিলে ও তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি স্পষ্ট কথাই বলিতেন। গল্প গুজবে কোন ও আকর্ষণ না থাকিলে, তিনি চেয়ারে আসন-পীড়ি হইয়া বসিয়া গুণ্-গুণ্ করিয়া তুড়ি দিয়া গান করিতেন। কাহারও রচনা ভালো না লাগিলে, প্রসঙ্গান্তরে মনোনিবেশ করিতেন; চাপিয়া ধরিয়া মত জানিতে চাহিলে, সংক্ষেপে 'রাবিশ্!' বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার বিবেক-বুদ্ধি এমনই জাগ্রৎ ছিল, তাঁহার বিদ্যাবত্তা এত গভীর ও স্পষ্টবাদিতা এমন নির্ম্মম ছিল, যে ও বিষয়ে সকলকেই বিনা শাসনে বাক্ সংযম করিতে হইত। কিন্তু আমোদ-প্রমোদ বা রহস্যালাপে তাঁহার রসিকতায় কুণ্ঠা ছিল না, তিনি মুক্ত প্রাণে সকলের সহিত যোগ দিতেন। সমসাময়িক লেখকগণ সম্বন্ধে তাঁহার শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধায় কোনও রূপ দ্বিধা ছিল না। তাঁহার আদর্শটি তাঁহার নিকট এমনই স্পষ্ট ও সবল ছিল যে কিছুদিন ধরিয়া কাহারও রচনা লক্ষ্য করিলেই সেই লেখক সম্বন্ধে তিনি নিঃসংশয় হইতে পারিতেন। এ বিষয়ে বহু পরিচয় বা বন্ধুত্বের খাতিরেও তিনি তাঁহার মত এক চুল পরিবর্ত্তন করিতেন না, ইহার বহু দৃষ্টান্ত আমি দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। তিনি যাহাকে মিথ্যা বলিয়া জানিতেন সেই মিথ্যাকে, কি সাহিত্যে কি সমাজে, কি রাষ্ট্রনীতিতে যে আশ্রয় করিয়াছে, তাহার সহিত তিনি কোনও কারণে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সন্ধি করিতে পারিতেন না—এ বিষয়ে তাঁহার অন্তর-বাহিরে ভেদ ছিল না। এই জন্য বন্ধু-মণ্ডলীর মধ্য দিয়া সাময়িক সাহিত্য-সমাজের এক অংশে, তিনি নিজের অজ্ঞাতে একটি সত্য ও উন্নত আদর্শের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

একদিন বৈঠক-শেষে আমাকে একান্তে ডাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, আমার কোনও একটি সদ্য-প্রকাশিত কবিতা তাঁহার ভালো লাগিয়াছে। ইহাও বলিলেন যে তাহা সাধারণ পাঠকের রুচি ও রসবোধের অনুকূল নয়, কিন্তু কবিতাটি খুব ভালো হইয়াছে। তাঁহার সেই আচরণে তাঁহার সাহিত্য-প্রীতি ও কর্ত্তব্যবোধ এমনই ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে আমি মুহূর্ত্তের জন্য শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। ইতিপূর্ব্বে আমার 'নাদির শাহ' পড়িয়া তিনি খুশী হন নাই, এবং বহুজনের প্রশংসা সত্ত্বেও নিজমত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

ইহার পরেও তাঁহাকে আমার কবিতা শুনাইতে ভরসা করি নাই। কিন্তু একবার দুইটি কবিতা প্রায় একই সময়ে লিখিয়া বন্ধুমহলে প্রশংসা লাভ করিয়াছিলাম। কবিতা দুইটি—'বেদুইন' ও 'শেষশয্যায় নূরজহান'—তখনও প্রকাশিত হয় নাই। বন্ধুবর মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখে কবিতা দুইটির অতিরিক্ত প্রশংসা শুনিয়া, সত্যেন্দ্রনাথ আমাকে পড়িয়া শুনাইতে অনুরোধ করিলেন, এবং আমিও যতই বিলম্ব করি তিনি ও ততই দেখা হইলেই মনে করাইয়া দেন। একদিন সকালে কান্তিক প্রেসে 'কুহু ও কেকা'র নূতন সংস্করণের প্রুফ দেখিতে আসিয়া আমার সহিত দেখা হইয়া গেল। সেবার আমিই বলিলাম, 'এখন সময় হইবে? কবিতা দুইটি এখন আমার সঙ্গেই আছে।' তিনি অম্লান বদনে বলিলেন, 'না, এখন আমার কবিতা ভাল লাগিবে না।' ইহার পর কিছুদিন দেখা হয় নাই। তারপর 'ভারতী'তে তাঁহার 'গরবা গান' প্রকাশিত হইলে, তাহা পড়িয়া আমি মুগ্ধ ও অধীর হইয়া পড়িলাম। অভ্যাসমত কবি করুণা-নিধানের বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সহিত উহা বার বার পড়িয়া আনন্দ বৃদ্ধি করিলাম। কিন্তু তাহাতেও তৃপ্তি

হইল না—স্থির করিলাম তাঁহার রচনা তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিতে হইবে। পরদিন আমরা দুইজনে 'ভারতী' খানি লইয়া সত্যেন্দ্রনাথের গৃহে অনাহুত অতিথির মত প্রবেশ করিলাম, এবং কবিতাটি তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইবার অনুমতি চাহিলাম। পরে যথাসাধ্য আবৃত্তি করিয়া মুখপানে চাহিয়া দেখিলাম—বিনীত বিষন্ন মূর্ত্তি; বলিলেন, 'মনে যাহা ছিল তাহা ফুটাইয়া তুলিতে পারি নাই, আমার নিজের পূর্ণ সন্তোষ হয় নাই।' বলিয়াই বলিলেন, 'আপনার কবিতা কই?' এ আশঙ্কা আমার পূর্ব্ব হইতেই ছিল, এবং পাছে ভদ্রতার হানি হয় সেজন্য এবার কবিতা দুইটি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম, নতুবা নানা কারণে আমি উহা পাঠ করিতে অনিচ্ছুক ছিলাম। করুণা-বাবু উৎসাহ সহকারে সায় দিলেন, তিনি প্রথমেই 'বেদুইন' পড়িতে বলিলেন, আমি 'নূরজহান'টিই প্রথমে পড়িলাম, পড়ার পর রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। প্রশংসার এমন উচ্ছ্বাস, এমন আত্মবিস্মৃতি আমি স্বপ্নেও আশা করি নাই। তিনি মুখে মুখে সদ্যপঠিত কাব্যের ভাব কল্পনা ও সূক্ষ্ম কলা-নৈপুণ্যের বিশ্লেষণ করিয়া গেলেন, পরিশেষে হঠাৎ আবেগের মুখে বলিয়া উঠিলেন,—"আমার 'কবর-ই-নূরজহান' ছিঁড়ে ফেল্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে!" সত্যেন্দ্রনাথের কবিচরিত্রের একটি অপ্রত্যাশিত দিক সেই দিন হইতে আমার স্মৃতি-পটে মুদ্রিত হইয়া আছে। সত্যেন্দ্র-চরিত্রের একদিক ভালো করিয়াই দেখিয়াছিলাম, কিন্তু সেদিন আর একদিক দেখিয়া তেমনই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাঁহার নিকট কোনও রচনা ভালো-লাগা যে কত দুরূহ ছিল তাহা জানিতাম, আজ ইহাও জানিলাম—যদি ভাল লাগে, তবে তাহার প্রশংসায় তিনি কেমন পঞ্চমুখ হইতে পারেন। ইহার পর 'বেদুইন' পড়িলাম, তাঁহার ভালো লাগিল না, বলিলেন "'নূরজহানে'র সঙ্গে তুলনাই হয় না—অনেক নিকৃষ্ট!"

ইহার পর হইতে সত্যেন্দ্রনাথ আমাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। মনে আছে, 'ভারতী'র বৈঠকে আমাকে দূরে একপাশে বসিয়া থাকিতে দেখিলে, ক্ষীণদৃষ্টি কবি একাধিক দিন ব্যস্ত হইয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "আপনি নিকটে আসিয়া আমার সম্মুখে বসুন, আপনার মুখ যে দেখিতে পাইতেছি না।"

ইতিপূর্ব্বে আর একদিন সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করিবার জন্য তাঁহার বাড়ী গিয়াছিলাম। বাহিরের দোতলার ঘরে পুস্তকরাশির মধ্যে কবি তখন মধ্যাহ্ন-বিশ্রাম করিতেছিলেন, আমি মূর্ত্তিমান উপদ্রবের মত তাঁহার নিঃসঙ্গতা ভঙ্গ করিলাম। সেদিন কথায় কথায় আর্য্য-গৌরব ও হিন্দু-ইতিহাসের বৈশিষ্ট্যের কথা উঠিয়া পড়িল। তিনি ভারত-সভ্যতার ইতিহাসে আর্য্যজাতির সুকীর্ত্তি অপেক্ষা অপকীর্ত্তি ঘোষণা করিলেন; যাহারা বেদ উপনিষদ রচিয়াছিল, প্রাচীন শাস্ত্র-সংহিতা ও পুরাণ যাহারা প্রণয়ন করিয়াছিল তাহাদের অন্যায়, অধর্ম্ম ও অহংকার, তাহাদের আত্মস্বার্থমূলক মনুষ্যত্ববিরোধী শাস্ত্রশাসনের উল্লেখ করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ বলিলেন,—ভারত-সভ্যতা বলিতে যাহা বুঝায়, ভারতীয় ধর্ম্ম ও চিন্তার যে উদারতার গৌরব আমরা করিয়া থাকি, তাহা এই আদিম হিংস্র আর্য্যজাতির একক সাধনা নয়, সেই বর্ব্বর বিজয়ী জাতির যত কিছু রূঢ়তা ও নির্ম্মমতা ধ্যান-গভীর ও মমতা-মধুর করিয়া তুলিয়াছে বহু অনার্য্যজাতির কর্ম্ম, আত্মদান ও তপস্যা। অতএব এই সভ্যতার আর যে নাম দেওয়া হয় হউক, তাহাকে আর্য্যসভ্যতা বলিলে অন্যায় হইবে, অথবা—ইহার মধ্যে যেটুকু কেবলমাত্র আর্য্য-দিগের কীর্ত্তি তাহা লইয়া গৌরব করিবার কিছু নাই। টেবিলের উপর হইতে (বোধ হয় কিছু পূর্ব্বেই পড়িতে-ছিলেন) একখানি সযত্নে বাঁধাই-করা পুরাণ-গ্রন্থ তুলিয়া লইয়া আমাকে বলিলেন, "আর্য্য-সভ্যতার উৎকর্ষে মুগ্ধ হইতে চান? এই কাহিনীটি পড়ুন!" বলিয়া, তাহা হইতে যে স্থানটি পড়িয়া শুনাইলেন তাহা সংক্ষেপে এই—এক শূদ্র দারুণ গ্রীষ্মে পথিককে জলদানমানসে পথিপার্শ্বে

একটি কুটীর রচনা করিয়া জল লইয়া বসিয়া থাকিত। একদা দৈবক্রমে এক ব্রাহ্মণ পিপাসার্ত্ত হইয়া জলপান করিতে চাহিলে, সে শাস্ত্রশাসন বিস্মৃত হইয়া তাহাকে জলদান করিল। শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণকে জলদান করায় তাহার কঠিন নরক দণ্ড হইল, এবং সেই ব্রাহ্মণেরও যথাপরাধ শাস্তি হইল।—এই পুরাণ-কাহিনী শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। সত্যসন্ধ সুপণ্ডিত সত্যেন্দ্রনাথের কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস হইল না। বুঝিলাম, বাস্তব-সত্যের সেবক মানবকল্যাণকামী সত্যেন্দ্রনাথকে হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় রহস্য, হিন্দুশাস্ত্রের অসাধারণ দিব্যদৃষ্টি এবং ভূ-দেবতা ব্রাহ্মণের মর্ত্ত্য-মহিমা বুঝাইতে যাওয়া নিস্ফল।

সত্যেন্দ্রনাথের দেশভক্তির মধ্যে মিথ্যা স্বপ্ন বা সুলভ জাতীয় আত্মপ্রসাদের আস্ফালন ছিল না। একবার কোনও বৈঠকে খেলাফতের প্রতি মহাত্মা গান্ধীর অতিরিক্ত সহানুভূতির কুফল আশঙ্কা করিয়া কথা উঠিল,—এরূপ ভাবে মুসলমানের ধর্ম্মান্ধতার প্রশ্রয় দিলে হিন্দুর সমূহ ক্ষতি হইবে, এমন কি শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুকে মুসলমান হইতে হইবে। সত্যেন্দ্রনাথ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে কেবলমাত্র বলিলেন, "সবাই মুসলমান হইয়া গেলে কি আমরা স্বাধীন হইতে পারিব? যদি তাহা হয়, তবে মুসলমান হইতে আপত্তি নাই।" তাঁহার দেশানুরাগ ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এমনই প্রবল ও সহজ ছিল!

খাঁটী বাংলা ভাষা ও সেই ভাষার ছন্দকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে সমৃদ্ধ করাই যেন তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এ বিষয়ে তাঁহার এমন একাগ্র নিষ্ঠা ছিল, যে সুরসিক ও সুপণ্ডিত হইয়াও তিনি বাংলা পয়ারের নিন্দা করিতেন—নিজে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে বহু কবিতা রচনা করিলেও ইদানীং তিনি স্বরবৃত্ত ছন্দ ব্যতীত আর কোনও ছন্দের কবিতা পছন্দ করিতেন না। একবার আমি তাঁহাকে বলিয়া বসিলাম, "আপনার 'চার্ব্বাক ও মঞ্জুভাষা' কবিতাটি কি জানি কেন আমার বড়ই ভালো লাগে।" শুনিয়াই বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ! ও আবার একটা কবিতা! অক্ষর গুণিয়া কখনও কবিতা হয়?" আমি নিজে বাংলা পয়ারের অতিমাত্রায় পক্ষপাতী, যদিও স্বরবৃত্তের মাধুরী অস্বীকার করিনা, তথাপি বাংলা পদ্যের উচ্চতম ধ্বনিগৌরব পয়ারেই সম্ভব—ইহাই আমার মত। কাজেই ক্ষুব্ধ হইয়া প্রতিবাদ করিলাম—রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিলাম—কিছুতেই ফল হইল না। তখন বুঝিলাম ইহা একেবারেই ব্যক্তিগত, এখানে যুক্তি চলিবে না—সত্যেন্দ্রনাথের যদি পয়ারেই ভক্তি থাকিবে তবে তাঁহাব নিজস্ব কার্য্যটি এমন করিয়া সাধন করিবে কে? ভাষার অনর্গল প্রাচুর্য্য, শব্দচাতুরী ও খাঁটী বাংলা শ্লেষ ও রসিকতার বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের সহিত কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের একটি গভীর সগোত্রতা ছিল। এই জন্য একবার যখন বাঙ্গালা কবিগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কাব্য-পরিচয় সম্বলিত চরিতগ্রন্থমালা প্রকাশের প্রস্তাব হয়, তখন শুনিয়া বিস্মিত হই নাই যে, সত্যেন্দ্রনাথ ঈশ্বর গুপ্তের চরিত লিখিবার ভার লইয়াছেন।

আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর যখন নানা পত্রিকায় তাঁহার ছবি বাহির হইল তখন একদিন আমার এক আত্মীয় যুবক আমার নিকট বড় দুঃখ করিয়াছিলেন। ইনি দুর্ল্লভ পুস্তক সংগ্রহের আশায় পুরাতন পুস্তকের দোকানে প্রায়ই ঘুরিতেন। অনেকেই বোধ হয় জানেন সত্যেন্দ্রনাথেরও এই রোগ ছিল। পত্রিকায় প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথের ছবি দেখিয়া আমার সেই আত্মীয়টি আমাকে বলিলেন, "ইনিই সত্যেন্দ্রনাথ! বইয়ের দোকানে ইহাঁকে যে কতদিন দেখিয়াছি! একই পুস্তক সম্বন্ধে দুইজনে কত কথা বলিয়াছি, ইহাঁর সহিত যে আমার নিত্য পরিচয় ছিল! আহা হা! এত চিনিয়াও চিনিলাম না—ইনিই কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ!" এই ঘটনায় সত্যেন্দ্র-চরিত্রের আর এক দিক স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। জীবনের যে দিকটি তাঁহার অন্তরঙ্গ দিক,

তাহা তিনি এমন করিয়াই আড়াল করিয়া রাখিতেন। আত্মপ্রচার ব্যাপারে তাঁহার এমনি আশ্চর্য্য সংযম ছিল।

*　　*　　*

আজ আষাঢ়ের ছায়াচ্ছন্ন প্রভাতে অন্ধকার তরুরাজী-বেষ্টিত গৃহকোণে বসিয়া ভাষা-মাতৃকার দুলাল, ছন্দ-সরস্বতীর বরপুত্র, সেই ক্ষত্রিয়-স্বভাব বাণী-ব্রহ্মচারীকে স্মরণ করিয়া হৃদয় অধীর হইয়া উঠিতেছে! আজ সেই অদৃশ্য অমর আত্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—কবি! তুমি তোমার সাহিত্যব্রত উদ্‌যাপন করিয়া বাংলার বাণী-চত্বরে অমৃত-পদ লাভ করিয়াছ, কিন্তু যে দুর্লভ হৃদয়-মন, যে অপূর্ব্ব চরিত্র তোমার জীবনকেই বহুমূল্য করিয়াছিল, তাহা যে আর কোথাও খুঁজিয়া পাই না; তোমার জীবলীলার অবসানে নব্যবঙ্গসরস্বতীর কেবল চরণ-নূপুরই খসিয়া যায় নাই, তাঁহার সীমন্তের স্যমন্তক-মণি আজ ধূলায় লুটাইতেছে!

মাটির রাজা

—পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর—

শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

কিন্তু মারামারি খুনোখুনি কোথাও কিছু নয়, তাঁহাদের দেখিবামাত্র রায়-জি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

"কেমন? রাগ এবার ভাঙলো ত?"

কথাটা যে কাহাকে বলা হইল তাহা আর বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না।

মা হাসিয়া বলিলেন, "কত ঢংই না জানো!"

টুনুও হাসিল। বলিল, "রাগ কে করেছিল কে?"

শান্তি অদূরে দাঁড়াইয়াছিল, হাসিয়া সে একবার বৌদির মুখের পানে তাকাইল।

"তুমিই বলেছ ঠিক।" বলিয়া টুনু তাহাকে ধরিতে গেল।

শান্তি ধরা দিল না,—ছুটিয়া আরও খানিকটা দূরে গিয়া দাঁড়াইল।

রায়-জি বলিলেন, "ওরও ত' কম রাগ হয়নি টুনু, রেগে কি করলে দেখ!"

টুনু দেখিল, রসগোল্লার মত কি যেন কয়েকটা মিষ্টির টুক্‌রা গাছের তলায় ইতস্তত ছড়ানো রহিয়াছে। কিন্তু ইহা দেখিয়া টুনু কিছুই বুঝিতে পারিল না।

রায়-জি বুঝাইয়া দিলেন।

মা কিছুই জানিতেন না, ব্যাপারটা আগাগোড়া শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "অভিমান ওর খুব বেশিই হয়েছে বৌমা, নইলে ও-জিনিষ ও এমন করে' ছড়িয়ে দিত না কখনও।"

"কিন্তু ও ত' জানে মা! রাগের সময় আমার যে ছাই......ও-সময় ও দিতেই বা গেল কেন?...আমি হতভাগীও ত' একবার চোখ চেয়েও দেখলাম না..."

বলিতে বলিতে টুনুর মুখখানা অকস্মাৎ ব্যথায় কেমন যেন

বিবর্ণ হইয়া উঠিল। সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া ধূলা-বালি-মাখানো রসগোল্লার টুক্‌রা কয়টি কয়েকটা কাকের মুখে ছুড়িয়া দিতে দিতে এমনি সব কত কথা বলিয়া নিজেই নিজেকে যেন শত সহস্র প্রকারে ধিক্কার দিতে লাগিল।

রায়-জি যে কথাটা এমন করিয়া প্রকাশ করিয়া দিবেন শান্তি তাহা ভাবে নাই, তাই সে বহুপূর্ব্বেই সেখান হইতে পলায়ন করিয়াছিল।

মা বলিলেন, "শ্যামল যে আমার একশ টাকা পাঠাচ্ছে, শুনেছ? চিঠি লিখেছে আজ।"

রায়-জি হঠাৎ সচকিত হইয়া উঠিলেন। সাপের ঝাঁপি কয়টা সরাইয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিলেন। বলিলেন, "সত্যি? কই দেখি দেখি—চিঠি দেখি!"

"বৌমার নামে চিঠি তুমি দেখবে কি রকম?"

"ও! তাই নাকি? তা আমি তোমাদের বলেইছি ত' কতদিন! কিন্তু আসে না যে? আছে কেমন? ভাল আছে ত?"

মা বলিলেন, "হ্যাঁ ভালই আছে। নিজেই সে টাকা নিয়ে আসবে লিখেছে।"

রায়-জি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "টাকা টাকা করে আমায় আর অনর্থক বিরক্ত করে' মেরো না বলে' দিচ্ছি। টাকা ত' শ্যামল না-পাঠানো হয় না, তবে তোমাদের অ-ভর পেট যদি না ভরে ত' সে কি করবে বল ত? তার দোষ কি?"

বলিয়া তিনি একবার স্মিতমুখে তাঁহার তৃণাচ্ছাদিত সুবিস্তীর্ণ মাঠগুলির পানে তাকাইয়া কহিলেন, "এবার কিন্তু পঞ্চাশটা টাকা আমায় নিতেই হবে,—আমিই চেয়ে নেব শ্যামলের কাছে।"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হবে শুনি?"

জবাবে তিনি যাহা বলিবেন মা তাহা জানিতেন, এবং জানিতেন বলিয়াই তিনি তাঁহার দুঃখের হাসিটিকে কোন প্রকারেই সম্বরণ করিতে পারিতেছিলেন না।

রায়-জি বলিলেন, "হবে তোমার মাথা!...এই জমিতে যদি বারোমাস চাষ করতে পাই, আর এই পুকুরে যদি বর্ষায় মাছ ফেলে দিই, আর ওই গাই যদি বারোমাস দুধ দেয়—বাস্! রাজাই বা কে, আর আমিই বা কে!—হাসচো যে?"

আর যাহাই হউক, গাই ও দুধের কথা শুনিয়া মা ও টুনু দুজনেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল।

হাসিবারই কথা।

কথাটা তবে খুলিয়াই বলি।

এখান হইতে ক্রোশখানেক দূরে ঝিলান্‌কাটি নামে একটা মুসলমানের গ্রাম আছে। মাস দুই আগে পশ্চিমদেশের জনকয়েক জোয়ান-জোয়ান পাগড়ি-বাঁধা সাপুড়ে আসিয়া নিজেদের মধ্যেই পাল্লা লাগাইয়া তুব্‌ড়ি খেলা ও বাণ-মারামারি দেখাইয়া সে-গাঁয়ের লোকগুলাকে তাক্ লাগাইয়া দেয়। এবং এই বলিয়া আস্ফালন করিতে থাকে যে, তাহাদের সমকক্ষ গুণী এক 'কাউর কামিচ্ছা' (কামরূপ কামাখ্যা) ছাড়া এদেশে আর কোথাও কেহ নাই।

ঝিলান্‌কাটির মনু মিঞা রায়-জিকে চিনিত। সে একদিন নিজে আসিয়া রায়-জিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়, এবং তাহাদের সঙ্গে পাল্লা লাগাইয়া বাণ-মারামারি খেলিতে বলে।

এ-সব কাজে রায়-জির সম্মতির অপেক্ষা করিতে হয় না। তৎক্ষণাৎ তিনি খেলা সুরু করিয়া দেন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! দু' তিন খানা গ্রাম ভাঙিয়া লোক ছুটিয়া আসে। দেখিতে দেখিতে প্রকাণ্ড আম-বাগান লোকে লোকারণ্য হইয়া ওঠে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া পুরাদমে খেলা চলিতে থাকে। অবশেষে অত বড় বড় পশ্চিমা জোয়ানগুলা একে একে সকলেই ঘায়েল্ হইয়া রায়-জির পায়ের কাছে লুটাইয়া

পড়িয়া সালাম ঠুকিতে ঠুকিতে তাহাদের পরাজয় স্বীকার করে।

সন্তুষ্ট হইয়া মস্থ মিঞা বলে, "এর জন্তে আপনাকে কি দিতে হবে রায়-জি ?"

রায়-জি হাসিয়া বলেন, "এ ত আনন্দের আদান-প্রদান ভাই, এর জন্তে দেবে আবার কি ?"

"তাহ'লেও ..."

রায়-জি বলেন, "একান্তই দিতে যদি চাও ত' বরং আমায় একটি গাই দাও। বৌমা আমার দুধ খেতে পায় না।"

গ্রামের একটা দুষ্টু রাখাল ঠ্যাঙ্গার চোটে মস্থ মিঞার একটা গাইএর বাঁ-পায়ে হাড় বাহির করিয়া মস্ত একটা দগ্‌দগে ঘা করিয়া দিয়াছিল। গাইটা বাঁচিয়া আছে, দুধও এককালে বেশ দিত, কিন্তু খোঁড়া হইয়া অবধি সেবা-শুশ্রূষার অভাবে এখন দুধ অতি সামান্তই দেয়। পুরস্কার স্বরূপ মস্থ সেই গাইটি তাঁহাকে দান করে।

গরুর গাড়ীতে চড়াইয়া বাছুর-সমেত কালো-রঙের গাইটি রায়-জি সেই দিন হইতে নিজের ঘরে আনিয়া রাখিয়াছেন।

এবং শুধু আনিয়া রাখা নয়, চব্বিশ ঘণ্টা রায়-জি তাহার পিছনে লাগিয়াই আছেন। সেবা-শুশ্রূষা বোধকরি মানুষেরও অত হয় না!

ঘরের গাই দুইটি দুধ ছাড়াইয়াছে। পশ্চিমদিকের দেওয়ালের গায়ে ছোট একটি চালায় তাহারা বাঁধা থাকে। কিন্তু এই খোঁড়া গাইটিকে তাহাদের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিলে অজান্তে পাছে উহার ওই ঘায়ের উপর চোট লাগে, এই ভয়ে রায়-জি তাহাকে নিজের বসিবার ঘরখানি ছাড়িয়া দিয়াছেন। গাইটি দিনরাত সেইখানেই বাঁধা থাকে।

বসিবার ঘর গোয়াল হইয়া উঠিয়াছে, আর নিজে ওই দোরের গোড়ায় কদম-তলায় আস্তানা গাড়িয়াছেন।

গাইটির ঘা সারিয়াছে, কিন্তু অত চেষ্টাতেও ভাঙা হাড় আর জোড়া লাগে নাই। গাইটি খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলে।

দুধ যে সে ভাল করিয়া কবে দিবে কে জানে!

মা বলেন, "দুধ ও কখ্‌খনো দেবে না। তার চেয়ে বেশ হয়েছে, এতদিন তোমার অদৃষ্টে ছিল, সেবা-শুশ্রূষা করলে, এইবার তোমার মস্থ মিঞাকে গাইটি তার ফিরে দিয়ে এসো।"

রায়-জি কিন্তু সেকথা বিশ্বাস করেন না। বলেন, "আহা, তোমার দয়া হয় না একটুখানি! যা-হোক্ করে' বাঁচালাম, মস্থ মিঞার ঘরে দিয়ে আসব,—আবার সেই রাখালব্যাটা দেবে কোন্‌দিন ওর ওই শুকনো ঘায়ের ওপর বেড়িয়ে—। তার চেয়ে আহা, যেমন আছে থাক্।... দুধ ও দেবে তুমি দেখো—একটুখানি সুস্থ সবল হোক্।"

সেই অবধি খোঁড়া গাইটি তাঁহার বসিবার ঘরখানি জুড়িয়া বসিয়া সুস্থ সবল হইতেছে।

খোঁড়া এই গাইটির প্রসঙ্গেই হাসি।

মা বলিলেন, "রাজা যখন হবে তখন না হয় দেখব আমরা চেয়ে চেয়ে,—এখন খাবার হয়ে গেছে, চান করে' এসো—যাও।"

টুনুর হাসি তখনও বন্ধ হয় নাই। বলিল, "রাজা হবার সময় এখনও আছে,—টাকা ওর আসুক আগে।"

আহারাদির পর রায়-জি আবার কদম-তলায় গিয়া বসিয়াছিলেন। এমন সময় গ্রামের একটা ছোক্‌রা তাঁহাকে ডাকিতে আসিল।—ষোল-আনা মজ্‌লিসের ডাক!

রায়-জি বলিলেন, "যাই। কিন্তু কিসের মজ্‌লিস রে?"

ছেলেটা কিছুই বলিতে পারিল না।

কয়েকদিন হইতেই এমনি একটা মজ্‌লিসের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল বটে।

মা বলিলেন, "হ্যাগা, এই না বলছিলে, ও সব কাজে তুমি থাকবে না। আবার কেন?"

রায়-জি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কাজ বল দেখি?"

মা বলিলেন, "ওই যে মজলিস না...কি..."

রায়-জি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "না, না, আবার থাকে! তবে যাই একবার শুনে আসি কি বলে।"

বলিয়া রায়-জি উঠিলেন।

পুরাতন কয়েকটি শিবমন্দিরের সুমুখে খড়ের একটি আট-চালার উপর মজলিস বসিয়াছিল। বহু লোক সমাগম হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-সজ্জনেরা কয়েকখানি তালপাতার চাটাই বিছাইয়া মাঝখানে বসিয়াছেন, শূদ্রেরা তাহাদের সংস্রব বাঁচাইয়া একটুখানি দূরে গিয়া বসিয়াছে। রায়-জির অপেক্ষায় আসল কথার অবতারণা তখনও হয় নাই।

রায়-জি আসিতেই জনতার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য জাগিল। তাঁহার জন্য চাটাইএর এক পাশে জায়গা করিয়া দিয়া জনকয়েক লোক একটুখানি চাপাচাপি করিয়া সরিয়া বসিল।

গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে অপ্রশস্ত সুগভীর একটি খাল বন-প্রান্তের উঁচু ডাঙ্গা হইতে নামিয়া আসিয়া চাষের জমির মাঝখান দিয়া বহু দূরে চলিয়া গেছে। এ খাল কেহ খনন করে নাই। অসমতল ভূমিখণ্ডের উপর জল নিকাশের একটি পথ ক্রমশ গভীর হইয়া খালে পরিণত হইয়াছে। বর্ষায় ইহার ড়ুকানা ছাপাইয়া জল থৈ-থৈ করে, কিন্তু তাহার পরেই জল শুকাইয়া যায়,—শুকনো খাল শ্যামল ধরিত্রীর গায়ে দীর্ঘাকৃতি শুষ্ক একটি ক্ষতচিহ্নের মত দাগ কাটিয়া বসিয়া থাকে।

কিন্তু তাহাও যে কোনোদিন কাজে লাগিতে পারে গ্রামের অতগুলা লোকের মধ্যে কাহারও কোনদিন সে-কথা মনে হয় নাই।

রায়-জি সে বছর অনেক চেষ্টা করিয়া, অনেক ঘুরিয়া, ইহার উহার কাছে চাঁদা ভিক্ষা করিয়া, অনেক কষ্টে ইঁট পাথর দিয়া খালটি বাঁধাইয়া ফেলিলেন বর্ষার জল বাঁধা পড়িল।

গ্রামের লোক দেখিল, কাজটা মন্দ হয় নাই। দুপাশে জমি যাহাদের ছিল, রায়-জির উৎসাহে তাহারা সেখানে বারো মাস ফসল দিবার বন্দোবস্ত করিল। হাতের কাছে চমৎকার জল। ফসল মন্দ ফলিল না। কিন্তু রায়-জির শুধু দেখিয়াই সুখ। সেখানে নিজের বলিতে এক কাঠা জমিও তাঁহার ছিল না।

বছর-দুই ফসল সেখানে মন্দ ফলিল না। কিন্তু জমি সেখানে যাহাদের নাই, এত বাড়াবাড়ি তাহাদের অসহ্য হইয়া উঠিল। রাত্রে চুরি হইতে লাগিল। গরু বাছুর ছাগল ভেড়া চরাইয়া দিয়া এ-উহার ফসল নষ্ট করিয়া দিতে সুরু করিল। নিজেরাই শেষে খাওয়া-খাঁওয়ি করিয়া মরিল।

খালের বাঁধ বাঁধানোই রহিল। ফসল আর কেহ সেখানে দিতে রাজি হইল না।

গত তিন বৎসর ধরিয়া সে-সব জমি আবার তেমনি খাঁ খাঁ করিতেছে।

ইহারই জন্য মজলিস।

লালবিহারী বলিল, "তোমায় ত আর একবার উঠে-পড়ে' না লাগলে হয় না রায়-জি।"

রায়-জি বলিলেন, "কি রকম?"

লালবিহারী বুঝাইয়া বলিল, যে, গ্রামের শত্রুপক্ষ, কাহারও শাসন-বারণ মানে না, চুরি করে, গরু বাছুর চরাইয়া ফসল নষ্ট করিয়া দেয়, সুতরাং তাহারই হাতে-গড়া খালের বাঁধ নষ্ট হইতে বসিয়াছে। এ সময় তাহাকে আর-একবার—

রায়-জি হাসিয়া বলিলেন, "বসে' বসে' ছাগল-গরু তাড়াতে হবে?"

অনেকেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রায়-জি বলিলেন, "না ভাই, আমায় আর ও-সবের মধ্যে ডেকো না কেউ।"

পঞ্চু নন্দীর জমি সেখানে ছিল না, কিন্তু আজিকার এই মজলিসে হাজির হইতে সে ভুলে নাই।

রায়-জির কথাটা শেষ হইবামাত্র মাটিতে হাত রাখিয়া সে বলিয়া উঠিল, "ঠিক! কথাটা বলেছেন বহুৎ দুঃখে তা জানি। সেই বেগুন এক সের……"

রায়-জি জিব কাটিয়া হাত নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "চুপ! চুপ! আমি সেজন্যে বলিনি, সেজন্যে বলিনি পশু, ছি, ছি, ও-কথা আমার মনেই ছিল না।"

পশু বলিল, "আপনার না থাকতে পারে, আমাদের ছিল। ওই ত' আকাল মোড়ল বসে' আছে এইখানে! বলুক না—কাজটা ভাল হয়েছিল না মন্দ হয়েছিল—ও নিজেই বলুক না শুনি!"

কাজটা যে মন্দ হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ কাহারও নাই।

ব্যাপারটা অতি সামান্যই।

খালের ধারে যখন ফসল হইত, রায়-জি প্রায় অধিকাংশ সময় সেইখানেই পড়িয়া থাকিতেন। কিন্তু কোনদিন অতি তুচ্ছ কোনও একটি ফসল তিনি হাতে করিয়া বাড়ী আনিতেন না।

মা বলিতেন, "সেখানে তোমার না আছে জমি, না পাও দুটো তরি-তরকারি, কি জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা পড়ে' থাকো বল ত?"

রায়-জি বলিতেন, "দিয়ে যাবে, দিয়ে যাবে সব, ঘরে পৌঁছে দিয়ে যাবে দেখো।"

কিন্তু ঘরে পৌঁছাইয়া দেওয়ার কথা দূরে থাক্, কয়েক-দিন হইতে ঘরে তাঁহার অত্যন্ত তরকারির কষ্ট চলিতে-ছিল, বৌমা তাঁহার ভাত খাইতে পারে না, তাই এতকাল পরে সেদিন ফিরিবার মুখে আকাল মোড়লের ক্ষেত হইতে মাত্র সেরখানেক বেগুন তিনি চাহিয়া আনিয়া-ছিলেন।

দিন দুই পরে আকালের স্ত্রী তাঁহার ঘরে গিয়া হাজির।

দরজায় মা দাঁড়াইয়াছিলেন, আকালের স্ত্রী বলিল, "চারটি পয়সা পাব ঠাকরুণ, বেগুনের দাম

মার হাতে সেদিন পয়সা ছিল না, বলিয়াছিলেন, "আজ ত' নেই মা, আর-একদিন এসো।"

এই অপরাধ। কিন্তু আকালের স্ত্রীর সেদিন—সে কী কথার চোট!

বলে, "মাঠের ফসল—অনেক মেহন্নৎ করে' আজ্জাতে হয়, আর পয়সার বেলা তোমরা এমনি করবে ঠাকরুণ—! কবে দেবে ঠিক করে' বল।"

কথায় কথায় এমনি সব আরও অনেক কথা।

মা সেদিন কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন।

বাড়ী ফিরিয়া রায়-জি শুনিয়া ত অবাক!

সেইদিন হইতে তিনি আর ও খালের পথ মাড়ান নাই।

আবার সেই কাজ……

সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বসিল, মাত্র জনকয়েক ছাড়া।

বলিল, "এ কাজ তোমাকে করতেই হবে রায়-জি।… তোমার তরি-তরকারি আনাজের ভাবনা আমরা ভাবব। ঘরে গিয়ে পৌঁছিয়ে যদি না দিয়ে আসি ত'……"

দিক আর না দিক সে জন্য দুঃখ নাই।

দুঃখ শুধু এই জন্য যে, তাঁহার অত কষ্টের বাঁধানো খাল আজ অনর্থক হইতে চলিয়াছে। দুধারে অমন সুন্দর মাটি আজ বন্ধ্যা নারীর মতই নিষ্ফলা; দু'বছর আগে যাহার যৌবন ফিরিয়াছিল, শস্য-শ্যাম মূর্ত্তিটি যাহার দুদণ্ড দাঁড়াইয়া দেখিতে হইত, আজ তাহার শুষ্ক রুক্ষ মলিন মূর্ত্তিটি দেখিলে চোখ দিয়া জল ঝরে।

রায়-জি বলিলেন, "তবে তাই হোক্!"

তাঁহার সম্মতি পাইয়া অনেকেই তখন ইন্তাম্ করিতে বসিয়া গেল।

সদয় মুরুব্বি মানুষ; বলিল, "আপন-আপন রাখালকে সব বারণ করে' দিও। গরু ছাগল প্রথমত

কেউ ছাড়বে না। ছাড়লে জরিমানা হবে। তাও যদি না শোনে কেউ ত—"

রামজয় বলিয়া উঠিল, "আ হা-হা-হা-হা, তবে আর রায়-জির ওপর ভার দেওয়া হলো কিসের জন্যে? মন্তর-তন্তর কত রকম জানে ও, দেবে তথন ইস্ তিস্ যাহোক্ একটা কিছু করে'—বাস্!"

কেহ বলিল, "ঘরে ভূত নাম্‌বে।"

আবার কেহ বলিল, "গাইএর দুধ উড়ে' যাবে।"

প্রহ্লাদ কিন্তু কোনোটাতেই তেমন করিয়া সায় দিতে পারিল না, ঘরে তাহার সেদিন একটা প্রকাণ্ড সাপ বাহির হইয়াছিল, ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "উঁহুঁ! সপ্প-ভয়ের বাড়া আর ভয় নেই বাবা। ঘরের ভেতর যাহোক্ একটা কিছু গোখ্‌রো-টোখ্‌রো চালিয়ে দিলেই···দাঁড়াবে যখন চক্কর্ নিয়ে···বাস্! গায়ের রক্ত আপনা হতেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

রায়-জি হাসিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ—

পত্র

অভিজাত সাহিত্য

কল্যাণীয়াসু,

তুমি জান্‌তে চেয়েছ "অভিজাত-সাহিত্য" কি?

দেখ্‌চি, আজকাল এম্নি একটা কথা চল্‌তে সুরু হ'য়েছে। সেদিন শিল্পাচার্য্য এর একটা খুব মুখরোচক উচিত জবাব "ভারতীর" পৃষ্ঠায় দিয়েছিলেন। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, বাণীর আবার জাত আছে নাকি?

কবি নিরঙ্কুশ। শিল্পীও তেম্নি অব্যাহত। তাদের কোন একটা গণ্ডীর মধ্যে টেনে নিয়ে এসে "গুড্-বয়" করে রাখা শক্ত। তাই বোধকরি, রুচির দল চুপ ক'রে চেপে গেল। কৈ তার তো একটা সুচিন্তিত ভদ্র-জবাব এ পর্য্যন্ত কেউ দিলে না?

জাত জিনিষটা সংসারে নেই, এ-কথা বলা চলে না। মানুষ, বিশেষত ছোট মানুষদের মধ্যে অমন একটা বিচার থাকেই থাকে। দেখ্‌তে পাবে সমাজের নীচু স্তরের মধ্যেই জাত বিচারের বালাইটা খুব বেশী পরিমাণে থাকে। যত ওপরের দিকে উঠবে ততই সেটা শিথিল হ'য়ে কমে আস্‌চে দেখ্‌বে।

আমাদের পুরুৎ-ঠাকুরের জাতের খুব কড়া বিচার; আবার সেই পুরুৎ-ঠাকুরই স্বামীজির পাদোদক রোজ সকালে পান না করে কোন কাজ করেন না; এদিকে কিন্তু স্বামীজি মোটেই কোন জাত মানেন না।

তেম্নি সাহিত্য-সমাজে, যারা সাহিত্যের ভার বহন করে, যাদের কাছে সাহিত্য সহজ সত্য হ'য়ে ওঠেনি, তারাই তার জাত খুঁজে ফেরে।

সাহিত্য যে কি তা ঠিক করে বুঝে ওঠা শক্ত। কেউ বল্লেন, সাহিত্য রসাত্মক বাক্য। কিন্তু তার পরের প্রশ্ন, রসটা কি? উত্তর, রস তো তিনিই! এ যেন পাঠশালার গুরুমশায়ের

জল—বারি;

না?

এ দুনিয়ায় জীবনের খেলা চল্‌চে। এই খেলা কবে আরম্ভ হয়েছিল, কবে গিয়ে শেষ হবে তা কেউ জানে না! এর প্রাণ কোথায়, কোথা থেকে তা উৎসারিত হচ্চে, মানুষ ভেবে ভেবে কিছুই ঠিক করে উঠতে পারে না। কিন্তু তাই বলে মানুষ এর সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট নয়। একদল মানুষ স্তব্ধ-অবহিত হয়ে এর তত্ত্বকথা জান্‌তে চায়; কি জানি কেন, যেটুকু জানে, সেটুকু যাতে হারিয়ে না যায় তাই লিখে রাখে। এই লেখার মধ্যেই সাহিত্যের ধারা বয়ে আস্‌চে। সাহিত্য বুঝতে চায় জীবনটা কি? অভিব্যক্ত জীবনের মূল সত্যই বোধ করি সাহিত্যের আলোচনার বিষয়।

আমরা যখন ছেলেমানুষ ছিলুম তখন বোধ হয় জাতের সাহিত্য ছিল রামায়ণ মহাভারত, সত্য নারায়ণের পাঁচালি। তখন গীত গোবিন্দ, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদাবলীকে সাহিত্যের "খেউড়" বলা হ'তো।

একটু বড় হ'য়ে জানলুম যে সত্যকার রস-বোধ করতে হলে ওগুলোকে বাদ দেওয়া চল্‌বে না। চণ্ডী-দাসের হাতে সাহিত্যের নাড়ির নাকি অনেকখানি আছে।

দিন কতকের মধ্যেই দেখা গেল বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস সোজাসুজি এসে আমাদের সাহিত্য-পরিষদের কোল জুড়ে বসলো। তখন "এডিসন" বার হ'লো। বটতলার অবহেলার আঁস্তাকুড় থেকে তাদের গতি হলো বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে!

একদিন আমাদের প্রিয় কবিরও জাত ছিল না তাঁর ছিল অসম্ভব দুঃসাহস! তিনি বাংলা দেশের লোককে সৌন্দর্য্য-বুদ্ধিতে প্রণোদিত হ'য়ে, অনেক অপকর্ম্ম করার জন্য ডাক দিয়েছিলেন। তখনো রুচির দল গদা হাতে মাসিক সাপ্তাহিকের স্তম্ভে দাঁড়িয়ে অনেক গলা-বাজি করেছিল। কিন্তু কৈ আজকাল তাদের গলা আর গদা দুই ভেঙ্গে গেছে; কিন্তু কবি তো কোন কথাই প্রত্যাহার করলেন না!

তিনি জীবনের সত্য অনুভূতিগুলি একটির পর একটি ক'রে দিয়ে গেলেন। তাতে কি ফল হলো জান? নিকটের লোকেরা তাঁকে অস্বীকার করলেও, পৃথিবীময় লোক তাঁকে আত্মীয় বলে স্বীকার ক'রে বসলো।

রুচির দলের সেদিনের নেকামির খেলাও মনে পড়ে! স্পেশাল ট্রেণে করে তাঁর তপোবনে পৌছে বল্লে, এই নেও কবি, আমরাও এসেছি তোমার মাথায় জয়-মাল্য দিতে!

রুচির দল জান্‌তো কবি বুঝি কেবল বাঁশিই বাজান; কিন্তু সেদিন কবি করলেন তূর্য্য-ধ্বনি! তার ফল হ'লো ছত্র-ভঙ্গ। রুচির দলের উর্দ্ধ-পুচ্ছ রবির সোনালি আভায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল, সেদিনও

আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এই রুচির দল, কবির গদ্য পদ্য লেখাগুলো কি তাদের অভিজাত সাহিত্য থেকে বাদ দেবে?

ধরে নেও, 'চিত্রাঙ্গদা'। এই বইখানিকে অভিজাত সাহিত্য থেকে বাদ দেবার জন্যে একজন ত বছর কয়েক আগে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। সুনীতির পক্ষ অবলম্বন করে সেদিন যে সব উচ্ছ্বাসের ফেণা উঠেছিল তা তো মাসিকের পাতা চাপাই রয়ে গেল। কেবল পড়লো না চাপা কবির মদন, বসন্ত—আর নায়ক নায়িকার 'গত রজনীর অসহ্য পুলকের' কাহিনী।

রুচির দল সাহিত্যের অকিঞ্চিৎকর স্থলবিশেষে মন না দিয়ে অভিজাত সাহিত্যের ঠাকুর-ঘরের সংস্কারে মন লাগালে বেশ হয় না?

সাহিত্য সত্যের উপলব্ধি। মানুষ মাত্রেরই তেমন

করার অধিকার আছে। সেখেনে রাজার ছেলের আর কোটালের ছেলের পদ-পার্থক্য নেই বলেই ত মনে হয়।

বুঝি, হিমালয়ের বুক ফেটে গঙ্গা-যমুনা, সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্র বার হয়েছে—তাই বলে কি একটি ছোট পাহাড়ের বুক ফেটে ছোট ঝরণা বেরুতে পারবে না? যদি সে ঝরণার জল লবণাক্ত হয় তো, মানুষ যাবে না সেদিকে;—করবে না তার স্তব-গান। চল্‌তে দাও না মানুষকে তার ক্ষুদ্র বুদ্ধিটি নিয়ে! সত্যই কি তোমাদের অভিভাবক হবার বয়স হয়েছে, না বুদ্ধি আছে?

জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়, তোমাদের পুরুতালির তলায় দালালির দলাদলি নেই তো? পয়সার লোভে ঠাকুর পূজা করলে যে কুলীনের ছেলে একদিনে বংশজ হ'য়ে যায়!

সমাজের কোলে আভিজাত্যের স্থান। কিন্তু তারও ত' আদর্শের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। ওদের আভিজাত্য কাঞ্চনে, আমাদের ত্যাগে। য়ুরোপ বড় হ'তে চায় ভোগের ভিতর দিয়ে, এশিয়া বড় হ'তে চায় নিজেকে উৎসর্গ ক'রে। তাই বলে, ওদের মধ্যে ত্যাগ নেই, আমাদের মধ্যে ভোগ নেই, এমন একটা ধরাবাঁধা কথার মধ্যে বিচারকে নিয়ে এলেও ভুল হবে।

ভাল-মন্দর বিচার করতে হ'লেই মাপকাটির দরকার। সেই মাপকাটির নিরূপণের মধ্যে থেকে যায় মানুষের প্রবৃত্তিটি। তাকে অস্বীকার ক'রে চলা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। শুধু বিচার দিয়ে, যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে মানুষ কদিন চ'লতে পারে? সে তার পোষাকি চলা। নিজের তালে, নিজের ছন্দে, নিজের প্রকৃতির মত চলাই—তার আসল চলা।

বুদ্ধদেবের প্রকৃতি ছিল রাজ্য ত্যাগ করে বনে গিয়ে লোক-হিতের চিন্তায় তপস্যা করা; কিন্তু আলেক্‌জাণ্ডারের প্রবৃত্তি সেদিকে ধাবিত হয়নি। অথচ দুজনেই ছিলেন রাজার ছেলে। বুদ্ধদেবাকে যুদ্ধবিদ্যা শেখাবার কতই না চেষ্টা হয়েছিল! কিন্তু তাঁর প্রবৃত্তি আর প্রকৃতির কাছে, সেগুলো ব্যর্থ হ'য়ে গিয়েছিল।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দিয়ে সত্য অভিব্যক্ত হ'তে চায়। সমাজ কিন্তু চায় না, ব্যক্তির অভিব্যক্তি। সমাজের চেষ্টা ব্যক্তিকে খর্ব্ব করে একটা ছাঁচে ঢেলে—মামুলি মানুষ নিয়ে মামুলি জীবন যাপন করতে। তাই যখন ব্যক্তি মাথা তুলে দাঁড়ায় তখন সমাজ আপত্তি করে। ব্যক্তিকে বড় হয়ে উঠ্‌তে হ'লে দুইহাতে লড়াই করতে হয়; প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে, আর সমাজের নিয়মের বিরুদ্ধে।

কিন্তু সমাজের সঙ্গে সাহিত্যকে গুলিয়ে ফেল্‌লে গোল হয়। সাহিত্য যে মানুষের জীবন নিয়ে। তবে কি অভিজাত-সাহিত্য বল্‌তে বুঝব যে রাজা-রাজড়ার জীবন, কি জমিদারের জীবন, না পাঁচশ' টাকার চাকুরের জীবন? সাহিত্য সমান দাম দিতে প্রস্তুত সব জীবনের। বিক্রমাদিত্যের জীবনের সত্যের উপলব্ধি—আর একজন মুটে মজুরের জীবনের উপলব্ধি—দুই সমান আদর পায় সাহিত্যের ভূমিতে।

সমাজে আজো চলচে জোর যার মুলুক তার। সাহিত্যে কিন্তু জোর জবরদস্তি চলে না। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে প্রবল ভাবে কাজ করে প্রেম-শক্তি। তাই সাহিত্যের মধ্যে রসের অত ছড়াছড়ি। মানুষকে বুঝতে হ'লে ওটা বাদ দিয়ে বোঝা চলে না।

একথা রুচির দল স্বীকার করে। সাহিত্য যে বীজ-গণিত নয় তা' তারাও জানে। তবে তাদের কাছে সমাজ বড়, মানুষের প্রেম ছোট। তাই তারা প্রেমকে নিয়ন্ত্রিত করতে চায়। কবি যখন বলেন, সমাজ সংসার বৃথা এ সব, বৃথা এ জীবনের কলরব .....ইত্যাদি; তখন তারা বলে, ঐ সব সর্ব্বনেশে কথাগুলো না বল্লেই পারো কবি, বুঝতে পার না যে আমাদের এই দুনিয়াতে ঘর-সংসার ত' করতে হবে!

সত্যের কবি কিন্তু একগুঁয়ে। সে বলে, সত্যই বড়, তার জন্যে তোমার ঘর-সংসার, দেশ, জন্মভূমি ভেসে যায় ত' গেল, গেলই! আমার কাজ, মানুষের সত্যের অনুভূতিগুলো ব'লে যাওয়া।

কবি যদি সিনার মত নগণ্য কবি হয় ত জনমত বলে, Tear him for his bad verses. আর কবি যদি প্রসিদ্ধি লাভ ক'রে থাকেন ত' জনমত এসব বেমালুম হজম ক'রে যেতে থাকে।

আমাদের দেশের সাহিত্যে দেখ না! ত্রিশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথের জাত ছিল না। দশবছর আগে শরৎচন্দ্রকে ধামা চাপা দেবার চেষ্টা চ'লেছিল। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আজো সে প্রচেষ্টা শেষ হয়নি।

খুব বিস্ময়ের বিষয় এই যে সাহিত্যের স্বাস্থ্য রক্ষার কাজটা সাহিত্যের অকেজো লোকগুলোর হাতেই আসে!

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের নীতি মেনে চলেন নি। রবীন্দ্রনাথ চলেন না। শরৎচন্দ্রও যে কোন দিন চল্‌বেন বলে মনে হয় না।

তাই মনে হয়, 'অভিজাত-সাহিত্য' একটা বোকা-বোঝান কথা। 'সোনার পাথর বাটি' 'কাঁটালের আমসত্ব' 'অশ্ব-ডিম্ব'—এই কথাগুলোর আওয়াজ আছে; কিন্তু অর্থ হিসাবে ও-গুলো একদম ফাঁকি!

তাই বলে শাসন ব্যাপারে ফাঁকা আওয়াজের দরকার নেই—একথা অন্তত সাহিত্যের পাহারাওয়ালারা কিছুতেই স্বীকার করবে না। তবে শুনেছি যারা ডাকে বেশী তাদের দাঁতে বিষ থাকে না।

৬ই আষাঢ়, ১৩৩৪। মণিবজ্র ভারতী

শ্রী শিশিরকুমার নিয়োগী কর্ত্তৃক, ১এ, রামকিষণ দাসের লেন, নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস হইতে মুদ্রিত ও বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

কাশ্মিরা মাঝিয়ান

[প্রবাসীর সৌজন্যে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

কালি-কলম

২য় বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩৩৪ [৪র্থ সংখ্যা

নারী-স্তোত্র

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

১

তোমার চরিত, নারী, কতজনে কত যে বাখানে।
অযুতাঙ্ক নাটকের তুমি যে নেপথ্য-দীপশিখা।
কত নিন্দা, কত স্তুতি!—স্বপনের সীমান্ত-সন্ধানে
ছুটিয়াছে পিছে-পিছে ধরিবারে রূপ-মরীচিকা
কত কবি, কত ঋষি হেরিয়াছে ও নয়নে লিখা
চির-শান্তি মানবের!—তনু তব নরকের দ্বার।
'শয়্তানে'র মোহমন্ত্র, তুমি তার সহজ-সাধিকা—
আদি-মাতা 'ইভ' সেই শিখাইল সহচরে তার
রসাল ফলের স্বাদ, হ'ল যাহে চিরতরে স্বর্গ-বহিস্কার।

২

দুষ্টমতি বিধাতার সৃষ্টি তুমি ?—সুর-তিলোত্তমা !
অসুরের সর্ব্বনাশ—স্বর্গনাশ তোমারি কারণে ।
রিপুর দর্পণে তুমি নর-চক্ষে দেবী নিরুপমা,
পুরুষের পুরুষার্থ হরি' লও, রহে না স্মরণে ।
তুমি তন্বী জ্যোতির্লতা ।. নৃত্য কর নীল নবঘনে,
কভু বজ্র, কভু বারি—নাহি তব ছলনার শেষ,
অনিন্দ্য-সুন্দর ফুল, বৃন্ত বাঁধা বিষধর সনে ।—
সে রূপ নেহারি' আঁখি নিদ্রাকুল, তবু নির্ণিমেষ !
চরণে লুটায় নর, তবু তার বুকে সেকি বিষম বিদ্বেষ !

৩

এ ধরার মরুমাঝে তুমি কিগো প্রস্তর-প্রতিমা ?—
পুরাতন মিশরের প্রশ্নময়ী মূরতি ভৈরবী !
অধরে অদ্ভুত হাসি,—মানবের প্রতিভার সীমা,
প্রজ্ঞা ও পৌরুষ-দম্ভ, অমৃতের আস্ফালন, সবি
উপহাসি' চিরদিন আছ মূক ধিক্কারের ছবি
যুগান্তের বালুকা-শ্মশানে । কত রাজ্য অবসান,
অস্ত গেল অন্ধকারে কত নব-অভ্যুদয়-রবি—
তুমি চির-প্রহেলিকা, আজও তার নাই সমাধান,
দেব, দৈত্য, নর—কেহ পায় নাই কভু তব রহস্য-সন্ধান ।

৪

ভূগর্ভের অগ্নি তুমি, ধরা-দেহে নিগূঢ়-সঞ্চার—
তোমারি অলক্ষ্য তাপে ঋতু-লক্ষ্মী পুষ্প-ফলবতী ;
তুমি উৎস জ্বালামুখী, অকস্মাৎ অনল-উদ্গার—
ভূমিকম্প জলোচ্ছ্বাস, তোমারি সে প্রকট মূরতি !

গৃহকোণে দীপ তুমি, আঁধারের মধুর আরতি,
বনে তুমি দাবানল—দিগন্তের দাহন-উৎসব !
হোম-ধূমারুণ-আঁখি বধূ তুমি, ব্রীড়া মূর্ত্তিমতী ;
তুমি বন্ধ্যা বারাঙ্গনা, নগ্ন অঙ্গ অনঙ্গ-গৌরব—
অধর পিপাসা-পাণ্ডু, নয়নে আরক্ত-রাগ আসব-সম্ভব !

৫

তাই প্রেম-বৃন্দাবনে তুমি কভু হৃদয়-রাধিকা,
ঘাট হ'তে চল পথে, নীল শাড়ী নিঙাড়ি' নিঙাড়ি'—
পরাণ তাহারি সাথে, তুমি সখী পরাণ-অধিকা,
নওল-কিশোরী প্রিয়া, পরকীয়া বধূ বরনারী !
রুদ্রের ঘরণী কভু, সতী তুমি দক্ষের ঝিয়ারী—
দশমহাবিদ্যারূপা, ধূমাবতী, ষোড়শী, কমলা !
তুমি শক্তি সংহারের, শিব নমে চরণে তোমারি—
অসুর-নাশিনী চণ্ডী, কালী তুমি কপালকুণ্ডলা !
তুমি মায়া মাহেশ্বরী, ত্রিসন্ধ্যা-সাবিত্রী তুমি লোহিত-কুন্তলা !

৬

তুমি নারী নর-বধূ, তুমি তার দেহ-সহচরী—
কল্পনার কাম-স্বর্গে তাই তুমি মোহিনী অপ্সরা,
তুমি দেবী, সুধাসিন্ধু-মন্থ-শেষ কল্যাণ-ঈশ্বরী,
ত্রিলোকের অধিষ্ঠাত্রী রমা তুমি, বিষ্ণু-স্বয়ম্বরা !
অবিদ্যারূপিণী, ধনি, ধরে' আছ মিথ্যার পসরা,
উড়িছে ঘাঘরি তব দিকে দিকে বিবিধ-বরণ !
যৌবন-সঙ্কটে তুমি প্রাণেশ্বরী পীন-পয়োধরা—
জায়া-স্বসৃ-মাতা রূপে কর যার মরণ বারণ,
মদন-সদনে তারে বাহুপাশে বাঁধি' আয়ু করিছ হরণ !

৭

তাই দ্বন্দ্ব চিরন্তন, অন্তহীন কলহ সংশয়—
ডানহাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড তাই বাম করে।
তুমি সত্য, তুমি মিথ্যা, তুমি ভয়, তুমিই অভয়—
প্রলাপ বকিছে কবি, যোগী শুধু অট্টহাস্য করে।
শাস্ত্র আর সংহিতায় বাঁধা তুমি নিয়ম-নিগড়ে!—
সৃষ্টির প্রাণের স্ফূর্ত্তি, বন্ধহারা আনন্দরূপিণী,
মৃত্তিকার সোমলতা, সুধাভাণ্ড মৃত্যুর অধরে—
সেই তুমি!—আদি রস-উৎস-ধারা মুক্ত-প্রবাহিনী—
তোমারে বাঁধিবে কেবা?—বিধি পরায়েছে যার চরণে কিঙ্কিণী!

৮

দুই নয়, এক সে যে!—নহে বিষ, নহে সে অমৃত!—
জীবন মরণ নাই,আছে শুধু সৃষ্টির উল্লাস।
নাই মন, নাই মোহ—আছে শুধু ছন্দ অনিন্দিত
আনন্দের, নাই কোনো স্বর্গের আশ্বাস।
ধরিত্রীর এই ধর্ম্ম, তুমি তার মর্ম্মের উচ্ছ্বাস,
প্রলয় হয়েছে লয়, তুমি চির-সৃষ্টির সুষমা,
তুমি কামনার কায়া, বিভু-হৃদি-পদ্মের পলাশ,
চিন্ময়ী মৃন্ময়ী তুমি, শরীরিণী শোভা নিরুপমা—
রাসরসোল্লাসময়ী নিয়তি-নিয়ম-হারা পীরিতি পরমা!

৯

বেদনার বিষহরী! মৃত্যু—তব মঞ্জীর-মেখলা—
নেচে ওঠে তালে তালে, গাও যবে জীবনের গান,
অসীম ব্যথার ভারে তবু তব হৃদয় উতলা
মমতার মহোৎসবে আত্মবলি করিবারে দান!

নয়নের বারি তব কামনারি অভিষেক-স্নান,
যত দুঃখ, যত শোক—তত সত্য এ ভব-ভবন,
সন্তান মরিছে বুকে, তখনি যে নব-গর্ভাধান।
রক্ত-রাঙা বেদনার আলিম্পনে ভরিছ ভুবন—
বেদনা সে? কে বলিবে সুখ নয় অসহ্য সে প্রীতির দহন।

১০

তোমারে চিনিতে নারি' পুরুষের অশান্ত ক্রন্দন—
ধরণীর ঘরণীরে স্বরগের দেবী-সমতুল
হেরিবারে চায় নর—চক্ষে ভাসে অলীক নন্দন,
আকাশ-কুসুম হ'য়ে ফুটে তাই মাটীর মুকুল।
তপনেরে তুচ্ছ করি' তারকার লাগি' সে আকুল।
ওই দেহ-রূপ-হ্রদে—টলমল রসের সায়রে
জুড়াল না জ্বালা তার, ঘুচিল না জীবনের ভুল?
সে চায় অমৃত-দীপ চিরনিশা-যাপনের তরে,
দেহহীন দেবতাত্মা!—দেবী চায় স্বরগের শয়ন-শিয়রে!

১১

মিলনে মলিন তাই, তাই তুমি বিরহে শ্রেয়সী,
দুর্লভ প্রেমের ধ্যানে কত গীত গুমরি' ধ্বনিছে!
পায় নাই যারে কভু, সেই তার পরাণ-প্রেয়সী—
ইতালীর মহাকবি, তুমি তার প্রিয়া 'বিয়াত্রিচে'।
কত স্বর্গ নরকের পথে পথে ধায় তার পিছে,
চরণ টলিছে মুহু, মূরছিয়া পড়ে বার বার।
উন্মাদ হেরিল শেষে—সান্ত্বনার বঞ্চনা সে মিছে—
ঊর্দ্ধ-স্বর্গে স্বর্ণজ্যোতি-কিরীটিনী মূরতি প্রিয়ার!
অমর সে মহাকাব্য, অমরীর স্তবগানে মোহিত সংসার।

১২

আরও এক রাজ-কবি রচিয়াছে মর্ম্মর-অক্ষরে
বিরহের মঞ্জু শ্লোক মমতাজ-মহিষীরে স্মরি,'
আজও তার দীর্ঘশ্বাস হাহা করে কবর-গহ্বরে।—
কবে প্রিয়া বেঁচেছিল?—চিরদিন রহিয়াছে মরি'।
মিলনে মিটেনি তৃষা, তাই দীর্ঘ বিরহ-শর্ব্বরী
জপিয়াছে নাম তার। চিনেছিল কভু কি তাহারে—
একান্ত সে ধরণীর বৃন্ত 'পরে আনন্দ-মঞ্জরী?
তবে কেন আঁখি ধায় পিছে-পিছে মৃত্যু-পরপারে?
জীবনের জয়মালা রাখে কেন মরণের শ্বেত শবাধারে?

১৩

হায় নর! কে বলেছে নারী তব মানসের মিতা?
উন্মাদ তাপস—তুমি, সে ত' নয় স্বেচ্ছা-তপস্বিনী।
তুমি শিল্পী, হেরিয়াছ নারী-মুখে 'প্রজ্ঞাপারমিতা'—
দেহের সীমার শেষে তটহীন রূপ-মন্দাকিনী।
ঋষিপত্নী মৈত্রেয়ীরে জানি আমি—সে ব্রহ্মবাদিনী
ভুলেছিল নারী-ধর্ম্ম,—মুখে তার পুরুষ-ভাষণ।
তুমিই করেছ তারে মূঢ় মূক নিয়ম-চারিণী—
অম্বপালী যাচে তাই যোড়করে বুদ্ধের শাসন,
শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মী, সেও শেষে তেয়াগিল নারীর আসন।

১৪

পতিতা সে? দেহ তার শুচি নয়?—পুরুষের মন
চায় রুক্ষ শমী-শাখা, গূঢ়তাপ যজ্ঞের সমিধ।
পর্য্যাপ্ত-স্তবক-নম্রা বসন্তের লতিকা শোভন
চায় বটে,—আপন মন্দিরে শুধু, ধূর্ত্ত স্থানবিদ্।—

মুক্তবায়ু-বিহারিণী কেড়ে লয় নয়নের নিদ্।
মুক্তির বিমল মুক্তা চায় না সে ডুবিয়া অতলে—
পাপ-ভীরু কৃপণের লক্ষ্য শুধু পুণ্যের কুসীদ !
রমণীর দেহ-মণিপদ্মে যেই আলোক উথলে,
জন্মান্ধের কিবা তায় ?—স্পর্শ করে মৃদ্ভাণ্ড শুধু করতলে।

১৫

তাই তনু তুচ্ছ করি' ফিরে তার অন্তর তপাসি'—
বরাঙ্গে যেথায় নিত্য বিরাজিছে দেবতা সুন্দর
প্রাণের প্রত্যক্ষ রূপে, হেরিল না সেথায় উদাসী
ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রধনু-আঁকা সেই শোভার নির্ঝর !
মাটীর প্রতিমা বটে, মাটি বিনা সবই যে নশ্বর—
দেহই অমৃত-ঘট, আত্মা তার ফেন-অভিমান !
সেই দেহ তুচ্ছ করি' আত্মাভয়-বন্ধন-জর্জ্জর
ভ্রমিছে প্রলয়-পথে অভিশপ্ত প্রেতের সমান,
আত্মার নির্ব্বাণ-তীর্থ নারীদেহে চায় তবু আত্মার সন্ধান !

১৬

হের ওই চলিয়াছে পথে নারী যৌবন-উন্মনা,
অপাঙ্গ লালসা-লোল, স্মিত-হাসি স্ফুরিছে অধরে,
অধীর মঞ্জীর, তবু শ্রোণীভারে অলস-গমনা,
বসনের তলে দুটি স্তনচূড়া এখনো শিহরে।
কাংস্যঘটে গঙ্গাজল, সদ্যস্নাতা ফিরে যায় ঘরে,
তৃপ্ততনু স্নিগ্ধ এবে, গেছে ক্লান্তি গত-যামিনীর,
নাই লজ্জা, নাই খেদ—মুক্তগতি মৃদুলীলাভরে
যায় চলি,' মরালী সে শুভ্রপক্ষ, ত্যজি' পঙ্ক-নীর—
অকুণ্ঠিত আনন্দের নির্ভয় মূরতি ও যে স্রষ্টা-কামিনীর !

১৭

সৃষ্টির মানস-লক্ষ্মী— কালস্রোতে কমল-আসনা—
মুহূর্ত্তে ধরিল রূপ মোর মুগ্ধ নয়নের আগে,
হেরিনু সে বিশ্বধাত্রী, সবে করে তারি উপাসনা,
জন্ম-মৃত্যু বাঁধা আছে পায়ে তার অন্ধ অনুরাগে!
সে যে চির-উদাসিনী, তবু তার হৃদয়-পরাগে
কামনার মধু-গন্ধ, দেহ-দীপে করিছে আরতি
সুন্দরের—মূর্ত্তি যাঁর আত্মহারা কাম-সুখে জাগে।
প্রকৃতির প্রাণরূপা, স্বতঃস্ফূর্ত্ত আহ্লাদিনী রতি—
স্বচ্ছন্দ-স্বৈরিণী ও যে, নিত্যশুদ্ধা, নহে সতী, নহে সে অসতী!

১৮

সেই এক-মূর্ত্তি নারী!—গৃহলক্ষ্মী—জায়া ও জননী—
সেই ভোগসুখতরে সেই নিত্য আত্ম-বলিদান!
দেহের মৃত্তিকা দলি' রাসমঞ্চ গড়িছে তেমনি,
শিশুরে পিয়ায় সুধা, রতি-বিষে পুরুষ অজ্ঞান!
হৃদয়ের ক্ষুধা তার মানে না যে ন্যায়ের বিধান,
যত দুঃখ—তত সুখ, নাই পুণ্য-পাপের ভাবনা,
সর্ব্বত্যাগী অন্ধ কাম—সেই তার প্রেমের প্রমাণ!
নিঃশেষে বিলায়ে দেহ হয় তার স্নেহ-উদ্দীপনা,
যে তার সর্ব্বস্ব হরে—সেই পতি, তারি কণ্ঠে সুচির-লগনা!—

১৯

নমি সেই কুলটারে। দেবী নহে, নহে সে অপ্সরা—
চিনেছি তোমারে, নারী, অয়ি মুগ্ধা মর্ত্ত্য-মায়াবিনী!
বহিতেছ হাসিমুখে পুরুষের পাপের পসরা—
তোমারে নরকে সঁপি' হতভাগ্য স্বর্গ লবে জিনি'!

মানস-মোহিনী অয়ি, মানবের দেহ-প্রসবিনী!
কবে স্বর্গ ঘুচে যাবে?— ঘুচে যাবে আত্মার প্রমাদ?
তোমারি মাঝারে হেরি' নিখিলের প্রাণ-প্রবাহিনী,
লভিবে নির্বৃতি নর, ফুরাইবে নিত্য-বিসম্বাদ—
মৃত্যু-মুক্তি হবে কবে?—ঘুচে যাবে চিরতরে অমৃতের সাধ?

রূপের অভিশাপ

শ্রী নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

১

যুধিষ্ঠির নমোদাস কাসিম বেপারীর উপর হাড়ে চটিয়া গিয়াছিল। ব্যাপারটা নির্ব্বিকার ভাবে ভাবিয়া দেখিলে বিশেষ রাগের কথা নয়, তবু যুধিষ্ঠির মর্ম্মান্তিক চটিয়াছিল।

ব্যাপারটা বিশেষ কিছু নয়। সেবার যুধিষ্ঠিরের ক্ষেতে পাটের ফসল হইয়াছিল অপর্য্যাপ্ত। কিন্তু যখন পাট ঘরে উঠিল তখন পাটের বাজার মন্দা দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের চক্ষু কপালে উঠিয়া গেল। সে অনেক দিন পাট আটকাইয়া রাখিল, কিন্তু যখন দিনের পর দিন জমীদার ও মহাজন তাগাদা লাগাইতে লাগিল আর পাটের বাজার ক্রমেই নামিতে লাগিল, তখন যুধিষ্ঠির নিরুপায় হইয়া সবগুলি পাট বেচিয়া ফেলিল কাসিম বেপারীর কাছে। কিন্তু বিধাতার এমনি বিচার, তার পর সপ্তাহ না ফিরিতে পাটের বাজার ঘুরিয়া গেল, আর দর চড়িতে চড়িতে এমন হইল যে একমাস বাদে কাসিম সেই পাট বেচিয়া মণকরা পাঁচ টাকা লাভ করিল!

খবরটা শুনিয়া অবধি যুধিষ্ঠিরের বুকটা যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তার মনে হইল যে এ টাকা তার ন্যায্য পাওনা, কাসিম কেবল তাহাকে ঠকাইয়া লইয়াছে। এ সিদ্ধান্তের ভিতর যুক্তিটা যে পরিমাণে কাঁচা, তার রাগটা হইল সেই পরিমাণে বেশী।

যুধিষ্ঠির ছিল গ্রামের ভিতর একমাত্র নমঃশূদ্র। তার বাড়ী ছিল হিন্দু পল্লীর বাহিরে, অথচ মুসলমান পল্লীর ভিতরে নয়। তার বাড়ীর পাশেই এক পাশে রাস্তার ওপারে গরীবুল্লার বাড়ী, আর অপর দিকে একটা খালের ওধারে লক্ষ্মণ নাপিতের বাড়ী—নাপিত-বাড়ীর পরই ভদ্র হিন্দু পাড়া।

যুধিষ্ঠির বাড়ী ফিরিয়া দেখিল তার বিধবা মেয়ে হারাণী উঠানে কয়েক গোছা পাট শুকাইতে দিতেছে। এ পাট তাদের ঘরের কাজের জন্য যুধিষ্ঠির রাখিয়া দিয়াছিল। যুধিষ্ঠিরের মেজাজটা চটাই ছিল, পাট দেখিয়া যেন সে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। সে সামান্য একটা কথা তুলিয়া রাগের মাথায় মেয়েকে প্রহার করিয়া বসিল। তার পর সেই রাগে সটান রাস্তার ওপারে গিয়া গরীবুল্লার উঠানে উঠিয়া দাঁড়াইল।

গরীবুল্লা সাধারণ রকম গৃহস্থ। কয়েক খাদা জমি আছে তার, তাই আবাদ করিয়া সে সুবৎসরে ভাল খাইয়া পরিয়া দিন কাটায়, দুর্ব্বৎসরে কোনও মতে সংসার চালায়। তার বয়স বছর পঞ্চাশেক হইবে, কিন্তু ইহারই মধ্যে সে চুল এবং দাড়ী আদ্যোপান্ত পাকাইয়া গ্রামের বুড়া মাতব্বর হইয়া বসিয়াছে

গরীবুল্লা উঠানে বসিয়া একখানা বেড়া বাঁধিতেছিল। উঠানের এক পাশে একটা আলসে' ও কিছু তামাক ছিল। যুধিষ্ঠির একেবারে সেখানে বসিয়া কল্কেতে তামাক ভরিতে ভরিতে বলিল, "শুনেছ গরীবুল্লা ভাই, কাসিম বেপারী আজ কি দরে পাট বেচেছে?"

গরীবুল্লা একটা বাঁধন শক্ত করিতে করিতে বলিল, "শুনেছি বই কি?—একেই বলে কপাল!"

"কপাল!—না শালা চোর!"

এ বিষয়ে গরীবুল্লার কোনও মত ভেদ ছিল না। সে এ কথায় সম্পূর্ণ সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া কাসিমের পূর্ব্বকৃত বহু অপরাধের পুনরাবৃত্তি করিয়া গেল। কাসিমের উপর তার বা গ্রামের আর কাহারও রাগ যুধিষ্ঠিরের চেয়ে কম ছিল না। কেন না কাসিম তারও পাট সস্তা দরে কিনিয়া লইয়াছিল

তার পর তাহারা দুজনে মিলিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাসিম ও তার পিতা ও পিতামহের অনেক কুকীর্ত্তির কথা অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত আলোচনা করিয়া তাহাদের মনের ক্ষোভ মিটাইল।

গরীবুল্লা বেড়াখানায় শেষ বাঁধন দিয়া তাহা খাড়া করিয়া রাখিয়া যুধিষ্ঠিরের পাশে তামাক খাইতে বসিল।

সহানুভূতিতে যুধিষ্ঠিরের দুঃখসাগর উদ্বেলিত হইয়া । জগতে যত লোকের যত অবিচারের জন্য তার অভিযোগ ছিল তাহা তার বুকের ভিতর ঠেলা মারিতে লাগিল। সে বলিল, "একেই বলে কারো সর্ব্বনাশ, কারো পৌষ মাস। ঐ পাট যদি আজ আমার ঘরে থাকতো তবে কি আজ নফর সা' আমাকে এমনি বেইজ্জত ক'রতে পারে! আজ শালা এক হাট লোকের মাঝখানে আমাকে যা তা ব'লে গালাগালি ক'রলে।"

গরীবুল্লা সহানুভূতির সহিত বলিল, "কেন, তার সেই খতের টাকার জন্য?"

"হাঁ ভাই। আমি ভেবেছিলাম এবার পাটের টাকায় সব শোধ ক'রে দেবো। পারতামও তো, যদি না ওই কাসিম শালা আমাকে ঠকিয়ে নিত।"

"তা কিছু দিয়ে ওকে ঠাণ্ডা কর না!"

"না, শালা তা শুনবে না। ওর একশো টাকার খতে এখন তিন শো টাকা হ'য়েছে, ও এখন টাকা চায়। এই বারই ধনে-প্রাণে মারা গেলাম—ঐ কাসিম শালাই আমাকে মারলে।"

যুধিষ্ঠির ক্রমে প্রকাশ করিল যে এখন তার সব জোত-জমা বিক্রয় করিয়া এ-গ্রাম পরিত্যাগ করা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। সে স্থির করিয়াছে, সব জোত বিক্রয় করিয়া স্ত্রী ও কন্যাসহ শ্রীনবদ্বীপ বাস করিবে। হিসাব করিয়া সে দেখিল যে সমস্ত জোত-জমী বিক্রয় করিলে সে সাত-আটশো টাকা পাইবে। তাহা হইতে নফর সাহার টাকা শোধ করিয়া সে অবশিষ্ট অর্থে নবদ্বীপ ধামে একরকম করিয়া চালাইয়া যাইতে পারিবে

কথাটা শুনিয়া গরীবুল্লার মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। যুধিষ্ঠিরের ক্ষেতগুলি গরীবুল্লার নিজের জমীর গায় গায়। যদি গরীবুল্লা জমী ক'খানা কিনিয়া রাখিতে পারিত! কিন্তু অত টাকা সে পাইবে কোথায়? আজ যদি সে পাটগুলি কাসিমকে না বেচিয়া ফেলিত তবে সে অনায়াসেই ক্ষেত ক'খানা রাখিতে পারিত। এখন সে কল্পনাও বাতুলতা। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল—তাহা যুধিষ্ঠিরের সহিত সহানুভূতির দীর্ঘশ্বাস নহে!

এমন সময় একটি মেয়ে যুধিষ্ঠিরের বাড়ীর দিক হইতে আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল—এক মুহূর্ত্তে সমস্ত বাড়ীখানা যেন হাসিয়া উঠিল। সে গরীবুল্লার মেয়ে পরী—বয়স বছর চৌদ্দ, কিন্তু বেশ ডাগর মেয়ে—রূপের ডালি। তার

পরণে ছিল লাল পেড়ে মোটা একখানা নীলাম্বরী, গলায় পুঁতির চিক, হাতে দু' গাছা কাচের চুড়ি—তবু হীরার গহনা-পরা রাজকন্যাকে ছাড়িয়া তার দিকে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। ফুট্‌ফুটে রং উপচীয়মান যৌবন-শ্রী তার সারা অঙ্গ অপরূপ লাবণ্যে ভরিয়া রাখিয়াছে।

পরীর বিবাহ হয় নাই। অনেকে তাকে বিবাহ করিতে চায়, কিন্তু তবু তার আজও বিবাহ হয় নাই, কেন না মনের মত ঘর বর পাওয়া যায় নাই। গরীব চাষীর ঘরের মেয়ে সে, পরদার ধার ধারে না, সবার সামনেই ঘুরিয়া বেড়ায়; গ্রামের যুবকের দল ছটফটাইয়া মরে—কিন্তু গরীবুল্লার কাছে কথা পাড়িলে বুড়া কেবল ঘাড় নাড়ে। সাহেবুল্লা—সে একজন মাতব্বর চাষী—সে তার ছেলে লতিফের সঙ্গে পরীর বিবাহের জন্য ঝুলোঝুলি করিয়া গিয়াছে, গরীবুল্লা রাজী হয় নাই। সকলে বলে, বুড়া বুঝি মেয়ের জন্য কোনও রাজা-বাদশা জামাতার কল্পনা করিতেছে!

পরী আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিল, "চাচা, আপনি হারাণীকে মেরেছেন কেন?"

এই কিশোরীকে দেখিয়া তুই বুড়ার মনের মেঘ হঠাৎ কাটিয়া গিয়া মনের ভিতর একটা অপূর্ব্ব আনন্দের জ্যোৎস্না খেলিয়া গিয়াছিল। তাই যুধিষ্ঠির রাগ করিতে পারিল না, সে হাসি মুখে বলিল, "মেরেছি তাই কি? তুই আমাকে সাজা দিবি না কি পরী?"

পরী বলিল, "আমি কেন সাজা দিতে যাব! সেই দিতে গিয়েছিল—ভাগ্যে আমি কাছে ছিলাম।"

"সে কি?" বলিয়া যুধিষ্ঠির ও গরীবুল্লা দুজনেই উঠিয়া পড়িল।

পরী বলিল, সে পুকুর ঘাটে জল আনিতে গিয়া দেখিতে পাইল যে ঘাটের কাছে একটা কাপড়ের একটুখানি ভাসিতেছে, তার পরই সে কাপড় তলাইয়া গেল। দেখিয়া তার মনে সন্দেহ হইল। কেহ ডুবিয়া মরিতেছে স্থির করিয়া সে চীৎকার করিয়া জলের ভিতর নামিল। সেখানে ডুব দিয়া দেখিতে পাইল তার অনুমান সত্য। সে তখন জলমগ্নাকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল, বহু কষ্টে ঠেলিয়া ঠেলিয়া তাহাকে থাই জলে আনিয়া দেখিল সে হারাণী! ঠিক সেই সময় তার চীৎকার শুনিয়া সাহেবুল্লা মণ্ডলের ছেলে লতিফ আসিয়া পৌঁছিল এবং তারা দুজনে হারাণীর গলার কলসী খুলিয়া তাহাকে টানিয়া উঠাইল। হারাণী সামান্য কিছুক্ষণ বেহুঁস হইয়া ছিল। তারপর জ্ঞান হইলে তাকে সুস্থ করিয়া পরী তাহাকে বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছে।

পরী ভারী রাগ করিয়া বলিল, "একে তো বিধবা মেয়ে, তাকে অমনি ক'রে মারতে আছে! ছি!" বলিয়া খুব ভারিক্কী-চালে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পরী বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

যুধিষ্ঠির তখন চঞ্চল হইয়া বাড়ীর দিকে ছুটিল। গরীবুল্লা তখন কল্কে ঢালিয়া আর এক ছিলিম চড়াইতে চড়াইতে ভাবিতে লাগিল, "আজকালকার এই মন্দার বাজারে পাঁচশো টাকা হ'লেই যুধিষ্ঠিরের জোত ক'খানা রাখা যায়। কিন্তু পাঁচশো টাকা! হায় পাঁচ—শো—টাকা!"

পিছন হইতে কে ডাকিল, "গরীবুল্লা মিঞা, আছ কেমন?"

চমকিত হইয়া গরীবুল্লা পশ্চাতে চাহিয়া দেখিয়া একেবারে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। একটা ঘরের দাওয়ায় একটা ছেঁড়া মোড়া ছিল, তাহা টানিয়া ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া আগন্তুককে বসিতে দিল। আগন্তুক আর কেহ নয়, স্বয়ং কাসিম বেপারী।

কাসিম বেপারী পিয়ারপুর গ্রামে একটা কেও-কেটা নয়। তাহার পিতা চাষী গৃহস্থ ছিল, কিন্তু নানারকম ফিকির ফন্দী করিয়া সে তার অবস্থা অনেকটা উন্নত করিয়াছিল, মুসলমান পাড়ার মধ্যে প্রথম টিনের ঘর তুলিয়াছিল সে, এবং তার পুত্র কাসিমই এ গ্রামের মধ্যে প্রথম উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। পিতার

মৃত্যুর পর কাসিম তার জোত-জমী বর্গা বন্দোবস্ত করিয়া নানারকম ব্যবসা আরম্ভ করিল। তার বুদ্ধির বলে, কতক অদৃষ্টের জোরে তাহাতে তার অবস্থা ক্রমেই ভাল হইয়া চলিল। ক্রমে সে জমীদারের বাড়ীর জন্য ইট কাটিবার কণ্ট্রাক্ট লইল। সেই কাজে ফালতু যে ইট বাঁচিল তাহা দিয়া সে তার ঘরের পাকা দেয়াল ও মেঝে এবং বাড়ীর চারিদিকে পাকা প্রাচীর করিয়া ফেলিল। এদিকে পাটের ব্যবসায়ে বছর বছর লাভ লোকসানের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে সে হঠাৎ এ দুই বৎসরে অনেক টাকা লাভ করিয়া একেবারে একটা কেষ্ট-বিষ্টু হইয়া বসিয়াছে।

সুতরাং যদিও চাষী গৃহস্থের সন্তান সে, তবু, তার চাল-চরিত্র ভদ্রলোকের মত, এবং স্বভাবতই সে চাষীদের সঙ্গে বড় মেলামেশা করিতে যায় না। যদি কখনও কথাবার্ত্তা কয় সে অবজ্ঞার সহিত। গ্রামের চাষীরা তার উপর চটাও বটে খুসীও বটে। তার ব্যবহারে অনেকে অনেক সময় মনঃক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু তবু তাদেরই একজন যে এত বড় লায়েক হইয়া উঠিয়াছে—সেজন্য তাদের গর্ব্বেরও অন্ত নাই।

এ হেন কাসিম বেপারী আজ বিনা নিমন্ত্রণে গরীবুল্লার বাড়ী আসিয়াছে এবং গরীবুল্লাকে "মিঞা" বলিয়া সম্মান করিয়াছে। গরীবুল্লার ছাতিটা উপযুক্ত পরিমাণে ফুলিয়া উঠিল তাহা বলাই বাহুল্য। সে তাড়াতাড়ি কাসিমকে বসাইয়া তামাক সাজিতে লাগিল।

কাসিমের বয়স গরীবুল্লার চেয়ে বেশী—কিন্তু সে বলে তার এখনও চল্লিশ পার হয় নাই। তার শরীর খর্ব্ব, রং কালো, চোখ দুটো ছোট ছোট, দাড়ি আছে গোঁফ নাই। তার দাড়ি ও চুলের রঙ্গ মিশ্‌মিশে কালো, কিন্তু পাঁচ সাত বৎসর পূর্ব্বে তার ভিতর অনেকটাই সাদা ছিল। দুষ্ট লোকে বলে এ নাকি কলপের কৃপায়। সে নিজে বলে যে বাতিকের জন্য তার চুল অসময়ে পাকিয়া গিয়াছিল, এক ফকীরের ঔষধে তাহা কাঁচিয়া গিয়াছে। তার ঠোঁট দুটো আবশ্যকের অতিরিক্ত পুরু এবং তার ভিতর দিয়া অনেক-গুলি দাঁত মুক্ত বায়ু সেবনের জন্য বাহির হইয়া পড়িয়াছে—সম্ভবত মুখের ভিতরকার দুর্গন্ধ সহ্য করিতে না পারিয়া। তার পোষাক-পরিচ্ছদ বেশ ভদ্র রকমের—পায়ে অক্সফোর্ড সু, পরণে দেশী তাঁতের ধুতি, গায় একটা ছিটের কোট এবং মাথায় মখ্‌মলের ফুলদার টুপী।

কাসিম গরীবুল্লা "মিঞা"-সাহেবের কুশলাদি বিবিধ প্রশ্ন ও নানাপ্রকার বিশ্রম্ভালাপের পর অত্যন্ত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া যে কথার অবতারণা করিল তাহা সংক্ষেপে এই যে কাসিম স্বয়ং পরীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে।

গরীবুল্লার মনটা এ কথায় নৃত্য করিয়া উঠিল, কিন্তু সে মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "সে কেমন ক'রে হয় বেপারী ভাই, পরী আমার যে দুধের মেয়ে।"

কাসিম হাসিয়া বলিল, "দুধের মেয়ে তো খাচ্ছে শাক ভাত, দুধ দিতে তাকে পারছো কই? আরে মিঞা আমি তো তোমার অবস্থা না জানি এমন নয়! ওই মেয়ে কি তোমার ঘরের যোগ্য? আমার ঘরে গেলে ও যেমন পরী, তেমনি পরীর মত পায়ের উপর পা দিয়ে থাকবে—দুধে-ভাতে থাকবে।* এ সহজ কথাটা বুঝছো না মিঞা!"

মিঞা সে কথা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল। উপরন্তু সে বুঝিয়াছিল যে একটু চাপিয়া গেলে, দুধ ভাত কোন্ ছার, কিছু টাকা-কড়িও নামিয়া আসিবে। তাই সে গম্ভীর-ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তার মা কিছুতেই রাজী হ'বে না বেপারী সাহেব। কচি মেয়েটা, তাকে সতীনের ঘরে—"

"সতীনের ঘর তাতে হ'য়েছে কি? ছেলেপিলে তো নেই। বুঝে দেখ মিঞা—কাসিম বেপারী মরদের বাচ্ছা—সে মেয়েমানুষের কথায় ওঠে বসে না। আমার ঘরে দশটা সতীন থাকলেও কার ঘাড়ে কটা মাথা যে টুঁ শব্দ ক'রবে। আমি কথা দিচ্ছি, তোমার মেয়েই হ'বে বাড়ীর মালিক—সতীন হ'বে তার বাঁদী।"

"তা' হ'বে সে আমি বুঝি সাহেব, কিন্তু, মেয়েমানুষ, বোঝেনই তো, অবুঝ জাত—ওদের বোঝান শক্ত। সে কিছুতেই রাজী হ'বে না।"

একটু দম ধরিয়া থাকিয়া কাসিম বলিল, "আচ্ছা কবুল, আমি আজই আমার জরুকে তালাক দেব। নেও, আর কোনও কথা নেই তো ?"

মুখ ভার করিয়া গরীবুল্লা বলিল, "আছে বই কি সাহেব—ছেলেমানুষ, তার কত সাধ আহ্লাদ—তাকে—এই আপনার তো কিছু বয়স হ'য়েছে।"

"আরে মিঞা, তুমি এমন বুদ্ধিমান হ'য়ে এমন কথাটা বল্লে ? তোমার ও মেয়ের কদর আজকালকার কচি ছেলেরা বুঝবে কি ? দেখ, বিয়ে যদি দিতে হয় তো বরের বেশ একটু বয়েস দেখে দিতে হয়, যে কোন্ জিনিষের কি দাম তা' বোঝে। বলি বয়সের যে বুদ্ধি বিবেচনা তারও তো একটা দাম আছে ? কি বল !"

"হাঁ, সে আমি তো বুঝি সাহেব, কিন্তু ওর মা—মেয়ে-মানুষ—"

"শোন মিঞা, বুঝে দেখ ! আমার কাছে তোমার মেয়ে রাজার হালে থাকবে। তা ছাড়া আমি নগদ পাঁচ শো টাকা মহর দেব—আর হাজার টাকার কাবিন লিখে দেবো।—বোঝ এমনটি পাবে কোথাও ?"

"কিন্তু ওর মাকে বোঝানই যে দায় সাহেব !"

"আরে মিঞা, মেয়েমানুষের কথা অত শুনতে আছে ! ওদের যত আস্কারা দেবে ওরা তত মাথায় চড়ে' ব'সবে। তুমি একটা বুদ্ধিমান লোক, বুঝে দেখ। একটা গরীব ছোকড়ার সঙ্গে যদি ওর বিয়ে দেও, ওর খাওয়া-পরার কষ্ট হবে—অমন সোণার শরীর তোমার মেয়ের, ধান ভানতে ভানতে হাড় কালি হ'য়ে যাবে ! আমার কাছে, পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে খাবে। কোন্‌টা ভাল হ'বে ভেবে দেখ দেখি।"

গরীবুল্লা তবু ভিড়িবার মত নয় দেখিয়া কাসিম তার ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িল। সে গরীবুল্লার কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিল, "তা ছাড়া—আমি এও বলে রাখছি, বিয়ের দিন এজেন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি নিজে পাবে পাঁচশো টাকা।"

গরীবুল্লার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এই পাঁচশো টাকাই না সে এই মাত্র চাহিতেছিল ! খোদা তার প্রার্থনার এমন হাতে হাতে জবাব পাঠাইয়াছেন। পাঁচশো টাকায় সে যুধিষ্ঠিরের ক্ষেত ক'খানা অনায়াসে কিনিতে পারিবে। নেহাৎ যদি না হয়, সাতশো টাকা তো যুধিষ্ঠির নিজ মুখে দাম বলিয়াছে—তা' এ বেপারীর কাছে আর একটু চাপাচাপি করিলে আর দু'শো টাকা অনায়াসে আদায় হইবে !

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গরীবুল্লা বলিল, "আচ্ছা, দেখি ওর মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে—কি ক'রতে পারি। কিন্তু হয় যদি বেপারী সাহেব, বলে রাখছি—পাঁচশো টাকা নয়, আমাকে সাতশো টাকা দিতে হ'বে।"

বেপারী প্রথমে একটু কেঁও-মেও করিয়া শেষে ইহাতেই সম্মত হইল। গরীবুল্লা পরের দিন সকালে সংবাদ দিবে এই আশ্বাস দিয়া বেপারীকে বিদায় করিল।

২

হারাণীকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবার যে বিবরণ পরী দিয়াছিল তাহার কোনও অংশ মিথ্যা না হইলেও পরী একটুখানি সত্য গোপন করিয়াছিল।

পরীর যে ঠিক সেই সময় জল আনিতে যাইবার দরকার হইয়াছিল একথা ঠিক নহে। জল আনিতে যাইবার কিছু পূর্ব্বে সাহেবুল্লার ছেলে লতিফকে গরীবুল্লার বাড়ীর পাশ দিয়া যাইতে দেখা গিয়াছিল—এবং দেখিয়াছিল পরী। তাদের চোখে চোখে কিছু আলাপও হইয়াছিল, তাই পরীর তাড়াতাড়ি জল আনিবার দরকার হইয়াছিল।

পুকুরটি সেন-বাবুদের বাগানের ভিতর। বাগানটি

গ্রামের বাহিরে একটু নির্জ্জন স্থানে, যুধিষ্ঠিরের বাড়ী হইতে বেশী দূর নয়। এই বাগানে লতিফ কয়েকটা গরু ছাড়িয়া দিয়া গাছতলায় বসিয়া গান গাহিতেছিল। পরী আসিয়া ঘাটের কাছে কলসী রাখিয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিল। কেউ কোথাও নাই দেখিয়া সে পুকুরের অপর পারে একটা বেতের ঝোপের দিকে অগ্রসর হইল। লতিফও এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া সেখানে গিয়া জুটিল।

লতিফ সহাস্য মুখে লালসাভরা চোখে পরীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল; "কিরে পরী, আজ যে বড় দয়া হ'ল—এলি বড়! এতদিন এত সাধছি, তুই মুখ ফিরেও চাস্ না, আজ এত দয়া!"

হাসিয়া লজ্জায় মুখ নত করিয়া পরী বলিল, "আমার খুসী আমি এলাম। তাই হয়েছে কি?"

বলিয়া সে এমন মধুর ভঙ্গী করিয়া নত মস্তকে লতিফের দিকে কটাক্ষ করিল যে লতিফ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সে চট্ করিয়া পরীর দেহখানি দুই বাহু দিয়া বেষ্টন করিয়া ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিতে অগ্রসর হইল।

পরী নানা রকমে মুখ ঘুরাইয়া তার সে উদ্যত চুম্বন ব্যর্থ করিয়া বলিল, "ও কি ছি, ছেড়ে দেও বলছি! যাও!"

লতিফ কিন্তু ছাড়িল না। প্রবল বাহুতে পরীকে সম্পূর্ণ বন্দিনী করিয়া সে তার ওষ্ঠাধর হইতে প্রথম চুম্বন আদায় করিয়া লইল।

এই সম্ভাষণে পরী ভয়ানক ভীত ও চমকিত হইয়া উঠিল। লতিফ তাহাকে ছাড়িয়া দিতেই সে ছুটিয়া পলাইল।

লতিফ তার অনুসরণ করিল না, মুগ্ধ তন্ময় দৃষ্টিতে তার অপরূপ লাবণ্যে মণ্ডিত দেহযষ্টির লীলাগতির অনুসরণ করিতে লাগিল।

ঘাটে আসিয়া পরী দেখিতে পাইল পাশের ঘাটে একখানা কাপড়ের শেষ ভাগ তখন তলাইয়া যাইতেছে। সে তখন ছুটিয়া গেল, এবং লতিফকে চীৎকার করিয়া ডাকিল। তারা দুজনে হারাণীকে তীরে উঠাইল—এবং জ্ঞান সঞ্চার হইলে তাহাকে বাড়ীতে রাখিয়া আসিল।

তার পর তারা দুজনে আবার পুকুর ধারে ফিরিয়া গেল। পাশাপাশি তারা হাঁটিয়া ফিরিয়া গেল। কেমন একটা লজ্জা আসিয়া দুজনের মাঝখানে দাঁড়াইল, তারা কেউ কথা বলিতে পারিল না। পরী তার কলসী ভরিয়া লইল, লতিফ সুধু চাহিয়া দেখিল। যখন পরী নত মস্তকে বাড়ী যাইবার জন্য পা বাড়াইল, তখন লতিফ কথা বলিল।

"তোর বাবা কি কিছুতেই তোকে আমার সঙ্গে বিয়ে দেবেন না পরী?"

পরী নীরবে কাপড়ের খুঁট ধরিয়া কামড়াইতে লাগিল।

লতিফ আবার বলিল, "কি বলেন তোর বাবা?"

পরী সুধু বলিল, "জানি না।"

তার পর পরী দ্রুত পদে চলিতে লাগিল। লতিফ পশ্চাৎ হইতে বলিল, "আমি আবার বাপজানকে পাঠাব তোর বাবার কাছে, আজই মাকে বলবো। তুই তোর মাকে বলবি ত?"

পরী বলিল, "দূর্!"

যতক্ষণ পরীকে দেখা গেল লতিফ হাঁ করিয়া সেদিকে চাহিয়া রহিল। তার পর সে হতাশ মনে ফিরিয়া গাছ-তলায় গিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল কেমন করিয়া পরী-টাকে বিবাহ করা যায়।

লতিফের বাপ সাহেবুল্লা মণ্ডল পিয়ারপুরের মধ্যে একটা মাতব্বর লোক। তারা তিন পুরুষ মণ্ডলি করিতেছে, এবং চাষীসমাজে তার প্রতিপত্তি যথেষ্ট। তার জমাজমী যাহা আছে তাহা তার চার ছেলে ও চার মেয়ের মধ্যে ভাগ হইলেও প্রত্যেকের খাওয়া-পরার পক্ষে যথেষ্ট হইবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। লতিফ তার তৃতীয় পুত্র। তার বয়স উনিশ বিশ, শরীর সুগঠিত ও বলিষ্ঠ। তার গায়ের রং কালো, কিন্তু সে

কালো রঙের মধ্যে একটা চিক্কণ শ্রী আছে—তাহা চক্ষুকে পীড়া দেয় না। মুখের প্রত্যেকটি অবয়ব সুগঠিত স্ফুট ও উজ্জ্বল। এমন বাপের এমন ছেলেকে জামাই করিতে পারিলে পাশের সাত খানা গাঁয়ের যে কোনও মেয়ের বাপ ধন্য হইয়া যায়। কিন্তু কি বেয়াড়া এই গরীবুল্লা সেখ, ইহাকে কিছুতেই রাজী করা যাইতেছে না।

লতিফ ইহার পূর্ব্বেই তার মায়ের কাছে জানাইয়াছিল যে সে পরীকে বিবাহ করিবে। মাতা যথাসময়ে পিতার কাছে জানাইয়াছিলেন। সাহেবুল্লাও স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করিতে ত্রুটি করে নাই। সে হাজার টাকার কাবিন ও নগদ মহর তিন শত টাকা পর্য্যন্ত কবুল করিয়াছিল—এত টাকা এ অঞ্চলে কেউ কখনও দেয় নাই—তবু গরীবুল্লা রাজী হয় নাই। শেষে সাহেবুল্লা রাগ করিয়া কঠিন শপথ করিয়া বলিয়াছিল যে সে পুনরায় গরীবুল্লার বাড়ী এ প্রস্তাব লইয়া যাইবে না।

সুতরাং এখন লতিফের পক্ষে পুনরায় এ বিষয় উত্থাপন করা কঠিন বলিয়া মনে হইল। সাহেবুল্লাকে সে চেনে। একবার যে জিনিষ সে হারাম বলিয়াছে সে কাজ সে কখনও করিবে না। কিন্তু এখন লতিফের মনে হইল, এ কাজ না করিলেই হইবে না, পরীকে পাইতেই হইবে। এত দিন সে এক রকম হাল ছাড়িয়া বসিয়া ছিল, কিন্তু আজ সে পরীকে তার বক্ষে ধরিয়াছে, তার চুম্বনের স্পর্শে এখনও তার ওষ্ঠাধর জ্বলিতেছে, আজ তার মনে হইল পরীকে পাইতেই হইবে।

সে আপন মনে বসিয়া বসিয়া অনেক রকম জল্পনা করিতে লাগিল। পরীকে কবিলারূপে পাইলে তার জন্ম যে কেমন করিয়া চারিদিক দিয়া সার্থক হইয়া যাইবে তাই লইয়া সে অশেষ স্বপ্ন রচনা করিতে লাগিল। কি উপায়ে তাকে পাইবে তার সম্বন্ধে অনেক রকম অসম্ভব কল্পনা করিতে লাগিল। কিন্তু পরীর সেই অঙ্গস্পর্শের স্মৃতি আর তার সঙ্গসুখের স্বপ্ন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তার সমস্ত অঙ্গ অপূর্ব্ব পুলকে ভরিয়া দিয়া বারবার তার সে সব কল্পনা ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিল।

নিজের বুদ্ধিতে সে ইহার কোনও একটা কিনারা করিতে না পারিয়া স্থির করিল তার বন্ধু ফকীরের সঙ্গে এবিষয়ে পরামর্শ করিবে। ফকীরের বয়স তার চেয়ে দুই চার বৎসর বেশী ; তার বুদ্ধিশুদ্ধির খ্যাতি আছে, তার পেটে কালির আখরও আছে। তাহার জোরে সে গ্রামের লোকের দলিল লেখে, রেজেষ্টি আফিসে গিয়া দলিল রেজেষ্টি করে, এবং গ্রামবাসীদের মোকদ্দমা মামলার তদ্বির করে। এই সবই তার প্রধান উপজীবিকা—জমী-জমা যৎসামান্য আছে, তাহা বর্গাতে আবাদ হয়—ফকীরের নিজের চাষ করিবার সময় নাই।

গরুগুলিকে কোনও মতে বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া লতিফ তাই ছুটিল ফকীরের সন্ধানে।

লতিফ প্রস্তাব করিল পরীকে চুরী করিয়া কোনও খানে লইয়া গিয়া বিবাহ করিবে। ফকীর তাহাতে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তাহাতে ফৌজদারী হইবে—দায়রা মোকদ্দমা পর্য্যন্ত হইতে পারে, ওসবে কাজ নাই।

লতিফের তখন রক্ত গরম, ফকীরের এই উপদেশ তার কাছে অত্যন্ত কাপুরুষের মত মনে হইল। লতিফের বাহুতে শক্তি আছে, অন্তরে সাহস আছে। দাঙ্গা হাঙ্গামা করিতে সে সতত প্রস্তুত। সে একটা সামান্য ফৌজ-দারীর ভয়ে পেছপা হইবে ? এত বড় কাপুরুষ সে নয়। সে কথা সে ফকীরকে জানাইয়া বলিল, "হয় হ'বে ফৌজদারী, না হয় কয়েক দিন জেল খাটবো। তা ছাড়া যদি আমি ওকে চুরী ক'রে নিয়ে ধুবড়ী পালাই তবে আমাকে ধরে কোন্ বেটা ?"

ফকীর বলিল, "তা না হয় হ'ল, কিন্তু তা' হ'লেও নেকাটা ঠিক হ'বে না বাতিল হবে তার ঠিক নেই। পরীর যে বয়স তাতে হয় তো ওর এজেন দেবার এক্তিয়ারই হয় নি, তা' হ'লে নেকা তো বাতিল হয়ে যাবে!"

এ কথায় লতিফ হটিয়া গেল। সে বলিল "অ্যাঁ, তাই হ'বে না কি? আচ্ছা, তাই যদি হয় তবে কি হ'বে?"

"কি আর হ'বে—তবে সে তোর জরু হ'বে না, এই। আর তার বাপ তাকে তোর কাছ থেকে জোর ক'রে নিয়ে আসবে।"

"তবে?" বলিয়া লতিফ বসিয়া পড়িল।

তখন ফকীর তাকে বলিল, "দেখ, এ সম্বন্ধে ঠিক হদিসটা আমার জানা নেই। আমি বলি চল্, কাল মহকুমায় গিয়ে একটা উকীলকে জিজ্ঞাসা ক'রে আসি কিসে কি হয়।"

অবশেষে সেই পরামর্শই স্থির হইল।

—ক্রমশ

তত্ত্ববাদ ও জীবন

শ্রী মহেন্দ্রচন্দ্র রায়

১

রূপক নাট্য সহজ এবং সরল। ও বস্তুটাকে পুতুল-নাচের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। পুতুল-নাচের পুতুলগুলি চলাফেরা করে, কথা বলে, হাসে কাঁদে, কিন্তু উহাদের মুখভঙ্গীর কোথাও এতটুকু পরিবর্ত্তন হয় না; উহাদের মুখে পরম নির্ব্বিকার ভাবের ছাপ সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত লাগিয়া থাকে। রূপক নাট্যেও তাই। রূপক নাট্যের যারা পাত্র-পাত্রী, তাহারা জীবনের রাজ্য হইতে আসে না, পুতুলের মতই প্রাণহীন কতকগুলি তত্ত্ববস্তুকে লইয়া তাত্ত্বিক একটা পুতুল খেলা খেলেন; ওই খেলার গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত একেবারে সুনির্দ্দিষ্ট; যেন কোন্ অদৃষ্ট ইহাদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ একেবারে পূর্ব্ব হইতে চিরকালের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই রূপক নাট্যের তারিফ এই যে ইহার মধ্যে প্রত্যেকটি চরিত্র একেবারে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ; তাহাকে বুঝিতে কোনোরূপ প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না। রূপক নাট্যের রাজা শুধু রাজত্বই করেন, তিনি আর কিছুই করেন না, চোর শুধু চুরিই করে, সে কখনো চোরাই ধন দিয়া তাহার প্রিয় পরিজনের পালন পোষণ করে না; ফলকথা রূপক-নাট্য কতকগুলি প্রাণহীন তত্ত্বের পুতুল-নাচ।

এই বিশ্বসৃষ্টি যদি এমনি রূপক নাট্য হইত তাহা হইলে বেশ হইত। অনেক তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে এই জগৎটা তাই বলিয়াই মনে হয়। তাঁহাদের নিকট গুরু একেবারে নিছক গুরুতত্ত্ব, শিষ্য নিছক ভক্তিতত্ত্ব, কুলীন কৌলীন্যতত্ত্ব আর ধর্ম্ম একেবারে ধর্ম্মতত্ত্ব, ইঁহাদের কল্যাণেই গৌরাঙ্গ একটি তত্ত্বমাত্র, বুদ্ধ একটি তত্ত্বমাত্র, রাধা একটি তত্ত্ব, রাধার সঙ্গিনীরাও তত্ত্ব, কৃষ্ণ তো তত্ত্ব বটেনই। এমনি করিয়া জীবনের রাজ্য হইতে বিদায় লইয়া, তাত্ত্বিকেরা তত্ত্বের রাজ্যে বাস করিতে থাকেন।

বিধাতার সৃষ্টি কিন্তু রূপক নাট্যের কোনো লক্ষণই দেখায় না। সর্ব্বপ্রথম এই সৃষ্টি বাস্তব নাট্য, ইহার ব্যক্তিমাত্রই জীবনের স্ফুরণে সত্য হইয়া উঠিয়াছে এবং

এই জন্য এই জীবন যেখানেই প্রকাশ পাইয়াছে সেখানেই জীবনের সর্ব্বপ্রকার জটিলতা প্রকাশ পাইয়াছে। সোজা হিসাবের পক্ষপাতী তাত্ত্বিক এই জটিলতাকে বুঝিতে পারেন না এবং এই কারণে আপনার কল্পনাকে সত্যের আসনে বসাইয়া পূজা করিতে থাকেন। তত্ত্বের মোহ কিছুতেই তাঁহাকে সত্য দেখিতে দেয় না। যেমন ধরা যাক্ হিন্দু-মুসলমানের কথা। তাত্ত্বিক হিন্দুত্ব আর মুসলমানত্বের গবেষণা করিয়া বেদ কোরাণের মর্ম্মগত গভীর ঐক্য লইয়া বিভোর হইয়া কেবলি বলিতে থাকেন, কই, বিরোধ কোথায়? তিনি জানেন না হিন্দুত্ব আর মুসলমানত্ব হইতে হিন্দু মুসলমান স্বতন্ত্র কথা; একটি তত্ত্ব-শাস্ত্রের পরিভাষা, আর অপরটি জীবনের অপরূপ জটিলতা-ময় সচল পরিবর্ত্তনশীল সত্য।

২

জীবনের প্রকাশের মধ্যে একটি অনির্ব্বচনীয় অখণ্ডতা রহিয়াছে। এই অপূর্ব্ব অখণ্ড সমগ্রতাকে মানুষ আপনার বুদ্ধির দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারে না। সৃষ্টির গোপন গুহা হইতে যে অবিচ্ছিন্ন প্রেরণা আসিয়া জীবনের সকল স্তরে এই আশ্চর্য্য প্রকাশগতি জাগাইয়া তুলিতেছে তাহা আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর নয় বলিয়া জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত একটি অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছে। মানুষ এই প্রকাশকে—কি মনোজগতে, কি প্রাকৃতিক জগতে—খণ্ড খণ্ড করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করে এবং এই খণ্ড খণ্ড জ্ঞানের সমষ্টি করিয়া নানা রকমের ব্যাপক তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করে। সীমাবদ্ধ দেশ ও কালের মধ্যে যে তত্ত্বকে, যে নিয়মকে সে আবিষ্কার করে, তাহাকেই সে সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকালের সত্য বলিয়া মানিয়া বসিতে চায়।

মানুষের সমস্ত ব্যাপারেই আমরা তাহার এই প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। মানুষের জীবন তাহাকে যদিও নিত্যই অভাবিত পথে চালনা করিয়া চলিয়াছে, তথাপি তাহার জড়বুদ্ধি কেবলি তাহাকে বুঝাইতে চাহিতেছে যে সে কোনো অনিশ্চিত পথে চলিতেছে না, তাহার পথ-রেখাটি একেবারে নিয়মে নিয়মে কাঁটা-বেড়া ঘেরা হইয়া অনাদি অতীত এবং অসীম ভবিষ্যতের জন্য সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। এই কারণেই কি বিজ্ঞান রাজ্যে, কি সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থায়, কি ধর্ম্মপদ্ধতিতে সর্ব্বত্র মানুষ তাহার তত্ত্ববুদ্ধি দিয়া জড় নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টায় আছে।

বৈজ্ঞানিক প্রগতির ইতিহাসে যাঁহারা নিয়ম আবিষ্কারের অধ্যায়টি আলোচনা করিবেন তাঁহারাই দেখিতে পাইবেন কেমন করিয়া একটি নিয়মের সমাধির উপর আরেকটি নিয়মের প্রাসাদ গড়িবার চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। যে যে বিশেষ সীমার মধ্যে বৈজ্ঞানিক কোনো নিয়মের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই সেই বিশেষ সীমা বিস্মৃত হইয়া যখনই বৈজ্ঞানিক তাঁহার নিয়মকে ব্যাপকতর অধিকার দিতে অগ্রসর হইয়াছেন তখনই তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। সেই ব্যর্থতা হইতে আবার বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি ব্যাপকতর ক্ষেত্রে নিবদ্ধ হইয়াছে, আবার নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা চলিয়াছে।

সামাজিক জগতেও এই ব্যাপার দেখিতে পাই। সামাজিক মানব নানাদেশে নানাকালে তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে কত অসংখ্য বিচিত্র নিয়ম ও বিধি-ব্যবস্থার প্রচার করিয়া ভাবিয়াছে বুঝি নিত্যকালের জন্য জীবনের পথখানি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু মানুষের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিকে বার বারই আপনার অজ্ঞতা স্বীকার করিতে হইল, বার বার জীবনের অচিন্তনীয় গতির দিকে চাহিয়া তাহাকে বিস্মিত হইতে হইল। যে-পথ সে আগে হইতেই আঁকিয়া রাখিয়াছিল তাহাকে বার বার অগ্রাহ্য করিয়া পুনরায় অভিনব পথে চলিতে হইল। তবু এমনি মানুষের জড়বুদ্ধি যে তত্ত্বের মায়া কোনও মতেই কাটাইয়া উঠিতে পারিল না।

চারিদিকের বিশেষ বিশেষ অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিশেষ বিশেষ দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী যে-সব

ব্যবস্থা মানুষকে সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল, সেই সব ব্যবস্থা আজ মানুষের মনে সনাতনত্বের মোহ জন্মাইয়া অচল হইয়া বসিয়া জীবনের গতিকে বিপাকগ্রস্ত ও বিপর্য্যস্ত করিতেছে তাহা সামাজিক চেতনায় কিছুতেই পরিস্ফুট হইতেছে না। জাগ্রত সত্যবুদ্ধি তত্ত্ববাদের মায়ায় মোহগ্রস্ত হইয়া আছে। ইহার দৃষ্টান্ত চারিদিকে এত বেশি রহিয়াছে, আমাদের দৈনন্দিন চলাফেরায় খাওয়া-দাওয়ায় আলাপে-ব্যবহারে এই তত্ত্ববাদের কুসংস্কার এত বেশি পরিস্ফুট যে ইহার মধ্যে কোনো বিশেষ একটিকে লইয়া আলোচনা করিতে যাওয়াও অসমীচীন মনে হয়। নিতান্ত সহজ বুদ্ধির দ্বারা যাহা অত্যন্ত অন্যায় এবং উদ্ভট বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তত্ত্ববাদের মোহ তাহাকেই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য করে।

কবে কি কারণে না জানা থাকিলেও মানিয়া লইতে পারি যে হয়ত চণ্ডাল ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্য হইয়াছিল। কিন্তু আজ বিংশ শতাব্দীর বুকে যখন শুনিতে পাই যে যে-পথ দিয়া ব্রাহ্মণ-তনয়েরা চলিবেন সে-পথে চণ্ডাল-পুত্র হাঁটিয়া গেলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব একেবারে লোপ পাইবার সম্ভাবনা তখন হাসিব না কাঁদিব ভাবিয়া পাই না। কোথাও কোথাও ব্রাহ্মণ-পুত্রেরা গাড়ী হাঁকাইয়া জীবন যাপন করিতেছেন সত্য, কিন্তু তথাপি সেই ব্রাহ্মণ-পুত্রকে দেখিয়া যদি কোনো ক্ষত্রিয়-পুত্র প্রণাম না নিবেদন করে তাহা হইলে তাহার ঘোরতর অপরাধ হয়। আসল কথা মানুষটাকে সামনা-সামনি বিচার করিবার ও বুঝিবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই; এখন আমরা কতকগুলি চলতি-সংস্কারের রঙীন কাঁচ দিয়া মানুষকে রঙাইয়া দেখিব পণ করিয়াছি! তাই সত্যকার সামাজিক উচ্চনীচজ্ঞান সুদূর-পরাহত হইয়া রহিল, যে যাহা নয় তাহাকে তাহা বলিয়া চালাইবার তাত্ত্বিক দুর্ব্বুদ্ধি আমাদিগকে পাইয়া বসিল। ফলে সমাজ-জীবন গলদে ভরিয়া উঠিল।

বিচিত্র ও সম্পূর্ণ অভিনব পরিবেষ্টনের মধ্যে জীবন আজ যে-পথ ধরিয়া চলিতে চাহিতেছে, তাত্ত্বিকতার মোহ জীবনকে সেই পথে চলিতে বাধা দিতেছে। তাই আজ যে আমাদের চারিদিকে নবীন ও প্রবীণের সামাজিক কলহ দেখিতে পাইতেছি ইহাকে এক দিক দিয়া তত্ত্ববাদ ও জীবনের সংগ্রাম বলিলে বলিতে পারা যায়। কৌলীন্য, জাতিভেদ, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য ইত্যাদি নানা রকমের মিথ্যা আচরণে জীবনের ও মানুষের সত্যকার মূল্য ও মর্য্যাদা দেওয়া সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন সংস্কারের আবর্জ্জনায় নবসৃষ্টির অঙ্কুরটি চাপা পড়িয়া হতাশ সংগ্রাম করিয়া মরিতেছে।

জীবনের কণ্ঠে তাই বিদ্রোহ জাগিতে চাহিতেছে।

যেমন বিজ্ঞানে ও সমাজে, তেমনি রাষ্ট্রে ও ধর্ম্মেও মানুষের এই একই জড়বুদ্ধির প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। অবস্থা বদলায়, কিন্তু মানুষ ব্যবস্থা বদলাইতে চায় না কিছুতেই। তাই নব নব শাসনপদ্ধতিকে মানুষ সানন্দে ও সহজে বরণ করে নাই। বিপ্লবের দ্বারাই মানুষের প্রাণের প্রবল প্রেরণা তাহার সংস্কারের মোহ, প্রাচীনতার মোহ ও তাত্ত্বিকতার মোহকে জড়ো করিয়া চলিল। কোনো ব্যবস্থাকেই কোনো কালে নানারূপে তত্ত্বের আবরণে মহনীয় ও বরণীয় করিয়া তুলিলে যে চলিতে পারিবে না, সর্ব্বব্যবস্থার মূলে যে মানুষের জাগ্রত জীবনের জাগ্রত চেষ্টা ও নিত্য পরিবর্ত্তনশীলতার একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে, এ কথাটি জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই ভুলিলে যে অকল্যাণ অনিবার্য্য তাহা যেন মানুষ কিছুতেই স্বীকার করিতে পারে না।

ধর্ম্মের ক্ষেত্রে আবার তত্ত্বের আচ্ছন্নতা এত বেশি যে সেখানে বিচারবুদ্ধিকে আমল দেওয়াই যেন ধর্ম্ম-নাশের পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া মনে হয়। গুরু-পুরোহিত পাণ্ডা-মোহান্ত তত্ত্বের রূপ ধরিয়া এমনি মোটা শিকড় আমাদের মর্ম্মমূলে বসাইয়া রাখিয়াছে যে তাহাকে ছিঁড়িতে গেলে যেন আমাদের মর্ম্ম ও ধর্ম্ম দুইই নষ্ট হইয়া যাইবে এমনি আশঙ্কা আমাদের হইতে থাকে। মানুষকে আমরা ধর্ম্মের ক্ষেত্রে প্রতীক করিয়া ব্যবহার করিতে চাই এবং

তাহারই চাপে যে মানুষের স্বাভাবিক স্বরূপটিকেও বিকৃত করিয়া ফেলি তাহা আমরা বুঝিতেই পারি না। ইহারই ফলে আমাদের ধার্ম্মিক ব্যবস্থা নানারূপ কলঙ্কে কদর্য্য হইয়া উঠিল, সমাজের ধর্ম্মজীবন ক্ষীণ ও বিকৃত হইয়া তাহাকে একটা অতি দুর্ব্বল শক্তিহীন জাতিতে পরিণত করিল, তথাপি তাত্ত্বিক পণ্ডিতদের চোখ বুজিয়া এই সব কদর্য্য ব্যবস্থার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কিছুতেই ঘুচিল না।

৩

মানুষের সজীব ও জটিল ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করিয়া তাহাকে শুধু একটা যন্ত্রে বা যন্ত্রশালার চাকায় পরিণত করিবার চেষ্টা চলিতেছে সর্ব্বত্র। একটা কোনো বিশেষ নাম দিয়া সেই নামের মধ্যে তাহাকে জড়ো করিয়া ধরিতে ও বুঝিতে চাই। মানুষকে আমরা শুধু বিচিত্র মানুষ বলিয়া মানিতে চাই না, তাহাকে মজুর বলি, মাষ্টার বলি, জমিদার বলি, জমাদার বলি, কেরাণী বলি কিম্বা কবি বলি, গুরু বলি কিম্বা ভক্ত বলি, শাসক বলি কিম্বা শাসিত বলি। এবং তখন তাহাকে তাহার জটিল ব্যক্তিত্বের সব দিক দিয়া সমগ্রভাবে ধারণা করিবার প্রয়োজন পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়া একটিমাত্র বিশেষ সীমায় তাহাকে বাঁধিয়া তাহার বিচার করিতে চাই। সে কি মজুর? অমনি তাহার সঙ্গে কোন্ ভাষা ও ভঙ্গীতে কথা বলিতে হইবে, কোন্ নিম্নাসনে তাহাকে বসিতে দিতে হইবে এবং তাহার খাওয়া-দাওয়ার অশন-বসনের কতটা দাবী স্বীকার করিতে হইবে তাহাও স্থির হইয়া যায়। উনি কি? গুরুদেব? অমনি তাঁহার পায়ে কেমন করিয়া উপুড় হইয়া পড়িতে হইবে, তাঁহার প্রসাদ ও পদধূলি কতখানি দৈন্যের ভঙ্গীতে গ্রহণ করিতে হইবে ইত্যাদি সব বিনা বিচারে নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। যান্ত্রিক সভ্যতাই যে মানুষকে মানুষের মর্য্যাদা হইতে নামাইয়া আনিয়াছে তাহা নহে, আমাদের এই যে তাত্ত্বিক বৃত্তি, এই যে নাম দিয়া সব জিনিসকে সীমাবদ্ধ করিয়া ধরিবার প্রেরণা ইহাই আমাদিগকে সত্য করিয়া সব জানিবার ও বুঝিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেছে।

কোনো কালে মানুষ তাহার এই স্বভাবটিকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়া বাস্তব সত্যকে গ্রহণ করিবার মত পরিপূর্ণ সক্ষম হইবে কিনা সন্দেহের বিষয়। কিন্তু জীবনকে সত্য করিয়া জানিতে হইলে, কেবল স্বপ্ন দিয়া চোখকে আচ্ছন্ন করিয়া হুঁচোট খাইতে খাইতে না চলিতে হইলে, এই বাস্তব জগতে সাময়িক শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে abstract তত্ত্বের মোহকে কাটাইয়া যাহা সত্য, যাহা বাস্তব তাহাকে ধারণা করিবার সত্যসাধনা মানুষকে করিতেই হইবে। প্রাচীনকে প্রাচীন বলিয়াই গ্রহণ করিবার শাস্ত্রীয় মনোভাব বর্জ্জন করিয়া প্রতিপদে জীবনের নূতন নূতন ভঙ্গীকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও বিচারের দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

শুধু কোনো একটা প্রথা-পদ্ধতি বা বিধি-ব্যবস্থা কোনো বিশেষ যুগে বিশেষ মহাপুরুষ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া এবং তাহা সেই সময়ে শুভফল প্রসব করিয়াছিল বলিয়াই তাহাকে ধরিয়া রাখিবার ও পোষণ করিবার মোহ হইতে মানুষ যত শীঘ্র মুক্ত হইবে, ততই তাহার জীবনকে সত্য করিয়া বুঝিবার শক্তি হইবে। মনে রাখিতে হইবে তত্ত্ব বড় নহে, মানুষ বড়, তাহার জীবন বড়। তত্ত্বের দায়ে কেহ ঠেকিয়া নাই, জীবনের দায়ই মানুষের একমাত্র দায়।

চিত্রবহা

—পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর—

শ্রী সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫

জাপান

শীতের সন্ধ্যা। টেবিলের উপর আলোর সুমুখে বই খুলিয়া অমর গভীর মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেছে। টেবিলের তলায় হিবাচিতে* গন্‌গনে কয়লার আগুনে তার পা-দুটি বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছে। পাশে রান্নাঘর। সেখান থেকে রান্নার শব্দ ও গন্ধ আসিতেছে। বাড়ির সম্মুখের পথ হইতে পথিকের কেঠো জুতার খটখট শব্দ, মাঝে মাঝে রিকশার ঘণ্টার রিনিঠিনি শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। অমরের কোনো দিকে লক্ষ্য নাই, সে পাঠে তন্ময় হইয়া গেছে।

এমন সময় হড়কানি দরজার ঘণ্টার তুমুল ঝঞ্চনায় অমরের ধ্যানভঙ্গ হইল। ঘুড়ির কাগজ-আঁটা কাঠের সাশি সশব্দে ঠেলিয়া দিয়া কে একজন "ওবাসান! ওবাসান! হিবাচি কুডাসাই!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। অমর মুখ তুলিয়া সুবোধকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, কিহে ব্যাপার কি? একেবারে ঝড়ের মত আগমন!

সুবোধ বলিল, ব্যাপার কি! বাবা! শীতে হাত পা জমে' যাচ্ছে! ওবাসান জল্‌দি করো! হিবাচি কুডাসাই! Damn this country! চিঙাইমাশ, চিঙাইমাশ কেবলই চিঙাইমাশ।† এদেশে আর থাকা নয়, 'merika is the place for me! তুমি থাক আপত্তি নেই, আমি আর নয়!

সুবোধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে অনর্গল বকিতে লাগিল। এক সুদর্শনা জাপনারী সুবোধের সুমুখে একটি হিবাচি আনিয়া রাখিল এবং তার ভাবভঙ্গী দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

দস্তানাপরা হাত তাতাইতে তাতাইতে সুবোধ বলিল, কি শীত হে! আঙুল জমে' বরফ হয়ে গেছে! জুতোর ফিতে খোলবার জো নেই! That reminds! যে-দেশে জুতো খুলে তবে ঘরে ওঠা যায় সে-দেশে আমি থাকি না! I call it barbarous, mediæval! তোমার কি বল না, তুমি ত নির্ব্বিকার! তোমার টেনিস আছে, শূটিং আছে, পোয়েট্রি আছে, and heaps of money in the bargain! আমার কি আছে বলো? I must clear out of here!

বকিতে বকিতে জুতা খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া সুবোধ অমরের পাশে গিয়া বসিল। বলিল, Look here old top! Got into a scrape to-day···had some fun I can tell you!

অমর ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি রকম?

সুবোধ যে-কাহিনী বিবৃত করিল তার মর্ম্ম এই—অপরাহ্নে সে হিবিয়া-পার্কে বেড়াইতে গিয়াছিল। ক্ষুধা বোধ হওয়াতে পার্কের রেস্তরাঁতে ঢুকিয়া সে একটা

* হাত পা তাতাইবার জন্য জলন্ত অঙ্গার রাখিবার চতুষ্কোণ কাঠের বাক্স।
† জাপানী শব্দ। অদল-বদল বা ভুল অর্থে ব্যবহৃত হয়।

টেবিলে গিয়া বসিল। জাপানী পরিচারিকা আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সে কি চায়। সুবোধ কি বলিবে, জাপানী ভাষায় তার জ্ঞান অসীম বলিলেই চলে, সে বলিতে চাহিল মুরগীর কাট্‌লেট, কিন্তু মুরগী শব্দের জাপানী কিছুতেই মনে পড়ে না। পরিচারিকা যতই তাহাকে প্রশ্ন করে ততই সে বিব্রত বোধ করে। তার ভাব দেখিয়া পরিচারিকা বিশেষ কৌতুক বোধ করিয়া ছুটিয়া গিয়া তার সঙ্গিনীদেরও ডাকিয়া আনিল। ব্যাপার দেখিয়া মরিআ হইয়া সুবোধ হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, ইমু নো কাট্‌লেট কুডাসাই! পরিচারিকার দল তুমুল কলরবে হাসিয়া উঠিয়া পরস্পরের গায়ে গড়াইয়া পড়িল। আশ-পাশের টেবিল থেকে জাপানী অভ্যাগতের দল সকৌতুকে সুবোধের পানে চাহিয়া বহুকষ্টে হাসি চাপিয়া রহিল। সুবোধ তখন দাঁড়াইয়া উঠিয়া দুই হাত পাখীর ডানার মত নাড়িতে নাড়িতে ইঙ্গিত করিয়া বুঝাইতে লাগিল সে মুর্গির কাট্‌লেট চায় এবং ঘন ঘন প্রশ্ন করিতে লাগিল—ওয়াকারিমাশ, ওয়াকারিমাশ—বুঝেছ, বুঝেছ? তখন মুরগীর কাট্‌লেট আসিল। ইত্যবসরে একজন ইংরেজি-অভিজ্ঞ জাপানী অভ্যাগত সুবোধকে বুঝাইয়া দিল, 'ইমু'র কাটলেট জাপানে কেহ খায় না, কারণ ঐ শব্দের অর্থ কুকুর!

গল্প শুনিয়া অমর প্রচুর হাসিল। অমর বলিল, জাপানী ভাষা তোমার মাথায় কিছুতেই ঢুকবে না দেখছি! এক কাজ করো, দু' একটা কথা তোমায় শিখিয়ে দিই, অন্তত তাই মনে রেখো। প্রথমত জাপানী ভাষায় ড নেই, সব দ। কুডাসাই নয় কুদাসাই। আর একটা কথা, এই মাত্র তুমি আমার ল্যাণ্ডলেডিকে ওবাসান বলে' ডাকলে, আর কখনো অমন করে' ডেক না, বুঝলে?

সুবোধ বলিল, কেন? আমার মেড্‌কে তো আমি ঐ বলেই ডাকি!

অমর বলিল, তাকে ডাকতে পারো, কারণ সে বুড়ী। বুড়ীদের ওবাসান বলে। আমার ল্যাণ্ডলেডি কি বুড়ী?

সুবোধ বলিল, Oh no, by no means! বলো কি! She is a beauty! Her voice is honey, she's perfectly charming! তাহলে ওকে কি বলে' ডাকি বল তো?

অমর বলিল, ওর নাম ও-যুকি-সান।

সুবোধ বলিল, তার মানে?

অমর বলিল, তুষার-সুন্দরী।

সুবোধ বলিল, By Jove! She deserves to be the landlady of a poet! I must admire your choice!

অমর যে-বাড়িতে ঘর ভাড়া লইয়া আছে সে বাড়ির মালিক এক ছুতার। তার যুবতী পত্নী যুকি-সান রন্ধন ও সীবন-পটু, বুদ্ধিমতী, সুশ্রী ও মধুরভাষিণী। অমর এই বাড়িতে সম্পূর্ণ নির্ঝঞ্ঝাটে আছে, কিছুই তাহাকে দেখিতে হয় না। মাসান্তে সে খরচ দিয়া খালাশ। বাড়িখানি য়ুনিভার্সিটির খুব কাছে, তাও এক মস্ত সুবিধা।

বাড়িখানির অন্য এক ঘর এক জাপানী ছাত্র ভাড়া লইয়া আছে। অমরের পাশের ঘরে নিঃসন্তান ছুতার-দম্পতী বাস করে। ছুতার প্রত্যূষে কাজে বার হইয়া যায় এবং অনেক রাত্রে বাড়ি ফেরে। সে জানে অমর ধনী ও শিক্ষিত ভদ্র-সন্তান, তায় বিদেশী। হয় ত সেই কারণেই তাহাকে যথেষ্ট সমীহ করিয়া চলে। দৈবাৎ তার সম্মুখে পড়িলে সে আনত হইয়া নমস্কার করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়।

গৃহকর্ত্রী যুকি-সানের কিন্তু এই হীনতা ও দারিদ্র্যের সঙ্কোচ মোটেই নাই, তার ব্যবহারে ভারি একটি সহজ সৌজন্য আছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই প্রভেদ অমরের দৃষ্টি এড়ায় নাই। মাঝে মাঝে সে বুঝিবার চেষ্টা করিত ইহাদের দাম্পত্যজীবন সুখের না অসুখের, কিন্তু বাহ্যত কোনোটারই কোনো নিদর্শন সে দেখিতে পাইত না।

জাপানী প্রকৃতি বড় চাপা, বাহির দেখিয়া তাদের অন্তরের পরিচয় পাওয়া দায়।

পাশের বাড়িতে সুবোধ ও তার বৃদ্ধা চাকরাণী বাস করে। সুবোধের ইচ্ছানুসারে অমরই সে বাড়ি তার জন্য বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিল। প্রথম পরিচয়েই অমরকে সুবোধের বড় ভালো লাগে এবং সে অমরের কাছে-কাছে থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। অমর সে ইচ্ছা পূরণ করিয়াছিল।

কলিকাতার ফিরিঙ্গি কলেজে ফিরিঙ্গি ছেলেদের সাহচর্য্যে সুবোধের হাবভাব কথাবার্ত্তা ও মেজাজ তাহাদেরই মত হইয়া উঠিয়াছিল। সাংসারিক অবস্থা তার বিশেষ স্বচ্ছল ছিল না। শিল্পশিক্ষা-সমিতির একটা বৃত্তি লইয়া সে জাপানে আসিয়াছিল। কিন্তু ভাষার বিপাকে হাবুডুবু খাইয়া অল্পদিনের মধ্যেই সে দেশটার উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল।

প্রত্যহ চামড়ার কারখানা হইতে ফিরিয়া সেখানকার অধ্যক্ষ হইতে সুরু করিয়া কুলি পর্য্যন্ত সকলেরই সে পিতৃ-শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। তাহাদের অপরাধ তাহারা সুবোধকে ইংরেজিতে শিখাইতে পারে না! গরজ যে তাহাদের নয়, সম্পূর্ণ সুবোধেরই, অমরের শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে কিছুতেই তাহা বুঝিবে না।

১৬

দুঃসংবাদ

শয্যার উপর বসিয়া সুকুমারীর চিঠি হাতে লইয়া অমর আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল। চিঠিখানা বারবার পড়িয়াও মনে হইতেছিল ভুল পড়িতেছে। খবরটা কিছুতেই বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি হয় না। করুণা গৃহত্যাগিনী হইয়াছে এও কি সম্ভব? অমর আর একবার চিঠি পড়িল। তার দৃষ্টিবিভ্রম হয় নাই, চিঠিতে সেই কথাই স্পষ্ট লেখা আছে।

জাপানের বিরাট বিচিত্র প্রাণপ্রবাহের মধ্যে পড়িয়া অমরের মন হইতে করুণার স্মৃতি ক্রমশ ম্লান হইয়া আসিতেছিল। জাপানে পৌঁছিয়া প্রথম প্রথম তার কথা নিয়তই মনে পড়িত। বিদায়-রজনীর সুমধুর স্মৃতি তার মনে সুখ ও দুঃখের একটা মিশ্রিত হিল্লোল তুলিত। অযাচিত যাহা পাইয়াছিল তার জন্য আনন্দ হইত, আবার করুণার নিঃসঙ্গ জীবনের দুর্ব্বহ ব্যথা উপলব্ধি করিয়া সে-আনন্দ বিষাদে পরিণত হইত। করুণা ভালো আছে এই সংক্ষিপ্ত সংবাদ ভগ্নীর চিঠিতে মাঝে মাঝে পাইত, কিন্তু ঐ টুকুতে মন খুসি হইত না। তার মনের নিভৃতে করুণার হাতের একখানি চিঠি পাইবার ইচ্ছা লুকানো ছিল। অবসরকালে সেই ইচ্ছা মাঝে মাঝে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইত, আবার কাজের ভিড়ে অগোচরে কখন অন্তর্হিত হইত, অমর জানিতেও পারিত না। দু'একবার অতর্কিতে করুণা তার মনে ভাবী পত্নীরূপেও দেখা দিয়াছিল। তখন অসম্ভব কল্পনায় সে মনে মনে হাসিয়াছিল বটে, তবুও না ভাবিয়া পারে নাই, যদি ইহা সম্ভব হইত তবে সে সুখী বই অসুখী হইত না!

সে যাই হোক, সে নিয়তই প্রার্থনা করিত, করুণা যেন সুখ ও শান্তি দু-ই লাভ করে। সেই প্রিয় পাত্রীটির এ কী পরিণাম! জাপানে পৌঁছিবার কিছুকাল পরে একদিন সুকুমারীর চিঠি খুলিতেই একটুকরা কাগজ খামের ভিতর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। অপরিচিত হস্তাক্ষরে লেখা কাগজখানি তাড়াতাড়ি খুলিয়া অমর দেখিল করুণার চিঠি। করুণা লিখিয়াছিল—আমি নিয়ত প্রার্থনা করি তুমি সকল সুখ ও গৌরবের অধিকারী হও! সেই এক ছত্র চিঠি কি অসীম আনন্দ সেদিন বহন করিয়া আনিয়াছিল! করুণা তাহাকে মনে রাখিয়াছে, ভুলিয়া যায় নাই—তারই নিদর্শন সেই চিঠি-টুকু অমর সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছিল।

তারপর বহুকাল সুকুমারীর চিঠিতে করুণার কোনো উল্লেখ থাকিত না। অমর কিছুকাল ইহা লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু যখন দীর্ঘকাল কাটিয়া গেল, তবুও সুকুমারী করুণার সংবাদ দিল না, তখন সে উপযাচক হইয়া বিশেষ করিয়া তারই খবর জিজ্ঞাসা করিয়া ভগ্নীকে পত্র দিয়াছিল। সেই পত্রের যে এমন উত্তর আসিতে পারে স্বপ্নেও সে তাহা কল্পনা করে নাই।

আজ করুণার কত কথা অমরের মনে পড়িতে লাগিল। সে-সব কথা ভাবিতে ভাবিতে শয্যার নিভৃতে তার অশ্রু আর বাধা মানিল না। জগতের জটিল পথে অপরিচিতের জনতার মাঝে করুণা যখন নিঃশেষে হারাইয়া গেল, তখন অমর আবিষ্কার করিল, সে করুণাকে ভাল বাসিয়াছিল। অন্তর্য্যামীর কাছে সে মিনতি করিতে লাগিল, আজ করুণাকে সকলে ছাড়িয়াছে, তুমি তাহাকে রক্ষা করো, তোমার কোলে তাহাকে স্থান দাও! সে সর্ব্বসুখবঞ্চিতা, দুর্ভাগিনী, আজন্ম গৃহকোণে লালিতা, ঘর ছাড়িয়া সে অজানা পথে বাহির হইয়াছে, তুমি তার হাত ধরো!

ক্রমে রাত্রি গভীর হইল। অমরের শয্যা কণ্টক-শয্যা হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া জানালার পাশে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া সে বসিল। বাহিরে তখন বিলাপের সুরে ঝিল্লিধ্বনি হইতেছিল। বসিয়া বসিয়া তার মনে হইল, রুদ্ধ ক্রন্দনের বেগে অন্ধকারে অন্তহীন অম্বর যেন কাঁপিতেছে তারই আর্ত্ত হৃদয়ের তালে তালে! তার মন কেবলই বলিতে লাগিল, পথটা ভুল, বড় দুঃখের সন্দেহ নাই! কিন্তু অন্যায় সমাজ-বিধির নির্ম্মম পেষণ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা যদি কেহ করে, তাহাকে দোষ দিব কেমন করিয়া? তৃষার্ত্ত তৃষ্ণা মিটাইতে চাহিবে ইহা ত স্বাভাবিক! সমাজের চেয়ে ঢের বেশি শক্তি ধরে প্রকৃতি, সে কথা ভুলিলে দুর্গতি ত অনিবার্য্য!

পরক্ষণেই কিন্তু মনে হইল, সমাজ যাই হোক, সে ন্যায়ই করুক আর অন্যায়ই করুক, তার উপর রাগ করিয়া অভিমান করিয়া ফল নাই! তাহাতে করুণা ফিরিবে না! তবে এ দারুণ বিপদে তাহাকে রক্ষা করিবে কে?

একান্তমনে বিধাতৃচরণে সে নিবেদন করিতে লাগিল, শুনিয়াছি অসীম তোমার দয়া, অনন্ত তোমার করুণা, করুণাকে তুমি করুণা করো!

১৭

তর্কযুদ্ধ

সন্ধ্যাগমের সঙ্গে সঙ্গে তুষারপাত সুরু হইল। সায়াহ্নের অস্পষ্ট আলোকে আকাশ ব্যাপিয়া ধোনা তুলার মত তুষারকণা ঝিরঝির করিয়া অবিরাম পড়িতে লাগিল। গৃহচূড়ায়, গাছের মাথায়, ভূমিতলে সর্ব্বত্র সেই তুষার বিস্তারিত হইয়া মাটির পৃথিবীকে অচিরে মায়াপুরীতে পরিণত করিল।

তোকিও ক্লাবের সভ্যেরা খেলা সাঙ্গ করিয়া বাড়ি ফিরিবার পূর্ব্বেই এই বাধার সৃষ্টি। অগত্যা সকলে ক্লাবের বাষ্পতপ্ত বৈঠকখানায় আসর জমাইয়া বসিয়াছে। ঘরের একপ্রান্তে অমর চায়ের পেয়ালা সুমুখে লইয়া অরবিন্দ ঘোষের 'বন্দে মাতরং' পড়িতেছিল।

অদূরে একটি টেবিলে এক ফরাসী ভদ্রলোক জনকয় মহিলার সঙ্গে রঙীন সুরা ও রসালাপের জালে বাঁধা পড়িয়াছেন। অন্য এক টেবিলে কয়েকজন ইংরেজ ও আমেরিকা-ফেরত জাপানী যুবক ব্রিজ খেলিতেছে। তাহাদের মুখে পাইপ, সিগার ও সিগারেট। টেবিলের উপর প্রচুর ধোঁয়া ভাসিতেছে।

কির্বি আসিয়া চেয়ার টানিয়া অমরের পাশে বসিল। লোকটি ইংরেজ, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। বেশ গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, একটু নেয়াপাতি ভুঁড়িও আছে। তার মনের ধারা ব্যুরোক্রেটিক, মতামত সাম্রাজ্যবাদীর যেমন হওয়া উচিত তেমনি, বিদ্যাবুদ্ধি যৎসামান্য। ইতি-

পূর্ব্বে অমরের সঙ্গে দু'একবার ভারত-প্রসঙ্গে বাকযুদ্ধ হইয়া গেছে। তাহাতে শোচনীয় পরাভব ঘটায় মনে মনে সে অমরের উপর একটু চটিয়া ছিল। তার ধারণা সে বাংলাদেশকে খুব ভালরকম জানে, কারণ সে মেদিনীপুর অঞ্চলে কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিল। অমর যে একজন বিপ্লববাদী সে বিষয়ে তার মনে সংশয়মাত্র ছিল না।

চা ও সংবাদপত্রের মধ্যে নিমজ্জিত অমরের পানে ক্ষণকাল তাকাইয়া কিবি বলিল, দেখ, তুমি সেদিন অনেক কথা বলিলে, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের জন্য কি ইংরেজ দায়ী ?

অমর ঈষৎ হাসিয়া বলিল, নিশ্চয় !

কি রকম ?

ভারতবর্ষের ধনদৌলত ইংলণ্ডে চালান দিয়া !

একটু খোলসা করিয়া বলো।

অমর বলিল, আচ্ছা। তোমারই জাতভাই ব্রুক অ্যাডাম্‌সের কথায় বলি শোনো—পলাসি যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই লণ্ডনে বাংলা লুটের মাল পৌঁছিতে সুরু হয়, তার ফল হাতে হাতে পাওয়া গেল বলিলেই চলে ! কারণ, বিশেষজ্ঞদের মতে ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের আরম্ভ ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে।

কিবি ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, আর কেহ এমন কথা বলিয়াছে ?

অমর বলিল, নিশ্চয়। যেমন মিষ্টার ডিগবি। তিনি বলেন, বাংলা ও কর্নাটদেশের অসীম ঐশ্বর্য্য হাতে পাওয়ার ফলেই ইংলণ্ডের শিল্পোন্নতির পত্তন হয় !

পাইপ টানিতে টানিতে বোণ্টার আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। যুবক ইংরেজ-দূতনিবাসের (Embassy) শিক্ষা-নবীশ ছাত্র, সম্প্রতি বিলাত হইতে আসিয়াছে। তার পেশীপুষ্ট বলিষ্ঠ দেহ লোহার মত দৃঢ়। তার চলাফেরা ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় বিধাতার জগৎটা তার কাছে অতি তুচ্ছ ব্যাপার। দারুণ শীতের দিনেও খেলার পর সে শীতল জলের ঝাঁঝরির তলায় দাঁড়াইয়া পরমানন্দে স্নান করে। ওভারকোট বা দস্তানার সঙ্গে তার পরিচয় নাই বলিলেই হয়। পুরুষ হইয়াও নারীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। মনে হইত, তার জগৎ তার নিজের মধ্যেই আবদ্ধ, সেখানে অন্য কারও স্থান নাই। সে স্বল্পভাষী। অসাধারণ একাগ্রতার সহিত সে খেলিত—খেলার হার-জিতের উপর যেন তার জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে ! বাঘ যেমন দুরন্ত আগ্রহে শীকারের পিছু পিছু ধায়, সেও তেমনি ব্যাট হাতে বলের পিছু পিছু ধাওয়া করিত। দৈবাৎ বল ফস্‌কাইলে অসহিষ্ণু হইয়া বলিত, Dash it ! তারপর দ্বিগুণ উৎসাহে আবার সংগ্রামে মাতিত। সে যেন প্রাচীন রোমের গ্লাডিয়েটরের এক নবীন সংস্করণ !

খাতির-নদারৎ ভাবে একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া বোণ্টার হাঁকিল, গেন্‌সান ! হুইস্কি-সোডা !

গেন্‌সান ক্লাবের বাটলার।

ব্রিজ-খেলার টেবিলে তখন জাপানী যুবক য়্যামাসাকি রাপ্পাবুশি * গাহিতেছিল—

> অতিবড় হাবাতে এই আমি গো একটা—
> আমিই আবার কুড়িয়ে পেলেম মনিব্যাগটা !
> চাঁদেরি আলোতে দেখি আরে ছ্যাঃ এ কি
> ট্রামগাড়ী-চাপাপড়া ব্যাং চ্যাপ্‌টা !
> আরে ছোঃ ছোঃ ছোঃ !
> তোগো ত্তো ত্তো ত্তো ! †

গানটা শেষ করিয়া সে ইংরেজিতে তার তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিল। তার খেলার সাথীরা তুমুল কলরবে হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিল। এবং তারই মাঝে কেহ কেহ—Go ahead ! let's have one more ! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

* বিউগলের সুরে গেয় হাসির গান।
† সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ।

বোণ্টার হুইস্কি-সোডায় চুমুক দিয়া বলিল, That's funny! বলিয়া নীরবে পাইপ টানিতে লাগিল।

ফরাসী ভদ্রলোক হাঁকিল, গেন্‌সান! Three Peppermint and one Gin Vermouth please!

য়্যামাসাকি আবার গান ধরিল—

দেখতে চাও মুখ দেখতে ফটোগ্রাফেতে পারো,
কইতে কথা চাও তো টেলিফোনেতে সারো!
দুনিয়াতে বিজ্ঞানের বলে এইটুকুই চলে—
বাকি যা, তা যায় না করা দেখা না হলে!
আরে ছোঃ ছোঃ ছোঃ!
তোগো তো ত্তো ত্তো···*

এবার হাসিটা আরও তুমুল এবং সংক্রামক হইল। এমন কি পরম-উদাসীন বোণ্টারও না হাসিয়া পারিল না।

রাত বাড়িতেছে দেখিয়া অমর দাঁড়াইয়া উঠিয়া ওভারকোট গায়ে দিল, তারপর পাইপ ধরাইয়া হাতে দস্তানা আঁটিতে আঁটিতে সকলকে বিদায়-সম্ভাষণ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

তুষারপাত তখন ধরিয়াছে। বসন ও ভূষণ মোচন করিয়া ধরণী যেন বিধবার বেশ ধারণ করিয়াছে! শীতল বাতাস অমরের নাকে মুখে ছুঁচ ফুটাইতে লাগিল।

ক্লাবের ফটক পার হইয়া পথে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে কিবি আসিয়া পৌঁছিল। অমরকে আর একবার খোঁচা দিবার প্রবৃত্তি রোধ করিতে না পারিয়া সে কহিল, কিন্তু যাই বলো মুখার্জ্জি, এ ত স্বীকার করিতেই হইবে, ইংরেজ ভারতবর্ষে ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে! ও জিনিস তোমাদের দেশে কি কখনো ছিল?

অমর ওভারকোটের কলার উল্টাইয়া কানদুটা ঢাকিয়া দিয়া বলিল, হাঁ, যেখানে তার স্বার্থ নাই সেখানে ইংরেজ ন্যায় বিচার করে, কিন্তু বিবাদ যেখানে সাদা ও কালোর মধ্যে সেখানে সে ভুলিয়াও ন্যায় বিচার করে না!

মোড়ের মাথায় আসিয়া গুড-নাইট বলিয়া দ্রুতপদে অমর চলিয়া গেল।

কিবি সেইদিকে চাহিয়া আপনমনে বলিল, Impossible man!

১৮

ওহানা

একদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া অমর পাশের ঘরে এক অপরিচিতার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। সে-ভাষা যে শিক্ষিতা মহিলার, তাহা বুঝিতে তার বিলম্ব হইল না। ওয়ুকির ঘরে এই নূতন অভ্যাগতের আগমনে অমর একটু কৌতূহল অনুভব করিল। কারণ, তার কাছে তার সমশ্রেণীর লোকেরাই আসিত। আজিকার মহিলাটি কে এবং সে কেন আসিয়াছে, এই চিন্তা তার মনে উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওয়ুকি কাঠের হড়কানি পর্দ্দা ঠেলিয়া মুখ বাহির করিয়া বলিল, মুখার্জ্জি-সান† এঘরে একবার আসবেন কি?

অমর বিস্মিত হইল। ওয়ুকি কি তার মনের কথা টের পাইয়াছে!

তার পিছু পিছু ঘরে ঢুকিয়া অমর দেখিল একটি মেয়ে নতনেত্রে সেলাই করিতেছে।

ওয়ুকি বলিল, ওহানা-সান, ইনিই মুখার্জ্জি-সান!

ওহানা মুখ তুলিয়া অমরের পানে তাকাইতেই ওয়ুকি অমরকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, দেখুন, ইনি কখনো ভারতবর্ষের লোক দেখেন নি, আপনি এখানে আছেন শুনে উনি বলছিলেন···

অমর ওহানার পানে স্মিতমুখে চাহিয়া মাথা নত

* সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ।
† ভদ্রভাষায় 'সান' শব্দটি নরনারীর নামের শেষে যোগ করিলে মহাশয় বা মহাশয়া বুঝায়।

করিয়া অভিবাদনান্তে. কহিল, বেশ ত! আমি পালাচ্ছি না, এই দাঁড়িয়ে রইলুম! আপনি ভারতবর্ষের লোক বেশ করে' দেখে নিন!

অমরের কথা শুনিয়া ওয়ুকি হাসিতে লাগিল, কিন্তু অপ্রতিভ ওহানার মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। সে চট করিয়া কোনো উত্তর দিতে পারিল না। ক্ষণকাল পরে মৃদুস্বরে বলিল, আপনাকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া হল! আপনি হয়তো ব্যস্ত ছিলেন···

অমর তার কথায় বাধা দিয়া বলিল, মোটেই নয়। আমি নিতান্ত কুঁড়ে মানুষ! একলা-একলা ঘরে বসে' থাকা আমার ভালো লাগে না। বরং আমি এসেই আপনার কাজে ব্যাঘাত দিলুম দেখছি···

ওহানা বলিল, না না, ব্যাঘাত কিসের?

অমর দাঁড়াইয়া আছে লক্ষ্য করিয়া সে তাড়াতাড়ি একখানা আসন আগাইয়া দিয়া বলিল, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন না।

ধন্যবাদ দিয়া অমর বসিল।

ওহানা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কতদিন জাপানে আছেন?

অমর বলিল, এক বৎসর।

ওহানা বলিল, এক বৎসর? আপনি ত চমৎকার জাপানী বলেন! ওহানার কণ্ঠস্বরে বিস্ময় প্রকাশ পাইল।

অমর বলিল, অক্ষম বলে'কি এমনি করেই লজ্জা দিতে হয়?

ওহানা শশব্যস্তে কহিল, না না, সত্যি বলছি, আমি অত্যুক্তি করছি না। আপনার উচ্চারণ ঠিক আমাদেরই মত। আমাদের স্কুলে এক আমেরিকান মহিলা ইংরেজি পড়াতেন। তিনি আমাদের ভাষা বেশ ভালোই বলতে পারতেন কিন্তু তাঁর উচ্চারণ ঠিক হ'ত না। তবুও তিনি বহুকাল এদেশে ছিলেন।

কথায় কথায় আলাপ জমিয়া উঠিল। বিদেশীর মুখে নিজের ভাষা নির্ভুল শুনিলে স্বভাবতই আমরা তার সঙ্গে একটা অন্তরঙ্গতা অনুভব করি। এ ক্ষেত্রেও তাই হইল। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর ওহানার সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। এমন কি মাঝে মাঝে সে ভুলিয়া যাইতে লাগিল যে সে একজন বিদেশীর সহিত আলাপ করিতেছে। তা ছাড়া অমরের এমন একটি অকৃত্রিম ভব্যতা ও সহজ সৌজন্য ছিল যে স্বল্পকাল আলাপেই সে মানুষের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিত।

ভারতবর্ষের লোক যে এমন হইতে পারে ওহানার তাহা ধারণার অতীত ছিল। সে শুনিয়াছিল, ভারতবর্ষ সুবিশাল তবে শক্তিহীন, ইংরেজের পদানত! সেখানকার লোকেরা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং ভারতবাসীর ধারণায় না কি যে যত কৃষ্ণকায় সে ততই রূপবান বলিয়া বিবেচিত! কিন্তু আজ এই যে মানুষটি তার চোখের সুমুখে বসিয়া আছে তার তুল্য সুপুরুষ সে ত দেখে নাই। যেমন তার গায়ের রং তেমনি তার দেহ-সৌষ্ঠব! দেখিলে য়ুরোপীয় বলিয়া ভ্রম হয়! সেদিন বাড়ি ফিরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া অমরের কথাই কেবল ওহানার মনে পড়িতে লাগিল।

তদবধি ওয়ুকির ঘরে ওহানার সহিত অমরের প্রায়ই দেখাশুনা হয়। ওয়ুকি ও ওহানা সেলাই করে, অমর নিকটে বসিয়া গল্প করে। অমর ও ওহানার মধ্যে যে-সব আলোচনা হইত সে-আলোচনায় যোগ দিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি ওয়ুকির ছিল না। তা ছাড়া এই দুটি ভদ্রবংশের নরনারীর সহিত সমান ভাবে মেশাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ, ঠিক সেই কারণেই এই দুই বন্ধু বিব্রত বোধ করিত, কারণ ওয়ুকির ঘরে বসিয়া তাহাকে বাদ দিয়া আলোচনা করায় সৌজন্যের অভাব প্রকাশ পায়। সেজন্য তাহাদের আলাপ বাধ-বাধ হইত, ঠিক জমিতে পারিত না। এই বাধার জন্য পরস্পরকে ভালো করিয়া বুঝিবার ঔৎসুক্য দুজনেরই বাড়িয়া চলিয়াছিল।

একদিন অমরের আমন্ত্রণে ওহানা শিক্ষা স্থগিত

রাখিয়া অমরের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া বসিবার আসন দিয়া অমর হিবাচির নির্ব্বাপিতপ্রায় আগুন চাগাইয়া তুলিতে উদ্যত হইল। লোহার কাঠি ও কয়লা লইয়া অমর বিব্রত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া ওহানা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, ও-কাজটা বোধ হয় আপনার চেয়ে আমি ভালো পারি! দিন, কাঠি-দুটো আমায় দিন, আপনি হাত ধুয়ে বসুন!

অমর বলিল, ধন্যবাদ। হাতের কাজে পুরুষেরা মেয়েদের নাগাল কবে পেয়েছে? বলিয়া সে উঠিয়া গেল।

হাত ধুইয়া ফিরিয়া আসিয়া অমর দেখিল আগুন গনগন করিতেছে। চমৎকার আগুন হয়েছে, বলিয়া সে শীতল হাত-দুটি বাড়াইয়া হিবাচির উপর ধরিল। তারপর বলিল, আমি কাঠি দিয়ে খেতে পারি বটে, কিন্তু এখনো দু'চারখানা কয়লায় আগুন তৈরি করার বিদ্যাটা আয়ত্ত করতে পারিনি।

ওহানা হাসিয়া বলিল, তার জন্যে দুঃখ কি? এমন ত অনেক বিদ্যা আপনার জানা আছে যার বিন্দু বিসর্গও আমি জানি না—আমি নেহাত বোকা!

কথাপ্রসঙ্গে ক্রমে তাহাদের নিজের কথা আসিয়া পড়িল। ওহানা প্রশ্ন করিয়া করিয়া অমরের দেশের কথা, সমাজ ও সংসারের কথা, পিতামাতা আত্মীয়-পরিজনের কথা, অনেক খবরই জানিয়া লইল। তারপর অমরের ফটো-আলবাম খুলিয়া তার প্রিয়-পরিজনের ছবিগুলি দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, আপনি এত দূরদেশে থাকেন, আপনার বাড়ির জন্যে মন কেমন করে না?

অমর বলিল, প্রথম প্রথম এদেশ যখন অপরিচিত ছিল, এখানকার ভাষা যখন জানতুম না, তখন করতো। এখন জাপানকে ভালবেসে ফেলেছি, এখন আর করে না।

ওহানা বলিল, ধন্যবাদ! তাহলে জাপান আপনার ভালো লাগে?

অমর বলিল, খুব! এখন থেকে আরো ভালো লাগবে!

'এখন' কথাটার উপর অমর একটু ঝোঁক দিল।

ওহানা অমরের পানে একবার তাকাইল, কি বুঝিল সেই জানে, সংক্ষেপে বলিল, অ! তারপর প্রসঙ্গটা ঘুরাইয়া লইল।

তুহিনশীতল নিভৃত কক্ষে সন্ধ্যার আবছায়ায় অগ্নি-গর্ভ হিবাচির দুইধারে যদি কোনো তরুণ ও তরুণী আসন পাতিয়া বসে, এবং তাহাদের শীতার্ত্ত হাত যদি আগুনের উপর প্রসারিত করিয়া দিয়া বিশ্রম্ভালাপে মগ্ন হয়, তাহা হইলে উভয়ের হাতে হাতে মাঝে মাঝে চকিতের জন্ম মিলন ঘটিবে ইহা ত খুবই স্বাভাবিক। অমরও তার হাতে মাঝে মাঝে ওহানার তপ্ত কাঞ্চননিভ আঙুলের স্পর্শ লাভ করিতেছিল। কথার অবকাশে সে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল ওহানার করপল্লব কি আশ্চর্য্য পরিচ্ছন্ন, সুগঠিত নখরকোণে কণামাত্র মলিনতার আভাস নাই। ঢিলা আস্তীনের মাঝ দিয়া তার নিশ্চল হাতের যে অংশ বাহিরে প্রসারিত, তাহা দেখিয়া অমরের ক্ষণে ক্ষণে ভ্রম হইতেছিল, সে-হাত অমূল্য গজদন্তে গঠিত, তাহা রক্তমাংসের নহে। ওহানার বিচিত্রবর্ণ রেশমী কিমোনো,* মাথায় প্রকাণ্ড ফাঁপানো খোঁপায় কৃত্রিম ফুলের গোছা, তার পা মুড়িয়া বসিবার মনোরম ভঙ্গী এবং মরালের মত সলীল গ্রীবা দেখিয়া কে বলিবে সে চীনা-মাটির বাসনে আঁকা ছবি নয়, একটি জীবন্ত মানুষ!

বিদায় লইবার সময় ওহানা অমরের ঘরের চারিদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কহিল, আপনার ঘরে ফুল নেই? আপনি ফুল ভালবাসেন না? আমাদের ঘরে আর কিছু না থাক, ফুল থাকবেই!

অমর বলিল, আমার ঘরে নেই কে বল্লে?

ওহানা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কৈ? দেখি।

* আলখেল্লার মত জাপানী পোশাকের নাম কিমোনো।

অমর ওহানার পানে তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, এই যে! *

ওহানা হাসিয়া ফেলিল। ঈষৎ অপ্রতিভ মুখে বলিল, আপনি ঠাট্টা করছেন!

অমর বলিল, না, ঠাট্টা নয়, যথার্থ।

ওহানা চলিয়া গেল। অমর দীর্ঘকাল স্তব্ধ হইয়া আসনে বসিয়া রহিল। ওহানার একান্ত অনুপম সঙ্গ তার চিত্তে মধু বর্ষণ করিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, ওহানার কণ্ঠের সুরে চরণভঙ্গে মুখের হাসিতে কি ত্রিভুবনের সকল সুষমা সঞ্চিত আছে? সে চলিয়া গেছে, কিন্তু ঘরের বাতাস তার চুলের গন্ধে পরিপূর্ণ। ওহানা যেন সুরভি হইয়া অমরকে বেষ্টন করিয়া আছে! ওহানার কথা ভাবিতে ভাবিতে অমরের মনে পড়িল কালিদাসের শকুন্তলার কথা— অনাঘ্রাতসুরভি পুষ্পের মত, অনাস্বাদিতপূর্ব্ব মধুর মত!

১৯

নিশীথে

কিছুকাল পরে একদিন ওহানা অমরের কক্ষদ্বারে করাঘাত করিল। দ্বার খুলিয়া অমর দেখিল ওহানা দাঁড়াইয়া আছে। তার একহাতে সেলাইয়ের পুঁটুলি আর অন্য হাতে একগোছা ফুল পাতা ও একটি নক্সাকরা বাঁশের ফুলদানি। জিনিসগুলি নামাইয়া লইয়া অমর তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। ওহানা সেলাইয়ের পুঁটুলি খুলিয়া কাঁচি বার করিয়া ডালপালা কাটিয়া ছাঁটিয়া ফুল ও পাতা সাজাইয়া গুছাইয়া একটি চমৎকার তোড়া তৈরি করিল। তারপর সেটি সযত্নে বাঁশের ফুলদানিতে ভরিয়া তোকোনোমায় † রাখিয়া দিল। তারপর অমরের পানে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেমন হল?

অমর বলিল, চমৎকার! আপনার তোড়া বাঁধা একটি রীতিমত আর্ট!

ওহানা বলিল, ঠিক তাই। চা তৈরি ও পরিবেশন করা যেমন আমাদের দেশের একটি আর্ট, ফুল আর ডালপালা দিয়ে তোড়া বাঁধাও ঠিক তেমনি। স্কুলে আমাদের এ-সব শিখতে হয়েছে।

অমর বলিল, প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটির মধ্যে যারা সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় দেয়, তারাই প্রকৃত সভ্য। আমার মনে হয় জাপানীরা এ বিষয়ে জগতের সব জাতকে হার মানিয়েছে!

স্বদেশের এমনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ওহানা লজ্জা ও আনন্দ দুই-ই অনুভব করিল। হাসিয়া বলিল, আপনার মত জাপান-ভক্তের এদেশেই জন্মানো উচিত ছিল!

অমর বলিল, আপনি আমায় এমন চমৎকার জিনিস দিলেন, আমি আর আপনাকে কি দিতে পারি? মুখের কথায় যতটা হয়!

ওহানা বলিল, ওঃ কথায় কথায় ভুলে যাচ্ছিলুম! আপনার জন্যে এক জিনিস এনেছি, বলিয়া আস্তীনের মাঝ থেকে রেশমী রুমালে বাঁধা কি এক পদার্থ বাহির করিল। তারপর রুমাল খুলিতে খুলিতে বলিল, বাড়িতে পিঠে তৈরি করেছিলুম। ভাবলুম, আপনি ভালমানুষ লোক, আপনাকে পিঠে খাওয়ালে আমার মত অক্ষম রাঁধুনীও একটা সার্টিফিকেট পাবে! অতএব বুঝছেন নিঃস্বার্থভাবে পিঠে আনিনি!

অমরের সম্মুখে পিঠে রাখিয়া বলিল, দয়া করে' চেখে দেখুন। নিতান্ত অখাদ্য যদিও!

অমর পিঠে খাইতে খাইতে চোখ বুজিয়া নীরবে বহুক্ষণ বসিয়া রহিল। দেখিয়া ওহানা সকৌতুকে বলিল,

* জাপানী ভাষায় 'হানা' শব্দের অর্থ ফুল।

† প্রকাণ্ড কুলঙ্গি। ঘরের মেঝে হইতে ছাদ পর্য্যন্ত প্রসারিত। এই কুলঙ্গিতে সাধারণত একখানি ছবি টাঙানো থাকে এবং ছবির তলায় থাকে বাঁশের ফুলদানিতে ফুল ও পাতার তোড়া।

ও কি? চুপ করে' বসে' রইলেন যে? ঘুমিয়ে পড়লেন না কি?

অমর বলিল, না, ঘুমুই নি। আপনার তৈরি পিঠের কী ভাষায় প্রশংসা করা যায় তাই ভাবছি!

ওহানা হাসিতে লাগিল। বলিল, আচ্ছা মজার লোক আপনি!

অমর বলিল, কেবল হাসলে হবে না। ফুলের তোড়াবাঁধার পরিচয় দিলেন, পিঠে-তৈরির পরিচয় অধুনা পেটের মধ্যে পাচ্ছি, এখন চা তৈরি করুন দেখি!

বলিয়া অমর চায়ের সরঞ্জাম বাহির করিয়া দিল।

চা তৈরি হইলে দুজনে চা খাইতে খাইতে এমন অনেক আলোচনা করিতে লাগিল বিজ্ঞলোকে যার অর্থ খুঁজিয়া পাইবে না।

সে যাই হোক, চা খাইয়া ওহানা সেই গোলাপী রুমালে অধর-প্রান্ত মুছিয়া উহা আস্তীনের ঝুলির মধ্যে রাখিতে যাইতেছিল। অমর বলিল, আপনার রুমালখানি চমৎকার! কী সুন্দর কাজ!

শুনিয়া রুমালখানি আগাইয়া ধরিয়া ওহানা বলিল, আঙেমাশো—আপনাকে দিলুম! বলিয়া অমরের হাতে উহা গুঁজিয়া দিল।

অমর এতটা আশা করে নাই! সে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া সাগ্রহে রুমালখানি লইয়া অধরে চাপিয়া ধরিল।

ওহানা তাহার পানে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, পাগল!

এমনি করিয়া দিনে দিনে এই দুটি নরনারীর হৃদয় তাদের অগোচরে বাঁধা পড়িতে লাগিল। শেষে এমন এক সময় আসিল, ওহানা একদিন না আসিলে যখন অমর অধীর হইয়া উঠিত। বেলাশেষের দিকে কলেজে আর মন টেঁকে না, সুখের স্বর্গ সেই কক্ষটিতে ফিরিবার জন্য সে ব্যাকুল হয়। বাড়ি ফিরিয়া ওহানা আসে নাই দেখিলে তার মন তিক্ত বিরস হইয়া উঠে, কোনো কর্ম্মে আর উৎসাহ থাকে না, লেখাপড়ায় মন বসে না। ওহানা অমরের হৃদয় একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।

একদা রাত্রে প্রকাণ্ড লেপ মুড়ি দিয়া অমর নিদ্রায় মগ্ন ছিল। হঠাৎ চোখে একটা উজ্জ্বল আলোক-শিখা পড়ায় তার ঘুম ভাঙিয়া গেল। চোখ মেলিয়া দেখিল ওয়ুকির স্বামী তার মজুরের পোষাক পরিয়া লণ্ঠন হাতে লইয়া তার মাথার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। এত রাত্রে তাহাকে শিয়রে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত অমর নিদ্রা-জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি চাই? ছুতার একটু খতমত খাইয়া ক্ষমাভিক্ষা করিয়া কি যে বলিয়া গেল অমর বুঝিল না। পরক্ষণে সে আবার গভীর ঘুমে অচেতন হইল।

কতক্ষণ ঘুমাইবার পর আর একবার অমরের ঘুম ভাঙিয়া গেল। পাশের ঘরে কে যেন কাঁদিতেছে এবং মাঝে মাঝে আর একটা কি শব্দ হইতেছে। অমর শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। শুনিতে পাইল, ওয়ুকি চাপা-গলায় ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে আর বলিতেছে—আমি ত বাজারে গিয়েছিলুম, এইমাত্র আসচি! আমি কি মিথ্যে বলছি? উত্তরে তেমনি চাপাগলায় একটা তর্জ্জন হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বশ্রুত শব্দ পাওয়া গেল। অমর বুঝিতে পারিল ছুতার তার স্ত্রীকে প্রহার করিতেছে।

রোষে ও ঘৃণায় অমরের চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। নিশীথরাত্রে অসহায় নারীর উপর এই অত্যাচারের কাপুরুষতার তুলনা সে খুঁজিয়া পাইল না। ইচ্ছা হইল, তখনি উঠিয়া এক পদাঘাতে ঘরের ভঙ্গুর দ্বার চূর্ণ করিয়া ছুটিয়া গিয়া দুর্বৃত্ত স্বামীর কবল হইতে মেয়েটিকে উদ্ধার করে। পরক্ষণেই কিন্তু মনে হইল, বিদেশে একটা ইতর প্রাণীর শয়নমন্দিরে গভীর রাত্রে অনাহূত প্রবেশ করিয়া হাঙ্গামা করা বোধ হয় ঠিক হইবে না। দেশালাই জ্বালিয়া দেখিল ঘড়িতে রাত দুইটা বাজে। সে ভাবিল, কোনক্রমে রাতটা কাটাইয়া দিবে, তারপর এ পাপপুরীর সংশ্রব ত্যাগ

করিবে! যেখানে নারীনিগ্রহ হয় সেখানে সে থাকিবে না!

প্রত্যুষে উঠিয়া ড্রেসিং-গাউনটা গায়ে জড়াইয়া অমর ত্বরিতপদে সুবোধের বাড়ি গিয়া উঠিল। বুড়ি-ঝি সেইমাত্র সদর দরজা খুলিয়া উনানে আগুন দিয়াছে।

দোতালায় একখানি মাত্র ঘর, সুবোধ সেইখানে শয়ন করিত। সরাসর উঠিয়া গিয়া দেখিল, সে লেপ মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে। শয্যাপ্রান্তে বসিয়া তাহাকে এক ঠেলায় সে জাগাইয়া দিল। চোখ মেলিয়া ক্ষণকাল বিস্মিত দৃষ্টিতে অমরের পানে তাকাইয়া সুবোধ জিজ্ঞাসা করিল, What's up? এত ভোরে?

অমর বলিল, ওঠ ওঠ, বিশেষ কথা আছে!

অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুবোধ উঠিয়া বসিল। অমর তখন গত রাত্রির ব্যাপার আদ্যোপান্ত বিবৃত করিয়া বলিল, আমি বাড়ি খুঁজতে চল্লুম! এই পাষণ্ডের বাড়িতে আর একদণ্ড থাকা নয়!

সুবোধ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। কোনো কথা বলিল না।

অমরের পিত্ত জলিয়া গেল। সে বলিল, তুমি কি কখনো ভুলেও সিয়েরিয়াস হতে পার না?

সুবোধ শান্তভাবে বলিল, তোমার ল্যাণ্ডলেডি মিছে কথা বলেছিল। তার স্বামী যখন বাড়ি ফিরে এল, সে তখন বাজারে যায়নি।

অমর জিজ্ঞাসা করিল, তবে?

সুবোধ বলিল, She was with me in my bed!

—ক্রমশ

আদি কথার একটি—

শ্রী জগদীশ গুপ্ত

(১)

বেণী একদিন দ্বিপ্রহর রাত্রে শুনিল, কে যেন তার ঘরের বেড়ার ওধার হইতে চুপি চুপি ডাকিতেছে— হরি?

দু' তিনবার……

পুরুষের গলা,—

আর হরি বেণীর স্ত্রীর নাম।

খানিক কান খাড়া করিয়া থাকিয়া বেণী খুব চুপি চুপি নিঃশব্দে বিছানা ছাড়িয়া উঠিল; পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া হড়াম্ করিয়া দরজার খিল খুলিতেই, যে-ব্যক্তি হরি হরি করিয়া ডাকিতেছিল, সে হুড়মুড় করিয়া বন-জঙ্গল ঝোপঝাড় ভাঙ্গিয়া দৌড় দিল—

বেণী তাড়িয়া গেল বটে, অন্ধকারে ভাল ঠাহর না হওয়ায় সুবিধা করিতে পারিল না।

ফিরিয়া আসিয়া বেণী ঘরের দীপ জ্বালিল,—

বেড়ায় গোঁজা ছিল রাম-দা খানা—

তাহাই দিয়া সে নিদ্রিতা হরিমতির মাথাটা খ্যাঁচ করিয়া এককোপে কাটিয়া লইয়া, সেই মাথা আর টকটকে রক্তমাখা দা লইয়া সেই দু'পুর রাত্রেই সটান থানায় আসিয়া হাজির হইল।

পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে বেণী কোনো কথা গোপন করিল না; কোনো কথার প্রতিবাদ করিল না…সোজা খুন কবুল করিয়া গেল শেষ পর্য্যন্ত।

আদি কথার একটি—

...তার ফাঁসির হুকুম হইয়া গেল।

এতবড় কাণ্ডটা ঘটিয়া গেল—কিন্তু একেবারে তুচ্ছ কারণে।

গোড়ার কথা এই—

দাসেরা পাঁচ ঘর গ্রামের একটি প্রান্তে বসবাস করিত, কিন্তু নিরিবিলি নীরবে থাকার মানুষ তার ছিল না। .. গাছের তলাকার আমটা জামটা সুপুরিটা করমচাটা লইয়া তারা ছেলেবুড়োয় মেয়েমদ্দয় এমন বকাবাকি কামড়া-কামড়ি সুরু করিয়া দিত যেন ঐ দ্রব্যটিই একমাত্র সম্বল ছিল, অমুকের ছেলেটা তাহা কুড়াইয়া লইয়া বাড়ী যাওয়ায় একজন একেবারে নিঃস্ব হইয়া গেছে। ক্ষেতের পাকা ধান রাতারাতি গরু দিয়া খাওয়াইয়া দিলে যদি অত হল্লা ওঠে তা' তবু মানায়—

কিন্তু এ একেবারে প্রাণপণ রেষারেষি—

পারে ত' এ উহাকে কাটিয়া বাঁটিয়া খায়—এম্‌নি রোখ্।

এম্‌নি হয় বারোমাস তিরিশ দিন...কেবল গলার আর গালির পাল্লা।—

বেণী দাসই ছিল পাড়ার বিভীষিকা, সকলের বড় ঠ্যাটা, বদরাগী আর জোয়ান ছিল সেই।—ঝগড়ায় বেণীকে আঁটিতে না পারিয়া তাহারই জ্ঞাতিকুটুম্ব প্রতি-বেশীরা তাহাকে অতিশয় জব্দ করিবার যে কৌশল অবলম্বন করিল, গ্রামস্থ মা রাজরাজেশ্বরীর কৃপায় তাহা অচিরাৎ সার্থকই হইল।—

দাসেদের সব আলাদা ভিটা হইলেও এ-বাড়ী ও-বাড়ীর ঘর-দুয়ার একেবারে কোল বেকোল, যেমন সরিকের বাড়ী হয়।......শত্রুপক্ষ সন্ধান রাখিয়াছিল, বেণী কোথায় যাইবে বলিয়া বাহির হইয়াছিল, কিন্তু যায় নাই; কি কারণে পথ হইতেই ফিরিয়া আসিয়াছে।

চক্রান্ত করিয়া তাই একজনের হরিমতির এই জার সাজা, ডাকাডাকি যত কিছু।

বেণীর ফাঁসির হুকুমের পরই ভাঙন ধরিল—দাসেরা বাস তুলিতে সুরু করিল।...সবাই গেল, রহিল কেবল দু'ঘর—সুবল একা, আর স্ত্রী-কন্যা লইয়া গোপাল দাস।

গোপালের দুই সংসার। প্রথম সংসার প্রথম সন্তান হইতেই মারা যায়।—

দ্বিতীয় সংসার কাঞ্চন।

কাঞ্চনই বটে—

মানুষের মন নারীর দেহে, তার মুখে, তার অঙ্গে অঙ্গে যত রূপ যত সুষমা যত নিবিড়তা কল্পনা করিতে পারে—সে তাই।...মানুষের মনের সেই ধ্যানেরই যেন সে রূপ।—

আর, তেম্‌নি বলিহারি বুদ্ধি।

কাঞ্চনের গর্ভে গোপালের দু'টি কন্যা জন্মিবার পর গোপাল একদিন তুলসী তলায় শয়ন করিল। সেটা স্মরণীয় বৎসর; সেবার দেশে গো-মড়কের খুব হুজুগ।

গোপাল একটি কন্যার বিবাহ দিয়াছিল; কিন্তু দ্বিতীয়াটিকে পার করিবার পূর্ব্বেই সে নিজেই পার হইয়া গেল।—

তখন তার সেই ছোট মেয়ে খুশীর বয়স মাত্র পাঁচ।

অনাথা কাঞ্চনের এই দুর্দিনে সুবল দাস অগ্রসর হইয়া আসিল, বলিয়া পাঠাইল খুশীকে সে বিবাহ করিতে চায়।—

কাঞ্চনের অরাজি হইবার কোনো কারণ ছিল না—একটি ছাড়া।...সুবল সবদিক দিয়াই মনের মত পাত্র; দেখিতে খাসা সুপুরুষ, ক্ষেত-খামার আছে, অবস্থা ভালই, তবে তার বয়স বেশী, তেইশ চব্বিশ...আর খুশীর বয়স পাঁচ।—

কিন্তু কাঞ্চন ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে মনকে বুঝাইল ইহাই বলিয়া যে, অমন ত' ঢেরই হয়...অমুক অমুকের,

অমুকের ছেলের, অমুকের ভাইয়ের, অমুকের ভাইপোর বিবাহ হইয়াছে···সেও ত' ঠিক এই রকমই—

ছেলে তাগ্‌ড়া জোয়ান, মেয়ে একরত্তি।

কাঞ্চন রাজি হইতেই সুবল খড় বাঁশ কিনিয়া ঘরামি লাগাইয়া চাল ছাওয়াইয়া, খুঁটি বদ্‌লাইয়া ঘর-দুয়ার ফিট্‌-ফাট্‌ পরিপাটি করিয়া দিল।

···এবং সাত পাক্‌ ঘুরিয়া গেল।

কিন্তু বিবাহের পর খুশীর কাণ্ড দেখিয়া লোকে হাসিয়া বাঁচে না।···সে সুবলকে সুবল বলিয়া ডাকে, তুই তোকারি করে, তার কাঁধে চড়িয়া পাড়ায় পাড়ায় বেড়ায়—

হাটের দিন বলে,—সুবল, হাটে যাবিনে ?

সুবল বলে,—যাব।

—এক পয়সার বাতাসা আনিস্‌ আলাদা করে' আমি খাব।

সুবল বলে,—আনব।

—তুই আন্‌বিনে। ওমা, ঐ দেখ সুবল বাতাসা আন্‌বে না।

—আন্‌ব' না তা' কই বল্‌লাম ?

—তবে হাস্‌ছিস্‌ যে ?

...এমনি রং তামাসা একটা না একটা রোজই হয়, কাঞ্চন শোনে আর হাসে।······সুবলের সঙ্গে কাঞ্চনের আগে হইতেই, পাড়ার লোক বলিয়া পরিচয় ছিল, তাই এখনো তেমন সঙ্কোচ নাই।—

সুখেই দিন যায়—

সুবল ক্ষেতের ফসল গাছের ফল এই বাড়ীতেই তোলে······

খুশীকে আশ্রয় করিয়াই ক্ষুদ্র পরিবারের কৌতুকের কণা ঠিক্‌রায়—

হাসি উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে—

চোখের জলের চিহ্নও ছিল না; কিন্তু হঠাৎ একদিন সে দেখা দিল······

জালার মুখে রাখিবার উদ্দেশ্যে চালের ধামাটা দুই হাতে আঁক্‌ড়াইয়া ধরিয়া মাটি হইতে তুলিয়া খাড়া হইবার সময় সুবলের কোমরের কোন্‌ একটা হাড়ে খট্‌ করিয়া একটা শব্দ হইয়া যন্ত্রণায় সে একেবারে টিক্‌-টিকির কাটা লেজের মত ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল...···কাঞ্চন হায় হায় করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; সুবলের মাথায় জল-বাতাস দিবে কি তার কোমরে তেল-তার্পিণ দিবে হঠাৎ তাহার দিশা সে পাইল না।···খুশী কাঁদিতে লাগিল—ওমা, সুবল যে মরে' গেল !—

যাই হোক্‌, শেষ পর্য্যন্ত তেলের ব্যবস্থাই হইল।

সুবলের ব্যথা বড় গুরুতর—

দিনে বিবিধ কাজকর্ম্মের ব্যস্ততায় যন্ত্রণা তেমন বুঝায় না; কিন্তু সন্ধ্যার পর হাত-পা ধুইয়া সুস্থির হইতে গেলেই না যায় দাঁড়ান, না যায় বসা; শুইয়া শুইয়া তামাক টানা ছাড়া বেচারীর আর গত্যন্তরই থাকে না।—

ব্যাধি যখন এম্‌নি প্রবল, তখন অভাবনীয় একটা গুরুতর কাণ্ড ঘটিয়া গেল—

হঠাৎ সুবল উঠিয়া বসিয়া যে-হাত দিয়া কাঞ্চন অন্য-মনস্কের মত তার কোমরে তেল মালিশ করিতেছিল, সেই হাতখানাই সে খপ করিয়া ধরিয়া ফেলিল !...

কিন্তু এটা দৈবাৎ নয়; আমরা সুবলের মনের কথা জানি।···কাঞ্চনের মেয়ে খুশীর রূপ, শিখা-প্রসূত শিখার মত, ছন্দে ছন্দে রেখায় রেখায় তার মায়ের অনুসরণ করিলেও বিবাহ অন্তে বহুবিলম্বে তার গৃহিণী হইয়া উঠিবার কথা।. ····সহধর্ম্মিণী আজকাল কেউ চায় না, সুবলরা আরো চায় না; ধান ভানিয়া চাল করিতে

পারিলেই এবং স্বামী মাঠ হইতে ফিরিলে সেই চাল সিদ্ধ করিয়া তাহার সম্মুখে দিতে পারিলেই অভিযোগের কিছু থাকে না; কিন্তু সে-যোগ্যতা ফুটিতেও খুশীর দেরী আছে।—

তবু সুবল যা তা করিয়া খুশীকে বিবাহ করিয়াছে শুধু ইহাই ভাবিয়া যে, সে বয়সে বেশ রূপবতী হইবে—

লোকে ভাবিয়াছিল তাই—

কিন্তু সুবলের উদ্দেশ্য ছিল আগাগোড়া অন্য রকমের.........

তার লক্ষ্য ছিল ঐ কাঞ্চন।

খুশীকে বিবাহ করা ছাড়া কাঞ্চনের হামেসা নাগাল পাইবার উপায় তার ছিল না।...আবার ইহাও সত্য যে, কোমরের ব্যথাটাও তার মিথ্যা।...কাঞ্চনকে একান্ত সন্নিকটে আনিতে হইলে ঐ কোমরে ব্যথার একটা হেতু সৃষ্টি করাই দরকার।—

কিন্তু এতদুর মানসিক ষড়যন্ত্রের ফল যখন একটা অতিশয় বর্ব্বর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সহসা দেখা দিল, তখন সে শুধু একজনকে ভয় দেখাইয়াই নিরস্ত হইল না, আর একজনকে আঘাতও করিল—

......কাঞ্চনের প্রচণ্ড ধাক্কায় সুবল আবার মাদুরের উপর চিৎ হইয়া পড়িল; এবং কাঁপিতে কাঁপিতে বাহির হইয়া আসিয়া অন্ধকার শূন্যের দিকে চাহিয়া কাঞ্চনের নিষ্পলক দুই চক্ষু দিয়া বিদ্যুৎ ছুটিতে লাগিল।......কিন্তু চোখে জল তার তখনই আসিল না।—

জানি না তার পূর্ব্বের কথা—

কিন্তু এখন যেন তার জীবনের সকল ব্যর্থতা লোকান্তর হইতে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিতে লাগিল—অসংলগ্ন, অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ আকারে।...যে অমৃতকুণ্ড একদিন কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে চাহিয়াছিল, তাহার শূন্যতা যে এত গভীর এত শুষ্ক আর এত তৃষিত তাহা তাহার যৌবনের সুপ্রচুর দীপ্তরাগেও লক্ষিত হয় নাই।...সেই অপার শূন্যতার আর্ত্তশ্বাস কোথা হইতে আজ এমন ক্ষিপ্রবেগে ছুটিয়া আসিয়া আঘাতে আঘাতে তার ভিত্তি পর্য্যন্ত টলাইয়া দিতে চাহিতেছে!......

ভয়ে কাঞ্চনের বুক শুকাইয়া উঠিল—

চোখে তার জল আসিল—

এবং ক্রোধেও তার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল।

......খুশী ঘুমাইতেছিল; হঠাৎ ছুটিয়া যাইয়া কাঞ্চন তাহাকে বুকের উপর তুলিয়া লইয়া দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া তাহারই মাথার উপর টপ্ টপ্ করিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল—

সে রাত্রে উনানে হাঁড়ি চাপিল না।

ঘণ্টাখানেক বেলা হইয়াছে—

খুশী কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া কাঞ্চনকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—মা, সুবল আমায় লাথি মেরেছে।

শুনিয়া দুরন্ত ক্রোধে কাঞ্চনের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।......শিশুস্ত্রীর প্রতি সুবলের অত্যাচার এই প্রথম, তাহাদের সমাজে স্ত্রীঅঙ্গ অস্পৃশ্য নহে, প্রহার গা-সওয়া জিনিষ; কিন্তু কিরূপ মনোভাব লইয়া সুবলের এই অত্যাচার আজ সুরু হইল তাহাই কাঞ্চনের অন্তরের প্রত্যেকটি বিন্দু অনুভব করিয়া যেমন তাহার জ্ঞান রহিল না, তেমনি সুবলের খুশীকে বিবাহ করিবার গুহানিহিত গভীর উদ্দেশ্যটা সহসা আঁধার কাটিয়া আজ তাহার চোখের সম্মুখে স্বচ্ছ সুস্পষ্ট হইয়া গেল।......কাঞ্চন শিহরিয়া উঠিল।

মেয়েটিকে কোলে করিয়া যখন কাঞ্চন সুবলের সন্ধানে ছুটিল তখন মেয়ে চীৎকার থামাইয়া সভয় নেত্রে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া কেবল ফুঁপাইতেছে...... অমন প্রলয়ঙ্কর অন্ধকারের বিভীষিকা সে মায়ের মুখে আগে কখন দেখে নাই।

কিন্তু সুবলকে পাওয়া গেল না; সে লাথি ঝাড়িয়াই বাহির হইয়া গেছে।

কাঞ্চন ফিরিয়া আসিল; মেয়েকে বলিল,—চুপ কর্! আসুক্ আগে, দেখ্‌ব'খন।

কিন্তু মেয়ের দুঃখ তাহাতে ঘুচিল না—

সুবল যখন ফিরিল তখন কাঞ্চন কুলার উপর ডাল মেলিয়া তার মাটি বাছিতেছে।

সুবলের বুক দুরুদুরু করিতেছিল—সে শব্দটা শোনা গেল না; পায়ের শব্দই অগ্রসর হইতে লাগিল।…কাঞ্চন সে দিকে চোখ ফিরাইতে পারিল না; কিন্তু তাহার মন যেন সহস্র চক্ষু মেলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, সুবলের ঘর্ম্মাক্ত ক্লান্তি, তৃষ্ণার শুষ্কতা

কাঞ্চন ডালের মাটি বাছিতে বাছিতে সহজ কণ্ঠেই বলিল,—তোমার জল আর গুড় ঢাকা রয়েছে জলচৌকির নীচে। এখনই খেয়ো না যেন, ঘামটা মরুক।

……সুবল এতক্ষণ ধরিয়া বুকের ভিতর এমন একটা দুর্ব্বহ শঙ্কার পিণ্ডভার বহন করিয়া ফিরিতেছিল যে, তার অস্বস্তির অন্ত ছিল না।……বিষাক্ত বাক্যের সঙ্গে গরুর পাচন হইতে ঢেঁকির মুগুর পর্য্যন্ত—ইহার মধ্যে যে কোন্ প্রহরণটা যথেষ্ট কার্য্যক্ষম মনে হইবে তাহারই কিছু উদ্দেশ না থাকায় তাহার মানসিক যন্ত্রণা বাড়িয়াছে বই তিলার্দ্ধ কমে নাই।—

গায়ের ঘাম মরিবে পরে—

আপাততঃ কাঞ্চনের সহজ কথায় ভয় আর দুর্ভাবনার সজীব পিণ্ডটা ত' মরিয়া বাঁচাইল।

……সুবল গামছা ঘুরাইয়া হাওয়া খাইতে খাইতে ঘরে ঢুকিতেছে এমন সময় খুশী কোথা' হইতে চেঁচাইয়া আসিয়া পড়িল,—মা, ঐ যে সুবল এসেছে।

শুনিয়া সুবল মুখ ফিরাইয়া একটু মুচ্‌কি হাসিয়া ঘরে ঢুকিয়া গেল, কিন্তু কাঞ্চনের আনত দৃষ্টি কঠিন হইয়া অনেকগুলি কটু উক্তি তার জিহ্বাগ্রে সাজিয়া দাঁড়াইল।

ঢক্ ঢক্ করিয়া একচুমুকে একঘটি জল খাইয়া ফেলিয়া সুবল "আঃ" বলিয়া স্বস্তির একটা নিনাদ করিতেই কাঞ্চন বারান্দা হইতে বলিল,—তুমি খুশীকে লাথি মেরেছ কেন?

কৈফিয়ৎ সুবলের প্রস্তুতই ছিল—

বলিল,—প্যান্‌প্যানানি আমার ভাল লাগে না দিনরাত।

খুশী খুব ছোট এবং সম্পর্কে স্ত্রী হইলেও, মনে মনে সুবল ভয় করিতেছিল, শুধু ভাল লাগা না-লাগার জবাব-দিহিটা ঠিক্ কাজে লাগিবে কিনা বলা যায় না—

কিন্তু কাজে যেন লাগিয়াছে……

কাঞ্চনের পক্ষ হইতে তাহার কৈফিয়তের কোনো বাদ-প্রতিবাদ আসিল না।……মনে মনে খুব একটা আমোদ অনুভব করিয়া সুবল টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে হাসিতে আস্তে আস্তে উঠিয়া দরজার ফাঁক দিয়া কাঞ্চনের দিকে মুখ বাড়াইয়াই থম্‌কিয়া গেল; দেখিল, কাঞ্চনের কথা না বলার কারণ আছে…নিঃশব্দ কান্নার বেগে তাহার দেহ দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে।—

মুখে একরাশ কালি মাখিয়া সুবল চোরের মত সরিয়া গেল।

সুবলের অভদ্র অন্তরের কাছে গত সন্ধ্যার যে অপরাধটা এতক্ষণ তাদৃশ গুরুতর মনে হয় নাই, কাঞ্চনকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহা সহসা এমনই লজ্জার কথা হইয়া উঠিল যে, ঘরের বাহিরে আসিয়া কাঞ্চনের সম্মুখীন হওয়াই যেন আর সম্ভব নয়।

খুশী আসিয়া বলিল,—সুবল, নাইতে যা, মা বল্‌লে।

সুবল চিৎ হইয়া শুইয়া ছিল, খুশীর মারফতি আদেশে সে নড়িল না

……খানিক পরে খুশী আবার আসিল, এবার

তেলের বাটি লইয়া ; বলিল,—সুবল, নাইতে যা শীগ্‌গির। মা বল্‌লে, এতই যদি ভয় তবে অমন আর করিস্‌নে।

সুবলের প্রাণ ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল—

তৎক্ষণাৎ সে বড় বড় চোখ্ করিয়া খুশীর দিকে চাহিয়া গা-ঝাড়া দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল।···

একেবারেই অসম্ভব হইলেও তার বড়ই ইচ্ছা করিতে লাগিল, একবার যাইয়া স্বকর্ণে শুনিয়া আসে কি সুরে কাঞ্চন কথাটা বলিয়াছে ; আর স্বচক্ষে দেখিয়া আসে তখনকার মুখের ভাবটি তার।······কথায় যেন ক্ষমার সুর বাজিতেছে।.... .খুশী দিল নিষ্প্রাণ খবর শুধু—কিন্তু সে মুখ তখন কঠিন, না কোমল, না কি !

দেরী দেখিয়া কাঞ্চন এবার নিজেই আসিল ; দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিল,—খাবে কি খাবে না বলে' দিলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। তোমাকে খাওয়ানো ছাড়া আমার আরো ঢের কাজ আছে।

—যাই। বলিয়া সুবল এক খাব্‌লা তেল মাথায় আর গামছা একখানা কাঁধে লইয়া যেন হাওয়ার উপর নাচিতে নাচিতে বাহির হইয়া গেল

কিন্তু অসহ্য আত্মগ্লানির সহিত কাঞ্চনের মনে হইতে লাগিল, যতদূর কঠোর হইয়া থাকা তার উচিত, তত কঠোর সে হইতে পারে নাই। আপন পেটের মেয়ের প্রতি তাহার যে কর্ত্তব্য সে কর্ত্তব্য সে পালন করিতেছে না।· ····কতবড় অসহায় অবোধ শিশুটি······খেলা ছাড়া আর কোনো আকাঙ্খার বীজ আজো তাহাতে অঙ্কুরিত হইয়া ওঠে নাই···ভবিষ্যতের সেই পবিত্র আকাঙ্ক্ষাকে যে ব্যক্তি কলুষিত অন্তরের ছোঁয়াচ দিয়া ব্যর্থ করিয়া দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত তাহাকে উচিত শাস্তি দিবার ভার ত' তাহারই হাতে।···অতিশয় ঘৃণার পাত্র সে, যে এমন দূরের জিনিষকে আজই লাঞ্ছিত করিতে এমন করিয়া অবাধে হাত তোলে।······

সুবল স্নান করিয়া আসিয়া দেখিল, ভাত ঢাকা রহিয়াছে, কিন্তু প্রত্যহ তাহা থাকে না। খুশী পাহারায় রহিয়াছে, বিড়াল না ডিঙায়।

সুবল মরা নদীর গরম জলে স্নান করিতে করিতে মনটাকে খুশীর হাওয়া লাগাইয়া আরো হাল্কা করিয়া তুলিয়াছিল ; এমন কি, একবার ডুব দিয়া উঠিয়া পুনরায় ডুব দিবার কথা খানিকক্ষণ তার মনেই পড়ে নাই······

কিন্তু যে অভ্যর্থনা আশা করিয়া সে আসিয়াছিল, কার্য্যক্ষেত্রে কোথাও তার লক্ষণ না দেখিয়া বড় দমিয়া গেল ; বলিল,—তোর মা কোথা রে ?

খুশী বলিল,—জানিনে। পান তুই সেজে খাস্।

কিন্তু সুবলের ভাতের প্রতি রুচি আর পানের প্রতি লোভ আর একটুও রহিল না।

কাঞ্চন আসিয়া দেখিল, সুবল ভাতের সিকিও খায় নাই। কিন্তু তখন তাহার শ্রান্ত মন যেন দু'চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এলাইয়া পড়িয়া আছে।······একজন না খাইয়া উঠিয়া গেছে ইহার দুঃখও যেন শুধু অবশ আলস্যের ভারেই তাহার অন্তরাত্মা গ্রহণ করিতে চাহিল না।

..... সুবলের ঘরের কপাট ভেজান রহিয়াছে—

একটুখানি খুলিয়া কাঞ্চন দেখিল, সুবল আর খুশী পাশাপাশি শুইয়া ঘুমাইতেছে ; সুবলের মুখ ম্লান, খুশীর মুখ হাসিতেছে।······দৃশ্যটা যুগপৎ যেমন করুণ, তেম্‌নি কৌতুককর।

দরজা পুনরায় ভেজাইয়া দিয়া কাঞ্চন যখন চলিয়া আসিল তখন অপার শ্রান্তির নির্জ্জীবতা ভাঙ্গিয়া তাহার অন্তর বাহিরের শোণিতমর্ম্মে একটা তীব্র জাগরণ কাঁপিয়া উঠিয়াছে।—

······সহসা সমগ্র ব্যাপারটার চরম নিষ্ঠুরতার দিকে তাহার চোখ্ খুলিয়া গেল।—

একই শয্যায় স্বামী-স্ত্রী নিদ্রিত—

পুরুষত্বের পূর্ণবিকাশে সর্ব্বদেহের অসাধারণ তেজো-প্রাচুর্য্যে একজন যেন পৃথিবীর সমস্ত মর্ম্মহীন রসহীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া এখন শুধু সর্ব্বব্যাপী ক্লান্তিতে ভারাক্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে—

তাহারই পাশে পড়িয়া আছে একটি অতিশয় শিশু !......

কাঞ্চনের পা দু'খানা সম্মুখের দিকে কিছুতেই চলিতে চাহিল না।......ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সে সুবলের শয়নকক্ষের দ্বার ঠেলিয়া মেয়েটিকে সন্তর্পণে তুলিয়া লইল......

কিন্তু মেয়েটিকে কোলে করিয়া বাহিরে আসিতেই তাহার মনের অবস্থা যে কিরূপ দাঁড়াইল তাহা তাহার নিজেরই জানা রহিল না।......ঝড়ে যেমন পাতা ছোটে তেম্‌নি করিয়া যেন পশ্চাতে ভূতের তাড়ায়, সেই দ্বিপ্রহরের রৌদ্রেই সে নিরুদ্দেশে ছুটিয়া চলিল......কোথায় যাইয়া থামিবে তাহা তাহার ভাবনার বাহিরেই পড়িয়া রহিল।

সুবল ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দেখিল, বাড়ী জনশূন্য ; এবং সেই সুযোগে বাড়ীতে গরু ঢুকিয়া রোদে-দেয়া ধানের পনর আনাই নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে।

সুবল বারকতক হাঁকিল,—খুশী।

কিন্তু খুশী তখন মাতৃক্রোড়ে—পুরাতন এক প্রতি-বেশীর দাওয়ায়।

কাঞ্চনকে ত' ডাকা চলে না, তাহাকে নিঃশব্দে খুঁজিয়া লইতে হইবে।

বিবাহের পূর্ব্বে কাঞ্চনকে সে নাম ধরিয়াই ডাকিত ; তখনো অন্তরে জাগ্রত কামনা ছিল ;—কিন্তু নামের সঙ্গে জড়াজড়ি হইয়া তাহা এমন তীব্র হইয়া ওঠে নাই।... আজ তাহাকে নাম ধরিয়া কাছে ডাকিতে তাহার বাক্‌-শক্তিটাই যেন দপ্‌ দপ্‌ করিতে থাকে—

কিন্তু সে পথ বন্ধ।

এখন সে ডাকে খুশীকে, কিন্তু যাহা বলিবার তাহা বলে কাঞ্চনের উদ্দেশে ; কাজ এক রকম চলিয়া যায়।

খুশীকে ডাকিয়া সাড়া না পাইয়া সুবল এ-দিক ও-দিক্‌ এ-ঘর সে-ঘর খুঁজিয়া দেখিল—খুশী আর তার মা কোথাও নাই।

......ধান্য রৌদ্রে দিয়া তাহা অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়া কাহারো উচিত কিনা সে বিষয়ে তাহার বক্তব্য সে ভাল করিয়াই বলিবে, কিন্তু তিলার্দ্ধ রাগ প্রকাশ করিবে না—মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়া সুবল যখন হাত মুখ ধুইয়া একটা পান সাজিয়া, গালে দিয়া কলিকার মাথায় আগুন দিয়াছে, এমন সময় বাহিরে খুশীরই কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—দেখ্‌ ত' মা, আমার ঠোঁট রাঙা হয়েছে কি না পান খেয়ে ?

কাঞ্চন আসিতেছে—

এবং তাহার শব্দেই সুবলের সঙ্কল্প উল্টাইয়া ধানের রাগটাই নিদারুণ হইয়া উঠিল।

......বড় কষ্টের ধান।

কিন্তু আসিল খুশী একা।

সুবল বলিল,—তোর মা কই ?

—মা ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে। মা বল্‌লে, তুই তোর নিজের বাড়ীতে যা ; তা নইলে সে আস্‌বে না।

—বটে ?—বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া সুবল চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল,—নেমকহারাম মেয়েমানুষ নইলে এমন কাজ কেউ করে !......যে বাড়ী করে' দিলে তাকেই বাড়ী থেকে তাড়ান' ! ......আচ্ছা, আমি চল্‌লাম, এখনই চল্‌লাম। রইল তোমার বাড়ীঘর, আর রইলে তুমি......কি করে' তোমার দিন চলে তাই একবার আমি দেখ্‌ব'। ভুঁয়ের ফসল, ক্ষেতের শাক দিয়ে কে ঐ নাদা পেট ভরাবে তাই আমি দেখব' বসে' বসে' ; আমার সঙ্গে বেইমানি—

বলিতে বলিতে রাগ নিবিয়া কোথা হইতে হু হু করিয়া জল আসিয়া তার দু'চক্ষু পূর্ণ হইয়া গেল।

খুশী বলিল,—তুই এখনই যা। মা—

দ্রুত পায়ের শব্দে খুশী ফিরিয়া চাহিতে না চাহিতেই

কাঞ্চন ঠাস্ করিয়া তাহার পিঠে এক চড় বসাইয়া দিয়া তাহাকে শূন্যে তুলিয়া লইয়া তেম্‌নি দ্রুত বেগে চলিয়া গেল।—

সুবলের মুখের ব্যথাটা কাঞ্চন স্বচক্ষে দেখে নাই, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছে,—কেমন করিয়া সে কণ্ঠস্বর অশ্রুভারে অচল হইয়া অকস্মাৎ থামিয়া গেছে।—

কাঞ্চনের বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল, যেন কে পাক্ দিয়া মুচড়াইয়া তুলিল……কিন্তু খুশীকে যখন কথাগুলি সে বলিতে শিখায় তখন ত' ঘুণাক্ষরেও সে অনুভব করিতে পারে নাই যে তাহারই কথা অপরের মুখ দিয়া বাহির হইবার সময় এমন দুঃসহ কঠিন হইয়া তাহারই কর্ণে প্রবেশ করিবে।……তখন সে হাজারো রাগের মধ্যে মনে মনে একটু হাসিয়াছিল—তা' কি সে পারে! আর না-ই পারুক, চোখের আড়ালে সে যাইতে পারিবে না।—

কিন্তু পারে কি না সে পরীক্ষা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কাঞ্চনকে উল্‌টা গাহিতে হইল।……

খুশী আসিয়া বলিল,—মা যেতে বারণ কর্‌লে।

সুবল কথা কহিলু না, হাত তুলিয়া চোখ মুছিল না, চোখ তুলিয়া চাহিলও না—অপমান আর নিমকহারামী তার বড় বাজিয়াছে। কিন্তু চুপ করিয়া থাকাও চলিল না। খুশীর সঙ্গে সঙ্গে সে বাহিরে আসিয়া বলিল,—আমি কারো খেয়ালের চাকর ত' নই যে, হুকুম কর্‌লে বেরিয়ে যাও, অম্‌নি বেরিয়ে গেলাম; আবার তখনি হুকুম হ'ল থেকে যাও, অম্‌নি থেকে' গেলাম।……এত দায় আমার কিসের?

প্রশ্ন করিয়া সুবল উঠিপড়ি তামাক টানিতে লাগিল; এবং একটু বিলম্বে তার প্রশ্নের জবাব আসিল।—

কাঞ্চন আড়াল হইতেই বলিল,—দায় তোমার নয়, দায় সব আমার, তা' আমি জানি। কিন্তু তোমার উচিত ছিল, আমার বল্‌বার আগেই সরে' যাওয়া……মানুষের আক্কেল তোমার নেই—থাক্‌লে তা-ই কর্‌তে।

সুবল বলিল,—ঝগ্‌ড়া করে' তোমার সঙ্গে কেউ পারবে না এ জানা কথা—আমি ত' নই-ই। কিন্তু আমার অপরাধ কি?

সুবলের এই প্রশ্ন যেমন দুঃসাহসিক তেম্‌নি নির্লজ্জ। ……সুবলের অন্তরভূমি কাঞ্চনের চোখের সাম্‌নে যেন প্রসারিত হইয়া দেখা দিল; সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল, বহুদিনের সঞ্চিত ইচ্ছা খলতায় ছলনায় পরিপূর্ণ হইয়া শামুকের মত ধীরে ধীরে বুকে হাঁটিয়া অগ্রসর হইয়া হঠাৎ খাড়া হইয়া উঠিয়াছে।

কাঞ্চনের গায়ে কাঁটা দিল……

পাপিষ্ঠের এই লজ্জাহীন সহজ ধৃষ্টতায় তার ক্রোধের অন্ত রহিল না।……কণ্ঠে তার কথা ফুটিল না; ফুটিলে কি সুর বাহির হইত কে জানে……সে শুধু কাঁপিতে কাঁপিতে আঙুল তুলিয়া সুবলের পরিত্যক্ত বাড়ীটা তাহাকে দেখাইয়া দিল; এবং দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া মাটিতেই লুটাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল,—ভগবান, আমায় বাঁচাও, বাঁচাও।……

খুশী আসিয়া খবর দিল,—মা, সুবল চলে' গেছে।

খুশী আশা করিয়াছিল, সুসংবাদটা শুনিবামাত্র তার মা লাফাইয়া উঠিবে, কিন্তু তাহাকে হতাশ হইতে হইল।

খুশী আবার ডাকিল,—মা, ওঠো না, সুবল চলে' গেছে।

—চলে' গেছে?—বলিয়া কাঞ্চন চোখ্ তুলিয়াই তাড়াতাড়ি ফিরাইয়া লইল।

খুশী ছোট্ট মেয়ে—

রক্তবর্ণ চক্ষু দেখিয়া অনুসন্ধিৎসু বা সংশয়াকুল হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নয়; কিন্তু অপরিসীম অন্তর্দ্দাহের সহিত কাঞ্চনের মনে হইতে লাগিল, মেয়েকে এই চক্ষু দেখাইবার মত প্রবঞ্চনা আর পাপ জগতে আর কিছু নাই।

সারাদিন সুবলের সাড়া পাওয়া যায় না।

সন্ধ্যার পর একটু খুট্‌খাট্‌ শব্দ শোনা যায়; আর দেখা যায়, সুবলের ঘরের অসংখ্য ছিদ্রপথে বাহির হইতেছে ধোঁয়া।......সেই ধোঁয়ার দিকে কাঞ্চন চাহিতে পারে না।

দিবসের নিরলস কর্ম্মচঞ্চলতার মধ্যে মনটা তার দিক্-যন্ত্রের কাঁটার মত অনুক্ষণ একই দিকের ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে .....

খুট্ করিয়া একটু শব্দ—

কোথায় তার ঠিক্ নাই—

অম্‌নি কাঞ্চনের কান মন স্নায়ু জ্ঞান যেন রোমে রোমে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া ওঠে!......বেলায় যত ভাটা পড়ে মন তার তত সচেতন হয়।......ঘর্ঘর করিয়া তার জাঁতা চলে......সপ্ সপ্ করিয়া তার ঝাঁটা চলে......খর্ খর্ করিয়া তার হাতা চলে......কিন্তু সকল শব্দের অন্তরালে একটি ক্ষুদ্রতম শব্দ, একটি আগমনবার্ত্তা—ক্লান্ত এতটুকু সুর, তার কল্পনার সুদূর দিগন্তরাল হইতে অবিশ্রান্ত মাথা তুলিতে থাকে।......হঠাৎ সে থামিয়া পড়ে—শব্দ যেন আসিয়াছে......পরক্ষণেই তার হতাশা আর ক্লেশের অবধি থাকে না, এত আশার প্রথম শব্দটি বুঝি এড়াইয়া গেছে।......কাজ ফেলিয়া বহুক্ষণ সে উৎকর্ণ হইয়া থাকে।—

হঠাৎ একদিন অভ্যস্তক্ষণে না আসিল শব্দ, না উঠিল ধোঁয়া।

কাঞ্চন খানিক্ এ-ঘর ও-ঘর ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াইয়া খুশীকে ডাকিয়া বলিল,—ও-বাড়ীতে সাড়াশব্দ পাচ্ছিনে; দেখে আয় ত' সুবল এসেছে কি না।

খুশী দৌড়াইয়া গেল—

এবং অনতিবিলম্বেই দৌড়াইয়া আসিয়া খবর দিল,—সুবল আসেনি, মা।

—চল্ দেখে আসি। বলিয়া খুশীকে লইয়া সুবলের বাড়ীতে কাঞ্চন নিজেই গেল।

......রান্নাঘরের শিকল খুলিয়াই যে দৃশ্য তার চোখের সম্মুখে সহসা উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িল তাহাতে তার চোখের জল যেন কিছুতেই বশ মানিতে চাহিল না।......কলার পাতার উপর রাশীকৃত উপকরণহীন অভুক্ত অন্ন শুকাইয়া চাল হইয়া উঠিয়াছে......ইঁদুরে তা' ঘরময় ছড়াইয়াছে।—

এ কালকার সন্ধ্যার আহারের আয়োজন—

তারপর আজ সমস্ত দিনটা গেছে—

অন্নস্তূপের দিকে চাহিয়া কাঞ্চনের চোখ্ ঝক্‌ঝক্ করিতে লাগিল; একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কাঞ্চন বলিল,—একটু গোবর কুড়িয়ে আন্ ত' খুশী, এঁটোটা মুক্ত করে' ফেলি।

কিন্তু সুবলের পরিবারের তাহাতে আপত্তি ছিল; সে বলিল,—ওমা, এ যে সুবলের ঘর।

—তা' হোক, তুই আন্।—বলিয়া কাঞ্চন এঁটো সাপ্‌টাইতে সুরু করিয়া দিল; কিন্তু কাজ সমস্ত হইল না।......গোবরের সন্ধানে খুশী উঠানে নামিয়াছিল, সেখান হইতেই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—ও মা, সুবল এসেছে।—বলিয়া সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

খুশীর কাছে ব্যাপারটা একেবারেই স্পষ্ট নয়—

কিন্তু, একটা লুকোচুরির ব্যাপার এখন চলিতেছে; এবং সুবল ঠিক্ এই সময়টিতেই আসিয়া পড়ায় তাহার মায়ের একটু বিপদ হইয়াছে, তাহা খুশীর স্বল্পবুদ্ধির কাছেও ধরা পড়িয়াছে—

সুবল সোজা ঘরের ভিতর উঠিয়া গেল—

কাঞ্চন তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

দুইজন সাম্‌না-সাম্‌নি দাঁড়াইয়া—চারি চক্ষু মিলিত হইল......সুবলের মুখখানা কৌতুক-হাসিতে ভরিয়া উঠিতে উঠিতে অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল; এবং কাঞ্চনের দেহ ও মনের সমগ্র চেতনা একটি মাত্র বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া আবর্ত্তিত হইতে লাগিল—যেন তীব্র স্রোতের মধ্যে জলের পাক্......

দূর-দুরান্তর হইতে দুর্নিবারবেগে আকর্ষিত হইয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য পদার্থ যেমন ঘূর্ণিত জলের গহ্বরে ছুটিয়া আসিয়া চক্ষের পলকে অদৃশ্য হইয়া যায়—তেম্‌নি একটা মহাশক্তির দুর্জ্জয় ক্রিয়া ঘটিতে লাগিল কাঞ্চনের সমগ্র চৈতন্য ব্যাপিয়া।……একটি নিমেষে ইহজগত ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান একেবারে মুছিয়া যাইয়া একটি প্রোজ্জ্বল বিন্দু শুধু চোখের সম্মুখে মুদ্রিত হইয়া রহিল।…

খুশী উঠান্ হইতে চেঁচাইয়া বলিল,—মা, কে এসেছে দেখ।

সুবল সরিয়া গেল—

তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করিয়া কাঞ্চন বাহিরে আসিল; কিন্তু যে প্রাণান্তকর আবর্ত্ত তাহাকে এইমাত্র উদ্গিরণ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে তাহার চিহ্ন ত সহজে মুছিবার নয়।—

আগন্তুক রমণী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাঞ্চনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু প্রশ্ন করিল খুশীকে,—ঘরের ভেতর আর কে রে?

খুশী বলিল,—সুবল রয়েছে।

—দুর্গা, দুর্গা। আর একদিন আস্‌ব' লো কাঞ্চন; আজ বড় অসময়ে এসে পড়েছি। তুই বুঝি এখন গা ধুতে' যাবি?—বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া হাসিটাকে দেখাইয়া দেখাইয়া আঁচল চাপা দিল

কাঞ্চন ভাবিল, এই আমার প্রাপ্য; প্রায়শ্চিত্তের হরু এই।—

বলিল,—না, পিসি; চল আমার ঘরে। সুবলের ঁটোটা মুক্ত করতে এসেছিলাম।

পিসি বলিল,—তা' বৈ কি; তা' ছাড়া আর এ সময়ে ক কাজে আস্‌বি! কাল আস্‌ব; কাজ আমার তেমন কছু নেই।—বলিতে বলিতে কাঞ্চনের পিসি কাঞ্চনের াকড়ি হাতের দিকে একবার বক্র কটাক্ষে চাহিয়া এক গায় দু' পায় বিদায় হইয়া গেল—

যেন প্রাণ তার দেহে নাই—

এম্‌নি নিশ্চল আর বিবর্ণ হইয়া সেই উঠানের মাঝ-খানেই কাঞ্চন দাঁড়াইয়া রহিল।

খুশী তাহাকে দুই হাতে ঠেলিতে লাগিল,—মা, চলো, ভয় কর্‌ছে।

যে-ঘরের ভিতর হইতে কাঞ্চন কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া এই মাত্র বাহির হইয়া আসিয়াছে সেই দিকে একবার সে ফিরিয়া চাহিল; অন্ধকারে কিছুই ঠাহর হইল না—

খুশীর দিকে চাহিতে কাঞ্চনের ভয় করে—

রাত্রে সে বেশ থাকে; অন্ধকারের আবরণ যেন তাহাকে একান্ত একাকী করিয়া পৃথিবীর সঙ্গে তার সংস্পর্শের স্থানটিতে একটা দীর্ঘ অটল ছেদ-রেখা টানিয়া দেয়……সে যেন লুকাইয়া বাঁচে।

কিন্তু স্পষ্ট দিবালোকে নিজের দেহটাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া তাহার সারা প্রাণ ছম্‌ছম্ করে—

খুশীকে স্পর্শ করিতে হাত উঠিয়াই যেন ধাক্কা খাইয়া হাত ফিরিয়া আসে; মনে হয়—তাহারই স্পর্শের ভিতর দিয়া কি একটা অজ্ঞাত বিষাক্ত বস্তু মেয়ের জীবনের উপর ঝরিয়া পড়িয়া তার অকল্যাণের আর কিছু বাকি থাকিবে না।……খুশী যেন ছাগশিশু—করালীর তৃষ্ণার আগুন তাহার জীবনমুকুলটি লক্ষ্য করিয়া অহরহ জিহ্বা দুলাইতেছে—

কাঞ্চন হঠাৎ শিহরিয়া চোখ বোজে—

চোখ বুজিয়া নিজের দিকে চায়; দেখে, দিক্‌চিহ্ন-হীন অসীম প্রান্তর,—তার কোথাও শব্দ নাই, কুয়াশা নাই, শৈত্য নাই, গতি নাই…প্রখর সূর্য্যকিরণ তাহার মধ্যস্থলে একটি মরীচিকার স্বচ্ছ সরোবর সৃষ্টি করিয়াছে।

সর্ব্বদেহে কাঁপিয়া রোমাঞ্চ জাগে—

চোখ খুলিয়া বলিয়া ওঠে,—চল্ খুশী, বেড়িয়ে আসি। বলিয়া খুশীকে পুরোভাগে লইয়া কাঞ্চন পল্লীর পথে পথ-ভ্রান্তের মত চলিতে থাকে।—

কাঞ্চনের মনের মোটামুটি একটা খবর এতদিনে সুবলের জানা হইয়া গেছে।...মনের সেই তীব্র প্রকাশ বর্ব্বরেরও, অন্ততঃ আংশিক ভাবেও না বুঝিবার কথা নয়। কিন্তু সেটা কতটা তীক্ষ্ণ, কতটা অনুকূল, তার কোথায় বিঘ্ন, কোথায় বিরাগ, কোথায় বিপত্তি—এত সূক্ষ্ম বিচার এবং অনুভূতির ধার ঘেসিয়া যাওয়াও অন্ধ সুবলের সাধ্য নয়।

কিন্তু তাহাতে তাহার প্রফুল্ল হইয়া উঠিতে কিছু বাধিল না; অথচ ভয়টাও একেবারে নিঃশেষ হইয়া কাটিতে চাহিল না। কখন অনুকূল আহ্বানটি একেবারে নির্ভয় নিঃসংশয় করিয়া দিয়া অভ্রান্ত হইয়া দেখা দিবে তাহারই আশা মারাত্মক হইয়া উঠিয়া তাহাকে অশোয়াস্তির একশেষ করিয়া তুলিল।—

সুবল কাজে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিল।—

খুশী মাঝে মাঝে আসে—

নারিকেলের মালাটা, গাছের তলাকার ফলটা কুড়াইয়া লইয়া যায়...

সুবল তাহাকে আসিতে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করে,—তোর মা আমায় ডেকেছে নাকি?

খুশী বলে,—না।

-তবে তুই এখানে কেন?—বলিয়া তড়াং করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া সুবল বারান্দা হইতে আঙ্গিনায় পড়ে।

খুশী ছুটিয়া পালায়।

কাঞ্চন আসে; বলে,—খবর্দ্দার, খুশীর গায়ে হাত তুললে তোমার ভাল হবে না।...

থাকিতে থাকিতে সুবল ছিঁচকে হইয়া উঠিল; ছোঁ ছোঁ করিয়া বেড়ায়, উঁকি ঝুঁকি মারে...শুভযোগের ক্ষণটি খোঁজে।—

কাঞ্চনের দেহ ভাল নাই; চক্ষু কোটরে প্রবেশ করিয়াছে; রঙে ময়লা লাগিয়াছে; একটা জীর্ণ শুষ্কতা যেন তার সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলিতেছে...মাঝে মাঝে হঠাৎ মাথা ঘুরিয়া সে চোখে অন্ধকার দেখে। সর্ব্বশরীরের এমনই অবসাদ অশেষ দৌর্ব্বল্য লইয়া কাঞ্চন শুইয়া আছে; ঘরের ভিতরকার মাটির প্রদীপটি টিপ টিপ করিয়া জ্বলিতেছে, খুশী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

সুবল কাঁপিতে কাঁপিতে কাঞ্চনের দাওয়ায় উঠিল—নিঃশব্দে; দরজায় চোখ লাগাইয়া দেখিল, কাঞ্চন চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে—গায়ে কাপড় নাই।—

বন্ধ দরজার সামনে সুবল মুহূর্ত্তেক আড়ষ্ট দেহে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঠেলিয়া দরজা খুলিল; এবং তাহারই শব্দে চোখ খুলিয়া দরজার সম্মুখেই সুবলকে দেখিয়া কাঞ্চন তাড়াতাড়ি কাপড় টানিয়া গায়ে দিয়া উঠিয়া বসিল; এবং পরক্ষণেই তাহার সকল আচ্ছন্নতা ভাঙ্গিয়া কণ্ঠ দিয়া যে স্বর নির্গত হইতে লাগিল, সুবল তেমনটি আর কখনো মানুষের মুখে শোনে নাই।...কাঞ্চন চীৎকার করিতে লাগিল—যাও যাও যাও, যাও আমার সামনে থেকে, শীগ্‌গির যাও, যাও বল্‌ছি, যাও যাও...

তার কণ্ঠস্বরে—আর মাটির প্রদীপের দুর্ব্বল আলোকে কাঞ্চনের মুখাবয়বের যে-টুকু দেখা গেল তাহাতেই সুবল চম্‌কিয়া একেবারে কাঠ হইয়া গেল।...সে দৃষ্টিতে হিংস্র রক্তালুতা ছাড়া আর যেন কিছু নাই

...কাঞ্চনের দুর্ব্বল মস্তিষ্ক এতটা উত্তেজনা সহ্য করিতে পারিল না; চীৎকার সহসা বন্ধ হইয়া সে জ্ঞান হারাইয়া সেইখানেই লুটাইয়া পড়িল।—

কিন্তু সুবলের পশুত্ব তখন ক্ষিপ্ততার চরম স্তরে উঠিয়া গেছে।

উভয়ে আর কথা হয় না।—

অভিশপ্ত রাজপুরীর মত অপরিসীম চঞ্চল অশান্তি নিস্পন্দ পাষাণ হইয়া গেছে।

(২)

বামন দাস অধিকারীর ডাক্-নাম জুজু। কথাটি আকারে ছোট, কিন্তু অর্থে গভীর বামনদাসের পরাক্রমে বাঘে গরুতে একই ঘাটে জল না খাইলেও অনাচার যে গ্রামের চতুঃসীমার মধ্যে ঘটিবার উপায় নাই ইহা ঠিক্।

বামনদাসই সুবলদের বাস্তুবাটির মাটির মালিক। গ্রামের অতি-আধুনিক এই নৈতিক অস্বাস্থ্যের কথা তিনি আগে কিছুই শোনেন নাই. পিসি সেদিন স্বচক্ষে সেই কাণ্ডটা দেখিয়াও প্রকাশ করে নাই। পিসি জানিত, ভগবান আছেন, পাপের ফল তিনি পাপীর অঙ্গেই একদিন না একদিন ফুটাইয়া তুলিবেন।

পিসির আশা ফলবতী হইয়াছে……

এবং পিসির চক্ষেই তাহা ধরা পড়িয়াছে।—

কানে কানে চলিতে চলিতে কথাটা একদিন বামন দাসেরও কানে ঢুকিয়া গেল; এবং মাটির মালিক মাটি ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া একেবারে প্রজ্জলিত হুতাশনের মত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন—

মাথায় জটা থাকিলে তাহা খাড়া হইয়া আকাশ স্পর্শ করিত নিশ্চয়।—

—পাকড় লে আও।—বলিয়া হুহুঙ্কারে হুকুম দিয়া তিনি গ্রেপ্তার করাইয়া আনিলেন আগে সেই "পাপিষ্ঠা"কে, তারপর সুবলকে

পিসিও সেখানে ছিল—

কাঞ্চনকে দেখিয়াই সে লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া আড়ালে যাইয়া ওৎ পাতিয়া বসিল।

বামনদাস বলিতে লাগিলেন, এবং সে শব্দ বোধ হয় সত্যস্বরূপ মহাপুরুষের পাদপীঠে মাথা ঠুকিতে লাগিল,—মেয়েমানুষে আস্কারা না দিলে বেটা ছেলের সাধ্য কি তার কাছে এগোয়। কথা কস্‌নে যে হারামজাদি?…

তারপর এম্‌নি ব্রহ্মতেজ শব্দ-ব্রহ্মের মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁর মুখ দিয়া বাহির হইতে লাগিল যে বাড়ীর লোকে শুনিয়া শিহরিয়া কানে আঙুল না দিক্, অবাক্ হইয়া গেল।

তারপর কাঞ্চনের চুল ধরিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া এমন খড়ম পেটা করিলেন যে, যে ভূত মারের চোটেও পালায় না, সে তখন ঐ মার দেখিলেই পালাইত।

বামনদাস শ্রান্ত হইয়া একটু বসিলেন; সুবলের ব্যবস্থা পরে হইবে।

কাঞ্চনের গা ফাটিয়া রক্ত গড়াইতে লাগিল—

তার ধূলি-লুণ্ঠিত রক্তাক্ত দেহ সম্মুখে করিয়া একদিকে বসিয়া রহিলেন কম্পিতকলেবর বামনদাস অন্যদিকে বসিয়া রহিল নির্ব্বাক সুবল।…রক্তধারার দিকে বিহ্বলের মত চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সুবল সহসা হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বামনদাসের পায়ের উপর আড় হইয়া পড়িল; বলিল,—যত দোষ আমার, আমাকেও মারুন।—

যত দোষ সুবলের, ইহা বামনদাস বিশ্বাসই করিলেন না; লাথি মারিয়া সুবলকে সরাইয়া দিয়া বলিলেন,—বড়ই মায়া দেখ্‌ছি যে!…আমার নাম বামনদাস অধিকারী, আমি সব বুঝি সব জানি। স্বর্ণ লঙ্কা ছারে খারে গেল উরি জন্যে, কুরুকুল ধ্বংস হল উরি জন্যেই; আমায় কিছু শেখাতে কেউ এস না। মাগীতে যাদু না করলে পুরুষ কি অম্‌নি ভেড়া হয়! হারামজাদা, তোরও কি বুদ্ধি শুদ্ধি নেই?—

বামনদাসের মারিবার ইচ্ছাটা কাঞ্চনের উপরেই ব্যয় হইয়া গিয়াছিল।—স্বর্ণ লঙ্কা ছারে খারে যাইবার এবং কুরুকুল ধ্বংস প্রাপ্ত হইবার কারণটা ব্যক্ত করিয়া, এবং বুদ্ধিহীনতার জন্য সুবলকে ধিক্কৃত করিয়া তিনি হাঁকিলেন,—কে আছিস্ রে?

খতের আসামী ভীম দাস সেখানে হাজির ছিল; তাহাকেই সম্মুখে পাইয়া হুকুম দিলেন,—ডেকে আন্ ষষ্ঠী, ফটিক, মাণিক, নিবারণ এদের সবাইকে; আর পথে যাকে পাবি, ধরে' আন্‌বি।

সুদের দায় বড় দায়—

বামনদাসের মুখের কথা ভাল করিয়া না ফুরাইতেই ভীম দাস তীর বেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

ষষ্ঠী, ফটিক, মাণিক, নিবারণকে এবং পথে যাহাকে পাইয়াছে তাহাকেই ধরিয়া আনিয়া, ভীম দাস বামনদাসের বাড়ী দেখিতে দেখিতে লোকে পূর্ণ করিয়া দিল।

বামনদাস বলিলেন,—আয় সঙ্গে।—বলিয়া তিনি নিজেই কুঠার হস্তে অগ্রসর হইয়া গেলেন; এবং তাঁহারই নেতৃত্বে ষষ্ঠী ফটিক মাণিক নিবারণ সবাই মিলিয়া কাঞ্চন আর সুবলের বাসের ঘর আর রান্নার চালা দুই মিনিটে ভূমিসাৎ করিয়া দিল। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পাপের এই শাস্তিভোগ প্রত্যক্ষ করিল।

ফিরিয়া আসিয়া ষষ্ঠী ফটিক মাণিক নিবারণ প্রমুখ জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—তোরা সবাই একটা করে লাথি মেরে যা এই শালীর পিঠে।—বলিয়া কাঞ্চনকে দেখাইয়া দিলেন।

কিন্তু তাঁহার এ আদেশ কেহ পালন করিল না; বোধ হয়, তার পিঠের উপরকার রক্তমাখা কাপড়ের দিকে চাহিয়াই সে দিকে কাহারো পা উঠিল না।

কেবল পিসি দূর হইতে বলিল,—ওমা আমার কি হবে!

বামনদাস তখন নিজেই কাঞ্চনের পিঠে আর এক লাথি এবং সুবলের ঘাড়ে আর এক ঘুসি মারিয়া বলিলেন,—গ্রামেব সীমানা পার করে দিয়ে তবে আমার কাজের শেষ। যাও, ওঠো—বলিয়া তিনি গ্রামের পশ্চিম সীমানার দিকে আঙ্গুল তুলিয়া রহিলেন।

খুশী তখন তার মায়ের কোলের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া বলিতেছে,—মা, ওঠো, চলো বাড়ী যাই।—
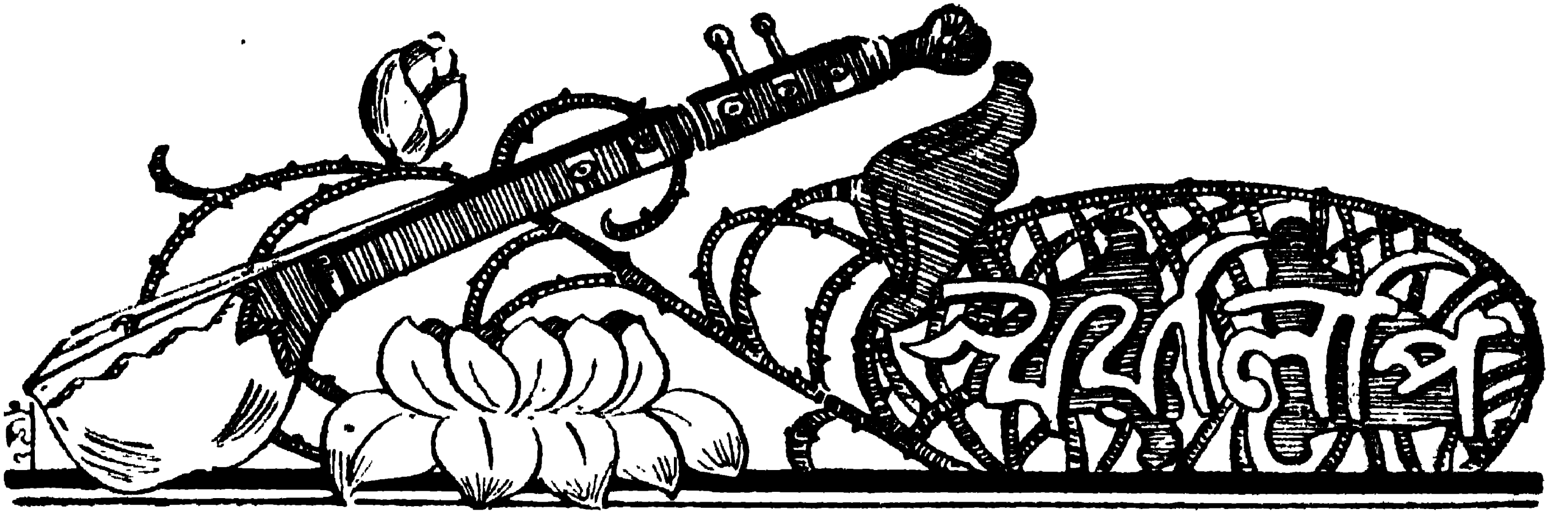
স্বরলিপি

কথা ও সুর—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আধেক ঘুমে নয়ন চুমে

স্বপন দিয়ে যায়

শ্রান্ত ভালে যূথীর মালে

পরশে মৃদুবায়।

বনের ছায়া মনের সাথী

বাসনা নাহি কিছু

পথের ধারে আসন পাতি

না চাহি ফিরে পিছু

বেণুর পাতা মিশায় গাথা

নীরব ভাবনায়।

মেঘের খেলা গগন-তটে

অলস লিপি লিখা

সুদূর কোন স্মরণ-পটে

জাগিল মরীচিকা,

চৈত্র দিনে তপ্তবেলা

তৃণ আঁচল পেতে

শূন্যতলে গন্ধভেলা

ভাসায় বাতাসেতে

কপোত ডাকে মধুক শাখে

বিজন বেদনায়।

স্বরলিপি—শ্রী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

I না র্সা র্গা | র্রা র্সা-া I" না র্সা র্রা র্র্সা-না-ধা I ধা না না |
আ ধে ক ঘু মে ০ ন য় ন চু মে ০ স্ব প ন
| না না-ধা I ধা-া-পা | -মা-া-া I মা-া মা | মপা মা-গা I
দি য়ে ০ যা ০ ০ য়্ ০ ০ শ্রা ন্ ত ভা লে ০
I মা ধাধা | না র্সা-া I না র্সা র্গা | র্রা র্সা-া I র্সনা-র্সা ধা |
যূ থীর মা লে ০ প র শে মৃ দু ০ বা ০ ০
| -না-র্সা-ধা II
০ ০ য়

II না র্সা র্সধা | না র্সা-া I নর্সা র্সধা ধা | না র্সা-া I
ব নে র ছা য়া ০ ম নে ব সা থী ০
I না না ধা | ধা ধা-না I না না-া | -া-া-া I র্সা র্গা-া | র্মা র্পা-র্মা I
বা স না না হি ০ কি ছু ০ ০ ০ ০ প থে র ধা রে ০
I র্গা র্মা-র্গা | র্গা র্রর্সা-না I র্সা র্সা র্গা | র্রা র্সা-র্রা I
আ স ন্ পা তি ০ না চা হি ফি রে ০
I না র্সা-া- | া-া া I না র্সা-র্গা | র্গর্রা র্সা-া I না র্সা-র্রা | র্সা না-ধা I
পি ছু ০ ০ ০ ০ বে ণু ব্ পা তা ০ মি শা য় গা থা ০
I ধা না না | না না-ধা I ধা-া-া- | পা-া-া I গমা-া মা |
নী র ব ভা ব ০ না ০ ০ য়্ ০ ০ শ্রা ন্ ত
| মপা মা-গা I মা ধা ধা | না র্সা-া I না র্সা র্গা | র্রা র্সা-র্রর্সা I
ভা লে ০ যূ থী র মা লে ০ প র শে মৃ দু ০ ০
I না-র্সা-ধা | -না-া-ধা II
বা ০ ০ ০ ০ য়্

II মা মা-া | মা মা-া I মা মা-া | মা মা-া I মা মা মা |
মে ঘে র্ খে লা ০ গ গ ন্ ত টে ০ অ ল স
I মা মগা-পা I পা মা-া | -া-া-া I মা মা মা | মপা-গা-া I
লি পি ০ লে খা ০ ০ ০ ০ সু দূ র কো ন্ ০
I মা ধা ধা | না র্সা-া I না না নধা | ধা-ধা-না I না না-া | -ধা-া-া I
স্ম র ণ প টে ০ জা গি ল ম রী ০ চি কা ০ ০ ০ ০
I ধা ধা পা | পা মা-গপা I পা মা-া- | -া-া-া- I
জা গি ল ম রী ০ ০ চি কা ০ ০ ০ ০

I ধনা-া ধা | না র্সা-া I ধনা-ধা ধা | না র্সা-া I
চৈ ০ ত্র দি নে ০ ত প্ ত বে লা ০

I র্সনা না-ধা | ধা ধা-না I না না-া | া-া-া I র্সা-র্গা র্গা |
তৃ ণ ০ আঁ চ ল্ পে তে ০ ০ ০ ০ শূ ০ ন্য

I র্মা র্পা-র্মা I র্গা-র্মা র্গা I র্গর্রা র্সা-া I না র্সা-র্গা | র্গর্রা র্সা র্রা I
ত লে ০ গ ন্ ন ভে লা ০ ভা সা ন্ বা ত্রা ০

I র্রনা র্সা-া | -া-া-া I না র্সা র্গা | র্গর্রা র্সা -া I না র্সা র্রা |
সে তে ০ ০ ০ ০ ক পো ত ডা কে ০ ম ধু র

| র্সনা-ধা I ধা ধা না | ধা ধা-পা I পা-া-া | -মা-া-া I
শা খে ০ বি জ ন বে দ ০ না ০ ০ য্ ০ ০

I মা-া-মা | মপা গা-া I মা ধ ধা | না র্সা-া I না র্সা র্গা |
শ্রা ন্ ত ভা লে ০ যূ থী র মা লে ০ প ব শে

| র্রা র্সা-া I না-র্সা-ধা | -না-া-ধা II
মৃ দু বা ০ ০ ০ ০ য়

রাজু-পণ্ডিত

—পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর—

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১০

নিমাইকে দুপুরের অবসরে মেনকা কিছু কিছু পড়াইত; কিন্তু তাহার অসুখের পর, দুরন্ত বালক এমন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল যে পাড়ার লোক পর্য্যন্ত তিক্ত-বিরক্ত হইয়া উঠিত।

বাড়ির সকলের একমত ছিল যে অবিলম্বে তাহাকে পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু প্রকাশ করিয়া কেহই সে কথা বলিত না; কারণ হরেকৃষ্ণ গোঁয়ার-গোবিন্দ, রাগের মাথায় কাহাকে কি বলিয়া বসে, কিছুই ঠিক নাই। লাভে, মার খাইতে খাইতে নিমাইএর পিঠ শক্ত হইয়া উঠিল। হরেকৃষ্ণ ছাড়া তাহাকে মারিয়া কাঁদাইয়া দিতে আর কেহই পারে না। স্ত্রীলোকের মার খাইয়া সে অবজ্ঞায় হাসিত।

একদিন মেনকা হরেকৃষ্ণকে ডাকিয়া বলিল, নিমাইটা

কি চিরদিন মুক্ষু হ'য়েই থাক্‌বে? রাজুদাদার সঙ্গে কি তোমার মিল হবে না? না হয়, বাবাকে বলি, তিনিই একদিন সঙ্গে ক'রে দিয়ে আসুন।

হরেকৃষ্ণ রাজুর সহিত একটা মিটমাট্ মনে মনে চাহিতেছিল; অতএব ইহা ত' একটা বেশ সুযোগ; তাই সে বলিল, নাঃ নাঃ; ওঁকে বল্‌তে হবে না; আমিই কাল দিয়ে আস্‌বো। তাহার পর, সে খানিক চিন্তা করিয়া বলিল, রাজু তো লোক মন্দ নয়; ভারি বদ্‌রাগী, এই যা দোষ।

মেনকা হাসিয়া বলিল, থাক্ আর চালুনির ছুঁচের দোষ ব্যাখ্যান করতে হবে না। কে যে কম তাই ভাবি; বাবাঃ এত রাগই বা কিসের! রাজুদাকে সবাই চেনে, হক-কথার মানুষ, তার সঙ্গে লাগ্‌তে যাবার দরকারই বা কি? দেখ্‌লে তো দশ জনে, এই নিয়ে তার মাইনে বেড়ে গেল। আগুন কি কাপড় চাপা থাকে?

হরেকৃষ্ণ মনে মনে রাগ করিল, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিল না; কারণ সে-রাত্রের ঘটনা তাহার মনে তখনো উজ্জ্বল ছিল।

শ.

ন

নিমাইকে লইয়া হরেকৃষ্ণ যখন পাঠশালায় গিয়া পৌঁছিল তখন ছেলেরা জলখাবার খাইবার ছুটি পাইয়াছে। এই সময়ের সদ্ব্যবহার ছেলেরা গাছে চড়িয়া পাখীর ডিম পাড়িয়া কিম্বা নানারূপ অদ্ভুত খেলা করিয়া করে, সেদিনও তাহারা তাহাতেই মনোযোগ দিয়াছিল। মা

ভক্তির লেখাপড়া অনেকটা অগ্রসর ছিল, হরেকৃষ্ণ টে একটা নাম দস্তখত করিয়া বলিল, বাড়িতে ব'লে দিয়েছে, মা দ্ র —ভারি শয়তান—হ'য়ে গেছে—একটু নজর রাখ্‌তে। গা-ন।

রাজু নিমাইকে কাছে টানিয়া আদর করিয়া বলিল, হাঁরে, নিমচাঁদ, তুই নাকি দুষ্টু হয়েছিস্?

নিমাই সমস্ত দেহ আড়ষ্ট করিয়া ভয়ে ভয়ে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আর দুষ্টুমি ক'র্‌বো না।

রাজু হাসিল, দুষ্টুমির সময় পাবি কোথায়? রোজ পড়া দিতে হবে, আঁক কষতে হবে, শ্লেটের দু-পিঠ হাতের লেখা—তার উপর কড়া-গণ্ডা নাম্‌তা······

হরেকৃষ্ণ বলিল, সে সব ও খুব পারবে, ওর বুদ্ধি ওর মার মত যেন ইস্পাতের ছুরি—বজ্জাতিটা না করলেই আমরা দায়ে নিষ্কৃতি······

রাজু নিমাইকে বলিল, আচ্ছা যাও, একটু বাইরে গিয়ে খেলে এসো ততক্ষণ।

সে সেইখানে বই শ্লেট রাখিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

রাজু হাসিয়া বলিল, ছেলেদের সাম্‌নে তাদের দোষ-গুণের আলোচনা না করাই ভাল; ওতে ছেলে এঁচোড়ে পাকে।

হরেকৃষ্ণ একটি ছোট্ট ধাক্কা খাইয়া মনে করিল রাজু তাহাকে আঘাত দিতেছে; সেই সঙ্গে মেনকার কথা মনে পড়িল, আসিবার সময় বার বার করিয়া মাথার দিব্য দিয়া দিয়াছিল—কিছুতেই যেন রাজুদার সঙ্গে ঝগড়া না করে।

ঝগড়া করিতে হরেকৃষ্ণের মন্দ লাগে না, তবুও সে আত্ম-সম্বরণ করিয়া—উঠিয়া দাঁড়াইল, আর কিছু নেইতো?—তবে চলি।

হরেকৃষ্ণ চলিয়া গেল।

হরেকৃষ্ণের অবরুদ্ধ ক্রোধ প্রলয় মূর্ত্তি ধারণ করিল। পাঠশালার ছাত্রবৃন্দ তাহাকে ঘেরিয়া পা ফেলিয়া ফেলিয়া উচ্চস্বরে গাহিতেছিল:—

ওরে হরি কিষ্টি,
খেজুর ছড়ি—গুড়ে মুড়ি
নয়কো ভারি মিষ্টি?

মেষ-শাবকের মধ্যে ব্যাঘ্রের মতই নির্দ্দয় হুঙ্কারে হরেকৃষ্ণ শিশুদলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুই হাতে অজস্র প্রহার বর্ষণ করিতে লাগিল। ছেলেরা যত না মার খাইল, তাহার দশগুণ বেশী চীৎকার করিল।

রাজু ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ কি অন্যায় কাণ্ড ছেলেদের!

নিমেষে টিফিন্ বন্ধের ঘণ্টা পড়িয়া গেল। ছেলের দল রাজুর অগ্নি-মূর্ত্তি দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

এত বড় অন্যায়ের বিচার আবশ্যক। ছেলেরা মাঠের মধ্যে চক্রাকারে দাঁড়াইয়া শাস্তির প্রতীক্ষায় রহিল। মধ্যস্থলে একখানি চৌকির উপর হরেকৃষ্ণ বসিয়া। রাজু ছেলেদের ডাক দিয়া বলিল, আজ তোমরা যে অন্যায় কাজ করেছ, তার জন্যে আমার মাথা হেঁট হ'য়ে গেছে; আমি হাতজোড় ক'রে, হরেকৃষ্ণ বাবুর পায়ে তোমাদের এই অপরাধের জন্য মার্জ্জনা চাইছি ·····

হরেকৃষ্ণ জিভ কাটিয়া বলিল, আঃ আঃ কর কি রাজু, তুমি যে বামুনের ছেলে, অকল্যাণ হয়······

রাজু সে কথায় কর্ণপাত করিল না; বলিল, শুধু আমার ক্ষমা চাওয়াতে কিছুই হয় নি। তোমাদের মধ্যে যে যে অপরাধ ক'রেচ—তারা একে একে এসে ওঁর পা ধ'রে মার্জ্জনা চেয়ে যাও।

একের পর এক করিয়া অপরাধীরা আসিয়া হরেকৃষ্ণের পায়ের কাছে মাথা ঠেকাইয়া বলিয়া গেল, আমার দোষ হয়েছে—ক্ষমা করুন।

শুধু একজন বাকি রহিল। সে দুর্গাদাস, বিদ্রূপ গানের কবি। দুর্গাদাস আসিল না, তাহার দুই প্রদীপ্ত চক্ষু হইতে বিদ্রোহের বহ্নি বর্ষণ করিয়া সে অটল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রাজু বজ্র-নির্ঘোষে ডাকিল, দুর্গাদাস······

দুর্গাদাস নির্ভয়ে উত্তর দিল, ও শুদ্দুর, আমি বামুন, আমি ওর পা ছোঁব না······

এই কথা কাণে আসিতে না আসিতে হরেকৃষ্ণ গম্ভীর গর্জ্জন করিতে করিতে গিয়া দুর্গাদাসের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে কিল চড় লাথি মারিয়া মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকের উপর চড়িয়া বসিয়া গলাটা এমন করিয়া চাপিয়া ধরিল যে দুর্গাদাসের মুখ হইতে জিভটা প্রায় এক হাত বাহির হইয়া পড়িল!

দুর্গাদাসের সংজ্ঞা লোপ হইয়াছিল। হরেকৃষ্ণ বুঝিল যে ব্যাপার খুনো-খুনিতে গিয়া দাঁড়াইয়াছে—তাই সে নিমেষে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া কাপুরুষের মত গা-ঢাকা দিল।

বিজয় ডাক্তার আসিবার পূর্ব্বে ধরাধরি করিয়া দুর্গাদাসকে তাহার বাড়ি লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে দুই বিধবার কান্নার রোলে দেশের লোক জড় হইয়া গেল।

বিজয়ের বহু চেষ্টায় দুর্গাদাসের জ্ঞান আর ফিরিল না; ডাক্তার বলিল, মাথার চোট এত সাংঘাতিক হয়েছে যে মারা পড়া একটুও আশ্চর্য্য নয়। সমস্ত রাত মাথায় বরফ দিতে হবে।

যাহাদের দিন আজ যায় ত' কাল কেমন করিয়া চলিবে তাহা কেহ জানে না—তাহারা কোথা হইতে রাশি রাশি বরফ আনিবে?

দূরে স্পষ্টবক্তা পদীর মা দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল, দিক্ না কেন বড়লোকের জামাই এক গাড়ি বরফ এনে, মেরে খুন্ কর্‌তে জানে, আর এটুকু আক্কেল নেই?

এই কথাগুলি মেনকার মর্ম্মে গিয়া তীরের মত বিঁধিল। সে একে দুর্ব্বল, তাহার উপর এত বড় মানসিক আঘাতে আর সেখানে থাকিতে পারিতেছিল না।

ধীরে ধীরে বিপদের বাড়ি হইতে বাহির হইয়া পথে চলিতে চলিতে বলিল, নিমাই তুই গিয়ে রাজুদাদাকে চুপি চুপি আমার নাম ক'রে ডেকে নিয়ে আয়, এক-ছুটে যা।

নিমাই ছুটিল।

মেনকা বাড়ি ফিরিয়া নিজের ঘরে আসিয়া শুইয়া

পড়িল। দুঃখে তাহার বুকের মধ্যে যেন কে আগুনের শলা বিঁধিয়া দিতেছে! একি মাতাল-মানুষ লইয়া তাহার ঘর করা! সে দুই হাত জোড় করিয়া বলিল, মা কালি, তুমি দুর্গাকে বাঁচিয়ে দাও—আমি জোড়া পাঁঠা মান্‌চি, মা!

সে আবার উঠিল, বাক্স খুলিল। তাহার পর বলিল, কত টাকা লাগ্‌বে, জানিনে, আসুক রাজুদাদা……

দূরে পথের উপর পায়ের শব্দ শুনিয়া ত্রস্তপদে জানালায় গিয়া দেখিল, হরেকৃষ্ণ ঝোপ হইতে বাহির হইয়া তাহাদের খিড়কির দিকে ছুটিয়া গেল। যেন ব্যাধ-ভয়ে ভীত বুনো-শূয়োরটি!

রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করে! উঃ কি মানুষই জুটিয়াছিল তাহার পোড়া কপালে!

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে হরেকৃষ্ণ ঘরে ঢুকিয়া বলিল, কেমন আছে ওদের ছেলেটা? বেঁচে আছে?

মেনকার দুই চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল—গলা হইতে স্বর বাহির হয় না—কে যেন বজ্র-মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া আছে!

বেঁচে আছে? বল না গো, বেঁচে আছে?

মেনকা রাগ করিয়া বলিল, জানিনে, গিয়ে নিজের চোখে দেখে এস না, নিজের কীর্ত্তি। লজ্জা করে না? মানুষ নয়ত'—জানোয়ার যেন……

উঠান হইতে রাজু ভারি গলায় ডাকিল, মেনকা।

হরেকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি চৌকির তলায় ঢুকিয়া গেল।

রাজুকে দেখিয়া মেনকার দুইচক্ষে অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, সে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন ক'রে এ কাণ্ড ঘট্‌লো রাজুদা?

রাজু রক্তবর্ণ দুই চক্ষু ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া ডান হাতে কপাল স্পর্শ করিয়া বলিল, আমার কপাল মেনকা, না বাঁচ্‌লে—আমার হাতে দড়ি পড়বে……

দুইচোখ বাহিয়া মেনকার অশ্রু বুকের উপর গড়াইয়া পড়িতে লাগিল; সে আর কথা কহিতে পারিল না।

দুইজনে স্তব্ধ নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে মেনকা বলিল, কিন্তু রাজুদা দুর্গাকে যে বাঁচাতেই হবে—তা যতটাকাই লাগে, আমি দেব, সায়েব ডাক্তার নিয়ে এসো; এখুনি বরোপ আনিয়ে দেও; নিয়ে যাও এই ব্যাগটা··

মেনকার হাত হইতে ব্যাগ আর এক মুঠা টাকা লইয়া রাজু দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

মেনকা ঘরে ফিরিয়া হরেকৃষ্ণকে না দেখিয়া বিস্মিত হইল। কৈ বাহিরও ত হইয়া যায় নাই! আর সে পারে না—কিছু ভাবিতে চিন্তাইতে। মেজের উপর তাই সে বসিয়া পড়িল।

চৌকির তলায় নড়ে কি? মেনকা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, কোণে মুখ লুকাইয়া হরেকৃষ্ণ কাঁদিতেছে। কান্নার আবেগে তাহার পিছনের দিকটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে।

করুণায় মেনকার মন ভরিয়া উঠিল। উদ্দাম মানুষ, পারে না তাহার ক্রোধ সম্বরণ করিতে, পারে না তাহার লোভ সম্বরণ করিতে, পারে না তাহার পশু-প্রবৃত্তি গুলিকে সম্বরণ করিতে! মেনকার মুখ হইতে আপনি বাহির হইয়া আসিল, আহা!

হরেকৃষ্ণ বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, কত টাকা দিলে?

জানিনে, বলিয়া মেনকা অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

হরেকৃষ্ণ ভয়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

ভয়ে ভয়ে সে একবার মেনকার হাতে হাত দিয়া বলিল, যদি না বাঁচে তো, অনেক টাকার দরকার হবে।

কেন?

পুলিশের হাত থেকে বাঁচ্‌তে।

মেনকা কঠিন কণ্ঠে বলিল, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, এবারে আমরা এক পয়সাও খরচ করবো না। তোমার ত ফাঁসি হওয়া উচিত।

নিমেষে হরেকৃষ্ণের মুখ কালো হইয়া গেল।

তুমি এই কথা বল্লে?

মেনকা ঝাঁঝাইয়া উত্তর দিল, বোল্‌বো না? একশ' বার বল্‌বো! মানুষের সোয়ামী আগে, না ধর্ম্ম আগে? মেয়েমানুষের কি পরকাল নেই, পরমেশ্বর নেই? শুধু স্বামী, শুধু তুমি?

হরেকৃষ্ণ মাথা নীচু করিয়া রহিল—মেনকার জ্বলন্ত দুই চক্ষুর উত্তাপ তাহার সর্ব্বাঙ্গ যে ঝল্‌সাইয়া দিয়া গেল!

নিমাই আসিয়া কাঁদিয়া কহিল, মাগো বড্ড ক্ষিদে—

মেনকা তাহার হাত ধরিয়া রান্না ঘরে চলিয়া গেল।

শেষরাত্রে দুর্গাদের বাড়িতে কান্নার রোল উঠিল।

মেনকা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল, যাঃ সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল।

হরেকৃষ্ণ উঠিয়া পড়িয়া বলিল, কি হয়েছে, কি হয়েছে?

শুনতে পাচ্চোনা? দুর্গা মারা গেছে।

এই কথা শুনিয়া হরেকৃষ্ণ ঘরের ভিতর হইতে তীরের মত বাহির হইয়া গেল।

১১

মেনকা গিয়া দেখিল রাজুকে অবলম্বন করিয়া দুই বিধবা আকুলি-বিকুলি কাঁদিতেছে। রাজু তাহাদের শান্ত করিবার ব্যর্থ-প্রয়াস করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সাম্‌নে দুর্গার শব, কাপড় ঢাকা; চতুর্দ্দিকে বরফ-ঢাকা কাঠের গুঁড়িতে—ভীষণ অপরিচ্ছন্ন

তখনো সূর্য্যোদয় হয় নাই। রাজু বলিল, তোমরা আমাকে ছাড়, লোক ডেকে আনি, বাসি ক'রে লাভ কি?

সে মেনকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তুই ততক্ষণ একটু থাক্‌, আমি এক্ষুনি ফিরে আসবো।

মেনকা দাওয়ায় উঠিবার সিঁড়ির এক পাশে অতি সন্তর্পণে বসিল ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়ে।

রাজু যাইতে যাইতে বলিয়া গেল, যদি কেউ আসে ত' চলে যেতে দিসনে।

অসম্ভব কঠিন রাজুর হৃদয়! মৃত্যুর করাল স্বরূপের কাছে অটল! এই কথা ভাবিয়া মেনকা বিস্মিত হইয়া গেল। এত বড় গ্রামে আর একটা লোক নাই যে, রাত্রে আসিয়া রাজুকে সাহায্য করে। উঃ কি সংগ্রামই না সে সমস্ত রাত্রি করিয়াছে!

দুই বিধবা কান্না থামাইয়াছিল। তাহার কারণ, তাহাদের কান্না হরেকৃষ্ণকে অভিশাপ দিয়াই চলিতেছিল। কিন্তু মেনকার সাম্‌নে তাহা করিতে তাহাদের বাধিল। তাহারা জানিত, মেনকার টাকায় সহর হইতে সাহেব ডাক্তার আসিয়াছিল, তাহারই টাকার বরফ এখনো শেষ না হইয়া পর্ব্বত-প্রমাণ পড়িয়া আছে।

কিন্তু মেনকাই প্রথমে কথা কহিল, রাতে আস্‌বো মনে করেছিলাম বামুন খুড়ি, কিন্তু কালামুখ দেখাতে লজ্জা করে......

দুর্গার ঠাকুর-মা কথা কহিলেন, তোর কি দোষ মেন্‌কি—তোর যা সাধ্যে ছিল করেছিস্‌। আমাদের কি ক্ষ্যামোতা, তোর টাকাই রাজু মুঠো মুঠো খরচ করেছে—কি হয়নি বল্‌? সবই আমাদের কপাল!

দুর্গার মা আর ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলেন না; ওরে আমার বিধবার খুদ-কুঁড়োরে, কোথায় গেলিরে; ওরে আমার কে আছেরে—ওরে আমার বাছারে......

মেনকার মাতৃ-হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া তপ্ত দুই ফোঁটা অশ্রু ভূমি স্পর্শ করিল।

বৃদ্ধা বলিলেন, চুপ কর্‌ বৌ, চুপ কর্‌, যা হলো তাতো হ'লো; আর কেঁদে বিপদ বাড়াস্‌নে......ধন্যি ছেলে রাজু, ওতো বলেছে—আজ থেকে আমাদের ছেলে হ'লো...... তুই কাঁদিস্‌ নে বৌ......

মেনকা বুঝিল রাজু এক রাত্রির মধ্যে এই দুই অসহায়

বিধবার নিকটতম আত্মীয় হইয়া পড়িয়াছে। সে বৃদ্ধার প্রতি চাহিয়া বলিল, বড়-মা, আমাকেও তোমাদের পায়ের সেবাদাসী ক'রে নাও। আমি আর কি ব'লবো —আমার বুক যে ফেটে যায়!

দুর্গার মা অবাক্ হইয়া মেনকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, মেনকা সত্যই কি শূদ্দুরের ঘরের মেয়ে?

শ্মশানে গিয়া রাজু নূতনতর বিপদে পড়িল।

দুইজন লালপাগড়ী শবদাহে বাধা দিয়া বলিল, থানার দারোগা-সাহেবের হুকুম। লাশ্ হাঁসপাতালে নিয়ে গিয়ে তদবিরের পর, যা হয় করবেন বাবু।

রাজু বলিল, তা হ'তেই পারে না, বামুনের ছেলের শব ডোমে ছোঁবে?

আর যাহারা ছিল বলিল, রাজু গোঁয়ার্ত্তুমি করিসনে, আমাদের সবাইকে কি খুনের দায়ে ফেলবি?

তবে উপায়?

যাও দারোগার কাছে, সেই বাৎলে দেবে পথ।

একজন চাপা গলায় বলিল, কিঞ্চিৎ উপুড়-হস্ত করলেই পথ খোলসা হ'য়ে যাবে হে পণ্ডিত। এ দুনিয়াটা টাকারই খেলা!

দারোগা-সায়েবের গদাই-লস্করি চাল। মুখ ধুইতেছেন তো ধুইতেছেন। হাই তুলিলে, পাশের তিন জনে তুড়ি দিতে থাকে।

বহুক্ষণ পরে রাজুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, কি চাও?

রাজু সকল কথা বলিল।

উত্তরে দারোগা-সায়েব বলিলেন, শুনেছি ওটা খুনের লাশ, সিভিল সার্জ্জেনের সার্টিফিকিট নইলে দাহ হ'তে পারে না।

দারোগা-সায়েব হিমালয়ের মত অটল কোন আবেদন-নিবেদনে ফল হইল না।

সায়েব-ডাক্তার লোক ভাল। সকল কথা শুনিয়া কাগজে লিখিয়া দিলেন যে, মাথায় এবং ঘাড়ে অতিরিক্ত চোট লাগার জন্য—দুর্ব্বল অবস্থার বালকের মৃত্যু হওয়া সম্ভব।

রাজু সেই পত্র লইয়া অশ্বগতিতে সহর হইতে থানার দিকে ছুটিতেছিল, হঠাৎ পিছন হইতে কে ডাকে?

ফিরিয়া দেখে হরেকৃষ্ণ খেজুর-ঝাড়ের পিছনে বসিয়া বিড়ি টানিতেছে।

ব্যাপার কি?

রাজু উত্তর করিল, গুরুতর বলেই ত' মনে হয়; পুলিশে দাহ আটক ক'রেছে। ভাগ্যে সায়েব-ডাক্তার ডাকা হয়েছিল। এখন বোধহয় দারোগা বাগ্ মানবে।

হরেকৃষ্ণর মুখ এতটুকু হইয়া গেল; সে বলিল, আমি কি করি?

এখেনে কি করছো?

পালিয়ে আছি। সন্ধ্যে আগে বাড়ি ফিরব না।

রাজু বলিল, কদিন পালিয়ে থাক্‌বে? গিয়ে সোজা আত্ম-সমর্পণ কর।

হরেকৃষ্ণ রাজুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, ভারি আমার হিতেকাঙ্ক্ষী—

রাজু বলিল, বেশ যা' ইচ্ছে তাই কর, কাজ কি আমার পরামর্শে?

বলিয়া সে দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছিল, পিছন হইতে হরেকৃষ্ণ বলিল, তা ব'লে থানায় গিয়ে ব'লে দিওনা।

রাজু কথার উত্তর দিল না।

হরেকৃষ্ণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিক দেখিয়া বলিল, কাজ নেই—এখেনে থেকে; সরাসরি বাড়ি চ'লে যাই; সেখেনে পুলিশের খুঁজে বার ক'রতে অনেক বেগ পেতে

হবে। অমনি ধরা দিচ্ছি কি না? খোকা বোঝাতে এসেছে, জানি ও বেটা এরি মধ্যে পুলিশের সঙ্গে ভিড়ে গেছে……

হরেকৃষ্ণ আবার উধাও হইল।

সন্ধ্যার পর ঘরে ফিরিয়া রাজু বুঝিতে পারিল যে নিদ্রা এবং ক্ষুধার চক্রান্তে তাহার শরীর অচল; কিন্তু আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া লইবার শক্তি একটুও নাই।

পদীর মা উনানে আগুন দিয়া রান্নার ব্যবস্থা করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল; কিন্তু রাজু বলিল, তুই যা, আমার একটুও খেতে ইচ্ছে নেই। খানিক না ঘুমিয়ে নিলে আমার শরীর ঠিক হবে না।

পদীর মা সহজ কথা আরো সোজা করিয়া বুঝিয়া বাড়ি চলিয়া গেল। পথে মেনকা তাহাকে ধরিল, রাজুদা কি খেলে?

পদীর মা বলিল, ঘুমে ঢুলে পড়চে, বলে না ঘুমুলে শরীল বেকৃতার;—খাবার মোটে ইচ্ছে নেই, কি ক'রবো বল, চ'লে এনু!

মেনকা বলিল, এর বেশী আর কি করতে পারিস, তোর হাতে তো খাবে না!

পদীর মা চলিয়া গেল।

মেনকা বাড়ি ফিরিয়া তাড়াতাড়ি রান্না ঘরের দিকে ছুটিল।

মা গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছেন। জামাই সেই সকালে বাহির হইয়াছে এখনো ফেরে নাই। ভাত তরকারি থরে থরে সাজান রহিয়াছে।

মেনকা বলিল, মা তুমি ভাবচো কেন? সে তো যাবার সময় ব'লেই গেছে যে তেমন্ তেমন্ বুঝিতো বাড়ি চ'লে যাবো। তা ছাড়া, আমি তো আছি।

তিনি বলিলেন, তোর শরীর ভাল থাকৃলে কথা কি ছিল, তুই কত করবি।

তুমি ত সমস্ত দিন হাঁড়ি টানচো মা, একটু জিরোও না; দুখানা লুচি ভেজে দিতে আমার শরীর গলে যাবে না।

অধর রাত্রে লুচি খাইতেন।

অল্প সময়ের মধ্যে সব প্রস্তুত করিয়া মেনকা বলিল, মা তুমি একটু শোও তো, বাবা এলে আমি খাইয়ে দেবো।

এ কাজ মেনকা প্রায়ই করিত।

অধর খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, হরেকৃষ্ণ ফেরে নি?

বোধ হয় বাড়ি গেছে, দু-চার দিন পরে, সব থেমে-থুমে গেলে, ফিরবে।

অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া অধর বলিলেন, কিন্তু যা শুনচি তাতে মনে হয় ব্যাপার অনেক দূর গড়াবে।

মেনকা কথা কহিল না; কিন্তু তাহার মনের মধ্যে কে যেন বলিয়া উঠিল, তাইতো হওয়া উচিত।

একান্ত ক্ষোভের সহিত অধর আবার বলিলেন, কিন্তু কিছুতেই জ্ঞান হয় না; এই সেদিন ইস্কুল বাড়ি পুড়িয়ে কি নাকালটাই না করলে—হাজার টাকায় থই পাইনে। ……রামকানাই লোক ভাল ছিল, আমার ছেলেবেলার বন্ধু;—তার ছেলে, মনে করেছিলুম ভালই হবে—ঘরে রাখলুম, লেখাপড়া কিছু শিখে আমার কারবারগুলো বুঝে নেবে……হায় রে কপাল! এতবড় অপদার্থ জন্মে দেখিনি; রাগ বলে রাগ, যেন অসুর একটা!

মেনকা বলিল, এবার আর তুমি কিছু করোনা বাবা! দেখই না কি হয়।

অধর মেনকার দিকে দুটি সজল চোখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন, পাগলী তাই কি হয়? জামাইএর হাতে দড়ি পড়বে, আর আমি থাকৃবো চুপটি করে বসে!

মেনকা কথার উত্তর না দিয়া দুধের বাটি আগাইয়া দিল।

তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, তবে শুন্‌চি রাজু নাকি বুদ্ধির কাজ করেছে, সায়েব-ডাক্তার এসেছিল—তারই চিঠিতে লাশ পুড়োতে দিয়েছে।······মনে করছি কাল্‌কের সব খরচ আমিই দেবো, তা না হ'লে ধর্ম্মে সইবে না।······আমাকে যদি সময়ে একটা খবরও দেয়, পুলিশকে ঠাণ্ডা করতে কত দেরি হয়?—তা নয়, একটা বাঁদর! পালিয়ে গিয়ে লাভ কি? ওতে তো অপরাধ স্বীকার করা হয়।......দেখি, কাল একটা লোক পাঠিয়ে ডাকিয়ে নি।

মেনকাও মনে মনে জানিত পালানো একেবারে উচিত হয় নাই; কিন্তু কাপুরুষের ইহা ছাড়া আর গতি কি?

নিত্যকার অভ্যাসবশত মেনকা হরেকৃষ্ণের খাবার সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, দেখছো ভুল একবার? মানুষ কোথায়, তার ঠিক নেই, খাবার সাজিয়ে রাখলুম! থাকগে; অনেক সময় দেবতারা ভুলের ভেতর দিয়ে মানুষকে ঠিক্ কাজ করিয়ে নেন...... জানিনে তাঁদের মনে কি আছে!

বিছানার কাছে গিয়া বলিল, আচ্ছা বিছানাও করে রাখি; বলে, বিছানা করে রাখলে মানুষ আসে না।······আসবে না ত জানাই আছে, তবুও......এলে কিন্তু খুশী হবে, মনে করবে মেন্‌কি আমায় ভালবাসে! ভালো কি একদিন বাসিনি! কিন্তু মানুষ নিজের দোষেই যে মন থেকে সরে যায়!......

মেনকা বিছানায় শুইয়া পড়িয়া বলিল, এখন নটা বেজেছে, ঠিক বারোটা বাজলে উঠবো—ততক্ষণে রাজুদার ঘুমটা পাকা হয়ে যাবে! বাবা! একটা লোক না খেয়ে কি ক'রে চব্বিশ ঘণ্টা কাটাচ্ছে! মুখ চাইবার লোক ছিল একা মা—তা আমাদের হুঁসো, পুড়িয়ে মারলে গো! কি-লোক, দয়া নেই, মায়া নেই! যাবে না মন থেকে সরে? মন ত আর কারুর বাঁদী দাসী নয়? তাই রক্ষে, কেউ জানতে পারে না, মানুষের মনের মধ্যে কি হচ্ছে!

মেনকা হাই তুলিতে তুলিতে ঘুমাইয়া পড়িল

গভীর রাত্রে মেনকার ঘুম ভাঙ্গিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আঁচলে দেশলাই বাতি বাঁধিয়া রাজুর খাবার হাতে লইতে লইতে দেখিল, হরেকৃষ্ণের খাবারের ঢাকা খোলা! বিছানার দিকে চাহিয়া দেখে হরেকৃষ্ণ নিদ্রায় অচৈতন্য!

লণ্ঠনের বাতি তুলিয়া ভাল করিয়া দেখিয়াও বিশ্বাস হয় না। মেজের উপর বসিয়া পড়িয়া মেনকা ভাবিতে লাগিল, যদি উঠে দেখে আমি নেই ত' গোল হ'তে পারে। কি করি এখন?

মেনকা হরেকৃষ্ণের গায়ে হাত দিয়া ডাকিল, শুন্‌চো, শুন্‌চো।

হরেকৃষ্ণ পাশ ফিরিয়া বলিল, কি?

একটু সজাগ থেকো, আমার কেমন পেটটা মোচড়াচ্ছে, বাইরে যাচ্ছি।

যাও। বলিয়া হরেকৃষ্ণ গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইল। বাহিরে যাইতে যাইতে মেনকা শুনিল—তাহার নাক ডাকিতেছে।

রাজুও গভীর ঘুমে মগ্ন ছিল।

মেনকা আসন পাতিল, খাবারের থাল রাখিল। এক গ্লাস জল লইয়া ধীরে ধীরে রাজুর মাথার কাছে আসিয়া ডাকিল, রাজুদা, রাজুদা!

কোন উত্তর নাই।

মেনকা আস্তে আস্তে রাজুর দুই চোখ জল দিয়া মুছিয়া দিতে দিতে বলিল, লক্ষ্মীটি, ওঠো একবার, খাবার নিয়ে এসেছি যে!

রাজু উঠিল।

খাইতে খাইতে রাজু জিজ্ঞাসা করিল, কত রাত রে?

বেশি রাত হয় নি তো, তুমি ভাল করে খাওনা রাজুদা।

রাজু বলিল, সে আর বল্‌তে হবে নারে, ক্ষিদেতে পিঠে-পেটে এঁটে ধরছিল।

মেনকা বুকের মধ্যে ব্যথা অনুভব করিল।

খাওয়ার পর মেনকা বলিল, এই নাও।

কিরে?

পান, রাজুদা।

পানও এনেছিস্? কি লক্ষ্মী মেয়ে তুই, মাইরি!

মেনকা বলিল, তবে এখন চলি রাজুদা, দেরি করার উপায় নেই—কর্ত্তা ফিরেছেন।

ফিরেছে? সাবাস্!

মেনকা হরিণের মত ক্ষিপ্র পায়ে বাড়ি ফিরিল।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত রাজু জাগিয়া শুইয়া রহিল। দুর্গাদাসের বাড়ির কথা ভাবিল, কাল সকালে গিয়ে খবর নিতে হবে। তাহার পর ভাবিল, হরেকৃষ্ণের কথা; তাহাকে না বাঁচাইতে পারিলে, মেনকার মনের আঘাতটা বড়ই কঠিন হইবে।

সকল কথার মধ্যে উঁচু হইয়া উঠে ঐ মেনকার কথা! রাজু অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, মেনকা আমার কে, যে ওর কথাই কেবল মনে আসে?

পাশ ফিরিয়া শুইয়া, দুই চোখ বন্ধ করিয়া বলিল, কেউ নয়—তাতো জানি; তবুও ওর যে গুণের ঘাট নেই......

রাজু ঘুমাইয়া পড়িল।

—ক্রমশ

মাটি

শ্রী হেমচন্দ্র বাগচী

আমার মাটিরে আমি চিনি নাই; তাই
অন্তর ভরিয়া মোর জাগিছে সদাই
অভাবের শীর্ণ মূর্ত্তি।
চির ক্ষুধানল,
ঘূর্ণী বায়ু, মরীচিকা, পিপাসা সম্বল।
মাটির সে ভাষা কাণে পশে নাই; তাই
উৎসহারা স্রোত-সম কেবলি শুকাই
দিবসের খরতাপে।

বর্ষা নাহি আসে ;—
শ্যামরেখা নাহি টানে গম্ভীর সম্ভাষে।
আজি দূর পরবাসে পড়িতেছে মনে ;—
প্রদীপ জ্বলিছে কোন্ গৃহের প্রাঙ্গণে,
তুলসীর মঞ্চতলে !
গাভী এল গেহে :
সুপ্তিমৌন শান্ত গ্রাম স্তব্ধ চির স্নেহে।
শুধু মোর মূক মাটি রয়েছে জাগিয়া—
যা'রা দূরে গেছে চ'লে তা'দেরি লাগিয়া

পত্র

আমাদের সাহিত্য

কল্যাণীয়াসু,

গতবার "অভিজাত-সাহিত্য" নিয়ে কিছু বল্‌তে গিয়ে রুচির দলের উপর কতকটা কঠিন কটাক্ষই হয়তো করে ফেলেছি ?

যারা পরের মুখের ঝাল খেয়ে, কেবল 'ফেসান' নিয়ে থাকে তারা সত্যক'রেই 'নাবালক'। বোধ-বিবেচনা একটু কমই, অতএব তাদের. তিরস্কার করার সময় খুব কড়া, কি রূঢ় হওয়া উচিত হয় না।

তা ছাড়া ওদের দিকেরও ত' কিছু বল্‌বার আছে! কোন আলোচনাই সুষ্ঠু এবং সম্পূর্ণ হয় না, যতক্ষণ না দু'পক্ষের বক্তব্যগুলো ধৈর্য্যের সঙ্গে বিবেচনা করা যায়।

মুস্কিল এই যে, ওরা নিজেদের কথাও ঠিক ক'রে বলে উঠতে পারে না। প্রসঙ্গের দু' একটা মুখস্থ, লম্বা লম্বা বুলি ঝেড়ে এমন উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠে যে, ওদের মুখ থেকে গাল-মন্দ এবং অভিসম্পাত ছাড়া, আর কোন কাজের কথা বার হয় না, এবং সবচেয়ে মজার হয়, যখন তারা যাত্রার ভীমের মত কম্পান্বিত কলেবরে রণে ভঙ্গ দেয়। সেদিন "ভারতবর্ষে" এই ধরণের একটা কসরৎ দেখা গিয়েছিল।

ওরা কি ব'ল্‌তে চায় সেটা কিন্তু আমাদের প্রণিধানের বিষয়।

গত বারে বলেছি যে ওদের দুহাতের শতমুখীর বেধড়ক আস্ফালনে সাহিত্যের বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রও দাঁড়াতে পারেন না। তবে ওরা মুখ-ফুটে এইসব বড়-সাহিত্যিকদের কোন কথা বল্‌তে সাহস করে না। জানি ; গলাবাজির পর চুপি-চুপি চিঠি লিখে বলে, "কেমন লাগ্‌লো আপনার, জানতে বড় ইচ্ছা হয়।"

এই চিঠি দেওয়ার অর্থ কি? যা বলেছি, আপনাদের নয়, আপনারা ত' আমাদের নমস্য; দেখ্‌বেন, রাগ করবেন না। এই নয় কি?

সত্য কথা যদি বলেই থাক ত', কাউকে কেয়ার করার দরকার কি?

ওদের রাগ-ঝালের চোট, ওই ছোট লেখক আর ছোট কাগজগুলোর ওপরেই। তাই ওদের ব'লতে ইচ্ছা হয়—

আধুনিক-সাহিত্যে যদি প্রচলিত রুচি-বহির্গত কেউ কিছু লিখে থাকে ত' স্পষ্ট ক'রে বল। অত রেখে-ঢেকে বল্‌তে গিয়ে তোমাদের আসল কথাগুলো পেটের মধ্যে প'চে তোমাদেরই মাথার বিকার আনে, আর তার ফল হয় যে তোমাদের অসম্বন্ধ প্রলাপে সত্যিকার কাজ কিছুই হয় না। খামোকা খানিকটা জল ঘুলিয়ে তুলে লাভ হয় কি?

সাহিত্যের বিষয়বস্তু নিয়ে এই দুই দলের যে বিশেষ মতভেদ আছে, তা মনে হয় না। রুচির দলের লেখক সম্প্রদায়ও ত' কথা-সাহিত্য নিয়েই নাড়া চাড়া করেন। ওঁদের লেখা যে ভুবনের মাসীর কাণ কামড়েই শেষ হ'য়ে যায়, তাও নয়। সে সব লেখার মধ্যে যুবক-যুবতীও আছে, আর তাদের প্রেমের লীলাকলাও দেখতে পাই।

তবে নিষ্কর্মা সমালোচকরা লেখকদের সব সময়ে হুঁসিয়ার ক'রে দিতে থাকে,—দেখো, অঘটন কিছু ঘটিও না। তুমি মুখুর্য্যের পো, ঐ যে বাঁড়ুয্যের ঝি, ওর সঙ্গে প্রেম করতে পার;—যে হেতু সে স্থলে বিবাহটা সম্ভবপর। তা' সমাজও সমর্থন করে, আর ভোজ-ভাতের মিষ্টান্নটা থেকে আমরাও বঞ্চিত হইনে। আর এবটা মস্ত লাভ সমাজ কু-দৃষ্টান্ত থেকে রক্ষা পেয়ে যায়।

ওরা চিত্রকরকে ডেকে বলে,—দেখো বাপু তোমাদের মনের ক্ষুধা কি তা' যে আমরা একেবারে জানিনে তাও নয় (কেননা, বুদ্ধি দিয়ে মানুষের সব বজ্জাতি আমরা বুঝতে পারি); তাই তোমাদের যে একেবারে নিবারণ করতে পারবো, এমন মনে হয় না। তবে কি না যদি ঐ সবই আঁকো ত' একটা পাৎলা কাপড়ের আবরু ঢেকে দিও; আর গায়ে দু' চারখানা গয়নাও এঁকে দিও, মানুষের দুষ্ট চোখ, হয়তো তাতেই আট্‌কা প'ড়ে যাবে;—অতটা গভীরের দিকে যাবে না। দেখো নগ্ন-সৌন্দর্য্যের মধ্যে আর্টের স্ফূর্ত্তি থাকতে পারে; কিন্তু বাপ্ সকল, সমাজকেও ত টিকিয়ে রাখ্‌তে হবে! শুধু আর্ট করলেই ত' দিন যাবে না!

মোট কথা, মানুষের চেয়ে মানুষের গড়া সমাজের জন্যই ওদের দরদ আর মাথাব্যথা ঢের বেশি। ওরা বোধ হয় মনে করে মানুষ আর কিছুই নয় খানিকটা ছানা-চিনির পাক, তাকে ছাঁচের মধ্যে ফেলে সন্দেশ গ'ড়ে তুল্‌তে পারলেই, যা-কিছু করার চূড়ান্তভাবেই করা হ'য়ে গেল।

ওদের সঙ্গে অন্যদলের এইখানেই গরমিল। ওদের মনে হয়, মানুষের যা-কিছু সবই জানা শেষ হ'য়ে গেছে; বিশ্ব-সংসারের যা-কিছু জান্‌বার ছিল আমাদের পূর্ব্বপুরুষ মুনি-ঋষিরা যোগবলে সবই জেনে সত্যের ভাণ্ডার আমাদের জন্য পূর্ণ ক'রে রেখে গেছেন। এখন আমাদের সোজা কাজ সামনে প'ড়ে রয়েছে—তাঁদের নির্দ্দিষ্ট পথে, তাঁদের দেওয়া নিয়ম মেনে জীবনটাকে গরুর গাড়ির চাকার মত চালিয়ে নিয়ে চল, দু'চোখ যেখেনে যায়। নূতনের মোহে ভুলোনা মন, ভুলো না!

কিন্তু এতে সকলের তৃপ্তি হয় না। এমন মানুষ আছে যে মনে ক'রে—এখনো আমাদের কিছুই জানা হয়নি; সত্যের পথে সমাজ কিছুই অগ্রসর হয়নি; সত্যকার সভ্যতার ফটকেও এসে মানুষ পৌঁছয় নি!

পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে চেয়ে সত্যই কি মন গ্লানিতে পূর্ণ হ'য়ে ওঠে না? একটা জাত অপর জাতের

ওপর জবরদস্তি চালিয়ে নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি ক'রে নিতে চায় না কি? ধনিক আর শ্রমিকের সমস্যা একদিকে—আর এপারে বামুন আর তার দাস শূদ্র।

ব্যক্তির স্বাধীনতা সমাজ অস্বীকার ক'রেইতো ব'সে আছে!

মানুষের স্বাধীনতা মানুষের অজ্ঞতার ফলেই বোধ করি এতখানি ব্যাহত যে, এখনো বর্ব্বরতার যুগই চলছে ব'লে মনে হয়!

লাভ কি মনে ক'রে নিয়ে যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা জ্ঞানের চরম সীমায় পৌঁছেছিলেন,—আমাদের সভ্যতা খুব উচ্চ স্তরেই উঠেছিল?

যদি ধরে নেই যে তাই হয়েছিল, ত' তাতে আমাদের অহঙ্কারের দিক দিয়ে কিছু তৃপ্তি থাকতে পারে; কিন্তু অপর সব দিকে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশী। তাঁরা যা সব রেখে গেছেন—তা' ত অমনি পাওয়া যায় না! সে অধিকারের যোগ্যতা আমাদের নেই; অধিকার লাভ করার সাধনা আমাদের নেই! তা যদি থাকতো তো আমাদের এ দুর্দ্দশা কেন? সামাজিক স্বাধীনতা নেই, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নেই, আমরা তিলে তিলে, পলে পলে ধ্বংসের মুখের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছি!

এই অবস্থায় পূর্ব্বপুরুষের গৌরবের ইতিহাস কামড়ে প'ড়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাকা চলে কি? এই নিদারুণ বিনষ্টির হাত থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা কি স্বাভাবিক নয়?

সাহিত্যে জাতীয় জীবনের ছায়াপাত হয়েছে। সেখানে একদলের নিশ্চেষ্টতার ছবি, আর অপর দলের তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং সেই বিদ্রোহের ফলে তারা মরিয়া হয়ে কতকটা উদ্দামতার সঙ্গেই চলছে—এ ছবিও ফুটে র'য়েছে!

সমস্ত দেশের নিরুদ্বেগ নিশ্চেষ্টতা, মৃতের জড়তার কথা ভেবে দেখ্‌লে, এই মুষ্টিমেয় তরুণের আবেগাতিশয্যকে ক্ষমা না ক'রেও থাকা যায় না।

সাহিত্য ত আয়না—তার মধ্যে ছবি পড়েছে, তা দেখে আঁৎকে উঠ্‌লে চল্‌বে কেন? যা বাস্তব তারই প্রতিলিপি ঐ। যদি বদলাতে চাও ত' জীবনকে বদলাও। তবেই রক্ষা। তবেই নিষ্কৃতির পথ উন্মুক্ত হবে।

প্রায় চল্লিশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ মনের যে দুরন্ত আশা দেশকে জানিয়েছিলেন, আজ তরুণের মধ্যে দিয়ে সেই আশা পূর্ণ হ'তে চলেছে!

কবিকে সিংহাসনে বসিয়ে যদি তাঁর প্রাণের কথাকে আজ অপমান করি ত নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করছি বলেই বুঝব।

কবি সেদিন কি বলেছিলেন সেটা এখেনে একটু ঝালিয়ে নেওয়াই যাক্ না;—

নিমেষ তরে ইচ্ছা করে
বিকট উল্লাসে
সকল টুটে যাইতে ছুটে
জীবন-উচ্ছ্বাসে।
শূন্য ব্যোম অপরিমাণ
মদ্যসম করিতে পান,
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ,
ঊর্দ্ধ নীলাকাশে!
থাকিতে নারি ক্ষুদ্র-কোণে
আম্রবনছায়ে
সুপ্ত হ'য়ে লুপ্ত হ'য়ে
গুপ্ত গৃহ-বাসে।

বিপদ মাঝে ঝাঁপায়ে প'ড়ে,
শোণিত উঠে ফুটে,
সকল দেহে সকল মনে
জীবন জেগে উঠে।

অন্ধকারে, সূর্য্যালোকে,
সন্তরিয়া মৃত্যুস্রোতে
নৃত্যময় চিত্ত হ'তে
মত্ত হাসি টুটে।
বিশ্বমাঝে মহান যাহা,
সঙ্গী পরাণের,
ঝঞ্ঝা মাঝে ধায় সে প্রাণ
সিন্ধুমাঝে লুটে।

অতএব তরুণদের দোষী করার আগে গুরুদেবের বিচারটাই কি উচিত হয় না ?

চল্লিশ বছর আগেকার বাংলার নৈতিক অবস্থাটাও ভেবে দেখ না কেন ?

মদ খাওয়াতো তখন সভ্যতার একটা অঙ্গ ছিল। আর যার অবস্থায় কুলোতো সে এক-স্ত্রীতে আবদ্ধ থাকতো না। এখন কিন্তু মদ খাওয়াকে দোষ বলেই মনে করা হয়; আর বহু সঙ্গতিপন্ন লোক আছেন যাঁরা বহু-স্ত্রী গ্রহণ সম্বন্ধে বেশ বিচার করেই চলেন।

এটা কি উন্নতি নয়? এ এলো কোত্থেকে ?

সমাজের দিক দিয়ে এমন কোন সংস্কারই ত আসে নি, যাতে সহসা এ অঘটন ঘটতে পারে !

এই চল্লিশ বছরের মধ্যে কাজ করেছে, ইংরাজি শিক্ষা, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের আদর্শ—আর সাহিত্য।

আমাদের আলোচনা সাহিত্য নিয়ে।

গত চল্লিশ বছরের সাহিত্যের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাঁরা তাঁদের কথাই বলি।

বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেই কি সাহিত্যে স্বাধীন চিন্তা করেন নি? অবশ্য প্রত্যেকের মধ্যেই তারতম্য আছে; সেটা কিছুই আশ্চর্য্যের নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু ছিলেন; কিন্তু অন্ধ ভাবে তিনি হিন্দুর সকল আচার ব্যবহার মানতেন না। এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত তাঁর লেখার মধ্যে পাওয়া যায়।

কথা-সাহিত্যে স্ত্রী-পুরুষের কি সম্বন্ধ হওয়া উচিত—তা দেখাতে তিনি পশ্চাদপদ হননি। সতী স্ত্রী যে কেবল দুই চোখ মুদ্রিত করে স্বামী-দেবতার চরণ সেবা করবে—এমন কথার বিরুদ্ধেই তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন।

তখনকার দেশের লোক তাঁকে নিয়ে কম 'সমালোচনা' করেনি।

তারপর রবীন্দ্রনাথ।

কথা-সাহিত্যে তাঁর বিনোদিনী বিমলার চরিত্র অঙ্কন রুচির দলের প্রণিধানের যোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যে দীর্ঘদিন ধ'রে অপরিমিত স্বাধীন চিন্তা করেছেন। অবশ্য দেশের লোকের কঠিন সমালোচনা তাঁকে অঙ্গের ভূষণ করে নিতে হয়েছে! তবুও আজ তাঁকে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বলে দেশকে মানতেই হচ্ছে!

এই চল্লিশের শেষের দিকটায় আসেন শরৎচন্দ্র। আজ চিঠি দীর্ঘ হলো। বারান্তরে তাঁর সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার ইচ্ছা রইল।

২রা শ্রাবণ, ১৩৩৪। **মণিবজ্র ভারতী**

হাসি ও অশ্রু

শ্রী অখিল নিয়োগী

পাশাপাশি বাড়ীতে তারা থাকে।

ছেলেটি দিন-রাত্তির আকাশের দিকে দু'টি চোখ মেলে রাখে—সারা জগতের ব্যথা-ভরা অশ্রু নিয়ে—।

আর মেয়েটির লঘু নৃত্য-পাগল চরণ দু'টি ঘুরে বেড়ায় বাড়ীর আশে-পাশে—কণ্ঠে বেজে ওঠে তার স্বর্গের অপ্সরীর অনিন্দিত সুর-লহরী!

ছেলেটি তার গোপন ব্যথা নিংড়ে কাব্য রচনা করে' চলে—রাত্রিদিন—।

আর মেয়েটি সুরে নৃত্যে গানে—কাটায় তার উচ্ছল আনন্দের দিনগুলি।

মেয়েটি অবাক হয়—কি এত ব্যথা ওই ছেলেটির প্রাণের গোপন রন্ধ্রে রন্ধ্রে!—কৈ আমার মনে ত' তার এতটুকু ছোঁয়াচ্ লাগে না!—আমি পৃথিবীকে ভালোবাসি গানে—সুরে—ছন্দের বৈচিত্র্যে নৃত্যের প্রতি চরণোৎক্ষেপে!

ছেলেটি ভাবে—কোন্ আনন্দ-সাগরের বানে মেয়েটি দিনরাত হাবুডুবু খায়? সুখের উৎসের গোপন ধারাটি কি ও সত্যি আকণ্ঠ পান করেছে? দুনিয়ার এত ব্যথা কি কোমল প্রাণে ওর এতটুকু দোলা দেয় না?

এমনি করে ছেলেটি ভাবে—মেয়েটি অবাক হয়!

একদিন গান থামিয়ে মেয়েটি তার দোর-গোড়ায় এসে শুধোলে,—ওগো কি এত ব্যথা তোমার প্রাণে? যদি সইতে না পারো ত' আমায় তার ভাগ দাওনা! তোমার অশ্রুতে যে আমার আনন্দের গানও ভিজে উঠ্‌ল!

ছেলেটি অবাক্ হ'য়ে চেয়ে থাকে!

তারপর ধীরে ধীরে মাথা নীচু করে' বলে,—জগতের ব্যথা আমার অশ্রু হ'য়ে ঝরে' পড়ে—তাই আমার চোখ ভিজে!

মেয়েটি অবাক্ হ'য়ে বলে,—জগতের ব্যথা? কই? আমি ত' তা জান্‌তে পারিনে! জগতকে দেখি আমি—আনন্দের ফোয়ারা—। রসে-বর্ণে-গন্ধে তা' আমার কাছে পূর্ণ হ'য়ে দেখা দেয়। কিন্তু কোথায় লুকোনো থাকে তোমার ওই ব্যথার সাগর?

ছেলেটি জবাব দেয় না, শুধু আঙুল দিয়ে তার বুকের মাঝখানটা দেখিয়ে দেয়।

মেয়েটি বলে,—দেখাতে পারো—আমায় তোমার সেই ব্যথার ক্ষত?

ছেলেটি বলে,—এ ত দেখাবার নয়—এ অনুভব করবার।

মেয়েটি বলে—কি করে' তবে আমি টের পাবো জগতের এত ব্যথা?

ছেলেটি তখন বলে,—ব্যথা যখন তোমার বুকেও তার বিষ-চুম্বন এঁকে দেবে—তখনই বুঝ্‌তে পারবে—তার আগে নয়।

মেয়েটি ফিক্ করে' হেসে বলে—আমার বুকে! তার পর গানের উৎসে—হাসির ঝর্ণায়—নৃত্যের হিল্লোলে ঘর থেকে চল্‌কে বেরিয়ে যায়—কোন্ আনন্দের টানে—কে জানে—!

ছেলেটি বসে' বসে' ভাবে—আর কাব্য রচনা করে।

একদিন মেয়েটি এসে শুধোয়,—আচ্ছা, সারা দিন তুমি মুখ নীচু করে' কি লেখ বলতো?

ছেলেটি খাতা থেকে মুখ না তুলেই জবাব দেয়,

জগতের ব্যথা নিংড়ে কাব্য-কাহিনী রচাই আমার কাজ

মেয়েটি ঝর্ণা-ধারার মতো খিল্‌খিলিয়ে হেসে ওঠে। তারপর হাসি থামিয়ে বলে, ওমা। তাই বুঝি তুমি দিন রাত মুখ গুম্‌ড়ে পড়ে থাকো? তা আনন্দ দিয়ে কি আর কাব্য লেখা চলে না।

ছেলেটি অসহায়ের : তার দি তাকিয়ে বল্‌,—কিন্তু জগতের ব্যথাই যে শুধু আমার সম্বল—আনন্দের সঙ্গে ত' কোনো পরিচয় আমার নেই।

শুনে মেয়েটি অবাক হয়—। ছেলেটি আবার মাথা নীচু করে' বসে।

ছেলেটিরও রচনার শেষ নেই—মেয়েটিও তার নৃত্যের দোলা আর সুরের খেলা নিয়েই আছে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় চাঁদের আলোয় বান ডেকে গিয়েছিল—আকাশের এপার থেকে ওপার অবধি।

মেয়েটির উতোল পরাণ আর ঘরে বাঁধা রইল না। ছুটে এসে ছেলেটির ঘরে ঢুকে দেখ্‌লে—মাথা গুঁজে অশ্রুর আখর দিয়ে সে শুধু লিখেই চলেছে।

ঘরের মাঝখানে এক ঝলক হাসি ছড়িয়ে দিয়ে মেয়েটি বল্লে,—ওগো শুন্‌ছ—আমি যে চলে যাচ্ছি এখান থেকে—।

ছেলেটি অবাক হ'য়ে তার মুখের দিকে চেয়ে শুধোলে,—কোথায়?

মেয়েটি বল্লে,—রাজার নাট-মন্দিরে নাচ্‌ শিখ্‌তে।

শুনে ছেলেটির চোখ দু'টো যেন সজল হ'য়ে উঠ্‌ল। শুধোলে,—কেন?

মেয়েটি মিষ্টি হেসে বল্লে,—ওমা, যাবো না। এযে আমার চিরজন্মের আকাঙ্ক্ষা—শুধু নাচ—গান—সুর—ছন্দ—বলে' মেয়েটি ঘরের ভেতর পায়রার মতো তিন পাক্‌ খেয়ে বেরিয়ে গেল।

ছেলেটি আবার মাথা নীচু করে' লেখায় মন দিলে

যাবার দিন মেয়েটি এসে বল্লে,—ওগো, তুমি এখান থেকে চলে যেও না—আজ থেকে পাঁচ বছর পরে আমি ফিরে আস্‌ব—তখন আমরা দু'জনে একসঙ্গে থাক্‌বো—কেমন?

ছেলেটি অসহায়ের মতো শুধু ঘাড় নাড়লে

তারপর—

অনেকদিন কেটে গেল।

একদিন ছেলেটি খাতা থেকে মাথা তুলে ভাব্‌লে—তাইত' মেয়েটি যে ফিরে আসবে বলে' গেল—কই তা ত' এলো না।

আবার সে খাতায় মন দিলে।

এমনি করে' আরো কিছুদিন কাট্‌লো।

এক শুভদিনে—সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার আজীবন শ্রমলব্ধ কাব্যখানা সম্পূর্ণ করে' ছেলেটি আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

তারপর জীবনে প্রথম রাজপথে নেমে একটি পথিককে শুধোলে,—রাজার নাট-মন্দির কোন্‌ পথে বল্‌তে পারো?

পথিক পথ দেখিয়ে দিলে।

কাব্য হাতে নিয়ে ছেলেটি সেইপথে পা বাড়িয়ে দিলে।

নাট-মন্দির অনেক দিনের পথ

ছেলেটি সেখানে পৌঁছুলে বটে—কিন্তু মেয়েটির কোনো খোঁজই সে পেলে না।

নাট্যাচার্য্যের কাছে তার হাঁটাহাঁটি সার হ'ল। কিন্তু যার জন্যে এখানে আসা তার সে কিছুই কর্‌তে পারলে না।

হঠাৎ একদিন তার মাথায় এক বুদ্ধি খেল্‌লো। কাব্য-খানা হাতে নিয়ে সে সোজা নাট্যাচার্য্যের কাছে গিয়ে বল্লে,—আমার এ কাব্য কি নাট-মন্দিরে অভিনীত হ'তে পারবে?

নাট্যাচার্য্য জবাব দিলেন না—শুধু আঙুল দিয়ে পুঁথি রাখ্‌বার ত্রিপদী আসনখানা দেখিয়ে দিলেন।

ছেলেটি ভয়ে ভয়ে তার প্রথম ও শেষ সঞ্চয় কাব্যখানা সেইখানে রেখে ধীরে ধীরে চলে এলো।

উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—প্রত্যহ এই কাব্যের খোঁজ নিতে এসে যদি মেয়েটির দেখা মেলে!

এর ভেতর মাসখানেক চলে গেল।

ছেলেটি রোজ একবার এসে—নাট্যাচার্য্যকে তাব কাব্যের কথা শুধোয়— কিন্তু প্রত্যহ একই কথা শুন্‌তে পায়—দেখা হয় নি!

সে কথা ছেলেটির কানে এসে আর এক সুরে বাজে—দেখা হয় নি—তার সেই আত্মার আত্মীয়ার সঙ্গে আজও দেখা হয় নি!

প্রতিদিনের পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধানে বিরক্ত হ'য়ে সেদিন নাট্যাচার্য্য কাব্যখানা খুলে বস্‌লেন। কিন্তু দুটো পাতা উল্‌টিয়েই তাঁর বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

কাব্যের প্রতিপত্রে প্রতিছত্রে—জগতের ব্যথা যেন একেবারে উপ্‌ছে পড়ছে।

কাব্য পড়্‌তে পড়তে তিনি বিশ্বসংসার ভুল্‌লেন—আপনাকে পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেল্‌লেন—শুধু ক্ষণে ক্ষণে তাঁর মনে দোলা দিতে লাগ্‌লো—বিশ্বের বিরহীদের এক দীর্ণ হাহাকার—। এই অশীতিপর বৃদ্ধের দু'টি চক্ষু আর শুষ্ক রইল না।

নাট্যাচার্য্যের মনে হোলো—অতি প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত কোনো কবি বিশ্বের ব্যথা এমন হৃদয়-গলানো ভাষায় ফুটিয়ে তুল্‌তে পারেন নি!

নাট্যাচার্য্য নির্ব্বাচন-অধ্যক্ষকে ডেকে সব খুলে বল্লেন।

অধ্যক্ষ শুধোলেন,—এর কবি কে?

নাট্যাচার্য্য জবাব দিলেন,—এক অজ্ঞাতকুলশীল যুবক।

কপট অধ্যক্ষের মনে হঠাৎ কি এক দুর্ব্বুদ্ধি এলো। তিনি নাট্যাচার্য্যের দিকে আসনটা একটু সরিয়ে নিয়ে তাঁর কানে কানে কি বল্‌লেন।

নাট্যাচার্য্য প্রথমটা কিছুতেই রাজী হ'লেন না—। অধ্যক্ষ আবার কি বল্‌তেই তিনি হঠাৎ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন।

রোজকার মতো—সেদিনও ছেলেটি এসে নাট্যাচার্য্যের কাছে তাব কাব্যের কথা শুধোলে।

নাট্যাচার্য্য দাড়ীতে একবার হাত বুলিয়ে গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন,—তোমার পুঁথি হারিয়ে গেছে—।

ছেলেটির কানে এসে বাজ্‌ল—হারিয়ে গেছে—এই সীমাহীন অনন্তের মধ্যে হারিয়ে গেছে—।

সত্যিই. ত—এই দীর্ঘ দিনের না-দেখার মাঝে সে ত' তার কোনো উদ্দেশই পায়নি!

তবে কি সে এই গোটা দুনিয়াটায় দু' চোখ মেলে আর তাকে দেখতে পাবে না!

উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে ছেলেটি আবার সদর রাস্তায় পা বাড়িয়ে দিলে।

নাট্যাচার্য্য একটু বিচলিত হ'য়ে অধ্যক্ষের দিকে তাকালেন—ক্রূর অধ্যক্ষ তাঁকে চোখের ইসারায় স্তব্ধ করিয়ে দিলে!

নাট-মন্দিরে একখানা নতুন বইয়ের মহলা চল্‌ছে। নাটকটির নাম নাকি শোনা যায়—অশ্রু-সায়র।

নায়িকার ভূমিকা নিয়েছে একটি নতুন মেয়ে—কণ্ঠে

বেজে ওঠে তার অপ্সরীর অনিন্দিত সুরলহরী—চরণে নৃত্যের বিচিত্র হিন্দোল।

মেয়েটি এতদিন নিভৃতে নৃত্যশিক্ষকের কাছে সঙ্গীত নৃত্য আর অভিনয় শিক্ষা কর্চ্ছিল—অশ্রু-সায়রে নায়িকার ভূমিকায় সে এই প্রথম জনসাধারণকে অভিবাদন করবে।

কি জানি কেন—মহলা দিতে দিতে মেয়েটির মনের দোরে—কর হানে—একটি ছেলের অশ্রু-সজল আঁখি দু'টি—তপ্ত হৃদয়ে জেগে ওঠে তার বিস্মৃতির গর্ভের ব্যথার কথাগুলি! তারপর হঠাৎ তার চোখ দুটিতে বান ডেকে যায়।

মেয়েটি আনমনে বসে বসে ভাবে—এই নায়িকার ভূমিকায় সে ছেলেটির মুখের কথাগুলো আবৃত্তি করবে কি করে!

কিন্তু কোনো কূলকিনারা পায় না।

এই মোহন নায়িকামূর্ত্তি ফুটে উঠেছে, আজ এতদিন পরে তাকে যথাস্থানে দেখেও তার মনে এতটুকু আনন্দের সঞ্চার হ'ল না।

থেকে থেকে শুধু তার মনে হ'তে লাগলো—এই পৃথিবী প্রবঞ্চকে ভরা!—সে কাকে বিশ্বাস করবে—কার কোলে মাথা রেখে সে একটু বিশ্রাম করবে—! বড় শ্রান্ত—সে বড় শ্রান্ত!

শেষের দিকটায় অভিনয় করতে গিয়ে যখন মেয়েটির দু' চোখ দিয়ে সত্যি সত্যি অশ্রুধারা নেমে এল—ছেলেটি তখন উন্মাদের মতো হাস্‌তে হাস্‌তে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে রাজপথে পা বাড়িয়ে দিলে!

সমস্ত বিশ্বসংসার তখন তার কাছে অভিনয় বলে ঠেক্‌তে লাগল। যে অশ্রু দিয়ে সে তার অনুপম কাব্য গড়ে তুলেছিল—আজ সেটা তার কাছে নিছক কৌতুক বলে বোধ হ'তে লাগল।

নাট-মন্দির লোকে লোকারণ্য।

অশ্রু-সায়রের প্রথম অভিনয় রজনীতে স্বয়ং রাজা থেকে আরম্ভ করে—দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা এসে ভীড় করেছে—নাট-মন্দিরের দোরে!

অভিনয়ের সুরু থেকে আরম্ভ করে—নায়িকার নৃত্য-কৌশল—অভিনয়চাতুর্য্য আর তার আবৃত্তির ভঙ্গী দেখে রাজা তাঁর গলার জয়মাল্য খুলে মেয়েটির গলায় পরিয়ে দিলেন।

নিজের লেখা কাব্য অন্যের নামে অভিনীত হচ্ছে ভেবে—ছেলেটিও সেদিন সকলকার অন্তরালে পেছনের একটি আসনে বসে এই মর্ম্মান্তিক অভিনয় দেখছিল। অশ্রু-সায়রের পেছনে যে আর একটি অশ্রুর মহাসমুদ্র লুকোনো আছে—সে কথা তার মত আর কেউ জান্‌ত না।

সে আরো অবাক্ হ'য়ে গেল মেয়েটিকে নায়িকার ভূমিকায় দেখে! যার গোপন-ছায়া নিয়ে তার লেখনীতে

অভিনয় শেষ হ'তে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ কম্পিত করে নায়িকার জয়ধ্বনি উঠল।

স্বয়ং রাজা বলে পাঠালেন,—রথ তৈরী—নায়িকা আজ তাঁর গৃহে নিমন্ত্রিতা।

মেয়েটি কিন্তু অভিনয়ের পরই মনের সঙ্গোপনে কার ডাক শুন্‌তে পেলে! তার মনে হ'তে লাগল—সেই ছায়াবীথি—ভরাগ্রাম—ঝর্ণার কুলু কুলু—সেই নীপবন—মেঠো পথ,—সেই বাড়ী যেখানে তারা দু'টিতে পাশাপাশি নীড় বেঁধেছিল—তারা শুধু তাকে হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে—ডাক্‌ছে!

মেয়েটি হাতের অলঙ্কার—মেখলার চন্দ্রহার—মাথার সীঁথি—পায়ের নূপুর ছুড়ে ফেলে দিলে—তারপর রথে না উঠে সারথিকে বিদায় দিয়ে পায়ের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

শ্রান্ত দেহমন নিয়ে যখন সে আবার সেই বাল্যের চিরপরিচিত গৃহে পৌঁছুল—একরাত একদিন অবিশ্রাম চলার পর, তখন পশ্চিম আকাশে রক্তের ঢেউ বইয়ে দিয়ে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে।

মেয়েটি একেবারে ছেলেটির বাড়ীর অঙ্গনে গিয়ে দাঁড়ালো।

আগাছায় ঘরদোর ভর্ত্তি হ'য়ে গেছে—যেন একটা কঙ্কাল নির্জ্জন শ্মশানে পড়ে—শ্বাস নেবার নিষ্ফল চেষ্টা করছে মাত্র!

দু' হাত দিয়ে আগাছা সরিয়ে ছুটে ঘরের ভেতর ঢুক্‌তেই—একটা তীব্র আর্ত্তনাদ শুনে মেয়েটি ভয়ে বিস্ময়ে চম্‌কে দাঁড়ালো। তারপর কোণের দিকে চাইতেই দেখলে—ছেলেটি সেই নির্জ্জন গৃহে পড়ে অসহ্য যাতনায় ছট্‌ফট্‌ কর্চ্ছে।

মেয়েটির মুখ দিয়ে কথা বেরুল না—শুধু সে ছুটে গিয়ে তার নুয়ে পড়া মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিলে!

ছেলেটি চোখ খুলে মেয়েটিকে দেখে একটি বার মাত্র কি বল্‌বার বৃথা চেষ্টা করলে—

মেয়েটি নির্ব্বাক পাথরের মতো অসাড় হ'য়ে বসে রইল।—দুটি চোখ দিয়ে বইতে লাগল তার প্লাবনের দরিয়া—কিন্তু ছেলেটির মুখ তখন মিষ্টি হাসিতে ভরে গেছে।

বিচিত্রা

'রঙ্গিলা-রসুল' কেতাবখানা আমরা পড়ি নাই। কিন্তু এই 'রঙ্গিলা-রসুল' কেতাবের মামলা উপলক্ষে যে রঙ্গ আজ দেশে উপস্থিত হইয়াছে তাহা কাগজে পড়িতেছি,—আর ভাবিতেছি, এ তামাসা মন্দ নয়।

* * *

শ্রীযুক্ত রাজপাল 'রঙ্গিলা-রসুল' বই লেখেন। এই কেতাবে নাকি হজরৎ মহম্মদের উপর আক্রমণ আছে। তাঁকে খাটো করার নাকি চেষ্টা আছে। আদালতে তার বিচার হয়। বিচারপতি দলিপ সিং বিচারকের আসনে বসিয়া আইনের মারফতে শ্রীযুক্ত রাজপালকে শাস্তি দেওয়ার কোন উপায় খুঁজিয়া পান নাই। তিনি রাজপালমহাশয়ের লেখাকে অবাঞ্ছনীয় মনে করেন, কিন্তু বর্ত্তমান আইনে যে, তাঁকে শাস্তি দেওয়া যায় না আর শাস্তি দিতে হইলে যে বর্ত্তমান আইন বদলাইতে হয় তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

—আমরা যেমন 'রঙ্গিলা-রসুল' কেতাবখানা পড়ি নাই, তেমনি আমাদের মুসলমান ভায়ারাও অনেকেই যে পড়েন নাই তা' জানি, এবং না পড়িয়াই যে অনেকে 'রঙ্গিলা-রসুল' আন্দোলনের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছেন তাও মানি।

* * *

কথাটা বলিয়া রাখাই ভাল, আমরা কোন ধর্ম্মকে মিথ্যা খাটো করার পক্ষপাতী নই, সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মবুদ্ধি বা সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি লইয়া ধর্ম্ম মতকে—বা কোন সমাজকে খাটো করার চেষ্টা বা তার কুৎসা করার মতি-গতিকে আমরা হেয় মনে করি। কিন্তু কোন দেশের কোন কালের কোন মানুষ অভ্রান্ত,—তাঁর কোন ত্রুটি বিচ্যুতি নাই, তাঁকে চরম ও পরম রূপে সত্য বলিয়া মানিয়া নিতে হইবে, মানুষের মনীষার এত বড় দাসত্ব ও এত বড় দৈন্যকে ত মানিয়া নিতে পারি না।

ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকদের, মহাপুরুষদের, ধর্ম্ম-নেতাদের অথবা প্রেরিত-পুরুষদের বা অবতারদের অযথা আক্রমণ করিবার, তাঁদের কুৎসা করিবার পথে কোন যদি বাধা না

থাকে, তবে মুসলমানদের ভয় যতটা, হিন্দুর ভয় ততোধিক। কিন্তু আমরা হিন্দু হইয়াও, আমরা মানুষ যে, এই যুগের মুক্তিকামী মানুষ যে, এই কথা ভুলিতে পারি না। তাই ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকদের সমালোচনার পথ আইনের দ্বারা বন্ধ করার চেষ্টাকে অর্ডিন্যান্সের চাইতেও জুলুম ও বর্ত্তমান যুগের পক্ষে বর্ব্বরতা বলিয়াই মনে করিব, এবং তেমন আইনকে, তেমন দাসত্ব-সুলভ মতিগতিকে অহরহ ধিক্কার দিব।

যে যাহাকে ভক্তি করে, তাকে কেউ নিন্দা করিলে তাহার দুঃখ বোধ হয়। হইতে পারে। কিন্তু রাম যাহাকে ভক্তি করে, শ্যামের বিচারবুদ্ধি, ঐতিহাসিক জ্ঞান যদি তাহাকে ভক্তি করিতে মানা করে, তবে উপায়?—কোন একজন মানুষকে তুমি যখন সহস্র বিশেষণে বিভূষিত করিতে পার তখন আমি যদি বিচারসহ, যুক্তিসহ প্রমাণ করিতে যাই যে, তোমার বিশেষণগুলি মিথ্যা, তবে কি তা' দোষের? শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্ম-নেতা, হিন্দুর অবতার। যদি কোন ইতিহাসে এমন কথা লেখা থাকে যে, তিনি সহস্র রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, আর আমার আজিকার যুগের মার্জ্জিত-বুদ্ধি বহুবিবাহকে বহুবিবাহকারীকে যদি ধিক্কার দিতে চাহে তবে আমি তা' দিব। আজ মানবতা বহু উর্দ্ধে উঠিবার আশায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে; মানবতার উদার মহিমার কাছে কোন ঐতিহাসিক ধর্ম্ম-নেতার-জীবনী, মতামত যদি হেয় প্রতিপন্ন হয়, আজিকার মহামানবের দরবারে তাকে হেয় হইতেই হইবে।—ইতিহাস যদি কোন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের কার্য্যাবলী, মতামতকে আমাদের কাছে ছোট করিয়া দেয়, তবে সেই সত্য ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকদের চেলাদের মুখ চাহিয়াও ত গোপন করা চলিবে না। কোন চেলার মনে আঘাত দেওয়ার উদ্দেশ্য আমার নাই, কিন্তু সত্যকে প্রকাশ করার দায়িত্ব প্রত্যেক মানুষের। সত্যের প্রকাশে যদি কোন মিথ্যা ব্যথা পায়—উপায় কি?

* *
*

তারপর মস্ত কথা এই, সহস্র লোকে যাকে মানে, সে-ই সর্ব্ববিষয়ে অভ্রান্ত, এমন কথা কেমন করিয়া বলিব? সহস্র লোক যাকে একদিন মাথায় করিয়া নাচে, তাঁকেই আবার সহস্র লোক যে তাণ্ডব নৃত্যে পায়ে দলে, তাও ত জানা আছে। ঐতিহাসিক সত্যের কষ্টিপাথরে ধর্ম্ম-নেতাদের যাচাই করার স্বাধীনতা মানুষের থাকা চাই। কারণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি মনুষ্য সমাজেরই সম্পত্তি। যাহারা তাঁকে মানে তাদেরও, যারা মানে না তাদেরও। ঐতিহাসিক প্রমাণের বিরুদ্ধে যদি তুমি হাজারো ভাল ভাল বিশেষণে তাঁকে আপ্যায়িত করিতে পার, ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে আমি কি তাঁর দুই-চারটা মিথ্যা বিশেষণ কাট-ছাট করিতে পারিব না? আমার প্রদত্ত বিশেষণে তোমার মনে দুঃখ হইতে পারে। কিন্তু তোমার দেওয়া মিথ্যা বিশেষণে আমার সত্যাশ্রয়ী মন যে পীড়িত হয়, তার উপায়? আমাকে যদি তোমার মিথ্যার উপদ্রব সহিতে হয়, তোমাকে আমার সত্যের আঘাত সহিতে হইবে বই কি।

তবে এ-কথা সত্য, ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকদের চরিত্রের, সমালোচনা এক কথা—আর হীন উদ্দেশ্যে জঘন্য আক্রমণ আর এক কথা। আইন শেষোক্তকেই সাজা দিতে পারে, প্রথমটিকে নয়। এমন কি তেমন চরিত্র সমালোচনায় যদি ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের আসন টলে তবু নয়।

* *
*

পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীযুক্ত রাজপালের লিখিত 'রঙ্গিলা-রসুল' আমরা পড়ি নাই। সুতরাং বলিতে পারিলাম না, ইতিহাসের প্রমাণের উপরে নির্ভর করিয়াই তিনি হজরৎ মহম্মদের চরিত্র সমালোচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন কি না, এবং চরিত্র সমালোচনার কোন্ উচ্চাদর্শকে সম্মুখে রাখিয়াছিলেন।

যাহাই হউক, আমাদের মুসলমান ভায়ারা 'রঙ্গিলা-রসুলের' মামলার রায় শুনিয়া উত্তেজিত হইয়াছেন। এই রায় ব্যাপারটাকেও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে ফেলিতে তাঁরা যেন ব্যস্ত। তবে বিচারকের ভাগ্য ভাল—তিনি হিন্দু নহেন, খৃষ্টান; তবু বিচারকের বরখাস্ত, 'মুসলিম আউট্‌লুকের' সম্পাদকের মুক্তি, তাঁরা চাহিতেছেন। রাজপালের সাজার ব্যবস্থাত সরিয়তেই নির্দ্দেশ আছে। এখন এই 'অবমাননাকারীকে' কোনও 'ধর্ম্মপ্রাণ' খোঁজ করিলেও আমরা আশ্চর্য্য হইব না—কারণ ধর্ম্ম-প্রাণ আবদুর রসিদের উত্তেজনার মদিরা অজ্ঞ-সাধারণকে নিত্যই আকণ্ঠ পান করানো হইতেছে।

আমাদের বিশ্বাস, সত্যকে খাটো করা যায় না। দুষ্টলোকে খাটো করার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে পারে মাত্র। ভগবান আছেন; খোদা আছেন,—এই কথা যে ভক্ত সত্যই বিশ্বাস করেন; ভগবান নাই, খোদা নাই, নাস্তিকের এই উক্তি সেই ভক্তদের কি উত্তেজিত করিতে পারে? হজরৎ মহম্মদ অভ্রান্ত, অপাপ-বিদ্ধ-মহাপুরুষ, প্রেরিত-পুরুষ—এ-বিশ্বাস, যখন কোটি কোটি মুসলমানের মধ্যে সত্যই আছে, এ-বিশ্বাস অচল-অটল—তখন হজরৎ মহম্মদের চরিত্রের বিরুদ্ধ সমালোচনা কেহ করিতে পারিবে না, অর্ডিন্যান্স করিয়া এমন ব্যবস্থা করিবার ব্যাকুলতা মুসলমানদের মধ্যে কেন এত দেখা দিল, তা বুঝিলেও, তার যুক্তিযুক্ততা দেখি না।

মিশনারীরা হিন্দুর আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে কম কুৎসা করে নাই। কিন্তু হিন্দু এমন আন্দোলন কখনও উপস্থিত করেন নাই। হয় হিন্দু তার আরাধ্য দেবতাকে এ-সবের বহু উর্দ্ধে জানিয়া এ-সব উক্তিকে পাগলের প্রলাপ বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছে, অথবা হিন্দু সত্যই তার আরাধ্য দেবতাকে মিশনারী প্রভৃতি বিশ্লেষিত হেয় জঘন্য বলিয়াই জানে। কোনটির সম্ভাবনা অধিক, হিন্দু বলিতে পারে। যে সত্যই ছোট নয়, তাকে কেহই ছোট করিতে পারে না, তাকে রক্ষা করিতে অর্ডিন্যান্স লাগে না—বাংলার বা অ-বাংলার কোন আবদার রহিমেরও দরকার হয় না। সত্যকে যারা গায়ের জোরে, সংখ্যা-বাহুল্যের জোরে তুলিয়া ধরিতে চায়, সত্য তাদের কাছে কখনো ধরা দিবে না। সত্যের সেবা করিতে গিয়াও তারা অন্তরের মিথ্যাকেই বড় করিয়া তুলিবে, ঐ মিথ্যাকেই সত্য বলিয়া ভুল করিয়া পূজা করিবে।—বিশ্বে যা' সত্যই বড়, তাকে দল বাঁধিয়া ছোটও করা যায় না, আর যা' ছোট তাকে দল বাঁধিয়া বড়ও করা যায় না; এ-কথাটা না বুঝিলে, মিটিংই করি, অর্ডিন্যান্সই করি, আর 'রঙ্গিলা-রসুল'ই লিখি মিথ্যার বোঝা বহিয়াই মরিতে হইবে। কিন্তু আমরা বলি, জয়ী হউক মানুষের স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন বুদ্ধি, মানুষের মুক্ত মনীষা। মানুষের মনীষা সেই মান্ধাতার আমলে খুলিয়া অমনি চুকিয়া বুকিয়া বন্ধ হইয়া গেল, এ-কথা যারা বলে তারাই ত নাস্তিক!

বাংলার রাজবন্দীরা এখনো প্রায় সবাই আবদ্ধ আছেন। সুভাষচন্দ্রের মুক্তির পরে, এই সকল বন্দীদের সম্বন্ধে আলোচনা যদি জোর না চলে তবে বাংলার নেতাদের সুনাম বাড়িবে না। সুভাষচন্দ্রের মত না হউক, প্রায় কাছাকাছি, আরো কেহ কেহ রোগ-শয্যায় আছেন, তাদের জন্য যথেষ্ট লেখালেখি কাগজে হইতেছে, বলা যায় না। 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' তা জানি। আর ফল হইবে না, জানিয়াও অনেক কথা সাংবাদিকেরা লেখেন। নাগপুরের কর্ম্মীরা বাংলার রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য অস্ত্র আইন অমান্য ব্রত আরম্ভ করেন। আমরা তদপেক্ষা ভাল কিছু পারি নাই,—তেমনটিও পারি নাই। নাগপুরের কর্ম্মীদের আমরা শ্রদ্ধা করি।

অধিকার রক্ষার জন্য পটুয়াখালিতে সত্যাগ্রহ চলিয়াছে, ভালই।—অর্ডিন্যান্স কি বাংলার মানুষের অধিকার হরণ করে নাই? পটুয়াখালির ব্যাপারে কি ফল হইবে জানি না, তবু হিন্দুর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, হিন্দুর সাড়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু জাতীয় মর্য্যাদার জন্য, রাজবন্দীদের জন্য এমনই কিছু করা যায় না কি? হাতে হাতে ফল না হইলেও জাতি তার ফল একদিন ভোগ করিত।

শ্রী নলিনীকিশোর গুহ

শ্রী শিশিরকুমার নিয়োগী কর্ত্তৃক, ১এ, রামকিষণ দাসের লেন, নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস হইতে মুদ্রিত ও
বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

কালি-কলম

জন্ম ৩১শে ভাদ্র, ১২৮৩ সন।
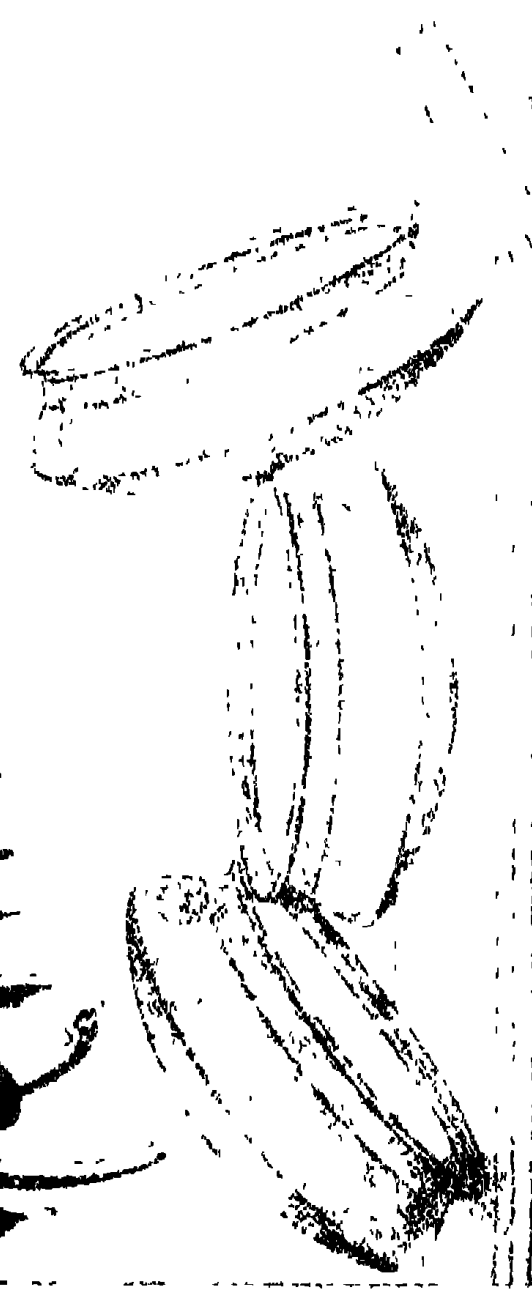
কালি-কলম

২য় বর্ষ] ভাদ্র, ১৩৩৪ [৫ম সংখ্যা

খোকা আয়! খোকা আয়!

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মেজদিদি ছিলেন বিধবা।

কোন মানুষের জীবন-মরণের জন্য আর কেউ দায়ী হ'তে পারে না, বিশেষ ক'রে, স্বামীর মৃত্যুর জন্য তাঁর স্ত্রী; একথা বুঝেও, মেজদিদির মনের এক জায়গায়, কেমন-যেন-একটু অন্ধকারের মত ছিল!

এ বিষয়ের কাছাকাছি কোন প্রসঙ্গ হ'লেই মেজদিদি হঠাৎ-কেমন চুপ ক'রে যেতেন। তারপর ক'দিন তাঁর মুখে কেউ হাসি দেখ্‌তে পেত না; চোখ দুটো তাঁর ডাগর হ'য়ে তা থেকে কেমন একটা জ্বালা বার হ'তে থাক্‌তো।

বড়দিদি এসে ব'লতেন, তোর বুঝি, মন ভাল নেই?

মেজদিদি রাগ ক'রে ব'লতেন, তোমার কি ও ছাড়া আর কথা নেই, বড়দি?

বড়দিদি বিড়-বিড় ক'রে কি ব'লতে ব'লতে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে, রোয়াকের উপর আনমনা হ'য়ে ব'সে থাক্‌তেন।

বাড়ীটা নিমেষে বিষাদে ভ'রে উঠ্‌তো।

সন্ধ্যার পর বড়বাবু আপিস থেকে বাড়ী ফিরতেন; গম্ভীর মানুষটি।

বড়দি ত্রস্তপদে একবার ঘরে ঢুকেই বেরিয়ে আস্‌তেন। আবার সেই রোয়াকের উপর ব'সে তাঁর কালো দুটি চোখ, কালো আকাশের কোলে কোলে কিসের ব্যথা জানিয়ে ঘুরে মরতো।

বড়বাবুর বন্ধুরা এসে সেদিন ফিরে যেতেন। সেতার খানা খোলের মধ্যেই সেদিনকার জন্য চুপ ক'রে অন্য দিনের প্রতীক্ষায় যেন থাকতো।

উঠানে নেয়ারের খাটের উপর তিনি চুপ ক'রে শুয়ে থাকতেন। সে রাতে তাঁর নাক ডাকা কেউ শুনতে পেত না।

শেষ রাতে মেজদি আভাং ক'রে চামেলির তেল মেখে ঘড়া ঘড়া জলে স্নান শেষ ক'রলে, আকাশ স্বচ্ছ হ'য়ে উঠতো, বাতাস হাল্কা হ'য়ে চাঁপার গন্ধে বাড়িটা আমোদ ক'রে দিত।

ছোট বৌ সাত-সকালে স্নান শেষ ক'রে পুষ্পপাত্রে থরে থরে ফুল সাজিয়ে, চন্দন ঘষে, নৈবেদ্য সাজিয়ে খাটো গলায় ডাকতো, মেজদি, মেজদি, এসো।

মেজদিদি পূজায় ব'সতেন।

পূজো শেষ হ'লে—ডাবের জল, মিছরির সরবৎ, বেদানার রস, আর থোলো থেকে ক'য়েকটা আঙুর খেয়ে মেজদিদি নিজের ঘরে যেতেন।

ছোট্ট বৌ—কাঁচের জানলার উপর কালো পর্দ্দা টেনে দিয়ে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রান্নাঘরের দিকে ছুটতো।

বড়দিদি এ খবর বাইরে দিয়ে এলে, বড়বাবু তাড়াতাড়ি চা খেয়ে মক্কেল নিয়ে ব'সতেন।

মেজবাবুর দেয়াল-জোড়া ছবিটি ফুলের মালায় বেড়ে দিয়ে, তার নীচে থরে-থরে খাবার সাজিয়ে ছোট বৌ ডাকতো, মেজদি, অনেক যে বেলা হ'লো!

মেজদিদির ঘুম ভাঙতো; মুখে হাসি ফুটতো।

সংসার-নদীর স্রোত আবার বইতো। বড়দিদি আর ছোট-বৌ রান্না ঘরে লুকিয়ে মাছ-ভাত খেয়ে, মুখে পাণ গুঁজে, পূবের বারাণ্ডায় শীতল-পাটির ফরাসের উপর তাস খেলতে বসতো। মেজদির সই ও-পাড়ার বিন্দুদিদি নইলে মেজদিদির সঙ্গে বসে কে? তাই আগে ভাগেই তাঁকে বড়দিদি ডেকে পাঠাতেন।

মেজদিদির ভারি-মন, বড়দিদিদের ঘাড়ে পঞ্জা, ছক্কা, ব্যোম চাপিয়ে সেদিনের জন্যে হাল্কা হ'তো। মেজদিদি খিল্-খিল্ ক'রে হাসলে, বড়দিদির মনে সুখ হতো।

ছোট বৌ বিকেলে একরাশ যুঁই ফুল তুলে গ'ড়ে গেঁথে রাখতো।

সন্ধ্যার পর বড়বাবুর বৈঠকে সেতার বেজে উঠলে, মেজদিদি ডাকতেন, দামিনি!

ছোট বৌ চুপি চুপি কাঁচের ছোট আলমারি থেকে চ্যাপটা বোতলের লাল ওষুধ জলের সঙ্গে মিশিয়ে মেজদিদির হাতের কাছে এগিয়ে দিলে, মেজদিদি বলতেন, বেশি ক'রে দিছলি ত?

ছোট বৌ ঘাড় নাড়তো।

মেজদিদি বিধবা, মন খারাপ, ও-ওষুধ নইলে সেতারের সুর কানে এলে যে তাঁর চোখে জল আসে! ওষুধ খেলে, তবে মেজদিদির মুখে হাসি ফোটে!

সেতারের বাজনা শুনতে শুনতে মেজদিদির বুকের মধ্যে ব্যথা জ'মে ওঠে! তখন ঝালর-দেওয়া বালিশের উপর শুয়ে প'ড়ে বুকের কাপড় খুলে দিয়ে মেজদিদি ডাকেন, ভামিনি!

ছোট বৌ রান্না ঘর থেকে ছুটে এসে তাঁর বুকে গন্ধ তেল মাখিয়ে দিতে দিতে ভাবে, মেজদিদির দিন কি ক'রে কাটবে!

রান্নাঘরে বড়দিদি একাই লুচি বেলেন, একাই ভাজেন, একাই থালের ওপর সাজিয়ে রাখেন।

বিধবাদের যে রাতে ভাত খেতে নেই!

খোকা আয়! খোকা আয়!

মেজদিদি ছোট বৌকে ডাকেন, দামিনী, ভামিনী আরো কত-কি আদরের নামে। ছোটবাবু দূর বিদেশে চাকরি করে। মুঠো মুঠো টাকা পাঠায়। ছোট বৌ ছুঁড়ির না আছে গয়নার সখ, না আছে একখানা ভাল কাপড়!

মেজদিদি তাই বলেন, মানুষ তো ঐ ছোট বৌ!

বড়দিদি ভাবেন, কি তাঁর দোষ!

মানুষের দোষ ত' ছোট্ট! কপালের দোষ কে খণ্ডাবে? সীঁথির সিঁদুর মুছে দেবার মালিক যে, তার ওপর ত' মানুষের হুকুম চলে না!

আদালতের কাজে বড়বাবু বাড়ী ছাড়া। বড়দিদির শরীর আজ ক'দিন ভাল নেই। মেজদিদির দুই ঠোঁটের মধ্যে টেপা হাসি!

ছোট বৌ রান্না ঘরের তাল সাম্‌লে মেজদিদির ঘরে এসে দেখে—সই বিন্দুদিদি ব'সে!

চ্যাপ্‌টা বোতলের আর্দ্ধেক খালি!

মেজদিদির চোখের খুসীর হাসি ঠিক্‌রে পড়ছে সইএর মুখের ওপর; দুজনের অনেকদিনের বন্ধুত্ব। ছোট বৌ তাও জানে!

আকাশভরা মেঘ; জোরে হাওয়া বইচে। কে জানে বিন্দুদিদি আস্‌বেন? অমন কিন্তু মাঝে মাঝে আসেন। হয়তো সমস্ত রাতই থেকে যান।

ছোট বৌ ছুটলো বিন্দুদিদির খাবার তৈরী করতে। বড়দিদি দোর ধ'রে, দেয়াল ধ'রে এসে বলে গেলেন, দেখিস্, ছোট বৌ; একলা পারবি তো?

ছোট বৌ একগাল হেসে বল্লে, পারবো বড়দিদি, পারবো, তুমি শোও গিয়ে।

ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নাম্‌লো। বৃষ্টির শব্দ, ব্যাঙের গান, ঝিঁঝিঁর কির্-কির্,—তার মধ্যে ছোট বৌএর হাত চল্‌চে অসম্ভব। নিমেষে সব তৈরী!

ছোট বৌ খাবার দিতে গিয়ে অবাক। মেজদিদির সোনার অঙ্গে নীল শাড়ি; বিন্দুদিদি চুলটাকে চূড়ো করে বেঁধে পীতাম্বর প'রে বাজাচ্চেন বাঁশি! মেজদিদি তাধি তালে পা ফেলে ফেলে নেচে চলেছেন; পায়ে নূপুর, কণ্ঠে সাতনলী মুক্তোর হার।

বোধ হয় রাসলীলা!

ছোট বৌ পা টিপে-টিপে বড়দিদিকে জাগিয়ে বলে, একবার দেখোসে এসে বড়দি; এমন জন্মে দেখোনি।

বড়দিদি পাশ ফিরে বল্লেন, থাক্‌গে যাক, রাগ করবে।

ছোট বৌ তাও বোঝে।

বলে, তবে কাজ নেই, বড়দি!

ছোট বৌ নিজের ঘরে গিয়ে ঢাকা তুলে দেখে খোকা তখনো ঘুমিয়ে! কি শান্ত ছেলে গো! নইলে কি-হ'তো বল্ দেখি!

ছোট বাতি-দানটি জ্বেলে ছোট বৌ ব'সলো চিঠি লিখ্‌তে। ঘুমুবার যো নেই; মেজদিদির কি দরকার হয়! এদিকে চিঠিও অনেকদিন দেওয়া হয়নি!

অনেক রাতে বৃষ্টি থাম্‌লো। বাইরে কে ডাকা ডাকি করে? রচ্ছা সিং বল্লে, ও বাড়ির মাইজিকে ডাক্‌তে লোক এসেছে, বাবুর অসুখ বেড়েছে।

বিন্দুদিদি মুখ ভার ক'রে বেরিয়ে এলেন। মেজদিদি পিছনে।

কিরে?

গাড়ি এনেছি।

কেন?

বাবুর অসুখ বেশি। ·

বাবু আর কবেইবা ভাল থাকেন! লোক-লৌকতা, আমোদ-আহ্লাদ—সব জলাঞ্জলি—ঐ বাবুর পায়ে!

ঘণ্টি বাজিয়ে গাড়ি চ'লে গেল।

মেজদিদি ডেকে বল্লেন, ছোটো, এখনো যে ঘুমুস নি?

খোকা জেগেছিল, মেজদিদি!

দুরন্ত ছেলের জ্বালায় তোর দেহখানা পাৎ হয়ে যাবে দেখচি।

অন্ধকারে ছোট বৌএর চোখ দুটো সে কিসের হাসিতে যেন ভ'রে ওঠে।

শেষরাতে বড়বাবু ফিরলেন। বৃষ্টিতে ভিজে সর্দ্দি সর্দ্দি বোধ হয়!

একটু চা খাওনা।

থাক্ গে।

ছোট বৌএর দরজার শিকলি ন'ড়ে উঠ্‌লো।

কি বড়দিদি?

বড়দিদি চুপি-চুপি বল্লেন, ভিজে এসেচেন, চা দিতে পারিস?

পারি।

দুধ?

আছে।

৩

খোকার কি হয়েছে?

মাথার তেলো এতখানি ব'সে গেছে, হাত-পা শুকিয়ে যেন কাঠি। পেটখানা ঢাক্।

কাঁদে, দিন নেই, রাত নেই, অবিশ্রাম, কেবল কাঁদে!

মেজদিদি মুখ ফুলিয়ে থাকেন। ছোট ছেলেপিলে মোটেই দেখতে পারেন না। তাঁর কোলে এক-একবারে দুটি-তিনটি ক'রে এসেছে-গেছে। থাকেনি কেউ। যাকে রাখবার এত চেষ্টা সেই থাকে না। পোকা-মাকড় গেছে, বালাই গেছে।

মেজদিদি অসৈরণ সইতে পারেন না, ছোট ছেলের গায়ের গন্ধে বমি আসে, কান্নায় মাথা ধরে, ওদের কথা মনে কল্লে গা যেন ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে ওঠে।

বড়দিদি ষষ্ঠী-মাকালের পুজো মানেন।

দিনের বেলা সংসার, রাত্তিরে ছোট বৌ-এর ঘরে, ঘুমে চোখ জড়িয়ে যায়।

বড়বাবু বাইরে ব'সে মাথায় হাত দিয়ে ভাবেন, ভাইকে আস্‌তে লিখবেন কি না।

ডাক্তার বাঁ হাতে পকেটের মধ্যে ফি গুঁজতে গুঁজতে বলেন, কিছু ভয় নেই; দাঁত ওঠার হাঙ্গাম ও সব।

দাঁত ওঠে না, খোকার চোখ দুটো কপালে ওঠে। নাক দিয়ে নিশ্বাস বয় না, বয় মুখ দিয়ে। গলার মধ্যে ঘড় ঘড়।

ডাক্তার বলেন, হোপ্‌লেস্।

ছোট বৌ ইংরিজি বুঝতে পারে? উত্তেজনায় কিবা অসম্ভব মানুষের?

বড়দিদি চেপে ধরেন তাকে নিজের কোলে।

সেই ফাঁকে, খোকা চলে যায় ফাঁকি দিয়ে।

খোকা নেই?

কাঁদলে মেজদিদি বকেন।

দেখচিস্‌নে, কত বড় শোক বুকের মধ্যে দিন রাত পুষ্‌চি?

খোকার খালিটা যে বুকের মধ্যে জমাট হ'য়ে পাথর

হয়ে যায়! দু'হাত দিয়ে সে পাথরকে চেপে ধরে চোখ ফেটে জল পড়ে, টপ্ টপ্!

বড়দিদি বলেন, কাঁদিস নি, বোন।

মেজদিদি রাগ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

দূরে খোকার কান্না শুনে ছোট বৌ চম্‌কে ওঠে।

খোকা নেই।

তিনদিন কাকাতুয়া জল পায় নি।

সেই ধাক্কায় ময়নাটা ঠেঙ উল্‌টেচে।

ওমা। বাড়ির লোক করছিল কি?

দাঁড়ে বসে কে ডাক্‌বে? খোকা আয়, খোকা আয়!

যাওয়ার স্রোতে—কে আস্‌বে উজান বয়ে।

সেতারের পঞ্চম ছিঁড়েচে। আর দুটোতে মর্চে।

পেতলের তারে মর্চে ধরে না, ধরলে ধরে কলঙ্ক!

সইএর কপালে সিন্দুর নেই!

সাত বছরের শক্ত গেরো, একদিনে আল্‌গা হয়ে গেল?

গেল, গেলই!

বিন্দুদিদির ঘা-খাওয়া বুক, ও টুকু আঘাত সয়ে নেবে।

৪

এক বছরের ছুটি নিয়ে ছোটবাবু বাড়ি এসেছেন।

বড়দিদির হাতে মানুষ।

মেজদিদির ভয় করে তাঁকে।

ছোট বৌ জানে না, কিসে মানুষ খুশী হয়, কোথায় জলে আগুন হয়ে ওঠে।

মাথার শিয়রে টোটা-ভরা বন্দুক; খাটের তলায় ঘুমোয় বোমর-সঙ্ক বিশ্রী দেখতে ডাল-কুত্তাটা!

বড়বাবু হাসেন, অম্‌নিইতো চিরকাল!

বড়দিদি মাথা নেড়ে বলেন, না, না, ...

আরও কিছু কিন্তু বল্‌তে সাহস হয় না।

এটা কি মেজদিদি? আঁচলের আড়াল থেকে বার করে ছোট বৌ দেখায়।

মেজদিদির চোখ দুটো খুশী হয়ে ওঠে।

ওমা। দুই ভায়ের এক পছন্দ। তিনিও ভালবাসতেন এই। এই এই ঠিক্ এমনি গোল বোতল, এই এম্‌নি নারাংগি রং.. ..কি আশ্চয্যি ..

ছোট বৌ অবাক হয়ে শোনে।

হাজার টাকা মাইনে। বলিস্ কি? বড় সায়েবদের সঙ্গে হরদম মেশা-মিশি, এ না হলে কি চলে?

মেজদিদি, এও ওষুধ?

মেজদিদি হাসেন।

কম খেলে ওষুধ, বেশী খেলে নেশা হয়।

ছোট বৌএর বুকের ভেতর থেকে ব্যথা আর ভয়ের ভারি নিশ্বাস বার হ'য়ে আসে।

মেজদিদি বলেন, ওর খোরাক চাই, মাংস। আর, কখ্‌খোনো নিজের হাতে খেতে দিতে নেই। দিলেই সর্ব্বনাশ। জানতুম্ কি আগে এ সব? ডাক্তার যেদিন বল্লে...তখন কপাল ত ধ'রে গেছে।

ছোট বৌ বলে, মেজদিদি, ও-কথা শুন্‌লে ভয় করে..

মেজদিদি হাসেন, ভয় কি লা ছুঁড়ি, পুরুষ নিয়ে খেলা, আর আগুন নিয়ে খেলা; দুই এক,—মেজদিদি মাথা নেড়ে বলেন, একটুও তফাৎ নেই! দুইই এক!

ছাতের ওপর মস্ত চেয়ার পড়লো। তাতে পা ছড়িয়ে সমস্ত রাতটাই আরামে কাটিয়ে দেওয়া যায়।

চেয়ারে শুয়ে ছোটবাবু আগাগোড়া চাঁদির কাজ করা—যার আওয়াজে ছোট বৌএর বুক কেঁপে ওঠে—কালো আবলুশের বাক্সটা থেকে বার ক'রে—তার কালো চক্‌চকে বাঁশিটা বাজাতে লাগলো।

মেজদিদি ছোট বৌকে ডেকে বল্লেন, হাতে যুঁইএর গোড়েটা বেঁধে দিয়ে আয় না, চট করে!

ছোট বৌএর উপরে যেতে পা কাঁপে।

মেজদিদি মনে মনে হাসেন।

পুরুষ ত নাটাইএর সুতো; খেই ধরলে—যাবে কোথায়!

বড়দিদি বলেন, বাপ্‌রে বাপ্, কান যে কালা হয়ে গেল, বাঁশির শব্দে!

ছোট বৌ ভাবে, সেতার কি মিষ্টি!

মাংসের কোর্ম্মা রাঁধতে রাঁধতে মেজদিদি বলেন, জঙ্গলের ছোট সায়েব, ও বাঁশি শুন্‌লে, বাঘ ভাল্লুক দূরে চলে যায়! মানুষের আবার ভয় কিসের?

ছোট বৌ ভাবে, মেজদিদি কত জানে!

বড়দিদি পেঁয়াজ রসুনের গন্ধে নাকে কাপড় দিয়ে বার হয়ে যান ঘর থেকে।

মেজদিদি মনে মনে গাল দিয়ে বলেন, আদিখ্যেতা!

বাঁশির শব্দে বিন্দু দিদি ঘরে থাকতে পারে না। সেই পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে। তাই সইয়ের কাছে ছুটে এলেন বিন্দুদিদি।

মেজদিদি গা টিপে বলেন, দেখবি চল্ ছাতের ওপরে।

টেবিলের ওপর থরে থরে সাজানো! সেকালের তেষ্টায় ছাতিখানা যে শুকিয়ে খাক্ হয়ে যায়!

সে একদিন গেছে! আর ফিরবে না, অভাগ্যিদের পোড়াকপালে!

তবুও, শুকনো গোলাপের গন্ধও মিষ্টি!

গোলাপের সিরাপে বরফ; তারপর?

সে কথা নাই জান্‌লো কেউ!

নইলে কি বাঁশির সুর বরদাস্ত হয়? দেখ্ না ঐ ছুঁড়ির দশা; হাত কাঁপে, পা কাঁপে টলেই বুঝি পড়ে!... ঐ, ঐ, ছোট বৌ ছুঁড়ি!

ছোট বৌ আর পারে না।

দু'চোখ জলে উপচে ওঠে; এত হাসি, এত গল্প এত ফুর্ত্তি...কিন্তু মনের খালি ত'—যেমন তেমনি; ব্যথার চারদিক কিসের চাপে আরো যেন ব্যথিয়ে ওঠে!

অবসাদে দুমড়ে পড়ে তার মন!

মজলিসি-মজা! তার মেজাজই অন্য!

কোন্ ফাঁকে সে শুতে চলে ঘরে।

সইএর আড়ালে মেজদিদি; মেঘের আড়ালে ইন্দ্রজিৎ!

৫

বড় সায়েবের জরুরি তার।

সরকারের জঙ্গল মহাল অচল। ছোট সায়েবকে ফিরতে হবেই।

অচিরাৎ; সাত দিনের মধ্যেই।

ছোটবাবু চ'লে যাবার মুখে দু'হাতে নিজেকে যেন বিলিয়ে দিতে চায়!

তার একটুখানির পুঁজিও সে বেঁধে নিয়ে যাবে না সঙ্গে ক'রে।

বড়দিদি পেলেন, সে অনেক টাকা তীর্থ ভ্রমণের জন্যে।

দাঁড়া-আর্শি, চিরুনি, ব্রুশ; আলমারি-ভরা ওষুধ; বুকে মালিশের গন্ধতেল।

মেজদিদির ঠাসা ঘরে আর তিল রাখার জায়গা নেই।

যে যা চাইলে সব পেয়ে গেল।

ছোট বৌএর মলিন মুখ, খালি বুক; কি চাইবে সে নিজেই জানে না।

কালই ত চ'লে যাবার দিন।

সমস্ত দিন ছু'চোখ ভ'রে উঠচে জলে; কিছুতেই বাঁধ মান্‌তে চায় না পোড়া চোখের জল।

চোখে জল-না-আসার ওষুধ একটু খেলেই ত' পারে।

সে বুদ্ধি তার সন্ধ্যাবেলায় হ'লো আজকের রাত আর কিছুতেই কেঁদে কাটতে দেবে না।

একি! ছোট বৌ যে এলিয়ে পড়ে!

কি হলো তোর ছোট্ট?

কি জানি মেজদিদি, চোখ জুড়ে আস্‌চে যে ঘুমে!

আ মরণ, আপনাহারা ছুঁড়ি।

বড়দিদি বলেন, তা ঘুমুতে জাগ না কেন।

মেজদিদি রাগ করতে করতে চ'লে যান নিজের ঘরের দিকে।

ছোট বৌ এলিয়ে পড়ে ঝরা ফুলের মত। তলিয়ে যায় তার ইহলোক-পরলোক, কামনা-বাসনার বিশ্ব-সংসার, অসীম শূন্যতার মধ্যিখানে।

তবুও মনের কোন্ অন্ধকার গুহায় কে যেন সজাগ হ'য়ে জেগে থাকে। সব-নেই এর মধ্যে তবু সে আছে, তবু সে থাকবে।

ছুটো সবল হাত দিয়ে কে তাকে জড়িয়ে ধ'রে টেনে তুলচে, কে তার সব ভুলে যাওয়ার স্বপ্নের মধ্যে চেতনা এনে দিয়ে বলে, তুই যে কিছু চাইলিনে?

চাইলে তবে পায় বুঝি? না চাইতে কি কিছু পাওয়া যায় না?

আবার হিম-সমুদ্রের মধ্যে তলিয়ে যায় তার দেহ-মন। সে যে ঘুমের দেশ, সে যে স্বপ্নের পুরী! কত মণি-মাণিক-মুক্তো ঘুমিয়ে জাগে সেই অতলের তলায়!

তুমি কে?

ডুবুবি!

আমায় ঘুমোতে দেবে না?

সেই ছু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরা! সেই বুকের মধ্যে টেনে নেওয়া!

ওকি! ঝড় উঠেছে বুঝি?

ছুলচে—ছুলচে—হিম-সমুদ্র ঝড়ের দোলায় ছুলচে!

একি ঢেউএর চাপ? না, না, এ যে গরম, এ যে আগুন!

হিম-সমুদ্রে আগুন লেগেছে!

কি চাই? কি চাই?

তাইতো ভাবি!

তলিয়ে যেতে দাও, সেই মণি-মুক্তোর দেশে।

এই যে, এই যে পায়ের কাছে হামাগুড়ি দিয়ে বুকের ধন।—না চাইতে আপনি এসেছে।

না এ যে অন্য দেশ।
ওই দাঁড়ের ওপর ময়নাটা, না ?
ময়না, ময়না, কি বলচিস্ তুই ?
খোকা আয়। খোকা আয়।
খোকা দুষ্টু—খোকা আসে না।

সকাল হয়েছে। ছোট বৌ একছুটে পুকুরে নাইতে যায়। কি বলে ঐ নির্লজ্জ পাখীটা বার বার মাথার ওপর শিরিশ গাছের ডালে ব'সে।

ওমা! বুক আর খালি নয়!

এলো নাকি বুকের ধন বুকের মধ্যে ?

চিত্ররহস্য

—পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর—

শ্রী সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২০

'বর্‌বোঁ'

রবিবার দুপুরের আহার শেষ করিয়া সোফার উপর লম্বা হইয়া শুইয়া অমর চুরুট টানিতেছিল। দ্বারে টক্‌টক্ শব্দ শুনিয়া সে বলিল, ও-হাইরি-নাশাই—আসুন। ঘরে ঢুকিল ঘনশ্যাম, সার্ট ও প্যাণ্টালুন পরিয়া এবং হাতের উপর কলার নেকটাই ও কোট ঝুলাইয়া। অমর তাহার পানে চাহিয়া বলিল, এই যে বাবু, বোসো।

ঘনশ্যাম বসিল না। বলিল, না মহারাজ, বসবো না। বড় তাড়াতাড়ি। একটু কষ্ট করতে হবে। আমায় ভালো ক'রে নেকটাইটা যদি বেঁধে দেন। আপনার স্কার্ফপিনটাও আজ ধার দিতে হবে।

অমর ঈষৎ হাসিয়া বলিল, আজ এত আয়োজন, ব্যাপার কি বাবু ?

ঘনশ্যাম বোকার মত হাসিতে লাগিল। বলিল, রাত্তিরে সব বলবো, আগে ঘুরে আসি।

অমর ঘনশ্যামের নেকটাই বাঁধিয়া দিল। তারপর যথাস্থানে পিনটি গুঁজিয়া দিয়া টেবিলের ড্রয়ারের মাঝ থেকে আয়না বাহির করিয়া তার সুমুখে ধরিয়া বলিল, দ্যাখো, পছন্দ হয়েছে ?

ঘনশ্যামের মুখে হাসি আর ধরে না। খুব ভালো

হয়েছে। চমৎকার হয়েছে! সাধে আর মহারাজের কাছে আসি!

ঘনশ্যাম ঘোষের আকৃতির সহিত তার বিদ্যাবুদ্ধির অতি আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য ছিল। তার চোখ ছোট, নাক চাপা, বর্ণ মসীনিন্দিত, আকার দীর্ঘ। তার শীর্ণ মুখের উপর প্রকাণ্ড একজোড়া গোঁফ। মনে হইত, সেই সুপ্রচুর গুম্ফগুচ্ছ ধারণ করিবার জন্যই বিধাতা তার দেহ-যষ্টিটি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অমর তাহাকে 'বাবু' বলিয়া ডাকিত বলিয়া অমরকে ঘনশ্যাম 'মহারাজ' আখ্যা দিয়াছিল।

তুষারের বাড়ি ছাড়িয়া বোর্ডিংএ আসার পর থেকে ঘনশ্যাম ঘন ঘন অমরের ঘরে যাতায়াত করে। ঘনশ্যামও সেই বোর্ডিংএ থাকে। অতি তুচ্ছ ব্যাপারেও সে অমরের পরামর্শ গ্রহণ করে, নিমন্ত্রণ থাকিলে তার সাজ-সজ্জা কর্জ্জ করে এবং তারই সাহায্যে শূন্য তহবিলও মাঝে মাঝে পূর্ণ করিয়া লয়। ঘনশ্যাম একটি মাত্র জাপানী পরিবারের সহিত পরিচিত। সেখানে সে প্রায়ই যায়। অমর ভাবিল, আজও এত সাজসজ্জা করিয়া সে সেখানেই গিয়াছে।

সেদিন সন্ধ্যার পর অমরের ঘরে মস্ত আড্ডা জমিয়া গেল। সিগারেট ও পাইপের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার। সেই রুদ্ধদ্বার ঘরের মাঝে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চালিত তুমুল আলোচনার শব্দ বোর্ডিং পার হইয়া আশপাশের বাড়িতেও পৌঁছিতেছিল। ইতিমধ্যে ঘনশ্যাম আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়া অমর বলিল, এই যে বাবু, এস!

নৃপেন তাহার পানে চাহিয়া অমরের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল, আরে বোসো বোসো! বাঃ বাঃ আজ যে ভারি খাপ্‌সুরত দেখাচ্ছে হে। কোন্ দিগ্বিজয় করে' এলে?

ঘনশ্যাম বিরক্ত হইল। কহিল, তুমি আমাকে 'বাবু' বলো কেন? 'বাবু' বলবেন খালি মহারাজ!

নৃপেন বলিল, বেশ বেশ! তা শ্যাম, আজ কোন্ বৃন্দাবনে গিয়েছিলে? কাকে মজিয়ে এলে?

ঘনশ্যাম কহিল, সে খোঁজে তোমার দরকার?

নৃপেন বলিল, ওঃ তবে বুঝি গরু চরাচ্ছিলে?

ঘনশ্যাম নৃপেনের পানে একটা কুপিত দৃষ্টি হানিল, কিছু বলিল না।

অমর বলিল, আঃ নৃপেন। কেন ওকে বিরক্ত করছো? আমাদের আলোচনাটা যে মাঠে মারা গেল।

তখন আবার আলোচনা সুরু হইল। আজ যদি ভারতবর্ষ রিপাব্লিক হয় তাহা হইলে প্রেসিডেন্ট কে হইবে এই ছিল আলোচনার বিষয়। কেহ বলিতেছিল, টিলক, কেহ বলিতেছিল গোখলে, কেহ বলিতেছিল বরোদার মহারাজা, কেহ বলিতেছিল অরবিন্দ। ঘনশ্যাম হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আরে প্রেসিডেন্ট হওয়া কি শক্ত, ও আমিও হতে পারি! পার্লামেন্ট থাকবে ত, সেখানে গিয়ে বল্‌বো, জেন্ট্‌লমেন......

নৃপেন ধমক দিয়া বলিল, আরে থামো থামো! বোকার মত বোকো না।

কি?—বলিয়া ঘনশ্যাম জ্যামুক্ত তীরের মত দাঁড়াইয়া উঠিল। ঘরের কোণ হইতে চকিতে সে অমরের একটা মুগুর তুলিয়া লইল, তারপর মাথার উপর উহা আস্ফালন করিতে করিতে অঙ্গভঙ্গী সহকারে বলিতে লাগিল, কি! আমায় অপমান? আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন! এই মুগুরের ঘায়ে তোমার মাথা চূর্ণ করে' দোবো! ফাঁসি যেতে হয় সো ভি আচ্ছা! এত বড় অপমান! আমায় বোকা বলা! এ আমি সইব না, ককখনো সইব না!......

ঘনশ্যামের এই বীরত্বের অভিনয়ে সকলে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। তার শীর্ণ দেহ, সূচ্যগ্র গুম্ফ, কাঁধের উপর গুরুভার মুগুর এবং লম্ফঝম্ফ দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠিল। তালপাতার সেপাইটা বলে কি! নৃপেনের মত হৃষ্টপুষ্ট বলবান লোকের মাথা ফাটাইতে চায়?

তার দৃপ্ত ভঙ্গিমায় কেহ অভিভূত হইল না। কেহ কোনো কথা বলিতেছে না দেখিয়া সে নৃপেনের পানে চাহিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, উঠে এস। দেখি একবার। বসে' রইলে কেন?

নৃপেন ধীরে ধীরে উঠিল। উঠিয়া গায়ের কোট খুলিয়া চেয়ারের উপর রাখিল। তারপর সার্টের আস্তীন গুটাইয়া ধীর পদক্ষেপে ঘনশ্যামের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

মুহূর্তে ঘনশ্যামের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে নৃপেনের পানে তাকাইয়া সহজকণ্ঠে বলিল, তুমি আমায় অপমান করলে কেন?

নৃপেন বলিল, কি অপমান?

ঘনশ্যাম বলিল, বোকা বল্লে কেন?

নৃপেন বলিল, বোকা বল্লুম কোথা? 'বোকার মত' বলেছি।

ঘনশ্যাম বলিল, অ? তাই না কি? তাহলে আমার কিছু বলবার নেই।

বলিয়া সে মুগুর নামাইয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যাইতে যাইতে সে শুনিতে পাইল ঘরের মধ্যে তুমুল হাসির ঝড় উঠিয়াছে।

সেদিনকার সভাভঙ্গের এক ঘণ্টা পরে অমর আহারে বসিয়াছে এমন সময় ঘনশ্যাম পুনরায় আসিয়া উপস্থিত। অমর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের পানে তাকাইতে সে বলিল, আজকের ব্যাপারটা আপনাকে বলতে এলুম।

অমর বলিল, কি ব্যাপার?

ঘনশ্যাম বলিল, ভুলে গেছেন? সেই যে আজ আমি বেড়াতে গেছলুম।

অমর বলিল, অ। ঠিক ঠিক। বোসো।

ঘনশ্যাম বসিল। কিছুক্ষণ পরে সে বলিল, সেই যে মন্তরটা আপনি শিখিয়ে ছিলেন, সেই মন্তরটা আজ......

অমর অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মন্তর? কিসের মন্তর?

ঘনশ্যাম ঈষৎ লজ্জিতমুখে বলিল, সেই যে, 'বর্‌বোঁ'।

অমর একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, ঠিক ঠিক, ভুলেই গিয়েছিলুম।

ব্যাপারটা বুঝাইয়া বলা দরকার।

বোর্ডিংএ পৌঁছিবার পরদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে অমর জানালার ধারে বসিয়া ছিল এবং তার পাশেও বসিয়া ছিল ঘনশ্যাম। জানালা হইতে নীচেকার পথ বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। সহসা ঘনশ্যাম দেখিল এক সুন্দরী নারী পথ চলিতে চলিতে উপরের জানালার পানে তাকাইতেছে। অমর একটু হাসিয়া হাতটা মাথায় ঠেকাইতেই সেই সুন্দরীও অমরকে প্রতিনমস্কার করিল।

ঘনশ্যাম অবাক হইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, ও কি? আপনি মেয়েটিকে চেনেন না কি?

অমর এই প্রশ্নে অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিল। মেয়েটি ওহানা, সে-কথা অমর ঘনশ্যামকে বলিল না। গম্ভীরমুখে বলিল, নাঃ চিনি না!

ঘনশ্যাম বলিল, তাহলে আপনাকে দেখে নমস্কার করলে যে।

অমর বলিল, হুঁঃ তোমায় বলি, আর তুমি ফাঁস করে' দাও আর কি!

ঘনশ্যাম বলিল, না না, বলবো না। সত্যি বলছি, মাইরি। এই আপনার গা ছুঁয়ে বল্লুম।

বলিয়া অমরের গাত্র স্পর্শ করিল।

অমর চারিদিকে চাহিয়া ফিশ্‌ফিশ্‌ করিয়া বলিল, মন্তর জানি।

ঘনশ্যাম বলিল, অ্যাঁ। মন্তর? বলেন কি?

অমর বলিল, হ্যাঁ।

ঘনশ্যাম মিনতির সুরে বলিল, আমায় শিখিয়ে দিন না!

অমর জিভ কাটিয়া বলিল, বলো কি হে। মন্তর কি যাকে তাকে শেখানো যায়?

ঘনশ্যাম পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। অমরও কিছুতেই বলিবে না। শেষে অমর বলিল, মন্তর অতি সামান্য, কিন্তু তুমি কি তা ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারবে? জানো ত, মন্তরের উচ্চারণই সব, নইলে ফল পাওয়া যায় না।

ঘনশ্যাম বলিল, আমি শিখবো। বলুন না মন্তরটি কি?

অমর মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল, মন্ত্র শিখিবার আগ্রহাতিশয্যে ঘনশ্যাম তাহা লক্ষ্য করিল না।

অমর বলিল, মন্তর হচ্ছে......বলিয়া একটু থামিল, তার পর বলিল, 'বরবৌ'।

কথাটিকে সে একটু বেশ টান দিয়া উচ্চারণ করিল।

ঘনশ্যাম বলিল, কেবল একটি কথা?

অমর বলিল হ্যাঁ। কিন্তু কথাটি ত কিছু নয়, এখন ঠিক উচ্চারণ করো দেখি। বলো, বরবৌ।

ঘনশ্যাম সোৎসাহে বলিল, বরবৌ।

অমর বলিল, উঁহুঃ, হল কৈ? বল্লেই হল, বলা কি এত সহজ? আমি পাঁচ বছর অভ্যেস করে' যা শিখলুম, তুমি এক মিনিটে তা শিখে নেবে?

ঘনশ্যাম বলিল, কেন, আপনি যেমন দেখালেন, তেমনি ত বল্লুম!

অমর বলিল, তাই না কি? এইবার শোনো দেখি কেমন করে' বলি। বলিয়া পূর্ব্বের উচ্চারণ-ভঙ্গী ঈষৎ বিকৃত করিয়া বলিল, বরবৌ।

ঘনশ্যামও তেমনি করিয়া বলিল, বরবৌ।

না হে না, ও রকম নয়, এমনি—বলিয়া অমর উচ্চারণ-ভঙ্গিমা আবার ঈষৎ বদল করিয়া বলিল, বরবৌ।

ঘনশ্যাম বিব্রত হইয়া উঠিল। তার উচ্চারণে একটু গলদ থাকিয়াই যায়। কিন্তু তার অদম্য উৎসাহ। নারী জয় করিবার একটা অমোঘ অস্ত্র সে লাভ করিতে চলিয়াছে ভাবিয়া সেই মন্ত্রকে আয়ত্ত করিবার জন্য তার চেষ্টার আর অন্ত রহিল না।

ঘণ্টাখানেক তাহাকে ভুগাইয়া অমর বলিল, হ্যাঁ, এইবার কতকটা হয়েছে! খুব অভ্যেস করতে থাকো।

ঘনশ্যামের সহিত অমর কৌতুক মাত্র করিয়াছিল। সে যে ঠাট্টা না বুঝিয়া সেদিন দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উদ্ভট মন্ত্রের গুণ পরখ করিবার জন্য তোকিওর পথে পথে সুন্দরী নারীর পিছু পিছু ঘুরিয়াছে তাহা শুনিয়া অমর স্তম্ভিত হইয়া গেল।

ঘনশ্যাম বলিল, আপনার মন্ত্রের যে জোর আছে তার আর সন্দেহ নেই, মহারাজ। দু' একটি মেয়ে মন্ত্র শুনে আমার দিকে কেমন করে' যে তাকিয়েছিল তা আর আপনাকে কী বলবো। মন্ত্র উচ্চারণ এখনো ঠিকমত করতে পারি না, নইলে তারা নিশ্চয় আমার সঙ্গে আসতো। আমাকে আর একটু তালিম করে' দিতে হবে।

অমর সংক্ষেপে বলিল, আচ্ছা, সে হবে 'খন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে একদিন সকালবেলা ঘনশ্যাম হুড়মুড় করিয়া অমরের ঘরে আসিয়া উপস্থিত। তার মুখ পাংশুবর্ণ, ভীতিবিহ্বল। অমরের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিতে লাগিল, মহারাজ! আমায় রক্ষে করুন, বাঁচান! সে এল বলে'।

অমর কিছুই বুঝিতে পারিল না। বিরক্ত হইয়া বলিল, ব্যাপার কি খুলেই বলো না ছাই।

ঘরের বাহিরে বারান্দায় সম্মিলিত পুরুষ ও নারী-কণ্ঠের একটা অনুচ্চ কলরব শুনিতে পাইয়া অমর কম্পমান ঘনশ্যামকে চেয়ারে বসাইয়া দ্বার খুলিয়া দেখিল, বোর্ডিং-এর কর্ত্তা পরিচারিকা-পরিবৃত হইয়া কি একটা আলোচনা করিতেছে। একজন পরিচারিকার হাতে একখানা আনাজ কুটিবার বড় ছুরি। রাগে সে গর্ গর্ করিতেছে, আর বলিতেছে, ঐ ভারতীয় লোকটাকে আমি মারিয়াই ফেলিব, সে আমাকে অপমান করিয়াছে।

জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া অমর শুনিল, সেদিন সকালবেলা ঐ চাকরাণী ঘনশ্যামের ঘর ঝাঁট দিতে গিয়াছিল। ঘনশ্যামের আদেশ সে বুঝিতে পারে নাই, কারণ তার জাপানী জাপানীরা বুঝিতে পারে না। ফলে ঘনশ্যাম রুষ্ট হইয়া বিজাতীয় ভাষায় তাহাকে গালি দিয়া তার ঘাড় ধরিয়া ঘরের বার করিয়া দিয়াছে।

অনেক কষ্টে বুঝাইয়া সুঝাইয়া অমর চাকরাণীকে শান্ত করিল। কিন্তু সে ইহাও বুঝিল, গোঁয়ারগোবিন্দ নির্বোধ ঘনশ্যামের একটু শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন। তাই সে গম্ভীরমুখে আসিয়া ঘরে ঢুকিল। তাহাকে দেখিয়া ঘনশ্যাম শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হল মহারাজ? ও আসচে না কি?

অমর বলিল, না আপাতত আসবে না। তবে দ্যাখো, একটা কথা বলে' দিই। ঝি-চাকর ধরে' ঠেঙানো বাংলাদেশের রীতি হতে পারে, কিন্তু এখানে সে-রীতি চালাতে গেলে বিশেষ বিপদে পড়বে। জাপান দেশটা জাপান, বাংলা নয়, এ কথাটা মনে রেখো। দেশে যখন সাহেবের লাথি খাও, তখন মুখ বুজে বেমালুম হজম করো। ওদিকে কারণে অকারণে দেশের গরীব লোকেদের ওপর, যাদের আমরা বলি ছোটলোক—অন্যায় জুলুম করো। আমরা নিজেকে সম্মান করতে শিখিনি, তাই পরকেও সম্মান করতে পারি না। অথচ আত্মসম্মান যেখানে আঘাত করতে বলে সেখানে হাত ওঠে না, ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকি। তোমার সঙ্গে আমি আর কোনো সংস্রব রাখতে চাই না। আমি সব সহ্য করতে পারি, কাপুরুষতা সহ্য করতে পারি না।

ঘনশ্যাম বলিল, কিন্তু ও আমার কথা শুনলে না কেন?

অমর বিরক্ত হইয়া বলিল, তোমার কথা বুঝতে পারলে ত শুনবে। যাক আর তর্ক কোরো না। এখন ঘরে যাও।

ঘনশ্যাম কিন্তু ঘর হইতে বাহির হইল না। সে বলিতে লাগিল, উহাদের বিশ্বাস নাই, হয়ত কখন আসিয়া খুন করিবে!

অমর তখন বলিল, তাহলে এক কাজ করো। আজই তল্পিতল্পা নিয়ে য়োকোহামা চলে' যাও। তারপর এর পরের জাহাজে আমেরিকা রওনা হও।

ঘনশ্যাম কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, সে কি করে' হবে মহারাজ। টাকা কোথায় পাবো।

অমর বলিল, তার ভার আমি নিলুম।

ঘনশ্যাম সত্যসত্যই আমেরিকা পাড়ি দিল।

২১

খোঁপার ফুল

ওয়ুকির বাড়ি ছাড়িয়া অমর চলিয়া যাইবে শুনিয়া ওহানা বিস্ময় অনুভব করিল। এই সেদিন পর্য্যন্ত অমরের সহিত কথাবার্ত্তায় আভাসে ইঙ্গিতেও সে ইহার বিন্দুবিসর্গ টের পায় নাই। এই অত্যল্প কালের মধ্যে এমন কি ঘটিল, যার জন্য এমন হঠাৎ এ বাড়ি ত্যাগ করা প্রয়োজন হইল, এই প্রশ্ন ওহানার মনে উদয় হইলেও মুখে সে তাহা প্রকাশ করিল না, কারণ সেটা অভব্যতা হইতে পারে। একটা কোনো গূঢ় কারণ নিশ্চয়ই আছে এইটুকু মাত্র সে বুঝিয়া রাখিল।

পত্নী-নির্য্যাতক ছুতারের প্রতি দারুণ ঘৃণায় অমরের মন ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাই নিকটবর্ত্তী বোর্ডিংএ উঠিয়া যাওয়া তাড়াতাড়ি স্থির করিয়া ফেলিয়া সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে আশা করিয়াছিল। কিন্তু তাহা হইল কৈ? অতঃপর ওহানার সঙ্গে আর ঘনঘন সাক্ষাৎ হইবে না, এই চিন্তায় তৃপ্তির পরিবর্ত্তে মনের মাঝে বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া উঠিল। তার মনে হইল, সে বেশ সুখে ছিল, এবং সেইখানেই বরাবর থাকিতে পারিত, কেবল ঐ দুর্বৃত্ত ছুতারটার জন্য পারিল না। যতই এই কথা ভাবে ততই ছুতারের উপর তার ক্রোধের মাত্রা বাড়িয়া যায়।

নিজের সুবিধা-অসুবিধার দিক দিয়া অমর ব্যাপারটার বিচার করিতেছিল, কিন্তু ছুতারের আচরণেরও যে একটা হেতু থাকিতে পারে, সে-কথা তার মনেই পড়িল না।

বোর্ডিংএ যাইবার দিন স্থির করিয়া সে ওহানাকে জানাইল এবং মামুলি ভাষায় সেখানে বেড়াইতে যাইবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিল। ওহানা সংক্ষেপে ধন্যবাদ জানাইল, কিন্তু সে আসিবে কি না, সেকথা স্পষ্ট করিয়া অমর জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ পাইল না। ওয়ুকি অত্যন্ত গম্ভীর ও বিষণ্ণ হইয়া আছে, বাস-পরিবর্ত্তনের আয়োজন উদ্‌যোগ ও ব্যস্ততা সামান্য নয়, ওহানার সহিত নিভৃতালাপ কিরূপে সম্ভব?

বোর্ডিংএ আসিবার পর কিছুকাল উত্তীর্ণ হইল অথচ ওহানা আসিল না। সম্মুখের পথ দিয়া প্রায় প্রত্যহই সে ওয়ুকির বাড়ি যায়, অমর দোতালার কক্ষের বাতায়নে বসিয়া তাহাকে দেখে। তার আশা হয়, ওহানার পা-দুখানি বোর্ডিংএর সম্মুখে ঘুরিয়া গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবে, ছুটিয়া নামিয়া গিয়া অমর তাহাকে অভ্যর্থনা করিবে, কিন্তু তাহা হয় না, ওহানা পথের বাঁক ঘুরিয়া চলিয়া যায়। অমর তৃষিতনয়নে তার পানে চাহিয়া থাকে। ক্রমে তার মূর্ত্তি অস্পষ্ট হইয়া আসে, কেবল দেখা যায় তার কালো কবরী এবং তার উপর একটি রঙিন ফুল, তারপর তাও অদৃশ্য হয়। অমর তখন বসিয়া বসিয়া কল্পনয়নে দেখিতে থাকে, ওহানা ওয়ুকির বাড়ি পৌঁছিল, তার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, মৃদু হাসিয়া তাহাকে নমস্কার করিল, তারপর জানুর উপর ভর দিয়া বসিয়া কর-কমল তপ্ত হিবাচির উপর প্রসারিত করিয়া ধরিল। অমরের ইচ্ছা করে পোষাক পরিয়া ছুটিয়া বাহির হয়, ক্ষণকালের জন্যও ওহানার পাশে গিয়া বসে। অমনি মনে পড়ে, এই সেদিন সেখান থেকে চলিয়া আসিয়াছে, কোন্ সূত্রে এত সত্বর সেখানে যাইবে? ওয়ুকি ভাবিবে কি? তারপর ধীরে ধীরে ছুতারের মুখখানা মনের মাঝে ভাসিয়া উঠে। তখন মনে হয়, দিন বেশ কাটিতেছিল, ঐ লোক-টাই উৎপাত ঘটাইল, ঐ বেটাই যত অনিষ্টের মূল, ও নিপাত যাক!

কয়েকদিন নিরন্তর মনের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে অমর সঙ্কোচকে পরাভূত করিল। এপ্রিল মাসের অপরাহ্ন, বসন্ত আসন্ন, দুদিন পরেই সাকুরা * ফুটিবে অথচ শীত প্রচণ্ড। বেশভূষা করিয়া সে ওয়ুকির গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। দ্রুতপদে চলিয়াও সে শীতের প্রকোপ এড়াইতে পারিল না। শীত তাহার মোটা ওভারকোট ও গরম পোষাক ভেদ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে যেন বিঁধিতে লাগিল। তার মুখ বাঙা হইয়া উঠিল, দস্তানা-আঁটা হাত-দুখানা কোটের পকেটে পুরিয়াও সে শান্তি পাইল না।

ওয়ুকির গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া আবার তার সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। মনে হইল, কাজ নাই, ফিরিয়া যাই, না আসিলেই ভালো ছিল! কিন্তু একটি মাত্র ভঙ্গুর দ্বারের ব্যবধান ঘুচিলেই সে ওহানার সাক্ষাৎ পাইবে, তার কমকণ্ঠ শুনিতে পাইবে, এই লোভ তাহাকে সবলে সম্মুখে ঠেলিয়া দিল, কিছুতেই ফিরিতে দিল না। গোমেন-নাশাই † বলিয়া সে দ্বার ঠেলিল, সঙ্গে সঙ্গে ঘরের কাগজের পর্দ্দা সরাইয়া হাসিমুখে ওহানা তাহাকে নমস্কার করিয়া বলিল, আসুন।

ঘরের মধ্যে ওহানা একলা, তুষার ছিল না।

ওহানা বলিল, যুকিসান কার্য্যান্তরে বাইরে গেছেন। অগত্যা তাঁর হয়ে আমিই আপনাকে অভ্যর্থনা করছি!

অমর তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিল। বাঁচা গেছে! ওয়ুকি নাই! থাকিলে সব মাটি হইত!

কুশলপ্রশ্নাদির পর ওহানা বলিল, আপনার ওখানে যেতে পারিনি, আপনি কি ভাবছেন জানি না!

* চেরি ফল। † ইহার ইংরেজি Excuse me, বাংলায়, আসতে পারি? অর্থ হয় ত করা যায়।

অমরের অভিমান হইল। সে বলিল, কেন, জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

ওহানা কুণ্ঠিতভাবে বলিল, কি জানেন...ছেলেদের বোর্ডিংএ যাওয়াটা......

অমর ভাবিল, তাই ত! ঠিক কথা! আশ্চর্য্য এ কথাটা তার মোটেই মনে পড়ে নাই! ভদ্রঘরের মেয়ে, ছেলেদের বোর্ডিংএ হট্ করিয়া ওঠে কি প্রকারে? তবে কি করা যায়? আবার তার মনে হইল, এখানে বেশ ছিল, ছুতার বেটাই সব মাটি করিয়াছে।

অমরকে নিরুত্তর দেখিয়া ওহানা কহিল, রাগ করলেন না কি? আমার অবস্থাটা.....

অমর বাধা দিয়া বলিল, না না রাগ করবো কেন? আমার ভাবা উচিত ছিল! সত্যিই ত আপনি ওখানে যেতে পারেন না।

ক্ষণকাল কেহ কোনো কথা কহিল না। ওহানা সেলাই করিতে লাগিল, অমর নতমুখে তার আস্তীনটা ধরিয়া নাড়িতে নাড়িতে কি ভাবিতে লাগিল সেই জানে।

নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ওহানা বলিল, সাকুরা ফোটবার সময় হয়ে এল। আপনার সাকুরা ভালো লাগে?

অমর বলিল, ভালো লাগে? তার তুলনা কোথায়? জাপানে তিনটি জিনিসের তুলনা খুঁজে পাই না। তার দেশভক্তি, তার সাকুরা, আর তার নারী।

ওহানা হাসিল। বলিল, দেখছি সব বিষয়েই আপনার ধারণা এরি মধ্যে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে!

অমর বলিল, হাঁ। অন্তত যা বল্লুম তাতে কোনো সংশয় নেই।

ওহানা কহিল, এবার ফুল দেখতে যাবেন?

অমর কহিল, আপনি যাবেন আমার সঙ্গে?

ওহানা বলিল, আমি?

অমর বলিল, হাঁ আপনি। কেন, আমার সঙ্গে যেতে ইচ্ছে করে না বুঝি?

ওহানা বলিল, অনিচ্ছের কি লক্ষণ দেখলেন?

অমর বলিল, তাহলে যাবেন?

ওহানা দুষ্টামি করিয়া বলিল, কখন সে কথা বল্লুম?

অমর ওহানার আস্তীনটা চাপিয়া ধরিয়া তার মুখের পানে চোখ তুলিয়া মিনতির সুরে কহিল, না, বলুন যাবেন?

ওহানা বলিল, এখুনি বলতে হবে?

অমর বলিল, হাঁ। এখুনি।

ওহানা বলিল, তাহলে আচ্ছা।

অমরের চোখমুখ অকৃত্রিম আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিল।

ওহানা সস্নেহে অমরের পানে তাকাইয়া কহিল, বোচান—খোকা!

ওহানা সেলাই করিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া অমর তার হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল, আজ আর সেলাই নয়। ও-সব তুলে রাখুন।

ওহানা জিজ্ঞাসা করিল, তবে?

অমর বলিল, গল্প করুন।

কিসের গল্প?

কেন, আপনার বাড়ির গল্পই বলুন না। এখনো ত শোনা হয় নি!

বাড়ির গল্প?

ওহানার মুখ ম্লান হইয়া উঠিল। নিশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল, আমার বাড়ির গল্প বড় দুঃখের। তাই আপনাকে এতদিন বলিনি।

অমর ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল, যদি কষ্ট হয় তবে বলে' কাজ নেই। কিন্তু যদি আমি আপনার দুঃখের ভাগ চাই, আপত্তি আছে কি?

ওহানা বলিল, না না, আপত্তি কিসের? বেশ ত বলছি, শুনুন।

ওহানা তার ঘরের কথা বলিতে সুরু করিল। বাপ মা, দুই ভাই এক বোন পাঁচ জন লইয়া সংসার। ওহানা সবার ছোট।

মানীর বংশ। কারণ তারা সামুরাই—ক্ষত্রিয়। জাপানের কুলীন। পিতামহের ব্যবসা ছিল অসিচালনা, পিতা অসি ছাড়িয়া মসি ধরিয়াছিলেন। তিনি স্কুল-মাষ্টার।

ভাই-দুটি কি শক্তিসামর্থ্যে কি বিদ্যাবুদ্ধিতে কিছুতেই কম ছিল না। বড় ভাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লইয়া ব্যাঙ্কের কাজে লাগিয়াছিল। ছোটটি হাইস্কুলের পড়া শেষ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু তা আর হইল না।

রুষের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ বড় সহজ কথা নয়! দৈত্যের সঙ্গে বামনের লড়ায়ের মত! জাপান সর্ব্বস্ব পণ করিয়া যুদ্ধে নামিল, কারণ যুদ্ধে হারিলে তার অস্তিত্বও থাকিবে না।

যুদ্ধে যারা যায় তারা আর ফেরে না, এমনি বিষম লড়াই! কেবল খবর আসে আরো লোক পাঠাও—আরো পাঠাও! গুলিগোলার মত অসংখ্য লোক যুদ্ধে খরচ হইতে লাগিল।

অনেক যুদ্ধ জয় হইল অনেক লোকের মরণে—শেষে আসিল পোর্ট-আর্থার। সে-লড়াই আর জিত হয় না, কিন্তু না জিতিয়াও ত উপায় নাই! লোক পাঠাও, আরো লোক, আরো লোক! মড়ার পাহাড় তৈরি না হইলে পাথরের পাহাড় বাগ মানে কৈ!

সেই ডাকে তার ভাই দুটিকেও যাইতে হইল। সঙ্গে সঙ্গে আরও কত বোনের কত ভাই গেল তার কি আর ঠিক আছে? তারা সব গেল একেবারে দেশের ঋণ চুকাইয়া দিয়া—সেই যে গেল আর ফিরিল না। পোর্ট-আর্থারে পাথরে তুষারে আর দেশভক্তের অস্থিতে একেবারে মাখামাখি কোলাকুলি চলিতে লাগিল!

ওহানা চুপ করিল।

অমর জিজ্ঞাসা করিল, তারপর?

ওহানা বলিল, তারপর আর কি! দেখতে দেখতে আমার চোখের সুমুখে মা-বাবার চুল সাদা হয়ে উঠলো, মুখের হাসি ফুরুলো, তাঁরা বুড়ো হয়ে গেলেন বুড়ো বয়সের অনেক আগেই!

গভীর সহানুভূতিতে অমর বলিল, আহা!

কিছুক্ষণ দুজনে স্তব্ধ হইয়া রহিল। শেষে অমর বলিল, আপনার মা-বাবার সঙ্গে পরিচয় থাকলে মাঝে মাঝে গিয়ে তাঁদের সঙ্গ দিতে পারতুম!

ওহানা বলিল, ধন্যবাদ। কিন্তু তা ত হবার উপায় দেখি না।

অমর জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

ওহানা এইবার হাসিল। বলিল, তাঁরা সেকেলে মানুষ......আমাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছেন যদিও...... তবুও হয় ত তাঁদের সঙ্গে পরিচয়ের পূর্ব্বে আমার সঙ্গে আপনার পরিচয়টা .....

অমর বাধা দিয়া বলিল, অ! বুঝেচি!

ওহানা বলিল, কিছু মনে করবেন না যেন!

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অমরের উঠিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সে ভাবিল, সে আছে বলিয়াই হয় ত ওহানা বাড়ি ফিরিতে পারিতেছে না। তারপর, যে-কোনো মুহূর্ত্তে ওযুকি ফিরিয়া আসিতে পারে, তার ফেরার আগেই বিদায় লওয়া ভালো।

অগত্যা অমর উঠিল। দাওয়ার তলায় দাঁড়াইয়া সে জুতা পরিতে লাগিল, উপরে ওহানা দাঁড়াইয়া রহিল।

জুতা পরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেই ওহানার খোঁপাটি তার চোখে পড়িল। তার উপর কৃত্রিম একগুচ্ছ সাকুরা শোভা পাইতেছিল।

অমর কহিল, দেখচি আপনার খোঁপায় এরি মধ্যে বসন্তের অগ্রদূত এসে পৌঁছেচে! বলিয়া মাথা হেলাইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই ওহানা তার কাঁধে হাত দিয়া নিবারণ করিয়া কহিল, দাঁড়ান। তারপর খোঁপা

হইতে ফুলটি খুলিয়া লইয়া অমরের কোটের কলারে পরাইয়া দিল।

ওহানার গোলাপী হাত-দুখানি ক্ষণেকের জন্য তার অধরের সন্নিকটে আসিয়া আবার দূরে সরিয়া গেল।

যাইতে যাইতে অমর বলিল, অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু ফুলটি আপনার খোঁপাতেই ছিল ভালো।

ওহানা বলিল, না। যেখানে তার স্থান সেখানেই রেখে দিলুম!

২২

হয় মৃত্যু নয় স্বাধীনতা

শেষ টোটা ছুড়িয়া তপ্ত বন্দুকটা হাতে লইয়া অমর ভূমিশয্যা ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। আশপাশের জাপানীরা নিম্নস্বরে তাহারই সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল।

একজন বলিল, ওস্তাদ! পাকা হাত! দশটার মধ্যে নটা গুলি অব্যর্থ হতে বড় একটা দেখা যায় না!

অপর জন জিজ্ঞাসা করিল, কোথাকার লোক?

উত্তরে তৃতীয় ব্যক্তি কহিল, য়ুরোপের লোক হবে, বোধ হয় ইংরেজ।

শুনিয়া য়ুনিভার্সিটির এক ছাত্র বলিল, না না, আমি জানি ও ভারতবর্ষের লোক, য়ুনিভার্সিটিতে পড়ে।

সন্দেহ প্রকাশ করিয়া অপর একজন কহিল, ক্ষেপেছ? ভারতবর্ষের লোক? এত ফর্সা?

তখন অন্যজন কহিল, খাঁটি নয়, খুব সম্ভব দো-আঁশলা!

বন্দুকের নল সাফ করিতে করিতে সমস্ত কথাই অমর শুনিতে পাইলেও কিছুই শুনিতে বা বুঝিতে পারিতেছে না এমনি ভাব দেখাইল।

ক্ষণকাল পরে মুখ ফিরাইতেই দেখিতে পাইল, ভিড়ের মধ্যে কিবি দাঁড়াইয়া আছে। এখানে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে অমর আশা করে নাই। তার ভারি কৌতুক বোধ হইল।

অমরের সহিত দৃষ্টি বিনিময় হইতেই কিবি কহিল, হাল্লো মুকার্জি! তুমি যে এত ভালো বন্দুক ছুড়তে পারো তা ত জানতুম না!

অমর ঈষৎ হাসিয়া বলিল, জানার জন্যেই ত আমাদের বাঁচা!

কিবি কহিল, ভাবতুম বাঙালীরা কেবল বুঝি কথাই বলে। এখন দেখছি......

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া অমর কহিল, তারা কিছু কিছু কাজও করে।

তারপর বন্দুক আগাইয়া ধরিয়া বলিল, Come and have a try!

কিবি ধন্যবাদ জানাইয়া কহিল, এখন নয়। আমার তাড়া আছে। রেসে যাচ্ছি। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, তুমি রেসে যাও না?

অমর কহিল, কখনো-সখনো। যদিও ঘোড়ায় চড়তে খুব ভালবাসি।

তোকিও শহরের উপকণ্ঠে ওমোরি নামক স্থান। ঘোড়দৌড়ের মাঠ এবং লক্ষ্যভেদের আস্তানা থাকায় সেখানে শহরের অনেক লোক আনাগোনা করে। গ্যালারিতে অল্প ব্যয়ে বন্দুক ও টোটা ভাড়া পাওয়া যায়। যাহার খুসি সেখানে গিয়া লক্ষ্যভেদ অভ্যাস করিতে পারে।

দেশে থাকিতে আগ্নেয়াস্ত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়-সাধনের কোনো সুযোগ অমর পায় নাই, কয়েকবার মাত্র বন্দুক চালনা করিয়াছিল, এই পর্য্যন্ত। শৈশবে গুরুজন-দের সঙ্গে সে মধ্যে মধ্যে পাখী-শিকার দেখিতে গিয়াছে। তখন প্রত্যুষ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রসদ বহন করিয়া এবং দুর্গম কাঁটাবন এবং ঝোপঝাড় ভেদ করিয়া নিহত পক্ষী আহরণ করিয়া অসীম গৌরব বোধ করিয়াছে। ক্ষুধাতৃষ্ণা বা শীতাতপের মত তুচ্ছ ব্যাপার তখন মনেই পড়ে নাই, তখন কেবল ইহাই মনে হইয়াছে সে-ও শিকারীদলেরই

একজন—সে কি কম কথা! তারপর বড় হইয়া অনেক সাধ্যসাধনার পর যেদিন সে প্রথম বন্দুক ছুড়িবার অনুমতি পাইল, সে-ও এক স্মরণীয় দিন—সে-দিনের কথা জীবনে ভুলিবার নয়।

শিশুহৃদয়ে আমরা কত সাধই পোষণ করি, কয়টাই বা জীবনে পূর্ণ হয়? জাপানে পৌঁছিয়া শৈশবের একটি প্রধান সাধ মিটাইবার সুযোগ অমর পাইল। অবসর পাইলেই সে ওমোরি গিয়া লক্ষ্যভেদ অভ্যাস করিত।

সেদিন বন্দুক-চালনা করিবার সময় অমরের অনতি-দূরে আর একটি যুবকও ঐ কাজে ব্যাপৃত ছিল। হাল-ফ্যাশানের মাকিন পোশাক-পরা সুশ্রী লোকটিকে দেখিয়া অমর আন্দাজ করিয়াছিল সে আমেরিকা-ফেরত সম্ভ্রান্ত বংশের চীনা যুবক।

গ্যালারি হইতে বাহির হইবার পথে লোকটি আসিয়া অমরকে অভিবাদন করিয়া তার হাত ধরিয়া প্রবল একটা ঝাঁকানি দিল। তারপর ঈষৎ নাকি সুরে চোস্ত ইংরেজিতে কহিল, আপনাকে অভিনন্দন করছি! আপনি খাসা বন্দুক ছোড়েন! ভারতবর্ষ ও চীনের লোক যত-দিন না জাপানীদের মত বন্দুক চালনায় রপ্ত হবে, ততদিন তাদের উদ্ধার নেই! বহুকাল আমরা দিবাস্বপ্ন দেখেছি, দর্শনের ধোঁয়ায় আমাদের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে গেছে। দর্শন সরিয়ে রেখে এখন বাস্তব জগতের দিকে তাকাবার সময় এসেছে!

অমরের পানে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কি মত?

অমর কহিল, দর্শনকে একেবারে ছেঁটে ফেলবার দরকার কি? বিজ্ঞান আর দর্শন এক সঙ্গে চলুক না!

চীনা যুবক জিজ্ঞাসা করিল, তা কি সম্ভব?

অমর কহিল, কেন নয়? আমার নিজের কথাই বলি, আমি স্বপ্ন নিয়েও খেলা করি, আবার বন্দুকও চালাতে পারি।

ষ্টেসনের দিকে চলিতে চলিতে দুজনে আলাপ জমিয়া উঠিল। চীনা যুবকটির নাম চ্যাং। সে আমে-রিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিশাস্ত্রের গ্রাজুয়েট। পাঠ সাঙ্গ করিয়া দেশে ফিরিবার পথে কিছুকাল জাপানে বাস করিতেছিল।

তোকিওগামী ট্রেনে উঠিয়া চ্যাং জিজ্ঞাসা করিল, জাপান লাগছে কেমন?

অমর কহিল, এক কথায় বলা যায় না। আপনি কোন্ বিষয় জানতে চান? ব্যক্তিগত হিসেবে জাপানী-দের আমার ভালই লাগে। তাদের সৌজন্য, অতিথি-বাৎসল্য এবং দেশপ্রীতি প্রশংসার যোগ্য।

চ্যাং বলিল, আমি জানতে চাইছি জাতিহিসাবে জাপানকে কেমন লাগে?

অমর বলিল, তাই বলুন। জাতিহিসাবে তারা একটু অ্যারোগ্যান্ট। অবশ্য এও মনে হয় রুষ-জাপান যুদ্ধ জিতে জাপানের মত ক্ষুদ্র জাতির পক্ষে সেরূপ হওয়া খুব অস্বাভাবিক নয়। এ থেকে ভাববেন না কিন্তু আমি জাতীয়তার দম্ভ পছন্দ করি।

চ্যাং জিজ্ঞাসা করিল, জাপান ভারতবর্ষকে শ্রদ্ধা করে কি?

অমর বলিল, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জাপানের জনসাধারণ সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তারা এইটুকু মাত্র জানে ভারতবর্ষ বুদ্ধ-দেবের জন্মস্থান। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তারা অনেক অদ্ভুত হাস্যকর ধারণা পোষণ করে। অবশ্য, এমন জাপানীও আছে যারা ভারতের বিশিষ্ট সভ্যতার অনুরাগী, কিন্তু তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য।

চ্যাং বলিল, কিন্তু জাপানীরা কি ভারতবর্ষের মঙ্গল কামনা করে? ধরুন, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করুক এমন কামনা কি তারা করে?

অমর বলিল, না, তা মনে হয় না। পরাধীন অধঃ-পতিত জাতির জন্যে তাদের মাথা ব্যথা নেই। তবে

জাপানী রাষ্ট্রীয় ধুরন্ধরেরা কেহ কেহ যে ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়া জয় করে' সেখানে জাপানী উপনিবেশ স্থাপন করতে চান, সে-কথা আমি শুনেছি। সমস্ত এসিয়াকে গ্রাস করবার তাঁরা স্বপ্ন দেখেন ইংলণ্ডের মত সাম্রাজ্যবাদের মোহে তাঁরা আবিষ্ট।

চ্যাং বলিল, আমারও তাই মনে হয়। জাপানের জাতীয়তা অ্যাগ্রেসিভ। তার সাম্রাজ্য-বিস্তারের ক্ষুধা রাক্ষসের মত, দুর্ব্বল জাতিকে গ্রাস করেই তার পরিতৃপ্তি!

ট্রেন তোকিওর সমীপবর্ত্তী হইল।

অমর বলিল, এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার মতদ্বৈধ নেই। এই ব্যাপারে জাপান ও য়ুরোপে কোনো প্রভেদ নেই। স্পেন মরক্কো গ্রাস করেছে, ফ্রান্স আল্‌জিয়ার্স গ্রাস করেছে, ইংলণ্ড ভারতবর্ষ ও মিশর গ্রাস করেছে, তেমনি জাপান কোরিয়া গ্রাস করেছে!

চ্যাং উৎসাহিত হইয়া বলিল, ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন! কিন্তু চীনের কথাটা ভুলবেন না। জাপান চীনকেও গ্রাস করবার আয়োজন করছে!

ট্রেন হইতে নামিয়া অমর কহিল, আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ায় খুব খুসি হলুম। একদিন আমার ওখানে আসবেন। এই আমার ঠিকানা। বলিয়া অমর চ্যাংকে একখানি কার্ড দিল।

চ্যাং অমরের করমর্দ্দন করিয়া ধন্যবাদ দিয়া নিজের কার্ড একখানি অমরকে দিল।

অমর বলিল, আমার বোর্ডিংএ সমস্তই চীনা ছাত্র, একজনও জাপানী নেই, অথচ এ পর্য্যন্ত কারও সঙ্গে আলাপ করবার সুবিধা হয়নি!

চ্যাং মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল, কিছু বলিল না।

অমর বলিল, হাসছেন যে?

চ্যাং বলিল, সে বোর্ডিংএ জাপানী একজনও নেই, কেন জানেন?

অমর বলিল, না। কেন বলুন ত?

চ্যাং বলিল, চীনাদের সংস্পর্শে এসে পাছে জাপানীর কৌলীন্য মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, সেই ভয়ে! চীনাদের সঙ্গে থাকা জাপানীরা পছন্দ করে না!

কথাটা শুনিয়া অমর স্তম্ভিত হইয়া গেল। একথা সে জানিত না। ইহা যে সম্ভব তাহাও কখনো কল্পনা করিতে পারে নাই। ক্ষণকাল পরে, সে ধীরে ধীরে, কতকটা আপনমনে বলিল, চীন, ভারতবর্ষ, কোরিয়া, মিশর—সবাই জগতে অপাংক্তেয়, অস্পৃশ্য!

চ্যাং উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, আর অস্পৃশ্য হয়ে থাকবো ততদিন, যতদিন না আমরা শক্তিমান হবো, স্বাধীন হবো! পরকালের চিন্তায় মগজকে ক্লিষ্ট করে' ইহকালের কথা ভুলে থাকলে এ দুর্গতি অনিবার্য্য! এ প্রকৃতির প্রতিশোধ! আমরা সকলের কৃপার পাত্র ঘৃণার পাত্র হয়ে থাকবো ততদিন, যতদিন না মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করে' দৃপ্তকণ্ঠে বলতে পারি—যেমন প্যাট্রিক হেনরি একদিন বলেছিলেন—Give me liberty or give me death!

—ক্রমশ
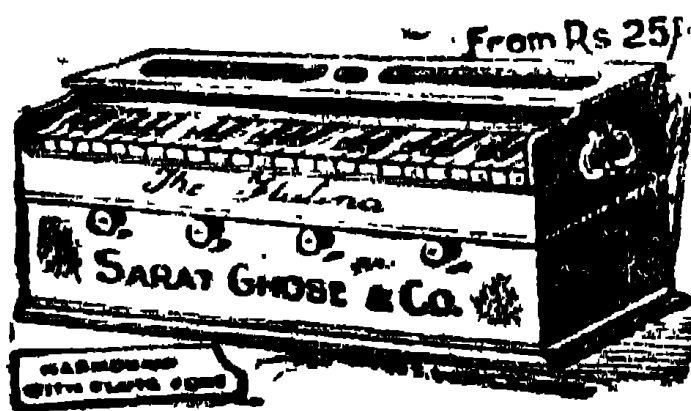
বীণা-বেণু

শ্রী যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

অযতনে ছিল বীণা ;—
সযতনে গুণী কোলে তুলে তারে কানে কহে কত কি না।
টানে টানে তার হৃদযতন্ত্রী কবিতেছে টন্ টন্,
দারুণ ব্যথায় শিরা উপশিরা ছিঁড়ে বুঝি ঝন্ ঝন্ !
সেই তারে ঘন অঙ্গুলি হানি গুণী বাজাইছে বীণ্,—
চন্ চন্ চন্ ছন্ ছন ছন্ ঝন্ ঝন্ ঝিন্ ঝিন্।
বাঁধন-বেদনে কাতরায বীণা, ওত উঠে সুব মিঠা ;
টানা তারে ঘন হানে 'মেবজাপ'—কাটাঘাযে নুন-ছিটা !
মৃণাল-ভুজেব কমল-আঙুল,—নিপুণ পবশে তাব—
ছট্ ফট্ কবে বীণাব তন্ত্রী যত খায় বাঁধামাব।
রিনি রিনি ঝিন্ ঝিন্,—
বিশ্বশুদ্ধ সুবিমুগ্ধ গুণী বাজাইছে বীণ্।

বেণুকুঞ্জেব বেণু ,—
পেযেছে বে আজ বংশীধারীব ফুল্ল অধব-বেণু।
ধ্বনিব পীড়ন বাজে বেণুহৃদে বিম্ব-ওষ্ঠ-পুটে,
বক্ষক্ষতের সাতমুখে তার সুবেব বক্ত উঠে !
অস্তশিখর ভেসে যায় সুরে, ছিটে লাগে নীলাকাশে
ফুটে উঠে তারা ; লুটে বনান্ত উহু উহু কুহুভাষে !
বেণুব বুকের আর্ত্তধ্বনি চাপি চাঁপা-অঙ্গুলে,
বংশীধারীব বাঁশীব আলাপে বিশ্বেব মন ভুলে।

কোবেছ কি মোরে বীণা-বেণু তব
পোড়েছে কি মোর পালা ?
তাই কি এ চোখে ফুবায না জল,
জুড়ায় না বুকে জ্বালা ?

রূপের অভিশাপ

—পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর—

শ্রী নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

দর বাড়াইবার জন্য কাসিমের সঙ্গে তর্কস্থলে যদিও গরীবুল্লা বসিরনকে একটা গুরুতর অন্তরায় বলিয়া দাঁড় করাইয়াছিল, তথাপি বাস্তবিক তার স্ত্রীকে সেরূপ অন্তরায় বলিয়া গণ্য করিবার তার কোনও হেতু ছিল না।

মেয়েমানুষকে আস্কারা দিলে যে তারা ঘাড়ে চড়িয়া বসে—এটা ছিল গরীবুল্লার নীতিশাস্ত্রের প্রথম সূত্র। তাই সে তার স্ত্রী বসিরনকে উঠিতে বসিতে শাসন করিয়া দুরন্ত রাখিত। বসিরন তার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, তায় নিতান্ত নিরীহ স্ত্রীলোক। সে যৌবনের প্রথম ভাগে দুই একবার ইহাতে বিদ্রোহ করিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু দীর্ঘকালের অভ্যাসের ফলে সে সম্পূর্ণ কাবু হইয়া স্বামীর হাতে ময়দার তালের মত বনিয়া গিয়াছিল।

তবু সেদিন সন্ধ্যা বেলায় বুদ্ধিটা পরিপূর্ণ রূপে পাকাইয়া যখন গরীবুল্লা স্ত্রীর কাছে কথাটা পাড়িল, তখন বসিরন চট করিয়া বলিয়া বসিল, "আই! ওই বুড়া।"

গরীবুল্লা জানে সে হার কাতে খেলিতেছে, কাজেই চট্ করিয়া মেজাজ চড়াইল না। সে বসিরনকে বুঝাইতে গিয়া যে দুইটি যুক্তি দিল তাহা অনেকটা পরস্পরবিরুদ্ধ হইলেও তার অসঙ্গতি সে লক্ষ্য করিল না। সে বলিল, কাসিমের বয়স এমন বেশী কিছু নয়, আর পরীরও অনেক বয়স হইয়াছে। তার দ্বিতীয় যুক্তি এই যে কাসিমের বয়স বেশী সে ভালই—কেন না সে শীঘ্র মারা গেলে তার ছেলে-পিলে না থাকায় সব টাকা তার পরীই পাইবে। তার পর সে যাকে মন চায় বিবাহ করিতে পারিবে। পরীর বয়স নিতান্ত কম, তার বয়স হইতে হইতে কাসিম ফৌত হইবে, সুতরাং মনের মত বিবাহ করিয়া সুখী হইবার দিন সে অনেক পাইবে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রস্তাব ছাড়িলে তার বড়লোক হইবার আশা আর নাই।

বসিরন বুদ্ধির জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিল না—এ সব যুক্তি খণ্ডন করা তার সাধ্যাতীত। তা ছাড়া দীর্ঘকালের অভ্যাসের ফলে স্বামীর কথায় নির্ব্বিচারে সায় দিয়া যাওয়াই তার আসিত। কাজেই স্বামীর যুক্তি সে আদ্যোপান্ত ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিল। কিন্তু শেষে বলিল, "বেপারীর যে বদখৎ চেহারা, আমার পরী ওকে দেখে ভয় পাবে।"

এইবারে গরীবুল্লা তাকে ধমক দিয়া উঠিল। তার পর আর বসিরনের পক্ষে আপত্তি করিবার কোনও সম্ভাবনা রহিল না।

পরীকে এ সম্বন্ধে কোনও কথা বলার কোনও প্রয়োজন কেহ অনুভব করিল না। পরী একরত্তি মেয়ে, সে বোঝেই বা কি, তার মতামতের মূল্যই বা কি?

যদিও গরীবুল্লার মনে আর এ সম্বন্ধে কোনও দ্বিধা ছিল না, তবু সে তার পরদিন সকালেই কাসিমকে গিয়া তার সম্মতি জ্ঞাপন করা সঙ্গত মনে করিল না। কি জানি যদি বেশী গরজ দেখাইলে শেষে বেপারী তার সাতশো টাকার প্রস্তাবটা নাকচ করিয়া দেয়। একটু দম ধরিয়া থাকিলে যে সাতশো টাকা পুরাপুরি আদায় হইয়া আসিবে সে বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল না।

তাই পরদিন সকালে গরীবুল্লা কাসিমের বাড়ী গেল

না, গেল যুধিষ্ঠিরের বাড়ী; যুধিষ্ঠিরের জমী ক'খানা খরিদের ব্যবস্থা করিতে। যাইতে যাইতে সে কেমন করিয়া কথাটা পাড়িবে সে সম্বন্ধে মুসাবিদা করিতে লাগিল। সোজাসুজি কথাটা পাড়া চলিবে না ইহা সে স্থির করিল। এক্ষেত্রে তার যথেষ্ট হেতু ছিল, কেন না সোজা কথাটা পাড়িলেই যুধিষ্ঠির বাঁকিয়া বসিয়া লম্বা দর ছাড়িবে। কিন্তু তা ছাড়া, গরীবুল্লা ঠিক যে কথা মনে ভাবে মুখে সেই কথা বলে এমন অপবাদ কোনও দিনই কেউ তাহাকে দিতে পারে নাই। গরীবুল্লা জগতের সাড়ে পোনেরো আনা লোকের মত আপনাকে খুব বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করিত এবং মনের কথা মুখে না প্রকাশ করা সে বুদ্ধিমানের প্রথম ও প্রধান লক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করিত। কাজেই সে কোনও দিনই সোজাসুজি নিজের মতলবটা প্রকাশ করে নাই; এমন কি কোনও জমী কিনিতে হইলেও সে বেনামীতে কিনিতে পারিলে নিজের নামে কখনও কেনে নাই। কাজেই সোজাসুজি যুধিষ্ঠিরের কাছে কথাটা পাড়া হইবে না সে সম্বন্ধে সে কৃতনিশ্চয় হইয়া মনের ভিতর নানা রকম মতলব গড়িতে লাগিল।

যুধিষ্ঠিরের বাড়ী গিয়া সে দেখিতে পাইল সেখানে মহা গোলোযোগ। গরীবুল্লা ইহা সুলক্ষণ বলিয়া গণনা করিল।

যুধিষ্ঠিরের মেয়ে হারাণী যে গতকল্য পুকুরে ডুবিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল এ-কথা ইতিমধ্যে যথেষ্ট প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল। চৌকীদার নবীন মালী খবরটা শুনিয়াই প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎ মাণিক চক্রবর্ত্তীর কাছে এতেলা দিয়াছিল। চক্রবর্ত্তীমহাশয় খবর শুনিয়া যুধিষ্ঠিরকে ডাকাইয়া বলিলেন যে ইহা গুরুতর ব্যাপার, এ বিষয়ে থানায় এতেলা করিলে হারাণীর পক্ষে ছাড়ান পাওয়া কঠিন হইবে। যুধিষ্ঠির তার কাছে কান্নাকাটি করায় তিনি অনুগ্রহ করিয়া বলিলেন যে দশ টাকা দিলে ব্যাপারটা মিটিতে পারে। অনেক কান্নাকাটিতেও যুধিষ্ঠির সে টাকার অঙ্ক কমাইতে পারে নাই।

বাড়ী আসিয়া যুধিষ্ঠির মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। দশ টাকা সে পাইবে কোথায়?

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছিল। তখন হারাণীর বিবাহ হইয়া সে শ্বশুর-বাড়ী গিয়াছে, আর যুধিষ্ঠিরের শেষ ছেলেটি তার কিছুদিন পূর্ব্বেই মারা গিয়াছে। শূন্য গৃহ পূর্ণ করিবার জন্য যুধিষ্ঠির একটি মধ্যবয়স্কা বিধবা সংগ্রহ করিয়া আনিল; বিধবা পরাণের মা তার গৃহলক্ষ্মী হইয়া বসিল। ইহার দুই বৎসর পর হারাণী স্বয়ং বিধবা হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখনও তার বয়স চৌদ্দ পার হয় নাই।

ইহার পর যে ব্যাপার যুধিষ্ঠিরের গৃহে আরম্ভ হইল তাহাকে কুরুক্ষেত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হারাণী ভাবে, পরাণের মা কোথা হইতে কে উড়িয়া আসিয়া তার পিতার সংসার জুড়িয়া বসিয়াছে। পরাণের মা ভাবে, হারাণী আপদটা আবার সোয়ামীর ঘর খাইয়া এখানে আসিয়া পড়িয়া মরিতে গেল কেন? পরস্পরের মনোভাব যখন এইরূপ তখন তাদের ভিতর দিনে অন্ততঃ পাঁচ-সাতবার চুলোচুলী হইবার হেতু অনায়াসে জন্মিত। এই সব দ্বন্দ্বে চিরদিনই জয়ী হইত পরাণের মা, কিন্তু তাই বলিয়া হারাণী কোনও দিনই কোনও পরাজয়কে চরম বলিয়া গ্রহণ করে নাই।

যুধিষ্ঠির এই সংগ্রামে যথাসম্ভব নিরপেক্ষ থাকিবার চেষ্টা করিত—যখন পারিত না তখন সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া চলিয়া যাইত। পরাণের মাকে কিছু বলিলে যে কুরুক্ষেত্র লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়া উঠিবে তাহা সে জানিত। আর হারাণীকে কিছু বলিলে সেও বড় কম যাইবে না, অশ্রুর প্রলয়পয়োধিজলে যুধিষ্ঠিরকে ভাসাইয়া দিবে এবং চীৎকারে মেদিনী বিদীর্ণ করিবে। কাজেই নিরপেক্ষ হওয়া এবং যথাসম্ভব তার এই সুখের সংসার হইতে দূরে অবস্থান করা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না।

কাল যুধিষ্ঠির প্রথম তার ধৈর্য্য হারাইয়াছিল। বাজারে গিয়া পাটের দর এবং কাসিম বেপারীর দপ্‌দপানী দেখিয়া

তার মনটা বিষে ভরিয়া গিয়াছিল—মনে মনে কাসিমের মাথা চিবাইতে চিবাইতে সে ঘরে ফিরিয়াছিল। বাড়ী ফিরিয়া দেখিল হারাণী পরাণের মার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া ঘর হইতে রাজ্যের হাঁড়িকুড়ি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া চুরমার করিতেছে। কাজেই কাসিমের উপর যে রাগটা জন্মিয়াছিল সেটা পড়িল গিয়া হারাণীর ঘাড়ে। যুধিষ্ঠির হারাণীর চুলে ধরিয়া দুই তিন ঘা বসাইয়া দিল—তাহা হইতেই যত বিপত্তির সৃষ্টি।

প্রেসিডেন্টের বাড়ী হইতে ফিরিবার পথে যুধিষ্ঠির ভাবিয়াছিল এ কথাটা সে পরাণের মার কাছে প্রকাশ করিবে না। কিন্তু বাড়ী পৌঁছিয়া সে পরাণের মাকেই ডাকিয়া কথাটা বলিল। বস্, আগুন লাগিয়া গেল।

যখন গরীবুল্লা আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল তখন পরাণের মা কোমর বাঁধিয়া হারাণীর মুখের কাছে হাত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বক্তৃতা করিতেছে, এবং হারাণী দাওয়ায় বসিয়া, চোখের জলে ভাসিয়া এমন সব কড়া কড়া কথায় তার জবাব দিতেছে যাহা কোনও অভিধানে লেখে না।

গরীবুল্লা উঠানে দাঁড়াইয়া বলিল, "আরে কি হ'য়েছে —হ'য়েছে কি?"

যুদ্ধকালে সঞ্চরণশীল রণপোতের মত চট্ করিয়া মুখ ঘুরাইয়া পরাণের মা গরীবুল্লার সামনে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া অভিধানবিরুদ্ধ বহুবিশেষণ সহযোগে যে কথা জানাইল তাহা সংক্ষেপতঃ এই যে উপস্থিত রাজকন্যা হারাণী সখ করিয়া পুকুর-ঘাটে ডুবিতে গিয়াছিলেন, তার জন্য বেচারী যুধিষ্ঠিরের এখন ঘটি-বাটী বেচিয়া দশ টাকা দিতে হইতেছে। পতিভোজিনীর যদি মরিবারই এত সখ ছিল্ তবে সে যেদিন স্বামীর মাথা খাইল সেই দিন সেই স্বামীর ভিটায় মরিল না কেন—পরাণের মার ঘাড়ে বিপদ টানিয়া আনিতে গেল কেন?

দাওয়ার উপর বসিয়াই পরাণের মার প্রত্যেক কথার সুরে সঙ্গে হারাণী যে উত্তর করিয়া গেল তার স্থূল মর্ম্ম এই যে তার বাপের ঘরে সে যা খুসী করুক তাহাতে অপর কোনও দগ্ধমুখীর প্রাণে দাবানল জ্বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। হারাণী প্রশ্ন করিল যে যুধিষ্ঠির পরাণের মার বাপ কি না?

এমন সম্পর্কবিরুদ্ধ সন্দেহ পরাণের মা সহ্য করিতে পারিল না, সে হারাণীর পতির সঙ্গে এবং বহু পুরুষের সঙ্গে নানাবিধ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া গরীবুল্লাকে প্রশ্ন করিল, হারাণীর মত এমন অপসৃষ্টি, এমন সর্ব্বলোক-বহির্ভূত জীব সে কখনও দেখিয়াছে কি না?

এই বাক্য-বন্যার ভিতর তাল সামলাইতে গরীবুল্লার কিছু সময় গেল। কিছুক্ষণ কথা কহিবার ব্যর্থ আয়োজনে সে কেবল হাত তুলিয়া একবার হারাণীকে একবার পরাণের মাকে থামিবার জন্য সম্পূর্ণ নিষ্ফল ইঙ্গিত করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর যখন এই দ্বৈত-গীতিমুখে সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল তখন গরীবুল্লা যুধিষ্ঠিরকে বলিল যে এ সব ব্যাপার লইয়া মেয়েমানুষের মাথা ঘামাইবার কোনও প্রয়োজন নাই—উভয় প্রতিদ্বন্দী নিবৃত্ত হইলে তাহারা দুজনে বুদ্ধি করিয়া ইহার একটা ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

যুধিষ্ঠির অনেকক্ষণ চেষ্টা করিয়া ক্রমে পরাণের মাকে স্থানান্তরে এবং হারাণীকে গৃহাভ্যন্তরে পাঠাইয়া গরীবুল্লার সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিল।

গরীবুল্লা বলিল যে প্রেসিডেন্টকে টাকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তার চেয়ে একেবারে থানায় যাইয়া দারোগাকে হস্তগত করা ভাল। থানার রাইটারের পিস-তুত ভাইয়ের সঙ্গে গরীবুল্লার জানা শোনা আছে, তার দ্বারা কাজটা সহজেই হাসিল হইতে পারিবে।

যুধিষ্ঠিরের সে সাহস হইল না।

তারপর গরীবুল্লা বলিল, "টাকা খরচের প্রয়োজনই বা কি? মোকদ্দমা যদি হয়ই তখন সাক্ষী সব ভণ্ডুল করিয়া দেওয়া যাইবে। সাক্ষী তো দুইজন মাত্র, পরী—সে তো সাক্ষী দিবেই না, আর লতিফ—তা লতিফকে হাত করা কঠিন হইবে না।"

ইহাতেও যুধিষ্ঠির সাহস পাইল না। অথচ দশটা টাকা আজকের দিনের মধ্যে জোগাড় করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। গরীবুল্লা সুযোগ দেখিয়া বলিল, "তাই তো, টাকা পাওয়াই তো এখন তোমার কঠিন।—কি আছে তোমার?"

যুধিষ্ঠির দেখাইল তার দুটি বলদ।

গরীবুল্লা বলিল, "বলদ বেচলে জমী আবাদ ক'রবে কি ক'রে?"

যুধিষ্ঠির বলিল, "আবাদ আর করবো না ভাই। বলেছি তো, সব বেচে কিনে নবদ্বীপ যাব।"

গরীবুল্লা তার দুঃখে যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইয়া বলিল, "কিন্তু জমীই বা এখন নেবে কে? এখন নিলে এক নফর সা'—না হয় জমীদার। কেউই উচিত মূল্য দেবে না।"

যুধিষ্ঠির বলিল, "যা দেয় তাতেই বেচবো, ওই নফর সাকেই দেব, তার দয়াধর্ম্মে যা সে দেয় তাই নিয়ে নবদ্বীপ যাব।"

গরীবুল্লা হিসাব করিয়া দেখাইল যে তার জমীর দাম অন্ততঃ ছয় শত টাকা হওয়া উচিত—কিন্তু নফর সা' তার পাওনা তিনশো টাকার উপর খুব যদি দেয় তো একশো টাকা দেবে।

যুধিষ্ঠির এ কথা শুনিয়া চমকিত হইল—সে বলিল, "বল কি ভাই—সাতশো টাকা তো জমীর দাম ফেলিয়ে ছড়িয়ে হ'বে। না হয় বড় জোর একশো টাকা কম দেবে।"

গরীবুল্লা ঘাড় নাড়িয়া বলিল যে জমীর আজকাল দাম বড় মন্দা, লোকের টাকা নাই জমী কিনিবে কি? কাজেই সাতশো টাকা দাম কিছুতেই হইবে না। তা' ছাড়া জমীদারকে নজর দিতে হইবে। এ সব হিসাব করিয়া পাঁচশো টাকার বেশী কিছুতেই হইবে না। কিন্তু সে পাঁচশো টাকা দিবার লোকেরও অভাব। সুতরাং নফর সা' চারশো টাকার বেশী কিছুতেই দিবে না।

এইরূপে তাহাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া ক্রমে অত্যন্ত সাবধানে গরীবুল্লা একটা ইঙ্গিত করিল, যে যুধিষ্ঠিরকে নিতান্ত বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সে জমী ক'খানা রাখিবার চেষ্টা করিতে পারে। তার হাতে টাকা নাই, কিন্তু পাঁচশো টাকা সে জোগাড় করিতে পারিলেও পারে ইত্যাদি।

প্রায় আধ ঘণ্টা এমনি বাদানুবাদের পর গরীবুল্লা যুধিষ্ঠিরকে লইয়া নফর সাহার কাছে গেল। সেখানে তার সঙ্গে বাদানুবাদ করিয়া তাকে সুদের পঁচিশ টাকা মাপ দিতে সম্মত করিল। তারপর সেই আসরে সে সকলের সম্মুখে যুধিষ্ঠিরকে জমী বিক্রীর বায়না স্বরূপ কুড়িটি টাকা দিল। ফকীরকে ডাকিয়া সে বায়নাপত্র লেখাইয়া লইল,—যুধিষ্ঠির নমোদাস তাহাতে টিপসই দিয়া দিল।

বাড়ী ফিরিবার পথে যুধিষ্ঠির প্রেসিডেণ্টকে দশ টাকা দিয়া হারাণীর মোকদ্দমা চাপা দেওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া গেল, আর গরীবুল্লা জমীদারের কাছারীতে গিয়া দাখিল খারিজের অগ্রিম অনুমতি লইয়া গেল।

লতিফ ফকীরকে লইয়া উকীল-বাড়ী যাইবার জন্য যতই ব্যস্ত হউক ফকীর একেবারে বিনা লাভে মহকুমায় যাইতে প্রস্তুত ছিল না। তাই পরের দিন সকালে তাদের যাওয়া হইল না। স্থির হইল তার পর দিন যাইবে।

কিন্তু পরদিন শোনা গেল কাসিম বেপারী তার বৃদ্ধা স্ত্রীকে হঠাৎ তালাক দিয়া বসিয়াছে।

লতিফ ও ফকীর মহকুমায় যাইবার জন্য কাপড়-চোপড় লইয়া পথে পা বাড়াইতেই কাসিম বেপারীর বাড়ীতে ফকীরের ডাক পড়িল—তালাকনামা লিখিবার জন্য। সেই লোকের মুখে খবর শুনিয়া কৌতূহলী হইয়া লতিফও ফকীরের সঙ্গে গেল। সেখানে তখন এক

মজলিস বসিয়া গিয়াছে—মহরের টাকা লইয়া একটা বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। সেই বিবাদ নিষ্পত্তি হইতে দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল, তার পর তালাকনামা লেখা হইল। তারপর কাসিমের পরিত্যক্তা স্ত্রী তার বাড়ী চলিয়া গেল। লতিফ তার দূর সম্পর্কের ভ্রাতুষ্পুত্র, কাজেই তাহাকে সঙ্গে যাইতে হইল। সে দিন আর তাদের উকীল-বাড়ী যাওয়া হইল না।

পরের দিন ফকীরের এক মক্কেলের এক মোকদ্দমা ছিল। সে দিন ফকিরের যাইতেই হইল, লতিফও সঙ্গে গেল।

উকীলের কাছে তাহারা যে পরামর্শ পাইল তাহাতে লতিফ খুসী হইতে পারিল না। আইনের এত গোলো-যোগ দেখিয়া সে চটিয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলায় পথে ফিরিতে ফিরিতে ফকীরের সঙ্গে সে তর্ক জুড়িয়া দিল।

সে বলিল, আইন যাই হউক সে পরীকে চুরী করিয়া একেবারে ধুবড়ী লইয়া বিবাহ করিবে। সেখান হইতে তাহাকে সন্ধান করিয়া আনিতে গরীবুল্লার সাধ্যে কুলাইবে না।

ফকীর বলিল, গরীবুল্লা না সন্ধান পাইলেও পুলিশ খুব সম্ভব পাইবে। তাহা হইলে পরীকে তো তাহারা ফিরাইয়া আনিবেই, তার উপর লতিফের জেল হইবে।

লতিফ মরিয়া হইয়া বলিল, তা হয় হউক, তবু সে এ চেষ্টা ছাড়িবে না।

ফকীর তাহাকে অনেক বুঝাইল, কিছুতেই লতিফ হটে না। শেষে লতিফ বলিল, সে স্বয়ং গরীবুল্লাকে বলিয়া বুঝাইয়া পড়াইয়া এ বিবাহে সম্মত করিতে চেষ্টা করিবে।

এই সঙ্কল্প করিয়া তাহারা প্রায় সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিল, লতিফ তার ঘরে চলিয়া গেল। ফকীর তার বাড়ীতে উঠিয়া দেখে গরীবুল্লা ও যুধিষ্ঠির তার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। গরীবুল্লা বলিল, যুধিষ্ঠিরের জমীর কবালা লিখিয়া পরের দিন রেজেষ্ট্রী আফিসে গিয়া রেজেষ্ট্রী করাইতে হইবে। তাহারা ষ্ট্যাম্প কাগজ লইয়া আসিয়াছে। ফকীর তখনই কালি-কলম লইয়া কবালা লিখিয়া ফেলিল। কবালাখানা ফকীরের কাছেই রহিল, পরের দিন সে উভয় পক্ষকে লইয়া রেজেষ্ট্রী করাইয়া দিবে কথা রহিল। টাকা রেজেষ্ট্রী আফিসেই দেওয়া হইবে।

যুধিষ্ঠির তারপর চলিয়া গেল, গরীবুল্লা রহিল। যুধিষ্ঠির চলিয়া গেলে গরীবুল্লা বলিল, "একবার কাসিম বেপারীর বাড়ী যেতে হ'বে, বেপারীর বড় জরুরী দরকার।"

কাসিম বেপারীর বাড়ী গিয়া ফকীর শুনিতে পাইল একখানা কাবিননামা লিখিতে হইবে। কাসিম যে নূতন সংসার করিবার জন্যই তার পুরাতন স্ত্রীকে তালাক দিয়া পথ পরিষ্কার করিয়াছে ইহা ফকীর কতকটা আন্দাজ করিয়াছিল, সুতরাং এ প্রস্তাবে সে খুব আশ্চর্য্য হইল না। কিন্তু লিখিতে বসিয়া যখন সে কাসিমের প্রস্তাবিত পত্নীর নাম শুনিল তখন তার হাত হইতে কলম পড়িয়া গেল।

পরীকে বিবাহ করিবে কাসিম! তবে লতিফের উপায় কি হইবে? এ-কথা ভাবিতে ফকীরের কান্না পাইল। তা' ছাড়া ওই পরীর মত মেয়েটা এই বৃদ্ধ মর্কটের অঙ্কশায়িনী হইবে, এ চিন্তাও তার চিত্তে অমৃত বর্ষণ করিল না।

কিন্তু ফকীর আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কাবিন নামাখানা লিখিয়া ফেলিল। লিখিতে লিখিতে সে নানারকম ফিকির আঁটিতে লাগিল, কি উপায়ে এই দলিল রেজেষ্ট্রী হইয়া বিবাহ সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে পরীকে স্থানান্তরিত করা যায়।

কোনও একটা ভাল বুদ্ধি তার মাথায় আসিল না। তাই দলিল লেখা শেষ হইলে অপ্রসন্নচিত্তে সে সেখানি কাসিম বেপারীর হাতে দিয়া উঠিল।

কাসিম বলিল, "তা হ'লে এখনি এটা সই হ'য়ে যাক, কি বল মিঞা?"

গরীবুল্লা বলিল, "না থাক, কাজী সাহেবের কাছে লেখাপড়া দস্তখত হ'লেই ভাল, কি বল ফকীর ?"

ফকীর আগ্রহের সহিত এই প্রস্তাবে সম্মতি দিল। তার মনে হইল যে কাজীর কাছে গিয়া বিবাহ করিয়া কাবিননামা লেখাপড়া করিতে কিছু সময় লাগিবে, কেননা কাজী সাহেবের বাড়ী এখান হইতে চার ক্রোশ দূরে, আর সেখানে যাইতে হইলে ফকীরকে সঙ্গে না লইয়া গরীবুল্লা যাইবে না। কাজেই ফকীর টাল বাহানা করিয়া কিছু সময় লইতে পারিবে। তাই সে আগ্রহ সহকারে বলিল, "তা বই কি, এ সব ব্যাপার কাজী সাহেবের সামনে হ'লেই পাকাপাকি হয়।"

বলিয়াই সে উঠিল—তার মন ছট্‌ফট্ করিতেছিল লতিফের কাছে খবরটা দিয়া তার সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য। সে ঠিক বুঝিল যে তার আইনসঙ্গত কোনও ব্যবস্থাই বর্ত্তমান অবস্থায় কার্য্যকর হইবে না, লতিফের বে-আইনি বুদ্ধিতে কোনও উপায় হইলেও হইতে পারে। সে বুদ্ধি যত শীঘ্র স্থির হয় ততই ভাল।

কিন্তু গরীবুল্লা ও কাসিম তাহাকে অত সহজে ছাড়িল না। কাসিম জিজ্ঞাসা করিল, কাজী সাহেবের কাছে কার কার যাওয়ার দরকার ? ফকীর তাড়াতাড়ি একটা উত্তর দিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইল। তখন গরীবুল্লা জিজ্ঞাসা করিল, পরীর পক্ষে এজিন দিবে কে ? সে নিজে দিলেই হইবে না উকীলের প্রয়োজন। ফকীর তার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিবামাত্রই কাসিম জিজ্ঞাসা করিল যে তাহা হইলে কাজী সাহেবের কাছে তো তিনজন লোক গেলেই চলে। ফকীর বুঝাইল যে গওয়াহ বা সাক্ষী এখান হইতে লইয়া গেলেই ভাল। গরীবুল্লা তখন কে কে সাক্ষী হইতে পারে তাহার বিচার আরম্ভ করিল। এমনি করিয়া কাজী সাহেবের কাছে কাহার কাহার যাওয়া আবশ্যক হইবে, কি কি করিতে হইবে, কাবিননামা আবার রেজেষ্ট্রী আফিসে রেজেষ্ট্রী করিতে হইবে কি না, কি কি কথা কোথায় বলিতে হইবে—পরীর পক্ষে এজিন বা সম্মতিজ্ঞাপন কে করিতে পারে, ইত্যাদি বহু প্রশ্ন ইহারা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জিজ্ঞাসা করিল, এবং প্রত্যেকটি প্রশ্ন ঠিক একই ভাবে অন্ততঃ দশবার জিজ্ঞাসা করিল। এমনি করিয়া অনেকটা সময় কাটিয়া গেল—ফকীর যতই পালাইবার জন্য ছটফট করিতে লাগিল ততই যেন ইহাদের প্রশ্ন গর্ত্ত হইতে পিঁপড়ার মত অবিরত শ্রেণীতে বাহির হইতে লাগিল। দুই তিনবার কাসিম ফকীরের হাত ধরিয়া বসাইল, গরীবুল্লা তিনবার বসাইল। তার পর ফকীর যখন উঠান পার হইয়া গিয়াছে তখন আবার তাহাকে ডাকিয়া নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় কয়েকটা কথার আলোচনা হইল।

উত্তরোত্তর উত্তেজিত হইতে হইতে ফকীর শেষে বলিল, "আজ থাক্, কাল হ'বে"—বলিয়া চোঁচা ছুট দিল। কাসিম ও গরীবুল্লা আবার পিছন হইতে ডাকিয়াছিল কিন্তু সে ডাক সে শুনিল না।

ফকীর যখন লতিফের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল তখন সে বাড়ীর সবাই যার যার ঘরে শুইয়া ঘুমাইয়াছে, কেবল বুড়া সাহেবুল্লা উঠানে একখানা পাটি পাতিয়া বসিয়া ফুড়ুক্ ফুড়ুক্ করিয়া তামাক টানিতেছে।

ফকীর জিজ্ঞাসা করিল, "লতিফ কোথায় ?"

সাহেবুল্লা বলিল, "ঘুমিয়েছে—বাড়ী শুদ্ধ সবাই ঘুমিয়েছে।" তারপর সে তার ছেলে এবং পুত্রবধূদের তার নিজের সম্বন্ধে যত্ন ও চিন্তার অভাব উল্লেখ করিয়া দীর্ঘ খেদ করিয়া গেল।

ফকীর বুড়ার কথায় দুই একবার সায় দিয়া বলিল, "লতিফকে বড় দরকার—একবার ডাকি ?"

বুড়া ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল ব্যাপার কি ? তার ব্যস্ত হইবার হেতু এই যে লতিফের যথেষ্ট শক্তি আছে, সে লাঠি ধরিতে জানে; এবং ঠিক বৃদ্ধ সাহেবুল্লার মত ঠাণ্ডা সুস্থির ভাবে সব কথা বিবেচনা করে না। সেই জন্য সাহেবুল্লা সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে সে কোথায় কোন ফৌজদারী হাঙ্গামা করিয়া কি বিপদ

বাধায়। হঠাৎ গভীর রাত্রে ফকীর আসিয়া তাহার জন্ম ব্যস্ততা প্রকাশ করায় সে চট্ করিয়া সিদ্ধান্ত করিল যে আজ লতিফ নিশ্চয় একটা কোনও ফৌজদারী করিয়া আসিয়াছে এবং তাহা লইয়া দারোগা পুলিস আসিতেছে, ফকীর সে সন্ধান পাইয়াই লতিফকে খুঁজিতেছে।

কাজেই ব্যাপার কি সে সম্বন্ধে ফকীরকে প্রশ্ন করিয়া তার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সাহেবুল্লা বলিয়া গেল, "আমি আগেই জানি, ও ছেলে একটা ফৌজদারী হাঙ্গামা ক'রে বসবেই। কত বলি বেটাকে—বাপু সে দিন কাল নেই এখন আইন পুলিসের দিন—লাঠি ধরলেই কাজ হয় না। তা যদি বেটা মানবে। এখন সামলাও। এখন তো ভোগ ভুগতে হ'বে এই বুড়ার! তা কি হ'য়েছে আমাকে খোলাসা ক'রে বল দেখি?"

ফকীর বলিল, "না না চাচা, সে সব কিছু নয়, আপনি মিছামিছি ভাববেন না। আমাদের একটা সামান্য কথা আছে।"

সাহেবুল্লা এ উত্তরে সন্তুষ্ট হইল না। ফকীর উঠিয়া লতিফের ঘরের দিকে যাইতেছিল বুড়া তাকে টানিয়া বসাইল। একটা সামান্য কথার জন্য যে ফকীর এই দ্বিপ্রহর রাত্রে লতিফের নিদ্রাভঙ্গ করিতে আসিয়াছে একথা যে সাহেবুল্লা বিশ্বাস করে না তাহা সে পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া বলিল। যদি কোনও বিপদ উপস্থিত থাকে তবে তাহা তাহাদের "চেংড়া" বুদ্ধিতে নিষ্পত্তি করিবার চেষ্টা না করিয়া সাহেবুল্লাকে জানানই তাহাদের উচিত। লতিফ যতই আইন আদালতের সংস্পর্শে থাকুক তবু সে ছেলে মানুষ, তার কাঁচা বুদ্ধি। সে সংসারের কিছুই জানে না বোঝে না—সাহেবুল্লা তার জীবনে অনেক ফৌজদারী করিয়াছে, অনেক মোকদ্দমায় সাক্ষী দিয়াছে, তার বুদ্ধি না লইয়া কাজ করিলে তাহারা বিপদে পড়িবে—ইত্যাদি কথা সে ফকীরকে বিশদভাবে বহু দৃষ্টান্ত সহকারে বুঝাইল।

"শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি" এই সংস্কৃত কথাটা ফকীরের জানা ছিল না, কিন্তু সে ইহা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিল। একটা প্রকাণ্ড গুরুতর সমস্যা তার সম্মুখে, অথচ তার সমাধানের চেষ্টা করিবার জন্য পরামর্শ করিবার পথে সে এই অনাবশ্যক বৃদ্ধের কাছে পদে পদে বাধা পাইয়া ক্ষেপিয়া উঠিল। গরীবুল্লা এবং কাসিম বেপারীকে সে বহুকষ্টে উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া অবশেষে পড়িল কি না ঠিক এই সাহেবুল্লার হাতে। ফকীরের মনে হইল যে কোনও কাজ করিতে গিয়া তার মধ্যে এত বাধা সে কোনও দিন পায় নাই।

সে তখন ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা মিথ্যা কথা বৃদ্ধকে বলিল। সে বলিল যে লতিফ বলিয়াছিল যে যুধিষ্ঠির নমোদাসের জমীগুলি কিনিবে, কিন্তু এই মাত্র যুধিষ্ঠির ফকীরকে দিয়া কবালা লিখাইয়া লইয়াছে, সে সব জমী গরীবুল্লাকে বিক্রয় করিতেছে। এখনও যুধিষ্ঠিরের কাছে গেলে জমীগুলি পাওয়া যাইতে পারে, তাই সে লতিফকে খবর দিতে আসিয়াছে।

বলিয়াই ফকীর উঠিল, কিন্তু সাহেবুল্লা তাহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কত দামে গরীবুল্লা কিনিতেছে এবং জমী কয়খানা। এ বিষয়ে সন্তোষজনক উত্তর পাইয়া বৃদ্ধ তার সঙ্গে দীর্ঘসূত্রে আলোচনা করিতে লাগিল যে জমীর উপযুক্ত মূল্য কত হইতে পারে। এই সব আলোচনায় যতই সময়ক্ষেপ হইতে লাগিল ততই ফকীর চঞ্চল হইল।

শেষে সাহেবুল্লা সিদ্ধান্ত করিল যে গরীবুল্লার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া জমী কিনিলে মামলা মোকদ্দমায় যে ব্যয় হইবে তাহা হিসাব করিলে ও জমী না কেনাই ভাল।

ফকীর মনে মনে বলিল, "তোমার গুষ্টীর মুণ্ড।" এবং সর্ব্বান্তঃকরণে সেই মুহূর্ত্তে বৃদ্ধের ভূমি-প্রাপ্তি কামনা করিতে লাগিল। কিন্তু সেই মঙ্গলময় পরিণতির কোনও আশু সম্ভাবনা নাই জানিয়া সে চঞ্চল হইয়া উঠিয়া বলিল, "তা যা' ব'লেছেন ঠিক, তবু লতিফ বড় আগ্রহ ক'রে ব'লেছিল, তাকে একবার জানান দরকার।" বলিয়া

সে সেইখান হইতেই বড় গলায় লতিফকে দুইটা ডাক দিল।

লতিফের তখন সবে নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছে। সে শুইয়া শুইয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিতেছিল কি উপায়ে পরীকে আত্মসাৎ করা যায়। ভাবিয়া ভাবিয়া তার মাথা গরম হইয়া গিয়াছিল। এতক্ষণে সবে তার একটু নিদ্রার ভাব হইয়াছিল। তাই দুই ডাকেই সে চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে দ্বার খুলিয়া উঠিয়া আসিল।

লতিফকে দেখিয়াই ফকীর বড় গলায় বলিল, "ওই যে যুধিষ্ঠিরের জমীর কথা ব'লেছিলে, তা' সে"—বলিতে বলিতে লতিফের কাছে অগ্রসর হইয়া সে মৃদুস্বরে জানাইল যে সে বুড়াকে কি কথা বলিয়া ভুলাইয়াছে। তার পরে স্বরূপ অবস্থা জানাইয়া বলিল, "আমার সঙ্গে আয়—একবার পরামর্শ করা দরকার।"

লতিফ একগাছা লাঠি লইয়া ফকীরের সঙ্গে চলিল।

বুড়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাও?"

"যুধিষ্ঠিরদা'র ওই জমী ক'খানা—ওই সেই জমীর কথা—একবার দেখে আসি"—আমতা আমতা করিয়া এই কথা বলিতে বলিতে লতিফ ফকীরের সঙ্গে অগ্রসর হইল।

বুড়া পিছু হইতে বলিল, "খবরদার তুই ও জমী ছুঁস না। মিছামিছি মামলা ফরিয়াদের হাঙ্গামা আমি ভাল বাসি না। ও জমী যদি নিস তো এক পয়সাও আমি দেব না বলছি।"

এ কথা শুনিবার জন্য যুবকদ্বয়ের কোনও আগ্রহ না থাকায় তাহারা অগ্রসর হইয়া চলিল।

—ক্রমশ

শরৎচন্দ্র

শ্রী জগদীশ গুপ্ত

সাহিত্যের বস্তুপরিধির এবং তার অতি আধুনিক আত্মপ্রকাশের দিকে চাহিয়া কঠোর ভ্রূভঙ্গী করে এমন লোক এখনো আছে; কিন্তু ঐ বৃহত্তর পরিণতির দিকে বিস্তৃতি লাভের চিন্ময় ক্রিয়াবেগটা আপনারই অন্তরের দুর্দ্দমনীয় প্রেরণার একান্ত অধীন, তাই সে স্থিতিশীল হইয়া থাকিতে পারে না।—ইহা সত্য। শরৎচন্দ্রে এই সত্য অবিনশ্বর জীবন্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ দেখা দিয়াছে।

এমন করিয়া আগে ত' অপ্রকাশকে কেহ উদ্ঘাটিত করিয়া দেয় নাই। কলা ছিল, শিল্প ছিল, ছিল না দরদ। অপরের মনের কথাটি চুনিয়া চুনিয়া চিরিয়া চিরিয়া বাছিয়া বাছিয়া হয় তো বলা হইয়াছিল, কিন্তু সে শুধু অনুভূতির বহিরঙ্গ স্পর্শ করিত।—

শরৎচন্দ্রে ইঙ্গিত নাই, উপদেশ নাই—একেবারে স্পষ্ট সত্যটি লুকাইত নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত যেন শূলের আঘাতে ওলটপালট করিয়া তাহাকে সূর্য্যের প্রখর আলোকের মাঝখানে টানিয়া আনিয়াছে।

নরনারীর অন্তর্নিহিত নিগূঢ় ভাবৈশ্বর্য্য তিনি সূক্ষ্ম স্ফুটতম রেখায় নিজেরই অন্তরপটে নিরীক্ষণ করিয়া তাহার সুপ্রকট প্রোজ্জ্বল লেখা চরাচরে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন।

যে আনন্দের কারণ নাই, কৈফিয়ৎ নাই, মীমাংসা নাই, প্রশ্ন নাই—শুধু সর্ব্বাঙ্গসুন্দরের সাক্ষাত লাভে যে আনন্দ আপনি উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে, শরৎচন্দ্র বারম্বার আমাদের তাহাই দিয়াছেন। ষোলআনা পরিপূর্ণ ভরাট্ দুঃখ—সে-ও আনন্দ; এ আনন্দও তিনি দিয়াছেন অকৃপণ অকুণ্ঠিত হস্তে।

দুঃখের রূপ, বেদনার রূপ এত বিচিত্র—দিকে দিকে তাহা এত প্রচুর পরিমাণে ছড়াইয়া আছে, তাহাই বা কে আগে জানিত!...ক্ষুদ্রতম অঙ্কুরবিন্দুতে জন্মলাভ করিয়া চোখের আড়ালে যে দরদর অশ্রুপ্রবাহ নামিয়া আসিয়াছে তাহার কল্লোল আমাদের বুকের পাঁজরের সীমার বাহিরে আসিবার পথ পাইবে, তাহাই বা কে আগে জানিত!

বিচ্যুতির ক্ষমা নাই-

এই বিপুল অন্ধতার ঠুলি একদিন অক্লেশে খুলিয়া যাইবে, তাহাও কেউ এখানে কখনো ভাবে নাই; কিন্তু খুলিয়া গেছে।—

গোপন নাই যে, মানুষ ভয় পাইয়াছে। পরের কণ্ঠে নিজের মনের অন্তঃপুরিকার অকস্মাৎ জাগরিত বাণীটি শুনিয়া ভয়ার্ত্ত ভয়ের তাড়নায় বিদ্রূপের অস্ত্র হাতে লইয়াছে; বলিতেছে,—ও মিথ্যাচারী; উহার কথার "জাত" নাই।

সাধনার বলে কঙ্কালের বুকে স্পন্দন জাগিয়াছে; তাহাকে দূরে ঠেলিয়া রাখা আজ চলে কি?...মিথ্যা প্রতিষ্ঠার অবয়বের দিকে সে কেবলি আঙ্গুল বাড়ায়—অগোচর কলুষের দিকে সে চোখ ফিরাইয়া দেয়।...মানুষ ভয় পায়; বলে,—অপকৃষ্ট, মিথ্যাচারী, কুৎসিত; উহাকে দূরে রাখ।

কিন্তু—

জীবানন্দ, ষোড়শী, অভয়া, অচলা, বামুনের মেয়েটি আর কিরণময়ী—ইহারা আছে বলিয়াই জানিতাম।...এ ছাড়া আরো আছে। এবং সাহিত্যে তাহারা দেখা দিবেও।

মাটির রাজা

—পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর—

শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ঠি এ আগ্ বসাইবার পরামর্শ দিয়া ... সেখান ... ফিরিতেছিলেন। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে সূর্য্য তখন অস্ত যাইতেছে।

কামার-শালার পাশে ফাঁকা এবং উঁচু খানিকটা জায়গা পড়িয়াছিল, দেখা গেল, তাহার উপর পাড়ার অনেকগুলা ছেলে আসিয়া জড়ো হইয়াছে, এবং কোথাকার কে বিদেশী আগন্তুককে ঘিরিয়া বসিয়া হল্লা করিতেছে। ব্যাপার কি জানিবার জন্য রায়-জি তাহাদের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। আগন্তুক বিদেশী নিঃসন্দেহ, কিন্তু একজন নয়—তিনজন। তিনজনেরই মাথায় ঠিক তাহারই মত বড় বড় চুল, কিন্তু কোঁকড়ানোও নয়, কালোও নয়, রুক্ষ মলিন চুলগুলি জটা বাঁধিবার উপক্রম করিতেছে,—প্রত্যেকেরই মাথার উপর গেরুয়া রংএর পাগ্‌ড়ী বাঁধা।

রায়-জিকে দেখিবামাত্র ছেলেগুলা এঁকে-একে পলায়ন করিতেছিল।

আগন্তুক তিনজনের মধ্যে একজন—বেশ লম্বা-চওড়া জোয়ান, বড় বড় চোখ, টাঙ্গির মত একজোড়া গোঁফ,—পরিষ্কার বাংলায় রায়-জিকে জানাইল যে তাহারা 'পামিষ্ট', মানুষের হাত মুখ দেখিয়া ভাগ্যগণনা করিয়া দিতে পারে, এবং ইহাই নাকি তাহাদের 'প্রফেশান'—পেষা।

তাহার পর রায়-জির কাছে উঠিয়া আসিয়া গলাটা একটুখানি খাটো করিয়া হাত মুখ নাড়িয়া সে রায়-জিকে যে সব কথা বলিল, তাহার মর্ম্মার্থ এই, যে, এ গ্রামে তাহারা বহুক্ষণ পূর্ব্বেই আসিয়া পৌছিয়াছে, ভাবিয়াছিল, গ্রামের ঘরে-ঘরে কিছু-কিছু ভিক্ষা করিয়া এইখানেই চারটি বাঁধিয়া খাইবে কিন্তু ওই ছেলেগুলি তাহা হইতে দেয় নাই, তাহাদের খাওয়া এবং নিরাপদে রাত্রিবাস করিবার বন্দোবস্ত তাহারা করিয়া দিবে বলিয়া ফাঁকি দিয়া প্রায় দশ বারোজন ছোক্‌রা তাহাদের ভাগ্য-গণনা করাইয়া লইয়াছে,—এখন বলে যে, গণনা তোমাদের নির্ভুল হয় নাই, সুতরাং এইখানে তোমাদের না খাইয়া পড়িয়া থাকাই উচিত। এতক্ষণ ধরিয়া এই লইয়া ছেলেগুলার সঙ্গে বচসা চলিতেছিল।

রায়-জি দেখিলেন, একটা ছেলেও আর সেখানে দাঁড়াইয়া নাই। হাসিয়া বলিলেন, "আমরা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, আমাদের ঘরের রাঁধা ভাত আপনারা খাবেন কি ?"

হাঁ হাঁ বলিয়া মাথা নাড়িয়া প্রত্যেকেই তাহাদের সম্মতি জানাইল।

রায়-জি বলিলেন, "তবে আসুন আমার সঙ্গে।"

তিনজনেই উঠিয়া আসিল।

কদম গাছের তলায় আসন বিছাইয়া তাহাদের বসাইয়া রাখিয়া রায়-জি ঘরে ঢুকিলেন।

মা ত' শুনিয়া অবাক্!—"তিন তিনজন লোক, তোমার বেশ আক্কেল যা-হোক্।"

রায়-জি বলিলেন, "আহা, বিদেশী মানুষ……ধর, আমিই যদি এম্‌নি কোনও বিদেশে গিয়ে পড়ি …"

আহারাদির বন্দোবস্ত কোনো রকমে হইল, কিন্তু মা বলিলেন, "কালকের দফা নিশ্চিন্তি।"

রায়-জি বলিলেন, "তা হোক্। সে ভাবনা তোমার নয়।"

অতিথি তিনজন—প্রত্যেকেই তামাক খায়। রায়-জি তামাক সাজিয়া আনিলেন। গোঁফ্‌ওয়ালা লোকটি নিজেদের পরিচয় দিতে লাগিল। তাহার নাম শান্তলাল। সেই সকলের চেয়ে ভাল গণনা করিতে পারে। হরিদ্বারে তাহাদের আশ্রম। সম্প্রতি কাশী হইতে পদব্রজে রওনা হইয়াছে, সকলেই কলিকাতায় যাইবে।

তাহারা হাত দেখিয়া ভাগ্য-গণনা করিতে পারে কথাটা শুনিয়া অবধি মা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রায়-জি লণ্ঠন লইবার জন্য ঘরে আসিতেই মা বলিলেন, "পরিষ্কার চাঁদ উঠেছে, লণ্ঠন কি হবে ?"

জ্যোৎস্না-রাত্রির চমৎকার স্নিগ্ধ আলো,—রায়-জি ফিরিয়া যাইতেছিলেন, মা বলিলেন, "দিতে পারি,—আমাদের শনির দশা কখন কাটবে তা যদি ওরা বলে দিতে পারে।"

রায়-জি সেইখান হইতেই হাসিতে হাসিতে হাঁকিলেন, "শান্তলাল ! ও শান্তলাল !"

বাহিরে কদম-তলা হইতে শান্তলালের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

রায়-জি কাছে আসিয়া বলিলেন, "ওদের হাত না দেখে দিলে আলো ওরা দেবে না বলছে ভাই !"

"বেশ, বেশ, চলুন, দেখে দিই !" বলিয়া শান্তলাল হাসিতে হাসিতে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল।

ঘরে ঢুকিতেই দারিদ্র্যের একটা শুষ্ক রুক্ষ মূর্ত্তি সহজেই নজরে পড়ে। রান্নাঘর বলিতে কোথাও কিছু নাই, ঘরেরই চালার এক পাশে রান্না চলিতেছে, মাটির দেওয়াল যেন দাঁত বাহির করিয়া আছে, একতলা ও দোতলার মাঝখানে কড়ি পাটা কিছুই পড়ে নাই, অসমাপ্ত ঘর কয়খানির মাথার উপর খড়ের চাল,—তাও আবার মাঝে-মাঝে কয়েকটা ফুটার পথে জ্যোৎস্নার আলো দেখা যায়।

মা রান্না করিতেছিলেন, কিছুদূরে একটি সৎরঞ্চ বিছাইয়া শান্তি, কান্তি ও টুনু তিনজনে তাস খেলিতেছিল, অপরিচিত আগন্তুককে দেখিয়া সকলেই একটুখানি বিচলিত হইয়া উঠিল; হইল না মাত্র তিনটি প্রাণী,—তাহারাও সৎরঞ্চের একপার্শ্বে বসিয়া বাজে কয়েকখানা তাস লইয়া বোধকরি খেলা করিতেছিল। সে এক ভারি মজার খেলা! জনি কুকুরটা মাটির উপর শুইয়া পায়ের থাবা দিয়া এক একটি তাস সরাইয়া দিতেছে, রুপী বাঁদরটা ত' পাকা খেলোয়াড়ের মত বাঁ-হাতে তাসগুলি সযত্নে মেলিয়া ধরিয়া ডান হাত দিয়া একটি একটি করিয়া মাটিতে ফেলিতেছে, আর কোথাও এতটুকু ভুলচুক্ হইলে ভাদ্ হাসিতে হাসিতে তাহাদের শাসন করিতেছে।

শান্তলাল একদৃষ্টে সেইদিক পানে তাকাইয়া রহিল।

রায়-জি ডাকিলেন, "জনি !"

কুকুরটা খেলা ছাড়িয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিল।

রায়-জি আঙুল বাড়াইয়া শান্তলালকে দেখাইয়া দিলেন।

জনি তাহার সুমুখের দুইটি পা তুলিয়া শান্তলালকে অভিবাদন করিয়া রায়-জির হুকুমের অপেক্ষায় তেমনি ভাবে বসিয়াই রহিল।

রায়-জি বলিলেন, "যা !"

কুকুরটা আবার ধীরে-ধীরে তাহার তাসের কাছে গিয়া বসিল।

রুপীকে কিছুই বলিতে হইল না। জনি ফিরিয়া গেলে রুপী তাহার হাতের তাসগুলি নামাইয়া রাখিয়া শান্তলালের কাছে আসিয়া হাত জোড় করিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া একটি প্রণাম করিল, তাহার পর ঘরের ভিতর হইতে অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত কম্বলের একটি ছোট আসন আনিয়া আগন্তুকের পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া আবার একটি প্রণাম করিয়া হুকুমের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

রায়-জি হাতের ইসারায় তাহাকে যাইতে বলিলেন।

শান্তলাল এমনটি কোনোদিন দেখে নাই; একেবারে

অবাক্ হইয়া সে রায়-জির মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া রহিল, তাহার পর হাত বাড়াইয়া রায়-জির পায়ের ধূলা মাথায় ঠেকাইয়া বলিল, "আপনি গুণী বাবুজি—!"

আর কিছু সে বলিতে পারিল না।

হাতে ধরিয়া রায়-জি তাহাকে বসাইয়া দিয়া, নিজেও বসিয়া বলিলেন, "কই গো, হাত কে দেখাবে—এসো!"

শান্তলাল ঈষৎ চাপা গলায় বলিয়া উঠিল, "না, না, না বাবুজি না, এ সব ঝুটা বুলি—" বলিয়া সে আবার তাঁহার পায়ের ধূলা লইবার জন্য হাত বাড়াইতেছিল, রায়-জি তাহার হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া চোখ টিপিয়া ইসারা করিয়া বলিলেন, "তা হোক্—তা আমি জানি,—তা হোক্।"

অগত্যা তাহাকে রাজি হইতে হইল।

মা বলিলেন, "আগে আমার বৌমার দেখুন, তারপর আমার।"

টুনুর হাত দেখিয়া শান্তলাল চোখ বুজিয়া বিড় বিড় করিয়া আপন মনেই কি যেন কতকগুলা শ্লোক আওড়াইতে লাগিল, তাহার পর চোখ খুলিয়া রায়-জির মুখের পানে একবার তাকাইয়া বলিল, "স্বয়ং লছমীরূপা নারায়ণী! আর আপনার পুত্র হচ্ছেন গিয়ে নারায়ণ! লক্ষ্মীর ঘরেই লক্ষ্মী এসেছেন মা!"

উনানে কি যেন চড়াইয়া দিয়া মা তখন অনেকখানি আগাইয়া আসিয়াছিলেন।

শান্তলাল বলিল, "এই লক্ষ্মীর বরে কোনও দুঃখ আপনার থাকবে না মা! এই ঘর আপনার দালান হয়ে যাবে। দালানে বসে আমরা তখন লুচি পরমান্ন খেয়ে যাব।"

ছেলেদের সৎরঞ্চের একপাশে বসিয়া চাপা গলায় অত্যন্ত আগ্রহের সহিত মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে হবে বাবা?"

"দু' এক বছরের ভিতর হবে মা, এই আমি বলে' রাখলাম।" এই বলিয়া শান্তলাল রায়-জির মুখের পানে একবার তাকাইল। তিনি তখন কলিকার আগুনে ফুঁ দিতেছিলেন। হাসিতেছেন কি আগুনের ছটায় মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে কিছুই বুঝা গেল না। শান্তলাল বলিল, "এঁর বাঁ-হাতে লক্ষ্মী আছেন মা, বাম হাত দিয়ে উনি যেন কাউকে কিছু না দেন। বাস্! আর কিছু আমার দেখবার নেই মা, আর কিছু আমি বলব না। দুটি বচ্ছর আপনি চোখ বুজে কাটিয়ে দিন—তারপর দেখবেন কি হয়।"

"দু বচ্ছর!" বলিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মা তাঁহার ছেলেদের মুখের পানে তাকাইলেন। ইচ্ছা যে, তাহাদের হাতগুলা একবার দেখান্। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই রায়-জি এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। হুঁকাটা টানিতে টানিতে হঠাৎ তিনি তাঁহার হুঁকা হইতে হাতখানা সরাইয়া লইলেন, কিন্তু আশ্চর্য্য অবলম্বনহীন হুঁকাটা তাঁহার মুখের কাছেই লাগিয়া রহিল,—অথচ দিব্যি সচ্ছন্দে হুঁকাও টানিতে লাগিলেন, ধোঁয়াও বাহির হইতে লাগিল!

আবার শুধু তাই নয়, রায়-জি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "চলো!" বলিয়া অবলীলাক্রমে ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে চলিতেও লাগিলেন! অদ্ভুত! হুঁকাটা কিন্তু তেমনি আলগোছে তাঁহার মুখের কাছে লাগিয়াই রহিল।

শান্তলাল নির্ব্বাক বিস্ময়ে হাসিতে হাসিতে তাঁহার পিছন ধরিল। হাত দেখা আর হইল না।

বাহিরে আসিয়া দেখা গেল, বাকি দু'জনের মধ্যে একজন তখন নিশ্চেষ্ট ভাবে ঘুমাইতেছে, আর একজন কদমগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে যে লোকটি ঘুমাইতেছিল, শান্তলাল তাহাকে উঠাইয়া দিল। রায়-জির তামাক খাওয়া দেখিয়া ঘুম ভাঙিতে তাহার দেরি হইল না।

তাহার পর বসিয়া বসিয়া শান্তলাল তাহার সঙ্গীদুইটিকে

শুনাইয়া শুনাইয়া যে-সব কথা বলিতে লাগিল, রায়-জির সেরেফ্ প্রশংসা ছাড়া সে সব আর কিছুই নহে।

রায়-জি বলিলেন, "আমি বড় গরীব শান্তলাল, নইলে তোমাদের আর-একদিন রেখে আমি আমার খেলা-তামাসা সব দেখাতাম।"

কিন্তু এই গরীব কথাটার তাৎপর্য্য শান্তলাল বুঝিল না, বলিল, "আপনি গরীব কিসের বাবুজি, আপনি গুণী, আপনি......"

এই স্তাবকতা রায়-জির আর ভাল লাগিতেছিল না। কথাটা থামাইবার জন্য বলিলেন, "থাক্। তোমার দেশের কথা বল শান্তলাল!"

কিন্তু এই শান্তলালের মুখেই তখন আলাদা সুর শোনা গেল। নিজেই বলিয়াছিল সে খুব ভাল ভাগ্য গণনা করিতে পারে, এখন আবার বলিতে লাগিল, ভাগ্য গণনার সে কিছুই জানে না, কতকগুলা সাধারণ প্রশ্ন এবং তাহার জবাব আছে যেগুলা প্রায় সকল জায়গাতেই খাটে, স্থান বিশেষে বেশ বুদ্ধিমানের মত লাগাইয়া দিতে পারিলে অতি সহজেই কার্য্য উদ্ধার হইয়া যায়। বাড়ীতে অনেকগুলি পোষ্য, দেশে থাকিয়া উপার্জ্জনের কিছু আশা-ভরসা নাই, তাই তাহাদের কপাল ঠুকিয়া এই বাংলা-মুলুকে চলিয়া আসিতে হয়। এই হীন বৃত্তি ভাল লাগে না বাবুজি, তবু কি করিবে, পেটের দায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

এমনি সব নানান্ কথা বলিতে বলিতে খাবার ডাক পড়িল।

মা আয়োজন মন্দ করেন নাই। অতিথি তিনজনের আহারাদি শেষ হইলে বালিস বিছানা কাঁধে লইয়া রায়-জি বলিলেন, "গরীবের ঘরে জায়গার বড় অভাব ভাই, চল তোমাদের কালী-ঘরে শোবার ব্যবস্থা করে' দিয়ে আসি।"

মা তাঁহাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমিও চারটি খেয়ে গেলে না কেন?"

রায়-জি বলিলেন, "আসছি, তোমরা ঠিক করে' রাখো।"

ভাত বাড়িয়া থালা ঢাকা দিয়া রায়-জির অপেক্ষায় মা ও টুনু বিছানার উপর বসিয়া বসিয়া গল্প করিতে লাগিল।

গল্প করিতে করিতে কোন্ সময় তাহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল কে জানে!

ঘুম ভাঙিতেই দেখিল, দরজা খোলা, প্রভাত হইয়া গেছে, তিন জনের ভাত তেমনি ঢাকা রহিয়াছে, রায়-জি তখনও আসেন নাই।

ক্রমশ—
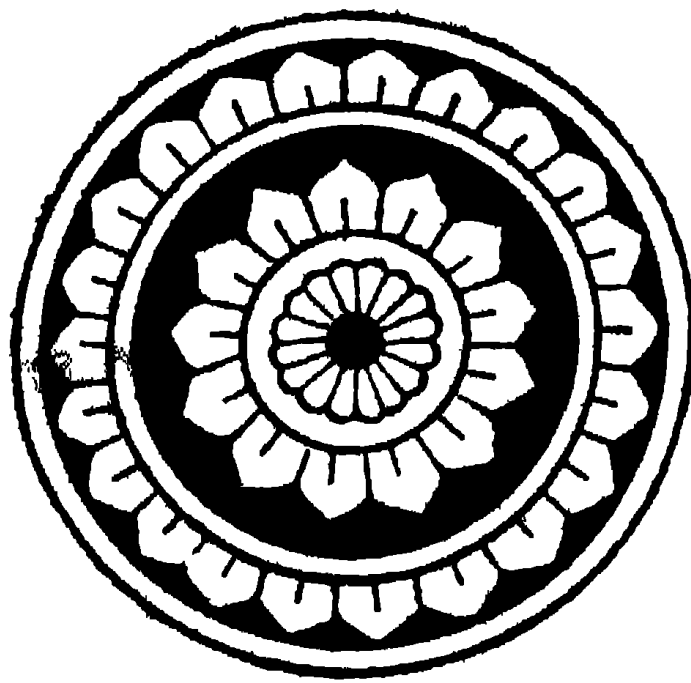
শরৎ-প্রশস্তি

শ্রী হেমচন্দ্র বাগচী

শরতের জন্ম হেরি শ্রাবণের মরণ-শয্যায়,
প্লাবন-পীড়ন-ক্ষণে।—প্রভাতের সন্ধ্যার লীলায়,
ধরিত্রীর নব অভিসারে।
আজি তা'রে
হেরি মুগ্ধ চোখে,—
জল-স্থল আবরিয়া নগ্ন শিশু, প্লাবিত আলোকে,
কাশ-কুসুমের সমারোহে। হাসির আনন্দ-গান
দিগ্বিজয়ী বীরশিশু তীব্র বেগে করিছে সন্ধান
পূর্ণা তটিনীর পাশে পাশে। নর্ত্তনের তালে তালে
সৃষ্টির বিষাদ-ভাতি মুহুর্মুহুঃ জাগে তার ভালে,
বিজয়ার অশ্রুর বাসরে।

তা'রি মতো মানব-অন্তরে,
আজিকে ফেলিছ ছায়া—নবমায়া—হে চিরনবীন!
বেদনা-পীড়ন-ক্ষণে। চিত্ত-উৎস-উৎসারিত রসে
সাজাইছ ভারতীরে আনন্দ-রভসে
বিচিত্র মাল্যের ভারে।

হেরি অনুদিন,
যে গান গাহেনি কেহ, তা'রে তুমি সঞ্চারিছ প্রাণ;
ধূলায় মলিন বীণা কোলে টানি' করিছ সন্ধান
মূর্চ্ছিত সুরের বাণী। যা'রে কেহ কহে নাই কথা,-
তাহারে আনিছ বুকে পূর্ণ করি' সকল ব্যর্থতা!

শরতের দীপ্ত রৌদ্র, পাশে তা'র ছায়া, গাঢ়তম;—
ক্ষতির কণ্টক দলি', বিক্ষেপিয়া জীবনের তম,

প্রসারিলে দৃষ্টি তব স্তব্ধ ঘন অন্ধকার তলে,—
গ্লানির জীবনে যেথা অন্তরের দীপ্ত মণি জ্বলে
অধীর ব্যাকুল লগ্নে। তা'রে হেরি এনেছ বাহিরে,
আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে, পুরাতন প্রাসাদ-কুটীরে,
দিবার আলোক-তলে। ধূলিম্লান জীবনের বাণী
রেখেছ কৌস্তুভ-সম সযতনে বক্ষতলে আনি'!

আজিকে স্রষ্টারে তব নবসৃষ্টি-অর্ঘ্য-উপহারে
নীরবে পূজিছ কবি! জীবনের জয়টীকা বহি'
শরৎ নমিছে যথা মেদিনীর চরণের তলে,
পূর্ণতার বাণীটিরে রাখি' দিয়া মৃত্তিকা-অঞ্চলে
নবীন সৃজন-বেগে।
অসঙ্কোচে সত্যবাণী কহি'
তোমার সৃষ্টির গান রাখি' দিলে রচনা-সম্ভারে;
কালের গভীর রন্ধ্র পূর্ণ করি' অমর ভাষায়—
বেদনারে বাণী দাও নবোন্মেষ-দীপ্ত প্রতিভায়।

হাড়

শ্রী জগদীশ গুপ্ত

এটাও হত্যা—
আহার্য্যে বিষ মিশাইয়া নয়, গলায় ছুরি দিয়া নয়—
আইনে তার সাজা নাই—
তবু এটা হত্যাই।
স্বাভাবিক মৃত্যু, তবু এ মরায় আর স্বাভাবিক মরায় যে কত প্রভেদ, তাহা যে মরে, সেই কেবল জানে। লোকে চোখে দেখে কেবল বাহ্যিক দেহটা, প্রাণহীন। কিন্তু নেপথ্যে তার কি ঘটিয়া গেছে তাহার খোঁজ কেউ রাখে না!……

লোকে মন-বুঝান' ভারি ভারি কথা কয়—

রক্ষাও মরিল।

কেন মরিল তাহার খোঁজ-খবর কেহ রাখিল না, তবে

তাহার এই মৃত্যুটা কারো কারো মনের কোমলতায় একটা ঘা দিয়া গেল।

রাগ করিল সবাই—

কারো মুখ ফুটিল, কারো ফুটিল না।

যাদের ফুটিল তাদের মধ্যে রসি একজন।

রক্ষা রসিকে মাসী বলিত। রসি রক্ষা দাসীকে রক্ষা কবচ দিতে পারে নাই, কিন্তু দুঃখে কাঁদিত।

রক্ষার স্বামী সনাতন লোক ভাল নয়।

......সনাতন একদা কাপড়ের দোকানে কাপড় কিনিতে যাইয়া বাছাই করিতে করিতে ন'গজি একখানা ধুতি চুরি করিয়া মার যা' খাইয়াছিল তাহা ঢের..... তার পর তিনমাস জেলও খাটিয়াছিল।

সনাতন বেপরোয়া—

তোয়াক্কা কারুর রাখে না—

দুনিয়ার লোকের মুখের সাম্‌নে বুড়ো আঙুল নাড়িয়া বেড়ায়—

তার কটু কর্কশ কথায়, দম্ভে দাপটে লোকে অস্থির।

কথায় কথায় সে লাঠি লইয়া তাড়িয়া আসে, লাঠি পড়িবার আগেই লোকে পালাইতে পারে, কিন্তু তার গলার আওয়াজ আর গালের ভাষা এমন উচ্চ এবং কু, যে কানে আঙুল দিলে কেবল তার প্রতিধ্বনিটা নিবারিত হয়।

.....প্রতিবেশীর ছাগল-খাসী তার চারাগাছে মুখ দিতে না দিতে একবার ব্যা করিয়াই আর নড়ে নাই এমন দৃষ্টান্ত বহু আছে।

এই সনাতন—রক্ষার স্বামী।

কিন্তু ছ' বছরের একটি ছেলে রাখিয়া রক্ষা মরিয়া গেল

......শুধু আয়ুঃশেষ হইয়া যায় বলিয়াই মানুষ মরে এমন নয়, আয়ু থাকিতেও বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছাটার যদি মৃত্যু ঘটে তাহা হইলেও মানুষ মরে। রক্ষার ঘটিয়াছিল তাই—

সনাতনের অত্যাচারে তার বাঁচিবার সাধ ফুরাইয়া গিয়াছিল।......দেহখানা তারপরে দিন দিন শুষ্ক হইতে শুষ্কতর হইয়া একদিন বাহিরের বায়ু ভিতরে প্রবেশ করিতে একেবারেই চাহিল না।

তখন কাছে ছিল রসি।

রক্ষা বলিয়া গেল,—মাসি, দেখো' মথুরকে, যেন বাপের মত না হয়।—

রসি ভাবিয়াছিল, মথুরকে কাছে লইয়া মানুষ করিবে। কিন্তু তাহাতে ছেলের বাপের অনুমতি চাই।......তাই সনাতনের ভ্রূকুটিকুটিল মুখের দিকে চাহিয়া অনেক স্তুতি-বচন আত্মীয়তা ভূমিকার পর রসি একদিন কথাটা পাড়িতেই সনাতন দস্তুরমত লাঠি লইয়া মারিতে উঠিল না বটে, কিন্তু তাই করাই ছিল ভাল।—

সনাতন রসির সম্মুখেই তাহার স্বার্থ, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, উদ্দেশ্য প্রভৃতি বিষয়ে এমন সব অন্যায় কথা বলিয়া গেল যার ওজন লাঠির চেয়ে ঢের বেশী।......শেষে বলিল,—মাগী ডাইনি।

মাগী শব্দটা গা'ল—

ডাইনি শব্দটাও গা'ল, উপরন্তু নারীর মাতৃ-হৃদয়কে অপমান!

কিন্তু রসি কাঁদিল না—

তার বুকের ভিতর যেন আগুন ধরিয়া গেল

কথাটা শুনিতে ভাল নয়—

কিন্তু কেন যেন রটিয়া গেছে, রসি মন্ত্রতন্ত্র

জানে; লোকের সে মন্দ করিতে পারে; তাহাকে "ঘাটান" দুঃসাহসের কাজ, বিপদসঙ্কুল ত' বটেই।—

কথাটা যে বিশ্বাস করে না সেও রসিকে পারতপক্ষে এড়াইয়া চলে; যে বিশ্বাস করে সে ভূত-প্রেত যক্ষ-রক্ষ দৈত্য-দানব-পিশাচ, সর্প, বৃশ্চিক প্রভৃতি জ্ঞাত অজ্ঞাত অনেক বিভীষিকা রসির সঙ্গে জড়াইয়া তাহাকে এমন ভয়ের চক্ষে দেখে যে ভগবানকেও তাহার বিরুদ্ধে অক্ষম নাচার বলিয়া মনে হয়।······মাত্র একটি শিকড়ের ছোঁয়া দিয়া রসি যে-কোনো মানুষকে যে-কোনো জন্তুতে পরিণত করিতে পারে; ইচ্ছা করিলেই সাড়ে তিন হাত লম্বা রসি হাত বাড়াইয়া তাল গাছের মাথা ছুঁইতে পারে; কবর খুঁড়িয়া মড়ার মাংস সে চিবাইয়া খায়; অসংখ্য মড়ার মাথা তার ঘরের মেঝেয় পোঁতা আছে.... .ইত্যাদি।

তিনটি বিল্বপত্র, তিনটি কড়ি, একটুখানি সিঁদুর, আর তিনটি শিকড়—এই সামান্য কয়টি বস্তুর সাহায্যে রসি যাহা ঘটাইতে পারে বলিয়া খ্যাত তাহা অসামান্য—

একসঙ্গে দেশের ঘর জ্বলিয়া উঠিতে পারে—

ক্ষেতের যাবতীয় পাকা ধানের ভিতরকার শাঁস অদৃশ্য হইয়া যাইতে পারে—

মানুষের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত অসহ্য চুলকানিতে ভরিয়া উঠিতে পারে—

ওলা দেবী কি মা শীতলা ত' যখন তখন দেখা দিতে পারেন

তার শান্তি স্বস্ত্যয়ন নাই, শাস্ত্রের সজীব মন্ত্র একেবারে নিরুপায়, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মবাক্য একেবারে নিষ্ফল, রক্ষা-কালীও সরিয়া দাঁড়ান।

ইহাদের উপর যদি পুং-শকুনের বিষ্ঠা আর স্ত্রী-ভেকের লালা পাওয়া যায় তবে ত—

কাজেই রসিকে সনাতন অপমান করিয়াছে শুনিয়া গ্রামের লোক কাঁপিয়া উঠিল—

না জানি কি ঘটে!

সনাতন অপ্রিয় ছিল, এখন লোকের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিল।······গ্রামের সকলেরই চালা ঘর, সকলেরই ছেলেপিলের ঘর।······বাগে পায় ত' সনাতনের তলপেটে সড়কি ফুঁড়িয়া দেয় এম্নি লোকের মনের বাতিক।······

যাই হোক, আরামের কথা এই যে, উৎকণ্ঠা কণ্ঠের কাঁটার মত অসহ্য হইলেও, দিন পনর পার হইয়া গেল, কিন্তু আপামর কাহারো অমঙ্গল ঘটিল না।—

একটি ছাড়া—

সেটাও রসির মন্ত্রবলে কি মানুষের আহাম্মকীতে তাহাও বিবেচনার বিষয়।

দাশুর পুত্রবধূ মানী লোক ভাল, কেবল ভয়-কাতুরে, ভয় পাইলে তার জ্ঞান থাকে না।—মানী একদিন পুকুর-ঘাটে যাইয়াই দড়্‌বড়্‌ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া দড়াম্ করিয়া উঠানে পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গেল।······দাশু তার মুখের ভিতর আঙ্গুল দিয়া দেখিল, দাঁত লাগিয়া গেছে—

কেহ বলিল,—হাঁচাও নাকের ভিতর কাঠি দিয়ে।

কেহ বলিল,—কোঁকে সুড়সুড়ি দাও।

কিন্তু দাশুর স্ত্রী আনিয়া দিল দাশুর হাতে জাঁতি—

এবং জাঁতি দিয়া চাড় দিতেই দাঁত ছাড়িয়া গেল বটে, কিন্তু একটা দাঁতের এক টুকরা ভাঙ্গিয়া পড়িল।

মির্‌গী না হিস্টিরী?

তা কিছু নয়—

মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া মানী বলিল,—বাঁশের ঝাড়ে কে পা ঝুলিয়ে বসে' রয়েছে, বাবাগো! সাদাপারা! জল দাও, জল খাবো।—বলিয়া মানী কাঁপিতে লাগিল; এবং জ্বর আসিতে বিলম্ব হইল না।

কিন্তু দেখা গেল, বাঁশের ঝাড়ে পা ঝুলাইয়া কেহ বসিয়া নাই; ছেলেদের একখানা ঘুড়ি সুতা ছিঁড়িয়া আসিয়া বাঁশের ঝাড়ে লট্‌কিয়া আছে। সাদা কাগজের

ঘুড়িখানা ঠিক্ মানুষের মত না দেখাক্, আঁধারি জ্যোৎস্নায় ভুল হওয়া আশ্চর্য্য নয়।—

মানীর ঐ দাঁত ভাঙ্গা ছাড়া আরো একটি অনিষ্ট হইল। সে পাঁচমাস গর্ভবতী ছিল; ভয় পাওয়ার দু'দিন পরেই গর্ভ নষ্ট হইয়া গেল।..রসির সঙ্গে এই ঘটনার সংস্রব এই খানে যে, ঘটনার ঠিক্ পূর্ব্বদিনে রসি মানীকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে চাহিয়াছিল, যাহা পরস্পর শুনা যাইতেছে তাহা যথার্থ কি না, এবং যথার্থ যদি হয়, তবে ক'মাস?

গ্রামের অন্তঃপুরে এবং অন্তঃপুরের বাহিরেও ফিস্-ফিস্ চলিতে লাগিল,—রসিই খেয়েছে ওর ওই পেটের ছেলেটাকে।

রসির একান্ত ইচ্ছা, মরা মানুষের কথাটা রাখে। অপমান হইয়াও সে নিরস্ত হইতে চাহে নাই। এবার সে মনের ইচ্ছাটা মানুষের মুখে গুঁজিয়া দিল।...ইহজন্মে রসিকে কেহ মা বলিয়া ডাকে নাই...কেহ ডাকিবে এ আশাও নাই···তবু একটি কচি প্রাণ, প্রথমে নির্লিপ্ত—

তারপর ধীরে ধীরে বেড়িয়া ধরিবে—

এ যে বড় লোভের জিনিষ।··

কিন্তু গুজব শুনিয়া সনাতন দ্বিতীয়বার রাগিয়া আগুন হইয়া গেল।

গর্ভের সন্তান যে বাহির করিয়া খায় সেই রাক্ষসী চায় তার ছেলেকে!····· সে কথা না হয় না ধরা গেল, দুপুরের মাঠে তাহার জন্য জল ভাত বহন করিবে কে ঐ ছেলেটি ছাড়া!···

মনে মনে অতিশয় কটু হইয়া ঐ কথাটাই তোলা-পাড়া করিতে করিতে সনাতন পথ দিয়া যাইতেছিল, এমন সময় তার সম্মুখেই পড়িয়া গেল সেই রসিই।

সনাতন আগে বাহির করিল দাঁত; তারপর বলিল—আঁটকুড়ি, ডাইনি।

দুইজনে চোখোচোখি হইয়া দাঁড়াইল—

সনাতন বলিতে লাগিল,—আমার ছেলের কথা ফের যদি তোর মুখে শুনি, বুড়ি, তবে তোর মুখে দেব গোবর গুঁজে। বলিয়া থু থু করিয়া খানিকটা থুথু মাটিতে ফেলিল।

রসি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল—

তার হাড় পর্য্যন্ত কাঁপিতে লাগিল।

সনাতন তার মুখের সামনে এক জোড়া বুড়ো আঙুল নাড়িয়া নাড়িয়া বলিতে লাগিল,—তোকে আমি ভয় করব ভেবেছিস্?···তোকে আমি পাঁকে পুঁতে না মারি ত' আমি···

এ-দিকে রসি, ও-দিকে সনাতন—

উভয়েই ভয়ঙ্কর।

কাজেই কাহাকেও না চটাইয়া যদি সালিশে কাজ হাসিল হয় তবে সে-ই উত্তম।······আইন সনাতনের অনুকূলে; মা অভাবে জন্মদাতাই ছেলের মালিক; সে যদি ছেলেকে নিজের কাছে রাখিতে চায়, তাহাতে কারো কিছু বলিবার নাই।

আবার এ-দিকে রসি—

হাড়ে তেমন জোর নাই, মুখেও দন্ত নাই; কিন্তু মনের জোর বেজায়।······সে না করিতে পারে এমন কাজ নাই।

সংঘর্ষ এই দু'টিতে।

সনাতনের দেহ চুলকানিতে ভরিয়া উঠে নাই বা তার ঘর জ্বলিয়া ওঠে নাই—কেবল সে মথুরের বাপ বলিয়া।

কিন্তু গ্রামের লোক নির্ভাবনায় কোনো পক্ষ অবলম্বন করিতে না পারিয়া দুর্ভাবনায় আকুল হইয়া উঠিল।

দু'দিকই বজায় থাকে ইহারই একটা উপায় চিন্তা করিতে করিতে চট্ করিয়া চাটুয্যে মহাশয়ের একটা বুদ্ধি খুলিয়া গেল। বলিলেন,—এক কাজ করা যাক্। বলিয়া উভয় সঙ্কট উত্তীর্ণ করিয়া দিবার যে মধ্য-পথটা তিনি দেখাইয়া দিলেন তাহা পরিষ্কার চোখে পড়িলেও আপত্তি তুলিলেন নিস্তারণদা। বলিলেন,—সেটা হ'তে পারে বটে, কথাটা অনেক আগেই আমাদের মনে পড়া উচিত ছিল, কিন্তু—

তারপর বোধ হয় আরো-সহজ একটা পথ আবিষ্কার করিতে না পারিয়া বলিলেন,—আচ্ছা, তাই বলে দেখো।

তখনই সনাতনকে ডাকা হইল।

চাটুয্যে মহাশয় বলিলেন,—সনাতন, তোর ছেলেকে তার মাসীর কাছে পাঠিয়েদে। আমাদের আশীর্ব্বাদে সেখানে সে থাক্‌বে ভালো।

শুনিয়া সনাতন, বুড়ো আঙুল নয়, মাথা নাড়িতে লাগিল।—বলিল,—তা' হয় না, ঠাকুর।

—কেন হয় না?

—তারা বড় গরীব, তা' ছাড়া ছেলেকে দিয়ে আমার কাজ আছে। বলিয়া সনাতন চলিয়া গেল।

ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে সুস্থ দেহে শ্রীবৃদ্ধি হইবে—এই কথাটা ভাল করিয়া কানে তুলিল না প্রথম এই সনাতন; এবং ব্রাহ্মণের আদেশ অবহেলিত হইল গ্রামে এই প্রথম।

রসির সঙ্গে দেখা হইলেই সনাতন মিছিমিছি থু থু করিয়া থুথু ফেলে, বলে,—আঁটকুড়ি ডাইনি, তুই মর্‌বি কবে?

রসি চুপ করিয়া থাকে।

এমনি করিয়া সনাতনের পক্ষ হইতে প্রাণপণ আক্রোশ প্রকাশ, এবং রসির পক্ষ হইতে প্রাণপণ ধৈর্য্যরক্ষা চলিতে চলিতে একদিন রসির ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে।

হাতে কোঁচ, রশি, বৈঠা লইয়া সনাতন মাছ মারিতে চলিয়াছে; সঙ্গে নৌকা ঠেলিবার লগি লইয়া ভুবন।

পথে রসির সঙ্গে তাহাদের দেখা হইয়া গেল।

বুড়ী তুর্‌তুর্ করিয়া চলিয়াছে; সনাতনের গলার শব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া আজ সে-ই পিচ্ করিয়া খানিকটা থুথু মাটিতে ফেলিল—

এমন অপমান আর নাই—

সনাতন এক নিমিষেই খুন চাপিয়া হাতের বৈঠা মাটিতে ফেলিয়া রসির বুক-বরাবর কোঁচ তুলিল।

রসি আর্ত্তনাদ করিয়া পিছাইয়া যাইতেই—

খানিক আগেই বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল—

পিছলে পা দিয়া দু'বার টাল খাইয়াই সে মাটিতে পড়িল।

ভুবন তাহাকে ধরিয়া তুলিল বটে, কিন্তু রসির মূর্ত্তি তখন ক্রুদ্ধ মার্জ্জারীর মত ভয়ঙ্কর।···রাগে তার গা ফুলিয়া রোঁয়া খাড়া হইয়া উঠিয়াছে...দৃষ্টি স্থির...চক্ষু জলপূর্ণ···চোখের উপরকার লোল চর্ম্মটা পর্য্যন্ত যেন কাঁপিতেছে।—

ভুবনের বুক কাঁপিতে লাগিল—

কিন্তু সনাতন দাঁত মেলিয়া হাসিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে লোক জমিয়া গেল—

রসি কাঁপিয়া কাঁপিয়া সবারই সম্মুখে অভিসম্পাৎ দিল,—অল্লেয়ে, আমায় মারতে উঠেছিলি? ভগমান তা' দেখেছেন। তুই মাছ মারতে চলেছিস্—ঐ মাছই যেন আজই তোকে মারে। বলিয়া রসি চলিতে আরম্ভ করিল।—

দু' একজন সরিয়া পড়িল।

কোঁচ রশি বৈঠা কুড়াইয়া লইয়া সনাতন আবার রওনা হইল, কিন্তু ভুবন পিছাইয়া দাঁড়াইল; বলিল,—

সনাতন-দা, তুমি আজ একাই যাও, ভাই। আজ যাত্রা ভাল নয়।

সনাতন ফিরিয়া দাঁড়াইল; বলিল,—ক্ষ্যাপা না পাগল! পেয়েছে আমাকে, মরি ত' আমি মরব। আয়।

কিন্তু যাহারা দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইত্যবসরে চোখ টিপিয়া ভুবনকে নিষেধ করিয়া দিয়াছে। ভুবন নড়িল না, বলিল,—না, আমি যাব না, দাদা, ক্ষমা করো। পারো ত' আর কাউকে সঙ্গে নেও।

—দরকার নেই, আমি একাই একশো। ঐ মাগীর কথায় যদি মানুষ মরত তবে ত' বাঁচতাম, তোদের মুখ আর দেখতে হত না।

বলিয়া সনাতন একাই গেল।

বর্ষার জল নদী ছাপাইয়া ধানের ক্ষেতে প্রবেশ করিয়াছে। ক্ষেতে আধ-হাত জল।

বড় বড় রুই কাৎলা, বোয়াল, আড় প্রভৃতি মাছ সেই অল্প জলে চরিয়া বেড়ায়—

সনাতনের শিকার তারাই।

কোনো মাছের পিঠটা জলের উপর জাগিয়া থাকে, কাহারো গতিটি শুধু লক্ষ্য হয়...

অতি সন্তর্পণে ডিঙ্গি বাহিয়া তাহাদের সন্ধানে ফিরিতে হয়, এবং চোখে পড়িলেই অব্যর্থ সন্ধানে কোঁচ নিক্ষেপ করিতে পারিলেই কাজ প্রায় শেষ হইয়া যায়, বাকি যা থাকে তা' অতি সামান্যই।—

ছোট নদী

সনাতন ডিঙ্গি ভাসাইয়া দিয়া ওপারের ধানের ক্ষেতে প্রবেশ করিল

একখানা যাত্রীর নৌকা গুণ টানিয়া উজান দিকে বাহিয়া গেল।...সূর্য্যাস্তের বিলম্ব নাই—সময়টি অতি সুন্দর...মেঘের গায়ে বর্ণ বৈচিত্র্যের সমারোহ...জলে স্থলে সোনার আভা...গাছের মাথায় আলোর মুকুট।...

কলসী ঘাড়ে এক ব্যক্তি ঘাটে জল লইতে আসিয়া হাঁকিয়া বলিল,—সনাতন, হ'ল কিছু?

কিন্তু সনাতনের মন প্রাণ জলের উপর একটি রেখার সন্ধানে নিমগ্ন হইয়া গেছে—কৌতূহলের প্রত্যুত্তর দিবার সময় তার নাই।

সনাতনের ডান হাতে উদ্যত কোঁচ—

বাঁ হাতে লগি—

নিঃশব্দে ধীরে ধীরে সে ডিঙ্গি ঠেলিয়া চলিয়াছে, চারিদিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।......

চলিতে চলিতে অকস্মাৎ চোখে পড়িয়া গেল সেই রেখাটি, জলের উপর একটা চেরা দাগ—

একেবারে সম্মুখে।

সঙ্গে সঙ্গে সনাতনের ডান হাতখানি আর একটু ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল, কোঁচ নিক্ষিপ্ত হইল।......

লক্ষ্য অব্যর্থ—শিকার বিদ্ধ হইয়াছে—

জলের উপর রক্ত—

কিন্তু পরক্ষণেই শক্তিশালী জীবের দেহ মোচড় খাইয়া উল্টাইয়া যাইতেই সেই টানে সনাতনও জলে পড়িল।—

জল তোলপাড় করিয়া জায়গাটা একেবারে কাদায় রক্তে পিঙ্গল গাঢ় হইয়া উঠিল।

এমন আর কোনোদিন হয় নাই—

সনাতন হঠাৎ ভয় পাইয়া গেল—

নিঃশব্দ আকাশে যেন একটি ক্রুদ্ধ কণ্ঠ বাজিয়া উঠিল, —তুই মর্। কোঁচ মাটির ভিতর চাপিতে চাপিতে সে একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিল—দৃষ্টির পরিধির মধ্যে মানুষ কোথাও নাই, বৃত্তাকার অন্ধকার যেন কেন্দ্রের পানে গুটাইয়া জড়ো হইয়া আসিতেছে

হঠাৎ সেই জীবটা জলে একবার লেজ আছ্‌ড়াইল। মাছই বটে; কিন্তু এখন ইহাকে তুলিবার উপায়! মাটির সঙ্গে চাপিয়া পড়িয়া আছে;...টানিলে তিলার্দ্ধ নড়ে না।

শিকারে ধৈর্য্যের দরকার, সনাতনের তাহা জানা আছে। মাছ ভাসিয়া উঠিতে বাধ্য—

এবং ঘটিলও তাই।

গাছের মত প্রকাণ্ড এক চিতল মাছ; পিঠ কালো, কিন্তু দেহখানা যেন রজতনির্ম্মিত। সনাতনের অন্তর আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

মাছের ক্ষয়িতবল অসাড় দেহ জলের উপর ভাসিতে লাগিল। সনাতন কোঁচ ধরিয়া তাহাকে টানিতে টানিতে নৌকার কোলে আনিয়া নিজে নৌকায় উঠিয়া পড়িল—

কিন্তু মাছটাকেও নৌকার উপর টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেই মাছের দেহটা ধনুকের মত বেঁকিয়া পড়ায় তাহাকে তোলা গেল না—

ঠেলিয়া তুলিতে হইবে।

সনাতন কোঁচ নামাইয়া আবার জলে নামিল—

কিন্তু না নামিলেই ভাল হইত।

সনাতন দুই হাতে মাছটাকে বেড়িয়া ধরিয়া হাত-তোলা করিয়া নৌকায় তুলিবার উদ্দেশ্যে ঝুঁকিয়া পড়িতেই মাছটা লাফাইয়া উঠিল।

মৃতপ্রায় মাছের দেহে অত শক্তি কোথা হইতে আসিল কে জানে—

মাছের সমস্ত দেহের গতিবেগ আর ওজনটা মুদ্গরের মত উঠিয়া সনাতনের বুকে লাগিল—

কণ্ঠের ভিতর কেমন একটা কঠিন শব্দ হইল—

পৃথিবীতে বায়ু নাই—

সম্মুখে আলো নাই—

ক'টি মুহূর্ত্ত—

ক'টি মুহূর্ত্ত চেতনার বাহিরে কাটাইয়া সনাতন যখন জাগিয়া উঠিল তখনও সে কোঁচের হাতল চাপিয়া ধরিয়াই দাঁড়াইয়া আছে। বুকের উপর কয়েকবার সে বাঁ হাত খানা বুলাইয়া লইল...ব্যথাটা যেন নিঃশ্বাসের পথ ছাড়িয়া দিতে চাহিতেছে না।—

নাকালের একশেষ করিয়া এবং বহু চেষ্টার পর মাছ নৌকায় উঠিল—

সনাতনের মনে হইল,এইবার তোমায় পেয়েছি, বাবা।

কিন্তু পায় নাই—

মাছের শক্তি অত শীঘ্র নিঃশেষ হয় না।

কোঁচের বঁড়শীগুলি এ-পিঠে বিদ্ধ হইয়া ও-পিঠ দিয়া বাহির হইয়া গেছে—তাহাই লইয়া মাছ নৌকার উপর যেন কুস্তি বাধাইয়া দিল...মোচড় খাইয়া, পুচ্ছ আছড়াইয়া, সনাতনের কোঁচের কাঠির চার পাঁচটা মট্‌মট্ করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়া, ডিঙ্গি কাৎ করিয়া, কয়েক ঝলক জল তুলিয়া দিল।

সনাতন মনে মনে শপথ করিল—ভবিষ্যতে ধারাল' কাঠারি একখানা যদি সে না আনে তবে সে—

মাছ খাবি খাইতেছে।

মৃত্যুর দৃশ্যে সনাতনের আনন্দ উপ্‌ছিয়া পড়িতে লাগিল। সনাতন চিতলের চোয়ালের ভিতর গুণের দড়ি পরাইয়া তাহাকে ঝুলাইয়া দিয়া ডিঙ্গি ঠেলিয়া বেশী জলে দিল।

কিন্তু তার বুকের ব্যথাটা তখনও মরে নাই। ডিঙ্গি ঘাটে যখন পৌঁছিল তখন মাছের মৃত্যু ঘটিয়া গেছে।

গ্রাম ভাঙ্গিয়া লোক আসিল মাছ দেখিতে। অত বড় মাছ সে তল্লাটে আর দেখা যায় নাই।

পাঁচ সাত জনে হেঁও হেঁও করিয়া সেই অদ্বিতীয় মাছ টুকরা টুকরা করিয়া কাটিল। এবং গ্রামময় বিতরণ করিবার পরও অবশিষ্ট যাহা সনাতনের নিজের জন্য রহিল তাহাও বিস্তর।

রসির অভিসম্পাৎ যে কেমন করিয়া ফলিতে ফলিতে সনাতন রক্ষা পাইয়াছে সেই লোমহর্ষণ কাণ্ডটি সনাতনের মুখে অবগত হইয়া মাছের ভাগ হাতে করিয়া অনেকেই কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু কাঁপুনিটা কম—

বক্রোক্তি, পরিহাস এবং হাসাহাসি যাহা হইল তাহাই প্রচুর। সকলেরই এক মত দেখা গেল—

রসির মন্ত্র তন্ত্র সব ফক্কা—

গ্রামের লোকগুলি ভয় পাইয়া এতদিন চূড়ান্ত আক্কেল-হীনতার পরিচয় দিয়াছে। এখন হইতে—

কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত আসিয়াই থামিয়া গেল।

রসির মন্ত্র তন্ত্র পদদলিত করিয়া চলিবে, এটা প্রকাশ্য সভায় দাঁড়াইয়া ব্যক্তিগত ভাবে প্রচার করা এত দিনের অনভ্যাসে যে-কাহারো পক্ষেই বড় দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে।—

মাছ রান্না হইল—

সেই মাছের ঝোল, আর ভাত।

মথুরের আনন্দ দেখে কে! সে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল......

সনাতন মথুরকে লইয়া খাইতে বসিল—

সম্মুখে থালায় ভাত, মাল্‌সায় এক মাল্‌সা মাছ আর ঝোল···চিতল মাছের লম্বা লম্বা পেটির ডগা মাল্‌সার কাঁধ ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

মথুরের খুব পুলক—

এমন ভোজ তার জীবনে এই প্রথম।

সনাতনেরও খুব ফুর্ত্তি।

দু' জনে হাসিয়া হাসিয়া খাইয়া চলিয়াছে—মাছ আর ভাত। কঞ্চির মত বড় বড় পেটির কাঁটা পাতের গোড়ায় স্তূপীকৃত হইয়া উঠিল।

সনাতন বলিল,—মাছের কাঁটা বেছে খাস্; গলায় বাধবে।

মথুর বলিল,—তাই খাচ্ছি, বাবা।

বাপের গাল-ভরা আদর মথুরের এই প্রথম পাওয়া। মথুর কলকণ্ঠে বলিয়া চলিল,—এমন মাছ কোনোদিন খাই নাই, বাবা। বড় ভালো লাগছে। সব মাছ দিয়ে দিলে কেন? আমরা রেখে রেখে এক মাস দু' মাস ধরে খেতাম। আবার যে দিন মারবে সে দিন যেন কাউকে দিও না, ওরা মেরে খেলেই পারে—হি হি হি······

মথুরের হঠাৎ হাসির কারণ এই—

একগ্রাস ভাত গিলিয়াই সনাতন দুই হাত দিয়া নিজেরই গলা চাপিয়া ধরিয়াছে···চোখ ঠিকরাইয়া উঠিয়াছে, যেন কেউ ভিতর হইতে ঠেলিয়া দিতেছে।

বাপের চেহারা দেখিয়া মথুর খুব হাসিতে লাগিল।

সনাতন আসন ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল—

কণ্ঠের ভিতর বারম্বার আঙ্গুল দিয়া এমন সব উৎকট শব্দ করিতে লাগিল যাহার মত তামাসা আর নাই।···

মুখ লাল আর স্ফীত হইয়া আকারে যেন গোল হইয়া উঠিল; সনাতন আর স্থির হইতে পারে না—

বসিয়া পড়িল।

গলা দিয়া এক ঝলক রক্ত আর একটা যন্ত্রণার অব্যক্ত নিনাদ বাহির হইল—

তারপর শুইয়া পড়িয়া সনাতন দুই হাত আছড়াইয়া মাটি পিটিতে লাগিল—

গড়াইতে সুরু করিল; দেহ তার বেঁকিয়া চুরিয়া ভাঙ্গিয়া দুমড়াইয়া গলা দিয়া খালি গোঁ গোঁ শব্দ বাহির হইতে লাগিল।

মথুর এতক্ষণে ভয় পাইয়া হাসি থামাইয়াছে,

যাইতে সাহস হইল না, দূরে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল,—বাবা, থামো থামো।

কিন্তু তার বাবা তখন পরের হাতে, নিজে থামিবার উপায় নাই।—

মথুর ছুটিয়া বাহির হইল—

উঠানে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিল,—বেহারী কাকা! বেহারী কাকা!

"যাই" বলিয়া সাড়া দিয়া কিছু বিলম্বে যখন বেহারী আসিয়া হাজির হইল তখন সনাতনের দেহের আক্ষেপ শান্ত হইয়া গেছে।

দেখিতে দেখিতে লোক জমিয়া গেল।

ডাক্তার আসিলেন; বলিলেন,—এ্যাস্‌ফিক্সিয়া। মাছের শিরদাঁড়ার হাড় বায়ুপ্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া মধ্য পথে আটকাইয়া আছে।—

রসিও আসিয়াছিল; অন্ধকারে দাঁড়াইয়াছিল। লুকাইয়া আস্তে আস্তে সে বাহির হইয়া গেল।

রাজু-পণ্ডিত

—পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর—

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১২

হরেকৃষ্ণের কীর্ত্তি কাহারো কাছে অবিদিত ছিল না। অজ্ঞ লোকে সহজে কোন কথা বুঝে না; কিন্তু একবার বুঝিলে আর রক্ষা নাই! কল্পনার সাহায্যে, তিলকে তাল করিতে তাহাদের কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না। হরেকৃষ্ণ অতি শীঘ্র শ্রীঘরের দিকে যাত্রা করিবে, ইহা যেন সকলে চোখে দেখিতে পাইতে লাগিল!

হরেকৃষ্ণকে কেহই পছন্দ করিত না। মানুষের ভিতরে সত্যকার বস্তু না থাকিলে মৌখিক দম্ভ একেবারে অসহ্য হইয়া পড়ে; বিষহীনের চক্র, তাই বোধ হয়, একটা অবজ্ঞার কথাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

[illegible] মুহূর্ত্ত— [illegible] [illegible] রাজুর সহিত অনতিবিলম্বে যদি সে বন্ধুত্ব করিতে না পারে তাহা হইলে তাহার সমূহ বিপদ। ধর্ম্মের কল, লোকে বলে, বাতাসে নড়ে। রাজুর কানে, কোন না কোন দিন, সকল কথা গিয়া পৌঁছিবেই পৌঁছিবে, তখন হরেকৃষ্ণ ত জেলে; কে তাহাকে রক্ষা করিবে?

অতএব কালক্ষয় না করিয়া সে অতি প্রত্যুষে গিয়া রাজুর গৃহে উপস্থিত হইল। রাজু তখন সবে মাত্র উঠিয়াছে।

পথে যাইতে যাইতে সে কি বলিবে না বলিবে তাহা অনেকটা সাজাইয়া লইয়াছিল; কিন্তু রাজুর সামনে আসিয়া সব যেন ওলট্ পালট্ হইয়া গেল!

রাজু জিজ্ঞাসা করিল, কিরে, এত সকালে; কি মনে করে?

রাজু যে তাহাকে তাহার মনের মতলবখানা কি সর্ব্বপ্রথমে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিবে, তাহা তাহার বুদ্ধিতে আসে নাই। তাই সে একটু থতমত খাইয়া বলিল, এজ্ঞে শুনছি হরেকিষ্টো-বাবু নাকি খুন ক'রেছে, জেল হবে।...

ভগা মনে করিয়াছিল যে এরূপ একটা কথা বলিলে রাজু খুসী হইয়া উঠিবে; কিন্তু সে রাজুর মুখ দেখিয়া পরিষ্কার বুঝিতে পারিল, যে রাজু প্রসন্ন হয় নাই।

রাজু বিরক্ত হইয়া বলিল, তোদের ছোট-মুখে এ সব বড় কথা কেন রে?......

ভগা অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, এজ্ঞে, তাই শুনলুম, আমরা কি জানি!......

রাজু বলিল, এখনো পুলিশ তদন্ত হয়নি। কোথায় কি বল্‌বি, শেষ পর্য্যন্ত তোকে নিয়েই পুলিশে একটা টানা-হেঁচ্‌ড়া করতে থাক্‌বে, কাজ কি বাপু, তোর পরের কথায় থেকে?

ভগা পুলিশ টানাটানি করিবে শুনিয়া ভয় পাইল; কারণ পুলিশের প্রতাপ সে কিছু কিছু জানিত; একবার সে দুর্ভোগ গিয়াছে; তাহার সে কথা মনে পড়িলেও আজও হাত-পায়ের নখের মধ্যে যেন বিষের জ্বালা অনুভব করে; তাই সে শিহরিয়া উঠিল।

ভগা ত্বরিতে দুই কানে হাত দিয়া বলিল, এই বাবু, নাক কান মল্‌ছি, আর একথা কারুর সাম্‌নে মুখে আন্‌বো না......

রাজু তাহার ভয় দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল, হুঁ খুব সাবধানে থাক্‌বি, একেই লোকে জানে তোর সব কাণ্ড কারখানা......

আর বলিতে হইল না, ভগা বসিয়া পড়িয়া কান্নার ভাণ করিয়া বিকৃত-স্বরে বলিতে লাগিল, বাবু, আমায় মাপ কর, আমরা ছোটলোক, গরীব গুরবো, পয়সার জন্যে কখন কি করি না করি......

ভগার মায়া-কান্না দেখিয়া রাজুর সে-দিনের কথা হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, সে বলিল, ঠিকতো, তোর যে আবার হরেকৃষ্ণের সঙ্গে বড় পীরিত রে; আর সাপ-টাপ্‌ ধরচিস্‌?

ভগা বুঝিল রাজুর কোন কথাই অবিদিত নাই; তখন একমাত্র উপায় মিথ্যার কবচে আত্মরক্ষা! তাই সে চোখ মুছিয়া কোমর বাঁধিয়া একটার পর একটা মিথ্যা বলিয়া যাইবে স্থির করিয়া বলিল, আমি কিছুই জান্‌তুম না কিছু আমি বাবু, আমায় শুধু বল্লে, তোর ওই সাপটা চাই, আর একটা বাঁশের চোঙ্গা তোয়ের কর্‌......আমি কি জানি! তাই করছি! শেষকালে মেন্‌কিদি' গেল ল্যাজ নিতে, তখন তো সব বুঝি!......সেই রাতে বাবু, হাঁড়িটার মুখে কাপড় জড়িয়ে—পগারের মধ্যে ফেলে দিনু, সাপ্‌টাকে! ভাবনু তারপর, যদি আসে চাইতে? তখন কি-করি?

রাজু ধমক দিয়া বলিল, যা, যা, বেটা, সকাল বেলায় যত ইচ্ছে মিথ্যে বল্‌চিস?—চুপ্‌ ক'রে থাক্‌;—বাজে কথা বলিস্‌ নে।

ভগা দুই হাত জোড় করিয়া রাজুর পায়ের কাছে নাকখৎ দিতে দিতে বলিল, আমায় এবারের জন্যে মাপ্‌ কর, বাবু......আর কোনদিন এমন হবে না......

রাজু বলিল, আচ্ছা যা হ'য়ে গেছে, গেছে; খবরদার সাবধান—ফের্‌ যদি......

ভগা দুই কান মলিতে মলিতে এতখানি জিভ্‌ বাহির করিয়া বলিল, কখ্‌নো না, কোন দিন হবে না।

রাজু মনে মনে হাসিয়া বলিল, সব ঠিক সত্যি বল্‌, হরেকৃষ্ণ? গিয়েছিল?

না আমি পেলিয়ে গেনু......

কোথায়?

হোই—যেখানে দুচোক যায়......

রাজু বুঝিল যে, সে সত্য কথা বলিবে না; বলিল, আচ্ছা যা,—আর কোনদিন এমন অন্যায় কাজ করিস্‌ নে......আজ তোকে মাপ্‌ কর্‌লুম।

ভগা চলিয়া যাইতেছিল, রাজু তাহাকে ডাকিয়া

বলিল, আর মেন্‌কি তোকে ক'টাকা দিয়েছিল, তাতো বল্লিনে ?

ভগা যেন শুনিতে পায় নাই ভাণ করিয়া পিট্টান দিল।—

ভাল করিয়া তামাক সাজিয়া রাজু মনোযোগসহকারে ধূমপান করিতে বসিল। ভগার কথায় তাহার কোনরূপ চিত্ত-বিক্ষেপ হয় নাই্। সে ভাবিতেছিল, পুলিশই বা এমন উদাসীন হইয়া কেন থাকে ? এত বড় সুযোগ তাহারা কেমন্ করিয়া হেলায় বহিয়া যাইতে দিতে পারে ! বোধ করি ইহার মধ্যে কোন খেলা চলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে দুই তিন দিন কাটিয়া গেল, ব্যাপার কি ? অধর কুণ্ডু হুঁসিয়ার লোক, পুলিশকে কায়দায় আনা কিছুমাত্র শক্ত নয়, এই ধূর্ত্ত লোকটির পক্ষে……

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া রাজু বলিল, ভালই ; এবারে কিন্তু হরেকৃষ্ণের সত্যিকার দোষ খুব বেশী নেই ; নিয়তি—সবই নিয়তি ! তা' না হ'লে দুর্গাটা অমন টপ্ করে মরেই বা যাবে কেন ? ও সব তো যমের অরুচি ছেলে !……তবে হরেকৃষ্ণের ভাল ক'রে শিক্ষা হওয়াও দরকার ; কিন্তু……রাজু অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আকাশের কোলে মেঘের উপর সূর্য্যের লাল আভার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, মুস্কিল, যে একজনকে মারলে —সেই আঘাতের ব্যথাটা গিয়ে লাগে অন্য জনের বুকে !

সত্যি ! কি দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে ও !

সেই রাত্রের কথা তাহার মনে আসিল ; এসেছে আমার কাছে, তারপর, ছুটেছে ভগার বাড়ি ! সাপ, ভগা নিজে ফেলেছে পগারের মধ্যে ? এ আমি, এক বিন্দুও বিশ্বাস করিনে। তারপর, নিশ্চয় তাকে এক মুঠো টাকা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে আর কোথাও ! কি কর্ম্মভোগ ! তারপর ? ঠিক তো, নিজে অজ্ঞান হয়ে মরো-মরো। তাইতো বল্‌চি, ও চোয়াড়টার কি ? না হয়, জেলে ছ'মাস ঘানি ঘুরিয়ে এলো, এদিকে মেন্‌কিটা নিশ্চয় তা'হলে মারা পড়বে।

এই কথা মনে করিয়া তাহার বুকের মধ্যের চাপ্‌টা গলার দিকে ঠেলিয়া উঠিল। তাইতো, তামাকটা বুঝি বড় কড়া, এমন হয় কেন ?

রাজু এক গ্লাস জল খাইয়া বুকটাকে ঠাণ্ডা করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া মনে মনে বলিল, কড়া তামাকই তো খাই সকালে, কিন্তু এমন তো হয় না !

কি এত ভাব্‌চো রাজুদা, বলিয়া মেনকা পিছন হইতে আসিয়া রাজুর পিঠে একটি ছোট্ট ঠেলা দিল। বলো না রাজুদা ? ডাক্‌লে শুন্‌তে পাও না ! কি এত ভাব্‌চো ?

রাজু মনে মনে কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হইল ; কিন্তু মুখে পরম তাচ্ছিল্য ভ'রে বলিল, হুঁ, কি আর ভাববো রে ? মাথা মুণ্ডু……

মেনকা একটু হাসিয়া বলিল, কিন্তু আমাকে তুমি লুকুতে পারবে না, রাজুদা, আমি ঠিক জানি, কি তুমি ব'সে ব'সে ভাবো ··

কি ? বল্‌তো ? বলিয়া রাজু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু তাহার চোখে কৌতূহলের একটি রেখাও ছিল না।

মেনকা,—যাও, আমি ব'লতে চাইনে, বলিয়া দূরে সরিয়া গেল ;—তুমি আমায় বিশ্বাস করবে না, জানি।

রাজু এবার হাসিল, পাগলি, এতে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কি আছে রে ? তুই তো বল্‌চিস্ আমার মনের কথা জানিস্ ; বল্ না দেখি, কি জানিস্ ?

মেনকা বলিল যা-ব'লবো, তুমি তো অম্‌নি ব'লবে, না, ঠিক হয়নি।

রাজু মনে মনে একটু ক্ষেপিল, দূৎ, সত্যি হ'লেও ব'লবো, না ?

তাই কি আমি বল্‌তে পারি তোমায় ? মেনকা হাসিতে হাসিতে বলিল, জানি নে, তুমি কলির যুধিষ্ঠির ?

রাজু হাসিল, দ্যাখ্, সকাল বেলা কেন ক্ষ্যাপাচ্ছিস্ আমাকে বল্ তো? তোর কি আর কোন কাজ নেই, মেন্‌কি?

কাজ, রাজুদা? যার সোয়ামী গৃহত্যাগী তার আবার কাজ কি? বেঁচে থাকাইতো তার বিড়ম্বনা, বলিয়া মেনকা দুই ঠোঁট চাপিয়া হাসি সম্বরণ করিল।

রাজুর মন কিন্তু গভীর ভাবে স্পর্শ ক'রিল, সে বুঝিল যে মেনকা তাহার মনের ব্যথা কাহাকেও দেখাইতে চায় না; হরেকৃষ্ণকে লইয়া যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে, তাহাও একান্ত বাহিরের, মৌখিক।

রাজু বলিল, মেন্‌কি, তোর কথাই ভাব ছিলুম

মেনকা হাসিয়া উত্তর করিল, তা আমি জানতুম, রাজুদা, ভগা এসে কতগুলো যা তা কথা ব'লে গেল বুঝি? ওর কথা তুমি একবর্ণও বিশ্বাস ক'রো না, ব'লে দিচ্ছি, রাজুদা।

রাজু একদৃষ্টে মেনকার মুখে যে রক্তিম আভাটুকু ক্ষণে ক্ষণে খেলিয়া যাইতেছিল, তাহার প্রতি পরম শ্রদ্ধার সহিত চাহিয়া রহিল।

মেনকা কলহের সুরে বলিল, আঃ অমন ক'রে চাও কেন? তা হ'লে আমি চ'লে যাবো, বলচি।

১৩

অবশেষে বাঘ আসিল।

সেদিন কিসের উপলক্ষে পাঠশালার সকাল-সকাল ছুটি হইয়াছিল। পাঠশালার নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে রাজু এক মনে হিসাব-পত্র দেখিতেছিল, এমন সময় কৌটিল্যের অবতার কোটাল আসিয়া উপস্থিত। সেই বাঁকা টুপিকে রাজু ভাল করিয়াই চিনিত।

বসিবার আসন দিয়া সে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু পুলিশ সহসা কথা কহে না, কেবল রাজুর বস্তা হইতে একখানা পাৎলা খাতা টানিয়া লইয়া হাত-পাখার মত সেটাকে জোরে জোরে নাড়িয়া বায়ু সেবন করিতে লাগিল।

অচিরে নীল-কুর্ত্তি চৌকিদার একটা প্রকাণ্ড হাত পাখা লইয়া পিছন হইতে ঝড় তুলিল, জমাদার রোষকষায়িত চোখে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে চৌকিদার বলিল, থানা থেকে দৌড়ে আস্‌চি হুজুর

হুজুর অস্ফুটে গালি দিয়া বলিল, আরো জোরে হাঁক্।

ঘাম শুকাইলে জমাদার-সাহেবের মুখে হাসি ফুটিল, কি হ'য়েছিল, পণ্ডিৎ?

রাজু বলিল, আমারি দোষ ..

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া জমাদার বলিল, কার দোষ, সে বিচার করতে আমি আসিনি, শুধু ব'লে যাও কি কি হ'য়েছিল .. কি করতে এসেছিল হরেকৃষ্ণ তোমার এই পাঠশালায়?

ছেলে ভর্ত্তি ক'রে দিতে।

বেশ, তাতে মারামারি হয় কেন, শুনি?

ছেলেরা .....

তারা তখন কোথায় ছিল?

বাইরে খেল্‌ছিল।

কেন?

সেটা টিফিনের সময়।

তুমি কোথায় ছিলে?

এই ঘরে খাতা লিখ্‌ছিলুম।

তারপর?

হরেকৃষ্ণ বাইরে যেতে ছেলেরা তাকে ক্ষেপিয়েছিল...

জমাদার হাসিল, ক্ষেপিয়ে ছিল? হরেকৃষ্ণ কি শিশু?

রাজু বলিল, বড় রাগী।

হুঁ। কি ব'লে ক্ষেপিয়েছিল?

রাজু বলিল,—

ওরে হরি কিষ্টি,
খেজুর ছড়ি,—গুড়ে মুড়ি
নয়কো ভারি মিষ্টি?

এ কে বানিয়েছে? তুমি?

না।

তবে?

বোধ করি দুর্গাদাস।

বোধ করি? কেন? তুমি তদন্ত করনি?

করেছিলুম, দুর্গাই।

এর মানে তুমি জান? খেজুর ছড়ি—গুড়ে মুড়ি—এর সত্যি মানে কি? খেজুর ছড়ি কি?

রাজু বলিল, আমি একদিন খেজুর ছড়ি দিয়ে হরেকৃষ্ণকে মেরেছিলুম।

তুমি? কবে?

কিছুদিন আগে।

কোথায়?

এইখেনে।

জমাদার দুই চোখ ডাগর করিয়া রাজুর দিকে চাহিয়া রহিল, তুমি? পণ্ডিৎ, তুমি।

রাজু লজ্জায় মাথা অবনত করিল।

জমাদার গভীর অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, ছোঁড়াদের সঙ্গে জুটে, পণ্ডিৎ তোমার স্বভাবও দেখ্‌ছি, ছোঁড়াদের মতন হয়ে গেছে।.....ও-ছড়াও তোমারই তৈরি......গুড়ে মুড়ি কি?

রাজুর দুই কান লাল হইয়া উঠিল, বলিল, না, জমাদার-সাহেব, ওটা আমার তৈরি নয়।

জমাদার অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, ছোঁড়ারাও সহজেই মিথ্যে বলে, পণ্ডিৎ, অনেক সময়ে অকারণেও।

রাজু এবার রাগে নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

জমাদার বুঝিল, রাজু চটিয়াছে, সে তাহাতে মনে মনে আমোদ পাইল। বলিল, তারপর, বলে যাও পণ্ডিৎ—তারপর?

রাজু বলিল, আমার কথা শুনে আপনার লাভ কি? আমি যা' ব'লছি সবই তো মিথ্যে......

জমাদার হাসিয়া বলিল, অত সহজে চটো কেন পণ্ডিৎ, বল, বল,—

রাজু তখনো কথা কহিল না; জমাদার জিজ্ঞাসা করিল, মার খেয়ে হরেকৃষ্ণ তোমার মারলে না?

না।

অমনি ছেড়ে দিলে?

হুঁ।

জমাদার একটু বিস্মিত হইল, বলিল, সে কেমন ক'রে হয়? এই যে বল্লে, সে ভারি গোঁয়ার।

ইত্যবসরে সশব্দে দারোগার প্রবেশ হইল।

কিছুক্ষণ দারোগা এবং জমাদার নিভৃতে কথোপকথনের পর দারোগা অগ্রসর হইয়া আসিয়া খোলা-গলায় বলিলেন, আপনি নতুন লোক, সে অনেক কেচ্ছা, আমি জানি ও-সব।

রাজুর প্রতি চাহিয়া দারোগা-সাহেব বলিলেন, হরেকৃষ্ণের দোষটা আমরা জান্‌তে চাই—পণ্ডিৎ তাই খুলে বলতো......

রাজু বলিল, এবারে তার দোষ খুবই কম।

তবে, দোষ কার?

রাজু মাথা অবনত করিয়া কহিল, দোষ আমারি।

এইবার পুলিশ দুইজনেই হাসিয়া উঠিল।

তুমি ছেলেটার গলা টিপে মেরেছ?

না।

তবে কে?

রাজু বলিল, হরেকৃষ্ণ তাকে আঘাত ক'রেছে সত্য; কিন্তু হরেকৃষ্ণের সকল উত্তেজনার কারণ আমিই।

তবে সে তোমায় খুন করেনি কেন?

রাজু বিষম ফাঁপরে পড়িল।

ছেলেটার কি নাম ছিল ?

দুর্গাদাস।

তার কোন দোষ ছিল ?

সে-ই ছড়াটা তৈরি ক'রেছিল।

তা' হরেকৃষ্ণ জান্‌লে কেমন ক'রে ?

বোধ হয় জানেনি।

তবে ?

দুর্গা ক্ষমা চাইতে অস্বীকার করে।

কেন ?

সে বলে, সে বামুন, শূদ্রের পা ধরবে না।

বটে ! তারপর ?

তাতেই হরেকৃষ্ণ কাণ্ড-জ্ঞানহীন হয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বুঝেছি, বলিয়া দারোগা একটা সিগারেট ধরাইয়া নিবিষ্ট মনে টানিতে লাগিলেন।

সেদিনের মত তদন্ত সেইখানেই স্থগিত রহিল।

থানায় ফিরিবার পথে জমাদার বলিল, এ লোকটা ইডিয়াট্‌।

দারোগা হাসিয়া বলিল, মাষ্টারগুলো সবঅম্‌নিই হয়—একটা লোক পাঁচ বছর মাষ্টারি করলে, একদম গাধা ব'নে যায়।

জমাদার হাসিতে লাগিল।

কিন্তু লোকটা সাচ্চা; এর আগেও দেখেছি। পাজি সেই বেটা; কিন্তু,—দারোগা চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল—যেন কেহ শুনিতে না পায়;—কিন্তু কেস্‌টা টিঁক্‌বে না।

জমাদার জিজ্ঞাসা করিল, কেন ?

আরে লাল-মুখের কথায় সব ভেসে যাবে ! বড় চাল দিয়ে সায়েব-ডাক্তার এনেছিলো; শুন্‌চি অধরের মেয়ে সব খরচ দিয়েছে। ভারি বুদ্ধি বেটির।

বটে! বলিয়া জমাদার যতখানি বিস্মিত হইবার কথা তাহার চেয়ে বেশী অবাক হইয়া রহিল।

দারোগা বলিল, যা হোক্‌, আমাদের খুব হুঁসিয়ারির সঙ্গে কাজ করতে হবে, আজ রাত নটার পর অধরকে ডেকেছি, হরেকৃষ্ণকে নিয়ে আস্‌বে।

বিজয় কি বলে ?

আরে দূৎ, বিজয় কি ক'রবে ? ওটা কি একটা ডাক্তার—সিভিল-সার্জ্জনের কাছে ?

অধর কুণ্ডু খাইতে খাইতে বলিলেন, আমাদের এক্ষুনি বেরোতে হবে মেন্‌কি।

কোথায় যাবে বাবা, উকিল-বাড়ি ?

নাঃ, আজ হরিকে নিয়ে থানায় যাবো......উকিল তো খুব ভরসা দেয়। কিন্তু ওদের কথায় বিশ্বেস নেই মা; দারোগা এখনো বেঁকে রয়েছে—আজ আবার রাজুর জবানবন্দি হয়েছে; শুন্‌চি অনেক বে-ফাঁস কথা বার ক'রে নিয়েছে।......হুঃ, বাহাদুরি ক'রে আগের কাহিনী গুলো না তুল্‌লেই হ'তো; এত করে বল্লুম যে বাপু যা সেদিন ঘটেছিল তাই ব'লো; একরোকা বামুন, যা নিজে বুঝবে......

দূরে পায়ের শব্দ শুনিয়া অধর বলিলেন, দেখিস্‌, এসব কথা তোর মাকে বলিস্‌ নি; এখুনি হাউ হাউ ক'রে কেঁদে সব ফাঁক ক'রে দেবে।

নাঃ, মাকে ব'লবো তোমরা উকিল-বাড়ি গেছো।

হুঁ, আর এক কাজ কর্‌, বলিয়া তিনি মেনকার মুখের দিকে চাহিলেন, বুঝেছিস্‌ ? পাঁচটা তাড়া দিবি, বুঝেছিস্‌ ?

মেনকা ঘাড় নাড়িল।

আর এক কাজ করবি, হরির ডান হাতে সেই যে সেই কবচটা এনেছি, যাবার আগে।—বেঁধে দিস্‌, আর ওকে ব'লবি যে, কথার উত্তর দেবার সময় এমনি ক'রে, বাঁ হাত দিয়ে ধ'রে, তবে যেন কথা কয়; বেশ করে বুঝিয়ে বলিস্‌—ভোলে না যেন।

দুঃখের ম্লান হাসিতে মেনকার মুখখানি ঈষৎ ক্ষুব্ধ হইল।

অধর বলিলেন, হাসিস্ নে মা, আমাদের কি ক্ষমতা আছে? টাকা-কড়িতে কি হয়? সব চেয়ে বড় সেই—

বলং বলং দৈব বলং ॥

সংস্কৃত শ্লোক শুনিলে মেনকার হাসি পাইত, সে অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া অন্য ঘরে পলাইয়া গেল।

—ক্রমশ

পত্র

সাহিত্যে শরৎচন্দ্র

কল্যাণীয়াসু,

আমাদের কথা-সাহিত্যে যে একটা তির্য্যক গতি অধুনা লক্ষিত হচ্চে তার স্পষ্ট সূচনা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার মধ্যেই পাওয়া যায়।

অতএব "আধুনিক-সাহিত্যে"র কাঁধের উপর দোষের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে যাঁরা স'রে দাঁড়াতে চান, তাঁরা হয় অজ্ঞ, নয় "অতি-বিজ্ঞ"!

সেদিন যাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন ক'রে তাঁকে রক্ষণশীলদের নিন্দা-গ্লানি থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন, তাঁরা একটা মজার পন্থাই অবলম্বন ক'রেছিলেন।

তাঁরা যে কথা ব'লেছিলেন তাও আমাদের জানা দরকার।

তাঁরা বলেছিলেন যে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের দেশের সনাতন আদর্শকেই উজ্জ্বল ক'রে তোলার জন্যই পাশ্চাত্য আদর্শের চরিত্র এঁকেছিলেন; সে কেবল একটা তুলনায় সমালোচনা ক'রে দেখিয়ে দেওয়া যে আমাদের আদর্শটা কত বড়! ইত্যাদি—

বঙ্কিমচন্দ্রের সত্যই কি মতলব ছিল তা বলা কঠিন।

অবশ্য একথা সত্য যে, বঙ্কিমের পরবর্ত্তী লেখকেরা বিষয়ে যতখানি সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁর লেখার মধ্যে তা পাওয়া যায় না। অবশ্য এ কথা থেকে যদি কেউ অর্থ করেন যে বঙ্কিমচন্দ্র এঁদের চেয়ে ভীরু ছিলেন তো বল্‌তে হবে যে তাঁরা আমাদের উপর সুবিচার ক'রছেন না।

এটা সহজেই মনে ক'রে নেওয়া যেতে পারে যে, তাঁর সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র এটুকুকেই, অনেকখানি মনে করেছিলেন। কারণ দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করেই সব কথা ব'লতে হয়, আর তিনি তাই ক'রেছিলেন।

যতদূর মনে পড়ে, সেকালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এই মর্ম্মের একটা আলোচনা বেরিয়েছিল। বোধকরি, বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের সেই লেখাটি।

সূর্য্যমুখী এবং ভ্রমরের তুলনায় পণ্ডিত-মহাশয় বলেছিলেন যে সূর্য্যমুখী স্বামীকে যে চক্ষে দেখেন তাই আমাদের দেশের সতীর আদর্শ। সূর্য্যমুখী স্বামীর কোন কাজের কি কোন ব্যবহারের, মনে-মনেও সমালোচনা করেন না। স্বামী গুরু, স্বামী দেবতা, তিনি কোন অন্যায় করেন না, করতেও পারেন না, অতএব সাধ্বী স্ত্রীর পক্ষে স্বামী-দেবতার-পদাঙ্ক অনুসরণ ভিন্ন আর কোন ধর্ম্মের পথ নেই; তাঁর কার্য্য-কলাপ নিয়ে কোন সমালোচনা পর্য্যন্তও স্ত্রীর পক্ষে পাপ।

ভ্রমর কিন্তু সেই ধরণের নারী নন; তিনি স্বামীর কার্য্য-কলাপের আলোচনা করেন, স্বামীর উপর রাগ অভিমান করেন এবং অসহ্য হ'লে রাগ ক'রে স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ ক'রতেও দ্বিধা বোধ করেন না।

বলা বাহুল্য, ভ্রমর পাশ্চাত্য আদর্শের স্ত্রী। তাঁকে আমরা মনে মনে পছন্দ করি না; আমরা সত্যসত্যই সূর্য্যমুখীকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি; এবং মনে করি, সূর্য্যমুখীর মত স্ত্রী নিয়ে সংসারকে স্বর্গ ক'রে তুল্তে পারা যায়।

পণ্ডিত-মহাশয়ের এই মত. তাঁর ব্যক্তিগত মত ব'লে মনে না ক'রে যদি মনে করি যে, সেই সময়ে ঐ মতই সমাজের মত ছিল, তাহ'লে হয়তো বিশেষ একটা মারাত্মক ভুল করা হবে না।

এই যে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের আদর্শ, এটা কোথা থেকে এলো, কবে থেকে আমাদের দেশে প্রচলিত হয়েছিল, তা' বলা শক্ত!

তবে একথা বলা বোধকরি খুব সহজ যে সেকালের পুরুষের মধ্যে—যারা একশোর মধ্যে একশো জনই স্বামী হওয়ার স্পর্দ্ধা রাখতো—তারা সবাই কিছু ঋষি, কি দেবতা ছিল না। এবং এমন কোন কড়া-নিয়ম, কি আইনের সংবাদ পাওয়া যায় না—যাতে ক'রে রক্ত-মাংসের দেহধারী নিতান্ত সাধারণ মানুষকে এই স্বামী-পদলাভ ক'রতে কোন রকম বাধা দেওয়া হ'তো। মোট কথা, আদর্শ স্বামী হওয়ার প্রচেষ্টা পুরুষের দিক্ দিয়ে ছিল কি না সন্দেহ। বরঞ্চ এর বিরুদ্ধে এই পাই যে এক-পুরুষ বহু-বল্লভ হ'তে পারতো; আর সেই পারাটাই ছিল সমাজের নিয়ম এবং হয়ত একটা গর্ব্বেরও বস্তু! অতএব এ সিদ্ধান্তে অনায়াসে আসা যায় যে ঐ আদর্শ কেবল মাত্র স্ত্রীর জন্যে সমাজ প্রবর্ত্তিত করেছিল। সমাজ অর্থে এখেনে পুরুষ-সম্প্রদায় ছাড়া, আর কিছুই নয়।

এই রকম জবরদস্তির ব্যাপার যে-সমাজের মধ্যে এসে দাঁড়ায় সেখানে সত্য বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য; এবং কল্যাণ কিছুতেই তিষ্ঠতে পারে না। বোধকরি এ কথা কেউ অস্বীকার করবে না।

এই জায়গায় আর একটা আদর্শের কথাও উল্লেখ করলে হয়তো কোন দোষ হবে না। সেটা সতী-দাহের ব্যাপার। স্বামী-দেবতার পঞ্চত্ব প্রাপ্তির পরও সতীদের নিষ্কৃতি ছিল না!

আধুনিকের দল যদি এই সব ব্যাপারকে একটু বিচারের চক্ষে দেখতে সুরু ক'রে থাকে তো এতবড় কি অপরাধ হয়েছে বুঝতে পারিনে।

এই প্রসঙ্গে, একটু অপ্রাসঙ্গিক হ'লেও আর একটা কথা বলতে চাই।

সর্ব্ব-শক্তিমান প্রভুরা, দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরে নেও রাজশক্তি আর প্রজাশক্তি, কি চান না যে, তাঁদের শাসিতেরা ঐ সূর্য্যমুখীর মতই, শান্ত-শিষ্ট হ'য়ে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করবে? তাঁদের অন্যায়কে অন্যায় ব'লে আইন করে শ্রীঘরে পাঠাবার দৃষ্টান্ত কি এই পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও নেই? তখন আমরা বড় গলায় কি বলিনে, "স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে"? তখন ন্যায়ের উপর দাঁড়িয়ে কি আমাদের বল্তে ইচ্ছা হয় না,

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে॥"?

সে-যুগের সাহিত্যের আলোচনা করতে গিয়ে একটা বিষয়ে আলোচনা না করলে হয়তো সব জিনিষটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেটা আমাদের দেশের বিধবা-বিবাহের আন্দোলনের কথা।

সেদিন একজন বিজ্ঞ লোক সাহিত্যের শক্তি কত বড় বোঝাতে গিয়ে ব'লেছিলেন যে বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের বিধবা-বিবাহব্যাপারে যদি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সঙ্গে যোগ

দিতেন তাহ'লে বোধকরি সমস্ত ব্যাপারটা অন্য মূর্ত্তি ধারণ করতো! হঠাৎ কথাটা শুন্‌লে মনে হয় এর ভেতর অনেকখানি সত্য নিহিত আছে।

বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের এই আন্দোলন একটা সামাজিক আন্দোলন, এবং এ কথা খুবই সত্য যে বঙ্কিমচন্দ্র সে দিক্ দিয়ে এতে যোগ দেন নি।

কেন দেন নি, তা' আমরা জানিনে।

কিন্তু সাহিত্যের দিক্ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন তাও ত মনে হয় না।

বিদ্যাসাগর-মহাশয় ঠিক যেমনটি চেয়েছিলেন তা' তিনি দেখে যেতে পারেন নি, সত্য, কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে দেশের লোকের মনটা যে অনেকখানি উদার, বড় এবং বিস্তৃত হ'য়ে ওঠেনি, সেই-কথাই বা কেমন করে বলি? বিধবা কন্যা, কি ভগ্নীর বিবাহ দিয়ে একটা সামাজিক গোলমালের মধ্যে গিয়ে না পড়ার হুঁসিয়ারি-বুদ্ধি আমাদের খুব থাকতে পারে; কাজ কি গণ্ডগোলে? কিন্তু তাই ব'লে এই ব্যাপারটার অন্যায়টা উপলব্ধি করার বুদ্ধিও যে আমাদের নেই, একথাও কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। বাঙ্গালী জাত অতখানি নির্ব্বোধ নয়।

বিধবা-বিবাহের আন্দোলন একটা সমাজের পক্ষে খুব ছোট এবং সঙ্কীর্ণ ব্যাপার নয়; বিশেষ করে আমাদের মত একটা রক্ষণশীল সমাজে। এটা একটা কামানের গোলার মতই একদিন এসে প'ড়ে যেন সমাজকে বিধ্বস্ত করে দেবার উপক্রম ক'রেছিল।

মানুষ পরিবর্ত্তন চায়, নূতনকে সে সব সময়ে ভয়ও করে না; কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রাঘাতকে সবাই ডরায়। বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের এই আন্দোলনটা অনেকখানি আকস্মিক হয়েছিল।

পাদ্রিদের হিন্দুধর্ম্মের ওপর আক্রমণ, ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুত্থান, তারপর বিধবা-বিবাহের আন্দোলন—আমাদের সমাজ সেদিন আত্মরক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। পরাধীন ব'লে আমরা দলাদলি করেই নিরস্ত হয়েছিলাম; এমন সব ব্যাপারে য়ুরোপে কত মারামারি কাটাকাটি হয়ে গেছে, তার ঠিক ঠিকানা নেই।

ছিপি-আঁটা সতীত্বের ধারণার মধ্যে সেদিন বিধবার বিবাহের কথা শুনে লোকে আঁৎকে উঠেছিল। সর্ব্বনাশ! তবুও বিদ্যাসাগর-মহাশয় অনেক আটঘাট বেঁধে কথা কয়েছিলেন। কিন্তু লোকে জান্‌তো যে, একবার এই ব্যাপারটা চলে গেলে ঐ সব সূক্ষ্ম বিচার টিক্‌বে না।

নারীর সতীত্বটা কি?—এই প্রশ্নটা শোনার ধৈর্য্য পর্য্যন্ত সেদিন আমাদের সমাজের সত্যক'রেই ছিল না। সেটা দেহের, না মনের? কোন্‌টা বড় কোন্‌টা ছোট? এ সব তর্ক আলোচনার দিন হয়তো এখনো সম্পূর্ণ আসেনি।

কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, আজ অমুক জায়গায় একটি বিধবা-বিবাহ হ'লো এই সংবাদে আমাদের দেশে আর সে চাঞ্চল্য দেখা যায় না! এটা অনেকখানি গা সহা হয়ে গেছে।

শুধু তাই নয়, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে বল্‌তেও শোনা যায় আজকাল যে ওটা চলে গেলে মন্দ হয় না। মোট কথা, বিধবা-বিবাহের কথা শুনে আমরা জাত যাবার ভয়ে আর কানে আঙুল দিইনে।

এখন বঙ্কিমচন্দ্রের কথা আর একটু বলি। তাঁর কথা-সাহিত্যের মধ্যে কি এমন কোন বিধবার চিত্র নেই যার মধ্যে সম্ভোগের লালসার উত্তাপ খুবই?

আছে।

রোহিণীর কথা বলছি।

এখন জিজ্ঞাস্য, যে কেন বঙ্কিমচন্দ্র এই পাপের দৃষ্টান্ত সমাজকে দিলেন? উত্তরে নিশ্চয়ই শুন্‌তে পাবো যে, পাপীর কত বড় শাস্তি হয় এই জীবনে, তাই দেখিয়ে দেবার জন্যে।

তার পরের প্রশ্ন, তার ফলে কি সমাজের কিছুমাত্র পাপ দূর হয়েছে?

এর উত্তরে কেউ বল্‌বেন খুব হয়েছে, কেউ বল্‌বেন না, বরং বেড়েছে।

কিন্তু এ দুটোর একটাও বোধ করি ঠিক নয়। যে পাপ করে সে বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তক পাঠ করার অপেক্ষায় ব'সে থাকে না। রোহিনীর কাহিনী পড়েও কেউ নিজের জীবনের পথ-নির্দ্দেশ করে না। বাস্তব জীবনের সংগ্রামের সঙ্গে এ সবের সম্পর্ক এত কম যে এগুলো ধর্ত্তব্যের মধ্যেই বাস্তবিক আসে না।

পাপের সঙ্গে মানুষের মনের গূঢ় নিহিত প্রবৃত্তি-গুলার এত ঘনিষ্ট যোগ আছে যে বাইরের মৌখিক উপদেশ বোধ হয় কোন কাজেই আসে না। বেদ বেদান্ত গীতা রামায়ণ মহাভারত পড়েও মানুষই অষ্টপ্রহর মিথ্যা বলছে, প্রতারণা করছে, চুরি করছে, মদ খাচ্ছে, বেশ্যালয়ে গিয়ে খুনও করছে!

আমাদের দেশে ধর্ম্মের আলোচনা, সাধনা চর্চ্চা তো সেই আবহমান কাল থেকে চ'লে আসচে—কত মুনি ঋষিরা এলেন, বুদ্ধ কৃষ্ণ চৈতন্য নানক, কত মহাত্মা মহাপ্রভুরা এলেন; কিন্তু কৈ দেশের পাপের ভার কমে কি? টাকা দেখলে মানুষের হাত তেম্‌নি নিশ্‌ পিশ্‌ করতে থাকে, কামিনী দেখলেও তার মন তেম্‌নি চঞ্চল হয়ে ওঠে।

আইন আদালত, জেল জরিমানা কিছুরই কমি নেই, তবুও শুনি, পাপ বেড়েই চলেছে। সুসভ্য আমেরিকাতেও যা আর অসভ্য কাফ্রিদের মধ্যেও তাই।

তাই মনে হয়, শুধু উপদেশের বক্তৃতা দিয়ে সত্যকার কোন কাজই হয় না। সমাজের অন্তরের মধ্যে যে গলদ আছে—তাকে বার করে সমাজকে আবার নূতন করে গড়ে তুল্‌তে না পারলে মানুষের নিস্কৃতির অন্য কোন পথ আছে ব'লে ত মনে হয় না।

এমন একটা কথা প্রায়ই আজকাল শোনা যায় যে মানুষ, সমাজ এবং সভ্যতা নিয়ে এতদিন যা' কিছু খাড়া করার চেষ্টা করে এসেছে—তার প্রায় সবটাই ভুল।

য়ুরোপে এমন সব চিন্তাশীল লোক জন্মেছেন যাঁরা খুব জোরের সঙ্গেই ব'লছেন যে পৃথিবীর যুদ্ধ-বিগ্রহ মারা-মারি কাটাকাটির গোড়ায় অতীত কালের বড় বড় গলদ র'য়ে গেছে; সেগুলোকে দূর করে না দিতে পারলে মানুষ এম্‌নি করেই অশান্তি নিয়ে দিন কাটাতে থাকবে। তাঁরা বলেন যে, নতুন ক'রে মানুষ নিজেকে গ'ড়ে না তুল্‌লে পৃথিবীতে শান্তি আস্‌তেই পারে না।

আমাদের দেশে মহাত্মা গান্ধিও প্রায় এম্‌নি ধরণের কথা বল্‌তে আরম্ভ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্যকার যোগ-সূত্র প্রেম ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই হ'তে পারে না।

বাংলার আধুনিক-সাহিত্যের উপর রাগ ক'রে দু-চারটে প্রবন্ধ লিখিয়ে নিলেই এই বিশ্ব-জোড়া আন্দোলন বন্ধ হ'য়ে যাবে না, নিশ্চয়।

মানুষের প্রাণ জেগে উঠছে—তারই সাড়া ইংরেজের সাহিত্যে আছে, হয়তো তারই আমরা 'নকল-তর্জ্জমা' করছি। সেটা আমাদের অক্ষমতার পরিচয় সন্দেহ নেই; কিন্তু তাতে ফরাসী-সাহিত্য কি রুশ-সাহিত্য ভয় খাবে? ইংরেজের টুপি মাথায় দিয়ে বাঁদর সাজতে দোষ হয় না এদেশের লোকের, যত দোষ তাদের দৃষ্টান্তে স্বাধীন চিন্তা করলেই!

শৈবলিনীর প্রতাপের উপর যে "দুষ্ট-প্রেম" তাও কি আধুনিক-সাহিত্যের? শৈবলিনীর ভীষণ পরিণামের কথা "ঘরে-বাইরের" বিমলা আগে ভাগে পাঠ করে রাখলে নিশ্চয়ই নিখিলেশের দিনগুলো পরম নিরুদ্বেগে কেটে যেতো!

বিধবা-বিবাহের আন্দোলন,—বৃহত্তর নারী-আন্দো-লনের একটা অংশ-মাত্র। এই আন্দোলনে আজ জগতের

সমস্ত সমাজ সংক্ষুব্ধ; এ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের রবীন্দ্রনাথের কি শরৎচন্দ্রের স'রে দাঁড়াবার সাধ্য নেই। যে সব সাহিত্যিক তাই করতে চান, তাঁরা যেন ব্যাকরণ আর অভিধান লেখেন! ধরি মাছ না ছুঁই পানি—এ কথা সাহিত্যে চলে না। গায়ে কাদা মাখতেই হবে, যত বড় হুঁসিয়ার তুমি হও না কেন!

এই "আধুনিক-সাহিত্যের" সঙ্গে শরৎচন্দ্র, অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। একথা তাঁর শত্রু-মিত্র উভয়েই স্বীকার করবে।

একটা তর্ক উঠেছে যে, য়ুরোপের সাহিত্যে বিজ্ঞানের উৎকট উত্তেজনা সম্প্রতি রস-বস্তুকে তিক্ত ক'রে তুলেছে; সেখানে তবুও এসব শোভা পায়; কেননা তারা সত্যকার বৈজ্ঞানিক; কিন্তু আমাদের এই অবিজ্ঞানের দেশে, সাহিত্যের উপর এ-সব অযথা উৎপাত কেন?

এখেনে অনেকগুলো কথা নিয়ে গোল বাঁধে, এক, বিজ্ঞান কি? দুই, রস-বোধই বা কি? তিন, এই রসের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন সম্বন্ধ আছে কি না?

কথা-সাহিত্যে, যেখানে মানুষ নিয়ে ব্যাপার, সেখানে যে সব বিজ্ঞানের প্রয়োজন সেগুলোতে পরীক্ষণের আগার প্রভৃতির তত প্রয়োজন নেই, একথা সহজেই বোঝা যায়। অতএব এই বিজ্ঞানের অজুহাতে কথা-সাহিত্যের মনস্তত্ত্বের দিক্‌টা বন্ধ রাখা বোধ হয় উচিত হয় না। আর আমাদের বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ কিছু সেই অপেক্ষায় তাঁদের কাজ বন্ধ রাখেন নি।

শরৎচন্দ্র তবুও একটা বৈজ্ঞানিক "ট্রেনিং" নেবার চেষ্টা ক'রেছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করতে ব'সে তাঁর "নারীর মূল্যে"র কথা একদম ভুলে গেলে চ'লবে না। অন্ততঃ এটুকু বলা যায় যে তিনি এ বিষয়ে নিজেকে গ'ড়ে তোলার একটা সবিশেষ চেষ্টা এক সময়ে ক'রেছিলেন।

বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথের ভূমি উত্তীর্ণ হয়ে আমাদের কথা-সাহিত্য একটা নূতন সুরের মধ্যে যেন প্রবেশ করছে। এই বর্ণ-বৈচিত্র্য কারুর বা ভাল লাগে, কারুর লাগে না।

এখানে সাহিত্যকে নূতন ক'রে গ'ড়ে তোলার একটা আন্তরিক চেষ্টা চ'লেছে। কাঁচা হাতে 'শিব গড়তে বাঁদর গড়াও' যে একেবারে হচ্চে না, তাই বা কেমন ক'রে বলি? তবে তা নিয়ে মাথা-ব্যথার প্রয়োজন কি?

ধমক খেয়ে কেউ ভাল লেখক হ'য়ে উঠতে পারে না। ধমকেও কোন লেখককে থামিয়ে দেওয়া যাবে না।

যার প্রতিভা আছে সে দাঁড়াবে; যার নেই, সে কালের স্রোতে ভেসে চ'লে যাবে; আর তার কথা কারুর মনেও থাকবে না।

একটা সহজ প্রশ্ন এখানে মনে আসে, সেটা এই, শরৎচন্দ্রের লেখার চাহিদা এত বেশী হলো কেন? এত অল্প দিনের মধ্যে দেশের লোক চিন্‌লেই বা কি ক'রে তাঁকে? যদি এই কথা সত্য হয় যে দেশের লোক চায় না কথা-সাহিত্যের এই অভিনব অভিব্যক্তি, তো' শরৎচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হয়ই বা কি ক'রে?

বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্যে শরৎচন্দ্র যে সুপ্রতিষ্ঠিত বোধকরি তাতে কারুর আর সন্দেহ নেই। এখন দেখা যাক্ সাহিত্যকে তিনি কি দিয়েছেন।

শরৎচন্দ্রের বইগুলোর বিশেষত্ব এই যে তাদের নারী-চরিত্রগুলো খুবই জীবন্ত, ঝাঁজালো বল্লেও বোধ হয় অন্যায় বলা হবে না।

আমাদের বাস্তব-জীবনে নারী যে খুব বেশী পরিমাণে বৈচিত্র্য আনে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; সেই নারী যদি আবার তেজালো ঝাঁজালো হয় তো আর কথাই নেই।

শরৎচন্দ্রের স্ত্রী-চরিত্রগুলি সাধারণের ঘরে-ঘরে যে মেলে, হয় তো ঠিক তেম্‌নি নয়; তারা আপনাদের অধিকার সম্বন্ধে মোটেই আত্ম-বিস্মৃত নয়। পুরুষের সমাজে পুরুষের সঙ্গে সংগ্রাম করে কেমন ক'রে আত্ম-প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারা যায়, তার ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত এবং ইঙ্গিত এদের চলা-ফেরায়, কথা-বার্ত্তায় একান্ত সহজ-সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠে!

শরৎচন্দ্রের কথা-সাহিত্য আমাদের সমাজে নারীত্বের আদর্শ গ'ড়ে তুল্‌তে চায়। তিনি যেন নারীদের ডাক দিয়ে বলছেন, তোমাদের এই পথ, সমাজ এম্‌নি ব্যবহারই তোমাদের উপর চিরদিন ধ'রে ক'রে যাবে, তোমরা স্ব-প্রতিষ্ঠিত হও।

নারী-প্রতিষ্ঠার যজ্ঞে বঙ্কিমচন্দ্র অগ্নি সংস্থাপন করেছেন, রবীন্দ্রনাথ ইন্ধন যুগিয়ে তাকে প্রধূমিত করছিলেন, শরৎচন্দ্র তাতে ঘৃতাহুতি দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছেন!

বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ, তথা-কথিত সভ্য এবং ভদ্রসমাজ নিয়ে তাঁদের কথা ব'লেছেন; শরৎচন্দ্র আরো এক পা অগ্রসর হ'য়ে বল্লেন, এত বড় কি দোষ করলে সমাজের পতিতারা? তাদের কি হৃদয় নেই, না, তারা জানে না ভালবাস্‌তে? সমাজ এবং অদৃষ্টের চক্রেই তারা আজ এই; কিন্তু তাদেরও মন আছে, আত্মা আছে; তাদের জীবন একেবারে ব্যর্থ নয়।

শরৎচন্দ্রের পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ যে এ কথা সাহিত্যে বলেন নি তা' নয়। (তিনি কবি, এবং কাব্যের ভিতর দিয়ে এ সব কথা বলার স্বাধীনতা, বোধ করি, অনেক বেশী আছে। তা ছাড়া কথা-সাহিত্যের চেয়ে কাব্য অনেক অল্প-লোকেই পড়ে)।

দু'-একটা দৃষ্টান্ত দি'—

"যৌবনে দারিদ্র্য-দুখে
বহু-পরিচর্য্যা করি' পেয়েছিনু তোরে
জন্মেছিস্‌ ভর্ত্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে,
গোত্র তব নাহি জানি, তাত।"

* * * *

"উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন
বাহু মেলি বালকেরে করি আলিঙ্গন
কহিলেন, "অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত,
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।"

(ব্রাহ্মণ—চিত্রা)

"আনন্দময়ী মূরতি তোমার
কোন্‌ দেব তুমি আনিলে দিবা?
অমৃত সরস তোমার পরশ
তোমার নয়নে দিব্য-বিভা।"

(পতিতা—কাহিনী)

"আধুনিক-সাহিত্যের" কল্যাণে আজ আমাদের অনেক জিনিষ সম্ভবপর হয়েছে। নারী আজ আর তার সতীত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। এখন আমাদের মধ্যে মনে এই কথা জাগ্রত হয়েছে যে, নারীত্ব বড় না সতীত্ব বড়?

শরৎচন্দ্রের কথা-সাহিত্যে এর নির্ভীক উত্তর পেয়ে পাঠকের মন সভয় বিস্ময়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে!

এই সত্যকে এতখানি সাহসের সঙ্গে সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করার জন্যে বাংলা দেশের যুবক যুবতীরা শরৎচন্দ্রের নিকট কৃতজ্ঞ। বৃদ্ধের দল ভয়-বিহ্বল!

মণিবজ্র ভারতী

চয়নিকা

সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি

শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

......প্রায় বছর দশেক পূর্ব্বে কয়েক জন তরুণ সাহিত্যিকের আগ্রহ ও একান্ত চেষ্টার ফলেই আমি সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়ে পড়ি।

বাংলার সাহিত্য-সাধনার ইতিহাসে এই বছর দশেকের ঘটনাই আমি জানি। সুতরাং এ বিষয়ে বলতেই যদি কিছু হয় ত এই স্বল্প কয়টা বছরের কথাই শুধু বলতে পারি।......

......আমি সামান্য একজন গল্প-লেখক। গল্প লেখার সম্বন্ধেই দু' একটা কথা বলব, কিন্তু সাহিত্যের দরবারে তার কতটুকুই বা মূল্য! কিন্তু সেটুকু মূল্যও আমি আপনাদের নির্ব্বিচারে দিতে বলিনে, কোন দিন বলিনি, আজও বলব না। এ শুধু আমার নিতান্তই নিজের কথা; যে কথা সাহিত্য-সাধনার দশ বৎসর কাল আমি নিঃসংশয়ে অকুণ্ঠিতচিত্তে ধ'রে আছি।

এই দশ বৎসরে একটা জিনিষ আমি আনন্দ ও গর্ব্বের সঙ্গে লক্ষ্য ক'রে এসেছি যে, দিনের পর দিন এর পাঠক-সংখ্যা নিরন্তর বেড়ে চলেছে। আর তেমনি অবিশ্রান্ত এই অভিযোগেরও অন্ত নেই যে, দেশের সাহিত্য দিনের পর দিন অধঃপথেই নেমে চলেছে! প্রথমটা সত্য, এবং দ্বিতীয়টা সত্য হ'লে এ দুঃখের কথা—ভয়ের কথা। কিন্তু এর প্রতিরোধের আর যা উপায়ই থাক্, সাহিত্যিকদের কেবল কটু কথার চাবুক মেরে মেরেই তাদের দিয়ে পছন্দমত ভাল ভাল বই লিখিয়ে নেওয়া যাবে না। মানুষ ত গরু-ঘোড়া নয়। আঘাতের ভয় তার আছে, এ কথা সত্য, কিন্তু অপমানবোধ বলেও যে তার আর একটা বস্তু আছে, এ কথাও তেমনই সত্য। তার কলম বন্ধ করা যেতে পারে, কিন্তু ফরমাসী বই আদায় করা যায় না। মন্দ বই ভাল নয়, কিন্তু তাকে ঠেকাবার জন্যে সাহিত্য-সৃষ্টির দ্বার রুদ্ধ ক'রে ফেলা সহস্রগুণ অধিক অকল্যাণকর।

কিন্তু দেশের সাহিত্য কি নবীন সাহিত্যিকের হাতে সত্য সত্যই নীচের দিকে নেমে চলছে? এ যদি সত্য হয়, আমার নিজের অপরাধও কম নয়, তাই এই কথাটাই

আজ আমি অত্যন্ত সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই। এ কেবল আলোচনার জন্য আলোচনা নয়। এই শেষ কয় বৎসরের প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা দেখে আমার মনে হচ্ছে, যেন সাহিত্য-সৃষ্টির উৎস-মুখ ধীরে ধীরে অবরুদ্ধ হয়ে আসছে। সংসারে রাবিশ বই-ই কেবল একমাত্র রাবিশ নয়, সমালোচনার ছলে দায়িত্ববিহীন কটূক্তির রাবিশে ও বাণীর মন্দির-পথ একেবারে সমাচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর চারদিকের সাহিত্যিকমণ্ডলী এক দিন বাংলার সাহিত্য-আকাশ উদ্ভাসিত ক'রে রেখেছিলেন। কিন্তু মানুষ চিরজীবী নয়, তাঁদের কায শেষ করে তাঁরা স্বর্গীয় হয়েছেন। তাঁদের প্রদর্শিত পথ তাঁদের নির্দ্দিষ্ট ধারার সঙ্গে নবীন সাহিত্যিকদের অনৈক্য ঘটেছে—ভাষা, ভাব ও আদর্শে। এমন কি, প্রায় সকল বিষয়েই। এইটেই অধঃপথ কি না, এই কথাই আজ ভেবে দেখবার।

আর্টএর জন্যই আর্ট, এ কথা আমি পূর্ব্বেও কখনও বলিনি, আজও বলিনে। এর যথার্থ তাৎপর্য্য আমি এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। এটা উপলব্ধির বস্তু, কবির অন্তরের ধন। সংজ্ঞা নির্দ্দেশ ক'রে অপরকে এর স্বরূপ বুঝান যায় না।

কিন্তু সাহিত্যের আর একটা দিক আছে, সেটা বুদ্ধি ও বিচারের বস্তু। যুক্তি দিয়ে আর একজনকে তা বুঝান যায়। আমি এই দিকটাই আজ বিশেষ ক'রে আপনাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত করতে চাই।

বিষ্ণুশর্ম্মার দিন থেকে আজও পর্য্যন্ত আমরা গল্পের মধ্য থেকে কিছু একটা শিক্ষা লাভ করতে চাই। এ প্রায় আমাদের সংস্কারের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। এ দিকে কোন ত্রুটি হ'লে আর আমরা সইতে পারিনে। সক্রোধ অভিযোগের বান যখন ডাকে, তখন এই দিককার বাঁধ ভেঙেই তা হুঙ্কার দিয়ে ছোটে। প্রশ্ন হয়, কি পেলাম, কতখানি এবং কোন্ শিক্ষালাভ আমার হ'ল? এই লাভালাভের দিকটাতেই আমি সর্ব্বপ্রথমে দৃষ্টি দিতে চাই।

মানুষ তার সংস্কার ও ভাব নিয়েই ত মানুষ, এবং এই সংস্কার ও ভাব নিয়েই প্রধানতঃ নবীন সাহিত্য-সেবীর সঙ্গে প্রাচীনপন্থীর সংঘর্ষ বেধে গেছে। সংস্কার ও ভাবের বিরুদ্ধে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা যায় না, তাই নিন্দা ও কটুবাক্যের সূত্রপাতও হয়েছে এইখানে। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি। বিধবা-বিবাহ মন্দ, হিন্দুর মজ্জাগত সংস্কার। গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে বিধবা নায়িকার পুন-বিবাহ দিয়ে কোন সাহিত্যিকেরই সাধ্য নেই নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর চোখে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করবার। পড়বা-মাত্রই মন তাঁর তিক্ত-বিষাক্ত হয়ে উঠবে। গ্রন্থের সমস্ত গুণই তাঁর কাছে ব্যর্থ হয়ে যাবে। স্বর্গীয় বিদ্যা-সাগর-মহাশয় যখন গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ করেছিলেন তখন তিনি কেবল শাস্ত্রীয় বিচারই করেছিলেন, হিন্দুর মনের বিচার করেননি। তাই আইন পাশ হ'ল বটে, কিন্তু হিন্দু-সমাজ তাকে গ্রহণ করতে পারলে না। তাঁর অত বড় চেষ্টা নিষ্ফল হয়ে গেল। নিন্দা, গ্লানি, নির্য্যাতন তাঁকে অনেক সইতে হয়েছিল, কিন্তু তখনকার দিনে কোন সাহিত্য-সেবীই তাঁর পক্ষ অবলম্বন করলেন না। হয় ত, এই অভিনব ভাবের সঙ্গে তাঁদের সত্যই সহানুভূতি ছিল না। যে জন্যই হোক, সে দিনের সে ভাব-ধারা সেইখানেই রুদ্ধ হয়ে রইল—সমাজদেহের স্তরে স্তরে গৃহস্থের অন্তঃপুরে সঞ্চারিত হ'তে পেলে না। কিন্তু এমন যদি না হ'ত, এমন উদাসীন হয়ে যদি তাঁরা না থাকতেন, নিন্দা-গ্লানি-নির্য্যাতন সকলই তাঁদের সইতে হ'ত সত্য, কিন্তু আজ হয় ত আমরা হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থার আর একটা চেহারা দেখতে পেতাম। সে দিনের হিন্দুর চোখে যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি কদর্য্য, নিষ্ঠুর ও মিথ্যা প্রতিভাত হ'ত, আজ অর্দ্ধশতাব্দ পরে তারই রূপে হয়ত আমাদের নয়ন ও মন মুগ্ধ হয়ে যেতো। এমনই ত হয়; সাহিত্য-সাধনায় নবীন সাহিত্য-

কের এই ত সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা। সে জানে আজকের লাঞ্ছনাটাই জীবনে তার একমাত্র এবং সবটুকু নয়, অনাগতের মধ্যে তারও দিন আছে; হোক সে শত বর্ষ পরে, কিন্তু সে দিনের ব্যাকুল-ব্যথিত নরনারী শত লক্ষ হাত বাড়িয়ে আজকের দেওয়া তার সমস্ত কালি মুছে দেবে। শাস্ত্রবাক্যের মর্য্যাদাহানি করা আমার উদ্দেশ্য নয়, প্রচলিত সামাজিক বিধি-নিষেধের সমালোচনা কর্‌বার জন্য ও আমি দাঁড়াইনি। আমি শুধু এই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, শত কোটি বর্ষের প্রাচীন পৃথিবী আজও তেমনই বেগেই ধেয়ে চলেছে, মানব-মানবীর যাত্রাপথের সীমা আজও তেমনই সুদূরে। তার শেষ পরিণতির মূর্ত্তি তেমনই অনিশ্চিত, তেমনই অজানা। শুধুই কি কেবল তার কর্ত্তব্য ও চিন্তার ধারাই চিরদিনের মত শেষ হয়ে গেছে? বিচিত্র ও নব নব অবস্থার মাঝ দিয়ে তাকে অহর্নিশি যেতে হবে,—তার কত রকমের সুখ, কত রকমের দুঃখ, কত রকমের আশা-আকাঙ্ক্ষা,—থামবার যো নেই, চলতেই হবে,—শুধু কি তার নিজের চলার উপরেই কোন কর্ত্তৃত্ব থাকবে না? কোন্ সুদূর অতীতে তাকে সেই অধিকার হ'তে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করা হয়ে গেছে! যাঁরা বিগত, যাঁরা সুখ-দুঃখের বাইরে, এ দুনিয়ার দেনা পাওনা শোধ দিয়ে যাঁরা লোকান্তরে গেছেন, তাঁদের ইচ্ছা, তাঁদের চিন্তা, তাঁদের নির্দ্দিষ্ট পথের সঙ্কেতই কি এত বড়? আর যারা জীবিত, ব্যথায় বেদনায় হৃদয় যাদের জর্জ্জরিত, তাদের আশা, তাদের কামনা কি কিছুই নয়? মৃতের ইচ্ছাই কি চিরদিন জীবিতের পথ রোধ ক'রে থাকবে? তরুণ-সাহিত্য ত শুধু এই কথাটাই বলতে চায়! তাদের চিন্তা, তাদের ভাব আজ অসঙ্গত, এমন কি অন্যায় বলেও ঠেক্‌তে পারে, কিন্তু তারা না বললে বলবে কে? মানবের সুগভীর বাসনা, নর-নারীর একান্ত নিগূঢ় বেদনার বিবরণ সে প্রকাশ কর্‌বে না ত কর্‌বে কে? মানুষকে মানুষ চিন্‌বে কোথা দিয়ে? সে বাঁচবে কি ক'রে?

আজ তাকে বিদ্রোহী মনে হ'তে পারে, প্রতিষ্ঠিত বিধিব্যবস্থার পাশে হয়ত তার রচনা আজ অদ্ভুত দেখাবে, কিন্তু সাহিত্য ত খবরের কাগজ নয়। বর্ত্তমানের প্রাচীর তুলে দিয়ে ত তার চতুঃসীমানা সীমাবদ্ধ করা যায় না। গতি তার ভবিষ্যতের মাঝে। আজ যাকে চোখে দেখা যায় না, আজও যে এসে পৌঁছয় নি, তারই কাছে তার পুরস্কার, তারই কাছে তার সংবর্দ্ধনার আসন পাতা আছে।

কিন্তু তাই ব'লে আমরা সমাজ-সংস্কারক নই। এ ভার সাহিত্যিকের উপরে নেই। কথাটা পরিস্ফুট করবার জন্য যদি নিজের উল্লেখ করি, অবিনয় মনে ক'রে আপনারা অপরাধ নেবেন না। 'পল্লীসমাজ' ব'লে আমার একখানা ছোট বই আছে। তার বিধবা রমা বাল্যবন্ধু রমেশকে ভালবেসেছিল বলে আমাকে অনেক তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছে। একজন বিশিষ্ট সমালোচক এমন অভিযোগও করেছিলেন যে, এত বড় দুর্নীতির প্রশ্রয় দিলে গ্রামে বিধবা কেউ আর থাকবে না। মরণ-বাঁচনের কথা বলা যায় না, প্রত্যেক স্বামীর পক্ষেই এ গভীর দুশ্চিন্তার বিষয়। কিন্তু আর একটা দিক্‌ও ত আছে। এর প্রশ্রয় দিলে ভাল হয় কি মন্দ হয়, হিন্দু-সমাজ স্বর্গে যায় কি রসাতলে যায়, এ মীমাংসার দায়িত্ব আমার উপরে নেই। রমার মত নারী ও রমেশের মত পুরুষ কোন কালেই কোন সমাজেই দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করে না। উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দুসমাজে এর সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হ'ল এই যে, এত বড় দুটি মহাপ্রাণ নর-নারী এ জীবনে বিফল, ব্যর্থ, পঙ্গু হয়ে গেল। মানবের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে বেদনার এই বার্ত্তাটুকুই যদি পৌঁছে দিতে পেরে থাকি ত তার বেশী আর কিছু করবার আমার নেই। এর লাভালাভ খতিয়ে দেখবার ভার সমাজের, সাহিত্যিকের নয়। রমার ব্যর্থ জীবনের মত এ রচনা বর্ত্তমানে ব্যর্থ হ'তে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের বিচার-শালায় নির্দ্দোষীর এত বড় শাস্তিভোগ এক দিন কিছুতেই

মঞ্জুর হবে না, এ কথা আমি নিশ্চয় জানি। এ বিশ্বাস না থাকলে সাহিত্য-সেবীর কলম সেইখানেই সে দিন বন্ধ হয়ে যেত।

আগেকার দিনে বাংলা সাহিত্যের বিরুদ্ধে আর যা নালিশই থাক্, দুর্নীতির নালিশ ছিল না; ওটা বোধকরি তখনও খেয়াল হয় নি। এটা এসেছে হালে। তাঁরা বলেন, আধুনিক সাহিত্যের সব চেয়ে বড় অপরাধই এই, তার নর-নারীর প্রেমের বিবরণ অধিকাংশই দুর্নীতিমূলক, এবং প্রেমেরই ছড়াছড়ি। অর্থাৎ নানাদিক দিয়ে এই জিনিষটাই যেন মূলতঃ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বস্তু হয়ে উঠেছে।

নেহাৎ মিথ্যা বলেন না। কিন্তু তার দু' একটা ছোট-খাট কারণ থাকলেও মূল কারণটাই আপনাদের কাছে বিবৃত করতে চাই। সমাজ জিনিষটাকে আমি মানি, কিন্তু দেবতা বলে মানিনে। নর-নারীর বহুদিনের পুঞ্জীভূত বহু মিথ্যা, বহু কুসংস্কার, বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হয়ে মিশে আছে। মানুষের খাওয়া পরা থাকার মধ্যে এর শাসনদণ্ড অতি সতর্ক নয়, কিন্তু এর একান্ত নির্দ্দয় মূর্ত্তি দেখা দেয় কেবল নর-নারীর ভালবাসার বেলায়। সামাজিক উৎপীড়ন সব চেয়ে সইতে হয় মানুষকে এই খানে। মানুষ একে ভয় করে, এর বশ্যতা একান্তভাবে স্বীকার করে, দীর্ঘ দিনের এই স্তূপীকৃত ভয়ের সমষ্টিই পরিশেষে বিধিবদ্ধ আইন হয়ে ওঠে, এর থেকে রেহাই দিতে সমাজ কাউকে চায় না। পুরুষের তত মুস্কিল নেই; তার ফাঁকি দেবার রাস্তা খোলা আছে; কিন্তু কোথাও কোন সূত্রেই যার নিষ্কৃতির পথ নেই, সে শুধু নারী। তাই সতীত্বের মহিমা প্রচারই হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ সাহিত্য। কিন্তু এই এক ভরসা, Propaganda চালানোর কাযটাকে নবীন সাহিত্যিক যদি তার সাহিত্য-সাধনার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য ব'লে গ্রহণ করতে না পেরে থাকে ত তার কুৎসা করা চলে না; কিন্তু কৈফিয়তের মধ্যেও যে তার যথার্থ চিন্তার বস্তু বহু নিহিত আছে, এ সত্যও অস্বীকার করা যায় না।

একনিষ্ঠ প্রেমের মর্য্যাদা নবীন সাহিত্যিক বোঝে, এর প্রতি তার সম্মান ও শ্রদ্ধার অবধি নেই, কিন্তু সে সইতে যা পারে না, সে এর নাম ক'রে—ফাঁকি। তার মনে হয়, এই ফাঁকির ফাঁক দিয়েই ভবিষ্যৎ বংশধররা যে অসত্য তাদের আত্মায় সংক্রামিত ক'রে নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, সেই তাদের সমস্ত জীবন ধ'রে ভীরু, কপট, নিষ্ঠুর ও মিথ্যাচারী ক'রে তোলে। সুবিধা ও প্রয়োজনের অনুরোধে সংসারে অনেক মিথ্যাকেই হয় ত সত্য ব'লে চালাতে হয়, কিন্তু সেই অজুহাতে জাতির সাহিত্যকেও কলুষিত ক'রে তোলার মত পাপ অল্পই আছে। আপাত-প্রয়োজন যাই থাক্, সেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডী হ'তে একে মুক্তি দিতেই হবে। সাহিত্য জাতীয় ঐশ্বর্য্য; ঐশ্বর্য্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত। বর্ত্তমানের দৈনন্দিন প্রয়োজনে তাকে যে ভাঙ্গিয়ে খাওয়া চলে না, এ-কথা কোন মতেই ভোলা উচিত নয়।

পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়, এই কথাটা এক দিন আমি বলেছিলাম। কথাটাকে যৎপরোনাস্তি নোঙরা ক'রে তুলে আমার বিরুদ্ধে গালিগালাজের আর সীমা রইল না। মানুষ হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেল। অত্যন্ত সতী নারীকে আমি চুরী, জুয়াচুরী, জাল ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে দেখেছি এবং ঠিক এর উল্টোটা দেখাও আমার ভাগ্যে ঘটেছে। এ সত্য নীতিপুস্তকে স্বীকার করার আবশ্যকতা নেই। কিন্তু বুড়ো ছেলে-মেয়েকে গল্পচ্ছলে যদি এই নীতিকথা শেখানোর ভার সাহিত্যকে নিতে হয় ত' আমি বলি, সাহিত্য না থাকাই ভাল। সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়। পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও হয় ত' এক দিন থাকবে না। একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, এ কথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায় ত এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়?

সাহিত্যের সুশিক্ষা নীতি ও লাভালাভের অংশটাই এতক্ষণ ব্যক্ত ক'রে এলাম। যেটা তার চেয়েও বড়, এর আনন্দ, এর সৌন্দর্য্য নানা কারণে তার আলোচনা করবার সময় পেলাম না। শুধু একটা কথা ব'লে রাখতে চাই যে,

আনন্দ ও সৌন্দর্য্য কেবল বাইরের বস্তুই নয়। শুধু সৃষ্টি করবার ত্রুটিই আছে, তাকে গ্রহণ করবার ক্ষমতা নেই, এ কথা কোন মতেই সত্য নয়। আজ একে হয় ত অসুন্দর আনন্দহীন মনে হ'তে পারে, কিন্তু এই যে এর শেষ কথা নয়, আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে এ সত্য মনে রাখা প্রয়োজন।

আর একটিমাত্র কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব। ইংরেজীতে idealistic ও realistic ব'লে দুটো বাক্য আছে। সম্প্রতি কেউ কেউ এই অভিযোগ উত্থাপিত করেছেন যে, আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্য অতিমাত্রায় realistic হয়ে চলেছে। একটাকে বাদ দিয়ে আর একটা হয় না—অন্ততঃ উপন্যাস যাকে বলে, সে হয় না। তবে কে কতটা কোন্ ধার ঘেঁসে চলবে, সে নির্ভর করে সাহিত্যিকের শক্তি ও রুচির ওপরে। তবে একটা নালিশ এই করা যেতে পারে যে, পূর্ব্বের মত রাজারাজড়া জমীদারের দুঃখদৈন্যদ্বন্দ্বহীন জীবনেতিহাস নিয়ে আধুনিক সাহিত্য-সেবীর মন আর ভরে না। তারা নীচের স্তরে নেমে গেছে। এটা আপশোষের কথা নয়। বরঞ্চ এই অভিশপ্ত অশেষ দুঃখের দেশে নিজের অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে রুশ-সাহিত্যের মত যে দিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ-দুঃখ-বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সে দিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশে নয় বিশ্বসাহিত্যেও আপনার স্থান ক'রে নিতে পারবে।……

(১৩৩২ সালে মুন্সীগঞ্জ সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ।)

স্মরণে

শ্রী কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালীর নাকি পেন্‌সন্ প্রাপ্তির পর আর কোনো কাজ থাকে না, "সতী" হবার ঝোঁকের মত, পরলোকের দিকে প্রমোসন্ নিয়ে ঝুঁকে পড়তে হয়—তা না তো ভালো দেখায় না;—শুভানুধ্যায়ীরা নিন্দাও করেন—যদি লোকটার উপকার করতে পারেন।

আমি কা'কেও সে কষ্ট না দিয়ে সরাসরি কাশী এসে পড়ি; যে-হেতু স্থান-মাহাত্ম্যে পরলোকের চিন্তা কাছিয়ে আসে এবং সে-পথে পা-দুটো আপ্‌সে গুটি-গুটি এগুতে থাকে।

কয়েক বৎসর কাটছে, অভাগা কিন্তু সে-পথের খুঁট্ খুঁজে পাচ্ছে না। পাঁচজনে পাঁচ রকম বাত্‌লায়;—এই অবস্থা!

আবার এমন সব রোগ আছে যা একেবারে সারে না—ভেতরে জড় থেকে যায়। সাহিত্য দেখচি তার মধ্যে একটি।

পথের ধারে কোনো এক পরিচিতের বারাণ্ডায় বসে সাহিত্য-প্রসঙ্গই চলছিল। কাশীতে সেটা অবান্তর হলেও—বসন্তের দাগ মিলয় না, অঙ্গের বা সঙ্গের সাথী!

নবীন ব্রতী—তরুণ উৎসাহী শ্রীযুক্ত সুরেশ সংবাদ দিলেন—"শরৎ বাবু এসেছেন, দেখা করতে যাবেন?"

সুরেশ সতেরো বছরেই সাহিত্যিক-শিকারে সিদ্ধহস্ত,—সব্যসাচী বলা চলে। শরৎ বাবুর সঙ্গে "বাৎচিৎ" সারা আছে। এ ক্ষেত্রেও সে আক্ষেপ রাখা হয়নি।

শরৎ বাবুকে দেখবার ইচ্ছাটা সত্যই প্রবল। যিনি

বই-ছাড়াদের কেঁচে বই ধরিয়েছেন, তাঁকে দেখতে হবে বই কি! খৃষ্টানই হয়েছি—তা বলে সরস্বতী পুজো করব না কেনো!

তবে—একটা কথা আছে। শঙ্কিতা "কমল"—আমি "কমল" বলে নলিনাক্ষের সামনে দাঁড়াতে পেরেছিল,—ক্ষীণ হলেও তার সম্পর্কের সাহস ছিল। কিন্তু আমি কি বলে গিয়ে দাঁড়াবো! অবশ্য আমিও ডুবো আসামী, সেটা প্রমাণ করতে পারি। দৃশ্যটা যে বড় বেখাপ্ ঠেক্‌বে! যিনি "অবক্ষণীয়া" লিখেছেন, তিনি "অরক্ষণীয়" সম্বন্ধে কি ভাবেন নি? মূঢ় তাটা মানিয়ে নিতে পারবেন।

সুরেশ বলে উঠলো।—"বাঃ—এই যে,—ঐ তিনি যাচ্চেন। চলুন—চলুন।"—

—"দাঁড়ান্—দাঁড়ান্!"

যন্ত্রচালিতের মত অনুসরণ করলুন। তারপরই সামনা-সামনি!

ভাগ্যে নমস্কার জিনিসটা সংস্কারের মধ্যে ছিল,—প্রথম ধাক্কা সেই সামলে দিলে।

তারপর!

তারপর,—যে কথা ভাবিনি কোনো কালে।—"ইনিই কেদার বাবু,—'কাশীর কিঙ্কিৎ-' এঁরই লেখা!"

দুর্বিষহ! ধরনি দ্বিধা হও!

ধরিত্রী শুধু সম্পর্কে নয়, সত্য সত্যই সীতার মা ছিলেন, তাই তাঁর উপায় হয়েছিল,—আমার বেলা একটু হাঁ করলেই বাঁচতুম!

যিনি কথা কইলেন—তিনিই শরৎ বাবু।—"বেশ লেখা হয়েছে—ঠিক্ লিখেছেন। খুব দেখা হয়ে গেল তো! তা—নাম লুকিয়েছেন কেনো,—নাম গোপন করবার মত লেখা তো আপনার নয়।"

"মাপ করুন, আর লজ্জা দেবেন না। ওই অপরাধের ওপর আবার নাম দিলে,—লোকের আঙুলের ডগায় ডগায় বেড়াতে হ'ত—শর-শয্যা ভীষ্মকেই আরাম দিয়েছিল।"

"না না—আপনি এবার নামটা দেবেন। আর কি কি আছে?"

"কাজ ছেড়ে কাশী এসে কু-কাজের "কিঙ্কিৎ" ঐ যা প্রকাশ পেয়েছে। "ক"য়ের কোটাতেই আছি—আর না এগুতে হয়।"

"সে কি কথা,—লিখবেন বই কি! চলুন না—কথা কইতে কইতেই চলা যাক্,—কোনো কাজ আছে কি?"

"কিছু না। এখানে আবার কাজ কি! এটা এ-পার ও-পারের সন্ধি স্থান বা শুদ্ধি স্থান,—সেগ্রিগেসন্ ক্যাম্প্—ছোঁয়াচ বাঁচাই-খানা আর কি! যেমন প্রথম প্লেগের দিনের "ঢউসা" ষ্টেসন্। সেখানে দিন কতক রেখে ধোঁ-দিয়ে শুদ্ধ (fumigate) করে ছাড়তো, এখানে অনুতাপ এনে ধোঁ-ছাড়িয়ে ছুটি দেয়!"

"বাঃ,—চলুন—চলতে চলতে কথা হোক্।"

পায় পায় উত্তর-মুখো।

নানা কথা চলতে লাগলো।—আমার লক্ষ্য কিন্তু মানুষটির ওপর। খুব সাদাসিদে চাল,—ক্যাম্বিসের জুতো,—তাও পুরো নয়—গোড়ালি নেই! টুইল্ সার্ট—তাও পুরো নয়—দু' একটা বোতাম্ নেই। দাড়ি—তাও পুরো নয়—বাদ্‌সাদ্ দেওয়া। এই ভাব।

বললুম—"আপনাকে বড় কাহিল দেখছি, সম্প্রতি অসুখ থেকে উঠেছেন বুঝি?"

"না, আমি বরাবরই এই রকম। একবার ভাগল-পুরের গঙ্গায় পড়ে এই শরীরেই কাহালগাঁয় গিয়ে উঠি।"

ভালো করে আর একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললুম—"বলেন কি! তা হলে শুধু শক্তিশালী লেখকই নন!"

তিনি হাসতে লাগলেন।

* * *

পঠদ্দশায় দু' বচর "ফ্রেনলজি" (মস্তিষ্কবিচার বিদ্যা) নাড়াচাড়া করে,—অন্যের মাথায় নজর রেখে নিজের মাথাটা খারাপ করবার সুবিধে করে এনেছিলুম। দৃষ্টি

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য থেকে হ'টে, আকৃতিকে আকৃষ্ট; পুস্তক ফেলে মস্তক দেখে বেড়াই,—ফলে ফেল্! যাক্, দেখি সেই অলক্ষ্মী ছাড়েন নি, ভেতরেই কায়েম্ ছিলেন।

মুখ রইলেন কথায়, মন রইলেন মাথায়। চিন্তা চল্লো—

"দেখছি—সঙ্গীতের স্থান সুপুষ্ট, কিন্তু—"রাসবিহারী" বেরয় কোথা থেকে!" ইত্যাদি দুশ্চিন্তা।

চকের রাস্তায় চলা গেছে; মাঝে মাঝে বঙ্কিম বাবু, রবি বাবু আসা যাওয়া করছেন।

পূর্ব্ব সঙ্গীরা বলে উঠলেন—"এই সব দোকানেই খোঁজ করতে হবে।"

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে পড়া গেল। কিসের খোঁজ করতে হবে,—তা জানি না।

দেখি সেটা—কুচোকাচার দোকান,—"হাউস্-ওয়াইফ" হিসেব। মিঞা মালিক।

"ক্যা চাহিয়ে বাবু?"

"ঐ যে গড়গড়াকা নল্চের ওপর মে পিতলের একটা খাপ থাক্তা,—এই দেড় ইঞ্চি আন্দাজ হবে,—জিস্‌কা ওপর ছিলিম বোস্‌তা, তা হায় কি?"

মিঞা নির্ব্বাক।

"ঐ যে গো—তামাকুকা রস্ ছিলিমের ছিদ্র দিয়ে গড়িয়ে পড়কে, একেবারে আস্‌কে ফরাস্ মাটি কর্‌তা;—সেই রস্ যাতে আকে জমে থাক্‌তা—গড়িয়ে পড়বার জো-টি নেই পাতা,—সেই চিজ্ গো! তোমরা তো ও-বিদ্যেকা আদিম্বুর হায় মিঞা সায়েব। হায় কি?"

"নেই সম্‌ঝা বাবু;—ছিলিম্ টুঁড়তে হেঁ?"

"আরে না-না, ঐ ছিলিম্‌কাই সম্বন্ধী হায়,—রসাধার্—রসাধার্।"—

—"বুঝিয়ে দিন না কেদার বাবু, আপনি জানেন বই কি,—জিনিসটা কাশীরও বটে কিঞ্চিৎও বটে।"

কি বিপদ—বলি কি! কোসিস্ করতেই হল; মিঞা সায়েবকে মোলায়েম করে বললুম—"দেখিয়ে—জিস্‌মে তামাকুকা রস্ আয়কে রুক্‌তা হায়—নীচে গির্‌তা নেই। রস্‌দানী—অ্যায়সা কুছ্ নাম হোগা।"

শরৎ বাবু যেন বল্ পেয়ে বল্লেন—"হ্যাঁ এইবার কাছিয়েছে।" তারপর গমক্ দিয়ে বল্লেন—"বুঝ্‌লে মিঞা সায়েব—রস-খপ্পর্!"

এক দম্ অত বড় ফার্সি কথাটা শুনে হেসে ফেললুম,—বললুম—"এইবার বলুন না—

"গৌড়জন যাহে"—

তা হলেই সাফ্ বুঝে নেবে!"

শরৎ বাবুও হেসে বললেন—"তাইত' কেদার বাবু, দু'জনে মিলে আর একখানা "অমরকোষ" বানিয়ে ফেল্‌লুম,—লোকটা তবুও বুঝলো না!"

"চিন্তার কথা বটে!"

"সে কালে বাঙালীরা এই দুঃখেই ঘরের বাইরে পা বাড়াত না। হুট্ করে একটা যা-তা করলেই কি হল! বিভ্রাট দেখুন না।"

যাক্,—পাঁচজনে মিলে অনেক কস্‌রতের পর লোক-টাকে বোঝাতে পারা গিয়েছিল। "আরখ্ দান্" না ঐ রকমের একটা কি নাম বলেছিল—ভুলে গেছি। শরৎ বাবুর নিশ্চয়ই মনে আছে।

গড়গড়া গোত্রেরই আরো দু' একটা বকাল খরিদের পর ফেরা গেল।

*   *   *

আবার সাহিত্যের কথা,—পরেই রবি বাবুর কথা সুরু হল। "দেশের কত বড় গর্ব্বের জিনিস,"—ইত্যাদি। তাঁর "ছবি" প্রভৃতি কবিতার আলোচনায় পথ কাটতে লাগলো।

কথাটা বোধ করি ৭।৮ বচরে পড়লো, মনে হচ্ছে সেই বচরেই যেন "গৃহদাহ" পুস্তকাকারে প্রকাশ পায়।

কি সূত্রে মনে নেই, আমিই "গৃহদাহের" কথাটা বললুম।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"গৃহদাহ" খানা দেখেছেন না কি?"

"শুধু দেখিনি—দেখে অবাক হয়েছি। নিজেকে বিপদে ফেলে—সেটা কাটিয়ে ওঠবার প্রয়াসের মধ্যেই কারো কারো আনন্দ থাকে,—আপনি তাঁদেরই একজন। বই-খানা "গৃহদাহ" হলেও—আপনারই অগ্নি-পরীক্ষা! ভাল মন্দ বলবার অধিকারী আমি নই,—তবে ডিহিরি পৌঁছবার পর থেকে শেষ পর্য্যন্ত,—কি ভাবে আর কতটা বিপদ মাথায় করে, আপনাকে এগুতে হয়েছে সেটা বুঝতে পারি। যুদ্ধে কাটাকাটি থাকে,—ওই কয় পৃষ্ঠা এগুতে আপনাকেও বোধ হয় অনেক কাটাকাটি করতে হয়েছে। খসড়াটা দেখতে ইচ্ছে হয়, সেখানা রাখবেন—নষ্ট করবেন না। আপনি যে কত বড় শক্তিশালী লেখক তার পরিচয়—ওই কয় চ্যাপ্টারেই রেখে দিয়েছেন।"

হাসতে হাসতে বললেন—"বলেন কি! আপনার তো সাহস কম নয়!"

তখন দশাশ্বমেধ কালী মন্দিরের সামনে এসে পড়েছি;—প্রণাম করলুম। বাঙালী-টোলার রাস্তায় ঢুকে পড়া গেল।

সারি সারি সন্দেশ রসগোল্লার দোকান।

"কাশী যে ভূ-স্বর্গ তার প্রমাণই এই সব,—ভক্তের ভিড়ও তাই এত,—না?

আমি একটু হাসলুম।

তাই বোধ হয় বললেন—"আমাকে নাস্তিক বলে মনে হয় কি?"

"এ কথা কেনো! আমি তো আপনার চেয়ে বড় আস্তিক দেখতে পাই না।"

"অপরাধ?"

"অপরাধটা অনেক স্থলেই লক্ষ্য করেছি। সব মনে নেই,—"চরিত্রহীনে" গৃহ-দেবতা নারায়ণকে অন্ন দেওয়ার ঘটনাটা নিয়ে—কলেজ থেকে ফেরবার পথে—গঙ্গাতীরে বসে যে অনুতপ্ত অপরাধীটি শান্তিলাভার্থে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল, সে দিবাকর নয়, বোধ করি—শরৎচন্দ্র। অন্ততঃ দিবাকরের প্রাণে যিনি অনুতাপ এনেছিলেন তিনি—আপনি। আবার অত বড় বিচার-গর্ব্বিতা বিদুষী কিরণময়ীর হাতে যিনি কালীঘাটের ফুল বিল্বপত্র দিয়ে তার অভিনয়ের পরিসমাপ্তি করেছেন, তিনিও আপনি বই আর কেউ নন।"

হেসে বললেন—"বই লিখতে বসে' অমন অনেক কিছু লিখতে হয়।"

"তা স্বীকার করি। তর্ক করতে পারব না—সে শক্তি বা স্পর্দ্ধা আমার নেই। জীবনে ভুল্ চুকই বহুৎ, কিন্তু এ ভুলটা স্বীকার করতে মন চাচ্চে না।"

"কাজ কি,—তাতে আমার লাভই রইল," বলে হাসলেন।

ছাড়াছাড়ির সন্ধি-পথে দাঁড়িয়ে অনেক কথাই হল।

তাঁর কথাবার্ত্তার আর ব্যবহারের সহজ-সৌন্দর্য্যে আমি মুগ্ধ হলুম। শেষ বললেন—

—"আবার যেন আপনাকে পাই,—আমি শিবালয়ে বাসা নিয়েছি।"

"নাস্তিকের লক্ষণ বটে!"

হেসে বললেন—"সুরেশ জানে,—আসবেন।"

"বলার অপেক্ষা রাখতুম না"

নমস্কার,—নমস্কার।

* * * *

যে লোকটির লেখা পড়তুম আর অবাক হয়ে ভাবতুম—বাঃ, কোথাও ফিকে মারে না! ভাষার শক্তি আর সৌন্দর্য্যে—ঘরের পরিচিত আটপউরে জিনিসটিকে কি, উপভোগ্য করেই উপস্থিত করেন! কোথাও রঙের সাজ-গোছ নেই,—উচ্ছ্বাসের উৎপাত নেই,—সবই সহজ! আজ সেই মানুষটির—চেহারায় আর পরিচ্ছদে সেই পরিচয়ই পেলুম!

সে দিন—আলাপের আনন্দ নিয়ে ফিরি। বাসায় ফিরে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হই,—'ফ্রেনলজি' তখনো ফুট্ কাটে!

জন্মাষ্টমী, ১৩৩৪।

বিচিত্রা

মুসলমান নেতারা অর্ডিন্যান্সের মতই আর একটি আইন করিয়া ধর্ম্মের, ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ও সাধুদের নিন্দা বন্ধ করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। এ দেশের সরকার অন্য ব্যাপারে দেশবাসীর কথায় কান না দিলেও এ ব্যাপারে দিবেন—মনে হয়। কোনও কথায় ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বা সাধু ব্যক্তিদের (saint) চেলাদের মনে কষ্ট হইলেই তাহা দ্বারা ধর্ম্মের নিন্দা করা হয় না। সে যাক্, এ দেশের লোকের স্বাধীনতা কোন দিকেই নাই, মনও পঙ্গু। সময়ে ব্যভিচারী ব্যক্তিবিশেষও সাধু বলিয়া গণ্য হয়—এবং শিষ্য-সামন্তও তার বেশ জোটে; নূতন বিধানে সে রকম—ধর্ম্ম নেতা সাধু (saint) দেরও সমালোচনা করা যাইবে না, করিলে নূতন আইনের কবলে পড়িতে পারে। যাতে অযথা ও বিদ্বেষমূলক মিথ্যা নিন্দা ও কুৎসা বন্ধ হয় তার ব্যবস্থা বর্ত্তমান আইনেই আছে, নূতন আইন করিয়া আইনের অপপ্রয়োগের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়া দেশের সুস্থ বুদ্ধিকে গলা টিপিয়া ধরিতে সাহায্য করা কর্ত্তব্য নহে।

* *
*

ডাক্তার আন্‌সারি সংবাদপত্রের মারফতে নিজের মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার নন্-কো-অপারেশনে বিশ্বাস এবং সেই সঙ্গে স্বরাজ্যদলের কাউন্সিল প্রোগ্রামে অবিশ্বাস—কংগ্রেস মহলে আবার একটা দলাদলির সূচনা না করিলে ভাল। ডাক্তার আন্‌সারি দলাদলি ভাঙ্গিতে চান; কিন্তু মনে হয় কাউন্সিলপন্থীর দল কংগ্রেসে যে রকম প্রবল তাতে তাঁদের কো-অপারেটার রূপে গণ্য করিতে চাহিলে তাঁরা নারাজ হইবেন—এবং তাহাতে করিয়া নূতনতর দলাদলির সূচনা হইবে। কংগ্রেসের প্রভাব, মধ্যপন্থীও গরমপন্থী প্রভৃতির মধ্যে দলাদলিতে কমে নাই,—স্ব স্ব দলের মধ্যে অন্তর্দ্রোহিতাই কংগ্রেসের শক্তি নষ্ট করিতেছে।

মহাত্মা গান্ধী যখন কংগ্রেসের কর্ণধার ছিলেন তখনও তাঁর বিরুদ্ধ মতাবলম্বী দল ছিল, দলাদলি ছিল, কিন্তু মহাত্মাপন্থীদের মধ্যে, কর্ম্মসূত্রে অন্ততঃ ঐক্যভাব ছিল, তাতেই কংগ্রেসের প্রভাব বাড়ে। বাংলায় স্বরাজ্যদলও চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বাধীনে কংগ্রেসে গিয়া কংগ্রেসের প্রভাব বাড়াইয়াই ছিল, নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্রোহ না হইলে কংগ্রেসের প্রভাব বাড়িতই—ভিন্ন দলের সঙ্গে দলাদলি সত্ত্বেও বাড়িত। সুতরাং কংগ্রেসের শক্তি ধরিয়া বাঁধিয়া মধ্যপন্থী ও রাজপন্থীকে কংগ্রেসে আনিতে পারিলে বাড়িবে, তা সত্য নয়, কিন্তু যে দল এখন কংগ্রেসে প্রবল

তাদের অন্তর্দ্রোহিতা যদি না থাকে, তবেই কংগ্রেসের প্রভাব দেশে বাড়িবে।

কংগ্রেস যদি অন্তর্দ্রোহ ছাড়িয়া কাজে লাগিতে পারে, দেশের কর্ম্মীকুলও জনসাধারণ কংগ্রেসকেই বড় করিয়া তুলিবে। কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয়গণ যদি কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া পথ নির্দ্দেশের গুরুদায়িত্ব লন, দেশের কর্ম্মী ও জনসাধারণ আজিও তেমনি সাড়া দিবে; কিন্তু দলে অন্তর্দ্রোহ ঘটিলে, বাইরের দলাদলি মিটাইবার চেষ্টায় আরো দল বাড়িবে, কিন্তু বল কমিবে।

কংগ্রেস জাতীয় সম্পত্তি। যে অগ্রসর দল কংগ্রেসকে দখল করিতে পারে সে করুক, কিন্তু ঐক্যের লোভে সকল দলকে টানিয়া আনিলে বা অনগ্রসর দলকে অগ্রগতির গৌরব দিলে কংগ্রেস জাতির গৌরবের বস্তু হইয়া থাকিবে না। কেবল লোকসংখ্যায় নহে, যথার্থ কর্ম্মীর সংখ্যায় ও সত্যকার সংঘবদ্ধতার দ্বারা কংগ্রেস জাতির কল্যাণ সাধন করিতে পারিবে। কংগ্রেসের সম্মুখে এবার কঠোর দায়িত্ব উপস্থিত, মাদ্রাজে কংগ্রেস কর্ম্মীরা সে কর্ত্তব্য কেমন করিয়া পালন করিবেন ভবিতব্য জানেন।—

বাংলা কাউন্সিলের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। এবার আগষ্টের অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র রাজার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়া কাউন্সিলের সভ্য হইয়াছেন।—রাজানুগত্যের শপথের পর আর সরকার বাহাদুরের—সুভাষচন্দ্রকে রাজদ্রোহী-দল-ভুক্ত (যদি তেমন কোন দল থাকে) বলিয়া ভীত হইবার কারণ থাকিবে না আশা করি। সুভাষচন্দ্র কারারুদ্ধ রাজবন্দীদের সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন স্বরাষ্ট্র সচিব তার কোন উত্তর দেন নাই, দিতে পারেন নাই। স্বাধীন দেশে এতে আশ্চর্য্য হইবার কথা বটে, এদেশে নয়,—ইহাই পরাধীন দেশের দস্তুর।

লাটসাহেব তাঁহার বক্তৃতায় ডেটিনুদের সম্পর্কে যথা পূর্ব্বং তথা পরং নীতি অনুসরণ করিয়া কথা কহিয়াছেন। কহিবেন, ইহাইত এদেশে দস্তুর। সংবাদপত্রে দেখিলাম, সুভাষচন্দ্র লাটসাহেবের কথা শুনিয়া হতাশ হইয়াছেন। কেন হতাশ হইলেন জানি না, হয় ত এই লাটসাহেবের কাছে তিনি আরো কিছু আশা করিয়াছিলেন।—কিন্তু এদেশে আমলাতন্ত্রী শাসন-চক্র যে পদ্ধতিতে চলে সে কথা মনে রাখিলে কোন লাট হইতেই—কোন নূতন কথা শুনা আশা করা চলে না।—

সুভাষচন্দ্র শপথ গ্রহণ করিলে পর কাউন্সিল সদস্যরা 'বন্দে-মাতরম্' ধ্বনি করেন। স্থান ও কাল বড়ই বেমানান হইয়াছিল।—শপথ গ্রহণ ব্যাপারটা শ্লাঘার নয়! উপায় নাই, তাই লইতে হয়।

বাংলায় মন্ত্রীত্ব আবার ঘুচিল। দেশের লোক এই ধরণের শিখণ্ডী-মন্ত্রীত্ব দেখিতে চাহে না, এতে সন্দেহ নাই। কংগ্রেস তথা স্বরাজ্যদল এই বিষয়ে যে মতামত প্রকাশ করেন তাহা দেশেরই জনমত। স্বরাজ্যদল নীতি হিসাবেই এই মন্ত্রীত্ব ধ্বংস কামনা করেন। স্যর আবদার রহিম প্রভৃতি কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রীত্ব ধ্বংস কামনা করেন অন্য কারণে। স্যর আবদারদের মন্ত্রীত্বনাশের চেষ্টা জাতীয় গৌরবের নহে। স্বরাজ্যদলের চেষ্টা সে হিসাবে গৌরবের, স্যর আবদারের মত লোকের ভোট নিরপেক্ষ হইয়া স্বরাজ্যদল যখন নিজেদের প্রভাবকে জয়যুক্ত করিতে পারিবেন, তখন তাহা অধিকতর জাতীয় গৌরবের হইবে। সেই প্রভাব বাড়িতে পারে, স্বরাজ্যদলের অন্তর্ব্বিবাদ ঘুচিলে এবং জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্র শিক্ষা বিস্তার

হইলে। কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি করা এখন সকলের কর্ত্তব্য, এই জন্য দলাদলি সর্ব্বাগ্রে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। যে স্বতন্ত্র ভাবেও সংঘবদ্ধ হইতে হইবে, এ সোজা কথা না বুঝার কারণ নাই।

গজচক্র মন্ত্রীত্ব গেল। এবার আবার কার মন্ত্রীত্ব গজাইবে বলা যায় না। তবে স্বরাজ্যদল সংখ্যায় অধিক না হইলেও—ব্যক্তিগত নানা কারণ উপস্থিত হইয়া কোন মন্ত্রীত্বকেই কায়েম হইতে দিবে না, মনে হয়। মন্ত্রীরা যখন জনমতের মর্য্যাদা বিন্দুমাত্রও রাখিতে পারেন না তখন খোলাখুলি আমলাতন্ত্রী শাসনই চলুক, মন্ত্রীত্বের মেকী চলিয়া লাভ কি?

বাংলা দেশে নানা স্থানে যুবক সম্মিলনী হইতেছে। এই যুবক সম্মিলনীগুলি ঠিক ঠিক গড়িয়া উঠিলে দেশের সুবৃহৎ কল্যাণ সাধন সম্ভব হইবে। তবে যুবকদের মধ্যেও দলাদলির প্রাবল্য রহিয়াছে। তাই কোথাও কোথাও এই সব যুবক সম্মিলনী উপলক্ষে স্থানীয় দলাদলি বাড়িয়া উঠিতেছে,—ইহা অতিশয় লজ্জার ও দুঃখের কথা। ব্যক্তিত্ব লইয়া দলাদলি সেকেলে ও প্রাচীন—তরুণধর্ম্মীদের মধ্যে এ ব্যাধি বড়ই ক্ষোভের। যুবকদের এই সংঘবদ্ধ হইবার প্রয়াসে কোন কোন কংগ্রেসকর্ম্মী আতঙ্কিত হন, কিন্তু এ মারাত্মক ভুল কেন? যুবকশক্তি কংগ্রেসের শক্তিই বৃদ্ধি করিবে। কংগ্রেস জাতীয় প্রতিষ্ঠান, যুবক মাত্রেরই কংগ্রেসে যোগদান কর্ত্তব্য; কিন্তু তা সত্বেও যুবকশক্তিকে

বেঙ্গল ন্যাশনেল ব্যাঙ্কের দুরবস্থায় দেশের ব্যবসা ক্ষেত্রে বিশেষ একটা অবিশ্বাস ও চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। যে জাতির ব্যাঙ্ক নাই তাদের ব্যবসায়ের বাজারে যে কত বেগ পাইতে হয় তা সহজেই অনুমেয়। রাজশক্তি যেমন খাঁটি থাকে সাধারণের সজাগ দৃষ্টি দ্বারা,—তেমনি লিমিটেড কোম্পানী গুলির কর্ত্তৃপক্ষও খাঁটি থাকেন সাধারণের সদা জাগ্রত দৃষ্টি ও দায়িত্ববোধের দ্বারা—। ন্যাশনেল ব্যাঙ্কের ভিতরের গলদ যে কত দূরে গড়াইয়াছে ও কত দিন যাবত চলিয়াছে, তার কতকটা ইতিমধ্যেই প্রকাশ, কিন্তু এদেশের জনসাধারণ, অংশীদার ও জননেতারা যদি আরো পূর্ব্বে দায়িত্বের পরিচয় দিতে পারিতেন—ভালো হইত, এ কলঙ্কের কালী মুখে মাখিতে হইত না। সে যাক্, ব্যাপার যখন আদালতে গড়াইয়াছে তখন এ সম্পর্কে কিছু না বলাই সঙ্গত। কিন্তু একটা ব্যাঙ্ক ফেল হইলেও জাতির হতাশ হইতে নাই। ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষরা যাতে দায়িত্ব ও সততার পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে সাহসী না হয় জাতিকে সে জন্য অধিকতর সজাগ হইতে হইবে। দুই একটা ব্যর্থতাকেই বড় করিয়া তুলিয়া দেশবাসীকে অবিশ্বাস করিতে নাই। কারণ আমাদের এই দেশবাসীকে ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে হইবে, ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। চোর, জোচ্চোর সব দেশেই আছে, তবে জনসাধারণ যত সজাগ হইবে ততই চুরি জুচ্চুরী বন্ধ হইবে।—খবরের কাগজগুলি এবিষয়ে দেশবাসীকে ইচ্ছা করিলে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন—।

শ্রী নলিনীকিশোর গুহ

প্রকাশ কা..
এবং সেই সঙ্গে

শ্রী শিশিরকুমার নিয়োগী কর্ত্তৃক, ১এ, রামকিষণ দাসের লেন, নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস হইতে মুদ্রিত ও বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

"অচ্ছোদ সরসী নীরে রমণী যে দিন
নামিলা স্নানের তরে,................"

বিজয়িনী—রবীন্দ্রনাথ

দই কিনিবার সময় তিনটী বিষয় লক্ষ্য রাখিবেন

যে

দই ভাল জমান কিনা ?

দইয়ের রংপরিষ্কার কিনা ?

দইয়ের আস্বাদ মধুর কিনা ?

আমাদের নিকট এই সমস্ত

গুণবিশিষ্ট দধি পাইবেন।

ইন্দু ভূষণ দাস এণ্ড সন্স

([illegible] মোদক)

৮০নং [illegible] রোড ভবানীপুর

কলিকাতা ফোন নং সাউথ [illegible]

কালি-কলম

২য় বর্ষ] আশ্বিন, ১৩৩৪ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

শরৎচন্দ্রের প্রতি

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

তখন যৌবন-দিন, বিকশিত চিত্ত-শতদলে
সুপবিত্র প্রীতিরাগ, পূজ্য-পূজা লাগি' সে অধীর,—
সেই কালে—অবারিত ছিল যবে আশীষ বিধির,
সহসা হেরিনু তোমা—পূর্ণচন্দ্র উদয়-অচলে।
সে কি চিত্ত-চমৎকার!—পড়িলাম রুদ্ধ কুতূহলে
সুবিচিত্র কথা সেই 'বিরাজে'র—হৃদয়-রুচির!
সামান্যা সে রমণীর অসামান্য প্রেম-কাহিনীর
অন্তরালে নিখিলের নয়নাশ্রু-উদধি উথলে।
এ বঙ্গের গৃহাঙ্গনে সে কি চিত্র চির-অগোচর
দেখালে দরদী কবি!—বিরহের ঘন-ঘোর নিশা,
বিদ্যুৎ-চকিত দীপ্তি তিমিরে দেখায় তবু দিশা!—
প্রেমের পুরুষ-মূর্ত্তি নীলকণ্ঠ-সম 'নীলাম্বর'!
কুলহীনা রমণীর নেত্রে সেই সন্ধ্যাদীপ-তৃষা,
কলঙ্কিনী-সতী-শোকে পতি তার ধ্যানী মহেশ্বর।

২

কে জানিত তার আগে—সর্ব্বশেষ মন্দির-সোপানে
ধূলায় ধূসর যেই পড়েছিল প্রাণের ভূখারি
একপাশে, অজ্ঞাত অখ্যাত সেই বাণীর পূজারী
জীবজন্ম-রসাতলে ডুবেছিল অমৃত-সন্ধানে!
ঘৃণা ভয় বিসর্জ্জিয়া আকণ্ঠ গরল-ফেন-পানে
লভিল আরেক আঁখি ভস্মলিপ্ত ললাটে তাহারি!
শ্মশানে মশানে সে যে ফিরিয়াছে মহা বীরাচারী—
শব-বক্ষে কাণ পাতি' ধ্বনি তার ধরিতে সে জানে!
তাই তার সাধনায় ভয়ঙ্করী অমা-নিশীথিনী
হাসিল মধুর হাসি, অন্তহীন লাবণ্য-লীলায়!
যা' কিছু কুৎসিত হেয়, তারে তার চিত্ত-প্রবাহিনী
করাইল পুণ্য-স্নান, মুহূর্ত্তে সে কালিমা মিলায়!
চাহিনি যাহার পানে ভুলে' কভু, তারে আজ চিনি—
মূল্য তার ধরা প'ল হৃদয়ের নিকষ-শিলায়।

৩

আজ তব জন্ম-মাসে শরতের প্রসন্ন আকাশ
কি নির্ম্মল গাঢ়-নীল, লঘু-শুভ্র মেঘ-অন্তরালে!
ক্ষণ-বৃষ্টিপাতে হের জল ভরে তরু-আলবালে,
তবু রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—এ যে রাখী-পূর্ণিমার মাস!
ঘাসেও ফুটিছে ফুল—গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটিয়াছে কাশ,
স্বচ্ছ সরসীর তলে পঙ্ক হ'তে উঠিয়া মৃণালে
ফুটিছে পূজার পদ্ম!—তার মর্ম্ম তুমিই শিখালে,
দিকে দিকে হেরি আজ তোমারি সে বাণীর বিকাশ!
বঙ্কিম—বসন্ত-বিধু, রবি—সে ত' সর্ব্বঋতুময়,
তুমি চন্দ্র শরতের, রশ্মি তব মর্ম্মান্ত-হরষ

এই পৃথ্বী-মৃত্তিকার ! তব করে লভিয়াছে জয়
তুচ্ছ তৃণ, অঙ্গে তার উজলিছে কাঞ্চন-পরশ !
চণ্ডালেরো গৃহে তব কিরণের পূর্ণ পরিচয়—
মানুষের সর্ব্বগ্লানি তব স্পর্শে শুচি ও সরস !

ই, ১৩৩৪ ।

রূপের অভিশাপ

—পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর—

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

ফকীরের কাছে সমস্ত অবস্থা শুনিয়া লতিফের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে এক মুহূর্ত্তও সময় লাগিল না। সে বলিল, সে আজ রাত্রের মধ্যেই কাসিম বেপারীকে হত্যা করিয়া সে ব্যাপারটার সন্তোষজনক নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিবে।

ফকীর বলিল, "ও সব পাগলের কথা। তা ছাড়া, খুন ক'রতে চাইলেই তাকে খুন ক'রতে পারছো কই—সে তো তার কোটা-ঘরে শুয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুচ্ছে।"

"তার জন্যে ঠেকবে না, আমি গিয়ে তার খড়ের পালায় আগুন ধরিয়ে দেব। আগুন লাগলে সে যেই ছুটে বের হ'বে অমনি তাকে এই লাঠির এক ঘা বসিয়ে দেব।"

"আর তক্ষুনি সাতজন লোকে তোমাকে পিছ্ মোড়া ক'রে বেঁধে থানায় নিয়ে যাবে। ফাঁসি যদি নাও যাও তবে দ্বীপান্তর হ'বে নিশ্চয়—তখন পরীকে বিয়ে ক'রবে. কে ?"

এ যুক্তি লতিফের মনে ধরিল। তাই সে একটু ভাবিয়া বলিল, "তা ব'লেছ ঠিক্—তার চেয়ে ওই ছুঁড়ীটাকে সরিয়ে ফেলাই ভাল।"

ফকীর ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "তা ছাড়া তো আর উপায় দেখি না। তাতে যা হয় পরে হবে—এখনকার মত তো বিয়েটা বন্ধ হবে।—কিন্তু তাই বা কি ক'রে হয় !"

সে বিষয়েও লতিফের কোনও সন্দেহ ছিল না। কাসিম বেপারীর খড়ের পালায় আগুন লাগাইবার মনোরম প্রস্তাবটা তার মাথায় তখনও ঘুরিতেছিল। সে বলিল, এখন গিয়া গবীবুল্লার খড়ের পালায় আগুন ধরাইয়া দিলে সবাই ছুটিয়া বাহির হইবে, সেই গোলোযোগের মধ্যে পরীকে লইয়া পলায়ন করা যাইবে।

ফকীর মাথায় হাত দিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। কথাটা তার মনে ধরিল, কিন্তু তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করিয়া শেষে সে বলিল, "নাঃ সে সুবিধা হবে না। একটা আগুন লাগলে গাঁ-শুদ্ধ লোক সেখানে গিয়ে হাজির হবে—তার ভিতর থেকে তাকে নিয়ে পালান কঠিন হবে। হয় তো মাঝ পথে ধরা প'ড়ে সব মাটি হবে।"

লতিফকে এই প্রশান্ত হিসাবনিঃসৃত সিদ্ধান্তে সম্মতি

করান কঠিন হইল। সে এই মুহূর্ত্তে গিয়া গরীবুল্লার ঘরে আগুন দিবার জন্য ভয়ানক ঝুঁকিয়া পড়িল। অনেক কষ্টে ফকীর তাহাকে নিবৃত্ত করিল।

হাঁটিতে হাঁটিতে তাহারা গরীবুল্লার বাড়ীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। লতিফ তৃষিত নয়নে সেই বাড়ীর দিকে চাহিয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, গরীবুল্লার ঘরে আগুন লাগিয়াছে—পরী কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া বাহির হইল—সে তাহাকে কাঁধে ফেলিয়া দে ছুট্!—ফকীর চাহিল যুধিষ্ঠিরের বাড়ীর দিকে।

যুধিষ্ঠিরের বাড়ী দেখিয়া ফকীরের মনে একটা বুদ্ধি আসিল; সে তাহা বিস্তার করিয়া লতিফকে বুঝাইল। তাহারা দুজনে তখন যুধিষ্ঠিরের আঙ্গিনায় গিয়া হাজির হইল।

সে বাড়ীতে তখন সকলে নিদ্রাগত, কিন্তু পরাণের মাকে ডাক দিতেই সে উঠিয়া আসিল।

যুধিষ্ঠিরের গৃহের অধিষ্ঠাত্রী এবং পরলোকগত শিশু পরাণের গর্ভধারিণী কেবল এই পরিচয়ে পরাণের মা প্রসিদ্ধ ছিল না; তার নিজের প্রতিষ্ঠার একটা প্রকাণ্ড স্বতন্ত্র ক্ষেত্র ছিল। প্রথমতঃ সে ধাত্রী বিদ্যায় পারদর্শী বলিয়া পরিচিত। প্রকৃত প্রস্তাবে তার এ বিষয়ে জ্ঞান কিছুই ছিল না, তবে সহজ ভাবে প্রসব হইলে সে তার আনুসঙ্গিক কার্য্যগুলি মোটের উপর করিতে পারিত। এবং এই কার্য্যে তার কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী এ গ্রামে না থাকায় সে সকলের পরিচিত ছিল। কতকটা সেই কারণেই সে প্রয়োজনমত নারীদের গর্ভনাশের সহায়তা করিত এবং সে বিষয়ে অনেকটা বিদ্যায় সে বিশেষজ্ঞ ছিল। এবং গ্রামের ভিতর যে সকল অবৈধ প্রণয়ে দৌত্যের প্রয়োজন হইত তাহাতেও সে অপরিহার্য্য ছিল। সে কেবল দূতীগিরী করিত না, পুরুষ বা নারীর মন হরণ করিবার জন্য বিবিধ তুক্ তাক্, তাবিজ, কবচ, ঔষধ প্রভৃতি তার জানা ছিল। এই জন্য গ্রামের অনেক পুরুষ ও নারী তাহার সহায়তা লাভের চেষ্টা করিত।

এই সব ব্যাপারে পরাণের মার এমন একটা বহুদর্শিতা জন্মিয়াছিল যে ফকীরের স্থির বিশ্বাস হইল যে তার কাছে সমস্ত অবস্থা নিবেদন করিলে সে এ সম্বন্ধে একটা সুসঙ্গত ব্যবস্থা করিতে পারিবেই। তাই তাহারা পরাণের মাকে নিভৃতে ডাকিয়া সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিল।

পরাণের মা গম্ভীর ভাবে সমস্ত কথা শুনিয়া বলিল, "বিয়েটা হ'বে কবে?"

সে কথাটা ফকীরেব জানা ছিল না। তবে চার ক্রোশ দূরে কাজীর বাড়ী গিয়া বিবাহ হইবে, অন্ততঃ দুইদিনের মধ্যে তাহা সম্ভব হইবে না। এই দুই দিনের মধ্যেই যাহা হউক একটা করিতে হইবে।

গালে হাত দিয়া পরাণের মা পরম বিজ্ঞের মত অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "তাই তো, বড় শক্ত কথা, পরী মেয়েটা বড় বেয়াড়া। তা ছাড়া তার আবার হারাণীর সঙ্গে বড় ভাব। ঘরে শত্রু, কি ক'রতে পারবো বুঝে উঠতে পারছি না।"

লতিফ বলিল, সে জন্য কোনও চিন্তা নাই, পরী অমত করিবে না। পরী লতিফকে পাইবার জন্য সব কাজেই সম্মত হইবে।

পরাণের মা বলিল, "কেন, সে কি তাই বলেছে নাকি?"

"না তা ঠিক বলে নি, তবে এ কথা ঠিক তুমি ধ'রে নেও।"

পরাণের মা ইহা ধরিয়া লইতে প্রস্তুত হইল না। লতিফও এ কথা খুব জোর করিয়া বলিল। শেষ পর্য্যন্ত সে প্রকাশ করিল যে পরীর সঙ্গে তার অনেক দিন হইল আস্‌নাই আছে। সেদিন পুকুর-পাড়ে যে ব্যাপার হইয়াছিল তাহা অত্যন্ত অতিরঞ্জিত করিয়া সে বুঝাইল যে পরী বাস্তবিক তার প্রণয়িনী।

পরাণের মা বলিল যে তাহা যদি সত্য হয় তবে সে কাল রাত্রে পরীকে লইয়া সেন-বাবুদের পুকুর-ধারে আসিবে, সেখানে যেন লতিফ তার লোকজন লইয়া উপস্থিত থাকে।

ফকীর বলিল, "কিন্তু ধর যদি পরী ভয় পায়, কি রাজী নাই হয়!"

পরাণের মা জোর করিয়া বলিল, "রাজী তার হ'তেই হবে। ভালবাসার খাতিরে না হয় তো আমার মন্ত্র-তন্ত্র লাগাব। মন্তরের কাছে কাবু না হ'য়ে সে যাবে কোথায়?"

এ কথায় সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া দুই বন্ধু যাইবার জন্য উঠিল। পরাণের মা তখন অগ্রিম পারিশ্রমিক চাহিল। কাসিম বেপারীর টাকা তখনও ফকীরের টেঁকে ছিল, অনেক দর কষাকষির পর সে তাহা হইতে একটা টাকা দিয়া কথাটা পাকাপাকি করিয়া গেল।

বাড়ী ফিরিবার পথে দুই বন্ধুতে পরামর্শ করিল যে কাল প্রত্যুষেই তাহারা দুই জনে গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইবে। ফকীর যাইবে মহকুমায়, লতিফ গিয়া ভিন্ন গ্রাম হইতে লোকজন এবং ডুলী-বেহারা লইয়া দ্বিপ্রহর রাত্রে আসিয়া পৌছিবে। লতিফ মামলা মোকদ্দমার কারবারী, সে স্থির করিল যে যদি কোনও ফৌজদারী বাধে তবে সে যে সে সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না সে বিষয়ে পাকাপাকি প্রমাণ ঠিক রাখিবে। সেই জন্য সে স্থির করিল যে সন্ধ্যা বেলায় উকীল-বাড়ী গিয়া সে সেখানেই শুইয়া থাকিবে এবং সকলে শুইলে উঠিয়া আসিয়া দ্বিপ্রহরে রাত্রে অকুস্থলে পৌছিবে এবং কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া রাত্রি থাকিতেই পুনরায় উকীল-বাড়ী গিয়া শুইয়া থাকিবে ও পরদিন উকীলের সঙ্গে দেখা করিয়া ফিরিবে।

এই বন্দোবস্ত অনুসারে পরের দিন পান্তাভাত খাইয়া লতিফ ছিলিমপুরের গো-হাটায় গরু কিনিবার ওজুহাতে বাহির হইয়া গেল, বলিয়া গেল, রাত্রে সেখানে থাকিয়া পরের দিন সকালে ফিরিয়া আসিবে। গরু কিনিবার নাম করিয়া বাড়ীতে যে টাকা পাইল সমস্ত সংগ্রহ করিয়া প্রায় একশত টাকা সঙ্গে লইল।

গরীবুল্লা ও যুধিষ্ঠির হয় তো সকালেই তাহাকে লইয়া রেজেষ্ট্রী আফিসে যাইবার জন্য আসিবে, সেইরূপ অনুমান করিয়া ফকীরও ভোরে ভোরে রওনা হইয়া মহকুমায় চলিয়া গেল।

প্রায় দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে সেন-বাড়ীর পুকুর-ধারে একটা ঘন ছায়ান্ধকার গাছের তলায় সে উপস্থিত হইয়া দেখিল লতিফ ছয় জন বেহারা, দুইটা ঘোড়া ও পাঁচ জন লাঠিয়ালসহ উপস্থিত—সমস্ত বন্দোবস্ত প্রস্তুত।

দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। ফকীর তখন চঞ্চল হইয়া উঠিল। বন্দোবস্ত ছিল যে পরীকে লইয়া লতিফ একেবারে ষ্টীমার-ঘাটে যাইবে এবং আসামের ষ্টীমার ধরিয়া ধুবড়ী চলিয়া যাইবে। আর বিলম্ব হইলে সময়মত ষ্টীমার-ঘাটে যাওয়া কঠিন হইবে। তা' ছাড়া ফকীরেরও রাত্রি থাকিতেই মহকুমায় উকীল-বাড়ী ফিরিতে হইবে। কাজেই আর তো দেরী করা চলে না। পরাণের মা করে কি?

লতিফ ও ফকীর দুজনেই ভয়ানক ছটফট করিতে লাগিল।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ফকীর সন্তর্পণে অগ্রসর হইল যুধিষ্ঠিরের বাড়ীর দিকে। সে দিকে খানিক দূর গিয়া সে যাহা দেখিল তাহাতে তাহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। সে দেখিতে পাইল গরীবুল্লার বাড়ীতে আলো জ্বলিতেছে এবং লোকজন চলা ফেরা করিতেছে। অনেকক্ষণ তফাৎ হইতে সে লক্ষ্য করিল, দুইজন মেয়ে মানুষের কান্নার শব্দ শোনা ছাড়া আর কিছুই বুঝিতে পারিল না।

ব্যস্তসমস্ত হইয়া ফিরিয়া গিয়া সে লতিফকে ব্যাপারটা জানাইল। লতিফ ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া তাহার সঙ্গে আসিয়া আপন চক্ষু কর্ণে ঠিক ফকীর যাহা দেখিয়াছিল ও শুনিয়াছিল তাহাই প্রত্যক্ষ করিল। তার মনে হইল পরীর নিশ্চয় কোনও গুরুতর পীড়া বা বিপদ হইয়াছে, সে অনুসন্ধান করিবার জন্য গরীবুল্লার বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল।

ফকীর তাহাকে টানিয়া ফিরাইল। তখন তাহারা দুই বন্ধুতে অন্ধকারে পা টিপিয়া যুধিষ্ঠিরের বাড়ীতে গিয়া মৃদুস্বরে পরাণের মাকে ডাকিল।

সে ডাক শুনিল যুধিষ্ঠির। সে ইহাতে খুব ব্যস্ত হইল না। পরাণের মার যাহা ব্যবসায় তাহাতে গভীর রাত্রে তাকে এমন ডাকাডাকি লোকে প্রায়ই করে। যুধিষ্ঠির পরাণের মাকে উঠাইয়া দিয়া আবার নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরাণের মা তাহাদিগকে দেখিয়াই গালে হাত দিয়া বলিল, "আ পোড়া কপাল! এতক্ষণে এসেছ! এদিকে সব যে শেষ হ'য়ে গেছে।"

লতিফ ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া বলিল, "অ্যাঁ বল কি? কি হ'য়েছে?—পরী মরে গেছে?"

"মরারই সমান আর কি! মেয়েটা যে ভাল বেসেছে তোমাকে তাতে তার এতে মরারই সামিল। আজ ভোর বেলায় আমি তাকে ডেকে বল্লাম তোমার কথা। বললে বিশ্বাস ক'রবে না, সে একবাক্যে রাজী হ'ল। অতটুকু মেয়ে, একটু ভয়ডর ক'রলে না, বল্লে যাব—বলে কি এখনি নিয়ে চল আমায়, এখনি যাব। তাই যদি ক'রতাম তবে আর এমনটা হয়!"

লতিফ বলিল, "হাঁ,—তা কি হয়েছে কি?"

সে প্রশ্ন সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া পরাণের মা বলিল, "তা আমারও দোষ নেই! যদিও সে বল্লে বটে তবু আমি তার কোমরে আমার মাদুলীটা ঝুলিয়ে দিয়ে তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলাম। তারপর তোমাদের খবর দিতে গিয়ে দেখি তোমরা দু'জনেই নিরুদ্দেশ। তার পর বাড়ী ফিরে কেবল দু'টো রান্না বাড়া ক'রে খাওয়া দাওয়া ক'রতে যা সময়! তার পরই গেলাম ও বাড়ী-- গিয়ে দেখি সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে।"

"বলি কি হ'য়েছে কি বল না ছাই!"

"হবে আর কি? গিয়ে দেখি সেই কাসিম বেপারী আর একরাজ্যি লোকজন ব'সে র'য়েছে। আমি গিয়ে শুধোতে শুনলাম ভোর না হ'তে হ'তে গরীবুল্লা আর কাসিম আর কে কে গিয়ে সেই কাজী সাহেবের কাছে গিয়ে বিয়ে সেরে এসেছে। আমি কি ছাই এত জানি যে তোমাদের মোসলমানের মেয়ে না হাজির থাকলেও বিয়ে হয়। তা জানলে আমি যা' হ'ক একটা ব্যবস্থা ক'রতাম।"

লতিফ ও ফকীর হতাশ হইয়া পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল—লতিফ ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

পরাণের মা বলিয়া গেল, "তোরা মিন্সে দুটো এমন সময় উধাও হ'য়ে গেছিলি কোথায়? এখানে যদি থাকতিস্ তবে হ'য়ে গেছে গেছে বিয়ে আমি মেয়ে তোদের কাছে পৌছে দিতাম। কিন্তু আমি খুব কম হ'লে দশ-বার তোদের বাড়ী হাঁটাহাঁটি ক'রেছি! পরী তখনও আমায় বলে কি, চাচী আমায় নিয়ে চল—কোনও মতে আমায় বাড়ী থেকে বের ক'রে লতিফের হাতে সঁপে দেও। সন্ধ্যে বেলায়ও আসতে তোমরা তবে আমি দিতামও তাই! আহা বেচারী যেন কাটা পাঁটার মত ধড়ফড় ক'রছিল গো! যখন নিয়ে গেল—মায়ের বুক থেকে যেন ছিঁড়ে নিয়ে গেল।"

লতিফ ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "নিয়ে গেছে? কখন নিয়ে গেল?"

"এই এক দণ্ডও হয় নি যে নিয়ে গেছে। সেই সন্ধ্যা-বেলা থেকে বেপারী বেটা এখানে হত্যা দিয়ে ব'সেছিল। ছুঁড়ীটা আর তার মাটা কেঁদেকেটে কত ক'রে বল্লে একটা দিন সময় দিতে, মিন্সে কিছুতে ছাড়লে না। ঝুলো-ঝুলি ক'রতে ক'রতে এত রাত্তির হ'য়ে গেল।"

লতিফকে ফকীর এক রকম টানিয়া লইয়া গেল। লতিফ পথে যাইতে যাইতে বলিল, "আর কোনও কথা নেই ভাই, আমি আজ রাত্রেই ওই বেপারী শালার ঘর জ্বালিয়ে তাকে খুন ক'রবো—আর পরীকে চুরী ক'রবো। আমি কারও কথা শুনবো না।"

ফকীর তাকে অনেক বুঝাইয়া সেন-বাড়ীর পুকুর-

ধারে লইয়া চলিল, সেখানে বসিয়া পরামর্শ করিবে বলিয়া। সেখানে যাইবার পূর্ব্বেই সেখানকার এক লাঠিয়ালের সঙ্গে দেখা হইল, সে বলিল যে ইতিমধ্যে মহা গোলযোগ হইয়া গিয়াছে।

সেন-বাড়ীর একটি বাবু আজ রাত্রে এই পথে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। বাগানে লোক দেখিয়া তিনি সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। লাঠিয়াল কয়জন ধরা পড়িয়াছে।

ফকীর বুঝিল ইহা হইতে গোলযোগের সম্ভাবনা। সুতরাং সে অবিলম্বে লতিফকে লইয়া গ্রামত্যাগ করা সমীচিন বিবেচনা করিল। যদি ডুলি বেহারারা তাহাদের নাম প্রকাশ করিয়া দেয় তবে তাদের নির্দ্দোষিতার পাকা প্রমাণ থাকা আবশ্যক।

সুতরাং কাসিম বেপারীর ঘর জ্বালাইবার প্রস্তাব আপাততঃ মুলতুবী রাখিয়া লতিফ গ্রামত্যাগ করিয়া গেল।

৬

সেদিন ভোর বেলায় পরী ঘুম ভাঙ্গিয়া দ্বার খুলিতেই দেখিল কাসিম বেপারী আসিয়া উঠানে দণ্ডায়মান। তখনও সে কিছুই জানে না। ব্যস্তসমস্ত হইয়া সে বেপারীকে একটা মোড়া পাড়িয়া বসিতে দিল এবং ছুটিয়া বাপকে খবর দিতে গেল। বসিরন তখন পালানে গিয়াছিল বেগুন ও লঙ্কা তুলিতে এবং গরীবুল্লা বাড়ীর অনতিদূরে নদীর ঘাটে রাত্রে যে ছিপ ফেলিয়া আসিয়াছিল তাহার খবর করিতে গিয়াছিল।

নদীর ধারে গিয়া পরী ব্যস্ত হইয়া গরীবুল্লাকে বলিল, "বাপজান, বেপারী সাহেব এসেছেন।"

ছিপে একটা মাছ ধরিয়াছিল, পরীকে সেটা ছাড়াইয়া আনিবার আদেশ দিয়া গরীবুল্লা তাড়াতাড়ি বাড়ী ছুটিল। পরী যখন মাছ ও ছিপ লইয়া ধীরে সুস্থে বাড়ী ফিরিল তখন গরীবুল্লা ও কাসিম বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরী মাছটা মায়ের সামনে ফেলিয়া বলিল, "মা, বেপারী এত ভোরে এখানে কি ক'রতে এসেছিল?"

বসিরন একটু হাসিল। সে আঁচলের বন্ধন খুলিয়া একজোড়া সোণার বালা বাহির করিয়া পরীকে বলিল, "বেপারী সাহেব এই বালা জোড়া তোকে দিয়ে গেছে—পর্।"

বালা দেখিয়া পরীর মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে চট্ করিয়া বালা জোড়া পরিয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, "হাঁ মা, একি পিতল না গিল্টি?"

"না রে না সোণা—খাঁটি সোণা!"

পরীর অন্তর নৃত্য করিয়া উঠিল। সত্য সত্য সোণার বালা সে পরিয়াছে—এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের অপরিমেয় আনন্দ তাহাকে অভিভূত করিল। তার মনটা ছট্ফট্ করিতে লাগিল এই বালা জোড়া সবাইকে দেখাইবার জন্য। বসিরন বলিল, "ওই দেখেই অজ্ঞান হলি, ঘরে দেখ্ গিয়ে আর কি আছে!" বলিয়া ঘরে গিয়া তাহাকে একখানা নূতন নীলাম্বরী সাড়ী দিল।

অবিলম্বে সাড়ীখানা পরী পরিয়া ফেলিল। তারপর ঘরের বেড়ার বাতা হইতে একখানা ছোট টিনে-বাঁধান আরসি টানিয়া লইয়া চুলটা পাট করিয়া ফেলিল। এত সজ্জা করিয়া তার পক্ষে ঘরে বসিয়া থাকা একেবারে অসম্ভব হইল—সে ছুটিল প্রথমে হারাণীকে তার সৌভাগ্য দেখাইবার জন্য।

বসিরন তার হাত ধরিয়া বলিল, "রোস্, যায় এখন। বেপারী এ সব কেন দিয়েছে জানিস্?"

পরী উৎসুক দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিল। বসিরন হাসিয়া বলিল, "আজ তার সঙ্গে তোর বিয়ে।"

এক মুহূর্ত্তে সমস্ত সজ্জা পরীর কাছে বিষ হইয়া গেল—তার মুখ সাদা হইয়া উঠিল। সে মনে মনে লতিফের হাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিল এবং তাহাকেই একমাত্র প্রেমাস্পদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, এবং সেই জন্যই সে পত্যন্তরের সম্ভাবনায় আকুল হইয়া উঠিয়াছিল তাহা নহে। লতিফের সঙ্গে সে সামান্য একটু ইয়ারকী মাত্র করিয়াছিল, ইহা ভিন্ন তার অন্তরে কোনও গভীরতর ভাবের অস্তিত্বের

সম্বন্ধে সে কিছু জানিত না। লতিফের প্রথম চুম্বনে তার সমস্ত শরীরের ভিতর একটা অপূর্ব্ব বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত হইয়াছিল সত্য, এবং সেই স্পর্শ ও চুম্বনের স্মৃতি থাকিয়া থাকিয়া তার শরীর মনে এক অপূর্ব্ব পুলকের সঞ্চার করিতেছিল সত্য, এবং লতিফকে দেখিলে কিম্বা তার কথা শুনিলে তার মনে একটা সলজ্জ প্রীতির রসধারা ঝরিয়া পড়িতেছিল সত্য, কিন্তু তাহার সেই ভাব এমন একটা বিশিষ্ট প্রেমের আকৃতি ধারণ করে নাই যাহাতে তাহাকে পুরুষান্তরের প্রতি একেবারে বিমুখ করিতে পারে।

পরীর যে মুখ শুকাইয়া গেল সে লতিফের সহিত আসন্ন বিচ্ছেদের স্মৃতিতে নয়, তার কথা তার মনেও হইল না—তার ভয় ও বিরক্তি হইল কাসিম বেপারীর সঙ্গের কল্পনায়। কাসিম সুপুরুষ নয়, তাহাতে সে বৃদ্ধ—পরীর মনে হইল অতিবৃদ্ধ, তা ছাড়া এমন একটা স্বামী তার হইবে! একথা ভাবিতে তার সমস্ত শরীর ঘিন্ ঘিন্ করিয়া উঠিল।

পরী অনেকদিন বিবাহের কল্পনা করিয়াছে, অনেকের সঙ্গে তার বিবাহ সম্ভাবনার আলোচনা সে সখীদের সঙ্গে করিয়াছে—তাদের ভালো মন্দ দিক লইয়া আলোচনা ও বিচার করিয়াছে। অনেককে তার মনে ধরে নাই, অনেককে সে চলনসই মনে করিয়াছে—কিন্তু কাসিমের মত বর যে তার হইবে এ কল্পনা তার মনের কোণায়ও কোনও দিন আসে নাই।

পরী এ সংবাদ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল, দেখিয়া বসিরনের হাসি মিলাইয়া গেল। ক্রমে পরীর চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল—সে বলিল, "মা আমাকে এখানে বিয়ে দিও না।"

তার কথা শুনিয়া বসিরন অঞ্চলে চক্ষু মুছিল। সে সাধ্যমত মেয়েকে বুঝাইল, কাসিম বেপারীর ধন দৌলতের কথা বলিয়া তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পরীর কান্না তাহাতে থামিল না।

অনেকক্ষণ পর পরী মায়ের কোল ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বসিরন তখন কাজে গেল। পরী ধীরে ধীরে তার সখী হারাণীর সন্ধানে গেল।

হারাণী তার বেশ দেখিয়া অবাক পুলকে তার দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর যখন সে শুনিল যে বালা-জোড়া সত্য সত্যই সোণার তখন সে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া হাঁ করিয়া রহিল। পরী কিন্তু কাঁদিয়া ফেলিল।

পরাণের মা পরীকে দেখিয়া হাতের কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল এবং পরীকে ডাকিয়া বাড়ীর পিছনে নিভৃত স্থানে লইয়া গেল।

পরাণের মা বলিল, "হাঁ পরী, কাসিম বেপারীর সঙ্গে তোর বিয়ে ঠিক হ'য়েছে?"

পরী সজল নয়নে বলিল, "হাঁ হ'য়েছে।"

পরাণের মা বলিল, "তুই এই বিয়ে করবি?"

বিষণ্ণভাবে পরী বলিল, "বিয়ে কি আমার হাত?—বাবা বিয়ে দেবে।"

"কিন্তু তুই তো চাস নে!"

চট্ করিয়া পরী উত্তর দিল, "ওই বাঁদরটাকে কে সাধ ক'রে বিয়ে ক'রতে চায়?"

একটু থামিয়া পরাণের মা বলিল, "তুই লতিফকে বিয়ে করবি?"

মরণোন্মুখ রোগীকে কে যেন সঞ্জীবনী সুধার বার্ত্তা শুনাইল! একটা ক্ষণিক আশার উৎসাহে পরীর সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পর মুহূর্ত্তে তার মুখ আবার অন্ধকার হইয়া গেল। সে বলিল, "বিয়ে দিচ্ছে কে তার সঙ্গে?"

"আমি দিয়ে দেব—আজই—যদি তুই এক কাজ করতে পারিস্।"

"কি করতে হবে বল, আমি করবো।"

তখন পরাণের মা বলিল, আজ রাত্রে সকলে নিদ্রিত হইলে পরাণের মা তাদের উঠানে গিয়া ইঙ্গিত করিলে পরীর বাহির হইয়া আসিতে হইবে, লতিফ রাতারাতি

তাহাকে একেবারে ভিন্ন দেশে লইয়া গিয়া বিবাহ করিবে।

প্রথমে এ কথায় পরী ভয় পাইল, কিন্তু কাসিম বেপারীর মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া তার সঙ্গে আসন্ন সহবাসের ভয়ে সে এত ভয় পাইয়া গেল যে শীঘ্রই সে এ প্রস্তাবে সানন্দে সম্মত হইল।

পরীর মনটা এই প্রস্তাবে অনেকটা হাল্কা হইয়া গেল। এখন তার মনে হইল লতিফের কথা, তার প্রেম ও তার অঙ্গস্পর্শের পুলকের কথা। সে মনে মনে একান্ত ভাবে লতিফকে কামনা করিতে লাগিল এবং তার সঙ্গে আশু মিলনের সম্ভাবনায় পুলকিত হইয়া উঠিল।

দিবসের বেশীর ভাগ তার এই আনন্দের ভিতর দিয়া কাটিয়া গেল। সে উৎফুল্ল হৃদয়ে গৃহকর্ম্ম করিয়া গেল। বাড়ী ফিরিয়া সে কাপড় ছাড়িয়া গরুগুলির জাব দিতে গেল। বিচালী কাটিয়া মাড় ও খোল মিশাইয়া সে যখন গরুগুলির সামনে দিতে গেল তখন গরুগুলি করুণ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে এমন লোলুপ হইয়া তার দিকে চাহিয়া রহিল যে পরীর মনটা হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল। এই মূক জন্তুদের সঙ্গে পরীর একটা নিবিড় স্নেহ-সম্বন্ধ ছিল। তাহারা কথা কহিতে পারে না কিন্তু তাদের চোখ দিয়া তাহারা পরীকে কত কথাই বলে, সে সব কথা পরী বোঝে। পরী তাদের গলা জড়াইয়া ধরিয়া আদর করে, তারা পুলকে চক্ষু মুদিয়া থাকে, আর কখনও কখনও অসীম স্নেহে পরীর অঙ্গ চাটিয়া দেয়। ইহাদের আজ ছাড়িয়া যাইতে হইবে সে চিন্তায় পরীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সে গরুগুলির সামনে খাবার দিয়া হাতে করিয়া তুলিয়া তাহাদিগের মুখে দিতে লাগিল, আর গায় হাত বুলাইয়া আদর করিতে লাগিল।

ইহাদের সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদের জল্পনায় পরীর চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হইল তার মিলন হইবে লতিফের সঙ্গে—কাসিমের সঙ্গে নয়। লতিফের প্রেমের পরিচয় সে পাইয়াছে—সেই প্রেমের কল্পনায় তার দুঃখ ধুইয়া আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।—সে চারিদিকে লতিফের মূর্ত্তি চক্ষে দেখিতে পাইল, সে বাড়ীময় নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বসিরন মেয়ের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া খুসী হইল। সে ভাবিয়াছিল মেয়ে কাঁদিয়া কাটিয়া না জানি কি কেলেঙ্কারী করিয়া বসিবে। কিন্তু দেখিল মেয়ের বুঝি গহনা কাপড়ে মন ভিজিয়াছে, ধন দৌলতের আশায় সে দুঃখ ভুলিয়াছে। ইহাতে বসিরন মনে মনে সন্তুষ্ট হইল।

অপরাহ্নে কাসিম বেপারী ও আর দুই তিন জন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। গরীবুল্লার আসিতে একটু বিলম্ব হইল, সে কাজীর আফিস হইতে টাকা লইয়া গিয়াছিল রেজেষ্ট্রী আফিসে যুধিষ্ঠিরের কবালা রেজেষ্ট্রী করিতে। কথা ছিল যুধিষ্ঠির ফকীরকে লইয়া সেখানে যথাসময়ে উপস্থিত হইবে। সেখানে গিয়া যুধিষ্ঠিরের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সে ফিরিয়া আসিল। ফকীর বাড়ী না থাকায় যুধিষ্ঠির কবালা লইয়া যাইতে পারে নাই।

ইহারা আসিলে পরী শুনিতে পাইল যে তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং আজই কাসিম বেপারী তাহাকে শ্বশুর লইয়া যাইবে।

এতক্ষণ সে স্বপ্ন দেখিতেছিল যে সে আজ রাত্রে লতিফের সঙ্গে মিলিত হইবে—এখন এই সত্য জানিয়া সে একেবারে গুঁড়া হইয়া গেল।

প্রথম খবর শুনিয়া সে এমন মর্ম্মান্তিক চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল যেন কে তার মর্ম্মস্থলে বিষের বাণ মারিয়াছে।—সে কি কান্না! বসিরন দেখিয়া একেবারে বসিয়া পড়িল—এমন কি গরীবুল্লা পর্য্যন্ত আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিল।

যখন সে পিতাকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিল, "বাপজান গো, কি করলে গো!—আমার গলায় তুমি ছুরী বসিয়ে দিলে না কেন গো?—দাও, দাও বাপজান এখনও ছুরী বসিয়ে দেও, মেরে ফেল আমায়—আমায় পাঠিও না ওর সঙ্গে!"

তখন গরীবুল্লার অর্থগৃধ্নু বক্ষে একটা তীব্র অনুশোচ-

চনার জ্বালা জ্বলিয়া উঠিল। গরীবুল্লা বুকে হাত দিয়া বসিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আল্লা এ কি বুদ্ধি দিলে আমায় ?"

গোলমাল শুনিয়া পরাণের মা আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন পরী একেবারে পাগলের মত হইয়া মাটিতে লুটোপুটী খাইতেছে, চুল ছিঁড়িতেছে, আর ভাঙ্গা গলা চিরিয়া চীৎকার করিতেছে। অবস্থা দেখিয়া পরাণের মারও চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

পরীর রকম সকম দেখিয়া গরীবুল্লা ও তার স্ত্রী ভয় পাইয়া গিয়াছিল। কাসিম বেপারীও ব্যাপার দেখিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল—তার এই বাড়ীতে বসিয়া এ সব দেখিতে শুনিতে কেমন একটু বাধবাধ ঠেকিতেছিল। কিন্তু সে লোক ও পাল্কী বেহারা রাখিয়া গিয়াছিল, বলিয়া গিয়াছিল যে আজ রাত্রির ভিতরই যে করিয়া হউক পরীকে কাসিমের বাড়ীতে আনিতে হইবে।

পরাণের মা পরীকে কোলে করিয়া বসিল। বসিরন বলিল, "দেখ দিদি দেখ, তুমি ওকে একটু বোঝাও।"

পরাণের মা বলিল, "তোমরা সবাই একটু সরে যাও, আমি ওকে এখনি ঠাণ্ডা ক'রে দিচ্ছি।" তার কথামত সকলে সরিয়া গেল—পরী কেবল মূর্চ্ছিতের মত তার কোলের উপর পড়িয়া রহিল।

সকলে চলিয়া গেলে পরী উঠিয়া বসিয়া ব্যগ্রভাবে মৃদুস্বরে বলিল, "ও চাচী তুমি আমায় রক্ষা কর—আমাকে কোনও মতে রক্ষা কর—কোনও মতে লতিফের কাছে নিয়ে যাও!"

পরাণের মা বলিল, "তাই তো, এমনটা হয় তা তো আমি জানি না, তা হ'লে এতক্ষণ কোন্ কালে তোকে পার ক'রতাম! এখন বিয়ে হ'য়ে গেছে—কাসিম বেপারীর অনেক টাকা! ওরা সাহস পায় কি না ব'লতে পারি না। তা' তুই একটু সুস্থির হ' আমি দেখি। আমি ব'লে কয়ে' আজকের রাতটা যদি পাই, তবে নিশ্চয় তোকে উদ্ধার করবো, তুই ভাবিস্ না।"

তারপর অনেক করিয়া বুঝাইয়া পড়াইয়া পরীকে সুস্থির করিয়া সে বসিরন ও গরীবুল্লাকে বলিল, "আজ আর মেয়েটাকে এমন ক'রে পাঠিও না। আজকের রাতখানা যা'ক্, কাল সকালে পাঠিও।"

গরীবুল্লা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যাই দেখি বেপারী রাজী হয় কি না!"

কাসিম বেপারীর কাছে গরীবুল্লার এ দৌত্য নিষ্ফল হইল। সে একটা উগ্র ক্ষুধা লইয়া শকুনির মত ওই কমনীয় মাংসপিণ্ডের প্রতীক্ষা করিতেছিল—বিলম্ব তার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল, "তোমরা মিথ্যা ভাবছ শ্বশুর, ওকে জো সো করে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দেও, আমি এক দণ্ডের মধ্যে ওকে ভুলিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে দেবো। ছেলে মানুষ—ওর খেয়ালে ভুলবে তোমরা? —ও বোঝেই বা কি জানেই বা কি! এখানে এসে আমার ধন দৌলত দেখলেই সব মিটে যাবে।"

গরীবুল্লা অনেক অনুনয় করিল, কিন্তু কাসিম বেপারী শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল। আজ রাতের মধ্যে পরীর এ বাড়ীতে আসা চাইই।

গরীবুল্লা যখন ফিরিয়া গেল তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। তার সংবাদ শুনিয়া পরী আবার ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল—তার দাঁত লাগিয়া গেল। তার পর তার মুখে চোখে জল দিয়া যখন ঠাণ্ডা করা হইল তখন তার গলা একদম বসিয়া গিয়াছে—হাত পা নাড়িবার শক্তি নাই।

সেই অবস্থায় তার অবসন্ন দেহ কাসিমের লোক দ্বিপ্রহর রাত্রে পাল্কীতে তুলিয়া লইয়া গেল।

কাসিমের বাড়ীর অন্দরের উঠানে যখন পাল্কী থামিল কাসিম তখন স্বয়ং পরীকে নামাইয়া লইতে আসিল। ভয়ে পরীর সমস্ত শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। সে যন্ত্রচালিত মৃতদেহের মত কাসিমের অনুসরণ করিয়া ঘরে গিয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িল।

অর্দ্ধ অচেতনের মত সে দেখিল কাসিম দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল, তার পর বুভুক্ষিত ব্যাঘ্রের মত সে তাহার

নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। পরী মোহমুগ্ধ হইয়া পড়িয়া রহিল—বিদ্রোহের সাহস দূরে থাকুক, ইচ্ছাও তার হইল না।

ভগবান তাহাকে অশেষ রূপ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন—সেই অপরাধে পরীব উপর যে নৃশংস বীভৎস অত্যাচার হইয়া গেল, শাস্ত্রে বা আইনে তার কোনও শাস্তি লেখে না।

ভগবানের বিধানে তার শাস্তি নাই কি?

—ক্রমশ

অনাগত

শ্রী মহেন্দ্রচন্দ্র রায়

১

বেলাশেষের শেষকথাটি প্রতিদিনশেষে পুরবীর ব্যথিত স্বরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া দীর্ঘনিশ্বাসের মত কোথায় আঁধারে মিলাইয়া যায়, তবু তার ওই কথাটি আর কিছুতেই বোঝা হয় না। কিছুতেই কি তাহার বেদনার রহস্য নিঃশেষিত হইয়া যায় না? সে কোন্ কথা যার সন্ধানে কালের এই কৃষ্ণা নদীর স্রোত বাহিয়া অনাদি কাল হইতে প্রভাতের ফুলগুলি ভাসিয়া চলিয়াছে? কি সে কথাটি তাব?

ফাল্গুন-সন্ধ্যা ফিরিয়া ফিরিয়া আসে, কোন্ হারানো স্বপ্ন আসিয়া সন্ধ্যার ম্লান আলোকে পরলোকের বাক্যহীন পথিকের মত যেন দাঁড়াইয়া থাকে! সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতে গিয়া বধূ তাই দিনশেষের দীর্ঘনিশ্বাসটি দিয়া সেই স্বপনের পূজা করে, যুবক তার সারাদিনের শ্রান্ত চলার শেষে যেন অকস্মাৎ এই চিরসুদূরের করুণ মূর্ত্তিখানি দেখিতে পাইয়া কেমন হইয়া যায়! যাহাকে কোনো দিনই সে পাইবে না, কোনোদিনই পায় নাইও, সেই চির-প্রার্থিত যেন কবে অতি নিকট হইয়া তাহার মর্ম্মে ধরা দিয়াছিল এক-দিন, সেই কথাটিই মনে করিয়া এই বিশ্বলোকের চিত্ত কেমন ব্যথাতুর হইয়া উঠে! তাই এই সন্ধ্যার মধ্যে বিশ্ব-লোকের যে চিরপ্রতীক্ষিত তাহারি উদ্দেশে একখানি সীমা-হীন বেদনার দীর্ঘশ্বাস মূর্ত্ত হইয়া আছে দেখিতে পাই।

সারাদিনের কর্ম্ম-চেষ্টার বুকে প্রত্যেকের অজ্ঞাতে এ কোন্ ব্যর্থতার ব্যথা সঞ্চিত হইয়া উঠিয়া অন্ধকারে সব-দিনের আলোককে ম্লান করিয়া তুলিতে থাকে? যে পথে সারাদিন চলিয়াছি সেই পথের পানে চাহিয়া এ কিসেব উদাস বিষণ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস আঁধারে মিলায়! সুদূরবনের ঝিল্লীস্বননে অন্তর কোথায় যেন আপনাকে হারাইয়া ফেলিতে চায়! দূর আকাশের সন্ধ্যা-তারার কাছে এত বড় বিশ্বজগৎটা শূন্য হইয়া যায়! অতি অস্পষ্ট, অজ্ঞাত কোন্ গোপন স্বপ্নের কাছে সমগ্র জীবনের কুড়ানো সঞ্চয় নীরস হইয়া যায়!

যে স্বপ্ন এত বড়, সে স্বপ্ন আমাদের কে হয়, কিসের এ স্বপ্ন?

২

প্রকৃতির কচি-শ্যামের অফুরানো বিকাশের পানে

চাহিয়া চাহিয়া অন্তর এ কি স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া উঠে! শ্যামলী প্রকৃতির শ্যামলিমার মধ্যে অন্তরের কোন্ মধুস্বপ্ন এমন সুন্দর হইয়া বিকশিত হইয়া উঠে! বসন্তের পরশ লাগে আর এ কোন্ অপরূপ মায়ায় প্রকৃতির ভুবনখানি আবিষ্ট হইয়া উঠে! অনাদি কাল হইতে মানবের অন্তরে তাই প্রকৃতি এক রহস্যময়ীর রূপ লইয়া কত লীলা করিতেছে। কি যেন অনাদি কালের পরিচয়, কি যেন পরম নিবিড় জানাজানি ওই প্রকৃতি আর মানবে......তবু পরিচয়ও আর হয় না, জানাজানিও হয় না! প্রকৃতির পানে চাহিয়া চাহিয়া মানুষের বুক কি এক ব্যথায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে! প্রকৃতির শ্যামবর্ণে উদ্বেলিত অফুরাণো রস-নির্ঝরের সন্ধান-স্বপ্নে প্রাণ-মন কেমন হইয়া যায়!

তারপর দৃষ্টি যায় প্রাণের অফুরাণো বিকাশের আর এক ক্ষেত্রে। মানুষের জীবনের বসন্ত-প্রভাতের চির-শ্যাম কৈশোরের দিকে চাই। কিশোরের চোখে মুখে, তাহার দেহের বিকাশে, মনের প্রকাশে সেই চির-অনাগতের পরিচয়খানি কেবলি যেন কৌতুকভরে হাসে আর ডাকে, ডাকে আর অন্তরাল হইয়া যায়। যে পরম অনাগতের প্রত্যাশাটি অন্তরে গুঞ্জরণ করে, যার চলার সুর কচিপাতার শ্যাম হিল্লোলে, যার মধুর হাসির আভাস প্রভাত-আলোর স্নিগ্ধ-উজ্জ্বল বিকাশে, যার স্পর্শ পাই বসন্ত-বাতাসে, তারি স্বপ্ন যেন আরো মধুর হইয়া আরো নিকট হইয়া আরো মূর্ত্ত হইয়া ধরা দিতে আসে ওই কিশোর-কিশোরীর দেহের সতেজ-সরস মাধুর্য্যে, প্রাণের সহজ-সুন্দর উল্লাসে, অন্তরের অপূর্ব্ব ভাবাবেগের রহস্যময় দ্যোতনায়!

রহস্যময় প্রাণকে পাওয়ার স্বপ্ন তবু তেমনি সুদূর থাকিয়া যায়! প্রভাতের পূর্ব্বাকাশে নানাবর্ণের অপরূপ বৈচিত্র্যে যাহার আগমনী ধ্বনিত হয়, দ্বিপ্রহরের খর-দীপ্তির অসহ্য হাহাকারে তাহার স্বপ্নটুকুও বুঝি কোথাও ঠাঁই পায় না! তারপর অন্ধকার যখন ছাইয়া আসে চতুর্দ্দিক হইতে বিশ্বকে লুপ্ত করিতে, মৃত্যুর তরণীখানি যখন প্রাণ-যাত্রীকে অন্ধকার রাত্রির অকূল সায়রে ভাসাইয়া লইয়া যায়, তখন আবার শুধু একবার নিমেষের মত পশ্চিমের আকাশে সেই প্রভাতের স্বপ্নই বুঝি সকরুণ দৃষ্টিতে ম্লান হাসিয়া বিদায় চায়!

হে পরম-প্রাণ, তোমার ক্ষণিকের প্রকাশই সত্য হইয়া থাকিল, আর তুমি রহিলে শুধুই স্বপ্ন হইয়া, মায়া হইয়া? প্রভাতের আশা কুহক হইল, আর সত্য হইল বেলাশেষের কান্নাটিই?

৩

এই স্বপ্ন পরমসুন্দর অমৃতময়।

কাব্যে সঙ্গীতে কল্প-সৃষ্টিতে মানুষের ভালবাসায়, বিশ্ব-প্রকৃতির রূপরসগন্ধময়ী রূপের অনুরাগে এই সুন্দরের বন্দনাগীতি শত ধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। অনাদি-কালের এই স্বপ্নসঙ্গিনীকে বাঁধিয়া ধরিবার ব্যর্থ প্রয়াস তাহার! এই জাগ্রত জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাই অতৃপ্তি কাঁদিয়া ফিরি-তেছে। এই যে অতৃপ্তি, ইহা তো কখনো কিছুই-না-পাওয়ার প্রকাশ হইতে পারে না। ক্ষণে ক্ষণে চকিতের মত জীবনের মাঝে মানুষ সেই অসীম সুন্দরের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সেই অনন্ত মুহূর্ত্তে সে পরম সার্থকতার আনন্দে কত না ছন্দে অন্তরের বন্দনা-সঙ্গীত গাহিয়াছে। যাহাকে মানুষ নিমেষের জন্য জীবনে দেখিতে পায় তাহাকে সে তো আপনার সমগ্র জীবনের চিন্তায় কর্ম্মে ভাবে ও ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিল না। তাই একটি নিমেষের অনন্ত আনন্দের নিকট তাহার সমগ্র জীবন দীন কাঙাল হইয়া লুটায়, তাই জীবন-ভরা কেবলই বেলাশেষের কান্না তাহাকে বিষণ্ণ করিয়া তুলিতে থাকে। তাই ওই মুহূর্ত্তটি যত বড় সত্যই হোক, সমগ্র জীবনের দীর্ঘ রিক্ততার সুমুখে তাহার কোনোই মূল্য দেওয়া যায় না, তাহার ক্ষণিকতা তাহাকে স্বপ্নের মর্য্যাদা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না। তাই যাহা আমাদের জীবনের

পরম দুর্লভ সত্য তাহা স্বপ্ন হইয়া রহিল, আর যাহা আমাদের জীবনের নিতান্তই অবান্তর বাধা তাহাই সত্য নাম ধরিয়া আমাদের জীবনকে নিদারুণ করিয়া তুলিল। হারানো স্বপ্নের কান্নায় ভরিয়া উঠে, অনাগতের বেদনায় জীবন অর্থহীন হইয়া যায়, বিশ্বজগৎ বেলাশেষের উদাস বৈরাগ্যে আনমনা হইয়া উঠে।

এই জঞ্জালগ্রস্ত জীবনের মধ্যে মানুষ কখনো কখনো অসীম সুন্দরকে তাহার পরিপূর্ণ সুষমা ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে দেখিতে পায়। দেখিতে পাই এই মুহূর্ত্তগুলি জীবনের জাগ্রত চেতনার মুহূর্ত্ত হইতে স্বতন্ত্র; জীবন যেন কখন কেমন করিয়া ধ্যানের মধ্যে নিবিড় হইয়া সমাহিত হইয়া যায়, এবং তখনকার সমাহিত চেতনায় মানুষ তাহার চির-দিবসের অনাগতকে প্রত্যক্ষ করিতে পায়। আর যাঁহারা জীবনকে ধ্যানের দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারাও এই কথাই বার বার বলিয়াছেন যে ধ্যানেই জীবনের পরি-সমাপ্তি। যাহার আভাস পাই এই পঞ্চেন্দ্রিয়েরই মধ্য দিয়া, তাহাকেই যখন পরিপূর্ণ করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে চাই তখন এই পঞ্চেন্দ্রিয়কে রুদ্ধ করিতে হয়। রুদ্ধ করিবার শক্তি তো আমাদের নাই, তবু এইটুকু জানি যখনই এই জীবনের কোনো অমৃতযোগে সেই অমৃতময় সত্তা অন্তরে আবির্ভূত হইয়া থাকে তখনই আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন বুজিয়া যায়, বাহির হইতে যেন অন্তরের দিকে ইহাদের মুখ ফিরিয়া যায়। তাই যাহাকে অকস্মাৎ চোখে দেখিতে দেখিতে পরম সুন্দর বলিয়া মনে হয়, তাহাকে আরো দেখিতে গিয়া চোখ বুজি; যাহার স্পর্শে দেহ-মনে অমৃত-স্পন্দন জাগে, তাহারই পরশ-রস-মাধুরী উপভোগ করিতে গিয়া স্পর্শাতীত চেতনায় লীন হইয়া যাইতে হয়। তাই এ বিশ্বে যে অকস্মাৎ আসিয়াছে বলিয়া চেতনা উন্মুখ হইয়া উঠে, তাহাকে আর বিশ্বে পাওয়া হয় না। ধ্যান চেতনায় আমাদের সত্তা লীন হইয়া কোন্ রূপাতীত জগতে চলিয়া যায়।

তাই যখন অনন্ত-মুহূর্ত্তটি কাটিয়া যায়, আবার যখন মনোময় চেতনার জগতে জাগিয়া উঠি, আবার চিত্ত

যুগে যুগে জীবন-ধেয়ানীরা তাঁহাদের ধ্যানে পরম সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেই তাঁহাদের চিত্ত পরিপূর্ণ তৃপ্তি পাইল কোথায়? এই ইন্দ্রিয়-জগতের সহস্র বিরোধকে অতিক্রম করিয়া ধ্যান-জগতে যাহার অপূর্ব্ব প্রকাশকে ইঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাকে সেই ধ্যানের মধ্যেই ধরিয়া রাখিয়া হয়ত কেহ কেহ জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এই ইন্দ্রিয়-দৃষ্টিকে, এই বাস্তব জগৎকে গ্রহণ করিবার যে-সব ইন্দ্রিয় আছে তাহা-দিগকে সেই পরম সত্তাকে ধারণ করিবার অযোগ্য বিবেচনা করিয়া বর্জ্জনের নীতি অবলম্বন করিয়া গিয়া-ছেন। তাঁহারা আপনাদের মনোময় চেতনাকে স্বরূপ-সিদ্ধির অন্তরায় মনে করিয়া ধ্যানময় চেতনাকেই আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন।

কিন্তু সকলেই ওই পথটিকেই একমাত্র পথ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

তাঁহারা তাঁহাদের ধ্যানের জগৎকে এই বাস্তবের মধ্যে আনিয়া ধরিতে চাহিয়াছেন। মানুষের মধ্যে দেবত্বের প্রতিষ্ঠা, ইন্দ্রিয়-জগতের মধ্যে অতীন্দ্রিয়ের আবি-র্ভাবকে একটা ক্ষণিকের ব্যাপার করিয়া রাখিতে চাহেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন, এই পরম সুন্দর রস-স্বরূপের প্রকাশ কোথাও ব্যাহত হইয়া যায় নাই। আমরা সংহত চেতনায় যাহার দীপ্তিকে অনুভব করি তাহার সেই দীপ্তি সর্ব্বত্র সর্ব্বকালের জন্য চির-দীপ্যমান হইয়া আছে। এই জগতের সর্ব্বত্র সেই দেবতার আসন রহিয়াছে। সর্ব্ব-ইন্দ্রিয় দিয়া তাহাকে উপলব্ধি করিবার এই যে প্রেরণা, ইহা মিথ্যা নহে। যাহাকে আমরা অনাগত বলিয়া কাঁদিয়া মরিতেছি সে কোথাও হইতে আসিবে না কোনো

দিন। যেমন কখনো কখনো না জানি কেমন করিয়া ধ্যাননিবিড়তার মধ্যে আমরা তাহার সাক্ষাৎ পাই, তেমনি যদি আমাদের এই মনোময় চেতনায় সোণার কাঠি লাগে 'তাহা হইলে তখন অমৃতময় চেতনায় এই বাস্তব জগতেরও জ্যোতির্ম্ময় রূপ আপনি ফুটিয়া উঠিবে।

কিন্তু সোণার কাঠি কোথা হইতে কে আসিয়া লাগাইবে, কখন সেই পরম মুহূর্ত্ত আসিবে আমাদেব জীবনে তাহা কে জানে!

তবু সমগ্র মানব জাতি যে সেই পরম সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করিবার কামনায় আকুল হইয়া নানা পথে তাহার সন্ধান করিতেছে তাহাতো অস্বীকার করা যায় না। কাব্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে, ধর্ম্ম-সাধনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া-পদ্ধতিতে, রাষ্ট্রে ও সমাজে, বিশ্বমৈত্রী সাম্য ও স্বাধীনতার প্রবর্ত্তন-প্রচেষ্টার সহস্র পাকে-প্রকারে কেবলি সেই পরম-অনাগতের পথ-চাওয়াটি মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে।

ও আমার যুগ-যুগান্তের সন্ধানী বিশ্বমানবাত্মা, কবে তোমার এই পরম তৃষার নিবৃত্তি হইবে, কবে অনাগতেব আগমনী অনন্ত আকাশে আনন্দধ্বনি জাগাইবে?

চিত্রবহা

—পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর—

। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২৩

আলো ও ছায়া

দীর্ঘ দারুণ শীতের অন্তে ধরণী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। সেই তপ্ত নিশ্বাসে আকাশের পাণ্ডুরতা ঘুচিয়া তুষার গলিতে সুরু করিল, চেরিগাছের রিক্ত শাখা অনুরাগে রাঙা হইয়া উঠিল। মেয়েদের পোশাকে রঙের বাহার খুলিল, তাহাদের কেঠো জুতার উচ্চতা কমিল। ছেলে-মেয়েরা ছুটি পাইয়া বই বন্ধ করিল, মানুষের মুখে খুসির আভাস জাগিল। দাঁড়কাকের তীক্ষ্ণ কর্কশ কণ্ঠস্বর আর শ্রবণ পীড়িত করে না, পাখীর কলকূজন আবার সুরু হইয়াছে। ভ্রূকুটিকুটিল প্রকৃতি প্রসন্নমুখে রুদ্ধ দ্বার নিরানন্দ গৃহকোণ হইতে আপনার রৌদ্রালোকিত অঙ্গনে সকলকে আহ্বান করিতেছে।

এমন সময় এক দিন প্রভাতে অমর একখানি কার্ড পাইল। তার উপরে চেরিফুলের রঙিন ছবি, তলায় মেয়েলি হাতে লেখা—শনিবার বেলা চারিটা, কোইশি-কাওয়ার মোড়ে। স্বাক্ষর নাই, কিন্তু অমর বুঝিল নিমন্ত্রণ কে পাঠাইয়াছে। বহুক্ষণ ধরিয়া কার্ডখানি সে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল, হস্তলিপি অনেকবার পড়িল, তারপর বুকের পকেটে সযত্নে রাখিয়া দিল। প্রিয়ার হাতের সেই প্রথম লিপি—তারই স্পর্শে তার হৃদয় দুরু-দুরু করিতে লাগিল, আনন্দ যেন বুক ফাটিয়া বাহির হইতে চায়! সে যেন মহামূল্য এক রত্ন হাতে পাইয়াছে তাহা লইয়া কি করিবে কোথায় রাখিবে কিছুই ঠাহর করিতে পারিতেছে না! এত সুখ একাকী উপভোগ করা সম্ভব নয়—তার ইচ্ছা হইতে লাগিল ছুটিয়া গিয়া জনে জনে

লিপিখানি দেখাইয়া বলে, ছাখো ছাখো ওহানা আমায় চিঠি লিখেছে!

চ্যাংএর সহিত আলাপের পর হইতে বোর্ডিংএর কর্ত্তার উপর অমর দারুণ চটিয়া গিয়াছিল। সকল জাপানীর মত সে-ও নিশ্চিতই চীনাদের ঘৃণা করে, অথচ তাহাদের পয়সায় উদর পোষণ করিতে কুণ্ঠিত নয়! অমর কিছুকাল তার সঙ্গে ভাল করিয়া বাক্যালাপ করে নাই। আজ কিন্তু মনে আর বিরাগ পোষণ করিয়া থাকিতে পারিল না, সাধিয়া গিয়া সে তাহাকে অভিবাদন করিল। কহিল, শীত আর নেই, বসন্ত এসেছে, ফুল ফুটেচে, আজ দেখতে যাচ্ছি! কর্ত্তার ষণ্ডামার্ক ছোট ছেলেটার হাতে এক মুঠা চকোলেট গুঁজিয়া দিয়া কহিল, খেয়ে ফ্যাল্! চাকরাণীদের ডাকিয়া বক্‌শিস করিয়া দিল। বলিল, ফুল ফুটেছে, দেখে আয়, পার্ব্বণী দিচ্ছি! অমরের বাক্যে ও ব্যবহারে খুসি যেন উপচিয়া পড়িতে লাগিল।

অপরাহ্নে যথাসময়ে ট্রাম হইতে নামিয়া অমরের উৎসুক দৃষ্টি চারিদিকে ওহানাকে অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু সব বৃথা, কোথাও তার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। তবে কি ওহানা আসিল না? এত আশা দিয়া নিরাশ করিল? সারাদিন ধরিয়া কল্পনার কুহকদণ্ডের স্পর্শে যে সুখস্বর্গ রচনা করিল তাহা কি নিমেষে এমনি করিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে? অমরের ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। একবার ভাবিল অগ্রসর হইয়া খুঁজিয়া আসে, আবার ভাবিল কাজ নাই, যদি সেই অবসরে সে আসিয়া ফিরিয়া যায়! কিন্তু সে যে অগ্রসর হইয়া আর কোথাও দাঁড়াইয়া নাই তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? দ্বিধার মধ্যে পড়িয়া অমর ম্লানমুখে স্থাণুর মত সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

অমর যখন ট্রাম হইতে নামে, ওহানা তখন অদূরবর্ত্তী বৃক্ষতল হইতে তাহাকে দেখিয়াছিল। অমরের সহিত একটু কৌতুক করিবার প্রলোভন সে ত্যাগ করিতে পারিল না—অলক্ষ্যে অমরের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। অমর তখন ওহানার সন্ধানে সম্মুখপানে চাহিয়া ছিল, সে টের পাইল না। গোপনে রহিয়া অমরের উৎকণ্ঠা ও হতাশা লক্ষ্য করিয়া ওহানার আনন্দের আর অবধি রহিল না। তাহার সাক্ষাৎ লাভের জন্য এত ব্যাকুলতা!

সহসা ওহানার মনে হইল অমরের চোখদুটা যেন চক চক করিতেছে। আর সে স্থির থাকিতে পারিল না, একেবারে অমরের পিঠের কাছে অগ্রসর হইয়া কহিল, কাকে খুঁজছেন?

অমর চমকিয়া উঠিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্তে তার সজল চোখ আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিল। অনুযোগের সুরে সে কহিল, বেশ ত! আমি ভেবে ভেবে মরছি, আর আপনি পিছন থেকে মজা দেখচেন!

ওহানা হাসিতে লাগিল। তারপর সম্মুখে পদক্ষেপ করিয়া কহিল, চলুন।

দুজনে পাশাপাশি চলিল। ছোট বড় মাঝারি ধনী দরিদ্র সকল বয়সের সকল অবস্থার নরনারী উৎসববেশে সজ্জিত হইয়া একই দিকে চলিয়াছে।

নদীর ধারে অপূর্ব্ব দৃশ্য। তীরবর্ত্তী তরুশ্রেণী ফুলের টোপর পরিয়া বরবেশে যেন বধূর প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে! মনে হইল যেন নীলাম্বর হইতে অদৃশ্য সূত্রে একখানি অতিসূক্ষ্ম গোলাপী চন্দ্রাতপ ঝুলিতেছে! তারই তলে মেলা বসিয়াছে। কোথাও ফুলুরি ভাজা হইতেছে, কোথাও শিশুর খেলনা সাজানো, কোথাও বিবিধ পিষ্টক ও মিষ্টান্নের দোকান। লোকেরা চলিয়াছে প্রধানত পদব্রজে, মাঝে মাঝে রিক্‌সায় নরনারীর যুগলমূর্ত্তি চোখে পড়িতেছে। কখনো বা গেইশারা * চলিয়াছে—বিচিত্র-বর্ণ ঝলমলে পোশাকে তাহাদিগকে অতিকায় প্রজাপতি বলিয়া ভ্রম হয়। তাহাদের উদ্দেশ করিয়া ভিড়ের মাঝ থেকে রসিক যুবকেরা দু' একটা রসের কথা নিক্ষেপ

* নর্ত্তকী

করিতেছে। দোকানীরা নিজ নিজ পণ্যের গুণকীর্ত্তন করিয়া উচ্চকণ্ঠে খরিদ্দার আহ্বানে রত। চারিদিকে হাসিগল্পের হর্‌রা, পথ একেবারে সরগরম।

অমর ও ওহানা জনস্রোতে ভাসিয়া চলিল। এই বিচিত্র জনতা, পুষ্পভারাবনত তরুশ্রেণী, এই আনন্দের কলরব, উৎসবের সমারোহ—এ কি অলীক? আর ওহানার সহিত অব্যাহত অন্তরঙ্গতায় এই যে ভাসিয়া চলা—এ কি সুখস্বপ্ন? পথ চলিতে চলিতে অমর ইহাই ভাবিতেছিল।

একস্থানে চীনাবাদাম বিক্রী হইতেছিল। একমুঠা বাদাম কিনিয়া অমর ওহানার আস্তীনের থলির মধ্যে ঝুপ করিয়া ফেলিয়া দিল। তারপর চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে তার মধ্যে হাত পুরিয়া দিয়া বাদাম খাইতে সুরু করিল। নির্ব্বাক ওহানা ভাবিতেছিল, দৌরাত্ম্যও এত মধুর হয়!

কিছুক্ষণ যায়। ওহানা রহস্য করিয়া কহিল, আচ্ছা স্বার্থপর লোক যাহোক্!

অমর শশব্যস্তে কহিল, ভুল হয়ে গেছে! মাপ করবেন! বলিয়া বাদাম ছাড়াইয়া ওহানার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া কহিল, খান!

ওহানা হাসিয়া মুখ সরাইয়া লইয়া বলিল, আমি নিজে খেতে জানি।

অমর বলিল, না, জানেন না। আপনি নেহাৎ ছেলেমানুষ! নিন, খেয়ে ফেলুন!

পথ চলিতে চলিতে অমরের হাত হইতে খাইতে ওহানার লোভ ও লজ্জা দুই-ই হইতে লাগিল। শেষে লজ্জারই জয় হইল। সে হাত পাতিয়া কহিল, দিন খাচ্ছি।

নাছোড়বান্দা অমর কিছুতেই রাজি হইল না। তর্কবিতর্কের পর ওহানা হার মানিল। একটা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থানে অমরের হাতে ওহানার বিম্বাধর চকিতে স্পর্শ করিল। ওহানা বাদাম খাইল।

• সন্ধ্যাগমে কল কারখানার ছুটির পর মজুরেরা দলে দলে আসিয়া ভিড় বাড়াইয়া তুলিল। সারাদিনের পরিশ্রমের পর অনেকেই একটু আধটু নেশা করিয়াছে, তারই উত্তেজনায় তাহারা উচ্চ কলরব করিতেছিল। কয়েকজন জড়িতকণ্ঠে গান ধরিল—জীসান্ সাকে নোন্দে য়োপ্পারাত্তে ইত্যাদি, অর্থাৎ, মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বুড়ো গেল গড়িয়ে, দেখে তাই বুড়ী অবাক দিল তারে চড়িয়ে! একজন টলিতে টলিতে একেবারে ওহানার গা ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল। চমকিয়া উঠিয়া অনুচ্চ চীৎকার করিয়া ওহানা সভয়ে অমরের কাঁধটা চাপিয়া ধরিল।

অমর হাত দিয়া তার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিয়া কহিল, ভয় কি! আমি ত সঙ্গে রয়েছি!

লজ্জিতমুখে ওহানা কহিল, মাতালকে বড় ভয় করে! অমরের কাঁধ হইতে হাত সরাইয়া লইয়া সে ধীরে ধীরে আপন কটিদেশ তার বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিয়া লইল।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়াছে। শীতের প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে মেলা ভাঙ্গিতে সুরু হইল। অমর ও ওহানা রিক্‌সায় উঠিল। রিক্‌সা চলিতে সুরু করিল।

কিছুক্ষণ যায়। ঢাকা গাড়ির মধ্যে ওহানার পাশে বসিয়া অমর সন্তর্পণে তার একখানি হাত টানিয়া দুই হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। ওহানা আপত্তি করিল না। তার মুখে একটু ম্লান হাসির আভাস ভাসিতে লাগিল।

ঘণ্টাধ্বনি করিয়া গাড়ি চলিয়াছে। কতক্ষণ উভয়েই নীরব, কারও মুখে কথা নাই। বোধ করি মৌনতার অবকাশে তাহারা পরস্পরের অন্তর্লোকে দৃষ্টিপাত করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

একটা চৌমাথায় আসিয়া সহসা গাড়ি থামিয়া গেল। রিক্‌সাওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ দিকে যাবো হুজুর?

ওহানা চমকিয়া বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিল। শশব্যস্তে কহিল, তাইত, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

অমর বলিল, কোথাও না! আমি ত এখনো কিছু বলিনি!

ওহানা হাসিল। কহিল, বেশ। আমরা বুঝি সারা-রাত গাড়িতেই থাকবো ?

অমর বলিল, ক্ষতি কি ?

ওহানা বলিল, না না, ঠাট্টা নয়। বলো কোথায় যাবে ?

এই প্রথম ওহানা অমরকে ঘনিষ্ঠ সম্বোধন করিল। সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অমর বলিল, তুমিই বলো না।

ওহানা একটু ভাবিয়া বলিল, আচ্ছা। তাহলে এই খানে নাবো।

অমর গাড়ির ভাড়া চুকাইয়া দিল।

ওহানা বলিল, এস। বলিয়া চলিতে সুরু করিল।

অমর তার সঙ্গে চলিল। কোথায় যাইতেছে সে জানে না, জানিবার কৌতূহলও নাই। ওহানার সঙ্গে যাইতেছে ইহাই যথেষ্ট

খানিকক্ষণ চলিয়া তাহারা একটা নির্জ্জন পথে আসিয়া পড়িল। সে পথে জনমানব নাই। চলিতে চলিতে এক সময় অমরের মনে হইল, ওহানার মুখ যেন ম্লান দেখাইতেছে, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল না-ও হইতে পারে, পথ অন্ধকার বলিয়া বোধ করি এমন মনে হইল। ওহানার দুঃখের ত কোনো হেতু নাই !

ওহানা একটা মন্দিরের পাশে আসিয়া থামিল। তার পর ইতস্তত দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া মন্দির-সংলগ্ন বিস্তীর্ণ উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিল। অমর তাহার অনুগমন করিল। পথে থাকিতে দূর ব্যবধানে দু' একটা তেলের আলো দেখা যাইতেছিল, উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে আলোকের আভাসটুকুও বিলুপ্ত হইল। সেখানে ঘোর অন্ধকার। সেই অন্ধকারে কত প্রসারিতশাখা বনস্পতি অতিকায় দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া আছে। স্থানে স্থানে ক্ষীণদ্যুতি খদ্যোৎ জ্বলিতেছে, মাঝে মাঝে মন্দিরের স্তিমিত দীপশিখা চোখে পড়িতেছে। চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ, কেবল রহিয়া রহিয়া দেবায়তনের নিভৃত কক্ষনিঃসৃত জড়িত কণ্ঠোচ্চারিত অস্পষ্ট সূত্র-আবৃত্তি-ধ্বনি অব্যাহত স্তব্ধতার বুকে ছিদ্র করিয়া দিতেছে। সেই নিরালোক কাননভূমির অনভ্যস্ত পথে চলিতে চলিতে অমরের মনে কেমন একটা মোহের সঞ্চার হইল। মনে হইল, সে যেন জগৎ সংসার ছাড়িয়া দূরে দুরান্তে চলিয়া যাইতেছে— এক রহস্যপুরীর সন্ধানে এক স্বপ্ন-বালার অনুসরণ করিতেছে !

অবশেষে ওহানা থামিল। তরুতলবর্ত্তী এক বৃহৎ শিলাখণ্ড নির্দ্দেশ করিয়া অমরকে বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিল। অমর বসিলে সে তার পাশে গিয়া বসিল।

সময় যায়। ওহানা কথা কহে না। অমরের অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। কথা বলিবার উদ্‌যোগ করিতেই ওহানা ইঙ্গিতে তাহাকে নিবারণ করিল—অমরের আর কথা কহা হইল না। রাত্রি বাড়িয়া চলিল, তবু ওহানা নির্ব্বাক বসিয়া আছে। ওহানার ব্যবহারে অমরের বুকের ভিতরটা ব্যথায় টনটন করিতে লাগিল, অপরাহ্নের উৎসবের এই কি পরিসমাপ্তি !

ভক্ত আসিয়া মন্দিরের ঘণ্টা বাজাইয়া দিল। তার প্রতিধ্বনি অন্ধকারের বুকে গড়াইয়া চলিতেছে, এমন সময় সহসা ওহানা দাঁড়াইয়া উঠিয়া ক্রন্দনবিকৃত কণ্ঠে কহিল, কেন তুমি এত নিষ্ঠুর ? কেন আমায় ভালবাসো ? কেন ভালবাসো ?

এক মুহূর্ত্তে অমর যেন আকাশ হইতে ধরণীর ধূলির উপর আছাড় খাইয়া পড়িল। এ কি ব্যাপার ! এই প্রশ্নের তাৎপর্য্য সে বুঝিল না, ইহার মধ্যে ওহানার কাঁদিবারই বা কি আছে তাহাও তার ধারণার অতীত। সে কেবল ওহানার মুখপানে মূঢ়ের মত তাকাইয়া রহিল, কি যে উত্তর দিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না।

ওহানা বলিতে লাগিল, দুদিন পরে যখন দেশে ফিরে যাবে তখন আমি কি নিয়ে থাকবো ? কি করে' বাঁচবো তখন আমি ? এ তুমি কি করিলে ? কি করলে ?

অমর এতক্ষণে ভাষা খুঁজিয়া পাইল। শিলাসন

দাঁড়াইয়া ওহানার সজল চোখের পানে চাহিয়া ধীর কণ্ঠে সে কহিল, কেন, তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।

ওহানা বলিল, সঙ্গে যাবো? কিন্তু……

কথা আর শেষ হইল না। বাহুবিস্তার করিয়া অমর তাহাকে নিমেষে বুকের উপর টানিয়া লইল, অজস্র চুম্বনের তাপে ওহানার চোখের জলের আর চিহ্নমাত্র রহিল না।

২৪

পরাভব

অধিকাংশ জাপানী কুমারীদের মত ওহানারও শৈশব ও কৈশোরকাল সংসারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়াই কাটিয়াছিল। বাড়িতে পুরুষ বলিতে পিতা ও দুই ভাই—তাহাদেরই উপর ওহানার সকল অভিমান আবদার ও স্নেহের দৌরাত্ম্য চলিত। বড় হইয়াও সে কখনো অনুভব করে নাই তাহার জীবনে আর কোনো পুরুষের সাহচর্য্যের প্রয়োজন আছে। তারপর দৈবদুর্বিপাকে ভাইদুটি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিল, শোকার্ত্ত পিতামাতার সন্তান বলিতে কেবল ওহানাই বাকি রহিল, তখন সে কেবল তাঁহাদিগকেই আশ্রয় করিয়া ভ্রাতৃশোক ভুলিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। তিনটি মানুষের জীবনস্রোত অতঃপর একদিকেই প্রবাহিত হইতে লাগিল, সেই ধারার যে কোনোকালে পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে এমন কল্পনা ওহানার মনে কখনো স্থান পায় নাই

শোকের আবহাওয়ায় দিনের পর দিন কাটাইয়া ওহানার তরুণ মন যখন ভিতরে ভিতরে পীড়িত হইয়া উঠিতেছিল এমন সময় অমরের সঙ্গে তার পরিচয় হইল। ব্যাপারটি তার মন্দ লাগিল না, সে বেশ একটু বৈচিত্র্যের স্বাধ পাইল। অনাত্মীয় পুরুষের সাহচর্য্যেও যে সুখ থাকিতে পারে ইহা সে প্রথম উপলব্ধি করিল। দিনে দিনে অমরের সহিত বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মনের উপর পিতৃস্নেহের আধিপত্যের হ্রাস ঘটিতে লাগিল। ধীরে ধীরে অমরের চিন্তায় তার মন আচ্ছন্ন হইতে লাগিল, অন্তর্লোকে পিতার সিংহাসন আর অটল রহিল না, নড়িতে সুরু করিল।

উঠিতে বসিতে সকল কাজে সকল চিন্তায় কেবলই অমরের কথা মনে পড়ে। কবরী রচনা করিয়া মনে হয় অমরের কি এই খোঁপা পছন্দ হইবে? বেশভূষা করিয়া মনে হয় কিমোনোর রঙ তাহার চোখে কেমন লাগিবে? কেশেবেশে সুগন্ধি মাখিয়া মনে হয় এই সুগন্ধে কি অমরের চিত্ত তৃপ্ত হইবে? মুকুরে আপনার সৌন্দর্য্য দেখিয়া আপনি মুগ্ধ হইয়া গিয়া বিনয়ের ভান করিয়া ওহানা ভাবিতে বসে, আচ্ছা, এই ত আমার রূপ, এ রূপের পানে সে অমন করিয়া চাহিয়া থাকে কেন? তার রূপের কাছে আমার রূপ কোন্ ছার! আর রূপই যদি বা কিছু থাকে, গুণ কি একরতি আছে? বিদেশের নিঃসঙ্গ জীবনে আমাকে পাইয়াছে, তাই ভালো লাগে, নহিলে ভালো লাগিবার এমন কি-ই বা আছে?

আজকাল মাটির পৃথিবীতে মাটি আর চোখে পড়ে না—সবই যেন সোনা হইয়া গেছে! সকল জিনিসেরই সে নব নব অর্থ নব নব রূপ দেখিতে পায়। ভুবন-ভবনে আর গগনের দিগন্ত-প্রসারিত অঙ্গনে সৌন্দর্য্যের এক অনন্ত বিচিত্র জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ, ধরণীর এক মোহিনী-মূর্ত্তি দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। পাতার মর্ম্মরে ঝর্ণার ঝর্ঝরে সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠে, নক্ষত্রখচিত নীলাকাশ কানে কানে কথা কয়! এতদিন সাগরগর্জ্জনের সে কোনো অর্থ খুঁজিয়া পায় নাই, আজ বুঝিয়াছে, সাগরের তটঘাতী তরঙ্গভঙ্গের অবিরাম আকুতি আকাশ ও ধরণীকে হৃদয়ে ধরিবার জন্য! বিরহের সেই বিক্ষোভ মিলনহেতুই সেই হাহাকার!

ওয়ুকির ঘরে নিভৃতালাপের পর, যেদিন সে খোঁপার ফুল অমরের কোটে পরাইয়া দিয়াছিল, সেদিন গৃহে ফিরিয়া রাত্রির নির্জ্জনতায় সে তার মানসলোকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, সেখানে একমাত্র অমরই রাজার মত

বিরাজমান, সেখানে পিতামাতার চিহ্নমাত্র নাই। ওহানা চমকিয়া উঠিল—কে যেন তাহাকে চাবুক মারিল। ক্ষত্রিয়-কুমারী সে—সন্তানের কর্ত্তব্য এমনি করিয়া কি সে পালন করিতেছে? যে-পিতা এতকাল তাহাকে অটল স্নেহে লালন করিলেন, তার শিক্ষার জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াও কত অর্থব্যয় করিলেন, তার কোনো সাধ যিনি অপূর্ণ রাখেন নাই, অহরহ তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যিনি চিন্তিত রহিয়াছেন, এই কি তাঁর পুরস্কার? এ কি মহাপাপ সে করিতেছে,—এ যে পিতৃদ্রোহ। আর যে পুত্রশোকাতুরা মাতা তাহারই উপর পুত্রস্নেহের সাধ মিটাইয়া দুঃখের দংশন হইতে হয়ত একটু অব্যাহতি পাইয়াছেন, সে কি তাঁহাকেও ভুলিতে বসিল?

অনুশোচনায় ওহানার চিত্ত বিক্ষুব্ধ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে ভাবিতে বসিল, পিতামাতার সেবাযত্নের কি কোনো ত্রুটি করিয়াছি? না তা সে করে নাই, পূর্ব্বে যেমন করিত এখনো তেমনি করিয়া থাকে! কিন্তু সেবাযত্নের কতটুকু মূল্য যদি তা শুষ্ক কর্ত্তব্যের খাতিরে করা হয়, যদি তার সঙ্গে স্নেহপ্রীতির কোনো সম্পর্ক না থাকে? আগে পিতামাতার চিন্তাই ছিল তার একমাত্র ধ্যান, আর এখন?

ওহানা স্থির করিল, আর নয়! সে অন্যায় করিয়াছে, তার অপরাধের তুলনা নাই, সে সন্তানের কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে! অতঃপর সে মন হইতে সকল চিন্তা নির্ব্বাসিত করিয়া একমাত্র পিতামাতার ধ্যানই করিবে! এতদিন অন্য কাহাকেও তার প্রয়োজন হয় নাই, এখনই বা হইবে কেন? সে সংকল্প করিল, অমরকে লিখিয়া দিবে, সে তার সঙ্গে ফুল দেখিতে যাইতে পারিবে না! অমর একে পুরুষ, তায় বিদেশী, তার সঙ্গে এতটা মাখামাখি কি ভালো? নিশ্চয় তার মাথা খারাপ হইয়াছিল, নহিলে ক্ষত্রিয়কন্যা সে—তার এমন অসংযম কখনো সম্ভব?

ওহানা ভাবিল, ওয়ুকির বাড়ি যাওয়া বন্ধ করিলেই আর অমরের সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা থাকিবে না। এবং তার সঙ্গে দেখা না করিলেই সে তাহাকে ভুলিতে সমর্থ হইবে। তখন সে পুনরায় তাঁর পুরাতন জগতে ফিরিয়া যাইতে পারিবে, যেখানে পিতামাতা ও কন্যার মাঝে আর কেহ আড়াল তুলিতে পারিবে না।

ইহা স্থির করিয়া সে কতকটা আশ্বস্ত হইল। পিতাকে বলিল, ওয়ুকির নিকট আর কিছু শিখিবার নাই, সেখানে আর সে যাইবে না। পিতা আপত্তি করিলেন না, কহিলেন, বেশ ত! প্রয়োজন না থাকিলে যাইবে কেন? ওহানার মর্ম্মদাহ অনেকটা লাঘব হইল। সে কয়েকদিন বাড়ির বাহির হইল না। পিতামাতার সেবায় তাঁদের একান্ত সাহচর্য্যে সারাক্ষণ গৃহকর্ম্মে নিরত থাকিয়া সে অন্তরের আকুতির প্রায় কণ্ঠরোধ করিয়া আনিল।

এমন সময় একদিন ঝুরুঝুরু দক্ষিণ পবন বহিতে সুরু করিল, আকাশ নীল নির্ম্মল হইয়া উঠিল, কূজনে গুঞ্জনে কাননভূমি ভরিয়া গেল। ওহানার মন কেমন করিতে লাগিল। তার অন্তরে একটা অস্পষ্ট ব্যাকুলতা জাগিল, তাহাতে কতকটা সুখ কতকটা বিষাদ, ঠিক যে কি তা বুঝা কঠিন। ওহানা উন্মনা হইয়া উঠিল

সে বুঝিল বসন্ত আসিয়াছে, এইবার সাকুরা ফুটিবে। তারপর তার স্মরণ হইল, সে অমরকে কথা দিয়াছিল তার সঙ্গে ফুল দেখিতে যাইবে। অমরের সহিত বহুদিন দেখা নাই, সে কেমন আছে কে জানে! অমরের মুখখানি ওহানার স্পষ্ট মনে পড়িল। তার প্রতিভাদীপ্ত দুটি চোখ, তার প্রসন্ন হাসি, তার সহজ সৌজন্য এবং অনাবিল রহস্যপটুতা একে একে সমস্ত কথা তার মনে পড়িতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে, কি জানি কেন, তার মন খুসি হইয়া উঠিল। অমরকে দেখিবার জন্য তার মন ব্যাকুল হইল।

অমরের চিন্তায় বহুক্ষণ কাটিবার পর তার স্মরণ হইল সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতেছে! অমনি তার মনে হইল, প্রতিজ্ঞা ত অমরের কাছেও করিয়াছে, একত্রে ফুল দেখিতে যাইবে! প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা যদি দোষ হয় তাহা হইলে সকল ক্ষেত্রেই সে কথা খাটিবে না কেন? অমরের

কাছেই সে প্রথম প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, সে-প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা ত উচিত!

ওহানা ঠিক করিল, অমরের সঙ্গে ফুল দেখিতে যাইবে, কেবল সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যই! তারপর তাহার সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিবে! ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য সে ত স্থির করিয়া ফেলিয়াছে, তবে আর তার সঙ্গে একবার মাত্র সাক্ষাৎ করায় দোষ কি? সম্মুখে অনন্ত বিচ্ছেদ যখন রহিয়াছে তখন একদিন মাত্র অমরকে একটু সুখী করিলে কি আর এমন অন্যায় করা হয়? বেচারা অমর, তারই বা অপরাধ কি? তবে খামখা তার মনে বেদনা দিবে কেন?

ওহানা অমরকে কার্ড লিখিয়া স্বহস্তে ডাকে দিয়া আসিল। বাড়ি ফিরিবার পথে বসন্তের হাওয়া তার গায়ে সস্নেহে হাত বুলাইতে লাগিল, উদার স্বচ্ছ আকাশ অনুরাগভরে যেন তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। তার মনে হইল পাখী যেন গাহিয়া গাহিয়া বলিতেছে, তোমার মনে এই যে অব্যক্ত বেদনা, অনির্দ্দিষ্ট দুঃখ, প্রিয়মিলনে তার উপশম করো! মনের মধ্যে ক্ষোভ বা অভিমান সঞ্চয় করিয়ো না, আজিকার উৎসব সার্থক করিবার জন্য তোমাকেও প্রয়োজন আছে! তৎপর হও, কারণ যে-ফুল আজ ফুটিয়াছে কাল তাহা ঝরিয়া পড়িবে, ক্ষণভঙ্গুর তার জীবন! যাহা পাইয়াছ তাহাকে কৃতজ্ঞ অন্তরে গ্রহণ করো, হেলায় ঠেলিয়ো না!

আশা উদ্বেগ আনন্দ ও বিষাদের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে কয়েকটা দিন দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। নির্দ্দিষ্ট দিনে সাজসজ্জা করিয়া পিতামাতার নিকট বিদায় লইবার কালে ওহানা বলিল, ফুল দেখতে যাচ্ছি।

তাঁহারা বলিলেন, এস। ফিরতে বেশি দেরী কোরো না।

ওহানা বলিল, একটু দেরী হবে, তোমরা খেয়ে নিয়ো।

তাঁহারা বলিলেন, কেন? আব কোথাও যাবে?

ওহানা এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, সে তার সহপাঠিনী এক বন্ধুর বাড়িতে আহার করিয়া ফিরিবে!

মাতাপিতার কাছে এই প্রথম সে সত্য গোপন করিল, এই চিন্তাটা মনের মাঝে কেবলই খচখচ করিতে লাগিল। শান্তি লাভের আশায় সে মনকে প্রবোধ দিল এই বলিয়া যে ব্যাপারটার আজই শেষ, আর মিথ্যাচরণের কোনো কারণ ঘটিবে না! একবার মাত্র মিথ্যা বলায় জগতের এমন কি ক্ষতি হইবে? কত লোক ত অহরহ মিথ্যা কহিতেছে—অবশ্য তারা যে ভালো লোক তা নয়—তবুও জগৎ ত উল্টাইয়া যায় নাই!

ওহানা স্থির করিয়াছিল অমরের সঙ্গে ভ্রমণ সাঙ্গ করিয়া ফিরিবার পথে তাহাকে শান্তচিত্তে সব কথা খুলিয়া বলিয়া বন্ধুভাবে তার নিকট বিদায় গ্রহণ করিবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সে বুঝিতে পারিল, সংকল্প করা যত সহজ সেটিকে কার্য্যে পরিণত করা ঠিক তার বিপরীত। আলোকিত জনবহুল পথে সে-সব কথা অনেক চেষ্টা করিয়াও ওহানা উচ্চারণ করিতে পারিল না। অমরের সহাস্য আনন্দিত মুখ তার কথা শুনিয়া মুহূর্ত্তে মলিন হইয়া যাইবে, যতই এই কথা সে ভাবিতে লাগিল কথাটা বলা তার পক্ষে ততই অসম্ভব হইয়া উঠিল। শেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া সে অমরকে নির্জ্জন উদ্যানে অন্ধকারের আড়ালে লইয়া গিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, সেখানে অমরের মুখ দেখা যাইবে না, কথাটা বলা হয়ত সহজ হইবে।

অন্ধকারে বসিয়া বসিয়া আসন্ন বিরহের ক্ষোভ তাহাকে এমনি বিচলিত করিল যে অনেক চেষ্টা করিয়াও সে একটি কথাও বলিতে পারিল না। সময় যত কাটিতে লাগিল ততই অমরের উপর তার অভিমান বাড়িয়া চলিল। কেন সে তার জীবনের পথে আসিয়া দাঁড়াইল? কেনই বা সে তাহাকে সম্মোহিত করিয়া জড়পদার্থে পরিণত করিল, তার সমস্ত শক্তি সামর্থ্য কর্ত্তব্যবুদ্ধি হরণ করিল? প্রকাশহীন কান্নায় তার কণ্ঠরোধ হইবার

উপক্রম হইলে অসহ দুঃখে সে আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল। পরে যাহা ঘটিল তার ফলে তার সকল সংকল্প স্রোতের মুখে তৃণের মত ভাসিয়া গেল।

২৫

অভিসার

বোর্ডিং ছাড়িয়া শহরের উপকণ্ঠে অমর বাড়ি ভাড়া লইয়াছে। টিলার উপর ছোট্ট একখানি বাড়ি—তার কোলে ছোট্ট এতটুকু বাগান। সুমুখ দিয়া সরু ঢালুপথ নীচে নামিয়া গেছে। চারিধার নিভৃত নির্জ্জন--প্রচুর গাছপালা শ্যামশ্রীতে সমুজ্জল। কোথাও কোলাহল বা ব্যস্ততার চিহ্নমাত্র নাই। সমাজ সংসার ভুলিয়া দুজনে মুখোমুখি বসিয়া থাকিবার এমন উপযুক্ত স্থান আর নাই।

অমরের গৃহস্থালী ওহানা গুছাইয়া দিয়াছিল। কোথায় কোন্ জিনিস থাকিবে, কোন্ ঘর কি কাজে লাগিবে, বাগানে কোন্ কোন্ বাহারী ফুল ও পাতার গাছ বসিবে, সমস্তই তার নির্দ্দেশ অনুসারে হইয়াছিল। সে-ই হইল সে-গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী।

ছুটির দিনে প্রাতরাশ সমাধা করিয়াই ওহানা আসিয়া উপস্থিত হয়। অমরের পড়ার ঘরে মেঝের উপর আসন পাতিয়া বসিয়া সে তার মোজা রিফু করে, সার্টের বোতাম বসায়, ক্রুশকাঠি দিয়া নেকটাই বুনে, আবার কথনো বা তারই জন্য কিমোনো * সেলাই করে। অমর টেবিলের পাশে বসিয়া বই পড়ে বা লিখিতে থাকে। দ্বিপ্রহরে দুজনে মুখোমুখি বসিয়া নিশ্চিন্ত আরামে আহার করে। এক এক দিন ওহানা নিজেই সমারোহ করিয়া রাঁধিতে বসিয়া যায়। জাপানী বা বিদেশী ব্যঞ্জন, অমর যাহা খাইতে ভালবাসে, তাহাই প্রস্তুত করে। এমনি সব দিনে অমর বইখাতা মুড়িয়া ব্যস্ত সমস্তভাবে রান্নাঘরে আসিয়া বসে, অপটু হাতে ওহানাকে সাহায্য করিতে গিয়া গোল বাধাইয়া ফেলে, তারপর বকুনি খাইয়া নিরস্ত হয়।

* জাপানী পোষাক, আলখেল্লা।

কোনো দিন বা ওহানা কোতো † বাজায় অমর হয় শ্রোতা, আবার কখনো বা অমর গান করে ওহানা বসিয়া শুনিতে থাকে। গান শেষ করিয়া গানের অর্থ সে ওহানাকে বুঝাইয়া দেয়। এক একদিন ওহানা জাপানের পুরাণ-ইতিহাসের কাহিনী, উপকথা বা ভূতুড়ে গল্প বলিতে বসে—সেদিন কোথা দিয়া যে সময় কাটিয়া যায় অমর জানিতেও পারে না।

ওহানা যতদিন না আসে প্রায় প্রত্যহই অমরের কাছে রঙীন খামে ভরিয়া সুরভিত এক একখানি চিঠি পাঠায়। প্রভাতে ঘুম ভাঙিলেই ওহানার লিপি লাভ করা অমরের অভ্যাসের মধ্যে পরিণত হইয়াছিল। দুইটি রবিবার বা এক ছুটি হইতে অন্য ছুটির ব্যবধান কালের মধ্যে ছোটো খাটো একটি চিঠির তাড়া অমরের বুকের পকেটে আশ্রয় লাভ করিয়া তার নিত্য সাহচর্য্য উপভোগ করে। রাত্রে শয়নের সময় কেবল তাহারা স্থানান্তরিত হইয়া তার কোমল উপাধানতলে আশ্রয় পায়।

একদিন ওহানা বলিল, আমায় বাংলা শেখাও না কেন? তোমার দেশে গিয়ে বোবা হয়ে থাকবো না কি?

অমর মুখে মুখে ওহানাকে বাংলা শিখাইতে সুরু করিয়া দিল। দ্রুতগতি ছাত্রীর উন্নতি হইতে লাগিল, দেখিয়া তার সুখের সীমা রহিল না। অল্পকাল অমরের সঙ্গে দেখা হইলে সে হাসিয়া বলে, কেমন আছ? থাকে থাকে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া অমরের পানে তর্জ্জনী নিক্ষেপ করিয়া কহে, দুষ্টু ছেলে! বিদায় লইবার কালে বলে, তবে আসি! ওহানার মুখে বাংলা কথা ভারি মধুর শুনায়, অমরের মাঝে মাঝে মনে হয় যেন ওহানাকে লইয়া কলিকাতায় সংসার পাতিয়া বসিয়াছে।

একদিন বাংলাপাঠরতা ওহানা কাব্যরচনারত অমরের পানে বারম্বার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াও তার মনোযোগ আকর্ষণ

† জাপানী তারের যন্ত্র।

করিতে পারিল না। অমর তখন স্বপ্নলোকে বিচরণ করিতেছিল। অনেকক্ষণ পরে রচনা শেষ করিয়া একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ওহানার পানে চাহিয়া অমর দেখিল, সে বই মুড়িয়া ম্লানমুখে বসিয়া আছে।

অমর জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে ? অমন করে' বসে' যে ?

ওহানা কহিল, ভাবছিলুম, কবিরা যখন রচনা করে তখন বোধ হয় জগৎ সংসারের আর কিছুর কথা তাদের মনে থাকে না !

অমর কথাটার তাৎপর্য্য না বুঝিয়া সহজভাবে উত্তর দিল, ঠিক বলেছ ! তখন আর কিছুই মনে থাকে না !

ওহানা কহিল, তাহলে এবার থেকে আমি অন্য ঘরেই বসবো ! কি জানি, এখানে বসলে কবির কাজে ব্যাঘাত ঘটতে পারে !

অমর বুঝিতে পারিল ওহানা মনে আঘাত পাইয়াছে, তার অভিমান হইয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে ওহানার পাশে আসিয়া বসিল। আদর করিয়া কহিল, রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি ! আমার দোষ হয়েছে, আমায় মাপ করো !

ওহানা আর স্থির থাকিতে পারিল না, অমরের কাঁধে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ওহানাকে শান্ত করিতে সেদিন অমরের যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। বাড়ি ফিরিবার সময় ওহানা বলিল, কিছু মনে কোরো না। তোমার লেখার ওপর মাঝে মাঝে ভারি হিংসে হয় !

এক দিন ওহানা জিজ্ঞাসা করিল, কটার সময় ঘুমও ?

অমর কহিল, কেন বলো দেখি ?

ওহানা কহিল, বলই না।

অমর কহিল, এগারোটার আগে নয়। লেখাপড়ার নেশায় ধরলে মাঝে মাঝে ঘুমোতেই ভুলে যাই।

ওহানা হাসিল। কহিল, বেশ। তা হলে খাওয়া দাওয়া সেরে একদিন রাত দশটায় এক জায়গায় যেতে পারো ?

অমর কহিল, কেন পারবো না ? কিন্তু কোথায় ?

ওহানা কহিল, বলছি, ব্যস্ত হয়ো না। তারপর নির্দ্দিষ্ট স্থানের নাম উল্লেখ করিয়া কহিল, তাহলে কালই এস। কেমন ?

অমর কহিল, কিন্তু কেন, তা ত বল্লে না।

ওহানা কহিল, গেলেই বুঝতে পারবে। বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

পরদিন সন্ধ্যার পর হইতে বরফ পড়িতে শুরু হইল। আহারাদি সারিয়া যথাসময়ে ওহানার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য অমর যখন যাত্রা করিল তখন পথঘাট সাদা হইয়া গেছে, পথে লোক চলাচল নাই বলিলেই চলে। একবার ভাবিল এমন দুর্যোগে গিয়া কাজ নাই, পরক্ষণেই মনে হইল, সে যাইবে বলিয়া ওহানার কাছে অঙ্গীকার করিয়াছে, অতএব না যাইয়া তার উপায় নাই। আসলে ভিতরে ভিতরে একটা অদম্য কৌতূহল তাহাকে তাগিদ দিতেছিল। ব্যাপারটা ওহানা খুলিয়া বলে নাই বলিয়াই সেটি জানিবার জন্য অমর অধীর হইয়া উঠিল।

সঙ্কেতস্থানের কাছাকাছি পৌছিয়া গাড়ি বিদায় করিয়া দিয়া অমর ধীরে ধীরে পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিল। তুষারাবৃত পথ নির্জ্জন, সাদা সাদা গাছপালা বরফের ভারে আড়ষ্ট হইয়া আছে।

একটা পথের বাঁকে আসিয়া অমর সহসা লক্ষ্য করিল গাছের তলা হইতে এক নারীমূর্ত্তি তার দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছে। অমর অবাক হইয়া গতিবেগ সংযত করিল,—অভিজ্ঞতাটা এমনি অভিনব যে তার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। নারীমূর্ত্তি তার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইতেই সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, এ কি ! তুমি ?

ওহানা কহিল, হ্যাঁ আমি। তুমি কি ভেবেছিলে ?

অমর কহিল, অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। এতরাত্রে তুমি কেমন করে' এলে ?

ওহানা কহিল, চলো, বলবো'খন।

বরফ ভাঙিয়া দুজনে হাতে হাত ধরিয়া চলিতে লাগিল। মাথার উপরে শশিতারাহীন আকাশ পাংশুবর্ণ, পদতলে তুষারের দীপ্তি, চারিদিকে অমানুষিক অবাধ স্তব্ধতা, তারই মাঝ দিয়া দুজনের নিঃশব্দ যাত্রা।

অনেকক্ষণ পরে অমর জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় চলেছ?

ওহানা সংক্ষেপে বলিল, দেখতেই পাবে। তারপর মৃদু হাসিয়া বলিল, কেন, পা ব্যথা করছে?

অমর বলিল, না তা নয়।

ওহানার কথায় ও ব্যবহারে তার কৌতূহল বাড়িয়াই চলিল।

চলিতে চলিতে ওহানা বলিল, একটা নতুন খবর তোমায় দিই। আমি আপাতত বাড়িতে থাকি না।

অমর জিজ্ঞাসা করিল, তবে?

ওহানা বলিল, এক মার্কিন পরিবারে কাজ নিয়ে আছি। গৃহিনীকে শেলাই শেখাই, তার বদলে তিনি আমায় ইংরেজি শেখান। থাকবার একটা আলাদা ঘর দিয়েছেন, খাওয়াদাওয়াও তাঁদেরি সঙ্গে হয়।

অমর আনন্দিত হইয়া বলিল, বেশ ত! কোথায় সে বাড়ি? কতদূর?

ওহানা হাসিয়া বলিল, সেইখানেই ত আমরা যাচ্ছি। আজ আমার ঘরে তোমার নিমন্ত্রণ! বলিতে বলিতে তার হাসি মিলাইয়া গেল, ধরা গলায় সে বলিল, নিজের বাড়িতে ত কখনো ডাকতে পারলুম না! কেবল তোমার আতিথ্যই গ্রহণ করেছি!

অমর তাহাকে প্রবোধ দিয়া কহিল, তাতে আর কি! তুমি আর কি করবে বলো, কেবল তোমার নিজের ইচ্ছেতেই ত হবে না!

পরে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার ঘরে আমার নিমন্ত্রণ এ কি সত্যি বলছো?

কথাটা এত ভালো যে অমর বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

ওহানা একটা বাড়ির সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। য়ুরোপীয় ধাঁচের বাড়ি—প্রবেশপথে উঁচু হইয়া বরফ জমিয়াছে।

আস্তীনের ভিতর হইতে চাবি বাহির করিয়া সে বলিল, এই বাড়ি। তারপর অমরের পানে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল, এখন বিশ্বাস হচ্ছে?

সদর দরজা খুলিয়া অমরের হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া সে বলিল, এস।

অমর দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলিল, কিন্তু এতে তোমার কোনো···

বাধা দিয়া ওহানা বলিল, কি? আমার সঙ্গে আসতে ভয় হয়?

উত্তরে অমর একটু হাসিল। ওহানাকে অনুসরণ করিয়া কহিল, ভয়? তোমার সঙ্গে মরতেও ত ভয় নেই!

ওহানার সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি যেন নীরবে বলিল, সে কথা আমি জানি!

দুজনে ভিতরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

পথের পথিক ঘরে ফিরিল। বাহিরে জনহীন পথে কেবল তুষারের পাণ্ডুর হাসিটি জাগিয়া রহিল।

২৬

মরীচিকা

দেশে ফিরিবার মাত্র মাসখানেক বাকি। একদিন রাত্রে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া অমর দেখে ওহানা উপস্থিত নাই। এমন কখনো ঘটে নাই, ওহানা অমরের প্রতীক্ষায় সেইখানে নিয়মিত দাঁড়াইয়া থাকে। আজ প্রথম সে নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিয়া অমর চিন্তিত হইয়া উঠিল। বহুক্ষণ সেইখানে পদচারণা করিয়া শেষে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইয়া সে ওহানার বাসস্থানের সম্মুখে উপস্থিত হইল। দেখিল বাড়ির দ্বার বন্ধ, সকল বাতায়ন রুদ্ধ। কোনোখান দিয়া আলোকের ক্ষীণ রশ্মিরেখাও তার মনে

আশার সঞ্চার করিল না। সেই রুদ্ধ দ্বার গৃহের সম্মুখে অমর ওহানার আসার আশায় দীর্ঘকাল দাঁড়াইয়া রহিল। প্রহরের পর প্রহর কাটিল, রাত্রি শেষ হইয়া আসিল, তবু ওহানার দেখা নাই। শেষে ক্ষুণ্ণ মনে ক্লান্ত দেহে সে বাসায় ফিরিল। পূর্ব্ব দিগন্তে তখন গোলাপের রং ধরিয়াছে।

এক একটা দিন যায় যেন এক একটা যুগ। প্রভাতে ওহানার পত্র লাভের আশায় অমর জাগিয়া উঠে, কিন্তু পত্র আসে না। রাত্রে তার সঙ্গে মিলনের আশায় সঙ্কেত স্থানে গিয়া ওহানার দেখা না পাইয়া পায়ে পায়ে আবার সেই বাড়ির সুমুখে গিয়া উপস্থিত হয়। রুদ্ধদ্বার মৌনমূক বাড়ি নিতান্ত অপরিচিতের মত দাঁড়াইয়া থাকে। তাহারই পানে তৃষিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অমর রাত কাটাইয়া দেয়।

কয়েকদিন এমনি করিয়া শেষে অমরের আশঙ্কা হইল হয় ত সে দারুণ পীড়িত, হয় ত তাহার সেবা শুশ্রূষা হইতেছে না, হয় ত তার লিখিবার শক্তি নাই, কিম্বা হয় ত চিঠি লিখিয়াও লোকাভাবে তাহা ডাকে দিতে পারিতেছে না। অমর অস্থির হইয়া উঠিল—কি করি, কোথায় যাই, কা'কে বলি! অনেক চিন্তার পর স্থির করিল ওহানার গৃহকর্ত্রীর সহিত দেখা করিয়া খোঁজ লইবে, তাহাতে তিনি যা ভাবিতে হয় ভাবুন। ভাবনার জ্বালা আর সহ্য হয় না!

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া সে যথাস্থানে উপস্থিত হইল। দ্বারের সম্মুখে পরিচারিকা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, ওহানা কয়েকদিন পূর্ব্বে বাড়ি গিয়াছে। গৃহকর্ত্রীও নাই, তাঁরা সপরিবারে কিওতো গিয়াছেন—ফিরিবার বিলম্ব আছে।

অমরের ডাক ছাড়িয়া কাঁদিবার ইচ্ছা হইল। ওহানার বাড়ির ঠিকানা সে জানে না—জানিবেই বা কিরূপে? ওহানা ত তার বাড়ির ঠিকানা কখনো বলে নাই! অতএব মুখ বুজিয়া দুঃখ ভোগ করা ছাড়া আর উপায় কি? তার মনে হইল, জগৎসুদ্ধ লোক তাহাকে ব্যথা দিবার জন্য চক্রান্ত করিয়াছে!

দিনের পর রাত রাতের পর দিন সময়ের নির্ম্মম জাঁতা ঘুরিতে লাগিল। তার তলে পড়িয়া পলে পলে বিরহবিধুর অমরের হৃৎপিণ্ড চূর্ণ হইতেছিল। জাপান ত্যাগ করিবার আর সপ্তাহ মাত্র বাকি, তবুও সে যাত্রার কোনো আয়োজন করিল না। ভাবিয়াছিল, জাপানের বিচিত্র কারুশিল্পের নানা নিদর্শন সংগ্রহ করিয়া দেশে লইয়া যাইবে, সে-সব ..ুই সে কিনিল না। যাহাকে কেন্দ্র করিয়া কারুচত্র রচনা করিবার আশা করিয়াছিল সে-ই যখন নাই তখন রেশম আর ছবি, চীনা-মাটি আর গালার বাসনে কি প্রয়োজন? কৃত্রিম পত্র পুষ্প কিনিয়া লাভ কি? কে তাহা খোঁপায় পরিবে?

সকালবেলা নামমাত্র আহার করিয়া সে বাহির হইয়া যায়, ওহানার সাক্ষাৎলাভের আশায় সারাদিন পথে পথে ঘুরিয়া ফিরে। রঙীন ছাতা মাথায় দিয়া হেলিয়া দুলিয়া দূরে তরুণী পথিক-ললনা চলিয়া যায়, দুরন্ত অমরের বুক দুরুদুরু কাঁপিয়া উঠে, মনে হয় যেন ওহানা! দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া বিস্ফারিত ব্যাকুল চোখে চাহিয়া দেখে—তা নয় তা নয়। তখন অপ্রস্তুত ও হতাশ হইয়া সে আবার পথ চলা সুরু করে।

বসন্ত বিদায় লইয়াছে, চেরিফুল ঝরিয়া গেছে—সে যেন কত দিনের কথা! স্নিগ্ধ বাতাস এখন আর গায়ে হাত বুলায় না—বাতাস তাতিয়া উঠিয়াছে। যুগযুগান্তের বিরহীর তপ্তশ্বাসের মত সেই বাতাস-পথিক অমরের চোখে মুখে আসিয়া লাগে, উত্থিত ধূলিজালে রৌদ্রালোক মলিন দেখায়, চরাচর ব্যাপ্ত করিয়া সীমাহীন নিরাশার অব্যক্ত হাহাকার যেন গুমরিয়া ফিরে! সারা শহরটা যেন একটা অনন্ত মরুপথ, তাহারই উপর দীর্ঘ দিন ওহানার মরীচিকা তাহাকে ছলনা করিতে থাকে!

অনাহারে অনিদ্রায় দিনের পর দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া

অমর ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। একটা গভীর অবসাদ গুরুভার বোঝার মত তার মনের উপর চাপিয়া বসিল। একদিন আর বাহির হইবার শক্তি নাই—সোফার উপর গা এলাইয়া দিয়া চোখ বুজিয়া সে পড়িয়া রহিল। অবস্থা এমন যে ভাবিবারও শক্তি নাই—ভাবিয়াই বা লাভ কি? ভাবনা সুখ দেয় না, সান্ত্বনা আনে না, কেবল পলে পলে দগ্ধ করিয়া মারে!

তন্দ্রালু নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন। মাঝে মাঝে ফেরিওয়ালার ডাক শুনা যাইতেছে। এদের স্বর অমরের পরিচিত, বহুদিন যাবৎ শুনিতেছে। প্রত্যহ একই সময়ে একই স্বরে ইহারা হাঁকিয়া যায়—একদিনের জন্যও অন্যথা হয় না। অমর ভাবিতেছিল, ইহাদের কি শ্রান্তি নাই, অবসাদ নাই, মনে কোনো দুঃখ নাই?

সময় যায়, অমরের খেয়াল নাই। চক্ষু মুদিয়া সে পড়িয়া আছে। ঠিক ঘুম নয় অথচ জাগ্রত অবস্থাও নয়—জাগরণ ও ঘুমের মাঝামাঝি একটা অবস্থা। এক সময় তার মনে হইল কে যেন তার মাথার উপর সন্তর্পণে হাত রাখিয়াছে। ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া, সে চমকিয়া উঠিয়া বসিল। এ কি? এ কি ওহানা দাঁড়াইয়া? পাণ্ডুর মুখ, শীর্ণ কপোল, দৃষ্টি উদাস গম্ভীর, চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে! বেশে পরিপাট্য নাই, অধরে হাসি নাই! এ কি ওহানা, না তার প্রেতাত্মা?

দাঁড়াইয়া উঠিয়া ওহানার হাত দুটি সে সবলে চাপিয়া ধরিল। জ্বালাময় কাতর দৃষ্টি তার মুখের উপর রাখিয়া কহিল, এ কি? কি হয়েছে তোমার? কেন এতদিন আসনি? কি করে' ভুলে ছিলে?

বলিতে বলিতে অমর কাঁদিয়া ফেলিল।

ওহানা বলিল, বোসো। সব বলছি। চুপ করো, অমন করে' কেঁদ না! তোমার কান্না আমি সইতে পারি না!

ওহানার অধর কাঁপিয়া উঠিল, অমরের হাতের উপর তার তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল। শোকের বেগ কতকটা হ্রাস হইলে দুজনে পাশাপাশি বসিল। অমরের মাথাটা সস্নেহে কোলের উপর টানিয়া লইয়া তার চুলের মধ্যে সেই আগেকার মত ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে ওহানা যে-সব কথা বলিতে লাগিল সেগুলা অমরের কানে পৌঁছিলেও তার কোনো অর্থ সে খুঁজিয়া পাইল না। এ যেন কোন্ এক সম্পূর্ণ অপরিচিত ভাষা! সে সভয়ে ভাবিতে লাগিল, নিশ্চয়ই তার মাথা খারাপ হইয়াছে—নহিলে এ দেশের ভাষা সে ত ভালই বুঝিতে পারিত!

সে যে ওহানার কথা বুঝিতেছে না সে-কথা বলিবার সে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু সমস্তই কেমন গোলমাল হইয়া গেল, কিছুই পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারিল না।

অনেকক্ষণ পরে ওহানা বিদায় লইবার জন্য উঠিল। অমরও দাঁড়াইল। আস্তীনের ভিতর হইতে একখানা খাম বাহির করিয়া সে অমরের হাতে দিয়া বলিল, আমি চলে' গেলে খুলে দেখো। এই আমার বিদায়-উপহার!

খামখানা মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া অমর জিজ্ঞাসা করিল, আবার দেখা হবে ত?

হবে, বলিয়া ওহানা বাহির হইয়া গেল।

অমর স্থাণুর মত নিশ্চল দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল পথের উপর ওহানার পাদুকার শব্দ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া শেষে নীরব হইল।

সহসা অমরের মনে হইল, ওহানা চিরদিনের মত চলিয়া গেল—আর আসিবে না! অমনি সে পাগলের মত ছুটিয়া বাহির হইতে গিয়া যেন কি একটা বাধা পাইয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

চমকিয়া চোখ মেলিয়া অবাক হইয়া দেখিল সে অন্ধকার ঘরে সোফার উপর শুইয়া আছে। তার হাতের মুঠায় ওহানারই একখানা পুরানো চিঠি, গালের উপরটা চোখের জলে ভিজিয়া আছে।

ওহানা স্বপ্নে বিদায় লইয়া গেছে!

অমর উঠিয়া চোখ মুছিল। ঘরের বাতাসে যেন নিশ্বাস

বন্ধ হইয়া আসে! তাড়াতাড়ি জানালাটা খুলিয়া দিয়া সে বাহিরে দৃষ্টিপাত করিল।

সেখানেও আলোকের চিহ্নমাত্র নাই। কেবল অন্ধকার—দুস্তর অন্ধকার!

—ক্রমশ

রহ' কুণ্ঠাহীন

তোমায় আমায় দেখা
কোন্ পুণ্যক্ষণে,
ভুলি নাই; ভুলিব না
এবার জীবনে।

স্নিগ্ধ আঁখি
অবনত করি,
অতসী ফুলের মত
পীতাম্বর পরি',
রহিলে দাঁড়ায়ে,
আপন-চরণ তলে
ছায়াটি মাড়ায়ে।

মুখে নাই কথা,
ক্ষীণতনু লীন ব্যথা-তলে

লভিলাম সেদিন তোমায়
বহু পুণ্য-ফলে,
নব কৌতূহলে!
দেবতার আশীর্ব্বাদ,
কহ কার ভুলে
আসিলে ভূতলে?

তুমি স্তব্ধ

প্রদোষের স্তিমিত আলোকে
হৃদয়ের পুলক দ্যুলোকে,
দূর্ব্বা-শিরে
শিশির-অঙ্কুর!

কান পাতি' শুনিলাম,
হৃদয়ের ব্যথার গহনে
কি বাজালে সুর!
পলকে টুটিয়া গেল
অজানার অন্ধ আবরণ,
দূরত্বের পীড়াময়
দূর।

তুমি বন্ধু,
জীবনের সুবন্ধুর পথে—
আছ নিশিদিন
অনন্ত নবীন!
অয়ি অকুণ্ঠিতে'
রহ' কুণ্ঠাহীন।

রতির প্রণয় পতি
নবসন্ত
দুরন্ত মদন
নির্দ্দয়-নিয়তি।

সহসা দৈবাৎ
হীনতার
ক্ষুদ্র ঈর্ষা,
আক্রোশ কঠিন,
জাগি' একদিন,
কালকুট বিষধর
ফণা
বিস্তারিল অনন্ত
অ-গোণা।

দগ্ধ
পঞ্চ-শর

কাঁপে স্বর্গ, কাঁপে মর্ত্ত্য,
ত্রস্ত
থর থর!
প্রদীপ্ত ললাট
ক্রোধ-বহ্নি
জ্বলে সুবিরাট!
ক্ষিপ্ত
মহাকাল!

প্রসন্ন-প্রভাত
পলকে নিবিড় মেঘে
অটল-জমাট;
বজ্র, অকস্মাৎ!

* * *
* *
*

কি তাহার পর?

অনন্ত-আলোক-লোকে,
শুভ্র-শশধর
কৈলাস ভূধর!
শৃঙ্গে তারি
পাতি' ধ্যানাসন,
অনাহারী,
মুদিত নয়ন
কালের প্রতীক্ষা করি'—
স্তব্ধ
মহাকাল!

কালের প্রতীক্ষা করি'
চিত্ত-মনোরমা,
তপস্যায় ক্ষীণতনু
মরি!
পূজার কুসুম-মালা
বহিয়া কুমারী,
আঁখি
নত করি',
আসিছেন
উমা!

মহাকাল
চিত্ত
মনোরমা

কালি-কলম

কালের
প্রলয়-ভালে
উদ্ভাসিয়া ক্ষমা!

প্রেমের পরশ মণি
বিশ্বজন মাতৃ স্বরূপিণী
ঐ দেখ ভূমা
মহাকাল
চিত্ত-মনোরমা।

কি তাহার পরে?

কোকিলের কুহু-কণ্ঠ স্বরে,
অনন্ত আকাশ হ'তে
পুলক-সম্পাতে,
ঐ পড়ে ঝরে,
অবাধ-প্রচুর,
রঙ্গীন সুরের বীণে,
সাত-রঙ্গা সুর!

তারি রসে
ধরণী সরসা,
তারি ছন্দে
নেচে চলে
ঋতু ছয়
প্রমোদ-হরষা!

প্রিয়া-কর-স্পর্শ-রসে
প্রশান্ত-করাল,
ঐ হের, তৃপ্ত মহাকাল!

প্রভাতের গাঢ় মেঘ-জাল;
গগন প্রাঙ্গনতলে দুন্দুভির ধ্বনি,
প্রভাতের নহে মন্ত্র-বাণী,
নাহি রহে, দীর্ঘ চিরকাল!

দিনের আলোকচ্ছটা
ছিঁড়ি' ছিন্ন করি' দেয়
কুয়াসার জটা!

অচিরে
প্রদীপ্ত-প্রভা উঠে দিনমণি!
যায় দূরে,
মিথ্যা ঘনঘটা;
উল্লাস-হিল্লোলে কাঁপে
ফুল্ল কমলিনী!

* *
*

অয়ি শুচিস্মিতে!
তোমার নয়নে জ্বলে,
যে জ্যোতির শিখা—
স্নিগ্ধ অকম্পিতে,
নহে সে, কুহক-লিখা;—
কালের ফুৎকারে
নিবিবার
নহে আচম্বিতে।

নাহি তাহে
ধূমার্জ্জিত কালি!
নহে তাহা লালসার, ক্লেদ-ক্লিষ্ট কামনার
ক্লিন্ন পুষ্প-ডালি!

অম্লান কুসুম-গন্ধে
মন্থর পবন
ক্লান্ত পথ-ভ্রান্ত জনে
নব-রস-রসায়নে
করে সঞ্জীবন!

রহ' কুণ্ঠাহীন

তোমার চিত্তের নীরে
নিভৃত নিলয়ে
ফুটে কুবলয় ;
তারি লোভে,
অয়ি, মনোলোভে,
ছাড়িয়া চন্দন-বন, কাঁদি' ফেরে
উদাসী মলয় !
তারি লোভে, বুভুক্ষিত ক্ষোভে
পতঙ্গের দল
ফিরিছে চঞ্চল !

অধীর ক্রন্দন,
লালসায় কলুষিত
বিকার-জ স্তন,
কাম-তিক্ত নরক-বিবরে
নিত্য করে
পুচ্ছ-সঞ্চালন ।

ত্যাগে ধন্য
ক্ষমা-পুণ্যময়ী ;
তোমার জয়ের
কেতু—
উড়িয়াছে—ওই !

* * *
* *
*

তুঙ্গ গিরি-শৃঙ্গ
হ'তে
তরঙ্গিনী
নির্ঝরিনী ধারা,
কার পথে,
কোন্ ভুলে,
ছুটে চলে
নিত্য আত্মহারা ?

তোমার ত্যাগের সেতু
জীবনের
ধ্রুব জয়-কেতু !
যেন আনে টেনে,
ভাগ্যহত
সংসারের যত
অভাজনে !
তোমার স্নেহের ধারা,
ছুটে চলে আত্মহারা
কিসের সন্ধানে,
কেহ নাহি জানে !

তুমি তার নাহি জান
হেতু !

সে কি সত্য ভুল ?
সে কি সত্য জগতের
অনাগত
অমোঘ কল্যাণে,
নহে
অনুকূল ?
সে কি সত্য ক্ষণিকের—
অলীক চাঞ্চল্য ?

সে কি নিত্য
মরণের
মহারণে
ব্যর্থ উপচার ?

পাষাণ-বেদির পরে
মানুষের ভ্রান্ত সংস্কার

আবর্জ্জনা রাশি
গলিত নির্ম্মাল্য ?
নহে নহে।

তাহে বহে
অবাধ প্রবাহে,
বিস্মৃত অতীত
হ'তে
অনাগত
বিস্ময়ের পথে,
অবিশ্রান্ত স্রোতে,
প্রেমের অমৃত-ধারা
চিত্ত-নিস্যন্দিনী
প্রীতি-মন্দাকিনী !
কুলু কুলু
কল্লোল-নন্দিনী
মৃত সঞ্জীবনী !

* * *

কেন তার—
হেরি বারম্বার,
অসহ্য অধৈর্য্য-ভরা
বিদ্যুতের গতি ?
কেন তার
আবেগ ব্যথায়
মহাকায়
দীর্ণ হিমাচল ?

কেন তার
নৃত্য আবর্ত্তনে
গিরি-শির
নিত্য পড়ে ভেঙে ?

তাই ভাবি মনে !
তাই থাকি চেয়ে—
অশ্রু
উ[illegible]-গণ্ড
ফুল্ল
পড়ে, দু-
গড়ায়ে,—
অসীম বিস্ময়ে

আনন্দ
বাজায় তার
বিচিত্র সেতার !
তারি সুরে
সৃষ্টি-পুরে,
আনন্দের
অভিনব গতি ;
তারি সনে
সঞ্চয়ের বেদনার স্থিতি ;
তারি লয়ে ছোট ভাঙা গড়া !
তারি শেষে
প্রলয়-তাণ্ডব,
উৎসারিত মহাকাল-সংহার বিষাণে

কালের দুরন্ত স্রোতে
জীবনের ফুল ।!
শুধু ভেসে
যায়,
কে জানে কোথায়

তারি বিন্দু বিন্দু
মধু,
হৃদয়ের রক্তিম
বেদন,

করি নিবেদন,
লহ তুলে,
বঁধু!

পুরোহিত

শ্রী নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

পর্ব্বতের উপর দেবীর মন্দির—স্বর্ণচূড়া তার আকাশ ভেদ করিয়া নীল আকাশে তারার মত জ্বল্ জ্বল্ করে।

সহস্র শতদলে দেবীর পূজা করেন পুরোহিত, বুকের রক্ত দিয়া রঞ্জিত করেন দেবীর পদতল। মন্ত্র গান তিনি উদাত্ত স্বরে—সঙ্গে সঙ্গে পূজারীর দল গান ধরে, প্রাঙ্গনে শত নট নটী তার তালে তালে নাচে। পুরোহিতের ধ্যানলব্ধ সে মন্ত্র, সে গান—তার সুর তাল!

সহস্র সোপান বাহিয়া পূজার্থী আসে তার নৈবেদ্য লইয়া। হাজার হাজার লোক জমিয়া যায় সে পর্ব্বতের পাদদেশে—হাজার হাজার ফিরিয়া যায় উচ্চ সোপান-শ্রেণীর দিকে চাহিয়া। শত শত লোক দৃঢ় পণ করিয়া তাদের নৈবেদ্য বহিয়া উঠিতে যায়—হাজারে একটিও দেবীর পায় পূজা পৌঁছাইতে পারে না।

হাজার হাজার লোকের ভিড়ের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল হাসিভরা কচি মুখ লইয়া এক তরুণ-কিশোর। রূপে তার চারিদিক আলো হইল, ঝল্‌মলে মণিমাণিক্যের অলঙ্কার তার দেহে—রবির কিরণ তাতে ঠিকরাইয়া চারিদিকে চমকাইতে লাগিল।

সোপানের পদতলে দাঁড়াইয়া সে হাসিমুখে তার গান ধরিল, তালে তালে পদ্মের পাঁপড়ির মত পা দুখানি তার নাচিয়া উঠিল;—তালে তালে নাচিয়া গাহিয়া সে উঠিয়া চলিল।

হাজার হাজার বলী যেখানে বিমুখ হইয়া যায় সেই মন্দিরে উঠিতে সাহস করে—ধৃষ্ট সে বটু! কেহ হাসিল, কেহ টিট্‌কারী দিল—কেহ বা তাকে তিরস্কার করিল—সে নির্ভীক বালক ভ্রূক্ষেপ করিল না।

ধাপে ধাপে সে উঠিয়া চলিল। মোহন কণ্ঠে উজ্জ্বল তরল রজতের ধারার মত বহিল তার অশ্রান্ত গীতি, তালে তালে নাচিতে লাগিল সোণার দুখানি পা—রুণু রুণু ঝুম্ ঝুম্ তালে তালে বাজিয়া উঠিল তার চরণে নূপুর!

যুবা যারা, প্রবীণ যারা, প্রাচীন যারা আসিয়াছিল পূজার উপচার কাঁধে লইয়া, ক্লান্ত হইয়া উঠিল তারা। কেহ বা বসিয়া পড়িল, কেহ ফিরিয়া গেল। শুধু ক্লান্ত হইল না এ কিশোর, শ্রান্ত হইল না তার কণ্ঠ—কমনীয় লঘু পা দুখানি অবিরাম নর্ত্তনে অগ্রসর হইল। তার পায়ের তলা হইতে ধাপের পর ধাপ যেন পরম স্নেহের সহিত সরিয়া দাঁড়াইল।

পুরোহিত বসিয়াছিলেন ধ্যানে, মৃদু মধুর কণ্ঠে গাহিতেছিল তাঁর শিষ্য পূজারীরা, কোমল মৃদু পদক্ষেপে নাচিতেছিল প্রাঙ্গনে নট নটীর দল।

বালকের অমলিন মধুমাখা উচ্চ কণ্ঠের সঙ্গীতে তারা চাহিয়া দেখিল—তার নৃত্যের তালে তালে নট নটীর তাল কাটিয়া গেল। কে এ দাম্ভিক বটু যে দেবীর মন্দিরে এমন গান গায় যার সুর তারা জানে না, এমন নাচ নাচে যার তালের সঙ্গে তাদের পরিচয় নাই?

নটনায়ক অগ্রসর হইয়া আসিল, ধমক দিয়া সে বলিল, "স্তব্ধ হও মূঢ়, কি সাহসে দেবীর মন্দিরে তুমি নৃত্যের তাল ভঙ্গ কর? জান না দেবীর অভিশাপ?"

হাসিয়া কিশোর কহিল, "আমার দেবী অভিশাপ দেন না, দেখছো না তাঁর মুখে ঐ আশীর্ব্বাদ?"

পূজারীরা ছুটিয়া আসিল। তারা বলিল, "কোথা হ'তে বর্ব্বরের মন্ত্র শিখে এসে তাই গাও দেবীর মন্দিরে?"

"বর্ব্বরের মন্ত্র এ নয়—এ দেবীর স্নেহের দান।"

একজন বলিল, "মূর্খ জান তোমার কি শাস্তি? যে সহস্র সোপান তুমি অনধিকারে লঙ্ঘন করে এসেছ, হাত পা বেঁধে তোমাকে গড়িয়ে দেব তার উপর দিয়ে।"

আর একজন—বড় হিংস্র তার মূর্ত্তি—সে বলিল, "দেবীর কাছে তোমাকে বলি দিব।"

নির্ভীক সে কিশোর সুধু দেবীর মুখের দিকে চাহিয়া মনের আনন্দে নাচিয়া তার গান গাহিয়া চলিল।

তারা আসিয়া তার পা বাঁধিয়া যূপকাষ্ঠের সঙ্গে তাকে বাঁধিল।

পুরোহিতের ধ্যানভঙ্গ হইল—দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত হইল তাঁর মুখ—দেবীর কাছে যেন কোন মনোজ্ঞ নূতন আদেশ তিনি পাইয়াছেন।

ব্যগ্রভাবে চারিদিকে তিনি চাহিলেন, শুনিলেন কিশোর কণ্ঠের সে গান! চঞ্চল পদে অগ্রসর হইয়া যূপ-কাষ্ঠ হইতে তরুণ পূজার্থীকে তিনি কোলে তুলিয়া লইলেন, আপনার কণ্ঠ হইতে মালা খুলিয়া পরাইলেন তার কণ্ঠে। বলিলেন,

"দেবীর দুলাল, ধন্য হ'লাম তোমাকে দেখে। আজ থেকে দেবীর পূজার অধিকার তোমার। আমার কাজ শেষ হ'য়ে গেছে।"

পুরোহিতের আসনে তাকে ত ক'রে বৃদ্ধ পুরোহিত চলিয়া গেলেন।

অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। সে দিনের কিশোর পুরোহিত আজ প্রবীণ।

দেবীর পূজা হয় মহাসমারোহে। সহস্র শতদলের পাশে লক্ষ লক্ষ যূথি জাতি চম্পকের শোভায় দেবীর পূজার ডালা অপূর্ব্ব সৌষ্ঠবে ভরিয়া উঠিয়াছে, শত শত ধূপাধার হইতে বিচিত্র সৌরভে মাতিয়া উঠিয়াছে সে মন্দিরের আকাশ।

পুরোহিত পূজা করেন তাঁর নিত্য নূতন মন্ত্রে, তাঁর নিত্য নূতন সুরে গান গায় পূজারীর দল; নূতন ছন্দে, নূতন তালে নাচে তালে তালে নটনটীর দল। মুগ্ধ হয় তারা দেবীর প্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া।

মন্দির সোপানের পাদপ্রান্তে আসিয়া দেখা দিল এক দল নূতন পূজার্থী—কিশোর তারা, উৎসাহে তাদের মুখ উজ্জ্বল—কিন্তু সুন্দর শোভন তারা নয়, মণিমাণিক্যে খচিত নয় তাদের অলঙ্কার। বনের ফুল কুড়াইয়া তারা মালা গাঁথিয়াছে, দরিদ্রের ক্ষুদ কুঁড়া লইয়া তারা অর্ঘ্য রচনা করিয়াছে। তারা গাহিতেছে গান—তার ভিতর কাঁদিয়া উঠিতেছে পীড়িতের আর্ত্তনাদ, গলিয়া পড়িতেছে দীন অসহায়ের অশ্রুর নির্ঝরিণী।

দীন জীর্ণ তাদের বসন ভূষণ, শ্রীহীন তাদের বেশ—কিন্তু প্রাণ কাড়িয়া লয় তাদের গানের সুর।

হাজার লোক সেখানে জমিয়াছিল—ইহাদের দেখিয়া তারা সরিয়া গেল—ইহাদের স্পর্শ যেন পূতিগন্ধময়।

গাহিতে গাহিতে তাণ্ডব নর্ত্তনে অগ্রসর হইল দীন এ পূজার্থীর দল, তাদের কণ্ঠের সঙ্গীতে আকাশ কান্নায় ভরিয়া গেল, ঝরিয়া পড়িতে লাগিল সহস্র ধারায় লক্ষ দুঃখীর অতল ব্যথার সাগর!

মন্দিরের নট নটীদের আনন্দের লঘু নর্ত্তন হঠাৎ থমকিয়া গেল—বেসুরা এ গানে পূজারীদের সঙ্গীতের সুর চূরমার হইয়া গেল। সকলে ফিরিয়া চাহিল নীচে, সিঁড়ির উপর এই নূতন পূজার্থীদের দিকে।

একটি নটী, রূপের তার বড় গরব—সে বলিল, "মা গো, কি কুৎসিৎ ও লোকগুলো!"

নটেরা হাসিয়া বলিল, "আর দেখ বেশের কি শ্রী! যে যা পেয়েছে গায় জড়িয়েছে!"

"আ মরি কি অলঙ্কার!"

পূজারীদের যিনি নায়ক তিনি বলিলেন, "কি বিশ্রী কান্নার মত এ সুর—আনন্দময়ীর মন্দিরে একি ব্যভিচারের আয়োজন!

"কি কদর্য্য এদের কথা—কি নোংরা!"

"তাড়াও ওদের।"

অমনি সবাই মিলিয়া যে যাহা পাইল ছুঁড়িয়া মারিল বড় বড় পাথর তাদের লক্ষ্য করিয়া সিঁড়ি দিয়া গড়াইয়া দিল

তরুণ পূজার্থীরা তাদের গান গাহিয়া অগ্রসর হইল—লোষ্ট্ররাশি তাদের স্পর্শও করিল না।

ধাপে ধাপে তারা উঠিতে লাগিল মন্দিরপ্রাঙ্গনের দিকে।

পুরোহিত বাহির হইয়া আসিলেন। পূজারীর দল বাহির হইয়া বলিল, "ভীষণ আপদ উপস্থিত হ'য়েছে প্রভু, মন্দিরের প্রশান্ত হাওয়ায় এরা ঝড়ের তাণ্ডব লাগিয়ে দিচ্ছে—দেউলের অমলিন শ্রীর ভেতর ময়লা ব'য়ে এনেছে।"

নট নটীর দল বলিল, "গেল গেল সব গেল, প্রভুর এত যত্নের বাঁধা সুর তাল সব ছারখার হ'য়ে গেল।"

পুরোহিত চাহিয়া দেখিলেন এই পূজার্থীদের দিকে। তারা সবাই নত হইয়া নমস্কার করিল, কেহ কেহ তাঁর পায়ের ধূলা লইতে হাত বাড়াইল। পুরোহিত সরিয়া দাঁড়াইলেন।

মন্দিরের লোক চীৎকার করিয়া বলিল, "এদের দমন করুন, দেব, নইলে সব ছারখার হ'য়ে গেল—শাস্তি দিন এদের।"

পুরোহিত দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "মৃত্যু এদের দণ্ড—অস্পৃশ্য এরা, দেবীর মন্দির কলুষিত করতে এসেছে; বর্ব্বর এরা, হাটের কোলাহল টেনে এনেছে দেবীর শান্তির প্রাঙ্গনে। বধ কর ওদের।"

সকলে ছুটিয়া গেল উহাদের বাঁধিতে।

মন্দিরের ভিতর পুরোহিত পূজায় বসিলেন—সম্মুখে দেবী আসিয়া আবির্ভূত হইলেন

দেবী ডাকিলেন "পুরোহিত!"

চমকিত পুরোহিত ধ্যানস্তব্ধ নেত্র উন্মোচন করিয়া চাহিয়া দেখিলেন—দেবী অপ্রসন্ন।

"এ কি আদেশ দিয়েছ পুরোহিত—ওদের কি অপরাধ?"

"বর্ব্বর ওরা মা, আপনার পুণ্য-মন্দিরে বয়ে এনেছে তাদের কুৎসিৎ কোলাহল!"

"মনে পড়ে পুরোহিত, বর্ব্বর বলে একদিন তোমাকে এ মন্দিরে বলি দিতে চেয়েছিল?"

"অজ্ঞান ছিল তারা মা, তারা তো আমাকে বোঝে নি।"

"তুমিও অজ্ঞান—তুমিও বোঝনি! বধ ক'রবে ওদের তুমি? তোমারই মত আমার বরপুত্র ওরা, তোমারই মত অমর!

চমকিত পুরোহিত চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখের দেবীর মণিময় মূর্ত্তি আসন ছাড়িয়া চলিয়া গেছে। ভীত দৃষ্টিতে প্রাঙ্গনে চাহিলেন—দেখিলেন সেখানে দেবীর সে মূর্ত্তি ঘিরিয়া নবীন পূজারীর দল নাচিতেছে গাহিতেছে।

শ্রী প্রবোধকুমার সান্যাল

কতদিন গেছে—কেই বা খেয়াল রাখে!

রাস্তায় রাস্তায় তখন চাকরির উমেদারি করি।

বর্ষার শেষ। ভরা গঙ্গা। ষ্টীমারের জেঠিতে কাজ পাইবার আশায় ঘোরাঘুরি করিতেছি। বেলা ঢের। কুলি মজুরের দানা-পানির সময়।

জামা-কাপড়পরা বোঁচকা হাতে একটি লোক জলে ডুব দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ঘাটের সিঁড়িতে উঠিয়া আসিল। সর্ব্বাঙ্গ দিয়া জল ঝরিতেছে, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ভিজা চুল মুখের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে—হুঁস্ নাই।—সমস্ত চেহারাটাই যেন লক্ষ্মীছাড়া!

কিন্তু অদ্ভুত লোক! সবশুদ্ধ এমন করিয়া কেহ জলে ডুব দিতে পারে, না দেখিলে বিশ্বাসই করিতাম না।

হঠাৎ মাথাটা যেন ঘুরিয়া গেল। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া বলিলাম, "জামাই?"

জামাই তখন একটা উড়িয়া-বামুনের কাছে ছোলা ও বাতাসা চাহিয়া খাইতেছিল। মুখ তুলিয়া আমায় দেখিয়া কহিল, "ভাল আছিস্? তোর কাছেই যাচ্ছিলাম।"

স্পষ্ট সাদা কথা। একটুখানি চম্‌কাইল না, এত দিনের অদর্শনের পর নূতন একটা কোনও কথাও কহিল না। ওর কাছে এ সব যেন অপরিচিত!

শুধু কহিল, "রেঙ্গুণের জাহাজ থেকে এইমাত্র নাম্‌লাম রে! জর হয়েছিল বড্ড।"

"রেঙ্গুণ গিছ্‌লি নাকি?"

ছোলা ও বাতাসা চিবাইতে চিবাইতে আমার একটি হাত ধরিয়া জামাই রাস্তার উপর উঠিয়া আসিল। বলিল, "বাসা তোর কতদূর? চল্ গিয়ে রেঙ্গুণের গল্প করবো। এধারে এসেছিলি কেন রে?"

"উমেদারি কর্ত্তে।"

একটুখানি হাসিয়া জামাই কহিল, "তেলের ভাঁড় আনিস্ নি সঙ্গে ক'রে? ওটা ভুল হয়ে গেছ্‌লো বলে' রেঙ্গুণে আমারও চাকরি হল না।"

"রেঙ্গুণে কি চাকরি কর্ত্তে গিছ্‌লি?"

"কি কর্ত্তে গিছ্‌লাম তা কি ছাই নিজেই জানি? তবে চাক্‌রি একটি পেলে মন্দ হত না।—নে চল্ ভাই, বড্ড ক্ষিদে লেগেছে। চেনা লোকের সন্ধান পেলে ছোলা বাতাসায় আর রুচি থাকে না।"

আমারও আর চাকরি করা হইল না, দুইজনে তাড়াতাড়ি বাসার পথ ধরিলাম।

তারপর কতদিন দুইজনের এক সঙ্গে কাটিয়া গেল তাহা নিজেরাই গণিয়া দেখি নাই।

তাহার অনেক দিনের অনেক ভ্রমণবৃত্তান্ত শুনিয়া লইলাম। শুনিতে শুনিতে নিজেকে হারাইয়া ফেলি।

সেদিন জামাই বলিল, "বেশ সুখে আমরা আছি—না রে?"

"এর নাম সুখ?"

"সুখ বৈকি!—কিন্তু এ আমার ভাল লাগে না, ভাই। সুখ আমি কোনদিন সহ্য কর্ত্তে পারি না। মনে

হয় ওটা আমার কাছে মিথ্যে, শুধু ছাঁচ আমার মধ্যে কোথাও নেই।”

হাসিয়া বলিলাম, “এ দর্শন-শাস্ত্রটা রেঙ্গুণ থেকে আমদানি নাকি? কিন্তু থাক্ ও কথা। এখন—রেঙ্গুণে তোর সেই প্রেমের কাহিনীটা আজ বল্ দেখি?”

“আমার প্রেমের কাহিনী!”

“তোর না হয়, সে মেয়েটির ত বটে?”

জামাই একবার উঠিয়া বসিল, একবার আড়ামোড়া খাইল; উঠিয়া গিয়া একছিলিম তামাক সাজিয়া আনিল, তারপর আবার বসিয়া পড়িয়া বলিল, “নেহাৎ শুন্তে চাস্?”

“হ্যাঁ।”

“তা হলে আজকে আর বল্‌বো না। আর একদিন বরং—”

“আধখানা তবে বলে রাখ্‌লি কেন?”—রাগ করিয়াই কথাটি বলিলাম।

হাসিতে হাসিতে জামাই বলিল, “আধখানা আবার কোথায় বল্‌লাম রে? সেই ত বললাম—রেঙ্গুণের বড় ‘ফয়া’, হাজারের কাছাকাছি সিঁড়ি, সারি সারি ফুলওলিরা সেখানে বসে থাকে, তার মধ্যে আমাকে একটি মেয়ের ভাল লেগেছিল; প্রথম দিন ফুল হাতে দিয়ে হাসলে, তারপর দ্বিতীয় দিন—”

“হাঁ হাঁ, ওই অবধিই বটে।—তারপর?”

জামাই কহিল, “এই ত আরম্ভ! কিন্তু পরে সেই মেয়েটি কত বড় ব্যর্থতা, কত বড় সর্ব্বনাশ নিজের বুক পেতে নিলে, কত বড় তার কান্না পৃথিবীর এই অবিচার ধর্ষণের তলায় চাপা পড়ে’ গেল,—তা যদি শুনতিস্ তা হলে—”

“বলই না শুনি?”

“আজ নয় আর একদিন বলবো।—কিন্তু দেখ, আমরা বেশ আছি—না? এত সুখ—এ যেন অস্থির করে’ তোলে সময় সময়। যদি কিছু না মনে করিস্—”

মুখে তাহার হাত চাপা দিয়া বলিলাম, “গল্প যদি না বলিস্ ত ঘুমিয়ে পড়্—অনেক রাত হয়েছে।”

সে আর কথা কহিল না।

নিস্তব্ধ রাত্রির বুকের উপর ঘা মারিয়া অনেক দূরে গির্জ্জার ঘড়িতে তৃতীয় প্রহর জানাইয়া দিল।

কিন্তু সকাল বেলা উঠিয়া আমার বিস্মিত দৃষ্টি আর জামাইকে খুঁজিয়া পাইল না।

রাত্রিতে কখন উঠিয়া সে পলাইয়া গেছে।—

.....সমস্ত মমতা সমস্ত বন্ধুত্বের বাঁধন কাটাইয়া সে সেই আগেকার মতই নিঃশব্দে পথে নামিয়া গেল!

আমাকে জাগাইল না—

একটি বিদায়-বাণী রাখিয়া গেল না।

এমনি তাহার ভূমিকা-হীন আকস্মিক পলায়ন।

যাক্—গিয়াছে বলিয়া কোনও দুঃখ নাই। তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবার মত আমার কি-ই বা আছে!

শুধু জানি সে আসিয়াছিল, আবার চলিয়া গেছে। হয়ত সে জানে তার যাওয়া-আসার দাগটি মরে না। হয় ত তাই এত শীঘ্র দেনা-পাওনা সাঙ্গ করে।

তবু মনের সঙ্গোপনে একটা বিশ্বাস ছিল,—আবার দেখা হইবে।

কোথায় কোন্ দিন কেমন করিয়া কি ভাবে,—তাহা জানি না। তবে দেখা যে আবার হইবেই, ইহা যেন জানা কথা।

আর হইলও তাই।

আবার কতদিন বাদে যে তাহাকে দেখিলাম তাহা আজ মনে নাই।

আমি চিনিতে পারি নাই—সে-ই চিনিল।

হাটের পথের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া সে তখন ভিক্ষা

করিতেছে। একটুখানি আড়ালে সরিয়া গিয়া গলা উঁচু করিয়া আমার উদ্দেশে কহিল, "ভিক্ষে না দিস্ না দিবি, কিন্তু ভিখারীটার দিকে একবার ফিরেও দেখিস্ রে।"

তাহার সেই কদাকার ভিখারীর সাজ দেখিয়া আমি একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেলাম। সে হাসিয়া কহিল, "কই, বাহবা দিলিনে? রাজা সেজে যখন থিয়েটার করেছি তখন ত খুব,—কোথায় চলেছিস্?"

পরে আমার কথা ফুটিল,—"একটুখানি লজ্জাও নেই তোর, জামাই?"

তাহার হাতে তখন অনেকগুলি পয়সা জমিয়াছে। সেগুলি ট্যাঁকে পুরিয়া বলিল, "দেখ্, ভিখিরিদের ভালবাসি বটে, কিন্তু ভিক্ষে করাটাকে আমি ঘৃণা করি। মনুষ্যত্বের এত বড় সর্ব্বনাশ আর কিছুতে হয় না।"

সঙ্গে চলিতে চলিতে বলিলাম, "তবে তুই কেন এমন ভাবে—?"

"আহা—হা, সাজ্‌তে দোষ কি রে? তা ছাড়া আমার সঙ্গে কার কথা? লোকের কাছে হাতই পেতে রেখেছি, কিন্তু ভিক্ষে করাটাই কি আমার আসল উদ্দেশ্য?"

তা বটে—। বলিলাম, "তারপর?"

"তারপর আর কিছু নেই। কেরাণীগিরি করেছি, মাড়োয়াড়ী ব্যবসাদার হয়েছি, মাতাল হয়েও দেখেছি,—বলিয়া সে একটু খানি হাসিল,—"এখন আর হাতে কিছু নেই, ভাই। রেলের কুলি হয়েছিলাম, সে চাক্‌রিটিও গেছে।"

একপক্ষ প্রায় নিঃশব্দ থাকিয়া সমস্ত পথটাই চলিয়া আসিলাম। আজ বোধকরি নানা কারণেই তাহার উপর আমার অত্যন্ত রাগ হইয়াছিল। এত বড় জীবনটাকে এমন একটা হাস্যকর স্বপ্নে পরিণত করিবার অধিকার কি তাহার নিজেরই আছে?

হঠাৎ বলিলাম, "এ তোমার কাপুরুষতা! এ মিথ্যা —এ তোমার ভণ্ডামী।"

জামাই নির্ব্বিকার দৃষ্টিতে মুখ ফিরাইল। বলিল, "বিচার করেছিস্ ঠিক, কিন্তু রায় লিখিস্‌নে যেন। ঠক্‌বি তাহলে, আর সে ভুল বড় মর্ম্মান্তিক।"

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। রাস্তা-ঘাট অন্ধকার। অন্ধকার সেই পথে আমাকে একবার দাঁড়াইতে বলিয়া সে কোথা হইতে কি সব কিনিয়া আনিল।

পথে চলিতে চলিতে সে কি-সব যা-তা বলিতে লাগিল তাহার কোনও অর্থই হয় না।

হঠাৎ এক সময় বলিল, "বহরমপুরের পাগলা-গারদ দেখেছিস্? ওরাই সব চেয়ে সুখী। আমিও একবার পাগল সেজে দেখেছি—হাঁ, শান্তি আছে বটে!"

এ-কথার উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া বলিলাম, "আর কেন, এইবার আমার বাসার দিকে চল্?"

"না—একটা আস্তানা গেড়েছি,—যাবো সেইখানেই। তুইও চল্। নয় একদিন আমার কাছেই পাত পাত্‌বি। ইচ্ছে নেই নাকি?"

"চল্ তবে তাই।"

"ভয় নেই রে, ভয় নেই! ভিক্ষের পয়সা তোর পেটে যাবে না। ঠাকুরের পেসাদ খাওয়াবো।"

চলিতে চলিতে হঠাৎ বলিলাম, "তোর হাতে মুখে গায়ে ওসব কাটা-ফুলোর দাগ কেন রে?"

সে একটুখানি হাসিল,—"জামাই বলে তোরা ডাকিস্ কিন্তু জামাই-আদর কি কোথাও পাই রে? মার-ধোর্‌টা আস্‌টা খেতে হয় প্রায়ই। এই কালকেও—"

পূর্ব্বাকাশে তখন চাঁদ উঠিয়াছে।

সে আবার আবোল-তাবোল সুরু করিল, "চাঁদ যে মদ খায়, জানিস্? আমি জানি, নৈলে সে এমন বিহ্বল হয়ে ওঠে কেন? চেয়ে দেখ্ দেখি, অন্ধকারের তীরে দাঁড়িয়ে ও যেন বল্‌ছে—জাগো, জাগো, বন্ধু দুয়ার তোমার খুলে দাও!—আচ্ছা লুকিয়ে লুকিয়ে কোনদিন চাঁদের আলোয় ফুলবনের সভা-সমারোহ দেখেছিস্?"

"আমি ত আর কবি নই!"

"তাই নাকি? এর মধ্যেই তোর কবি মরে গেছে?"

"কোনদিন ছিল কি?"

"ছিল রে ছিল। এখনও আছে,—থাকবেও। আমার মনে হয় সৃষ্টির আদি থেকে অনন্তকাল পর্য্যন্ত আমি কবি এই জীবনের তটে বসে দূরের দিকে চেয়ে আছি। কবে আসবে তারা,—যারা আর কাঁদবে না, যারা অন্ধকারের ব্যথা কবির ললাট থেকে মুছিয়ে দেবে, যারা ভালবাসবে, যারা আমার মত এমনি অভিনয় আর করবে না,—কই তারা?—আচ্ছা, এদের দুঃখ কি একটুও লাঘব করা যায় না?"

রাগিয়া বলিলাম, "আমার ক্ষিদেটা এইবার একটু লাঘব কর্ দিকি?" বলিয়া মুখ তুলিতেই দেখি, তাহার মুখের আকৃতিটা পর্য্যন্ত যেন বদলাইয়া গেছে। চোখ দুইটা ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতছিল।

আস্তে আস্তে বলিলাম, "ভালবাসতে শেখ্, জামাই। তোর এই খাপ্‌ছাড়া জীবন মেয়েদের ভালবাসাতেই সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠ্‌তে পারে।"

জামাই হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল,—"রাস্তার মাঝখানে দুই বন্ধুর ন্যাকামি এইবার ঠিক জমে উঠেছে, না রে?"

আমিও মুখ ফিরাইয়া দেখি, চটুল হাসি তাহার মুখের উপর বিদ্যুতের মতই খেলিয়া বেড়াইতেছে।

সে কহিল, "একটুখানি দার্শনিকের অভিনয় করা গেল। যদি মূর্খ না হতিস্ তা হলে বুঝ্‌তিস—ওসব কেবল শব্দের আড়ম্বর, আর কিছু না। দর্শন শাস্ত্রটাই যে ওই। কাব্য আবার আরো ভূয়ো।"

একটি জীর্ণ মন্দিরসংলগ্ন দুইখানি কুটিরের কাছে পৌঁছিয়া সে কহিল, "ভেতরে আয়।"

দুইজনেই ভিতরে গিয়া ঢুকিলাম।

আমাকে এক জায়গায় বসাইয়া সে আর একটা ঘরে গিয়া ঢুকিল।

তারপর কতক্ষণ কি যে ভাবিতেছিলাম তাহা নিজেরই মনে নাই।

কয়েক মিনিট পরেই সে পুনরায় বাহির হইয়া আসিল। আমি যে অন্ধকারে ঠিক কোথাটায় বসিয়াছিলাম তাহা বোধ করি সে বুঝিতে পারে নাই।

ডাকিল, "মাসিমা?"

তৎক্ষণাৎ উত্তর আসিল, "যাই বাবা।"

কিন্তু মাসিমা বাহির হইবার পূর্ব্বেই তিন চারিটি ছোট ছেলে মেয়ে কিল্ বিল্ করিয়া বাহির হইয়া আসিল। উহাদেরই মধ্যে যে মেয়েটি বড়—সে আলো হাতে করিয়া বাহিরে আসিতেই, জামাই হঠাৎ আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিল, "আরে—তুই এখানে? ঘরে ছিলি না?"

আমিও সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম,—ইহারই মধ্যে কখন সে অবিকল পূজারি পুরোহিতের সাজ করিয়া আসিয়াছে। গায়ে নামাবলী, মাথায় টিকি, কপালে তিলক, ইত্যাদি।

আমার মুখ দিয়া কেবল একটা অস্ফুট শব্দ বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু বিস্ময়ের আর অবকাশ নাই। দুর্ভিক্ষপীড়িতের মত সেই কয়টি বালক ও শিশুর দল আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া টানিয়া জামাইয়ের ভিক্ষালব্ধ যাহা কিছু কাড়াকাড়ি করিয়া খাইতে বসিয়া গেল।

বড় মেয়েটি একবার আমার দিকে একবার জামাইয়ের দিকে তাকাইয়া কহিল, "আমার জন্যে খোকা-পুতুল আনলেন না, দাদা?"

"আন্‌বো দিদি কাল সকালে, আজ কথায় কথায় ভুলে গেছি, ভাই।"

রাগে লজ্জায় ঘৃণায় তখন কাঠ হইয়া বসিয়া আছি।

চুপি চুপি জামাই বলিল, "এখানে আমায় পুরুত ঠাকুর বলেই সকলে জানে। আচ্ছা, ভাল করে দেখ্ দেখি নিখুঁৎ হয়েছে কি না?"

ঠিক সেই সময় দরজা ঠেলিয়া মাসিমা প্রবেশ

করিতেই আমি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, এবং আর কোনও কথা না বলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলাম।

পিছনে পিছনে বাহিরে আসিয়া জামাই কহিল, যাস্‌নে যাস্‌নে, শুনে যা। মাসিমা অন্ধ,—চোখে উনি দেখ্‌তে পান্‌ না—শুনে যা।"

চলিয়া যাইতে যাইতে বলিলাম, "না না,—এতবড় মিথ্যা, এ চল্‌বে না,—কিছুতেই না।"

অন্ধকার পথে হন্‌ হন্‌ করিয়া চলিয়া গেলাম। রাগ করিয়াই চলিয়াছি কিন্তু সেই অন্ধকারেও ওই বঞ্চিত হত-ভাগ্য ক্ষুধার্ত্ত শিশুদের মুখগুলি বারম্বার যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম।

সেদিন আর বাসায় ফিরি নাই। সহরের একটা বাগানের ভিতর বেঞ্চিতে আসিয়া বসিয়া ছিলাম।

নিজের মনের কথাও সেদিন বুঝিতে পারি নাই।

তবুও তাহার সম্বন্ধে সেদিন আর একটি কথা বুঝিলাম। কোনও অভিনয়ই তার অর্থহীন নয়!

সেদিন সে আমারই কাছে আসিয়া দেখা দিল।

কহিল, "রাগ পড়লো রে?"

চটিয়া উঠিলাম—"তোকে আমি দয়া করি!"

সে কেমন একটা মুখের শব্দ করিয়া আমার পিঠ চাপ্‌ড়াইল; যেমন করিয়া ক্ষ্যাপা জানোয়ারকে লোকে শান্ত করে। তারপর বলিল, "চল্‌ একবার, একটু কাজ আছে। রেলে করে' বেড়িয়ে নিয়ে আসি—চল্‌।"

তাহার আওতায় আসিলে সব কিছু বিশৃঙ্খল হইয়া যায়। সে কাহাকেও কোনদিন গৃহবাসী করে না—দেশত্যাগী, লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয়।

তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া বলিলাম, "কোথায় যেতে হবে?"

"নরকে!"

পথে চলিতে চলিতে সে পুনরায় কহিল, "আমার পেছনে পেছনে যারা ঘোরে তাদের আমি গ্রাহ্য করিনে; কিন্তু তোর মতন বুঝলি—ত্যাগ করে' আসে যারা আমাকে—তাদের ভয় করি।"

কথা বাড়াইয়া তাহার ন্যাকামিকে আর প্রশ্রয় দিলাম না।

ইষ্টিশান হইতে গড়ানে রাস্তা গাঁ-পথে নামিয়া গেছে।

দূরে প্রান্তরের ওপারে বেণুবনের পাশ দিয়া গ্রীষ্মের সূর্য্য এইমাত্র অস্ত গেল। বড় বড় তাল-নারিকেল ও বট অশথের ছাওয়ায় ইহারই মধ্যে গ্রাম্য-পথ অন্ধকার হইয়া গেছে।

কোথায় চলিয়াছি কেন চলিয়াছি এ সকল প্রশ্ন তাহার কাছে নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু আঁকা-বাঁকা অনেকগুলি পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার পর যখন তাহাকে স্বগ্রামে প্রবেশ করিতে দেখিলাম— তখন বিস্ময়ে আমি অবাক্‌।

পিতামাতার মৃত্যুর পর বৈমাত্রেয় ভায়েরা তাহাকে সমস্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। কেন না মন্ত্র পড়িয়া পিতা তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে বিবাহ করেন নাই।

বলিলাম, "এতদিন পরে বাড়ী চলেছিস্‌ নাকি?"

তাহার যেন ধ্যানভঙ্গ হইল, সে বলিল, "হুঁ।"

"কিন্তু তুই না প্রতিজ্ঞা করেছিলি যে—"

এইবার সে হাসিয়া উঠিল,—"থাক্‌, ও-কথাটা আর তুলিস্‌নে, ভাই। প্রতিজ্ঞা! সাত বছর ভগ্নিপতিটার মুখ দেখলাম না, শেষ কালে তার একরত্তি মেয়েটার জন্যে—বর্ষাকাল, ভারি রাত—আমার সব প্রতিজ্ঞা ওলোট-পালট করে দিলে! গেলাম দেখ্‌তে! মরেই যদি যেত' মেয়েটা রোগে ভুগে'—কি ক্ষতি হত' আমার? —না না, সব মিছে কথা! অনেকবার অনেক প্রতিজ্ঞা

করেছি, রাখ্‌তে প্যারিনি। অথচ কত কঠিন মন আমার,—কিন্তু কি দুর্ব্বলতা—"

চলিতে চলিতে আবার বলিল, "মানুষের ওপর কি রাগ কর্ত্তে আছে রে? রাগ কর্ব্বি ভগবানের ওপর, যদি পারিস্ প্রতিশোধও নিস্।"

"আচ্ছা ভেবে দেখি, এখন চল্।" কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিক্তকণ্ঠে পুনরায় কহিলাম, "দাদাদের কাছে সোহাগ কর্ত্তে যাওয়া হচ্ছে বুঝি?"

কথাটার মধ্যে যে খোঁচা ছিল তাহা সে তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফেলিয়া একটুখানি ম্লান হাসি হাসিল, বলিল, "মেজ বৌদির কাছে যাচ্ছি।"

অতি মাত্রায় বিস্মিত হইলাম,—"কেন?"

"তার বড় অসুখ—খবর পেলাম।"

"তাই বুঝি দরদ জানাতে—তা চোখের জল দু'ফোটা ফেল্‌তে পাল্লে বেশ দু'পয়সা—মন্দ কি!"

কিন্তু কিসে কি হইল! ফিরিয়া দেখি, মর্ম্মান্তিক আঘাতে তাহার মুখের আকার পর্য্যন্ত বদ্‌লাইয়া চোখ দুইটি প্রায় বুজিয়া গেছে।

কিন্তু সে কোনও কথার উত্তর না দিয়া ট্যাঁক হইতে কি একটা বাহির করিয়া একান্ত অসহায় করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া কহিল, "এই মাদুলিটি—তা সারবে না রে বৌদির অসুখটা? কিন্তু এর নিয়ম সব ঠিক ঠিক মেনে চলা চাই নৈলে—"

বাড়ীর কাছাকাছি সে আসিয়া পড়িয়াছিল, বলিল, "থাক্ তুই ওই ঝোপটার আড়ালে দাঁড়িয়ে।"

তার পর উঁকি ঝুঁকি মারিয়া আবার বলিল, "লুকিয়ে লুকিয়ে যাবো ঠিক। দাদারা কি আর জান্‌তে পারবে? এত বড় বাড়ী!- দাঁড়া তুই।"

সে চলিয়া গেল; আমি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

আবার তাহাকে সঙ্গে করিয়া সেই অন্ধকার গ্রামাপথ অতিক্রম করিয়া যখন ইষ্টিশানে আসিলাম—তখন রাত্রি অনেক।

ফিরিবার ট্রেণ আসিতেও অনেক বিলম্ব হইল। যখন চড়িয়া বসিলাম, তখন রাত্রির জমাট অন্ধকার পাৎলা হইয়া আসিয়াছে।

জামাই শুইয়াই রহিল। উঠিলনা—সাড়াও দিল না।

রাত্রির বুক বিদীর্ণ করিয়া পাগলের মত গাড়ীখানা ছুটিয়া চলিয়াছে। খোলা জানালায় মুখ দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

বাহিরে চলমান প্রকৃতির নিঃশব্দ নিস্তরঙ্গ অন্ধকারের ওপারে আধখানা ঘোলাটে চাঁদ উঠিল। রক্তের মত যেন রাঙা চাঁদের আলো।—আকাশের বেদনার প্রতিমূর্ত্তি।

বসিয়া বসিয়া দুইটা উচ্ছৃঙ্খল ছন্নছাড়া জীবনের কথা ভাবিতেছিলাম। ঘর নাই, সংসার নাই, স্থিতির কোন বালাই নাই,—দীর্ঘ নির্জ্জন অফুরন্ত পথ চিরদিন তাহার লোল দুই বাহু দিয়া এই দুইটি জীবনকে বাঁধিয়া কোথায় কোন্ রহস্যের দ্বারে লইয়া চলিয়াছে।

কিন্তু আর যে আমরা পারি না!

হঠাৎ জামাই উঠিয়া বসিল—"চল্ এইবার সব শেষ করে' দিয়ে আসি।"

তাহার কথায় যেন চমক ভাঙিল,—"শেষ হতে আর কি বাকি?"

"না—এবার সত্যিই শেষ! বাসনার ব্যথা, অভিমানের বোঝা নিয়ে আর বেড়াতে পারিনে।—চল্—গৌরীকে দেখে আসি।"

অবাকবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে একবার চাহিলাম। আমার মনের কথা বোধ করি বুঝিয়াই সে শুধু মাত্র কহিল, "ভয় নেই রে, ভয় নেই। সে যে এখন পরের তা বোধ হয় তোর চেয়ে আমি বেশীই জানি।"

গৌরী আমার মামাতো বোন।

একটুখানি ইতিহাস—

গৌরীর সঙ্গে জামাইয়ের ভালবাসা বাল্যকাল হইতে!

......তারপর একদিন বিবাহের ঠিক-ঠাক্। বর বিবাহ করিতে গেছে—সম্প্রদান বাকি।

গোলমাল উঠিল। জামাইয়ের দাদারা তাহার বিবাহ ভাঙিয়া দিয়া সেই আয়োজনেই মেজ ভায়ের শ্যালক রঙ্কুবিহারীর সহিত গৌরীর বিবাহ দিয়া দেন।

কথা উঠিল—বরের আবার জাত আছে নাকি? তাহার পিতামাতার যে গন্ধর্ব্ব-বিবাহ!

......গৌরীর মূর্চ্ছা ভাঙিলে—সে অন্ধকারে লুকাইয়া আমার কাছে আসিয়া বলিয়াছিল, "বেশ, চল্‌লাম। কিন্তু ভিক্ষে চাইতে পারবো না, ছোড়্‌দা,—তত ছোট আমি নই। আশীর্ব্বাদ কর, যেন সজ্ঞানে নিজেকে বলি দিতে পারি।"

জামাই বলিয়াছিল, "তল্পি-তল্পা কিছু থাকে ত গুটিয়ে নে ভাই। সকাল বেলাকার আলো ফুটলে নিজেকেও হয়ত আর চিন্‌তে পারবো না।"

রাত্রির সেই অন্ধকারে লুকাইয়া আমি আর জামাই গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেলাম।

তাহার জামাই নাম তখন হইতেই।

গৌরী আবার আর একটু যোগ করিয়া দেয়—জামাই-দা!

কিন্তু যে-রূপে জামাইকে এতদিন ধরিয়া দেখিয়া আসিয়াছি,—সেদিনকার সেই অন্ধকার পথে সে যেন কেমন করিয়া বদ্‌লাইয়া গেল।

পথে চলিতে চলিতে বলিয়াছিল, "আঘাতটা খুব গুরুতর রকমের পেয়েছি না রে?—তা হ'কগে, কিন্তু সহ্য করবার শক্তিও যেন থাকে। দুঃখ উথ্‌লে না ওঠে, তাকে যেন বেঁধে রাখ্‌তে পারি।"

"আশ্চর্য্য! জাত গোত্র যে এত কাজে লাগে এই আজ প্রথম জানলাম;—তুইও যা রে, নিজের সুখ-দুঃখ নিয়ে তুইও চলে যা যেখানে হ'ক।"

একাকী সেইদিনই সে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিল।

......উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, "এ নাটুকেপণার দরকার কি?

সে আবার চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল। খানিকক্ষণ পরে মুখ গুঁজিয়াই বলিল, "তুই আমার শালা হবারই যোগ্য,—বুঝ্‌লি?"

সকাল হইয়া আসিল। আর একটু পরেই গাড়ী হইতে নামিতে হইবে। অন্ধকার স্বচ্ছ হইয়া গিয়া দূরে অস্পষ্ট বনস্পতির রেখা নজরে পড়িতেছিল।

জামাই নিঃশব্দে উঠিয়া বসিয়াছিল। আকাশের দূর কিনারায় তাহার জাগরণ-ক্লান্ত চোখ দুটি নিবদ্ধ করিয়া কতক্ষণ সে নীরবে বসিয়া রহিল।

হঠাৎ বলিলাম, "কাঁদচিস্ নাকি রে?"

সেকথায় কান না দিয়া ঈষৎ ম্লান হাসিয়া সে শুধু কহিল, "আলো ফুট্‌ছে না ওই—দিনের আলো?"

আট্‌-ফাটা চিড়-খাওয়া সোনামুখীর মাঠ। জ্বলা-পোড়া সেই মাঠে তিনকোশের মধ্যে আর গাঁ নাই। রোদের তাতে খোলা প্রান্তরের বুকে রাম-ধনুকের রঙ খেলে; সাতরঙা।

থাকিয়া থাকিয়া যেন সরষে-ফুলের ফুল্‌কি ফাটিয়া পড়ে। দূরে ঈষৎ নীল একটি রেখা।

আধ-বোজা স্বপ্নের আমেজ যেন চোখে লাগিতে থাকে।

মাঠের পরেই জলকর। মাছ ধরা হয় না—মারা হয়। নূতন খালে নৌকায় করিয়া দূরের সহরে মাছ চালান যায়। সকাল হইতে বিকি-কিনি করিয়া সন্ধ্যার সময় ওইটিই ফিরিবার পথ।

অদূরে বোজা-খালের উপর একখানা মাটি-কাটা

জাহাজ যখন-তখন মাটির বুক আঁচড়ায় আর ইতর জন্তুর মত আর্ত্তনাদ করে।

গাঙ্‌চিলগুলা চীৎকার করিতে করিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। নালীর ধারে ধারে ওৎ পাতিয়া বকগুলা বসিয়া থাকে। সুবিধা পাইলেই ছোট ছোট মাছ ধরিয়া উড়িয়া পলায়।

মুক্তারামের মাছের ভেড়ি। মুক্তারাম জামাইদের প্রজা। কারবারটি তাহার বেশ জম্‌-জমাট।

'আলার' মধ্যে পাশাপাশি তিন চারিটি কুটুরি। একটি আমাদের দুজনের দখলে। বাকি কয়টিতে ভেড়ির লোকগুলি একরকম করিয়া থাকে।

বাঁধা আলের তলাতেই নূতন খাল। জল ভাল নয় —তবু ওইতেই জীবন ধারণ!

পথে দুইদিন এই খানেই কাটিল। কিন্তু জামাইয়ের মন আর এখানে টেঁকে না।

সেদিন কহিল, "দেখা-শোনা ত হ'ল রে, আর কেন, —চল্‌ এইবার!"

এই অবারিত উন্মুক্ততা ছাড়িয়া যেন আর কোথাও যাইতে ইচ্ছা হয় না। বলিলাম, "আরও দিন দুই যদি—?"

"আরে না না, কি হবে থেকে এখানে? খেয়ে খেয়ে পেট মোটা করা আর পড়ে পড়ে ঘুমানো ছাড়া বুঝি আমার অন্য কাজ নেই?"

হাসিতে লাগিলাম। সে কহিল, "কেন, হাসি হচ্ছে কেন অমন করে'? যার বাঁধা কাজ নেই তারই ত' পাঁচ কাজ,—বেকার হয়ে একথাটাও বুঝি জেনে রাখিস্‌ নে?"

কিন্তু যাওয়ার সুবিধা সহজে হইল না। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাড়্‌দার হাঁটা-পথ নাই, খালের ফাকড়া দিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু সে ফাকড়ায় এখন জল নাই, পান্‌সীও চলিবে না।

সেটা শ্রাবণ মাস—তাই রক্ষা। পরদিন রাত্রেই আকাশের আশীর্ব্বাদের মত জল নামিল। সঙ্গে সঙ্গে জামাইয়েরও তাড়া-হুড়া।

"এই সুযোগে বেরুতে হবে, নৈলে মুস্কিল। বৃষ্টি যদি ধরে' যায় আর ফাকড়ার শুক্‌নো মাটি যদি জল টান্‌তে সুরু করে তা হলে, বুঝ্‌লি ত?—মাঝ পথেই একেবারে ঠুঁটো জগন্নাথ!"

"কিন্তু এই রাত্রে—দুর্য্যোগে—"

"সেই জন্যেই ত যাবো! ফুলের বনে দিনের আলো —সুখের যাত্রায় সেটা কাজে লাগে বটে কিন্তু আমরা সে সব গ্রাহ্য করিনে। বাদলের দুর্য্যোগ, শীতের হিহিকার, বোশেখের খরতাপ—আমাদের সময় ত এই! ভিজে ভিজে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে চিরকাল এদেরই মধ্যে কেবল পথ হাতড়ে চল্‌বো। নৈলে দুঃখের যাত্রা কি একটা কথার কথা?—নে, আয়, দেরি করিস্‌নে, ভাই।" বলিতে বলিতে জামাই 'আলা' হইতে বাহির হইয়া অন্ধকার রাত্রির সেই উন্মাদ বর্ষণের অবিশ্রান্ত মাতামাতির মাঝখানে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

কিন্তু, হরি হরি! পান্‌সী ফাকড়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়া খানিক দূর যাইতেই কোথায় গেল বর্ষা—আর কোথায়ই বা গেল মেঘ! আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়া খট্‌খটে চাঁদের আলো দেখা দিল।—যেন শরৎকাল!

সেটা বোধ করি পূর্ণিমা তিথির কাছাকাছি। আকাশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ নিবিড় চন্দ্রালোক নিমীলিত দৃষ্টির সুমুখে অপরূপ কল্পলোকের মত ঝিমাইতে লাগিল। দিগন্তের চারিদিকে অস্পষ্ট বনস্পতি মাটির তলায় শিকড় ছড়াইয়া শুধু আকাশের দিকে চাহিয়া আছে।

জামাই অনেকক্ষণ সেইদিকে চাহিয়াছিল, এইবার মুখ ফিরাইয়া কহিল, "দেখেছিস্‌ কত অসহায় ওরা! যুগের পর যুগ ওরা অমনি করেই ওপর দিকে চেয়ে আছে,—থাকবেও। কিন্তু কেন বল্‌তে পারিস্‌? বীজ ফেলে

মরে' যায়, আবার জন্মায়, আবার অম্‌নি অসহায় হয়ে' চেয়ে থাকে! অথচ কতই না অত্যাচার চলেছে বেচারিদের ওপর! মানুষে ওদের পাঁজরার ভেতর কুড়ুল চালিয়ে দেয়—ওরা নীরবে সহ্য করে; চোত্‌-বোশেখের আগুনে জ্বলে' পুড়ে মরে—তবু তেষ্টার জল চায় না; ঝড় বাদলে ওদের মাথা নুইয়ে পড়ে—এতটুকু আপত্তি করে না; শীতকালে হি হি করে' শুকিয়ে মরে—তবু সেই মরা-দেহ নিয়েই বসন্তের অভ্যর্থনা করে। ওরা ত অকৃতজ্ঞ নয়, যে মাটির রসে বাঁচে তাকেই ওরা ঝরা-পাতার অঞ্জলি দেয়। তারপর আবার চেয়ে থাকে! কিন্তু কেন বল্‌তে পারিস্?" বলিয়া সে আবার হাত চালাইতে লাগিল। একবার থামাইয়া পুনরায় বলিল, "পাবে পাবে, এর উত্তর ওরা পাবেই একদিন!—পাবে না? কেন পাবে না, শুনি?"

নীরবে শুনিতে লাগিলাম।

সে এইবার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর হঠাৎ হাসিয়া বলিল, "কোথায় যাচ্ছি আমরা মনে আছে?"

"কেন, গৌরীকে দেখতে?"

জামাই আর কোনও কথা বলিল না। কিন্তু এই না বলার অবকাশে অনেকদিনের অনেক কথাই মনে পড়িতে লাগিল।

আঁকা-বাঁকা খালের ফাক্‌ড়ার ভিতর দিয়া পান্‌সী ধীরে ধীরে চলিতেছিল। দুই ধারের বুনো কচুর পাতা, কুকুসিমার ডাল, আয়াপানির চারা জলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। সেগুলাকে দুই হাতে সরাইতে সরাইতে চলিয়াছি—যেন আমারই কত গরজ!

মাঝে মাঝে জলের ভিতর পারাপারি বড় বড় শিকড়ে পান্‌সী আট্‌কায়, হাত দিয়া ঠেলিতেই আবার চলে।—গায়ে ঘাম দেখা দিল।

জামাই চুপ করিয়া উপরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

সবে ভোর হইয়াছে—।

ডাক শুনিয়া গৌরী ছুটিয়া বাহিরে আসিল।

"আ—! ছোড়দা? কোত্থেকে এলে? ও কে তোমার পেছনে?" বলিতে বলিতে খিল্‌ খিল্‌ করিয়া গৌরী উচ্ছ্বসিত হাসি হাসিয়া উঠিল,—"জামাই-দা তুমি নাকি সন্নিসি হয়েছিলে?"

একটুখানি হাসিয়া জামাই বলিল, "রোগটা ধরেছিল বটে, ভাই।"

গৌরী আমার একটা হাত চাপিয়া হাসির বেগ দমন করিতে করিতে বলিল, "ও জামাই-দা, তোমার জটা-গেরুয়া কোথায় গেল? ছোড়দা, তুমিই বুঝি ওকে সন্নিসি-গিরি থেকে ছাড়িয়ে এনেছ?"

বলিলাম "সন্নিসি হলে কি আর কেউ ছাড়াতে পারতো?"

সেদিনকার সেই গৌরী! বিবাহ রাত্রে একটুখানি বদ্‌লাইয়া ছিল—আবার ঠিক তেম্‌নি!

জামাই বলিল, "কইরে, আমাদের অভ্যর্থনা কল্লিনে যে?"

পরক্ষণেই গৌরী গম্ভীর হইয়া গেল। বলিল, "আজ উনি বাড়ী নেই,—ইষ্টিশানের মাষ্টার কিনা তাই রোজ বাড়ী আসেন না। কাল কি পরশু—"

তাড়াতাড়ি বলিলাম, "কিন্তু আমি ত জানি তুই বাড়ীর কর্ত্তা-গিন্নী সবই।"

গৌরী সে কথা কানে না লইয়া কহিল, "ভয় নেই গো ভয় নেই, তোমাদের অভ্যর্থনা চিরকাল আমি নিজেই কত্তে পারবো।—জামাই-দা মুখ ফিরিয়ে রইলে যে? তোমার বৈরাগ্যের মধ্যে আমার মুখ দেখাটাও বাদ পড়্‌বে নাকি?"

জামাই কহিল, "বৈরাগ্য ত নয় ভাই। কিন্তু মুখে আমার এখন যে ছবিটা ভাস্‌ছে তা যে আমি নিজেই চিনি না,—তা তোমাকে দেখাবো কি?"

"সন্নিসির মুখে কি যখন তখন ছবির বদল হয়, জামাইদা?—এসো এখন ভেতরে, কাল থেকে যে তোমাদের হরিমটর চল্‌ছে তা ত দেখতেই পাচ্ছি। খাইয়ে-দাইয়ে একটু পুণ্যি কত্তে দাও।"

জামাই কহিল, "দুজনের মধ্যে কাকে খাওয়ালে তোমার বেশী পুণ্যি হয়, গৌরী ?"

গৌরী আমাদের দু'জনের দিকে এক একবার চাহিয়া অকস্মাৎ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে গিয়া হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল, বলিল, "তা কে জানে—জানি না, ছোড়দাদা ত ঘরের লোক,—কিন্তু ভারি অন্যায় তোমার ছোড়দা, ভয়ানক অন্যায়,—আমায় এম্‌নি করে'—" বলিতে বলিতে বিবর্ণ কালো মুখে হন্ হন্ করিয়া গৌরী ভিতরে চলিয়া গেল।

জামাই গলা বাড়াইয়া শুধু কহিল, "সন্নিসি মানুষ, দক্ষিণা চাইনে, শুধু খেতে পেলেই খুসী হব, গৌরী!"

দুজনেই ভিতরে গেলাম। গৌরী তখন ওদিকে রান্না-বান্নার যোগাড় করিতে গিয়াছে।

ঘরের ভিতর তক্তাপোষ খানিতে জামাই ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। চারিদিকে তাকাইয়া সে যে গোঁজ গোঁজ্ করিয়া কি বলিল—বুঝিতে পারিলাম না।

বলিলাম, "খেয়ে দেয়েই কি আমরা বেরিয়ে পড়বো নাকি রে ?"

এদিকে আর বোধ হয় তাহার কান ছিল না। সে কোনও জবাব দিল না; আন্‌-মনা হইয়া কি ভাবিতে লাগিল।

খানিক পরে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া মুখ বাড়াইয়া গৌরী বলিল, "রান্না হতে আর আমার দেরি নেই কিন্তু।"

জামাই বলিল, "ভেতরে এসেই বল না, গৌরী। তা ছাড়া শুধু খাবার জন্যেই কি এতটা রাস্তা আমরা—?"

"তর্ক করবার আমার সময় নেই, জামাই-দা।"

"তর্ক করলে হারবো আমরাই, সুতরাং ওটা এখন মুলতুবি থাক্।—ঘরটি যে তোমার চমৎকার করে' সাজানো হয়েছে সেই কথাটাই তোমায় বলতাম, ভাই।"

বোকার মত আমি শুধু দুজনের দিকে তাকাইতে লাগিলাম।

গৌরী চলিয়া যাইতেছিল—কি ভাবিয়া সে একবার ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "তোমার ও-কথার মানে জানি, জামাই-দা। ডেকে হয়ত তুমি আমাকে স্বীকার করিয়ে নিতে চাও যে, দেয়ালে ওই ছবিগুলো, আলমারির ওই পুতুল কটা, সেলাইয়ের ওই বাক্সটা, ওই কটা ফুলদানি—ও সমস্তই তুমি ছোটবেলা আমাকে দিয়েছিলে। কেমন, এই না ? কিন্তু কৃতজ্ঞতা দিয়ে তার দাম ত শুধেছি, জামাই-দা ?" বলিয়া সে তাহার মাথার চওড়া সিঁদুরের উপর কাপড়খানি আর একটু সরাইয়া দিল।

জামাই মাথা হেঁট করিয়া বসিয়াছিল। এইবার মুখ তুলিয়া বলিল, "ছোটবেলা তোমাকে কি দিয়েছি না দিয়েছি তার আলোচনা আমি কর্ত্তে চাইনে, ভাই। তবে এই কথাটি ভেবেই আশ্চর্য্য হচ্ছি যে যার মরণ নেই সেইটাই মরে' গেল, আর যেগুলোর ধুলোটুকু পর্য্যন্ত থাকবার কথা নয় তারাই আজ সযত্নে দেয়ালে আলমারিতে র'য়ে গেছে ? বলি, সেটা যে মরে গেছে, তারই সাক্ষী রেখেছ বুঝি ওইগুলোকে—?"

গৌরী হঠাৎ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া যেন মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের মেঘটুকু উড়াইয়া দিল। তারপর কহিল, "জামাই-দা বেশ গম্ভীর হয়ে কথা বল্‌ছে কিন্তু—না ছোড়দা ? বলিয়া উত্তর শুনিবার পূর্ব্বেই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

জামাই চিৎ হইয়া তক্তার উপর শুইয়া রহিল। এবং আমি যে কি করিতে লাগিলাম—আজ আর তাহা মনে পড়ে না।

খানিকক্ষণ পরে স্বপ্নাবিষ্টের মত জামাই বলিতে লাগিল, "আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! ছবি আর পুতুলে মানুষের দাম যাচাই হয়ে গেল!"

আর আমি সহিতে পারিলাম না। কহিলাম, "দাম যাচাই করবার জন্যই কি এখানে এসেছিস্ ?"

"তাই ত!—আচ্ছা, রেলে বসে আমি তোকে কি বলেছিলাম—মনে আছে ?"

"শেষ করে' আস্‌বো—বলেছিলি।"

"না না—তা বলিনি—তা বলিনি, কিন্তু যা বলেছিলাম তা বোধ হয় তুই শুন্‌তেই পাস্‌নি—না? তোকে বোধ হয় বলেছি এই কথা যে—ক্লান্ত পাদুটো আর চল্‌তে পাচ্ছে না! এতদিন পরে যেন মনে হচ্ছে—এ জীবনে কোনও দিন বিশ্রাম করা হয়নি। বিদায় নেবার এত আগ্রহ, তবু চলে' যাবার সময় যদি এল—মনে হচ্ছে, জান্‌লার বাইরে ওই মাঠের দিকে চেয়ে এইখানেই আর একটুখানি শুয়ে থাকি। ইচ্ছা করে এইখানে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যা হোক একটি স্বপ্ন দেখে যাই। স্বপ্ন স্বপ্ন,—সত্য একটুও না থাক্‌, মিথ্যার মাধুর্য্য ত আছে!"

খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া গল্প চলিতেছিল।

গৌরীর কি একটা কথার উত্তরে জামাই বলিল, "কি আশ্চর্য্য, আমি ঘর ছাড়া সন্ন্যাসী কিছুতেই নই, তুই কি আমায় জোর করে হওয়াতে চাস্ রে?"

"কিন্তু যার সংসার নেই, যার কেউ নেই, সে-ই ত' সন্ন্যাসী, জামাই-দা? তা ছাড়া সন্নিসি হওয়াই তোমার উচিত ছিল!"

জামাই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—"তোর কথা শুনে সেই একটা গল্প মনে পড়্‌লো—তা যাক্, কিন্তু আমার মধ্যে আজও সে মরে নি ভাই, যে পৃথিবীর কাছে তার অধিকার দাবি করে, যে ঘর চায়, যে বঞ্চনা সইতে পারে না, যে কাঁদ্‌তে জানে।"

"দাঁড়াও আসছি—" বলিয়া গৌরী উঠিয়া বাহির হইয়া গেল।

একটু পরেই আবার ভিতরে ঢুকিল। ঘরের ভিতর পায়চারি করিয়া বেড়াইয়া বেড়াইয়া হঠাৎ এদিকে একবার মুখ ফিরাইয়া বলিল, "তুমি এত বড় ভণ্ড? এত বড়—?"

জামাই সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া কি একটা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই গৌরী চেঁচাইয়া কহিল, "অধিকার দাবি কর্ত্তে তুমি জান না,—তুমি কেবল বঞ্চনা সইতেই পারো!—" বলিতে বলিতে ছুটিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

মাথা হেঁট করিয়া জামাই বসিয়া রহিল। আমি উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। কিন্তু গৌরীকে এদিকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না।

আবার আসিয়া বসিতেছি—গৌরী হাসিতে হাসিতে আসিয়া ঘরে ঢুকিল। আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "সত্যি আমি কি পাগল ছোড়দা, পরের অধিকার নিয়ে অনধিকার চর্চ্চা করছিলাম। তোমরা দুটিতে হাস্‌ছিলে বুঝি খুব?—তা হাস না, আমার কি, আমি ত আর কিছু বলিনি!"

চুপ করিয়াই রহিলাম। সে আবার কহিল, "কিন্তু দেখেছ ছোড়দা, মানুষ কত অবস্থায় কত রকম করে' হাস্‌তে জানে?" বলিয়া ঘরের ভিতর এধার ওধার ঘুরিতে লাগিল, এটা ওটা নাড়াচাড়া করিল। তারপর বলিল, "চুপ করে' আছ কেন, ছোড়দা? কেউ তোমরা কথা বলবে না, আমি একলাই শুধু বকে' যাবো? আচ্ছা, সকলে মিলে কথা বললে অনেক কথা চাপা পড়ে যায়, না ছোড়দা?" বলিয়া একটা গেলাসে করিয়া কলসী হইতে জল গড়াইয়া সে ঢক্ ঢক্ করিয়া খাইল। খাইয়া বলিল, "উঃ—কি তেষ্টাই পেয়েছিল, সত্যি!—তোমরা কেউ জল খাবে, ছোড়দা?"

"না।"

"তবে আমিই আবার খাই।" বলিয়া পাগল মেয়েটা আবার ঢক্ ঢক্ করিয়া খানিক জল খাইল।

"যাই, কত কাজ পড়ে' আছে তার ঠিক নেই! উনি আবার যে রাগী, কি যে বলবেন হয়ত কে জানে তা!—সত্যি, সকলে মিলে চুপ করে' থাকলে মনে হয়, আমরা যেন মরেই গেছি, কোথাও যেন আর আমাদের সাড়া শব্দটি নেই। বাড়ীতে কেউ না থাক্‌লে আমার এমনিই মনে হয়!—যাই।" বলিয়া গৌরী তেম্‌নি দ্রুতপদেই বাহির হইয়া গেল।

জামাই এতক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়াছিল। এইবার তাহার রুক্ষ চুলগুলা মুখের উপর হইতে সরাইয়া উ

বসিল, বলিল, "ঠিক বলেছে গৌরী, নিজের কথা দিয়ে সরগরম করা ছাড়া আর উপায় নেই।" একটুখানি হাসিয়া সে আবার কহিল, "আমারও তাই মনে হয়,— কেউ আর বেঁচে নেই! এই ঘর-বাড়ী, ওই গাছ-পালা মাঠ-ময়দান,—সবই যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। জীব জানোয়ারের জগতেও চেয়ে দেখ—ওরাও যেন আর পারে না, ওরাও যেন চায় একটা অবাস্তব অদ্ভুত কিছু দিয়ে ওদের সরগরম করে তোলা হোক্। নৈলে পৃথিবীর এই একটানা খাঁচার জীবন যেন অসহ্য হয়ে উঠেছে। জীব-জগতের এত বড় দুর্দ্দিন আর কবে হয়েছিল, কে জানে!"

জামাই আবার শুইয়া পড়িল।—উঠিয়া বাহিরে আসিলাম।

দেখি, উঠানে সেই গাব গাছটার কাছে দাঁড়াইয়া গৌরী কেবলই মুখে চোখে জল দিতেছে। হাসিয়া বলিলাম, "এবার নিয়ে কবার হল রে?"

গৌরীও মুখ ফিরাইয়া হাসিল,—"এসে জল মেশাচ্ছি, ছোড়দা।"

কিন্তু হঠাৎ সেই মুখের হাসি বন্ধ করিয়া সে বলিল, "তোমরা যাবে কখন্?"

"তাড়িয়ে দিবি নাকি?"

"না তা নয়, তবে—কিন্তু আর কি জন্যেই বা তোমরা মিথ্যে—?"

"বাড়ীর কর্ত্তার সঙ্গে দেখা না করেই যেতে বলিস্?"

মাথা তুলিয়া গৌরী বলিল, "আমি বলি কি—"

"তুই যাই বল্, এই সন্ধ্যেবেলা বেরিয়ে রাতে আমরা পথ হারাতে পারবো না।" বলিয়া পুনরায় ঘরে উঠিয়া আসিলাম।

ক্রমে রাত্রি হইল।—

এদিক ওদিক ঘুরিয়া দুজনে ফিরিয়া আসিলাম। গৌরী ষোড়শ উপচারে আহারের যোগাড় রাখিয়াছিল। কিন্তু অনেক অনুরোধ উপরোধে জামাই কিছুতেই খাইতে চায় না।

গৌরী বলিল, "আমার উপর রাগ নাকি, জামাই-দা?"

হাসিতে হাসিতে জামাই বলিল, "দূর পাগল! বরঞ্চ অনুরাগ রাখবার ঠাঁই আছে, কিন্তু রাগ রাখবার জায়গা কি পৃথিবীতে আমার আছে রে?"

"সাধাসাধি করে' খাওয়াবো—ইচ্ছে আছে নাকি?"

"সেটা মিষ্টি লাগত' বটে কিন্তু শরীরটা আমার—তা ওটা বন্ধুবাবুর জন্যেই কেন—?"

একবার গৌরীর সঙ্গে তাহার চোখচোখি হইল—হঠাৎ থামিয়া গেল। তারপর গৌরী নিজেই চলিয়া গেল।

সে রাত্রে জামাই খাইল না। আড়ালে ডাকিয়া গৌরী শুধু কহিল, "কিন্তু কালই তোমরা চলে যেও ছোড়দা, নৈলে উনি এসে পড়লে ভারি লজ্জায় পড়বো।"

"উনি'র ভয়টা যে খুব দেখছি তোর? বেশ মন দিয়ে ঘরকন্না কচ্ছিস্—না?"

"ছাই ঘরকন্না! ইচ্ছে হলে এক পলকে ছেড়ে যেতে পারি। অত আমার ইয়ে নেই!"

অন্ধকার রাত্রে বিছানায় শুইয়া জামাই উস্‌খুস্ করিতে লাগিল। রাগিয়া বলিলাম, "বরাতটা এম্‌নি যে এমন নরম বিছানা পেয়েও তোর জালায় ঘুমোবার যো নেই"— বলিয়া আবার ঘুমাইতে চেষ্টা করিলাম।

সে আস্তে আস্তে কহিল, "সত্যি, অভিনয় করে' করে নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছি, রাগ-অনুরাগ যার ছিল তাকে আর খুঁজেই পাই না।"

খানিকক্ষণ পরে আবার কহিল, "ঘুমোলি নাকি রে?"

"না।"

"তবে উঠে বস্।"

"কেন?"

"আমার কেবলই আবোল-তাবোল বকতে ইচ্ছে করছে।"

উঠিলাম না। চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম।

অনেকক্ষণ পরে আবার সে বলিল, "ঘুমোলি?—

উত্তর দিলাম না। সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল,

তারপর বিছানা হইতে নামিয়া ঘরময় ঘুরিতে লাগিল। অন্ধকারে নিঃশব্দে পায়চারি করিতে করিতে সে যেন আপনাকেই খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কিম্বা তাও নয়—। এই অন্ধকার, এই ঘরের চারিটা দেওয়াল, এই গভীর রাত্রি—সমস্ত কিছু দীর্ণ-বিদীর্ণ করিয়া খোলা আলো বাতাসে সে যেন আপনাকে প্রকাশ করিতে চায়।

সে রাত্রে বাদল নামিয়াছিল—

এবং প্রাতঃকালেও সে ধারা-বর্ষণের বিরাম ছিল না।

চোখ খুলিয়া দেখি, গা-মাথা বালিস-বিছানা সব বৃষ্টির ছাটে ভিজিয়া গেছে।

জামাই কোথায়—?

দরজা খোলা—

তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলাম।—কিন্তু কাহাকেও সে দেখি না!

ডাকিলাম, "গৌরী?"

সাড়া পাইলাম না। ঘরের কোলের দালান পার হইয়া উঠানে নামিয়া বাহিরে আসিলাম!

দেখি, বাহিরের দরজাও খোলা, কিন্তু গৌরী সেখানে কোথাও নাই!

আবার একবার ডাকিলাম।

কিন্তু বৃষ্টির ঝম্ ঝম্ শব্দ ভেদ করিয়া সে ডাক বেশী দূর গেল না।

হঠাৎ একটা ভয়ানক সন্দেহে যেন গলা পর্য্যন্ত শুকাইয়া উঠিল। দ্রুতপদে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়া গৌরীকেই শুধু ডাকিতে লাগিলাম।

জামাই যে একদিন পলাইবেই ইহা ত জানা কথা—কিন্তু গৌরীকে না দেখিতে পাইয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিলাম।

চীৎকার করিতে থাকি আর দুজনকে খুঁজিয়া বেড়াই।

কিন্তু কোথায় গৌরী আর কোথায়-বা জামাই!

শূন্য বাড়ীখানার অবস্থা দেখিলে মন হু হু করিয়া ওঠে।

তাড়াতাড়ি পথে নামিয়া আসিলাম।

গত রাত্রে গৌরী বলিয়াছিল, 'ইচ্ছে হলে এক পলকে ছেড়ে যেতে পারি।'

অবসন্ন পায়ে পথ চলিতে চলিতে সেই কথাটাই বারে বারে মনে পড়িতে লাগিল।

কিন্তু জামাই?

এ কাজে তার অধিকার থাকিতে পারে কিন্তু গৌরব আছে কি?
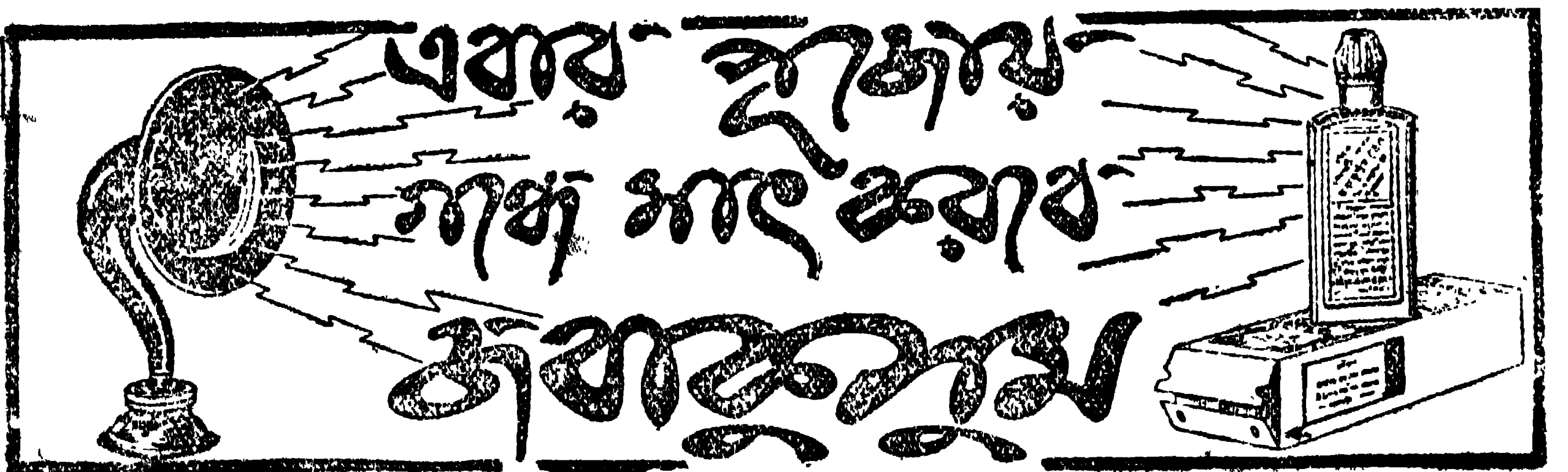
রাজু-পণ্ডিত

—পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর—

। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৪

বাবাজীবনকে বাঁচাইতে অধর কুণ্ড টাকার শ্রাদ্ধ করিলেন। অনেকেরই পকেট পূর্ণ হইল। উকিল ভরসা দিল, নীচের আদালতে যাই কেন হোক্ না, আপিলে তাহা টিকিবে না।

নীচের আদালতের হাকিম, চাকরি-জীবনে উন্নতি কামনা করিতেন, অতএব ব্যাপারটাকে সহজে শেষ হইতে দিলেন না। তিনি নিজেই হরেকৃষ্ণকে জেরা করিলেন।

জেরাতে হরেকৃষ্ণ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

রাজুকে মেনকা কলির যুধিষ্ঠির বলিত, সে-তারিফ সে আদালতের কাছেও পাইল এবং তাহার সাক্ষ্যের সূত্র ধরিয়া বিচারক এমন সকল প্রশ্ন হরেকৃষ্ণকে করিলেন যাহাতে সে কখনো বা ভয়ে দিশাহারা হইল, কখনো বা রাগিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল।

উকিল তাহাকে বারবার করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, ভয় কিম্বা রাগ করিয়া কোন উত্তর দিবে না। হরেকৃষ্ণ সে কথা মনে রাখিতে পারিল না।

বাম বাহুর রক্ষা-কবচ দক্ষিণ হস্ত দিয়া স্পর্শ করিয়া প্রশ্নের উত্তর দিবার কথা মেনকা তাহাকে পাখী পড়াইবার মত করিয়া শিখাইয়াছিল—সময়ে সে কথাও সে একেবারে ভুলিয়া গেল।

হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন, দুর্গাদাস কি অপরাধ করেছিল ?

হরেকৃষ্ণ উত্তর করিল, অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ।

এত বড় অপরাধ যে তুমি তাকে মেরে ফেল্‌তেও দ্বিধা বোধ করলে না ?

উকিল এ প্রশ্নে আপত্তি করিল। কিন্তু হরেকৃষ্ণ ক্রোধভরে বলিল, এত বড় আস্পর্দ্ধা ? ব'লে কিনা আমি শূদ্দুর !

তোমাকে যদি কেউ শূদ্র বলে তো তুমি তাকে মেরে ফেল্‌তে পার ?

হরেকৃষ্ণ মনে করিল বিচারক এই প্রশ্ন তাহার দৈহিক বলের পরিচয় পাইবার জন্যই করিয়াছেন, অতএব সে বুক ফুলাইয়া উত্তর দিল, তা' আর পারিনে, অমন সাতটাকে এক চড়ে ভবনদীর পারে পাঠিয়ে দেবার বল আমার আছে……

উপস্থিত সকলের হাস্য-কোলাহলে বিচারালয় ধ্বনিত হইয়া উঠিল, কেবল অধরচন্দ্রের চক্ষু হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িল। জামাতার নির্বুদ্ধিতার আর তুলনা ছিল না।

উকিলের ধমকে উল্টা ফল ফলে! হরেকৃষ্ণ এমন আড়ষ্ট হইয়া কথার উত্তর দেয় যে, সকলেই পরিষ্কার বুঝিতে পারে যে সে সত্য গোপন করিতেছে।

অতএব ব্যাপারটা মানুষের চেষ্টার সীমার বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। উকিল আইনের পথ ত্যাগ করিয়া অপরাধীর বুদ্ধির উপর ইঙ্গিত করিয়া মামলা খাড়া করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অধর সেইদিন বাড়ি ফিরিয়া আর জল স্পর্শও করি

তারপর বিছানা হইতে অনেক সাধা-সাধি করিল; কিন্তু অন্ধকারে নিঃশয্যাত্যাগ করিলেন না। বলিলেন, মা, ম্যাগ্নাকৃষ্ণের বুদ্ধির কথা মনে করলেও জীভ পেটের মধ্যে চ'লে যায়, মানুষের মধ্যে এত বড় নির্ব্বোধও জন্মায়!

হরেকৃষ্ণ ঘরে আসিয়া স্ত্রীর নিকট অনেক লম্বা চওড়া করিয়া নিজের বুদ্ধি এবং কেরামতির বড়াই করিল। বলিল যে হাকিম তাহাকে নিশ্চয় ছাড়িয়া দিবে। আর যদিই বা না ছাড়ে তো উকিল বলিয়াছে আপীলে নিশ্চয় খালাস।

মেনকা দুঃখের মধ্যেও হাসিয়া ফেলিয়া তাহাকে ভৎসনা করিল, বলিল, কি যে কথা কও তার কোন মাথা-মুণ্ড নেই......আমি শুনেছি সব, বাবার কাছে।

জেলে এক পা বাড়াইয়া দিয়াও হরেকৃষ্ণ এমন আত্ম-প্রসাদে পূর্ণ হইয়া উঠিল যে তাহাকে আদালতের পেয়াদা পর্য্যন্ত কৃপার চক্ষে দেখিল, কিন্তু যার মন চাঙ্গা—তার কাছে নর্দ্দমাও গঙ্গা!

সেদিন ছুটির বার, তাই অধর উকিল-বাড়ি যাইবার জন্য গা-ঝাড়া দিয়া সাত সকালে উঠিলেন না,—এই কথাই বাড়ির লোক মনে করিল। তাঁহার অজস্র অর্থ-ব্যয়, দৈহিক পরিশ্রম, এবং অতিরিক্ত মানসিক উদ্বেগের কথা সকলেই জানিত; অতএব সেদিন তাঁহাকে নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইতে দেখিয়া সবাই যেন মনে মনে আরাম বোধ করিল; এমনি একটা বিশ্রাম যে তাঁহার একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু ক্রমেই বেলা বাড়ে, অধরের উঠিবার কোন লক্ষণই দেখা যায় না। তখন সর্ব্ব-প্রথমে মেনকার যেন তাহা ভাল বোধ হইল না; সে বার বার পা টিপিয়া ঘরের মধ্যে যায়, খাটের পাশে চুপ্ করিয়া দাঁড়ায়; অধর গভীর ঘুমে মগ্ন, আস্তে আস্তে নাকও ডাকিতেছে!

কোন ভয়ের কথা মাকে বলিতে তাহার সাহস হয় না। এমনি কান্না-কাটি জুড়িয়া দিবেন যে পাড়ার লোক আসিয়া জড়ো হইয়া পড়িবে।

হরেকৃষ্ণ ঘরে ছিল না। নিজের অশেষ বাহাদুরীর কথাই বোধ হয় পাড়ায় প্রচার করিতে বাহির হইয়াছিল। মেনকা তাই গিয়া রাজুকে ডাকিয়া আনিল।

রাজু দেখিয়া শুনিয়া ভাল বুঝিল না। মেনকাকে বলিল, ঘুম ভাঙ্গাবার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌লে হয় না?

মেনকা ডাকিল, বাবা, বাবা।

অধর উঁ উঁ করিয়া উত্তর দিলেন বটে কিন্তু বার কোন চেষ্টাই লক্ষিত হইল না।

ডাক্তার আসিয়া বলিল, সন্ন্যাস-রোগ।

মেনকা বুঝিল, এই রোগের কি কারণ। পুত্রহীন পিতা অপত্য-স্নেহে যে মানুষটিকে বুকের কাছে টানিতে চাহিয়াছিলেন তাহার অমানুষ পশুর অধম ব্যবহারে তাঁহার হৃদয় চূর্ণ হইয়া গেছে!

দুঃখে এবং রাগে তাহার মনে হইল যে হরেকৃষ্ণের জেলই উপযুক্ত স্থান; এবং বিধাতার অমোঘ বিধানে তাহার সুনিশ্চয় ব্যবস্থা এইবার হইল। কে আর তাহার পিছনে প্রাণপাত করিবে?

সত্যই হরেকৃষ্ণের জেলের হুকুম হইল। বোধ করি, তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য বিচারক কিঞ্চিৎ কৃপাপরবশ হইয়া শাস্তির মেয়াদ কতকটা অল্প করিয়াই ধার্য্য করিলেন। অবশ্য উকিলে বলিল, একদিনও টিকবে না আপীলে। কিন্তু আপীলের ব্যবস্থা করে কে?

অধর উঠিতে-বসিতে যদিও পারিলেন, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধির পর্দ্দা আর সাফ্ হইল না। শিশুকে যেমন করিয়া লালন-পালন করিতে হয়, তেমনি করিয়া মেনকা তাঁহার সেবায় মন-প্রাণ ঢালিয়া দিল।

একদিন রাজু মেনকাকে বলিল, তোমার বাবার অবস্থা যা দাঁড়ালো, তাতে শীঘ্র কিছু তিনি সেরে উঠবেন না; কিন্তু তাই ব'লে হরেকৃষ্ণের আপীলের কোন একটা ব্যবস্থা তো করতে হয়।

মেনকা হয় তো একটু লঘু ভাবেই কহিল, কে করবে ও সব রাজুদাদা? বাবার অসুখের পর ও কথা আমাদের মনে করবারও ফুরসৎ নেই!

কথাগুলি সত্য, তাই তীব্র ভাবে রাজুর চিত্ত বিদ্ধ করিল। সে কোন কথার উত্তর না দিয়া ম্লান মুখে বাড়ি গিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইল।

মেনকা তাহা বুঝিয়াছিল, কিন্তু তাহার মন এতখানি তিক্ত হইয়াছিল যে ঐ কথার আলোচনা করিতেও তাহার মন চাহিত না।

হরেকৃষ্ণের স্বাস্থ্যের দিক দিয়া জেল তাহার পক্ষে কিছু মাত্রই ভয়ের কারণ নহে। এক-জীবনে অর্থাভাবের সকল দুঃখই তাহার সহ্য করা অভ্যস্ত ছিল। বাকি অপমান বোধ?

মেনকা হাসিল; সেটুকু যদি থাকবে তো—আজ এমনটাই ঘটে কি ক'রে!

লোকে মেনকাকে নির্দয় কঠিন কঠোর, স্ত্রীর অনুপযুক্ত যে না বলিত তাহাও নহে; কিন্তু সে রাগ করিত না। মনে মনে বলিত, বলা ত খুব সহজ; কিন্তু যদি ঐ-মানুষ নিয়ে সত্যিকার ঘর করতে হতো তো আমি নিশ্চয় ক'রে ব'লে দিতে পারি যে, যে মানুষেরা ঐ কথা বলে তারাই পাগল হয়ে যেতো!

রাজু উকিল-বাড়ি গিয়া বুঝিল যে যথেষ্ট কায়িক হায়রানির উপর আপীল করিতে অনেকগুলি টাকাও খরচ করিতে হয়।

পরিশ্রম করিতে সে পিছ-পা নয়; কিন্তু টাকা আসে কোথা হইতে?

মেনকার কাছে টাকা চাহিতে তাহার লজ্জা করিল; তাই সে স্থির করিল, না হয় নিজের বাড়ি-ঘর বাঁধা রাখিয়াও টাকাটা সংগ্রহ করিবে।

কয়েকদিন সেই চেষ্টায় ঘুরিয়া রাজু ব্যর্থ মনোরথ হইয়া উকিলের কাছে গিয়া বলিল, আপনি আমার বাড়ি-ঘর বন্ধক রেখে টাকাটা দিন, আমি মাসে মাসে সুদ দিয়ে যাবো, আর দু-বছরের মধ্যে শোধ করতে না পারি তো, বিক্রি ক'রে শোধ ক'রবো।

উকিল হাসিল, তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন হে? থাক্ না গোঁয়ারটা দিন কতক জেলেই!

রাজু পুরানো কাহিনী বার বার বলিতে লজ্জা বোধ করিয়া বলিল, ওর জন্যে আমার বড় দুঃখ হয়।

তোমার পরম-বন্ধু কিনা!

উকিলের কঠিন বিদ্রূপের হাসি তাহার সহ্য হইল না; নিরুপায়ে সে ঘরে ফিরিল।

মেনকা তাহাকে ফিরিতে দেখিয়াছিল, সে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সকালে কোথায় গিয়েছিলে রাজুদা? ইস্কুল না হয় বন্ধ; কিন্তু তাই ব'লে কি খাওয়া দাওয়া নেই?

রাজু অপ্রস্তুত হইল, বলিল, তুমি শুন্‌লে ঠাট্টা করবে।

মেনকা বলিল, বল্‌তে হবে না, আমি জানি। উকিল-বাড়ি গিয়েছিলে তো?

রাজু কথা কহিল না; কিন্তু তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

মেনকা তাহার কাছে গিয়া বসিয়া বলিল, ছিঃ কেঁদনা, রাজুদা; পুরুষের কি এমন ক'রে কাঁদতে আছে? মন শক্ত কর। যে কথার এক বিন্দু বিসর্গও সত্যি নয়, তাই নিয়ে ভেবে ভেবে তোমার কি চেহারা হ'য়েছে—তা তুমি জান?

রাজুর দুই গণ্ডের উপর দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া চোখের জল গড়াইয়া পড়িল।

মেনকা শুনিয়াছিল যে রাজু বাড়ি-বাঁধা দিবার চেষ্টা

করিয়া ফিরিতেছে। সে কথা শুনিয়া অবধি রাগে তাহার অন্তরটা যেন পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছিল। তাই পরিপূর্ণ অভিমানে বলিল, টাকা আমি তোমায় দিচ্চি, আমার হাতের গয়না বিক্রি ক'রেও না হয় দেব; কিন্তু তুমি কি ব'লে বাড়ি বাঁধা দিতে চাচ্চ, শুনি? চেয়েছিলে কি আমার কাছে টাকা?

রাজু চোখের জল মুছিয়া বলিল, টাকা কি তোমাদের এ বিপদের সময় চাওয়া যায়?……আর তবে, আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত……

মেনকা জ্বলিয়া উঠিল, ফের্ ঐ এক কথা! আর যদি তোমার মুখ থেকে ঐ কথা শুনি কোন দিন্ তো নিশ্চয় বিষ খাবো; এই তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌চি রাজুদা তুমি বামুন, আর আমি এখনো জল স্পর্শ করিনি!

মেনকার দুই চক্ষু হইতে যেন অগ্নির জ্বালা বাহির হইল।

ভয়ে বিস্ময়ে রাজুর চক্ষু নিমেষে শুষ্ক হইয়া উঠিল; সে অবাক হইয়া মেনকার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, মেন্‌কি, তুই যে পাগল হয়ে যাবি!

আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে মেনকা প্রায় ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

হরেকৃষ্ণের আপীলের কাগজ-পত্রের বস্তা রাজুর হাতে দিয়া মেনকা বলিল, টাকার জন্যে তুমি কিছু ভেবনা রাজুদা, শুধু একবার উকিলের কাছে ঠিক ক'রে জেনে এসো কত আন্দাজ খরচ পড়বে। ব্যবস্থা হবেই কোন রকমে।

বস্তা বগলে করিয়া বাড়ি আসিয়া সে আলো ধরাইয়া কাগজগুলি গোছ-গাছ করিতে লাগিল। অনেক বাজে কাগজও তাহার মধ্যে কেমন করিয়া আসিয়া পড়িয়াছে।

কাগজ সাজাইতে সাজাইতে রাজু মনে মনে বলিল, তোকে আমি খুব চিনি, মেন্‌কি। এ সব আমার পরীক্ষা চ'লছিল! আপীল না ক'রে তুই চুপ ক'রে থাক্‌তে পারিস্?……এমন দেখায়! যেন স্বামীর জন্যে কোন ব্যথা, কোন দুঃখ ওর মনে নেই!……তাই কি আর হয়?……অসম্ভব।

একখানা খামের মধ্যে এক তাড়া কাগজ বাহির হইল, খামের উপর অধর লিখিয়া রাখিয়াছেন, শেষ উইলের খসড়া।

রাজু আরম্ভে কতকটা অন্যমনস্ক ভাবে তাহা পড়িতে সুরু করিয়াছিল, কিন্তু কয়েক লাইন পড়ার পর তাহার কৌতূহল বাড়িয়া উঠিল।

নূতন উইল করিবার হেতু দেখান হইয়াছে দুর্গাদাসের অকস্মাৎ মৃত্যু। কি কারণে মৃত্যু হইয়াছে তাহার কোন উল্লেখ নাই, শুধু বলা হইয়াছে যে দুই বিধবা ইহাতে একেবারে নিঃসহায় হইয়া পড়িলেন! অতএব তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার কন্যা বিষয়ের আয় হইতে বিধবাদের ভরণ-পোষণ উপযোগী ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য রহিল।

তারপর কন্যাকে নিজের ইচ্ছা জানাইয়া বলিয়াছেন, এই বিষয়ে তুমি সর্ব্বদা শ্রীযুক্ত রসরাজ রায়ের উপদেশ এবং নির্দ্দেশ মত কাজ করিবে। যেহেতু তাহার মত পরোপকারী যুবক কদাচিৎ দৃষ্ট হয়……

রাজু আর কিছুতেই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নিজের মনে বলিল, উঃ, এ দুনিয়াতে মানুষ চেনা কি শক্ত! কোনদিন কল্পনাতেও আন্‌তে পারিনি যে অধর কুণ্ডুর মত লোক এত বড় সহৃদয়তা দেখিয়ে যেতে পারে!

পরের দিন রাজু উকিল-বাড়ি হইতে ফেরৎ আসিয়া উইলের নকল খানা লইয়া মেনকার সহিত দেখা করিতে গেল।

কি খবর রাজুদাদা?

রাজু বলিল, উকিল সকল ভার নিয়েছেন; আপাতত তাঁকে কিছু টাকা দিয়ে আস্‌তে হবে। আপীল করতে

হ'লে হাকিমের রায়, সাক্ষিদের জবানবন্দীর নকল নিতে হয়। টাকা কুড়ি পঁচিশ্ হ'লেই চল্‌বে এখন।

বেশ, তা তুমি কাল দিয়ে এসো গিয়ে; আজই তোমাকে টাকাটা দিয়ে দি?

তা দাও।

টাকা দিতে দিতে মেনকা জিজ্ঞাসা করিল, ওটা কিসের কাগজ রাজুদাদা?

এটা? এটা তোমার বাবার একটা উইলের নকল। বোধ হয় কাগজ-পত্রের সঙ্গে ভুল ক'রে চ'লে গিয়েছিল।

তুমি প'ড়ে দেখেছ?

রাজু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হুঁ।

বেশ ক'রেছ। ভুল করে যায় নি, আমি ওটা ইচ্ছে করে দিয়ে দিয়েছিলাম।

রাজু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

মেনকা একটু হাসিল, বলিল, ভাবচো বুঝি, মেন্‌কি এটুকুও কথা চেপে রাখতে পারে না?

দূৎ, তা ভাব্‌তে যাবো কেন?

তবে?

তোমার বাবার কথা।

মেনকা বলিল, তার চেয়ে আর একটু বেশী ভাবতে হবে। বাবা এদিকে ওদের কি দিয়েছিলেন তা তো জানিনে; তবে আমাদের কি দিতে হবে, তা তো তুমিই ব'লে দেবে।

রাজু বলিল, উইল মত কাজ—ওঁর অবর্ত্তমানে হবে......

মেনকা বলিল, তাই কি হয় রাজুদা? ওঁদের দিন চল্‌বে কি ক'রে?

রাজু হাসিল, দুর্গা না জানি কতই উপার্জ্জন ক'রতো......

তা ঠিক, তবুও আমাদের কর্ত্তব্য করতে হবে।

বেশ কাল তোমাকে ব'লবো।

রাজু উঠিল; কিন্তু যেন কি বলিবে বলিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

কিছু ব'লবে রাজুদা?

একটা কথা......একদিন হরেকৃষ্ণকে দেখে এলে হয় না? .....উকিল বলছিলেন......যদি কিছু বলার থাকে তার......তাই ব'লছিলাম......

মেনকা একটু হাসিয়া বলিল, বেশ তো একদিন গিয়ে দেখা করে এসো তোমার বন্ধুটির সঙ্গে।

১৫

রাজু সেদিন আর অন্ন গ্রহণ করিতে পারিল না।

হরেকৃষ্ণের কৃশ-মলিন চেহারা; গলায় তারে-বাঁধা কাঠের নম্বর-মারা তক্তি দেখিয়া তাহার হাত-পা যেন পেটের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। মনুষ্যত্বের এত বড় অপমান সে কল্পনাতেও চিন্তা করিতে পারে নাই।

হরেকৃষ্ণের চক্ষের দৃষ্টি মোটেই স্বাভাবিক নহে। সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যেন সেখানে জন্ম লাভ করিয়া সুযোগের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে! একবার ছাড়া পাইলে সে কাহাকেও ক্ষমা করিবে না।

রাজুর বই-পড়া বিদ্যা ছিল না বটে; কিন্তু মানব-শিশুর সহিত নিত্য-ব্যবহার করিয়া সে বুঝিত যে, অপমানে অপমানে মরীয়া করিয়া দিলে মানুষের কোন কল্যাণ হয় না; তাহাকে পতনের মুখে ঠেলিয়া দিয়া মানুষের পরম শত্রু করিয়া তোলা হয় মাত্র।

হরেকৃষ্ণের ভিতরে মানুষের চির-শত্রুর মূর্ত্তি দেখিয়া রাজুর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

হরেকৃষ্ণ বেশী কথা কহিল না। আপীলের কথা জিজ্ঞাসা করায় সে হাসিল। সে হাসির মধ্যে গভীর ব্যথা আর তীব্র জ্বালা নিহিত।

সে হাসি যেন পরিষ্কার বলিয়া দিল, তাহাতে ফল কি? লাভই বা কাহার? আমাকে তোমাদের কৃপা-

করুণা হইতে রক্ষা কর। জীবনের তিক্ত-রসের মধ্যে যে নিষ্ঠুর আনন্দ আছে—তাহার আকণ্ঠ রস গ্রহণ করিতে দাও; তোমরা এমন করিয়া আর আমার অপমানের উপর লাঞ্ছনার বোঝা চাপাইও না।

সঙ্গে উকিল বাবুও ছিলেন। তাঁহার কয়েদি দেখার অভ্যাস ছিল; তাহাদের অসহায় অবস্থা লইয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতেও গায়ে লাগিত না। তাই তিনি বলিলেন, আপীলে ছাড়া পেলে ব্যাটা বেরিয়ে এসে আবার কাউকে খুন করবে। চোখ দেখ্‌লে আর একটুও ভুল থাকে না; ব্যাটা একদম খুনে!

এই কথা শুনিয়া রাজুর মন কান্নায় ভরিয়া গেল। কত বড় অবিচারের কথা এই!

ফিরিতে ফিরিতে রাজুর মন দুশ্চিন্তায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। হরেকৃষ্ণের অপমানে লাঞ্ছনায় কেন যে সে এত খানি বিচলিত হইয়াছে তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া উঠিতে সে কোন ক্রমেই পারিত না। এই অবিজ্ঞাত রহস্যের কিন্তু সহজ সমাধান আসিত তাহার মনের সেই সোজা পথ দিয়া—দুর্গাকে রাজু মারিয়াছিল বটে; কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারের মূল-প্ররোচনার সেই তো আদিভূত কারণ। স্বভাব-কবি দুর্গা তাহা বুঝিয়াছিল—তাই তো ছড়ার মধ্যেও খেজুর ছড়ির উল্লেখ!

কিন্তু একথা মেনকাকে বলিবার আর কোন উপায় ছিল না। সে যে কেবল ইহা অবিশ্বাস করিত, তাহা নহে; একথা কাহাকে বলিতে শুনিলে তাহার দুই চক্ষু দিয়া অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইত। তাই রাজুর অসীম দুর্ভাবনা হইল, কেমন করিয়া মেনকার সহিত দেখা হইবার পূর্ব্বে নিজেকে সম্পূর্ণ সম্বৃত করিবে!

সে একান্ত মনে প্রার্থনা করিল, যেন শীঘ্র মেনকার সহিত দেখা না হয়।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া রাজু এই প্রার্থনা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল সত্য; কিন্তু সেখানেও তাহার নিস্তার ছিল না।

ঘুমের ভিতর সমস্ত রাত্রি রাজু স্বপ্ন দেখিল যে চার জন যমদূত তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া কণ্টকাকীর্ণ পথের উপর দিয়া হিড়-হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে বারম্বার প্রশ্ন করিল, কি পাপে তোমরা আমাকে এত কষ্ট দিচ্চ?

তাহারা কথা কহে না; কেবল হাসে! সে কঠোর অট্ট-হাস্যের নির্দ্দয় শব্দ কাণের পটহ ভেদ করিয়া মস্তিষ্ক ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়!

দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া তাহারা তাহাকে তুষার-পুরীতে লইয়া গেল। কি শীত! ঠাণ্ডায় হাত পা অসাড় হইয়া গেল; তুহিনের পঙ্ক-কুণ্ডে পড়িয়া ধীরে ধীরে তাহার চৈতন্য লুপ্ত হইল।

সেখান হইতে তাহাকে অগ্নি-পুরীতে লইয়া গিয়া একটা উত্তপ্ত তেলের কটাহে ফেলিবার উপক্রম করিতে সে চীৎকার করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল, না, না, আমি জীবনে......

তখন সকালের রৌদ্র জানালা দিয়া ঘরের দেয়ালে আসিয়া পড়িয়াছে!

পদীর মা ছুটিয়া আসিয়া রাজুকে ধরিয়া ফেলিল; একি সর্ব্বনাশ, জ্বরে যে গা পুড়ে যাচ্ছে! চোখ দুটো আগুনের মত টক্‌টকে লাল!

রাজু, অ-রাজু! কখন জ্বর হয়েছে?

রাজু হুঁ বলিয়া আবার অচৈতন্য হইয়া পড়িল।

পদীর মা ছুটিতে ছুটিতে মেনকাকে সংবাদ দিল; দেখ্‌বে এসো, তোমার রাজুদা কেমন যে করে!

মেনকা ভয় পাইল, রাজুদা, ও রাজুদা, সে ডাকিল। রাজু রক্তবর্ণ দুই চক্ষু খুলিয়া বলিল, উঁ। কিন্তু পরিষ্কার বোঝা গেল যে সে জ্ঞানে উত্তর দিতেছে না।

মেনকা মনে-মনে প্রলয় গণিল। তাহার বাবাকে লইয়া তাহার দিনের বেশী সময় কাটিয়া থাকে। এখন রাজুর এত বড় অসুখে কে তাহার দেখা-শুনা করে?

পদীর মার স্থূল-বুদ্ধির উপর নির্ভর করা চলে না।

অগত্যা তাহাকে কোন একটা উপায় বাহির করিতেই হইবে।

অনেক ইতস্ততঃ করিয়া সে দুর্গার মার কাছে গেল।

দুর্গার মা রন্ধন ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন অতএব গোড়ায় বড় একটা আমোল দিতে চাহিলেন না। মেনকা বলিল, একটা বড় দরকার আছে, যদি একবার বাইরে আস্‌তে পারতেন।

তিনি বাহিরে আসিলে মেনকা সকল কথা বলিল; এমন একটি লোক দেখিনে যে নিয়ম মত ওষুধ খাওয়ায়, মুখে একটু জল তুলে দেয়।

দুর্গার মা মলিন হাসি হাসিয়া বলিলেন, বুঝিতো সব, কিন্তু আমাদের হয়েছে সেই মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল। তা ছাড়া ঠাকরুণকে অষ্ট প্রহরই দেখা-শোনা করতে হয়। কোথায় মা, আমার সময়? তা ছাড়া বিধবা মানুষ, রাত বিরিতে বাড়ির বাইরে যেতে সাহস হয় না, মা।

মেনকা বুঝিল।

সে বাড়ি ফিরিয়া বাহিরের ঘরখানি ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া পরিষ্কার করিয়া একটা বিছানা করিয়া মার কাছে গেল।

মা, রাজুদার ভারি অসুখ ক'রেছে।

কবে থেকে মেন্‌কি?

বোধ হয় কাল রাত থেকে হবে; মা, একেবারে জ্ঞান চৈতন্য নেই; কি হবে?

বৃদ্ধা দিশাহারা হইয়া বলিলেন, তাইতো কি হবে এখন?

বাবা ভাল থাক্‌লে আমি গিয়ে পড়ে থাকতুম, তা' যেই যা' ব'ল্‌তো; কিন্তু সে উপায়ও ত নেই।...তাই মনে করছি, রাজুদাকে আমাদের বাইরের ঘরে নিয়ে আসি।

মেনকার মা এতবড় সাহসের কথা কল্পনাতেও আনিতে পারেন নাই; তাই অবাক হইয়া মেনকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; অবশেষে বলিলেন, আন্‌বি?

আন্‌বো না মা? আজ যদি রাজুদার মা বেঁচে থাক্‌তেন ত' অন্য কথা ছিল; কিন্তু......তার জন্যে আমরাই ত দায়ী!

বৃদ্ধা শুব্ধ হইয়া রহিলেন।

পদীর মা ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল, বল্লে এখুনি আস্‌বে।

মেনকা রাজুর মাথায় জলের পটি দিয়া বাতাস করিতেছিল, বলিল, তুই এমনি ক'রে আস্তে আস্তে হাওয়া কর্‌, আমি একবার চট্‌ ক'রে বাবাকে খাইয়ে আসি...... এর মধ্যে ডাক্তার বাবু এলে তুই ডাক্‌ দিস্‌......বুঝলি পদীর মা?

পদীর মা বিড়-বিড় করিয়া কি বলিতে বলিতে নিতান্ত অনিচ্ছায় বসিল; তাহার রান্না চড়াইবার সময় বহিয়া যায়। মেনকা চলিয়া গেলে সে তবুও বকিতে লাগিল, বলেছিলুম যে ছেলের বে' দাও; কেমন ফ'ল্লোনা আমার কথা?.

ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল, জ্বরটা তো খুবই বেশী, বিকার আছে; ছাড়তে অন্ততঃ সাতদিন তো নেবেই।

সাত দিন? চক্ষু বড়-বড় করিয়া মেনকা জিজ্ঞাসা করিল।

এ সব জ্বরের ঐ রকম গতিক; আর ভারি হেফাজতের দরকার হয়; কেই বা তেমন দেখা শোনা করে!......পদীর মার দিকে চাহিয়া বলিল, তোকে রাত দিন থাক্‌তে হবে......নইলে......

মেনকা বলিল, কোন রকমে আমাদের বাইরের ঘরে নিয়ে যাওয়া যায় না, ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, একটা ষ্ট্রেচার হ'লে পারা যায়।

সে কি জিনিষ?

ডাক্তার বুঝাইয়া বলিল।

আপনার বাড়ি নেই ?

ডাক্তার হাসিল, আমার কিসের দরকার ?

ডাক্তার চলিয়া গেল।

মেনকা যেন চারিদিক অন্ধকার দেখিল। কেমন ক'রে রাত কাট্‌বে ?

পদীর মা চলিয়া যাইতে চায়।

কিন্তু, তুই ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ফিরে আয়।

পদীর মা এবার রাগ করিল, যাবো, রাঁধবো-বাড়বো—তবে ত' আসবো ?

সে কথাও ত' ঠিক। আচ্ছা তুই যা, যাবার সময় ভগাকে একবার ডেকে দিয়ে যা।

পদীর মা চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাঁশ কাটিয়া, মেনকার নির্দ্দেশমত চট শেলাই করিয়া ভগা এক অভিনব ষ্ট্রেচার তৈরী করিয়া বসিল।

লোকের উপর লোক পাঠাইয়া ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিয়া মেনকা রাজুকে ঘরে আনিল।

সকলেই বুঝিল যে মেনকা জিদ্ ধরিলে তাহা করিবেই করিবে। বড়-মানুষের মেয়ে কিছুরই ত' অভাব নেই!

অন্যের বিপদে যে নিজেকে অকাতরে ছাড়িয়া দিতে পারে, তাহাকে দেখিবার, তাহার মুখে এক গণ্ডুষ জল দিবার কথা কাহারো মনে পড়ে না! অদৃষ্টের একি নির্ম্মম পরিহাস! এ অবিচার যে একেবারে অসহ্য!

মেনকার মুখে হাসি দেখা দিল; উৎসাহে যেন নিমেষে তাহার দশ হস্ত বাহির হইয়া আসিল।

রাজু বাঁচিল।

মেনকার অহঙ্কার করিবার কোন মূল-ধনই ছিল না। পুরাণকাহিনীতে যমের সহিত মানুষের এমন সকল লড়াই-এর কথা আছে। যম প্রসন্ন হইয়া সতীকে বরদান করিয়াছিলেন। সেই বরে সত্যবান আবার জীবন লাভ করিলেন।

এখানে যম প্রসন্ন হইয়াছিলেন কি অপ্রসন্ন হইয়াছিলেন, জানা নাই; তবে মেনকার ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত প্রিয়জনের সেবা যে ব্যর্থ হয় নাই—ইহা অস্বীকার করিবারও পথ দেখি না।

রাজু বাড়ী ফিরিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিল।

মেনকা রাগ করিয়া বলিল, মনে কর তোমার বাড়ি নেই; বন্ধুর আপীলে তা বিক্রি ক'রে দিয়েছ। এখন, সেই বন্ধুর সহধর্ম্মিণী যদি তোমায় আশ্রয় দিয়ে থাকে ত' রাজুদা, তার কি মস্ত বড় অপরাধ হয় ?

রাজু চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, যেদিন হেঁটে' চ'লে যাবার মত পায়ে জোর হবে……রাজু এমনি সব কথা বারবার করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার সঙ্কল্পকে দৃঢ় করিয়া তোলে।

তাহার মনের কথা বুঝিয়া মেনকা মুখ টিপিয়া হাসে; একবার ঘর হইতে চলিয়া যায়, আবার যেন কত কাজের তাড়ায় ঘরে আসিয়া বলে,

একটা কথা তোমাকে বলা হয় নি কিন্তু রাজুদা।

কি রে ?

তোমার বাড়ীটা ভগাকে দিয়ে মেরামত করাচ্ছি।

কেন ?

ওটায় এবার ভাড়াটে বসাব কিনা ?

রাজু পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলে, তোর যা ইচ্ছে হয়, কর্; আমি তোর সঙ্গে পেরে উঠ্‌বো না।

মেনকা হাসিয়া বলে, ছিঃ, অমন কথা ব'ল্‌তে নেই রাজুদা, তুমি যে পুরুষ মানুষ!

রাজু কি উত্তর করিবে ভাবিয়া পায় না।

রাজু জিজ্ঞাসা করিল, আজ কি বার মেন্‌কি ?

কেন বলত' রাজুদা ?

তাই বলছি ; বলিয়া রাজু চুপ করিয়া রহিল।

মেনকা কাছে আসিয়া বলিল, আজ যে বুধবার রাজুদা ; কেন ?

আর চারদিন পরে তা হ'লে পাঠশালা খুলবে ; তাই ভাবচি, চারদিনে কি তেমন জোর পাব ?

মেনকা হাসিল, তা আর পাবে না ? আর যদি নাই পাও ত' আর কেউ ক'দিন কাজ করে দেবে।

কে করতে যাবে, ও কাজ ?

তা কি আর লোক পাওয়া যাবে না ?

কে ?

কেন, পাঁচকড়িদা, হরিশদা।

দূৎ, বলিয়া রাজু মুখ ফিরাইল, ওরা করবে না, আর পারবেও না।

ইস্! মস্ত বড় বিদ্বানের কাজ কিনা ? আমরাও পারি।

তুই পারলেও পারতে পারিস্ কিন্তু ওরা পারবে না। ও যে বড় ধৈর্য্যের কাজ, বড় সইতে হয়......মেরে ধরে একেক্কার করে দেবে।

মেনকা বলিল, ভালই ত'। মনে নেই আমাদের গুরু মশাইকে ? না মেরে-মেরে তুমি ত' ছেলেদের মাথা খাচ্ছ !

অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া রাজু 'তাইতো' বলিয়া সজোরে নিশ্বাস ফেলিল ; এই চার দিনের মধ্যে আমাকে খাড়া হতে হবেই হবে।

মেনকা কথা না কহিয়া হাসিল।

আবার খানিক পরে রাজু ডাকিল, মেনকা।

কি রাজুদা ?

আমার ক'দিন অসুখ হয়েছে ?

কেন ? তার হিসেব তোমার নেই ?

রাজু অনেক চিন্তা করিয়া বলিল, রবিবার রাত্রে জ্বর হয়, তা হ'লে চার দিন......

বটে! বলিয়া মেনকা হাসিল।

তবে ?

এগার দিন।

রাজু উত্তেজনায় উঠিয়া বসিল, বলিস্ কি ? পাঠশাল খুলে গেছে ? ইস্ কি অন্যায় হ'লো !

কিছু অন্যায় হয়নি রাজুদা, ওরা ত' তোমার কাজ ক'রে দিচ্চে।

রাজু মেনকার মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, এ ব্যবস্থাও বোধ হয় তোমার ?

মেনকা লজ্জায় সেখান হইতে চলিয়া গেল।

রাজুদা।

কি মেনকা ?

আজ তুমি পথ্যি ক'রবে।

রাজু ফিরিয়া দেখিল, মেজের উপর ঠাঁই করা ; আসনের সাম্‌নে ভাতের থালা দিয়া দুর্গার মা দাঁড়াইয়া আছেন।

রাজু খাইতে বসিল ; দুর্গার মা চলিয়া গেলেন।

খাইতে খাইতে রাজু বলিল, আজ যে ডাক্তারের এত দয়া ?

ব'লেছিল, তেরোদিন না গেলে—কিছুই বলা যায় না......কেমন লাগে খেতে রাজুদা ?

রাজু হাসিল, বলা বাহুল্য।

খাওয়ার পর কিন্তু ঘুমুতে পাবে না আজ, ডাক্তার ধরে মানা করে দিয়েছে।

ঘুম ত' পেযে আস্‌চে রে।

তা হবে না—বলিয়া মেনকা মাথা নাড়িল ; আমি ত' তোমায় ঘুমুতে দিলে।

কি করবি ?

শুতে দেবনা ; কাছে ব'সে বক্-বক্ ক'র্‌বো ; তোমাকে জেলের কয়েদিদের গল্প ব'লবো......

রাজুর সর্ব্বাঙ্গ যেন শিহরিয়া উঠিল ; হাসিমুখে

হাসিস্‌নে; যদি জান্‌তিস্!……রাজু জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মেনকা মৃদু হাসিয়া বলিল, কিছু জান্‌তে বাকি নেই রাজুদা; গলায় তারে বাঁধা তক্তি; তার নম্বর ৩২৭; নয় কি?

তুই গিছ্‌লি?

দূৎ……জ্বরের ধমকে তুমি কি বাকি রেখেছ বল্‌তে? সেরে ওঠো; তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া আছে।

বাড়ি ফিরিবার হুকুম পাইয়া রাজুর দেহে যেন শত-হস্তীর বল আসিয়া দেখা দিল। একান্ত আগ্রহে পরদিন প্রভাতের শুভক্ষণটির জন্য তাহার মন যে কতখানি প্রতীক্ষা করিয়া আছে তাহা বুঝিতে মেনকার একটুও বাকি রহিল না।

মেনকার বিষাদ-গম্ভীর মুখ দেখিয়া রাজু লজ্জিত হইল। যে ক'দিন তাহার তত্ত্বাবধানে সে ছিল সে ক'দিনের মত যত্ন সে, সত্য কথা বলিতে কি, মার হাতেও পায় নাই! তবুও মানুষের মন দুরধিগম্য রহস্যে পরিবৃত! এত সুখের বন্ধনের আবেষ্টন হইতে মুক্তির আনন্দই যেন বড় হইয়া উঠে! বিচ্ছেদের বিষাদ হয়ত' তাহাতে ছিল; কিন্তু তাহার সঞ্চার মনের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে অতি গোপনে! প্রকাশের রূঢ় আলোক সহ্য হয় না; আহত ধ্বনিতে যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে, অভিব্যক্তির রেখার একটা ক্ষীণ আঁচড়েও যেন তাহার বিপুল লজ্জা নিমেষে কে হরণ করিয়া বসে!

কৃপণের ধনের মত রাজু তাহাকে অপরিসীম যত্নে লুকাইয়া রাখিল!

ক্ষিপ্রতার সহিত হাতের কাজ সারিয়া লইয়া মেনকা সন্ধ্যার প্রাক্কালেই সমর ঘোষণা করিল। তাহার চোখের নিবিড়কৃষ্ণ দুটি তারা হইতে ক্ষণে ক্ষণে যে প্রভা নিসৃত হইতেছিল, তাহাকে রাজু ভাল করিয়া চিনিত! মেনকা তাহার আশৈশব সাথী; কত না হর্ষে, কত না কলহে সে দিনগুলি কাটিয়াছে!

বিছানার উপর শুইয়া চোখ দুইটি বন্ধ করিয়া—রাজু আলস্যবিজড়িত তন্দ্রার মধ্যে স্বচ্ছ স্বপ্নের মত একটি একটি করিয়া সেই সব দিনের ছবি দেখিয়া লইতেছিল।

শিয়রে বসিয়া কপালের উপর হাত রাখিয়া মেনকা ডাকিল, রাজুদা, ও রাজুদা! এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে?

নাঃ, বলিয়া রাজু মেনকার হাতখানি দুইহাত দিয়া ধরিয়া আদর করিয়া টিপিয়া দিল।

মেনকা হাত টানিয়া লইয়া বলিল, ওকি! রাজুদা?

রাজু হাসিল, বলিল, পাগলী! লাগলো?

লাগেনা?

নিবিড় ব্যথার হাসির মত, অন্ধকার ঘরে জানালার ফাঁক দিয়া পঞ্চমীর চাঁদের আলো, বিছানার একপাশে লুটাইয়া পড়িল!

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর মেনকা কহিল, কাল থেকে তুমি বাঁচবে, রাজুদা! কত কষ্ট পেলে ক'দিন! কি করবে বল? সবই কপালের ভোগ!

ব্যথার হাসির ধ্বনি মিলাইয়া রাজু উচ্চারণ করিল, কষ্ট!

স্তব্ধ জলের হিল্লোলের মত সেই ধ্বনিটি যেন ঘরের দেয়ালে গিয়া প্রতিহত হইয়া চতুর্দ্দিকে কাঁপিয়া ফিরিতে লাগিল! কষ্টো...কষ্টো...কষ্টো!...

মেনকা মনে সুখ পাইল।

সেই উত্তেজনায় সে বলিল, আচ্ছা রাজুদা, আগে তুমি আমাকে যত ভাল বাসতে, এখন তার আর একটুও বাস না, না?

রাজুর মুখের উপর হাসির একটা ক্ষীণ তরঙ্গের উচ্ছ্বাস খেলিয়া গেল—মেনকা তাহা দেখিতে না পাইলেও, তাহার অনাহত ধ্বনি যেন কাণে শুনিল।

কথা কইলে না যে?

রাজু আবার হাসিল, এ সবতো পাগলের প্রলাপ ; এর কি কোন উত্তর হয় ?

মেনকা একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, হুঁ পাগলই বটে ! এ সব জানি, গায়ে-তেল মাখা কথা, ধরা না দেবার ফন্দি !

রাজু গম্ভীর ভাবে বলিল, তবে তাই।

এই একটা সোজা কথার উত্তর দিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হ'তো শুনি ?

রাজু অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া একটা উত্তর গড়িল, তোকে আরো খুবই ভালবাসতুম, কিন্তু এখন যে আর বাসতে নেই, তাই বাসি নে।

মেনকা অধর চাপিয়া হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিল, কচি খুকি পেয়েছ আমাকে, না ?

তবে তুই কি বুড়ী ? তুই আমার কাছে তেমনিই আছিস,—তাই যদি চিরদিন থাকতিস......

রাজু কথা শেষ করিল না, নিস্তব্ধ ঘরে কিন্তু তাহার দীর্ঘনিশ্বাসটুকু অশ্রুত রহিয়াও গেল না !

মেনকাও নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সত্যি রাজুদা, বেশ হ'তো তা হ'লে—না ?

রাজু বলিল, কিন্তু যা হয়নি, তা নিয়ে দুখ্খু ক'রে লাভ নেই, ফলও নেই।...মেনকা, তোর জন্যে বড় দুঃখ হয়।

তা আর মিছে কেন কর ? আমার আশা-ভরসা, সবই ত শেষ হয়ে গেছে !

তাই ব'লে কি দুঃখের শেষ হয় ?

মেনকা বলিল, তা' আমার জন্যে ভাববার আর একজন তো আছে ?

রাজু বলিল, সেই কথাই তো ভাবি, কি তোমার কপাল !

থাক্‌গে রাজুদা, তুমি আর আমার কথা ভেবোনা ; সে অধিকারও তো তোমার নেই ; আমি পরস্ত্রী।

রাজু চুপ করিয়া রহিল।

খানিক পরে মেনকা বলিল, আচ্ছা রাজুদা, আমাদেরও অন্য পুরুষের কথা ভাবলে পাপ করা হয়, না ?

রাজু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তাইতো বলে শাস্ত্রে।

মেনকা বলিল, আচ্ছা শাস্ত্র কারা করেছিল ?

মুনি-ঋষিরা।

মুনি-ঋষিদের মনগুলো ছিল পাথরের মত শক্ত—কঠিন। মানুষকে তাঁরা মানুষ মনে ক'রতেন না ; যেন গরু-ছাগল !

ছিঃ মেনকা, তাঁদের নিন্দে করতে নেই।

তুমি কানে আঙ্গুল দেও রাজুদা, নইলে তোমার পাপ হবে ; কিন্তু আমি পাপী ; আমার নরকেও আর ভয় নেই......নরক তো দেখ্‌চি, এই ! আবার নতুন ক'রে নরক তৈরী করার দরকার তো দেখিনে !

রাজু মনে মনে শিহরিয়া উঠিল ; বিকারের ঘোরে যে নিদারুণ নরকের ছবি সে দেখিয়াছিল—কি ভয়ঙ্কর সে দৃশ্য !

মেনকা উঠিয়া ঘরের এক কোণে প্রদীপ সাজান ছিল, জ্বালাইয়া দিয়া আসিয়া, এবার একটু দূরে বসিল।

রাজু তেমনি নিশ্চেষ্ট ভাবেই পড়িয়া ছিল। মেনকা ডাকিল, রাজুদা, তোমাকে ভারি বিরক্ত করছি, না ?

রাজু একটু নড়িয়া চড়িয়া বলিল, মোটেই না ; কেবল দুঃখ হয় যে মানুষের হাতে কিছুই নেই......সবই যেন কার অদৃশ্য হাত দিয়ে ক'রে চ'লেছে......তাকে বাধা দিতে গেলে আমাদের দুঃখ বাড়ে, তাকে মাথা পেতে নিতে পারলে তবেই, শান্তি!

মেনকা একান্ত অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, তুমিই এ সংসারে সুখী রাজুদা ! যে সেই অদৃশ্য হাতের ওপর এতখানি নির্ভর করতে পারে, তার আর কিসের ভাবনা রইলো ?......কিন্তু আমিও তো, এই সমাজের মধ্যে জন্মেছি, বড় হ'য়ে উঠেছি, কিন্তু আমার মনে ও-বিশ্বাস কিছুতেই আসে না। আমার মনে হয়, অত খানি ঠিক-ঠিকানা বিশ্ব-বিধানে নেই ; অনেকখানি

বোধ করি, আমাদের হাতেও আছে!......যদি তাই সত্যি হ'তো তো—ধ'রে নেও না কেন, তুমিই বা গুরুগিরি কেন কর? এওতো তোমার পণ্ড-শ্রম!

বোধহয় তাই!

তাহ'লে আমার নিজের করার কিছুই নেই? কেবল স্রোতে ভেসে যাওয়া? তবে তো পাপ-পুণ্য কিছুই থাকে না! যে খুন করে সেও ঈশ্বরের ইচ্ছায়, যে ঘরে আগুন দেয় সেও তা হ'লে অন্যায় করে না?......উত্তর দেও রাজুদা?

আমি জানিনে, ও কথার কি উত্তর! মেনকা, তুমি আমার চেয়ে জ্ঞানে বুদ্ধিতে ঢের বড়!

মেনকা হাসিল; কিন্তু রাজুদা আমি তা মানিনে, শুধু এই জানি যে সংসারের আঘাত আমাকে জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছে......একদিন আমার মনেও ঐ নিশ্চেষ্ট নির্ভরতা ছিল......কিন্তু রাজুদা, সে কথা শুনে তোমার কি হবে?

রাজু উঠিয়া বসিয়া বলিল, বল্ বল্ মেনকা, হয়তো কত অবিচার করি তোর ওপরে মনে মনে!

মেনকা আবার হাসিল। বলিল, তাও আমি জানি রাজুদা, বিকারের ঝোঁকে তুমি মনের সব ময়লা, হাওয়াতে উড়িয়ে দিয়ে ব'সেছ, তুমি তা জান না!

রাজু সভয়-বিস্ময়ে মেনকার মুখের দিকে চাহিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিল!

মেনকা নিজের মনেই বলিয়া চলিল; বিচারবুদ্ধি দিয়ে দেখতে গেলে কিছুই ত দেখতে পাইনে! ব্যথা দিয়ে না দেখতে পারলে.. ...

মেনকা আর যেন বলিতে পারে না. সে মৌন হইয়া গেল। তাহার চোখের কোণের দু'ফোঁটা জল যেন মহা সমুদ্রের নিবিড় ব্যথা বহন করিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল!

অনেকক্ষণ পরে, রাজু মেনকার হাত ধরিয়া বলিল, মেন্‌কি, তোর নির্ব্বোধ রাজুদার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর্।

মেনকা আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া বলিল, তোমার কি অপরাধ রাজুদা? তুমিও শাস্ত্রের মতই বিচার কর। যে করুণা থাকলে সত্যিকারের বোঝা হয়, ত'াও তুমি ফিরিয়ে নিয়েছ একদিন!

লজ্জায় রাজুর মাথাটা যেন নুইয়া পড়ে।

ঘরের প্রদীপটা কখন নিবিয়া গিয়াছিল।

মেনকা উঠিল।

কোথায় যাবি? রাজু জিজ্ঞাসা করিল।

তেল নেই ব'লে পিদীম্‌টা নিবে গেছে; জ্বেলে নিয়ে আসি।

থাক্‌গে মেন্‌কি—তুই বল্, তোর কথা শুন্‌তে আমার ভারি ভালো লাগে!

মেনকা হাসিল, বটে! এ নতুন সৌভাগ্য বল্‌তে হবে, কিন্তু।

তুই বড় দুষ্টু মেন্‌কি।

তা' কি আজ নতুন জান্‌লে রাজুদা?

চাঁদের আলো কখন বিছানা হইতে সরিয়া গিয়াছে; বোধকরি চাঁদ ডুবিয়াও গিয়াছিল।

মেনকা কহিল, রাজদা, মনে করে নেও যে তোমাদের মেন্‌কি অভাগী ম'রেছে, তার ভূত এসে, আজ কথা কইচে! ভূতের কথার কেউ দোষ-ছল্ ধরে না; তার বলারও ছিরি নেই, আর বাচালতারও শেষ থাকে না!

দূরে শিয়াল ডাকিল, মাথার উপর কালপেঁচা চীৎকার করিয়া গেল।

মেনকা বলিল, তবে শোন রাজুদা।

তোমাদের মেন্‌কি পোড়ারমুখী বিয়ের আগেই পাপ ক'রেছিল। তার বয়স না হ'তেই সে একজনকে ভাল-বেসে ফেলেছিল।

মানুষের সমাজে আর সব অপরাধের ক্ষমা আছে; কিন্তু এমনি ক'রে ভালবাসা অমার্জ্জনীয়, নয় কি রাজুদা?

তুমি বলবে, সেই বয়সে ভালবাসার সে বুঝতো কি? জানতোই বা কি?

সে কথা হয়তো খুবই সত্যি ; তবুও সে মনের মধ্যে একজনের জন্যে একটা গাঢ় ব্যথা বোধ ক'রতো ; সে কেমন তা আমি বুঝিয়ে ব'লতে পারবো না।

রাজু জিজ্ঞাসা করিল, কে সে মেন্‌কি ?

তুমি তাকে চিন্‌বে না রাজুদা, সে বাপে তাড়ানো, মায়ে খেদান—একটা বেয়াড়া বিদ্‌কুটে ছেলে......তার দোষই ছিল বেশী , গুণের মধ্যে ছিল তার অসীম সাহস, মরতে তার কোন ভয় ছিল না ; কি আগুন, কি জল—অবাধে তার সর্ব্বত্র উদ্দাম গতি ! লোকে তাকে পাগল বল্‌তো, লোকে তাকে ডাকাত বল্‌তো—লোকেদের সে ছিল দু' চক্ষের বিষ , কিন্তু কি জানি কেন, মেনকি মুখপুড়ীর তাকে দেখেই দু'চোখ জুড়িয়ে যেত ।

সে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতো, ফাঁদ পেতে শেয়াল ধ'রে ! পরের গাছে রাত্রে আম না চুরি ক'রলে তার ঘুম হ'তো না !

কত মার না খেয়েছে মেন্‌কি তার হাতে !

মেন্‌কির তারপর বিয়ে হ'লো—তোমাদের হরেকৃষ্ণর সঙ্গে ! এও কম উদ্দাম কম ডাকাত নয়, কিন্তু এর মূলে-হাবাৎ ! এ ভুলে একটি সত্যি কথা বলে না, লোকের মর্য্যাদা করতে জানে না, জানে কেবল আত্ম-সুখ !

পতি পরম দেবতা ! মেন্‌কি তাই তার পায়ে আত্ম-সমর্পণ ক'রে গৃহ-ধর্ম্মের দিকে মনে দিলে । কিন্তু আসল সোনা বাইরে ফেলে কোন্ গিন্নী আঁচলে গিল্‌টি বেঁধে স্থির থাক্‌তে পারে ?

কিন্তু একদিকে মেন্‌কির পরম নিস্কৃতি ছিল ; তোমার বন্ধুটির মানুষের মন অধিকার করার কোন চেষ্টার বালাই পর্য্যন্ত ছিল না । পেটুক ছেলের মত ; কি খাচ্চে তা জানে না ! কতকগুলো মুখে পুরে দিতে পারলেই পরম তৃপ্তি !

কিন্তু রাজুদা, তোমরা হয়তো জান যে, মন যখন পঙ্গু হয় তখন—দেহ সুস্থ থাক্‌লেও কিছুতেই আর ন'ড়তে চ'ড়তে চায় না ; রুচি না থাক্‌লে ক্ষীর-সরও মুখে যেমন রোচে না !

মেন্‌কির মিছে খেলা খেল্‌তে গিয়ে মনটা একেবারে তেতো, কালো হ'য়ে গেল !

তখন তার মনের মধ্যে একটা সাধ তীব্র হ'য়ে জেগে উঠ্‌লো—সেটা মরণের সাধ ; সব জ্বালা থেকে এক নিমেষে ছড়িয়ে যাবার সেই পরম আকাঙ্খাটি !

কিন্তু সে সাধেও বাদ প'ড়লো ! মেন্‌কি নিজের প্রাণ নিয়ে যা ইচ্ছে তাই ক'রতে পারে, কিন্তু আর একটা প্রাণ......

মেনকা চুপ করিল।

তারপর তো তোমরা জান রাজুদা, মেন্‌কি পুকুর ঘাটের সিঁড়িতে পা-পিছ্‌লে পড়ে গিয়ে কি কাণ্ডটাই না বাধিয়ে ছিল !

তিনমাস সে শয্যাগত ; ডাক্তার, বদ্দি ধাই-চামারির পেছনে টাকাগুলো জলের মতই খরচ হয়ে গেল।

পুকুর ঘাটের সিঁড়ি, পা পিছ্‌লোনর কাহিনী মিথ্যে-বাদী মেন্‌কির তা' বানানো মিথ্যে কথা !......

সে কেবল তার পতি-দেবতার সুনাম বজায় রাখবার জন্যে পাপীয়সী মেন্‌কি মিথ্যার জাল বুনেছিলো !

তার নারীত্বের মর্ম্মচ্ছেদ ক'রে যে মানব-কোরকটি......

মেনকা কাঁদিয়া ফেলিল।

রাজুদা কি ব'লব তোমায় ! স্বামী-দেবতার পাদ-স্পর্শে......সে আর এই পৃথিবীর আলো দেখ্‌তে পেলেনা......

মেনকার চক্ষু হইতে শ্রাবণের ধারার মত অশ্রু বাহিয়া পড়িল।

ধর্ম্মিষ্ঠি লোকে, রাজুদা, আমার কথা শুন্‌লে কানে

আঙুল দেবে; কিন্তু না ব'লেও আমার নিস্তার নেই! মনের আগুন কি চেপে রাখা যায়?

তুই বল্ মেনকি, একটুও তোর চাপ্‌তে হবে না; অগ্নি-পর্ব্বতের আগুনকে কে না ভয় করে? কিন্তু ধরণীর অন্তরের বহ্নি যখন উত্তাল তরঙ্গে বা'র হ'য়ে আসে পৃথিবীর গহ্বর থেকে—তখন কেউ তাকে রোধ ক'রতে পারে না।......

হ্যাঁ রাজুদা, সেই অদৃশ্য হাতের অমোঘ-বিধানে মেন্‌কি কিন্তু অশুচির আঁস্তাকুড় থেকে দেব-মন্দিরে আব স্থান কিছুতেই ক'রে নিতে পারলে না।......

তার মনের কোণের ছোট দীপটির অমলিন আলো, পতঙ্গের শত ফুৎকারে আজো নিভলো না।.. ...

চারিদিক অন্ধকার হ'য়ে আস্‌চে—হয়তো পাপীয়সীকে সেই আলো সম্বল ক'রে নরকের কাঁটা-পথেও হেঁটে চল্‌তে হবে!

রাজুদা, তুমি শাস্ত্র জান, ধর্ম্ম মান'। তুমি ব'লে দিতে পার না, অসতী মেনকার উদ্ধারের পথ?

ধ্যানভঙ্গে ধূর্জ্জটির মত মাথা নাড়িয়া গম্ভীর-বিস্ময়ে রসরাজ বলিল,—মেনকা অসতী?

সমাপ্ত

পূজা উপলক্ষে কালি-কলম কার্য্যালয় এক মাস বন্ধ থাকিবে। কার্ত্তিকের কালি-কলম ঐ মাসের শেষে প্রকাশিত হইবে।
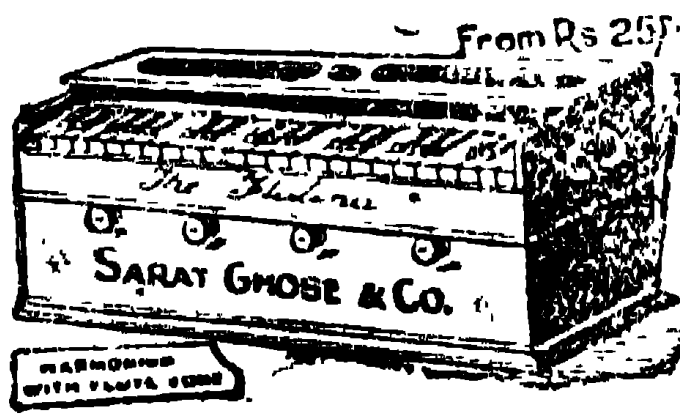
কামাখ্যার কর্ম্মদোষে

শ্রী জগদীশ গুপ্ত

পূজোর ছুটির মাত্র দু'দিন বাকি।

মাষ্টাররা আল্‌গা দিয়েছেন, পড়ার চাপ অনেক কমে' গেছে। আনন্দে আমরা আকাশে লাথি ছুড়ে বেড়াচ্ছি—

ফিফ্‌থ মাষ্টার নীরদবাবু হঠাৎ আমাদের মাতব্বর ক'জনকে ডেকে' বল্‌লেন,—ওহে, আমার এক বন্ধু আস্‌ছেন, উঁচুদরের হিপ্‌নটিষ্ট। যদি হিপ্‌নটিজম দেখতে চাও ত' তাঁকে বাজি করতে পারবো।

শুনেই আমাদের শারদীয়া ফূর্ত্তি চতুর্গুণ বেড়ে গেল. লাফিয়ে উঠে' বল্‌লাম—দেখবো, সার।

—তবে হেডমাষ্টারকে রাজি করে' যোগাড় করো; আজই তিনি আস্‌বেন। বলে' নীরদবাবু চলে' গেলেন।

হেডমাষ্টার দু' একবার না না করেই রাজি হলেন

ইস্কুলের হলঘরে চেয়ার বেঞ্চি সাজিয়ে তামাসার আসর হ'ল।

নীরদ বাবুর বন্ধু এলেন—

নাম শুন্‌লাম তাঁর কামাখ্যা বাবু; কিন্তু দেখে আমাদের ভক্তি হ'ল না; কেমন যেন কাঠখোট্টা চেহারা—ঘাড় খাড়া ত' বটেই, তার উপর মাথাটা যেন পেছন্‌ দিকে হেলে পড়ে' বুক খানাকে বাড়িয়ে দিয়েছে; চোখ খুব বড় বড়—যেন মানুষের অন্তরাত্মা লক্ষ্য করতে করতে কবে তার পলক পড়লেই বন্ধ হ'য়ে যাবে।—

যা-ই হোক্‌, তামাসা সুরু হবে—হেডমাষ্টার থেকে মৌলভীসাহেব পর্য্যন্ত উৎকণ্ঠায় সূচ্যগ্র হ'য়ে বসে আছেন—

আমরা ত নির্ব্বাক—

কার ঘাড়ে কে দাঁড়িয়ে পড়েছি তারই ঠিক নাই।

কামাখ্যাবাবু খুব ধীরে ধীরে পা ফেলে অবতীর্ণ হলেন—

হয়েই বল্‌লেন,—যাদুবিদ্যায় আমি বহুদর্শী অভিজ্ঞ অধ্যক্ষের মত পারদর্শী নই; নিজের চেষ্টায় অল্প স্বল্প শিখেছি। আশা করি, তাতেই আমি আপনাদের সন্তুষ্ট এবং ততোধিক বিস্মিত করতে পারবো।

বলে' সাম্‌নের খানকতক চেয়ার খালি করে নিয়ে জনকতক ছেলেকে বেছে নিয়ে তাতে বসিয়ে দিলেন। তারপর, তাদের প্রত্যেকের হাতে একখানা কিসের চাক্‌তি দিলেন আর বল্‌লেন,—এই চাক্‌তির দিকে প্রাণ পণে চেয়ে থাকো।

......তারা চেয়েই রইলো—

থাক্‌তে থাক্‌তে চোখ টাটিয়ে বিষিয়ে উঠলো তবু যেমনকার তাই, কিছুই ফল হ'ল না।...

কামাখ্যাবাবুর ভূমিকায় বিস্মিত হবার কথা ছিল, তাই আমরা বিস্মিতই হলাম......

কামাখ্যাবাবুর মুণ্ডটার দিকে চেয়ে আমরা হাস্‌তে সুরু করেছি এমন সময় রব উঠলো—চুপ, চুপ···

হাতের চাক্‌তিখানা ঝম্‌ করে' শাণের উপর পড়লো—এবং রামপদ তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে হঠাৎ সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে পড়লো—

আমরা হাসি চেপে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠলাম।

কামাখ্যাবাবু রামপদর ডানা ধরে' তাকে খাড়া করে' দিলেন···তারপরই তামাসা ঘোরালো হ'য়ে উঠলো।

রামপদ লুচি মনে করে' চটি জুতো মুখে দিলে—

রসগোল্লা মনে করে' খোয়া কাম্‌ড়ালে—একটু গানও গাইলে······

শুনে মৌলভী সাহেবের লাল দাড়ি দু'লতে লাগল।

কামাখ্যাবাবু সাম্‌নের ছাত্র-সঙ্ঘের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—তোমাদের কারো কিছু বল্‌বার আছে?

একটা ছেলে উঠে বল্‌লে,—আমার আছে, সার।

কামাখ্যাবাবুর পাশেই দাঁড়িয়ে নীরদবাবু বন্ধুর সাফল্যে গর্ব্ব অনুভব করছিলেন; তিনি বল্‌লেন,—চলো।

ছেলেটি বল্‌লে,—রামপদ আমার ঠেঙে চারটি পয়সা ধার নিয়েছিল—অনেকদিন হল, দেয় না। ওর এখন জ্ঞান নেই—এই বেলা যদি চেয়ে দেন······

দর্শকগণ কথাটা শুনে হেসে উঠলেন

নীরদবাবু হেসে কামাখ্যাবাবুর মুখের দিকে চাইলেন; কামাখ্যাবাবু হেসে' ছেলেটিকে বল্‌লেন,—সবুর করো, দিচ্ছি।

আর একটি ছেলে উঠে বল্‌লে—আমিও দুটো পয়সা পেতাম, সার।

কামাখ্যাবাবু বল্‌লেন, বেরিয়ে এস। এসে রামপদর সাম্‌নে দাঁড়াও।

তারা এসে তাই দাঁড়ালে—

কামাখ্যাবাবু অভিভূত রামপদকে উদ্দেশ করে' বল্‌লেন,—তোমার কাছে এরা পয়সা পাবে; তুমি ধার নিয়ে আর দাওনি। তোমার ডান হাতের কাছে যে দাঁড়িয়ে তাকে দাও এক আনা; আর যে তোমার বাঁ হাতের কাছে দাঁড়িয়ে তাকে দাও দু' পয়সা—দিয়ে তুমি ঋণমুক্ত হও।

রামপদ নির্ব্বিকার ভাবে পকেটে হাত পুরে' অক্লেশে পয়সা দিয়ে দিলে—

ছেলে দুটো একলাফে গিয়ে জায়গায় উঠলো—

আমাদেরও আমোদের সীমা রইল না।

হেডমাষ্টার চিরকাল ভীরু প্রকৃতির লোক। বিপদ সম্ভাবনায় তিনি সুরু থেকেই কেমন অস্থির বোধ করছিলেন; বললেন,—এইবার ওকে ছেড়ে দিন্‌।

—বেশ। বলে' উল্টো দিকে হাত খেলিয়ে কামাখ্যাবাবু রামপদকে মোহমুক্ত করে জ্ঞানজগতে ফিরিয়ে আন্‌লেন—

রামপদ টল্‌তে টল্‌তে গিয়ে তার দলের মধ্যে বসে' পড়ল'।······

আমাদেরই ক্লাসের গোবিন্দ ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল; কামাখ্যাবাবুর দুর্ম্মতি ঘট্‌ল'—তিনি তারই দিকে মুরুব্বি ভাবে আঙ্গুল তুলে বল্‌লেন,—ওহে সরফরাজ খাঁ, শোনো দেখি এদিকে।

গোবিন্দ হাস্‌তে হাস্‌তে এসে তাঁর সাম্‌নে দাঁড়াল। কামাখ্যাবাবু বল্‌লেন,—হিপ্‌নটাইজড্‌ হবে?

গোবিন্দ আমাদের পানে চাইলে—

আমরা চোখ নেড়ে তাকে রাজি হ'তে বললাম। গোবিন্দ বললে,—হবো। কিন্তু আমাকে পারবেন বলে' মনে হয় না।

—কেন বলো দেখি? বলে কামাখ্যাবাবু চোখ বড় করে তুললেন।···রামপদকে বশে এনে তাঁর বড় আনন্দ হয়েছিল।

গোবিন্দ বললে,—আমার বড় কঠিন প্রাণ।

—এসো ত, দেখা যাক্। বলে' কামাখ্যাবাবু তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন।

গোবিন্দ তাকে সাবধান করে' দিলে—আমি কিন্তু কারু ধারি-টারিনে। আমার পকেটে পয়সা আছে—যেন খোয়া না যায়।

শুনে রামপদর বোধ করি সন্দেহ হ'ল—

সে তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়েই চেঁচিয়ে উঠল,—আমার পয়সা?

নীরদবাবু ধমকে উঠলেন,—চুপ এখন। পরে হবে পয়সার কথা।···রামপদ এবং সভা তৎক্ষণাৎ নিঃশব্দ হ'য়ে গেল।

তখন কামাখ্যাবাবু গোবিন্দকে বললেন,—তোমার নামটি কি?

গোবিন্দ বললে,—গোবিন্দ।

কামাখ্যাবাবু গোবিন্দর চোখের দিকে ভীষণ ভাবে চেয়ে বললেন,—আমার চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাক'।

গোবিন্দ চেয়ে রইলো—

আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখতে লাগলাম, যৌগিক-বল আর পশুশক্তির সেই সংঘর্ষ।···ধীরে ধীরে পশুশক্তি পরাভূত হয়ে এল।···হঠাৎ গোবিন্দ সামনের দিকে ঝুঁকে এল; পড়েই যেত; কিন্তু কামাখ্যাবাবু তাকে চট্ করে ধরে' ফেলে ঠিক করে' বসিয়ে দিলেন।···

কামাখ্যাবাবু নীরদবাবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে কি যেন বললেন; নীরদবাবুও বললেন কিছু—

কামাখ্যাবাবু তখন গোবিন্দকে আদেশ করলেন,—গোবিন্দ, চোখ খোলো—

গোবিন্দ চোখ খুললে।

কামাখ্যাবাবু ডাকলেন,—গোবিন্দ?

গোবিন্দ উত্তর দিলে,—আজ্ঞে।

তারপর প্রশ্নোত্তর সুরু হ'ল।

—তুমি কোথায়?

—ইস্কুলে, চেয়ারে বসে' আছি।

—এখন তুমি আমার সম্পূর্ণ বশীভূত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তোমার নাম কি?

—শ্রী গোবিন্দবন্ধু চট্টোপাধ্যায়।

·· না, তোমার নাম শ্রী যদুপতি ব্যাকরণতীর্থ।

বুঝলাম কামাখ্যাবাবু নীরদবাবুর কর্ণমূলে কথা ক'য়ে এই সমাচারটি নিয়েছিলেন।

বলতে লাগলেন,—তুমি এই স্কুলের হেডপণ্ডিত। তোমার হাতে ব্যাকরণ-কৌমুদী রয়েছে। ছেলেদের পড়াও।

ব্যাকরণ-তীর্থের মুখের দিকে চেয়ে মনে হ'ল, তিনি ক্ষুণ্ণ হ'য়েছেন।—হবারই কথা। এতগুলি লোকের সামনে তাঁর পদগৌরব আর পাণ্ডিত্যকে ভ্যাংচান—তাঁরই ছাত্রকে দিয়ে—বেশ মনোরম নয়।

গোবিন্দ আদেশ মানতে বাধ্য—

বললে,—হবে, এদিকে আয়·····অমুক তমুক।

পণ্ডিত মশাইয়ের মুদ্রাদোষ ছিল ঐ অমুক তমুক বলা—কাজেই অমুক তমুক শুনেই ছেলেরা হো হো শব্দে হেসে উঠল।

হরি নামে গোবিন্দর, তথা আমাদের এক সহপাঠী সত্যই সেখানে ছিল; ডাকতেই সে গোবিন্দর সামনে গিয়ে দাঁড়াল; বললে,—এসেছি, পণ্ডিতমশাই।

গোবিন্দ বললে,—পড়া করে' এসেছিস আজ, না রোজকার মতই বলবি, মাথা ধরেছিল অমুক তমুক?

হরে বল্‌লে,—আজ পড়া করে এসেছি, পণ্ডিত মশাই। বলেই হরে চট করে সত্যিকার পণ্ডিত মশাইয়ের মুখখানার দিকে চেয়ে নিলে ; আমরাও দেখলাম, যেন কে লঙ্কা বেটে দিয়েছিল, মুখ তাঁর এম্‌নি লাল।

গোবিন্দ খুশী হয়ে বল্‌লে,—বেশ। বল্ দেখি, সাধু শব্দের তৃতীয়ার বহু বচনে কি হয় অমুক তমুক ?

হরে বল্‌লে,—সাধবাঃ।

রুখে উঠে গোবিন্দ বল্‌লে,—এই পড়া করে এসেছ অমুক তমুক ? মেরে হাড় চূর্ণ করে দেব জানিস্ ? সাধু শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে সাধবাঃ ! হতভাগা ছেলে অমুক তমুক। যা সাম্‌নে থেকে।

হরে সরে গেল—

পণ্ডিত মশাইয়ের অবিকল নকল দেখে হাস্‌তে হাস্‌তে আমাদের পেটে খিল ধরে গেল ; ছোট ছোট ছেলেরা ত হেসে গড়াগড়ি দিতে লাগল।……হেডমাষ্টারও হাসছিলেন ; পণ্ডিত মশাইয়ের মুখের দিকে চেয়েই হঠাৎ তিনি ভুরন্ত গম্ভীর হ'য়ে গেলেন ; বল্‌লেন,—থাক্, আর না।

কামাখ্যাবাবুর তখন শনিগ্রহ প্রবল—

সে-কথায় তেমন কান দিলেন না।

গোবিন্দ বল্‌তে লাগল,—গোবিন্দ, তুমি বড় বেয়াড়া ছেলে। কাল্‌কে রাস্তায় তোমায় আমি কুকথা বল্‌তে শুনেছি। ঠিক কিনা অমুক তমুক ?

কেউ জবাব দিলে না—

গোবিন্দ তখন উঠে দাঁড়িয়ে, যেন ক্লাসের সব বেঞ্চিগুলিই দেখছে এম্‌নি ভাবে চেয়ে বল্‌লে,—অমুক তমুক, গোবিন্দ লুকোচ্ছে। মেরে হাড় চূর্ণ করে দেব জানিস ? বেঞ্চির ওপর দাঁড়া—দাঁড়া বল্‌ছি অমুক তমুক। কেশব, দপ্তরীকে ডাক্, বেত নিয়ে আসুক। হতভাগার হাড় আমি চূর্ণ করে দিচ্ছি অমুক তমুক।

হেডমাষ্টার পণ্ডিত মশাইয়ের লজ্জায় লজ্জা পেয়ে ঘাড় হেট করেছিলেন—

মুখ তুলে পুনরায় বল্‌লেন—ঢের হয়েছে, আর না। ফিরিয়ে আনুন, কামাখ্যাবাবু।

কিন্তু কে জান্‌ত এমন হবে !

আরো খানিকটা হাসাবার ইচ্ছে বোধ হয় কামাখ্যাবাবুর ছিল ; কিন্তু হেডমাষ্টারের কথাটা তিনি বারবার অমান্য করতেও পারলেন না।—

গোবিন্দকে পণ্ডিত মশাই থেকে গোবিন্দে ফিরিয়ে আন্‌বার মতলব করে তার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াতেই গোবিন্দ ভেবে বসল তিনিই বুঝি গোবিন্দ—

যে কুকথা বলে' বেড়ায়—

আর ডাকলে কাছে আসে না।

গোবিন্দ তাই গোবিন্দর ওপর রেগেই ছিল—আচম্‌কা কামাখ্যাবাবুর গালে ঠাস করে' এক চড় বসিয়ে দিয়ে বল্‌লে, সেই আসাই ত' এলি গোবিন্দ। আগে এলে ত এই চড়টা খেতে হত' না।……

মাষ্টাররা সব হা হা করে' উঠলেন ; ছেলেরা হৈ রৈ করে উঠল ; কামাখ্যাবাবু হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে বল্‌লেন,—ব্যস্ত হবেন না আপনারা, মাত্রা একটু বেশী হ'য়ে গেছে দেখছি। তা হোক, এখুনি ঠিক করে নিচ্ছি। —বলে তিনি গোবিন্দকে চেয়ারে বসিয়ে দু পা পিছিয়ে এসে তার মুখেচোখে যারপরনাই জোরে জোরে ফুঁ দিতে লাগলেন—

তাতে কামাখ্যাবাবুর গাল ফুলে চোখ ঠিক্‌রে মুখের চেহারা বদ্‌লে গেলেও গোবিন্দর মারমুখী উত্তেজনার ভাবটা কেটে গেল—

কিন্তু আচ্ছন্ন ভাবটা গেল না।

—"জাগো, জাগো"—বলে তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাঁকৃতে লাগলেন……পায়ের দিক থেকে হাত খেলিয়ে মাথা পর্য্যন্ত

তুল্‌তে লাগলেন......কামাখ্যাবাবু গোবিন্দকে জাগাবার ক্লেশে গলদ্‌ঘর্ম্ম হ'য়ে উঠলেন...

কিন্তু গোবিন্দ জাগলে না।

কামাখ্যাবাবু মুখে তখন ভয়ের লক্ষণ দেখা দিল-রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেলে বিব্রত ভাবে বল্‌লেন,—জ্ঞান ফিরছে না ত!......হাত তাঁর কাঁপছিল।

মৌলভীসাহেব দাড়ি তুলে নাক পর্য্যন্ত ঢেকে ফেল্‌লেন—

কিন্তু হেডমাষ্টার বল্‌লেন,—তারপর, এখন উপায়?

এই হতাশ প্রশ্ন তিনি কাকে করলেন জানিনে—কিন্তু মনে হ'ল, শঙ্কায় তাঁর বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছে

কামাখ্যাবাবু চেয়ারে বসে' পড়ে' বল্‌লেন,—আমার সাধ্যের বাইরে গেছে মনে হ'চ্ছে। আর একবার চেষ্টা করে' দেখি।

কিন্তু আর একবার চেষ্টা করতে না গেলেই ভাল হ'ত।......উঠে দাঁড়িয়ে তিনি গোবিন্দর নাক বরাবর দুটি মাত্র ফুৎকার ছেড়েছেন, এমন সময় গোবিন্দ গর্জ্জন করে' বলে উঠল,—আজ আমি গোবিন্দকে মেরেই ফেল্‌ব। আমার সামনে কুকথা উচ্চারণ? অমুক তমুক? বলেই সে লাফিয়ে উঠে কামাখ্যাবাবুর গলাটা দু' হাতে বেড়ির মত জড়িয়ে ধরে'—

বেড়াল যেমন করে ইঁদুরের টুঁটি কাম্‌ড়ে ঝাঁকায়—

তেম্‌নি ঝাঁকাতে লাগল—

যেন মাটিতে আছড়ে ফেল্‌বে।......

"ধরুন, ধরুন," বলে কামাখ্যাবাবু আর্ত্তনাদ করে' উঠলেন···নীরদবাবু প্রভৃতি ছুটে এসে গোবিন্দর হাত ছাড়িয়ে দিলেন...কামাখ্যাবাবু সরে এসে হাঁপরের মত হাঁপাতে লাগলেন···সভা নিঃশব্দ হ'য়ে গেল।

হেডমাষ্টার উঠে দাঁড়ালেন—

হাত তুলে বল্‌লেন,—একি নীরদবাবু?

কামাখ্যাবাবু বন্ধু হলেও নীরদবাবু তাঁর কৃতকর্ম্মের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত ছিলেন না; রুষ্টস্বরে বল্‌লেন,—কি হে কামাখ্যা?

অর্থাৎ আনাড়ি হ'য়ে এ কি তোমার দুঃসাহস; আর দায়িত্ব সব তোমারই স্কন্ধে তা' কি জানো?

কামাখ্যাবাবু তা বুঝলেন—

বল্‌লেন,—নিজের শক্তির পরিমাণ আমার অজ্ঞাত ছিল; সাব্‌জেক্টে এত শক্তি অজ্ঞাতসারেই প্রেরণ করেছি যে, ঠিক এখন ও আমার আয়ত্তে নয়। আমি দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছি; আমারই শক্তি নিয়ে ও এখন আমার চাইতে শক্তিমান। সেই শক্তিটা ক্ষয় প্রাপ্ত হ'য়ে আমার চেয়ে দুর্ব্বল না হওয়া পর্য্যন্ত ওকে পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা আমার পক্ষে অসম্ভব।—বলে তিনি একটু হাসতে চেষ্টা করলেন।

রাখালবাবু, থার্ড মাষ্টার, হঠাৎ ধৈর্য্যের সীমা লঙ্ঘন করে গেলেন; বিশ্রী দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলেন,—এঁঃ অসম্ভব। তবে কেন এসেছিলেন মশাই? আবার হাসি হ'চ্ছে!...

মনে হ'ল, সবাই যেন নিঃশব্দে রাখাল বাবুর এই অসহিষ্ণু কটূক্তির সমর্থনই করলেন। সেটা কামাখ্যা-বাবুরও চোখ এড়াবার কথা নয়।...সভয়ে চারিদিক চেয়ে তিনি সভাকেই সম্বোধন করে' বল্‌লেন,—আমি প্রথমেই বলেছিলুম, এ-কাজে আমি নূতন। কেমন, বলিনি? বলে' নীরদবাবুর দিকে তাকিয়ে যেন আশ্রয় চাইলেন।... কিন্তু নীরদবাবু ঠিক সেই সময়টিতে অন্য দিকে চেয়ে অন্যমনস্ক ছিলেন—কামাখ্যাবাবুর নির্ভরতা হড়্‌কে গেল।

হেডমাষ্টার মাটিতে পা ঠুকে বল্‌লেন,—বাক্‌বিতণ্ডা থামান্। এখন উপায় কি তা' বলুন। আচ্ছা বিপদে ফেল্‌লেন দেখ্‌ছি···

—উপায় ঐ যে বল্লুম। অচৈতন্যই বলুন মোহই বলুন আপনি ক্ষয় হ'য়ে যাবে। ভয়ের কারণ নেই। বলে রুমাল পকেটে গুঁজে কামাখ্যাবাবু উঠে দাঁড়ালেন।. . পুনশ্চ বল্লেন,—আপনারা একটু সাবধানে থাক্‌বেন; ও-র কথার প্রতিবাদ কর্‌বেন না, কাজে বাধা দেবেন না। ও এখন যত্নপতি ব্যাকরণতীর্থ, হেড্‌পণ্ডিত,—তা নয় বলে' ওকে বোঝাতে গেলে রাগের মাথায় মেরে বস্‌তেও পারে, তার নমুনা পেয়েইছেন। বলে' তিনি প্রস্থানোদ্যত হলেন।

নীরদবাবু ভীতভাবে বল্লেন,—যাচ্ছ না কি?

—হ্যাঁ, আমার আর কোনো কাজ নেই; বিশেষ আমাকে বড় অপছন্দ কর্‌ছে, আমি থাক্‌লেই কেস্ আরো খারাপ হবে। বল্‌তে বল্‌তে কামাখ্যাবাবু দরজার দিকে অগ্রসর হয়ে গেলেন।......

হেডমাষ্টারকে রাগ করতে দেখেছি; কিন্তু রাগে কখনো কাঁপতে দেখিনি; আজ দেখ্‌লাম।

কামাখ্যাবাবুকে বেরিয়ে যেতে দেখে তিনি রাগে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বল্‌তে লাগলেন,—যাচ্ছেন কি রকম? জানেন ছেলের জীবনের জন্য দায়ী আপনি? যদি—

কিন্তু কামাখ্যাবাবু সে-কথা আদৌ কানে না তুলে সেই পায়েই ষ্টেশনে গিয়ে গাড়ী ধর্‌লেন।—

মাষ্টাররা আতঙ্কে শুকিয়ে একেবারে আদ্দেক হ'য়ে গেলেন......দিশেহারা ত' হলেনই।

একি কাণ্ড! যদি মারা যায়? যদি পাগল হয়ে যায়? তা না হোক্, যদি পণ্ডিত হয়েই রয়ে যায়? তামাসা দেখ্‌তে গিয়ে একি বিপদ!

......নিজেদের ওপর সমস্ত দায়িত্ব কল্পনা করে' মাষ্টাররা ফৌজদারী, কয়েদখানা, খেসারৎ প্রভৃতির বিভীষিকা চতুর্দ্দিকে যে কত দেখ্‌তে লাগলেন তার হিসাব নেই।—

তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও

হরিষে বিষাদ ঘটে' গেল—

এমন মনে হ'তে লাগল, দূর কর ছাই, ছুটিতে আর কাজ নেই।...ছুটির ওপর এমন বিতৃষ্ণা আর কোনোদিন হয় নি।

গোবিন্দ এদিকে রীতিমত স্নান আহ্নিক আহারাদি কর্‌লে, ছড়ি হাতে করে' পণ্ডিত মশাইয়ের মত একটু ঘুরেও বেড়ালে।...এক কথায়, সে যে গোবিন্দ নয়, সে যত্নপতি ব্যাকরণতীর্থ এই ভ্রমটা ছাড়া আর একটা আচ্ছন্ন নিশ্চেষ্টভাব ছাড়া, তার আর কোনো বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না।

পরদিন ইস্কুলের সময় গোবিন্দ খেয়ে দেয়ে মাষ্টারদের ঘরে গিয়ে সমান চালে একখানা চেয়ার দখল করে' বস্‌ল।...আমরা উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখ্‌তে লাগলাম, সে কি করে!

গোবিন্দ হেডমাষ্টারকে বল্লে,—শশধরবাবু, প্রথম ঘণ্টায় আমার কোন্ ক্লাস?

হেডমাষ্টার বল্লেন,—আজ্ঞে থার্ড ক্লাস।

সবাই জান্‌ত, পণ্ডিতমশাই রোজ জিজ্ঞাসা করেই বেরুতেন, নতুবা তাঁর ভুল হ'ত।

গোবিন্দ বল্লে,—শশধরবাবু, আর একটা কথা বলি আপনাকে, শুনুন। অমুক তমুক।

—বলুন। বলে' শশধরবাবু উদ্‌গ্রীব হ'লেন।

গোবিন্দ বল্লে,—সখারামবাবু ক্লাসে ঘুমোন্।...... সখারামবাবু সেখানে উপস্থিত ছিলেন......গোবিন্দর কথা শুনে' তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল।

গোবিন্দ বল্‌তে লাগল,—আর নস্য নেন্। দুটোর একটাও ত কাজ ভাল নয় অমুক তমুক।

হেডমাষ্টার বল্‌লেন,—তা' ত নয়ই। কি করতে বলেন?

—বারণ করে' দেবেন। আর একটি কথা; গোবিন্দকে টিট্ করা দরকার হয়েছে। সে আমার সাম্‌নে কুকথা উচ্চারণ করে অমুক তমুক? বলে' গোবিন্দ অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে চোখ পাকিয়ে রইলো।

হেডমাষ্টার ঠাণ্ডাস্বরে বল্‌লেন,—তা' শাসন করে' দেব'খন্।

গোবিন্দ আরো বেশী করে' চোখ পাকিয়ে বল্‌লে,—আপনার ত' মুখে শুধু দেবো'খন্ দেবো'খন্; দিতে ত' একদিন দেখলাম না অমুক তমুক!

—সময় হয়েছে, এখন আপনার ক্লাসে যান্। বলে' হেডমাষ্টার যেন তাকে বিদায় করতে পারলে বাঁচেন এম্‌নি একটি অসহিষ্ণু ভঙ্গী করে' উঠে দাঁড়ালেন।

—যাই। বলে' গোবিন্দও উঠে পড়ল।

গোবিন্দ পড়াতে চলেছে!—

তার পিছু পিছু ইস্কুলের সমস্ত মাষ্টার আর প্রায় আদ্দেক ছেলে থার্ড ক্লাসে ঢুকে' পড়ল।

......যাচ্ছেতাই পড়া ধরে' বেতিয়ে, ঠেঙ্গিয়ে, ঘুষিয়ে চড়িয়ে গোবিন্দ ছেলেদের আধমরা করে' দিলে।

রাখালবাবু বিমর্ষ হ'য়ে বল্‌লেন,—আজ ওকে ছুটি কেন দিলেন না?

—এত কি আগে জানি! বলে' হেডমাষ্টার অতিশয় করুণচক্ষে থার্ড ক্লাসের ছেলেদের পানে চেয়ে রইলেন।

কামাখ্যাবাবু বলে' গেছেন, বাধা দিলে ফল খারাপ হবে—

কাজেই গোবিন্দ নৃশংস অবাধ গতিতে পড়িয়ে গেল......

এবং দৃশ্য কখন করুণ, কখন হাস্যকর হ'য়ে সে-দিনটা ওতেই কেটে গেল।

কিন্তু এমন করে ত' চিরকাল চল্‌তে পারে না—

অতঃপর কি করা যায়, এই হ'ল মাষ্টারদের মস্ত ভাবনা।

ডাক্তার এলেন—

বলে' গেলেন, চিকিৎসা নেই। কবিরাজও ভরসা দিলেন না।......

মাষ্টারদের এ সঙ্কটে আমরাও ভাবছিলাম—

চার পাঁচজনে পরামর্শ করে' প্রস্তাব ক'রলাম, গোবিন্দকে বাড়ী রেখে আসব; তার বাপ মাকে বুঝিয়ে বলে আসব—তাঁরা কেঁদে কেটে না নেন। দরকার বুঝলে, গোবিন্দ ভালো না হ'য়ে ওঠা পর্য্যন্ত তার বাড়ীতেই থাকা যাবে।

শুনে হেডমাষ্টার কূল দেখতে পেলেন—

বল্‌লেন,—তাঁরা বুঝবেন ত' ব্যাপারটা?

—বুঝবেন বই কি; তাঁরা খুব ইয়ে, মানে পাড়া-গেঁয়ে হলেও একেবারে ইয়ে নয়। বলে' হেডমাষ্টারকে সাহস দিলাম।

—দেখিস, বাবা, তাঁরা যেন নালিশ টালিশ না করেন। তুই থাকিস কিছুদিন, তাঁদের থামিয়ে থুমিয়ে রাখিস।

আমি বল্‌লাম,—আজ্ঞে আচ্ছা। নালিশ টালিশ খবরাখবর হতে কিছুতেই দেব না।

এই বন্দোবস্ত হ'য়ে রইল।

পরদিন মর্নিং ইস্কুল হয়েই ছুটি।

বোর্ডিংএ গোবিন্দ, প্রকাশ আর আমি এক ঘরে থাকতাম। রাত্তিরে খাওয়া দাওয়া করে শুয়েছি; প্রকাশ

নাক ডাকাচ্ছে ; আমারও একটু তন্দ্রা এসেছে ; এমন সময় কে যেন আমার কানের সঙ্গে মুখ ঠেকিয়ে চুপি চুপি ডাকলে,—শশাঙ্ক ?

আমি চম্‌কে উঠে বল্‌লাম,—কে ?

—আমি গোবিন্দ।

—গোবিন্দ ?

গোবিন্দ আমার মুখ চেপে ধরে' বল্‌লে,—চুপ্।

তেম্‌নি চাপা গলায় বললুম,—তোর সে ইয়ে সেরে গেছে ?

—কি যদুপতি ব্যাকরণতীর্থ হওয়া ? হয়ই নি তার সারবে কি ! সব মিছে কথা।

—বলিস কি ?

—তোর দিব্যি। যা' করেছি সব সজ্ঞানে। কাল সকালে উঠেই আমায় বাড়ী রওনা করে' দিবি কিন্তু তুইও আমার সঙ্গে যাবি—তুই একা। গাড়ীতে বসে হবে'খন।

—কাল সেরে' উঠবি ?

—না। একটা মাস ওদের দুর্ভাবনায় কাটুক।

বলে' গোবিন্দ গিয়ে শুলে।

এদিকে আমি আমার খাট কাঁপিয়েহাসতে লাগলাম... ওদিকে গোবিন্দ তার খাট্ কাঁপিয়ে হাসতে লাগ্‌ল।...

পরদিন—

গোবিন্দকে নিয়ে রওনা হব তারি যোগাড় করছি ; বিছানা বাঁধা হ'য়ে গেছে ; গোবিন্দর বাক্সে তার বইগুলো গুছিয়ে রেখে দশটি টাকা তার হাতে দিয়েছি ; সে-ও টাকাগুলো ঝম্ ক'রে পকেটে ফেলেছে—এমন সময় বারান্দার ও ধারে একটা একটানা খস্ খস্ শব্দ উঠল।

রাখালবাবু এদিকে আসছেন—

ছড়িটা মাটির সঙ্গে ঠেকিয়ে টেনে আনা ছিল তাঁর অভ্যাস।

শব্দটি শুন্‌তে পেয়েই গোবিন্দর সঙ্গে চোখোচোখি করেই সতর্ক হয়ে গেলাম।......

রাখালবাবু এসে চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ ধরে' আমাদের যাওয়ার আয়োজন দেখলেন...

তারপর ভয়ঙ্কর গম্ভীর গলায় গোবিন্দকে উদ্দেশ করে' বল্‌লেন,—পণ্ডিতমশাই আমার টাকা সাতটা দেবার এখন সুবিধে হবে কি ?

গোবিন্দ স্পষ্টই চম্‌কে উঠ্‌ল—

বল্‌লে,—টাকা ? অমুক তমুক—আপনার—

আপনার মনে নেই দেখছি। জষ্ঠি মাসে নিয়েছিলেন, জামাইষষ্ঠীর ঠিক আগের দিন, জামাতৃ অর্চ্চন করেছিলেন মনে পড়েছে ?—বল্‌তে বল্‌তে রাখালবাবু এগিয়ে এসে, গোবিন্দ বসে' ছিল—তার সাম্‌নে দাঁড়ালেন।

আমার মনে হ'ল, রাখালবাবু পণ্ডিত মশাইয়ের সঙ্গে সচরাচর ঠিক এ-সুরে কথা বলেন না...আর তাঁর চোখ মুখের ভাব যেন আক্রোশে ক্রূর।

গোবিন্দও ভয় পেয়েছে দেখলাম, টাকাটা যথার্থ ই দিতে হবে বলে' কি রাখালবাবুর কণ্ঠস্বর শুনে তা' সেই জানে...

রাখালবাবুর গোবিন্দর ভয়টা লক্ষ্য করলেন তা-ও বেশ বুঝলাম।

যাই হোক, ঋণের কথাটা ভুলে যাওয়ার দরুণ নিরতিশয় অপ্রতিভ হয়ে গোবিন্দ বল্‌লে,—হেঁ হেঁ, মনে পড়েছে বটে, জামাই ষষ্ঠীর ঠিক আগের দিন নিয়েছিলাম বটে, যথাসময়ে দিই নি বটে, নিন নিন অমুক তমুক।

বলে টাকা সাতটি গুণে রাখাল বাবুর হাতে দিতে গিয়েই হঠাৎ হাত গুটিয়ে নিয়ে তন্দ্রা ভেঙ্গে গোবিন্দ বলে' উঠল,—আমি কোথায় ? বলেই অকপট বিস্ময়ে এদিক্ ওদিক্ চাইতে লাগল।.. ...

রাখাল বাবু বল্লেন,—তুমি এখানে, ইস্কুলের বোর্ডিংএ।

গোবিন্দ রাখালবাবুর মুখের দিকে শুষ্কমুখে চেয়ে বল্লে,—কামাখ্যাবাবু কোথায় ?

—তিনি বাড়ী গেছেন। বলেই রাখালবাবু একেবারে অকস্মাৎ হাত বাড়িয়ে গোবিন্দর বাঁ কানটা ধরে' ফেল্লেন—

হা ক'রে থাকলাম—

এবং গোবিন্দর মাথাটা তার কানের সাথে সাথে ডাইনে বাঁয়ে সমানতালে দুলতে লাগল।......

রাখালবাবু দাঁত কড়মড় করে' বল্‌তে লাগলেন,—খাটে শুয়ে খুব হাসি হচ্ছিল যে রাত্তিরে...আমি যে তখন খড়খড়ি তুলে দাঁড়িয়ে......শুনেছি সব......শুনেছি......শুনেছি......শুনেছি......

তিনটি প্রলয়ঙ্কর চাপড় তিনি গুণে গুণে গোবিন্দর মাথায় মারলেন।—

সব ফাঁস হ'য়ে গেল; কিন্তু কামাখ্যাবাবুকে দুর্জ্জয় একজন হিপ্‌নটিষ্ট বলে এখনো ইস্কুলের কেউ কেউ জানে। *

ইংরাজী হইতে

পত্র-চিত্র

শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

কাল নিজেই পোষ্টাপিসে গিয়াছিলাম। রূপ-গাঁর সেই ছোট পোষ্টাপিসটি! এখনও তেমনি আছে। পরিবর্ত্তন বিশেষ কিছুই হয় নাই। তবে ভাঙা দেওয়ালটিকে আশ্রয় করিয়া লাউ গাছের একটি লতা উঠিয়াছে, আর পুরানো পোষ্টাপিসের ভাঙা ঘরখানি এখনও পড়িয়া যায় নাই—তালপাতার ছাউনী দিয়া কোন রকমে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছে। পিয়ন বলিল, 'যাবেন না ওদিকে। মাষ্টার-মশায়ের ফিমেল্‌-কোয়ার্টার।' কিন্তু অতদূর যাইবার প্রয়োজন হইল না; ভাঙা দেওয়ালের ফাঁকে স্পষ্ট দেখা গেল, মাষ্টার-মশায়ের গৃহিনী উঠানে খাট পাতিয়া রোদে পড়িয়া আছেন,—মাথায় একটা লাল-রঙের গামছা বাঁধা। সম্ভবত জ্বর আসিয়াছে। আর তাহারই পাশে পাঁচ-ছ' বছরের ঘাগ্‌রা-পরা একটা মেয়ে ছোট একটা বাছুরের লেজ ধরিয়া টানাটানি করিতেছে।

"কে হে? কি চাই তোমার? এখানে কেন?"

পিছন ফিরিয়া দেখি, কালো রঙের ভুঁড়িওয়ালা বেঁটে একটি লোক, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, হাতে—দড়িতে বাঁধা একটি গাই।

বলিলাম, "পোষ্ট-মাষ্টারকে চাই।"

"আমিই পোষ্ট্‌-মাষ্টার।"

গলার আওয়াজ শুনিয়া এবং বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলাম। কিন্তু সে হাসির মানে একটুখানি পাল্‌টাইয়া দিয়া বলিলাম, "চিন্‌তে পারিনি। নমস্কার!"

"হুঁ" বলিয়া গম্ভীর ভাবে গাইটিকে টানিতে টানিতে

তিনি তাঁহার 'ফিমেল্-কোয়ার্টারে' গিয়া প্রবেশ করিলেন। ফুটা দেওয়ালের ফাঁকে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, "নতুন পোষ্টাপিস ওইদিকে। দেখতে পাও না? এখানে কেন?"

বলিলাম, "আসুন আপনি।"

তাঁহাকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না, কিন্তু জবাব আসিল, "হুঁ—।"

হড়াম্ করিয়া আল্‌কাতরা-মাখানো পোষ্টাপিসের কপাট দুইটি ভিতর হইতে খুলিয়া গেল। দেখিলাম, তিনিই। এবার আর হাতে গরু ছিল না, ছিল একটা থেলো হুঁকা।

উবু হইয়া ঘরের এক কোণে বসিয়া তিনি তামাক সাজিতে লাগিলেন।

মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাই কি হে?"

"রেজেষ্ট্রি আছে দুটো।"

কথাটা শুনিবামাত্র চোখ দুইটা তাঁহার হঠাৎ যেন জলিয়া উঠিল।—"হবে না, হবে না। জান না—আজ শনিবার। তিনটে বেজে গেছে। হবে না।"

অত্যন্ত রাগ হইল। বলিলাম, "আচ্ছা একটা টিকিট —না, তাও হবে না?"

"টিকিট দিতে পারি। বসো ওইখানে। তামাক খেয়ে নিই।"

বাহিরে চালায় দাঁড়াইয়াছিলাম। বসিতে হইলে মাটিতেই উবু হইয়া বসিতে হয়। বলিলাম, "থাক্— আমি দাঁড়িয়েই আছি। খেয়ে নিন্, আপনি তামাক খেয়ে নিন্।"

ভিতরে একটা দড়ির খাটিয়া পাতা ছিল। কলিকায় আগুন চড়াইয়া—সটান্ তিনি সেই খাটিয়ার দড়ির উপরেই পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িলেন। তাহার পর পায়ের উপর পা চাপাইয়া পাশ ফিরিয়া সে কি আরামের টান! পুড়ুক পুড়ুক করিয়া শব্দ উঠিতে থাকে, অল্প অল্প ধোঁয়া বাহির হয়, আর কস্ বাহিয়া লাল গড়াইয়া পড়ে। তখনি আবার সড়াৎ করিয়া লালটা মুখের ভিতর টানিয়া লইয়াই কোঁৎ করিয়া গিলিয়া ফেলেন। আবার শব্দ হয়।

এমনি করিয়া প্রায় আধ ঘণ্টাখানেক আরাম করিবার পর, খাটিয়া হইতে উঠিয়া যখন তিনি বসিলেন, দেখিলাম, তাঁহার নাদুস্-নুদুস্ নরম দেহের প্রায় সর্ব্বত্রই খাটিয়ার দড়ির চৌকা দাগ বসিয়া গেছে। বলিলেন, "টিকিট? ক'পয়সার?"

"চার পয়সার—একটি।"

পয়সা চারটি হাতে লইলেন, তাহার পর টিকিটখানি ফেলিয়া দিলেন।

তোমার চিঠির উপর টিকিটখানি বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আজকের ডাকটা একবার দেখাতে পারেন?"

"আঃ! মুস্কিল করলে দেখ্‌ছি!"

টেবিলের উপর হইতে এক গোছা চিঠি আনিয়া সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "বেছে নাও। ইংরেজি জান ত? আর কারও নামের নিও না কিন্তু—।"

চিঠিগুলি বাছিতেছি, হঠাৎ গোঁ গোঁ করিয়া কে যেন চীৎকার করিয়া উঠিল।

মুখ তুলিয়া দেখি, দড়ির সেই খাটিয়াটির উপর বসিয়া মাষ্টার-মহাশয় মহাভারত পড়িতে সুরু করিয়াছেন। মনে হইল যেন বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছেন।

তোমার চিঠিখানি ছাড়া আমার আর-কোনও চিঠিই ছিল না। কিন্তু রেজেষ্ট্রি দুটি যদি আজ না করিয়াই ফিরিয়া যাইতে হয়, সোমবার দিন আবার আমাকে এতটা পথ হাঁটিয়া আসিতে হইবে। এখন উপায়—?

মাষ্টার-মহাশয় আমার মুখের পানে তাকাইয়া হাসিলেন।—"কেমন?"

একেবারে মুগ্ধ হইয়া চক্ষু দুইটি ঈষৎ উর্দ্ধে তুলিয়া বলিলাম, "চমৎকার! এমন পড়া আমি কখনও শুনিনি— পড়ুন!

থপ্ করিয়া চৌকাঠের উপরেই বসিয়া পড়িলাম।

"শুনুন তবে!" বলিয়া থামিয়া থামিয়া অতি কষ্টে

আরও প্রায় একটা পৃষ্ঠা তিনি পড়িয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "আর-কোনও বই-টই পড়ি না—বুঝলেন? আমাদের এই বেঙির মায়ের জ্বর হয়েছে, বলি, শোন্ মহাভারত শোন্—বেশ তন্ করে' শুনিস্ কিন্তু। বাস্। রোজ দু' ঘণ্টা। দশ দিনের দিন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে' গেল

বুঝিলাম আমার শর-সন্ধান ব্যর্থ হয় নাই।

"আর শুনবেন?"

বলিলাম, "অনেক দূর যেতে হবে। আর একদিন এসে শুনে যাব। বাঃ! আচ্ছা পড়েন আপনি!"

হাত পাতিয়া বলিলেন, "কই, আপনার কি রেজেষ্ট্রি আছে দেখি!"

মোড়ক দুইটি পকেট হইতে বাহির করিয়া দিলাম।

"দেখুন, গাঁয়ের এই শালারা এম্নি বদ্—ভুলেও কেউ উপগার করে না একটি। ছ' সের করে' চাল বিক্রি করছে, আর আমি গেলে বলে কি না—পাঁচ সের।......বেশ। একদিন দাদার হাত—একদিন দিদির হাত!... আজ একটা রেজেষ্ট্রি ছিল গাঁয়ের লোকের। বলি, থাক্ বেটা তবে এইখানেই পড়ে' থাক্। পরশু যাবে। হুই দেখুন ফেলে রেখেছি!"

ঘরের এক কোণে কাঠের একটা বাক্সের দিকে আঙুল বাড়াইয়া কথা কয়টি বলিয়াই তিনি আমার মোড়ক দুইটি নাড়াচাড়া করিয়া কহিলেন, "কালও ত যাবে না মশাই, কাল রবিবার। যাবে পরশু। আচ্ছা রসিদ দুটো আমি পিয়নের হাতে পাঠিয়ে দেব। দিন, তিন তিন ছ' আনা লাগবে—দিয়ে যান।"

ছ' আনা পয়সা তাঁহার হাতে দিয়া বলিলাম, "যায় যেন ঠিক্।"

"বেঠিক্ কথা পাবেন না মশায় আমার কাছে—বেঠিক্ কথা নেই। তা যদি থাক্‌তো, বুঝলেন কিনা, পাঁচ বছর কাজ করে'—পিয়ন থেকে পোষ্ট্-মাষ্টার......" ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "উহুঁক্! হয় না কেউ! কত বেটা ফ্যা ফ্যা করছে। জানেন?"

তাহার পর কত কথা! কথা যেন আর ফুরাইতেই চায় না।

"পুত্তু ছ'টি আর কন্তে ছ'টি। পঁচিশটি টাকা মাইনেয় আর কত চালাই বলুন......তাও ভাগ্যিস্ মাম্‌লা-মোকদ্দমা করে' জমি ক'বিঘে পেলাম ভাই, তা না হ'লে......" গলাটা তাঁহার ধরিয়া আসিয়াছিল, একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন, "তুঁদুলের বাবুরা বড় ভাল লোক মশাই—বড় দয়ালু! আব-বছর ছিলাম সেইখানে। ওই যে ধলা গাইটা দেখলেন—এক সের করে' দুধ—ওঁরাই দিয়েছেন। বলে, ছোট মেয়েটা তোমার দুধ খাবে কেষ্টো নিয়ে যাও। কিন্তু এক সের দুধ কি আর......ওই পো'খানেক রাখি ঘরে, বাকি তিন পোয়া...ওই যে ওই থানার দারোগাবাবু...উনিই—"

"ওঁকেই দিয়ে দেন বুঝি?"

বলিলেন, "হ্যাঁ। আমি বলি, ছ' সের করে' সবজায়গাতেই, উনি বলেন, এ ত' ঘরে ঘরে বন্দোবস্ত মাষ্টার, সাত সের করেই হলো টাকায়—বুঝলে? আমি বলি—বেশ, তাই তা-ই।"

বাহিরে তাকাইয়া দেখিলাম, সন্ধ্যার সূর্য্য তখন পাটে বসিয়াছে। পশ্চিম আকাশটা লালে লাল!

অনেক দূর পথ। বলিলাম, "উঠি—।"

আমার সঙ্গে তিনি আর কথাই বলিলেন না। মহাভারতটা হাতের কাছেই ছিল। তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "লম্ফটা নিয়ে আয় ত বেঙি, বিরাট-পর্ব্বটা পড়ে ফেলি।"

তোমার চিঠিখানি পকেটে রাখিয়াছি কিনা দেখিয়াই উঠিয়া পড়িলাম।

সেইখানে দাঁড়াইয়াই চিঠিখানি পড়িতে পারিতাম, কিন্তু পড়িলাম না—পাছে শেষ হইয়া যায়!

চিঠিখানি পকেটে ছিল বলিয়া পথের কষ্ট বুঝিতে পারি নাই। ফিরিতে রাত্রি হইয়াছিল।

...অন্ধকার নির্জ্জন পথ। একদিকে ধানের

আর একদিকে শালের জঙ্গল। তখন উত্তরী বাতাস বহিতেছে। বনের মাঝে কোথায় না-জানি নাম-না-জানা কি একটা পাখী ডাকিতেছিল।...চমৎকার! ডাকিবার সময় বটে! নিস্তব্ধ বনানী···আকাশ অন্ধকার···গাছের আড়ালে দূরের গাঁয়ে আকাশ-প্রদীপের একটি আলো দেখা যায়—আঁচল-আড়ালে পল্লী-বধূর সন্ধ্যা-দীপের মত।

মনে হইতেছিল, সারা পথ তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছ।

ধান-মাঠের আলের পথে গিয়া নামিলাম। পথ আর চেনা যায় না। দু' পাশে বড় বড় ধানের গাছ নিতান্ত অন্তরঙ্গের মত তাহাদের স্নিগ্ধ সবুজ আবেষ্টনে আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। সবুজ ঘাসের মাঝখানে সাদা ধব্‌ধবে একফালি সরু পথ। মানুষের পায়ের চাপে কচি ঘাস আর কতক্ষণই বা বাঁচে!......তাহারই উপর দিয়া আগাইয়া চলিলাম।···

বিচিত্রা

মিস্ মেয়ো আমেরিকান মহিলা। তিনি তাঁহার 'মাদার-ইণ্ডিয়া' পুস্তকে ভারতবর্ষের নারীদের সম্বন্ধে অনেক কথা কহিয়াছেন। আমরা 'মাদার-ইণ্ডিয়া' পুস্তকখানা পড়িতে পারি নাই, কিন্তু মিঃ পিল্‌চারের বক্তৃতা যা ষ্টেট্‌সম্যান কাগজে বাহির হইয়াছিল, এবং অন্যত্র যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি, মিস্ মেয়ো কতটা মিথ্যা ও কতটা অর্দ্ধ সত্য বলিয়াছেন, কতটা সত্যকে বিকৃত করিয়াছেন।

* *
*

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই মিস্ মেয়োর উক্তির প্রতিবাদ হইয়াছে। আমাদের কলিকাতায় টাউন-হলে, সকল দলের লোক মিলিয়া—মিস্ মেয়োর উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন, এবং ষ্টেট্‌সম্যান কাগজ মিঃ পিল্‌চারের কথা তুলিয়া ভারত-নারীর কুৎসা প্রচার করিয়াছেন বলিয়া উহা বয়কট করার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

*
* *

স্বরাজ পাওয়ার যোগ্য যে ভারতবাসীরা নহে, তাহা প্রমাণ করিতে ভারতবর্ষের অধিবাসিদের অসভ্য করিয়া দেখানোর মতলব সাম্রাজ্যবাদীদের থাকিতে পারে। জানিনা ভারতবাসীদের অসভ্য প্রমাণ করিয়া,—বিশেষ, ভারতের নারীদের কুৎসা কীর্ত্তন করিয়া ভারতবাসীদের স্বরাজ না দেওয়ার 'কৈফিয়ৎ' দিবার কোনও আবশ্যকতা আছে কি না! স্বরাজ লাভের যোগ্যতার মাপকাটি তথা সভ্যতার মাপকাটি আজ চরিত্রে নহে, সতীত্বে নহে, জাতির উচ্চতর নীতিজ্ঞানে নহে; আজ কামান বন্দুকে অর্থ-সম্বন্ধে ও সংহতি শক্তির প্রভাবের মধ্যে স্বরাজ লাভের

যোগ্যতার বীজ নাকি আছে ; যারা পরস্বাপহরণ করিতে পারে, পররাজ্য লুণ্ঠন করিতে পারে, পরের শিল্প বাণিজ্য নানা উপায়ে ধ্বংস করিয়া নিজ ব্যবসায় বাণিজ্য বৃদ্ধি করিতে পারে, স্বরাজ লাভের তারা কেবলমাত্র যোগ্যই নহে, সম্রাজ্যের মালিক হইবার যোগ্যতাও তাদের আছে। চরিত্রবল, নীতিজ্ঞান, নারীর সতীত্ব যদি স্বরাজ লাভের যোগ্যতার নিদর্শন হইত, অনেক স্বাধীন, সুতরাং সভ্য জাতিকেই আজ স্বরাজ লাভে বঞ্চিত থাকিতে হইত। সুতরাং স্বরাজ লাভের অযোগ্যতা আমাদের কোথায় তাহা নিশ্চিত জানি বলিয়াই মিস্ মেয়োর উক্তিতে যে আমাদের স্বরাজ লাভ বা অলাভের পক্ষে বিশেষ কিছু কাজ করিবে, তাহা মানি না।

* *

*

মিস্ মেয়ো নিজেই কৈফিয়ৎ দিয়াছেন যে কাহারো দ্বারা নিযুক্ত হইয়া তিনি এই পুস্তক লেখেন নাই। এ কৈফিয়ৎ পুস্তকে লিখিয়া দেওয়ার আবশ্যকতা তিনি কেন বুঝিয়াছেন তিনিই জানেন। এই পুস্তক পড়িয়া লোকে হয়ত সন্দেহ করিবে যে তিনি ভারতবাসীর স্বরাজ লাভের বিরুদ্ধ দলের কাছ হইতে সাহায্য পাইয়া এই বই লিখিয়াছেন,—এমনই একটা আশঙ্কা করিয়াই কি তিনি পুস্তক লিখিয়া সেই সঙ্গে এই অনাবশ্যক কৈফিয়ৎ দিয়া ফেলিয়াছেন ?

* *

*

ভারতবাসীর সমাজে কোন দোষ নাই এই কথা বলিব, এমন অন্ধ আমরা নহি। কিন্তু ভারতভূমি ঘুরিয়া কেবল ভারতবর্ষের দোষ ছাড়া কোন গুণ চোখে পড়িবে না এত বড় অন্ধও ত কেহ থাকিতে পারে না। আমাদের সমাজে যদি গলদ থাকে তা আমরাই শোধরাইব, কিন্তু মিস্ মেয়ো মিথ্যা ও অর্দ্ধ-সত্য প্রচার করিয়া ভারতবাসীকে অসভ্য ও ভারতনারীকে হীন প্রমাণ করিবার জন্য যে মিথ্যা প্রয়াস পাইয়াছেন তাহাতে তিনি নিজেই আমাদের—ভারতবাসীদের—চোখে অতিমাত্রায় ছোট হইয়া পড়িয়াছেন।

* *

*

মিস্ মেয়োর এই জঘন্য মিথ্যা উক্তিতে আমাদের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হইবে না। আমাদের নারীদের চরিত্রবল ও সতীত্ব বিষয়ে আমরা শ্রদ্ধাযুক্ত। আমাদের সভ্যতা সম্বন্ধেও আমরা অচেতন নহি। এক—আমাদের এই চিত্র দেখিয়া যদি ইংরেজ রাজশক্তি স্বরাজ মঞ্জুর না করেন! কিন্তু আমরা জানি, ইংরেজও মনে প্রাণেই জানে, কেন আমরা স্বরাজ পাই না, আর ইংরেজ কোন্ স্বার্থে আমাদের স্বরাজ-প্রচেষ্টার পথে নিয়ত বাধা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে ! ইংরেজ যে দিন জানিবে স্বরাজ আটকাইবার ক্ষমতা আর তাহার নাই—তাহার সকল অজুহাতই বৃথা—তখন সে কোন অজুহাতই আর দিতে যাইবে না, যা সত্য তাকে সুবোধ বালকের মতই স্বীকার করিয়া লইবে। আজিও কোন অজুহাত না দেখাইয়াও সে পারে—গায়ের জোরই তার সকল যুক্তির সেরা যুক্তি ; কিন্তু তবু যে স্বরাজ না দেওয়ার অজুহাত দেয় সে কেবল কাগজপত্র দুরস্ত রাখিতে আর চক্ষু লজ্জা বাঁচাইয়া চলিতে ; কিন্তু ইংরেজও জানে এর সত্যই কোন প্রয়োজন নাই, আর আমরাও জানি (অন্ততঃ জানা উচিত) ইহার কোনই প্রয়োজন নাই।

আর দ্বিতীয়—সভ্যজাতির কাছে আমাদের হেয় প্রতিপন্ন করা। এ বিষয়ে আমরা শক্তিহীন। কারণ অর্থবলে ও অন্যান্য বলে ইংরেজ যতটা শক্তিশালী, সে যেমন করিয়া 'প্রোপাগাণ্ডা' চালাইয়া আমাদের কুৎসা রটাইতে পারে, আমরা তেমন সার্থক 'প্রোপাগাণ্ডা' করিতে পারি না। তবে সাধ্যানুসারে বিদেশে আমাদের দেশের সত্যকার রূপ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। কিছু কিছু চেষ্টা এ দিকে যে না হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু আরো

হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ, স্বরাজকামীরা বিদেশের সহানুভূতি কামনা করিবেন—এবং তা করা উচিত।

* * *

মিস্ মেয়োর বই যতটা প্রচার হইত, তার চাইতে ঢের বেশী প্রচার করিয়া দিয়াছি আমরা অত্যধিক নিষ্ফল প্রতিবাদ করিয়া।

স্বরাজ আমরা নিজেরা শক্তির শুল্কে আদায় করিব, ইংরেজ দয়া করিয়া দিবে না, বরং শেষদিন পর্য্যন্ত বাধা দিতে চেষ্টা করিবে ইহা আমরা নিশ্চিত বিশ্বাস করি, সুতরাং সেই ইংরেজ যখন মিথ্যা অজুহাতে আমাদের স্বরাজের অযোগ্যতার প্রমাণ দিতে বসে, আর আমরা অমনি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ঐ মিথ্যা প্রমাণ খণ্ডন করিতে শক্তি ও সময়ব্যয় বাহুল্য ভাবেই করিতে বসি, তখন ইহাই সাব্যস্ত হইয়া যায় যে আমাদের যোগ্যতার বিচারক ইংরেজ, এবং স্বরাজ দেওয়া না দেওয়ার মালিক ইংরেজই।

মহাত্মা গান্ধী মিস্ মেয়োর পুস্তক সবটা পড়িয়াছেন। তাঁহার মতে উহা মিথ্যায় পূর্ণ—অর্দ্ধসত্যে ভরা। ভারতবর্ষের সমাজে গলদ আছে একথা মিথ্যা নহে, কিন্তু গলদ ছাড়া ভারতবর্ষে আর কিছুই নাই—ইহা সত্যের অপলাপ—জঘন্য মিথ্যা। মিস্ মেয়ো এই ভাবেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচার করিয়াছেন। যাহাই হউক, মিস্ মেয়োর যে জঘন্য মতলবই থাকুক, আমরা আমাদের সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকে অধিকতর মনোযোগী যেন হইতে পারি। মিস্ মেয়ো আমাদের মা-বোনকে অমর্য্যাদা করিয়াছেন,—আমরা জানি তাঁহারা মর্য্যাদার যোগ্য। পুরুষ আমরা সে দিন টাউন-হলে আমাদের মা-বোনদের অমর্য্যাদার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছি, পূতচরিত্রা বিধবাদের অমর্য্যাদায় ব্যথিত হইয়া ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু আমরা পুরুষরা দেশের মা-বোনদের মর্য্যাদা যেন রাখিতে পারি। বাংলার মা-বোন যেন নিঃশঙ্কে, মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলা-ফেরা করিতে পারেন। অমর্য্যাদার ভয়ে তাঁহারা যে একাকী রাস্তায় বাহির হইতে পারেন না, বা পারা আজিও শক্ত, আমাদের সমাজের এই কলঙ্ক যেন আমরা মুছিয়া ফেলিতে পারি। গুণ্ডা বদমায়েস জোট বাঁধিয়া নারী হরণ করিয়া লইয়া যায়—সমাজের মধ্যেই গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়—এই কলঙ্ক যেন অতীতের বস্তু হয়। ব্রহ্মচারিণী দেবীকল্পা বিধবারা যেন সমাজে সত্যই সম্মান ও শ্রদ্ধা পান,—বিধবা যেন আর 'অসহায় বিধবা' হইয়া না পড়েন,—পুরুষ আমরা যেন নারী জাতির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে শক্তিশালী ও চরিত্রবান হই,—তবেই মিস্ মেয়োর শত মিথ্যার পরেও জয় আমাদেরই হইবে।

সরকার রাজবন্দীদের ক্রমে ক্রমে অন্তরীণ করিতেছেন। রাজবন্দীর অবস্থা হইতে অন্তরীণ যে বিশেষ সুখকর,—অভিজ্ঞতা যাদের আছে তারা তা বলেন না। রাজবন্দীদের স্থানে স্থানে অন্তরীণ রাখিয়া সরকার দেশবাসীর দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতে পারিবেন না। দেশবাসী চায় তাঁদের সম্পূর্ণ মুক্তি। সম্প্রতি সত্যেনবাবু ও মদনবাবু মুক্ত হইয়াছেন। অনেক রুগ্ন, ভগ্নস্বাস্থ্য যুবক এখনো অন্তরীণে আবদ্ধ আছেন। সরকারের ধরার ও ছাড়ার সূত্র আবিষ্কার করা দেবেরও অসাধ্য। যাহার খেয়ালের উপর ধরা ও ছাড়ার প্রহসন চলিয়াছে, সকলকে সসম্মানে ছাড়িয়া দেওয়ার খেয়াল তাহার হইবে না কি?

কলিকাতা করপোরেশনের শতকরা ৫০টি পদ

মুসলমানরা দাবী করিতেছেন। কলিকাতা করপোরেশনের ৫০টি চাকুরী মুসলমান সদস্যগণ কোন্ হেতুতে চাহেন?—সংখ্যা হিসাবেও নহে। সংখ্যায় শতকরা ৫০ জন তাঁহারা নহেন। শিক্ষা হিসাবেও যে নহেন তাহাও বোধ হয় তাঁদের অজানা নাই। ধর্ম্ম হিসাবেও তাঁহারা শতকরা ৫০ জন হন না। কারণ কলিকাতায় কেবলমাত্র হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মী লোকই নাই—অন্য ধর্ম্মাবলম্বীও আছেন। চাকুরীর যোগত্যা থাকিলে মুসলমানরা শতকরা ৯০টি চাকুরী পাইলেও আমরা আপত্তি করিব না; কিন্তু যেহেতু তাঁহারা মুসলমান সেই হেতুই ৫০টি পদ চাই, এই চাওয়া সঙ্গত নহে। কারণ অশিক্ষায় চাকুরীর যোগ্যতা বাড়ায় না। অনুন্নত থাকিলে উন্নতির ব্যবস্থার প্রস্তাব উঠান, সর্ব্বান্তঃকরণে আমরা তার সমর্থন করিব। যোগ্যতাকে জবাই করিয়া সম্প্রদায়বিশেষের অযোগ্যতাকে সমর্থন করা দেশকে পিছাইয়া দেওয়ারই নামান্তর।

পূজার অবকাশে শিক্ষিত বাঙ্গালী হাওয়া বদলাইতে যাইবেন। এই হাওয়া বদলানো ব্যাপারটা যদি অনেকেই একটু চেষ্টা করিয়া স্ব স্ব গ্রামে করেন তবে গ্রামের তথা দেশের হাওয়া অনেকটা বদলায়! গ্রামের অশিক্ষা ও কুসংস্কার—অস্বাস্থ্য—গ্রামে গেলে যতটা দূর করা যায় উপদেশ দিয়া গবেষণা করিয়া তাহা যায় না। শিক্ষিত বাঙ্গালী স্ব স্ব গ্রামে গিয়া পূজার সুদীর্ঘ অবকাশ কাটাইয়া আসুন,—স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন—বাংলার মাতৃপূজা ষোল আনা সার্থক হইবে।

শ্রী নলিনীকিশোর গুহ

প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশন আগামী বড়দিনের ছুটিতে মিরাটে হইবে স্থির হইয়াছে। এই সম্মিলন বাঙ্গালী মাত্রেরই গৌরবের ও আদরের বস্তু। ইহা আমাদের জাতীয় একতা ও অন্তরঙ্গতার প্রতীক স্বরূপ। মৌলিক প্রবন্ধ পাঠ ও তদ্বিষয়ক আলোচনা এই সম্মিলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই অনুষ্ঠানটির প্রতি বাঙ্গালীমাত্রেরই সহানুভূতি আকৃষ্ট হউক ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

অঙ্গারং শত ধৌতেন—

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১

মোহিনীর গায়ের রং মিশ-মিশে কালো ছিল, সাম্নের দুটি দাঁত উঁচু, চোখ দুটি ছোট, কপালখানা এত-খানি!

তাহার লজ্জা করিত; নামের সহিত চেহারার বিষম গরমিল; যে শুনিত, সেই নাক বেঁকাইয়া বলিত, মাগো! নামে ঘেন্না

ঘৃণা, অবজ্ঞা এবং অবহেলা লইয়াই তাহার ক্ষুদ্র জীবনটি আরম্ভ হইয়াছিল। বোধ করি, এমনিই হয় তাহাদের, যাহারা রূপের মূলধন না লইয়া এই সংসারের লেন-দেন সুরু করে! বিশেষ করিয়া একজন নারীর, যে জন্মিয়া তাহার বাপ-মার মুখ দেখিতে পাইল না, তাহাদের নিঃস্বার্থ সোহাগ-ভালবাসার এক কড়া-ক্রান্তিরও স্বাদ বুঝিল না।

দূর-সম্পর্কের মাসীর ঘরে কোন্ বন্যার দুর্ব্বিপাকে

মোহিনী কবে নীত হইয়াছিল তাহার ইতিহাস-কাহিনী আদর করিয়া বলিবার মত লোক তাহার ভাগ্যে জুটে নাই। জ্ঞান হইবার পর, দুঃখ-দুর্গতির সহিত অহরহ লড়াই করিয়া সে একদিন আঁস্তাকুড়ের ফুল-গাছের মত যৌবনের চক্রান্তে পুষ্পিত হইয়া উঠিয়া বুঝিল, তাহার জন্য লোভ করিবার মত মানুষও এ জগতে আছে!

ভালবাসার নেশায় তাহার মন মাতাল হইয়া উঠিল; পিছনে টানিয়া রাখিবার মত কোন আকর্ষণই ছিল না; তাই সে এক বসন্ত-নিশীথে জীবন নদীর স্রোতে গা-ভাসাইয়া দিল।

গঙ্গার তীরে প্রকাণ্ড চটের কল; ইটের চিম্‌নি অভ্র-ভেদ করিয়া বিদেশী মহাজনের অর্থ-দৃপ্ততা জাহির করিতেছে! সকালে বিকালে, সময়ে অসময়ে গুরু-গর্জ্জনে ভোঁ বাজিয়া দরিদ্র মানুষের উপর অর্থের সে এক নিষ্ঠুর বিজয় ঘোষণা!

বংশী কুলি-বস্তিতে দুইখানি ঘর ভাড়া করিয়া মোহিনীকে রাখিল।

কলে বংশী মিস্ত্রির কাজ করিত।

শৈশবে কোন অজ্ঞাত অর্জ্জুন-বন্ধুর অব্যর্থ শর-সন্ধানে বংশীর একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। দুই চোখ থাকিলে সে দুই হাত পূর্ণ করিয়াই টাকা ঘরে আনিতে পারিত; কিন্তু যাহা আর কিছুতেই মেরামত করিবার নহে তাহার জন্য শোক করিয়া লাভ কি?

মোহিনী বংশীর সামান্য টাকাতেই সংসারটিকে সুন্দর করিয়া তুলিবার জন্য কোমর বাঁধিল।

দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাওয়া, কস্তা-পাড় শাড়ী পরিয়া গঙ্গা হইতে জল আনা, এও কি কম সৌভাগ্য! মোহিনী জানিত দিনের পর দিন না খাইয়া থাকার লজ্জা নিবারণের জন্য ঘরের কোণের আশ্রয়টি কত সুখের আর? সে কথা মনে করিলেও সে শিহরিয়া উঠিত।

মোহিনী বংশীর ঘরে আসিয়া প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া বাঁচিল।

কিন্তু বিধাতার সে হাসি সহ্য হইল না।

বস্তির পশ্চিম সীমায় দুইখানা ঘর ভাড়া করিয়া পিয়ারী দোকান করিত। তাহার চটুল হাসির চটকে সন্ধ্যার পর অনেকেই গিয়া সেখানে জমিত।

পান চিবাইতে চিবাইতে সিগারেট টানার আরাম যে না জানে তাহার মনুষ্য জন্মই বৃথা! আবার সেই সঙ্গে পিয়ারীর পাৎলা ঠোঁট নিঃসৃত মিঠে বুলির ওয়াজ, এক-দম কেয়াবাৎ!

একদিন বংশী মিস্ত্রী পরিষ্কার হৃদয়ঙ্গম করিল যে পেয়ারীর হাসিতে তাহার মনের মধ্যে ত্রাসের একটুও সঞ্চার হয় না। তাই সে মোহিনীর দিকে কাণা চোখটি ফিরাইয়া দিয়া অনিমিখ নেত্রে পিয়ারীর হাসিটুকু লুটিয়া লইবার চেষ্টায় অনুক্ষণ রহিল।

ভালবাসার খরাটানে হঠাৎ টান বুঝিয়া মোহিনী চিন্তিত হইয়া উঠিল; কিন্তু তাহার শক্তিতে কুলাইল না। অন্তরের ধন যে তাহার সারা বুক জুড়িয়া বসিয়াছে!

মোহিনী তখন দোহদ-কাতর।

প্রথম প্রথম বংশী রাত করিয়া আসিত, তাহার পর রাত কাবারও হইয়া যাইতে লাগিল।

যাহা ঘটিত, বস্তির মেয়েরা তাহার দশগুণ বাড়াইয়া মোহিনীকে বলিত। মোহিনী তাহার কপাল দেখাইয়া তাহাদিগকে কহিত, যা নেকা আছে, তা কে খণ্ডাবে?

কিন্তু মন কিছুতেই বুঝে না, ভিতরের রক্ত ঈর্ষায়, রাগে টগ্‌-বগ্‌ করিতে থাকে।

একদিন মোহিনী বংশীকে দশ-কথা শুনাইয়াও দিল।

বংশী রাগে চক্ষুটি বিস্ফারিত করিয়া বলিল, তোর

পয়সায় মদ খাই? তোর খাই, না, পরি মাগি? মুখ নাড়া দিচ্চিস্ কিসের জোরে?—না জানি তুই যদি ধম্মো-মাগ্ হতিস্—তোকেও ত' বের ক'রে এনেছি রে ছুঁড়ি!……

মোহিনী নীরব হইয়া গেল।

২

মোহিনী চুপ করিল বটে, কিন্তু কথাটা গড়াইতে গড়াইতে গিয়া কলের ছোট সাহেবের কাণে উঠিল। সোমবারে বংশীর গর-হাজিরি একটা ধরা-বাঁধা নিয়মের মধ্যেই দাঁড়াইয়াছিল।

তিনবার নোটিশের পর বড় সাহেব ডাকিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিল।

বংশী বাড়ি ফিরিল না। পিয়ারীর দোকানে বসিয়া চুপি চুপি কি পরামর্শ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল। কেহ বলিল, অন্য কলে চাক্‌রির সন্ধানে গেছে। কেহ বলিল, সে দূর দেশে চ'লে গেছে।

এই সংবাদ মোহিনীর কাণে পৌঁছিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না।

মোহিনী বুঝিল, তিন মাসের মেয়ে অলসাকে লইয়া এবার সত্যই সে দুঃখের সমুদ্রে ভাসিল। বংশী ফিরিলেও সে আর তাহার নহে, পিয়ারীর কেনা গোলাম।

লোকে দু' চার দিন দয়া করিয়া কিছু-কিছু ডাল-চাল দিয়া গেল বটে; কিন্তু সবাই একবাক্যে বলিল যে তাকে একটা কিছু উপায় দেখ্‌তেই হয়।

সেদিন ভোঁ-বাজার সঙ্গে সঙ্গে মোহিনী গিয়া কলের ফটকের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। যা ঘটে ঘটুক, না হয় সাহেবের চাবুক খাইয়াই প্রাণ যাইবে।

সবাই নিজের নিজের কাজে চলিয়া গেল। সে এক-পাশে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ভাগ্যে দারওয়ানের জর হইয়াছিল—তাই তাহাকে কেহই গলা-ধাক্কা দিল না।

হঠাৎ ফটকের লোহার দরজার সাম্‌নে আসিয়া একটা হাওয়া গাড়ী উপস্থিত।

মোহিনী ভয়ে জড়-সড় হইল।

পিছন হইতে বড় সায়েব ছুটিয়া আসিয়া গাড়ীখানা ভিতরে লইয়া গেল।

মেমসাহেবের ভারি অসুখ। কলিকাতা হইতে ডাক্তার ডাকা হইয়াছে।

মোহিনী মনে করিয়াছিল সাহেবের পা-জড়াইয়া ধরিয়া একটা সোজা-কাজ চাহিয়া লইবে।

বুঝিল, সে পথেও কাঁটা।

তবুও সে জোর করিয়া বসিয়া রহিল, দেখিই না, শেষ পর্য্যন্ত কি হয়? শেষে না হয় গলায় হাত দিয়ে বার ক'রে দেবে। সে আর এত কি বেশী?

জমাদারনী পথ ঝাঁটাইতে আসিয়াছিল; সে মোহিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে গা?

মোহিনী নিজের বৃত্তান্ত বলিল।

জমাদারনী বলিল, তুই কলের হাতার মধ্যে এসে থাক্‌তে পারবি?

কি না পারি মা, পেটের দায়ে?

জমাদারনী বিস্মিত হইল। আহা! মেয়েটি বড় নরম স্বভাব, কত দুঃখেই না প'ড়েছে!

মোহিনীর চাক্‌রি জুটিল।

কিন্তু তাহাকে কাপড় ছাড়িয়া ঘাঘ্‌রা পরিতে হইল।

বড় সায়েবের তিন মাসের ছেলেটিকে নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া মোহিনী বলিল, তুমি তিন মাসের বাচ্চা, তবুও বাবা, আমার রক্ষে-কর্ত্তা; বেঁচে থাক! তোমা

কল্যাণে আমি দু-মুঠো নিজে খেতে পাবো, আমার মেয়েটাও বাঁচবে।

মোহিনী আর বংশীর কথা মনে করিত না। থাক্ সে সুখে তার পিয়ারীকে নিয়ে!

৩

জনির জন্য মোহিনী যাহা করিল সে ঋণ কেহ শোধ করিতে পারে না; সাহেব আর কিছু না বুঝিলেও এই কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিল। তাই মোহিনীকে বিদায় করিবার সময় তাহার নামে কুলি-বস্তির মধ্যে একখানা বাড়ি লিখিয়া দিল এবং কল হইতে মোহিনীর জীবদ্দশা পর্য্যন্ত মাসহারা বরাদ্দ হইল।

মোহিনী কিন্তু বসিয়া খাইবার মানুষ নয়। সে বাড়িখানি ভাড়া দিয়া ভদ্রলোকের বাড়িতে চাকরি লইল।

বস্তির লোক হাসিল, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

মোহিনী বলিল, আমি একা মানুষ। একজন পুরুষ নইলে কি থাকতে পারি? অলসার বে-দিয়ে নাতি-নাত্নী নিয়ে ঘর ক'রবো, যদি নিকে থাকে সে-সুখ কপালে!......

খবর দেনা বংশীকে।

মুয়ে আগুন একচোকো মিন্সের।

মোহিনীর কিন্তু সবচেয়ে বিপদ হইল একটা বিরাট লোহা-কাঠের সিন্দুক লইয়া। সায়েব সেটি তাহাকে বড় খুসী হইয়াই দিয়াছিল। তাহার চাবি ছিল বিচিত্র, না জানিলে খোলা যায় না।

মোহিনী তাহার ভিতর নিজের কাপড়-চোপড় রাখিত; আর রাখিত......মোহিনীর সে বড় গোপনীয় কথা! সে কথা মনে করিলে তাহার সর্ব্ব-শরীর কাঁপিতে থাকে; জিভ শুকাইয়া কাঠ হইয়া যায়!

ভাড়াটিয়া গছিতে চাহে না; অবশেষে সে ছোট সাহেবের কাছে গিয়া কলের গুদাম ঘরে সেটাকে রাখিয়া আসিল।

কলে ত' তাহার অবাধ-গতি।

মোহিনী যে বাড়িতেই কাজ করিতে যায় তাহারা তার গুণে মুগ্ধ হয়।

একদিন বোস-গৃহিণী তাহাকে সোহাগ করিয়া বলিলেন,—ওলো, প্রথম দিনে হেসেছিলুম তোর নাম শুনে; আজ বুঝছি, কেন তোর বাপ-মায়ে দিয়েছিল ওই-নাম।

মোহিনী হাসে আর বলে, লজ্জা দিও না মা।

মোহিনীর হাতে টাকা-কড়ি, জিনিষ-পত্র, ঘর-ভাণ্ডার সব! পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিতেই মানুষ এমন দাসী পায়!

সংসার চলে যেন স্রোতের মুখে নৌকা ভাসিয়া যাওয়ার মতই।

ওকি লা, কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো ফুলিয়েছিস্ কেন মোহিনী?

ভারি ভাঙ্গা কান্নার গলায় সে বলিল, এই বুঝে নেও মা, ভাড়ারের চাবি, তোমার জিনিষপত্র সব। এ বাড়িতে আমার অন্ন-জল উঠেছে।

সেকি লো! তোর হোলই বা কি? খুলে বল্ না কেন?

মোহিনী কাঁদে, কিছুই বলিতে পারে না!

সে সেখানে আর কিছুতেই কাজ করিল না।

শেষ পর্য্যন্ত সকলেই জানিল যে মোহিনীর ঘাড়ে ভূত আছে। কোথাও সে বেশী দিন টিকিতে পারে না। কিন্তু তাহার মত লোক পাওয়া শক্ত।

এমনি করিয়া দিনের পর দিন কাটিল। কলের মাসহারা জমিয়া অনেক টাকা হইল। সত্যই তাহার খাটিয়া খাইবার প্রয়োজন ছিল না।

অবশেষে তাহার বুদ্ধি ফিরিল; সে অলসার বিবাহ দিয়া সংসারে মন দিল।

দিদিমণি !

কি ব'লছো মাণিক ?

তোর এই সিন্দুকে কি আছে ?

মোহিনী রাগিয়া উঠিয়া গর্‌গর্‌ করিতে লাগিল। চাপা গলায় জামাইএর উদ্দেশ্যে সে বলিল, ঘুম হচ্ছে না আর! পেতিস্‌ নে তো খেতে পত্তে! পায়ের উপর পা দিয়ে দু' বেলা মাছ ভাত খাচ্ছিস্‌! ..

অলসা আসিয়া বলিল, কি বল তো মা? সে যেন তাড়িয়া-ফুঁড়িয়া লড়াই করিতেই আসিয়াছিল।

মোহিনী তাহার কথার উত্তর না দিয়াই বলিল, আমার পিণ্ডি আছে ঐ সিন্দুকে, মরলে খুলে দেখিস্‌; তারও তর সয় না···মরবো লো মরবো একদিন!

অলসা রাগিয়া এক চড় মারিল মোহিতকে। আর যাইবে কোথায়? মোহিনী জ্বলিয়া উঠিল, খবরদার ওলসি, তুই আমার সাম্‌নে ছেলের গায়ে হাত তুল্‌বি তো দেখতে পাবি, ব'লে দিচ্চি ..

মোহিনীর মেজাজ মোটেই উগ্র নয়; কিন্তু এই সিন্দুকের প্রসঙ্গে সে একেবারে ক্ষেপিয়া যাইত।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে মোহিনীর সিন্দুক সম্বন্ধে সতর্কতা বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

অবশেষে তাহার বিছানা উঠিল গিয়া সেই প্রকাণ্ড লোহা-কাঠের সিন্দুকটার উপরেই!

মোহিতের কৌতুহলের শেষ নাই। সে জিজ্ঞাসা করে, মা, দিদিমণির ঐ সিন্দুকের মধ্যে কি আছে?

অলসা ধমক দিয়া বলে, চুপ্‌-চুপ্‌, শুন্‌তে পেলে আর রক্ষে রাখবে না মা।

মোহিত তবুও ছাড়িতে চাহে না, চুপি-চুপি বলে, তুই জানিস্‌ নে মা?

অলসা তাহার কাণে কাণে বলে, কলের বড় সায়েব একহাঁড়ি মোহর দিয়ে গেছে!

মোহর কি মা? মোহর খায়?

দূর্‌ হতভাগা, মোহর সোনার টাকা রে!

তাতে কি হয় মা, বল্‌ না?

অলসা রাগ করিয়া বলে, পারিনে আমি তোর সঙ্গে সমস্ত-দিন ব'কতে।

মোহিত শুনিয়াছিল সিন্দুকের চাবি মোহিনীর কোমরের ঘুন্‌সিতে বাঁধা থাকে।

একদিন সে সেই চাবিটা তাহার নিদ্রিত অবস্থায় ঘুন্‌সি কাটিয়া উদ্ধার করিল।

মোহিনীর যখন খেয়াল হইল, তখন একটা রৈ-রাবণের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। মেয়ে-জামাই হইতে সুরু করিয়া নাতি-নাতনী পর্য্যন্ত কাহারো কুষ্টি কাটিতে মোহিনী ছাড়িল না।

কিন্তু চাবি কিছুতেই বাহির হয় না!

অবশেষে গণৎকার আসিয়া চাল-পড়া দিয়া বলিল, চাবি যাহার কাছে আছে তাহার মুখ হইতে রক্ত বাহির হইবে!

মোহিত ভয়ে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া চাবি বাহির করিয়া দিল।

বোস-গৃহিনী মোহিনীকে জোর তলবে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

মোহিনী গিয়া উপস্থিত হইলে বলিলেন, তোর কোন আপত্তি শুন্‌বো না মোহিনী, তোকে যেতেই হবে চারুর সঙ্গে তার শ্বশুর বাড়ি···আট দশ দিন বাড়ি ছেড়ে থাক্‌তে পারবিনে—এ একটা কথা?

মোহিনী বলিল, তা' কি আর বল্‌তে পারি; হাজার হোক তোমরা পুরোণো মুনিব, তোমাদের কত নুন খেয়েছি···তবে কি না মা···

রাখ্‌ রাখ্‌,—তোর ওই আহ্লাদিপণা···ওসব আমি কিছুই শুন্‌বো না···

মোহিনী কি করে, রাজি হইয়া বাড়ি ফিরিল।

একান্তে বসিয়া মোহিনী অনেক ভাবিল-চিন্তাইল, শুনচি—জামাইরা খুব বড়লোক, তাইতো আমার ভয়। হাত দু'খানা নিয়েই তো বিপদ—কিযে হয়! কিছুতেই আর সামাল দিতে পারিনে।

হে মা কালী, হে মা দুর্গা...মোহিনীর এই বোধহয় শেষ পরীক্ষে, তোমরা মুখ তুলে চেও।

তাহার পর হাত দু'খানাকে বহুমতে নিপীড়ন করিল, বলিল, সাবধান বলে দিচ্চি—এবারে কিছুতেই নয়।

নূতন কুটুম্বের বাড়ি গিয়া দিন-দুই চার ভালই কাটিল মোহিনীর।

হঠাৎ এক রাত্রে তাহার ঘাড়ে ভূত চাপিল। এবারে ছোট-খাট কিছু নয়, কর্ত্তার আসল হীরার আংটিটা। কর্ত্তা স্নানের ঘরে খুলিয়া ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন। মোহিনী আর কিছুতেই তাহার হাত দুইটাকে সাম্‌লাইতে পারিল না।

সকালে সেই ভূতের বাণ্ড! কান্না-কাটি! মোহিনী একেবারে পাগল হইয়া গেল।

নিরুপায় দেখিয়া তাহারা মোহিনীকে দিয়া গেল।

মোহিনী আর কোথাও থাকিবে না। তাই তাহাকে সেই সিন্দুকের উপর শোয়াইয়া দেওয়া হইল। জ্বরে তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া যাইতেছে। মুখে অনর্গল অসম্বদ্ধ প্রলাপ।

বড় সায়েব, ফিরিয়ে নেও বাপু তোমার ঐ সব জিনিষ, নইলে মোহিনীর সুখ নেই ম'রেও · হারিয়েছে? ছাই ..

এমনি করিয়া তিনদিন অনুতাপাগ্নি বিদগ্ধ হইয়া মোহিনী ইহলোকের যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

তাহার ঘুন্‌সি হইতে চাবি খুলিয়া লইবার সময় ঘুন্‌সিতে বাঁধা একটা হীরার আংটিও পাওয়া গিয়াছিল।

* * * *
* * *
* *
*

অনেক কষ্টে অলসা সিন্দুক খুলিয়া অবাক হইয়া গেল। তাহাতে একটিও মোহর ছিল না।

লোকে কিন্তু তাহাকে কিছুতেই বিশ্বাস করে না। সিন্দুকে তবে ছিল কি?—সবাই একবাক্যে জিজ্ঞাসা করে। অলসা অবনত মস্তকে মৌন হইয়া থাকে।

শ্রী শিশিরকুমার নিয়োগী কর্ত্তৃক, ১এ, রামকিষণ দাসের লেন, নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস হইতে মুদ্রিত ও
বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

চিত্রকর :—ই, এইচ, ব্লাসফিল্ড।

কালি-কলম

২য় বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩৩৪ [৭ম সংখ্যা

চিত্রবহা

—পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর—

শ্রী সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২৭

সনাতনী

অমর কলিকাতা পৌঁছিলে তাহাকে দেখিবার জন্য আত্মীয় ও বন্ধু-সমাগম হইতে লাগিল। আগমনের উদ্দেশ্য অবশ্য সকলের এক নয়। বয়সে বা মনে যাহারা কাঁচা তাহারা আসিল অমরের মুখে জাপানের গল্প শুনিবার জন্য। আর বিজ্ঞের দল আসিল, অমর সাগরপারে গিয়া জাত খোয়াইয়া কেমন বাঁদর হইয়া আসিয়াছে তাহাই দেখিবার জন্য।

এই শেষোক্ত শ্রেণীর কেহ কেহ অমরকে ধুতি গেঞ্জি পরিয়া ঠনঠনের চটি পায়ে দিয়া বাংলা কথা কহিতে শুনিয়া থ' বনিয়া গেল। তাই ত হে! তুমি যে একেবারে খাঁটি বাঙালী আছ, একটুও বদলাও নি! যেমনটি গিয়েছিলে ঠিক তেমনি ফিরে এয়েছ! আশ্চর্য্য বটে!

তাদের কথার সুরে আনন্দের চেয়ে নিরাশাটাই ফুটিয়া উঠিল বেশি। মনে হইল যেন উল্টাটা দেখিতে পাইলেই তারা তৃপ্ত হইত।

কেহ কেহ বলিল, ভেবেছিলুম এসে দেখবো কোট-প্যান্টলুন পরে' জুতো মস্‌মসিয়ে বেড়াচ্ছ, কাঁটা-চামচ ধরে' টেবিলে খানা খাচ্ছ, গ্যাটম্যাট করে' ইংরিজি বলছো। হেঃ হেঃ হেঃ...

ত্রিলোচন দূরসম্পর্কে অমরের ঠাকুর্দ্দা, বয়স পঞ্চাশ পার হইয়াছে। সেই সম্পর্ক ধরিয়া রসিকতার মাত্রা আর এক ধাপ চড়াইয়া সে বলিল, কি হে ভায়া, একলা ফিরলে যে! ভেবেছিলুম জাপান-দেশ থেকে বুঝি বা খ্যাঁদানাকী নাতনী জোগাড় করেই ফিরছো! কাটালে ত সেখানে অনেক কাল!

অমর হাসিয়া বলিল, আনলে ক্ষতি কি ছিল?

ত্রিলোচন কহিল, রামচন্দ্রঃ! ক্ষেতির কথা কে বল্লে?

সাগরপারেই যখন এতদিন কাটাতে পারলে, তখ॰ র আর …উনিশ আর বিশ বইত নয়! তোমরা আজকাল॰ কার ছেলে, তোমরা কি আর আমাদের মতন! আমরা হলুম গিয়ে ওল্ড্-ফুলের দল! কি বলো? হাঃ হাঃ হাঃ…

এক দিন বৈষ্ণনাথ আসিয়া পৌছিল। কুশল প্রশ্নাদির পর সে অমরকে কহিল, তোমার বোন তোমায় দেখতে আসতে চায়।

অমর খুসি হইয়া বলিল, বেশ ত! কবে আসচে? আজই আনলেন না কেন?

বৈষ্ণনাথ বলিল, সেই জন্যেই ত এলুম্।

অমর জিজ্ঞাসা করিল, তার মানে?

বৈষ্ণনাথ বিজ্ঞের মত বলিল, তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি আছে, এত লেখাপড়া শিখলে, এটা বোঝ না? সে এখনি আসে কি করে'?

অমর অসহি … বলিল, গৌরচন্দ্রিকা ছেড়ে দয়া করে' বক্তব্যটা। … ই বলুন না!

বৈষ্ণনাথ ক … একটা প্রায়শ্চিত্ত করে' ফ্যালো, তা হলেই আসবে। সমুদ্র পারে গেলে আমাদের সমাজে প্রায়শ্চিত্ত দরকার—এ কথা নিশ্চয়ই জানো!

অমর কহিল, অর্থাৎ আপনি বলছেন আমি প্রায়শ্চিত্ত না করলে সুকুকে এখানে পাঠাবেন না। এই ত?

বৈষ্ণনাথ মনে মনে অমরকে ভয় করিত। অমরের বিরক্তভাব লক্ষ্য করিয়া আমতা-আমতা করিয়া সে কহিল, তা, হ্যাঁ, কতকটা তাই বটে।

অমর কহিল, দেখুন, পাপ করলে তার প্রায়শ্চিত্ত দরকার। লেখাপড়া করতে বিদেশে গিয়ে কি এমন পাপ-কার্য্য করলুম?

কাঁচা পাকা চুলের শিখাটি নাড়িয়া বৈষ্ণনাথ বলিল, আহা পাপপুণ্যের কথা হচ্ছে না! সমাজে একটা বিধি রয়েছে, সেটা ঠেলি কেমন করে'?

চট্ করিয়া অমরের করুণার কথা মনে পড়িয়া গেল। সে-ও সমাজবিধির পেষণেই গৃহত্যাগিনী হইয়াছে! অমরের মন তিতো হইয়া উঠিল।

প্রকাশ্যে কহিল, বিধি থাকলেই মানতে হবে না কি? বেশ … ! বিধি যদি নিরর্থক হয়, অন্যায় হয়, তা হলেও মানতে হবে …?

বৈষ্ণনাথ ক… হিল, তুচ্ছ একটা প্রায়শ্চিত্ত করলে যদি তোমার বোন আসতে … পারে তাহলে তোমার এত আপত্তি কিসের? ক্ষণকাল থামিয়া … বলিল, কিছুই করতে হবে না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কিছু কিছু … দক্ষিণা দিলেই চুকে যাবে। শ' দুত্তিন টাকার মামলা বই ত নয় …!

অমর কহিল, সে-টাকা আপনা… র কাছে তুচ্ছ হতে পারে, আমার কাছে নয়। আমাদের দে… শের অনেকে অত টাকা কখনো চোখেও দেখেনি! আর … টাকা যদি খরচই করতে হয়, তাহলে লোভী মুখ্যু বামুনকে … দিতে যাবে কেন? ঢের ভালো কাজে তা খরচ করা … যেতে পারে। শেষে বলিল, যাকগে, আমি আর তর্ক করতে … চাই না। সোজা কথা হচ্ছে এই, আমি প্রায়শ্চিত্ত করবো না!

বৈষ্ণনাথ প্রমাদ গণিল। খুব শান্ত ভাবে … কহিল দ্যাখো, বুঝ্চই ত, ব্যাপারটা কিছুই নয়, লোক দেখানো মাত্তর! কি করবে বলো, সমাজে থাকতে হলে…

বৈষ্ণনাথকে শেষ করিতে না দিয়া অমর জ্বলি… য়া উঠি… কহিল, ভণ্ডামি করতে হয়! ভণ্ডামি না কর… লে যে … সমাজে স্থান হয় না, সে-সমাজে থাকার জন্যে আমা… মাথা ব্যথা নেই!

অতঃপর অমরকে ঘাটানো আর যুক্তিযুক্ত বি… বেচনা … করিয়া বৈষ্ণনাথ উঠিয়া বলিল, যাই একবার ম… াব স… দেখা করে' আসি।

কিছুক্ষণ পরে মাতার আহ্বানে অন্দরে আসি… য়া অ… দেখিল ভাঁড়ারঘরে পট্টবস্ত্র পরিয়া বসিয়া ক্যাত্যায়… নী এ… খানা ছোট কুলার উপর ছড়ানো জো… নের ধ… লাম বাছিতেছে। আর চৌকাটের বাহিরে বৈষ্ণনাথ আ… উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

অমর আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি মা? আমায় ডেকেছ?

কাত্যায়নী বলিল, হ্যাঁ বাবা। বোসো। বলিয়া বৈদ্যনাথের পাশে একখানা আসন বিছাইয়া দিল।

অমর বসিলে সে বলিল, বদ্দিনাথ বলছিল···

অমর তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, সুকুর আসা সম্বন্ধে ত? সে-সব আমি শুনেছি।

কাত্যায়নী বলিল, সুকু তোমায় বড় ভালবাসে বাবা। সে না আসতে পারলে মনে ভাবি কষ্ট পাবে। একটা পায়েচ্চিত্তির করেই ফেল না বাবা, বদ্দিনাথ বলছে সব বন্দোবস্ত করে' দেবে·

বৈদ্যনাথের পানে অমর দৃষ্টিপাত করিল। পরের চরকায় তেল দিয়াই তার দিন কাটিল, নিজের চরকায় তেল দিবার আর অবসর হইল না।

সংক্ষেপে সে কহিল, হ্যাঁ ওঁর আর কি কাজ।

কাত্যায়নীর স্বর করুণ হইয়া উঠিল। সে কহিতে লাগিল, ভেবে দ্যাখ্ বাবা। পায়েচ্চিত্তির যদি না করিস তাহলে কি আর সুকু কখনো এ বাড়িতে আসতে পারবে? তার সঙ্গে আর জন্মে দেখা হবে না। সে যে তোকে কত ভালবাসে, এই কি তার পিরতিদান।

কাত্যায়নী আঁচলে চোখ মুছিল।

অমর বিরক্ত হইয়া কহিল, বাড়ি পৌঁছুতে না পৌঁছুতে কান্নাকাটি সুরু হল। বেশ, আমি আলাদা থাকবার ব্যবস্থা করি, তাহলে আর সুকুর এখানে আসবার কোনো বাধা থাকবে না।

কাত্যায়নী কহিল, তাই কি বল্লুম বাবা? সে কি কথা! বৈদ্যনাথের পানে ফিরিয়া কহিল, তোমরা যা ভালো বোঝো করো। আমি আর এ সবের মধ্যে নেই বাপু! আমি কি-ই বা বুঝি! আমায় তোমরা রেহাই দাও।

[illegible]লিয়া, ফিরিয়া বসিয়া, জোয়ান বাছায় মন দিল।

[illegible] ঁড়ির উদ্দেশে একটা প্রণাম করিয়া বৈদ্যনাথ কহিল, আজ তাহলে উঠি। আমায় আবার কবরেজের বাড়ি যেতে হবে।

বৈদ্যনাথ বিদায় হইবার পর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত অমর নীরবে বসিয়া আড়চোখে মায়ের মুখ পানে চাহিয়া চাহিয়া শেষে উঠিয়া ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

মায়ের পাশে খালি মেঝের উপর বসিয়া বলিল, রাগ করলে মা।

কাত্যায়নী রুদ্ধ অভিমানে বলিল, না, রাগ কিসের?

মায়ের মাথাটা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া অমর বলিল, বলো রাগ করনি? কেন তুমি পাঁচজনের কথায় মাথা ঘামাও? আমি বলছি, প্রথম প্রথম অমন লোকে বলে' থাকে। তারপর দেখবে সবাই আসবে, কেউ বাকি থাকবে না।

কাত্যায়নীর কঠিন ভাবটা কাটিয়া গেল। বলিল, নে ছাড়্। আমায় কাজ করতে দে।

অমর বলিল, কাজটা কি আমার চেয়ে বড়ো হল মা?

কাত্যায়নী হাসিল। সস্নেহে পুত্রের পানে চাহিয়া বলিল, তোর সঙ্গে পারবার জো নেই! কেন আমায় এত জ্বালাস বল ত?

অমর হাসিয়া বলিল, স্বভাব মা স্বভাব। যাক্‌গে সে সব কথা। এস আমার সঙ্গে গল্প করো। বলিয়া মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

অনন্তবাবু অমরের পিতৃবন্ধু। তিনিও উদিল। তিনি একদিন আসিয়া উপস্থিত। পরিচয়ের পর প্রথম কথা তিনি অমরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, জাপানী মেয়েদের ক্যারেক্টার কেমন?

অমর কহিল, আমাদের মেয়েদের চেয়ে খারাপ নয়।

তারা কি পুরুষদের সামনে বার হয়?

হয় বৈ কি। বাংলাদেশের মত ত সেখানে পর্দ্দা নেই। তারা সকলের সামনেই বার হয়। পথে হেঁটে বেড়ায়। ইস্কুল-কলেজে লেখা পড়া শেখে।

চন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, বাইরের পুরুষের সঙ্গে তাঁরা কি মেশেন?

অমর কহিল, পরিচয় হলে বা প্রয়োজন হলে মেশেন বৈ কি।

অনন্তবাবু শ্লেষের স্বরে বলিলেন, তাই বলো। বিলিতি কায়দা শিখেছে তাহলে।

অমর কহিল, কেন? বাংলা ছাড়া ভারতবর্ষের অনেক জায়গাতেই ত মেয়েদের পর্দ্দা নেই। পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে সেখানকার মেয়েরাও ত অল্পবিস্তর মেলা মেশা করে' থাকেন। লেখাপড়াও অনেকে শেখেন। তবে বিলিতি কায়দা বলছেন কেন?

অনন্তবাবু কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন, তবু ভালো; স্বাধীনতা পেয়েও যে সেখানকার মেয়েদের ক্যারেকটার নষ্ট হয়নি। সাহেবদের যে কাণ্ড।

অমর ধীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি কাণ্ড?

অনন্তবাবু কহিলেন, এই ধরো, স্বামী বাড়িতে রইলো, আর বিবির পুরুষ বন্ধু এসে বিবির কোমর জড়িয়ে ধরে' বেড়াতে বার হয়ে গেলেন। আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ, একেবারে বেলেল্লা কাণ্ড।

অমর কহিল, আপনি ভদ্র সাহেবদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছেন কি?

অনন্তবাবু মুরুব্বিয়ানা চালে কহিলেন, আরে মিশিনি বলে' কি আর জানতে বাকি আছে কিছু? দেখতে শুনতে পাই ত।

অমর কহিল, যাদের সম্বন্ধে আপনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই তাদের নিন্দে না করাই বোধ হয় ভালো। আমি অনেক ভদ্র য়ুরোপীয় পরিবারে বন্ধুভাবে মিশেছি, আমার ধারণা আপনার মত নয়।

অনন্তবাবু কিন্তু হার মানিতে রাজি নন। তিনি কহিলেন, আচ্ছা ভায়া, বলো দেখি ওদের বল্‌নাচে কি পরপুরুষ আর পরস্ত্রী কোমর জড়িয়ে নাচে না?

অমর কহিল, নাচে, কিন্তু তাতে করে' এ প্রমাণ হয় না যে তারা দুশ্চরিত্র। তাদের আনন্দ করবার রীতিটা আপনার চোখে বিসদৃশ ঠেকতে পারে এই মাত্র! যেমন ধরুন, আমাদের দেশে মেয়েরা অধিকাংশ এক বস্ত্রে আর খালি পায়ে থাকে। এ দৃশ্য য়ুরোপীয়ের চোখে বিসদৃশ ও অভব্য ঠেকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার দ্বারা এ প্রমাণ হয় না যে আমাদের মেয়েরা চরিত্রহীনা।

চন্দ্রবাবু এই সময় তাঁর বন্ধুকে লইয়া উঠিয়া যাওয়াতে ব্যাপারটা আর বেশি দূর গড়াইল না।

পিতার সহিত একদিন অমরের দেশ সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। প্রসঙ্গত চন্দ্রবাবু বলিলেন, দেশের উন্নতি করতে হ'লে স্বদেশী শিল্পের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেদিকে কারও দৃষ্টি নেই, কেবল পলিটিক্স আর ফাঁকা বক্তৃতা। বাংলাদেশ একটার বেশি কাপড়ের কল হ'ল না অথচ আমরা লাফাচ্ছি এই ব'লে—দেশ থেকে ইংরেজকে তাড়াবো। দেখ না কেন কতকগুলো মাথা-পাগলা ছেলে বোমা ছুঁড়ে ম'ল। কেনরে বাপু, দেশসেবার কি আর কোনো উপায় ছিল না? বসে' বসে' কাঁচের পিছনে পারা লাগিয়ে আর্শি তৈরি করলেও যে ঢের কাজ হোত!

অমর পিতার কথায় ক্ষুণ্ণ হইল। সে কহিল, তুমি যা বলছো সেটা ঠিক। স্বদেশী শিল্পের প্রতিষ্ঠা খুবই দরকার। তবে সবাই যে কেবল সেই কাজ নিয়ে থাকবে তার কি মানে আছে? সবায়ের মন এক ছাঁচে তৈরি নয়, সবাই এক কাজের উপযুক্তও নয়। পরাধীন অবস্থায়, শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছে থাকলেও, আমরা পদে পদে বাধা পাবো, কারণ সেখানে ইংরেজের স্বার্থে ঘা পড়বে। ইংরেজ বেনের জাত, ব্যবসা করতেই সে ভারতবর্ষে আছে। ট্যাকে হাত পড়লে সে ছোবল দিতে ছাড়বে না। আমার

মনে হয়, গোড়ায় আমাদের মধ্যে আত্মসম্মান আর আত্মবিশ্বাস-বোধ জাগিয়ে তুলতে হবে, নির্ভয় হতে হবে। আর সব কিছু তার পরে আসবেই।

চন্দ্রবাবু উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। প্রতিবাদ সহ্য করা তাঁর ধাতে নাই। কহিলেন, বোমা ছুঁড়ে মানুষ খুন করলেই বুঝি আত্মসম্মান-জ্ঞান টনটনে হয়ে ওঠে?

অমর কহিল, এর মধ্যে মানুষ খুন করাটাই বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে, অন্যায়-অসহিষ্ণুতা। যার তাড়নায় ক্ষেপে উঠে তারা প্রাণ নিয়ে খেলা করতে নেমেছিল!

চন্দ্রবাবু বলিলেন, হ্যাঁ, আর যার ফলে দেশের কত নিরীহ লোক শাস্তি পেলে, যন্ত্রণা সইলে, জীবনের সমস্ত প্রসপেক্টস্ তাদের নষ্ট হয়ে গেল। আমি বলছি, বোমা ছুঁড়ে তারা দেশের সর্ব্বনাশ করে' গেছে। তারা দেশের শত্রু।

অমর অনেকক্ষণ আত্মসম্বরণ করিয়াছিল, আর পারিল না। কহিল, সর্ব্বনাশ করেছে কি উপকার করেছে সে বিচারের সময় এখনো আসেনি। তা নিয়ে আলোচনা করা বৃথা। তাদের কাজের ফলে নিরীহ বাঙালীর ওপর জুলুম হয়েছে বলছো, তার জন্যে তাদের ওপর রাগ করছো, তাদের অভিসম্পাৎ দিচ্ছ। কিন্তু বিদেশীর হাতের লাঞ্ছনা দিব্যি মুখ বুজে আমরা হজম করে' আসছি। যারা বোমা ছুঁড়েছিল তারা স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে তা করেনি, দেশবাসীকে দুর্গতি ভোগ করাবার জন্যেও করেনি, দাসত্বের অপমানে পাগল হয়ে তারা তা করেছিল! হয়ত তাদের দেশ-সেবার প্রণালী আমাদের মনের মত না হতে পারে, কিন্তু তা বলে' তাদের অদ্ভুত আত্মত্যাগ আমরা অশ্রদ্ধা করতে পারি না। আমার মনে হয় প্রাণ যারা দিতে পারে তারাই কেবল প্রাণ দেওয়ার দাম বুঝতে পারে। আমরা কি করে' পারবো?

সকলের সহিতই অমরের মতান্তর ঘটিতে লাগিল। সে দূরে বসিয়া ভাবিয়াছিল তার অনুপস্থিতি কালে দেশের জীবন ও চিন্তাধারায় বৃহৎ একটা বিপ্লব ঘটিয়া গেছে, কিন্তু দেশে ফিরিয়া অবধি অনুক্ষণ অনুভব করিতেছে যে দেশ যেমন ছিল এখনো প্রায় তেমনই আছে, কুসংস্কার ও গতানুগতিকতাই এখনো বাঙালীর কর্ম্ম ও ভাবধারাকে চালিত করিতেছে, আলস্য ও ভয়বিমূঢ়তা তার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। কোথায় গেল সেই উদ্দীপনা, প্রাণাবেগের সেই অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা, দেশ ছাড়িবার কালে যাহা সে দেখিয়া গিয়াছিল? সে-সব এখন অলীক স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। বঙ্গভঙ্গ রদ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশজোড়া সেই বিরাট আন্দোলন নিবিয়া গেছে! বাঙালী আবার শান্ত শিষ্ট হইয়া স্বার্থসিদ্ধির দিকে মন দিয়াছে। তার দেহে শক্তি নাই, মনে আনন্দ নাই, মুখে দীপ্তি নাই। বিদেশীর ঘানি আবার সে নিশ্চিন্ত মনে ঘুরাইতে সুরু করিয়াছে। কোথায় গেল সেই দৃপ্ত ভঙ্গিমা, মাতৃভূমির সেবার জন্য সেই অধীর আগ্রহ, ভায়ে ভায়ে মিলিয়া দেশসেবার সেই অটল প্রতিজ্ঞা? বিলাতী বস্ত্র আবার অবাধে চলিতেছে, তাহা কিনিতে বা পরিতে এখন আর লজ্জা নাই। জাতীয় শিক্ষা এখন একটা প্রহসনে পরিণত, বাংলা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরে ফিরিয়াছে!

২৮

স্ত্রী-শিক্ষা

লীলা চন্দ্রবাবুর সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান। একদিন তার পদতল লক্ষ্য করিয়া অমর শিহরিয়া উঠিল। যে-দেশে নারীর চরণের সঙ্গে কমলের উপমা দেওয়ার রীতি, সে-দেশের মেয়ের পদতলের এ কী দুর্গতি! এ যেন জ্যৈষ্ঠ মাসের খররৌদ্রে মাটি ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেছে! ধূলা-মাটির পুরু আস্তরণ পড়িয়া অঙ্গারতুল্য সেই পদতল অমরের চোখে যেন কাঁটা ফুটাইতে লাগিল।

লীলাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, খালি পায়ে থাকিয়া থাকিয়া এরূপ হইয়াছে।

অমর কহিল, তা জানি। খালি পায়ে থাকিস কেন?

লীলা কহিল, বাঃ আমাদের ইস্কুলে যে জুতো পরবার নিয়ম নেই! জামা সেমিজ পরাও তঁ বারণ।

অমর কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে আবার কোন্ ইস্কুল?

লীলা কহিল, সনাতনী বালিকা বিদ্যালয়।

অমর বলিল, অ! তারপর ক্ষণকাল থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তা ইস্কুলে কি শেখানো হয়?

লীলা সোৎসাহে কহিল, শিবপূজো, স্তবপাঠ, বারাপাত আর শিশুশিক্ষা।

অমর জিজ্ঞাসা করিল, আর কি?

লীলা কহিল, আর কিছু না।

অমর কহিল, বলিস কি রে? সেলাই, গানবাজনা, ছবি-আঁকা, রান্না, ইংরিজি, এসব কিছু নয়?

লীলা কহিল, না।

অমর ক্ষণকাল নির্ব্বাক হইয়া রহিল। পরে কহিল, আজ তোদের ইস্কুল দেখতে যাবো।

লীলা খুসি হইয়া কহিল, যাবে? বেশ ত! আমি পণ্ডিতমশাইকে বলে' রাখব' খন।

অমর জিজ্ঞাসা করিল, পণ্ডিতমশাই? মেয়ে-মাষ্টার নেই?

লীলা কহিল, না।

মধ্যাহ্নে আহারাদির পর অমর সনাতনী বালিকা বিদ্যালয় দেখিতে গেল। স্কুলের জীর্ণ ফটক পার হইয়াই একটি উঠান, তার এক পাশে ঘোড়ার আস্তাবল। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সেই আস্তাবলের আবর্জ্জনা হইতে উৎকট দুর্গন্ধ বাহির হইতেছিল। নাকে কাপড় দিয়া একটা অনাবৃত ভাঙা সিঁড়ি বাহিয়া অমর দোতালায় উপস্থিত হইল।

প্রশস্ত বারান্দায় ছিন্ন মলিন মাদুর বিছাইয়া এলোমেলো-ভাবে বসিয়া ছাত্রীরা পাঠাভ্যাস করিতেছে। তাহাদের বেশভূষায় শোভনতা বা পরিচ্ছন্নতার চিহ্নমাত্র নাই। অদূরে একটা তৈলাক্ত মোড়ার উপরে পণ্ডিত-মহাশয় অধিষ্ঠিত। তাঁর বয়স হইয়াছে। জীর্ণ কঙ্কালসার অনাবৃত দেহে মলিন পৈতার গোছা, পরিধেয় বস্ত্রের প্রসার হাঁটু পর্য্যন্ত, চোখের চশমা সনের সূতা দিয়া কানে আটকানো।

মেঝের উপর প্রচুর ধূলাবালি, সেখানে কখনো ঝাঁট পড়ে বলিয়া মনে হয় না। জানালাগুলা ভগ্নপ্রায়, দেয়ালে ধোঁয়ার কালি, কোথাও বা পানের পিকের চিহ্ন। সেখান থেকে মাঝে মাঝে বালি ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। কড়ি-কাঠে প্রচুর ঝুল, ঝিলমিলির ধারে ধারে থামের মাথায় পায়রার খোপ, সেখানে অবিরাম কপোতের কূজনধ্বনি হইতেছে। থামের তলদেশে দীর্ঘকালসঞ্চিত পারাবত-পুরীষ কঠিন হইয়া স্তরে স্তরে উঁচু হইয়া উঠিয়াছে।

লীলা অমরের পরিচয় দিলে গুরুমহাশয় তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। বলিলেন, সনাতন হিন্দু আদর্শে কেমন শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা তাঁর মত শিক্ষিত ব্যক্তির দেখা প্রয়োজন। সেখানে যে সতীসাধ্বী আদর্শ হিন্দুনারী গঠিত হইতেছে সেই বিষয়ের প্রতি তিনি বারবার অমরের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার প্রয়াস পাইলেন। তারপর বোধ করি তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুট করিবার জন্য লীলা ও অন্য কয়েকটি মেয়েকে ডাকিয়া স্তোত্র আবৃত্তি করিতে কহিলেন।

মেয়েরা আবৃত্তি সুরু করিল, তাহারই সঙ্গে যেন তাল রাখিয়া বারান্দা-সংলগ্ন অন্ধকার ঘরের মধ্যে চামচিকার পাখার শব্দ হইতে লাগিল।

অমর হতাশ হইয়া পড়িল। জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যেমন হয় দেশে ফিরিয়া তার অবস্থাও তেমনি হইয়াছে। যেদিকে তাকায় সমস্তই অশোভন, কুশ্রী ও কদর্য্য—সে যেন আদিম কালের বর্ব্বরতার মাঝে ফিরিয়া আসিয়াছে। দেশের জলস্থল আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া দাসত্ব যেন দানবের মত বিরাজিত—সমাজের দাসত্ব, সংস্কারের দাসত্ব, যুক্তিহীনতার দাসত্ব, বিদেশীর দাসত্ব। দাসত্বের

বিষবাষ্পে তার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। সে যেন ভুল করিয়া একটা উদ্ভট দেশে আসিয়া পৌছিয়াছে, যেখানে তার চিন্তা, তার স্বপ্ন, তার আশা, সমস্তই তার নিজস্ব, যেখানে তার সুমধর্মী সহমর্মী কেহই নাই!

হতাশার অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া একদিন অমর আলোকের সন্ধান পাইল। মানুষ না থাকুক, অনন্তকালের কবি মনীষীর স্বপ্ন ত হাতের কাছে রহিয়াছে! সে-কথা সে ভুলিয়া ছিল কেমন করিয়া? সেই স্বপ্নই তার সহচর বন্ধু পরমাত্মীয়, তার সহধর্মী এবং সহমর্মী! তাহাই তার পীড়িত বিপর্যস্ত মনে সান্ত্বনার পরশ আনিয়া দিতে পারে!

বহুদিন পরে অমর আবার সাহিত্যচর্চ্চায় মন দিল, আবার সে ইতিহাস খুলিয়া বসিল। অমনি মুখের গুণ্ঠন সরাইয়া অতীত যেন কথা কহিয়া উঠিল! সে বলিল, অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোকের, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের, অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের, দাসত্বের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রাম ত যুগে যুগে চলিয়া আসিতেছে, তবে তুমি নিরুৎসাহ হও কেন? জীবন মানেই ত সংগ্রাম।

২৯

'ব্যুলি'

অভ্যস্ত সান্ধ্য ভ্রমণ সারিয়া অমর গোলদীঘির মধ্যে বসিবার বেঞ্চি সন্ধান করিতেছিল। গ্রীষ্মাধিক্যবশত অনেকেই তখনো বাড়ি ফেরে নাই, খালি বেঞ্চি কোথাও দেখিতে পাইল না। ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিল একটি ঝোপের পাশে একখানি বেঞ্চিতে মাত্র এক ব্যক্তি বসিয়া গ্যাসের আলোয় বই পড়িতেছে। অমর বেঞ্চির অপর প্রান্তে গিয়া বসিল। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পরও লোকটি একবারও তার পানে চাহিল না। অমর লক্ষ্য করিল, তার শ্যামবর্ণ পাতলা চেহারা, দাড়ি গোঁফ কামানো, বয়স বড় জোর অমরের চেয়ে বছর পাঁচছয় বেশি হইবে। পোষাক পরিচ্ছদ সাদাসিধা অথচ বেশ পরিচ্ছন্ন। চোখে চশমা, মুখ একটু ম্লান। অমর ভাবিল, লোকটি নিশ্চয়ই কলেজের ছাত্র। পরীক্ষা আসন্ন, তাই এত পাঠানুরাগ।

উপরি উপরি কয়েকদিন সেই ব্যক্তিটিকে একই স্থানে একই সময়ে তেমনি পাঠরত দেখিতে পাইয়া তাহাকে জানিবার জন্য অমরের মনে একটু কৌতূহল হইল। মানুষটি অন্তত এক বিষয়ে তার সমধর্মী ইহা বুঝিয়া তার প্রতি একটু সূক্ষ্ম সহানুভূতি তার মনে অগোচরে জাগিয়া উঠিল। কিন্তু কেমন করিয়া আলাপ করা যায়? তাহারি সন্ধানে অমর সেই বেঞ্চিতে নিয়মিত বসিতে সুরু করিল।

একদিন লোকটি বই শেষ করিয়া বেঞ্চির উপর রাখিয়া তৃপ্ত প্রসন্ন মুখে অমরের পানে দৃষ্টিপাত করিল। অমর এই সুযোগটিরই অপেক্ষায় ছিল। তাড়াতাড়ি নমস্কার করিয়া কহিল, যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

লোকটি বলিল, নিশ্চয়, পারেন বৈ কি।

অমর জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কলেজে পড়েন?

লোকটি হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। অমর একেবারে অপ্রস্তুত। ভাবিল, প্রশ্নটা ভারি খেলোরকম হইয়া গেল, অথচ আলাপই বা করা যায় কিরূপে?

হাসি থামিলে লোকটি প্রশ্ন করিল, কেন বলুন দেখি? একথা কেন জিজ্ঞেস করছেন?

অমর কহিল, ক'দিন থেকে দেখছি আপনি বসে' বসে' কেবল পড়েন, অথচ সময়টা ঠিক পড়বার সময় নয়। তাই ভাবছিলুম, হয়ত আপনি একজামিনের পড়া মুখস্ত করছেন।

ঈষৎ হাসিয়া ক্ষণকাল থামিয়া লোকটি বলিল, আ! কি জানেন, সারাদিন অন্ন সংস্থানের জন্যে কলম পিশি, সকালটা সংসারের কাজে কাজে নষ্ট হয়, পড়ার নেশাটাও মারাত্মক, তাই আপিসের ফেরত

এখানে বসে' সেই সখ মেটাই। বলিয়া আবার একটু হাসিল। হাসিটি বড়ই করুণ দেখাইল। তারপর বই-খানি অমরের হাতের পানে ঠেলিয়া দিয়া কহিল, দেখতে পারেন, পাঠ্যকেতাব নয়।

অমর বইখানি খুলিয়া দেখিল ভ্যার্লেন-রচিত মূল ফরাসী কবিতা। বিস্ময় ও আনন্দে সে কিছুক্ষণ কথা কহিতে পারিল না। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, আপনি ফ্রেঞ্চ খুব ভালো জানেন নিশ্চয় ?

লোকটি বলিল, ভালো আর কি ! তবে কাজ চালিয়ে নিই এক রকম।

এটি যে সত্য নয়, বিনয় মাত্র, অমর তাহা বুঝিল। সে কহিল, যদি বেয়াদপি মাপ করেন, আপনার নামটি জানতে পারি কি ?

লোকটি বলিল, নিশ্চয়। আমার নাম অমিয়কুমার সেন।

অমরের চোখ দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে প্রশ্ন করিল, কবি ?

অমিয় বলিল, হাঁ্যা।

অমর সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া কহিল, আমার পরম সৌভাগ্য আপনার সঙ্গে পরিচয় হল ! আমি বহুকাল থেকে আপনার কবিতার ভক্ত। রবিবাবুর আওতায় মানুষ হয়েও আপনি যে-শক্তি আর স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব !

অমিয় জিভ্ কাটিয়া বলিল, ও কথা বলবেন না ! আমাদের আবার শক্তি ! রবি মানে সূর্য্য, তাঁর নাগাল কি কেউ ধরতে পারে ? তিনি একক এবং অদ্বিতীয়। আমি অক্ষম হলেও তাঁরই শিষ্য, সেই আমার পরম গৌরব ! ক্ষণকাল থামিয়া কহিল, আপনার নামটি ত বল্লেন না।

অমরের নাম শুনিয়া অমিয় বলিল, ওঃ তাই বলুন। একজাতের লোক ! বলতে হয় এতক্ষণ ! তা বেশ হল, আপনার কাছে জাপানী সাহিত্যের খবর একদিন শুনবো।

পরদিন নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিয়া অমর দেখিল অমিয়-বাবুর পাশে আরো কয়েক ব্যক্তি বসিয়া আছে। অমরকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া অমিয় কহিল, আসুন অমর-বাবু ! ভয় পাবেন না, এঁরা সবাই আমাদেরই দলের।

ঔপন্যাসিক, গল্পলেখক, আর্টিষ্ট, গায়ক, সাহিত্য-রসিক, প্রায় সকলের নামই অমরের পরিচিত। সাক্ষাৎ পরিচয় হইয়া গেল।

অমিয় বলিল, এই আমাদের ক্লাব। আজ থেকে আপনিও একজন সভ্য হলেন। আপাতত আমাদের যাযাবর অবস্থা—চালচুলো কিছুই নেই। বর্ষাকালে একটা আস্তানা ঠিক করলেই হবে।

ভালো মানুষদের সঙ্গ অমরের বিষ হইয়া উঠিয়াছিল, মনের মত একটা দল পাইয়া সে যেন বর্ত্তিয়া গেল। অমিয়ই তাহাকে উদ্ধার করিল, এই ভাবিয়া অমরের মন তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

সে কহিল, আপনাদের দলে স্থান দিয়ে আমায় বাঁচালেন অমিয়বাবু ! আপনাকে যে কি বলে' ধন্যবাদ দেব জানি না।

অমিয় বলিল, না না, ফর্ম্যালিটি নয়। ফ্র্যাঙ্ক যত পারেন হোন, কিন্তু ফর্ম্যাল হবেন না ! থাক, এখন অনাদিবাবুর লেখাটা শোনা যাক। তুর্গেনিভের একটা গল্প অনুবাদ করেছেন।

অনাদিবাবুর পাঠ শেষ হইলে সেদিনকার মত সভাভঙ্গ হইল। স্থির হইল, পরদিন রবিবার অপরাহ্নে সভার বৈঠক হইবে শিবপুর বটানিক্যাল গার্ডেনে।

সেদিন আকাশে একটু মেঘসঞ্চার হইয়াছিল। গঙ্গার ঘোলা জল কাটিয়া ষ্টীমার চলিয়াছে—মৃদু জলোচ্ছ্বাস ঘুমপাড়ানি গানের মত কানে বাজিতেছে। কি একটা যোগ উপলক্ষ্যে নদীর ঘাটে ঘাটে স্নানার্থিনী নারীর ভিড়। এক জায়গায় স্নানরতা এক যুবতীর অনাবৃত দেহের উপরার্দ্ধ জলের উপর জাগিয়া ছিল। তার সুগঠিত

দেহের পানে অমর অমিয়র দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিল, দেখুন দেখুন, সুন্দর নয়?

অমিয় নারীকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, মুণ্ডুটা কেটে বাদ দিলে মন্দ না!

অমর হাসিয়া ফেলিল।

অনাদি বলিল, অমিয়র সবতাতেই বাড়াবাড়ি!

অমিয় বলিল, আমার মত, কুৎসিৎ কুশ্রী মেয়েদের আলখেল্লায় সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে বার হওয়া উচিত। নগ্ন সৌন্দর্য্য যেমন মনকে খুসি করে নগ্ন কুশ্রীতা তেমনি মনকে পীড়া দেয়।

বাগানে নামিয়া জলের ধারে একটা গাছের ছায়ায় সভা বসিল। গম্ভীর কণ্ঠে অমিয় বলিল, জাতীয় সঙ্গীত!

সকলে গান ধরিল, তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও, কুলু কুলু কুলু নদীর স্রোতের মত—আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে থাকি, মরমে গুমরি মরিছে ভাবনা কত!

জাতীয় সঙ্গীত শুনিয়া অমর হাসিয়া খুন। অমিয় বুঝাইল, কবিদের জাতীয় সঙ্গীত এ ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না!

গানের পর আলোচনার পালা। রবিবাবুর কবি-প্রতিভার কথা উঠিল। অমিয় বলিল, আমাব মনে হয় রবিবাবুর সঙ্গে জগতের মাত্র তিন জন কবির নাম করা যেতে পারে—শেক্‌স্‌পীয়র, হুগো আর গ্যয়টে!

অনাদি বলিল, ও-কথা শুনলে আমাদের দেশের অনেকে খাপ্পা হবেন। তুমি ত কালিদাসের নাম করলে না?

অমিয় বলিল, রবিবাবুর সমান হওয়া কোনো দাসের কর্ম্ম নয়, তা সে কালীর দাস হলেও!

অনাদি বলিল, যেতে দাও কালিদাস! আচ্ছা, ধরো গিরীশ ঘোষ?

চারিদিকে হাসির তুফান উঠিল।

হাসি থামিলে অমর জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা অমিয়বাবু, শশধর-বাবুর কবিতা আপনার কেমন লাগে?

অমিয় বলিল, ঠিক যেন হাতীর নাচ!

এমনি করিয়া কাব্যালোচনা ও হাস্য পরিহাসে দিন কাটিয়া গেল। ভোজনপর্ব্বান্তে আসন্ন সন্ধ্যায় সকলে আসিয়া কলিকাতামুখো ষ্টীমারের সম্মুখের বেঞ্চিখানি দখল করিয়া বসিল।

ষ্টীমার বাঁশি দিয়াছে এমন সময় এক দল শ্বেতাঙ্গ হুড়-মুড় করিয়া আসিয়া উপস্থিত। সে দলে দুইটি পুরুষ ও একটি নারী এবং তাহাদের ভৃত্য ও একটি চেনবাঁধা কুকুর।

ষ্টীমারে কোথাও স্থান নাই দেখিয়া অনাদি দাঁড়াইয়া উঠিয়া মেমসাহেবকে সেই স্থানে বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিল। মেমসাহেব প্রথমে অনাদির মুখের পানে পরে বেঞ্চির শূন্য স্থানের পানে তাকাইলেন, কিন্তু সেখানে বসিলেন না। শ্বেতাঙ্গদল অগ্রসর হইয়া গিয়া ষ্টীমারের মাথার কাছাকাছি রেলিং ঠেস দিয়া দাঁড়াইল, কেবল তাহাদের প্রতিভূস্বরূপ বেহারা ও কুকুরটিকে বেঞ্চির ঠিক সম্মুখে দাঁড় করাইয়া গেল।

অনাদি আবার স্বস্থানে আসিয়া বসিল। ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। বেহারা দুই হাতে টিফিন বাক্স, বর্ষাতি জামা, কুকুরের চেন প্রভৃতি ধরিয়া সম্মুখের দৃষ্টিপথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া অনাদি তাহাকে এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইতে কহিল। লোকটা আদেশ পালন করি-বার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া তার প্রভু তাহাকে সেখান থেকে নড়িতে বারণ করিয়া দিল। তার মুখের ভাবে এবং গলার আওয়াজে মনে হইল সে বিষম রুষ্ট হইয়াছে।

অনেকক্ষণ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। চাঁদপালঘাটে পৌছিতে আর বিলম্ব নাই, তীরবর্ত্তী আলোকমালা ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, এমন সময় সেই ইংরেজ যুবক গটগট করিয়া অগ্রসর হইয়া উপবিষ্ট অনাদির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হাতের সরু বেতটা তার জুতার উপর ঠুকিয়া বলিল, কি বাবু, তোমার বাঙালী সভ্যতার জন্য নিশ্চয় খুব গর্ব্ব বোধ করিতেছ!

অনাদি তীরের মত সোজা দাঁড়াইয়া উঠিল। সাহেবের চোখের উপর চোখ রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তার মানে?

অনাদির সঙ্গীরাও ইতিমধ্যে দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে। সাদায়-কালোয় সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখিয়া আশপাশের মাড়োয়ারিদের মধ্যে একটা ভীতিমিশ্রিত চঞ্চলতার সৃষ্টি হইল। তাহারা নীরবে একটু তফাতে দাঁড়াইয়া আসন্ন যুদ্ধের পরিণাম দেখিতে লাগিল।

অনাদির প্রশ্ন শুনিয়া ক্রোধে ইংরেজের মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে কহিল, মহিলাটিকে বসিবার জায়গা দাও নাই কেন?

অনাদি বলিল, দিয়াছিলাম ত! মহিলাটি গ্রহণ করিলেন কই?

সাহেবের চোখ জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, সমস্ত বেঞ্চিখানাই তোমাদের খালি করিয়া দেওয়া উচিত ছিল। মহিলাটি তোমাদের পাশে ত আর বসিতে পারেন না!

অনাদি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, এ-কথা বলার পরও তুমি বাঙালীকে শিষ্টাচার শিখাইতে চাও?

আগুনে ঘৃতাহুতি পড়িল। সাহেব চীৎকার করিয়া বলিল, শাট্ আপ্!

অমর এতক্ষণ নীরব ছিল। কিন্তু আর সহ্য করিতে পারিল না। উদ্ধত ইংরেজটার দিকে ফিরিয়া বলিল, চীৎকার করিয়ো না! ষ্টীমারখানা তোমার পৈতৃক সম্পত্তি নয়! আমরাও তোমার খিদমদগার নই!

মুহূর্ত্তের মধ্যে ইংরেজ ঘুসি উঁচাইল। অমর স্থির হইয়া তার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে সাহেবের প্রথম আঘাতের প্রতীক্ষা করিতেছিল, তারপর সে তাহাকে শাস্তি দিবে।

ষ্টীমার তখন জেটিতে ভিড়িয়াছে। মেমসাহেব দ্রুত-গতি আসিয়া সাহেবের উদ্যত হাতটা চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে পিছনে টানিতে টানিতে বলিল, ও ডোণ্ট্ বি ম্যাড্, ডোণ্ট্ বি ম্যাড্! ডু কাম্ এওয়ে!

শ্বেতাঙ্গদল নামিলে অমর তার সঙ্গীদের সঙ্গে নামিল। তাহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া মাড়োয়ারিদের মুখে হাসি আর ধরে না। তারা বলিতে লাগিল, বাবু সাব! আপনারা বেশ করেছেন, খুব করেছেন, আমরা বড় খুসি হয়েছি! ব্যাটারা এমন পাজি, পথে ঘাটে অত্যাচার অপমান আর ত সহ্য হয় না! আপনারা উচিত শিক্ষা দিয়েছেন! ব্যাটারা বুঝুক, এ দেশেও মানুষ আছে!

—ক্রমশ

গান
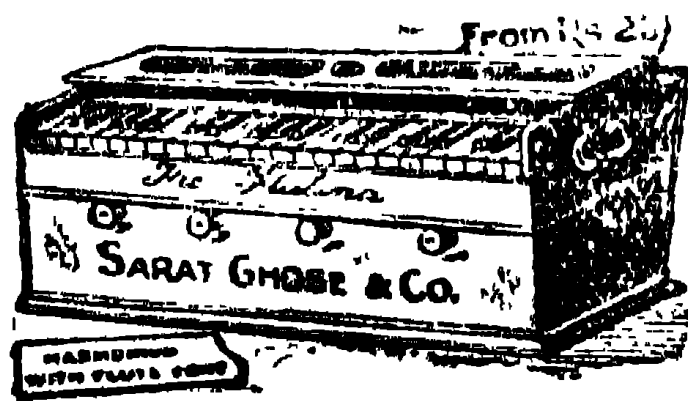
(Heine-এর অনুভাবে)

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

চাই যবে ওই চোখের পানে
বয় যে প্রাণে মলয়-হাওয়া !—,
সে যেন ওই চাঁদের পানে
ফাগুন-রাতে চম্‌কে' চাওয়া !
এই ধরণীব বিভীষিকা
মিলিয়ে যে যায় গো !
জীবন-মরুর মরীচিকা
ছায়ায় হারায় গো !
বনেব মাঝে পান্থ যেমন
—আঁধারে পথ হারিয়ে ফেলে,'
আশ্বাসে তার ভরে যে মন
একটু আলোর আভাস পেলে',—
তেম্‌নি তোমার চোখের পানে
চাইলে যে হয় অভয়-পাওয়া,
বয় যে প্রাণে মলয়-হাওয়া !

হাত হু'খানি গলায় নিয়ে
নিশাস যে হয় আগুন-পারা,
অধর 'পরে অধর দিয়ে
পান করি সে প্রাণের ধারা!
বক্ষে জুড়ায় বিষের জ্বালা,
অশ্রু ঘুমায় গো !

চক্ষে ঢুলাই স্বপন-মালা
তোমার চুমায় গো।
শিরায় জাগে সুরের কাঁপন,
কর্ণ শুনায় কিসের বাণী।
হৃদয় করে কি আলাপন।
জগৎটারে তুচ্ছ মানি।
অধর-সুধায় চুমুক দিয়ে
মন যে ভাঙে দেহের কারা।
—নিশাস যেন আগুন-পারা।

তারাব আলোর চমৃকানিতে
নিথর নিশায় ঘুমায় অলি,
আমাব বুকেব ফুলদানিতে
তোমার ছুটি পদ্ম-কলি।
সেই পবশে পিয়ায় সুধা
দেহেব শবায় গো।
মিটায় চিবদিনের ক্ষুধা
ধূলির ধরায় গো।
কেবল, যখন বক্ষে আসি'
শোনাও কথা কাণে কাণে—
'প্রিয়, তোমায় ভালোবাসি',
—ব্যথা যে পাই প্রাণে প্রাণে'
ঝাপ্‌সা দেখি চোখ ছুটিতে
মাথা পড়ে বক্ষে ঢলি,'
মূর্চ্ছা হানে পদ্ম-কলি।

চন্দ্র সূর্য্য যতদিন

শ্রী জগদীশ গুপ্ত

পিতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া এবং জননীর অনুমতিক্রমে দীনতারণ তাহার শ্যালিকা প্রফুল্লকে বিবাহ করিয়া আনিল। প্রথমা পত্নী ক্ষণপ্রভা মরিয়া ত' যায়ই নাই, উপরন্তু তাহার গর্ভে একটি পুত্র-সন্তানও জন্মলাভ করিয়াছে।

খোকার বয়ঃক্রম এই আটমাস।

দুইবার বিবাহ করা যেন দীনতারণদের বংশগত প্রথায় দাঁড়াইয়া গেছে। তাহার পিতামহ রামতারণ, পিতা জগত্তারণ দুইজনেই দুইবার বিবাহ করিয়াছিলেন—অবশ্য প্রথমার স্বর্গারোহণের পর। কাজেই দ্বিতীয়বার বিবাহ করাটা তাহাদের খুব পরিচিত ঘরোয়া ব্যাপার। কিন্তু পুরুষানুক্রমে পরিচিত এই ঘরোয়া ব্যাপারটাই দীনতারণের বেলায় কিছু ঘোরালো হইয়া অপরিচয়ের একটা রহস্যময় আবরণ পরিয়া দেখা দিল।

দীনতারণেরও তেমন দোষ নাই।—

মানুষের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি উন্মীলিত হইয়া যতদূর পৌঁছিতে পারে ততদূর পর্য্যন্ত সকলেই দেখিয়াছিলেন।

...দীনতারণও দেখিয়াছিল।...কিন্তু সে-দৃষ্টি কেবল অনাগতকালের বহির্দ্দেশটা বিচরণ করিয়া আসিয়াছিল। যবনিকার অন্তরালে চির-অন্ধকার পর-চিত্তে প্রবেশের চেষ্টা কেহ করে নাই—দীনতারণও না। সতীনের ঘর হইবে এই যা একটু আশঙ্কা ছিল, দীনতারণের জনক-জননী ভাবিয়াছিলেন, তাঁহারা সতর্ক থাকিয়া এবং শাসনে রাখিয়া বিশেষ অশান্তি ঘটিতে দিবেন না। দ্বিতীয়তঃ, সতীন হইলেও উভয়ে সহোদরা।...কাজেই মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া উহারা যত ঈর্ষাই পোষণ করুক, ঈর্ষার কণ্টকটা সুস্পষ্ট হইয়া যখন তখনই অপরকে বিদ্ধ করিতে পারিবে না। তারপর চক্ষুলজ্জা বলিয়া জিনিষটাও ত' একেবারে মিছে কথা নয়।

এক স্ত্রী বর্ত্তমানে দীনতারণের দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার কারণ শ্বশুরমহাশয়ের সম্পত্তি। প্রফুল্লকুমারী অন্যঘরে গেলে সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশ বাহির হইয়া যাইত—সম্পত্তিও সামান্য নয়।

দীনতারণের শ্বশুর জগত্তারণের প্রস্তাবে অসম্মত হইবার কোনো হেতুই দেখিতে পাইলেন না, বরং অত্যন্ত উৎসাহসহকারে কেবল বার্ত্তা পাঠাইলেন যে, তিনিও মনে মনে ঐ কথাটাই বহুদিন হইতে ভাবিয়া আসিতেছেন, কিন্তু ও-পক্ষের কি মতামত হইবে তাহা জানা না থাকায় কথাটা উত্থাপন করিতে সাহসী হন নাই,—ইত্যাদি অনেক কথাই লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু গৃহিণীর অশ্রুপাতের কথাটা অন্দরের সংবাদ বলিয়া কাহাকেও জানাইলেন না, এমন কি নিজেও তেমন আমল দিলেন না।—

স্বরূপচন্দ্রের সম্পত্তি যেন কথা কয়—আর প্রসব করে স্বর্ণ।

সেই সম্পত্তি তুচ্ছ কন্যাদায়ে ভাগবাটোয়ারা হইয়া সূতা ছিঁড়িয়া দুই অংশ দুই দিকে ঝুলিয়া পড়িবে, এ চিন্তাও ক্লেশকর—

স্বরূপচন্দ্র নিজের কবন্ধ-মূর্ত্তি অক্লেশে কল্পনা করিতে পারেন, কিন্তু ঐটি পারেন না।

আবার ইহাও বিবেচ্য—

এ বিবাহে আদৌ পণ দিতে হইবে না; যদি দিতে হইত, তবে সে টাকাটা কত টাকার কত দিনের সুদ তাহাও তিনি মনে মনে কসিয়া দেখিলেন।

এইরূপে উভয়পক্ষের বিবিধ চিন্তার ফলে ক্ষণপ্রভা ও প্রফুল্ল একই স্বামীর সহধর্ম্মিণীর আসন গ্রহণ করিল।

ক্ষণপ্রভার বয়স উনিশ।

কি কারণে কে জানে, মানুষে এক হুজগ্ তুলিয়া দিয়াছে যে, মেয়েমানুষ কুড়ি পেরলেই বুড়ি।

কথাটা কোনো প্রকারেই সত্য নয়। মানুষের দুষ্ট কল্পনা যে বতদূর বেয়াদপি করিতে পারে, এটা তাহারই নিদর্শন, এবং কেবল পুরুষ-হিতৈষিণার তরফের পুনঃপুনঃ উক্তি ও শ্রুতির পাকচক্রে পড়িয়া এই মিথ্যাটা, আরো অনেকানেক মিথ্যার মত, প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেছে।—

যদি এমন কেহ থাকে যে কথাটা বিশ্বাস করে না, তাহাকে দিয়া আপাতত এ-গল্পের প্রয়োজন নাই, যাহারা বিশ্বাস করে তাহাদেরই একজনের কথা বলি—

সে ক্ষণপ্রভা।

ক্ষণপ্রভার বয়স এই উনিশ, কিন্তু ক্ষণপ্রভা ভাবে, যে উনিশ, সেই কুড়ি, আর মেয়েমানুষ কুড়ি পেরলেই বুড়ি।

নারী কিন্তু বেহায়ার মত একটা অর্থহীন প্রবাদবাক্য সৃষ্টি করিয়া পুরুষের যৌবনের সীমাটায় একটা দাগ কাটিয়া দেয় নাই।

ক্ষণপ্রভা মনে মনে স্বামীর দিকে চায়—

আবার মনে মনে নিজের দিকে চায়—

মনে মনে যাচাই করে তার বয়স আছে কি গেছে.. একবার মনে হয়, গেছে, একবার মনে হয়, যেন আছে—

তার বুকের ভিতর সন্দেহ জাগিয়া একটা পিণ্ডের মত দুলিতে থাকে... কান্না হাসির দীপক-মল্লার চলিতে থাকে।—

এমন সময় দীনতারণ ক্ষণপ্রভারই পঞ্চদশী ভগিনীকে বিবাহ করিয়া আনিল......

দিদিকে দেখিয়া প্রফুল্ল সযত্নে তাহার পায়ের ধূলা লইয়া হাসিতে লাগিল,—দিদির সঙ্গে এই নূতন সম্পর্কটি ঘটিবার মত কৌতুককর আর যেন কিছু নাই।

ক্ষণপ্রভা চাহিয়া দেখিল, প্রফুল্লর যৌবনের যেন ইয়ত্তা নাই। সে-ও একটু হাসিল।

ক্ষণপ্রভার শাশুড়ী সেখানে উপস্থিত ছিলেন; তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি ক্ষণপ্রভারেই লক্ষ্য করিতেছিলেন.. ...

কিন্তু যাহা প্রত্যাশা করেন নাই তাহাই বোধ হয় তাঁর চোখে পড়িল।—ক্ষণপ্রভার মুখের ঐ হাসিটুকু দেখিতেই ধক্ করিয়া পাঁজরে ধাক্কা দিয়া একটা সংশয় বড় বেদনাদায়ক তীব্র হইয়া উঠিল...

সম্পত্তির লোভে কাজটা কি ভাল হইয়াছে।

তিনিও নারী—

নারী-হৃদয়ের একাধিপত্যের লালসা যে কিরূপ দুর্নিবার প্রখর তাহা ত' তাঁহার অগোচর নাই; সেই লালসাটিকে যে পরাস্ত করিতে চায় তাহাকে ক্ষমা করা যে কত কঠিন তাহাও তাঁহার সুবিদিত।.. কিন্তু আগে এ দিক্‌টা ভাবিয়া দেখা হয় নাই। স্বামীর সম্পত্তি বিষয়ক ওজস্বিনী সৎ-যুক্তির স্রোত তাঁহাকে ওলট্-পালট্ করিয়া দিয়া এমন বেগে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল যে, এই সংশ্রবে সম্পত্তি ভিন্ন অন্য কথা ভাবিবার অবসর তাঁর মন পায়ই নাই।.. তখন কেবল মনে হইয়াছিল, দীনতারণ এবং তার বংশধরগণের বিশেষ সুরাহা হইয়া গেল—

তারা রাজার হালে দিন কাটাইবে।

কিন্তু এখন দুটি বধূকেই পাশাপাশি সম্মুখে দেখিয়া স্রোত উল্টা দিকে বহিতে লাগিল.. ...

সহসা তাঁর বধূ-হৃদয়টিই জাগিয়া উঠিয়া যেন কঠিন কণ্ঠে তাঁহাকে ধিক্কৃত করিতে লাগিল।

পাড়ার মেয়েরা আসিয়া দুই বউয়ের রূপের তুলনা করিতে বসিয়া গেল।

প্রফুল্লর স্বাভাবিক দেহচ্ছটার উপর নবযৌবনের রাগ-লাবণ্য যে অতিশয় মনোহর তাহা একেবারে অবিসম্বাদিত, তাহাতে মতানৈক্য দেখা গেল না; গেলে সেইটাই অদ্ভুত হইত।—

ক্ষণপ্রভার মুখের দিকে তাকাইয়া কে একজন যেন ভরসা দিয়া বলিল,—বড় বউয়েরও জলুস্ আছে, তা না থাকা নয়

প্রফুল্ল লজ্জিতমুখে বসিয়া রহিল—

কিন্তু ক্ষণপ্রভা উঠিয়া গেল।

রূপের এই তুলনা বড় লজ্জাকর। ইহা ঠিকই যে, প্রতিবেশিনীরা তাহার খর্ব্বতা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই আসিয়া জোটে নাই; তবু তাহাদের কথাগুলি সে সহ্য করিতে পারিল না।

সে সন্তানের জননী—

এই তুলনামূলক রূপব্যাখ্যার সূত্র ধরিয়া অকস্মাৎ সেই মাতৃত্বজ্ঞানটা প্রস্ফুটিত হইয়া তাহার রূপ-দৈন্যের লজ্জাটা আবৃত করিয়া দিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দুঃসহ একটা ব্যথাও সে জাগাইয়া তুলিল।....

মুগ্ধ-নেত্রে স্বামী এই দেহখানার দিকেও ত' একদিন চাহিয়া থাকিতেন·· পুলকে তখন সির্ সির্ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ জাগিত।.. সেদিন গত কি বিদ্যমান সে-সংবাদটা তার মর্ম্মস্থলে কোনদিন পৌঁছিত কি না কে জানে; পৌঁছিলেও সে কি আকার লইয়া আসিত তাহা অনুমান করাও সুকঠিন; কিন্তু বড় কষ্টের কথা এই যে, না থাকার সে নিদারুণ সংবাদটা আজ যে মহাসমারোহ সহকারে তার সুপ্তি ভাঙ্গিয়া দিয়া এমন অকস্মাৎ তার অন্তস্থলে আনিয়া দিল সে তাহারই বোন্।......

কিন্তু ক্ষণপ্রভার মন বিষাক্ত হইয়া উঠিল না—

চোখে তার জল দেখা দিল······

এই দেহটার দিকেই সকলের লক্ষ্য—

দেহের মাংস, দেহের চর্ম্ম, দেহের বর্ণ!

কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী দেহ মথিত করিয়া দেহাতীত চিরজীবী যে অমৃত বস্তুটি সে বহন করিয়া আনিয়া দিয়াছে তাহার দিকে ত' কাহারো চোখ পড়িল না!...

অভিমানে ক্ষণপ্রভার বুক ফাট্‌ফাট্ করিতে লাগিল।—

এই দেহ দিয়া স্বামীর কতটুকু প্রয়োজন!...এই দেহকে উপলক্ষ্য আর অবলম্বন করিয়া স্ত্রী-পুরুষের যে যোগ আর মায়া, উৎক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের মত কেবল অধো-দিকেই তার গতি—

জলের তিলকের মত তা' এই আছে এই নাই।

·· সন্তান গর্ভে আসিতেই স্বামীর সঙ্গে যে একাত্মতার নিবিড়তম অচ্ছেদ্য বন্ধন অনুভব করিয়া তাহার অন্তর প্লাবিত করিয়া অনন্তসুন্দর সুখের ঢেউ বহিতেছিল, সেই বন্ধনবোধটা হঠাৎ দুর্ব্বল হইয়া তাহাকে যেন দুস্তর শূন্যের মাঝে বৃন্তচ্যুত নিরালম্ব করিয়া দিল।..সে বেদনার সীমা নাই।

প্রতিবেশিনিবর্গের গতর আয়াসের উড়ো কথায় এত ক্লেশ অনুভব করা ক্ষণপ্রভার বুদ্ধিমত্তার কাজ হইয়াছিল কি না সে বিচার না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে, আতঙ্কে তার মাথার ঠিক ছিল না ··রূপলাবণ্য অতিশয় অসার, যৌবন যারপরনাই অল্পায়ুঃ, দেহ পুরাতন ও বিস্বাদ হইয়া উঠিতে বেশী সময় লাগে না, পুত্রবতী স্ত্রী-ই সার ও সেরা. .ইত্যাদির স্বপক্ষে বহু যুক্তি সংগ্রহ করা গেলেও ইহা ত' অস্বীকার করা কিছুতেই চলে না যে, তার নিজেরই একদিন রূপ-যৌবনের গর্ব্ব ছিল, আকর্ষণ করিবার প্রলোভন ছিল,...রূপ যৌবন যে মানুষকে

কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জ্জিত অন্ধ করিয়া তুলিতে পারে—তাহাও সে জানে।

তাই এই ত্রাস।

কিন্তু তাই বলিয়া অভিমান তার একেবারেই ভিত্তি-হীন নয়।—

মুখখানা দাড়ি-গোঁফে সমাচ্ছন্ন বলিয়াই হোক্ কি হাসে কম বলিয়াই হোক্, দীনতারণ খাঁটি লোক বলিয়াই মানুষের কাছে পরিচিত হইয়া গেছে।

দীনতারণ অসার অল্পায়ুঃ রূপ-লাবণ্য যৌবনের দিকে ঝুঁকিবে, কি পুত্রের জননীর সঙ্গে একাত্মভাবে ভাব-সংযুক্ত হইয়া যাইবে, তাহা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।

নারীর সহজ লালসা কোন্‌টি—

একাধিক হইলে, তাহার কোনটি স্ফুটতর, কোনটি অগ্রগণ্য, কোনটি অধিক উন্মুখ, কোনটিব বেদনা অসহিষ্ণুতা বেশী...এই সব সূক্ষ্ম বিবেচনার অধীন হইয়া সাবধানে পা ফেলিয়া চলা, আরো সংখ্যাতীত লোকের মত, দীনতারণেরও পারিবারিক ব্যবহারবুদ্ধির অন্তর্গত নহে,...নিত্য-নৈমিত্তিক ভাব-গোপন এবং ভাব-প্রকাশের জুয়াচুরিতে তাহা ধরিতে পারাও কঠিন—

নারী নিজেই নিজের মন বুঝিয়া সর্ব্বদা তাহা ধরিতে পারে কিনা সন্দেহ...

কিন্তু ব্যাপাব আরো কঠিন হইয়া ওঠে যখন দু'টি স্ত্রী একঠাঁই হয়,—তাদেব একটি রূপলাবণ্যময়ী যুবতী, আর একটি সন্তানের জননী।

দীনতারণ ভাবিয়া দেখিল, দু'জনাই তাব স্ত্রী, স্বয়ং নারায়ণ আর অগ্নিদেবতা তাব সাক্ষী—

সুতবাং কেহই উপেক্ষণীয়া নহে—

দু'জনারই খোঁজ-খবর সমান ভাবে লইতে হইবে, এবং বস্ত্রালঙ্কার যাহা দেওয়া হইবে তাহার মধ্যে যেন ইতরবিশেষ না থাকে।...

তা না থাক্—

কিন্তু এ-ক্ষেত্রে ইতরবিশেষ রূপে আর বয়সে—

যৌবনের মর্ম্মকথাটি দীনতারণ জানে।...

কিন্তু পুত্রের জননী পুত্রকেই মধ্যবর্ত্তী রাখিয়া, পুত্রের পিতার সঙ্গে যে নিগূঢ় একাত্মতার দাবি করিয়া কায়মনো-বাক্যে অন্তর্ম্মুখী হইয়া ওঠে, তাহা সচরাচর যেমন পুরুষের অন্তরের অগোচরে থাকিয়া যায়, তেম্‌নি থাকিয়া গেল—

এবং আটপৌরে বাহিরেব আচরণের দিক দিয়া তাহা বিপ্লবপন্থী মারাত্মক হইয়া না উঠিলেও, কখন কখন যেমন বুদ্ধি-বিভ্রাট ঘটাইয়া তোলে, তেম্‌নি ঘটাইয়া তুলিল।

দীনতারণদের বিস্তৃত কারবার।

দীনতাবণ নিজে হিসাব রাখে, আর যথাসময়ে যথোচিত কার্য্যটি সম্পন্ন করা হইল কি না সে দিকে লক্ষ্য রাখাও তাব কাজ।...

কাজেই সে ব্যস্ত লোক।

ক্ষণপ্রভা যখন তখন ছেলেটাকে দীনতারণের কাছে পাঠাইয়া দেয়—বেশ পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া।... ইচ্ছাটা যেন তার—এতটুকু বামন যেমন দেখিতে দেখিতে ত্রিলোক আচ্ছন্ন করিয়া বলির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তেম্‌নি করিয়া তার অতটুকু ছেলে পিতাব সম্মুখ হইতে সমস্ত পৃথিবীটাকে খাতাপত্র মাল-গুদাম সুদ-আসল মামলা-আদালত ইত্যাদি সহ একেবারে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া নিজেকে সর্ব্বব্যাপী করিয়া তুলিবে।...

কিন্তু অতবড বিরাট কাণ্ড সংঘটিত করা ক্ষণপ্রভার ছেলের সাধ্য নয়।—

ছেলেকে যে লইয়া যায়, কখন কখন সে তখনই তাহাকে ফিরাইয়া আনে—ছেলেকে আদর করিবাব সময় দীনতারণের নাই।

দীনতারণ ঘুণাক্ষরেও জানে না যে সে গুরুতর একটা পরীক্ষার ভিতর দিয়া চলিয়াছে।

যিনি জানেন তিনি দীনতারণের মা।

সুভদ্রা বুঝিয়াছেন যে, স্বামীতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কায় ব্যগ্র হইয়া বধূ নিরতিশয় বিপন্নের মত অতি উগ্র সন্তান-মমতাকেই শেষ অবলম্বনেব মত একাগ্রভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে—

তার আকুলি ব্যাকুলি সংশয় উৎকণ্ঠার সীমা পরিসীমা নাই—

সন্তানের দৌলত দেখাইয়াই সে স্বামীকে ধরিয়া রাখিতে চাহিতেছে।—

প্রফুল্ল ফুলের মত তাজা, ঝর্ণাব মত চঞ্চল, কৌতুকে আমোদে সে তার দিদিকেও সঙ্গিনী করিতে চায়। ক্ষণপ্রভাও যে সর্ব্বক্ষণই গোম্‌রামুখে থাকে তা-ও নয়... চাপল্য যতটুকু সাজে ততটুকুতে সে যোগ দেয়।. দিদির ছেলেটাকে লইয়া প্রফুল্ল যা কবে সে ই এক হুলুস্থুল উদ্দাম ব্যাপার।

ছেলেটিব প্রফুল্লই নাম রাখিয়াছে, অঙ্কুর।

...কিন্তু প্রফুল্লর প্রফুল্লতা একদিন হঠাৎ ঘা খাইয়া থম্‌কিয়া গেল। সুভদ্রা তাহাকে নিদারুণ কটু কণ্ঠে ধম্‌কাইয়া দিলেন।· প্রফুল্লব মনে হইল, বিনা অপরাধে সে তিরস্কৃত হইয়াছে। ভাবিয়া দেখিলে, অপরাধ তার বিশেষ কিছু ছিল বলিয়াও মনে হয় না।—

এই সংসারটিকে সে নিতান্তই পরের সংসাব মনে করিতে পারে নাই...

তার দিদির সংসার—

তাই পদার্পণ করিয়াই সঙ্কোচ যা একটু ছিল তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কাটিয়া গেল।......স্বভাবতই সে হাল্কা-মেজাজী, চপল, দ্রুতকণ্ঠ।

—"অত হাসি কিসের বাপু খামখা?" বলিয়া সুরু করিয়া সুভদ্রা এমন সব কথা প্রফুল্লকে একাদিক্রমে শুনাইয়া গেলেন যার ঝাঁঝও যেমন ধারও তেম্‌নি।

নববধূ ভয়ে লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া উঠিল—এবং তারপর চোখের জলও ফেলিল বিস্তর।

সুভদ্রার এই রূঢ় ভৎর্সনার কারণ কিন্তু প্রফুল্লর স্বভাবসুলভ অস্থিবতা, তার হাসি কৌতুক আমোদ-প্রিয়তা নহে—সেগুলি সুভদ্রার ভালই লাগে...

কিন্তু ক্ষণপ্রভা যে নিঃশব্দ ব্যাকুলতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে সেইটা তাঁর প্রাণে চোখের বালির মত ধাকিয়া থাকিয়া খচ্‌খচ্ করিয়া বিঁধিতে থাকে—

প্রফুল্লর কলহাস্য-মুখরতা বড বিসদৃশ তিক্ত লাগে—

তাঁর নির্ম্মম আত্মগ্লানি জন্মে—

এবং সেই আত্মগ্লানির ব্যথাই একদিন অকস্মাৎ অসহিষ্ণু হইয়া, বিনামেঘে বজ্রের মত, প্রফুল্লর উপর ভাঙ্গিয়া পডিল।...

প্রফুল্ল হাপুস্ নয়নে কাঁদিতে লাগিল—

সুভদ্রা পৌত্রটিকে লইয়া প্রতিবেশীর বারান্দায় যাইয়া উঠিলেন।

ক্ষণপ্রভাও অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। সে-ও আজ পর্য্যন্ত অনেক অপরাধ করিয়াছে—অসাবধানতা অন্যমনস্কতা, নির্ব্বুদ্ধিতা প্রভৃতি ক্ষতিকর অনেক দোষ ত্রুটি তাহাতে দেখা গিয়াছে—

সুভদ্রা কখন হাসিয়া, কখন কেবল মুখখানা গম্ভীর করিয়া দু'চারিটি অসন্তোষেব কথা কহিয়াছেন—

কিন্তু এমন করিয়া ফাটিয়া কখন পড়েন নাই।

ক্ষণপ্রভা খানিক্ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—কাঁদিস্‌নে। মা-ও ত' কত বকে।

কিন্তু মা বকিলে ত' এত কান্না আসে না।

শাশুড়ীকে সে আজই মায়ের মত আপন মনে করিতে পারে নাই ..আর আঘাতটা অপ্রত্যাশিত।

প্রফুল্ল জানিত—দিদির সে সতীন হইয়া যাইতেছে, সেখানে দিদিই সব…

শাশুড়ী বলিয়া যে এক ব্যক্তি সেখানে থাকিতে পারে তাহা সে ভাবেও নাই।.. কাজেই শাশুড়ী যখন দিদিকে ডিঙাইয়া সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তির মত আচরণ করিয়া গেলেন, তখনই তাহার মনে হইল, আঘাতটা নিঃসম্পর্কীয় পরের হাত হইতে আসিতেছে—

আর অকারণে।

প্রফুল্ল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—দিদি, আমায় পাঠিয়ে দেও।

—বলিস্ ওঁকে। বলিয়াই ক্ষণপ্রভা লজ্জায় নবীনা কিশোরীর মত লাল হইয়া উঠিল।

বয়স তাহার উনিশ, প্রায় সে বুড়ি। .....

যে ঐ মিথ্যাটি রটনা করিয়া দিয়াছে, সে নারীকে কেবল নারী বলিয়াই জানে—সমষ্টি হইতে বিচ্যুত স্বতন্ত্র করিয়া তাহাকে সে দেখে নাই। কিন্তু পরম আশ্চর্য্য এই যে নারী আবহমানকাল নিঃশব্দ থাকিয়া ঐ মিথ্যা-টাকে পরোক্ষে অপরোক্ষে কেবল প্রশ্রয় দিয়াই আসিয়াছে—

প্রতিবাদ করে নাই।

কিন্তু মনের গুহাশায়িত দিব্য দেহটি—

যার অনন্ত সম্বিৎ—

যার অজ্ঞাতে দেহাশ্রিত ভূত-জগতে সূক্ষ্মতম স্পন্দনটি ঘটিতে পারে না—

সে জানে সে একা, ঠিক তারই মত যদি আর কোথাও কেহ থাকে তবে সে থাক্—

কিন্তু সে অদ্বিতীয়—

আর একটি সে এ বিশ্বে নাই।…

"বলিস্ ওঁকে" বলিতেই উনিশ বছর বয়সেও ক্ষণ-প্রভার মনে পড়িয়া গেল স্বামীর শয্যাংশ—সেখানকার স্বপ্ন, জাগরণ, হর্ষ, তৃপ্তি……

স্মৃতি বড় মধুর।

সে স্থানটি সে স্বেচ্ছায় নহে, অনুরুদ্ধ হইয়া নহে, লৌকিকতায় বাধ্য হইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু মনে মনে সে লজ্জা পাইল, শুধু সেই স্থানটির মাধুর্য্য 'স্মরণ করিয়া নয়।—

...তাহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে তাহারই ভগিনী—

সে বোধ হয় সেখানে উঠিয়াই দিদিব ছবিটা ভাবিতে থাকে।......

চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া প্রফুল্ল বলিল,—আমি পাববো না। তুমি বলো'।

—পাগল তুই। আমি কি তা পাবি? বলিয়া ক্ষণপ্রভা একটু হাসিল।

তা বটে, দিদি তা পারে না—

তাহাব হইয়া দিদিব ও-কথা বলিতে যাওয়া কেবল দৃষ্টিকটু নয়, অর্থবোধে গোল ঘটিলে বিশ্রী অপরাধেও দাঁড়াইয়া যাইতে পারে।

সেইদিন বাত্রে দীনতারণেব সমক্ষে পিত্রালয়ে যাইবার প্রস্তাব করিয়া এবং তার প্রত্যুত্তর শুনিয়া প্রফুল্ল এমন গোঁ ধরিয়া পিছন ফিরিল যে দীনতারণের খাঁটি গাম্ভীর্য্য বুদ্ধি খুঁটি হাবাইয়া বোঁ বোঁ করিয়া কেবলি ঘুরিয়া মরিতে লাগিল—

মধুচক্র কি অগ্নিশিখা কোনোটারই সন্ধান পাইল না।

দীনতারণ দাড়ির ভিতর হইতে দু' পাটি দাঁত বাহির করিয়া গম্ভীরভাবে হাসিয়া বলিয়াছিল,—তোমাব দিদিকে বলো', সে যা ক'রবে তাই হবে। মাকে রাজি সেই ক'রবে।

তাহাকে এই দিদির দিকে ঠেলিয়া দেওয়া মুখ্য প্রশ্নটি এড়াইবার কৌশলমাত্র, এবং এতক্ষণে সে বুঝিতে পারিল, দিদিও "বলিস্ ওঁকে" বলিয়া দিয়া সেই জঘন্য পন্থাই অবলম্বন করিয়াছে—

মানুষের মনের এই দ্বিচারিতা অসহ্য—

রাগে প্রফুল্লর গা ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল।

এদিকে দীনতারণের মনটাও টিপ টিপ্ করিতে ছিল,—

ওরা সহোদরা হইলেও সতীন, এ কথা তার মনেই ছিল না। দু' সতীনের একজনের মুখের সাম্নে আর একজনকে স্পষ্টবাক্যে কর্ত্তা করিয়া তোলা সুবুদ্ধির কার্য্য নহে—

বিপত্তি তার এইখানে যে, জানিয়া হোক্ না জানিয়া হোক্, ঈর্ষাকে উজ্জীবিত করিয়া তুলিবার এমন সহজ উপায় আর নাই।

দীনতারণের ক্ষোভ কাটিয়া যাইবে কি থাকিয়াই যাইবে তাহা নির্ভর করিতেছে, যদি ওদিক্ হইতে কোনো জবাব আসে, তাহারই উপর।

.. খানিক পরে প্রফুল্ল বলিল,—দিদিকে বলেছি। সে-ই আপ্—তোমাকে বল্‌তে বলেছে।

ভগিনীপতি অবস্থায় দীনতারণকে সে 'আপনি আপনি' করিত, সে অভ্যাসটা এখন ত্যাগ করিতে হইতেছে।

দীনতারণ মনে মনে একটু হাসিল—

ভাগ্যিস্ বুদ্ধি তত পাকে নাই,...ঝগড়া একটা বাধিয়াছিল আর কি! বলিল, কিন্তু এবার প্রফুল্লর দিদির নামোল্লেখও করিল না,—বেশ করেছ। সব ঠিক্‌ঠাক্ করে' আমিই দেব'খন্, মাকেও রাজি করব; মা বাবাকে রাজি ক'রবেন। হাঙ্গামা কত! বলিয়া অতগুলি লোককে রাজি করিবার হাঙ্গামার ক্লান্তিতেই যেন সে চোখ্ বুজিল।

এটা পূরো মরশুমের সময়—

যেমন সদরে, তেম্‌নি অন্দরে—ভয়ঙ্কর কাজের ভিড়। কাছারীবাড়িতে আর গোলাবাড়িতে লোক যাতায়াতের অন্ত নাই...উঠানের দূর্ব্বা মরিয়া ধূলা উড়িতে লাগিল।—

অন্দর হইতেই আগন্তুকগণের তুষ্টির সোপকরণ আয়োজন করিয়া পাঠাইতে হয় বলিয়া সেখানেও দিবারাত্র দৌড়াদৌড়ি। ওরা দু'জন আর সুভদ্রা হাতে হাতে কাজ তুলিয়া দিতেছেন; একরকম সুশৃঙ্খলার সহিতই কাজ চলিয়া যাইতেছে। এই সময়ে ছোট বৌকে বাপের বাড়ী পাঠাইলে ছেলে লইয়া বড় বৌয়ের বড় কষ্ট হইবে, এবং কাজ সাম্‌লান মুস্কিল হইয়া উঠিবে—এই আপত্তি তুলিয়া সুভদ্রা দু'চারবার বিরুদ্ধদিকে মাথা নাড়িয়া শেষে কি ভাবিয়া রাজি হইয়া' গেলেন। ভাবিলেন,—থেকে আসুক দু' দশদিন, বড় বৌ ..

প্রফুল্লর যাওয়ার সব ঠিক্—

বাক্স গোছানো শেষ; দীনতারণ মায়ের আদেশে শাশুড়ীর জন্য প্রণামী কাপড় এবং প্রফুল্লর জন্য চলিত ফ্যাসানের রঙিন সাড়ী আনিয়া দিয়াছে; তাহা ক্ষণপ্রভা ও প্রফুল্ল উভয়েরই মনঃপূত হইয়া বাক্সে উঠিয়া গেছে—

কিন্তু সব আয়োজন ভণ্ডুল করিয়া দিল যে যাইবে সে নিজে—

স্নান করিয়া উঠিয়াই প্রফুল্লর গা সির্ সির্ করিতে লাগিল, এবং তার পরই মাথা দপ্ দপ্ করিয়া হুহু শব্দে জ্বর আসিয়া পড়িল্।

দুয়ারে মজুত গাড়ী ফেরত গেল।

সদরে অত কাজের ভিড়—

কাজের ব্যস্ততায় দীনতারণের নাওয়া খাওয়াই সময় মত হইত না—

কিন্তু প্রফুল্লর জ্বর হইতেই অত ভিড় ঠেলিয়া কেমন করিয়া পথ করিয়া লইয়া প্রফুল্লকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় সে দেখিতে আসে সেইটাই হইল ক্ষণপ্রভার বড় বিস্ময়ের কথা।

কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়ে বলা যায় না।—

যখন দীনতারণের অল্পবিস্তর অবসর ছিল, তখনও

ছেলেটিকে পাঠাইয়া ক্ষণপ্রভা সঙ্গে সঙ্গে ফেরত পাইয়াছে......ছেলেকে আদর করিবার অবসর দীনতারণের হয় নাই।

কিন্তু এখন!......

হইতে পারে, এ এক, আর সে এক—দুটিতে তুলনা চলে না; এটা দায়িত্ব, ওটা অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস মাত্র; এটা না করিলে কর্ত্তব্যচ্যুতির অপরাধ হয়, ওটাতে তা হয় না।

কিন্তু ক্ষণপ্রভার যন্ত্রণা তাহাতে কিছুমাত্র কমিল না। ছেলে ত সামান্য জিনিষ নয়!......ছেলের উপর যেমন তার তেম্‌নি স্বামীরও সর্ব্বহৃদয় ঢালিয়া পড়িয়া জীবনে জীবনে জড়াজড়ি হইয়া যাওয়ার কথা!......ছেলে ত' শুধু স্বামীর ভোগের রসমূর্ত্তি নহে......ছেলেরই অষ্টাঙ্গে স্বামীর কলেবর পুনরায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে...... স্বামীর সত্তাটিকেই পুনরাবৃত্তি করিয়া সে ঐ সন্তান তাঁহাকে উপহার দিয়াছে!

তবু যৌবনই হইল সবার বড়!...

দীনতারণ চটি ফট্‌ফট্ করিয়া দেখিতে আসে—

প্রফুল্ল লজ্জিত হয়; বলে,—রকম দেখে রাগই হয়।

কিন্তু রাগ যে তার ত্রিসীমানায়ও নাই তাহা এমনি প্রাঞ্জল যে চাহিয়া দেখিবারও দরকার হয় না।

ক্ষণপ্রভাও হাসে; বলে,—চিরকাল অম্‌নি।

কথা দু'টি এমন করিয়া বলে যেন তাহাকেও দীনতারণ ঠিক্ এম্‌নি করিয়া দেখিতে আসিত।

প্রফুল্ল হয়ত' এত গভীর অর্থে পৌঁছিতে পারে না; কিন্তু ক্ষণপ্রভা কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই হঠাৎ চোখ ফিরাইয়া অন্যদিকে চাহিয়া থাকে—

একটু গ্লানি জন্মে—বুঝি ঈর্ষা প্রকাশ পাইয়াছে।

......দীনতারণ তাহাকেও এম্‌নি করিয়াই দেখিতে আসিত কি না তাহা যেন ভাল করিয়া ক্ষণপ্রভার এখন মনে পড়ে না...কিসের একটা ঢেউ উত্তরোল হইয়া তাহাকে শৃঙ্গে তুলিয়া লইয়া নাচাইতেছে...সেই আলোড়নে তার মনের থেই হারাইয়া গত দিনগুলি অস্পষ্ট হইয়া গেছে।

প্রফুল্লর জ্বর ত্যাগ পাইয়াছে; এবং বহু সাধ্য সাধনার পর সে কুইনাইন সেবন করিয়াছে।

বৈকালে সে অঙ্কুরকে কোলে করিয়া দাওয়ায় বসিয়াছে; ক্ষণপ্রভা তার কাছেই বসিয়া ছেলের বালিশের খোল সেলাই করিতেছে—

প্রফুল্ল বলিল,—দিদি, তোমার ছেলের নামের ভেতর থেকে তারণটা তুলে' দিতে হবে—বিশ্রী সেকেলে। বিপত্তারণ আবার নাম হয় না কি?

ক্ষণপ্রভা মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল; বলিল,—বলিস্ ঠাকুরকে......

কিন্তু প্রফুল্ল তখন ছেলেকে হাঁটুর উপর দোলা দিয়া সুর করিয়া গাহিতে সুরু করিয়া দিয়াছে—

ওরে আমার লুলু লুলু—
ঘুমে দু'চোখ ঢুলু ঢুলু—
হাস্‌ছে তবু খুলু খুলু—
তোমায় ধরে' মার্‌তে হবে—
কাজল নেপ্টে ভূত সেজেছে—
কেমন মজা.........

শ্লোক তৈরীর কৃতিত্বে ক্ষণপ্রভাও মৃদু মৃদু হাসিতেছিল; হঠাৎ কি একটা শব্দে দু'জনাই মুখ তুলিয়া দেখিল, দীনতারণ উঠানে দাঁড়াইয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতেছে—

প্রফুল্লর আবোল তাবোল তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া গেল; সে ঘোম্‌টা আর একটু টানিয়া দিয়া চোখ নামাইয়া রহিল। কিন্তু ক্ষণপ্রভার মুখ আর কান অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া উঠিল—তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে প্রফুল্লর কোল হইতে টানিয়া লইয়া সে ঘরে ঢুকিয়া গেল।......

প্রফুল্ল চোখ দুটি একটুখানি তুলিয়া স্বামীর দিকে চাহিল—

দীনতারণ হাসিয়া ফিরিয়া গেল।

......ক্ষণপ্রভা স্বামীর মুগ্ধ-দৃষ্টিটা লক্ষ্য করিয়াছিল, এবং ইহাও মর্ম্মে মর্ম্মে হৃদয়ঙ্গম করিতে তার তিলার্দ্ধ বিলম্ব হয় নাই যে, শুধু প্রফুল্লর বিকচ যৌবন-শ্রীই স্বামীর এই মোহের কারণ নহে .. ..

তাঁর পরম তৃপ্তির এই বুকভরা হিল্লোল যে তুলিয়াছে সে শুধু প্রফুল্ল নয়—

সঙ্গে তারই গর্ভজাত ছেলেটিও আছে।

স্বামীকে দেখিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও সে একবার আড় চোখে চাহিয়া প্রফুল্লকে দেখিয়াছিল—

ছেলে কোলে করিয়া তার যে ছবিটি ফুটিয়াছিল, কোন ঐন্দ্রজালিকের সাধ্য নাই শুধু দেহে রূপ ঢালিয়া তাহাকে নিষ্প্রভ করিতে পারে।.. .পুরুষের চোখেও সে-ছবিটি না পড়িবার নয়—

এবং তাহারই দিকে স্বামীকে মুগ্ধ লুব্ধ দৃষ্টি পাতিয়া রাখিতে দেখিয়া সহসা-সঞ্জাত একটা বিজাতীয় আক্রোশে আত্মবিস্মৃত হইয়া ছেলেকেই কাড়িয়া লইয়া সে স্বামীকে উপভোগে বঞ্চিত করিয়া দিল।

···· চরম-মিলনের ঐ রূপটিই যে সে পাগল হইয়া খুঁজিয়া মরিতেছে।

তার পরদিনই সকাল বেলায় আগুনে ইন্ধন পড়িল।

"দিদি" বলিয়া ডাক্ দিয়া কি একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়াই প্রফুল্ল থামিয়া গেল—লজ্জায় সে মুখ ফুটাইতেই পারিল না, কিন্তু মিষ্টি মিষ্টি হাসিতে লাগিল।

ক্ষণপ্রভা বলিল,—কি রে?

—পরে ব'ল্‌ব। বলিয়া প্রফুল্ল ফিরিবার উপক্রম করিতেই ক্ষণপ্রভা তার আঁচল চাপিয়া ধরিল, বলিল,—কি বল্‌ছিলি ব'লে যা।

শুধু কৌতূহল এত উগ্র হয় না—

ক্ষণপ্রভা কি ভাবিয়াছিল কে জানে, কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে এই ভাবটাই অভ্রান্ত হইয়া দেখা দিল, যেন বেশি দেরী করিলে সংযত থাকা শক্ত হইবে।

প্রফুল্ল হাসিতে হাসিতেই বলিল,—কিছু নয়, অম্‌নি। কি বল্‌তে যাচ্ছিলাম তা ভুলেও যাচ্ছি ছাই।

—বল্, আমার মাথার দিব্যি!

—বল্‌ছি, তুমি আঁচল ছাড়। বলিয়া আঁচল টানিয়া গুটাইয়া লইয়া প্রফুল্ল বলিল,—লজ্জা কর্‌ছে, দিদি।

কিন্তু দিদির আগ্রহ তখন যেন হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে; বলিল,—তা করুক। না বলে' তুই যেতে পারিনে।

কথাটা শুনিবার জন্য ক্ষণপ্রভার এই প্রাণপণ জিদও কিন্তু বড় আশ্চর্য্য—

প্রফুল্ল তার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—তুমিই আজ ওপরে শু'য়ো। ওঁর ছেলে চাই। বলিয়াই সে দুম্ দুম্ করিয়া ছুটিয়া পালাইল।

কিন্তু এদিকে যা ঘটিতে লাগিল তার বর্ণনা নাই।

. ..যেন প্রফুল্ল বুকে দাঁত বসাইয়া তাহার দেহের রক্ত শেষ বিন্দুটি পর্য্যন্ত এক নিমেষেই চুষিয়া শুষিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেছে এমনি বিবর্ণ পাংশুমুখে ক্ষণপ্রভা সম্মুখের দিকে চাহিয়া কেবল শূন্যকেই দেখিতে লাগিল।—

দীনতারণ ঠিক্ কি কথাটি বলিয়া আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছে তাহা বোঝা গেল না—

কিন্তু প্রাণের যেখানে অন্তর্য্যামী—

বুকের যেখানে অকথিত বার্ত্তাও আপনি আসিয়া পৌঁছায়—

সেখানে চক্ষের পলকে আদ্যন্ত নিঃসংশয়ে জানা হইয়া গেল।

......স্বামী তাহাকে তাহার পুত্রসহ চাহেন নাই—উহারই গর্ভের সন্তানটিকে কামনা করিয়াছেন।

বিকালের সেই ছবিটা তাঁর মনে ছাপ রাখিয়া গেছে; পরের সন্তান কোলে করিয়া শোভা তখন সম্পূর্ণ ফোটে নাই···নিজের সন্তান ক্রোড়ে লইয়া স্বামীকে ও করে

দেখাইবে।...সেই দিনটির প্রতি স্বামীর লালসা সহসা জাগরিত হইয়া বোধ হয় দুর্নিবার হইয়াই উঠিয়াছে।

......ক্ষণপ্রভার মনে হইতে লাগিল, তাহার জীবন মিথ্যা, আশা আকাঙ্ক্ষা প্রীতি সব মিথ্যা—

সর্ব্বোপরি, সন্তানধারণও মিথ্যা।—

ভোগের ক্ষেত্র অবারিত পাইয়া স্বামী তাহাকে লইয়া কেবল খেলা করিয়াছেন।...ভাবিতে ভাবিতে ক্ষণপ্রভার মনে যে ভাবটির উদয় হইল, সাধ্বীর পক্ষে তাহা মহাপাতকের কথা—

স্বামীকে স্মরণ করিয়া ঘৃণায় মন ঘুলাইয়া উঠিল।

ক্ষণপ্রভার মনে হইল, তার চতুর্দ্দিকে অন্ধকার ঘিরিয়া আসিয়াছে...স্নিগ্ধ সুবিস্তৃত অন্ধকার নহে...সে অন্ধকার সঙ্কীর্ণ, কাঁটার মত চোখে বেঁধে।... সেই অন্ধকারের কেন্দ্রে সে...চারিদিকে যাহারা বিচরণ করিতেছে তাহারা যেন এ পৃথিবীর মানুষ নয়...তারা এমনই বিকৃত, বীভৎস।—

প্রফুল্ল টিপ্ পরে, চুল বাঁধে—

স্বামীর মনোরঞ্জনের অভিলাষটি যেন তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া উপছিয়া পড়ে—

ক্ষণপ্রভা শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখে...

দেখিতে দেখিতে একদিন বুক দুরু দুরু করিয়া অকস্মাৎ-উদ্ভূত একটা অতিশয় শঙ্কিত মমতায় ক্ষণপ্রভা বিগলিত বিহ্বল হইয়া প্রফুল্লকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

প্রফুল্ল অবাক্ হইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল—

দিদির এই আশ্চর্য্য অশ্রুমোচনের কারণ সে কিছুই বুঝিতে পারিল না।—

কিন্তু সুভদ্রা কিয়ৎক্ষণ পরেই একবার ঘরে ঢুকিয়া বড় বধূর চোখে অশ্রুচিহ্ন দেখিয়া ব্যাপার কতকটা বুঝিয়া ফেলিলেন; এবং একটু ভাবিতেই আগায় গোড়ায় কার্য্য কারণে চমৎকার সামঞ্জস্য ঘটিয়া ক্রন্দনের হেতুটা তাঁহার কাছে পরিস্কার হইয়া গেল।—

কিন্তু সুভদ্রার সব ভুল।

......চলা ফেরার যে পথটি মানুষের অসংখ্য পদচিহ্ন বুকে করিয়া পড়িয়া আছে, সেই সত্য, সেই সনাতন; তাহার বাহিরে পা বাড়াইলেই অকল্যাণ সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিবে—

নমস্য পূর্ব্বগামীরা যে পথে চলিয়া হাসিতে হাসিতে জীবন কাটাইয়া দিয়াছেন সেই নিরূপিত পথটি যথেষ্ট সুখকর প্রশস্ত নহে মনে করিয়া অন্য পথের জন্য মানুষ দাবি নয়, লোভ করিতে পারে, ইহা সুভদ্রার ধারণাতীত।...কেহ অমন কথাটি মুখে আনিলে সুভদ্রা তাহাকে পাগল বলিবেন।—

তাই তিনি ক্ষণপ্রভার নিরুৎসাহ শুষ্কতা লক্ষ্য করিয়া ভাবিয়া আসিতেছেন তার নারী-সুলভ স্বামী-লোলুপতার স্বাভাবিক দিকটাই; এবং আধুনিকতম চোখের জলের উৎসও যে সেইখানেই তাহাতে তাঁহার সন্দেহ রহিল না।

কিন্তু সব ভুল—

ক্ষণপ্রভা সে কারণে কাঁদে নাই।

প্রফুল্লর প্রসাধনের দিকে নিঃস্পৃহ চক্ষে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে ক্ষণপ্রভার মনে হইল, ইহার অদৃষ্টও ত তাহারই মত; ঊর্ণনাভের তন্তুকেই এ-ও প্রেমের বন্ধন বলিয়া ভুল করিতেছে; ভোগের কেবলি বর্দ্ধিষ্ণু ক্ষুধার মুখে আহার তুলিয়া দিয়া এ ও মনে করিতেছে জীবনের চরিতার্থতার কিছু বাকি রহিল না!..কিন্তু যে দিন আত্মার ক্ষুধার দাবি মিটাইবার দিন আসিবে—সে দাবি যখন আর কোনো কথা কানে তুলিতে চাহিবে না—তখনই মায়াবীর এই স্বপ্নপুরীর চিহ্নও রহিবে না......দেখিতে হইবে, সব শূন্য; পৃথিবী শবের মত অসাড়; বৃথাই সে অগ্নিতে ঘৃত ঢালিয়াছে......

বেচারী জানে না, তাহার আকাশে উল্কা জ্বলিয়া উঠিল বলিয়া।—

প্রফুল্ল ক্ষণপ্রভাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরে, বলে,—দিদি, ভাই, রাগ করেছিস্?

ক্ষণপ্রভা কথা কহে না—

যে কথা ভিতরের কটাহে ফুটিতেছে তাহা বলিবার নয়......

বিষণ্ণ কুয়াসাচ্ছন্ন চক্ষু দু'টি তুলিয়া ভগিনীর মুখের দিকে সে চায়—

চাহিয়াই থাকে।

কিন্তু রাগ সে করে নাই।......হঠাৎ সে হাত বাড়াইয়া প্রফুল্লর চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করে, ভাবে, কোথায় চলেছি আমরা!..... এ কেন আমার সঙ্গিনী হল।

......ভাবিতে ভাবিতে মন তার চিন্তার জটিল গহনের অপার অন্ধকারে কোথায় হারাইয়া যায়...একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস মোচন কবিবার মত সামর্থ্য সজীবতা তার প্রাণের থাকে না।—

সুভদ্রা অনুকম্পাপরবশ হইয়া রাত্রে এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন—

আহারাদির পর ক্ষণপ্রভা বিছানায় উঠিতে যাইতেছে, এমন সময় সুভদ্রা আসিয়া বলিলেন,—তোমার বিছানা ওপরে দিয়েছি বড বৌমা।

শুনিয়াই ক্ষণপ্রভা ছিটকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—

কি একটা কথা, কিম্বা বোধ হয় আর্ত্তনাদই, তার জিহ্বাগ্রে ছুটিয়া আসিয়া ঠোঁট দু'খানিকে বারকতক কেবল কাঁপাইয়া দিয়া গেল—

শব্দ ফুটিতে পারিল না—

পরক্ষণেই তার দৃষ্টি একটা অব্যক্ত ব্যাকুলতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল... ..

সুভদ্রা তার চোখের দিকে চাহিয়া অবাক্ হইয়া বধূর এই আচরণের অর্থগ্রহণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সুচতুর শ্বশ্রূ-সুলভ সংস্কারের সহিত ইহ'র কোনো স্থানেই মিল না দেখিয়া রাগিয়া উঠিয়া কহিলেন,—যাও।

ক্ষণপ্রভা পা বাড়াইয়াও দাঁড়াইয়াই রহিল।

সুভদ্রা ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়া আসিয়াছিলেন—

আজ বড় বৌকে উপরে পাঠাইতেই হইবে—

অভিমান ত সে করিবেই।

আবার বলিলেন,—যাও।

নিদ্রিত ছেলেটাকে, বুকে তুলিয়া লইয়া ক্ষণপ্রভা চলিতে আরম্ভ করিল।

দীনতারণ শুইয়া শুইয়া লণ্ঠনের আলোয় সাপ্তাহিক কাগজে কলপের বিজ্ঞাপন পড়িতেছিল—

পায়ের শব্দে সে চোখ ফিরাইল—

সে-চোখ কি দেখিবার অনন্ত আশায় চকিত হইয়া ফিরিয়াছিল, এবং কি দেখিয়া গুটাইয়া যাইতে যাইতে কি মনে করিয়া রহিয়া গেল তাহা স্পষ্ট—

ক্ষণপ্রভাও তাহা নিজের চোখেই দেখিল।......

তারপর তার পা দু'খানা সম্মুখে শয্যার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া চলিল বটে, কিন্তু তখন তাহার কায় ও মনের গতি-চেতনা একেবারে নিশ্চল হইয়া থামিয়া গেছে।

দীনতারণ বলিল,—খুব রোগা হ'য়ে গেছ দেখ্‌ছি। খোকাকেও ত' রোগা রোগা দেখ্‌ছি।

বহুদিনের পর স্ত্রী-পুত্রের স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় দীনতারণের এই উৎকণ্ঠা পৃথিবীর সূচ্যগ্র ভূমিও স্পর্শ করিল না—হাওয়ায় ভাসিয়া নিঃশেষে বাহির হইয়া গেল।

দীনতাবণ কোনো জবাব না পাইয়া মানভঞ্জনের পক্ষে অতিশয় কার্য্যকরী অনেকগুলি শব্দ জুটাইয়া রাখিল; এবং তাহাতে ফল না দর্শিলে কি উপায় অবলম্বন করা যাইবে তাহাও বিবেচনা করিতে লাগিল।

.. .. খোকার শয্যায় খোকাকে শোয়াইয়াই ক্ষণপ্রভা হঠাৎ আপাদমস্তকে চম্‌কিয়া উঠিল—

এমন যে কখনো ঘটিবে তাহা সে জানিত না...

এই শয্যায় প্রবেশ করিতে তার গা ঘিণ্‌ ঘিণ্‌ করিতেছে!...অদূরবর্ত্তী ঐ লোকটা যেন কেবল একটা মাংসপিণ্ড—যেমন কদর্য্য তেমনি লোলুপ, তার মাংসাশী দেহটা যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়া হা করিয়া আছে...

মন দিয়া ঐ দেহ স্পর্শ করা সে যেন স্মরণাতীত কোন যুগে পরিত্যাগ করিয়াছে—;

কিন্তু হাত দিয়া তার শয্যাটা স্পর্শ করিতেই তার মনে হইল, এই তার এখানে শেষ আসা......

পতনের শেষ ধাপে আসিয়া সে দাঁড়াইয়াছে—

তারপরে......

ক্ষণপ্রভা সভয়ে চোখ বুজিল।

* * * কিন্তু দেবতা তার প্রাপ্য অর্ঘ্য আদায় না করিয়া ছাড়িল না।

রাত্রি গভীর।—

হঠাৎ মেঘের ডাকে ঘুম ভাঙ্গিয়া দীনতারণ দেখিল, ক্ষণপ্রভা শয্যায় নাই, ছেলেটিও নাই, দরজা খোলা।

দীনতারণ উঠিল,—আগে পালঙ্কের এ-ধার ও-ধার খুঁজিল...তারপর বারান্দা...তারপর উঠান...

এবং তারপরেই হাঁকডাক্ করিয়া যেখানে যে ছিল সবাইকে টানিয়া আনিল—

সুভদ্রার গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল—

জগত্তারণ চীৎকার করিয়া দিক্‌বিদিকে লোক ছুটাইতে লাগিলেন।—

ক্ষণপ্রভা কোথাও নাই...

ঘরে নাই, বারান্দায় নাই, বাড়ীর ত্রিসীমানায় নাই।

কিন্তু কোথাও সে ছিল—

ভোরবেলা একজন তাহাকে ধরিয়া আনিয়া হাজির করিয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল, সবাই মুখ ফিরাইল।—

তখন সে নগ্নদেহ—

সম্পূর্ণ উন্মাদ; কিন্তু ছেলেটি বুকে আছেই।

রূপের অভিশাপ
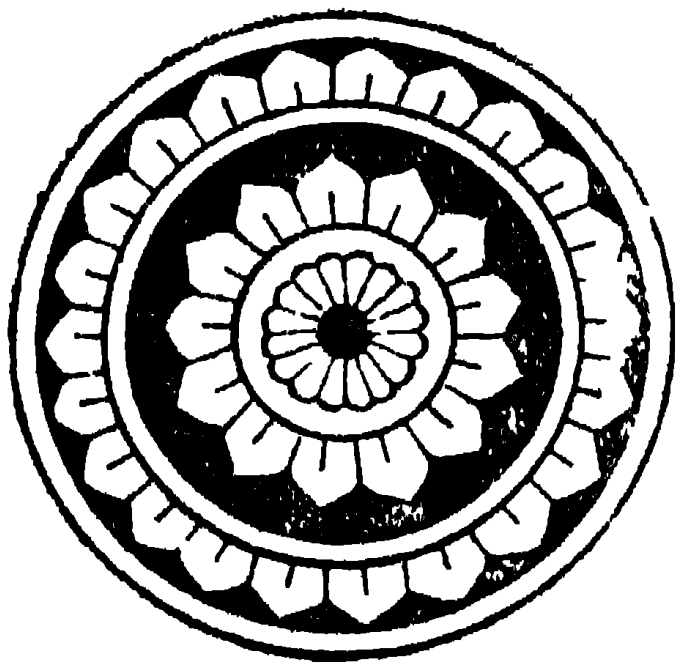
—পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর—

শ্রী নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

৭

পরের দিন ভোরে যখন পরীর ঘুম ভাঙ্গিল, তখন সে সব ভুলিয়া গিয়াছে। চক্ষু মেলিয়া তার সমস্ত আবেষ্টনটা প্রথমে অপরিচিত বোধ হইল। সে ভাবিল এ কোথায় সে কেমন করিয়া আসিয়া পড়িয়াছে। তার পাশে কাসিম শুইয়া নিদ্রা যাইতেছিল, তার দিকে চাহিতেই চড়াং করিয়া একটা কঠিন আঘাত খাইয়া সে সমস্ত অবস্থা স্মরণ করিল। কাসিমের দিকে চাহিতে তার একটা অকথ্য দুর্নিবার অপরিমেয় ঘৃণা ও ভীতির ভাব মনে জাগিয়া উঠিল। সন্তর্পণে শয্যাত্যাগ করিয়া সে বসন সংবৃত করিল, তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া সে দ্বারের দিক অগ্রসর হইয়া নিঃশব্দে দুয়ার খুলিল।

তখন তার মনে একমাত্র চিন্তা একমাত্র প্রবৃত্তি জাগিয়া ছিল—ওই কদাকার পশুটি হইতে যত দূর সম্ভব পলায়ন করিতে হইবে। সে খুব তাড়াতাড়ি চিন্তা করিতে লাগিল। তার মনে হইল সে এখনই পলাইয়া পিত্রালয়ে যাইবে, আর আসিবে না।

দুয়ার খুলিয়া সে ভীত ত্রস্ত চিত্তে একবার কাসিমের দিকে চাহিল—দেখিল সে অঘোরে ঘুমাইতেছে। আশ্বস্ত হইয়া সে সেদিকে চাহিতে চাহিতেই দাওয়ায় পা বাড়াইল। তার কোনও দ্বিধা মনে ছিল না, তার এক লক্ষ্য ছিল পলায়ন।

মুখ ঘুরাইয়া সম্মুখে চাহিতেই সে দেখিল একটা দাসী সম্মুখের কাঁচা-ঘরের 'ডোয়া' গোবর-মাটি দিয়া লেপিতেছে। কাসিমের বাড়ীতে এই একখানা ঘরের পৈঠা ও দেওয়াল ছিল পাকা, বাকী সবই কাঁচা পৈঠার উপর বাঁশের বেড়া দেওয়া টিনের ঘর। দাসী কুড়ানী রোজ প্রত্যূষে উঠিয়া এই সব কাঁচা ঘরের পৈঠা এবং মাঝে মাঝে উঠান মাটি দিয়া লেপিয়া দেয়।

কুড়ানীর সঙ্গে পরীর অবশ্যই পূর্ব্ব হইতেই জানা শোনা ছিল। সে সেই পূর্ব্ব পরিচয়ের জোরে পরীকে গত রাত্রের কথা লইয়া একটা মোটা রকমের রসিকতা করিল। পরীকে কে যেন বুকে ছুরী মারিল।

কুড়ানীকে দেখিয়া পরী মনের ভিতর একটা মস্ত ধাক্কা খাইল। তার পলায়নের পথ প্রশস্ত নয় অনুভব করিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। যেন একটা মহা কুকর্ম্মে ধরা পড়িয়াছে, এমনি তার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল।

সে মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিয়া নিঃশব্দে উঠান ডিঙ্গাইয়া বাহির বাড়ীতে চলিয়া গেল। সেখানে উঠানের এক ধারে গোয়াল-ঘরে পাঁচ ছয়টা গরু বাঁধা ছিল—একটা চাকর তাহাদিগকে জাব দিতেছিল। গরুগুলি দেখিয়া তার প্রাণ তার পিত্রালয়ের জন্য কাঁদিয়া উঠিল। সেখানে তাঁর নিজের গরুগুলি না জানি কত আকুল হইয়া পরীকে অন্বেষণ করিতেছে! সে মোহমুগ্ধের মত গরুগুলির ক্ষুধিত ব্যগ্র ভোজনক্রিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ এমনি দাঁড়াইয়া থাকিবার পর পশ্চাতে কাসিমের কণ্ঠ শুনিয়া তার সমস্ত অঙ্গ একেবারে কাঁপিয়া উঠিল।

কাসিম বলিল, "এখানে এসেছিস্ বড়; অন্দরে যা।

খবরদার অন্দর থেকে বেরিয়ে আমার বেইজ্জত করিস্ না।"

আর দ্বিতীয় কথা বলিতে হইল না, আহত শম্বুকের মত পরী সুড়ুৎ করিয়া তার অন্দরের খোলসের ভিতর অন্তর্হিত হইল।

এ কি বিষম আপদ। পরী ছিল গরীব চাষীর মেয়ে, তার বাপের বাড়ীতে পরদার ধার কেউ ধারে না, কোনও অপরিচিত লোক দেখিলে ঘোমটা-টা একটু লম্বা করিয়া টানিয়া তারা পরদার মর্য্যাদা রক্ষা করে। সেই গৃহে সে উন্মুক্ত আকাশতলে খোলা হাওয়ায় ছুটাছুটী করিয়া মানুষ হইয়াছে, কোনওখানে যাইতে তার বাধা ছিল না, কোনও দিন কোনও বাধা হইবে বলিয়া সে কল্পনাও করে নাই। কিন্তু কাসিমের পয়সা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সরীফ লোকের হালচাল ষোলআনা আদায় করিবার চেষ্টায় গৃহে এমন প্রচণ্ডভাবে পরদার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল যে খানদানি ঘরেও এতটা কষাকষি দেখা যায় না। তার অন্দরের প্রাচীর উঁচু, তার কাছাকাছি কোনও এমন গাছ নাই যার উপর কেহ উঠিলে বিবিদের বেইজ্জত হইবার সম্ভাবনা হয়। দশ বৎসরের অধিক বয়স্ক কোনও পুরুষের সে অন্দরে গতিবিধি নাই, কেবল কাসিম ছাড়া। এ ব্যবস্থা কাসিম করিয়াছিল তার পরিত্যক্ত স্ত্রীর আমলেই, যখন তার রূপ বা যৌবনের ছিঁটা ফোঁটাও অবশিষ্ট ছিল না। সে যে ঈর্ষ্যা বা ভয়ে এমন করিয়াছিল তাহা নয়, সে ইহা করিয়াছিল ইজ্জতের খাতিরে,—আপনাকে খানদানি ভদ্রলোকদের সঙ্গে সমান আসনে বসাইবার জন্য। আজ যে একটা জলজীয়ন্ত পরীকে ঘরে পুরিয়া সে এ পরদার মর্য্যাদা ষোলআনা বজায় রাখিবার চেষ্টা করিবে সে আর বিচিত্র কি?

কাসিমের কাছে তাড়া খাইয়া পরী একেবারে তার শুইবার ঘরের দাওয়ার উপর গিয়া উঠিয়া বসিল। সেখান হইতে সে অপরিসর উঠানের চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টনীর দিকে সভয়ে চাহিয়া দেখিল। এই ক্ষুদ্র বেষ্টনীর মধ্যে তবে তাকে দিন গুজরান করিতে হইবে কেবল মাত্র ওই আস্ত মর্কট-টার সঙ্গে। ভাবিতে তার অন্তর হাঁপাইয়া উঠিল।

ইহার পর পরী সহজেই আন্দাজ করিল এমন সরীফ স্বামী তার, পরদার সম্পর্কবর্জ্জিত গরীবুল্লার বাড়ীতে তাহাকে কখনও যাইতে দিবে না। এইখানেই তার পচিয়া মরিতে হইবে। ভাবিতে তার বুকের রক্ত শুকাইয়া গেল।

সে একটা কাজ হাতে পাইলে বাঁচিয়া যাইত, কিন্তু কেহ তাহাকে কোনও কাজ করিতে বলিল না। সে শুধু অলসভাবে বসিয়া বসিয়া তার দুঃসহ জীবনের ভীষণ স্বপ্ন মনে মনে গড়িয়া যাইতে লাগিল। যতই ভাবিল ততই ভয়ে তার আত্মা শুকাইয়া উঠিল।

আজ এই দুঃখে পড়িয়া তার খুব বেশী করিয়া মনে পড়িল লতিফের কথা। লতিফের সঙ্গে যদি তার কাল বিবাহ হইয়া যাইত তবে কত সুখে সে দিন কাটাইতে পারিত। লতিফ তার চোখে অপরূপ সুন্দর, তার সঙ্গ তার কাছে স্বর্গসুখ বলিয়া মনে হইল। সেই অলভ্য ঈপ্সিতের স্বপ্নে সে বিভোর হইয়া বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া শেষে সে এক আঁটি বারুণ দেখিতে পাইয়া তাহা লইয়া তার ঘরের ভিতর গেল। বিছানা পাট করিয়া জিনিসপত্র গুছাইয়া সে ঘরখানা ঝাঁট দিয়া নির্ম্মল ঝকঝকে করিয়া ফেলিল। যে প্রীতি এই কাজকে তার চক্ষে পুণ্য ও মনোরম করিয়া তুলিতে পারিত তাহা তার ছিল না, শুধু কাজ করিবার অভ্যাস ও একটা সহজ পরিচ্ছন্নতার প্রবৃত্তিবশে সে যন্ত্রের মত কাজ করিয়া গেল, ইহার ভিতর তৃপ্তির সুখ সে পাইল না।

কুয়ার ধারে হাত ধুইয়া সে ঘরে ফিরিয়া দেখিল কাসিম সেখানে জুটিয়াছে। সে পরিপূর্ণ তৃপ্তির সহিত গৃহের নূতন স্ত্রী উপভোগ করিতেছে—তার উন্মুক্ত ওষ্ঠাধর দিয়া কয়েকটি অতিরিক্ত দন্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

কাসিমকে ঘরে দেখিয়াই পরী ঘোমটা-টা লম্বা করিয়া টানিয়া মুখ ঘুরাইয়া বাহির হইতে গেল।

কাসিম তাহাকে হাত ধরিয়া ফিরাইল। শয্যার কাছে তাহাকে টানিয়া লইয়া সে বিছানার উপর বসিয়া দুই বাহুবেষ্টনে পরীকে বুকের ভিতর সাপটিয়া ধরিল—পরীর বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল।

কাসিম তার ঘোমটা খুলিয়া ফেলিয়া বলিল, "একলা ঘরে আর অত লজ্জা নাই ক'রলি? এখানে আমি আর তুই ছাড়া তো কেউ নেই, কেউ আসবেও না।" বলিয়া পরীর অনাবৃত গণ্ডে সে ক্ষুধিতের মত চুম্বন করিতে লাগিল।

ঘোমটা খুলিয়া ফেলায় পরী ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করিল। ওই সূক্ষ্ম আবরণের অন্তরালে সে বরং এই জানোয়ারটার সান্নিধ্য সহ্য করিতে পারিত কিন্তু অনাবৃত হইয়া তার সমস্ত মুখখানা ইহার লোলুপ দৃষ্টির সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দাঁড়াইতে তার যেন প্রাণের তলা পর্যন্ত ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। কাসিম তখন তার গৃহসজ্জার ভূয়সী প্রশংসা করিল। তারপর সে দুয়ার বন্ধ করিয়া দেয়ালে গাঁথা তার লোহার সিন্দুক খুলিয়া কয়েকটা গহনা বাহির করিয়া পরীকে পরাইল। টাকার তোড়া দেখাইল। এমনি করিয়া সে পরীকে আদর করিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিল।

পরীর জিহ্বা একেবারে তালুর সঙ্গে আঁটিয়া আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সে একটা কথাও কহিল না, কোনও বাধা দিল না—কাসিম তাহাকে যাহা করিতে বলিল তাই সে শুধু করিয়া গেল।

অনেকক্ষণ এমনি সোহাগের পর কাসিম বলিল, "এখন আমি যাই, আমার হাটে যাবার বেলা হ'য়ে এলো।"

বহুকষ্টে পরী বলিল, "এসো।"

কাসিম বলিল, "কিন্তু তুমি আমাকে একটা চুমো দেবে না পরী?"

এ কথায় পরীর যা কিছু সাহস এতক্ষণ হইয়াছিল সব শুকাইয়া গেল।

কাসিম কথাটা বলিয়াই পরীকে দুইহাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া পরীর ঠোঁটের কাছে তার গালটা বাড়াইয়া দিল।

বলির পশুর মত কাঁপিতে কাঁপিতে হাড়িকাঠে গলা বাড়াইয়া দিবার মত করিয়া পরী বহুকষ্টে কাসিমের সেই শ্মশ্রুবহুল গণ্ডে একটি ক্ষুদ্র চুম্বন দিল। তার মনে হইল, তার তো উপায় নাই!

কাসিম উৎফুল্ল হৃদয়ে পরীর দিকে বুভুক্ষু দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে বিদায় হইয়া গেল। পরী তার শুষ্ক ওষ্ঠাধর বার বার করিয়া চাটিতে চাটিতে কোনও মতে আত্মসংবরণ করিয়া রহিল। কাসিম বাহির হইয়া গেলেই সে বিছানার উপর ধপ্ করিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল—নিঃশব্দে—অস্ফুটস্বরে সে শুধু বলিল, "মাগো, এ কি ক'রলে আমার!" তার সেই কান্নার ভিতর দিয়া তার সমস্ত নিস্ফল, লাঞ্ছিত নারীজন্ম হাহাকার করিয়া উঠিল।

কাসিম বেপারী হাটে চলিয়া যাইবার অনেক পরে কুড়ানী তার কাজ সারিয়া একটা কাঠাতে করিয়া কিছু মুড়ি, একটা 'বীচা' কলা ও একটা কদমা লইয়া ঘরে আসিল। পরীকে কাঁদিতে দেখিয়া সে সস্নেহে তাহাকে টানিয়া উঠাইল, বং মুখ ধুইয়া খাইতে বলিল।

পরীর মনে হইল যে তার কণ্ঠনালী বুঝি একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে—খাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব। সে কুড়ানীকে অনুনয় করিয়া মাপ চাহিল।

কুড়ানী বলিল, "ওমা সে কি কথা? খাবেনা কি? না খেলে আমি বেপারী সাহেবকে ব'লে দেব।"

এ কথায় পরীর বুক কাঁপিয়া উঠিল, সে ভয়ে ভয়ে উঠিয়া মুখে চোখে একটু জল দিয়া শুষ্কমুখে মুড়ি চিবাইতে বসিল। কুড়ানী পাশে বসিয়া গল্প করিতে লাগিল।

শেষে পরী বলিল, "ফুপু, তুমি আমার বাপজানকে

একবার একটা খবর দিতে পার, বাপজান মা এরা কেউ একবার আমার দশা দেখতেও এলো না!"

কুড়ানী বলিল, "ওমা সে কি কথা? আসবে না কেন? তোর না হ'তে হ'তে বুড়াবুড়ী এসে হাজির হ'য়েছিল, কিন্তু বেপারী সাহেব তাদের ফিরিয়ে দিলে। বল্লে কি এখানে এনে দেখিয়ে শুনিয়ে তোমার মনটা অনেকটা, ঠাণ্ডা হ'য়েছে, এখন আবার বাপ মাকে দেখলে হয় তো তুমি কান্নাকাটি সুরু ক'রবে, তাই তাদের বুঝিয়ে পড়িয়ে ফিরিয়ে দিলে, বল্লে, কয়েক দিন যাক্, মনটা এখানে থিতিয়ে পড়লে তবে যেন তারা আসে।"

বাপ মা আসিয়াছিল, কাসিম তাদের ফিরাইয়া দিয়াছে এই কথা শুনিয়াই পরী হাত তুলিয়া বসিয়াছিল। এখন সে কাঠাশুদ্ধ মুড়ি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া উঠিয়া গেল। খাটিয়ার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

কুড়ানী প্রমাদ গণিল। কোন্ শয়তান তার মুখে এ কথা আনিয়া দিয়াছিল ভাবিয়া তার চুল ছিঁড়িতে ইচ্ছা হইল। কেন সে মরিতে এ কথা বলিতে গেল? বেপারী একথা শুনিলে তো তাহাকে আর আস্ত রাখিবে না।

মুড়ীগুলি খুঁটিয়া খুঁটিয়া কাঠায় তুলিয়া কুড়ানী পরীর কাছে গিয়া মিনতি করিয়া বলিল, "হেই তোর পায় পড়ি মা, তুমি ঠাণ্ডা হও—বেপারী যদি শুনতে পায় আমি একথা ব'লেছি, সে আমাকে ছিঁড়ে খাবে। দোহাই মা তোমার—ঠাণ্ডা হও—একথা বলো না বেপারীকে—মাথা খাও আমার! লক্ষী মা আমার!"

অনেকক্ষণ পরে কতকটা সুস্থ হইয়া পরী উঠিল। তার আর কিছু ভাল লাগিল না। ভাবিয়া ভাবিয়া সে আর কুল পাইল না, ভাবিতে তার ইচ্ছা হইল না। তার মনে হইল একটা কাজ কর্ম্ম না করিলে সে মরিয়া যাইবে।

সে কুড়ানীকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ বাড়ীতে রান্না করে কে?"

কুড়ানী জানাইল কাসিমের এক বুড়া ফুপু আছে সেই রাঁধে, কুড়ানীও মাঝে মাঝে রাঁধে।

পরী বলিল, "চল রসুই ঘরে চল—দেখিগে কি রান্না হ'চ্ছে।"

রসুই ঘরে গিয়া সে ফুপুর সঙ্গে পরিচয় করিল—দুই একখানা রান্না লইয়া একটু ঘাটাঘাঁটি করিল, তারপর উঠিয়া গেল। আসিতে আসিতে দেখিল ঢেঁকিঘরে তার পিতৃগৃহের দুই প্রতিবেশিনী ধান ভানিতেছে। সে ছুটিয়া সেখানে গিয়া অনেকক্ষণ তাদের সঙ্গে আলাপ করিল। খানিকক্ষণ তাদের সঙ্গে ঢেঁকি "পাড়"ও দিল।

দ্বিপ্রহরে বেপারী বাড়ী ফিরিল না। তখন পাটের বাজারে খুব ধুমধাম, বেপারীর বাড়ী ফিরিবার অবসর প্রায় হয় না। পরী আহারান্তে ঘুমাইয়া দিনটা কাটাইয়া দিল। অভ্যাসমত সে একটু প্রসাধন করিল। যতই সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল ততই তার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল—আর এক ভীষণ রাত্রি তার সম্মুখে—সে রাত্রির কল্পনায় তার হৃদয় স্তরে স্তরে কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু রাত্রি আসিল, কাটিয়াও গেল, আবার দিন আসিল, দিন কাটিয়া গেল। সময়ে সব চেয়ে বড় দুঃখও সহিয়া যায়—পরীরও সহিয়া গেল।

কয়েক মাস না যাইতেই পরী পুরাপুরি কাসিমের গৃহিণী হইয়া বসিল। সে এখন দিনরাত কাসিমের সংসারের পিছনে খাটে,—ধান শুকায়, ধান-কুটুনীদের ধান মাপিয়া দেয়, চাল মাপিয়া তোলে, বর্গাদারের বীজ মাপিয়া দেয়, তাদের ফসল মাপিয়া লয়—গৃহস্থ-ঘরের সব কাজই পরম সৌষ্ঠবের সঙ্গে সম্পন্ন করে। তার গুণে কাসিমের একটি পয়সাও অপচয় হয় না।

তার কোনও দুঃখ আছে কিনা এখন তার কেউ খবরও রাখে না—সেও বড় রাখে না। কিন্তু তার ঘরের একটা জানালা দিয়া সাহেবুল্লার বাড়ীর সুপারী গাছের ঝাড়ের ডগাটা দেখিতে পাওয়া যায়—মাঝে মাঝে পরী সেই জানালার কাছে দাঁড়াইয়া হতাশ উদাস দৃষ্টিতে সেই গাছের ঝাড়ের দিকে চাহিয়া থাকে,—মাঝে মাঝে তার বুক ভাঙ্গিয়া উদাস নিঃশ্বাস ঝরিয়া পড়ে!

পরীর সব সহিয়া গিয়াছে—কাসিমের সঙ্গে সে মিশিয়া গিয়াছে। যেমন আর দশ স্থানে হয় এখানেও তেমনি হইয়াছে—ইহাতে কেহ একটু আশ্চর্য্যও হয় না। কিন্তু কত বড় একটা বিপ্লব, কি প্রকাণ্ড দুর্দ্ধর্ষ একটা অত্যাচারে যে একটা নারীর কোমল প্রাণ নিষ্পেষিত হইয়া কেবল একটা জড় মাংসপিণ্ড হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তার খবর এক অন্তর্য্যামী ভগবান ভিন্ন কেহই জানে না।

৮

এমনি করিয়া পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটিল।

লতিফ ও ফকীর সেই রাত্রির পরের দিন বাড়ী ফিরিয়া দেখিল ভয়ানক কাণ্ড। বৃদ্ধ সাহেবুল্লা হঠাৎ একেবারে মৃত্যুশয্যায় শুইয়া পড়িয়াছে: যখন লতিফ আসিল তখন শেষ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই।

সাহেবুল্লাকে মাটি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পরিবারে দারুণ অশান্তি লাগিয়া উঠিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র করিম প্রকাশ করিল যে সাহেবুল্লা মৃত্যুর তিন মাস পূর্ব্বে একখানা কোরাণ শরিফ ও একখানা তছবী লইয়া করিমের বরাবরে প্রায় অর্দ্ধেক সম্পত্তি হেবা বিল এওয়াজ করিয়া দিয়াছিল। মধ্যম পুত্র হবিব স্বীকার করিল একথা সত্য এবং নিজেও আর অর্দ্ধেক সম্পত্তি হেবা বিল এওয়াজ সূত্রে দাবী করিল। লতিফ ও তার নাবালক ছোট ভাই ইহাতে পথে বসে।

যে মজলিসে এই নিদারুণ বার্ত্তা প্রকাশ হইল সেখানে লতিফ ফকীরকে ডাকিয়া আনিল। ফকীর আসিয়া মহা তর্ক জুড়িয়া দিল, বলিল, এ হেবা মিথ্যা—সত্য হইলেও ইহা তঞ্চকী। আর যাই হউক হেবা করিয়া এত সম্পত্তি দান করিবার অধিকার সাহেবুল্লার ছিল না। করিম বুঝাইল হেবা বিল এওয়াজে ইহা হইতে পারে উকীলের কাছে এই পরামর্শ লইয়াই সাহেবুল্লা বিল এওয়াজ হেবা করিয়াছিল।

ফকীর তখন বলিল, এওয়াজের কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। সে বলিল, বেশ এওয়াজ যদি হ'য়ে থাকে তবে সে কোরাণ-শরিফ আর তছবী গেল কোথা? করিম এইখানে একটু ভুল করিয়াছিল—অতটা হিসাব করে নাই। লতিফ যখন সে কোরাণ-শরিফ ও তছবী তলব করিল তখন গ্রামের এক বৃদ্ধের কাছে একখানা তছবী ছিল সেইখানা করিম চাহিয়া আনিয়া হাজির করিল—কিন্তু কোরাণ-শরিফ মিলিল না। পিয়ারপুর গ্রামের মধ্যে কোথাও কাহারও একখানা কোরাণ শরিফ ছিল না; তাই মিলিল না।

যদিও সে মজলিসে করিম এই কারণে ঠকিয়া গেল তবু ইহাতে সে হটিল না। যতক্ষণ লতিফ পরীর পিছনে ছুটাছুটী করিতেছিল ততক্ষণ করিম ও হবিব পিতার অস্থাবর সম্পত্তি ও নগদ টাকাকড়ি সমস্ত হস্তগত করিয়াছিল। কাজেই টাকার জোরে মালিক ও গোমস্তারা হস্তগত হইল, তাহারা হেথা বিল এওয়াজ স্বীকার করিয়া করিম ও হবিবের নামে দাখিল খারিজ করিয়া দিল।

লতিফ প্রথমে লাঠির জোরে জমী দখল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু দুই এক নম্বর ফৌজদারী হইয়া জমী দখল করিম ও হবিবের সাব্যস্ত হইল। তখন নাচার হইয়া লতিফ দেওয়ানী মোকদ্দমা সুরু করিল। এক বৎসর হাঁটাহাঁটি ও তদ্বিরাদি করিয়া মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি হইল, করিম ও হবিব লতিফকে যৎকিঞ্চিৎ ভূমি ছাড়িয়া দিল। কিন্তু মোকদ্দমার খরচের জন্য যে দেনা হইয়াছিল তারজন্য লতিফের সে জমি ছাড়িতে হইল।

বিষম চটিয়া লতিফ দেশ ছাড়িয়া ধুবড়ী চলিয়া গেল। বিবাহের পর আর গরীবুল্লা পরীর খোঁজ করিতে পারে নাই—সে ইচ্ছা বা অবসরের অভাবে নয়—তার শরীফ জামাতা এই ছোটলোক চাষীকে তার কবিলার সঙ্গে বেশী মেশামিশি করিতে দিতে চায় না বলিয়া।

বিবাহের পরদিনই গরীবুল্লা ও রসিমন মেয়ের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল। সেদিন কাসিম নানা রকম

শ্লোকবাক্যে তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিয়াছিল। তাহার পরও তাহারা অনেকবার দেখা করিবার চেষ্টা করিয়াছে—আমল পায় নাই। আজ এটা কাল ওটা এইরূপ নানা ওজুহাতে বেপারী তাদের ফিরাইয়া দিয়াছে। শেষে গরীবুল্লা ব্যাপার বুঝিয়া রাগ করিয়া বলিয়াছে যে পুনরায় কাসিম বেপারীর বাড়ী যাওয়া তার পক্ষে হারাম।

একথা খুব চোটের সহিত বলিয়া সে বাড়ী আসিল বটে, কিন্তু আসিয়া সে একেবারে বসিয়া পড়িল। তার বুক ঠেলিয়া কান্না আসিতে লাগিল। বৃদ্ধ পরীকে ভালবাসিত—তার মনে হইল যে টাকার লোভে মেয়েটাকে এমনি করিয়া ভাসাইয়া দিয়া সে ভয়ানক অপকর্ম্ম করিয়াছে—বোধ হয় ইহা তার পক্ষে একটা গুরুতর গুণাহ হইয়াছে। তাহার উপর যখন তার ছেলেরা—এমন কি বসিবন পর্য্যন্ত তাহাকে একথা লইয়া খোঁটা দিতে আরম্ভ করিল তখন তার দুঃখসাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

সে যে গুণাহ করিয়াছে সে বুঝিল যে তার পরিচয় সে হাতে হাতে পাইয়াছে। সে মনে করিয়াছিল যে মেয়ের বিবাহ দিয়া সে যুধিষ্ঠিরের ক্ষেত ক'খানা সুবিধা দরে কিনিয়া ফেলিবে, কিন্তু সে ক্ষেত সে পায় নাই। সে দিন কন্যার হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়ায় যুধিষ্ঠির যথাসময়ে কবালা লইয়া রেজেষ্ট্রি আফিসে হাজির হইতে পারে নাই। তার পর যুধিষ্ঠিরের মত ফিরিয়া গেল, সে জমী দিতে অস্বীকার করিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে জমী বিক্রয় করিয়া নবদ্বীপ বাসের প্রস্তাব পরাণের মার মনঃপুত হয় নাই। সে নবদ্বীপ যাইতে ঝাড়িয়া অস্বীকার করিয়াছে। তাহাকে ছাড়িয়া যুধিষ্ঠির যাইতে পারে না—কাজেই সে যাইতে রাজী হইল না। এদিকে নফর সাও জমী বেহাত হইয়া যায় দেখিয়া একটু নরম হইয়া কিস্তিবন্দীতে সম্মত হইয়াছিল, কাজেই যুধিষ্ঠিরের জমী বেচিবার তেমন তাগাদাও ছিল না। খুব চটিয়া গরীবুল্লা যুধিষ্ঠিরকে খুব খানিকটা শাসাইল এবং মোকদ্দমা করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু উকীল-বাড়ী হাঁটাহাঁটি করিয়া সে জানিল যে যে বায়না-পত্র যুধিষ্ঠির সম্পাদন করিয়াছিল তাহা আইন সঙ্গত হয় নাই। কাজেই গরীবুল্লা কেবল রাগই করিল, জমী পাইল না।

কাসিম বেপারীর কাছে যে সাতশো টাকা গরীবুল্লা পাইয়াছিল তাহাও টিকিল না। একদিন রাত্রে সে টাকা চুরী হইয়া গেল। যখন পুলিসের পিছনে টাকার শ্রাদ্ধ করিয়াও সে টাকার কোনও রকম কিনারা হইল না, তখন গরীবুল্লা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তখন আর তার সন্দেহ রহিল না যে যুধিষ্ঠিরের ক্ষেত না পাওয়া এবং টাকা চুরী যাওয়া উভয়ই খোদাতা'লার ন্যায় বিচারে তারই গুণা'র শাস্তি।

তার গুণাহগারীর ব্যাপারের একমাত্র লাভ এই যে পরী বড়লোক—এবং কাসিমের টাকা কড়ির সেই একমাত্র ওয়ারিশ। কাসিমের বয়স হইয়াছে, এবং খোদাতালার মরজী হইলে সে শীঘ্রই ফৌত হইবে। তাহা হইলে পরী অনেক টাকার মালিক হইয়া গরীবুল্লার হাতের মুঠার ভিতর আসিবে।

কিন্তু এ আশায়ও যেন ছাই পড়িবার মত হইয়াছে। বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল কাসিম বেপারীর মারবার কোনও গা দেখা যায় না। বরং যেন যুবতী স্ত্রী ঘরে আনিয়া তাহার দেহে চিক্‌নাই ধরিল, বয়সে যেন উজান বহিল। পরীর পর পর দুটি ছেলেও জন্মিয়া গেল।

এই সব ব্যাপার দেখিয়া গরীবুল্লার মন ভাঙ্গিয়া পড়িল। এদিকে পাটের বাজারের অনিশ্চিত অবস্থার জন্য প্রতি বৎসরই গরীবুল্লার লোকসান হইতে লাগিল। এ সব উৎপাত সহ্য করিতে না পারিয়া পরীর বিবাহের তিন বৎসর পর গরীবুল্লা মরিয়া বাঁচিল।

ইহার পর গ্রামে হঠাৎ একটা ধর্ম্ম-বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হইল। পিয়ারপুরের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে একদিন খুব হৈ চৈ করিয়া একটা ওয়াজের মজলিস হইল—ঢাকা কি কলিকাতা হইতে এক মৌলবী আসিয়া সেখানে মুসলমানদের ধর্ম্মোপদেশ দিলেন।

পিয়ারপুরের অনেক লোক সেই মজলিসে গিয়াছিল। মৌলবী সাহেবের বাগ্মীতা আছে, তিনি এই শ্রেণীর চাষীদের মনস্তত্ত্ব খুব ভাল রকমই জানেন। কাজেই তিনি যে ওয়াজ করিলেন তাহা সকলের অন্তরে গিয়া পৌঁছিল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন যে এ দেশের মুসলমানেরা নামে মুসলমান হইয়াও কাফের হইয়া রহিয়াছে। কাফের যে কত বড় অশ্রদ্ধেয় জীব এবং পরলোকে তার যে কি ভীষণ দুর্দ্দশা তাহা তিনি কোরাণের বাছা বাছা বচন উদ্ধার করিয়া শুনাইলেন। তিনি বলিলেন, কাফের বলিতে শুধু বিধর্ম্মী পৌত্তলিক-দের বুঝায় না, নামে মুসলমান হইয়াও যে ইসলামের শরিয়ৎ অনুসরণ করে না সেই কাফের। অথচ বলিতে গেলে এ অঞ্চলের শতকরা নব্বই জন তথাকথিত মুসলমান শরিয়ৎকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া চলে। ইসলাম ধর্ম্মের চারটি প্রধান কার্য্য—তার অপরিহার্য্য অঙ্গ—নমাজ, রোজা, জাকাত ও হজ। নমাজ মানে দিবসে পাঁচবার ঈশ্বরের আরাধনা, রোজা মানে রমজানের উপবাস, জাকাত মানে ধর্ম্মার্থে দান ও হজ মানে মক্কাশরীফ তীর্থ যাত্রা। শক্তি থাকিতে যে ইহা করে না সে মুসলমান নয়, কাফের। অথচ তিনি দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন যে এ অঞ্চলের খুব কম মুসলমানই নমাজ করে বা রোজা রাখে। এমন কি ঈদের নমাজের সময়ও সকল লোককে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জাকাত শরিয়ৎ অনুসারে করা অনেকেরই কঠিন, কিন্তু তবু সাধ্যমত সবাই কিছু করিতে পারে। হজ করা ব্যয় সাপেক্ষ, অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়, কাজেই সে সম্বন্ধে তিনি কিছু বলিলেন না।

যাহারা ওয়াজ শুনিতে গিয়াছিল তাহারা ফিরিয়া আসিয়া এই মৌলবী সাহেবের বার্ত্তা প্রচার করিল। একদিন সাহেবুল্লার উঠানে এক বৈঠক করিয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা হইল। কয়েকজন উৎসাহী লোকের কথায় সকলেই স্থির করিল যে পিয়ারপুরে যে একটা জুম্মা-ঘর নাই এবং কোনও বিশিষ্ট গাঁয়ে একখানা কোরাণ শরীফও এখানে পাওয়া গেল না ইহা বড়ই লজ্জার কথা। অতএব অবিলম্বে একটা "জুম্মা-ঘর" তৈয়ার করা আবশ্যক—সে জন্য "হারি" অর্থাৎ চাঁদা তোলা হউক। চাঁদার হার পর্য্যন্ত ঠিক হইয়া গেল।

কিছুদিন পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে আর উচ্চবাচ্য হইল না। তার একটা গুপ্ত কারণ এই যে যেসব মাতব্বর সর্ব্বাগ্রে ঘাড নাড়িয়া বলিয়াছিল যে এসব অত্যন্ত লজ্জার কথা, তাহারা বৃদ্ধ হইলেও নমাজ তাহাদের জানা ছিল না। নমাজে কি কি ঠিক করিতে হয় তাহা না জানায়, জুম্মার নমাজে হাজির হইলে অর্ব্বাচীনদের কাছে লজ্জা পাইবে এই আশঙ্কায় তাহারা চাপিয়া গেল। তারপর খবর আসিল যে আসে-পাশে আর তিনটি গ্রাম, যাদের সঙ্গে পিয়ারপুর সব বিষয়েই বরাবর পাল্লা দিয়া আসিয়াছে সেখানে জুম্মা-ঘর প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। তখন গ্রামে আবার চঞ্চলতা দেখা দিল, এবং ঝটপট কিছু চাঁদাও আদায় হইয়া গেল। কিন্তু জুম্মা-ঘর উঠিল না।

ইহার পর এক ফকীর সাহেব সে অঞ্চলে আসিলেন। তিনি কেবল জ্বালাময়ী বক্তৃতা করিয়া ছাড়িলেন না, বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া গৃহস্থদের জাকাতের পুণ্যার্জ্জনের অবসর দিলেন। তিনি অনেক দিন এ অঞ্চলে বাস করিলেন, অনেক লোক দিনের পর দিন তাঁর কদমবেল্লা (পদ চুম্বন) করিতে যাইতে লাগিল।

ফকীর সাহেব উপদেশ দিলেন—মুসলমান হইতে হইলে শুধু শরিয়ৎ মতে নমাজ রোজা জাকাত ও হজ করিলেই চলিবে না। ইহা কেবল নিম্নাধিকারীর পক্ষে। শরিয়ৎ মতে কর্ম্ম করিয়া ক্রমে মারফৎ ও হকিকৎ মতে ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ করিলে ক্রমে ইসলামের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা লাভ করা যাইবে। কাজেই ইসলামের প্রকৃত সাধন করিতে হইলে ফকীর হইয়া মারফৎ মতে সাধনা করিতে হইবে।

দীর্ঘ শ্মশ্রু বৃদ্ধের দল প্রাজ্ঞের মত কেবল দাড়ি নাড়িয়া তাঁর প্রত্যেক কথা সমর্থন করিয়া বাড়ী ফিরিল; ফিরিল

না কেবল যুবক ইনু সেখ। ইনু দরিদ্র চাষী, কিন্তু একটু খামখেয়ালী। একুশ বৎসর তার বয়স হইয়াছে, তবু সে বিবাহ করে নাই। তার মত আদ্যোপান্ত সৎ লোক গ্রামে দ্বিতীয় নাই। সঙ্গীতে তার বেশ অধিকার ও রুচি আছে। সে হাসান হোসেনের করুণ কাহিনীর জারী গান গাহিয়া অনেক দিন অনেকের চক্ষে জল বাহির করিয়াছে। তেমনি রামপ্রসাদী মালসীর গানেও সে লোককে মাতাইয়াছে।

ইনু যেদিন মৌলবী সাহেবের ওয়াজ শুনিল সেই দিনই সে স্থির করিল সে সত্য মুসলমান হইবে। নমাজ তাহার ঠিক জানা ছিল না, চেষ্টা করিয়া সে তাহা শিখিয়া পাঁচ বেলা নিয়মিত নমাজ পড়িতে লাগিল। আর জুম্মাঘর প্রতিষ্ঠার জন্য সে লোকের দ্বারে দ্বারে হত্যা দিতে লাগিল। তবে সে একে ছেলে মানুষ তায় সবাই পাগল বলিয়া তাকে জানে, কাজেই তার কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না।

ইনুর ধর্ম্মজীবন লাভের পক্ষে একটা গুরুতর অন্তরায় ছিল এই যে সে লেখাপড়া কিছুই জানে না। অথচ কোরাণ-শরীফ পাঠ করিতে না পারিলে তার মনে হইয়াছিল সকলই বিফল। সেই জন্য সে তার জমী জমা ভাইকে বর্গাপত্তন করিয়া দূরবর্ত্তী এক গ্রামের মক্তবে গিয়া আলিফ্-বে পড়িতে লাগিল। পাঠে বিশেষ অগ্রসর হইতে না পারিয়া সে হতাশ হইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিল। এখানে আসিয়া ফকীর সাহেবের উপদেশে সে অকূলে কূল পাইল। ক্রমে সে ফকীর সাহেবের নিকট দীক্ষা লইয়া ফকীর হইয়া বসিল।

ইহার পর আর ইনুকে অবহেলা করিবার উপায় রহিল না। ইনু তার জমীর একখণ্ড জুম্মাঘরের জন্য দান করিল, অবশিষ্ট সে তার ভাইকে দিল। তারপর সে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করে, আর ধর্ম্মের নামে সমস্ত গ্রামবাসীকে শাসন করিয়া বেড়ায়।

ইনুর চেষ্টায় চট করিয়া জুম্মাঘর উঠিয়া পড়িল। ইনুর উৎপীড়নে সকলে সেখানে জুম্মার নমাজে জমায়েৎ হইতে লাগিল, এমন কি তাহারা বাড়ীতেও রোজ নমাজ পড়িতে লাগিল, না হইলে ইনু আসিয়া তাহাদের লজ্জা দেয়।

দুই একজন তেড়িয়া মেজাজের বৃদ্ধ ইনুকে আমল দিতে চায় নাই। এই ডেঁপো ছোকরার জেঠামি তাহাদের অসহ্য হইয়াছিল, তাই তাহারা জুম্মার নমাজে হাজির হইতে এবং বাড়ীতে নমাজ পড়িতে ঝাড়িয়া অস্বীকার করিল। ইনু তাহাদের সঙ্গে তর্ক করিতে গেলে তারা তাকে গালাগালি দিয়া বিদায় করিল।

ইনুর ফকীরি গৌরব ইহাতে বড় ক্ষুণ্ণ হইল। তাই সে পরের দিন জুম্মার নমাজের সময় সমবেত মুসলমানদের কাছে প্রস্তাব করিল যে এই কয়জন বিদ্রোহীকে এক-ঘরে' করা হউক।

উপস্থিত মজলিস হইতে যখন অপরাধীদের ডাকিয়া পাঠান হইল তখন তাহারা জবাব দিল যে জীবনে কোনও দিন তারা নমাজ পড়ে নাই, নমাজ পড়িতে তারা জানি না। ইনু বলিল, নমাজ না জানিলে কোনও ক্ষতি নাই, জুম্মার নমাজে সবার সঙ্গে দাঁড়াইয়া তাহাদের অনুকরণে কেবল "আল্লা আল্লা" বলিয়া ওঠা-বসা করিলেই চলিতে পারে। তখন তাহারা হাসিয়া বলিল, ইহা তাহাদের কাছে নিতান্ত নিরর্থক হাস্যকর ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। ফলে তাহারা নমাজে আসিতে অস্বীকার করিল।

যদিও সে দিনকার মজলিসে তাহাদিগকে একঘরে' করা হইল না, তবু ক্রমে তাদের এক ঘরে করা ছাড়া আর উপায় রহিল না।

এই দিন যে কাণ্ডটা হইল ইহার ফল হইল প্রকাণ্ড। এই সূত্রে পিয়ারপুরের মুসলমান সমাজ সমবেত শক্তির প্রথম আস্বাদ পাইল। সে শক্তি আজ তাহারা ইনুর প্ররোচনায় ধর্ম্মের জন্য নিযুক্ত করিল সত্য, কিন্তু শক্তির আস্বাদ একবার পাইয়া ক্রমে এই সমবেত শক্তি তাহারা অন্য প্রয়োজনেও নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করিল।

একদিন এই শক্তি ভাঙ্গিয়া পড়িল কাসিম বেপারীর মাথায়। ইনুর স্পর্দ্ধার অন্ত ছিল না। সে একদিন স্বয়ং কাসিম বেপারীর বাড়ী গিয়া তাহাকে বলিল, "বেপারী সাহেব আপনি গাঁয়ের মাথা, আপনাকে দেখে সবাই শিখবে। আপনি যদি নমাজ না পড়েন, রোজা না রাখেন তবে গাঁয়ের লোক তো মানতে চায় না।"

কাসিম বেপারী প্রথমে একটু আমতা আমতা করিয়া নানারূপ ওজর উপস্থিত করিল। ধর্ম্মের আবেদন বস্তুটা আমাদের দেশবাসীকে এত কাবু করিয়া দেয় যে ধর্ম্মের নামে কেহ কোনও কথা কহিলে, অতিবড় দুর্দ্দান্ত যে সেও চট্ করিয়া সোজাসুজি ধর্ম্মকে আক্রমণ করিতে সাহসী হয় না, কেবল পাশ কাটাইয়া যাইতে চায়। আমি ধর্ম্ম মানি না একথা বলিতে সাহস হয় না, আর কাহারও চেয়ে ধর্ম্মে আমি খাটো এ কথাও কেউ স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করে। তাই স্বয়ং কাসিম বেপারীও নানা রকম ওজর করিয়া ইনুকে পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পাশ কাটাইয়া ইনুর হাত এড়াইবে এমন লোক ইনু নয়। তার জ্ঞান বুদ্ধি অতি অল্প, কিন্তু সেই অল্প টুকুকে সে সকল শক্তি দিয়া বিশ্বাস ও অনুশীলন করিত, আর যেটা করিবে বলিয়া স্থির করিত জোঁকের মত সে তাহার পিছনে লাগিয়া থাকিত। কাজেই কাসিম বেপারী এমনি পরোক্ষ আঘাতে তার আক্রমণ ব্যর্থ করিতে পারিল না। ইনু প্রতি জুম্মাবারে তার কাছে গিয়া হত্যা দিয়া প্রচণ্ড একাগ্রতার সহিত তার সঙ্গে তর্ক করিতে থাকে। শেষে কাসিমের অসহ্য হইল। সে ইনুকে স্পষ্ট বলিল. সে ধর্ম্ম-টর্ম্ম মানে না, নমাজের কোনও সার্থকতা অনুভব করে না—এবং ইহাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিল যে ইনু ও তার আল্লাহতালা গোল্লায় গেলে তার কোনও আপত্তি নাই।

—ক্রমশ

জীবন মাধবী

শ্রী সুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

জীবন মাধবী তুমি,—
বসন্তবিধুর প্রাণে, কামনার তীব্রসুরা ঢালি,'
অম্বরের স্নিগ্ধ ছায়ে বল্লরী-পল্লব ল'য়ে
উঠিলে জাগিয়া!
ধরণীর কুঞ্জে কুঞ্জে মঞ্জরীর বিপুল-উচ্ছ্বাস,—
প্রাণে মোর বারম্বার তুলিলে হিল্লোলি'!

শ্যামল পল্লবে যবে সমীরের মৃদু শিহরণ,
তব নব তনুটিরে তুলে চঞ্চলিয়া,
ভাবি মনে,
লজ্জানম্রা বধূটির মতো সংগোপনে
মোর স্বপ্নসৌধ 'পরে আরক্ত-চরণে
—মোহমূর্ত্ত চিত্র যেন,—
উঠিছ ফুটিয়া।
মুগ্ধ মরীচিকা যেন মায়াবীর মন্ত্রস্পর্শ লভি'
প্রেমের কল্লোলে মাতি'
জীবনের অনুরাগে উঠিছে উচ্ছ্বসি।

তব গান, তব রূপ, তব মধুবাণী,
সুপ্তিমাঝে এনেছে যে বিস্মৃত চেতনা,

তাহারে সম্মুখে রাখি' জীবনের যাত্রাপথে
শান্ত মুখে হ'ব অগ্রসর,
পথের কণ্টক-ধূলি
যাব ভুলি',—
দিবসের কর্ম্মক্লান্ত সুপ্তি-অবসরে,—
মগ্ন হ'য়ে রব তব সুরহারা নিঃশব্দ সঙ্গীতে
নিশীথের আনন্দ-বাসরে।

তার পরে যাত্রা হবে সুরু,—
তোমার মধুর স্মৃতি সন্ধ্যার শঙ্খের সাথে
আনিবে বহিয়া যবে শান্তির উদ্দেশ,—
সুনীল অম্বর-তল-নিলীন প্রশান্তি যবে
বেদনার হোমানলে হবে উচ্ছ্বসিত,
জানি মোর পথ-পার্শ্বে, বিরহ-গুঞ্জন-রোল,
যাত্রার আনন্দ-গানে উঠিবে চঞ্চলি'
—মিশাইবে সিন্ধুকলোচ্ছ্বাসে,
জীবনের সর্ব্ব দুঃখ, দৈন্য, ক্ষোভ, তাপ।
অন্তরের তীব্র অভিশাপ
টুটে যাবে নবারুণ রক্ত-রশ্মিপাতে।

তবে—মোর সর্ব্ব তৃপ্তি খুঁজে পাবে ভাষা,
অন্তরের গভীর নিরাশা
লুপ্ত হবে কামনার বহ্নি-বজ্রানলে।

জীবন মাধবী তুমি, উঠিবে মুঞ্জরি'
রাত্রির উৎসবে যবে,—
তারাহারা নীলাকাশ স্তব্ধ হ'য়ে রবে।
তার মাঝে পশি' তব স্বর
ক্রন্দনের উচ্চ কলরোলে,—
মন্দ্রিয়া তুলিবে বিশ্ব সুগম্ভীর উদাত্ত সঙ্গীতে।
আমার পরাণে,
শান্ত হবে কামনার অগ্নিদীপ্ত শিখা।
প্রেমের প্রদীপ জ্বলি'
দগ্ধ হবে বাসনার তীব্র মোহানল।

তোমার পরশ লভি'
নিভে যাবে সুতীব্র পিপাসা—
দীপ্ত হবে গরিমার মহীয়সী তেজে,—
অন্তর আমার,
—রুদ্র বাসনার।

বনান্তের শেফালিকা,—কেতকী করবী
মঞ্জুল-গন্ধের ভারে ফিরিবে পবনে—
অন্তর-মন্দির মন করিবে বিহ্বল।
নিখিলের বন্দনার গানে—
বেদনার মহাদান—হবে সম্পূরিত।
অন্ধকারে ঘেরা এই দীর্ঘ যাত্রা-পথ
বিদ্যুৎ-বহ্নির বাণে সচকিত হবে।
মুকুল-মল্লিকা গন্ধে বনভূমি হবে সুরভিত,
রোমাঞ্চিত অন্তর আমার,
উঠিবে উচ্ছলি'।
ছন্দোময়ী ধরিত্রীর শ্যামল অঞ্চল
ঘন ঘন হবে আন্দোলিত।
মুক্ত বনবিহঙ্গের কাকলী-কল্লোলে,
আলোক-বীণার গান ধ্বনিবে অম্বরে।

স্বপ্নের মাধবী তুমি, উঠিয়াছ সিন্ধুর মন্থনে,
শুভ্রভালে নাহি অঙ্ক লেখা,
তোমার পল্লবে আজি উঠে বাজি জীবনের গান;
কাঁপে আলো কুসুমে তোমার,
স্নেহ প্রেম জাগে অনিবার।
মোর বাসনায় তুমি ফিরেছ চাহিয়া—
মহাবাণী এনেছ বহিয়া
নব-সাজে সাজি,—
জীবন লতিকা হেরি
মুঞ্জরিল আজি,
জগৎ-অরণ্যমাঝে নীলাকাশ-তলে,
শান্ত স্নিগ্ধ প্রেমবারি লভি'।

হুকুমের কিস্মৎ

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১

আমাদের প্রোফেসারটি ছিলেন একটি ছোট্ট খাট্টো মানুষ। লম্বে ফুট চারেকের এক-ইঞ্চি বড় নয় বোধ হয়, আর কলেবরে অবিকল ঠিকে-গাড়ীর ঘোড়াটি। গলার আওয়াজটা ছিল কিন্তু কাঁসরের মত জোর; আর তার চেয়ে বড় ছিল নাকি তাঁর বিদ্যার বহরখান্!

পড়াতেন ইতিহাস; কিন্তু পণ্ডিত মশাইএর অসুখের দিনে সংস্কৃত কাব্য পড়ানর কি কায়দা! মনে হলো যেন, ওটা ত রোজ পড়ালেই পারেন!

আরো আশ্চর্য্য হলুম সেইদিন, যেদিন গণিতের অধ্যাপক যার অসুখের খবর পেয়ে বাড়ি চ'লে গেলে—তিনি এসে ক্লাশে ঢুকলেন খড়ির পেন্সিল আর বোর্ড-মোছা ঝাড়ন হাতে ক'রে। গণিতেও তিনি পাক্কা!

এ ছাড়া, নাকি ওপর ক্লাশে তিনি ইংরিজি আর দর্শনও পড়াতেন!

কেউ কেউ হিংসে ক'রে ব'লতো তাঁকে "জ্যাক্"; তাই ব'লে, তাঁর পাণ্ডিত্যের ত্রুটি কোন দিনই ধরা পড়েনি।

ইতিহাসেই এম-এ পাশ করেছিলেন; কেননা ইতিহাসটাই তাঁর সব চেয়ে পড়তে বিশ্রী লাগ্‌তো।

একদিন ক্লাশে এসে হেসে-হেসে তার ছোট গল্পটি আমাদের ব'লছিলেন।

ব'ল্লেন, জান, কেন তোমাদের ইতিহাস পড়তে ভাল লাগেনা? একদিন আমারো ঐ বিষয়টার ওপর ছিল ভারি অবহেলা। পরীক্ষায় পাশ নম্বর ত পেলুমই না; অধ্যাপক রাগ ক'রে নীল পেন্সিল দিয়ে একটা প্রকাণ্ড গোল্লা খাতার ওপর এঁকে রেখেছেন।

খাতা ফেরাবার সময় খাতাটা উঁচু ক'রে ধ'রে তিনি সমস্ত ক্লাশকে দেখিয়ে ব'ল্লেন, ব্রীলিয়াণ্ট!

লজ্জায় মাথাটা আমার যেন কাটা গেল।......

তারপর একমাসের মধ্যে ইতিহাসের বই দুখানা একদম কণ্ঠস্থ ক'রে ফেল্লুম।.....

বলা বাহুল্য, পরের পরীক্ষায় প্রফেসারটি মনে ক'রে ব'সলেন যে 'কপি' করেছি; কারণ কমা-সেমিকোলনটিও পর্য্যন্ত ভুল ছিল না।

তিনি রিপোর্ট করে দিলেন।......

ব'লে রজত বাবু অধ্যাপক বই খুলে আমাদের পড়াবার উপক্রম করতেই—আমরা হৈ হৈ ক'রে বল্লুম, তারপর কি হ'ল স্যর, তার পর?......

তিনি হেসে বল্লেন, সে আর একদিন ব'লব—যেদিন তোমাদের ইতিহাসের পড়ায় আর একটুও অবহেলা দেখব না।

আমরা বল্লুম, আজই বলুন, আমরা ইতিহাসে আর একটুও ফাঁকি দেবনা।

তিনি হেসে বল্লেন, ঠিক্ তো? কথার নড়্ চড়্ হবে না?

না, না, না, না, চারিদিক থেকে এক সঙ্গে সবাই বলে উঠলো, না, না, না, না,......

তিনি দুকানে হাত দিয়ে ব'ল্লেন, সাইলেন্স্ সাইলেন্স...

পাশের ঘরে পড়াচ্ছিলেন খোদ প্রিন্‌সিপ্যাল। চক্ষু

শুক্ল বর্ণ ক'রে এসে বল্লেন, এ কি ? তোমরা কলেজে পড়ার অযোগ্য......

এই কথা শুনে আমরা সব একযোগে চ'টে গিয়ে পাথরের মেজের ওপর জুতো ঘষে এমন একটা বিশ্রী শব্দ করতে লাগলুম যে, সেখানে আর তাঁর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হ'ল না।

তিনি রাগ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে—আবার ফিরে এসে হাজিরা-বইটা তুলে নিয়ে বল্লেন, প্রতি ছাত্রের একটাকা ক'রে ফাইন······তারপর রাগ ক'রে বকের মত লম্বা-লম্বা পা ফেলে তিনি যেম্‌নি ক্লাশ থেকে বার হ'য়ে গেলেন—অমনি আবার এক সঙ্গে ক্লাপ .—ছ'শো ছেলের একসঙ্গে হাত্‌তালি যেন বাজপড়ার মত শোনালো।

আমরা যে অন্যায় করছি তা জেনেও কেমন-যেন রাগের ঝোঁকে একটার পর একটা অন্যায় ক'রেই চ'লেছি !

প্রফেসার বুঝিয়ে বল্লেন, তোমরা কাজ ত একটুও ভাল করনি···প্রথম নম্বর আমাকে অবজ্ঞা দেখিয়েছ ·

সবাই মিলে বল্লুম, একটুও না স্যর, একটুও না, আপনাকে আমরা ভালবাসি, যা ক'রেছি আবদার ক'রে......

তিনি বল্লেন, তা আমি বুঝি, তাই সবই অগ্রাহ্য করি, ...

আমরা বল্লুম, যদি কোন দোষ ক'রে থাকি—আপনার কাছে একশো বার মাপ চাইছি !...কিন্তু······

প্রফেসার বল্লেন, না, না, দেরি ক'রনা, ওঁর কাছেও মার্জ্জনা চাও তো, গিয়ে......

টিফিনের ঘণ্টা বেজে গেল।

২

টিফিনের আধ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের মস্ত মিটিং হ'য়ে গেল।

এক বাক্যে সবাই ব'ল্লে, এক পয়সাও ফাইন্‌ দেব'না, তাতে যদি কলেজ ছাড়তে হয়, সোভি আচ্ছা !

জন পাঁচেক বৃত্তি-ধারী ছিল, তাদের মুখ ফেক্‌সা হ'য়ে গেছলো, কিন্তু আমাদের মুখগুলো রাগে টক্‌টকে লাল।

টিফিনের ঘণ্টাতেই নোটিশ-বোর্ডে দপ্তরি প্রিন্‌সিপ্যালের কড়া হুকুমটা ল'ট্‌কে দিয়ে গেল। ক্লাশে যেতে না যেতে অর্ডার-বই এসে উপস্থিত !

কাল কলেজ বসার আগে ফাইন্‌ তামিল না ক'রলে ক্লাশে ঢুক্‌তে দেওয়া হবে না একটি ছাত্রকেও ইত্যাদি।

ছুটির পর আবার মিটিং।

এবারে বৃত্তি-ধারীদের মধ্যে মোহিত কথা কইলে, সে ব'ল্লে, ভাই, আমাদের কথা কি তোমরা ভেবে দেখেছ ?

কি ভেবে দেখ্‌তে হবে ? ক্লাশের অপমানে কি তোমাদের অপমান হয় না, কি এমন দেবতা তোমরা ?

. . ভাল মানুষের ডিম্‌ ?

হরেন ব'ল্লে, এই ক'রেই তো দেশটা গেল, একটা এত বড় ব্যাপারেও তোমাদের জ্ঞান হয় না ? দু' দিন অপেক্ষা ক'রে দেখই না কেন বাবা, যে ব্যাপারটা কত দূরে গিয়ে দাঁড়ায়। কলেজের ছ'শো ছেলেকে তাড়িয়ে দিলে তার পর দিন, কলেজ অচল হ'য়ে যাবে।······

সবাই সমস্বরে বল্লে, ঠিক কথা, ঠিক্ বলেছে হরেন. থ্রি চীয়ার্স ফর হরেন, হিপ্‌ হিপ হুররা, হিপ্‌ হিপ্‌ হুররা; হিপ্‌ হিপ হুর্‌রা......

বৃত্তি-ধারীর দল ধীরে ধীরে স'রে প'ড়লো।

আমরা বুঝতেই পারলুম যে তাদের মতলবটা কি।

হরীশ ব'ল্লে, এক কাজ কর; আরো দু'জন ওদের সঙ্গে মেশো গিয়ে, নইলে ওদের চাল কিছুই ধরতে পারা যাবে না।

সবাই বল্লে, ঠিক্ ঠিক্, দুজন, একটু চালাক গোছের

—ধরা না পড়ে,—বুঝেচিস্ কিনা?......চালটা ফেসে না যায়!

কে কে যাবে? কে কে? বিধু, হাঁ বিধু পারবে। আর? তারক। না, না, ও বড়·····, না, না, ও না।

তারক ভাল মানুষ? বাবা, খুব লোক চেনতো, ওটি একটি ভিজে বেরাল, যাকে বলে ঐ-গিয়ে ওয়েট্ ক্যাট্!

বিধু, তুমি পারবে?

ও, ইয়েস্!

তারক? কোথায় তারক?

তারক কথা কয় না।

তারক? তারক? কি বলেবে তারক?

একজন ব'লে উঠলো, তারক গণ্ট গো ট্ নরব।

তবে?

হরীশ যাক্, হরীশ চমৎকার পারবে।

হরীশ বল্লে, আমি রাজি আছি, কিন্তু গাঁট নিজের ট্যাক্ থেকে ফাইন দেব না।

বেশ, বিধু আর হরীশের টাকা চাদা তুলে দ'ও।

তখনি দু' টাকা উঠে গেল।

বিধু আর হরীশ বেরিয়ে পড়ল। মোহিতের দলের খোঁজে।

হরীশ ব'ল্লে, দেখ্, ওরা এতক্ষণে প্রিন্সিপ্যালের বাড়ি গিয়েছে, চল্ ঐ দিকেই যাই···

চল্ চল্, পা চালিয়ে চল্—বলে বিধু নিজে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চ'ল্লো।

হরীশ ব'ল্লে, ওরে বিধু, আগে ঠিক ক'রে নে, কি ওদের বলা যাবে, নইলে গোল করবি তুই......

কি ব'লবি? বিধু ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে।

কেন? সোজা কথা, এ-সব গোলমালের মধ্যে আমরা নেই।

বিধু ব'ল্লে, বেশ, আর কথাটাও ত' নেহাৎ মিছে নয়? বলিস্ কি বিধু? তোর একটু সেল্ফ্ রেসপেক্ট্ নেই? হ'ত যদি বিলেত তো দেখ্‌তিস্ মজা, আজ বেঞ্চ-টেবিলের বন্-ফায়ার ক'রে ছেলেরা কলেজ ছারখার ক'রে ঠাণ্ডা ক'রে দিত ঐ বাছাধনকে।

তাই নাকি ভাই! বিস্ময়ে বিধু দু' চোখ বড় ক'রে বল্লে, বাপ্ রে, সে দেশটা কি রে? একদম···

কি বলিস্? হরিশ ব'ল্লে, আলাদা? একটুও না নয়, সেখেনে ছেলেরা নিজেদের মান রেখে, দাবী রেখে চল্‌তে জানে। আমরা তো আর কচি খোকা নই··· এখন তো জেণ্টল্-ম্যান্ রে!··

হঠাৎ হরীশ ব'ল্লে, আরে ঐ দেখ্, ওরা যে ফিরচে,—ঐ, দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ নে?

তাই তো।

কি ভাই মোহিত, এত শিগ্‌গির ফিরলে যে?

দেখা হ'ল না।

দেখা হ'ল না?···ব্যাপার কি? বাড়ি নেই? হরীশ জিজ্ঞাসা করলে।

বাড়ি আছেন···ব'লে পাঠালেন, দেখা হবে না; ফাইন নিয়ে কাল যেন কলেজ বসার আধ ঘণ্টা আগে আসি।

কি ক'রবে এখন? বিধু জিজ্ঞাসা ক'রলে।

যো হুকুম, উপায় কি?

হরীশ ব'ল্লে, তাত' বটেই, চল্ বিধু, আমরাও দেখা দিয়ে আসিগে, কি হয় দেখাই যাক্ না।

বিধু ব'ল্লে, চল্, কিন্তু মিছে যাওয়া, আচ্ছা, তবুও চল্।

৩

প্রিন্সিপ্যাল্ ডি, এম্, ভালে বাঙ্গালী কি বেহারী, কি মারাঠী, কি মান্দ্রাজী, কি পাঞ্জাবী তা ঠিক বোঝবার

কোন উপায় ছিল না। কলেজে আসতেন তিনি একদম সাহেবী পোষাকে আর মেজাজে, কিন্তু বাড়িতে কোনদিন করতেন বাঙ্গালীর পোষাক, কোনদিন আবার বেহারীর।—এমনি ক'রে বহু দেশের বহুরূপ, আর ভাষায় তাঁর অসম্ভব দখল ছিল।

অন্য ভাষার কথা ঠিক জানিনে, কিন্তু বাংলা যে তিনি একদম চোস্ত আর নির্ভুল বলতেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বিধু আর হরীশ যখন তাঁর বাড়ি গিয়ে পৌছল' তখন তিনি মৌলবী সাহেবের পোষাক প'রে বাগানে দাঁড়িয়ে ছাকা উর্দ্দুতে মালির সঙ্গে কথা কইছিলেন।

তাদের দেখে ব'ল্লেন, কিহে তোমাদের মিটিং ভাঙ্গলো? রেজোলিউশন হ'ল? তারপর একটু হেসে বল্লেন, কলেজের প্রিন্‌সিপ্যালের চাকরিটা থাকবে তো এই বাজারে?

বিধু আর হরীশ দু'জনেই লজ্জায় মাথা হেট ক'রে রইলো।

ভালে মৃদু হেসে বল্লেন, লজ্জা কিহে? তোমাদের আত্ম-সম্মানের জন্যে, ছাত্রবর্গের অধিকারের জন্যে, তোমরা যা ক'রবে তাতে আমার সম্পূর্ণ অনুমোদনও আছে, সহানুভূতিও আছে। আমার দিক থেকে আমি লড়বো, তোমাদের দিকে তোমরা লড়বে। আমিও দেখবো, আমি কোন অন্যায়, কি নোংরা উপায় অবলম্বন না করি, তোমরাও তেমনি দেখবে,—যদি তোমাদের ব্যবহারে কোন হীনতার পরিচয় প্রকাশ পায়, আমি তোমাদের শাস্তি দেবো—আর আমার ব্যবহারে যদি কোন দোষ ত্রুটি ঘটে—তার বিচারের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ ত' আছেনই। . মনেচ হে, স্বাধীনতার লড়াই, এ সম্বন্ধে না অটুট রাখতে পারলে সব ব্যর্থ হয়।

কোন কথা না ব'লে বিধু আর হরীশ দাঁড়িয়ে রইল।

ভালে আবার বল্লেন, দেখ, তোমাদের মেজেতে পা ঘ'ষে আমাকে যে অপমান করার চেষ্টা, ওটাকে আমি তোমাদের অপরাধ বলে মনে করেছি, তার বিচার কাল সকালে কলেজ বসার আধ ঘণ্টা আগে হবে—সেই সময় তোমরা উপস্থিত হ'য়ে তোমাদের যদি কিছু বলার থাকে ব'লবে। তার আগে আমি কিছু শুনতেও চাইনে—আর কিছু করতেও চাইনে।

বিধু আর হরীশ ধীরে ধীরে ফিরে গেল।

পথে তাদের রজত বাবুর সঙ্গে দেখা।

হরীশ জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় চ'লেছেন, স্যর?

জোরে হাঁটার জন্য স্যর একটু বেদম ছিলেন, তাই দম নিয়ে বল্লেন, মিষ্টার ভালে ডেকে পাঠিয়েছেন।

তোমরা বুঝি সেখেন থেকেই আসছ?

হ্যাঁ, স্যর।

বেশ।

হরীশ আর বিধু এগিয়ে গিয়েছিল হঠাৎ হরীশের একটা কথা মনে পড়াতে সে খানিকটা ছুটে এসে বল্লে, স্যর, কাল সকালে আপনার বাড়ি আসবো।

বেশ, ইচ্ছা হয় এসো।

পথে চলতে চলতে বিধু জিজ্ঞাসা করলে, কাল কি ক'রতে যাবিরে?

হরীশ ব'ল্লে, ওঁর সঙ্গে কি কথা-বার্ত্তা হয় সেটাও ত আমাদের জানা দরকার। তুই যাবিনে?

বিধু ব'ল্লে, তুই যদি বলিস্ তো আস্‌বো, কিন্তু ভাই আমার মাথায় কিছুই প্ল্যান আসচে না, উঃ, তোর মাথাটা কি সাফ. মাইরি ভাই।

হরীশ গর্ব্বিত পদভরে পৃথিবীকে প্রায় কাঁপিয়ে চলতে লাগলো।

৪

রজত বাবু জানতেন যে মিষ্টার ভালে নিজের বাড়িতে তাঁর প্রতি কোন রকম অসম্মানের ব্যবহার করবেন না,

তবুও কেমন একটা অস্বস্তিতে তাঁকে অধীর ক'রে তুল্‌ছিল।

তখন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে, পড়ার ঘরে একটা উজ্জ্বল আলো জ্বেলে ভালে একখানা মোটা গোছের কেতাব প'ড়ছিলেন। পরণে তখনো সেই মৌলবি সাহেবের পোষাক।

ভালে রজত বাবুকে সাদরে বসিয়ে বল্লেন, আপনাকে কষ্ট দিলুম, ক্ষমা করবেন।···মনে করেছিলুম আমিই যাবো আপনার কাছে; কিন্তু বাড়ি এসে শুনি ঘোড়াটার অসুখ।

রজত বাবু বল্লেন, তাতে কি? লাভে হ'তে একটু বেড়ান হ'য়ে গেল আমার···

ভালে অবিশ্বাসের হাসি হেসে বল্লেন, বেড়ানটা নিজের ইচ্ছামতই ভাল লাগতে পারে, অন্যের ইচ্ছায় দায়ে পড়ে, মোটেই প্রীতিকর নয়।

রজত বাবুও হাস্‌তে লাগলেন।

ভালে বল্লেন, রজত বাবু, আজকের ব্যাপারটা আমি ভাল ক'রে বুঝে উঠতে পারিনি। আমি যে ছেলেদের কোন রকম শাস্তি দেব, তাতো কল্পনাতেও জানতুম না, ভারি আশ্চর্য্য! মানুষ এক ক'রতে যায়, আর এক হয়ে যায়...হঠাৎ আমার রাগ হয়ে গেল···আমি ছেলেদের ফাইন ক'রে বসলুম···কাজটা মনে হচ্ছে ভাল হয় নি... কাল মনে করছি ফাইনের অর্ডারটা সকালেই তুলে নেব; কিন্তু শুনেছি ছেলেরা মিটিং ক'রে কি একটা রেজোল্যুশন ক'রেছে; সেটাই বা কি জান্‌তে বড় ইচ্ছা হয়। কি বলেন আপনি?···আপনাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে কোন কাজই করা উচিত নয়।

রজত বাবু যে কি ব'ল্‌বেন তা ভেবেই ঠিক ক'রতে পারলেন না। অবশেষে ব'ল্লেন, ফাইনের অর্ডারটা টপ্‌ ক'রে তুলে নেওয়া কি ঠিক হবে? ছেলেরা দোষ করেছে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তাদের আপনার সামনে, ও-রকম শব্দ করা, কি ক্ল্যাপ দেওয়া মোটেই উচিত হয়নি......

ভালে হেসে বল্লেন, ও সব ধরতে গেলে চলে না, রজত বাবু; বিলেতে,—আমাদের অক্সফোর্ডে থাকার সময় অমন সব ঘটনা নিত্য ঘ'ট্‌তো; প্রোফেসারের সাম্‌নে ছেলেরা মারামারি ক'রে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে চ'লে গেল; প্রোফেসার বই বন্ধ ক'রে নিজের ঘরে গেলেন।... আমেরিকায় এর চেয়ে বেশী! তাদের ক্লাশে ক্লাশে লড়াই একহপ্তা পর্য্যন্ত চলে!—তখন সব কাজ-কর্ম্ম বন্ধ! সাধ্য কি সে লড়াই কেউ থামায়, যতদিনে নিজেদের আপোষ না হয়।

রজত বাবু অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলেন, তাই নাকি?

অনেক কথা-বার্ত্তার পর ভালে বল্লেন, কিন্তু এখানকার কর্ত্তৃপক্ষ এদেশটাকে বিলেত কি আমেরিকা, কি জর্ম্মানি ক'রতে দেবেন না তাই আমাদের কিছু-না-কিছু ষ্টেপ্‌ নিতেই হবে...কাল আপনি কি একটু সকাল সকাল, কলেজ বসার আধঘণ্টা আগে আসতে পারবেন না?

রজত বাবু সম্মতি জানিয়ে বাড়ি ফিরলেন।

পরের দিন সকালে রজত বাবুর বাড়িতে ছাত্রদের জমায়েৎ হ'ল।

রজত বাবু বল্লেন, প্রিন্‌সিপ্যালের এটিচিউড্‌ খুব ভাল ব'লেইতো মনে হয়......

হরেন তাড়াতাড়ি ব'ল্লে, তাতো হবারই কথা স্যর; এখন তিনি বুঝেছেন যে চাল দেখালে কলেজ টেঁকে না......

তার উদ্ধত কথা শুনে রজত বাবু বল্লেন, হরেন, তোমার কথায় ভারি দুঃখ পাচ্ছি......

কেন স্যর?

গুরুজনদের বিরুদ্ধে ওরকম রূঢ় মন্তব্য উচিত নয়।

বিদেশে অনুচিত হ'ল, স্যর? তাঁরা অন্যায় করতে পারেন, আর আমরা সেটা বলতেও পারিনে?

কি অন্যায় তাঁরা করেছেন, শুনি? প্রোফেসার জিজ্ঞাসা করলেন।

হরেন উত্তেজিত হ'য়ে ব'ল্লে, কোন্ অন্যায়টা হয়নি? আমি এক এক ক'রে ব'লে যাচ্ছি, আপনি গুণে দেখুন; এক, আপনার ক্লাশে আসার কি তাঁর অধিকার ছিল?

রজত বাবু বল্লেন, অধ্যক্ষের সে অধিকার সব সময়েই থাকে; তুমি তা জান না।

হরেন ব'লে যেতে লাগ্‌লো, দুই, তিনি কোন তদন্ত না করেই বল্লেন, তোমরা কলেজে পড়ার অযোগ্য। আমরা মনে করি, এইটেই তাঁর সব চেয়ে বড় অপরাধ হয়েছে···এর জন্যে তাঁর হোল্ ক্লাশের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত···

হরেনের কথা শুনে বাকি সকলে যেন শিউরে উঠ্‌লো। হরীশ তার জামার পেছনটা ধ'রে টান্ দিয়ে ব'ল্লে, আঃ কি বল্‌ছিস হরেন?

হরেন কিন্তু তখন একেবারে গরম—সে কারুর কথা গ্রাহ্যই করে না!

রজত বাবু বল্লেন, হরেন, তোমার কথার মধ্যে খুব সূক্ষ্ম যুক্তি আছে; কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে অত চুল-চেরা বিচার চলে না।

হরেন উত্তেজিত হ'য়ে বল্লে, তা' আমি জানি স্যর। ক্ষমতার অপব্যবহার যারা করে তাদের কাছে সুবিচার আশা করা বাতুলতা......

৫

কি বাতুলতা? জিজ্ঞাসা করতে করতে মিষ্টার ভালে সেখানে এসে উপস্থিত।

ছেলেরা এক জোটে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো; কেবল হরেন মাথা নীচু ক'রে যেমন ব'সে ছিল তেম্‌নি বসে রইল; কোন কথার উত্তর পর্য্যন্ত সে দিলে না।

ভালে একখানা চেয়ারে ব'সে রজত বাবুর দিকে চেয়ে বল্লেন, মনে করলুম আপনার রিটার্ণ ভিজিটটা দিয়ে আসি; এখন দেখ্‌চি রথ-দেখা কলা-বেচা দুইই হ'ল।

ভালে সেদিন মান্দ্রাজী ভদ্রলোকের পোষাক করেছিলেন।

রজত বাবু একটু অপ্রস্তুতের হাসি হাস্‌লেন।

ভালে হরেনের দিকে ফিরে বল্লেন, বেশ তো, বল না, তোমার কি বলবার আছে?

হরেন মাথা নীচু ক'রেই রইলো, কিছু বল্লে না।

ভালে একটু হেসে বল্লেন, এইটেই আমি পছন্দ করিনে মানুষের মধ্যে; আমার পেছনে, তোমার জিভে সরস্বতী নৃত্য করছিলেন, আর সামনে এসে একটি কথাও তোমার মুখ থেকে ফোটে না, হরেন?......আমার বিরুদ্ধে কি তোমাদের চার্জ্জ, সেটাও কি জানার সৌভাগ্য আমার ঘটতে পারে না?......দোষ ত্রুটি কোন্ মানুষের নেই? কি বলেন রজত বাবু?

রজত বাবু একটু মুস্কিলে প'ড়েছিলেন, কারণ আলোচনাটা তাঁর সাম্‌নে প্রবল বেগেই চ'লেছিল। তাই তিনি বল্লেন, ওরা হয়তো সব কথা আপনাকে খুলে ব'লতে সাহস ক'রছে না, ওরা যদি না বলে ত' আমি যতটুকু শুনেছি, বলি আপনাকে।

বেশ বলুন, ব'লে মিষ্টার ভালে অবহিত হ'য়ে ব'সলেন।

রজত বাবু বল্লেন, ওদের প্রথম আপত্তি আমার ক্লাশে আপনার আসাটা। কিন্তু আমি বুঝিয়ে দিয়েছি।

ভালে বল্লেন, ওখানে আমার একটু ত্রুটি হ'য়েছিল, তার জন্যে আমারই আপনার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত......

রজত বাবু বাধা দিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন, ওকি কথা আপনি বলেন? আপনার......

ভালে হেসে বল্লেন, হাঁ হয়েছিল, রজত বাবু, হয়েছিল, আপনাকে একটা স্লিপ্ দিয়ে তবে আমার আসা উচিত ছিল; কিন্তু আমি সাময়িক উত্তেজনায় তা' একদম ভুলে গেলুম......জানি, আপনি কিছু মনে করেন নি, তবুও যা উচিত তা আমাকে স্বীকার করতেই হবে......

দ্বিতীয় চার্জ্জটা কি?

হরেন? রজত বাবু ডাক্‌লেন।

হরেন নিরুত্তর।

বল হরেন নির্ভয়ে বল, এটাতো রজত বাবুর বাড়ি, আমি এখন তোমাদেব একজন বন্ধু ব'লেই ধরে নেও না কেন?

তবুও তার মুখ দিয়ে কথা বার হ'ল না।

ভালে বল্লেন, লজ্জার কথা!—তাবপর বজত বাবুর দিকে ফিরে বল্লেন,—আপনিই বলুন?

আপনি একটা সাধাবণ মন্তব্য চালিয়েছিলেন—সব ছেলের উপর, তারা কলেজে পড়ার অযোগ্য......

ভালে বল্লেন, এব জন্যে আমি বিছুমাত্র দুঃখিত কি ক্ষুব্ধ নই। ছেলেবা কি তাদের পবেব ব্যবহাবে প্রমাণ করচে না যে এটাই তাদের একান্ত প্রাপ্য?

... হট্টগোল করে অন্যের কাজেব ক্ষতি এবং বিঘ্ন করাটা কি শিক্ষাব পবিচয়, না কিসেব পরিচয়?

হরেন মাটিব দিকে চেয়ে ব'ল্লে, আপনাব তদন্ত করা উচিত ছিল সব আগে .....

কিসের তদন্ত?

কেন গোল হয়।

ভালে হাস্‌লেন, না, তোমরা ক্লাশেব মধ্যে কোন কাবণেই গোল করতে পার না।

করলে, হয়তো বেউবা ক্ষমা কবতে পাবেন, কিন্তু সেত' অন্য কথা..... কিন্তু তোমরা গোল ক'রে তোমাদের অধিকারেব বাইরে চ'লে গিয়েছিলে ব'লেই আমি মনে করি .. ...তারপব জুতোর শব্দ আর হিস্, ক্ল্যাপ.. ...এগুলো?

হরেন গোঁজ হ'য়ে ব'সে রইল।

ভালে চ'লে গেলেন।

যাবার সময় তাঁর গম্ভীর মুখ দেখে সকলেই যেন মনে মনে ধবে নিতে পারলুম যে কলেজেব বিচারে রায়টা মোটেই সুবিধাজনক হবে না।

রজত বাবুব বাড়ি থেকে বেবিয়ে হরেন ছাড়া আব সকলেরই মতটা ক্ষমা চাইবার দিকে যেন ঢলে পড়লো; কিন্তু হরেন ব'ল্লে, কলেজ ছাড়তে হয়, আজীবন মূর্খ থাকতে হয় তাও স্বীকাব, কিন্তু মাপ আমি কিছুতেই চাইবো না।

তার এই এক-গুঁয়েমিতে আমরা মনে মনে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম, আবাব আর একদিকে মনে হ'তে লাগলো স্বাধীনতার অধিকার লাভ কবতে হলে মানুষকে তো এমনি কঠোব এমনি কঠিন হ'তে হয়—ভাঙ্গবো—তাও সই, কিন্তু নুইবো না, মচকাবো না।

তবে কি হরেনকে ছেড়ে দিতে হবে? গুরুতর সমস্যা! হবেন বিষয়-বুদ্ধিকে পায়ে দ'লে যে মনুষ্যত্বের পথে চলার সঙ্কল্প করেছে—সে কথা মনে ক'রে আমাদের বুকেব মধ্যে বীর্য্যেব প্রসাদ স্পন্দন যে অনুভব ক'রছিলুম না, তা নয়, কিন্তু চোখেব সামনে যে দুর্গতির ভয়াল ছবি ফুটে উঠ ছিল—সেটাই যেন বেশী কাজ করছিল; হরেন যেন বলছে—আগে চল্, আগে চল্,—বেঁচে-ম'রে কোন ফল নেই—তার চাইতে ঐ রসাতলটাই ভাল।

সে কথা শুনে আমাদের দেহেব মধ্যে রক্ত যেন উচ্ছল-ছন্দে নেচে ওঠে! তারপর ভয়, ভয়, ভয়, শেষ পর্য্যন্ত যদি না দাঁড়াতে পাবি? তখন?

সমস্ত মন জুড়ে বাঁশ বনে হাওয়াব মত একটা চাপা কান্না—বেজে ওঠে, কাজ নেই, কাজ কি? এতখানির জন্যে প্রস্তুত হয়নি যে দেশটা আমাদেব এখনো!

কিছুই ঠিক্ হ'ল না—আমরা যে-যার বাড়ি চ'লে গেলুম। দেখা যাক্ কি করে আর সকলে কলেজের বিচার ক্ষেত্রে!

৬

কেরাণী-বাবুর কালো হুতুম পেঁচার মত হাম্‌দো মুখ-খানার মধ্যে লাল দুটো চোখ আনন্দে বন্ বন্ ক'রে ঘুরচে। উপরি-আমদানির লোভ পেল্লায়, দিন কতক নেশা-ভাঙ্‌টা চল্‌বে ঐ ফাইনের টাকা-গুলোতে।

কেরাণী-বাবু!

কি ?

বড় সায়েব কখন আস্‌বেন ?

এই যে, এলেন ব'লে……

কেরাণী-বাবু !

কি গো ?

ভালে সায়েব এলেন না ?

এই যে—এখুনি……

কেরাণী-বাবু !

আঃ কি, কি ?

প্রিন্‌সিপুল্‌ কখন আসবেন ?

জানিনে—যাও গোল ক'র না, বল্‌চি· ····

আপনি জানেন না ?

আর একজন ব'ল্লে, আরে দূৎ, উনি আবার জানেন না ?

বিধু ব'ল্লে, উনিই তো মালিক।

পিছন থেকে কে বল্লে, কিসের মালিক রে ? বাঁদর নাচের ?

ভিড়ের মধ্যে থেকে বাঁদর-নাচের বাজনা জন-দুই গলায় বাজাতে লাগ্‌লো কোঁ-বোঁ, বোঁ-কোঁ-বোঁ, কোঁ-কোঁ……

কেরাণী-বাবু ! কেরাণী-বাবু ! কেরাণী বাবু !… ··

কথার উত্তর নেই।

কে ব'ল্লে, চুপ্‌, অ্যাসের রাগ হয়েছে এখন·· ···

কথা কানে যেতে-না-যেতে তিনি একেবারে আগুন হয়ে উঠে বল্লেন, রাস্টিকেট করিয়ে দেব……নিশ্চয় ব'লছি……

রহস্য-কীট ?

হাসির রোলে আপিস-ঘর চৌচির হয়ে ফেটে পড়ে আর কি !

ভালে এলেন কাজির পোষাকে, সেকেলে কাজি নয়, এ কালের ; চাপকান-চোগা, মাথায় পিরিলি পাগ্‌ড়ি—আদালতের সিংহাসনে বসিয়ে দিলেই হয়।

ঠোঁট দুটি তাঁর হাসিতে একটুখানি ফাঁক ! যারা চিন্‌তো—তারা সরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলে চোখের কোণে রাগের ঘনিয়ে-ওঠা কালো ছায়ার ওপর ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চম্‌কে যাচ্ছে !

কিন্তু সবাই কিছু তা দেখ্‌তে পেলে না—তাই হৈ হৈ-টা তখনি থেমে গেল না।

ভালে সায়েবকে দেখে আমাদের কেরাণী-বাবুর শোক উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌ল।

ছেলেরা যে তাঁকে অপমান করেছে, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু কে-যে গাধা বলেছে—তা তিনি জানতেন না।

কিন্তু তাকে অপমান ক'রে সেই ফাঁকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে, এ কথা মনে করতেও তাঁর ভাল লাগ্‌চে না ; তাই তিনি বল্লেন—ঐ বিধু, বিধু গাধা ব'লেছে……

বিধু জোর গলায় ব'ল্লে, আমি, আমি ? মিথ্যে কথা, কখ্খোনো গাধা বলিনি, স্যর !

তবে কি ব'লেছ ? ভালে জিজ্ঞাসা করলেন।

মালিক বলেছি স্যর, ভালই তো বলেছি……

ছেলেরা হেসে উঠ্‌ল।

ভালে কেরাণী-বাবুর দিকে ফিরে চাইতে, তিনি বল্লেন, না অ্যাস্‌ ব'লেছে……

বিধু ব'ল্লে, আমি ও-কথা বলিনি, স্যর……

ভিড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে হরেন ব'ল্লে, আমি ব'লেছি, আমরা সবাই ওঁকে বলি অ্যাস্‌, ও-আর কিছুই নয়, অ্যাসিস্‌ট্যাণ্টের অপভ্রংশ।

আবার একটা হাসি !

হরেন বলেছিল কি না জানিনে, বোধ হয় বলেনি, কিন্তু সকাল থেকেই সে কাপুরুষের অখ্যাতি অর্জ্জন করতে করতে তিক্ত-বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিল—তাই সে যেন ক্ষিপ্ত হয়ে মরিয়া হ'য়ে—যা-থাকে-কপালে মনে ক'রে—বড় সায়েবের সঙ্গে সম্মুখ সমরে এগিয়ে এলো।

ফল ভাল হ'ল না, ভালে তাকে এক বছরের জন্য জাহান্নামে দিলেন, সে রাষ্টিকেট্ই হ'ল।

রজত বাবুর দিকে ফিরে ভালে বল্লেন, কেমন রজত-বাবু, আপনার সম্মতি আছে ?

রজত বাবু মাথা নেড়ে বল্লেন, একটুও না, এটা বোধ হয় সুবিচার হ'চ্ছে না……হরেন দোষ স্বীকার না করলে তো তাকে শাস্তি দেওয়ার কোন উপায়ই ছিল না· …লঘু পাপে গুরু দণ্ড হ'চ্ছে……

একটা শুষ্ক হাসি হেসে কর্কশ-কণ্ঠে ভালে বল্লেন, তবুও বুঝেছেন কি না, ঐ হুকুমই আমার বহাল থাক্‌বে।……

ছেলেদের ফাইন মাফ ক'রে দিয়ে বড় সায়েব নিজের কাম্‌রায় চ'লে গেলেন।

পরাজিত পুরুষ মতই অপমানের তিলকটি হরেনের কপালে জ্বল্-জ্বল্ করতে লাগ্‌লো।

৭

চিড্ খেলে কাঁচ যেমন জোড়ে না, ফাট্ বেড়েই যায়, তেম্‌নি চল্‌তে লাগলো খুটি-নাটি, ছোট খাট ব্যাপারে ভালে সায়েবের সঙ্গে রজত বাবুর !

কাজের চাপে তাঁর পিঠটা বুঝি ভেঙ্গে হুমড়েই পড়ে ! একদিন তিনি এক দম বেঁকে ব'সলেন।

এমন স্বুবর্ণ-স্বুযোগ ভালে হেলায় যেতে দিলেন না।

কলেজ কমিটির মিটিং ব'সেছিল সেদিন। ব্যাপারটা খুবই ইন্‌টারেষ্টিং।

অজাত-শত্রু রজত বাবুকে তাঁর বুদ্ধির গোলক-ধাঁধাঁর মধ্যে ঘুরপাক খাইয়ে ভালে বোধ করি দিব্য জ্ঞান দিচ্ছিলেন।

কিন্তু হঠাৎ এক মুহূর্ত্তে রজত বাবুর ভিতরের মানুষটা সজীব হ'য়ে সাড়া দিয়ে উঠ্‌ল। ভালে তারই অন্য ভাষ্য দিলেন, বল্লেন, অবাধ্যতা, শাসন-শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, আরো কত কি !

ভালে গোড়া থেকেই কোমর বেঁধে কাজ করছিলেন, তাঁর চিঠি-পত্র হাঁক-ডাক-হুকুম-নামা, যাতে কমিটির হাতে দেওয়া চলে, এমনি ক'রেই তৈরি হচ্ছিল, কিন্তু রজত বাবু সবটাই যেন আদব-আব্দারের মত চালাচ্ছিলেন।

কমিটির কর্ত্তারা রজত বাবুকে হাজির হ'তে বল্লেন সাম্‌না সাম্‌নি—যাতে ব্যাপারটার শীঘ্রই নিষ্পত্তি হ'য়ে যায়।

কিন্তু রাম বুঝলেন উল্টোই।

আর পাঁচজনের পরামর্শ মত রজত বাবু যেদিক দিয়ে তৈরি হয়ে গিয়েছিলেন—কমিটির তদন্তের গতি সেদিকটা মাড়ালেই না। সভ্যেরা ধরেই নিলেন যে, কাজটাকে ঠিক মত ক'রে চালাতে হ'লে জোর-জবরদস্তির দরকার হয়ই হয়। ব্যক্তির স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রেখে কাজ চলতেই পারে না।

এইখানেই এসে রজত বাবুর সঙ্গে তাঁদের গোল বেধে গেল। তিনি বল্লেন, ব্যক্তিদের জবাই করলে থাকেন তো মাত্র একজন, তাঁকে দিয়ে একলা কাজ চল্‌তে পারে কি ?.. …মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব ক'রে দিলে মানুষের আর থাকে কি ? জানওয়ার কি কল দিয়ে তো' এ কাজ চল্‌তে পারে না !

কথাটার মূল-অর্থ সবাই বুঝেছিলেন, কিন্তু সেটাকে স্বীকার করলেই যে হার হয়ে যায়। তাই কমিটি তার দক্ষিণ হস্তকে খর্ব্ব ক'রে—আর সব হাত গুলোকে সক্ষম ক'রে তুল্‌তে ভয় পেয়ে গেল। কর্ত্তা নইলে কি কর্ম্ম হয় ? কর্ত্তার ইচ্ছাই তো চালাবে, মজুরদের আবার ইচ্ছা কি ? তারা বোঝেই বা কি ?

রজত বাবু রাগ ক'রে বল্লেন, ও আপনাদের ফল্‌স্ এনালজি, এ ক্ষেত্রে ও একেবারে খাটে না—

তর্ক এমনি করে গড়াতে গড়াতে এসে একটা মজার জায়গায় দাঁড়ালো।

রজত বাবু বল্লেন, আমার নির্দ্ধারিত কাজটা—হুকুমেই তামিল করতে পারি ; কিন্তু যে কাজটা বাড়্‌তি—যেটা আমার নয়, যেটা অন্য কারুর অক্ষমতার জন্য আমাকে করতে হ'চ্চে—তার মধ্যে হুকুম চল্‌বে না ; সেখানে আপনাদের দিক থেকে অনুরোধ আর আমার দিক থেকে সহজ ইচ্ছা, তাতে যদি চলে ত' চল্ল'—নইলে বুঝতে হবে যে ব্যবস্থার ত্রুটিতে সেখানে ব্যাপারটা অচল হয়ে গেল।

কমিটির মুরুব্বি তখন ধাঁ ক'রে প্রশ্ন করলেন, তা হ'লে দাঁড়াচ্চে এই যে, হুকুমে আপনি কাজ করবেন না! আপনাকে কি কথায় অনুরোধ করতে হবে?

কতকটা তাই বোধ করি।

যদি সে অনুরোধও আপনি না মানেন?

রজত বাবু পকেট থেকে একখানা কাগজ বার ক'রে টেবিলের উপর রেখে বল্লেন,—তখন এ ছাড়া আমার আর অন্য কোন সাধু পথ নেই।

সেটা তাঁর কাজের ইস্তফা-পত্র।

তা দেখে ভালের মুখ কালো হ'য়ে গেল, এ আবার কি ফ্যাসাদ?

কিন্তু কমিটি কি মানুষের ব্যথা বোঝে?

রজত বাবুর ইস্তফা পত্র মঞ্জুর ক'রে কমিটি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো।

ভালে বল্লেন, তা কেমন ক'রে হয়? এক্ষুণি লোক পাই কোথায়? আমাকে দেখে শুনে একজন যোগ্য লোককেই তো নিতে হবে?···উনি তিনমাস থাকুন......

কমিটি বল্লে, সে কেমন ক'রে হয়, উনি তো কোন হুকুমের মধ্যে আসবেন না!

ভালে একটু হেসে বল্লেন, কলেজের হিতের জন্যেই কেবল সে-টুকু অবনতি, আমাকে স্বীকার করতেই হবে—আমি ওঁকে অনুরোধই করবো এখন থেকে······

সবাই হেসে ব্যাপারটাকে সহজ ক'রে উড়িয়ে দিতে চাইলেন; কিন্তু রজত বাবুর মুখে দৃঢ়তার ছাপটা একটুও নরম হ'ল না।

৮

গায়ে প'ড়ে মাইনে বাড়িয়ে দেবার প্রস্তাব ক'রে, অতিরিক্ত খাটুনিটা কমিয়ে দিয়ে, ক্লাশে ক্লাশে তাঁর সুখ্যাতি ক'রে ভালে রজত বাবুকে তোয়াজ করতে কিছুমাত্র কসুর করলেন না।

যাকে এক-কথায় বলে, গোড়া কেটে আগায় জল!

আমরাও একতিল আলস্য করিনি, তাঁর পেছু পেছু ঘুরে ঘুরে অনবরত বল্‌ছি, স্যর, আপনি চ'লে যাবেন না স্যর; আপনার পায়ে পড়ি, স্যর!

ছোট্ট একটা হাসি হেসে তিনি বল্‌তেন, দূর, তোরা কি পাগল হবি?

প্রোফেসারদের মধ্যে কেউ কেউ অবাক হয়ে যেতেন, তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলা-বলি করতেন, এর পর চ'লে যাওয়াটা, কোন দিক দিয়ে বুদ্ধির কাজ হবে না রজত বাবুর।

একদিন বুড়ো শম্ভু পণ্ডিত-মশাই বলেই ফেল্লেন, দেখুন রজত বাবু, এম্নি ক'রে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেল্‌বেন না। ব্যাপারটা তো কিছুই হয়নি, যদি কেউ আপনাকে অপমান ক'রে থাকে তো সে কমিটি, আর বিশেষ ক'রে ঐ কেশব রায়—উকিল;······ওরা জেরা করতে সুরু করলে আর রক্ষে থাকে? মানুষকে ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে নিয়ে গিয়ে ফেলেন একেবারে ভাগাড়ে।......

রজত বাবু কথার উত্তর করেন না, একটি ছোট্ট হাসি! যার অর্থ শিশুও বুঝতে পারে।

সে দিন কিসের একটা ফন্দি ধ'রে ছেলেরা "হাফ্ ইস্কুল" আদায় করেছিল—তাই, প্রোফেসারদের ঘরটা একদম গুল্‌জার।

রজত বাবু বেগতিক বুঝে খ'সে পড়ার চেষ্টায় ছিলেন, এমন সময় মনি অধিকারী তাঁর কাঁচা-পাকা দাড়িটায় ঘন ঘন হাত বুলিয়ে খোদ কর্ত্তার সঙ্গে একটা রফায় আসতে তাঁকে অনুরোধ করলেন, বুয়েচেন্ কিনা, ভেবে দেখুন রজত বাবু......

রজত বাবুর সেই কৃশ হাসিটি !

লড়াই করতে হ'লে গদা চায় গদা, খড়কের সঙ্গে সে-কাজ করতে হলে, গদা অচল হয়। তাই হ'ল অধিকারী মশাইয়ের—এক যুগে নাকি হাতী আর মশায় যুদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু সে তো অতি-ঐতিহাসিক যুগ—এ ক্ষেত্রে মণি অধিকারী বহুমূল্য সময়টার সদ্ব্যবহারের জন্য ভালে সায়েবের ঘরে তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন।

বিষ্ণুদত্ত বুঝতেন কেবল অর্থ নীতি, তাই রজত বাবুর খাম খেয়ালিটা বুঝে উঠতে পারছিলেন না—বল্লেন, চ'লে গিয়ে—কাজ না পাওয়া পর্য্যন্ত বসেই তো থাকতে হবে?

তা হবে বৈকি?

অর্থাগমের প্রত্যক্ষ সুযোগ ত্যাগ ক'রে অভাবের মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করাটা, উঃ—বিষ্ণু দত্তর রাগ হয়ে গেল চন্ ক'রে, তিনি নস্যর কৌট বার ক'রে ঘন-ঘন নস্য নিতে লাগলেন।

প্রিয়রঞ্জন কবি-ধাঁচার মানুষ ছিলেন, সব জিনিষের মধ্যে থেকে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যটুকু আহরণ ক'রে তিনি আনন্দে দোল খেতেন। তাই একপাশে বসে তিনি দুলে দুলে সারা।

বিষ্ণুদত্ত বল্লেন, কবি, তুমি কিছু বল, চুপ করেই যে থাকলে হে?

প্রিয়রঞ্জন কবি-জনোচিত একটা আলগোছে হাসি হেসে বল্লেন,

> রজতের নাহি লোভ রজতের প্রতি।
> ব্যর্থ বুঝি যায় ভেসে কূট অর্থ নীতি॥

হাসির গর্‌রা উঠলো।

৯

ছেলেদের উদ্যোগেই ফেয়ারওয়েল্ পার্টি ভালে এসেছিলেন—উঁচু কালো হ্যাট্, কোট-টার পিছনের দিকটা ঝুলে আছে, যেন লর্ড রোজভেলি। মুখে স্বস্তির চেয়ে অস্বস্তির রেখাই বেশি।

আর সবলেই দেশী পোষাকে, তাঁকে তাই বকের মধ্যে হংসো যথা, দেখাচ্ছিল।

ভালে কিছুতেই সভাপতির কাজ করতে রাজি হ'লেন না—কাজেই ছেলেরা ধ'রে প'ড়লো মণি অধিকারীকে। অধিকারী মশাই ঘন-ঘন দাড়িতে হাত বোলাতে লাগলেন। তক্তে বসার লোভও ছিল, কিন্তু তার চেয়ে ভয়টা বেশী। ছেলেরাও না-ছোড়; তখন তিনি গিয়ে নিজেই অনুরোধ করলেন কর্ত্তাকে—আপনি হ'লেই তো সব দিক দিয়ে সুন্দর হয়।

না, না, আজকে আমাকে মাপ করবেন আপনারা...

ছেলেরা উপায় না দেখে গিয়ে প'ড়লো শম্ভু-পণ্ডিত মশাইএর পায়ে। তিনি বল্লেন, কিন্তু বাপ-সকল, ইংরিজিতে স্পীচ্ দিতে পারবো না......

তার দরকার কি পণ্ডিত-মশাই?

মালা, চন্দন, ফুলের তোড়া কিছুরই ত্রুটি হ'ল না।

পণ্ডিত-মশাই বোধ করি বেদ থেকে একটা শ্লোক পড়লেন—যার অর্থ শুনে সকলের চোখে জল এসে প'ড়ল। আশু-বিচ্ছেদের করুণ রসে সে জায়গাটা যেন ভিজে গিয়েছিল। বিচ্ছেদ তো আছেই এ জগতে, কিন্তু এ-যে একান্ত অকারণে।

সবারই মনে ধাক্কা দিয়ে অন্তরের গোপনতম স্থান থেকে যেন একই কথা, একই ব্যথার সুরে বেজে বেজে উঠতে চায়। এ কি অবিচার এ সংসারের, এ কি দুর্ভাগ্য মানুষ-জীবনের।

এ সবের এক বর্ণও কেউ উচ্চারণ পর্য্যন্ত করতে সাহস ক'রলে না—তবুও এই কথাগুলোই সকলের মন জুড়ে চেপে ব'সে রইল।

কেউ বিশ্বাস না ক'রলেও সকলেরই মনে কেমন যেন একটা আশা জেগে রইল যে, শেষের মুহূর্ত্তে ভালে তাঁর ত্রুটি স্বীকার করবেন—কেননা গ্যাসের জলজলে আলোতে

তাঁর মুখখানা দেখে মনে হচ্ছিল—অনুতাপ অতি বিলম্বে হলেও—না এসে পারেই না!

কিন্তু এ'ল আর একটা জিনিষ!

কেরাণী-বাবু একটা মেটে রংএর খাম এনে রজত বাবুর হাতে দিলেন।

সেখানা একটা টেলিগ্রাম।

নিমেষে সবাই জান্‌তে পারলে যে প্রেসিডেন্‌সি কলেজে রজত বাবুর কাজ হয়েছে'!

মরা মানুষ গুলো যেন এক পলকে হুড়মুড় ক'রে জ্যান্ত হয়ে উঠ্‌ল।

পটাপট্‌ সোডা লেমনেডের বোতল ভেঙ্গে—আমরা মনের আনন্দটাকে রঙ্গীন জলের সঙ্গে যেন ফেনিয়ে

ভালে এক পাশে নির্ব্বাক হ'য়ে ব'সে রইলেন—ক্ষণেকের জন্যে মণি অধিকারীও বোধ হয় তাঁর কথা ভুলে গেছ্‌লেন!

আমরা জিদ্‌ ধ'রলুম—ঘোড়া খুলে আমরা গাড়ি টেনে নিয়ে যাবো......

পাগল! হ'তেই পারে না। আমার ঠিকে গাড়িই ভালো।

গাড়ি বারাণ্ডা পেরিয়ে গাড়ি খানা দাঁড়িয়ে ছিল। রজত বাবু চুপে চাপে চ'ড়ে ব'সতে যাচ্ছেন তাতে!

সাম্‌নে ভালে সায়েব এসে তাঁর লম্বা হাতখানা এগিয়ে দিয়ে দাঁড়ালেন।

রজত বাবু এক-পা এক-পা ক'রে পিছিয়ে গিয়ে—তাঁর ছোট দুটি হাত জোড় ক'রে করুণ কণ্ঠে বল্লেন, আমায় মার্জ্জনাই করবেন।

ঠিকে গাড়ি শব্দ করতে করতে বার হয়ে গেল। ভালে সেখেনে তখনো বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে!

রেলপথে

শ্রী নিরুপম গুপ্ত

তপ্ত দীর্ঘ দিনের ক্লান্ত সমাপ্তি আসন্ন হইয়া আসিল। অস্তপ্রায় সূর্য্যের ম্লান আলো দুদিকের দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তরের উপর অবসন্ন হইয়া পড়িয়া আছে। গাড়ীখানি চলিয়াছে। তারও গতি যেন শিথিল, মন্থর। কোথায় যেন লক্ষ্যহীন চলিয়াছি মনে হয়, যেখান হইতে আসিলাম সেখানে কেহই অশ্রু-চোখে আমাকে বিদায়-বেদনা জানায় নাই, যেখানে চলিয়াছি সেখানেও কাহারো উৎসুক প্রতীক্ষা আমার জন্য উন্মুখ হইয়া নাই। তাই পথে পথে যত একা পথিক দেখি তাহাদের পানে চাহিয়া থাকি, উহাদের জন্য মনটা কেমন হইয়া উঠে।

এইমাত্র একটা মস্ত জংশন ছাড়াইয়া আসিলাম। চারিদিকে মানুষের কি চল চঞ্চলতা! কে কাহাকে দলিয়া পিষিয়া যাইবে তাহার যেন ঠিকানা নাই! পান-সিগারেট চাই, সুন্দর সুন্দর বাহারদার চুড়ী চাই তরুণী প্রিয়ার মৃণাল-বাহুর জন্য, ভালো ভালো খেলনা চাই নয়নানন্দ খোকা-খুকীর জন্য—কত রকমের হাঁক ডাক! একটি নিমেষের মধ্যে যেন মানুষের সহস্র রকমের প্রয়োজন তাহার শেষ নিশ্বাস লইবার জন্য উন্মত্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছে। বন্ধু গাড়ীর বাহিরে দাঁড়াইয়া দূরযাত্রী বন্ধুর হাতটি ধরিয়া দাঁড়াইয়াছে, হয়ত বা দুটা তুচ্ছ কথা,

একটু হাসি হয়; অন্তরে অন্তরে আসন্ন বিচ্ছেদের ব্যথা কাঁপে, তবু তো হাতে হাত রাখিবার পরমানন্দে এই বিদায় উজ্জ্বল হইয়া আছে। একদল বিবাহযাত্রী তাহাদের বালক-বরটিকে লইয়া চলিয়াছে, গাড়ীর মাঝ খানে একটা হৈ-চৈ বাধাইয়া দিয়াছে; বালককে লইয়া কত রকমের কৌতুক, সে তাহার কি বোঝে কে জানে! তবু 'বউ' আনিবার আনন্দে মুখখানি তাহার প্রদীপ্ত। একটা খোকা তার মার গলাটি কেমন করিয়া জড়াইয়া আছে, মার মুখখানি স্নেহের উচ্ছ্বাসে ভরপুর!

এত আনন্দের উৎসব, এত চঞ্চল আনাগোনার ব্যস্ততা, এ সব তবু মনকে বাঁধিতে পারে না।

এই গাড়ীতেই অন্য কামরায় যে-মহিলাটি একাকিনী শূন্যদৃষ্টি মেলিয়া বসিয়া আছেন, তাঁর কথাটাই ঘুরিয়া ফিরিয়া মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। কত কত রকমের পসরা হাঁকিয়া গেল সে দিকে একবার ওই দুটি চোখ নামিল না, দৃশ্য চোখের সুমুখ দিয়া বহিয়া গেল বন্যার মত, একবারও ও দুটি চোখে তাহাদের ছায়া পড়িল না। রুক্ষ চুলগুলি মুখের আশে পাশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, আর চোখ দুটি বিষণ্ণ-উদাস হইয়া কোথায় যে হারাইয়া গেছে তাহার সন্ধান বুঝি কেহই জানে না। আমিও জানি না কিছুই; তবুও ওই যে জীবনের দীর্ঘ-পথের মাঝখানে একেবারে নিঃসঙ্গিনী হইয়া উদাস দৃষ্টি মেলিয়া ওই প্রান্তরের পানে চাহিয়া আছেন তাহা যেন সহিতে পারি না।

আমারই মত তাঁহারও পথখানি কি দিক-হারা হইয়া যে-কোনো দিকে চলিয়াছে!

গাড়ী চলিয়াছে। বাতায়ন দিয়া চাহিয়া আছি ওই বিশাল শূন্য শুভ্র প্রান্তরের পানে। ওই শস্যহীন ক্ষেত গুলির রিক্ত নিঃসঙ্গতার পানে চাই আর বুকের ভিতর এ কোন্ কাঁদন গুমরিয়া উঠিতে চায়। একদিন ওই ক্ষেত গুলির বুকের উপর শ্যাম শস্যরাশি সবুজ আনন্দের হিল্লোলে কি উৎসবের সৃষ্টি করিয়াছিল! পাখীরা আসিয়াছিল, নরনারী আসিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে এই প্রান্তর মধুর হইয়া উঠিয়াছিল, আজ এই ক্ষেতগুলি সকরুণ একাকিত্ব লইয়া কাশীবাসী বুড়া বুড়ির মত এই সন্ধ্যা বেলার আকাশের নীচে ঝিমাইতেছে। ওই দু' পাশের নিঝুম আম বন গুলি; ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা গুঞ্জনে ইহাদের নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধতা আরো তীব্র হইয়া বাজে। ওই আম বনের পাশ দিয়া একটা পথ কোন্ সুদূর হইতে আসিয়া আবার পশ্চিমের দিকে কোথায় চলিয়া গেছে; একটা আম গাছের নীচে একটা ভিখারী ঝুলিটা নামাইয়া বসিয়া আছে! ও-ও একা, গৃহহীন জীবনখানি কোথাও সন্ধ্যাবেলা নামাইলেই হয়। সন্ধ্যা আসিতেছে।

সারারাত ওই প্রান্তরটা হা করিয়া আকাশের পানে মড়ার পলকহীন চোখ মেলিয়া পড়িয়া থাকিবে। ওই আমবনের কোলে আঁধার জমিয়া উঠিবে, আর মেঠো হাওয়াটা বিশ্বের একটা দীর্ঘ ক্ষুব্ধ নিশ্বাসের মত ওই আমবনের মাঝে সাঁ সাঁ করিবে সারারাত। ওই ভিখারীটা ওখানেই কি রাতের বেলা মরিয়া থাকিবে?

কোন্ একটা ছোট্ট ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিল। দু' পাশে ধারে কাছে কোথাও লোকালয় দেখা যায় না। একটি পায়ে-হাঁটা সরু সাদা পথ ক্ষেতের আল ধরিয়া ধরিয়া দক্ষিণ দিকে চলিয়া গেছে। ষ্টেশন-মাষ্টারকে দেখি,. এ যেন একটা কলের মানুষ, গুণিয়া গুণিয়া পা ফেলে, ধরা বাঁধা তার ক্রিয়া কলাপ। এমনি করিয়া এই জনহীন প্রান্তরের মাঝখানে দিন কাটে, ষ্টেশন-ঘরের পেছনে তাহার থাকিবার ছোট্ট বাসা। বাতায়নের ফাঁক হইতে কে দুটি ক্ষুধিত করুণ চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে; একটি ম্লান বিষণ্ণ তরুণীর মুখ—যেন মৃত্যু-লোকের বাতায়ন হইতে এই চলন্ত জীবন-লোকের পানে পিণ্ড প্রত্যাশী প্রেতাত্মার মত ব্যাকুল হইয়া চাহিয়া আছে একখানি আত্মীয়ের মুখ দেখিবার জন্য। দিনের পর দিন এমনি করিয়া মেয়েটি চাহিয়া থাকে, মুক্তির আশায়। না জানি কোন্ দূর পল্লীর কথা উহার মনে পড়ে সন্ধ্যাবেলা,

মায়ের স্নেহমাখা দৃষ্টি, ভায়ের আদর, পোষা ছাগলের গা ঘেঁসা আত্মীয়তা আর তুলসী-তলার দীপালোক—যাহা চিরতরে হারাইয়া গেছে, আর যাহা ফিরিবে না।

শুধু একটা অসহায় কাতর দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসে!

রাত্রির ঘনকৃষ্ণ অন্ধকার মাঠ ঘাট বন সব ঢাকিয়া দিয়াছে, গাড়ীর ভিতর লোকগুলা বত রকমের কথা বলিতেছে। বচসা, গান, গালাগালি যত রকমে পারে তারা নিজেদের নিঃসঙ্গ অস্তিত্বকে আড়াল করিতে চাহিতেছে। বাহিরের অন্ধকারে মাথাটা ডুবাইয়া দিয়াছি, ও যেন কালো জলের সাগর, তাহার মাঝে আপনাকে নিলীন করিয়া দিলেই বাঁচি। ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পার হইয়া চলিয়াছি, অনন্ত অন্ধকারের সাগর ভেদ করিয়া—না জানি কোন অতল অন্ধকারে। ষ্টেশনের আলোগুলি রক্ত-চোখে দাঁড়াইয়া থাকে সারারাত। গাড়ীর চাকার শব্দে সহস্র দানবাত্মার অট্টহাস্য শুনিতে পাই।

রাত্রি গভীর হইয়া গেছে, বোধ হয় কোন্ পাহাড়ের দেশ দিয়া চলিয়াছি, চারিদিক হইতে বন্য-কীটের বিকট ধ্বনি আসিতে থাকে, গাড়ীর ভিতরে চাহিয়া দেখি মানুষ গুলি নানা রকমের অচিন্ত্য ভঙ্গীতে এলাইয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছে। প্রত্যেকটি মানুষ যে এই অসীম অন্ধকারময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কি নিদারুণ অসহায়, তার ওই ঘুমন্ত মূর্ত্তির পানে চাহিয়া স্পষ্ট দেখিতে পাই। শিশুর চেয়েও এই বুড়া বুড়া মানুষগুলি যেন অসহায়।

দূরে নদীতীরে একটা আগুন জ্বলিতেছে দেখিতে পাই, জলে তার আভা পড়িয়াছে। চিতার আগুন মানব জীবনের দুঃস্বপ্নকে ভস্ম করিতেছে—হয়তো কোন যুবকের প্রিয়তমার স্বপ্ন, হয়তো কোনো যুবতীর প্রিয়তমের স্বপ্ন পুড়িয়া ছাই হইতেছে! বালক-বরটি ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া বউ আনার স্বপ্ন গড়িতেছে বোধ করি।

গাড়ীটা যেন কোথায় থামিয়াছে। ইঞ্জিনটার কি বিকট শব্দ! সৃষ্টির বুকে কোন্ চিতা যেন অনাদিকাল হইতে জ্বলিতেছে, এ যেন তারি গোঙানি। চিতারও ক্লান্তি লাগে। আর কতকাল এই ভস্মীকরণ চলিবে! এ রাত যেন আর ফুরাইবে না।

দুঃস্বপ্নের জগৎ মিলায়, আঁধার ধীরে ধীরে সরিয়া যায়।

নিবিড় শ্যামশ্রীর ঘুমভাঙা নির্ম্মল মুখের উপর উষার প্রসন্ন আলো আসিয়া পড়ে। এ যেন আমার সেই জীবনের কোন্ ভোরে হারাইয়া যাওয়া মায়ের স্নিগ্ধ হাসি-মুখখানি আমার পানে চাহিয়া চাহিয়া ডাকে! সব ভুলিয়া যাই, দীর্ঘ রাত্রির উৎকট দুঃস্বপ্নের যাতনা মিলাইয়া যায়, আঁধারের মতই শুধু চিরদিনের হারাণো আমার মা আমায় কোলে লইয়া আমার সমস্ত চেতনাকে সুধায় সুধায় অভিসিঞ্চিত করিতে থাকে।

গাভী চলিয়াছে মাঠে, বাছুরটা তাহার স্তন মুখে দিয়া চলিয়াছে। অন্ধ ভিখারী ভগবানের নাম করিয়া ভিক্ষা চায় গাড়ীর দ্বারে দ্বারে, সাত বছরের একটি মেয়ে তাহার হাত ধরিয়া চলে। একটা রুগী ভিখারী ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে গোঙায়; কিশোর যুবক দুটি তাহাকে সযত্নে কোলে করিয়া বোধ করি সেবাশ্রমে লইয়া যায়। শ্রমিক যুবক দূরে কোথায় চলিয়াছে, ষ্টেশনের রেলিং ধরিয়া বাহিরে একটি তরুণী মেয়ে লাল চোখে হাসিবার চেষ্টা করিতেছে আর অশ্রু মুছিতেছে। যুবকটি সেই দিকেই তন্ময় হইয়া চাহিয়া আছে, সমস্ত অন্তরের আকুতি দিয়া ভালবাসা দিয়া নীরবে যেন এই কথাটিই বলিতেছে, ওগো আমার নিত্যকালের সঙ্গিনী, আমার সকল সুখে দুঃখে বুক জোড়া সহচরি।

ভোরের আকাশ সোনার আলোয় রাঙা হইয়া উঠে, মানুষের হাজার আশার রঙে আবার জীবন বর্ণ-বিচিত্র হইয়া উঠে।

কোন্‌টা সত্য আর কোন্‌টা মায়া কিছুই বুঝি না!

জলপথে

শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু

বাড়ী থেকে যখন বেরুলুম তখন শেষরাতের তারারা আকাশে ভিড় করে রয়েছে, রাত্রি শেষের অন্ধকার দু'ধারে গাছের সারির মাঝে ঘন নীল আঁচলের মত জড়ান। ও-দিকে গগনপ্রান্তে অন্ধকার নদীর ওপর চাঁদ রূপোর নৌকার মত ভাসছে। রাতে যখন সে যাত্রা সুরু করেছিল তখন আমরা ঘুমোচ্ছি, যখন আমাদের যাত্রা সুরু হবে তখন তার পাড়ি দেওয়া শেষ হয়ে যাবে, এখুনি পূর্ব্ব-তোরণের স্বর্ণ দুয়ার খুলে সূর্য্য আলোর রথে বাহির হবে, তারি প্রতীক্ষায় ভোরের অন্ধকার মায়ের প্রাণের আশার মত কাঁপছে।

ঘাটে এসে পৌছুলুম—নদীটি ঘুমন্ত রাজবালার স্বপ্নমুগ্ধ মুখের হাসির মত ঝিকমিক্ করছে, চারিদিকে রহস্যময় অন্ধকার, ওপারের গাছপালা অন্ধকারে মেশা, যেন কোন অপূর্ব্ব দৈত্যপুরী, ষ্টিমারের সার্চ্চলাইটটা মাঝে মাঝে ঝক্-মক্ করে উঠছে কোন দানব প্রহরীর নিদ্রাহীন চোখের মত। ষ্টিমারগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, তাদের আবছায়া দেখে মনে হচ্ছে যেন রূপকথার বেঙ্গমবেঙ্গমীরা পাখা মুড়ে ঘুমোচ্ছে, কত দূর অজানা দেশ তারা দেখেছে, কত দূর-দেশে তারা যাবে, তাদের স্মৃতি তাদের স্বপ্নে উষার অন্ধকার ভরা।

একে একে তারা মিলিয়ে যাচ্ছে, ঘাটের বকুলগাছ থেকে স্নিগ্ধ বাতাসে মৃদু গন্ধ আসছে, তারাদের বিদায় বাণীর মত কয়েকটি ফুল ঝরে পড়ল, ফুলেদের কানে কানে তারারা কি কথা বলে গেল!

পূবের আকাশে একটু রং ধরেছে, যেন তারা-ভরা ঘন নীল শাড়ির ঘোমটা খুলে কে একটু চাইল, তার চাউনির আলোর মেঘ সব রাঙা হয়ে উঠল।

আলো, আলো, বকুল ফুলের মত সাদা আলো, শিশুর হাসির মত মধুর আলো আকাশ ছাপিয়ে মেঘ হতে ঝরে পড়ে ঘন নীল গাছের সারির ওপর দিয়ে নদীর জলে গিয়ে পড়ছে—নদী জেগে উঠছে—কল্-কল্!

এতক্ষণ সব স্নিগ্ধ শুব্ধ ছিল, এখন চারিদিকে জাগরণের কল্লোলধ্বনি। ঝাউ গাছগুলো বাতাসে সন্ সন্ করছে, নদীর জল কল্ কল্ ধ্বনিতে কেঁপে উঠছে, যাত্রীদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেছে। এতক্ষণ তারা তাদের পুঁটলী বোঁচকা বিছানা ট্রাঙ্কের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিল, এখন জেগে উঠে প্রভাতের আকাশ কলরব-মুখর করে তুলেছে,—ওরে ভজুয়া পুঁটলীটা ভাল করে বাঁধ্, ওরে রামা, টিকিটটা করে আন্, আর আমার ট্রাঙ্ক! টিকিট-ঘরের কাছে মৌমাছিদের চাকের মত তাদের অবিশ্রাম কলরব।

ভিড়ের মধ্যে একজন অন্ধ ভিক্ষুক একটি ছোট ছেলের হাত ধরে ভিক্ষা চাইছে, চারিদিকে আকাশভরা আলো কিন্তু তার চোখে আলো নেই, অন্ধকারে গাছের তলায় এতক্ষণ সে নমাজ পড়ছিল, চারিদিকের গোলমাল শুনে উঠে ভিক্ষা আরম্ভ করেছে।

এতক্ষণ ষ্টিমারগুলো নদীর জলে ঘুমন্ত ছেলের মত পড়েছিল, এবার তারা ঘুম-হতে-জাগা দস্যি-ছেলের মত দাপাদাপি সুরু করছে, কেউ চেঁচাচ্ছে ভোঁ, ভোঁ, কারুর ইঞ্জিনের ঝক্‌ঝক্ শব্দ সুরু হয়েছে। ছোট জেলে-ডিঙ্গি-গুলো যেন মায়ের কালো ছোট ছেলের সারি, কিন্তু ষ্টিমারগুলোকে জলে মানায় না, এরা যেন বিমাতার কোলে, তাদের ঠিক স্থান হচ্ছে সমুদ্র, সেখানে ঢেউয়ের দোলায় তরঙ্গ গর্জ্জনে তাদের যথাস্থান।

ষ্টিমার ছাড়বার সময় হল, ডেকে একটা ইজিচেয়ারে

এসে বসলুম। ঘণ্টা পড়ছে, জাগরণপূর্ণ আলোয় চারিদিক জল জল হয়ে উঠছে, ওপারে স্থপারি-বন নারিকেল-বনের পাশ দিয়ে সূর্য্য উঠছে, এপারে ঝাউ গাছের ফাঁকে ফাঁকে আলো কাঁপছে।

ঘাট ছেড়ে সমুখে চলেছি, সামনে পাল তুলে একটি ছোট নৌকা চলেচে ; আমরা চলেছি জল কাটতে কাটতে, নৌকাটি চলেছে সাদা বকের মত সহজ গতিতে উড়ে। তরুছায়াসমাচ্ছন্ন সহরের ওপর সূর্য্য-কিরণউদ্ভাসিত নারিকেল স্থপারি বৃক্ষবেষ্টিত বাড়ীগুলি ছোট হয়ে সবুজের অন্তরালে মিলিয়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে কোন কোন বাড়ীর সাদা, হলদে, নানা রংএর ছোপ। পথের ধারের ঝাউ গাছের সারি শেষ হয়ে এল। এপার ওপারের ভেদাভেদ ঘুচে গেল, দুধারে স্নিগ্ধ সবুজের ঘন-রেখা, গত রাতের ঝড়ে ধোয়া নিষ্কলঙ্ক নীল আকাশের পাত্র হতে সম্মুখে সূর্য্যালোক নির্ম্মল স্থধার মত ঝরে পড়ছে। এগিয়ে চলেছি।

ওই নগরের শেষ বাড়ী,—ওখানি এখন সদ্যোজাগ্রত শিশুদের হাস্য-কলগানমুখর, গৃহিনীর মঙ্গলকর্ম্মরত হস্তের কঙ্কনধ্বনিমধুর। তরল আলোর স্রোতের মত নদীর জল কেটে চলেছি। নদীটি বেঁকেছে, এতক্ষণ দক্ষিণের দিকে যাচ্ছিলুম সূর্য্যের পাশাপাশি, এখন পশ্চিমে চলেছি সূর্য্যের আগে আগে

ষ্টিমারটি একটি ছোট গ্রামের সামনে এসে নোঙর ফেলেছে, টিনের ছাদ ও দরমার দেওয়াল-ওয়ালা বাড়ীর সারি পল্লীবধূদের মত নারিকেল গাছগুলির ঘোমটার ফাঁকে উঁকি মারছে। এতক্ষণ ষ্টিমারের ইঞ্জিনের শব্দে বাহিরের শব্দ শোনা যায়নি, এখন ষ্টিমার স্তব্ধ তাই পাতাদের মর্ম্মর-ধ্বনি, একটি কুহুর ডাক শোনা গেল। গ্রামের ছেলে মেয়েরা ঘাটে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে, একটি উলঙ্গ শিশু তার বড় বোনের হাত ধরে বিমুগ্ধ বিস্মিত নেত্রে ষ্টিমারের দিকে তাকিয়ে, এক ছোট নগ্ন বালক গ্রামের সরু পথ দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে, বুঝি পড়ে যায় ; সামনের মাঠে যারা কাজ করছিল, তারা কাজ থামিয়ে দেখছে, প্রভাতের আলোয় এ ষ্টিমার অপূর্ব্বরূপে গ্রামের শিশু বৃদ্ধদের নিকট প্রকাশিত হল।

কেউ নগ্ন, কেউ ময়লা রাঙা লুঙি পরা, কারুর সাদা কাপড়—গ্রামের ছেলের দল—কেউ কলা নিয়ে কেউ দুধ বেচতে এসেছে। কিন্তু ওই যে নগ্ন শিশু দিদির আঁচল ধরে এসেছে ও কিছু বেচতে আসেনি, ও শুধু ষ্টিমার দেখতে এসেছে—দিদি ওই দেখ, ওটা কি! বা! অকারণ উৎসুক ও পুলকে তাদের প্রাণ ভরা। যাত্রীদের ওঠা-নামা শেষ হল, নোঙর তুলে ষ্টিমার চল্ল, ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে চেয়ে রইল। নিমেষের মধ্যে ছোট গ্রাম দিগন্তে মিশে গেল।

ছোট একটি খালে ঢুকছি—এবার দুধারের তীর নারিকেল স্থপারি খেজুর কদলী গাছের জড়ামড়িতে নিবিড় সবুজ, তারি মাঝে গলান রূপার মত খালটি এঁকে বেঁকে চলেছে, ষ্টিমার ঠিক খালের মাঝখান দিয়ে চলেছে। তীরের ধার দিয়ে একখানা নৌকা গুণ টেনে চলেছে আমাদের পাশাপাশি, মাঝিদের পায়ের ও পিঠের মাংস-পেশীগুলি ফুলে উঠে রোদে ঝকমক্ করছে, গাছের পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে নদীর জলে আলো ঝিকমিক্ করছে, —মেঘশূণ্য দীপ্ত আকাশের তলে জল ও বাতাসের কাঁপনে দুধারে সবুজ বনের স্রোতের মধ্য দিয়ে আমার মন কোন স্বপ্নতরীর গুণ টেনে চলেছে।

পাল তুলে একটি নৌকা চলে গেল। ওই নৌকাটি বড় সুন্দর লাগছে, মনে হয় আমাদের একখানি শান্তি-স্নেহসিক্ত গৃহ নদীর জলে নেমে ডানা মেলে চলেছে, সে এ ষ্টিমারের মত চারিদিকে তোলপাড় করে বিজয়ী বীরের মত যাচ্ছে না। এই স্নিগ্ধ শান্ত সুন্দর প্রভাতে ষ্টিমারের গর্জ্জন বেহালার মিঠে আলাপের মধ্যে হঠাৎ বিলিতী ব্যাণ্ডের বাজনার মত।

আমার সহযাত্রী একটি ইংরাজ ও একটি মাড়োয়ারী। মাড়োয়ারীটি ইংরাজটির কাছ থেকে একচোট বকুনী

খেয়েছে, সে মেয়েদের স্নান করবার ঘরেতে ঢুকে স্নান করে চারিদিক জলে ভাসিয়েছে বলে। সুতরাং ইংরাজটির সঙ্গে আলাপ বন্দ করে আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা সুরু করলে।

মাড়োয়ারীটি বল্লে, কেন এদিকে এসেছিলেন?

বল্লুম—বেড়াতে।

আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—শুধু বেড়াতে?

বল্লুম—হাঁ, বেশ জায়গা, বেশ সুন্দর।

মুখে কিছু না বল্লেও সে মনে মনে আমার কথা অবিশ্বাস করলে, শুধু বেড়াতে এসেছে! বল্লে, এদিকে বেড়াতে এসেছেন, এর চেয়ে ত কলকাতা ভাল।

এ স্থানের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে মাড়োয়ারী হৃদয়ে রসবোধ জাগাবার আশা ত্যাগ করে চুপ করে রইলুম। সে এ-দিকে ঘিয়ের ব্যবসা করে, গ্রামে গ্রামে শস্তায় ঘি কিনে কলকাতায় চালান দেয়, তারপর চর্ব্বি-মিশ্রিত হয়ে সে ঘি ডবল দামে বিক্রি হয়। মাড়োয়ারীটি পকেট থেকে তার হিসাবের খাতা খুলে দেখতে লাগল, ইংরাজটি খবরের কাগজ পড়া শেষ করে একটা ডিটেকটিভ নভেল খুলল।

অদূরে সামনে একটি গ্রাম বাঁশের ঝাড়ের পেছনে উঁকি মারছে, কয়েকটি জেলে জাল শুকোচ্ছে, একটা জেলের ছেলে জলে লাফিয়ে পড়ল, জলকে আলিঙ্গন করে আনন্দে নাচছে; একটা ভাঙা মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে, একটি বৃদ্ধ জেলে জাল সারাচ্ছে, তার সাদা দাড়ি, উন্নত দেহ, গম্ভীর প্রসন্ন মুখ দেখলে মনে হয় যেন একটি ঋষির ছবি। এম্নি জেলেরাই যিশু খৃষ্টের শিষ্য ছিল, এম্নি কোন জলের ধারে প্রভাতের উদার আলোয় তিনি জেলেদের তাঁর শুভবাণী বলেছিলেন। আজ যিশু এখানে এলে ওই বৃদ্ধ জেলেকে তাঁর প্রেমের বাণী দিয়ে আহ্বান করতেন, আমার পাশে যে খৃষ্টানটি বসে আছে, তাকে নয়।

চলেছি, আলো হাওয়ার মাঝ দিয়ে সবুজ স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের পাশ দিয়ে জলের সাথে চলেছি এগিয়ে, দুচোখ ভরে চারিদিকের মাধুর্য্য পান করতে করতে।

ইংরাজটি বেশীক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে পারলে না, ডেকের একদিক থেকে অপরদিক পায়চারি আরম্ভ করল, তারপর খানসামাকে ডাকল, একবার ষ্টিমারের বাবুকে ডেকে পাঠাল কি সব হুকুম দিলে, একটা প্রভুত্ব করবার ব্যগ্র বাসনায় সে ব্যস্ত, এ শান্ত নির্ম্মল প্রভাত তার অন্তরকে স্পর্শ করছে না।

তার কোন পূর্ব্বপুরুষ যখন এই নদী ধরে বাংলায় প্রবেশ করেছিল তখন সে যে স্বর্ণের সন্ধানে শক্তির উন্মাদনায় এসেছিল, সেই মত্ততা ও জালা সে তার বংশ-ধরদের দিয়ে গেছে; সে ত প্রেমরসসিক্তা কীর্ত্তন-মুখরিতা সৌন্দর্য্যময়ী বাংলাতে আসেনি, সে বাংলার পাটের হাটে চায়ের বাগানে এসেছে, সে ত বঙ্গজননীর অন্তঃপুরে কল্যাণী লক্ষ্মীর কোলে সন্তানের রূপে আসেনি, সে এসেছে বণিকরূপে, সৈনিকরূপে, সে আদায় করবে, সে জয় করবে, সে মাতৃস্নেহ চায় না, সে স্বর্ণের স্তুপ চায়।

একটা বড় নদীতে এসে পড়লুম, জলের কল্লোলধ্বনি বেড়ে উঠেছে, ওপারের গাছগুলো সব নীলপটে তুলির সবুজ ছোপের মত, তার ওপর হাল্কা পেঁজা তুলোর মত মেঘের সারি।

বঙ্গজননী, তোমার স্তন্য সুধাধারা পান করে চলেছি; আমি নগরের পুত্র, আমি তোমায় ধাত্রী বলে জানি, আজ মাতা বলে চিনলুম, এই দীপ্ত মধ্যাহ্নের উদার আলোর নীল অবগুণ্ঠন খুলে কি জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে এসে দাঁড়ালে। জননী, তোমায় দেখলুম, তোমার রৌদ্রদীপ্ত শ্যামল অঞ্চল মাঠে মাঠে লুটিয়ে পড়েছে, তোমার কল্যাণহস্তের স্নিগ্ধ স্পর্শে বাতাস আকুল, তোমার স্নেহ পীযুষধারা নির্ম্মল নদীর জলে প্রবাহিত, চির জাগ্রত স্নেহদৃষ্টিতে তুমি চেয়ে আছ। মাগো, নগরেতে আকাশ কলের ধূমে আতঙ্কিত, বদ্ধ ঘরের বাতাস দ্বন্দ্ব দ্বেষে উত্তপ্ত, পুরী স্বর্ণের লোভে কলঙ্কিত, নদী শৃঙ্খলিত আবর্জ্জনা-মলিন, সেখানে তোমার দেখা পাই

না, আজ এই দীপ্ত দ্বিপ্রহরে উদার মাঠের মেখলায় নদীর ওপর তোমার অপরূপ রূপ দেখলুম, আমি ধন্য হলুম।

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন; একটি ছোট গ্রামের পাশ দিয়ে চলেছি, ঘাটে কয়েকটি নৌকা বাঁধা; একটা গরু নাইতে নেমেছে, তার সঙ্গে একটি ছোট মেয়ে নেমেছে, তীরেতে তার ছোট ভাই নগ্নদেহে দাঁড়িয়ে। দূরে গ্রামখানি মধ্যাহ্নের ক্লান্ত রৌদ্রে যেন ঘুমন্ত। সম্পদ এদের অল্প, সঞ্চয় এদের সামান্য, কিন্তু তোমার সূর্য্য তোমার চন্দ্র এদের আশীর্ব্বাদ করে, তোমার নদীর কলগান এদের ঘুম পাড়ায় জাগিয়ে তোলে, তোমার লক্ষীর ভাণ্ডার সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার এদের জন্য খোলা।

জানি, আমি স্বপ্নের চোখে গ্রামগুলিকে দেখছি; সত্যিকার গ্রামের দুঃখ দারিদ্র্য বিপুল, শারীরিক ও মানসিক অস্বাস্থ্য অসীম, সেখানে সামাজিক রাজনৈতিক পেষণ, অশান্তি দলাদলির বিরাম নেই। তবু ওই যে সরু পথ ঘাট থেকে গাছের ছায়া দিয়ে সুদূরে চলে গেছে, তারি আহ্বানে মন উদাস হয়ে ওঠে

ডেকের একেবারে সামনে জলের মুখে ইজিচেয়ার নিয়ে শুয়ে পড়েছি, পাশে তিনদিক খোলা, মাথার ওপর নীলাকাশে সাদা মেঘের ভিড়, সামনে নদী এঁকে বেঁকে চলেছে, যেন সবুজ তটের মায়া কাটিয়ে পালাতে চায়, আবার ফিরে এসে উল্লাসে আলিঙ্গনে বেঁধে আবার চলে যায়, মনে হচ্ছে যেন কোন নীল সবুজ মায়াপুরীর সন্ধানে চলেছি, যতই কাছে আসি ততই দূরে সরে যায়, যেন এক পাখীর ডানায় শুয়ে সূর্য্যালোক পান করতে করতে উড়ে চলেছি। হাওয়া, হাওয়া, কি মিষ্টি সুন্দর হাওয়াতে জল দুলছে, হাওয়াতে তীরের কলাপাতা সুপারিপাতা সব কাঁপছে, হাওয়াতে আমার কাপড় উড়ছে, হাওয়াতে মেঘেরা ভেসে চলেছে, হাওয়াতে আমার মন দুলছে।

একটি ছোট চর—ধূসর বালির পাশে কচি ঘাসগুলি জেগে উঠেছে, মাঝে কতকগুলি কলাগাছ নারিকেল গাছের জড়ামড়ির মধ্যে কয়েকখানি কুঁড়েঘর—মনে হয় ওখানেই বুঝি শান্তি—হয় ত এবছর জেগে উঠেছে, আসছে বছর ডুবে যাবে, ওই কচি ঘাসগুলির ঝিকি-মিকি লক্ষ্মীর দেহের লাবণ্যের মত। চোখের ওপর স্বপ্নের মায়া জড়িয়ে আসছে।

বিকেল বেলা। সূর্য্য পশ্চিমে ঢলে পড়ছে, ডেকে পাশ দিয়ে রোদ এসে পড়ছে, তার প্রখর দীপ্তি, ক্লান্ত ক্ষুব্ধ চাউনি। গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে ষ্টিমার চলেছে, তার ঝক্‌ঝক্ শব্দে যেন ক্লান্তির সুর লেগেছে।

বাঁশ ঝাড়ের পেছনে সূর্য্য ঢলে পড়েছে, তার ক্লান্ত করুণ আলোয় আকাশ ভরা।

তাল নারিকেল গাছের আড়ালে সূর্য্য অস্ত গেল, ঘন সবুজের মাথায় রাঙা টিপের মত সন্ধ্যারাগ জ্বল্‌জ্বল্ করছে।

চারিদিকে স্নিগ্ধ অন্ধকার, বাতাস আদ্র হয়ে উঠছে, নদী যেন আরও স্থির। যুঁইফুলের মালার মত একদল বক উড়ে গেল। দূরে একটি গ্রামের আবছায়া, পল্লী-বধূরা জল নিয়ে চলে গেছে, ঘাট জনহীন, খেয়ার নৌকা শেষ পাড়ি দিচ্ছে, আকাশে একটি তারা ফুটে উঠেছে, বনের অন্ধকারে একটি আলো দেখা যাচ্ছে, আমরা এগিয়ে জল কেটে চলেছি।

অন্ধকার ঘন তুলি বুলিয়ে দুই তীরের সব গাছ এক করে দিচ্ছে, আর আমে জামে নারিকেল গাছে ভেদাভেদ নাই, এক মসীরেখা টানা, তার ধারে নদী স্থির কাচের পথের মত পড়ে রয়েছে।

একটা পথহারা পাখী ক্লান্ত ভাবে একা উড়ে চলে গেল, একটা নৌকা মিটিমিটি আলো জ্বালিয়ে ভেসে যাচ্ছে।

আর গ্রাম দেখা যাচ্ছে না, তীরের গাছের সারি দেখা যাচ্ছে না, আকাশ বন মাঠ গ্রাম সব এক হয়ে গেছে, আকাশের তারাদের তলে গ্রামের প্রদীপের আলো মিটিমিটি জ্বলছে

তরল অন্ধকার ঠেলে চলেছি, ইঞ্জিনের ঝক্‌ঝক্ শব্দ জলের কল্লোলধ্বনি অন্ধকার আকুল করে তুলছে, মাঝে মাঝে সার্চ্চলাইটের আলো সামনের অন্ধকারকে একটু ক্ষুব্ধ করে নিবিড়তর করে তুলছে। জোলো বাতাস বইছে।

অদূরে কতকগুলি আলোর ঝিকিমিকি, সার্চ্চলাইটে সহসা একটা জেটি, তুটো সাদা বাড়ী, কতকগুলি গাছের সারি উদ্ভাসিত হয়ে আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, আবার আলোর ধারায় দেখা গেল, ষ্টেসনের বাড়ী, রেলগাড়ীর একটু অংশ।

নীচে হৈ-চৈ পড়ে গেছে, তু' তিন মিনিটের মধ্যে ষ্টিমার ঘাটে গিয়ে পৌছবে, কলরব শোনা যাচ্ছে, ওরে মধু পুঁটলীটা বাঁধ্, ওরে রাধা বাক্সটা কৈ? ভোরের আলোয় যাত্রীদের যে কলরবের সুর শুনেছিলুম, সন্ধ্যার অন্ধকারে তা অন্যরকম লাগছে।

সহরের আবছায়া ম্লান হয়ে আসছে, সম্মুখে ঘাটের আলোর সারি জলজল করছে, পেছনে কৃষ্ণ অন্ধকারে জলের কল্লোলধ্বনি, জোলো বাতাসের দীর্ঘশ্বাস, আকাশে তারারা ভিড় করে আসছে।

১৩২৯।

পত্র

আধুনিক সাহিত্যের আর এক দিক

কল্যাণীয়াসু,

আধুনিক কিম্বা "অতি-আধুনিক সাহিত্যকে" অবলম্বন ক'রে মাস কয়েক যে তর্ক চলেছে তা' থেকে তিন জন সাহিত্য-স্রষ্টার মত জানার সুবিধা হ'ল।

সাহিত্যের উপর সত্যিকার দরদ থাকায় কেউ এমন কথা বল্লেন না যে সমাজের "কল্যাণের" জন্য আধুনিক-সাহিত্যিকদের কলম বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ক্।

অব্যাহত না হ'লে সৃষ্টি যে পঙ্গু হয়ে যায়!

রাজ-শক্তি কি জন-শক্তির সাহায্যে অকাল-বধের প্রস্তাব যদি কেউ ক'রে থাকেন তো বুঝতে হবে যে তাঁর মনটি সুস্থ নয়। সে ক্ষেত্রে তাঁকে ক্ষমাই করতে হবে

সাহিত্য কিছু আজ-কালের বস্তু নয়; আর চিরদিন সকল দেশে এক-ধারা ব'য়েও চ'লে আস্‌চে না।

জাতের উত্থান-পতনের সঙ্গেই তার ওঠা-পড়া; তাই সাহিত্যকে যে সংকীর্ণ ক'রে দেখ্‌তে চায়, সে ভুল করে; তাকে খাটো গণ্ডীর মধ্যে ধ'রে রাখার চেষ্টা তো ব্যর্থ হবেই; আর, একটা মাপ-কাটি দিয়ে তার সহজ-বুদ্ধিকে রোধ করতে যাওয়াটা নিশ্চয়ই বাতুলতা।

পৃথিবীর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের বয়সও বেড়েই চলেছে। তার অতীত-ইতিহাস নেই, এ কথাই বা কে বলবে? তাই সাহিত্য, মানুষের যুগ-যুগ ধ'রে কোন্ কাজে লেগে এসেছে, তা বলা একান্ত অসম্ভব নয়। একটু শান্ত-অবহিত হ'য়ে পর্য্যালোচনা ক'রলে, তার আর-একটা দিক মনের সাম্‌নে পরিষ্কার হ'য়ে ফুটে ওঠে।

কোন্ যুগেই পাঁচজনে পরামর্শ ক'রে সাহিত্যের পথ নির্দ্দেশ ক'রে দেয় নি।

কালিদাস সমালোচক দিঙ্‌-নাগাচার্য্যের পরামর্শ নিয়ে কি তাঁর হুকুম মত চলেন নি। ভবভূতির কাণের কাছে একজন পরামর্শ দেবার লোক ছিল ব'লে তো জানা নেই।

আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ কারুর উপদেশ মেনে চ'লেছেন ব'লেও তো মনে হয় না।

আর শরৎচন্দ্র? তাঁর কথা ছেড়েই দেও, তিনি তো মা-সরস্বতীর "বয়াটে-ছেলে।"

যাঁরা সত্যিকারের সৃষ্টি করতে বসেন তাঁদের লোকের উপদেশ-পরামর্শের বড় একটা প্রয়োজন হয় না।

এই সৃষ্টির কাজটাও হাটে-বাজারে ব'সে চল্‌তে থাকে না। স্রষ্টা যিনি, তিনি নিজের সঙ্গে বোঝা-পড়া ক'রে একান্ত নিভৃতে, সকলের অজ্ঞাতেই কাজটা সম্পন্ন করতে থাকেন।

সমালোচকের সৌন্দর্য্য-বোধ, কি পণ্ডিতের ভাষা-জ্ঞান—সেগুলো সাহিত্যের সম্পদ হ'তে পারে; কিন্তু স্রষ্টাকে নিজের পুঁজির উপরেই একান্ত-ভাবে নির্ভর ক'রতে হয়।

তা'ছাড়া আর একটা কথা মনে আসে, সাহিত্য-স্রষ্টা ভাবে-চিন্তায়, রস-বোধে সর্ব্ব-সাধারণ থেকে কিছু এগিয়েই বোধ হয় চ'লতে থাকেন।

তার ফলে, আরম্ভে সাধারণের সঙ্গে তাঁর একটা গর-মিলের সুর বেজে ওঠে; তখন তীব্র-সমালোচনা; হৈ-হৈ, রৈ-রৈ!

দিন কতক পরে সে-সব থিতিয়ে গিয়ে সাধারণই আবার তাঁর জয়-গান করতে থাকে।

যে-সব স্রষ্টার দেয় মেকি কি গিল্টি নয়, তাঁরা এই সব হট্টগোলে বিচলিত না হয়ে নিজের কাজ তদ্গত-চিত্তে ক'রে যেতে থাকেন।

সাহিত্যের আর-একটা দিকের কথা বলেছি সেটা যে কি, তা' আরো বিশদ ক'রেই এখানে বলি:—

সকল দেশের সাহিত্যেই প্রেমের অবিসম্বাদ প্রতিষ্ঠা আছে। এর প্রত্যবায় কোথাও দেখেছি ব'লে জানিনে।

মানুষকে ঠিক ক'রে বুঝতে হ'লে, তার দৈনন্দিন কার্য্য-কলাপের গতির দিক নির্ণয় ক'রতে গেলে তার হৃদয়ের এদিকের অনুসন্ধানটা একান্ত প্রয়োজন।

শাস্ত্র-অবহিত হ'য়ে মানুষের বিচার, তাকে মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা দানের বাস্তবিক চেষ্টা—সাহিত্যের একটা বড় দিক।

সাহিত্য-পরিমণ্ডলের মধ্যে বিচরণ করার সময়ে এর উপলব্ধি আমাদের ঘটে, এর সম্ভোগ মানুষের সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণের অন্যতম কারণ; কিন্তু আমাদের "ব্যবহারিক-জীবনে,"—সমাজের কারখানা-ঘরে এ বিষয়ে সামাজিক মানুষের প্রগাঢ় ঔদাসীন্যটাই দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

একটা দৃষ্টান্ত দি:—

সাবিত্রীর উপাখ্যান তো সবাই জানে রাজ-কন্যা সাবিত্রী কাঠুরে সত্যবানের প্রেমে প'ড়লেন। অবশ্য সেটা তাঁর পিতার ভাল লাগেনি; আজ পর্য্যন্ত, কোন পিতার লাগেনা। কেননা, নিজেদের জীবনে যাই-না-কেন ঘটুক, পুত্র-কন্যার সম্পর্কে পিতামাতারা প্রেমের এমন সব উচ্ছ্বাস-ঘটিত উপসর্গগুলো মোটেই বরদাস্ত ক'রতে পারেন না।

সাবিত্রীর বিপদের উপর বিপদ হ'ল, ত্রিকালজ্ঞ দেবর্ষি নারদ এসে বল্লেন, সর্ব্বনাশ! সত্যবান? আরে ও-তো বিয়ের বছর পার-না-হ'তেই মারা যাবে।

নারদ সাবিত্রীকে ডেকে বল্লেন, ছি ছি মা, এ-কাজ তুমি কিছুতেই ক'রতে পাবে না......জেনে-শুনে বৈধব্যকে কে বরণ ক'রে নেয়?

সাবিত্রী কিন্তু অচল-অটল। বল্লেন, সে-কেমন ক'রে

হয়? আমি যে সত্যবানকে প্রাণ মন সমর্পণ ক'রে ব'সেছি! এখন অন্য পুরুষের কথা মনে স্থান দেওয়া যে পাপ!

অবশেষে প্রেমের জয়-জয়কার! মরা-মানুষ জ্যান্ত হ'য়ে উঠ্‌লো।

সাবিত্রী-ব্রত হিন্দু-ঘরের মেয়েরা নিষ্ঠার সঙ্গে আজও ক'রে থাকেন। আসল বস্তুটি বাদ দিয়ে অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি হয় না!

সাবিত্রী উপাখ্যানের আসল-মর্ম্মটি আমরা হারিয়ে ব'সেছি!

সাহিত্য আর সমাজের মধ্যে বিচ্ছেদের লাইনটি প্রণিধান-যোগ্য নয় কি?

বিষয়ী-মানুষ কবির কাব্যকে দূরে থেকে প্রণাম ক'রে বলে, ওর প্রয়োজন বাস্তব-জীবনে নেই; ওটা মনের বিলাস-মাত্র!

তেমনি, সমাজও আজ পর্য্যন্ত প্রেমকে বাতিল ক'রে দিয়ে আস্‌চে না কি? তা না হ'লে অত বড় যোগ্য-পাত্র হ'য়েও অর্জ্জুন বেচারির সুভদ্রা-হরণের অখ্যাতি অর্জ্জন ক'রতেই বা হবে কেন? আর সংযুক্তাকেই বা মৃন্মূর্ত্তির গলায় মালা দিতে হয় কেন?

এটা একটা মনের সহজ-তত্ত্বের কথা, আমি যাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে ক'রে পূজো ক'রছি, তুমি যদি তাকে অবজ্ঞা-ভরে পায়ে দ'লে চ'লে যাওতো তখুনি তোমাতে-আমাতে লাঠালাঠি বেধে যায়।

ঠিক এই ব্যাপার নিয়ে সাহিত্য আর সমাজের মধ্যে একটা লাঠা-লাঠির সম্বন্ধ আবহমান কাল থেকে চ'লে আস্‌চে।

বোধ করি রান্নাঘর আর বৈঠকখানার বিরোধের মূল কারণ এম্‌নি একটা কোন গূঢ় ব্যাপারের মধ্যে নিহিত আছে!

সাহিত্য এতদিন ব'লেছে যে নর-নারীর সম্বন্ধ যদি প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তো সেটাই আদর্শ-মিলন। "ব্যবহারিক-প্রয়োজনের" মিলন নিকৃষ্ট, মানুষকে তা শিব-সুন্দর করে না। সেটা একান্ত সুলভ—জীব-জগৎ জুড়ে চারিদিকে ছড়িয়ে র'য়েছে

এখন, আপনি এসে প'ড়ে দুটো দিক। একটি প্রেমের সাফল্যের দিক আর অপরটি বিফলতার দিক কল্পনার তুলিতে উজ্জ্বল ক'রে এঁকে গেছেন, সাফল্যের দিকটা যুগ-যুগান্তর ধ'রে বহু বহু কবি। তার ফলে আমরা পেয়েছি দুষ্মন্ত-শকুন্তলা, রাম-সীতা ইত্যাদি।

এ দিকের কথা বেশী বলার দরকার নেই। তবে একটা কথা মনে হয়, এই সব চিত্ত-হারী চিত্র পাঠকের মনকে অনেকখানি অবাস্তবের মধ্যে নিয়ে গেছে। রাম-সীতাকে তো আমরা দেবত্ব দান ক'রেছি। তাঁদের প্রেম সাধারণের অধিগম্য নয়, ক্ষুদ্র মানব-মানবীর ও-সবের আকাঙ্ক্ষাও ক'রতে নেই—এমনি একটা ধারণাই যেন আমাদের মন অধিকার ক'রে বসেছে।

বাস্তব জীবনে আদর্শ প্রেমের স্থান নেই মনে ক'রে মানুষ নিজের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে বনি-বনাও ক'রেই চ'লে আস্‌ছিল; কিন্তু এমন একদিন এলো যখন কল্পনার কল্প-লোক নিয়ে মানুষ আর কিছুতেই তৃপ্ত থাক্‌তে পারলো না! তখনই মানুষের চৈতন্য-মনকে ঘন-ঘন কাঁপিয়ে দিয়ে প্রশ্ন উঠ্‌লো, কেন? কেন? কেন?

সাহিত্য, কল্পনার কল্প-লোক ছেড়ে বিজ্ঞানের বাস্তবে এসে নাম্‌লে কবিরা হয়তো নারাজ হ'তে পারেন; কিন্তু যেখানে জীবনের তাগিদ র'য়েছে, যেখানে মনের ক্ষুধা তীব্র হ'য়েছে—সেখানে আর সহজে কেউ মাথা অবনত ক'রবে না।

একদিন ছিল যখন মানুষ সাহিত্যকে ইডন-গার্ডেন

মনে ক'রে সময়ে সময়ে তার ফাঁকা হাওয়াতে খানিকটা বেড়িয়ে আবার ব্যবহারিক জীবনের কোটরে ফিরে এসে ব'লতো,—এটা বিলাসিতা ; সব সময়ের জন্য তো নয়!

সেকালের বাড়ি-গুলো দেখনি? আব্রুর জন্যে, পর্দ্দার আড়ালে মানুষ "গবাক্ষ" বানিয়ে অন্ধকারের রাজ্যে প্যাঁচা-পক্ষীটির মত জীবন-যাপন ক'রে আত্ম-শ্লাঘায় মশ্‌গুল থাক্‌তো!

আর আজকাল? সে আব্রু নেই, পর্দ্দা নেই! ঘর-গুলোতে সাত আট ফুটের জান্‌লা ব'সে গেছে! সে কেন? ঐ মুক্ত আকাশ আর বাতাসকে ঘরে এনে বিজ্ঞানের পরামর্শে মানুষ সুস্থ থাক্‌তে চায় ব'লে।

এর জন্যও কি বিজ্ঞান দোষী? •

বিজ্ঞানের দোষই বল আর গুণই বল, সে কল্পনার কল্প-লোকে রাজপুত্রের মত পক্ষীরাজ চ'ড়ে বেড়াতে পারে না। সে বাস্তবকে সুন্দর ক'রে কল্প-লোক বানিয়ে তুলতে চায়।

আমাদের সাহিত্যে যদি বিজ্ঞানের সন্দেহ, প্রশ্ন, অন্বেষণ, আহরণ, পর্য্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণ এসে থাকে তো ভালই হ'য়েছে।

আধুনিক সাহিত্য যদি এই কথা বলে যে প্রেমকে বর্জ্জন ক'রলে জীবনটা নোংরা হ'য়ে যায় তো সে তো খুব বড় সত্যই ব'লছে! এই বল্‌তে গিয়ে যদি নোংরা ছবি ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজন হ'য়ে থাকে তো সেটা সেই "নিত্য-চিরন্তন" কে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই।

মানুষের জীবনে খাওয়া-শোয়ার মত ব্যবহারিক ব্যাপারের মধ্যে আধুনিক সাহিত্য যদি রস অন্বেষণ ক'রে থাকে তো বুঝবো যে আমাদের সত্যের ক্ষুধা জেগেছে—আমরা আর শিব-সুন্দরকে কল্পনার বাসর ঘরে বসিয়ে রেখে অলীকের গান শুনিয়ে তৃপ্ত থাক্‌তে পার্‌ছিনে!

১০ই কার্ত্তিক, ১৩৩৪।

মণিবজ্র ভারতী

বিচিত্রা
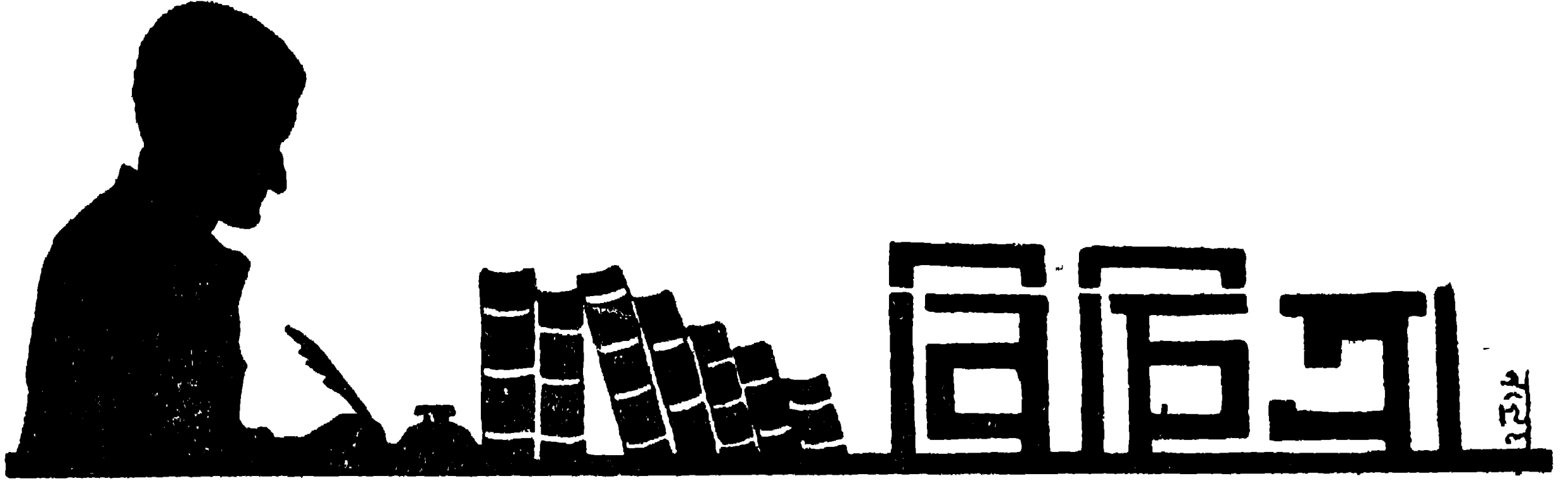
ভারতবাসী স্বায়ত্বশাসনের যোগ্য হইয়াছে কিনা, বা কতখানি যোগ্য হইয়াছে, তাহার পরীক্ষা গ্রহণ করিতে রয়াল কমিশন বসিতেছে। মণ্টেগু রিফর্মের মধ্যে এই রয়াল কমিশনের কথা আছে। ভারতবাসীকে সংস্কার আইনের মারফতে অধিকারের যে হাতিয়ারগুলি দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি ভারতবাসীর উপর কি ভাবে প্রযুক্ত হইয়া কি ফল ফলাইয়াছে, এবং স্বায়ত্বশাসনের আর কতখানি পাওয়ার উপযুক্ত ভারতবাসী ইতিমধ্যে (অর্থাৎ ১৯২৯ সালের মধ্যে) হইয়াছে, তাহার পরীক্ষা রয়াল কমিশন লইবেন এবং কমিশনের কথানুযায়ী কাজ হইবে। ভারতবাসী মণ্টেগু শাসন-সংস্কারের মাকালে তুষ্ট হয় নাই, ভারতের জননেতারা এই অকেজো শাসন-সংস্কারের বিরুদ্ধে অনেক আন্দোলন করিয়াছেন। রয়াল কমিশন না বসিলে ইহার আর রদ-বদল নাই, এই কথা বলিয়া কনষ্টিটিউশনের ভক্তরা ভারতবাসীদের দাবীর উত্তর দিয়াছেন। যাহাই হউক এবার রয়াল কমিশন বসাইবার আয়োজন চলিতেছে। রয়াল কমিশনে কে কে বসিবেন —কে সভাপতিত্ব করিবেন, তাহাও ঠিক হইয়া গিয়াছে।

রয়াল কমিশন কেমন ধারার হইবে, তাহা বল্ডুইন্ সাহেবের গবর্ণমেণ্ট ঠিক করিয়া দিয়াছেন। এই কমিশনে কোন ভারতবাসীর বালাই নাই। কমিশনে কোন ভারতবাসী নাই বলিয়া ভারতবাসীরা কমিশন বয়কট করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। মিঃ বল্ডুইন্ কেন যে অর্থাৎ কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে ভারতবাসীদের কমিশনের সদস্য করেন নাই—তাহাও সম্প্রতি বক্তৃতায় জানাইয়াছেন। সেই মহৎ উদ্দেশ্য এই, ভারতে যে-সব ইউরোপীয় আছে, তাদেরও যেমন কমিশনে নেওয়া হয় নাই, ভারতীয়দেরও তেমনি আনা হয় নাই। ভারতীয়-দের সঙ্গে ভারতবাসী ইউরোপীয়দের স্বার্থের সংঘাত হওয়া সম্ভব—তা ছাড়া ভারতীয়দের মধ্যেও বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীতে মত ও স্বার্থভেদ সম্ভব—সুতরাং ভারতবাসীদের যোগ্যতা বিচারে, এবং কি ভাবে যোগ্যতার পুরস্কার দেওয়া যায়, সেই সিদ্ধান্ত একেবারে নিরপেক্ষ খাস্ পার্লামেণ্ট কর্তৃক নিয়োজিত কমিশনই ভাল করিতে পারিবেন—ভারতীয়রা পারিবে না। এ যুক্তি খণ্ডন করার শক্তি আমাদের কৈ? কারণ কর্তাদের কথার মর্ম না বুঝিতে পারিলেও তাহা শুনিতে যখন আমরা বাধ্য তখন এই সকল যুক্তি খণ্ডন করিতে বাক্যপ্রয়োগ বাতুলতা বলিয়াই ভারতবাসীরা ক্রমে ক্রমে তাহা ছাড়িয়া দিতেছে।

রয়াল কমিশনে সাক্ষ্য দিতে যাওয়া কোনও মর্য্যাদা-জ্ঞানসম্পন্ন ভারতবাসীর সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

তাহা এই জন্যই কেবল নহে যে তাহাতে ভারতবাসী নাই। তাহা এই জন্য যে ভারতবাসী স্বায়ত্বশাসনের যোগ্য কিনা, সেই বিচার করার সত্যকার অধিকার ব্রিটিশ পার্লামেণ্টেরও নাই।

নিজের দেশের শাসনাধিকার লাভের অধিকার প্রত্যেক জাতিরই আছে; বিদেশী একটা জাতির কোনও সময়েই এই অধিকার জন্মায় না যখন সে ন্যায়সঙ্গত ভাবে বলিতে পারে তোমার দেশ শাসন করার অধিকার তোমার নাই। ভারতবাসীর স্বায়ত্বশাসনের অধিকার আছে কিনা, সে কথা পরে না হয় বিচার করা যাইবে, কিন্তু একটি বিদেশী জাতি ভারতবাসীকে শাসন করার অধিকারী এত বড় মিথ্যা উক্তি ভারতবাসীরা সহ্য করে বলিয়াই কিছু সত্য নহে। ভারতবাসী যদি ভারত শাসনের যোগ্য না হয়, তুমি ইংরেজ আরও অযোগ্য। যাক্ সে কথা। যে ভারতবাসী এতদিন বলিয়া আসিতেছে, স্বরাজ ও স্বায়ত্বশাসন লাভের সময় আমাদের উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, স্বরাজের দাবী আমাদের পূর্ণ কর, তাহারা আর নূতন করিয়া যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে পারে না। যে জাতি যত অধঃপতিত দুর্ব্বলই হউক সে জাতি নিজে যদি মনে করে সে স্বরাজ লাভের যোগ্য, সে নিজে যদি স্বরাজ চায় তবেই তাহার চরম পরীক্ষা দেওয়া হয়, তাহার উপরে বিজেতা জাতি যে পরীক্ষা লইতে চাহেন তাহা জুলুম।—এই জুলুম বন্ধ করার উপায় ভারতবাসীর হয়ত নাই; কিন্তু জুলুমকে বরণ করা, সাহায্য করা তাহার আত্মমর্য্যাদায় আঘাত করার কথা।

একটা জাতি যে যে কারণে পরাধীন হয়, তাহা আমরা জানি। কিন্তু একটা জাতি যতই অযোগ্য হউক তাহাকে শাসন করিবার ন্যায়সঙ্গত দাবী আর কোন জাতির জন্মায় না। ভারতবাসী ইহা জানে যে, সে যত বড় অযোগ্যই হউক, নিজের দেশ শাসন করিবার যোগ্যতা তাহার প্রত্যেক ইংরেজের চাইতেই বেশী আছে।—একশত সত্তর বছর ইংরেজের সুশাসনে থাকিয়া তাহার যে হাল হইয়াছে, অযোগ্য ভারতবাসীর অযোগ্য স্বায়ত্বশাসন দ্বারা তেমন হওয়া সম্ভব ছিল না। আমরা আমাদের শত দুর্ব্বলতা লইয়াও স্বায়ত্ব-শাসন চাই, কারণ আমরা জানি, ইহাই জাতির গোড়ার অধিকার। এই অধিকার গেলেই জাতি মানুষ হইয়া উঠিবার সমস্ত সুযোগ, সুবিধা ও অধিকারই খোয়ায়। এই অধিকার পাইয়া যদি আমাদের সর্ব্বনাশ হয় হউক, তোমাদের মাথা নাই ঘামিল। কিন্তু ইংরেজের মাথা যে ঘামিবেই! তাই আমরা যে যোগ্য নই তাহা প্রমাণ করিতে তার গরজের অন্ত নাই। এ কথা সকলেই জানে, নাবালক আমরাও জানি, আমরা যোগ্য নই, আমাদের শাসন করিবার অতি সাত্বিক ভগবৎদত্ত অধিকার যে কেবলমাত্র তাহারই আছে তাহা প্রমাণ করিবার প্রধান ঔষধটি তাহারই হাতে, সুতরাং সেই যুক্তির সেরা সেই প্রতিষেধকটি যত দিন আছে, ততদিন আমরা পুত্রাদিক্রমে অযোগ্য থাকিতে বাধ্য।

তবে যে দৈন্য বাধ্য হইয়া মাথা পাতিয়া বহন করি, তাহা গৌরব বলিয়া ভুল করিব না। আমরা স্বরাজ লাভের যোগ্য কিনা, তাহার চরম মীমাংসা করিব আমরা ভারতবাসী। আমাদের যোগ্যতার পরীক্ষা যদি অপরে লইতে আসে তবে তেমন পরীক্ষায় হাজিরা দিয়া বিদেশীর পরীক্ষা গ্রহণের অধিকার সাব্যস্ত করিব না।

রয়াল কমিশনের মূল নীতিই মানিয়া লওয়া চলে না

তবে উপায়হীন আমাদের অনেক কিছুই মানিতে হইয়াছে। তেমনি রয়াল কমিশনে যদি ভারতের প্রতিনিধিরা স্থান পাইতেন তাহা হইলেও মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াও রয়াল কমিশনের সহায়তা জননেতারা হয়ত করিতেন, কারণ জাতীয় স্বাধীনতার জ্ঞানের মর্য্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, কোথাও আপোষ না করিয়া আমাদের কম নেতারাই চলেন।—কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতীয়দের কমিশনের মধ্যে স্থান দেওয়াও প্রয়োজন বোধ করেন নাই। আমাদের নেতারা ও কাগজওয়ালারা কমিশন বয়কট ঘোষণা করিতেছেন। কমিশন বয়কটের কাজ এ নহে। কমিশন ত তুচ্ছ কথাই। যদি পার ব্রিটিশ পণ্য সম্পূর্ণ বর্জ্জনের বিপুল আন্দোলন চালাও। আহত জাতীয় মর্য্যাদা স্বদেশীযুগের মত তেমন করিয়া গর্জ্জিয়া উঠুক। কমিশনে সাক্ষ্য দেওয়া না দেওয়া খুবই তুচ্ছ কথা, বড় কথা সম্পূর্ণ পণ্যবর্জ্জন। আত্মকলহ ত্যাগ করিয়া নেতারা যদি ঐক্যবদ্ধ হইতে পারেন—কিছুই অসম্ভব নহে। বাংলা সেই বাংলাই আছে।

* * *

কলিকাতায় য়ুনিটি কনফারেন্স হইয়া গিয়াছে। আমরা বরাবর বলিয়াছি, সিদ্ধান্তে হেঁয়ালী রাখা চলিবে না। বাজনা বাজিবে কি বাজিবে না, গো-জবাই চলিবে কি চলিবে না, তাহার স্পষ্ট মীমাংসা চাই। আর সেই মীমাংসা করিতে হইবে, ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারত তাহার প্রত্যেক নাগরিককে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে যে সমান অধিকার দিবে, সেই অধিকারের ভিত্তির উপর। রাস্তায় যদি সব চলিতে পারে, হিন্দুও বাজনা বাজাইয়া যাইতে পারিবে। গরু যদি মুসলমান কাটিতে চাহে হিন্দুর বাধা দেওয়া তাহাতে চলিবে না। হিন্দু যদি মহিষ কাটিতে পারে, মুসলমানের গো-জবাইএর অধিকার নিশ্চিতই আছে। তবে মহিষ কাটিতেও হিন্দুকে যেমন আইন কানুনের বাধা-নিষেধ মানিতে হয় মুসলমানকেও গরু কাটিতে সেই বিধি-নিষেধ মানিতে হইবে। তবে গো-পালক মুসলমান এই অধিকার পাইয়াই অমনি গরু কাটিতে সুরু করিবে না, কারণ গরু কাটা অর্থই যে তাহার গলা কাটা এই সত্য মুসলমানই আগে বুঝিবে। তেমনি হিন্দুও অধিকার আছে বলিয়াই কিছু দিনরাত রাস্তায় ঢাক ঢোল বাজাইবে না। মানুষের জীবনসমস্যায় মসজিদ বাজনা ও গরু ছাড়া বহু বস্তু আছে। হিন্দু মুসলমান জনসাধারণ অধিক দিন কলহ করিবে না এই বিশ্বাস আমাদের আছে, সাম্প্রদায়িক গোঁড়াদের কাল বেশী দিন নাই।

শ্রী নলিনীকিশোর গুহ

শ্রী শিশিরকুমার নিয়োগী কর্ত্তৃক, ১এ, রামকিষণ দাসের লেন, নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস হইতে মুদ্রিত ও বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

চিত্রকর :—ই, এইচ, ব্লাসফিল্ড।

কালি-কলম

২য় বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ [৮ম সংখ্যা

অশ্লীল ও অসুন্দর

শ্রী নলিনীকান্ত গুপ্ত

শিল্পে অশ্লীলের স্থান আছে, কিন্তু অসুন্দরের স্থান নাই।

অশ্লীল ও অসুন্দর এক জিনিষ নয়—শ্লীল আর সুন্দরও এক জিনিষ নয়।

মানুষের মধ্যে যে পশু আছে, তাহাকে রাখিয়া ঢাকিয়া চলা সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ; ইহারই নাম শ্লীলতা। আর এই পশুকে বে-আবরু করিয়া ধরার নামই অশ্লীলতা।

সভ্য সমাজেও কোথাও কোন ক্ষেত্রে পশুকে বে-আবরু করিয়া ধরিবার প্রয়োজন বা সার্থকতা আদৌ আছে কি?

বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসার এই অধিকার আছে, বলা যায়—কিন্তু শিল্পীর আছে কি? সৌন্দর্য্য-রচনার দিক দিয়া অশ্লীলতা কোন্ উপকরণের যোগান দিতেছে?

* * *

পশুকে বে-আবরু করা, কথার কথা নয় কি? কারণ, সেই বে-আবরু যে কিসে হয় আর কিসে হয় না, তাহা লইয়া দেশে দেশে কালে কালে বিস্তর মতান্তর ও মনান্তর রহিয়াছে।

শ্লীলতা হইতেছে আচারগত ভব্যতা, সমাজে চলিত নিয়ম নিষ্ঠা। যাহা সামাজিক সংস্কার মাত্র সমাজ হিসাবে তাহার ব্যতিক্রম হইবেই। শ্লীল অশ্লীল আপেক্ষিক জিনিষ, তাহা নিত্য কিছু নয়।

শিল্পী অশ্লীল হইতে পারেন অর্থাৎ সামাজিক একটা সংস্কারকে, বিশেষ দেশের বিশেষ কালে প্রযুক্ত একটা ব্যবস্থাকে সমাজপতি যেমন সনাতন সত্য বলিয়া দেখেন তেমন না দেখিয়া, নেহাৎ আপেক্ষিক সত্যরূপেই দেখিতে পারেন, তাহার বিপরীত ব্যবস্থার মধ্যেও যে সত্য থাকিতে পারে তাহা দেখাইতে পারেন; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে অসুন্দর হইয়া পড়িবেন, এমন কথা নাই।

* * *

যাহা শ্লীল তাহা ভব্য, তাহা সুষ্ঠু (correct) হইতে পারে; কিন্তু এই হেতুই তাহাকে যে আবার সুন্দর বলিয়া অভিহিত করা হয়, তাহা সঙ্গত নয়।

পিউরিটানেরা (Puritans) সুষ্ঠুর ভব্যের শ্লীলের প্রতিমূর্ত্তি, কিন্তু সেই জন্য তাহাদের মধ্যে সুন্দরও যে আসিয়া ধরা দিয়াছে এমন প্রমাণ পাই না। ইতিহাস বলিতেছে উল্টা কথা—শ্লীলতাও যে অসুন্দরেরই বিগ্রহ হইতে পারে তাহার উদাহরণ পিউরিটান ইংলণ্ড।

আর অশ্লীল যে অসুন্দর হইবেই, এ কথা কত বড় মিথ্যা তাহার জাগ্রত প্রমাণ মহাকবি কালিদাস।

* *

*

অশ্লীল অসুন্দর হইয়া পড়ে কখন? বে-আবরুতার একটা বিশেষ ধাপে নামিয়া আসিলে? আমি তা মনে করি না। অশ্লীলের সাথে বে-আবরুতার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু অসুন্দরের সাথে নয়। চরম বে-আবরুতাও পরম সুন্দর হইতে পারে—দ্রষ্টার দেখার ভঙ্গীতে, শিল্পীর হাতের গুণে। আমি মনে করি অশ্লীল অসুন্দর হয় ঠিক সেই কারণেই যে কারণে শ্লীলও অসুন্দর হইয়া পড়ে।

শ্লীলতা অসুন্দর যখন শ্লীলতার অর্থ ছুঁৎ-ধর্ম্ম, রুচি-বাগীশতা, "উন্নাসিকতা" (priggishness)—অর্থাৎ বস্তুকে যখন তাহার সহজ স্বাভাবিক মর্য্যাদা দেই না, বিশ্বলীলায় তাহার যে ধর্ম্ম কর্ম্ম তাহা উপলব্ধি না করিয়া, সমগ্রের মধ্যে তাহার স্বস্থান হইতে কাটিয়া তুলিয়া আলাদা করিয়া দেখি, একটা কৃত্রিম মূল্য—কখনও অত্যধিক, কখনও অতি ন্যূন—তাহার উপর আরোপ করি। জিনিষ সুন্দর হইয়া উঠিতে থাকে যখন তাহাতে ধরা দেয় বিশ্ব-ছন্দের দোল, সৃষ্টির মহানন্দের একখানি হাসি। স্বভাবের বুকে সবই সুন্দর, অসুন্দর হইতেছে যাহা কৃত্রিম, যাহা কুটিল (perverse)।

শ্লীলতা অসুন্দর যখন তাহা কেবল বাহ্যিক ধোপ-দুরস্ত শুচিতা, যখন তাহা অন্তরের কোন সত্যের অভিব্যক্তি নয়। শুধু অসুন্দর কেন, শরীরটাকে সামলাইয়া ধরিবার অতিমাত্র চেষ্টায়, শ্লীলতা সময়ে সময়ে প্রায় অশ্লীলই হইয়া উঠে।

অন্তরের চিন্ময় আনন্দে যাহা উপলব্ধ সত্য নয়, তাহাকে যখন জোর করিয়া সত্য বলিয়া সাজাইতে বসি, তখনই অসুন্দরের সৃষ্টি—তাহা শ্লীলই হোক, অশ্লীলই হোক।

* *

*

কুৎসিতকে, ক্লেদকে যে আনন্দে ভরপুর হইয়া ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন, হে শিল্পী, তুমি অনুভব করিয়াছ কি সেই আনন্দ—তোমার সৃষ্টির পিছনে আছে সেই আনন্দ, সেই আনন্দের নিরিখ? তবেই তুমি সেই পরশ পাথর পাইয়াছ অসুন্দরকেও যাহা সুন্দর করিয়া তোলে।

দুঃশাসনের হাতে আবরু-হরণ অশ্লীল এবং অসুন্দর; শ্রীকৃষ্ণের হাতে আবরু-হরণ শ্লীল না হোক, পরম সুন্দর।

কবি বলিতেছেন, "অতি-অসুন্দরের সাথে জুড়িয়া দাও ভগবানকে, পাইবে অতি-সুন্দর। ফাঁসিকাঠে ভগবানকে যখন ঝুলাইয়া দিয়াছ তখনই তাহা হইয়া উঠিয়াছে 'ক্রশ'।"*

* "Attachez Dieu au gibet, vous avez la croix". (Victor Hugo)

চিত্রবহা

—পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর—

শ্রী সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৩০

মাধুরী

লীলা বলিল, দাদা, আমি একটা গান শিখেছি।

অমর জিজ্ঞাসা করিল, কি গান?

লীলা বলিল, অমল ধবল পালে লেগেছে···

অমর বলিল, গা' দেখি।

লীলা গাহিতে সুরু করিল। অমরও তার সঙ্গে যোগ দিল। গান শেষ হইলে লীলা অবাক হইয়া বলিল, তুমি এ গান জানো?

অমর বলিল, জানি।

লীলা বলিল, তুমি কি স-অ-ব জানো?

অমর হাসিল। কহিল, কেন বল্ দেখি?

লীলা বলিল, যা জিজ্ঞেস করি তুমি ত সমস্ত বুঝিয়ে দাও। ক-কৃ-থ-নো জানি না বল না।

প্রগল্‌ভা ভগ্নীর মাথাটা নাড়িয়া দিয়া অমর বলিল, আমি যে তোর চেয়ে ঢের বড়। জানবো না? তারপর জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, ঐ গানটা কার লেখা বল্ ত।

লীলা বলিল, তা'ত জানি না। কার লেখা দাদা?

অমর বলিল, রবিবাবুর।

লীলা জিজ্ঞাসা করিল, রবিবাবু? কে তিনি?

অমর বলিল, কবি।

লীলা বলিল, অ, তিনিও তোমার মত কবিতা লেখেন্?

অমর হাসিল। বলিল, তাঁর মত কবিতা আজকাল জগতে কেউ লিখতে পারে না।

লীলা সম্প্রতি ভূগোল পড়িতে সুরু করিয়াছিল। সে সবিস্ময়ে বলিল, উঃ! তাহলে এসিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, কোথাও কেউ তাঁর মত পারে না?

অমর বলিল, না।

এই সংবাদে লীলা স্তব্ধ হইয়া বোধ করি রবিবাবুর অসীম শক্তির একটা ধারণা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

তার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া অমর জিজ্ঞাসা করিল, গানটার মানে বুঝেছিস?

লীলা যেন আকাশ হইতে পড়িল। গানের আবার মানে থাকে না কি?

অমর বলিল, মানে থাকে না?

লীলা বলিল, আমি ত মানে জানি না, মাধুরী-দি ত বুঝিয়ে দেননি!

অমর জিজ্ঞাসা করিল, মাধুরী-দি আবার কে?

লীলা ত অবাক। মাধুরী-দি কে জানো না? তাঁর কাছেই ত গান শিখেছি। তিনি আমায় খুব ভালবাসেন! ফার্ষ্টক্লাশে পড়েন, জানো দাদা? তার ওপর ইস্কুলে আর ক্লাশ নেই।

অমর গানের অর্থ লীলাকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিল। তারপর বলিল, এটা শরতের গান।

লীলা জিজ্ঞাসা করিল, শরৎ কি?

অমর তখন ষড়ঋতুর নাম ও রূপের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইল।

সনাতনীর কবল হইতে লীলাকে উদ্ধার করিয়া অমর

তার শিক্ষার সম্পূর্ণ ভার লইয়াছিল। সে এখন ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ে। এই নূতন ব্যবস্থা চন্দ্রবাবু সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছিলেন। বাঙালীকে বাঁচিতে হইলে তার মডার্ন্ আইডিয়াস্ গ্রহণ করা অপরিহার্য্য ইহাই তাঁর বিশ্বাস। মান্ধাতার যুগের নিরর্থক নিয়ম আঁকড়িয়া থাকিলে চলিবে না! অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা দরকার! বলেন, মেয়েদের মুখ্যু করে' ঘরের কোণে রেখে রেখে আমরা তাদের একদম জড়ভরত অপদার্থ করে' ফেলেছি— আর কোনো যোগ্যতা নেই, পারবার মধ্যে তারা পারে কেবল কথায় কথায় পা ছড়িয়ে কাঁদতে! ছেলেদেরই মত তাদের লিখিয়ে পড়িয়ে শক্ত হতে শেখাতে হবে! যে-দিন তারা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সংসার চালাতে পারবে, সেদিন আর তারা আমাদের কাঁধের বোঝার মত হয়ে থাকবে না, সেদিন দেশের পনেরো আনা অভাব আর কষ্ট চলে' যাবে! এই ধরোনা যে টাকাটা পণ দিয়ে স্বকুর বিয়ে দিয়েছি সে-টাকা খরচ করে' তাকে যদি লেখা পড়া শেখাতুম তাহলে তার এমন দুর্দ্দশা হ'ত কি? নিশ্চয় সে সুখী হতে পারতো! তোমার মা কেবল পেড়াপিড়ী করে'…কাসেড্‌নেস অফ উইমেন,…বোঝই ত!

মেয়েদের শিক্ষা কেমন হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে অমরের ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল। লীলাকে নিজের আদর্শে গড়িয়া তুলিতে পারিবে ভাবিয়া তার আনন্দের সীমা ছিল না। প্রথম প্রথম দেশে ফিরিয়া যে হতাশার ভারে তার মন অহরহ পীড়িত হইত, হাতে মনের-মত একটা কাজ পাইয়া তার তীব্রতা অনেকটা কমিয়া গেল, এমন কি ওহানার বিরহ-বেদনাটাও কতকটা সহনীয় হইয়া উঠিল।

লীলা একদিন বলিল, দাদা! শনিবার আমাদের প্রাইজ, তোমায় যেতে হবে, কার্ড এনেছি। গান বাজনা, রেসিটেসন, এ্যাক্টিং, এই সব হবে। মাধুরী-দি রেসিটেসন করবেন। রোজ রিহার্সাল হচ্ছে।

অমর বলিল, মাধুরী-দি'র সঙ্গে তোর খুব ভাব বুঝি? সব সময় তাঁর কথা বলিস!

লীলা বলিল, উঃ খুব ভাব, ভ-য়-ঙ্ক-র ভাব!

অমর হাসিতে লাগিল। ভয়ঙ্কর ভাব? তাই না কি রে?

লীলা বলিল, জানো দাদা, মাধুরী-দি বলছিলেন তোমার লেখা তাঁর খুব ভালো লাগে। তিনি তোমার সব লেখা পড়েছেন।

অমর জিজ্ঞাসা করিল, তোর মাধুরী-দি কী রিসাইট করবেন?

লীলা বলিল, গোড়ার লাইনটা খালি মনে আছে—

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত
মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে
একদা ছিলেন সুপ্ত;—

লীলা থামিতেই অমর বলিতে লাগিল,

নগরীর দীপ নিবিছে পবনে,
দুয়ার রুদ্ধ পৌরভবনে,
নিশীথের তারা শ্রাবণ গগনে
ঘন মেঘে অবলুপ্ত।
কাহার নূপুরশিঞ্জিত পদ
সহসা বাজিল বক্ষে!
সন্ন্যাসীবর চমকি জাগিল,
স্বপ্নজড়িমা পলকে ভাগিল,
রূঢ় দীপের আলোক লাগিল
ক্ষমা-সুন্দর চক্ষে।
নগরীর নটী চলে অভিসারে
যৌবনমদে মত্তা।
অঙ্গে আঁচল সুনীলবরণ,
রুনুঝুনু রবে বাজে আভরণ;
সন্ন্যাসী-গায়ে পড়িতে চরণ,
থামিল বাসবদত্তা। *

লীলা উৎসাহে হাততালি দিয়া উঠিল। বলিল, উঃ

* রবীন্দ্রনাথ।

তুমি কি সুন্দর রেসিটেসন করো দাদা? আমাদের ইস্কুলের মেয়েদের যদি শোনাতে পারতুম!

প্রাইজের দিন সকাল বেলা লীলা যখন শুনিল অমর বিকালে টেনিসম্যাচ দেখিতে যাইবে, তাহাদের প্রাইজ দেখিতে নয়, তখন সে কাঁদিয়া কাটিয়া সোরগোল বাধাইয়া দিল। বা রে! আমি যে মাধুরী-দি'কে বলে' রাখলুম তুমি যাবে, তোমার সঙ্গে তাঁর ভাব করিয়ে দোব! তুমি সেদিন কেন বল্লে যাবে? এখন আমি কি করবো? বেশ, তাহলে আমিও যাব না, আমি বাড়িতে বসে' থাকবো, গাড়ি এলে ফিরিয়ে দোব'খন!

অগত্যা অমর হার মানিল। বলিল, আচ্ছা বাপু, যাবো যাবো! আর কাঁদতে হবে না, চুপ কর্!

লীলার মুখে হাসি ফুটিল, কিন্তু তাব চোখ দিয়া তখনো জল গড়াইতেছিল।

প্রাইজ শেষ হইয়াছে। অভ্যাগতেরা বিদায় লইতেছে। মেয়েরা ইতস্তত দলে দলে দাঁড়াইয়া আনন্দিত কলগুঞ্জনে হল মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল।

আজিকার উৎসব অমরের ভারি ভালো লাগিয়াছে। এই যে শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী মেয়ের মেলা, তাহাদের সুরুচি-সঙ্গত সুন্দর বেশভূষা, মার্জ্জিত মুখশ্রী, গীতবাদ্য আবৃত্তির এই উৎকর্ষ দেশে একান্ত দুর্লভ। প্রবাস-জীবনের কথা তার মনে পড়িতেছিল, যখন প্রভাতে ও অপরাহ্ণে বিদ্যার্থী নরনারীর আনাগোনায় পথ সজীব হইয়া উঠিত। আর মনে পড়িতেছিল সেখানকার উৎসবের সমারোহ—নারীর আনন্দ ও সৌন্দর্য্যই ছিল যার প্রাণ। তার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া সহসা লীলা ছুটিয়া আসিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে তার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে একটি মেয়ের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। সে যে মাধুরী· অনুমানে তাহা বুঝিয়া অমর নমস্কার করিল।

মৃদু হাসিয়া প্রতি-নমস্কার করিয়া মাধুরী কহিল, লীলার মুখে আপনার আলোচনা এত শুনেছি যে আপনাকে ঠিক অচেনা বলা চলে না! চাক্ষুষ পরিচয় অবশ্য এই প্রথম! ও ত দাদা বলতে অজ্ঞান! বলিয়া সস্নেহে লীলাকে কাছে টানিয়া লইয়া তার বিনুনিটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

অমর বলিল, খালি দাদা বলতেই অজ্ঞান নয়, আপনার সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা খাটে! সেদিন বলছিল মাধুরী-দি'কে ও ভ-য়-ঙ্ক-র ভালবাসে!

মাধুরী একটু লজ্জিত হাসি হাসিয়া লীলার উদ্দেশে বলিল, খুব বাজে বকিস বুঝি বাড়িতে গিয়ে?

অমর বলিল, আপনার রেসিটেসন খুব ভালো লাগলো!

নিকটেই একখানা চেয়ারের উপর মাধুরীর প্রাইজের বই ও মেডেল দেখিয়া সেই দিকে ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, দেখতে পারি কি?

মাধুরী বলিল, নিশ্চয়। বলিয়া প্রাইজগুলি একে একে অমরের হাতে তুলিয়া দিতে লাগিল।

দৃশ্যটি মাধুরীর সহপাঠিনীদের দৃষ্টি এড়াইল না। অদূরে দাঁড়াইয়া বক্রচোখে ব্যাপারটা লক্ষ্য করিয়া মৃদু হাস্যে অস্ফুট স্বরে তারা যে-সব মন্তব্য করিতে লাগিল তাহা শুনিতে পাইলে অমর খুসি হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু সেদিকে তার মন ছিল না।

বিদায়ের সময় মাধুরী অমরকে বলিল, লীলাকে নিয়ে একদিন আমাদের বাড়ি আসবেন। বাবার সঙ্গে আপনার খুব বনবে। তিনিও আপনার মত অষ্টপ্রহর বই নিয়ে বসে' থাকেন।

অমর বলিল, আমি বই নিয়ে বসে' থাকি কে বল্লে?

মাধুরী চলিয়া যাইতে যাইতে ঘাড় ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল, শুনতে পাই।

মাধুরীকে তার বন্ধুর দল ঘিরিয়া দাঁড়াইল। একজন বলিল, তবু ভালো সজ্ঞানে ফিরেছিস! আমরা ত হাল

ছেড়ে দিয়েছিলুম। বা-আ-বা! তোর পেটে এত বিছে কে জানতো? লীলাব সঙ্গে দিনরাত ফুসফাস গুজগাজ আমবা ভাবি কি বে বাপু, এমন তাব দাদা তাই কি ছাই তখন জানি। হ্যাঁ ভাই, আগে থেকে খবব পেয়েছিলি বুঝি?

মাধুরী তাব গালে তর্জ্জনী দিয়া একটা ঠোনা মাবিয়া বলিল, যা, যাঃ, আর ফাজলামো কবতে হবে না।

তখন আর একজন বলিল, তোব আজ থেকে নাম দিলুম স্থহরী। বস্তু চিনিস বটে।

মাধুরী সহাস্থে বলিল, হিংসে হচ্ছে বুঝি? তাহলে বল্, অমরবাবুর সঙ্গে ইন্ট্রোডিউস করিযে দিই?

৩১

পুত্রশোক

ম্লান পাণ্ডুর আকাশ হইতে সারাদিন টিপি টিপি বৃষ্টি ঝরিতেছে চোখেব জলেব মত। উপবে নীচে যে দিকে দৃষ্টি ফিরাও সমস্তই নির্জ্জীব, নিরানন্দ। এমন দিনে নিঃসঙ্গতা একেবারে অসহ্য—মন প্রিয়জনেব সঙ্গ লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে।

ঘবেব কোণে বসিয়া অমব হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। কোথাও যাইতে পারিলে ভালো হয়, কিন্তু কোথায যে যাওয়া যায় ভাবিয়া সে ঠিক কবিতে পারিতেছিল না। এমন সময় লীলা স্কুল হইতে ফিবিয়া যখন মাধুরী-দি'ব বাড়ি যাইবার প্রস্তাব কবিল তখন অমব সে-প্রস্তাব সানন্দে এবং সাগ্রহে অনুমোদন কবিল।

তখন সে বুঝিতে পারে নাই তাব আনন্দ অচিরে অনুশোচনায় পরিণত হইবে। মাধুরীদেব বাড়ি পৌঁছিয়া তাহারা দেখিল ভিজা উঠানেব উপর বসিয়া ক্লান্তবর্ষণ সন্ধ্যার ম্লানালোকে সে বাসন মাজিতেছে। অমরের কবি-কল্পনা একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খাইল—এমন বাদল সন্ধ্যায় মাধুরীকে এভাবে দেখিবার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তাব মনে হইল তাদের আগমন সময়োচিত বা সঙ্গত হয় নাই। পূর্ব্বাহ্নে খবর দেওয়া নিশ্চয়ই উচিত ছিল। মাধুরীকে না জানি কত বিব্রত করা হইল।

ক্ষুণ্ণস্বরে সে বলিল, বড় অসময়ে এসে পড়েছি···

মাথায় কাপড নাই, দুই হাতে কাদা, আঁচলটা কাঁধেব উপর দিয়া ফিরাইয়া কোমবে জড়ানো, এমন অবস্থায় মাধুরী একটু বিব্রত হইযা পডিল, কিন্তু সে এক মুহূর্ত্তের জন্য। পরক্ষণেই অমরের পানে চাহিয়া সহজভাবে সে উত্তর দিল, সুসময়ে ত সবাই আসে, কিন্তু অসময়ে বন্ধু ছাড়া কে আসে বলুন।

তাড়াতাড়ি কলেব জলে হাত ধুইতে ধুইতে সে বলিল, আজ বাদলা দেখে ঝি দয়া কবেছে। চলুন ওপরে।

মাধুবীকে অনুসরণ কবিয়া ভাই-বোন উপরের ঘরে গিয়া পৌঁছিল। তাহাদের দেখিয়া হাতের বই বন্ধ করিয়া বিহাবীবাবু দাঁডাইয়া উঠিলেন। পিতাব সহিত অমরের পবিচয কবাইয়া দিয়া মাধুবী লীলাকে লইয়া নীচে নামিয়া গেল।

ঘবখানিব পরিচ্ছন্নতা ও অনাড়ম্বর সজ্জাব শৃঙ্খলা অমবের চিত্তকে আকৃষ্ট কবিল। সে লক্ষ্য করিল, যে-জিনিসটি যেখানে মানায় সেখানেই সেটি স্থাপিত। বস্তুব বাহুল্যে ঘবেব অবকাশ সঙ্কুচিত নয়, সেখানে বেশ স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস ফেলা যায়। দেয়ালেব গায়ে একখানি মাত্র ছবি—এক সুদর্শন বালকেব পূর্ণাকৃতি ফটো। ঘরে অন্য ছবি নাই।

বিহাবীবাবুর মাথাব চুল আধাআধি পাকা। শরীর কগ্ন বোধ হয় না, কিন্তু তাঁর মুখের উপর ভারি একটি শ্রান্তির ভাব। গোঁফ ছোট করিয়া ছাঁটা, দাড়ি কামানো, কথা কহিবাব সময় কপালের উপর স্তরে স্তরে বলিরেখা ফুটিয়া উঠে। তাঁর চোখের উজ্জ্বলতা অমরের একটু অস্বাভাবিক বলিযা মনে হইল।

বিহাবীবাবু অমরকে সমাদরে বসাইলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি লেখো?

অমর বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

বিহারীবাবু বলিলেন, মাধুরী তাই বলছিল। তা বেশ! লেখাপড়ার মত আর কি আছে বলো? এই ত আমি একলাটি থাকি, মাধুরী কাজেকর্ম্মে পড়ায় ব্যস্ত থাকে, বই না থাকলে আমার গতি কি হ'ত বলো দেখি? আগে আগে যখন কাজেকর্ম্মে ব্যস্ত থাকতুম, নিশ্বাস ফেলবার সময় ছিল না, তখন বন্ধুবান্ধব ছিল, স্ত্রী-পুত্র সব ছিল! আর এখন বুড়ো হতে চলেছি, পেনসন নিয়ে বসে' আছি, এখন কাজকর্ম্মও নেই বন্ধুবান্ধবও নেই স্ত্রী-পুত্রও নেই—কিছুই নেই! এখন থাকবার মধ্যে আছে মাধুরী আর ঐ বই—তা-ও না থাকলে হয়ত পাগল হয়ে যেতুম!

বিহারীবাবুর কথার মধ্যে একটা হতাশা ও বিষাদের সুর স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল।

একটু থামিয়া অমরকে নিরীক্ষণ করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বয়স কত হবে?

অমর কহিল, পঁচিশ।

পঁচিশ! পঁচিশ! হ্যাঁ, সঞ্জীব বেঁচে থাকলে সে-ও এত দিনে পঁচিশ বছরের হ'ত! কথাগুলো স্বগতোক্তির মত শুনাইল।

অমরকে উদ্দেশ করিয়া কথাটা যেন খোলসা করিবার জন্য কহিলেন, সঞ্জীব আমার ছেলে! ঐ যে তার ছবি! বলিয়া দেয়ালের দিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিলেন।

প্রায়ান্ধকার ঘরে সঞ্জীবের ছবি অস্পষ্ট দেখাইতেছিল। সেই দিকে ফিরিয়া বিহারীবাবু বলিলেন, দাঁড়াও, একটা আলো আনাই, নইলে দেখতে পাবে না। কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, মাধুরী, একটা আলো দিয়ে যাও ত মা!

অনতিকাল পরে আলো হাতে মাধুরী ঘরে ঢুকিল। তার পশ্চাতে আসিল লীলা।

দেখিয়া বিহারীবাবু বলিলেন, আলোটা এই দিকে নিয়ে এস। তারপর দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, ছাখো, অমরবাবু ছাখো!

অমর দাঁড়াইয়া ছবিখানি ভালো করিয়া দেখিল। তারপর আবার উভয়ে আসন গ্রহণ করিলে বিহারীবাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেখলে?

অমর সংক্ষেপে বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

মাধুরী তাড়াতাড়ি ডাকিল, ছাখো বাবা!

বিহারীবাবু সে-কথা শুনিতে পাইলেন না। অমরকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, কেমন, সুন্দর নয়?

অমর বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

পিতার কাঁধে হাত দিয়া মাধুরী ডাকিল, শুনচো বাবা!

এইবার বিহারীবাবুর হুঁস হইল। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, কি বলচিস মাধুরী!

মাধুরী বলিল, অমরবাবু বেশ গাইতে পারেন।

বিহারীবাবু বলিলেন, বেশ ত! গান শোনা যাক!

অমর মাধুরীর পানে ফিরিয়া বলিল, আগে আপনি, তারপর আমি!

বিহারীবাবু বলিলেন, সে কথা ঠিক। উনি আমাদের অতিথি, ওঁর অনুরোধ আগে রাখা উচিত।

অগত্যা মাধুরী গাহিল। গান শেষ হইবার পর অমর কহিল, আপনি গানের বেশ এক্সপ্রেসন দেন! ঐটিই হ'ল গানের প্রাণ! অনেকে সে-কথা ভুলে গিয়ে তালমানের ওপর বেশি নজর দিতে যান। তার ফলে গানের রসকষ নষ্ট হয়ে যে জিনিসটা দাঁড়ায় সেটাকে গানের ছিবড়ে বলা হয় ত চলে, কিন্তু গান বলা চলে না।

আত্মপ্রশংসায় লজ্জিত হইয়া মাধুরী বলিল, থাক থাক, আমায় আর বেশি বাড়াবেন না! এবার আপনি গান।

অমর গাহিতে সুরু করিল—

পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে!
শ্যামবিটপিঘন তটবিপ্লাবিনী ধূসর তরঙ্গভঙ্গে!
কত নগনগরী তীর্থ হইল তব চুম্বি চরণযুগ মায়ি—
কত নরনারী ধন্য হইল মা তব সলিলে অবগাহি॥
বহিছ জননী এ ভারতবর্ষে কত শত যুগ যুগ বাহি
করি সুশ্যামল কত মরুপ্রান্তর শীতল পুণ্য তরঙ্গে॥ *

* দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

গান গাহিতে বা কবিতা আবৃত্তি করিতে বসিলে অমর তন্ময় হইয়া যাইত। তাই সে লক্ষ্য করিল না, গান শুনিতে শুনিতে মাধুরীর মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তার উৎকণ্ঠিত শঙ্কিত দৃষ্টি তার পিতার মুখের উপর পড়িয়া আছে। প্রথম চরণ শেষ হইতে না হইতে হঠাৎ বিহারীবাবু অমরের হাতদুটা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, থাক থাক! আর কিছু গাও! ও গান নয়, ও গান নয়! পতিতোদ্ধারিণী? আমি বলি রাক্ষসী! রাক্ষসী! বুঝেছ?

এই আকস্মিক অপ্রত্যাশিত রূঢ়তায় বিস্মিত হইয়া অমর থামিয়া গেল। বিহারীবাবুর মুখের পানে চাহিয়া দেখিল অপরিসীম ক্রোধে তাঁর চোখ যেন জ্বলিতেছে। কিন্তু তাঁর কন্যার চোখে জল, সে যেন নীরব দৃষ্টি দিয়া অমরের মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছিল। এ সবের অর্থ কি? অমর কিছুই বুঝিল না, আহত চিত্তে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। লীলার সশঙ্ক অসহায় দৃষ্টি একবার মাধুরী একবার অমর একবার বিহারীবাবুর মুখের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ধীরে ধীরে মাধুরী পিতার একখানি হাত দুই হাতে তুলিয়া লইল। অমর সবিস্ময়ে দেখিল বিহারীবাবুর শীর্ণ গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে।

কেহ কোনো কথা বলিল না, কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল। তারপর বিহারীবাবু অমরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, কিছু মনে কোরো না অমরবাবু! আমায় মাপ করো! গঙ্গার নাম শুনলে মাথা ঠিক রাখতে পারি না, একেবারে পাগল হয়ে যাই! তুমি জান না, ঐ গঙ্গাই সঞ্জীবকে খেয়েছে! সঞ্জীব আমার ছেলে, বুঝেছো ত? ঐ যে ছবি এখনি দেখলে! কেমন হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে…আমার আঠারো বছরের ছেলে…আমার একমাত্র ছেলে অমরবাবু…তাকে গ্রাস করেছে, ভাবো দেখি একবার! অথচ লোকে তাকেই বলবে, মা গঙ্গা! মা গঙ্গা! সহ্য হয় না আমার, শুনলে পাগল হয়ে যাই!

অমর সমস্ত বুঝিল। কহিল, থাক, ও সব আলোচনা করলে কষ্ট হয়, কাজ কি! আপনি একটু স্থির হোন।

বিহারীবাবু বলিলেন, কষ্ট? স্থির হলেই কি কষ্ট কমে অমরবাবু? আজ পনেরো বছর ধরে' স্থির হয়ে পলে পলে পুড়ে মরছি…ভেতরটা ফাঁপরা হয়ে গেল! থাকি থাকি চোখের সামনে জলেডোবা ছেলেটার মরা মুখ দেখতে পাই! অন্ধকার জলের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে দম বন্ধ হয়ে মরা, ওঃ কত কষ্টের মরণ একবার ভাবো দেখি অমরবাবু! মরবার সময় সে কি ভেবেছিল, কার কথা ভেবেছিল, কিম্বা কিছুই ভাবেনি হয়ত, সেকথা আজ আর জানবার উপায় নেই! তবে একথা নিশ্চয় জানি, সে মায়ের কোলে যাচ্ছে এমন কথা নিশ্চয় ভাবেনি! মা গঙ্গা! শুনলে হাসবো না কাঁদবো ঠিক করতে পারি না! জল থেকে যখন তুল্লে, তাকে দেখে মনে হল যেন ঘুমিয়ে আছে—মুখে এতটুকু কষ্টের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই! জামা জুতো কাপড় যেমন পরা ছিল ঠিক তেমনি রয়েছে, হাতে আংটি, জামার পকেটে রুমালে-বাঁধা একটা সিকি। রোসো সিকিটা দেখাচ্ছি। বিহারীবাবু উঠিয়া টেবিলের উপর হইতে ঘড়ির চেনটা তুলিয়া আনিলেন। চেনের প্রান্তে সিকিটি আটকানো ছিল। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সেটি অমরকে দেখাইয়া আবার পূর্ব্বস্থানে রাখিয়া দিলেন।

অমর নড়িয়া বসিল। মাধুরী একবার তার মুখের পানে চাহিয়া জানালার পানে মুখ ফিরাইল। আলোর আশেপাশে একটা উচ্চিংড়ে ক্রমাগত লাফালাফি করিতেছিল। লীলা স্থির হইয়া বসিয়া তাহাই দেখিতে লাগিল।

বিহারীবাবু বলিতে লাগিলেন, যারা ভালো তারা বেশিদিন বাঁচে না, এ আমি বরাবর দেখে আসচি। কেন, তা অবশ্য জানি না। সেই 'কেন'র উত্তরের জন্যে অনেক ফিলসফি হাতড়েছি, অনেক পণ্ডিতের শরণ নিয়েছি, কিন্তু বৃথা বৃথা! উত্তর আজও খুঁজে পাইনি। এমন মায়ার শরীর ছেলেটার…লোভ নেই হিংসে নেই মনের মাঝে কোথাও এতটুকু ময়লা নেই! তার ভেতরটা

যেন পষ্ট দেখতে পেতুম—একেবারে আলোর মত পরিষ্কার! হাসি লেগেই থাকতো। কখনো তাকে রাগ করতে দেখিনি, বিরক্ত হতে দেখিনি! এমন ছেলে বেঁচে থাকে, বিধাতার প্রাণে তা সইলো না! কেন সইলো না, বলতে পারো অমরবাবু?

ঘড়িটা বাজিতে আরম্ভ করিল।

বাজনা থামিলে বিহারীবাবু অমরের পানে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ঈশ্বর বিশ্বাস করো?

ক্ষণকাল মৌন রহিয়া অমর বলিল, যে-নিয়মে এই জগৎ চলছে সেই অমোঘ অব্যর্থ নিয়মধারাকে আমি ঈশ্বর বলি, পার্শন্যাল গড্ আমি বিশ্বাস করি না।

বিহারীবাবু হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। মনে হইল যেন তিনি হাহাকার করিতেছেন। উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, নিয়ম? কোন্ নিয়ম? সমস্তই অনিয়ম, কেয়স্! সঞ্জীব ছেলেমানুষ, তার মরবার কথা নয়, সে গেল মরে', অথচ আমার মরণ নেই! শুধু আমি কেন, আরো লক্ষ লক্ষ মানুষ রয়েছে, কত অন্ধ, কত পঙ্গু, কত হস্তিমূর্খ, কত লোভী, কত ভোগী; কত খুনে চোর গাঁট-কাটা, কত জুয়াড়ী, কত জরাজীর্ণ বুড়ো, যাদের বেঁচে থাকার কোনো অর্থ পাওয়া যায় না, জগতের কোনো উপকারে যারা লাগে না, তারা দিব্যি বেঁচে বর্ত্তে রয়েছে, সংসারের ভার বাড়াচ্ছে। কোথায় নিয়ম? বলো আমায়!

অমর উত্তর দিল না, মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। সজল হাওয়ায় জানালার পর্দাগুলো উড়িতে লাগিল। পথ দিয়া একখানা ভাড়াটে গাড়ি সশব্দে চলিয়া গেল। সেই শ্রুতিকটু কর্কশ শব্দ থামিলে বিহারীবাবু বলিতে শুরু করিলেন—

সেবার পুজোর ছুটিতে কলকেতা এসেছিলুম। এখন মনে হয় না এলেই ছিল ভালো, তাহলে হয় ত সঞ্জীব মরতো না! আবার মনে হয় অপঘাতে সঞ্জীব মরবে এই ছিল তার নিয়তি, সেই নিয়তিই আমাদের কলকেতা টেনে নিয়ে এল। যাক, যে-কথা বলছিলুম।

সেদিন কোজাগর পূর্ণিমা। সকালবেলা খবরের কাগজ পড়ছিলুম। সেজেগুজে সঞ্জীব এসে দোরগোড়ায় দাঁড়ালো। বল্লে', বাবা দক্ষিণেশ্বর যাচ্ছি। আমি বল্লুম, খাবিনি? সে বল্লে, আমাদের যে পিকনিক, সেইখানেই খাওয়া হবে। বলে' হাসিমুখে সে দাঁড়িয়ে রইলো! তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলুম না, ভারি ভালো লাগছিল তাকে দেখতে। জিজ্ঞেস করলুম, আর কে যাচ্ছে? সে বল্লে, অনেক লোক, আমাদের 'দলের সবাই। বলে' তার বন্ধুবান্ধবের নাম করলে। বল্লুম, ফিরবি কখন?' সে বল্লে, সন্ধ্যের সময়।

সন্ধ্যের পর বেড়িয়ে যখন বাড়ি ফিরলুম তখন রাত আটটা। সঞ্জীব তখনো ফেরেনি বলে' তার মা ভাবছেন। কি জানি কেন আমারও মনটা ছাঁত্ করে উঠলো। মুখে অবশ্য তার মাকে বোঝালুম, আসবে'খন, সে ত আর কচি খোকা নয়! সঙ্গে আরও দশজন ছেলে রয়েছে, অত ভাবনা কিসের? তাঁর মন যে নিশ্চিন্ত হল এমন মনে হয় না, কিন্তু পাছে তিনি ভাবেন সেইজন্যে সে-প্রসঙ্গ আর তুল্লুম না।

মনের অস্বস্তি লুকিয়ে কেবলই ভাবছি, এই বুঝি আসে, এই বুঝি আসে, কিন্তু সে আর আসে না! রাত বেড়ে চল্লো। শেষে কোনোগতিকে খাওয়া-দাওয়া সেরে যখন উঠলুম তখন দশটা বেজে গেছে। সঞ্জীবের মা চুপ করে' বসে' আছেন, ঠিক যেন পাথর! ভয়ে তাঁর মুখের দিকে চাইতে পারলুম না। মনে হচ্ছিল কি যেন একটা অমঙ্গল ঘটেছে, কিন্তু সেটা যে কি তা তলিয়ে ভাববার সাহস হ'ল না। শেষে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লুম।

ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি না। তখনকার দিনে শুলে আর একদণ্ড জেগে থাকতে পারতুম না, আর এখন সাধাসাধি করেও ঘুমের দেখা মেলে না, বিছানায় ঢুকলেই রাজ্যের ভাবনা মাথায় এসে জোটে! যাকগে, যে-কথা বলছিলুম...

এক সময় চট্ করে' ঘুমটা ভেঙে গেল। ধড়মড় করে'

উঠে বসে' দেখি মাধুরীর মা গায়ে হাত দিয়ে ডাকছেন। বুকের মাঝটা ঢিবঢিব করে' উঠলো, ব্যাপার কিছু বুঝতে পারলুম না, তারপর মনে পড়লো। জিজ্ঞেস করলুম, সঞ্জীব এসেছে? তিনি বল্লেন, ত্যাখো দিকি সদরে কে যেন ডাকছে মনে হল। ডাকছে? তাহলে নিশ্চয় সঞ্জীব! তার পরেই গা শিউরে উঠলো, মনে হল, কিন্তু সে যদি না হয়?

দরজাটা খুলে দেখি একটি বোগামতন শ্যামবর্ণ ছেলে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দু' একবার সঞ্জীবের কাছে আসতে দেখেছিলুম। জিজ্ঞেস করলুম, কোথা থেকে আসচ?

সে বল্লে, আজ্ঞে আমি আসচি...আসচি...আর কিছু বলতে পারলে না, সে কেঁদে ফেল্লে।

আমার রক্ত হিম হয়ে গেল, বল্লুম, কি হয়েছে শীগ্‌গির বলো! কাঁদো কেন? সঞ্জীব কোথায়?

সে কাঁদতে কাঁদতে থেমে থেমে বলতে লাগলো, আমি জানি না...নৌকো করে' ফিরছিলুম...ষ্টীমারে ধাক্কা লেগে নৌকো উল্টে গেল...খালাশিরা আমাদের তিন-জনকে তুল্লে...অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম...জ্ঞান হয়ে সঞ্জীবকে দেখতে পেলুম না...তাকে খুঁজে পাওয়া যায় নি!

পায়ের তলায় পৃথিবীটা যেন দুলে উঠলো, চোখে অন্ধকার দেখলুম। প্রাণপণ শক্তিতে আমি ছেলেটার হাতদুখানা চেপে ধরলুম, চীৎকার করে' বল্লুম, মিথ্যে কথা, এ হতেই পারে না! আমি যে আজ সকালে সঞ্জীবকে দেখেছি, সে মরতে পারে না...মরতে পারে না...

দোরের পাশ থেকে কথাটা শুনতে পেয়ে সঞ্জীবের মা সেইখানে আছড়ে পড়লেন। চাকর-বাকর উঠে পড়লো, বাড়িময় সোর গোল পড়ে' গেল। তাঁকে ধরাধরি করে' ওপরের ঘরে নিয়ে গেলুম। খালি মেঝের ওপর পড়ে' ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তিনি কাঁদতে লাগলেন, আর আমি তাঁর পাশে বসে' বসে' সেই কান্না শুনতে লাগলুম। আমার কান্না বার হবার জন্যে বুকের মাঝে ছটফট করতে লাগলো, কিন্তু আমি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে বসে রইলুম... আমার যে কাঁদবারও জো নেই। এর পর কি যে করতে হবে তা ভাববার তখন শক্তিও যেন ছিল না।

সময় কাটতে লাগলো। মাঝে মাঝে মনের মাঝে দুরাশা উঁকি দিতে লাগলো...হয়ত সঞ্জীব জলের স্রোতে ভেসে গিয়ে চরের ওপর কোথাও আটকা পড়েছে... হয়ত তাকে দেখতে পেয়ে কেউ তুলে নিয়ে সেবা করে' বাঁচিয়ে তুলেছে...হয়ত কাল সকাল বেলা খবর আসবে সে মরেনি.. হয়ত সে আবার হাসিমুখে এসে দাঁড়াবে.. এবার আর কখনো তাকে একলা বার হতে দোব না.. নৌকোয় পা দিতে দোব না ..দিনরাত তাকে চোখে চোখে রাখবো ...চোখে চোখে রাখবো...

হঠাৎ বারান্দায় চোখ পড়লো—সাদা দুধের মত জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে। খোলা দোরের মাঝ দিয়ে যতটা আকাশ দেখা যায় একেবারে পরিষ্কার তকতক করছে, কে যেন মেজে ঘসে' পালিশ করে' দিয়েছে। তার মাঝে থালার মত প্রকাণ্ড পূর্ণিমার চাঁদ হাসছে! এত বড় একটা নিদারুণ দুর্ঘটনা ঘটলো, আমাদের বুক ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল, কিন্তু তাতে করে' জগতের একচুল ক্ষতিবৃদ্ধি হল না। তার নিষ্ঠুর নিয়মে সমস্তই যেমন ছিল ঠিক তেমনি চলতে লাগলো। পূর্ণিমার চাঁদ চিরকালই হাসে, তা তুমি বাঁচো আর মরো, তার রীতিই এই রকম! কিন্তু তাহলেই কথাটা আসে, ভগবানের হৃদয় বলে' কিছু নেই। তবে মানুষ তাঁর কাছে হাত জোড় করে' দয়া করো রক্ষা করো বলে' চেঁচায় কেন? ভালো যদি ঘটবার হয় ঘটে, মন্দ যদি ঘটবার হয় ঘটে, ভগবানের কাছে হাজার কান্নাকাটি করলেও তার নড়চড় হয় না! তবে মানুষ এমন করে কেন? সে দুর্ব্বল বলে', অসহায় বলে', সে জানে না বলে' ভগবানকে আমরাই কল্পনায় সৃষ্টি করেছি, আসলে ভগবান বলে' কিছু নেই, সব ফক্কিকার! যা আছে, তা হচ্ছে একটা নিষ্ঠুর নির্ব্বিকার যন্ত্র,

একটা নিরর্থক নিয়ম, যার কার্য্যকারণ কেউ বুঝতে পারে না!

৩২

নির্ব্বাণের কূলে

ছয় মাস পরে। অবাধ মেলামেশা ও ঘনঘন যাতায়াতের ফলে চন্দ্রবাবু ও বিহারীবাবুর পরিবারের পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে।

প্রথম পরিচয়ের দিন বিহারীবাবুর নিদারুণ শোকের কাহিনী শুনিয়া অবধি অমরের মন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। পুত্রহারা পিতার বেদনা আর প্রিয়াহারা প্রেমিকের বেদনার মধ্যে প্রকারে প্রভেদ থাকিলেও তীব্রতার প্রভেদ ত নাই, বোধ করি সেই কারণেই সমদুঃখী মানুষের সন্ধান পাইয়া অমর যেন কতকটা সান্ত্বনা পাইল। সময় পাইলেই সে বিহারীবাবুর কাছে গিয়া বসিত এবং নানাবিধ আলোচনায় তাঁর দুঃখ ভুলাইবার চেষ্টা করিত। তার এই স্বতঃপ্রবৃত্ত সহৃদয়তার ঋণ মাধুরী নিয়ত কৃতজ্ঞতার সহিত মনে মনে স্বীকার না করিয়া পারিত না।

কাত্যায়নীকে মাধুরী মাসীমা বলিয়া ডাকে, কাজেই চন্দ্রবাবু হইয়াছিলেন তার মেসমশাই। চন্দ্রবাবু মাধুরীর একান্ত অনুরক্ত ভক্ত, তার সমন্ধে কিছু বলিতে হইলে তিনি তাল সামলাইতে পারিতেন না। বলিতেন, অমন মেয়ে জীবনে দেখেন নাই! কাজেকর্ম্মে পড়াশুনায় যাতে দাও কিছুতেই পিছপা নয়! তারপর, তার ম্যানার্স—তার আর তুলনা নাই!

কাত্যায়নী কিন্তু শিক্ষিত মেয়ে দুচক্ষে দেখিতে পারিত না। তাদের উপর তার একটা জাতক্রোধ ছিল। তার মূলগত হেতু নির্ণয় করা কঠিন—সম্ভবত আজন্মের সংস্কার, সম্ভবত হিংসা। দরিদ্র যেমন ধনবানকে ঈর্ষা করে তার সম্পদের জন্য, তেমনি অশিক্ষিতা কাত্যায়নী বিপরীত গুণসম্পন্না নারীর উপর বিদ্বেষভাব পোষণ করিবে ইহা আর এমন বিচিত্র কি!

সে যাহা হউক উক্ত অমার্জ্জনীয় শ্রেণীভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও মাধুরীর উপর কাত্যায়নীর তেমন বিরাগ ছিল না, কেবল যা এতবড় ধাড়ি মেয়ের আইবুড় অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সে মাঝে মাঝে একটু আধটু তিক্তকষায় সমালোচনা করিত মাত্র। তা ছাড়া পতিমুখে মাধুরীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিয়া কখনো কখনো আত্মসম্বরণ করিতে পারিত না, ঝাঁঝিয়া উঠিয়া বলিত, এত যদি দরদ তো নেকাপড়াজানা মেয়ে বিয়ে করনি কেন? অমর উপস্থিত থাকিলে পিতামাতার এরূপ দাম্পত্য কলহের সূত্রপাতেই ছুতা করিয়া উঠিয়া পালাইত। ব্যাপারটা তার অত্যন্ত বিসদৃশ অশোভন ও লজ্জাকর বোধ হইত।

একদিন চন্দ্রবাবু অমরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, মাধুরীকে তোমার কেমন লাগে?

অমর বলিল, মাধুরী বেশ মেয়ে।

উত্তরটা চন্দ্রবাবুর মনঃপূত হইল না। তিনি বলিলেন, বেশ মেয়ে? শী ইস্ এ জুয়েল! আমি ত এমন মেয়ে কখনো দেখিনি!

ক্ষণকাল থামিয়া বলিলেন, অমনি মেয়েকে বৌ করতে ইচ্ছে হয়। কি বলো? তুমি এ সম্বন্ধে কিছু ভেবেছ?

অমর কহিল, না, ওকথা কখনো ভাবিনি, আপাতত বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই।

কথাটা বলিয়া অমর মনে মনে হাসিল। ভাবিল, বাবা ওহানার কথা জানেন না! জানিলে আর মাধুরীর সঙ্গে আমার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিতেন না!

আসল কথা, ওহানার আশা অমর তখনো ত্যাগ করিতে পারে নাই। দেশে ফিরিয়া অবধি যদিও তার লেখা একছত্র চিঠিও পায় নাই, সে যে কোথায় আছে, বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াছে তা-ও জানে না, তবুও সে যে একদিন আসিয়া তার হৃদয় ও গৃহ পূর্ণ করিবে এই আশাটি সে সংগোপনে হৃদয়ে পোষণ করিত।

সপ্তাহান্তে জাপানী ডাক আসিবার দিন তার অন্তর অধীর হইয়া উঠিত। ভাবিত, আজ হয় ত ওহানার খবর পাইব! আশায় আশায় দিন কাটিত, কিন্তু খবর আসিত না। কখনো বা ভাবিত টেলিগ্রাফ করিয়া দিবে—শুধু কুশল প্রশ্ন, আর কিছু নয়। পরক্ষণে মনে পড়িত, তার ঠিকানা সে জানে না, কে যে জানে তাও তার অজ্ঞাত। তার মাথা খুঁড়িয়া মরিবার ইচ্ছা করিত।

সপ্তাহ আসে যায়, মাস আসে যায়, ওহানাব চিঠি আসে না। সে কি তবে বাঁচিয়া নাই? নিশ্চয় নাই! নহিলে সে কি এমন নিষ্ঠুর হইতে পারে? কিন্তু সে যে নাই এ কথাও তো ভাবা যায় না! সে না থাকিলে জগতে আর রহিল কি? তাহার বিহনে বাঁচিয়া থাকিযা কি লাভ? কোন্ সার্থকতা?

ওহানার ক্ষতি সম্যক উপলব্ধি হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ যেন অমরের মন হইতে মুছিয়া গেল, একটা গুরুভার প্রকাশহীন বেদনা তার সমস্ত সত্ত্বাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, উঠিতে বসিতে উহা নিত্যসহচরের মত তার আশেপাশে ফিরিতে থাকে উহা তার চারিদিকে একটা দুর্ভেদ্য দেয়াল তুলিয়া দিয়া এমন একটা নিঃসঙ্গতার সৃষ্টি করিল যেখানে সে ছাড়া আর দ্বিতীয় প্রাণী নাই।

ওহানার কথা কারও সঙ্গে আলোচনা করিতে পারিলে সে বাঁচিয়া যাইত, কিন্তু তেমন লোক কোথায়? এমন কেহই নাই যার সঙ্গে ওহানা সম্বন্ধে দুটা কথাও বলা যায়। এখানে কেহই তার রূপ দেখে নাই, তার কণ্ঠ শুনে নাই, তার নামটি পর্য্যন্ত কেহ জানে না। একান্ত নির্জ্জনে সেই নামটি অমর ধীরে ধীরে মন্ত্র পাঠ করার মত আবৃত্তি করিতে থাকে, স্বকণ্ঠ উচ্চারিত প্রিয় নামের সেই মধুর ধ্বনিটি তার শ্রবণ মন পরিতৃপ্ত করে। তার মনে হয় লোকান্তর হইতে হয়ত তার আহ্বান ওহানা শুনিতে পাইতেছে এবং শুনিযা হয়ত সে খুসি হইতেছে।

অমর বন্ধুদের এড়াইয়া চলে। কি জানি যদি তারা তার দুঃখ দেখিতে পায়! এই দুঃখটি তার একান্ত আপনার, সেটিকে সে সংগোপনে হৃদয়ের মাঝে পোষণ করিতে চায়, দশের মাঝে তার প্রকাশ সে ত সহ্য করিতে পারিবে না। তা ছাড়া অপরের সুখের মাঝে দুঃখের ছায়া ফেলিতে নাই! সুখ যে বড় ক্ষণস্থায়ী, তাহাতে বাদ সাধিতে আছে কি?

তাই সে আত্মগোপন করিয়া রহিল। দৈবাৎ কাহারো সহিত দেখা হইলে সে এমন ভাব দেখাইত যেন তার কিছুই হয় নাই, সে আগে যেমন ছিল এখনো ঠিক তেমনি আছে। তার বাক্যে বা ব্যবহারে তার হৃদয়ের গভীর ক্ষতটি কেহ দেখিতে পাইত না।

—ক্রমশ
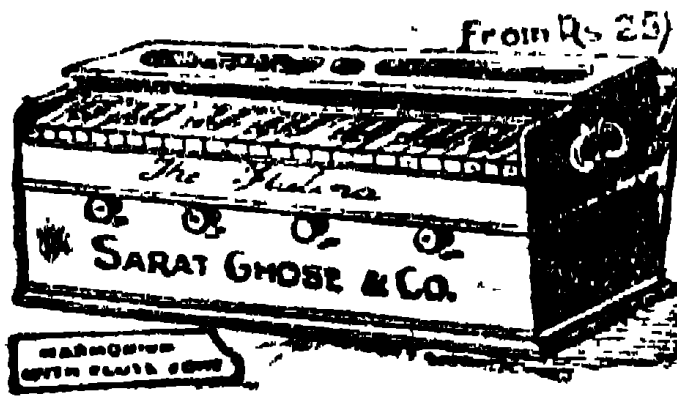
রূপ-রহস্য

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

জোড়া-ভুরু নাই থাক্,
চুল একরাশ খুব—
গালে নেই গুল্‌বাগ ?
হুরীদের চাস্ রূপ ?—
মুখে হাসি, চোখে জল
আছে ত' বে,—বাস্ চুপ !

ওই প্রাণ-বীণ্‌খান
বুকে থুয়ে সাধ্‌না,
সারানিশি দিনমান
সুরে সুর বাঁধ্‌না,
বুঝ্‌বি সে কত সুখ—
একবার কাঁদ্ না !

দুনিয়া যে আয়না—
কোনো রূপ নাই তার !
কেন মিছে বায়না ?
তোরি দোষ চাইবার।
প্রাণটারে চোখে আন্—
দেখ্, রূপ নাই কার ?

হোক্ না এ শীত-রাত—
কিছু আপশোষ্ না !
কেবা করে দৃক্‌পাত,
থাকে যদি জ্যোৎস্না !

চেনা-অচেনা

শ্রী সরোজকুমারী দেবী

লক্ষ্ণৌএর গঙ্গাপ্রসাদ হল থেকে রমেশ যখন বাইরে এলো তখন প্রায় সন্ধ্যা। সেদিন সেখানে একটা বড় রকমের সভা ছিল—কিন্তু লোকের অসম্ভব ভিড় ও গরমে কিছুক্ষণ পরেই অসহ্য বোধ হওয়ায় তার আর বক্তৃতা শোনবার ধৈর্য্য রইলো না।

সামনেই আমিনাবাদ পার্ক—লোকজন তখন প্রায় চলে গেছে। সমস্ত দিনের গরমের পর সন্ধ্যার সময় ঝির-ঝির করে' ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল। সামনের রাস্তা দিয়ে গাড়ী মোটর টঙ্গা অবিরাম গতিতে চলেছে—দূরে দূরে নানাবিধ দোকানের আলো—সেখানে অবাধ জনপ্রবাহ—কিন্তু সেখানকার কেনাবেচার দর-দস্তুর ও কোলাহল পার্ক পর্য্যন্ত পৌছায় না। পার্কের ভিতরটিতে যেন একটা স্তব্ধ স্বপ্নালস ভাব। রমেশ বাগানের ভিতর ধীরে ধীরে বেড়াতে লাগলো।

এ কি? রমেশ? পিছন থেকে এই কথা শুনে রমেশ চকিত হয়ে ফিরে দেখলে। তার সামনে একটি যুবক দাঁড়িয়েছিল।

আগন্তুকের মুখের দিকে চেয়ে কথা বলতে গিয়ে রমেশ হঠাৎ চুপ করে গেল।

ছেলেটি একটু অপেক্ষা করে' হেসে বল্লে—খুব অবাক্ হয়ে গেছ, না? এখানে আমাকে দেখবার কথা কখনো ভাবতে পার নি।

রমেশ একটু সামলে নিয়ে গম্ভীর ভাবে বল্লে—সে কথা সত্য। তা ছাড়া অনেক দিন হয়ে গেল—তোমার কথা বিশেষ ভাবে মনেও ছিল না।

ছেলেটি শুধু বল্লে—তা না থাকবারই কথা।

অনেকক্ষণ দুজনেই নীরব। দুজনেরই কেমন বিব্রত ভাব; কে যে কি কথা বলবে তা যেন ভেবে পেলে না।

কতক্ষণ পরে আগন্তুক ছেলেটি বল্লে—এখানে কবে এলে? একা এসেছ? না বাড়ীর সকলে সঙ্গে আছেন?

রমেশ বল্লে—একলাই এসেছি। রমেন এখানে একটা কাজ নিয়ে এসেছে, তার বোর্ডিংএই আছি; হপ্তাখানেক থাকবার ইচ্ছে আছে।

ছেলেটি বল্লে—তা হলে আজ আমার ওখানে চল না? অবশ্য আমি জোর করে' তোমায় বলতে পারি না। যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে—তা হলে আমার সঙ্গে এলে আমি খুব সুখী হব—এই পর্য্যন্ত বলতে পারি।

রমেশ যেন কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছিল। একবার সে কি একটা কথা বলতে গেল—তারপর সেটা সামলে নিয়ে একটু ইতস্ততঃ করে বল্লে—তা তুমি এখানে কোথায় থাক যতীশ? এ দু' বচ্ছর এইখানেই বাস করছো না কি?

যতীশ একবার তার মুখের দিকে চাইলে; তারপর বল্লে—আমি এখানকার একটা স্কুলের মাষ্টার ও বোর্ডিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট; বোর্ডিংএই থাকি।

রমেশ অবাক্ হয়ে বল্লে—বল কিহে? তুমি মাষ্টারী করছো? তা আবার এই হিন্দুস্থানীর দেশে? আশ্চর্য্য ত!

যতীশ একটু হেসে বল্লে—তা হলে আমার সঙ্গে যাচ্ছ ত?

রমেশ বল্লে—যেতে আপত্তি নেই; তবে রমেনকে আনিনি সেটা আবার ভাববে না?

যতীশ বল্লে—সে ভাবনা নেই। আমি দরোয়ানকে দিয়ে চিঠি দিয়ে দেব। হলো ত? এখন চলো।

২

রাত্রের আহারাদি সাঙ্গ হলে যতীশ ও রমেশ বারাণ্ডায় দুখানা ইজিচেয়ার টেনে নিয়ে বসেছিল। সামনের বাগানে চাঁদের আলো—তাদের চোখে মুখেও জোছনার স্পর্শ এসে লাগছিল। যতীশ অন্যমনে কোন চিন্তায় নিস্তব্ধ—রমেশ অলস ভাবে চেয়ারখানার উপর পড়ে একটা সিগারেট টানছিল।

হঠাৎ যতীশ বল্লে—রমেশ! আজ দু বচ্ছর পরে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল। কিন্তু তুমি সেই সন্ধ্যা থেকে চুপ করে রয়েছ, তোমার কি আমায় জিজ্ঞাসা করবার মত কোন কথা নেই?

রমেশ ধীরে ধীরে উঠে বসলো, হাতের সিগারেটটা নামিয়ে রেখে যতীশের মুখের দিকে চেয়ে সে বল্লে—তুমি ঠিক কথাই বলেছ যতীশ! তোমায় জিজ্ঞাসা করবার কথা আমার অনেক আছে, কিন্তু আমি কি যে তোমায় বোলবো—কোথা থেকে আরম্ভ করবো—কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। আমাদের নিবিড় বন্ধুত্বের মাঝে তুমি যে ব্যবধান তুলে দিয়েছ তাতে এত দিনের পর দেখা হলেও আর সহজ ভাবে মেশা যায় না: তোমায় দেখে পর্য্যন্ত অনেক কথাই মনে হচ্ছে—অনেক কিছুই বলতে ইচ্ছে হচ্ছে—কিন্তু বলতে পাচ্ছি না বলে শুধু অস্বস্তি ভোগ করাছি।

যতীশ বল্লে—বলতে না পারবার কারণ কি? আমি এমন কি—

রমেশ বাধা দিয়ে বল্লে—যখন তুমি কথাটা নিজে হতেই তুল্লে তখন বলি, কারণ তুমি ভদ্রসন্তানের অনুপযুক্ত কাজ করেছ—তোমাদের পারিবারিক মান-সম্ভ্রম নষ্ট করে তাঁদের একান্ত স্নেহের মর্য্যাদা হানি করেছ—একটা নিতান্ত লজ্জাকর সংস্রবে পড়ে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছ এবং একটি বিশ্বস্ত হৃদয়ের একাগ্র প্রেমের অপমান করে দেশান্তরে পালিয়ে এসেছ—তোমার মত উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশের শিক্ষিত যুবকের পক্ষে এগুলো কি সামান্য অপরাধ?

যতীশ অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বল্লে—তুমি আমার বিরুদ্ধে অনেক বড় বড় চার্জ আনলে, এসব কথার উত্তর পরে হবে। আপাততঃ আমার একটি ছোট্ট প্রশ্ন আছে তার উত্তর দাও।

রমেশ জিজ্ঞাসুনেত্রে তার মুখের দিকে চাইলে।

যতীশ বল্লে—আমি লতিকার কথাই বলছি—তার খবর কি?

রমেশ বল্লে—অনিল বোস বলে কে একজন ব্যারিষ্টার আছে, তুমি চলে আসবার পর তার সঙ্গেই লতিকার বিবাহ হয়ে গেছে।

যতীশ অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইলো। তারপর ধীরে ধীরে বল্লে—আমিও তাই আন্দাজ করেছিলুম।

রমেশ বল্লে—তা হলে তুমি এইখানেই থাকা স্থির করলে না কি? কলকাতায় আর ফিরবে না?

যতীশ বল্লে—কার কাছে যাব? আমার কেউ নেই, যারা আছে তারা কোন দিন আমায় চায় নি—কোন দিন চাইবেও না।

রমেশ বিরক্ত হয়ে বল্লে—এ মহাসত্য কবে থেকে আবিষ্কার কল্লে? তোমার বৃদ্ধ পিতা, তোমার ভাইয়েরা এ দু বচ্ছর তোমার খবর না পেয়ে—

যতীশ বল্লে—অত্যন্ত কাতর হয়েছেন, না? আমার ধারণা কিন্তু ঠিক বিপরীত।

রমেশ আর নিজেকে সামলাতে পারলে না, বল্লে—সে তো হবেই! অধঃপতন হলে মতি বুদ্ধিও তেমনি হবে ত?

যতীশ তার রুষ্ট মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—আমার সম্বন্ধে তোমাদের ধারণাটা দেখছি খুব উচ্চ! কিন্তু আমি সত্যই বলছি—আমি আজ পর্য্যন্ত এমন কোন কাজ করিনি যা আমার বা আমাদের পরিবারের পক্ষে লজ্জাকর বা অপমানজনক। তোমরা সকলে আমার সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা করে নিয়েছ।

রমেশ সংশয়ের দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলে। বল্লে—অর্থাৎ—

যতীশ গম্ভীর ভাবে বল্লে—অর্থাৎ যা হয়েছিল বলছি—কলেজে পড়বার সময় থেকেই গান-বাজনার দিকে আমার কি প্রবল ঝোঁক চেপেছিল ও তার ফলে ক্রমে ক্রমে কি করে আমাদের সঙ্গীত সভার উদ্ভব হলো সে সবই ত তুমি জান। আমার তখন প্রধান কাজ ছিল কলকাতার যত বড় বড় ওস্তাদদের ডেকে মাঝে মাঝে গানের মজলিস করা। বাইরে থেকেও যখন যে গুণী লোক আসতেন খবর পেলেই তাঁকে এনে একটা আসর জমান যেত। একবার দিল্লী থেকে একজন বিখ্যাত ওস্তাদ কলকাতায় এসেছেন সংবাদ পাওয়া গেল। শুনেই যথারীতি আমি তাঁর কাছে গিয়ে হাজির; অনেক সাধ্য-সাধনা করে' তাঁকে আমাদের সভায় নিয়ে এলুম। তাঁর গান হল। আমাদের ওস্তাদদের গানও তাঁকে শোনানো গেল। তারপর জলযোগের পালা—সে সময় ত তিনি খুব মন খুলে গল্প আরম্ভ কর্লেন। তিনি বয়স্থ লোক—সারা জীবন অনেক স্থানে ঘুরেছেন—অনেক কিছু দেখেছেন—সেই সব অভিজ্ঞতার কথা তিনি যখন সাড়-স্বরে বলতে সুরু কর্লেন আমরা তখন একেবারে অভিভূত হয়ে গেলুম। এ সব গল্প অবশ্য গান-বাজনা সম্বন্ধে।

কথায় কথায় তিনি বল্লেন—গান-বাজনা পেশা হিসাবে ত অনেকেই করে থাকে, সে এমন কিছু নয়। তবে যথার্থ গুণী লোকের সংখ্যা ত খুব কম। যারা সত্য সত্যই এ জিনিসটাকে জীবনের সাধনা বলে' গ্রহণ করেছে এমন লোক দু একজন ছাড়া আর কেউ তাঁর নজরে পড়ে নি। তার মধ্যে জয়পুরের কম্‌লা বাই একজন। এত বড় সুরের সাধিকা তিনি জীবনে আর কখনো দেখেন নি। আমাদের পুরাকালের শাস্ত্রোক্ত নৃত্যকলাতেও কম্‌লা বাই বিশেষ পারদর্শিনী। বহুদিন পূর্ব্বে গোয়ালিয়ারের রাজসভায় তিনি একবার কম্‌লা বাইকে কুমারী গৌরীর সাজে নৃত্য করতে দেখেছিলেন। নাচের কথাটা আমাদের সকলেরই কাছে নূতন—কাজেই এ বিষয় ভাল করে শোনবার জন্য আমরা উৎসুক হয়ে উঠলুম।

ওস্তাদজী বলতে লাগলেন—তপস্বিনী গৌরী মহাদেবকে স্বামীরূপে পাবার জন্য কঠোর তপস্যা কর্চ্ছেন। সে একাগ্র সাধনায় উপাস্য দেবতা আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁকে উপাসিকার কাছে আসতে হলো। কিন্তু তিনি বর দেবার আগে কুমারীকে পরীক্ষা করবার জন্য সন্ন্যাসীরূপে এসে শিবের অত্যন্ত নিন্দাবাদ ও তার মত অপদার্থের জন্য গৌরীর এ কঠোর তপঃক্লেশ যে সম্পূর্ণ নিরর্থক এই সমস্ত বলে' গৌরীকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা আরম্ভ করলেন। এই প্রসঙ্গে গৌরীর রোষ—শিবকে তিরস্কার—পরে মহাদেবের আত্মপ্রকাশে তাঁর লজ্জা ও বিস্ময়—ঈপ্সিতকে নিকটে পাবার অতুল আনন্দ ও তাঁর সান্নিধ্য থেকে লজ্জায় পলাইবার চেষ্টা এবং সে চেষ্টায় সক্ষম না হয়ে ন যযৌ ন তস্থৌ ভাব। গৌরীর এই ক্রোধ, পুলক, বিস্ময়, লজ্জা, আনন্দ, এই সব বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন ভাবপরম্পরা শুধু নৃত্যের মধ্যে মুখভঙ্গী অঙ্গবিন্যাস ও নানারূপ মুদ্রার দ্বারা ফুটিয়ে তোলাই ছিল সেই নৃত্যের বিষয়।

গোয়ালিয়ারের রাজসভায় কম্‌লা বাই বিশ বছর পূর্ব্বে এই নাচ দেখিয়েছিলেন—অপূর্ব্ব সে নৃত্য, অতুলনীয় সে কণ্ঠের সুর। আজও ওস্তাদজী সে কথা ভুলতে পারেন নি। তার পর থেকে আর একবার তাঁর গান শোনবার জন্য কত চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কম্‌লা বাই এমন দাম্ভিকা যে, গান শোনা দূরে থাক তাঁর সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করতে পারেন নি। কথাটা সকলে গল্প হিসাবেই শুনছিল, কিন্তু আমার যেন মনের মধ্যে এটা দৃঢ়মূল হয়ে বসে গেল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে' ওস্তাদজীর কাছ থেকে সেই রাজসভা ও সেই নাচের বৃত্তান্ত সব জেনে নিলুম। কম্‌লা বাই উপস্থিত কোথায় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্লেন—গত ১৪।১৫ বৎসর ধরে' তিনি কলকাতার * * * ষ্ট্রীটেই বাস কর্চ্ছেন। তবে তাঁর কথা বিশেষ কয়েকজন

ঘনিষ্ঠ লোক ছাড়া আর কেউ বড় একটা জানে না; কারণ তিনি বড় গর্ব্বিতা—কারু সঙ্গে মেশেন না—বেশি মুজরো নেন না। খুব বড় বড় রাজা মহারাজার বাড়ির ডাক এলে দু' একটা নেন, না হলে একান্তে বসে নিজের সাধনা নিয়েই থাকেন। কয়েকটা বিশেষ বিশেষ সুরের তাঁর যে সাধনা আছে সে অপূর্ব্ব!

সে-দিনের সভা ত ভঙ্গ হল। কিন্তু আমার মনে অহরহ কেবল কম্‌লা বাইয়ের কথা জাগতে লাগলো। ছোটবেলা থেকেই আমার একরোখা স্বভাব; অন্য লোকে যে কাজটা অসাধ্য বলে ছেড়ে দেয় সেই সব কাজেই আমার প্রবল ঝোঁক। যতই আমি এ-কথাটা ভাবি ততই আমার কেমন দুর্দ্দম্য খেয়াল চাপতে লাগলো যে, যেমন করে হোক তাঁকে আয়ত্ত করে তাঁর কাছ থেকে সুরগুলো আদায় কর্ত্তেই হবে।

তা ছাড়া ওস্তাদজী বর্ণিত সেই অশ্রুতপূর্ব্ব নৃত্যের বিবরণ আমার এত দিনের রসপিপাসু চিত্তের উপর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের রেখাপাত করেছিল।

যতই এ সব কথা ভাবতুম্ ততই তাঁকে একবার দেখবার প্রবল আগ্রহ আমায় চঞ্চল করে তুলতো। আমি স্থির সংকল্প করলুম, যে কোন উপায়েই হোক কম্‌লা বাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেই হবে।

রমেশ শুনতে শুনতে একবার চেয়ারখানার উপর নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসলো। তার মনে হল এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে আসছে।

যতীশ বলতে লাগলো—সংকল্প ত স্থির হল—এখন কি উপায় করা যায়? দিন কয়েক বাড়িখানার চার ধারে ঘুরতে লাগলুম। প্রকাণ্ড বাড়ি—ফটকে একজন দরোয়ান। একদিন তার কাছে গিয়ে বিবিসাহেবের সঙ্গে দেখা করবার কথা জানালুম; সে গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়লে, অর্থাৎ—অসম্ভব!

কথাটা জানাই ছিল, কাজেই না দমে দরোয়ানজীর সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলুম। কথায় কথায় জানালুম—বিবিসাহেবের সহিত আমার সাক্ষাতের অত্যন্ত প্রয়োজন; যদি সে কোন রকমে কাজটা করে দিতে পারে তা হলে আমি তাকে খুসি করে দেবো।

সঙ্গে সঙ্গেই দরোয়ানজীর হাতে একখানা নোট গুঁজে দিতেই তিনি প্রসন্ন হয়ে নরম সুরে জানালেন—এ বিষয়ে সর্দ্দার বেহারার সাহায্যের প্রয়োজন। আমি তৎক্ষণাৎ সর্দ্দার বেহারার জন্যও কিছু টাকা তার হাতে দিয়ে সে দিনের মত চলে এলুম।

পরদিন বৈকালে আবার গেটের কাছে দরবার করা গেল। দরোয়ানজী উপদেশ দিলেন—ঘাব্‌ড়ানা মৎ; দো চার দিন সবুর করনেসে হো যায়েগা।

তাই হলো। তিন চার দিন এই রকম চেষ্টার পর একদিন আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হলো। সেদিন আমি যেতেই সর্দ্দার বেহারা বাইসাহেবকে খবর দিয়ে এসে আমায় বল্লে—উপ্পর্ মে চলিয়ে।

আমি এ কয়দিন তো এই সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলুম, কিন্তু আজ উপরে যেতে হবে শুনেই হঠাৎ যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল। এতদিন ধরে যে-সব কথা বলতে হবে বলে গুছিয়ে ভেবে রেখেছিলুম সে সবই ভুল হয়ে বিশৃঙ্খল হয়ে গেল। এই অনভ্যস্ত স্থানে প্রবেশের ও এরকম অদ্ভুত সাক্ষাতের লজ্জা ও কুণ্ঠায় আমি যেন বিব্রত হয়ে গেলুম।

যাই হোক্ এতদূর এসে আর ফেরা যায় না। আমি কোন মতে নিজেকে সামলে নিয়ে বেহারার সঙ্গে উপরে উঠলুম। সে আমাকে দোতলার একটা বড় ঘরের সামনে নিয়ে গিয়ে ভিতরে যেতে বলে চলে গেল।

প্রবেশ করে দেখলুম, প্রকাণ্ড হল্; মেঝেয় মূল্যবান গালিচা, চার পাশের দেয়ালে চারখানা কারুকার্য্যখচিত বৃহৎ আয়না—দেয়ালের গায়ে গায়ে সঙ্গীত-শাস্ত্রোক্ত নানা রাগ-রাগিণীর ছবি। ঘরের মাঝখানে বাইসাহেব বসে—তাঁর চার পাশে আরও জনকতক লোক বসে ছিল। বাইসাহেবের সামনে একটি সোনার পানবাটা, পাশে

গুড়গুড়িতে সজ্জিত সুগন্ধি তামাকের সৌরভে ঘর আমোদিত—তাঁর কাছে দুখানা বড় বড় জয়পুরী পিতলের থালায় স্তূপাকার ফুল ও মালা।

বাইসাহেবের বয়স প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। রাজপুত রমণীসুলভ অত্যন্ত সুশ্রী ও তেজোদৃপ্ত রূপ। মুখের উপর একটা বিপুল গর্ব্ব ও উগ্রতার ছায়া।

তিনি ক্ষণকাল আমায় বিশেষ ভাবে দেখে অভ্যর্থনা করে বল্লেন—আইয়ে বাবুসাহেব—বৈঠিয়ে।

অন্য লোকগুলোও একদৃষ্টে আমায় নিরীক্ষণ করছিল। আমার তখন রীতিমত হৃৎস্পন্দন সুরু হয়েছে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বাইসাহেব আমায় বল্লেন—কি প্রয়োজনে আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন?

আমি একবার ঘরের লোকগুলোর দিকে চাইলুম। তারপর তাঁর দিকে ফিরে বল্লুম—বিশেষ প্রয়োজনে আমি আপনার কাছে এসেছি। কিন্তু আমার বক্তব্য শুধু আপনার কাছে নির্জ্জনে আমি বলতে চাই।

তিনি বোধ হয় ভেবেছিলেন কোন বিশেষ সম্ভ্রান্ত ঘর থেকে আমি তাঁকে গানের মুজরো দিতে এসেছি। কিন্তু আমার এ অদ্ভুত উত্তর শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তিনি আমার মুখের দিকে চাইলেন; তার পর কি ভেবে ঘরের লোকগুলোকে বাইরে যেতে ইঙ্গিত কল্লেন। তারা ঈর্ষ্যাকুল নেত্রে আমার দিকে চাইতে চাইতে চলে গেল।

বাইসাহেব তখন আবার বল্লেন—আমার সর্দ্দার বেহারার কাছে শুনলুম আপনি কয়েক দিন ধরে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন। আপনার কি প্রয়োজন এখন বলতে পারেন।

আমি উত্তরে শুধু বল্লুম—আমার কোন প্রয়োজন নেই, আমি কেবল আপনাকে দেখবার জন্য এসেছি।

তিনি হয়তো আমার মুখে এ রকম কথা শোনবার আশা করেন নি; কারণ আমার কথা শুনেই তাঁর মুখের ভাব অত্যন্ত কঠোর ও গম্ভীর হয়ে উঠলো।

পাছে তিনি ভুল বোঝেন তাই তিনি কিছু বলবার আগেই আমি তাড়াতাড়ি বল্লুম—আপনি জানেন না—কিন্তু আমি আপনাকে গত বিশ বৎসর ধরে দেশে দেশে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনার নাম পরিচয় কিছুই আমি জানতুম না, তাই এতদিন কোন সন্ধান করতে পারি নি। মাত্র কয়েক দিন আগে আমি আপনার নাম জানতে পেরেছি। এত কাছে আপনি আছেন জেনে আর কিছুতে আমি স্থির থাকতে পারি নি, তাই কয়েকদিন ধরে আপনাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ছুটোছুটি কচ্ছিলুম।

তিনি অবাক্ হয়ে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আমার মাথাটা প্রকৃতিস্থ আছে কি না সে বিষয়ে বোধ হয় তাঁর সন্দেহ হচ্ছিল।

যাই হোক, তিনি ক্ষনেক পরে অত্যন্ত অবিশ্বাস্য ভাবে বল্লেন—আপনি কি বলতে চান্—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমিও আবার বল্লুম—আমি বলছি যে গত বিশ বৎসর ধরে আমি আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম।

তিনি বল্লেন—অসম্ভব! বিশ বৎসর ধরে! এখন আপনার বয়স কত?

আমি বল্লুম—আটাশ বৎসর।

তিনি বল্লেন—অথচ আপনি বিশ বৎসর আমায় খুঁজছিলেন? আর কেনই বা? কি প্রয়োজনে আমায় খুঁজছিলেন?

আমি তখন বল্লুম—দেখুন সংসারে প্রয়োজনটাই কি সব চেয়ে বড় জিনিস? বিনা প্রয়োজনেও অনেকে অনেক কিছু করে। আমিও প্রথমেই আপনাকে বলেছি আমার প্রয়োজন কিছু ছিল না; আমি শুধু আপনাকে একটিবার দেখবার জন্যই চারিদিকে সন্ধান করছিলুম।

বাইসাহেব যেন কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। যে অপরিচিত ব্যক্তি এসে পর্য্যন্ত তাঁর মুখের উপর নির্ব্বিকার ভাবে তাঁকে শুধু দেখবার আগ্রহ এমন পুনঃ পুনঃ ঘোষণা

করছে তাকে যে কি উত্তর দেবেন—তা বোধ হয় তাঁর মনে আসছিল না।

তাঁকে তদবস্থ দেখে আমি তখন যেন কতকটা আত্মগত ভাবেই বল্লুম—বিশ বৎসর আগে গোয়ালিয়ারের রাজসভায় আমি প্রথম আপনাকে দেখেছিলুম।

তিনি একটু উৎসুক ভাবে আমার দিকে চাইলেন—বল্লেন—গোয়ালিয়ারে? তারপর কি যেন ভাবতে লাগলেন।

আমি ঘাড় নেড়ে বল্লুম—হাঁ, গোয়ালিয়ারে। সে এক বিরাট রাজসভা, বিপুল ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বরের অপূর্ব্ব অনুষ্ঠান! আরো অনেক রাজা মহারাজা সে সভায় নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। সেই উৎসব রজনীর অতুল জাঁক-জমকের মধ্যে নৃত্যের আসরে তপস্বিনী গৌরীর বেশে আমি আপনাকে সেই সভায় দেখলুম।

তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি বল্লেন—ঠিক বলেছেন। আমার মনে পড়েছে, বহুদিন পূর্ব্বের কথা—রাজকন্যার বিবাহ-উৎসবে নাচের নিমন্ত্রণ পেয়ে আমি গোয়ালিয়ারে গিয়েছিলুম।

আমি বল্লুম—হাঁ, গিয়েছিলেন। আমার বাবা তখন সেখানকার প্রধান বিচারপতি। তাঁর সঙ্গে আমিও সে সভায় উপস্থিত ছিলুম। আপনার সে-দিনের অপূর্ব্ব নৃত্যের প্রশংসায় সকলে মুখর হয়ে উঠেছিল। তার পরেও কতদিন গোয়ালিয়ারের ঘরে ঘরে শুধু আপনারই কথা। তারও পরে ক্রমে সকলে এ-বিষয় ভুলে গেল, কিন্তু একটি আট বৎসরের বালকের অন্তরে আপনার সেদিনকার সেই উজ্জ্বল ভাস্বর রূপ যে দৃঢ়মূল হয়ে বসে গেল জীবনে সে আর আপনাকে ভুলতে পারলো না।

বাইসাহেবের মুখে বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠলো। তিনি কোন কথা না বলে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

আমি দেখলুম, তিনি আমার গল্প শুনে খুব অভিভূত হয়ে গেছেন। আর রাগ বা বিরক্তি তাঁর পক্ষে অসম্ভব। আর এ-রকম অবাধ স্তুতি শুনলে মানুষ কতক্ষণই বা বিরূপ হয়ে থাকতে পারে?

যা হোক, তাঁকে আরও তাক্ লাগিয়ে দেবার জন্য আমি বলতে লাগলুম—উৎসব ত শেষ হল; নিমন্ত্রিতেরা যে যার স্থানে ফিরে গেলেন, সহরে আবার পূর্ব্বের সেই শান্তি ফিরে এলো। আমি কিন্তু মনে মনে অশান্ত হয়ে উঠতে লাগলুম। আপনাকে আবার দেখবার আগ্রহ আমায় আকুল করে তুলতো, কিন্তু আমি সে-কথা কারুকে বুঝিয়ে বলতে পারতুম না—হয় ত নিজেও ভাল করে বুঝতুম না। খালি সকলকে জিজ্ঞাসা করতুম, সেই নাচ আবার কবে হবে, কেনই বা আবার সে রকম কিছু আয়োজন হচ্ছে না? প্রথম প্রথম বালকের কৌতূহল বলে আমায় সকলে আশ্বাস দিয়ে ভুলিয়ে রাখতো, কিন্তু ক্রমশঃ কেবলই আমার এ অসঙ্গত প্রশ্ন ও আগ্রহে সবাই উত্যক্ত হয়ে উঠলো। তার পর এ-সম্বন্ধে কিছু বলতে চাইলেই আমার ভাগ্যে জুটতো শুধু তিরস্কার ও লাঞ্ছনা। আট বৎসরের বালক পড়া-শুনো সব ছেড়ে খালি নাচের সন্ধানে ফিরবে এ অদ্ভুত আবদার অভিভাবকেরা কি করেই বা সহ্য করেন?

ধমক-ধামকের ভয়ে মুখ ফুটে আর কিছু বলতে সাহস কর্ত্তুম না। কিন্তু মন থেকে সে-কথা মুছলো কই? আমার খুব মনে আছে—কত দিন রাত্রে আপনার কথা মনে পড়ে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে কত কেঁদেছি। পড়তে বসে সামনে বই খোলা থাকতো—আমি আপনার চিন্তায় তন্ময় হয়ে যেতুম। মন যখন অত্যন্ত আকুল হয়ে উঠতো তখন আমি নিজেকে নিজেই সান্ত্বনা দিতুম যে, আমি বড় হয়ে যেমন করে পারি আপনাকে খুঁজে বের করবোই—আবার আপনার সঙ্গে আমার নিশ্চয় দেখা হবে।

বাইসাহেব স্তব্ধ হয়ে আমার এ কল্পিত বেদনার কাহিনী শুনছিলেন। একটি ছোট ছেলে তাঁর জন্য এত দিন ধরে এত দুঃখ পেয়েছে শুনতে শুনতে তাঁর অন্তরেও বোধ হয় তখন বিস্ময় ও করুণা জেগে উঠছিল।

আমি বলতে লাগলুম—তার পর ক্রমে বড় হলুম। আমার স্বাভাবিক মনোবৃত্তি আমাকে সঙ্গীতের দিকে আকৃষ্ট করেছিল; আমি গান-বাজনা শিখতে আরম্ভ করলুম। সেই সূত্রে ক্রমে অনেক বড় বড় গুণী লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলো। সুবিধা পেলেই আমি তাঁদের কাছে আপনার সন্ধান পাবার চেষ্টা করতুম, কিন্তু কোন খবর পাইনি; অথচ এই অভাবের বেদনায় সময়ে সময়ে মন আনচান করে উঠতো। অবশেষে আমি এই কারণে একদিন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। তার পরে কত দেশ-বিদেশে ঘুরেছি, কত লোককে জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু আমি ত আপনার নাম বা পরিচয় কিছুই জানতুম না, কাজেই আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'লো!

বাইসাহেব নিজের মনেই বল্লেন—আমি এ রকম আশ্চর্য্য কথা জীবনে কখনো শুনি নি। এ কি অদ্ভুত কাণ্ড!

আমিও গম্ভীর মুখে বল্লুম—সত্যই এ-সব কথা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। কিন্তু সংসারে প্রতি-নিয়ত কত অসম্ভব ঘটনাই ঘটতে থাকে—কে তার খবর রাখে? যা হোক, আপনার সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাবার আশা যখন ক্রমেই আমার শেষ হয়ে আসছিল তখন মাত্র হপ্তাখানেক আগে উত্তর-পশ্চিমের একজন ওস্তাদের মুখে আমি আপনার নাম শুনলুম। তিনিও আমার মত আপনাকে গোয়ালিয়ারের রাজ সভায় দেখেছিলেন। কথায় কথায় গল্পচ্ছলে তিনি আপনার সেই নাচের বর্ণনা করতেই আমি তখনি সমস্ত বুঝলুম। তারপর তাঁর কাছ থেকে আপনার সম্বন্ধে সমস্ত কথা ভাল করে জেনে নিলুম। ওস্তাদজী অবশ্য আমায় বলেছিলেন—আপনি কারু সঙ্গে সহজে দেখা করেন না। কিন্তু আমি যাঁর জন্য এত দীর্ঘকাল ধরে এত দুঃখ ভোগ করেছি, যাঁকে একবার দেখবার জন্য আকুল হয়ে দেশ-বিদেশে ছুটে বেড়িয়েছি, তিনি এত নিকটে আছেন এ-খবর পেয়ে স্থির থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব—তাই আপনি হয় ত বিরক্ত হবেন জেনেও একবার এখানে আসবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা আমি কিছুতেই সম্বরণ করতে পারলুম না।

বাইসাহেব একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন। আমার কথা শেষ হতেই তিনি একটু কুণ্ঠিত ভাবে বল্লেন—না না, সে কথা আপনি ভাবছেন কেন? বিরক্ত হবার কারণ এতে কি থাকতে পারে? কিন্তু আমি শুধু আপনার কথাই ভাবছি। একটি আট বছরের বালকের মনে এত দীর্ঘকাল ধরে...আমার এত আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে—আমি যেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না!

আমি বল্লুম—আপনি ঠিক কথাই বলছেন। বড় হয়ে প্রথম প্রথম আমার মনেও এই অহেতুক আকর্ষণের কারণ জানবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ হত। আমি এ-সম্বন্ধে অনেক ভেবেছি, অনেক খোঁজ করেছি। এখন কিন্তু আমার মনে আর কোন সংশয় নেই; এখন আমার এ-বিষয়ে একটা স্থির বিশ্বাস হয়ে গেছে।

বাইসাহেব অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আমার দিকে চাইলেন।

আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বল্লুম—লোক মুখে শুনেছি এবং আমাদের শাস্ত্রেও আছে এ-রকম অজ্ঞাত আকর্ষণের মূলে অনেক সময় জন্ম-জন্মান্তরের গভীর যোগ থাকে। কে বলতে পারে—আপনি হয় তো পূর্ব্বজন্মে আমার পরম আত্মীয় ছিলেন।

আমি অত্যন্ত সহজ ও সরল ভাবে কথাটা বল্লুম। তাঁর কি মনে হলো জানি না, কিন্তু তাঁর মুখের সে উগ্র কঠোর ভাব ঘুচে একটি অতি কোমল স্নেহ-করুণ আভা ফুটে উঠলো। তিনি কোন কথা বলতে পারলেন না, শুধু আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন—বোধ হল অত্যন্ত বিচলিত হয়েছেন।

প্রথম দিন আর বেশি বাড়াবাড়ি না করাই ভাল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমি সে-দিনের মত বিদায় প্রার্থনা করলুম। বল্লুম—আপনাকে আজ দেখে আমার

এতদিনের সমস্ত দুঃখ ও উদ্বেগ দূর হল; এখন তবে উঠি। আমার অবশ্য রোজই আপনার কাছে আসবার ইচ্ছা হবে, কিন্তু আপনার সময়ের মূল্য আছে, কাজেই—

তিনি ব্যস্ত হয়ে বল্লেন—আমার কোন ক্ষতি হবে না। এ-সময় তো আমার হাতে কোন কাজ থাকে না—আপনি যদি আসেন আমি তা হলে খুব খুসি হব।

আমি উঠলে তিনিও উঠে এসে সিঁড়ি পর্য্যন্ত আমায় এগিয়ে দিয়ে গেলেন। বিজয়ের উল্লাসে উৎফুল্ল হয়ে আমি সেদিন বাড়ি ফিরে এলুম।

এই পর্য্যন্ত বলে যতীশ একবার একটু থামলো। রমেশ আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বল্লে—বাহাদুরী আছে যা হোক্। এমন অদ্ভুত আষাঢ়ে গল্প মাথায় যোগাল কি করে? আমরাত সাত জন্ম মাথা কুটলেও এমন উদ্ভট গল্প বানাতে পারতুম না।

যতীশ একটু হেসে আবার বলতে লাগলো—তার পর দিন যেতেই খুব সমাদর। দরোয়ান আমায় দেখেই সেলামের উপর সেলাম বাজিয়ে তখনি বেহারাকে ডাক দিলে। বেহারা প্রস্তুত ছিল, তখনি ছুটে হাজির—তার সঙ্গে উপরে গেলুম। বাইসাহেব বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রকাশ্যে কিছু না বল্লেও আমি বুঝলুম তিনি আমারই জন্য প্রতীক্ষা করছেন।

সে-দিন হলে আর কেউ ছিল না। পূর্ব্বদিনের গল্পের সঙ্গে যোগ রেখে সেদিনও অনেক গল্প তৈরি করে আসর জমালুম। তিনিও তাঁর পূর্ব্ব জীবনের অনেক কথা—তাঁদের দেশের অনেক গল্প—বল্লেন। বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে গেল। রাত্রে ফেরবার সময় তিনি আমাকে আতর ও ফুলের মালা উপহার দিয়ে আবার আসতে অনুরোধ করলেন।

ক্রমশঃ এই রকম যাতায়াতের ফলে তাঁর সঙ্গে আমার বিশিষ্ট ঘনিষ্ঠতা জন্মে গেল। মানুষকে আমরা বাইরে থেকে দেখে কতটুকুই বা বুঝি? মুখের আলাপে ও বন্ধুত্বে তার বাহ্যিক সাজানো রূপ ও আড়ম্বরই চোখে পড়ে—অন্তরের যে সত্য পরিচয় সে গোপনেই থাকে। রাজ-স্থানের বিখ্যাত গায়িকা কমলা-বাইকে যারা জানতো তারাও দেখেছিল শুধু তাঁর বাহ্যিক গর্ব্বিত রূপ ও আড়ম্বর। আমার সঙ্গে ক্রমে যতই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতে লাগলো ততই আমি বুঝলুম, ঐশ্বর্য্য ও ভোগ-বিলাসের প্রাচুর্য্যের মধ্যে তাঁর অন্তর কি দারুণ রিক্ত! তাঁর শূন্য একক জীবন কি ব্যর্থ ও করুণ!

তাঁর কথাবার্ত্তার মধ্যে মাঝে মাঝে তাঁর মনের জালা ও বেদনা পরিস্ফুট হয়ে উঠতো। তিনি বলতেন, সংসারে যখন গৃহে গৃহে মঙ্গল উৎসব জমে ওঠে তখন চারিদিকের আনন্দ ও হাসি-খেলার মাঝে ঐ মিলন আরো মধুময় করে তোলবার জন্য আমাদের আহ্বান আসে—সভাগৃহ সাজে সজ্জায় আলোর মালায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আমরাও উৎসাহে আনন্দে প্রফুল্ল চিত্তে মিলনের রাগিণী গেয়ে এই মহোৎসবকে পরিপূর্ণ করে তুলি। লোকে তখন আমাদের বাহ্যিক জাঁক-জমক দেখে মুগ্ধ হয়; আমাদের প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে; কিন্তু যখন উৎসব শেষ হয়, আলো নিভে যায়, তখন আমরা সকলকে আনন্দ দান করে নিজের শূন্য নিরানন্দ গৃহে ফিরে এসে অবসন্ন মনে লুটিয়ে পড়ি। আমাদের তখনকার বিপুল বেদনা ও হতাশার খবর কে রাখে? তখন নতুন করে মনে পড়ে নিজেদের অবস্থা। আমরা এই সংসার রঙ্গভূমে এক একটি দর্শক মাত্র। আমাদের সামনে এই যে সুখে দুঃখে হাসি কান্নায় ভরা বিচিত্র জীবনের স্রোত বয়ে চলেছে এর সঙ্গে আমাদের কোন যোগ নেই—আমাদের দিন এমনি তৃষাতুর হয়েই কাটবে।

আবার হয় তো একটু থেমে কি ভেবে বলতেন—আগে কিন্তু আমাদের এ-রকম অবস্থা ছিল না। আমাদের বাল্যজীবনেও দেখেছি আমাদের এ-শিক্ষা একটা জীবিকা-অর্জ্জনের পেশা ছিল। তখনকার দিনে এ-ব্যবসা করে যারা দিনপাত করতো তারা সকলেই গৃহস্থ, সংসারী, স্ত্রী, সন্তানের জননী ছিল। যখন কোন স্থান থেকে ডাক

আসতো তখন তারা অন্যান্য নিমন্ত্রিতের মত গৃহস্বামীর কাছে বাড়ির কন্যার মতই সমাদর ও সম্মান পেত। ঘটনাচক্রে অবস্থার ফেরে এখন সে-সকল দিনের কত পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে।

আমি তাঁর কাছে বসে নীরবে এ-সব গল্প শুনতুম। একটা করুণ সহানুভূতিতে আমার অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠতো।

কথা শেষ করে তিনি অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকতেন, কি তাঁর মনে হতো কে জানে। বলতেন আমি যদি সেই রকম গৃহস্থ ভাবে থাকতে পারতুম তা হলে এত দিন আমার ঠিক তোমার মত এত বড় এমনি সুন্দর ছেলে হতো।

তাঁর অন্তর যদি এমনি শূন্য ও তৃষিত না হতো তা হলে আমার পক্ষে তাঁকে একটা উদ্ভট কাল্পনিক গল্প শুনিয়ে এত সহজে আমার প্রতি আকৃষ্ট করা সম্ভব হতো না। আমি দেখতুম, আমায় উপলক্ষ্য করে তাঁর এতদিনের বুভুক্ষিত তৃষার্ত্ত মাতৃহৃদয় যেন দিনে দিনে বিকশিত হয়ে উঠছিল।

কতদিন নিজে পরিশ্রম করে আমার জন্য নানা রকম উপাদেয় খাদ্য তৈরি করে কাছে বসে আমাকে খাওয়াতেন—আমি বলতুম, আপনার ত এ সব কাজ অভ্যাস নেই—কেন আপনি অনর্থক এত কষ্ট স্বীকার করে এ-সব প্রস্তুত করতে যান্? মহারাজকে বলে দিলে সেই ত সব করে দিতে পারে?

বাইসাহেব কোন কথা না বলে শুধু একটু হাসতেন। সে-হাসিটি অশ্রুজলের মতই স্নিগ্ধ ও করুণ।

আমি খুব পরিতৃপ্তির সঙ্গে পাত্র নিঃশেষ করে খেতুম—তখন তাঁর মুখে একটা গভীর সুখ ও তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠতো।

তাঁর ব্যবহারিক জীবনেও দিন দিন বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটছিল। আমার সঙ্গে পরিচয় হবার দু' পাঁচ দিন পরেই তাঁর সে অম্বুরী তামাক ও গুড়গুড়ি অন্তর্হিত হয়েছিল: বেশভূষার আড়ম্বর ক্রমশঃই কমে অত্যন্ত সাধারণ পরিচ্ছন্ন পোষাকে দাঁড়িয়েছিল।

তাঁর অনুচরবৃন্দকে আর আগের মত দেখতে পেতুম না। একদিন সে-কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় বল্লেন—তাদের সঙ্গ আর ভাল লাগে না।

এদিকে আমার অবস্থাটা অদ্ভুত হয়ে দাঁড়ালো। আমি তাঁকে ছলনা করে গোটাকয়েক সুর আয়ত্ত করে নেব—এই উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়েছিলুম—কিন্তু আমার প্রতি তাঁর এ অকৃত্রিম স্নেহের পরিচয় পেয়ে আমি আর সে-কথা ভাবতে পারতুম না। সে-কথা ভাবতে গেলেই একটা গভীর ধিক্কার ও আত্মগ্লানিতে আমার মন ভরে উঠতো। যে সারা জীবনভোর সংসারে সকলের কাছে শুধু বঞ্চনাই পেয়ে এসেছে—আমিও অবশেষে এমন স্বার্থপরের মত অনায়াসে তাকে এত বড় প্রতারণা করলুম? আমার এতদিনের উচ্চশিক্ষা, ভদ্রতা ও আভিজাত্যের এই পরিণাম? কি করে যে আমার মাথায় এমন দুর্বুদ্ধি যোগাল তাই ভেবে আমি নিজের কাছেই লজ্জায় কুণ্ঠায় মরে যেতুম।

একদিন সন্ধ্যা রাত্রে কথায় কথায় তিনি নিজেই সে প্রসঙ্গ তুল্লেন। গান-বাজনার কথাই হচ্ছিল। হঠাৎ কি মনে পড়ায় বাইসাহেব বল্লেন—তুমি গান-বাজনা শিখেছ—বলছিলে না?

বারাণ্ডার ধারে ধারে বসান ফুলের টবে রজনীগন্ধা ফুটেছিল—আমি তার মধ্যে একটা স্তবক তুলে নিয়ে বল্লুম—সে আর শেখা নয়। ওস্তাদজী সেদিন বলছিলেন—আজকাল লোকে সুর নিয়ে খেলা করে। সে-শেখার পিছনে প্রাণ নেই, অধ্যবসায় নেই। এ-শিক্ষার জন্য যে সাধনার প্রয়োজন সে কেউ করতে চায় না। আমারো মনে হয়—কথাটা ঠিক।

বাইসাহেব বল্লেন—অনেকটা সত্যই বটে। অনেকে এর পিছনে বিশেষ পরিশ্রম করতে চায় না। কোন রকমে বাজার চলতি গোছ হলেই হল। আমি কিন্তু ও

জিনিসটাকে অত সাধারণ ভাবে দেখতে পারি না। এতটা বয়স আমার ছুটো তিনটে সুরের সাধনা কর্ত্তেই কেটে গেল। তুমি যদি শিখতে চাও তা হলে আমি যা জানি তোমায় শেখাতে পারি।

কথাটা তাঁর মুখ থেকে শুনে মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। তবু ভয়ে ভয়ে বল্লুম, শেখবার আগ্রহ আমার খুব আছে—তবে সাহস হয় না—আপনার মত ও-রকম সারা মনপ্রাণ দিয়ে একাগ্র সাধনা কি আমি করতে পার্ব্ব?

আমার এ সঙ্কোচ দেখে তিনি খুসি হয়ে বল্লেন—তুমি নিশ্চয়ই পার্ব্বে। তোমার মধ্যে সে একাগ্রতা আছে—আমি বুঝতে পেরেছি। যে জিনিসটা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে চায় তাকে শেখাতেও আনন্দ আছে। তুমি প্রথম কিছুদিন আমার আলাপ শোন। দেখ, তোমার কি রকম লাগে।

বাইসাহেব উঠে গিয়ে তাঁর সেতার নিয়ে এলেন। রাত তখন প্রায় নয়টা—ছু' একটা সুরের টান দিতেই বুঝলুম—এ এক অপূর্ব্ব সাধনা।

খুব উচ্চ অঙ্গের না হলেও আমি নিজে প্রায় দশ বার বছর ধরে বিশেষ যত্ন ও চেষ্টায় এ শাস্ত্র কতকটা আয়ত্ত করেছি। এতাবৎ কাল অনেক বড বড় গানের আসরে গিয়েছি। দেশবিখ্যাত নামজাদা ওস্তাদের হাতের বাজনাও শুনেছি বিস্তর—কিন্তু বাইসাহেবের হাতে সেতারে যে সুরের আভাস পেলুম সে রকম জীবনে আর কখনো শুনি নি।

সেদিন বোধ হয় পূর্ণিমার রাত্রি—জোছনার আলোয় চারিদিক মগ্ন—বারান্দায় ছাতে ঘরে সর্ব্বত্র চাঁদের আলো যেন একটা ঘুমন্ত মায়াপুরীর রচনা করেছিল—রজনীগন্ধা ও হাস্নাহানার মৃদু মদির সুবাসে বাতাস বিহ্বল! উপরে আর কোন লোক ছিল না—বাই-সাহেবের হাতে সেতারে ক্রমে ক্রমে অপূর্ব্ব সুরের লহরী জমে উঠতে লাগলো।

প্রথমে অত্যন্ত মৃদু—অত্যন্ত কোমল—অস্ফুট রাগিণীর মত একটা সুর ধীরে ধীরে বাজছিল। যেন কার অন্তরের গোপন কাহিনীর মত—যে আত্মপ্রকাশ করবার জন্ম ব্যাকুল—অথচ যেন সঙ্কোচে, কুণ্ঠায় মনের কথা কিছু-তেই ফুটতে চাইছিল না। সে সুরে কত আকুলতা—কত মিনতি! তারপর ক্রমে ক্রমে সেই অব্যক্ত সুর পরিস্ফুট হয়ে যেন সমস্ত আকাশ বাতাস ব্যাপ্ত করে ফেল্লে। মনে হল, সে কোন এক অতৃপ্ত হৃদয়ের ব্যর্থ বেদনার উচ্ছ্বাস! চন্দ্রালোকিত মধুর রজনীতে শুব্ধ জোছনার মাঝে—পুষ্পিত ফুলবনের মধ্যে—সেই আশাহত রুদ্ধ অভিমানের সুর যেন কেঁদে ফিরতে লাগলো। সুরের টানে টানে কত অব্যক্ত অভিমান—কত নিস্ফল ব্যথার গুঞ্জন! চারিদিক যেন একটা অজ্ঞাত বেদনার ভারে পরিপূর্ণ—বাতাস সে ভারে শুব্ধ—চন্দ্রালোক মূর্চ্ছিত—আমার অন্তরও এক অব্যক্ত বেদনায় টন্-টন্ করে উঠছিল। অজ্ঞাতে আমার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠলো।

বাইসাহেবের চোখ ছুটি মুদ্রিত—তাঁর সে সময় বাহজ্ঞান কিছু ছিল না। সমস্ত মনপ্রাণ তাঁর যেন সুরের ভিতর নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। সুরের পর সুর। কেবল সুরের অপূর্ব্ব খেলা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোথা দিয়ে কেটে গেছে কিছু বুঝতে পারিনি।

যখন তিনি সেতার নামিয়ে রাখলেন তখনো যেন চারিদিকে সেই সুরের রেশ। আমি শুব্ধ হয়ে গিয়ে-ছিলুম—বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আমি আর কোন কথা বলতে পারলুম না। আমার সেই শুম্ভিত সমাহিত ভাব দেখে তিনি প্রসন্ন হয়ে বল্লেন—তুমি সমঝদার বটে। তোমার শীঘ্রই হয়ে যাবে। তবে প্রথম কিছুদিন শুধু এই সব বিভিন্ন সুরের আলাপ শুনে যাও। তার পর শিক্ষা।

সেদিন অর্দ্ধেক রাত্রে আমি স্বপ্নাচ্ছন্ন মুগ্ধচিত্তে কখন যে বাড়ি ফিরে এসেছিলুম সে কথা মনে পড়ে না।

৩

আমার কেমন সুরের নেশা লেগে গেল। সেই দিন

থেকে সন্ধ্যার পর হতে রাত এগারটা বারোটা পর্য্যন্ত এই রকম মোহের মধ্যে কাটতে লাগলো। তখন কোথায় রইলো বাহ্য জগৎ—আর কোথায়ই বা সংসারের বিধি-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের শৃঙ্খলা!

এদিকে আমি যখন এইরূপ বিভোর—তখন আমার চারিদিকে বেধে উঠলো বিষম বিপ্লব। প্রতিদিন বৈকালে লতিকাদের বাড়ি যাওয়া আর সেখানে রাত দশটা পর্য্যন্ত কাটিয়ে বাড়ি ফেরা—এটা কিছুকাল থেকে বাঁধা বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রায়ই অন্যথা হত না। যদি কোন দিন সঙ্গীত-সভার মজলিস থাকতো—তা হলেও পূর্ব্বাহ্ণে সে খবর তাকে দিয়ে আসতুম। বাইসাহেবার সম্বন্ধে আমার মাথায় এই অদ্ভুত খেয়াল চাপবার পর থেকে এই নিয়মের ব্যতিক্রম সুরু হলো। নতুন উৎসাহে ও কার্য্যসিদ্ধির আগ্রহে তখন লতিকার কথা আমার মনে আসতো না। সন্ধ্যার সময়টা নানা ফন্দী ও উপায় আবিষ্কার করতে ও দরোয়ানজীর সঙ্গে দরবার করতেই কাটতো। রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে প্রতিদিনই ভাবতুম, কাল নিশ্চয়ই যাব—তবে কার্য্যকালে ঘটে উঠতো না।

কয়েক দিন এই ভাবে কাটবার পর—যেদিন বাই-সাহেবার সঙ্গে দেখা হল তার পরের দিন—আমি লতিকাদের বাড়ি গেলুম। দেখি, সকলেরই মন ভার ভার। তার মা বল্লেন—কদিন তুমি এসো নি—আমরা ভাবছিলুম কিছু অসুখ-বিসুখই বা হল—তা তোমার বাড়িতে খবর নিয়ে জানলুম, ভালই আছ—তবে...পরের কথাটা আর তিনি উচ্চারণ করলেন না

আমি তাঁর অনুচ্চারিত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বল্লুম—একটা বিশেষ কাজের জন্য কদিন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলুম—তাই আসতে পারি নি।

অনিল বোস—কে এক ব্যারিষ্টার দিন-কতক থেকে লতিকার জন্য ঘোরাঘুরি করতো—তবে বিশেষ আমল পেত না। এই কদিনে দেখি—সে এখানে বেশ জমিয়ে নিয়েছে। লতিকার সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়েই যেন তারই ভার—এম্নি একটা ভাব! যা হোক্—আমি তখন সেটা গ্রাহ্য করলুম না। লতিকা আমায় এড়িয়ে চল্‌ছে দেখে আমি মনে মনে হাসলুম। আমি জানতুম সে রাগ করেছে—তবে সে জন্য আমার কোন দুশ্চিন্তা ছিল না—কারণ এ কয় দিনের উদ্ভট গল্প শুনলে সে না হেসে থাকতে পারবে না এবং তখনি সব মিটমাট হয়ে যাবে এটা আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল। কিন্তু অনিলের মোড়লির জন্য একবারও তাকে একান্তে কাছে পেলুম না।

ক্রমে চায়ের সময় হলো। লতিকা প্রতিদিনের মত আমাদের সকলকে চা ও খাবার সাজিয়ে দিলে। অনিল অনেক হাসির গল্প করছিল—আমিও মাঝে মাঝে সভা জমাবার চেষ্টা করলুম—কিন্তু লতিকা আমার ও অনিলের—উভয়ের—সম্বন্ধেই নির্ব্বিকার! সে কথাবার্ত্তায় বিশেষ যোগ না দিয়ে চা খাওয়া শেষ করে উঠে গেল।

আমি তার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ বসে রইলুম। সন্ধ্যার পর আমায় আবার বাইসাহেবার কাছে যেতে হবে—কাজেই আমি মনে মনে চঞ্চল হয়ে উঠছিলুম। কিন্তু লতিকা কোথায় যে গেছে—সে আর কিছুতেই আসে না। অবশেষে বিরক্ত হয়ে আমি যখন চলে আসছি—তখন দেখি—এক-তলার একটা ঘরে জানালার ধারে সে দাঁড়িয়ে পথের দিকে চেয়ে আছে। আমি কাছে গিয়ে ডাকলুম—লতিকা!

সে একবার চেয়ে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলে। আমি বল্লুম—লতিকা, তুমি আমার উপর রাগ করেছ?

সে চুপ করে রইলো। তার পর বল্লে, আমার রাগে তোমার কি আসে যায়?—এইটুকু বলতেই তার ঠোঁট কাঁপতে লাগলো। চোখের জল লুকোবার জন্য সে তাড়া-তাড়ি পথের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

তার এ অভিমানটুকু আমার কাছে বড় মধুর বলে মনে হল। তার কাছে সরে গিয়ে কি একটা কথা বলতে যাব—এমন সময় অনিলটা কোথা থেকে ছুটতে ছুটতে এসে বল্লে—এ কি? মিস দত্ত! আপনি এখানে? আমি আপনাকে এতক্ষণ ধরে চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি!

তার পর আমার দিকে একটা কটাক্ষ করে আমাকে শুনিয়েই বল্লে—মা বলছিলেন—একেই ত কদিন ধরে আপনার শরীর খারাপ রয়েছে—তার উপর নীচের এই বন্ধ ঘরে থাকলে আরো মাথা ধরবে। উপরে চলুন—মা ডাকছেন।

আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলুম। অনিল থাকতে আজ আর কোন সময়েই কথা বলা যাবে না। উপরের হট্টগোলে যাবার আমার প্রবৃত্তি ছিল না—কাজেই অপ্রসন্ন মনে ফিরে এলুম।

তার পরে আরও তিন দিন গেলুম। কিন্তু এঁদের সবাইয়ের আমার সম্বন্ধে কেমন যেন উদাসীন ভাব! অনিলই সর্ব্বেসর্ব্বা! লতিকার মনের ভাব জানাবার কোন উপায় নেই। তাকে কোন সময় একা পেতুম না। কি যে ব্যাপার কিছু বুঝতে পারতুম না—শুধু অতৃপ্তি ও অশান্তিতে মন ভরে উঠতো। তার পর যে দিন বাইসাহেবার সেতারের আলাপ শুনলুম—সেদিন থেকে প্রায় হপ্তা খানেক আমি আর কোথাও যাই নি। বাড়ি ফিরতে রাত হত। দিনের বেলা প্রায় ঘুমিয়েই কাটতো। বাকি সময়টা সুরে সুরে মস্তিষ্ক পূর্ণ হয়ে থাকতো। আর কিছুতে মন দিতে পারতুম না।

আট দশ দিন এই ভাবে কাটবার পর একদিন দুপুরে বাবা আমাকে ডেকে পাঠালেন। একটু বিস্ময় বোধ হলো। কারণ এমন ডাক প্রায়ই আসে না। ছুটির দিন গিয়ে দেখি—দাদারাও সেখানে হাজির। সকলের মুখ বিষম গম্ভীর।

টেবিলের উপর একখানা খোলা চিঠি পড়ে ছিল। আমি যেতেই বাবা সেখানা আমার গায়ের উপর ছুঁড়ে দিয়েই বল্লেন—পড়ে দেখ

আমি দেখলুম—লতিকার বাবার চিঠি। তিনি বাবাকে কি লিখেছেন? একটু উৎসুক হয়ে কয়েক ছত্র পড়েই আমার কাণ মাথা আগুন হয়ে উঠলো।

তাঁর বক্তব্যটা এইরূপ—তিনি আমায় সম্ভ্রান্ত বংশের উচ্চশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র ছেলে জেনেই তাঁর পরিবারে অবাধে মেশবার অধিকার দেন। লতিকার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ ঘটলে তাঁর আনন্দ ছাড়া আপত্তির কোন কারণ ছিল না। তবে উপস্থিত তাঁর মতের পরিবর্ত্তন হয়েছে। কারণ কিছুদিন থেকেই তিনি আমার মতি গতি ও ব্যবহারের বৈলক্ষণ্য দেখে আসছিলেন—তবে তখন কিছু বুঝতে পারেন নি। আজকাল আমি তাঁদের বাড়ি যাওয়া ছেড়েই দিয়েছি। অনিল কার্য্য-গতিকে একদিন * * * * ষ্ট্রীট দিয়ে যেতে যেতে আমায় একটা বাড়িতে ঢুকতে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হয়, কারণ বাড়িখানি একজন বিখ্যাত বাইজীর। অনিল সেই বাড়ির লোকজনের কাছে সন্ধান নিয়ে জেনেছে যে প্রত্যহ সন্ধ্যা থেকে রাত এগারটা—বারোটা পর্য্যন্ত আমি ঐ বাড়িতে কাটাই। সে একদিন লতিকার দাদাকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছে—যে ঐ বাড়িতে আমার যাতায়াত আছে। অতঃপর আর কিছু ব্যক্তব্য নেই। আমার সঙ্গে লতিকার বিবাহের প্রস্তাব এইখানেই শেষ। আমি যেন আর কখনো তাঁদের বাড়ি যাবার বা লতিকার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা না করি ইত্যাদি।

আমি কোনমতে চিঠিখানা শেষ করে টেবিলের উপর রাখতেই বাবা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বল্লেন—তুমি এ সম্বন্ধে কি বলতে চাও?

এবং আমার উত্তরের কোন অপেক্ষা না করেই—যত দূর পারা যায়—আমাকে তিরস্কার ও অপমানের চূড়ান্ত করলেন—তার যা কিছু বা ক্রটী হল—সেগুলো দাদারা সেরে নিলেন। আমি যে অধঃপাতের চরম সোপানে নেমে তাঁদের মুখ ডুবিয়েছি—সে বিষয়ে তাঁদের লেশমাত্র সংশয় ছিল না। আর থাকবেই বা কি করে? বাবা চিরদিন জজিয়তি করেছেন—দাদারা ব্যারিষ্টার—তাঁরা যুক্তি প্রমাণের দাস—প্রমাণ যখন হাতে হাতে—চাক্ষুষ সাক্ষী মজুদ—তখন তাঁরা আমার সাফাই শুনবেন কেন? না হলে প্রতিদিন রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত আমি যাই বা

কোথায়? তাঁরা জানতেন—আমি লতিকাদের বাড়িতেই থাকি—আর আমার এই নীচ প্রবৃত্তি?

অবশেষে শাসন শেষ করে তাঁরা একতরফা রায় দিলেন—চরিত্র সংশোধন করতে পারি ত ভাল—নতুবা আমার মত কুলাঙ্গারের সঙ্গে তাঁরা কোনরূপ সম্বন্ধ রাখতে চান্ না

দু' দিন দু' রাত যে কোথা থেকে কাটলো—তা জানি না—মাথার স্থিরতা ছিল না। দাদারা মাঝে একবার বোঝাতে এসেছিলেন—আমি কোন কথা বলি নি। যাঁকে আমি অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করি—তাঁর সম্বন্ধে যাদের ধারণা এত নীচ তাদের কাছে তাঁর নাম করে আমাদের সম্বন্ধের কথা বলে কৈফিয়ৎ দিতে বিষম ঘৃণা বোধ হলো। নীরবে থাকলুম।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে নিজের অবস্থা ভাববার শক্তি আসতেই প্রথমে মনে পড়লো—লতিকার কথা। সে ও তবে আমাকে একটা দুশ্চরিত্র বলেই জেনে রাখলে? অন্তরের মধ্যে কে যেন শত সহস্র ছুঁচ ফোটাতে লাগলো। উপায় নেই? কোন উপায় নেই? শুধু তাকে—তাকেই শুধু আমার শেষ কথাটা জানিয়ে যাবার কি কোন উপায় নেই? সেদিন সন্ধ্যার আলো-আঁধারের মধ্যে জানলার ধারে তার সেই অভিমানে ভরা অশ্রু-সজল মুখখানি মনে পড়লো। আমি জানি—সে আমার সঙ্গে একান্তে দেখা করবার জন্যই উপরের মজলিস ছেড়ে একলা নীচে এসে দাঁড়িয়েছিল। কি বলতে চেয়েছিল সে? হয় তো কদিন আমার অপেক্ষায় বসে আশা ব্যর্থ হওয়ায় সে কত বেদনা পেয়েছে—সেই কথাই বুঝি বলতে চেয়েছিল! ভালবাসার অভিমান কত মধুর! তাই আমার কথার উত্তর দিতে তার ঠোঁট দুটি কেঁপে কেঁপে উঠছিল। সে হয় তো তখন চেয়েছিল—আমার কাছে দুটি আদরের কথা! আমি তার তপ্ত অশ্রুজল মুছিয়ে দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেব—এই টুকুই সে হয় তো চেয়েছিল! কিন্তু—তা তো হয় নি। এ কার নিষ্ঠুর বিধান? যে এক দিন আমার সর্ব্বস্ব ছিল—দুদিনের ব্যবহারের সামান্য ত্রুটিতে সে আজ কত দূরে! আর হয় ত জীবনে তার সঙ্গে দেখা হবে না! আমার কোন কথা আর তাকে বলা হল না। চিঠি? তা ও বৃথা। সে চিঠি কোন দিন তার হাতে পড়বে না। কোন উপায় নেই।

তৃতীয় দিনে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে এই কথা ভাবছি—হঠাৎ বাবার সঙ্গে দেখা। তিনি তখনই সেই পথ দিয়ে বৈঠকখানায় যাচ্ছিলেন—আমার উপর দৃষ্টি পড়তেই অত্যন্ত বিরাগে তখনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

ছোট্ট একটি ঘটনা! কিন্তু তাতেই আমার মন যেন বিষাক্ত হয়ে উঠলো। কি স্নেহহীন নির্ম্মম অন্তর এঁদের! এঁরা কখনো কারুকে মন দিয়ে ভালবাসেন নি! কেবল অযথা প্রভুত্ব—আর শাসন! এই দিয়েই এঁরা নিজের সন্তানকেও বশ করতে চান্! ওঁদের বিশ্বাস মত যদি আমি সত্যই অধঃপাতে যেতুম—তা হলেও আমায় ফিরিয়ে আনবার কি এই একমাত্র পথ? মানুষের মনে স্নেহ ভালবাসার কি কোন স্থান নেই?

মনের তখন এমন অবস্থা—বাড়িতে থাকতে যেন নিশ্বাস রোধ হয়ে আসছিল। শান্তি পাবার মত কোন আশ্রয় ছিল না। যাঁর অকৃত্রিম স্নেহ ও মমতায় আমার এই ব্যথিত ক্ষুব্ধ চিত্ত সান্ত্বনা পেত—তাঁর কাছে তখন যাবার সাহস বা প্রবৃত্তি আমার ছিল না। তাই একদিন আজন্মের বাসস্থান থেকে সকল সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লুম।

এই পর্য্যন্ত বলে যতীশ একবার একটু থামলো! জোছনার আলো তখন ম্লান। রাত্রি গভীর, নিস্তব্ধ। সামনের অশথ গাছটায় পাতার ফাঁকে দ্বাদশীর চাঁদের আভাষ দেখা যাচ্ছিল—সেই দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ পরে যতীশ আনমনে বল্লে—তার পর কতদিন উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে দেশে দেশে ঘোরা—কত অভাব—কত দুর্গতির মধ্যে দিনপাত—সে সব কথা আর সবিস্তারে নাই বা বল্লুম! মনের এই নিরাশ্রয় অবস্থায় মাঝে মাঝে মনে হত যে

আবার তাঁর কাছে ফিরে যাই। লোকে আমাদের সম্বন্ধে যাই ভাবুক—আমি অন্ততঃ এটুকু বুঝেছিলুম—যে, সেখানে আমার একটা অকৃত্রিম স্নেহের আশ্রয় আছে কিন্তু আবার সেখানে ফিরে গিয়ে সেই পূর্ব্ব ঘটনার জের টানতে আর প্রবৃত্তি হত না। অথচ দুদিনের আলাপে অত্যন্ত অযাচিতভাবে আমি যে অনাবিল স্নেহ ও ভালবাসা পেয়েছিলুম—তার তুলনায় আমার আজন্মের স্নেহ-প্রীতির বন্ধনের মূল্য কতটুকু? সামান্য এতটুকু ত্রুটির জন্য আমার চার পাশের সব সম্বন্ধ এক মুহূর্ত্তে খসে পড়লো! আমি আজ আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত, বন্ধু বান্ধবের বর্জ্জিত—নিঃসঙ্গ, একা। জীবনের সুনির্দ্দিষ্ট ধারা সব ওলট্ পালট হয়ে গেল। অথচ কেউ কোন দিন আমার দোষ যে কতটুকু তার কোন খোঁজও রাখে নি। তাই ভাবি—মানুষ তার অত্যন্ত ঘনিষ্ট আত্মীয় স্বজনকে কতটাই বা বোঝে? কতটুকুই বা বুঝতে চায়?

বাগানের ধারে চামেলীকুঞ্জে অস্তোন্মুখ চাঁদের আলো। একটা নিশাচর পাখী ডানা ঝট্‌ফট্‌ কর্ত্তে কর্ত্তে তাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। তারপর রমেশ উঠে এসে যতীশের পাশে বসে নীরবে তার হাত খানি নিজের হাতে তুলে নিলে।

স্বপ্ন

হুমায়ুন কবির

দিবস ভরি' আলোর মাঝে চাইতে যা'রে সাহস নাহি পাই
নিশীথ রাতে দেখেছিনু স্বপন মাঝে তা'রে,
ব্যাকুল প্রাণের সকল আকুল আবেগ দিয়ে যাহায় পেতে চাই
আপনি হেসে এসেছিল আমার প্রাণের দ্বারে।
পরশ যা'রে ক'রতে চাহে পিয়াস-ভরা নয়ন দুটি মম
আপনারই সে দুঃসাহসে শিহরি উঠে চকিৎ মৃগসম।

স্বপন মাঝে দেখেছিনু প্রিয়া আমার এল আমার সাথে
লজ্জানত স্নিগ্ধ নয়ন গোপন সুখে ভরা।
রাতের গভীর ছায়ায় ফোটা শিউলি ফুলের গুচ্ছ তাহার হাতে—
লাজের মত অরুণ রাঙা বসনখানি পরা।
তাহার কোলে স্বরগশিশু হাসির মাণিক ছড়ায় বুঝি বসি'।
এই ধরণীর ধূলির পরে মধুরাতের পড়ল মায়া খসি'।

তাহার কোলে মাণিক দোলে নিখিল ভুবন আলোয় ওঠে হাসি'
মনের কালি ঘুচল মম নিমেষ-মাঝে বুঝি।
অভিমানে আমায় যা'রা ছেড়েছিল, আবার ভালবাসি'
আমার প্রাণের দ্বারে তা'রা এল আমায় খুঁজি'।
বহুদিনের গোপন আশা স্বপন মাঝে পূর্ণ হল মম
সকল চেতন মাঝে আমার রইল স্মরণ নয়ন নিরুপম।

কপোল্'পরে চূর্ণ অলক অলস বায়ুলীলায় পড়ে লুটি'
স্নিগ্ধমায়া রচন করে নয়ন দুটি কালো ;
রহস-ভরা হাসির আভাস অধর কোণে নিয়ত রয় ফুটি'
পরাণ জ্বালে নিশীথিনীর বুকের মাঝে আলো।
কইতে চাহি কতই কিছু হৃদয় মম সাহস নাহি পায়
তোমার পানে বাক্যহারা ভিক্ষা-কাতর নয়ন মেলি' চায়।
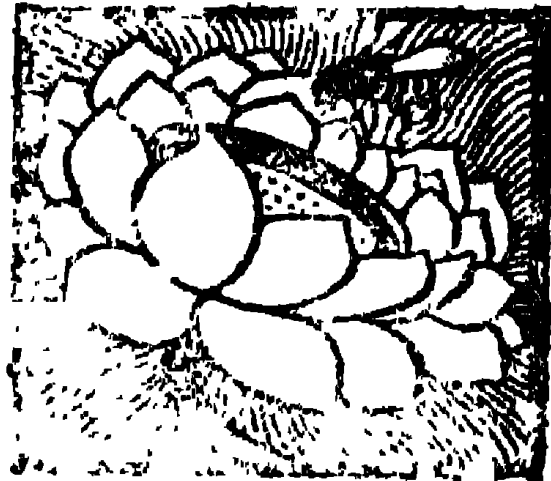
রূপের অভিশাপ

—পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর—

শ্রী নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

কাসিম বেপারীর অসংযত কথায় চটিয়া ইনু একটা উত্তর দিবার আয়োজন করিতে গেলে কাসিম সত্য সত্যই তাহাকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিল।

রোষে, ক্ষোভে ফুলিতে ফুলিতে ইনু ফকীর সেদিনকার জুম্মার জমায়েতে এই কথা বিশদ ভাবে গ্রামবাসীর কাছে জানাইল। তাহারা অনেকেই এ খবর আগেই জানিয়াছিল,—এবং তাদের মধ্যে এমন অনেকে ছিল যাহারা ইহাতে মোটের উপর খুসীই হইয়াছিল। ঐ একরত্তি ছোঁড়া ইনু, যাকে পাগল বলিয়া তারা ছেলে বয়স হইতে জানে, সে যে তাদের কাছে দিন রাত ধর্ম্ম বিষয়ে মাষ্টারী করিয়া বেড়ায় ইহা অনেকেরই ক্রমে অসহ্য বোধ হইতেছিল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে অসন্তোষ তার সামনা-সামনি প্রকাশ করিতে বড় কেহ সাহস করিত না। তাই আপনা-আপনির ভিতর তাহারা ইহা লইয়া যতই পরিহাস বা গালাগালি করুক না কেন, ইনুর কাছে তাহারা মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মত চুপ করিয়া থাকিত। ইহারা কাসিম বেপারীর কাছে ইনুর এই পরাভব ও লাঞ্ছনায় মনে মনে সুখী-ই হইয়াছিল।

কাজেই ইনু যতই কান্নাকাটি করুক, তার কথায় কাসিম বেপারীকে একঘরে' করিতে কাহারও বিশেষ প্রবল উৎসাহ দেখা গেল না। কাসিম বেপারীর উপর তাহারা কেহই খুব খুশী ছিল না। এই ভুঁই ফোঁড় শরীফের ঔদ্ধত্য তাহাদের অনেককেই আঘাত করিয়াছে। তা' ছাড়া অনেকেরই কাসিম বেপারীর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ ছিল। যুধিষ্ঠির ও গরীবুল্লার মত অনেকেই মনে করিল যে কাসিম তাদের ধনে অন্যায়রূপে ধনী হইয়াছে। ইহা ছাড়া কাসিম সত্য সত্যই ঠকামি করিয়া অনেকের কাছে অনেক অন্যায় লাভ করিয়াছে। এই সব কারণে কাসিমের প্রতি কাহারও বিশেষ প্রীতি ছিল না। কিন্তু ইনুর ঔদ্ধত্য আরও পীড়াদায়ক হইয়াছিল। কাসিম আর যাই হউক ধনী—ধনের যে ঔদ্ধত্যের একটা স্বভাবসিদ্ধ অধিকার আছে ইহা এই গ্রামবাসীরা মনে মনে মানিয়া লইয়াছিল। তাই কাসিম বরং সহনীয়। কিন্তু এই নেংটী-পরা মূর্খ ভিখারী ইনুর ধর্ম্মের ঔদ্ধত্য একেবারে অসহ্য। তাই ইনুর আবেদনে খুব জোর সাড়া পাওয়া গেল না।

প্রস্তাবটা প্রায় চাপা পড়িয়া যায়, এমন সময় গ্রামের অন্যতর মাতব্বর সহর আলি ইহাকে একদিকে ঠেলিয়া দিল।

জুম্মার নমাজ শেষ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু এই কথাটা বলিবার জন্য ইনু সকলকে বসাইয়া রাখিয়াছিল। তারা সকলে আগুনের আলিসার কাছে ঘিরিয়া বসিয়া তিন চারিটা কল্কী ধরাইয়া পর্য্যায় ক্রমে টানিতে টানিতে ইনুর কান্নাকাটি, তার আবেদন নিবেদন শুনিতেছিল।

সহর আলি এতক্ষণ বসিয়া কেবলই কল্কী ধরাইতেছিল আর ঢালিতেছিল। কথাটা চাপা পড়িয়া যায় দেখিয়া সে আর এক ছিলিম বেশ করিয়া সাজিয়া খুব জোরে দুই চার টান দিয়া যখন স্বচ্ছন্দে ধূম বাহির হইল তখন একটা সুখটান দিয়া অজস্র ধূম উদ্গার করিতে করিতে পার্শ্ববর্ত্তী লোকটির হাতে তাহা সমর্পণ করিয়া বলিল,—

"দেখ ভাই সাহেবরা, আমি সিধা মানুষ, ধর্ম্মের ফারাক্

দিবার আমি পারি না। আমার সিদ্যা কথা! কাসিম বেপারী নামাজ পড়ুক না পড়ুক তাতে আমার তোমাগর কিছুই কইবার নাই। সে যদি জাহান্নমে পইচব্যার চায় তবে পচুক না—সে বরং ভালাই। কিন্তু তার টাকার গরমডা যে বাড়ছে সেইডা ভাইব্যা দেইখো।" বলিয়া সে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিল যে সেদিন কাসিম ব্যাপারী সহর আলিকে ভয়ানক অপমান করিয়াছে।

আর একজন বলিল, "আর 'গরীবুল্লারে তো সে সুদা টাকার গরমে মাইরাই ফালাইল। দোম দিয়্যা তার কাঁচ মেয়্যাডারে বিয়্যা কইর‍্যা শেষে মা বাপেরে তার সাতে দেখা কইরব্যার দেয় না—কয় কি তারা ছোট লোক!" বলিয়া কয়েকটা অনাভিধানিক গালি দিয়া বক্তব্য সমাপ্ত করিল।

ইহার পর ক্রমে বক্তার পর বক্তা প্রথমে কাসিমের ঔদ্ধত্য এবং পরে তার শঠতা জুয়াচুরী প্রভৃতির ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিল।

অভিযোগের পালা যখন অতি দীর্ঘ হইয়া চলিল তখন সহর আলি বলিল, "আরে ও সকল কথা রাখ—কাসিম বেপারী যে কি মানুষ সে আমাগো জানা আছে।—তার হাতে নাকালডা না হইচে ক্যারা? এহন কথাডা এই যে তারে জব্দ করন যায় কেমতে?"

ইসু বলিল, "তাকে একঘরে কর।"

একজন যুবক বলিল, "হ' সে তো তোমাগো ঘরে রে যে না গেরায্য করে? তারে এক ঘইর‍্যা করলে সে মানবো!"

আর একজন বলিল, "ওরে ভাই, টাকা যার আছে তারে এক ঘইর‍্যা কইর‍্যা করবি কি? টাকার জোরে তার সব মিলবো। লোকের অভাব হবে না।"

আর একজন বলিল, "আরে হ মিয়া, টাকা থাকলিই সমাজরে অত কলা দেহান যায় না। আজ না হয় না মানলো, কিন্তু মরুক যে—দেখি কে তারে মাটি দেয়।"

পূর্ব্বপক্ষ উত্তর করিল, "হ ভাই কও, তোমরা তারে জব্দ কইরব্যা সে মইলে। বাইচ্যা থাকতে অর কইরবা ভইর‍্যাডি।"

এই তর্ক যখন অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিল, তখন রজব সেখ—রাজমিস্ত্রীর কাজ করে—সে নিরতিশয় আলস্যের সহিত বলিল যে' সে ইচ্ছা করিলে কাসিমকে অনায়াসে জব্দ করিতে পারে। এ কথায় সকলে তাকে চাপিয়া ধরিল। রজবের মুখের ভাবে সে যে উপস্থিত ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট লোক এ কথা সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করিয়া টুকরা টুকরা কথায় ক্রমে যে কথা বলিল তার স্থুল মর্ম্ম এই যে এ অঞ্চলের সমস্ত রাজমিস্ত্রী তার হাতে। সম্প্রতি কাসিম ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কাছে কতকগুলি সাঁকো প্রস্তুত করিবার ঠিকানী লইয়াছে। রাজমিস্ত্রীরা যদি তার কাজ না করে তবেই কাসিম বেপারী জব্দ হইবে।

এ প্রস্তাব সকলের মনঃপূত হইল। সুতরাং রাজ-মজুরদের সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইয়া গেল যে তাহারা কাসিমের কাজ আর করিবে না।

ইহাদের দৃষ্টান্তে ক্রমে আরও অনেকের মনে হইল যে তাহারাও ইচ্ছা করিলেই কাসিমকে জব্দ করিতে পারে। যথা, যদি কেউ তাহাকে পাট না বেচে তবে কাসিম দুই দিনে একেবারে কাবু হইয়া যাইবে। সে প্রস্তাব সম্বন্ধে অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনা হইল। অনেকের ভয় হইল। যারা কাসিমের কাছে টাকা ধারিত তারা ঘাড় নাড়িল। যাদের সন্দেহ ছিল যে সকলে কিছুতেই এ বিষয়ে এক যোগে কাজ করিবে না, মাঝখান হইতে যে করিবে সে মারা যাইবে, তারা খুব জোর করিয়া তাদের মন্তব্য প্রকাশ করিল। নানা রকম আপত্তি-আলোচনার পর শেষে স্থির হইয়া গেল যে কাসিমকে এবার আর কেউ পাট বেচিবে না।

প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলেও সেগুলি নিশ্চয় মাঠে মারা যাইত, কিন্তু ফকীরের উৎসাহে তাহা হইতে পারিল না। এ প্রস্তাবে সে পুরাপুরি সন্তুষ্ট হয় নাই,

তবু পণ্ডিত না হইলেও সে "অৰ্দ্ধং ত্যজতি" নীতি মানিত। তাই গ্রামবাসীদের এতটুকু সহকারিতা লাভ করিয়া সে তাদের প্রতিজ্ঞা ধর্ম্মশপথ দিয়া পাকা করিয়া লইল ; তার পর সে এই প্রতিজ্ঞা বাস্তবিক কার্য্যকরী করিবার জন্ম উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। কিছুদিনের জন্ম নামাজের জন্ম আর ব্যস্ততা সে ভুলিয়া গেল, ঘরে ঘরে ঘুরিয়া কেবল দেখিতে লাগিল এই প্রতিজ্ঞা ঠিক উপযুক্ত রূপে কার্য্যে পরিণত হয় কি না।

কাসিম বেপারী বিষম ফাঁপরে পড়িয়া গেল। রাজ-মিস্ত্রীদের ধর্ম্মঘটে সে বেশী বিচলিত হইল না। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে সময় লওয়া তার পক্ষে কঠিন হইল না ; এবং সে অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে ঢাকা হইতে রাজমিস্ত্রী আনাইয়া কাজ সারিবার বন্দোবস্ত করিল। ইহাতে তার লাভটা খাইয়া গেল, কিন্তু বিশেষ লোকসান হইল না। কিন্তু অদৃষ্ট বৈগুণ্যে সে এই বৎসর পাটের ব্যবসায়ে ফড়িয়াগিরী ছাড়িয়া নিজে একটা সবকন্ট্রাক্ট লইয়া বসিয়াছিল।

পাট খরিদ করিবার জন্ম টাকার জোগাড়ও হইয়াছিল অন্য এক মহাজনের সঙ্গে। সে হিসাব পত্র করিয়া স্থির করিয়াছিল যে ইহাতে তাহার প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা লাভ দাঁড়াইবে। যখন পাট জোগাইবার তারিখ নিকট হইয়া আসিল তখন হঠাৎ গ্রামের গৃহস্থেরা পাট জোগাইতে অস্বীকার করিয়া তাহাকে বিপদে ফেলিল। তার মনে সঙ্কল্প ছিল যে সে একেবারে গৃহস্থের কাছে পাট কিনিয়া জোগাইবে—তাহাতে লাভের অঙ্ক বেশী হইবে—হাটে বা ফড়িয়ার কাছে কিনিয়া জোগান দিলে তত লাভ হইবে না। তাই গ্রামের গৃহস্থদের কাছে ধাক্কা খাইয়া সে ছুটিল অন্য গ্রামে পাটের সন্ধানে।

সংবাদ পাইয়া ইনু দশ ক্রোশের ভিতর প্রত্যেক গ্রামে ঘুরিয়া তার নামে এক প্রকাণ্ড জেহাদ লাগাইয়া দিল। সামান্য কিছু পাট কিনিবার পরই বেপারী দেখিল যে আর কেহ পাট বেচিতে চায় না। তখন সে হাটে হাটে ছুটিল। জেহাদ সেখানেও রটিয়া গেছে,—না গৃহস্থ না বেপারী, কেহই তাহাকে এক কোষ্টা পাটও বেচিল না।

আর এক সপ্তাহ মাত্র তার হাতে ছিল। ইতিমধ্যে পাটের বাজার চড়িয়া গিয়াছে—কিছু লোকসান তার অনিবার্য্য, তবু এই সপ্তাহে কয়টা হাটে কিনিতে পারিলে সে লোকসানটা সহনীয় করিতে পারিবে। বিপন্ন হইয়া কাসিম ইনুর পায় জড়াইয়া ধরিল।

ইনু তখন জুম্মা ঘরের দুয়ারের কাছে বসিয়া ছিল। কাসিম ব্যাপারী তার পায় লুটাইয়া পড়িতে সে তীব্র আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহা উপভোগ করিল, এবং শেষে উদার ভাবে বিজয়ী বীরের মত তাকে অভয় দিয়া বাড়ী পাঠাইল।

সকালে উঠিয়া পরী দুইটা মুরগী বাছিয়া জবাই করিতে আদেশ দিয়া রসুই ঘরে গিয়া রান্নার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। তার বড় ছেলে আসিয়া বলিল তার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। পরী সে কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া তার কাজ করিতে লাগিল। তার পর দ্বিতীয় পুত্র আসিয়া একদম তার ঘাড়ে চড়িয়া বসিল। ও দিকে কুড়ানীর কোলে তার তৃতীয় পুত্র এমন ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিল যে পরী ক্ষেপিয়া গেল। সে হঠাৎ মুখ ঘুরাইয়া প্রথমে জ্যেষ্ঠ পুত্র ও পরে দ্বিতীয় পুত্রকে দমাদম কয়েকটা প্রচণ্ড চড় মারিয়া দিল। তারা দুইজন হাঁউ মাউ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

কাসিম বেপারী ঠিক সেই সময় পাড়া ঘুরিয়া হতাশ মনে হন্ত দন্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে—মনটা ভয়ানক ভার। মেজাজ অত্যন্ত চটা। বাড়ীতে পা দিয়াই তিন বংশধরের ঐক্যতান চীৎকার শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া গ্রামবাসীদের উপর তার যত রাগ সমস্ত সে ঝাড়িয়া ফেলিল জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর। সে বেচারা তার পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে বাপের হাতে এমন মার কোনও দিন খায় নাই।

তাই সে মার খাইয়া চুপ করিয়া গেল, কিন্তু ফুলিয়া ফুলিয়া ফুঁপাইতে লাগিল। ব্যাপার দেখিয়া কুড়ানী দ্বিতীয় পুত্রকে কোলে তুলিয়া ছুটিয়া পলাইল। কাসিম তাহাকে তাড়া করিয়া নাগাল পাইল না।

তখন সে রসুই-ঘরে প্রবেশ করিয়া পরীর উপর গিয়া পড়িল। কাসিমকে পরী এখনও ঠিক যমের মতই ভয় করে—কেননা কাসিম তাহাকে তাড়না কম করে না। তার শীঘ্র বাড়ী আসিবার সম্ভাবনা আছে এমন জানা থাকিলে পরী কখনও তার ছেলেদের মারিতে সাহস করিত না। তাই যখন কাসিম অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া ঘরে প্রবেশ করিল তখন পরী মনে মনে স্মরণ করিল চটতলার চড়ুই চণ্ডী ঠাকুরাণীকে। এই দেবী এমন জাগ্রত্ দেবতা, যে ইহাকে ভয় বা মানত করে না এমন লোক এ গাঁয় নাই। আপাতত মুসলমান পুরুষের অধিকাংশ ইনু ফকীরের উত্তেজনায় ইহার প্রতি প্রকাশ্যে কোনও রকম শ্রদ্ধা দেখায় না, কিন্তু মেয়েরা, বিশেষতঃ আপদে বিপদে ইঁহাকে স্মরণ না করিয়া পারে না।

কাসিম আসিয়া পরীকে খানিকটা বকিবার মতলব করিয়া আসিয়াছিল—সে উদ্দেশ্য সে প্রথমেই সম্পন্ন করিয়া ফেলিল। কিন্তু পরী তাহাতে কাঁদিল। তার চোখে জল দেখিয়া কাসিম ক্ষেপিয়া উঠিল—সে তার স্ত্রীকে দুটো বকুনী দিবে, তাতে আবার সেই স্ত্রী কাঁদিবে এ স্পর্দ্ধায় তার রাগ চড়িয়া গেল—সে হুমকী দিয়া তাহাকে তাড়া করিয়া গেল। দুর্ভাগ্য ক্রমে তার হাতের গোড়ায় সেই সময় পড়িয়া গেল কাঠের একটা গাছা। দ্রব্যগুণের ফলে কাসিমের বর্ত্তমান মেজাজে গাছাটা তার হাতকে আকর্ষণ করিল এবং পর মুহূর্ত্তে কাসিম কোনও বিশেষ অভিসন্ধি না করিয়াও পরীর পিঠের উপর সেই গাছা দিয়া দুই ঘা লাগাইয়া দিল। চীৎকার করিয়া পরী সেখানে পড়িয়া গেল। কাসিম গর গর করিতে করিতে বাহির হইয়া নিজের শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিল।

কুড়ানী আসিয়া পরীকে ধরিয়া উঠাইল ও তার পিঠে তেল মালিস করিতে বসিল। কিছুক্ষণ পর পরী তার মুলতবী কাজ করিতে লাগিল, শুধু তার দুই চক্ষু দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল। কুড়ানী পাশে বসিয়া পা ছড়াইয়া তার হাতের তেল নিজের পায় মালিস করিতে লাগিল।

কুড়ানী বলিল, "তোমারও অন্যায় কই।, তুমি পোলাডারে দুই চক্ষে দেইখবার পার না। এ'ডা মিষ্টি কথা নাই, ক্যাবল মাইর আর গাইল।"

পরীর এ কথায় রাগ হইল, সে বলিল, "বেশ করি, ও আবাইগারা আইসবার গেছিল ক্যান আমার প্যাটে। আমার সতীনের প্যাটে যে কয়ডা হইছিল সব তো ম'রেছে, ইগুলার মরণ নেই?"

"তোবা, তোবা, কি আকথা কুকথা যে কও তুমি তার ঠিক নাই। পোলারে অমন কয়? ছিক্কো!"

"সুদা কওনের কথা কি কও ফুপু, পাইরতাম যদি, ওয়াগরে নিজ হাতে গলা টিপ্যা ওয়াগরে কবর দিতাম —অজাতের গুষ্টি!"

এ কথাগুলি সে বলিল নিতান্ত উত্তেজনা বশে। এমন কথা কেহ কখনও বলে না। কিন্তু এখন এ কথা কেবল মুখের কথা ছিল না, ইহা সে সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত বলিয়াছিল। সহজ অবস্থায় সে ছেলেদের মৃত্যু কামনা করে না সত্য, কিন্তু তাদের প্রতি তার যে একটা অহেতুক বিরাগ ছিল সে কথা সে নিজের কাছেও গোপন করিতে পারিত না।

তার ছেলেগুলি প্রত্যেকেই ছিল ঠিক কাসিমেরই মত কদাকার। সে নিজে সুন্দরী সুধু নয়, অসুন্দরের প্রতি তাহার একটা নিদারুণ বিরক্তি ছিল। কিন্তু ইহাই তার পুত্রগণের প্রতি বিরাগের একমাত্র হেতু নয়—হেতু যাহা তাহা সে নিজেও জানিত না।

কাসিম বেপারীর সাহচর্য্য পরীর সহিয়া গিয়াছিল, এই পর্য্যন্ত—সে কাসিমের প্রতি এক ফোঁটা আকর্ষণ কোনও দিন অনুভব করে নাই। তাকে দেখিলেই তার মনের

তলাটা বিষাইয়া উঠিত—সে কেবল কোনও মতে সেই বিষ হজম করিয়া সংসার চালাইয়া যাইত। সেই কাসিমের পুত্রকে গর্ভে ধারণ করিয়া তার একটা নিদারুণ ঘৃণা ও বিরক্তি জন্মিয়াছিল, তার প্রকৃত হেতু সে কোনও দিনই বুঝিতে পারে নাই। যখন তার পুত্র হইল তখন তার অসুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া সে ভ্রূকুটি করিয়া উঠিল। সেই দিন হইতে সে একদিনের তরেও তার এই ঘৃণা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইতে পারে নাই। তার মনের তলার এই যে বিরক্তি ইহা সে হামেষা প্রকাশ করিত না। বরং সে নিষ্ঠার সহিত পুত্রদের প্রতি তার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইত, কতক স্বামীর ভয়ে, কতক কেবল লৌকিক গতানুগতিকতার ফলে। গ্রামে চারিধারে যে সব মা দেখা যায় তাদের চেয়ে সে ছেলেদের যত্ন মোটের উপর কম করে না—তবে তার মা-গিরীতে বিশেষ সুখ্যাতির কথাও কিছু নাই।

এমনি করিয়া পরীর দিন যায়। সংসারে সব কাজই সে করে, নিয়ম মত দিনের পর দিন সে কাজ করিয়া যায়, কিন্তু তার কোনও কাজের উপর এক ফোঁটা মায়া নাই, এতটুকু প্রাণের টান নাই। সে যেন কলের পুতুল।

পরীর সম্বন্ধে সরাসরি ব্যবস্থা নিষ্পন্ন করিয়া কাসিম ঘরের ভিতর গিয়া কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পায়চারী করিতে লাগিল। সমস্ত সংসারের উপর সে চটিয়া ছিল—সকলকে সে এমন অভিশাপ দিয়া দগ্ধ করিতেছিল! কিছুক্ষণ পর গিয়া সে সিন্দুক খুলিল, টাকা কড়ি কাগজ পত্র লইয়া অনেক হিসাব পত্র করিল। তারপর সে পরীকে ডাকিল।

পরী আসিলে সে বলিল, "দেখ্ আজ তোর কাবিনের টাকা শোধ ক'রে দেব, কুড়ানীকে পাঠিয়ে দে তোর ভাইদের ডেকে আন্‌তে।"

পরীর প্রাণটা একটু কাঁপিয়া কেঁপিয়া উঠিল। কাবিনের সব টাকা মিটাইয়া দেওয়া মানে তাকে তালাক দেওয়া। কেন? এমন একটা কি সে করিয়াছে?

কিন্তু পরী কোনও কথা বলিল না, কুড়ানীকে পাঠাইয়া দিল তার নাম করিয়া ভাইদের ডাকিতে, বলিল, বিশেষ প্রয়োজন। সে জানিত না হইলে তার ভাইয়েরা এ বাড়ীতে আসিবে না। কাসিম সঙ্গে সঙ্গে ফকীরকে ডাকিতে পাঠাইল এবং সিন্দুক বন্ধ করিয়া বাহিরে গিয়া ফকীরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ফকীরকে ডাকিয়া পাঠাইতে পরীর আর সন্দেহ রহিল না যে তার তালাক আজ হইবেই। তার মনে ইহাতে একটা দুর্জ্জয় ক্রোধ হইল। কাসিমের সংসারের উপর তার এক ফোঁটা মমতা ছিল না—এ সংসার হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সে নিজেই অনেকদিন মনে মনে কামনা করিয়াছে। গরীবুল্লাও বসিরন তার বিবাহের সময় তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য একটা কথা বলিয়াছিল,—কাসিমের বয়স বেশী, সে কয় দিনই বা বাঁচিবে—তারপর তার ছুটী—সে কথা অনেক দিন তার মনে পড়িয়াছে এবং কায়মনোবাক্যে সে স্বামীর মৃত্যু কামনা করিয়াছে। কিন্তু তবু আজ এই তালাকের কথায় তার সমস্ত অন্তরাত্মা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। ইহাতে সে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিল এবং তার মনে হইল কাসিমের তাকে এ অপমান করিবার কোনও হেতু নাই—অধিকার নাই।

ক্রমে তার মনে উঠিল, তাহাকে তালাক দিলে সে এখন করিবে কি? তিনটি ছেলে লইয়া গরীবুল্লার ছোট বাড়ীতে বাস করিতে তার কষ্ট হইবে। সে ভাবিল সে একখানা বাড়ী চাহিবে। তার পর আরও কথা মনে হইল—মনে হইল বিবাহের কথা—অনেক দিন পর মনে পড়িল লতিফের কথা।

লতিফ যে নিঃস্ব অবস্থায় গ্রাম ছাড়িয়া আসাম চলিয়া গিয়াছে সে খবর সে শুনিয়াছিল। পরীর মনে হইল সে এখন কোথায়? বাঁচিয়া আছে কি? যদি সে এখন ফিরিয়া আসিত! সে কি এখন পরীকে বিবাহ করিতে চাহিবে? সে পরী তো নাই—এখন তার তিনটি ছেলে হইয়াছে! ইত্যাদি নানা কথা তার মনে হইল—অনেকক্ষণ

বসিয়া বসিয়া সে লতিফের ধ্যান করিল—তার কথা ভাবিতে পরীর অন্তর অপূর্ব্ব রসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিল।

ক্রমে একথা ভাবিতে ভাবিতে তার মনের ক্রোধ ও বিরক্তি কাটিয়া গেল। এখন আর তালাকের প্রস্তাবে তার রাগ হইল না, বরং এই মনোজ্ঞ সম্ভাবনার জন্য সে তালাকটাকে এতটা বাঞ্ছনীয় মনে করিল যে ইহার ভিতর-কার যে অপমান তাহা আর তাহার মনকে পীড়া দিতে পারিল না।

তার দুই ভাই যখন আসিয়া উপস্থিত হইল তখন তার খুব কান্না পাইল। এক গাঁয়ে থাকে তারা, তবু কতকাল পরে তাদের সঙ্গে দেখা! ইহার মধ্যে গরীবুল্লা যে দিন মারা যায় সেদিন কিছুক্ষণের জন্য মাত্র পরী ইহাদের দেখিয়াছিল—আর আজ। ভাইদের দেখিয়া তার বাপের জন্য দুঃখ উথলিয়া উঠিল। কিন্তু সে কিছু বলিল না…চোখের জল মুছিতে মুছিতে শুধু তাদের কাসিমের কাছে পাঠাইয়া দিল। তার ভাইয়েরা শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হইয়াছে? পরী বলিল, "আমি জানি না।"

কাসিম তখন ফকিরকে দিয়া দলিল লিখাইতেছিল। শ্যালকদিগকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি দলিলখানা সহি করিয়া পকেটে পুরিল। তারপর তাহারা আসিলে তাহাদিগকে লইয়া অন্দরে গেল।

অন্দরে শয়নগৃহে গিয়া সে পরীকে ডাকিয়া পাঠাইল এবং সিন্ধুক খুলিয়া পকেটের দলিলখানা এমন কৌশল করিয়া বাহির করিল যেন সে সিন্ধুক হইতেই বাহির করিল। পরী আসিলে কাসিম পরীকে বলিল, "আমি তোমার কাবিনের টাকার বাবদে এই বাড়ী আর দশ পাখী জমী তোমাকে লিখে দিয়েছি তিন মাস হ'ল, আজ সেটা রেজেষ্ট্রী করে দেব। এই নেও দেখ।"

পরী ও তাহার দুই ভাই অবাক্ হইয়া গেল। তাহারা প্রতীক্ষা করিতে লাগিল ইহার পরের কথার জন্য। ইহার পরই যে কাসিম পরীকে তালাক দিবে সে বিষয়ে তাদের কোনও সন্দেহ রহিল না। কিন্তু তাহারা ইহাও ভাবিল যে তালাকই যদি দেয় তবে এ বাড়ীখানা পরীকে দেয় কেন?

ইহার পর কাসিম অনেকক্ষণ আর কোনও কথা কহিল না। সিন্ধুক হইতে ধীরে ধীরে সে একটা পুলিন্দা ও একটা ছোট টিনের বাক্স বাহির করিল। ধীরে ধীরে পুলিন্দা খুলিয়া এক হাজার টাকার নোটের তাড়া বাহির করিয়া আস্তে আস্তে তাহা গুণিল। তারপর টিনের বাক্স খুলিল। টিনের বাক্সের ভিতর একরাশ সোণার গহনা দেখিয়া পরীর চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। কাসিম গহনাগুলি সব বাহির করিয়া পাশে পাশে সাজাইয়া রাখিল—সে প্রায় পাঁচশো টাকার গহনা হইবে, কাসিম তাহা সম্প্রতি গোপনে গড়াইয়া আনিয়াছে।

গহনাগুলি একসঙ্গে হাতে তুলিয়া পরীর দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, "নেও এগুলিও তোমাকে দিলাম।" কাঁপিতে কাঁপিতে হাত বাড়াইয়া পরী সেগুলি গ্রহণ করিল। তার পক্ষে যাহা কুবেরের সম্পদ তাহা হাতে পাইয়াও তার বুক কেবলি কাঁপিতে লাগিল। সে এসবের কোনও মানে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না—এ সমস্তই কাসিমের স্বভাবের এত সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ!

তারপর কাসিম সেই হাজার টাকার নোটের তাড়া লইয়া পরীর বড় ভাইয়ের হাতে দিয়া বলিল, "এ টাকা তোর বোনের!" সে গুলি পোষ্ট আফিসে লইয়া পরীর নামে ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনিবার আদেশ দিল।

তারা তিন জন ফ্যাল ফ্যাল করিয়া পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিল। পরী তার সে গহনার রাশি হাতে করিয়া শুষ্ক মুখে চাহিয়া রহিল।

কাসিম বলিল, "হা কইর‍্যা চাইয়া রইলি যে? হইছে কি? যা গয়না গুলা পইরা আজ বেড়া, রাইত্রে সিন্ধুকে তুইল্যা রাখলেই হবো।"

তবু তারা নড়ে না।

অবশেষে পরীর বড় ভাই বলিল, "বেপারী সাহেব, আমাদের বহিনের কি দোষ হইল যে"—

বেপারী বলিল "ভালারে ভালা, দোষের কোন কথাডা কইছি। দোষ করলে মানষে বকশীষ দেয়?"

"কিন্তু তালাক দিত্যাছেন ওয়ারে"—

"তুই কি পাগল হ'লি নাকি রসুল? আমি তালাক দিমু পরীরে; কি ভাবচস তুই?"

"তবে"—

"ইয়ার মধ্যে 'তবে' কি? জরুকে কিছু বকশিষ করলাম। ইয়ার মধ্যে কথা কি? তা ছারা আজ ওয়ারে মারচি কি না? বুঝলি?"

পরীর মাথা হইতে যেন একটা বোঝা নামিয়া গেল। সুখের চেয়ে স্বস্তিটা বাস্তবিক সবাই ভাল বাসে। যদিও এতক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া পরী তালাকটাকে মোটের উপর ভাল বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়াছিল, তবু উপস্থিত জীবনের শান্ত নিশ্চিন্ততার স্থানে আবার একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সুখদুঃখের সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া সে বেশ একটু অস্বস্তিও বোধ করিতেছিল। সে সম্ভাবনা নাই শুনিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল। এখন সে গহনাগুলির দিকে চাহিয়া সত্য সত্যই খুশী হইয়া উঠিল। সে একে একে সবগুলি গহনা পরিল। তারপর একখানা ভাল কাপড় পরিয়া হৃষ্টমনে বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ আগে যে গাছার ঘা সে খাইয়াছিল তাহাতে পিঠটা এখনও টন্ টন্ করিতেছিল, কিন্তু তাহা সে গ্রাহ্য করিল না।

রসুল গিয়া সেই দিনই ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনিয়া দিয়া গেল।

* * *

ইহার কয়েকমাস পর দেশময় রাষ্ট্র হইয়া গেল যে কাসিম বেপারী সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। আদালত হইতে আজ তার নামে অগ্রিম ক্রোক বাহির হইয়াছে।

ব্যাপারটা এই। ইনু ফকীর যদিও প্রচুর বদান্যতার সহিত কাসিমের অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে অভয় দিয়াছিল, তবু কাসিম যখন পরের দিন পাট কিনিতে গেল, সেদিন সে পাট পাইল না। তার পূর্ব্বেই ইনু ফকীর বাড়ী বাড়ী গিয়া বলিয়া আসিয়াছিল, কাসিম তার পায় ধরিয়া মাপ চাহিয়াছে তাই তার কাছে পাট বেচিবার বাধা সে উঠাইয়া দিয়াছে। সহর আলি সে কথায় তাকে ধমক দিয়া বলিয়াছিল, "তুই কি ফকীর হইয়া বাদশা হইচস্ নাকি ইনু যে তর হুকুমে আমরা তারে বন্ধ করুম আর তোর হুকুমে উঠামু? কাসিম কাইন্দা ভাসাইয়া দিলেও আমরা তারে পাট বেচব না। এত দিন শালা আমাগো বুকের রক্ত শুইষা খাইচে, আইজ দিন আমাগো।"

আরও সকলে এই রকম কথাই বলিল, ইনু ফকীর যথা সম্ভব লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া জুম্মাঘরে বসিয়া "আল্লা আল্লা" ডাকিতে লাগিল।

সকলেই স্থির করিয়াছিল কাসিমের দর্প চূর্ণ করিতে হইবে, কাজেই কেহ পাট বেচিতে সম্মত হইল না। তা ছাড়া তাদের সম্মত হইবার উপায়ও ছিল না। কারণ সম্প্রতি কিছুদিন হইল কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে একটা বৃহৎ পাটের সমবায় স্থাপিত হইয়াছিল। এ অঞ্চলে একজন ব্যাপারীর সঙ্গে গৃহস্থদের একটা গোলোযোগ বাধিয়াছে শুনিয়া সেই সমবায়ের একজন কর্ম্মচারী আসিয়া সকলকে বুঝাইয়াছিলেন, যে কাসিম বেপারীর যা অপরাধ অল্প বিস্তর সব বেপারী সব মহাজনেরই সেই অপরাধ। বুকের রক্ত দিয়া চাষী পাট জন্মায়, তার লাভ লুটিয়া যায় স্তরে স্তরে মহাজন বেপারীর দল। যখন তারা জোট করিয়াছে যে কাসিম বেপারীকে পাট বেচিবে না, তখন তাদের সেই সঙ্গে ইহাও সঙ্কল্প করা উচিত যে কোনও বেপারী বা মহাজনকে পাট বেচিবে না। তিনি নিকটবর্ত্তী হাটে একটা গুদাম ভাড়া করিয়া বসিয়া গেলেন এবং বলিলেন, সমবায়ের পক্ষ হইতে তিনি সব পাট কিনিবেন। গৃহস্থেরা দেখিল যে ইহার সঙ্গে কারবারে আপাতত তারা পাটের বাজারদর যাহা তাহা প্রায় যোল-

আনাই পায়, উপরন্তু ব্যবসায়ে যে লাভ হইবে তারও অংশ অনুসারে ভাগ ইহারা পাইবে।

ইহা লইয়া গ্রামে গ্রামে মাতব্বরদের বাড়ীতে বৈঠক বসিতে লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত এ অঞ্চলের পোনের আনা লোক সমবায়ের সভ্য হইয়া তাহাদের কাছে পাট-চুক্তি বেচিয়া ফেলিল। কাজেই কাসিম বা অন্য কোনও মহাজন বা বেপারীই এ অঞ্চলে পাট কিনিতে পারে নাই।

সুতরাং কাসিমের সর্ব্বনাশ হইল।—

—ক্রমশ

বেতালের বৈঠক

স্থান—কাশী

বিরূপাক্ষ শর্ম্মা

সেদিন সান্ধ্য বৈঠকে গিয়ে দেখি হাওয়াটা কিছু গরম। সবাই যেন বেশ একটু খাড়া হ'য়ে বস্‌বার চেষ্টা করছে, এবং অমল-বাবুর মুখের দিকে চেয়ে আছে। অমল-বাবু দীপ্ত কণ্ঠে কি একটা বিষয়ের প্রতি অবিরাম অগ্নিবাণ বর্ষণ ক'রে চলেছেন। তাঁর রীতিমত যোদ্ধৃবেশ।

সাধারণত আমাদের সান্ধ্য বৈঠকের ভাবটা বেশ একটু ঢিলা-ঢালা। ফরাশের ওপর গোটাকয়েক তাকিয়ার সাহায্যে এবং আলবোলার সেবায় আমরা ঝিমুতে ঝিমুতে তাসপাশা ইত্যাদি খেলি। ক্লান্তি-বোধ করলে সর্ব্ব-শ্রান্তি-হর-রসায়ন পরনিন্দামৃত সেবন করবার বিশেষ বিধি আছে। তাইতেই আবার আমাদের প্রাণের মরা গাঙ্গে জোয়ার আসে।

কিন্তু সেদিন কুম্ভকর্ণের অকালে নিদ্রা-ভঙ্গের ব্যবস্থা দেখে একটু শঙ্কিত ও বিস্মিত হ'লাম।

বেতালগণের মধ্যে অমল-বাবুরই একটু সাংসারিক ভালমান আছে। তিনি এম, এ বি, এল, সুবক্তা এবং পসারেও মন্দ নয়।

আমাকে দেখে অমল-বাবু একটু বিরক্ত হ'লেন, কিন্তু থামবার জো নেই। ভিতরে ভাবের বাষ্প তখন অত্যন্ত অধিক ও ঘনীভূত; তাই তিনি ব'লে চল্‌লেন—"হ্যাঁ, ওই যে বল্‌ছিলাম। আজকালকার ছেলেদের একটা টেন্‌ডেন্সি দাঁড়িয়েছে—এটা রোগ বিশেষ। ষষ্ঠী মাকাল থেকে আরম্ভ করে কালী দুর্গা প্রভৃতি হিন্দুর দেবদেবীর বিষয়ে তারা সুবিধা পেলেই ঠাট্টা করে। হিন্দুর আচার পদ্ধতিকে তারা হেসে উড়িয়ে দিতে চায়। কিন্তু তারা অন্ধ। তারা দেখে না, বোঝে না যে, এই যুগে—এই কলিযুগে কালীর ভজনা করে' রামকৃষ্ণদেব সিদ্ধ হ'য়ে গেলেন।" এই পর্য্যন্ত বলেই অমল-বাবু বিজয় গর্ব্বে আমাদের সকলের দিকে চাইলেন। অন্তার্থ:—আমাকে ঠেল্‌তে পার কিন্তু রামকৃষ্ণদেবকে?

হেমেন্দ্র হঠাৎ বলে' উঠল,—"বাস্তবিক অমলদা, এ ভারি অন্যায়। জগতে কোন জিনিষই হেলার নয়। শোনা যায় রামকৃষ্ণদেব কালীর ভজনা করার আগে শীতলা, ওলাবিবি, মাকাল প্রভৃতি দেবতার

কাছে "এপ্রেন্টিস"-গিরী করে' তবে পাকা হ'য়েছিলেন।"

অমলদা চোখ রাঙিয়ে বল্লেন,—"ঠাট্টা?"

আমি বল্লাম,—"তুমি বুঝছোনা অমলদা। হেমেন তো পরোক্ষভাবে তোমাকেই সাপোর্ট করছে। সাধনের স্তর বিভাগ আছে নিশ্চয়ই, অতএব ওটা অসম্ভব নাও হ'তে পারে। থিওরিটা নতুন বটে, তবে খোঁজ খবর নিয়ে ওই থিওরিটা যদি একবার খাড়া করতে পার তো ভবিষ্যতে তোমার ষষ্ঠী মাকাল প্রভৃতি চুণোপুঁটী দেবতাও রুই কাতলায় পরিণত হয়ে যাবে!"

অমলদা সে কথায় কাণ না দিয়ে রুক্ষস্বরে বল্লেন,—"বলি তুমি বিশ্বাস কর কিনা যে রামকৃষ্ণদেব কালীর"—

বাধা দিয়ে আমি বল্লাম,—"খুব বিশ্বাস করি। তবে তিনি কালীর ভজনা করে' ধ্যান করে' সাধনা করে' সিদ্ধ হ'য়েছিলেন। ফাঁকি দিয়ে পুজো করে হন্‌নি।"

"ফাঁকি দিয়ে পুজো কি রকম?"

আমি বললাম,—"তা ছাড়া আর কি? আমরা যে পুজো করি বা করাই তার ষোল আনার মধ্যে আঠার আনাই ফাঁকি। যার বাড়ীতে পুজো হয় তাঁরও যেমন ভক্তি শ্রদ্ধা, যিনি পুজো করেন তাঁর আবার ততোধিক!"

বিদ্রূপের স্বরে অমলদা বল্লেন,—"একটু ভেঙ্গেই বল, শুনি।"

আমি বল্লাম,—"সেদিন তোমাদের পাড়ায় গিয়েছিলাম। শুনলাম ও পাড়ায় একটি ঝি আছেন—গিরিবালা। জাতিতে বাগ্দিনী। গত জন্মের প্রেম-ঋণশোধার্থে এঁর দ্বারে বাঁধা পড়েছেন এই জন্মের এক ব্রাহ্মণ-সন্তান। পাড়ার এই মুখুয্যে-মশাইটি তাঁর পৈতৃক যজ্ঞোপবীতের জোরে একাধিক গৃহে রন্ধনাদি এবং বহুগৃহে দেবসেবা করে থাকেন। ধর্ম্ম রাজ্যে এই রকম ডেমোক্রেশির আভাস পেয়ে আমাদের আনন্দই হ'ল। তবে ভাবছিলাম এঁর হাতে পুজিত নারায়ণের মর্ম্মান্তিক দুঃখের কথা! নিতান্ত কলিকাল, আর আমাদের মত ভক্তের সামনে নারায়ণ স্বরূপে প্রকাশ হ'তে লজ্জা পান, তাই রক্ষে। না হ'লে ওই শালগ্রাম শিলা এতদিনে চতুর্ভুজ হ'য়ে মুখুয্যে-মশাইয়ের যজ্ঞোপবীতের সাহায্যে পূজারী ও গৃহস্থকে এক সঙ্গে বেঁধে ও তৎসহ একটি কলসী সংলগ্ন করে উভয়কে ক্ষীরোদসাগরের তলদেশে প্রেরণ করে' বল্‌তেন,—"বৎসগণ, তোমরা উভয়ে আমাকে যে ভক্তি দেখিয়েছ তা'তে এজগতের অন্ননীরে তোমাদের আর প্রয়োজন নেই, যাবজ্জীবন ক্ষীরোদসাগরের তলদেশে বসে বসে ক্ষীর খাওগে।"

রাগতভাবে অমলদা বল্লেন,—"এসব বাজে খবর তোমাকে কে দিলে?"

হেমেন সহাস্যে বল্‌লে,—"আকাশে থুতু ফেলা খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয় বোধ হয় অমলদা!"

কথাটার মোড় ফিরিয়ে সুরটা একটু মোলায়েম করে' অমলদা' বল্লেন,—"যাই বল ভাই সুনীল, এবারে ঢাকায় যা দেখে এলুম তাতে আশায় বুক ভরে গেছে। বাংলায় নিও-বৈষ্ণবিজম্ দেখা দিয়েছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—"তার মূর্ত্তিটা কি রকম?"

"তার মূর্ত্তিটা? যেখানে যাই সেখানেই কীর্ত্তন। দুর্গাপূজা—বিজয়া দশমী। হাজার খোল বেরুল সহর প্রদক্ষিণ করতে।"

"বাপরে, এর পরেও ঢাকাবাসীরা ইহলোকের নশ্বর লীলা ছেড়ে গোলোকের নিত্যলীলা দেখবার জন্যে মহাপ্রস্থান করেনি? কড়া প্রাণ বটে!"

অমলদার সুর চড়তে লাগ্‌ল—"কেবল ইয়ার্কি মারবে, খবর রাখ কিছু? জয়দেব ফিল্‌ম এল, একাদিক্রমে ৩৪ 'নাইট' হ'য়েছে। তবু কী ভীড়! ভদ্রলোকের মেয়েছেলেরা রাস্তায় বসে আছে নেক্‌স্‌ট্ সোএ ঢুক্‌বে বলে। পুলিস কমিশনার নিজে ট্রাফিক রেগুলেট্ করছে।"

গদ্‌গদস্বরে হেমেন বলে উঠল,—"আহা করবে বইকি, করবে বইকি! পুলিস কমিশনার কেন? স্বয়ং ম্যাজি-

ষ্ট্রেটও দুদিন পরে ট্রাফিক রেগুলেট্ করবে হয় তো। জয়দেব ফিল্‌ম—একি চালাকি? শ্রীকৃষ্ণের লীলা।"

হারুবাবু এতক্ষণ চুপ করে' ছিলেন। হেমেনের কথাটা যে ব্যাজস্তুতি সেটা বুঝতে না পেরে বলে' উঠলেন,—"ঠিক বলেছেন। এই দেখুন না, কর্ণার্জ্জুন ৩০০ রাত্রি হ'তে চল্‌ল—সীতা ২০০ রাত্রি হয়ে গেছে বোধ হয়। বাঙলায় "নিও-বৈষ্ণবিজম্" এসেছে নিশ্চয়।"

আমি বল্‌লাম,—"বাঙলা দেশে এক সময়ে আলিবাবা এবং আবুহোসেন শতাধিক রাত্রি চলেছিল বোধ হয়। সেটাকে কিসের রিভাইভাল্ বলা যাবে হারুবাবু? 'জয়দেব ফিল্‌ম' দেখতে ভদ্রলোকের মেয়েছেলেরা ঘরবাড়ী ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন, এতে বাহাদুরী কার সেটা সঠিক বল্‌তে পারেন কি? প্রাচ্যভক্তির না পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের?"

অমলদা দমবার পাত্র নন। সোৎসাহে তিনি হারুবাবুকে বাধা দিয়ে বলতে লাগলেন, "দু পাতা ইংরেজী পড়ে সব তাতেই ঠোক্‌রাতে আরম্ভ করেছ। কিন্তু ভরসা এই নিরক্ষরদের এখনও প্রাণ আছে, প্রাণে দরদ আছে। সেদিন এক হোটেলে চা খেতে গেলাম। আমার আগে আরও দুচারজন সেখানে জমায়েত হয়ে ছিলেন। তাঁদের কথাবার্ত্তায় বোঝা গেল সেই দোকানের সামনে রাস্তার অপর পারে একটা কি আশ্রম আছে। সেখানে পূর্ব্ব রাত্রে সমস্তরাত ধরে কীর্ত্তন হয়েছে। পাড়ার কেউ নাকি ঘুমুতে পারে নি। এই শুনে হোটেল-ওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি মশাই খবর কি? কীর্ত্তন শুনছেন? কেমন আছেন?' গাঢস্বরে হোটেলওয়ালা বল্‌লে, 'বড় সুখে আছি।' ভাবে তার চোখ দুটি ঢুলুঢুলু। দেখে আমি একেবারে বিস্ময়-বিমুগ্ধ।"

অতিকষ্টে হাস্য সম্বরণ করে বল্‌লাম, "দাদা তুমি বুঝেছ ঠিক, তবে একটু ঠিকে ভুল হ'য়েছে। হোটেল-ওয়ালার রসঘন মূর্ত্তি তুমি প্রত্যক্ষ করেছ ঠিকই, সেটা হয়তো তোমার বহুভাগ্য। কিন্তু রসটা ঠিক মোক্ষরস নয়, অর্থ রস।"

বিরক্তিভরে অমলদা বললেন, "মানে?"

আমি বললাম,—'মানে খুবই পরিষ্কার। তার আনন্দটা শ্রবণানন্দ বটে, তবে সেটা শ্রীখোলের আওয়াজের নয়, টাকার বাদ্যির। সমস্তরাত নাম গান করে কীর্ত্তনীয়াদের ভগ্নকণ্ঠ মেরামতের জন্য অষ্টোত্তরশত কাপ চা বিক্রী হয়েছে। এখন বুঝছ হোটেলওয়ালার আনন্দটা নিতান্তই ইহলৌকিক, পারলৌকিক মোটেই নয়।"

ক্রুদ্ধস্বরে অমলদা বললেন, "আরে যাও যাও, চোরের মন বোঁচকার দিকে। রবি-ভক্ত তোমরা বৈষ্ণব রসতত্ত্বের কি বুঝবে? চণ্ডীদাসের পদাবলী পড়েছ? কিছু বুঝেছ তার? রবিবাবুর কবিতার মত শুধু শব্দের ঝঙ্কার নয়। রীতিমত সাধন মার্গের কথা। আহা—"জনম জনম হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।" ভাবের ঘোরে অমলদার চোখ টলটল করতে লাগল।

থাকতে না পেরে আমি বলে ফেল্‌লাম,—"দাদা, যে পদটা আওড়ালে সেটা চণ্ডীদাসের নয়, বিদ্যাপতির।"

অমলদা অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে মৃদু হাস্যের সঙ্গে বললেন,—"ওই হ'ল দাদা, ওই হ'ল। কাব্যের দিক থেকে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস সব আলাদা। কিন্তু রসতত্ত্বের দিক থেকে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব—বিলকুল এক।"

হেমেন হঠাৎ বলে উঠল,—"তত্ত্বের এই সাম্যবাদ নববৈষ্ণববাদের দর্শনের অন্তর্গত বোধ হয়?"

"তোমরা অতি-আধুনিক, তত্ত্বের বোঝ কি হে?"

আমি হেসে বললাম, "তা সত্যি। 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।' বুদ্ধির বালাই মগজে থাকতে তোমাদের ধর্ম্মতত্ত্ব বোঝা যায় না, এই কথাই তো এ যুগের ধর্ম্মদিকপালগণ বলে' থাকেন।"

হেমেন বললে, "আচ্ছা অমল-দা, প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক যুগে যখন ধর্ম্মের নব জাগরণ হ'য়েছে তখন তার ফল দেশের সাহিত্যের শিল্পের নব নব বিকাশের মধ্যে প্রত্যক্ষ হ'য়েছে। এ যুগে বাঙলার শিল্পে সাহিত্যে নব বৈষ্ণববাদের দান কি?"

গম্ভীরভাবে আমি বল্‌লাম,—"জান না বুঝি ? শিল্পে দান হ'চ্ছে, কুঁড়োজালির ওপর নানারূপ সুতার ফুল লতা ইত্যাদি কারুকার্য্য, ব্যবহারিক শিল্পে দান হচ্ছে ভেজিটেবল চপ, ভেজিটেবল সু, আর সাহিত্যে দান হচ্ছে ধর্ম্মমূলক উপন্যাস সব। আর নববৈষ্ণবের লক্ষণ কি জান হেমেন ?"

হেমেন হেসে বল্‌লে,—"না।"

আমি বল্‌লাম—"জান তো বৈষ্ণবের একটা লক্ষণ সেকালে ছিল যেটা "তৃণাদপি সুনীচেন ইত্যাদি শ্লোকে ব্যক্ত হয়েছে। আর নিম্নলিখিত অর্থাৎ বথিত শ্লোকে নব বৈষ্ণবের লক্ষণ সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। পারতো মুখস্থ করে নাও। শ্লোকটা হচ্ছে এই :—

বটাদপিস্থ-উচ্চেন অগ্নেবিবাসহিষ্ণুনা।
মানিনাপ্যমানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ।

দেখেছ, আর সব উল্টে গেছে—কেবল হরিনামটা কেমন ফ্যাক্টর হয়ে আছে।"

অমলদা রণে ভঙ্গ দিয়ে বল্‌লেন,—"বাহ্ বল দেব দ্বিজে ভক্তি আমাদের নেই। তাই আমাদের এমন দুর্দ্দশা।'

আমি বললাম,—"এ কথা ঠিক, কারণ দেবতা ও দ্বিজ এ দুটোর একটাও আজকাল দেখা যায় না। তবে আমরা জাতভক্ত, চোখ বুজে ভক্তি আমাদের কাউকে না কাউকে করতেই হবে। তাই আমরা এখন ভক্তি করি গো-ব্রাহ্মণকে আর আমাদের ভক্তির আওতায় যে আসে সেই শুকিয়ে মরে। গো-পূজা করি তাই গরুর অত্যন্ত দুর্দ্দশা, দেশে দুধ নেই, এবং গো-মাতাকে যে ভক্তি করি তার প্রমাণ আমাদের মত বুদ্ধিমান সুসন্তান। আর ব্রাহ্মণকে যে পূজা করি বা ভক্তি করি তার প্রমাণ গিরিবালার প্রেমে বাঁধা মুখুয্যে-মশাই। ভক্তির বাষ্প চারদিকে এমন ঘি'রছে যে কোথাও বুদ্ধির আলো এতটুকু দেখা যাচ্ছে না। কথার শেষাদ্ধটা তুমি ঠিকই বলেছ অমল-দা — অর্থাৎ তাই আমাদের এমন দুর্দ্দশা।"

অমলদার দারুণ বিরক্তির মধ্যে সে দিন সভা ভঙ্গ হল। তারপরে একমাইল রাস্তা একসঙ্গে এলাম, অমলদা আর একটিও কথা কইলেন না।

একতারার কবি

তোমার অই—একতারাতে একটি যে তার আপন মনে তাই বাজালে।
হে বাউল—জয়তিলকে কল্পলোকে যৌবনেরে ভূপ সাজালে।
হরিয়া—দেব-দেউলের অর্ঘ্য সবি
লাগালে—রাজভোগে তাব প্রেমিক কবি।
রচিলে—কিরীট তাহাব বাণীর গলার মালার গজমুক্তাজালে।

যমুনা—হলো, তোমার দ্বৈত হিয়াব দুকূলভবা বৈতরণী।
মিলে তা'—গঙ্গাসনে সিন্ধুপানে ছুট্‌ল তুলে কলধ্বনি।
কামনার—ক্লিন্নদেহের দহের জলে
তব প্রেম—ফুটল অমল হাজার দলে।
রসরাজ—করে বিরাজ তাহার 'পরে আমরা তুলি গুঞ্জরণী।

শ্রী কালিদাস রায়

চয়নিকা
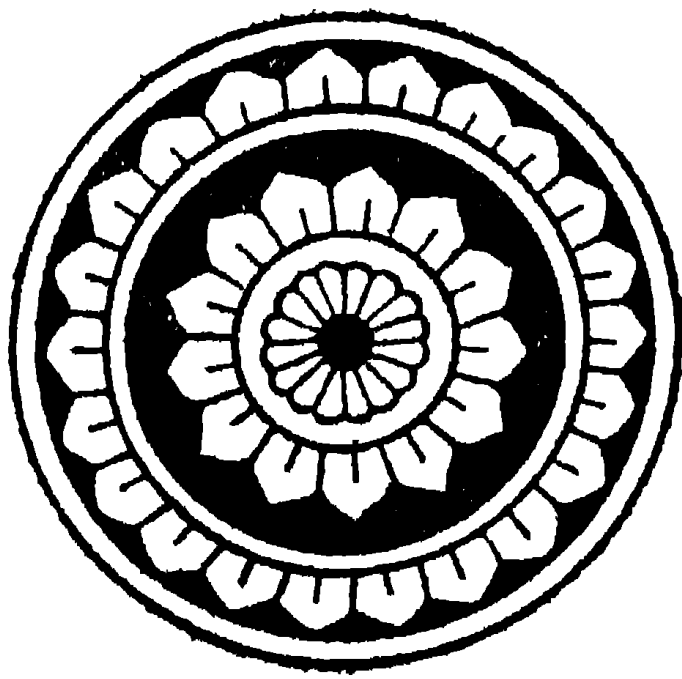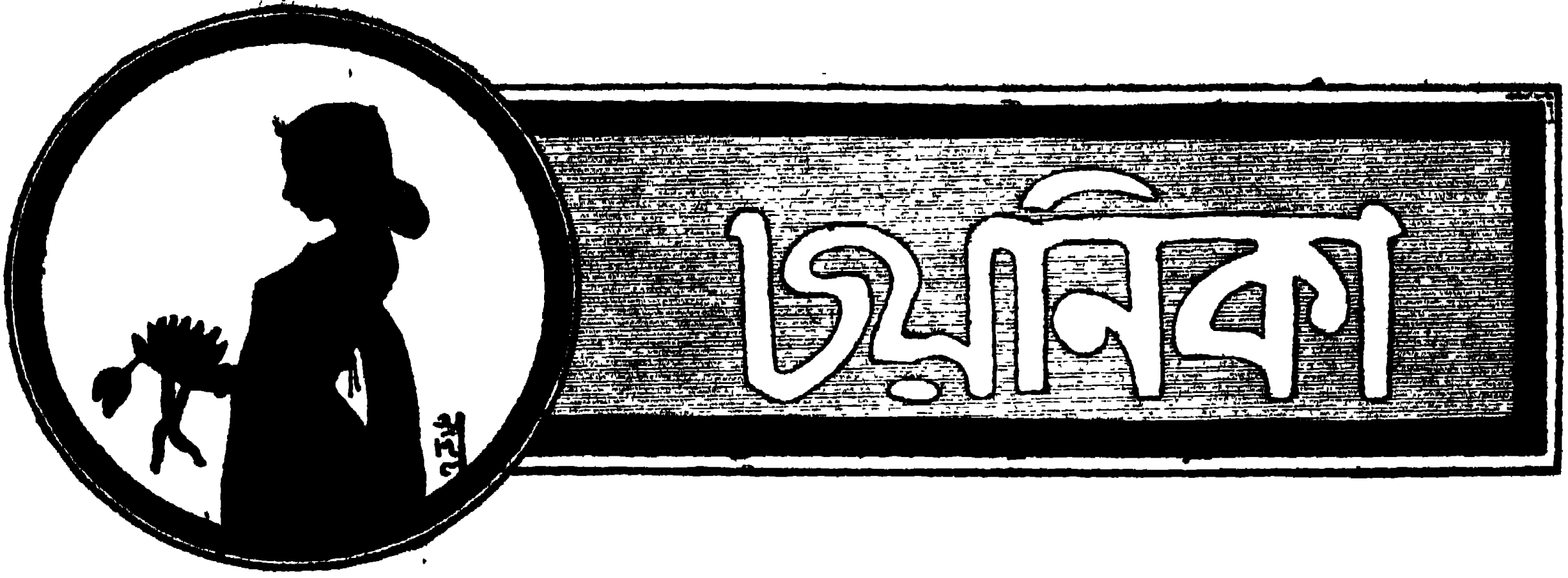
কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের 'একতারা' হইতে—

যেদিন আমি ডুব দিবগো স্তব্ধ মরণ-সাগর নীরে
ক্ষণিক অদর্শনের লাগি ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদবি কি রে?
যতই কেন হোক্ না প্রবল কোন্ সে শক্তি ত্রিসংসারে
তোমার আপন হ'তে তোমায় একটুখানি কাড়তে পারে?
অই সাগরের অতল তলে ডুব যে মোরে দিতেই হবে,
বিপুল মহা রহস্য ওর চিরদিন কি অম্নি রবে?
অই অকূলের বুকে বাজে স্তব্ধতার যে বিরাট বাণী
তারি সুরে বাঁধতে হবে আমার মরম-বীণা খানি।
নিত্য মুখর উর্ম্মিচপল কল্লোলিত প্রাণ-সাগরে
ঝাঁপিয়ে আমি পড়েছিলাম তিলেক তরে ভয় না করে
তাইতো তোমায় পেয়েছি গো রবিশশীর আলোর দেশে,
যেটুক তোমার প্রাণের লীলার ঢেউয়ে ঢেউয়ে বেড়ায় ভেসে।
তেমনি আবার তোমায় পাবো, পাবো তোমায় অচঞ্চলে
পাবো তোমায় স্তব্ধ গভীর ঐ মরণের সিন্ধুতলে
হেথা মোদের প্রাণের কথা কতই সুরে কতই রূপে,
তোমার সনে আমার কথা সেথায় শুধু চুপে চুপে। (মরণে)

এত দিনকার এত সুখ এত ব্যথা
এত ভালবাসা ছাড়া কি মুখের কথা?

দিয়ে যেতে চাই নয়নের শেষ জল
নিয়ে যেতে চাই—দুই ফোঁটা সম্বল।
হে আলো আঁধার ওগো রবিশশীতারা
মাটির বক্ষ বাহিনী প্রেমের ধারা,
ওগো প্রিয় সবে ওগো মরমের প্রিয়া
যেতে চাই আজি চিরতরে ছুটি নিয়া
হাসিয়া বিদায় দিতে পারো যদি ভাল
নাই পারো যদি নয়নের জল ঢালো
সকল প্রেমের এইত সহজ শেষ
ররিবর ছেড়ে প্রাণের আলোর দেশ। (স্বর্গমর্ত্ত)

ওগো মরণ, ওগো চির পরাণ সখী মোর,
মোদের বাসর কুঞ্জ দ্বারে আপন মনে একটি ধারে
নিশির প্রহর গুণে করলে নিশি ভোর।
সাঙ্গ হলো প্রতীক্ষা তোর সময় হলো আজ
কুঞ্জদুয়ার যায় যে খুলি বাহির হাওয়ায় উড়ায় ধূলি
মলিন হলো বাসর সজ্জা সাজ।
ওগো মরণ, নবলীলার বাসর সখী মোর
এবার তবে ধরো হাতে লওগো মোরে আপন সাথে
মন্ত্র পড়ি ঘনাও ঘুমের ঘোর। (বাসর সখী)

বিধবা নয়, সাজলো সে আজ প্রিয়-মিলন লাগি
ছাড়ল যে তাই সকল ভূষা তার,
রিক্ত করি সকল দেহ রইল নিশি জাগি—
পরশ রস সুধার ধারে ভরবে অনিবার
সে পরশ যে ভূষণ হবে সকল অঙ্গে তার
হাতের কাঁকণ হবে সে যে গলার মণিহার।
ছেড়েছে যে সকল ভূষা খুলেছে সব সাজে
ধরেছে যে এই বিধবার বেশ,
আহা, বঁধুর অঙ্গে যদি একটু কোথাও বাজে
মিলনে তার কোথাও বাধে লেশ।
কে জানে গো এই যে সে আজ সকল ভূষা ছাড়ে
আড়াল হ'তে গোপন হেসে বঁধুই সে সব কাড়ে। (নিরাভরণা)

পরাস্থ যেই সিঁদুর ওগো সিঁদুর শুধু নয়
তোমার ভালে আমার প্রেমের নবীন সূর্য্যোদয়।

* * *

সন্ধ্যা যখন আসবে নেমে আলোর লীলা ঘুচে
তোমার সীঁথার সিঁদুরটুকু যাবেই কিগো মুছে?
সকল জীবন স্নিগ্ধ করি জাগবে স্মৃতির ইন্দু
সেও কি নহে আমার দেওয়া এই সিঁদুরের বিন্দু?
উষার আশাস বহি পুন ফুট্‌বে যে শুকতারা
নূতন দিবালোকের মাঝে রাত্রি হবে হারা
এই সিঁদুরের বিন্দু পুন ফুট্‌বে তব ভালে,
জ্বল্‌বে সে যে জ্বল্‌বে ওগো সকল দেশে কালে। (চির-এয়ো)

পাপড়ি ত সব উঠ্‌ল ফুটে রং যে আজো ধরল না,
গন্ধ আজো বন্ধ কোথায় বুক যে সুধায় ভরল না।
পাপড়ি সে যে শুধুই আমার আজ বাদে কাল ঝরবে গো,
চিরদিনের নূতন সে যে ধূলির মাঝে মরবে গো।
গন্ধে যে মোর খুলবে বাঁধন ছড়াবে প্রাণ চার ধারে
যেটুকু বিলাই পাই ফিরিয়ে অমরতার দরবারে
যেটুকু আমার মধুরকণে মিটায় ভ্রমরের ক্ষুধা
গুঞ্জনেরি সুরের মাঝে রয় চিরদিন তার সুধা। (অপেক্ষা)

বিধি নিষেধ বাঁধা এ পাঠশালা হেথাই মোদের বদল হবে মালা
প্রেমের সে যে বাসর কুঞ্জ হবে,
পুঞ্জীভূত শাস্তিশতক বুকে মিলন শয়ন রচলে কেহ সুখে
গুরুমশায় রোবোন্মদ তবে।
দেখছ নাকি শুকনো তোমার বেতে নবজীবন উঠছে কেমন চেতে
সবুজ পাতায় ফেলছে ছেয়ে তারে
আদ্যিকালের তোমার চিকন টাক ঘুচল বুঝি মৌরুসী তার জাঁক;
লুপ্ত হলো কৃষ্ণ কেশের তলে। (বিপর্য্যয়)

প্রেমের এম্‌নি লালাই চল্‌বে।
ফুরায় যদি ফুলের ফসল সোনার ফসল ফলবে।

বন-বসন্ত না রয় বনে মন বসন্ত জাগবে মনে
আঁধার কূলের অচিন ফুলের গন্ধে আকাশ ভরবে।

* * *

দেহের কূলে ভাঙন যত মনের কূলে গড়বে তত,
মন দিয়ে সব এম্‌নি দেহের ক্ষতি পূরণ চলবে।
দেহ যখন না রবে আর প্রাণ কি শুধু প্রেমের আধার
মনের কল্পলতায় শুধু সুধার ফসল ফলবে। (চিরলীলা)

মিলন পরশমণি পরশের মোহে
দুইমনে জাগে এক সুখের স্বপন,
সে যে তুমি, সে যে আমি, সে যে মোরা দোঁহে
দোঁহার মাঝারে দুহুঁ সম্পূর্ণ মগন।
কে পুরুষ কেবা নারী ক্ষণে হয় ভুল,
প্রাণ কোথা ভাসি যায় ছাড়ি দেহকূল। (দেহ ও দেহাতীত)

ফুলের ত্রুটী নয়গো কাঁটা কাঁটাই সকল হয় যে ফুলে
মরম মধুর সন্ধানীরা একথাটা যায় না ভুলে। (ত্রুটী)

প্রেমের রস ত বশে নহে, কেবল তাহা অজানায়,
জীবন এত মধুর শুধু মরণের অই অচেনায়,
অজানার সেই আঘাত লেগে পরাণ যদি রহে জেগে
প্রেম যে তবেই উঠবে ফুটে মরমের সেই বেদনায়। (অজানা)

কথা যখন ফুরায় তখন ছন্দ আনি
কাঁপবে বুকে অর্থহারা বেদন খানি
ছন্দ প'ড়ে রইলে দূরে পরাণ কেঁদে ওঠে সুরে
সুর হারালে কেবল তোরে বক্ষে টানি। (চরম প্রকাশ)

জ্বেলেছিলাম প্রদীপখানি ঘরের আলোর তরে
বাহিরও হয় আলো
জগৎ জোড়া ব্যথার ছবি পড়লো নয়ন পরে
আঁধার ছিল ভালো।

*　　　*　　　*

সবার ব্যথাই বইতে হবে আপন মরম তলে
রইবে না কেউ দূরে,
পরম অভিষেক যে প্রেমের সবার আঁখির জলে
নিখিল হৃদয়-পুরে। (বিশ্বচেতন প্রেম)

তোমার মেলা আঁচল খানি কিগুণ হেন ধরে
নেবার ছলে চুপিচুপি দেয় যে সবি ভরে'
আঁচল বলে ভিখারিণী—চক্ষু বলে—রাণী—
আঁচল যা পায় চোখ তা যে দেয় হাজার গুণে আনি। (আঁচল)

হায়রে কোথায় সেই চুমা কই প্রাণ জাগানো তড়িৎ ভরা
আজ এ শুধু অধর দিয়ে অধর খানি পরশ করা।
দেহের তপ্ত নীড় আরামের যার ভেঙেছে চির তরে
প্রেমের বাসা নইলে যে নয় মনের কল্পতরুর 'পরে।
ভোগবতীর চপল লীলা কোন্ মরুতে হয়বে হারা
মোদের এখন চাইই যে চাই মন্দাকিনীর অমল ধারা।
(প্রেম ও যৌবন)

সুখের হাসি মিলায় কোথা দুখের দিনে
নয়ন জলে ডুবলে তারে কেইবা চিনে ?
মলয় বায়ে যে সুর বাজে　　নীরব সে যে হবেই লাজে
ঝঞ্ঝা যবে টুটবে গো তার প্রাণের বীণে।
সুখের হাসি নয় গো এ নয় অধর দলে,
চিন্তামণির জ্বলছে আভা মরম তলে।
এ হাসি যে আমার তুমি　　আছো আমার সকল চুমি
এই হাসিতে প্রেমের চির প্রদীপ জ্বলে। (চিরহাসি)

সঙ্কলয়িতা—শ্রী কালিদাস রায়

রাতের পথ

শ্রী নিরুপম গুপ্ত

রাত্রি ন'টা, রাজপথ দিয়া চলিয়াছি, বন্ধু,
পথের দু' পাশে সারি দিয়া ঘর উঠিয়াছে, ঘর নয় এক একটি ধাঁধা যেন, পথিক মানুষ উহাদের মাঝে পথ হারাইয়া পড়িয়া আছে।

রাত্রি ন'টা রাজপথ দিয়া চলিয়াছি। পথের দু' পাশে কেবলি পথহারাবার দল শ্রান্ত চোখে ঝিমাইতেছে

তেলের দোকান। তেলি উহার চারি পাশে ছড়ানো একরাশি ছোট বড় তেলের ভাঁড়ের মাঝখানে ঘাম-তেলে একাকার দেহ লইয়া বসিয়া আছে। ঘরের মেঝে তেলে-তেলে কাদা হইয়া গিয়াছে, চারিদিকে রূপে গন্ধে স্পর্শে একমাত্র তেল ছাড়া আর কিছুই নাই। একটা ছোট তেলের প্রদীপ মিটমিট করিয়া আলো ছড়াইয়া ঘরের দৃশ্যটাকে আরো কদর্য্য করিয়া তুলিয়াছে। তার মাঝে বসিয়া বসিয়া তেলি সকাল হইতে সন্ধ্যা কেবলি তেলে-মাখা পয়সার হিসাব করে। তেলের ভাঁড়ে মাছিগুলা যেমন চুবিয়া আছে তেলির অন্তরাত্মাও তেমনি ওই তেলের পিপায় ডুবিয়া মরিয়া গেছে?

একদিন জীবনের প্রারম্ভ বেলায় এই ধরণীর মুক্ত আলোক বাতাস, গাছের সবুজ, আকাশের নীলিমা, পাখীর কাকলি, প্রান্তরের বিস্তীর্ণতা না জানি কোন অসীম পথের রাহীরে ডাক দিয়াছিল! তেলের দোকানের সেই তেলি আকাশ বাতাস আজ চেনে না। একরাশি তেলে-ভেজা পয়সা দিয়া কে একটা নকল মানুষ তৈরী করিয়া ওখানে রাখিয়া দিয়াছে যেন। জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া তেলের ওপর পড়িয়াছে, তেল শুধু চিকচিক করে, আর কিছুই না। ঘরখানিকে ঘিরিয়া হাওয়াটা শুধু হুহু করে, তার কোন্ সঙ্গীকে সে যেন এইখানে হারাইয়া ফেলিয়াছে! কখনো ঘরের দেয়ালের উপর হইতে কয়েকটা কাগজ হাওয়ায় উড়িয়া যায়, তেলি বিরক্ত হইয়া ওঠে হাওয়ার ওপর।

চাল-ডাল-মসলার দোকান। দোকানী ঘর্ম্মাক্ত দেহে কোনো গ্রাহকের মন জোগাইতে ব্যস্ত। ঘরখানি রাশি রাশি শিশি আর ভাঁড়ের ভিড়ে কোথায় হারাইয়া গেছে যেন। দেয়ালগুলিতে পর্য্যন্ত অজস্র গর্ত্ত করিয়া মসলা-পাতি রাখা হইয়াছে। সকাল হইতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হইতে রাত্রি, কেবলি ছোট বড় মাঝারি কত রকমের মোড়ক বাঁধা আর পয়সা গোণা চলিয়াছে, কত মানুষ আসিল গেল দোকানী একটিও মানুষ দেখিল না। শুধু একটা কোন দানব যেন লক্ষ প্রশ্ন শুধাইয়া চলিয়াছে আর দোকানী কেবলি পুঁটলি আর মোড়ক বাঁধিয়া সেই সব প্রশ্নের জবাব দিয়া চলিয়াছে। এই যেন তার কাজ, তার জীবন যাত্রা— শুধু সকাল সন্ধ্যা ছেঁড়া কাগজে এলাচ দানা আর মধু, লবঙ্গ খয়ের আর সুপারি, মেথি আর মরিচ, মুগ আর মসুরী বাঁধ আর দাও আর পয়সা সিকি দুয়ানি টাকা গুণিয়া গুণিয়া ভাঁড়ে ফেলিতে থাক!

নানারসে বিচিত্র ধরণীকে মানুষের পিপাসিত প্রাণ কামনা করিয়াছিল রসের পিপাসায়। বাঁচিবার দুর্নিবার প্রেরণা জাগিয়াছিল রসের লালসায়। অপরূপ ধরণীর মায়া, জীবনের যৌবনের স্বপ্ন কোথায় কোন্ অতলে হারাইয়া গেছে কে বলিতে পারে! আজ শুধু মাত্র বাঁচিয়া থাকিবার দায় তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। যৌবনের স্বপ্ন, প্রিয়ার মধুর বুকের নেশা সব মিলাইয়া গেছে, আছে শুধু পেট ভরাইবার ও পেট ভরিবার একটা অন্ধগতি—সকাল হইতে সন্ধ্যা শুধু টাকা, টাকা—আরো টাকা!

মাঝে মাঝে কচিৎ কখনো হয়তো এই প্রাণধারণের দায় হইতে সে মুক্তি পায়। হয়তো কোনো দিন হরতালের ডঙ্কা বাজে, হয়তো রোগ আসিয়া তাহাকে জোর করিয়া দোকানের বাহিরে লইয়া যায়। ভালো লাগে না তাহার এই অত্যাচার—সমস্ত দেহ মনের অভ্যাস বিদ্রোহ জানায়। কোনো কাজ না থাকায় মস্ত অস্বস্তি তাহাকে পীড়া দেয়। বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া ছেলেমেয়ে বউদের দেখে, যাহাদের ভালবাসা তাহাকে এই দোকানের কারায় চিরবন্দী করিয়াছে, তাহাদের পানে চাহিয়া যেন কোন্ আনন্দ জাগিতে চায়। রুগ্নশয্যায় স্ত্রীর হাতের সযত্ন শুশ্রূষা আর সেবায় অন্তর যেন কোন সুধারসে সিক্ত হইয়া ওঠে! বহুকাল যাহা পায় নাই, যাহা সে চায় অথচ পায় নাই, যাহার জন্য তাহার এই মানব ঘানি টানিয়া চ... যাহাকে সে চাহিয়া দেখে নাই তাহার অস্ত অব্যক্ত একটা কামনা ও আবেগ যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিতে চায়। শুধু নিমেষের জন্য, তারপর আবার মনে পড়িয়া যায় দোকানটা বন্ধ, টাকা রোজগার বন্ধ, সমস্ত আশার পুঁটলি বাঁধা—আনন্দ উঁকি মারিয়াই আবার অদৃশ্য হইয়া যায়। বাহিরের বাঁধন তো বাঁধিতে পারে না, বন্ধু, মনের কারাগারের মোহই যে সব চেয়ে নিদারুণ বন্ধন!

ডাক্তারখানার ডাক্তার সেই সকাল হইতে কেবল রুগী দেখিয়া চলিয়াছেন। রাত নটা হইয়া গেছে, প্রেস্কৃপশন লেখার আর শেষ হইল না। কে আসে কে যায় তাহার ঠিকানা কে রাখে। কাল যে রুগী আসিয়াছিল আজ তাহার মুখ দেখিয়া মনে পড়ে না, কিন্তু ... বলেন, কি জানি বাপু তোমার চেহারা মনে করিবার অবসর আমার ফুরসৎ নেই, কাল যে প্রেস্কৃপশন দিয়েছিলাম কোথায় সেটা? মানুষকে জানিবার চিনিবার, তাহার জটিল জীবনের পরিচয় লইবার প্রয়োজন এবং অবসর কোথায়? ডাক্তার রোগ দেখেন, লিভার শ্বাসযন্ত্র নাড়ী পরীক্ষা করেন, কতক বুঝিয়া কতক না বুঝিয়া শুধু প্রেস্কৃপশন লিখিয়া যান, প্রেস্কৃপশনটাকে অন্ততঃ এক টাকার না করিতে পারিলে চলে না। টাকা পিছু ডাক্তারখানা হইতে দু' আনা চার আনা কমিশন, ব্যস্ আর কিছু মনে করিবার অবসর নাই। দিনরাত কেবলি ভিজিটের টাকা আর প্রেস্কৃপশনের হিসাব! কল্পিত টাকার অঙ্কটা কেবলি বাড়িয়া চলে, সেই অঙ্কটা চোখের সামনে নাচে, ধরিতে গেলে যেন মিলাইয়া যায়।

একটা প্রকাণ্ড বাড়ি তৈরী হইতেছে তাহার টাকা চাই, ছেলেটাকে বিলাত পাঠান হইয়াছে তাহার খরচ চাই, মেয়েটার বিবাহ দিতে হইবে বিলাত ফেরত কোনো ব্যারিষ্টারের সঙ্গে, টাকা চাই, গৃহিণীর সপ্তাহে সপ্তাহে নূতন নূতন কাপড় কিনিতে হয়, প্রতি মাসে ফ্যাশানের পরিবর্তে নূতন গহনা কিনিতে হয় তাহার টাকা চাই, ইনসিওরেন্স কোম্পানীকে মাসে মাসে প্রিমিয়াম দিতে হয়, টাকা চাই! হাজার হাজার টাকার দুঃস্বপ্ন মাথায় আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে। যত কঠিন রুগী আসে ততই ভাল, রুগী না আসিলে বিধাতাকে অভিশাপ দিতে ইচ্ছা করে।

এই দারুণ দুরাকাঙ্ক্ষার আগুনে তাহার যুবা বয়সের সেই সুন্দর স্বপ্নটি পুড়িয়া ছাই হইয়া কোথায় উড়িয়া গেছে কে জানে। বোধ হয় সে কথা এখন আর মনেও পড়ে না। তখন ডাক্তারী পড়া চলিতেছে—মেডিক্যাল কলেজে কত অসংখ্য রকমের ব্যাধি আর মানুষের সেই অবর্ণনীয় যাতনার দৃশ্য তাহার চোখের সমুখ দিয়া যাইত প্রতিদিন। তখন বিদেশের বৈজ্ঞানিকদের ব্যাধিকে জয় করিবার সেই অক্লান্ত চেষ্টার আশ্চর্য্য ইতিহাস পড়িতে পড়িতে তাহার বুকের ভিতর একটা বিরাট স্বপ্ন জাগিয়া উঠিত। সেও বড় ডাক্তার হইবে, মানুষের দেহের এই সব ব্যাধিকে সে দূর করিবে, প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক গবেষণা-মন্দির স্থাপন করিয়া সে দেশের যুবাদের ডাকিয়া আনিবে। সে আর এক দল তরুণ মিলিয়া রোগের জীবাণুদের নিঃশেষে ধ্বংস করিবার পথটিকে বাহির করিবেই, পাস্তুর, মেচনিকফ... তারপর সত্যাগ্র

সরকার......আরো আরো কত এই ভারত বিজ্ঞান-মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিবে; এই জগৎ হইতে মানুষের সব ব্যাধি একদিন দূর হইয়া যাইবে, এই মহা অভিযানের ইতিহাসে তাহার নামটিও উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে!

আজ সেই সঙ্কল্প-সুন্দর চিত্ত কোথায়? আজ যত রুগ্নের দল তাহার ডাক্তারখানা ভরিয়া ওঠে ততই বেশি করিয়া তাহার টাকার দুঃস্বপ্ন তপ্ত হইয়া ওঠে মাথার ভিতরে! রোগ সারিবে কি না সারিবে তাহার চিন্তা কে করে আজ! মরিবার যারা মরিবেই! মাঝে হইতে তাহার প্রেস্ক্রপশন আর ভিজিট মারা যায় কেন? প্রাসাদ গড়িতেছে তাহার কল্পনা, শুধু মনে জাগে—বিজ্ঞান-মন্দির নয়, বিলাস-মন্দির!

বিশ্বমানব ব্যাধিমুক্ত হইবে এই স্বপ্ন একদিন যুবাকে মুক্তির পথে ডাক দিয়াছিল, মানুষের চোখের পানে চাহিয়া তাহার ব্যাধিক্লিষ্ট দৃষ্টি তাহার চোখে পড়িয়াছিল, অন্তরের অসীম ভালবাসা সে দিন জাগিয়া উঠিতেছিল, আজ সেই ভালবাসা সেই মানুষের প্রতি সহানুভূতির বেদনা অর্থলিপ্সার পঙ্কতলে কোথায় হারাইয়া গেছে!

একাওয়ালা অস্থিচর্ম্মসার শ্রান্ত ক্লান্ত ঘোড়াটার পিঠে প্রাণপণে চাবুক মারিয়া, তাহার সহিত অতি মধুর নিকট আত্মীয়তার সম্পর্ক জানাইয়া তাহাকে দ্রুত অগ্রসর হইবার কথাটি উচ্চকণ্ঠে জানাইতেছে। সেই ভোর হইতে এই রাত্রি অবধি রোদে-বৃষ্টিতে, শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায় এই তাহাদের কাজ—ঘোড়ার এবং একাওয়ালার! ঘোড়াটা এক সময়ে সুন্দর সুস্থ সবল চপল ছিল। তারপর কত দিন গিয়াছে; এখন দার্শনিক গাম্ভীর্য্যে মাথাটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে নীচের দিকে, যৌবনের সেই উদ্ধত গ্রীবা এখন চিন্তাশীলতার ভারে নত হইয়া গেছে! হাড়গুলি গোণা যায়, চলে বলিয়া মনে হয় না, যেন উপুড় হইয়া পড়িবার জন্ত টলে! দানা যা পায় তাতে পেট ভরে না, কাহাকে জানাইবে তা? তবু তাহাকে আবার দৌড়াইতে হয় কখনো আরোহীদের ট্রেণ ফেল হইবার ভয়ে, কখনো আর একখানি একার সহিত টেক্কা দিতে হইবে একাওয়ালার সেই তাগিদের খাতিরে। দৌড়ায় সত্যই—না দেখিলে ও যে দৌড়াইতে পারে বিশ্বাস হইত না। পশু! মানুষের এই নির্ম্মমতার উত্তর সে দিবে কি করিয়া? সকাল হইতে সন্ধ্যা মানুষের অস্বাভাবিক প্রয়োজনের দাসত্ব করিয়া সে মরিতেছে—পেট ভরিয়া খাইতেও পায় না! বিশাল প্রান্তরের সত্তা তাহার নিকট নিস্ফল হইয়া গেল! শুধু পাথর-বাঁধা রাজপথে চাকা টানিয়া মরাই তাহার জীবন!

একাওয়ালা সারা সহরের পথে পথে রোদে পুড়িয়া জলে ভিজিয়া সওয়ারীর সন্ধানে ঘোরে, আর থাকিয়া থাকিয়া রাগিয়া উঠিয়া ঘোড়াটাকে গালাগালি করে, সারাদিন হাঁকাইয়া কি-ই বা সে পায়? মনটা ক্রোধে বিরক্তিতে ভরিয়া ওঠে, তাই কেবলি তাহাকে অশ্রাব্য গালাগালি করিয়া নিজের বিদ্রোহ জানায়। এমনি করিয়া জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর শুধু পথে পথে দিন রাত্রি ঘোড়া হাঁকাইয়া বেড়ানো, এর কোনো ফাঁক দিয়া বর্ণ বিচিত্র ধরণীর আবির্ভাব ঘটে না, বাঁচিয়া থাকিবার কোন আনন্দ আসিয়া তাহাকে সাগ্রহ নিমন্ত্রণ জানায় না! সে শুধুই একাওয়ালা আর কিছুই নয়—মানুষ নয় সে! কখনো কখনো তাড়ি খায়, কদর্য্য আলোচনা করিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসে—আনন্দকে উপহাস করে। আবর্জ্জনায় ভরা কুড়ে ঘর, ছিন্ন মলিন ঘামে পচা বিছানা, একটা ভাঙা খাটিয়া ছারপোকায় ভরা, বাসি রুটি আর পচা ভাত,—এই তাহার ঘর, আর কালি ছড়ানো একটা কেরাসিনের বাতি! তাহার সুমুখের পাকা বাড়ীতে যারা থাকে—কি সুন্দর! পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরখানি, কাপড়-চোপড় সাদা ধব্‌ধবে, বউটি সুন্দর সেমিজ ব্লাউস পরা, চুল বাঁধিবার কি পরিপাটী ভঙ্গী, বাবুটির পরিষ্কার কামানো চেহারা—হারমোনিয়াম বাজাইয়া সকাল সন্ধ্যায় মধুর সঙ্গীত! আর 'খাওয়া দাওয়া কি চমৎকার! বাবুটিও যেন কোথায় কাজ করেন

দশটা হইতে চারিটা। সেও কাজ করে সকাল হইতে রাত ন'টা। তবু তাহার ঘর একটা আস্তাকুঁড়—নরক! লুব্ধ দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে শুধু তাকাইয়া থাকে তাহাদের পানে। কিছুই ভাবিয়া পায় না! এ অসামঞ্জস্যের একটা অস্পষ্ট অনুভূতি শুধু মাঝে মাঝে উহাকে কেমন বেজার করিয়া তোলে এই মাত্র! কোন্ অপরাধে, কাহার অপরাধে এই বৈষম্য অত কথা ভাবিবার বুদ্ধি তাহার নাই—ওই বাবুটিই বরং ওই সব কথা লইয়া আলোচনা করেন আরাম কেদারায় শুইয়া শুইয়া।

পথের পাশেই সিনেমা, লোকেরা ভিড় করিয়াছে। টিকিট ঘরে টিকিট বাবু টিকিট দেয় আর হাত বাড়াইয়া পয়সা নেয়। লোকের ভিড় কমিয়া যায়, তখনো বসিয়া বসিয়া সে হিসাব মিলায় আর বিড়ি টানে। ভালো লাগেনা এই দিনের পর দিন ওই এক ঘেয়ে কাগজ ছেঁড়ার কাজ। বাহিরে মানুষ নদীতীরে জ্যোৎস্নায় বেড়ায়, পাশের হলে লোকেরা তামাসা দেখে যত খুসি। তাহার প্রাণটা যেন হাঁপাইয়া উঠে, তবু বসিয়া থাকিতেই হয়। দশ পনেরো টাকার কাছে তাহার সন্ধ্যা হইতে রাত বারোটা বিক্রী হইয়া গেছে। সকালবেলা পাওনাদার খুব কড়া কথা শুনাইয়া গেছে। এখনো মাস কাবার হইতে তিন দিন বাকী, আর মাস কাবার হইলেই বা কি! খরচ কুলায় না কিছুতেই। সুমুখেই টিকিট বিক্রীর টাকা সাজানো—মৃগতৃষ্ণিকার মত! যার সিনেমা তার দৈনিক আয় দেড় শ টাকা আর তাহার দৈনিক আয় আনা পাঁচেক। দিন রাত টাকার চিন্তায় বুকের রক্ত শুকাইয়া ওঠে তবু দশটি টাকা এগারোটি হইবার কোনো পথ কোনো দিকেই নাই!

সিনেমা হলের ভিতর একজন লোক বেহালা বাজায়। এক এক সময় সিনেমার দৃশ্যপট হইতে মন সরিয়া যায়, বেহালার সুরে শ্রোতাদের মন দুলিয়া ওঠে, বাহবা শোনা যায়। যে বাজায় তার কিন্তু বেহালাটাকে আছাড় মারিয়া ভাঙিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে; আপন মনে বলে, 'শালা, শুধু বাহবা ছাড়া একটা পয়সা বেশী না।' এক সময় প্রাণের তন্ময়তায় সুরের সাধনা করিয়াছিল সে, আজ সেই সুর-সাধনা বিশটি টাকা মাসে আদায় করিতে গিয়া নাকাল হইতেছে! ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতিদিন বাজাইতে বাজাইতে হাত টন্‌টনায়, থামিবার উপায় নাই তবু। নিজের খুসী মত বাজাইবার স্বাধীনতা নাই, এক ঘেঁয়ে বাজানো শুধু। বাড়ীভাড়া তিনমাসের জমিয়াছে পনেরো টাকা, চাল ডালের দোকানে দশ টাকা, দোকানদার বলিয়াছে আর ধার দিবে না। বাজনা চলিতে থাকে, বাদকের মন বেদনায় হতাশায় ছট্‌ফট্ করে। রাত বারোটায় বাড়ী ফেরে যখন তখনো শ্রান্ত ক্লান্ত মন টাকার হিসাব কসিতে থাকে—জমা খরচ মিলিতে চায় না, খরচ কিছুতেই কমানো যায় না, জমার ঘরে একটি পয়সাও বাড়ে না। এমনি করিয়া দিন যায়!

সারি বাঁধিয়া আরো কত বন্দী মানুষের হতাশ মুখগুলি চোখের উপর ভাসিয়া ওঠে! ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মানুষের অন্তরাত্মা! বনের গুহায় যে মানুষ একা একা বাস করিত সেই স্বচ্ছন্দচারী মানুষ আজ সহরের ঘরে ঘরে বন্দী!

পথের উপরেই একটি ঘরে মাষ্টার তিনটি ছেলেকে পড়াইতেছেন। লোকটিকে চিনি আমি। তাঁর নিজের তিনটি মেয়ে আর দুটি ছেলে। ভোর বেলা উঠিয়া দুটা বাতাসা ভিজাইয়া জল খাইয়া ছেলে পড়াইতে বাহির হন। কোথাও দশ টাকায় দু' ঘণ্টা কোথাও তিন টাকায় এক ঘণ্টা; দশটা হইতে চারিটা অনাথ বিদ্যালয়ে মাসিক দশ টাকা; এমনি করিয়া মাসে কোনো রকমে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ আসে। সব সময় টিউশন থাকে না, তখন চমৎকার! রাত ন'টা অবধি সেই সকাল বিকাল শুধু গলি গলি ঘুরিয়া এ বাড়ী সে বাড়ী করিয়া মাসের পর মাস কাটে। ছেলেদের অভিভাবকদের মুখে মাঝে মাঝে সুমধুর কথাও শুনিতে হয়। কোনো রকমে টাকা

আনিবার নিদারুণ চেষ্টা! নিজের ছেলে মেয়েগুলার পড়াশুনা কি হয় না হয় দেখিবার এক মিনিট অবসর নাই। কোনো রকমে তাহাদের মুখে দুটা ভাত গুজিয়া দিবার দুঃসাধ্য ব্রত পালন! ছেলে মেয়েকে সংসারে আনিবার দুঃসহ পাপের প্রায়শ্চিত্ত চলিতেছে। জীবন, স্নেহ, ভালবাসা, হাসিমুখ, অবসর-সময় পাঠে সঙ্গীতে যাপন করিবার আনন্দ, ভাল খাওয়া ভাল পরার আনন্দ—যুবা বয়সের সেই সব কল্পনা কখনো মনে পড়ে, যেন হাজারোটা প্রেতাত্মা তাহাদের রুদ্র পরিহাসের অট্টহাসি হাসিয়া ওঠে! জীবন না কারাদণ্ড?

প্রকাণ্ড ষ্টেশনারী দোকান—আলোকে বিলাস-পণ্যের পসরা ঝলমল করিতেছে! পেট মোটা থলথলে-শরীর দোকানের মালিক, হাতে রিষ্ট ওয়াচ, গায়ে শুভ্র পাঞ্জাবী, পায়ে স্যাণ্ডাল, মুখে মোটা সিগার, বাবুদের সঙ্গে গল্প গাছা করেন। থাকিয়া থাকিয়া কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে নোট টাকা আসিতেছে আর বাক্স বন্ধ হইতেছে, সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত এই কাজ। রূপার টাকা আর কাগজের নোটে বাক্স ভর্ত্তি হইতেছে, ব্যাঙ্কে হিসাবের অঙ্কটা বাড়িতেছে, পরম নিশ্চিন্ত! ওদিকে অন্তর-পুরুষ যে ওই স্ফীত দেহের মধ্যে রুদ্ধশ্বাসে মরিতেছে তাহার এতটুকুও খবর পৌঁছায় না। হাতের কাছে টেলিফোনে নিমেষে নিমেষে তবু বাজার দরের কোটেশান অবিরাম চলিতেছে। হায়রে অন্ধকারের যাত্রী, আলো ঝলমল দোকানের মাঝে কি নিদারুণ অন্ধকার জমিতেছে! আলো তো নয়, আলেয়া!

রূপার দেয়াল-ঘেরা ঘরে আলোক-যাত্রী বন্দী হইয়া ঘুমায়!

জমিদার বাবুর বৈঠকখানার পাশ দিয়া চলিতে থাকি। নিশ্চিন্ত আলস্যে বসিয়া বসিয়া অজীর্ণ রোগ ধরিয়াছে, সুখ নাই। ফ্যানের হাওয়া, বিদ্যুতের আলো, এসেন্সের গন্ধ, সিগারের ধোঁয়া, উমেদার বন্ধুবর্গের মিষ্টভাষণ, টাকার হিসাব কিছুতেই যেন প্রাণের ভিতর-কার ফাঁক ভরিয়া ওঠে না। মুখে হাসি ফোটে, তাহার অন্তরালে ভাল-না-লাগা আপনাকে আপনি দাঁত খিঁচায়। সকলেই বলে জমিদার বাবু পরম ভাগ্যবান্! যারা বলে তারা এই জমিদার বাবুর পানে চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস দিয়া বিধাতাকে অভিশাপ জানায়! জমিদার বাবুও তাঁহার চারিপাশের ঐশ্বর্য্যের স্তূপের পানে চাহিয়া বাড়ী ঘর আসবাব পত্র, গাড়ী মোটর দাস দাসী, অনুগত আশ্রিতের পানে চাহিয়া সেই কথাই ভাবিবার চেষ্টা করেন। তবু যে হাসি পাঁচ বছরের কুলির ছেলেটা পথের ধূলায় গড়াইতে গড়াইতে হাসে, যে হাসি ভোরের আলোর মুখে, যে হাসি সবুজ পাতায়, সে হাসির দিকে চাহিয়া চতুষ্পার্শ্বের এই নিস্ফল প্রাচুর্য্যের ব্যর্থতা বুঝিতে বাকি থাকে না।

নিরুপায়! ওই মাধুর্য্যের উৎসধারা যেন তাহার জীবনে চিরতরে কে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে! উর্দ্ধবাহুর হাতের মত তাহার সুখোৎকণ্ঠ প্রাণখানি শুষ্ক শীর্ণ—চারিদিকের সহজ আনন্দ-জীবনের স্রোত তাহার প্রাণের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয় না! জীবন তো নয় জীবনের ব্যঙ্গচিত্র!

সুমুখেই পথের উপর ঘাসের বাজার। একরাশি মেয়ে ঘাস লইয়া তখনো বসিয়া আছে। সারাদিন সকাল বেলা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দরিদ্র মাঠের বুকটা চিরিয়া চিরিয়া এক এক ঝুড়ি ঘাস সংগ্রহ করিয়াছে। কাদা মাটিতে কাপড় ভেজা, মলিন, মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয় ভিজিতে থাকে, তাহার উপর আষাঢ়ের রোদ, কোন দিকেই ভ্রুক্ষেপ নাই, কেবলি একটি একটি করিয়া ঘাস উপড়াইতে হয় সারাদিন। ওই বৃদ্ধা যার মুখ খানি অভাবক্লিষ্ট চিন্তার রেখায় সমাকীর্ণ, দেহখানি যার বাঁকিয়া গেছে আজও তার ছুটি মিলে নাই! ওই কচি দশ বছরের মেয়েটি ভেজা কাপড়ে দাঁড়াইয়া আছে ছোট ঘাসের ঝুড়িটি লইয়া! ওই পঁচিশ বছরের মেয়েটি চোখ দুটি যার ভীত চকিত সেও বসিয়া আছে কাদার উপর! ঘরে বছর তিনেকের বাচ্চাটা পড়িয়া আছে,

সারাদিন তাহাকে দেখে নাই; বুড়িমার কাছে রাখিয়া আসিয়াছে। কাতর দৃষ্টিতে গাড়ীওয়ালাদের পানে তাকায়, কেউ যদি দয়া করিয়া তাহাকে কয়েক আনা পয়সা দিয়া মুক্তি দেয়! অনাহারে পরিশ্রমে চোখ দুটি তার বসিয়া গেছে।

মানুষের আরামের প্রয়োজনে বনের স্বাধীন ঘোড়া বন্দী। সে খাইতে পায় না পেট ভরিয়া। তাহার সেই প্রয়োজনের ঠাট বজায় রাখিতে গিয়া ঘোড়াকে বাঁচাইয়া রাখিতে হয়। সেই বাঁচাইয়া রাখিবার নিষ্ঠুর প্রয়োজনে ঘাসের বাজার বসিয়াছে। সেই প্রয়োজনে ওই মেয়েগুলি বৃষ্টি জলে কাদায় রোদে দেহপাত করে। তাহাদের সুখ নাই, আরাম নাই, তাহাদেব জন্য জীবনের কোনো সুখ সৌন্দর্য্যই নয়!

মানুষ জন্মিয়াছিল কেন পৃথিবীতে বলিতে পার, বন্ধু? দেহের শৃঙ্খলে ওই যে বন্দী মানবাত্মা হাহাকার করে, বলিতে পার বন্ধু, এই শৃঙ্খলিত মানবাত্মার মুক্তি কেমন করিয়া হইবে?

প্রাকৃতিক জগতের পানে চাই আর সেখানে দেখিতে পাই দানের দ্বারা ধরণী সুন্দরী হইয়া উঠিতেছে। রুক্ষতা শ্যামল মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। আর মানুষের জগতে? এক একজন মানুষের আরামের দায় চুকাইতে গিয়া হাজার হাজার মানুষ জীবনের ও জগতের আনন্দ মাধুর্য্য ও স্বচ্ছন্দতা বলি দিল, আপনাদের দেহ-মন নিঃশেষে বিলাইয়া দিল, তারপর সেই শোষিত-শক্তি হাজার হাজার মানুষের কঙ্কালে জগৎ শশ্মান হইয়া উঠিল, আর সেই একজন, সেও কি সুখী হইল? কিছুই নয়।

সড়কের ওপর ঘরগুলি আলোয় আলোয় উজ্জ্বল, যেন কোন্ উৎসব রজনী! প্রতিদিনই এমন ধারা। ঝালরে আলোর নানাবর্ণে ঝিলিমিলি, বাতায়নে নানারঙের—সবুজ-নীল-আসমানি-গোলাপী-ফিরোজা-ধানী পরিচ্ছদে তনুকে বর্ণ বিচিত্র করিয়া মুখে লালসা-বিকট হাসি টানিয়া পথের পানে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে রূপসীরা চাহিয়া আছে! পথের উপর পানের দোকানে সুমুখে ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবী পরিয়া বাঁকাইয়া টুপি মাথায় দিয়া কতকগুলি লোক পান চিবাইতে চিবাইতে সে-দিকে চাহিয়া হাসে, শিস্ দেয়, কখনো দৃষ্টি বিনিময় হয়, কদর্য্য হাসি ফুটিয়া ওঠে। এই কৃত্রিম হাস্যোল্লাসের অন্তরালে বুভুক্ষ মানবাত্মার চাপা হাহাকার শুনিতে পাই যেন!

ওই যে মানুষটা লুব্ধ হিংস্র পশুর মত তাহার সুমুখে দোতলায় ওই মেয়েটার পানে তাকাইতেছে, কি চায় সে? প্রতি রাত্রি এমনি আসে দেহের দুয়ারে দুয়ারে। হাসিবার আমোদ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। যে হাসিত আনন্দ করিত, শিশুবেলার নূতন কৈশোরের সেই হাসি-হাসি মানুষটি মরিয়া গেছে; কবে কেমন করিয়া কে জানে! সেই হারানো মনের মানুষটিকে সে খুঁজিতে আসে বাববনিতার দেহের মরীচিকায়, তাহার ছলনাময় কটাক্ষে ও হাস্যে! মদ খায় গেলাসের পর গেলাস—সেই নিদারুণ হারানো স্মৃতিকে আড়াল করিয়া আনন্দের স্বপ্নকে সে কোনো রকমে জড়াইয়া ধরিতে চায়। ব্যর্থ চেষ্টা শুধু দেহে মনে দিনের পর দিন ধ্বংসের রেখা টানিয়া দিয়া যায়।

আর, ওই যে মেয়েটি দেহের পণ্যশালা খুলিয়া বসিয়াছে, ওই যে গোলাপী ওড়না জড়াইয়া ওষ্ঠাধার তাম্বূলরাগে রাঙাইয়া হাসিয়া আপনাকে উৎসব উল্লাসের রাণী বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছে, উহার মত একা, উহার মত অসহায় কি কোথাও আছে! ওই তো দিনের পর দিন তাহার যৌবনের অস্তরাগ ভাঁটার স্রোতের মত মিলাইয়া যাইতেছে, তাহার মুখে সেই কিশোরী বয়সের অনাবিল শেফালি-নির্মল পবিত্রতার, মুগ্ধ ভালবাসার, অনন্ত মধুর প্রেমের যে-আবেশ-আভা স্বর্গের মত তাহাকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল, সেই দীপ্তি আজ কোথায় বিলীন হইয়া গেছে! তাহার মুখে চোখে, তাহার ছল-হাস্যে আজ শুধু কোন্ প্রেতিনীর অট্টহাসিই

ফুটিয়া ওঠে তাহা সেই জানে। নানা রকমে তাহা সে ভুলিতে চায়! এক একবার আর্ত্ত প্রাণে বলিয়া ওঠে, না, না কিছুতেই সে এমন হইতে পারে না। কে যেন জোর করিয়া তাহার মুখে একটা প্রেতিনীর মুখোস আঁটিয়া দিয়াছে, উহাকে সে ছিঁড়িয়া ফেলিতে চায়। আপনাকে সে পিষিয়া দলিয়া ফেলিতে চায়। এই অনন্ত সংসারের জনতারণ্যের মাঝে তাহার একাকিত্ব তাহাকে যেন গ্রাস করিতে আসে! রোগ আসে, কেহ স্নিগ্ধকণ্ঠে সান্ত্বনা দেয় না। পাশের ঘরের সঙ্গিনীরা সে দিন আরো উৎসবে মাতিয়া ওঠে। (উৎসব!!!) মৃত্যু আসিতেছে মনে হয়; আর্ত্ত অন্তরাত্মা অসহায়ের মত কাহার একখানি শক্তিশালী হাতের স্পর্শ কামনা করিতে থাকে। কেউ তবু বলে না, সখি, ভয় নাই, হাত ধরো। অন্ধকারে কে বলিতে থাকে, রিক্ত পাত্রকে আবার কে তুলিয়া রাখে, আবর্জ্জনার স্তূপে তাহাকে আছাড় মারিয়া ফেলিয়া দেয় সবাই!

অন্তহীন অসহায়তা, অবসাদ, অন্ধকার! তবু ওই নারী কাঁদে না। হাসিয়া ওঠে, জোরে, আরো জোরে হাসির ধ্বনি শুধু ঝালরগুলিকে কাঁপাইয়া তোলে। গেলাসের পর গেলাস, বোতলের পর বোতল নিঃশেষ হইয়া যায়।

চলিতে চলিতে বুকের মাঝে কেমন যেন দম বন্ধ হইয়া আসে, বন্ধু!

একটা পাগল। রুক্ষ চুল জটা পাকাইয়াছে। এক রাশি ছেঁড়া ময়লা কাপড় আর কম্বলের গাঁঠরী পাশে। আপন মনে কি যে বিড়বিড় করিয়া বকিতেছে ঠিক নাই। এক একবার হাউ হাউ করিয়া কাঁদে, আবার হঠাৎ অট্টহাস্যে তাহার চারিদিকের অন্ধকারটাকে ভীত চকিত করিয়া তোলে। কখনো ওই ছেঁড়াময়লা কাপড় আর লোটা-কম্বল ছুঁড়িয়া ফেলে যেদিকে-সেদিকে, আবার কি মনে করিয়া সেগুলিকে গুটাইতে থাকে; আবার অকস্মাৎ হো-হো করিয়া হাসিয়া ওঠে!

মনে হয়, ওই বুঝি বিশ্ববিধাতা অনন্ত শূন্য অন্ধকারের বুকে বসিয়া বসিয়া এই জঘন্য জীর্ণ সৃষ্টিটার পানে চাহিয়া অনুতাপের অগ্নিজ্বালায় কখনো হো-হো করিয়া অট্টহাসি হাসিতেছে, আবার কখনো গভীর শোকে হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছে! এই সৃষ্টিকে ফেলিতেও পারে না, উহার পানে চোখ মেলিয়া চাহিবারও শক্তি নাই!

বিচিত্রা

রয়াল কমিশন 'বয়কট' করা সম্পর্কে ভারতের রাজনীতিকগণ অনেকেই এক মত। রয়াল কমিশনে ভারতবাসীদের স্থান না দিয়া ভারতবাসীদের অপমান করা হইয়াছে ইহাই বয়কটের সমর্থকদের (অনেকের) মূল কথা। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের মধ্যে জাতীয় আত্ম-মর্য্যাদা-বোধের অভাব রহিয়াছে। এই দুর্ব্বলতাটুকু যথেষ্ট পরিমাণে আছে বলিয়াই, ইংরেজ জাতির বড় ও ছোট রাজনীতিকদের মিষ্ট কথায় আমরা সহজে তুষ্ট হই।

যাহারা সত্যই দুর্ব্বল তাহাদের বয়কটের আস্ফালন বিন্দুমাত্রও মানায় না, কিন্তু আত্ম-মর্য্যাদা ও জাতীয় মর্য্যাদা যতটুকু অবশিষ্ট আছে তাহা রক্ষার জন্য আমলাতন্ত্রের ত্রিসীমানায় না যাওয়া কর্ত্তব্য—ইহাকে বয়কট বা বর্জ্জন বল আপত্তি নাই—কিন্তু ইহাই এই দুর্ব্বল জাতির শক্তি অর্জ্জনের সরল পথ—যদিও এই পথ সুগম নহে।

কমিশন বয়কট করার কথা বলিতে দুঃখ হয়, কারণ এই 'বয়কটও' আমরা আঘাত না পাইয়া উচ্চারণ করিতে পারিলাম না। ধরিতে গেলে আমরা সাহচর্য্যই করিতে উন্মুখ হইয়া ছিলাম, কিন্তু আমাদেরই ইংরেজ আমলাতন্ত্র বর্জ্জন করিয়াছেন বয়কট করিয়াছেন। আমাদের 'জাতের ভাগ্য বিধাতা' বলিয়া তাহার যে সহজ দম্ভ রহিয়াছে সেই দম্ভই আমাদের জাতির কি চাই না চাই তাহার মীমাংসা ব্যাপারে আমাদের বর্জ্জন করিতে উপেক্ষা করিতে তাহাকে বুদ্ধি যোগাইয়াছে। সুতরাং এই কমিশন ব্যাপারে আমাদের ইংরেজই সুস্পষ্ট রূপে বর্জ্জন করিয়াছেন—ইহা ভারতের ভাগ্য-বিধাতারই মার—আমাদের বর্জ্জন ঘোষণা পরে হইল। সুতরাং এই বর্জ্জন ঘোষণার ইতিহাসের সমগ্র পাঠ উদ্ধার করিলে আমাদের যে দুর্গতি ফুটিয়া উঠিবে, তাহাতে আমাদের লজ্জিত হইবার কারণ যতই থাকুক, এই পাঠোদ্ধারে আমাদের যদি 'আপন বুঝে' চলার দৃষ্টি খুলিয়া থাকে তবেই বুঝিব আঘাতের পর আঘাত দিয়া ভগবান আমাদের ঘুম ভাঙ্গিতেছেন।

*

* *

পরাধীন জাতির সহযোগিতার নেশা মরীচিকার মতই অবাস্তব। ইংরেজ বড় জোর আমাদের সাহচর্য্য চাহে—তার বেশী নহে। মহাত্মা গান্ধী বুয়ার যুদ্ধে এই ভ্রান্তিতেই ইংরেজের সাহচর্য্য করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু সত্যকার সহযোগিতা যে অসম্ভব মহাত্মা ভারতের মাটিতে তাহা বুঝিয়াছেন, জালিনওয়ালাবাগের রক্ত-লেখায় সে পাঠ তিনি পড়িয়াছেন। কিন্তু তবু ভ্রান্তি আমাদের অনেকের সংস্কারে জড়াইয়া রহিয়াছে। একটু সুযোগ পাইলেই আমরা নিজের স্থান কাল পাত্র ভুলিয়া গিয়া যাহা অবাস্তব মরীচিকা সেই সহযোগের ফাঁদে—অর্থাৎ ইংরেজের উপর নির্ভর করিয়া কাজ

কাটাইবার মায়াজালে নিজেকে নির্ব্বিচারে আবদ্ধ করিয়া ফেলি। তাই বুঝি রয়াল কমিশনের এই সুস্পষ্ট আঘাত আমাদের প্রয়োজন ছিল।

*

* *

রয়াল কমিশনকে বয়কট মাত্র করিয়াই যদি আমরা কমিশনের শিক্ষার সদ্ব্যবহার করি তবে আমাদের এতেও শিক্ষালাভ হয় নাই বুঝিতে হইবে। এই রয়াল কমিশনে ব্রিটিশ শক্তিই আমাদের বর্জ্জন করিয়াছেন, আমাদের সাক্ষ্য না দিতে যাওয়ায় এর আর কি হ্রাস বৃদ্ধি করিবে? আমাদের সর্ব্ব-প্রধান কর্ত্তব্য ব্রিটিশ পণ্য বর্জ্জন করা, কাউন্সিল অচল করিয়া কাউন্সিল বর্জ্জন করিয়া আসা ও ব্রিটিশ পণ্য বর্জ্জনের জন্য জাতীয় শক্তিকে নিযুক্ত করিতে কাউন্সিল ও এসেমব্লিগামীদের দেশের জন সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়া। ইংরেজের প্রতি নির্ভর না করিতে হইলে যে জাতির উপর চরম নির্ভর করা ভিন্ন আর উপায় নাই এই সত্য আমাদের রাজ-নীতিক দের মধ্যে—সাহিত্যিকদের মধ্যে—জনসাধারণের মধ্যে মূর্ত্ত হউক।

*

* *

রয়াল কমিশনে আমাদের স্থান দেওয়া হয় নাই। এই না দেওয়াই যে অতি সঙ্গত কার্য্য হইয়াছে, আমাদের ব্রিটিশ রাজশক্তির অন্যতম স্তম্ভ বার্কেনহেড সাহেব বলিয়া দিয়াছেন। দেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত -ইহাদের স্বার্থের সঙ্গে শিক্ষিত ভারতবাসীর স্বার্থের সঙ্গতি নাই, সুতরাং শিক্ষিত ভারতবাসীদের কমিশনে স্থান দিলে অগণিত অশিক্ষিত ভারতবাসীদের উপর অবিচার হইত। ইহার পরে আর কোন তর্ক করা চলে না; কারণ তর্ক করিতে প্রবৃত্তি হওয়াও অসম্ভব। শিক্ষিত ভারতবাসীদের সঙ্গে অশিক্ষিত ভারতবাসীর স্বার্থের বিরোধ কল্পনা করা অসম্ভব নহে, কিন্তু এই অশিক্ষিত লোক গুলির স্বার্থের সঙ্গে বার্কেনহেড সাহেবের স্বজাতীয়দের (তাহারাও শিক্ষিতই বোধ হয়) বেশ সঙ্গতি আছে বলিয়াই বুঝি ভারতের আমলাতন্ত্রী শাসনের দেড় শত বৎসরেও ওদের জীবনের তমিস্রা দূর হইল না?—যদিও অনেকেরই রোগে দুঃখে অনাহারে ভব যন্ত্রণা দূর হইয়াছে। যাক, রয়াল কমিশনের শিক্ষা ঘরে ফিরিবার শিক্ষা। জাতিকে গড়িয়া তোলার শিক্ষা। বয়কটে এই গড়িয়া তোলা যে সহজ করিবে ইহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বয়কটের সঙ্গে চাই রাজশক্তির উপরে নির্ভর করিয়া থাকা সম্পূর্ণ বর্জ্জন। তবেই জাতির আত্মসম্বিত ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি দেখা দিবে। জাতি ইংরেজরাজকে দেখাইতে demonstration কম করিবে। যে শক্তি থাকিলে ভারতের চাওয়া ভারতের দাবী অমোঘ হইবে, জাতির রাজনীতিকগণ—সংস্কারকগণ—সকলেই জাতিকে লইয়া সেই শক্তির সন্ধান করিবে।

*

* *

এবারে কংগ্রেসে বেশ লোক সমাগম হইবে মনে হয়। নানা কারণে এবারের কংগ্রেসের গুরুত্ব বাড়িয়াছে। কংগ্রেসের প্রভাব দেশে যথেষ্ট বাড়াইতে হইলে কংগ্রেসের কর্ম্ম-শক্তিও যথেষ্ট বাড়াইতে হইবে। কংগ্রেসের কর্ম্ম-শক্তি বর্ত্তমানে যথেষ্ট দেখা যাইতেছে একথা বলা চলে না। অথচ কংগ্রেসের কর্ম্ম-শক্তি বৃদ্ধি না করিতে পারিলে দেশের সমূহ ক্ষতি। কংগ্রেসের কর্ম্ম-শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে কংগ্রেসের কর্ম্ম পদ্ধতিও কিছু পরিবর্ত্তনের দরকার। কর্ম্ম-পদ্ধতির উপরে কর্ম্ম-শক্তির বৃদ্ধি-হ্রাস যে অনেকটা নির্ভর করে ইহাতে আর সন্দেহের অবকাশ নাই।

কংগ্রেসের কর্ম্ম-শক্তি যথেষ্ট লক্ষিত হইতেছে না, ইহার মূলে কর্ম্ম-পদ্ধতির দায়িত্ব কতখানি তাহা বুঝিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। এবারের কংগ্রেসে কর্ম্ম-পদ্ধতি পরিবর্ত্তনের চেষ্টা চলিবে—চলা উচিত।

*

*   *

হিন্দু মুসলমান সমস্যাও কংগ্রেসে এবার বিশিষ্ট স্থান লাভ করিবে। কংগ্রেস-কর্ম্মীদের এই প্রশ্নটাকে ভারতের জাতীয়তার দিক দিয়া—স্বাধীন দেশের নাগরিক সাধারনের দায়িত্ব ও অধিকারের দিক দিয়া একেবারে চরম—স্পষ্ট মীমাংশা করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

*

*   *

তার পর রয়াল কমিশন। রয়াল কমিশন বয়কট কংগ্রেসে সহজেই গ্রাহ্য হইবে। ইহা লইয়া বিশেষ কোন গোলযোগ হইবে না। কিন্তু একদল কংগ্রেস-কর্ম্মী এই উপলক্ষে বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনের প্রস্তাবও উঠাইবেন। এখানে সকলে একমত হইবেন না। কিন্তু বর্জ্জনের দিকেই অনেকে মত দিবেন মনে হয়—দেওয়াও উচিত।

*

*   *

শুধু বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন নহে কমিশন ব্যাপার উপলক্ষে কাউন্সিল ত্যাগের কথাও উঠিবে বলিয়া মনে হয়। বাহিরে বিপুল বিরোধের জন্য সমগ্র দেশকে গড়িয়া তুলিতে হইলে—দেশ-কর্ম্মীদের সবখানি শক্তি—একৈকনিষ্ঠার সহিত কাউন্সিলের বাহিরে ব্যয় করার সময় আজ উপস্থিত হইয়াছে কিনা কংগ্রেসের সে কথা ভাবিয়া দেখিবার।

শ্রমিক ও কৃষক কংগ্রেসের কর্ম্ম-পদ্ধতিতে স্থান পাইয়াছে। এবারের কংগ্রেসে শ্রমিক ও কৃষকের কথা আরো বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে—করা উচিত। কংগ্রেসের কর্ম্ম-পদ্ধতিতে যে কয়টা প্রধান কাজ থাকিবে শ্রমিক ও কৃষক সম্পর্কিত কাজ তাহাদের অন্যতম হওয়া উচিত। শ্রমিক ও কৃষকগণকে বছরে একবার বিনা পয়সায় কংগ্রেস 'দর্শন' এর সুযোগ দিলেই চলিবে না, শ্রমিক ও কৃষকরা কংগ্রেসকে যাহোতে নিজেদেরই বলিয়া মনে করিতে পারে তেমন করিয়া কংগ্রেসের আদর্শ তাহাদের কাছে পৌঁছাইতে হইবে—তেমন করিয়া কংগ্রেসে তাহাদের স্থান দিতে হইবে।

শ্রী নলিনীকিশোর গুহ

পত্র

কল্যাণীয়াসু,

অনেককেই দুঃখ করতে শোনা যায় যে আমাদের সাহিত্যে সমালোচনার দিকটা ভারি অপরিস্ফুট রয়েছে।

কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়।

কিন্তু আমাদের সাহিত্যে ভাল সমালোচনার যে একেবারেই নেই, এ কথাই বা কেমন করে বলি?

সে-মুখ রবীন্দ্রনাথ বন্ধ করে রেখেছেন। তাঁর হা থেকে এমন গুটিকয়েক সমালোচনা বার হয়েছে যা' চিরদিন, যে-কোন দেশের সাহিত্যে সমালোচনার আদর্শ হ'য়েই থাকতে পারে।

একদিন, জন কয়েক গিয়ে তাঁকে ধরেছিল, আমাদের সাহিত্যের ও-দিকটা কাণা হয়ে আছে, আপনি এ-দিকে একটু নজর দিন্।

কবি কোন কথা ব'লেছিলেন কিনা মনে করতে পারিনে, সে বিশ-বাইশ বছরের আগেকার কথা; কিন্তু তাঁর শান্ত-সুন্দর হাসিটি আজো যেন দেখতে পাই।

এমন দুর্গতি তাঁর অনেক হ'য়েছে; লোকের গানে সুর বসিয়ে দেওয়ার অনুরোধ; গল্প-উপন্যাসের প্লট বলে দেওয়ার উপরোধ আজো হয়তো তাঁকে হজম করতে হয়!

কবির হাসির অর্থটি কি বুঝিয়ে দিতে হবে?

যিনি সৃষ্টির কাজে অদ্বিতীয়, তাঁকেই আহ্বান ফের সমালোচনার কাজে?

ল্যাণ্ডরের সেই কথাটি মনে পড়ে না?

বুট-জুতো কেটে যেমন যখন ইচ্ছা শু-জুতো করে নেওয়া যায়, তেমনি কবি আর সমালোচক।

অক্ষম কবি না হয় সমালোচক হ'লেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে সমালোচক হতে বলায় নিশ্চয়ই খুব বেশী সম্মান করা হয়নি!

কবি তাঁর ক্ষমা-সুন্দর হাসিতে এই কথারই ইঙ্গিত করেছিলেন, বোধ হয়। সমালোচনার পথও ত খুলে দেওয়া হ'য়েছে!

তবে কথা এই যে, বাংলা সাহিত্যের এই দিকটা এমন দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হ'য়ে রইল কেন?

সেদিন, এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত সুন্দর কটি কথা ব'লেছেন। সমালোচকের কি কাজ? সেই কথা বোঝাতে অতুল-বাবু বলেছেন :—

> সমালোচনার মূল তত্ত্ব বোঝা কঠিন নয়। সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও রসের অনুভূতি সকল পাঠকের সমান নয়। এ অনুভূতি কারও সূক্ষ্ম কারও মোটা; কারও ব্যাপক, কারও সঙ্কীর্ণ। বেশীর ভাগ পাঠকের সাহিত্যে বোধ সূক্ষ্ম ও ব্যাপক নয়। কিন্তু অনেক পাঠকেরই এ টুকু শক্তি আছে যে, দেখিয়ে দিলে তারা দেখতে পায়। সমালোচনার কাজ এ দেখিয়ে দেওয়ার কাজ। যাঁর অনুভূতিতে সাধারণ দৃষ্টির অতীত, সুষমা ও রসের উপলব্ধি হয়, তাঁর যদি অপরকে দেখিয়ে দেবার শক্তি ও প্রেরণা থাকে তবে তিনিই সমালোচক। সাহিত্যের জগতে সমালোচক হচ্চেন, দ্রষ্টা ও দর্শয়িতা।
>
> (কালি-কলম, বৈশাখ '৩৪, সমালোচক)

তিনিও সমালোচনার দৃষ্টান্ত দেখাতে গিয়ে কবির শরণ নিয়েছেন। তারপর বড় দুঃখেই নীচের কথা গুলি বলেছেন :—

> কিন্তু এমন সমালোচনা ইচ্ছা থাক্‌লেই লেখা যায় না। যেমন ইচ্ছা করলেই কবি হওয়া যায় না। কিন্তু অকবি লোকও কাব্য লেখে আর যার কোন সাহিত্যিক সূক্ষ্ম দৃষ্টি নেই সেও সমালোচক হয়। স্বভাবতই তাদের সমালোচনায় **আলো থাকে না, থাকে শুধু উত্তাপ।**
>
> [বড় অক্ষর আমার]

বলা বাহুল্য যে, ব্যক্তিগত স্বার্থ কি ঈর্ষ্যা বিদ্বেষ নিয়ে কথা কইতে গেলে মনের ক্লেদ আর গরল বার হয়ে আসে।

নিশ্চয় আমাদের বড় দুর্ভাগ্য যে এ বছরটা আমাদের অদৃষ্টে এই সব বিভ্রাট এত বেশী দেখা দিয়েছে।

মাসের পর মাস যেন অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আসচে। ছেলে বেলা একটা ছড়া শিখেছিলুম, দেখি সেটা সত্যই হ'লো বা!

অন্ধকারে মহাঘোরে
যে-যত ভেঙ্‌চুতে পারে॥

মনকে শান্ত সংযত করতে না পারি তো আমার সমালোচনা ব্যর্থ হবেই হবে!

গালাগালি যে অন্যের গায়ে ফোস্‌কা না তুলে আমাদেরই রসনাকে তিক্ত কলুষিত করে—একথা আমরা কতদিনে বুঝব?

সাহিত্যের মধ্যে রস-বোধের একতা-বুদ্ধি হারিয়ে ফেল্লে সমূহ ক্ষতি যে আমাদেরই। যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর ভূমিতে যে আমাদের যেতে হবে, তাঁর দৃষ্টির সঙ্গে আমাদের দৃষ্টি যে মেলাতে হবে; সুরের সঙ্গে সুর না মেলাতে পারলে আনন্দের হদিস পাই কেমন করে?

সাহিত্যের দরবারে এ সব তো একটুও নূতন কথা নয়।

সমালোচনা করতে ব'সে যদি মনটা অনুরাগের বদলে

বিরাগেই আচ্ছন্ন হয়ে থাকে তো থাক্ না সমালোচনা! কিলিয়ে পাকানোর দরকার কি?

বিরাগ মনশ্চক্ষুর ওপর যে কালো পর্দা টেনে দেয়, আর দৃষ্টি চলে না!

সমালোচনা কথাটার মধ্যে লোচন কথাটা বাদ দেবার তো উপায় নেই।

কিন্তু মন যে মানে না।

সত্য ভিতর থেকে ব্যথা দিয়ে বাইরে আস্‌তে চায়!

সত্য!

শুন্‌বে একটা ঐ সত্য-সম্বন্ধে খাঁটি সত্যি-কথা?

* * * তিনি বার বার বলেন, সত্যের স্থান বুকের মধ্যে, মুখের মধ্যে নয়। কেবল মুখ দিয়ে বার হয়েছে বলেই কোন জিনিস কখনো সত্য হয়ে ওঠে না। তবুও তাকেই যারা সকলের অগ্রে, সকলের উর্দ্ধে স্থাপন করতে চায়, তারা সত্যকে ভালবাসে বলেই করে না, তারা সত্য-ভাষণের দম্ভকেই ভালবাসে বলে করে।

(শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত দত্তা, চতুর্থ সংস্করণ ২৬২ পৃষ্ঠা)

অতুল বাবু লেখাটি শেষ করার আগে ভারি মূল্যবান কথা বলেছেন:

বিশ্বের রহস্য কবির মনে যে প্রকাশের আবেগ আনে তা থেকে কাব্যের সৃষ্টি হয়। সাহিত্যের বিবর্তদর্শী রসজ্ঞের মনে যে আনন্দের আবেগ আনে "সমালোচনা" তার অভিব্যক্তি। ইনস্পেক্টরি করা সমালোচকের কাজ নয়, তা "ভ্যানিটেরি"ই হোক্, আর "লিটেরেরি"ই হোক্। সাহিত্যের **হিতেচ্ছায়** যে সব সমালোচনা তা অনেক পরহিতৈষণার মত শুধুই **পীড়াদায়ক**।

[বড় অক্ষর আমার]

তাই ভাবি, এমন কলহ-প্রিয় মন নিয়ে কেমন ক'রেই বা আমরা সমালোচনা লিখি?

আধুনিক-সাহিত্যের সমালোচনা মানে কি?

রাগ হয়ে যায়!—ছোট-সম্রাট, বড়-সম্রাট; আরো কত কি!

এই দেশের মাটিতেই তো জন্মেছিল দুর্য্যোধন-দুঃশাসন, এই দেশের আলো-বাতাসেই তারা পুষ্ট হ'য়ে উঠেছিল, ভীষ্ম-বিদুরের সাম্‌নেই!

ভুলে গেলে চল্‌বে কেন যে অন্যায় আত্মঘাতী? বিনাশ—তার পিছনে পিছনে ছায়ার মত ছোটে!

"আধুনিক-সাহিত্যের" জল্লাদের কাজ করবেন কিনা রবীন্দ্রনাথ!

হায়, দুরদৃষ্ট বঙ্গ-সাহিত্যের!

২০শে অঘ্রাণ, ১৩৩৩। — মণিবন্ধ ভারতী

পথ-মায়া

শ্রী হেমচন্দ্র বাগচী

পথিক-হৃদয় ধীরে ধীরে কয়, যোজন পথের শেষে
ফেরো কা'র উদ্দেশে?
গীত-নির্ঝর গীত গেয়ে যায়; রৌদ্র মলিন হেসে
শুধায় আমায়—কা'র তরে ফেরো এমন উদাস-বেশে!

খুঁজে নাহি পাই কথা ;—
ভাবি মনে একি অকারণ আকুলতা !
গোপন মরমে ক্ষীণ বাণী রহে জাগি'—
পথ চলি হায় উদাসী বিধুর, প্রেয়সী নারীর লাগি' !

প্রতিটি দিনের বেদনা শুধায়—জীবন আঁধার হ'লে
কা'রে চাও পলে পলে !
নীরব গহন বনতলে চলি ; মন যে চলে না আর।
সবে ডাকি' কয়—পরাণ ভরিয়া কেন এত হাহাকার ?
যা'রে চাও তারে লহ ;
নিঠুর বেদনা কেন বা এমনে বহ' ?
সারাটি হৃদয়ে এক বাণী রহে জাগি'—
পথ-চলা মোর সুদূর মধুর প্রেয়সী নারীর লাগি' !

চারিপাশে জাগে মহাকলরোল ; জীবন-তটিনী ঘিরে
কালের নটিনী ফিরে !
মৃদু ভাষে তা'র ব্যথা ভোলে প্রাণ ; তবু যেন সে কি চায় !
ঘরের উদাসী ঝড়ের দোলায় পথে পথে বাহিরায় !
কাঁপে দেহ-হিন্দোল—
অন্তর আজি উতরোল উতরোল !
ধ্রুবতারকার প্রভা তবু রহে জাগি'—
শত বন্ধন-ক্রন্দন মাঝে প্রেয়সী নারীর লাগি' !

আতুর হৃদয় ধীরে ধীরে কয়, আজি বেলা হ'ল শেষ—
বিফল সুরের রেশ !
গগনে গগনে জ্বালা নাহি রবে ; সন্ধ্যাধূসর দিন ;
ঊষর মরুর শেষের সীমায় বাজিবে জীবন-বীণ !
শূন্য সে পথ 'পরে—
দীর্ণ হিয়ার বেদনা ঝুরিয়া মরে !
মধ্যমণি সে বাসনা রহিল জাগি'—
পথ চলি হায় সুদূর মধুর প্রেয়সী নারীর লাগি'।

শ্রী শিশিরকুমার নিয়োগী কর্তৃক, ১এ, রামকিষণ দাসের লেন, নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস হইতে মুদ্রিত ও
বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

কালি কলম

কালি-কলম

২য় বর্ষ] পৌষ, ১৩৩৪ [৯ম সংখ্যা

মুক্তো

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১

রাজবাড়ির দক্ষিণ মহলের দোতালায় দুটো বড় বড় ঘরে থাকতো মতি আর মুক্তো।

ঘর দুটো যেমনি আয়তনে বড়, তেমনি সাজানো। সকালের সিঁদুর-মাখা সূয্যি-মামা বিকেলে গৈরিক চাদর গায়ে দিয়ে যখন তালবনের মধ্যে বাণপ্রস্থে যেতেন তখন ঘরের দাঁড়া-আসিগুলো ঝক্‌ঝক্‌ করে যেন মানুষদের চোখ ঝল্‌সে দিতো।

বড় বড় দুই পালং, নেটের মসারি খাটানো, মখমলের গদি-আঁটা; বকের পাখার মত ধপ্‌ধপে সাদা বিছানা। অন্ধকার হবার আগেই বুড়ো উল্‌ফৎ মিঞা সুইচ্‌ টেনে বিজলীর আলো জ্বেলে দিয়ে যেত।

মতি আর মুক্তোর সুখ দেখে আর সকলের চোখ টাটাতো।

কিন্তু মতি মুক্তো কারুর মনেই ছিল না সুখ।

মতির বয়স বোধ করি ষাট পার হয়েছে। সামনের দুটো দাঁত নেই। পাকা চুলগুলো ছেঁটে ফেলা। রংটা তখনো কাঁচা হলুদের মত।

মুক্তোর বয়স হবে বত্রিশ। কুড়ির পর বুড়ী,—একটুও খাটে না তার বেলায়।

কোঁকড়া কাঁচা কালো কুচ্‌কুচে চুল পা পর্য্যন্ত লুটিয়ে পড়ছে। লম্বা দেহখানা—দেখলে মনে হয় যৌবন-শ্রীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সেখানে।

মতি বিধবা, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু মুক্তোরই ছিল কি-একটা যেন গোল।

রাণীমা পায়ে তেল দিতে ডাকতেন, বল্‌তেন, তোর হাত নয়তো যেন দুটো পদ্ম-ফুল, কি রূপ গা!

মুক্তো ঠোঁট চেপে হেসে বলতো, কালো যে মা, এই অপরাধেই তো কপাল পুড়লো……

রাণীমা রাগ করে বল্‌তেন, থাক্‌ না, থাক্‌; আর মিথ্যে বলে পাপ বাড়াস্‌নে…তোর রূপ নেই, সে কোন্‌ চোখ-খাকি বলে?

মুক্তো একথা শুনেও হাস্‌তো।

তার রূপের অপরাধ যে ছিল না, তা' মুক্তো ভাল করেই জান্‌তো; কিন্তু সে দুঃখের কথা কি কাউকে বলা চলে? কপাল, কপাল, মানুষের যা-কিছু সবই তো ঐ পোড়া কপালের দোষে!

রাজার তিন চার বছরের এক রত্তি মেয়ে, কথা কইতো, যেন চোখে-মুখে খই ফুটছে! সে বলতো, মুক্তো, তুই কেন কালো হলি জানিস্?

কি করে জান্‌বো বল দিদি?

উষা হেসে বলতো, আমি... নি, বলবো?

বল না।

উষা ভণিতা ক... বলতো, আমি কি করে এত ফর্সা হলুম জানিস্ মুক্তো?

কি করে জান্‌বো দিদি?

তবে শোন্, বলে উষা ঢোঁক গিলে বল্লে, জানিস্ দু' রকম মদ আছে? এক লাল, আর এক সাদা···আমার হবার পরই ডাক্তার-সায়েব, বুঝেচিস্ মুক্তো, সায়েবেরা খুব মদ খায় কি না...

মুক্তো অজ্ঞতার ভাণ করে বল্লে, তাই নাকি?...তা ত; জানিনে!

খুশীতে উষার গল্পের খেই হারিয়ে যায় আর কি!

তারপর উষা দিদি, তারপর?

তারপর? দু' চৌবাচ্চা মদে, আগে সাদায় তার পরে লালে, আমাকে নাইয়ে দিলে...তাইতে তো, মা বলেছে, আমার রং দুধে-আলতার মত...আচ্ছা মুক্তো, তোর মা-বাবা বুঝি খুব গরীব ছিল? তোর বাবা মদ খেতো না? বলেই উষা অপ্রস্তত হয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

মদ খেতো না বাবা, তাই রক্ষে; মুক্তো মনে মনে বল্লে, গরীবমানুষ, মদ খায় না; খায় পান-তামাক। মুক্তো খানিক পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির-অচল হয়ে ভাবতে লাগলো।

সে মনে মনে যেন তার স্নেহময় বাবার সঙ্গে কথা কইতে লাগলো, বাবা, তুমি যদি জান্‌তে তোমার আদরিণীর এই দুর্দ্দশা হবে, তাহলে কি তুমি...

মুক্তো হাসে। ছোট্ট কথা! তামাক খাওয়া, মেয়ে-মানুষের তামাক খাওয়া; পান খেতে আছে, তামাক খেতে নেই; এত বড় মারাত্মক দোষ? বাবা! কি কাণ্ডটাই না হ'লো, তাই নিয়ে! কোথায় গেল শ্বশুর শাশুড়ি, দূর হয়ে গেল সব! তোমার কত আদর যত্নের আদরিণী দাঁড়াল গিয়ে পথের ওপর ভিখারিণীর বেশে!

মুক্তো আর যেন ভেবে উঠতে পারে না।

মতি এসে বল্লে, ও মুক্তি, অমন হাঁ করে বসে ভাবিস্ কি লা? ওদিকে উষা কি সর্ব্বনাশ করেছে, দেখ্‌গে যা...

মুক্তো ঘুম থেকে যেন ধড়মড়িয়ে উঠলো; কি হয়েছে? কি করেছে উষা? বল্‌তে বল্‌তে সে ছুটলো রং মহলের দিকে—রাজা যেখেনে ইয়ার-বকসী নিয়ে ব'সে আমোদ আহ্লাদ করেন। উষা সেখেনে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে গেলাস-বোতল চুরমার করে দিয়েছে। ফরাসের চাদর খানায় টক্‌টকে লাল দাগ—যেন তার ওপর কে পাঁঠা জবাই করেছে!

রাজার রক্ত-বর্ণ দু'চোখ—মুক্তোকে দেখে তা' দিয়ে অগ্নি-বর্ষণ হলো।

মুক্তোর ওপর ছোকরাদের বড় রাগ। ওর চেয়ে মতি ঢের ভাল—তার কোন বালাই নেই।

কিন্তু উষাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। মুক্তো এ-ঘর ও-ঘর করে; কাউকে মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতে পারে না।

আড়াই বছরের খোকা-রাজা ঘুমুচ্চে—মতির বিছানায় তিনখানা কিংখাবের গদির ওপর; তার পাশে মতি বুড়ী ঝিমোচ্চে।

মুক্তো বলে, ও দিদি উষা গেল কোথায় ?

আফিমের মৌতাৎ ভেঙ্গে মতি চোখ চেয়ে বলে, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, কাজ কি আমার উষার খপরে ?

রাত বেড়ে চলে।

উষাকে কিছুতেই পাওয়া যায় না।

মুক্তো কাঁদ-কাঁদ হয়ে বল্লে গিয়ে বৌ-রাণীকে। বৌ-রাণী তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন।

রং মহলে রাজা শুনে ডাক্ দিলেন জমাদারকে। জমাদার গিয়ে দেউড়ীর ঢাকে কাঠি দিতে যে যেখেনে ছিল পিল্ পিল্ করে এসে হাজির।

শিবের পুকুর রাণীর পুকুর অন্দরের পুকুরে ডুবুরী নেমে গেল। রাজবাড়ি জুড়ে একটা হৈ-হৈ—কোথায় উষা, কোথায় উষা !

খাজনা-খানার ঘণ্টায় বাজলো রাত বারোটা। বারোটার গজালের গম্‌গমানিতে, পেতল-কাঁসার বাসন, রং মহলের ঝাড় লণ্ঠন সব বেজে উঠলো !

সব যেন কেঁদে বলে, উষা, উষা, উষা...ওরে কোথায় গেলিরে !

রাজার লাল চোখ রাগে বন্ বন্ করে ঘুরতে লাগলো ;—তার সঙ্গে বৌ-রাণীর উস্কুনির ফোড়ং। আর যাবে কোথায় ?

মালাক্কা-বেতের সোনা-বাঁধান ছড়ি নিয়ে রাজা তেড়ে গিয়ে মুক্তোকে করলেন নিম্-খুন।

রাণীমা ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বল্লেন, করো কি,—করো কি—মেয়ে মানুষের গায়ে হাত তুল্‌তে আছে ? এ যে নারী-খুন !

দু'পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে রাত কেটে গেল সব্বারির। দেখতে দেখতে কালো আকাশ নীল হ'লো, তারপর বেগুনি—তারপর লাল ; তার পর সূর্য্যি-মামা সেই দাঁড়া-আসির লোভে পুবে উঁকি মারলেন।

সকালে ক্ষেমা দাসী রাজার মেহগিনির চোদ্দ হাত লম্বা-চওড়া পালংএর তলা ঝাঁট দিতে গিয়ে দেখে উষা সেখেনে পড়ে আছে—মাটির ওপর ; গা তার পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে, একেবারে অজ্ঞান।

মুক্তো এসে তাকে পাঁজা-কোলা করে তুলে নিয়ে গেল, মাগো, কি হবে মেয়েটার !

জমাদার নিজেই ছুটলো রতন ডাক্তারকে ডাকতে।

রতন ডাক্তার না-বুড়ো, না-যুবো। একটা হাতীর মত মোটা ; কিন্তু বুদ্ধি [illegible] ছুঁচের মতই সূক্ষ্ম।

সবাই চেয়ে আছে, কখন আসেন ডাক্তার-বাবু। ঐ যে দূরে দেখা যায়,—ঐ [illegible] পিঠে হাতী ! ঐ তো আস্‌ছেন রতন ডাক্তার, মেয়াণী হাতীর ওপর। বাচ্চা মেয়াণী, ছোট যেন একটা টাট্টু ঘোড়ার মত।

উষার বুক-পিঠ পাঁজরে নল বসিয়ে ডাক্তার বল্লেন, নিমোনিয়া।

মতি বল্লে, জানি আমার মাস্-শাশুড়ীর হয়েছিল, ঐ নীল্‌মোনিয়া !...মতির চোখে জল এসে পড়ে।

ভয়ে মুক্তোর জিভটা তালুতে গেল এঁটে। কি হবে, হে মা দুর্গা—আবার বাঁ চোখ নাচে !

বাঁ চোখ ? মতি জিজ্ঞেস করলে, তা বোধ হয় ভাল......

রাণীমা এসে বল্লেন, কার বাঁ-চোখ ?...মুক্তি তোর ? নাচে ?...আঃ তবে মেয়েটা বেঁচে যাবে।

রতন ডাক্তার বাড়ি গেলেন না। বাড়িতে কেই বা আছে ? কম্পাউণ্ডার ভাগনে, দু-বেলা রেঁধে দেয়। আর কি ? খান-দান, আর হাতীর পিঠে ছুটচেন অষ্ট-প্রহর রুগী দেখতে—আর আন্‌চেন জেব-ভরা টাকা !

কেন, সংসার ?

আ কপাল, সেই কোন্ বয়সে বৌ মরেছে; আজকাল-

কার ছেলেপুলে ; ইংরিজি বইয়ে মানা আছে দু'বার বে করতে। আর কি সেদিন আছে? এক শ্রীকৃষ্ণের

এতক্ষণ পরে গজগমনে এলেন বৌ-রাণী। চাঁচা-ছোলা গলা, যেন ইষ্টিমারের বাঁশী। হুকুম কল্লেন, শুন্‌চিস্ মতি?

কি মা?

তুই খোকাকে নিয়ে আমার মহলে যা; তোর ঘরে থাক্‌বেন ডাক্তার-বাবু...

বৌ-রাণী চলে গেলে, ... গজ গজ্ করতে লাগলো,—পারিনে আ... খেটে খেটে—গতর চূর্ণ হ'য়ে গেল।

মতির ঘরে এলো একখানা মস্ত ইজি-চেয়ার, পা তুলে রাখার জন্য হাতল দুটো বেখাপ্পা লম্বা; আর এল মণ খানেক টিকে-তামাক, আর তার সঙ্গে হরদম-তাজা আল্-বোলা। রতন ডাক্তার নাকি এক দণ্ডের জন্যে তামাক না খেয়ে থাকৃতে পারেন না।

মুক্তো উষার পাশে চুপটি করে বসে জুল্-জুল্ ক'রে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। সর্ব্বাঙ্গ তার ব্যথায় আড়ষ্ট; মালাক্কা-বেত যেখেনটা ছুঁয়ে গেছে সেইখেনেই ফুলে যেন দড়া হয়েছে; কিন্তু তা নিয়ে শোক করার ফুরসৎ নেই তার;—উষার যদি ভাল-মন্দ কিছু হয় তো তার কি আর জ্যান্ত থাকৃতে হবে?

মতি যেন কতদূরে চলেছে, এমনি তার ভাব ভঙ্গী। যাবার সময় ব'লে গেল, রইলি তুই মুক্তি একলা, তোর দোষে পুড়লো আমারই কপাল, বউ-রাণীর চোখের সাম্‌নে তাঁইস্-তম্বিতে প্রাণ বুঝি কণ্ঠায় ওঠে।

মুক্তোর হাসি পায় কিন্তু হাসবার শক্তি যেন নেই! বলে, তাইতো দিদি, কে জানে, কপালে কি আছে।

রতন ডাক্তারকে এর আগেই মুক্তো দেখেছে, তবে সে দূরে দূরে। চুল গুলোতে পাক ধরেছে কিন্তু মুখটি একেবারে কাঁচা। ও মুখের আরো একটা মুস্কিল ছিল, দেখলেই মনে হয় মানুষটি বোধ হয় নিজের লোক—যেন পরমাত্মীয়।

মুক্তোর মনে হয় যেন দেখেছি কোথায় ওঁকে, যেন সে স্বপ্নে, হয় তো বা আর জন্মে।

মুক্তো অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকে, তামাকের ধোঁয়ার মধ্যে মস্ত বড় বড় কাগজের এপার থেকে ওপার প'ড়ে চলেছেন রতন ডাক্তার চোখে কি ছাই এক তিলের জন্যেও ঘুম আসে না?

রাত বোধ হয় বারোটা, উষা উঠে বসে বল্লে, মুক্তো, সায়েব আমাকে মদের চৌবাচ্চায় ডুবিয়ে দেবে, আমি যে তার কাঁচের গেলাস ভেঙ্গে দিয়েছি! মুক্তো, তুই আমাকে কোলের মধ্যে নে,—মুক্তো আমার যে বড্ড ভয় করে...

রতন এসে কাছে দাঁড়িয়েছেন, ওকে কোলে তুলো না মুক্তো, দেখি, হাতখানা?

মুক্তোর পাশে বসে ধীর বিচক্ষণ মানুষটি কতক্ষণ ধরে উষার নাড়ি দেখেন। বলেন, তাইতো মুক্তো, অসুখের বড় বাড়াবাড়িই চলেছে...

মুক্তো ভয়ে ভয়ে বলে, ডাক্তার-বাবু, বাঁচবে তো?

মালিক জানেন,...... মুক্তো, ডাক্তার কিছু জানে না।

মুক্তো ভাবে তবে বাঁচবে না, তাই ডাক্তার বলতে চান্ না...

ভয়ে মুক্তোর শীত করে; মুক্তো ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে।

রতন ডাক্তার বল্লেন, মুক্তো, তুমি খানিকটা ঘুমিয়ে নিতে! আমি তো জেগে আছি—

মুক্তো মাথা নেড়ে বলে, না আমার ঘুম হবে না; তার চেয়ে আপনি একটু ঘুমুন গে না; সারারাত কি জেগেই কাটুবে আপনার?

রতন ডাক্তার হাসেন, উঁহু, আমার ঘুমুলে চলে ?

কেন ? এখন তো বেশ ঘুমোয় !

তবুও। আমি যে রাত-জাগার জন্যে একশ টাকা পাবো !

মুক্তো মনে মনে বলে, আমি যে পেয়ে গিয়েছি, একশো বেত !

রাত কেটে যায়। ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ আর উষার জোরে জোরে নিশ্বাস—তার মধ্যে গন্নার তামাকে মিঠে গন্ধ।

মুক্তো ডাকে, ডাক্তার-বাবু, একবার আসুন, হাত-পা ঠাণ্ডা মনে হয়..

তাইতো !

রতন ডাক্তার ছোট্ট একটা কাঁচের পিচকিরি বার করে বলেন, ধর তো মুক্তো এই বাঁহাত-খানা চেপে।

উষা ব্যথায় কাৎরাতে থাকে।

মুক্তো মনে করে, আঃ, ডাক্তারেরা কি নিষ্ঠুর !

রতন ডাক্তার মৃদু হেসে বলেন, ওকে যে বাঁচাতেই হবে

ভোর না হ'তেই এলেন রাজা। কেমন দেখছেন ডাক্তার-বাবু ?

বৌ-রাণী বারান্দায় দাঁড়িয়ে কান দুটো এগিয়ে দিয়ে শুনচেন। ঐটুকু অধিকারই ঢের তাঁর ; রাজা সঙ্গে করে এনেছেন, তাঁর সঙ্গেই ফিরতে হবে ! এই যে রাজ-বাড়ির রীতি !

ডাক্তার মেয়েদের সাম্‌নে কিছু বল্‌তে চান্ না, বলেন, একটু এ ঘরে আসুন।

মাঝের দোর বন্ধ হয়ে গেল।

বৌ-রাণী উষার কপালে হাত ঠেকিয়ে বল্লেন, ইস্ পুড়ে যাচ্ছে যে...কি করলে ডাক্তার সারা রাত ধরে ?

ও-ঘরে ডাক্তার তাঁর কৈফিয়ৎ দিচ্চেন :

পাঁচদিন এম্নি বাড়াবাড়ি যাবে ; ভয় এগার দিনের দিন ; তের দিন না কাট্‌লে কিছুই বলা যায় না...

কলকাতা থেকে সায়েব-ডাক্তার আন্‌বো ?

ইচ্ছে হয় আনুন, আমি মানা করবো না...

কিছু দরকার বুঝছেন কি ?

ডাক্তার অনেক ভেবে বলেন, তাতো দেখিনে...

হোমিওপ্যাথি ?

ডাক্তার হাসেন, জানিনে ও-শাস্তর টা···

* * *

রাজা বল্লেন, তুমি যাই কেন বলনা, রতন ডাক্তার লোকটি বিচক্ষণ, ধীর, [illegible]-স্থির।

বৌ-রাণী এসব যে [illegible] তা নয় ; তবুও, তাঁর মনে হয় দুজন হলে ভাল হয়।

রাজা মাথা নেড়ে বলেন, তাতে আবার না বৈদ্য-সঙ্কট হয়ে বসে···তার চেয়ে একজন নার্স আনাই...কি বল ?

নার্স ? সেই ঘেরাটোপ্ মোড়া মেম্ গুলো ? না না কাজ নেই তাদের নিয়ে—ছাই সেবা করবে তারা—আমারই প্রাণ যাবে—চা-রে খানা-রে করতে করতে...

রাজা ভাবতে লাগলেন, তাই তো !

সেবা করার লোকের জন্য তুমি ভাবচো কেন ? মুক্তো একা না পারে, মতি আছে ত ? তা ছাড়া ক্ষেমিও আছে !

রাজা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লেন, মুক্তো একাই একশ তা জানি ; কিন্তু আমিই যে মেরে তাকে আধমরা করেছি !

বৌ-রাণীর মুখ কালো হ'য়ে গেল

৩

উষার অসুখের বাড়াবাড়িটা কমে এসেছিল।

সেদিন রতন ডাক্তার রাজাকে বল্লেন, আর কি আমার রাতে থাকার দরকার আছে? দু' বেলা দেখে গেলেই চল্‌বে না ?

রাজা প্রসন্ন ছিলেন, বল্লেন, আজ দশদিন, আরো তিনদিন ডাক্তার-বাবু,—তেরোদিনটা কেটে যেতে দিন।

এ শুধু অনুরোধ নয়, এর ভেতর অনুনয় ছিলো বারো আনা। রতন ডাক্তারের পক্ষে তা' এড়ানো প্রায়

মুখ থেকে এক রাশ ধোঁয়া বের করে রতন ডাক্তার ভাবেন, কিন্তু দোষ কি ওঁর? ওঁর মাতৃত্ব, নারীত্ব ফুটতে পেলে না! বরফের ঠাণ্ডার চাপে কি পদ্ম ফুটতে পায়?

সেদিনের কাগজখানা তুলে নিয়ে ডাক্তার-বাবু মনটা অন্যদিকে ছুটিয়ে দিতে চান!

রতন ডাক্তার বোধহয় নিজেকে একটা ছোটখাট শাসনের মধ্যে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন। রাত আর জাগতে ত হয়ই না, তার উপর মুক্তোর ব্যবহার তাঁর পক্ষে ক্রমেই একটা বিপুল বিস্ময়ের ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াচ্ছিল।

মুক্তো দাসীর ব্যবহার ঠিক একটা দাসীর মত নয়। তার উষার ওপর টানটা কি অদ্ভুত! একটা অবলম্বন-হীন জীবনের এই একটি ছোট্ট অবলম্বন। ভগবানের কঠোর বিধানে যদি তা' অপহৃত হ'তো তো মুক্তো জীবনে কি করতো তা' রতন ডাক্তার ভেবেই পান না।

পরের মেয়ের জন্যে এত বড় আকর্ষণ, নারী-চিত্তের একটা অপূর্ব্ব সম্পদ!

রতন ডাক্তার অবাক হ'য়ে ভাবতেন, তাই সম্ভব হয়েছে—সংসার গড়ে তোলা। সম্পূর্ণ একজন বাইরের মানুষ এসে এমনি করে আত্মদান করে বসে যে সংসার তার হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে ধন্য হয়ে যায়!

এই উষা কি বাঁচতো—যদি না মুক্তো দাসীর নিত্য-জাগ্রত প্রাণখানা দু' হাত দিয়ে যমালয়ের দরজাটা আগ্‌লে থাক্‌তো?

কিন্তু বুঝেই উঠতে পারা যায় না কেন সে এমন করে নিজেকে লুটিয়ে দেয়! টাকার জন্যে? ছিঃ, মানুষকে অত ছোট করে ভাবলে যে নিজের মনটা গ্লানিতে ভরে ওঠে।

মুক্তো দাসী...রতন ডাক্তার অবাক্ হয়ে ভাবতে থাকেন, দাসী? এই যদি দাসীর স্বরূপ হয় তো কাজ নেই মানুষের দেবীদের নিয়ে। ঐ তো একজন দেবী বসে আছেন সিংহাসনের ওপর তাঁর অপার ঐশ্বর্য্য শক্তি আর দম্ভ নিয়ে...

ডাক্তার-বাবু, রাত যে অনেক হ'লো।

মুক্তো এ ক'টি কথা খাট থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে বল্লে।

সেকি মনের শয়তানটা যে ঘুচিয়ে দিতে চায় এই দূরত্ব?

পতঙ্গের পুঞ্জো উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে, ঊর্দ্ধে, বহু-ঊর্দ্ধে—সেই মহাব্যোমের চক্‌চকে তারাটির দিকে। হায় পতঙ্গের ব্যাকুল পাখার আকুলি-বিকুলি!

রতন ডাক্তার সহাস্য গম্ভীর মুখে বল্লেন, মুক্তো তুমি না হয় একটু ঝিমিয়ে নেও ততক্ষণ, আমার যে ঘুম আস্‌বে না!

ঝিমিয়ে আমি নিয়েছিলুম দুপুর বেলায় ডাক্তার-বাবু!

রতন ডাক্তারকে ঘুম না পাড়িয়ে যাবে না মুক্তো দাসী!

মুক্তো...

একি! গম্ভীর মানুষটির গলা কেঁপে যায় কেন আবার?

মুক্তো স্পষ্ট কণ্ঠে বল্লে, কি বল্‌চেন ডাক্তার-বাবু?

কি আর বল্‌বেন রতন?

কিন্তু না বল্লে যে বিশ্রী দেখায়!

তাই বল্লেন, কতদিন করবে এই দাসী-বৃত্তি?

বিধাতা যতদিন ভোগ লিখেছেন...গোণক্কার বলেছিল, রাজ-রাণী হবো—তাতো এ জন্মে হবে না, তাই দু-বেলা রাজ-বাড়ির ভাতে পেট ভরাই!

অদৃষ্টের একি কঠিন পরিহাস ক্ষুদ্র মানবের ব্যর্থ জীবনের এই একান্ত অক্ষমতায়!

রতন ডাক্তার হাসেন!

চিনি গো, চিনি ; ওতো হাসি নয়! চোখের জলের মুক্তো, মানুষের ঠোঁট দুটির ওপরেও চিক্-চিক্ করে নাকি?

মুক্তো মেঝের ওপর বসে। তার মন চায় বুঝি দুটো মনের কথা বলতে এই শান্তসংযত মানুষটির সঙ্গে!

মুক্তো বল্লে, আপনারা বামুণ?

জান্তো মুক্তো এ কথা, তবুও জিজ্ঞাসা করে! নইলে কি কথাই বা বলে?

তোমরা কি, মুক্তো?

মুক্তো মাটির দিকে চেয়ে হাসে, মেজে খোঁটে, তার-পর বলে, আমিও...

বামুণের মেয়ে? রতন ডাক্তারের আর বিস্ময়ের শেষ নেই!

মুক্তো, তুমি বামুণের মেয়ে! একি কপালের ভোগ!

মুক্তো কথা কয় না, হাসে।

রতন ডাক্তারের আর জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না, হয়তো সে অনেক নোংরা কথা! তবুও মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, তুমি কি বিধবা?

মুক্তো দু'চোখ অবনত করে বল্লে, তিনি বেঁচে আছেন কি না জানিনে...

তবে তুমি কি...?

না ; আমার অপরাধের জন্য ; শ্বশুর শাশুড়ী তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

ভয়ে-বিস্ময়ে রতন ডাক্তারের জিভটা শুকিয়ে ওঠে ; কি অপরাধ মুক্তো?

তামাক খাওয়া? দোক্তা? জরদা?

না, হুঁকো কোল্‌কেয়...

স্তম্ভিত রতন ধীরে ধীরে সোজা হয়ে উঠে বসলেন। তারপর জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে বল্লেন, তাই তো, এই বদ অভ্যেস কে করিয়ে ছিল তোমায়?

বাবা...

বাবা?

হুঁ তিনিই।...আমাকে তিন মাসের রেখে মা মারা যান্, বাবাই আমাকে বড় আদরে মানুষ করে-ছিলেন।...তিনি ভারি তামাক খেতেন, অনেকটা আপনার মত,—আমার হুঁকো কোল্‌কে সব ছিল...

বটে! বলে রতন শুয়ে পড়ে বল্লেন, মুক্তো তোমার বুঝি নিজের নেওয়া নাম?

হুঁ তাই ; ও আমার সই দিয়েছে। সেই আমাকে জল থেকে তুলে নিয়ে যায়...আমি জলে ডুবে মরতে গিয়েছিলুম...

তাইতো মুক্তো, কট...জলো?, এবার আমার ঘুম আসে,...এক গ্লাস জল দে...

মুক্তোর বুকের ব্যথার ভার অনেকটা হালকা হ'লো! সকালে কিন্তু সেই খালি জায়গাটা লজ্জায় ভরে উঠলো।

মুক্তো বসে বসে ভাবে, তাইতো! এ সব কথা তো কোন দিন বল্‌তে যাই নি কাউকে? ওমা, হলো কি আমার? কি না মনে মনে করছেন ভদ্রলোকটি!

উষা জিজ্ঞেস করে, মুক্তো, ডাক্তার-বাবু কখন আস্‌বে?

এই এখ্‌খুনি—এ কথা বলেও যেন কোথায় মনের এক কোণে আরাম হয়।

পাত্র-মিত্র-সমাবিষ্ট হ'য়ে রাজা ছিলেন বসে। মোসাহেবের দল রাজাকে বোঝাচ্ছিল যে উষার অসুখে রতন ডাক্তার খুব দাঁও মারলে।

রোজ একশ টাকা!

একজন বল্লে, তা যাই বল, শেষ পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে দিয়েছে...

রাধিকে কুণ্ডুর কালো মুখখানি জুড়ে বড় দাঁতগুলি যেন ঝুলে আছে ;—তিনি হেসে বল্লেন, রাখে কেষ্টো

মারে কে ?...এ ধর্ম্মের সংসার হুজুরের ধর্ম্মবলে বেঁচে উঠলো—এতো সবাই চ'খের সাম্‌নে দেখতে পাচ্চে...

সমস্বরে সকলে বল্লে, তাতো বটেই, তাতো বটেই,—তাতে আর সন্দেহ কি ?

রাজা হাসেন। এই জন-মত ! এই মানুষ ! এক-একটি স্বার্থের কূপো ! জল-উঁচু জল-নীচুর দল ! বিক্রমাদিত্যও এদের চাষ-আবাদ করে গেছেন—আর আমিও করছি !

কাঠের সিঁড়িতে দুম্ দুম্ পায়ের শব্দ ; কে আসে ?

পলক-ধারী সিং উত্তর দিলে, হুজুর, ডাগদর বাবু...

আরে ! আস্‌তে আজ্ঞা হয় ডাক্তার-বাবু...অনেক দিন বাঁচবেন, আপনার শ্রাদ্ধ হচ্ছিল এতক্ষণ...

রতন বসে বল্লেন, [illegible] কি না, চলুক না...

মোসাহেবের দল অস্বস্তিতে উস্‌খুস্ করে, মনে মনে বলে, ডাক্তারকে চটানোটা কিছু নয় হে, বাচ্ছা-কাচ্ছা নিয়ে ঘর করতে হয়...

কিন্তু রাজা কার তোয়াক্কা রাখে !

বুঝেছেন, ডাক্তার-বাবু, এরা বলে যে, আপনি খুব দু' হাত্তা দাঁও মেরেছেন, উষির অসুখে...উষি যে বাঁচলো, সে আমার ধর্ম্মবলে...কি বল কুণ্ডু—রাখে কেষ্টো মারে কে...

রাজা যত বলেন, তার তিনগুণ হাসেন।

শ্রাদ্ধ বটে !

রতন বলেন, আপনার সঙ্গে একটু বিশেষ কথা ছিল যে...

বেশ তো, বেশ তো, চলুন আমার খাস-কাম্‌রায়...ওরে নিধু, তামাক দে...

আমরা উঠি ?

আরে বসো, বসো...এরি মধ্যে যাও কোথায়, সবে সন্ধ্যে...পাশায় বসো, আমি এখুনি আস্‌বো।

রাজার খাস-কামরাটি চমৎকার, একটি কথা বাইরে শোনা যায় না।

রতন ডাক্তার বল্লেন, আমাকে যে বিদায় দিতে হবে, রাজা-বাবু !

সে কি ? আপনি বলেন কি, ডাক্তার-বাবু ?

এই অনুগ্রহটি আপনাকে করতেই হবে।

তা হয় না ; আমি আপনার মাইনে বাড়িয়ে দিচ্চি ; তিনশো পাচ্চেন—আরো একশো দেবো.

ডাক্তার চুপ করে রইলেন।

কি বলেন ?

কিছুই বল্‌বার নেই, আমাকে বিদায় দিতে হবে, এই আমার একান্ত অনুরোধ...

রাজা এদিক-ওদিক দেখেন, একেবারে একলা, নইলে তাদের দিয়েও অনুরোধ করাতেন।

অবশেষে উপায় না দেখে বল্লেন, কেন চলে যেতে চাচ্চেন ?—সেটা কি জান্‌তে পারি ?

রতন বল্লেন, কেবল মাত্র আপনাকেই বল্‌তে পারি, যদি আর...

না, না, আর কাউকে আমি বলবো না ; আমি কথা দিচ্চি, আপনাকে—

ডাক্তার খানিকটা মাথা নীচু করে দৃঢ়ভাবে কি ভেবে নিয়ে মাথা তুলে বল্লেন,—রাজা-বাবু, মুক্তো দাসী আমার স্ত্রী।

আশ্চর্য্য হ'য়ে রাজা কেবল চেয়ার থেকে পড়ে গেলেন না।

বিস্ময়ের তরঙ্গটা ব'য়ে গেলে রাজা বল্লেন, তাতে আপনাকে কেন চলে যেতে হবে ? ওকে আজই আমি সরিয়ে দিচ্চি ;—না হয় যা করতে বলেন, করচি...আপনি কেন চলে যাবেন ?

রাজা স্থির দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে চেয়ে রইলেন। ডাক্তার তখন দুচোখ বুজে।

শুনচেন ডাক্তার-বাবু ? ডাক্তার চোখ চেয়ে শুন্‌লেন।

আপনার ভয় কি, আমি থাক্‌তে কোন লোককে একটা টুঁ-শব্দ করতে দেব ?

আপনি পারেন তা, আমি ভাল করে জানি; কিন্তু তার যে কোন দরকারই দেখিনে।

রাজা কথার মর্ম্ম গ্রহণ করতে না পেরে নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে রইলেন।

ডাক্তার ধীর-স্থির ভাবে বল্লেন, রাজা বাবু, আমি যে সঙ্কল্প করেছি—

রাজার দুইচক্ষু বিস্ফারিত হ'য়ে উঠলো; তারপরে বজ্রপতন:

মুক্তোকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করবো।

রাজা দুইচক্ষু কঠিন মুদ্রিত করে, দুইকানে হাত দিয়ে তাড়াতাড়ি বল্লেন, রাম, রাম, আরে, এমন সর্ব্বনাশ! আরে, ডান হাত দিয়ে...আরে, ঐ গিয়ে...না, না ডাক্তার-বাবু, তা হ'তেই পারবে না...রাধামাধব, সর্ব্বনাশের মাথায় পা!···

রাজার উত্তেজনা আর কিছুতেই থামে না। রতন ততক্ষণ শান্ত হ'য়ে বসে রইলেন।

অবশেষে তিনি বল্লেন, আপনার কি আপত্তি, কিসের আপত্তি?

রাজা বল্লেন, মুক্তো পতিতা...তাকে গ্রহণ করলে আপনি ধর্ম্মে পতিত হবেন...

সে যে পতিতা তার প্রমাণ আপনি দিতে পারেন?

প্রমাণ? প্রমাণ, আবার কি? কুল-স্ত্রী যখন কুল ত্যাগ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে—তখনই ত সে জাতে পতিত, ধর্ম্মে পতিত, সে অসতী, সে...

শেষের কঠিন কথাটা রাজা উচ্চারণ করলেন না,— সে শুধু রতন ডাক্তারের মুখ দেখে, সেরেফ্ অনুকম্পার বশে।

কিন্তু, রতন বল্লেন, কুল-ত্যাগে তার চেয়ে অপরাধ আমাদের বেশী। তার কোন অপরাধ ছিল না, তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তারপর সে আত্মহত্যা করে দুঃখের জীবনটা শেষ করে দিতে গিয়ে...

রাজা অধীর হয়ে বল্লেন, কুল যখন সে একবার ত্যাগ করেছে, সে যে-কোন কারণেই হোক, তখন তাকে কোন হিন্দু—কোন ব্রাহ্মণ গ্রহণ করতে পারে না···

রাগে রাজার ঠোঁট কাঁপে।

ডাক্তার একান্ত বিনয় সহকারে বল্লেন, আমি কিন্তু মনে করি যে তাকে গ্রহণ করার চেয়ে আর কোন ব্যবস্থাই ধর্ম্মানুযায়ী হতে পারে না।

প্রবলের শক্তি প্রয়োগের সব পথ যখন রুদ্ধ হয়ে যায় তখন হিংসা তার নখ-দন্ত বার করে শার্দ্দুলের মতই গর্জ্জন করে ওঠে।

রাজাও করলেন তাই। তখন শান্তম্ চলে গেল— ভদ্রতার পর্দ্দা ছিন্ন কাঁথার মত খসে পড়লো। রাজা বল্লেন, তুমি, মুক্তোকে পাও কি করে? ও লিখে দিয়েছে তিন বছরের আগে চাকরি ছাড়তে পারবে না। তার দু'বছর হয়েছে—এক বছরের জন্য সে আমার মুঠোর মধ্যে—তাকে তুমি পাবে কি করে?

রতন ডাক্তার মাথা নীচু করে বল্লেন, মুক্তোকে পাবার জন্যে আমি এক বৎসর প্রতীক্ষা করেই থাকবো। তাকে লাভ করার সৌভাগ্য এখনো আসেনি আমার জীবনে, এই আমি বুঝবো।——এখন ও কথা যাক্, আমার নিজের মুক্তির কথা, তাও আর আমি ভিক্ষে করে অর্জ্জন করতে চাইনে...একমাস আপনার চাকরি, আমার সমস্ত দেহ মনের শক্তি নিয়োগ করে করবো···তার পর, মুক্তি আপনি আস্‌বে—

রতন ডাক্তার ধীরে ধীরে উঠে রাজার খাস-কামরা থেকে বার হয়ে সিঁড়ি বেয়ে যখন নীচে এসে দাঁড়ালেন তখন রাত্রি গভীর।

রাজবাড়ির সবাই সুখনিদ্রায় সুপ্ত।

আলোকোজ্জ্বল দেউড়ির পথ পার হয়ে রতনের চোখে রাত্রির অন্ধকারটা ঘনীভূত হয়ে ঠেক্‌লো; যেন একটা কালো কঠিন প্রাকার তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে!

দূরে মহাকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ ঝলমল করে যেন মানুষকে

বলে দিতে চায় যে তার বুকের মধ্যে সত্যের অমলিন আলোটিই মানুষের নিত্য বন্ধু ; সত্য সহায়, আর সবই মায়া।

রতন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে হাঁটতে লাগলেন। একটা দমকা বাতাস দেবতার আশীর্ব্বাদের মতই তাঁর উত্তপ্ত শির চুম্বন করে চলে গেল।

অপ্রেমিক

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

ভালোবাসি ভালোবাসা,—তোমারে ত' নয়!
তোমারে বাসিলে ভালো হইত অক্ষয়
জীবনের সুধাভাণ্ড ; মৃত্যু স্মিতমুখে
মূর্ত্তিমান পুণ্য যেন পরাইত বুকে
বৈকুণ্ঠের কৌস্তুভ-রতন!—মিথ্যা নয়,
ধ্রুব সত্য!—প্রেমই শুধু মরণে অজয়!
জানি তাহা, ভালোবাসা ভালোবাসি তাই—
তবু সে মনেরি মায়া, হৃদয়ে ত' নাই!
জন্মান্তরে আছে ভালোবাসিবার আশা,
এ জীবনে শুধু গানে দিনু তারে ভাষা!
তুমি বুকে মাথা রেখে চাও মুখপানে,
সে চাহনি মোর চোখে শুধু স্বপ্ন আনে!
সত্য-মিথ্যা তুমি জানো—তাহারি দু'চারি
গাঁথিনু যতনে আমি—প্রেমের পূজারী।

রূপের অভিশাপ

—পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর—

শ্রী নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

১০

লতিফ দেশ হইতে এক রকম রিক্ত হস্তেই গিয়াছিল ধুবড়ী। সেখানে তার খালাত ভাইয়ের উকীল শ্বশুর বছর দশেক আগে গিয়া বেশ গুছাইয়া লইয়াছে—তার আশ্রয়ে গিয়া উঠিলে সহজে জমীজমা পাইবার সম্ভাবনা, এই আশায় সে ধুবড়ী-জেলার অন্দরে করিমনগর গ্রামে নকীব সেখের বাড়ী গিয়া অতিথি হইল।

নকীব সেখের বয়স পঞ্চান্ন বছর, চুল এবং দাড়ী একদম পাকা, মুখটা কিঞ্চিৎ বাঁকা হইয়া গিয়াছে, দাঁতগুলি অনেকই নাই, কিন্তু বুড়ার শরীর শক্ত আছে—সে নিজেই খাটিয়া ক্ষেত-খামারের তদারক করে। দশ বছরে সে অনেক ক্ষেত আবাদ করিয়াছে, এখন তার আট জোড়া বলদ, রোজ প্রায় দশ বারো জন মজুর তার তাঁবে কাজ করে। তার নিজের এখন আবাদের কাজ করিতে হয় না, সে সুধু দেখা শুনা করে।

নকীবের এক ছেলে ছিল, তিন চার বছর হইল সে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া একেবারে জঙ্গলের ভিতর জমী লইয়া নিজে স্বতন্ত্র আবাদ আরম্ভ করিয়াছিল। তার রাগের কারণ নকীবের বৃদ্ধ বয়সের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী নেকজান। পঞ্চাশ বছর বয়সে জোয়ান ছেলের বিবাহ না দিয়া নকীব সেখ স্বয়ং নেকজানকে বিবাহ করায় অনেকেই তাকে দোষ দিয়াছিল। ছেলে তো রাগ করিয়া ঘর ছাড়িয়াই গিয়াছিল। সে ছেলেটি কয়েক মাস হয় মারা গিয়াছে।

নেকজান ছিল নকীবের প্রতিবেশীর বিধবা পত্নী। স্বামীর মৃত্যু হওয়ায় তার জমীজমা দেখাশুনা করিবার অসুবিধা হইত, তাই নকীব তার সাহায্য করিতে যায়। নেকজানের পূর্ব্ব-স্বামীর অন্যান্য ওয়ারিশেরা টাঙ্গাইল অঞ্চল হইতে খবর পাইয়া সম্পত্তি লইয়া মামলা মোকদ্দমা করে, কিন্তু নকীবের বুদ্ধি ও সহায়তার জোরে তাহারা পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিতে বাধ্য হয়। কৃতজ্ঞ নেকজান কাজেই বুড়া নকীবকে বিমুখ করিতে না পারিয়া নেকা করিয়া বসিয়াছিল।

নেকজানের বয়স এখন বছর ত্রিশেক। পূর্ব্বপক্ষের মাত্র একটি ছেলে আছে, তার বয়স ছয় বৎসর। নেকজান রূপসী নয় কিন্তু কুৎসিৎও নয়—যৌবনের লাবণ্য ও দীপ্তি তার সুস্থ শরীরে যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। নকীব তাহাকে বিবাহ করিবার কিছুদিন পরই বুঝিতে পারিল যে যুবতী নেকজান তাকে দয়া করিয়া বিবাহ করিয়াছে, তার যত্ন-আত্তিরও সে ত্রুটি করে না, কিন্তু বৃদ্ধ স্বামী তার মনপ্রাণ একেবারে ভরিয়া নাই। তার রকম সকম দেখিয়া বুড়ার ভারী সন্দেহ হইত। অনেকগুলি যুবক তার বাড়ীতে খাটে, নেকজান তাদের দিকে যে দৃষ্টিতে চায় সেটা বুড়ার পছন্দ হয় না। কাজেই সে সজাগ প্রহরীর মত নেকজানকে চোখে চোখে রাখে।

চঞ্চলা নেকজান বুড়ার রকম সকম দেখিয়া হাসে, আর তাকে আরও ক্ষেপাইবার জন্য সে সর্ব্বদাই তার চক্ষু এড়াইয়া এদিক ওদিক পলাইয়া যায়, কোথাও বা তাকে দেখাইয়া দেখাইয়া নিরিবিলি কোনও ছোকরা মজুরের সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া কথা কয়—আর আড় নয়নে বুড়ার দিকে চাহিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া পলাইয়া যায়। তার চঞ্চল যৌবনের রুদ্ধ বাসনাগুলি এমনি করিয়া আরও

যেন তীব্র হইয়া জ্বলিয়া ওঠে। মনটাকে সে যতই আলগা দেয় তাহা যেন ততই সব বন্ধন ছাড়াইয়া উধাও হইয়া ছুটিবার জন্য আকুল হয়।

লতিফ যখন তার কমনীয় দীর্ঘ বলিষ্ঠ সুদর্শন মূর্ত্তি লইয়া তার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল তখন নেকজানের ভিতরকার সবটুকু চাপা আগুন যেন দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। লতিফ তার চেয়ে অন্তত দশ বছরের ছোট, একেবারে কাঁচা আন্‌কোরা তাজা যুবক—তাকে দেখিয়া নেকজানের মনের ভিতরটা যেন খল্‌বল্‌ করিয়া নাড়া দিয়া উঠিল।

লতিফ নকীবের বাড়ীতেই রহিল, তার ক্ষেত-খামারের কাজ করিতে লাগিল। বলিষ্ঠ কর্ম্মঠ যুবক সে, নকীবকে সহজেই সন্তুষ্ট করিয়া ফেলিল। নকীব তার খাওয়া দাওয়া ও আরামের জন্য বিশেষ ব্যস্ততা প্রকাশ করিতে লাগিল।

লতিফের আসিবার পর হইতেই নেকজানের মতিগতি ফিরিয়া গেল। সে তার চঞ্চলতা ভুলিয়া গিয়া একাগ্র-মনে সংসারের কাজে ব্যস্ত হইল। সে আর ছোক্‌রা মজুরদের পিছনে ছুটোছুটি করে না, নকীবকে ক্ষেপাইবার আগ্রহও আর তাহার নাই। দিন রাত সে সংসারের কাজ করে। ভোর হইতে সে স্বামী ও লতিফকে নাস্তা খাওয়াইয়া ক্ষেতে পাঠায়; তারপর সে বসিয়া অনেক ভাবনা চিন্তা করিয়া দ্বিপ্রহরের খাওয়ার আয়োজন করে। মাছ জোগাড় করিয়া পরিপাটি করিয়া রান্না করে, মুরগীর ঝোল সে সপ্তাহে অন্তত দুই দিন রাঁধে, ডালের ভিতর তরকারী ফেলিয়া ঘন করিয়া রাঁধে, এমন কি পায়স ও পিঠা পর্য্যন্ত সে ঘন ঘন রাঁধিতে আরম্ভ করিল। নকীবের সংসারে স্বচ্ছলতার অভাব নাই। খাওয়া দাওয়ার এতটুকু পারিপাট্য সে অনায়াসেই করিতে পারে, কিন্তু নেকজান এতদিন এ সব করিবার আবশ্যকতা অনুভব করে নাই।

যেদিন লতিফ বাড়ী ফিরিয়া ভাত খাইয়া যায় সেদিন নেকজান নিজে সামনে বসিয়া তাকে খাওয়ায়; যেদিন সে আসে না, সেদিন মাঠে তার খাবার পাঠাইয়া দেয়; এবং নিকটের কোনও ক্ষেত হইলে সে নিজে ভাতের সান্‌কী লইয়া লতিফকে খাওয়াইয়া আসে।

লতিফ এ সব সমাদর বিশেষ লক্ষ্য করিত বলিয়া মনে হয় না। সে কাজের একটা ঘোর নেশায় মত্ত থাকিত, আর যখন তার অবসর থাকিত তখন সে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিত। তখন নেকজান তাকে তফাৎ হইতে দেখিত, কিন্তু দেখা দিত না। লতিফ প্রায়ই গান গাহিত; যখন সে গাহিত তখন নেকজান যেখানেই থাকুক ছুটিয়া আসিত—আর মুগ্ধ তন্ময় হইয়া তার সে মধুর সঙ্গীত শুনিত।

নকীব কোনও দিন সন্দেহ করে নাই যে লতিফের প্রতি নেকজানের কোনও রূপ আকর্ষণ আছে। বরং নেকজানের মতিগতির বিশেষ উন্নতি লক্ষ্য করিয়া সে মনে মনে খুসীই হইয়াছিল। আহারাদির আয়োজনে যে উন্নতি হইয়াছিল তাহাও সে নেকজানের নৈতিক উন্নতির পরিচয় বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিল। তা ছাড়া লতিফের সঙ্গে নেকজানের ব্যবহারে গায়-পড়া ভাবের একান্ত অভাবে সে সন্দেহ করিবার আর কোনও অবসরই পায় নাই।

কিন্তু নেকজানের অন্তরের ভিতর নিদারুণ ক্ষুধা লতিফকে গ্রাস করিবার জন্য হাহাকার করিতেছিল। তার অন্তরের অতিরিক্ত ব্যগ্রতাই তার বাহিরের প্রকাশকে এত সাবধান ও সংযত করিয়াছিল। তার কামনা যত তীব্র হইত ততই সে ভয় পাইত;—ভাবিত লতিফ তাকে ভালবাসিবে কেন? সে যে বুড়ী! যদি কোনও অদ্ভুত ইন্দ্রজালবলে সে তার জীবনের দশ বারোটা বছর অন্তত মুছিয়া ফেলিতে পারিত তবে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া নেকজান তাহা করিত। এই বয়সের অন্তরায় যে তার পক্ষে বড় গুরুতর অন্তরায়!

কিন্তু ক্রমে তার ভালবাসার উগ্রতা তার সংযমের বন্ধন শিথিল করিয়া দিল। প্রথমে অতি সাবধানে, তার

পরে ক্রমে সাহসের সহিত সে লতিফের সঙ্গে একটু অন্তরঙ্গ ভাবে আলাপ করিতে লাগিল। তার দেশের সব সংবাদ সে জানিয়া লইল, তার ভাইদের বেইমানীর কথা শুনিয়া সে জ্বলিয়া আগুন হইয়া উঠিল। তার এই ক্রোধ ও সহানুভূতি লতিফের অন্তরের জ্বালায় যেন একটা স্নিগ্ধ প্রলেপ লাগাইয়া দিল।

স্নেহ ও সহানুভূতির কাছে লতিফের হৃদয়ের দুয়ার ক্রমে খুলিয়া গেল। অবসর পাইলেই এখন সে নেকজানের সঙ্গ কামনা করিত, তার কাছে তার মনের দুঃখের বোঝা নামাইয়া তৃপ্তি পাইত। এমনি করিয়া ক্রমে সে নেকজানের কাছে পরীর সম্পর্কিত সমস্ত ইতিহাস প্রকাশ করিয়া ফেলিল।

নেকজানের বুকের ভিতর এ কথায় যেন কিসে খোঁচা দিয়া গেল। সে সমস্ত শুনিয়া বলিল, "এ সকলই সেই ছুঁরী শয়তানী। সে হারামজাদী টাকার লালচে বুড়ারে বিয়া ক'রচে। নাইলে—আমি হইলে সেই রাত্রেই ছুইট্যা গিয়া তোমার দুয়ারে গিয়্যা ধন্না দিতাম।"

লতিফ তখন পরীর হইয়া লড়াই করিল। সে পরাণের মার কাছে পরীর বিবাহের কথা যাহা শুনিয়াছিল সব বলিল, শেষে সে বলিল, "তারে তার বাপে আর বেপারীতে মিল্যা জবাই ক'রছে—তার কোনও দোষ নাই —"

"কিন্তু সে গেল ক্যান?—এজেন দিল ক্যান? ইতো হিন্দুর মেয়্যা না যে ধইরা পাইড়া বিয়া দিলেই হইল। তার তো এজেন দেওন লাগে, তার মত না হইলে তো মোছলমানের মেয়্যার সাদী হয় না!"

অবাক হইয়া লতিফ বলিল, "নাকি? ক্যান, কত লোকে তো উকীল দিয়্যা এজেন দেয়!"

"হ, তা দেয়। কিন্তু সে উকীলরে গওয়ার সামনে এজেন দেওয়ার এক্তিয়ার সে মেয়্যায় দিলেই যেন সে পারে এজেন দিবার। তা সে পরী ক্যান উকীল দিবার গেল?"

এত সব হদিস্ লতিফের জানা ছিল না বয়ঃপ্রাপ্তা মুসলমান কন্যার পক্ষে তার পিতার এজেন দিবার অধিকার নাই, এবং সাক্ষীর সমক্ষে রীতিমত ভাবে কন্যা উকীল নিযুক্ত না করিলে যে সে উকীলের এজেন দিবার শক্তি হয় না, একথা লতিফ আজ প্রথম শুনিল। ক্রমে সে নেকজানের কথায় স্থির বুঝিল যে পরী নিজে সম্মতি দিয়াই বিবাহ করিয়াছে, নতুবা তার বিবাহ হইতেই পারিত না।

ইহার পর তাদের মধ্যে পরীর প্রসঙ্গ প্রায়ই উঠিত। নানা ভাবে নানাদিক দিয়া সম্পূর্ণ নিরিবিলি বসিয়া তারা দুজনে এই কথা আলাপ করিত। ইহাতে দুজনের মধ্যে অনেকটা অন্তরঙ্গতা বাড়িয়া গেল, দুজনের মধ্যে [illegible] কথার আদান প্রদানে ক্রমে হৃদ্যতা জমিয়া উঠিল।

একদিন নেকজান বলিল, "তোমারও দোষ আছে। মরদ যদি হইতা তুমি তবে কি পরীরে ছাড়তা? তোমার নাই সাহস, মেয়্যামানুষকে হাত করতে হইলে সাহস লাগে।"

তার পৌরুষের উপর এই আক্রমণে লতিফ খাড়া হইয়া বলিল, "ক্যান, আমার সাহস নাই কিসে?"

দুষ্টহাসি হাসিয়া নেকজান তাকে উত্তর দিল, "হ, সাহস আছে, লয় কি? দুই দশটা মরদ খুন কইরবার পার; কিন্তু একটা মেয়্যা মানষের হাত ধইরবার পারস—সে নাই।"

ইহাতেও হইল না।

ক্রমে আরও স্পষ্ট ভাবে নেকজান লতিফকে আক্রমণ করিল। লতিফ আত্ম-সমর্পণ করিল।

১১

ইহার দুই বৎসর পর যখন নকীব ফৌত হইল, তখনও লতিফ সে বাড়ীতে রহিয়া গেল, এবং ইদ্দতের কাল অতীত হইবামাত্র সে নেকজানকে বিবাহ করিয়া মালিক হইয়া বসিল।

নেকজানের জীবন যেন ধন্য হইয়া গেল। সে যে

লতিফের যোগ্য নয়,—তার বয়স হইয়াছে, লতিফ নব যুবক—এই বোধ তাকে লতিফের কাছে একান্তভাবে নত করিয়া রাখিল। দিনরাত সে লতিফের প্রীতিসাধনের জন্য আপনাকে নিযুক্ত রাখিত। সে তাকে খাওয়াইবার জন্য নিত্য কত নূতন নূতন আয়োজন করিত, কত প্রেম দিয়া সে তার সমস্ত সেবা ভরিয়া দিত। সব সময় সে লতিফের সঙ্গে ছায়ার মত থাকিত, লতিফকে চক্ষের আড়াল করিতে হইলে সে জগৎ অন্ধকার দেখিত।

লতিফ প্রথমে নেকজানকে বেশ ভালবাসিত। বয়সে অনেক বড় হইলেও নেকজান রূপ যৌবন হিসাবে তার একেবারে অশ্রদ্ধার যোগ্য ছিল না। তা' ছাড়া প্রথম যৌবনের উদ্দাম আবেগ পাত্রাপাত্রের হিসাব করে না। তাই নেকজানের উপর তার মনটা সত্য সত্যই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু দুই চার বছর পর যখন ঝোঁকটার একটু মন্দা পড়িল, নেকজানের বয়সটাও বাড়িয়া গেল—তখন লতিফ প্রাণের ভিতর আর সে উত্তাপ অনুভব করিল না। কেন না একে তো প্রেমের আবেগে ভাটি পড়িয়াছে, তাতে নেকজানের যৌবনে হঠাৎ একটা যেন বিষম ভাটার টান পড়িয়া গিয়াছে। তা' ছাড়া এত বড় প্রকাণ্ড সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার পড়িয়াছে লতিফের হাতে—কেন না নেকজানের দুই স্বামীরই যথা সর্ব্বস্ব এখন তার হাতে ;—কাজেই তার খাটিতে হয় অনেক, ভাবিতে হয় অনেক—প্রেম করিবার অবসর তার অল্প।

নেকজানের প্রেমে কিন্তু ভাটা পড়িবার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না ; বরং বয়স যতই বাড়িতে লাগিল, শরীর যতই টোল খাইতে লাগিল ততই যেন তার প্রেমের আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার মত সঙ্গতি লতিফের প্রাণের ভিতর ছিল না। কিন্তু তবু সে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া তার প্রেমের খোলস বজায় রাখিত, আর নেকজানের প্রত্যেক প্রেমের আব্দার সে পরিতৃপ্ত করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিত ; কেন না সে অনুভব করিত যে নেকজানের প্রতি তার কর্ত্তব্য কত বড়। নেকজানের প্রতি কৃতজ্ঞ হইবার তার যথেষ্ট হেতু ছিল,—সে যে এই বিপুল সম্পত্তির মালিক হইয়াছে সে কেবল নেকজানের প্রেমের জোরে। সুতরাং আজ তার নিজের প্রেমের নদী শুকাইয়া গিয়াছে বলিয়া যে সে কর্ত্তব্যের দায় অস্বীকার করিবে এত নীচ লতিফ নয়।

ভালবাসা যখন সহজ থাকে তখন তার যেমন আনন্দ, ভালবাসা ফুরাইয়া গেলে কর্ত্তব্যের দায়ে অভিনয় ঠিক সেই পরিমাণে অসহ্য একটা বোঝা। তাই যতই দিন যাইতে লাগিল ততই লতিফ নেকজানের প্রেমটাকে একটা বিষম বোঝা বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিল।

নেকজানের চোখে মেকীটুকু ধরা না পড়িত তা নয় নারীর সহজ অনুভূতির বলে সে টের পাইত যে তার স্বামীর ভিতর প্রথম প্রেমের সে অসহ্য আবেগ যে নাই শুধু তাই নয়, তার আদর সোহাগের ভিতর অনেকটা চাপা বিরক্তিও হয় তো আছে। সে যখন সমস্ত দিন অদর্শনের পর স্বামীকে পাইয়া তার কণ্ঠে ঝাঁপাইয়া পড়ে তখন লতিফ তাকে বাহুবেষ্টনে জড়াইয়া ধরে বটে, কিন্তু মুখের উপর তার যে একটা ছায়া পড়িয়া যায় তাহা নেকজানের চক্ষু এড়ায় না। লতিফ যে তাকে আর আগের মত ভালবাসে না একথা ভাবিতে নেকজানের কান্না পাইত। কিন্তু সে যতই কাঁদুক তাতে তার রাগও হইত না, লতিফকেও সে দোষীও করিত না। সে কেবল ভাবিত, কেন তাকে ভালবাসিবে লতিফ ? সে যে বুড়ী ! এক একবার সে মনে মনে সঙ্কল্প করিত, আর সে এমন করিয়া আদরের বাড়াবাড়ি করিয়া লতিফকে ক্ষেপাইবে না। কিন্তু তার যুবক স্বামীর উপর তার অসহ্য লোভ সে কিছুতে দমন করিতে পারিত না, তাকে দেখিলে আদর না করিয়া থাকিতে পারিত না, সোহাগের বন্যায় তাকে না ভাসাইয়া নেকজানের তৃপ্তি হইত না। সকল বিরাগ সকল অস্নেহ সে বুঝিত, বুঝিয়া সে সকলই সহিয়া যাইত, শুধু সোহাগ করিয়া সে যেটুকু আনন্দ পাইত তাহাতেই সে

কৃতার্থ হইয়া থাকিত। সে বুঝিত লতিফের যৌবন সে চোরের মত অনধিকারে লুটিয়া লইতেছে—তাই ষোল আনা পুরাইয়া পাইবার অসম্ভব আবদার সে করিত না; চোরের যে রাত্রিবাসই লাভ! নেকজান যতই অনুভব করিল যে তার নিজের রূপ-যৌবনের সম্বল ফুরাইতে বসিয়াছে, যতই সে দেখিতে পাইল লতিফের মন তার পাশ হইতে সরিয়া যাইতেছে ততই সে অসহ্য আবেগের সহিত তার সোহাগ ও আদর বন্যার মত লতিফের উপর ছুটাইয়া দিতে লাগিল। তার সুখ-স্বপ্নের আসন্ন অবসানের ভয়ে সে তার হস্তগত সংক্ষিপ্ত অবসর ঠাসাঠাসি করিয়া উপভোগের আনন্দে ভরিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল।

লতিফ শেষে হাঁপাইয়া উঠিল। হাসির মুখোস পরিয়া এই দমফাটানো প্রেমের ঝড় সহ্য করা তার সম্ভব হইল না। তার ভিতরকার তাজা প্রাণটাকে নিত্য নিত্য মুচড়াইয়া কর্তব্যের চাবুকে তাকে দুরস্ত রাখিতে রাখিতে তাহা মুশড়াইয়া যাইতে বসিল। তার মনটা উদাস অস্থির হইয়া উঠিল। লু'র তপ্ত নিঃশ্বাসের মত নেকজানের প্রেম তার অন্তরটাকে শুকাইয়া ফেলিল,—জীবনটা তার মরুভূমির মত শুষ্ক নীরস হইয়া গেল। ইহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।—তার মনটা ছুটিয়া গেল তার দেশের শান্ত শীতল ছায়াময় কুটীরের দিকে, তার শৈশবের চিরপরিচিত গ্রামের শত সহস্র স্মৃতির দিকে।

শেষে একদিন সে নেকজানকে বলিয়া বসিল, "কি কও বিবি, একবার দ্যাশটা ঘুইর‍্যা আসি?" সে নেকজানকে এখনও 'বিবি' বলে।

নেকজানের মন একথায় ভার হইল, কিন্তু বাধা দিবার ভরসা হইল না, সে শুধু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা যাও সোণা!"

পরম উৎসাহের সহিত লতিফ দেশে যাইবার আয়োজন করিতে লাগিল। তার অনুপস্থিতিকালে সমস্ত কাজের সুবন্দোবস্ত করিয়া সে সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী ফিরিল—পরের দিন প্রত্যূষে রওনা হইতে হইবে। অনেক দিনের পর তার চিরপ্রিয় গ্রামে ফিরিবার আনন্দে উৎসাহে তার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

নেকজান তার জন্য খাবার লইয়া আকুল অন্তরে বসিয়াছিল। লতিফ আসিয়া আনন্দের আতিশয্যে তাকে চট্ করিয়া চুম্বন করিয়া ফেলিল।

এ আদরে নেকজান একেবারে গলিয়া গেল, তার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। সাহস পাইয়া সে লতিফের কাঁধে হাত দিয়া বলিল, "আমারে সাথে লইয়া চল।"

লতিফের উৎসাহের আগুনে কে যেন জল ঢালিয়া দিল, তার আনন্দ বিষাক্ত হইয়া উঠিল।

মুখ ভার করিয়া সে বলিল, "পাগলেরকথা! তোমারে লওন কি সিধ্যা কথা—কতগুলা ট্যাহা লাইগবো, তা সয়, পথে ঘাটে মেয়্যা মানুষ লইয়া চলনে কত হাঙ্গাম! আর সেখানেই বা আমরা থাকুম কোথায় তার নাই ঠিকনা।"

মুখ ভার করিয়া নেকজান তার হাত নামাইয়া লইল। গম্ভীর ভাবে বিজ্ঞের মত বলিল, "হ, তা' সয় কি?"

কিন্তু তার চোখের জল সে রোধ করিতে পারিল না।

রাত্রিতে নেকজান বলিল, "কাইল না গেলা, পরশু যাইও।"

লতিফ আবার বলিল, "পাগলের কথা! সব ঠিক, এখনে মিছামিছি একদিন বৈসা থাকন ক্যান? কও চে!"

আরও বেশী রাত্রে নেকজান লতিফের ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাকে বলিল, "তুমি কবে আইবা কও, ঠিক কথা কইবা।"

নিদ্রাভঙ্গে বিরক্ত হইয়া লতিফ বলিল, "কও চে! তা কেমনে কমু? দশদিনও হইবার পারে একমাসও হইবার পারে। একখানে যাওন—সেখানে সকল লোকের সাথে দেখাশুনা কইর‍্যা কবে ফিরবার পারুম আইজ কেমতে কই?"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া নেকজান বলিল, "হ বুঝ্‌ছি—তুমি আর আইবা না। আমি বুড়া হইছি—আমারে

ভাল লাগে না, তাই তুমি পলাইবার লইছ।" বলিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

লতিফ অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া সুস্থির করিল।

আবার নেকজান বলিল, "পরীর সাথে দেখা কইরবা তো?"

লতিফ বলিল, তাহা অসম্ভব, কেন না কাসিম বেপারী পরীকে নিদারুণ পরদার অন্দরে ঢুকাইয়াছে, সেখানে তার কাছে বাড়ীর চাকর মজুরের পর্য্যন্ত প্রবেশ নাই, বাহিরের লোক কোন্ ছার।

শেষে যাইবার সময় অশ্রুজলে ভাসিয়া নেকজান বলিল, "সোণা, বেশী দেরী কইরো না, শীগ্‌গির আইসো। আমি তোমার পথ চাইয়া বইসা থাকুম—দেরী হইলে বাচুম না। —তোমার দিল যদি চায় সোণা, তুমি আবার নিকা কইরো—পরীরে হয় যারে হয় নিকা কইরো, কিন্তু আমারে ছাইর‍্যা যাইও না সোণা। তোমার নয়া বউ নিয়্যা তুমি আইসো। আমি তোমার বউরে যতন করুম, তোমার সেবা করুম আমার মাথা খাও শীগ্‌গির ফির‍্যা আইসো।"

লতিফ বার বার তাকে এসব অসম্ভব কল্পনা মন হইতে দূর করিবার উপদেশ দিয়া বিদায় হইল। কিন্তু পথে যাইতে যাইতে নেকজানের কথাটা তার মনের ভিতর খুব পাক খাইতে লাগিল। যদি তাই সম্ভব হয়? এমনও তো হইতে পারে যে পরী এখন বিধবা হইয়াছে—তবে তো লতিফ তাকে বিবাহ করিতেও পারে—তা হইলে তো সে পরীকে লইয়া ফিরিতেও পারে!

ষ্টীমারঘাটে নামিয়া লতিফ একটা অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিল। তার গ্রাম এখান হইতে দশ মাইল, কিন্তু এইখানেই তার মনে হইল যে প্রবাসী গৃহে ফিরিয়াছে। মরুভূমির মত বিশাল তৃষিত সৈকতের প্রত্যেকটি বালুকণা, যমুনার বিস্তীর্ণ বক্ষের উপর প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র বীচি যেন স্নেহের সহিত হাত বাড়াইয়া তাকে অভিনন্দন করিল।

খরখরে' শুকনো চড়ার উপর দিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রে সে পথ চলিল, তবু তার প্রাণটা ভারী হাল্কা বোধ হইল—নন্দনের পথে মলয় সমীরণ সেবিত হইয়া যেন সে চলিয়াছে! আপনার দেশে অনেকদিন পর ফিরিয়া এই যে অহেতুক প্রীতি ও আনন্দ সে অনুভব করিল তার মূল কোথায় তা সে জানে না, ভাষায় তাকে সে প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু তবু তার অন্তরের আদ্যোপান্ত এ আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে তা সে অনুভব করিল।

লতিফ প্রাণ খুলিয়া গান গাহিতে গাহিতে চলিল। একটা হাটখোলার উপর দিয়া সে যাইতেছিল। আজ হাট নাই, সেখানে আছে শুধু একটা চওড়া জায়গা ও কয়েকটা ছোট ছোট টিনের ছাপড়া—আর এক পাশে দু তিনটি মাত্র স্থায়ী দোকান। একটা মুদীর দোকানের সামনে বসিয়া কয়েকজন লোক তামাক খাইতেছিল ও গল্প করিতেছিল।

তার মধ্যে একজন লতিফের গান শুনিয়া ফিরিয়া চাহিল। ডাকিয়া বলিল, "কে ও—লতিফ ভাই?"

লতিফ গান থামাইয়া সেদিকে চাহিয়া বলিল, "আরে কে? ইনা ফকীর? এহানে যে?"

ইনু উঠিয়া লতিফের দিকে অগ্রসর হইয়া জানাইল যে সে পাশের এক গাঁয়ে একটা ওয়াজের নিমন্ত্রণে গিয়াছিল, এখন ফিরিতেছে।

হাসিয়া লতিফ কহিল, "আরে কস্ কি ইনা? তুই এহন ওয়াজ করিস্? তর কথা শুনে কেরা?"

ইনু গম্ভীর হইয়া বলিল, "সকলেই শুনে। না শুনবো ক্যান? কথা তো আমার না, আল্লা রসুলের—না শুইনবো ক্যান?"

ইনুর এই ক্ষুণ্ণ গাম্ভীর্য্য সত্ত্বেও লতিফ তার হাসি রাখিতে পারিল না, নিরক্ষর বেকুব মুখচোরা ইনা, যাকে

ছেলেবেলায় তারা বরাবর অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে, সে যে এখন ফকীর হইয়া ওয়াজ করিতেছে, এ-কল্পনায় লতিফের বড় হাসি পাইল।

দুজনে পথে চলিতে চলিতে নানা কথা আলাপ করিল। লতিফ গ্রামের খবর জিজ্ঞাসা করিল। ইনু বলিল যে তার অভিশাপে গুণাহগার কাসিমের সর্বনাশ হইয়াছে। সে দেউলিয়া হইয়া মারা গিয়াছে। আর সে-মৃত্যু যেমন-তেমন নয়। অসুখ-বিসুখ কিছুই নাই। হঠাৎ সে পড়িয়া মরিয়াছে।

"কাসিম বেপারী মরছে?" বলিয়া লতিফ থমকিয়া দাঁড়াইল, তার রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

"খালি কি মরছে, যে টাকার গরমে তাব এত সে টাকাকড়ি সব গিয়া ফকীর হৈয়া মরছে।"

"পরীর তাইলে কিছুই নাই?"

"হ' তার এখনও আছে। কিন্তু তা লইয়াও মোকদ্দমা চইলত্যাছে। বাড়ীখান আর কিছু জমীন আর টাকা কাসিম তারে হেবা করচ্যাল, এখন অলি বেপারী তাই লইয়া মামলা করত্যাছে। হাইকোর্টে আছে মামলা, কি হয় কওয়া যায় না। হ' আর শুইনচ নি, পরী এহনে নিকা কইরবো ফকীর শ্যাকেরে। ইদ্দতডা পার হইলেই হয়। তারা চাইচিল আগেই কইরব্যার, কেবল আমি দেই নাই—ইদ্দৎ পার না হইলে তো সরায় নিক্যা লেখে না।"

দপ্ করিয়া লতিফ জ্বলিয়া উঠিল। ফকীর!—এমন বেইমান সে? আর পরী!—নেকজান ঠিক বলিয়াছিল, পরী তার সঙ্গে সুধু খেলা করিয়াছিল। কিন্তু—লাঠিটা জোর করিয়া ধরিয়া সে বলিল—কিন্তু সে দুজনকেই খুন করিবে।

—ক্রমশ

ম্যাক্সিম গোর্কি

ক্রপট্‌কিন্‌

ম্যাক্সিম গোর্কির মত খুব কম লেখকই এত অল্প কালের মধ্যে আপনার যশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন। তাঁর প্রথম কথা-চিত্রগুলি (১৮৯২—১৮৯৫ খৃঃ) ককেসাসের একখানি অজ্ঞাতপ্রায় প্রাদেশিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং সাহিত্যিক জগতের নিকট সম্পূর্ণ ই থাকিয়া যায়। কিন্তু করলেঙ্কো সম্পাদিত, বহু লোকপঠিত পত্রিকায় যখন তাঁর একটি ছোট গল্প বাহির হইল, তখন উহা এক নিমেষেই সাধারণের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিল। গল্পটির গঠন সৌন্দর্য্য, ও শিল্প সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণতা, এবং গল্পের মধ্যে সাহস এবং সবলতার একটি নূতন সুর এই নবীন লেখকটিকে অবিলম্বে লোকদৃষ্টির সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। জানা গেল যে ম্যাক্সিম গোর্কি ছদ্মনামের অন্তরালে যিনি আছেন তিনি সম্পূর্ণ যুবক, নাম এ পিয়েস্কফ, ভল্গা নদীর তীরে নির্জনিনভগবত নামক একটি বড় সহরে ১৮৬৮ সালে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন মজুর কিম্বা ব্যাপারী ধরণের লোক, আর মা চাষার মেয়ে হইলেও তাঁহার একটু অসাধারণত্ব ছিল। পুত্রের জন্মের অল্পকালের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। আর ছেলেটিও মাত্র নয় বছর বয়সে পিতৃমাতৃহীন হইয়া পিতার আত্মীয়দের একটি পরিবারে আশ্রয় পায়। গোর্কির বাল্যজীবন আর যাই হোক্ নিশ্চয়ই সুখের ছিল না, কারণ একদিন তিনি পলাইয়া গিয়া ভল্গা নদীর কোনো ষ্টীমারে চাকুরী আরম্ভ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র বারো বছর। ইহার পরে রুটিওয়ালার কাজ, মুটে মজুরের কাজ, পথে পথে ফল বিক্রীর কাজ করিয়া শেষে কোনো আইন ব্যবসায়ীর নিকট কেরাণীগিরিতে বাহাল হন। ১৮৯১ সালে তিনি একদল বেদের সঙ্গে বাস করেন এবং পায়ে হাঁটিয়া দক্ষিণ রুশিয়া ভ্রমণ করেন। এই ভ্রাম্যমান অবস্থায় তিনি কতকগুলি ছোট গল্প লেখেন এবং ১৮৯২ সালে উহা সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। গল্পগুলি খুবই সুন্দর হয় এবং যখন ১৯০০ সালে তাঁহার লিখিত গল্পগুলির একটি সংগ্রহ ছোট ছোট চারিখণ্ডে প্রকাশিত হইল তখন খুব অল্পকালের মধ্যেই একটি বৃহৎ সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া গেল এবং ফলে তাৎকালিক জীবিত লেখকদের কথা ধরিলেও বলিতে পারা যায় যে লিও টলষ্টয়ের নামের অব্যবহিত পরেই করলেঙ্কো এবং চেহফের (Tchehoff) নামের পাশাপাশি গোর্কির নাম স্থান পাইল।

ফরাসী এবং জার্ম্মান ভাষায় তাঁহার দুটি কথাচিত্র বাহির হওয়া এবং ফরাসী কিম্বা জার্ম্মাণ হইতে তাহা ইংরাজীতে অনুবাদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিম ইউরোপ এবং আমেরিকাতেও তাঁহার খ্যাতি তেমনি দ্রুত ছড়াইয়া পড়িল।

গোর্কির কয়েকটি মাত্র ছোট গল্প পড়িলেই তাঁহার এত দ্রুত লোকপ্রিয় হইয়া ওঠার কারণ উপলব্ধি করা যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে, 'মাল্‌ভা', কিম্বা 'চেচল্‌কাশ', কিম্বা 'মানুষ ছিল' (Ex-men), 'ছাব্বিশ পুরুষ ও একটি মেয়ে' শীর্ষক গল্পগুলি লওয়া যাইতে পারে। তিনি যে সব নরনারী আঁকিয়াছেন তাহারা নায়ক নায়িকা হইবার মত অসাধারণ নহে; উহারা অতি সাধারণ ভবঘুরে কিম্বা বস্তি-বাসী মাত্র। আর তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাকে বাস্তবিক যাহাকে নভেল বলা যায় তাহাও নহে; তিনি আঁকিয়াছেন মাত্র কতকগুলি বাস্তব জীবনের ছবি (Sketch)। কিন্তু সর্ব্বদেশের সাহিত্যে, ব্রেট হার্ট এবং গী দ্য মোপাসাঁর ছোট গল্পগুলিকে লইয়াও বলা যাইতে পারে, যে এমন লেখা খুব

অল্পই আছে যাহার মধ্যে জটিল সজ্ঘাতপূর্ণ মানবীয় অনুভূতির এমন সুন্দর বিশ্লেষণ আছে, এমন চিত্তাকর্ষক এবং সম্পূর্ণ নূতন ধরণের চরিত্র-সৃষ্টি আছে, অথবা যাহার মধ্যে প্রশান্ত সমুদ্র, ক্ষুব্ধ-উদ্বেল তরঙ্গমালা কিম্বা অন্তহীন রৌদ্রদগ্ধ মরু-প্রান্তরের মত প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের সহিত মানবীয় মনোলীলাকে এমন সুন্দর করিয়া মিলাইয়া মিশাইয়া আঁকা হইয়াছে। প্রথম গল্পটির মধ্যে আমরা একেবারে সুস্পষ্ট সেই অন্তরীপটিকে দেখিতে পাই যাহা হাস্যোচ্ছ্বসিত তরঙ্গরাশির মধ্যে আপনাকে বাড়াইয়া দিয়াছে, যাহার উপর জেলেরা তাহাদের কুটীর স্থাপন করিয়াছে। জেলের প্রণয়িণী নারী মালভা প্রতি রবিবার যখন তাহাকে দেখিতে আসে তখন আমরা বুঝিতে পারি যে এই স্থানের প্রতি মালভার ভালবাসা তাহার প্রণয়ের চেয়ে কম নহে। তার পর মালভার অদ্ভুত জটিল প্রকৃতির ভালবাসাটিকে যেরূপ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ও বিচিত্র ভাবে আঁকিয়া দেখান হইয়াছে, কিম্বা অল্প কয়েকটি দিনের পরিসরের মধ্যে ভূতপূর্ব্ব-কৃষক জেলে এবং তাহার কৃষক ছেলেকে যে রকম অভিনবত্বের দিক দিয়া দেখানো হইয়াছে, প্রতি পত্রে তাহা আমাদের বিস্ময় জাগাইয়া তোলে। গোর্কি মানবীয় অনুভূতিগুলিকে এমন বিচিত্র তুলিকা সম্পাতে কখনো কোমল করুণ করিয়া কখনো হিংস্র নির্ম্মম কঠোর করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন যে তাঁহার নায়কদের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে আমাদের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকগণের নায়ক নায়িকারাও নিতান্ত সাদা সিধে বলিয়া মনে হয়। মনে হয় যেন একটি সত্যকার ফুলের পাশে, ইউরোপীয় আলিপনা-শিল্পের (decorative art) একটি ফুল রাখা হইয়াছে!

গোর্কি একজন বড় শিল্পী; তিনি কবি; কিন্তু গত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া রুশিয়ায় যে সব 'গণ-শিল্পী', * (folk novelist) দের দীর্ঘ ধারা চলিয়া আসিয়াছে ইনি তাঁহাদেরই সন্তান এবং তাঁহাদের অভিজ্ঞতার সুযোগ পাইয়াছেন। আদর্শবাদ এবং বাস্তব-বাদের যে সুন্দর সমন্বয়ের জন্য এতকাল হইতে রুশীয় 'গণ-শিল্পীরা' প্রয়াস পাইয়াছেন গোর্কি সেই সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। রিয়েশেৎনিকফ্ এবং তাঁহার মণ্ডলীর লেখকেরা আদর্শবাদের গন্ধবর্জ্জিত অতি-বাস্তব চরিত্রের উপন্যাস সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যখনই সৃষ্টি করিবার দিকে, আদর্শীকরণের দিকে তাঁহাদের ঝোঁক হইয়াছে তখনই তাঁহারা লেখনীকে নিরস্ত করিয়াছেন। তাঁহারা কেবল ডায়ারী লিখিবার চেষ্টা করিতেন; বর্ণনার সুর এতটুকুও না বদলাইয়া তাঁহারা ছোট-বড় প্রয়োজন-অপ্রয়োজন সব ঘটনাকেই সমান ভাবে সঠিক করিয়া বর্ণনা করিতেন। আমরা দেখিয়াছি যে এইভাবে শুদ্ধমাত্র বর্ণনা নৈপুণ্যের বলে ইহারা খুবই স্পষ্ট এবং তীব্র রস সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; কিন্তু ঐতিহাসিকেরা যেমন পক্ষপাতহীন হইবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া কোনো না কোনো দলের লোকই থাকিয়া যান, তেমনি যে আদর্শীকরণকে ইহারা এতটা ভয় করিতেন, ইহারা তাহার হাত এড়াইতে পারেন নাই, ইহারা ইহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। শিল্পসৃষ্টি সব সময়ই ব্যক্তিস্বভাব সমন্বিত (personal); লেখক যাহাই করুন না কেন, তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে তাঁহার সহানুভূতি প্রকাশ পাইতে বাধ্য; যাহারা তাঁহার সহানুভূতি জাগায় তাহাদিগকে তিনি আদর্শ করিয়া গড়িবেনই। গ্রিগরোভিচ্ এবং মার্কো ভভ্চক রুশীয় কৃষকের অতুল ক্ষমাশীল ধৈর্য্য এবং সর্ব্বসহা আনুগত্যকে আদর্শ করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং রিয়েশেৎনিকফ্ সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে এবং হয়ত ইচ্ছার বিরুদ্ধেও উরাল প্রদেশে এবং সেণ্ট পিটার্সবর্গের বস্তিতে যে অতি মানুষিক সহনশক্তি প্রত্যক্ষ

* 'গণ-শিল্পী' (Folk novelist) বলিতে যাঁহারা জনসাধারণের জন্য লেখেন তাঁহাদের কথা মোটেই বলিতেছি না. গণ-সাহিত্যিক বলিতে তাঁহাদের কথাই বুঝিব যাঁহারা জন-সাধারণের বিষয়ে—চাষা, খনির শ্রমিক, কারখানার শ্রমিক, যারা সহরে সর্ব্বনিম্নশ্রেণীর লোক, ভবঘুরে বেদে সম্প্রদায়ের বিষয়ে লেখেন।—ক্রপট্কিন।

করিয়াছিলেন তাহাকে আদর্শ করিয়া তুলিয়াছিলেন। অতিবাস্তব পন্থী এবং রোমান্স পন্থী উভয়েই কিছু না কিছুকে আদর্শ করিয়া তুলিয়াছিলেন। গোর্কি ইহার অর্থ নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিলেন; অন্ততঃ কতকটা পরিমাণ আদর্শীকরণে তাঁহার কোনো আপত্তি দেখা যায় নাই। সত্যানুরাগের দিক দিয়া ইনি রিয়েশেৎনিকফের মতই একজন বাস্তবপন্থী, কিন্তু টুর্গেনেফ্ তাঁহার রুডিন, হেলেন কিম্বা বাজারফ্ চরিত্র সৃষ্টির বেলা যে ভাবের আদর্শানুগত্য দেখাইয়াছেন ঠিক সেই ভাবেই গোর্কিও আদর্শীকরণ করিয়াছেন। গোর্কি বলিয়াছেনও যে, আমাদিগকে আদর্শ গড়িতেই হইবে এবং তাঁহার জানা ভবঘুরে শ্রেণীর মধ্যে যে 'টাইপ'টিকে গোর্কি প্রশংসা করিতেন সেই 'বিদ্রোহী'কেই তিনি আদর্শ করিবার জন্য বাছিয়া লইয়াছেন। এইখানেই গোর্কির সাফল্য; একঘেয়ে মামুলিত্ব এবং একটা সবল ব্যক্তিত্বের অভাব হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সর্ব্বদেশের পাঠকবর্গ যেন ঠিক এই বস্তুটিরই কামনা করিতেছিল।

গোর্কি তাঁহার প্রথমকার ছোট গল্পের নায়কগুলিকে (আর ছোট গল্পেই গোর্কির শ্রেষ্ঠতা) সমাজের যে-স্তর হইতে গ্রহণ করিলেন তাহা দক্ষিণ রুশিয়ার ভবঘুরে বেদের শ্রেণী। এই সব লোকেরা ব্যবস্থিত সমাজকে লঙ্ঘন করিয়া চলে, স্থায়িভাবে কখনো কোনো কর্ম্ম-শৃঙ্খলে আপনাদের বাঁধে না, কৃষ্ণ-সাগরের বন্দরে ইচ্ছামত দুচার দিনের জন্য কাজ করিয়া থাকে; ডস্-হাউসে (রাত্রি বেলা ভাড়া দিয়া শুইবার স্থান) কিম্বা সহরতলীতে খাতে পড়িয়া তাহারা নিদ্রা দেয় এবং গ্রীষ্মকালে ওডেসা হইতে ক্রিমিয়া এবং ক্রিমিয়া হইতে উত্তর ককেশিয়ার 'প্রেয়ারি' (Prairies) প্রান্তরে ফসল-কাটার কাজ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

দারিদ্র্য এবং দুর্ভাগ্যের সনাতন অভিযোগ, অসহায়তা এবং আশাহীনতার সুর, যাহা প্রথমকার 'গণসাহিত্যিকদের' (folk novelist) লেখায় অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, গোর্কির গল্পে তাহা একেবারেই নাই। তাঁহার ভবঘুরেরা অনুযোগ করে না। একটি ভবঘুরে বলিতেছে, 'সব ঠিক আছে; অনুযোগ-অভিযোগ আর প্যানপ্যানানি একেবারে নিরর্থক, ওতে কোনো লাভ নেই। যতক্ষণ না ভেঙে যাও, বেঁচে থেকে সয়ে যাও, আর যদি ভেঙে গিয়েই থাক, মৃত্যুর প্রতীক্ষা কর। এই দুনিয়ায় এই খাঁটি জ্ঞানের কথা, বুঝেছ?' (Works i, p. 311)

তাঁর ভবঘুরেদের দুরদৃষ্টের দিকে চাহিয়া প্যানপ্যানানি বা অভিযোগ তো তিনি করেনই নাই, বরং তাঁহার গল্পের মাঝ দিয়া রুশ সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব সাহস এবং শক্তির উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে। গোর্কির ভবঘুরেরা দরিদ্র হইলেও তাহারা 'বেপরোয়া'। ইহারা মদ খায়; কিন্তু লেভিটফের লেখায় আমরা নৈরাস্যের যে মাতলামী দেখিয়াছি, তাহার কাছ দিয়াও ইহারা যায় না। ডষ্টয়েভস্কির মধ্যে অসহায়তাকে ধর্ম্ম করিয়া তুলিবার যে ভাব আছে, ইহাদের মধ্যে তাহাও নাই। ইহাদের মধ্যে সব চেয়ে 'দলিত' যে-মানুষটি সেও এই জগৎকে নূতন করিয়া সংস্কার করিবার, সুন্দর করিবার স্বপ্ন দেখে। সে সেই মুহূর্ত্তের স্বপ্ন দেখিতে থাকে, 'যখন আমরা, যারা গরীব সেই আমরা ধনকুবেরদের আত্মাকে সুন্দর এবং জীবনকে বলিষ্ঠ ক'রে দিয়ে চিরকালের জন্য তিরোহিত হব।' (A Mistake, i, p. 170)

গোর্কি ঘ্যানঘ্যানানি সহিতে পারেন না। অন্য রুশ লেখকেরা আপনাকে শাস্তি দিবার যে আনন্দ পান—টুর্গেনেফের 'হ্যামলেট' রা যে-ভাবটিকে এমন সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিয়াছে, ডষ্টয়েভস্কি যে-ভাবটিকে ধর্ম্ম করিয়া তুলিয়াছেন, এবং রুশিয়ায় যে-ভাবটির অনন্ত বিচিত্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, গোর্কি সেই আত্ম-লাঞ্ছনার ভাবটিকে সহিতেই পারেন না। গোর্কি ওই জাতীয় চরিত্রটিকে জানেন, কিন্তু ওই রকমের লোকগুলির প্রতি তাঁহার সহানুভূতি নাই। এই যে-সব অহমিকাগ্রস্ত দুর্ব্বল চরিত্র মানুষগুলি সব সময় নিজের অন্তরকে ক্ষয় করিতে থাকে, নিজের 'খাক্-হয়ে-যাওয়া' প্রাণের কাহিনী বলিবার উদ্দেশে অন্যকে টানিয়া লইয়া মদ খাইতে বসে, ইহাদের চেয়ে

আর যে-কানো রকমের মানুষও গোর্কির নিকট ভাল মনে হয়। এই সব 'দরদ-ভরা' মানুষগুলি কখনো নিজের প্রতি সহানুভূতি ছাড়া আর কিছুই পারে না, এবং 'প্রেমার্দ্র' প্রাণগুলি ইহাদের আত্মপ্রীতি ছাড়া আর কিছুই জানে না। গোর্কি এই সব মানুষদের অত্যন্ত ভাল করিয়াই জানেন; যে-সব নারী ইহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, ইহারা তাহাদের জীবনকে নিতান্ত খামোখাই ধ্বংস করিতে ছাড়ে না; ইহারা রাস্কলনিকফের কিম্বা কারামাজফ্‌দের মত খুন করিতেও বিমুখ হয় না—অথচ কেবলি প্যান্‌প্যান্‌ করিতে থাকে যে, যা-কিছু ইহারা করিয়াছে সেজন্য দায়ী পারিপার্শ্বিক অবস্থা। গোর্কি বৃদ্ধ ইজেরঘিল্‌কে দিয়া বলাইয়াছেন, 'এই যে অবস্থা নিয়ে এত কথা, এ সব কি? প্রত্যেক অবস্থাকে মানুষ নিজে তৈরী করে। আমি কত রকমের মানুষ দেখি, কিন্তু সবল মানুষ—কোথায় তারা? মহৎ মানব কেবলি কম হয়ে যাচ্ছে!'

তথাকথিত চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের (intellectuals) মধ্যে এই ঘ্যান্‌ঘ্যানানি রোগ কত বেশি এবং অগ্রগতিশীল আদর্শবাদী সত্যকার বিদ্রোহীর সংখ্যা ইহাদের মধ্যে কত দুর্লভ এবং অপর দিকে যে-সব দেশ-প্রেমিক (politicals) সহিষ্ণুতার সঙ্গে সাইবেরিয়ার নির্ব্বাসন বরণ করে, তাহাদের মধ্যেও 'নেজ্‌দানফে'র (টুর্গেনেফের কুমারী ধরণী Virgin Soil) সংখ্যা কত বেশি গোর্কি জানেন বলিয়াই এই সব 'চিন্তাশীলের' শ্রেণী হইতে গোর্কি তাঁহার টাইপ্‌ (আদর্শ) চয়ন করেন নাই, কারণ তিনি মনে করেন যে ইহারা অত্যন্ত সহজে 'জীবনের মধ্যে বন্দী' হইয়া পড়ে।

ভারেঙ্কা ওলেসোভায় গোর্কি আমাদের বর্ত্তমান কালের সাধারণ চিন্তাশীল মানুষের প্রতি তাঁহার অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আমাদের সম্মুখে প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্যে ভরা একটি মেয়ের হৃদয়গ্রাহী 'টাইপ' আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। এই মেয়েটি সম্পূর্ণ ভাবে স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ-সংস্পর্শ-বিবর্জ্জিত আদিম যুগের একটি নারী, কিন্তু এই মেয়েটির জীবন এমনি প্রচণ্ড তীব্র, এমনি স্বতন্ত্র, ইহার ব্যক্তিত্ব এমনি সুস্পষ্ট যে ইহার প্রতি চিত্ত অত্যন্ত আকৃষ্ট না হইয়াই পারে না। এই মেয়েটি একটি পুরুষের সহিত পরিচিত হইল, পুরুষটি সেই চিন্তাশীল শ্রেণীর একজন, যাহারা মহত্তর আদর্শকে জানে এবং শ্রদ্ধা করে, কিন্তু যাহারা একান্ত দুর্ব্বল এবং সম্পূর্ণ ভাবে প্রাণ-শক্তি বর্জ্জিত। ভারেঙ্কা তো তাহার সহিত এই লোকটির প্রেমে পড়াটাকে হাসিয়াই উড়াইয়া দিল। গোর্কি এই মেয়েটির মুখ দিয়া রুশীয় উপন্যাসের সাধারণ নায়ককে এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

'রুশীয় নায়ক সব সময়ই নির্ব্বোধ এবং বোকা' মেয়েটি বলে; 'কোনো-না-কোনো বিরক্তি তাকে সব সময়ই পেয়ে আছে; সব সময়ই সে এমন কিছু ভাবচে যা বোঝা যায় না, আর সেজন্যে তার মনের অসুখ লেগেই আছে, সে ভয়ানক অ-সু-খী! সে ভাবচে, কেবলি ভাবচে, তারপর কথা বলচে, তারপর গিয়ে কোনো মেয়েকে প্রেম-নিবেদন করচে, তারপর আবার ভাবনা সুরু হচ্চে, ভাবতে ভাবতে বিয়ে করচে...তারপর যখন বিয়ে হলো, তখন স্ত্রীর কাছে নানা রকমের বাজে বকচে, তারপর তাকে ত্যাগ করচে।'

Varenka Obsova ii, p. 281)

গোর্কির প্রিয় চরিত্র হইতেছে বিদ্রোহীর—সেই মানুষ যে সমাজের উপর সম্পূর্ণ বিদ্রোহী কিন্তু সেই সঙ্গে সে মানুষটি সবল, একটা শক্তি; তিনি যে-সব ভবঘুরেদের সঙ্গে জীবন যাপন করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে তাঁহার এই আদর্শটির অন্ততঃ ছোটখাটো রূপও দেখিয়াছিলেন বলিয়াই সমাজের এই স্তর হইতেই তিনি তাঁহার সব চেয়ে চিত্তাকর্ষক চরিত্রগুলিকে গ্রহণ করিয়াছেন।

'কনোভালফে' গোর্কি নিজেই তাঁহার ভবঘুরে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব অন্ততঃ আংশিক ভাবে দান করিয়াছেন: "সহরের বস্তিগুলি যে-সব ছিন্ন-বস্ত্র, ক্ষুধাতুর, তিক্ত-জীবন অর্দ্ধ-মানব এবং অর্দ্ধ-পশুতে পরিপূর্ণ, সেই সব ভাগ্য-লাঞ্ছিত

মানুষদের মাঝে এই একটি 'চিন্তাশীল মানুষ'—"সাধারণতঃ এই মানুষটিকে কোনো পর্য্যায়েই ফেলা যায় না" এই মানুষটি 'নোঙর-ছেঁড়া নৌকার মত, সর্ব্ব বিষয়ের প্রতি বিরূপ, এবং তার তিক্ত ক্রুদ্ধ অবিশ্বাসের শক্তি দিয়ে যে-কোনো বস্তুকেই আক্রমণ করতে উন্মুখ' (ii, p. 23)। গোর্কির ভবঘুরে জানে, যে, সে জীবনে পরাজিত, কিন্তু তা বলিয়া অবস্থার উপর সে দোষ চাপাইতে ব্যস্ত নয়। যেমন ধরা যাক কনোভালফ্—শিক্ষিত অকর্ম্মাদের মাঝে 'বিরুদ্ধ অবস্থার দুঃখজনক সৃষ্টি' বলিয়া যে মত চলিত আছে কনোভালক্ তাহা স্বীকার করিবে না। সে বলে, 'দুর্ব্বল হৃদয় যার সে-ই এই রকমের মানুষ হতে পারে' 'আমি বেঁচে আছি, কিছু আমায় চালিয়ে নিয়ে চলেচে··· কিন্তু আমার মাঝে ভেতর থেকে কোনো প্রেরণা নেই···আমার কথা বুঝতে পারচ কি? কি ক'রে যে কথাটা বলতে হবে জানি না। আমার অন্তরে সেই জলন্ত শিখা নেই...বোধ হয় তাকে শক্তি বলে? কিছু একটা নেই; এই শুধু!' তার তরুণ বন্ধু পুস্তকে চরিত্রগত দুর্ব্বলতার নানা রকম হেতুবাদের কথা পড়িয়াছে; সে যখন 'চারদিকে তার বিরুদ্ধ অদৃষ্ট শক্তির' কথা বলে, কনোভালফ্ উত্তর দেয়, 'তা হলে খাড়া হয়ে দাঁড়াও, ভালো করে শক্ত হয়ে দাঁড়াও; কোথায় আছ তা বোঝ, বুঝে দাঁড়াও!'

গোর্কির কোনো কোনো ভবঘুরে বাস্তবিক দার্শনিক প্রকৃতির। তাহারা মানব-জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করে, মানব-জীবন কি তাহা জানিবার সুযোগ ইহাদের হইয়াছে। এক জায়গায় সে বলিতেছে, 'যাদের জীবনে সংগ্রাম করতে হয়েচে, তারপর পরাজিত হয়ে জীবনের অভাব-দৈন্যের মালিন্যের মধ্যে যারা নিষ্ঠুর ভাবে বন্দী হয়েচে ব'লে অনুভব করেচে, তাদের প্রত্যেকে শপেন হয়েরের চেয়ে বড় দার্শনিক; কারণ দুঃখ বেদনার মাঝ থেকে চিন্তা যেমন ক'রে প্রকাশ পায় তেমন সত্য এবং সুন্দর রূপ নিয়ে 'এ্যাবষ্ট্র্যাকট' চিন্তা কখনো প্রকাশ পেতে পারে না। (ii, p. 31) লোকটি আবার বলিতেছে, 'এই সব লোকের জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান আশ্চর্য্য রকমের।'

ভবঘুরের আরেকটি বিশিষ্টতা তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যানুরাগ। 'কনোভালফ্ গভীর এবং অনির্ব্বচনীয় ভাবে প্রকৃতিকে ভালবাসত, সে-ভালবাসা শুধু তার চোখের ঔজ্জ্বল্যে প্রকাশ পেত। যখনই সে মাঠে কিম্বা নদীতটে যেত তখনই প্রশান্তি এবং প্রেমে তার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে গিয়ে তাকে আরো শিশুর মত করে তুলতো। কখনো কখনো আকাশের পানে তাকিয়ে বলে উঠত, 'বাঃ'। বহু কবির শব্দচ্ছটার চেয়ে ওই একটি উচ্ছ্বাসের মধ্যে অনেক বেশি অনুভব প্রকাশ পেত।···সব জিনিসের মতই পেশায় দাঁড়িয়ে গেলে কবিতা তার নির্ম্মল সারল্য এবং প্রাচুর্য্য হারিয়ে ফেলে।' (ii, p. 33-34)

তা বলিয়া গোর্কির বিদ্রোহী ভবঘুরে কিন্তু নীট্‌শের মত সঙ্কীর্ণ অহমিকার বাহিরের সব-কিছুকে তুচ্ছ করে না, কিম্বা আপনাকে অতিমানব (superman) বলিয়াও ভাবে না; সত্যকার নীট্‌শে-'টাইপ' সৃষ্টি করিতে হইলে চিন্তাশীল ব্যক্তির ব্যাধিগ্রস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রয়োজন। গোর্কির ভবঘুরেদের মধ্যে এবং নিম্নতম শ্রেণীর স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে চরিত্রের মহত্ত্বের এমন বিদ্যুৎস্ফুরণ রহিয়াছে, এমন একটি অনাড়ম্বর সারল্য আছে যাহা অতিমানুষের আত্মম্ভরিতার সঙ্গে খাপ খাইতে পারে না। সত্যিকার নায়কের মত ইনি চরিত্রগুলিকে আদর্শ করিয়া তোলেন না, জীবনের দিক দিয়া তাহা হইলে উহারা অসত্য হইয়া পড়িত; ভবঘুরেকে তিনি ব্যর্থ পরাভূত করিয়াই দেখাইয়াছেন। কিন্তু ওরলফ (in The Orloffs) কিম্বা ইলিয়াকে (in The Three) একটা সত্যকার শক্তিতে পরিণত করিয়া তাহাদিগকে সত্যকার আদর্শ নায়ক করিয়া তুলিবার মত, নিজের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী মানুষদের সঙ্গে সংগ্রাম করিবার মত অন্তন্ন-শক্তি ইহাদের মধ্যে না থাকিলেও, শক্তির গোপন চেতনা থাকার ফলে এই সব মানুষের অন্তরে যে এক একটি

মহিমাময় মুহূর্ত্তের আবির্ভাব হয় গোর্কি তাহাই দেখাইয়াছেন। গোর্কি যেন বলিতে চান, ওগো চিন্তাশীলেরা, এই কয়েকটি তলাইয়া-যাওয়া মানুষের মত এমনি সত্যকার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং বলিষ্ঠ তোমরা হও না কেন? তোমরাও এমনি সরলভাবে সমাজবিদ্রোহী হও না কেন?

ছোট গল্পে গোর্কির স্থান খুবই বড়; কিন্তু তাঁর সমসাময়িক করলেঙ্কো এবং চেহফের মত যখনই তিনি চরিত্রগুলির পরিপূর্ণ ক্রমবিকাশ দেখাইয়া বড় উপন্যাস লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তখনই তাঁহার চেষ্টা বিফল হইয়াছে। 'ফোমা গর্ডেফ' বইখানিকে সমগ্রতার দিক দিয়া দেখিতে গেলে, স্থানে স্থানে সুন্দর এবং হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য সত্ত্বেও উহা গোর্কির বেশির ভাগ ছোট গল্পের চেয়েও নিকৃষ্ট হইয়াছে বলিতে হয়; "তিনজনে"র (The Three) প্রথমাংশ—তিনটি তরুণের কাব্যময় জীবন এবং তাহার অন্তর্নিহিত সকরুণ পরিণতির আভাস—রুশ সাহিত্যের একখানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস দেখার আশা জাগ্রত করিলেও, উহার শেষ আমাদিগকে হতাশ করিয়া তোলে। "তিনজনে"র ফরাসী অনুবাদক, বইখানিকে গোর্কি যেখানে শেষ করিয়াছেন সেইখানে শেষ না করিয়া, যেখানে ইলিয়া তাহার স্বহস্তে নিহত লোকটির সমাধি-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে সেইখানেই হঠাৎ শেষ করিয়াছেন।

গোর্কি এই দিক দিয়া কেন সফল হইতে পারেন নাই তাহার উত্তর দিতে যাওয়া বাস্তবিক অত্যন্ত কঠিন এবং অশোভন। তবু একটি কারণের দিকে ইঙ্গিত করা যাইতে পারে। গোর্কি টলষ্টয়ের মতই একজন অত্যন্ত খাঁটি শিল্পী; সেইজন্য তাঁহার চরিত্রগুলির সত্যকার জীবন যে-পরিণতির দিকে নির্দ্দেশ করে না, সেই পরিণতিকে, যত চমৎকারই হোক, তিনি গুঁজিয়া দিতে পারেন না; যে-শ্রেণীর মানুষকে তিনি এমন আশ্চর্য্য ভাবে আঁকিয়াছেন, তাহার মধ্যে সেই নিবিড়তা এবং ঐক্য নাই যাহা শিল্প সৃষ্টিকে নিখুঁত করিয়া তাহাকে চরম সামঞ্জস্য দিয়া সম্পূর্ণ করিবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ The Orloffs এর অর্লফ চরিত্র লওয়া যাক্। 'আমার মধ্যে আমার অন্তরাত্মা জ্ব'লে যাচ্চে' অর্লফ বলে, 'আমার শক্তির পূর্ণ বিকাশের জন্য আমার স্থান চাই। আমার মধ্যে আমি এক দুর্জ্জয় শক্তি অনুভব করি। ধর, এই কলেরা যদি মানুষ হ'ত, একটা দানব হ'ত—ও যদি ইলিয়া মুরোমেট স্বয়ং হ'ত—তা হ'লে আমি তার সম্মুখীন হ'তাম। আমি বলতাম, এসো জীবন-মরণ লড়াই হোক, তুমি একটা শক্তি, আমি, গ্রিস্কা অর্লফ, আমিও একটা শক্তি। এসো, দেখা যাক্ কে বেশি শক্তিমান্!'

কিন্তু এই শক্তি, এই তেজ স্থায়ী হয় না। অর্লফ এক স্থানে বলিতেছে, 'আমায় সব দিক থেকে একসঙ্গে সব টেনে ছিঁড়বার চেষ্টা করচে' এবং ইহাও বলিতেছে যে দানবের সঙ্গে সংগ্রাম করা তাহার নিয়তি নয়, সামান্য ভবঘুরে হওয়াই তাহার নিয়তি। এই ভাবেই তাহার শেষ। গোর্কির অসাধারণ শিল্পীত্বই তাহাকে দানব-হন্তা করিতে দেয় নাই। 'তিনজনে'র ইলিয়ারও এই একই দশা। ইলিয়া একটি বলবান্ চরিত্র, সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে যে-সব সোসিয়ালিজ্‌মের (সমাজতন্ত্রবাদ) তরুণ প্রচারকদের সঙ্গে ইলিয়ার দেখা হইল, তাহাদেরই কাহারো প্রভাবে গোর্কি ইলিয়ার একটা নূতন জীবনের সূত্রপাত কেন দেখাইলেন না? ধরুন না, গোর্কি যে-সময় এই নভেলখানি শেষ করিতেছিলেন ঠিক তখনই রুশিয়ায় ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিক এবং সৈন্যদের মাঝে যে-সব সঙ্ঘর্ষ হইয়াছিল, তাহারই একটিতে ইলিয়া প্রাণ দিল না কেন? কিন্তু এখানেও হয়ত গোর্কির উত্তর এই হইবে যে বাস্তব জীবনে এমন ধারা হয় না। ইলিয়ার মত যে-সব লোক 'ব্যবসায়ীর নির্দ্দোষ জীবনের' স্বপ্নই দেখে শুধু, তাহারা শ্রমিক-আন্দোলনে যোগ দেয় না। গোর্কি তাঁহার নায়কের পরিণাম অত্যন্ত হতাশাজনক করিয়াই

দেখাইয়াছেন, পুলিস কর্ম্মচারীর স্ত্রীর উপর তাহার আক্রমণের মধ্যে তাহাকে ক্ষুদ্র এবং অপদার্থ করিয়া দেখাইতেই চাহিয়াছেন ; ধর্ম্মঘট-সংগ্রামে ইলিয়াকে বড় করিয়া না তুলিয়া, গোর্কি পাঠকের সহানুভূতিকে বরং ওই স্ত্রীলোকটির দিকেই আকৃষ্ট করিয়াছেন। আদর্শীকরণের সমস্ত সীমা লঙ্ঘন না করিয়া ইলিয়াকে আদর্শ করিয়া তোলা যদি সম্ভব হইত গর্কি হয় ত তাহা করিতেন, কারণ বস্তু-তান্ত্রিক শিল্পে গোর্কি আদর্শীকরণের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ; কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাহা করিলে উহা নিতান্তই রোম্যান্টিসিজ্‌ম্ এর কল্প-কথার মত হইয়া দাঁড়াইত।

উপন্যাস লেখকের পক্ষে যে, আদর্শের প্রয়োজন একথা গোর্কি ফিরিয়া ফিরিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন, (রুশ সমাজে) এই যে আধুনিক মতের অস্থিরতা ইহার কারণ আদর্শবাদের প্রতি অবহেলা, 'যাঁরা জীবন থেকে সর্ব্বপ্রকারের রোম্যান্টিসিজ্‌মকে অভিনব কল্পনাকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন তাঁরা আমাদের সম্পূর্ণ নগ্ন করে ধরেচেন ; এই কারণেই আমরা পরস্পরের নিকট এত নীরস এবং বিরক্তিকর ঠেকচি।' (A Mistake, i. p. 157) 'পাঠক' গল্পে (১৮৯৮) গোর্কি তাঁহার শিল্পসম্বন্ধীয় মতবাদটিকে পূর্ণভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

গোর্কির সর্ব্বপ্রথম রচনা ছাপা হইবার পর একদিন রাত্রিবেলা তাহার মধ্য হইতে একটি লেখা তাঁহার একটি বন্ধু-মণ্ডলীর মধ্যে পঠিত হইল। অনেকেই তাঁহাকে প্রশংসা-বাদ করিলেন ; সেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া একটি নির্জ্জন পথ দিয়া জীবনের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম আনন্দ অনুভব করিতে করিতে ধীরপদে তিনি বাড়ীর দিকে চলিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার অপরিচিত একটি লোক, যাঁহাকে তাঁহার লেখাটি পড়া হওয়ার সময় তিনি দেখেন নাই, তাঁহার নিকট আসিয়া লেখকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

অপরিচিত বলিলেন, "আপনিও স্বীকার করবেন যে সাহিত্যের কর্ত্তব্য হচ্চে, মানুষের আত্মপরিচয়ে সহায়তা করা, আত্ম-বিশ্বাসকে বাড়ানো, সত্যের কামনাকে পরিপুষ্ট করা, মানুষের মাঝে যা অসৎ তার সঙ্গে সংগ্রাম করা, মানুষের মাঝে যা ভাল তাকে আবিষ্কার করা এবং তাদের অন্তরে লজ্জা, ক্রোধ, সাহসকে জাগ্রত করা ; সংক্ষেপে, সেই সবই করা, যাতে মানুষ সত্যি সত্যি বলিষ্ঠ হতে পারে, যাতে তারা তাদের জীবনকে পবিত্র সৌন্দর্য্যের ভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারে।" (iii, p. 241) "আমার বোধ হয়, আবার আমাদের স্বপ্নের প্রয়োজন, কল্পনা এবং দিব্য-দৃষ্টির (vision) সুন্দর সৃষ্টির প্রয়োজন, কারণ আমরা যে জীবনকে গড়ে তুলেচি সে জীবন বিবর্ণ, অপরিস্ফুট এবং বিরস।...যা হোক, চেষ্টাতো করা যাক্। হয় তো কল্পনা মানুষকে মুহূর্ত্তের জন্যেও পৃথিবীর উর্দ্ধে উঠতে এবং সেখানে তার হারানো স্থানটিকে ফিরে পেতে সাহায্য করতে পারে।" (p. 245)

কিন্তু ইহার পর গোর্কি একটি কথা বলিয়াছেন যাহা হইতে চরিত্রসৃষ্টিমূলক বড় উপন্যাস লিখিতে গিয়া তিনি আজ পর্য্যন্ত কেন সফল হইতে পারেন নাই তাহা বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলিতেছেন, "আমার মধ্যে অনেক সুন্দর অনুভব এবং কামনা জাগে যাদের অনেকখানিই সাধারণতঃ ভাল ব'লে বিবেচিত ; কিন্তু এই সমস্তকে সমগ্রতার মধ্যে এক ক'রে তুলে ধরবার মত অনুভব, জীবনের সমস্ত ব্যাপারকে এক সঙ্গে গেঁথে ধরবার মত একটি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুস্পষ্ট ভাবকে আমার মধ্যে উপলব্ধি করতে আমি পারি নি'।" ইহা পড়িয়া তৎক্ষণাৎ টুর্গেনেফের কথা মনে পড়ে যিনি এই স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতাকে, বিশ্বজগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে একটি সুসম্বদ্ধ ধারণাকে বড় শিল্পী হওয়ার পথে প্রথম প্রয়োজন বলিয়া মনে করিতেন।

.. আবার তিনি বলতে লাগলেন, 'আপনি কি মানুষের মনে এতটুকুও মায়া সৃষ্টি করতে পারেন যা তাকে একটুও উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারে? না!' 'আধুনিক যুগের শিক্ষাদাতা আপনারা সবাই যত দিচ্চেন তার চাইতে বেশি নিচ্চেন, কারণ আপনারা কেবলি দোষের কথাই বলেন—আপনারা

শুধু তাই দেখতে পান। কিন্তু মানুষের মাঝে ভাল গুণও নিশ্চয়ই আছে; আপনারও কতকগুলো ভাল গুণ আছে, নেই কি? আপনি কি লক্ষ্য করেন নি যে তাদের শ্রেণীবিভাগ আর সংজ্ঞানিরূপণের ক্রমাগত চেষ্টার ফলে পাপ আর পুণ্য কালো আর সাদা সুতোর গুলির মত জড়িয়ে গিয়ে দুইই পরস্পরের সংস্রবে মেটে রঙ ধরেচে?'...... 'আপনাকে ঈশ্বর পৃথিবীতে পাঠিয়েচেন কি না তাতে আমার সন্দেহ আছে। তিনি যদি দূতই পাঠাতেন তা হ'লে তিনি আপনার চাইতে শক্তিমান্ লোকদের নির্ব্বাচন করতেন। তিনি তাদের মাঝে, মানুষ সত্য, এবং জীবনের প্রতি প্রবল ভালবাসার আগুন জ্বালিয়ে দিতেন।'

নির্ম্মম বক্তা বল্‌তে লাগলেন 'শুধু সাধারণ দৈনন্দিন জীবন, সাধারণ মানুষ, সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনা আর চিন্তা ছাড়া আর কিচ্ছু না! কখন তা হ'লে বিদ্রোহী অন্তরাত্মার কথা, মানবাত্মার নবজন্মের প্রয়োজনের কথা বলবেন? একটা নবজীবন সৃষ্টির আহ্বান কোথায়? সাহসের শিক্ষা কোথায়? সেই বাণী কোথায় যা অন্তরাত্মাকে উধাও হবার শক্তি দেবে?'

'স্বীকার করুন জীবনকে আপনি এমন ভাবে দেখাতে পারেন না, যাতে আপনার সেই ছবি মানুষের মধ্যে এমন লজ্জা বোধ জাগাবে যা তাকে মুক্তির পথে উদ্বুদ্ধ করবে, যা জীবনের নব নব রূপ-সৃষ্টির জন্য জ্বালাময়ী বাসনাকে জাগ্রত করবে?......আপনি কি জীবনের স্পন্দনকে দ্রুততর করতে পারেন? আপনি কি অন্যেরা যেমন করে গেছেন তেমনি জীবনকে শক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ করতে পারেন?'

'আমার চারদিকে আমি অনেক বুদ্ধিমান লোক দেখতে পাই, কিন্তু মহৎ লোক খুব কচিৎ, আর এই স্বল্পসংখ্যক লোকগুলি ভাঙা-চোরা, ব্যথা-দীর্ণ। কেন যে এমন হয় জানি না, কিন্তু এটা সত্যি কথা। যত ভালো, যত শুদ্ধ, যত খাঁটি কারু প্রাণ, তার মধ্যে শক্তি তত কম, ততই বেশি তার দুঃখ, ততই কঠিন তার জীবন।......কিন্তু যদিচ উন্নততর জীবনের অভাব বোধ তাদের এত পীড়া দেয়, তবু একে সৃষ্টি করবার শক্তি তাদের নেই।'

'আরেকটি কথা' অদ্ভুত প্রশ্নকারী একটু থেমে আবার ব'লেই চল্লেন, 'আপনি কি মানুষের মাঝে জীবনের আনন্দে ভরা হাসি জাগিয়ে তুলতে পারেন, যা তার অন্তরাত্মাকে উন্নত করে তুলবে? দেখুন মানুষ ভালো সুস্থ হাসি হাসতে একেবারেই ভুলে গেছে!'

'জীবনের অর্থ আত্মপরিতৃপ্তির মাঝে নয়; যেমন ক'রেই হোক মানুষ তার চাইতে উন্নত। জীবনের সার্থকতা তার সৌন্দর্য্যে, কোনো না কোনো আদর্শের পানে তার চলার প্রয়াস-শক্তির মধ্যে; মানুষের জীবনের প্রতি-মুহূর্ত্তে সেই উচ্চতর লক্ষ্যের চেতনা থাকা উচিত।' 'ক্রোধ, ঘৃণা, লজ্জা, বিতৃষ্ণা আর সর্ব্বশেষে নিদারুণ হতাশা এগুলো দিয়ে পৃথিবীর সব আপনি নষ্ট করতে পারেন।' 'আপনি যদি শুধু আর্ত্তনাদ দীর্ঘশ্বাস নিয়েই থাকেন কিম্বা নিতান্ত উদাসীন ভাবে মানুষকে শুধু এই কথাই জানান যে ধূলির চাইতে তার মূল্য বেশি নয়, তা হ'লে জীবনের পিপাসা আপনি জাগাবেন কেমন ক'রে?'

'হায়রে, সেই মানুষকে যে চাই যে শক্তিমান এবং প্রীতি-পূর্ণ, যার হৃদয় উদ্দীপনার জ্বালায় ভরা, শক্তিময় মন যার সর্ব্ব বস্তুকে আপনার আয়ত্ত করতে চায়। এই লজ্জিত নীরবতার বদ্ধ হাওয়ায় তার দিব্যবাণী সতর্ক-ধ্বনির মত বেজে উঠবে আর হয় ত জীবন্ত মৃতদের নীচ অন্তরাত্মা কেঁপে উঠবে।' (p. 253)

সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের চেয়ে ভালো-কিছুর প্রয়োজন, অন্তরাত্মাকে উন্নত করিতে পারে এমন কিছুর প্রয়োজন সম্বন্ধে গোর্কির যে ধারণা তাহা হইতে তাঁহার নাটক At the Bottom (or The Lower Depths) এর অর্থ সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়। মস্কো থিয়েটারে এই নাটকখানির যেমন সমাদর হইয়াছিল, একই অভিনেতাদের দ্বারা অভিনীত হওয়া সত্ত্বেও সেন্ট-পীটার্স বর্গে তাহার প্রতি লোকের কোনো অনুরাগই দেখা যায় নাই। এই নাটকের

ভাব-বস্তু ইবসেনের Wild Duck 'জংলী হাঁসের'ই অনুরূপ। একটি ডস্‌-হাউসের (যেখানে রাত্রিবেলা ভাড়া দিয়া লোকেরা শুইবার স্থান পায়) চিত্র; সেখানকার অধিবাসীরা কোনো না কোনো মিথ্যা মায়াকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কোনোও রকমে বাঁচিয়া থাকিবার শক্তি সংগ্রহ করিতেছে; মাতাল অভিনেতা কোনো বিশেষ স্থানে গিয়া নীরোগ হইবার স্বপ্ন দেখে, একটি পতিতা মেয়ে সত্যকার ভালবাসার মিথ্যামায়ায় আশ্রয় চায়, এমনি ধারা আরো কত। যাহাদিগকে জীবনের রাজ্যে ধরিয়া রাখার কিছু নাই বলিলেই চলে, তাহাদের এই মায়া যখন নষ্ট হইয়া গেল, তখন এই সব চরিত্রগুলির অবস্থা-সঞ্জাত নাটকের মধ্যে নিতান্ত নিদারুণ হইয়া দেখা দিল। একখানি শক্তিশালী নাটক ইহা। কয়েকটি রচনা-প্রণালীর ভুল থাকায় নাটকখানি রঙ্গমঞ্চে তেমন সাফল্য লাভ করিতে পারিবে না (অনাবশ্যক চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম দৃশ্যে বিনা-প্রয়োজনে স্ত্রীলোকটির আবির্ভাব এবং তিরোধান); কিন্তু এই সব ভুলভ্রান্তি বাদ দিয়া বলা যায় যে নাটকখানি খুবই নাটকীয়গুণ-সম্পন্ন হইয়াছে। নাটকের ঘটনা-সংস্থান সত্যই অত্যন্ত করুণ, ঘটনা-পারম্পর্য্য দ্রুত আর ডস্‌-হাউসের বাসিন্দাদের বার্ত্তালাপ, তাহাদের জীবন-দর্শন, দুইই প্রশংসার অতীত। মোটামুটি মনে হয় গোর্কির শেষ কথা বলিতে এখনো অনেক বাকী। প্রশ্ন শুধু এই যে, গোর্কি এখন সমাজের যে-শ্রেণীতে চলা-ফেরা করিতেছেন, তাহার মধ্যে যে-সব চরিত্রকে তিনি খুব বেশি বুঝিতে পারিয়াছেন, সেই সব চরিত্রের আরো কোনো (বৃহত্তর) বিকাশ দেখাইতে পারিবেন কি না। শিল্পের যে-আদর্শকে অনুসরণ করিয়া গোর্কি শক্তিশালী হইয়াছেন সেই-আদর্শের অনুযায়ী আরো বেশি কিছু কি তিনি ইহাদের মধ্যে পাইবেন?

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে আমি আমার মনে এই প্রশ্নগুলি তুলিয়াছিলাম। পর বৎসর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ায় বিপ্লব আন্দোলন সুরু হয় এবং গোর্কি তাহাতে যোগ দেন। ফলে তাঁহাকে দেশান্তরবাসী হইতে হয় এবং কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার লেখায় প্রথমকার ছোট গল্পের সেই উদ্দীপনা এবং অভিনবত্ব পাওয়া যায় নাই। শুধু রুশিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহার 'বাল্য-জীবন' গ্রন্থে আবার তিনি তাঁহার সেই উচ্চতর সৃষ্টি প্রতিভার কাজ দেখাইয়াছেন যাহার কথা ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

অনুবাদক—শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়।

যুবা অশ্বারোহী

শ্রী জীবনানন্দ দাশগুপ্ত

যুবা অশ্বারোহী,
রাঙা কঙ্করের পথে কোন্ ব্যথা বহি'
ফিরিতেছ একা একা নদীতীরে—সাঁঝে!
তোমারে চিনিনা মোরা,—আমাদের মাঝে
তোমারে পাইনি খুঁজে',—দুপুরের রূঢ় কলরবে
নগরীর পথে মোরা নামিয়াছি যবে,
বন্দরের কোলাহলে— বেসাতির ফাঁদে
আধো হর্ষে—আধেক বিষাদে
বিকিকিনি করিয়াছি সুরু,
তুলিয়াছি স্থবিরের মত দুটি ভুরু,
সঙ্কোচ সংশয় ভয়ে উঠিয়াছি দহি',—
দূরে—দূরে—কে তুমি বিরহী
ফিরিয়াছ, স্বপ্নালস আঁখি
দু'টি তুলি' দিবালোকে একান্ত একাকী
ছুটিয়াছ পাথারের বালুবেলা পানে!
বনে বনে যখন অঘ্রাণে
পাতা ঝরে,—সবুজ পৃথিবী
যখন হারায়ে ফেলে শ্যাম বাস, কুসুমের নীবী,
ঝাউশাখে পাখিনীর নীড়
ভেঙে যায়,—কুয়াশার ভিড়
পথে পথে কালো হ'য়ে ওঠে,
অবেলায় নেভে আলো,—সুন্দরীর ঠোঁটে
ডালিম ফুলের রং হ'য়ে যায় নীল,—
মোরা ঘরে ফিরে যাই,—কার ঝিল্‌মিল্
মায়ার মুকুরে তুমি একা দেখ ছবি!

কালি-কলম

পৃথিবীর যত গুণী—আর যত কবি
তাহারে চেনে কি তারা ?—দিয়েছে কি ধরা
বাউলের বীণাতারে সে কখনো ?—তাহার পসরা
ধরণীর মধুকর-ডিঙাগুলি খুঁজে
পাব' মোরা কোনোদিন !—তাই চোখ বুজে
মাটির বুকের পরে মুখখানা রাখি.
আমরা ঘুমায়ে পড়ি ;—নির্জ্জন একাকী
পাথরের পথ দিয়া অশ্বারোহী কোন্
চ'লে যায়,—শুনেছি কখন
বিক্ষুব্ধ ক্ষুরের শব্দ, -দেয়ালের গায়
সুর তার বেজে ওঠে,—বিদায় জানায় ।

চিত্রবহা

শ্রী সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

—পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর—

৩৩

শৈশব-স্মৃতি

কাত্যায়নীর ব্রত ঘটা করিয়া উদ্‌যাপন করিবার জোগাড় যন্ত্র চলিতেছিল। প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে বৈদ্যনাথ আসিয়া কালি কলম কাগজ লইয়া কাত্যায়নীর সম্মুখে বসে এবং তার নির্দ্দেশমত অসীম ধৈর্য্যের সহিত আবশ্যকীয় জিনিস-পত্রের ফর্দ্দ তৈরি করে। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম্মের ব্যাপারে বৈদ্যনাথ কাত্যায়নীর ডানহাতের মত, তাহাকে না হইলে তার চলে না। এ-সব ব্যাপারে চন্দ্রবাবু অমরের মতই সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতে ভালবাসেন, উপবীতধারীর উদর পূরণ করাইয়া পুণ্যসঞ্চয়ের সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ। অবশ্য সে-সন্দেহ তিনি পত্নীর সম্মুখে ব্যক্ত করিতেন কদাচ, কারণ কাত্যায়নীর রসনা ক্ষুরধার, তাহাকে সমীহ না করিয়া উপায় ছিল না, তাই প্রয়োজনীয় অর্থ তিনি গৃহিণীর হাতে সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলেন।

ব্রত-উদ্‌যাপনের পূর্ব্বদিন সকালবেলা অমর বৈঠক-খানায় উদাসভাবে বসিয়াছিল এমন সময় বাড়ির দ্বারে একখানা সেকেণ্ডক্লাশ গাড়ি আসিয়া থামিল। গাড়ির সকল ঝিলমিলিই তোলা—একটা পাখিও খোলা নাই। তার ছাদের উপর নানা আকারের পোঁটলাপুঁটলি চুবড়ি ধামা হাঁড়ি বিছানা বাক্স পেঁটরা কচিছেলের ঢাকা প্রভৃতি এবং পিছনে সহিসের দাঁড়াইবার জায়গায় পা ঝুলাইয়া বসিয়া ছিল এক ঝি।

সেই সচল অন্ধকূপের মধ্যে কে আসিল জানিবার জন্য

অমরের ভারি কৌতূহল বোধ হইল। গাড়ির দরজা খুলিয়া প্রথমে নামিল বৈদ্যনাথ। তার পরণে কালাপাড় সিমলার মিহি ধুতি, গায়ে সার্টের উপর গলাবন্ধ লংক্লথের কোট, দড়ির মত পাকানো কোঁচানো উড়ুনি কোমরে বাঁধা, বুকের উপর সোনার মোটা ঘড়ির চেন। বৈদ্যনাথ নামিতেই তার পিছু পিছু নামিল ছোট বড় মাঝারি নানা বয়সের ছয়টি ছেলে মেয়ে। সবার পিছনে নামিল আপাদমস্তক বোম্বাই-চাদরে-ঢাকা এক স্ত্রীলোক দুই হাতের উপর মাস চারেকের এক ঘুমন্ত শিশু লইয়া।

অমর তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সুকুমারীর আগমন সে প্রত্যাশা করে নাই, তাই তাহাকে দেখিয়া সে যত আনন্দিত হইল বিস্মিত হইল তার চেয়ে কম নয়। সংবাদটা অন্দরে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। ঝি-চাকরেরা জিনিসপত্র সামলাইতে ব্যস্ত হইল, মামার বাড়ি আসিয়া শিশুরা আনন্দ-কলরব জুড়িয়া দিল এবং ইত্যবসরে লীলা কচি খোকাকে টানিয়া টিপিয়া চটকাইয়া তাহাকে তারস্বরে কাঁদাইয়া ছাড়িল। সেই কলরবের মধ্যে অমর সুকুমারী এবং তাহাদের পিতা মাতা সকলেই একত্রে কথা কহিবার চেষ্টা করায় কেহ কিছু বুঝিতে না পারিলেও এটা বেশ বুঝা গেল সকলেই খুসি হইয়াছে। গোলমালের মধ্যে বৈদ্যনাথ কখন সরিয়া পড়িল অমর দেখিতেও পাইল না।

উত্তেজনা কতকটা কমিবার পর কাত্যায়নী ভাঁড়ারে প্রবেশ করিলেন এবং অমর ও সুকুমারী দ্বারদেশে স্থির হইয়া বসিল। এ-কথা সে-কথার পর সুকুমারী অমরকে বলিল, খুব যা হোক! সেই প্রায়শ্চিত্ত করলে শেষে—দেশে ফিরে করলেই হ'ত! আমি এতদিন আসতে পারতুম!

অমর যেন আকাশ হইতে পড়িল। বলিল, কি রকম? প্রায়শ্চিত্ত কে করলে আবার?

সুকুমারী বলিল, কেন, 'ওঁরা' যে সেদিন আমার শাশুড়ীকে বল্লেন···

ইতিমধ্যে কাত্যায়নী সরিয়া আসিয়া চোখ টিপিয়া কন্যাকে থামিতে ইসারা করায় সে সহসা থামিয়া গিয়া অপ্রতিভ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অমর সমস্তই দেখিল এবং বুঝিল। সন্তানস্নেহান্ধ অল্পবুদ্ধি মাতার মিথ্যাচার সে ক্ষমা করিল—তার উপর রাগ করিতে পারিল না। বৈদ্যনাথের অসত্য আচরণের আলোচনা বা প্রতিবাদ করিয়া ভগ্নীর মনেও ক্লেশ দিবার প্রবৃত্তি তাহার হইল না। আহা! একে তার মনো-কষ্টের সীমা নাই! শৈশবের সঙ্গিনী সুকুমারী—আজ কতকাল পরে তার সঙ্গে দেখা—তর্ক-বিতর্ক করার এ ত সময় নয়! অমর তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গ তুলিয়া ভগ্নী ও মাতার কুণ্ঠা মোচন করিয়া দিল।

পরদিন ব্রত-উদ্‌যাপনের কাজকর্ম চুকিয়া মেয়েদের আহার শেষ হইতে প্রায় সন্ধ্যা হইল। তারপর তাহাদের বিদায়ের পালা, তাও এক বিষম ব্যাপার। আহারান্তে বিহারীবাবু বাড়ি ফিরিয়াছিলেন, অগত্যা অমরকেই মাধুরীকে রাখিতে যাইতে হইল। গাড়িতে যাইবার প্রস্তাব মাধুরী সমর্থন না করায় দুজনে হাঁটিয়া চলিল। রাত হইয়াছিল, গলির পথ প্রায় ফাঁকা। অমর মৌনমুখে চলিতে লাগিল—সারাদিনের উত্তেজনার পর তার মন আবার অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়াছে। নির্জ্জনতার অবকাশে তার গোপন দুঃখটা আবার তাহাকে পাইয়া বসিল।

বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া মাধুরী জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কি হয়েছে অমরবাবু?

সুপ্তোত্থিতের মত মাধুরীর মুখের পানে চাহিয়া অমর জিজ্ঞাসা করিল, কেন বলো দেখি? কি আর হবে?

মাধুরী জিজ্ঞাসা করিল, তবে আপনার মনে এত কষ্ট কেন?

শুনিয়া অমর স্তম্ভিত হইয়া গেল। ক্ষণকাল সে

কোনো উত্তর দিতে পারিল না। গ্যাসের আলো মাধুরীর করুণামণ্ডিত শ্যামল মুখের উপর পড়িয়াছিল, তাহারই পানে চাহিয়া অমর ভাবিতে লাগিল, কেমন করিয়া তার গোপন দুঃখ মাধুরীর কাছে ধরা পড়িয়া গেল? এত লোক তাহাকে প্রতিনিয়ত দেখিতেছে, কৈ, কেহই ত তাহাকে এমন প্রশ্ন করে নাই? সে কোন্ দুর্জ্ঞেয় শক্তি, যার বলে মাধুরীর দৃষ্টি তার মনের গভীর গহনে প্রবেশ করিল?

সে বলিল, কেমন করে' জানলে?

মাধুরী বলিল, বুঝতে পারি। বলবেন না আমায়?

বিহারীবাবুর বাড়ির দ্বারের কড়া নাড়িতে নাড়িতে অমর বলিল, সে অনেক কথা। একদিন তোমায় বলবো।

মাধুরীর সহানুভূতি অমরের হৃদয় স্পর্শ করিল। বাড়ি ফিরিবার পথে তার কেবলই মনে হইতে লাগিল, যে-কথা কেহ বুঝিতে পারে নাই, একমাত্র মাধুরীই তাহা বুঝিয়াছে!

অমরের ঘরের সম্মুখের বারান্দায় সুকুমারী দাঁড়াইয়াছিল। দাদাকে দেখিয়া বলিল, সারাদিনে তোমার সঙ্গে দুটো কথা কইবারও অবসর পাইনি। ছেলেগুলোর জ্বালায় কিছু কি আর করবার জো আছে? এতক্ষণে সব ঘুমুলো। তোমার ঘুম পেয়েছে না কি?

অমর বলিল, ঘুম ত রোজই আছে ভাই, তুমি ত আর রোজ থাক না। এস আমার ঘরে।

ঘরে ঢুকিয়া অমর আলোর সুইচটা টিপিয়া দিল। ভাই-বোনে পাশাপাশি একখানা সোফার উপর বসিল। বাড়ি নিস্তব্ধ। সকলে তখন ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে।

উজ্জ্বল আলোয় সুকুমারীর রক্তহীন পাণ্ডুর মুখের কৃশতা যেন বেশি করিয়া অমরের চোখে আসিয়া পড়িল। শৈশবে তার অটুট স্বাস্থ্য ও রূপলাবণ্য সকলকে মোহিত করিত, আজ তাহা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে! এ যেন সুকুমারীর প্রেতাত্মা! ভাবিয়া অমরের মন ব্যথিত হইয়া উঠিল। স্নেহসিক্ত কণ্ঠে সে বলিল, বড়ো রোগা হয়ে গেছ ভাই! শরীর কি ভালো থাকে না?

সুকুমারীর অধরপ্রান্তে একটু ম্লান হাসি দেখা দিল। তাচ্ছিল্যের স্বরে সে বলিল, ভালই ত আছি! থাকগে আমার কথা! আগে বলো শুনি বিয়ে করবে কবে? এখনো কি তার সময় হয়নি?

অমর হাসিয়া বলিল, কেন? বুড়ো হয়ে গেলুম না কি? তারপর মাথার উপর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, খোদা জানেন!

সুকুমারী বলিল, না ঠাট্টা নয়। এইবার বিয়ে করো! ক্ষণেক থামিয়া কহিল, আচ্ছা দাদা, তুমি মাধুরীকে বিয়ে করো না কেন? বেশ মেয়েটি, তার সঙ্গে আজ অনেক আলাপ করেছি। ভারি ভালো লাগলো তাকে! মাকেও বলছিলুম, তাঁর অমত হবে না!

অমর বলিল, বাবা, তুমি ত কম নও। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! বিয়ে করো বল্লেই কি বিয়ে করা যায়? তোমাদের নয় সবায়ের মত হ'ল, কিন্তু মাধুরী করবে কেন? সে ত আর কচিখুকি নয়, যে ঘাড় ধরে' যাকে বিয়ে করতে বলবে তাকেই করবে!

সুকুমারী বলিল, আচ্ছা তার মত্ করাবার ভার আমি নিচ্ছি! তা হলেই ত হবে?

অমর ত্রস্তকণ্ঠে বলিল, না না, ওসব ছেলেমানুষি কোরো না! বিয়ে করবার আমার ইচ্ছে নেই! থাকগে ওসব আলোচনা, অন্য কথা বলো।

সুকুমারী অমরের পরিচ্ছন্ন ঘরের চারিদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিল।

আলমারিতে স্তরে স্তরে ইংরেজি ও বাংলা বই—তৃষিত দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিতে দেখিয়া অমর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, পড়াশুনো চলছে কেমন?

আবার সুকুমারী একটু ম্লান হাসি হাসিল। বলিল, পড়াশুনো! সে সব অনেককাল চুকেবুকে গেছে! লেখা-পড়া করবার আর জো নেই!

অমর জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

সুকুমারী বলিল, ঝাপসা দেখি, অক্ষরগুলো যেন ভেসে ভেসে বেড়ায়।

অমর বলিল, তাহলে ত তোমার চোখ খারাপ হয়েছে!

সুকুমারী সংক্ষেপে বলিল, হ্যাঁ।

অমর জিজ্ঞাসা করিল, চশমা নাও না কেন?

সুকুমারী বলিল, 'ওঁর' মত্ নেই। বলেন, মেয়েমানুষের আবার চশমা পরা কি?

অমরের ভিতরটা যেন জ্বলিয়া উঠিল। অনেক কথাই তার কণ্ঠ ভেদ করিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইল, সেগুলা সবলে রোধ করিয়া সে কেবল বলিল, তোমার সামনে তোমার পতিনিন্দা করবার ইচ্ছে নেই, কিন্তু জিজ্ঞেস করি, এমন করে' আত্মহত্যা না করেও কি সতী সাধ্বী হওয়া যায় না?

সুকুমারী কথা কহিল না। তার দৃষ্টি যেন বহুদূরে কি অন্বেষণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। ধীরে ধীরে তার মুখখানি স্নিগ্ধ কোমল হইয়া উঠিল, অমরের পানে ফিরিয়া সে বলিল, মাষ্টারমশায়ের কথা মনে পড়ে দাদা? সেই কেমন তিনি লেপের ওপর বসিয়ে আমাদের দোলা দিতেন?

অমরের বিরস মুখ মুহূর্ত্তে আনন্দিত হইয়া উঠিল।

সোৎসাহে সে বলিল, আর সেই কেমন আমরা তাঁর কাছে আলুর দম চেয়ে খেতুম!

দুজনে হাসিয়া ফেলিল। একে একে শৈশবের অনেক কথাই তাহাদের মনে পড়িতে লাগিল। ক্রমে তারা ভুলিয়া গেল তাদের বয়স হইয়াছে, ভুলিয়া গেল যে সেদিনের পর বহুকাল উত্তীর্ণ হইয়াছে। মাতার ব্রত-উদ্‌যাপনের দিন রাত্রিকালে কলিকাতায় তড়িতালোকিত ঘরের মাঝে তারা বসিয়া আছে—সে-কথাও তাহাদের আর মনে রহিল না। কেবল মনে হইল, তারা দুটি শিশু, বৃষ্টিঝরা সন্ধ্যায় পল্লীভবনের বহির্ব্বাটীতে স্তিমিত দীপশিখার তলে বসিয়া পাঠাভ্যাস করিতেছে! আর তাদেরই পাশে বসিয়া এক সহৃদয় শিক্ষক স্নেহাপ্লুত নয়নে তাদের পানে চাহিয়া আছেন। বাহিরে বাদল বাতাসে গাছের পাতা মর্ম্মরিয়া উঠিতেছে, ভেকেরা কলরব করিতেছে, আর অন্ধকার আকাশপটে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুদ্বিকাশ হইতেছে বিমর্ষ মুখে চকিত হাসির মত!

৩৪

আঁধারে আলো

মাধুরী মনে করিয়াছিল, ম্যাট্রিকুলেসন পাশ করিয়া কলেজে পড়িবে, কিন্তু সে-আশায় বিধি বাদ সাধিলেন। কলেজে ভর্ত্তি হইবার সময়ে বিহারীবাবুর জ্বর হইল। জ্বর বিরামের সঙ্গে সঙ্গে হাঁপানির সূত্রপাত দেখিয়া ধূলিধূমের আকর কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কোনো স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিবার জন্য তাঁহাকে ডাক্তার উপদেশ দিলেন।

বিহারীবাবু বলিলেন, কিন্তু তোর কলেজে পড়ার কি হবে মা? আমি যে ভেবেছিলুম…আর কিছু তাঁর মুখ দিয়া বাহির হইল না, তিনি রুমালে চোখ মুছিলেন।

মাধুরী বলিল, ছিঃ বাবা! এতে তুমি দুঃখ্যু করো কেন? তোমার শরীরের চেয়ে কি আমার পড়া বড়ো হল! কলেজ ত আর পালাচ্ছে না, তুমি সেরে উঠলেই ভর্ত্তি হলে চলবে!

বিহারীবাবুর বুক ভাঙিয়া যাইবার উপক্রম হইল। ভালো আর তিনি হইবেন না, এ কথা তিনি নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন। আশাভঙ্গের দুঃখ কন্যার তরুণ মনে কতটা বাজিয়াছে তাহা তিনি অনুমান করিতে পারিলেন এবং সে যে তৎসত্ত্বেও হাসিমুখে তাঁর সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইল, ইহাতে তিনি মনে যতটা ক্লেশ অনুভব করিলেন সুখী হইলেন তার চেয়ে কম নয়।

সঞ্জীবের আকস্মিক অকালমৃত্যুর পর মাধুরীই একাধারে তাঁর পুত্র ও কন্যার স্থান অধিকার করিয়া বসিল। তারপর কালক্রমে মাধুরীর মাতাও

পরলোকে গমন করিলেন, তখন পিতার একক নিঃসঙ্গ জীবনে মাধুরী হইল তাঁর সহচরী সন্তান এবং বন্ধু। মাধুরীর শিক্ষা যত অগ্রসর হইতে লাগিল পিতাপুত্রীর অন্তরের যোগ ততই ঘনিষ্ঠ ও দৃঢ় হইয়া উঠিল। জাহাজ-ডুবিতে রক্ষা পাইয়া তুচ্ছ এক ভেলার উপর অকূল সাগরে ভাসমান দুটি মানুষের মত পরস্পরকে একান্তভাবে আশ্রয় করিয়া তাহাদের দিন কাটিতে লাগিল

ডাক্তার যখন বিহারীবাবুকে কলিকাতা ত্যাগ করিবার পরামর্শ দিলেন তার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই তিনি অনুভব করিতেছিলেন ইহকালের মেয়াদ আর বড় বেশি বাকী নাই। পরকাল সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, সেখানকার চিন্তা কোনোদিনই তাঁহাকে ব্যাকুল করে নাই। মরণের ভয় তাঁর আদৌ ছিল না। তবে তিনি ব্যাকুল হইলেন এই ভাবিয়া, পাছে কন্যার শিক্ষা অসমাপ্ত থাকে, পাছে সে নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারার পূর্ব্বেই কালপুরুষ তাঁহাকে জীবন-ভেলার উপর হইতে ঠেলা দিয়া মৃত্যুর অকূলে ফেলিয়া দেয়!

তাঁর আশঙ্কা ইতিমধ্যেই ফলিতে সুরু হইল দেখিয়া তিনি যারপরনাই ক্লেশ বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁর অসুস্থতা কন্যার ভবিষ্যৎ নির্ম্মূল করিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া আপনার দুর্ব্বল পীড়িত ভঙ্গুর দেহটার উপর বিরক্তির আর সীমা রহিল না—তাঁর সমস্ত মন তিক্ত বিরস হইয়া উঠিল। অন্তরে আশাভঙ্গজনিত ভাষাহীন দুঃখের সহিত যুঝিয়া যুঝিয়া এবং বাহিরে পিতাকে আনন্দিত রাখিবার অবিরাম প্রয়াসে মাধুরীও ক্লান্ত হইয়া হাল ছাড়িয়া দিবার উপক্রম করিয়াছে, এমন সময় একদিন অমর আসিয়া উপস্থিত।

সমস্ত ব্যাপার সে শুনিল। কিন্তু তার ভাবভঙ্গীতে সমস্যাটা যে কিছুমাত্র জটিল এমনতরো কোনো আভাস পাওয়া গেল না। বরং সে ব্যাপারটা এমনি হালকাভাবে গ্রহণ করিল এবং কথাবার্ত্তায় এমন একটা আশা আর আনন্দের ঢেউ বহাইয়া দিল যে পিতাপুত্রীর মনের অন্ধকার পালাইবার পথ পাইল না।

বিহারীবাবুকে উদ্দেশ করিয়া অমর বলিল, চমৎকার জায়গা পুরী! সেখানে গেলে হপ্তাখানেকের মধ্যে আপনার হাঁপানি-টাঁপানি সব সেরে যাবে, কিছুই আর থাকবে না! এই কলকেতা শহর খালি ধুলো আর ধোঁয়া, এতে যে আমারই হাঁপ ধরে! সারাদিন গাড়ির ঘড়ঘড়ানি, মোটরের ভোঁ-ভোঁ, ফিরিওলার বিকট বেয়াড়া চীৎকার, এতে কোন্ ভদ্রলোকের হাঁপ ধরবেনা বলুন! সেখানে যাবেন, সকাল-সন্ধ্যে সমুদ্রের নোনা হাওয়া খাবেন, দেখতে দেখতে শরীর শুধরে যাবে! অসুখ সেখানে টেঁকতেই পারে না! আর ক্ষিদে, উঃ ক্ষিদেয় সেখানে চোখে কানে দেখতে পাবেন না!

বিহারীবাবু সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেখানে গেছলে বুঝি?

অমর বলিল, কক্ষনো না।

বিহারীবাবু হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। মাধুরীও হাসিতে লাগিল। বিহারীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন তবে এত খবর জানলে কি করে'?

অমর বলিল, লোকমুখে। লোক ত ওখান থেকে হামেসা যাওয়া-আসা করছে, সবাই বলে, কাছাকাছি অমন জায়গা মেলা দায়! মাধুরীর পানে ফিরিয়া বলিল, মাধুরীরই মুস্কিল! আমিও ত আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছি কি না! দিনকয়েক থেকে সব গুছিয়ে গাছিয়ে দিয়ে আসব'খন। এখন থেকে কিন্তু বলে' রাখছি, আহারে আমার বিশেষ আশক্তি, ভালো জিনিস খেতে আমি ভাবি ভালোবাসি! রেঁধে খাওয়াতে পারবে ত মাধুরী? অবশ্য আমি সাহায্য করবো, যদিও বলে' রাখা ভালো আজ পর্য্যন্ত কক্ষনো দুখানা আলুও ভাজতে পারিনি! বিহারীবাবুকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, কবে যাওয়া হবে? আসুন, একটা দিন স্থির করে' ফেলা যাক! দাও ত পাঁজিখানা মাধুরী!

মাধুরী পাঁজি আনিয়া অমরের হাতে দিল।

বিহারীবাবু বলিলেন, ভাবছি সামনের মঙ্গলবার বেরিয়ে পড়বো। কি বলো?

অমর পাঁজির পাতা উলটাইতে উলটাইতে বলিল, বেশ ত! আমাদের সব দিনই শুভদিন! যেদিন আপনার সুবিধে সেই দিনই যাওয়া যাবে।

মাধুরীর পানে ফিরিয়া বলিল, কিন্তু সঙ্গে প্রচুর লুচি আর বেগুনভাজা নিতে হবে, ট্রেনের ঝাঁকানি লাগলেই আমার পেটে আগুন জলে' ওঠে, সে এক বিষম ব্যাপার! পাঁজি দেখিতে দেখিতে বলিল, ইস্, সেদিন আবার বার্ত্তাকু-ভক্ষণ নিষেধ লিখচে! লিখুক গে, ও-নিষেধ আমরা মানবো না, কি বলো? কারণ আজকালকার বেগুন চমৎকার, তা খেলে যদি পাপ হয় ত হোক! পেটে খেলে পিঠে সয়, বলিয়া পাঁজিখানা মুড়িয়া ফেলিয়া অমর হাসিতে লাগিল।

মাধুরী হাসি টিপিয়া বলিল, বেগুনভাজা ত হল, আর কি কি দরকার হবে বলুন।

অমর বলিল, নাঃ, বেশি হাঙ্গাম করে' কাজ নেই। গোটা কত ডিমের অমলেট—অবশ্য মুর্গীর ডিমের—হাঁসের ডিম আমার ধাতে সয় না, তাছাড়া শুনেছি ও-ডিম খেলে বাতে ধরে! তারপর, আজকাল সমস্ত সদ্‌ব্রাহ্মণই চায়ের দোকানে প্রচুর মুর্গীর ডিমের সদ্গতি করেন, যদিও তা চাইবার সময় চাপা গলায় বলেন, ছোট ডিম আছে কি?

বিহারীবাবু হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, তুমি এত খবরও রাখো!

মাধুরী জিজ্ঞাসা করিল, আর কি?

অমর বলিল, আর কি! ওতেই হবে! হ্যাঁ, মনে পড়েছে, একটা মস্ত ভুল হয়ে যাচ্ছিল, মধুরেণ সমাপয়েৎ, কিছু বাগবাজারের রসগোল্লা, সেটা আমিই সঙ্গে নেবখন!

৩৫

আবিষ্কার

পূজা আসন্ন। সকালবেলায় আকাশের নীলে আর সোনার সূর্য্যালোকে শরৎলক্ষ্মীর আঁচলখানি ঝলমল করিতেছে। সম্মুখের বাগান হইতে শিউলিফুলের মৃদু গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে দুঃখসুখের সুরে বাঁধা শরতের প্রভাত ভৈরবী রাগিণীর ম[illegible] তাহা একই কালে আনন্দ ও বেদনা দুই-ই বহন করিয়া আনে।

বন্ধুগোষ্ঠী কয়েকদিনের জন্য ভ্রমণে বার হইবে স্থির হওয়ায় অমর হাত ব্যাগ গুছাইতে বসিয়াছে। তাহাকে সাহায্য করিবার অছিলায় নিকটে দাঁড়াইয়া লীলা রীতিমত গল্প জুড়িয়া দিয়াছিল।

বন্ধুবান্ধবের চিঠিপত্র, ছবি, কবিতার খাতা, গানের বই প্রভৃতি অমরের একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি ঐ হাত-ব্যাগটির মধ্যে থাকিত। অল্পকালের ভ্রমণে উহা তার নিত্য-সহচর ছিল।

জিনিসপত্র একে একে বার করিবার সময় অমর নিজের একখানি ফটো খুঁজিয়া পাইল না। ছবিখানি চমৎকার উঠিয়াছিল বলিয়া আত্মীয়-বন্ধুদের দিতে দিতে সব ক'খানি শেষ হইয়া অবশিষ্ট ছিল মাত্র একখানি, তা ও অদর্শন হইয়াছে।

নিশ্চয়ই ভুলিয়া অন্য কোথাও রাখিয়াছে ভাবিয়া অমর বারবার সমস্ত জিনিস উলটিয়া পালটিয়া খাতাপত্র খুলিয়া ছড়াইয়া টেবিলের দেরাজ বইয়ের আলমারি হাটকাইয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও কোথাও যখন ফটোখানি দেখিতে পাইল না, তখন লীলার হুঁস হইল, দাদার কিছু একটা হারাইয়াছে। তখন বাক্যস্রোত থামাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, কি খুঁজছ দাদা? কিছু কি হারিয়েছে?

অমর বলিল, ছাখ্, সেই যে আমার একখানা ফটো ছিল, ক'মাস আগে তুলিয়েছিলুম, সেখানা খুঁজে পাচ্ছি না। দেখেছিস কোথাও?

লীলা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কিছুকাল স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল। তারপর সহসা বলিয়া উঠিল, ও! হ্যাঁ! মনে পড়েছে! সে-ছবি যে আমি মাধুরীদি'কে দিয়েছিলুম! তিনি ত আর ফেরত দেন নি!

অমর অবাক হইয়া গেল। বলিল, মাধুরীদি'কে দিতে গেলি কেন?

লীলা গড়গড় করিয়া বলিতে লাগিল, আমি তাঁর কাছে বলেছিলুম কি না—তুমি একটা চমৎকার ছবি তুলিয়েছ—তাই তিনি বল্লেন, আমায় দেখতে দিস ত একবার—তাই দিয়েছিলুম। তারপর তিনিও ফেরত দেননি—আমারও চাইতে মনে নেই, একদম ভুলে গেছি!

অমর মুখে কিছু বলিল না, কিন্তু তার যাত্রার আয়োজনে বাধা পড়িল। তার মনের বনের মাঝে অকস্মাৎ কোকিল কুহরিয়া উঠিয়াছে। সেখানকার পুঞ্জীভূত বিষাদের অন্ধকার যে কোনদিন কাটিতে পারে এমন ধারণাও তার মনে কখনো উদয় হয় নাই, কিন্তু যেই জানিতে পারিল সে এক নারীর প্রেমাস্পদ, অমনি তার অন্তরের অবরুদ্ধ অনুরাগ বন্যাস্ফীতা নদীর মত উচ্ছ্বসিত আবেগে মাধুরীর প্রতি উধাও হইয়া ছুটিল। আসল কথা, বহুদিন হইতেই তার বিষাদক্ষিন্ন কাঙাল মন নারীর ভালবাসা পাইবার জন্য তৃষিত হইয়া ছিল, আজ শরতের প্রসন্ন প্রভাতে সেই আকাঙ্ক্ষার ধনকে অপ্রত্যাশিতরূপে সম্মুখে দেখিয়া সে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। চিন্তায় আত্মহারা হইয়া হাতব্যাগ গুছাইবার কথা সে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গেল।

মাধুরী তার ছবি চাহিয়া লইয়াছে এবং সেই ছবি নিজের কাছে এখনো রাখিয়াছে, এটা অনুরাগের লক্ষণ সন্দেহ নাই, কিন্তু অমরের মনে পড়িল, সে তারও চেয়ে অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছে। পুরী ছাড়িবার পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে বিহারীবাবুর সঙ্গে সে ভ্রমণে বার হইয়াছিল। মাধুরী সেদিন বাড়িতেই ছিল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বিহারীবাবু আবিষ্কার করিলেন, গায়ের কাপড় ফেলিয়া আসিয়াছেন, অগত্যা তাঁকে পথের মাঝে দাঁড় করাইয়া অমরকে ছুটিয়া বাড়ি ফিরিতে হইল। বৈঠকখানায় ত্বরিতপদে ঢুকিয়াই সে দেখিতে পাইল টেবিলের ধারে বসিয়া মাধুরী চমকিয়া উঠিয়া হাতের ফটোখানা তাড়াতাড়ি উলটাইয়া রাখিল। সে সহজ স্বরে কিছু একটা বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তার চোখমুখ দেখিয়া অমর বুঝিতে পারিল, সে কাঁদিতেছিল। পিতার পীড়াই মাধুরীর শোকের হেতু অনুমান করিয়া অমর দুঃখ অনুভব করিল, সে কহিল, বিহারীবাবুর গায়ের কাপড়খানা নিতে এলুম! ক্ষণেক থামিয়া কহিল, ওঁর জন্যে অত ভাবো কেন? উনি ত সেরে উঠছেন!

মাধুরী দাঁড়াইয়া উঠিল।

অমর বলিল, চল না বেড়াতে! তোমার ত এখন কাজকর্ম্ম নেই!

মাধুরী সংক্ষেপে বলিল, আপনি যান। আমার আজ ইচ্ছে করছে না।

অগত্যা অমর চলিয়া আসিল।

ফটোখানি কার অমর দেখিতে পায় নাই, কিন্তু ছবিখানি উল্টাইয়া রাখাতে পিছনের রংটি তার চোখে পড়িয়াছিল এবং সে-কথা তার মনেও ছিল, কারণ সেই রঙের মাউন্টই সে নিজের ছবির জন্য পছন্দ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু ফটো যে তার হইতে পারে এ-সন্দেহের ছায়াও তার মনে তখন পড়ে নাই, তাই সে ব্যাপারটা একরকম ভুলিয়াই গিয়াছিল। লীলার মুখে দৈবাৎ যে-তথ্য অবগত হইল, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না, ছবিখানি তারই নিজের এবং মাধুরীর বিলাপের হেতুও সে-ই।

অনেক দিনের অনেক কথা আজ নূতন করিয়া অমরের মনে পড়িতে লাগিল। প্রাইজের সভায় মাধুরীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হইতে সুরু করিয়া এ পর্য্যন্ত অমর তার কাছে যে সৌজন্য বন্ধুত্ব ও প্রীতির পরিচয় পাইয়াছে, সে-সম্বন্ধে সে কোনো কালেই অচেতন ছিল না, কিন্তু আজ ভাবিতে ভাবিতে বিস্মৃতপ্রায় এমন অনেক ছোটখাট ঘটনা মনে পড়িতে লাগিল, যেগুলি সেই গভীর প্রীতির নিদর্শন যার নাম প্রেম। সেগুলি আজ বিবিধ বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়া তার বিরহী মনের আঁধার কক্ষ জ্যোতির্ম্ময় করিয়া

তুলিল। খররৌদ্রতাপে জর্জ্জরিত বিশুষ্ক উষর ভূমির উপর বারিবর্ষণ হইলে তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেমন অধীর চঞ্চলতা জাগিয়া উঠে, তেমনি মাধুরীর চিন্তায় অমরের ব্যাথাতুর মনও একটি মধুর এবং মদির বিহ্বলতায় ডুবিয়া গেল। নারীহৃদয়-জয়ের যে-গৌরব সৃষ্টির আদি-কাল হইতে পুরুষের শ্রেষ্ঠ কামনার ধন হইয়া আছে সেই গৌরবে অমরের হৃদয় ভরিয়া উঠিল। করুণা, ওহানা, মাধুরী—যখন যে-নারী তার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছে তখনই সে তার কাছে পরাভব স্বীকার করিয়াছে, ইহার অন্যথা হয় নাই। করুণার পর ওহানা, ওহানার পর মাধুরী, বিশ্বের এ এক বিচিত্র লীলা—হারানো আর পাওয়ায় আলোছায়ারই মত এক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ—যেন একই জিনিসের দুই ভিন্ন রূপ।

পুরীতে একদিন অপরাহ্নে অমর ও মাধুরী বেড়াইতে বার হইয়াছিল। বিহারীবাবু সেদিন বাড়িতেই ছিলেন। বেলাভূমির উপর দিয়া গল্প করিতে করিতে তারা বহুদূর চলিয়া গেল। লক্ষ্য করিল না সূর্য্য কখন নীলাম্বর মাঝে অদর্শন হইল, কখন আকাশে একখণ্ড মেঘের উদয় হইল এবং সেই মেঘ ক্রমশ আকাশ আবৃত করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারকে গাঢ়তর করিয়া তুলিল।

সহসা বজ্রধ্বনিতে সচকিত হইয়া তারা আকাশের পানে চাহিল। দেখিল সূর্য্যাস্তকালের দীপ্ত মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে আকাশের মূর্ত্তি মসীলিপ্ত ভয়াল হইয়া উঠিয়াছে। বালুকানন ত্যাগ করিয়া ব্যস্ত বিব্রতভাবে তারা দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

বিদীর্ণ মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দানবের রক্তচক্ষুর মত ক্ষণপ্রভা ক্ষণে ক্ষণে ঝলসিতে লাগিল। আকাশের চতুঃসীমায় প্রলয়ের ডমরু বাজিয়া উঠিল, আর তারই সঙ্গে যেন তাল রাখিয়া প্রমত্ত ঝঞ্ঝা কোটিপক্ষ মেলিয়া ছুটিয়া আসিল। সমুদ্রের নীল ধূসর হইয়া উঠিল—ফেনিল জলরাশি ফুলিয়া ফাঁপিয়া দুরন্ত কেশরীর মত সগর্জ্জনে বেলাবালুকাকে বারম্বারে দংশন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে শলাকার মত প্রবল বৃষ্টিধারা জলধির বুকে আকাশের শরশয্যা রচনা করিয়া দিল। জলস্থল সমস্ত একাকার—কোনোদিকেই আর দৃষ্টি চলে না।

প্রতিদিনের পরিচিত পথটি আজ আর চিনিবার জো নাই। তারই মাঝ দিয়া তারা দুটি প্রাণী পাশাপাশি মাথা নীচু করিয়া বিরুদ্ধ প্রকৃতির সহিত যুঝিতে যুঝিতে চলিয়াছে। পথ ঠাহর করিতে না পারিয়া কতবার যে ফণীমনসার বনে পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল—কাঁটায় কাপড় ছিঁড়িল, পায়ে আঁচড় লাগিল, তার আর ঠিক নাই। চলিতে চলিতে মাধুরীর ভিজা শাড়ী অমরের ভিজা কোঁচার প্রান্তে জড়াইয়া যায়, তার হাতের চুড়ি মাঝে মাঝে অমরের কব্জিতে আসিয়া ঠেকে, দুজনের দেহে দেহে স্পর্শ হয়। উচ্ছৃঙ্খল বাতাসে ক্ষণে ক্ষণে মাধুরীর মাথার কাপড় খসিয়া পড়ে, তার ভিজা চুল অমরের মুখ ছুঁইয়া যায়। মাধুরীর লজ্জিত বিব্রত মুখের পানে চাহিয়া অমর কৌতুকের সঙ্গে দুঃখও অনুভব করিল। কহিল, ভালো বিপদেই পড়া গেল! জলে ভিজে এখন তোমার অসুখ না হলে হয়! আজ না বেরুলেই ছিল ভালো!

মাধুরী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, বেশ! আপনি বুঝি ভিজছেন না? তা ছাড়া বৃষ্টিতে ভিজতে আমার এমন ভালো লাগে! অনেকদিন পরে আজ মনের সাধে ভেজা গেল!

দুজনের জুতা ভিজিয়া ঢোল হইয়াছিল। মাধুরীর পায়ে ছিল একজোড়া পুরানো ঢিলেঢালা নাগরা, তার মধ্যে কাঁকর ও জলের অবাধ প্রবেশের ফলে তার পায়ের এমনি দুরবস্থা হইল যে সে আর চলিতে পারে না। অগত্যা তাহাকে জুতা খুলিতে হইল।

জুতা খুলিয়াই কিন্তু তার মনে হইল না খুলিলেই ছিল ভালো। সে-জুতা অমর কিছুতেই তাহাকে বহন করিতে দিল না। অনেক অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও অমরের সংকল্প যখন টলিল না তখন লজ্জায় ও দুঃখে মাধুরীর চোখে জল

আসিল। অমর হাসিয়া বলিল, তর্কে যখন তোমার জেতবার কোনো সম্ভাবনা নেই তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজে আর লাভ কি? দেরী করলে ওদিকে তোমার বাবা ব্যস্ত হবেন বৈ ত নয়! তবে যদি ভাবো স্ত্রীলোকের জুতো পুরুষে হাতে করে' নিলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় তাহলে না হয় বাড়ি ফিরে এই মহৎ পাপের একটা প্রায়শ্চিত্তই করে' ফেলো।

মাধুরী তর্কে বরাবরই অমরের কাছে হার মানিয়াছে, আজও তার অন্যথা হইল না। ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে সে বলিল, না মহাভারত অশুদ্ধ হবে কেন? তবুও... আপনি...আমার জুতো...

অমর বলিল, হ্যাঁ তোমার জুতো বলেই নিচ্ছি.. রাস্তার লোকের হলে নিতুম না নিশ্চয়।

মাধুরী মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, কি যে বলেন!

স্বাভাবিক সৌজন্যবশতই না ভাবিয়া চিন্তিয়া অমর যে-কথা সেদিন মাধুরীকে বলিয়াছিল, আজ তার হৃদয়ের গোপন কথাটির সন্ধান পাইবার পর তার অনুমান করা কষ্টকর হইল না, সে-কথা মাধুরীর কানে কোন্ সুরে বাজিয়াছিল। আজ অমরের মনে সেই সন্ধ্যার সুখস্মৃতিটি অনুরাগের রঞ্জনে মনোরম হইয়া জাগিয়া উঠিল। সেদিন মাধুরীর একান্ত সাহচর্য্য ও সান্নিধ্যে সে যে সুখী হয় নাই তা নয়, কিন্তু আজ সেই অতীত ঘটনা স্মরণ করিয়া তার মনে যে পুলকসঞ্চার হইল তা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। বর্ষণবিক্ষুব্ধ জনহীন অন্ধকার পথে অশান্ত প্রকৃতির প্রতিকূলতায় চলার সময় মাধুরীর বচন ও স্পর্শনের স্মৃতিগুলি আজ নূতন রূপে তার মনে দেখা দিল। কারণ, সেদিন মাধুরী ছিল বান্ধবী, স্নেহের পাত্রী, আজ সে হইয়াছে ঈপ্সিতা প্রেয়সী নারী।

আর একদিনের কথা। সেদিনও দুজনে ভ্রমণে বার হইয়াছিল। অমরের মনটা ভালো ছিল না, বিশেষ যে কোনো কারণ ছিল তা নয়, মাঝে মাঝে অকারণে যেমন আমরা বিষণ্ণ উদাস হইয়া পড়ি তেমনি আর কি।

তাহাকে অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখিয়া মাধুরী জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাবছেন?

অমর বলিল, কিছু না।

মাধুরী বলিল, আচ্ছা দেখুন, কলকেতা থাকতে একদিন আমায় বলেছিলেন, আপনার মনে যে-দুঃখ আছে তার কারণটা আমায় একদিন বলবেন। মনে আছে বোধ হয়?

অমর বলিল, কবে বলো দেখি? ঠিক মনে পড়ছে না।

মাধুরী বলিল, বাঃ এর মধ্যে ভুলে গেলেন? সেই যে মা'র ব্রত-উদ্‌যাপনের রাত্তিরে আমায় যখন বাড়ি পৌঁছতে গিয়েছিলেন, তখন সেই যে পথের মাঝে আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম...

অমরের মনে পড়িল। সে বলিল, হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। আচ্ছা, আজই সেই গল্প বলবো। মস্ত কাহিনী, তোমার ধৈর্য্য থাকলে হয়।

মাধুরী বলিল, আপনি বলুন। আমি ত নিজেই শুনতে চাচ্ছি।

অমর তখন মাধুরীকে ওহানার কাহিনী শুনাইতে লাগিল। প্রকাশের পথ না পাইয়া যে-কথাটি মর্ম্মের মাঝে এতকাল শুম্ভিত হইয়া ছিল, আজ তাহা সমবেদনার তাপে গলিয়া অমরের মুখ হইতে কলগুঞ্জনা ঝর্ণাধারার মত নিঃসৃত হইয়া মাধুরীর হৃদয়ের তটমূলে কত হাসিকান্না, অনুরাগ ও অভিমান, কত বিরহ ও মিলনের ঢেউ তুলিয়া তাহাকে একান্ত অভিভূত করিয়া ফেলিল। কালের কুহেলিকার অন্তরালে যে-সব ঘটনা অস্পষ্ট আবছায়াঘেরা হইয়া উঠিয়াছিল অমরের প্রদীপ্ত কল্পনা আর ভাষার ঐশ্বর্য্য সেগুলির মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া দিল। তখন তুচ্ছ আর তুচ্ছ রহিল না এবং সাধারণ আপন সীমা লঙ্ঘন করিয়া অনির্ব্বচনীয় হইয়া উঠিল। বল্গাছেঁড়া ঘোড়া মুক্তির

আস্বাদে পাগল হইয়া যেমন ছুটিয়া চলে, অমরও তেমনি মনোভার নামাইবার সুযোগ পাইয়া কথার নেশায় একেবারে মশগুল হইয়া উঠিল। স্থানকালপাত্রের কথা তার মনেই রহিল না।

বহুক্ষণ পরে সে যখন চুপ করিল তখন মাধুরী সজল চোখে তার দীপ্ত মুখশ্রীর পানে অভিভূতের মত চাহিয়া রহিল, শোকার্ত্ত বন্ধুকে সান্ত্বনা দিবার মত একটা কথাও খুঁজিয়া পাইল না।

অমর কতকটা আপনমনে বলিতে লাগিল, ভালবাসলে দুঃখ পেতেই হয়! তবুও, আমার সৌভাগ্য, আমি ভালবাসার প্রতিদান পেয়েছি। কিন্তু যারা ভালবাসে অথচ কোনো প্রতিদান পায় না, হয় ত যাকে ভালবাসে তার কাছে যাবার সুযোগ পর্যন্ত পায় না, কিম্বা হয় ত তার পাশে পাশে থেকেও তার মনের নাগাল পায় না, তাদের না জানি কত দুঃখ!

মাধুরীর পানে ফিরিয়া বলিল, যাক, আজ তোমাকে সব কথা বলে' মন অনেকটা হাল্‌কা হল। এতদিন বলবার লোক পাইনি! তুমি আমার মনের দুঃখ নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে!

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে হঠাৎ প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, তুমি কখনো ভালবাসায় পড়েছ?

প্রশ্ন শুনিয়া মাধুরী চমকিয়া উঠিল। নিমেষে তার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। কিছু একটা অন্যায় কাজ করিয়া যেন ধরা পড়িয়াছে, এমনি ভাব। সে আমতা-আমতা করিয়া বলিল, আমি...আমি...তা ত আমি জানি না।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এইবার উঠুন, সন্ধ্যে হয়ে এল। বাবা অনেকক্ষণ একলা রয়েছেন।

অমর নীরবে মাধুরীর অনুসরণ করিয়া চলিল। তার প্রশ্নে এমন কি ছিল যাহাতে মাধুরী অমন বিচলিত হইল তাহা অনেক ভাবিয়াও সে বুঝিতে পারিল না।

হঠাৎ তার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া লীলা চীৎকার করিয়া উঠিল, দাদা! অ দাদা! শুনতে পাচ্ছ না? অনাদিবাবু যে তোমায় ডাকছেন!

—ক্রমশ

ঝর্ণা

শ্রী শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

আমাব বুকেব পাষাণ টুটি ঝর্ণা তুমি এলে নামি,
তোমার ধাবায় গাহন কবি তাই ত প্রিয়ে, দিবস-যামী।
বাসনা মোব ছিল যত
জীবন ভরে স্তব বাঁধিল কঠিন শিলায় লক্ষ শত,
উদাস হাওয়াব গানগুলি তার অচল চূড়ায হয় প্রহত।
বেদনা মোর বোদন-ধারায় গোপন তলে বয় না থামি'
ঝর্ণা রূপে তাইত প্রিয়ে, এলে নামি।

তুমি আমাব অন্ধকাবের বক্ষ-চোঁয়া রসের ধাবা,
মুক্তি-বেগের গতি-লীলায় আলোকে আজ হলে হারা।
ছেয়ে আমার প্রাণের সীমা
তোমার মধুর পরশ পেয়ে ফটলো ধরার শ্যামলিমা ;
তোমার কান্নার ছায়ায় ভাসে সীমাহীনের ঐ নীলিমা।
তৃপ্তি আমার নেচে নেচে তোমার ঢেউয়ে দেয়গো সাড়া,
আমার বুকের প্রিয়ে তুমি রসের ধারা।

কোন্ অতীতের স্বপ্ন তুমি,—মূর্ত্তিময়ী চঞ্চলতা,
থম্‌কে বসার মোহে আমার জাগিয়ে দিলে চলার কথা।
বহুদূরের সাগর সাথে
আমায় তুমি মিলিয়ে দিলে কূল-হারাবার মূর্চ্ছনাতে।
কোন্ ওপারের উধাও পাখী যায় ব'সে মোর মন্-শিলাতে।
স্তব্ধ বুকের গহন মাঝে বাজেরে কোন্ স্মৃতিব ব্যথা।
প্রিয়ে, তুমি আমার চির-চঞ্চলতা।

তুমি আমার অশ্রু প্রেমের—অশ্রুত কোন্ গানের ধ্বনি,
তৃষিত মোর মিলন-নেশা তোমার ভাষায় উঠছে রণি !
তুমি আমার শেষের আশা,—
তটে তোমার ঘরের মায়া,—বক্ষে তোমার সর্ব্বনাশা।
তোমায় ধরে রাখতে নারে তাই এ কঠিন রূপের বাসা।
তুমি যে মোর ভাবের বধূ—সৃষ্টি-ছাড়া পথের মণি,
আমার প্রাণের অশ্রুত কোন্ গানের ধ্বনি।

পত্র

নামী, নাম এবং ছদ্মনাম

কল্যাণীয়াসু,

আমাদের দেশে একটা মতবাদ প্রচলিত আছে যে নামীর চেয়ে নাম বড়। শুন্‌লেই কেমন খটকা লাগে না? তর্ক করার প্রবৃত্তি সজাগ হ'য়ে বল্‌তে চায়, সেকি? তাই কি আবার হ'তে পারে নাকি?

কিন্তু বাস্তব জীবনে, শুনলে আশ্চর্য্য হবে, প্রায়ই তাই হয়!

কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের দুটো কবিতা আছে। "ইয়ারো অন্‌ভিজিটেড্", "ইয়ারো ভিজিটেড।"

প্রথমটায় তাঁর কল্পনার ইয়ারো, শেষেরটায় দেখার পর বাস্তব ইয়ারো।

ইয়ারো দেখে কবি আক্ষেপ করেছেন; তাঁর কল্পনার ইয়ারোটাই যে ছিল ভাল!

যা' পাওয়া যায় না, তাকে কল্পনা দিয়ে উপলব্ধি করার একটা শক্তি সব মানুষের ভিতর কম বেশী পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়।

একেই বোধ হয়, ইংরিজিতে ইন্‌টেলেক্ট দিয়ে পাওয়া বলা হয়।

এতে ইন্দ্রিয়গুলোর অতৃপ্তি হয় তো থাকে কিন্তু বুদ্ধির ভেতর দিয়ে পাওয়ার তৃপ্তি এবং আরাম থাকে। কবিরা এমনি ক'রে পেতে ভালবাসেন, নইলে ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থ কেনই বা এমন দুঃখ করেন?

আমরা তো জানি যে কল্পনা বাস্তবের চেয়ে অনেক বেশী উঁচুতে উঠতে পারে। বাস্তব পৃথিবীতে এখনো উনত্রিশ হাজার ফুটের চেয়ে উঁচু পর্ব্বত জানা নেই; কিন্তু কল্পনা দিয়ে মানুষ চাঁদের মধ্যে তার চেয়ে অনেক উঁচু পাহাড় সহজেই মনে করে নিতে পারে।

কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে, কল্পনা নিয়ে তুষ্ট থাকার নিবৃত্তি সাধারণের মধ্যে বিরল। পাওয়ার

লোভ বাস্তবকেই বড় ক'রে দেয়। এই পাবার লোভকে মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতরা আকাঙ্খা নামে অভিহিত করেছেন।

আকাঙ্খা নিবৃত্তি নয়, প্রবৃত্তি; সকল চেষ্টার মূলে প্রবৃত্তি নিহিত থাকে; এমন কথাই বিজ্ঞান বলে।

এদিকে 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা' কে মহাপ্রভু নিন্দা করেছেন; গীতা ব'লেছেন, মা ফলেষু কদাচন।

সাধারণের কাছে এ গুলো সমস্যার মত কঠিন।

গীতার অনেক ভাষ্য। বিবেকানন্দ বলেন, ফলের জন্য অতিব্যগ্রতায় মানুষকে কর্ম্মহীনতার ভূমিতে নিয়ে গিয়ে নিশ্চেষ্ট করে আলস্যের পাপে নিমজ্জিত করে। তাই তাঁর উপদেশ—ফল তো ফলবেই, ব্যাকুলতা ত্যাগ কর; ফল ফলতে সময় লাগে, তুমি কাজ করে চল।

ফলকে তিনি অস্বীকার করলেন না।

এখন সাহিত্যের প্রসঙ্গে আসা যাক্।

লেখক কোনই ফল কামনা না ক'রে লেখেন, বোধ হয় জোর করে একথা কেউ বল্‌বে না।

সুধীরা বলেন যে, মহাপুরুষের মনেও দুর্ব্বলতা থাকে, আর সেটা যশের কামনা।

কেউ বলেন, আনন্দের জন্য লিখি; কেউ বলেন, লোক শিক্ষার জন্য; কেউ বা যশের জন্য, আবার কেউ হয় তো অমরত্ব লাভের কামনায় কলম ধরেন।

টাকার জন্য লিখি, এ কথা বলার সময় এখনো আসেনি বোধ করি আমাদের দেশে।

বিনা উদ্দেশ্যে কাজ হয় না; বিশেষ করে লেখা!

সুখ-দুঃখ, সংগ্রাম-সম্ভোগের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে লেখক জীবনে কত অভিনব সত্যের সাক্ষাৎ লাভ করেন! একলা ভোগ করে যখন আর তৃপ্তি হয় না; তখন উত্তর পুরুষের কথা মনে আসে। তখন বণ্টনের পালা।

এই যে ত্যাগের সঙ্গে ভোগ, এই ইচ্ছাই শুনেছি সাহিত্যের জননী।

সাহিত্য "সহিতে"র রূপান্তর।

লেখকদের মধ্যে নানা মুনি, তাঁদের নানা মত।

কারুর মধ্যে সত্যই বড় আমি ছোট। আবার কোথাও আমি সত্যের উপর। কেউ সত্যকেই চান, নাম চান না; তখন নামহীন লেখা কি বেনাম কি ছদ্মনামের লেখা দেখতে পাই।

কোথাও বা নামী লেখার অন্তরালে থেকে লেখার সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখে—নাম নিয়ে বার হন

বেনাম কি ছদ্মনামের উল্টো পিঠের ব্যাপারটা বোধ হয় আত্মজীবনচরিত লেখার সময় এসে দাঁড়ায়।

দেখতে পাওয়া যায় হয়তো যিনি একদিন বেনাম কি ছদ্মনামে লিখেছিলেন, তিনিই আবার বয়স, প্রতিষ্ঠা, যশ মানের সঙ্গে বেড়ে উঠে আত্ম-জীবনী লিখে গেলেন।

নামী সত্যের পতাকার অন্তরালে সংগ্রাম ক'রে যে নাম অর্জ্জন করলেন, তখন আবার সেই নামের ছাপে সত্য বাজারে এসে হাজির!

এখানে নামীর চেয়ে নাম বড় হয় না?

প্রায় সকল দেশের সাহিত্যে ছদ্মনামের প্রচলন আছে। কিন্তু স্থল ভেদে তার কারণেরও বিভিন্নতা দেখা যায়।

ঠাণ্ডা লাগলেও খোকার জ্বর হয়, আবার বদ্‌হজমেও জ্বর হয়। এক জ্বর নানা কারণেই হ'তে পারে।

আমাদের সাহিত্যে ছদ্মনামের প্রচলন ক্রমেই যেন বাড়চে। বঙ্কিমের যুগে ঠিক এতখানি বোধ করি ছিল না; তবে বিশেষ বিশেষ লেখায়, লেখার তাৎপর্য্য অনুসারে তিনি ছদ্মনামের ব্যবহার করতেন।

সেই সময়ে, কি কিছু পরে পঞ্চানন্দের উৎপাত সাহিত্যে ছিল। তাঁর রসিকতার সম্বন্ধে কোন তর্কই উঠতে পারে

না, তাঁর লেখার মধ্যে বিষ থাক্‌তো ; অনেক সময় রসিকতা ভাড়ামিতে নেমে আসতো।

কিছুদিন কাব্য-বিশারদ এই কাজ করেছিলেন। ব্যঙ্গে তাঁরও মুন্‌সিয়ানা ছিল।

কিন্তু এঁরা মাসিক সাহিত্যের বড় বিশেষ ধার ধারতেন না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অল্প বয়সে ভানুসিংহ নাম নিয়েছিলেন। আজও সে নাম চলছে।

শরৎচন্দ্র 'নারীর মূল্যে' অন্য নাম ব্যবহার ক'রেছিলেন।

বীরবল প্রমথ-বাবুর ছদ্মনাম।

আরো অনেক আছে।

কাউকে-কাউকে এই ছদ্মের উপর একান্ত বিরক্ত দেখি। তাঁরা মনে করেন যে, সত্য গোপনের কোন প্রয়োজন নেই, ওটা একটা জোচ্চুরির সামিল।

অবশ্য ও কথা স্বীকার করতে হলে কলম ছেড়ে আমাদের অন্য কাজে বেরিয়ে যেতে হয়।

একজন মহিলা সেদিন বলছিলেন, ওটা অধর্ম।

কিন্তু সাহিত্যে যখন ওর অত প্রসার, নামজাদা লেখকদের অনেকেরই একটি করে ছদ্মনাম আছে—তখন একটু ক্ষমা ঘেন্না করে চল্‌তে হবে।

কিছুকাল আগেকার একটা বড় মজার কথা এই সম্পর্কে মনে পড়ে গেল।

সেটা সমাজপতি-সাহিত্যের যুগ।

'সাহিত্য' কাগজখানির পিছনের ক'য়েক পাতায় মাসিক সাহিত্যের জন্‌মোনিয়ান্‌ সমালোচনা থাক্‌তো।

সমাজপতি সুখ্যাতি করলে তাকে আকাশে তুল্‌তেন, আর নিন্দা করলে তাকে জাহান্নমে পাঠাতেন। লেখকদের দুর্ভাগ্য বশে নিন্দাটাই বেশী থাক্‌তো।

তাই বিশেষ করে নূতন লেখকেরা নবমী পূজার পাঁঠাটির মত কাঁপতে কাঁপতে ঐ লাইন গুলো প'ড়তো।

এই কঠিন সমালোচনার ভয়ে অনেক নূতন লেখক রণে ভঙ্গ দিতেন।

এর উপায় বোধকরি, রবীন্দ্রনাথের মাথা থেকে প্রথম বার হ'লো।

'ভারতী' আর 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনের সময় তিনি লেখার উপর কি নীচে থেকে লেখকদের নাম তুলে দিয়ে—কাগজের প্রচ্ছদে লিখে দিতেন, এই সংখ্যার লেখক অমুক-অমুক।

বছরের শেষে কে কি লিখেছেন তা' সূচিপত্র থেকে জানা যেতো।

এর ফল ভালই দাঁড়িয়েছিল। ছিদ্রান্বেষণ ক'রে তীব্র সমালোচনা বার করা মুস্কিল হ'তো।

মনে পড়ে, এই সময় অনেক অজ্ঞাত নূতন লেখক সমাজপতির সুখ্যাতি লাভ করতে পেরেছিলেন।

সমালোচনা তীব্র হ'লেও লেখক অন্তরাল থেকে সাবধান হবার সুযোগ পেতেন।

সম্পাদক তাঁদের এমনি ক'রে রক্ষা করাতে অনেকেই তাঁর কাছে এখনো কৃতজ্ঞ।

আমাদের এই অসংযত সমালোচনার দিনে সম্পাদকেরা এই পথ অবলম্বন করলে বোধহয় ভাল হয়।

লেখার উৎকর্ষতাই তার উচিত মূল্য হোক্‌ ; লেখকের নামের ছাপ নাই বা থাক্‌লো ?

বিশেষ করে নূতনপন্থী কাগজের সম্পাদকগণ, যাঁরা নূতন লেখকদের উৎসাহ দিতে চান, তাঁদের এ কথা ভেবে দেখলে ক্ষতি কি ?

১০ই পৌষ, ১৩৩৪। মণিবজ্র ভারতী

ব্যবধান

শ্রী প্রমথনাথ বিশী

তুমি যদি হও আকাশ-কুসুম, কঠিন বোঁটার বাঁধন ভুলি'
আমি হই তবে অস্তমেঘের ক্লান্ত করুণ পাঁপড়ি গুলি!
মাঝারে থাকে না কোনো ব্যবধান, বুকে বুকে সুখে লাগিয়া থাকি
তুমি হলে সখি আকাশ-কুসুম, পাঁপড়ি হইয়া তোমায় ঢাকি।
আমি যদি হই ঝড়ের মুখেতে আর্ত্ত আনত পালের খুঁটি,
তিমিরপুচ্ছ-তাড়িত সাগরে তুমি যদি হও মুক্তা মুঠি!
মরণে তাহলে ভয় বা কিসের—সিন্ধু দোলায় স্বয়ম্বর!
প্রভাতবিহীন চিরদীপহীন মোদের গোপন বাসর ঘর!
এসব কিছুই হ'ল না যে সখি, তুমি হ'লে শুধু কঠিন নারী;
আমি প্রেমভীরু উদাস পুরুষ; বিধাতার এযে কেমন আড়ি!
চোখে দেখিলাম, কাছে আসিলাম, পরশ লভিতে গেলাম স'রে,
তুমি নারী আমি হ'লাম পুরুষ—একি দ্বিধা হায় জগৎ ভ'রে!

গরমিলের ঘর

* * * "নিরমল মুকুলিতার মুখচুম্বন করিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল।" * * *

—শ্রী নিরুপম রায় প্রণীত
"সাঁঝের সাথী"

নিরমল কাঁদিল কেন?—

কয়েকখানি সাহিত্য পত্রিকা ঐ উদ্ধৃত অংশ সম্বন্ধে উপযুক্ত প্রশ্ন করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। মন্তব্যগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দিনকর

—"মুকুলিতা রূপসী পঞ্চদশী। তাহার মুখচুম্বন করিয়া নিরমলের অশ্রু মোচন করিবার কোনো কারণ আমরা দেখিতে পাইলাম না। গ্রন্থকার পাঠকের সম্মুখে একটা হেঁয়ালি ধরিয়াছেন।"

নারীরঞ্জিকা

—"ইহা অসম্ভব নহে যে, মুকুলিতা নিরমলের গালে একটি চড় বসাইয়া দিয়াছিল। গ্রন্থকার তাহা গোপন রাখিয়া পুরুষ-প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন।"

প্রভাতবাবুর গল্প

উর্ম্মি

—"নিরমলের উদ্গত অশ্রু হর্ষজনিত। অতি আনন্দে ক্রন্দন অনিবার্য্য হইয়া ওঠে।"

সেবক

—"নিরমল কাঁদিল চুম্বনের প্রতিদান না পাইয়া। তৃতীয় এক ব্যক্তি আসিয়া পড়িয়াছিল কি ?"

কনক

—"আমাদের মনে হয়, নিরমলের এই প্রথম চুম্বন। এতদিন বৃথা কাটিয়াছে এই আক্ষেপেই নিরমলের চক্ষে জল আসিয়াছিল। অসম্ভব নয়।"

জাগরণ

—"একটি চুম্বনে নিরমলের তৃপ্তি হয় নাই। নিরমল কাঁদিল অতৃপ্ত লালসার পীড়নে।"

দেশ ও দশ

—"নিরমল ভীরু প্রকৃতির লোক। প্রথম চুম্বনটির সময় তার দিগ্বিদিক্ জ্ঞান ছিল না। কিন্তু মুকুলিতার উন্মুখ অধরের দিকে চাহিয়াও দ্বিতীয়বারের জন্য সাহস সঞ্চয় করিতে না পারিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।"

কামিনী

—"বাবাকে বলে দেব বলে মুকুলিতা ভয় দেখিয়েছিল কি ?"

প্রবাহিনী

—"নিরমল কাঁদ্‌লে কেন তা' আমরা জানি।—দুনিয়ায় ঐ একটি মুকুলে ধরা পূর্ণ নয় কেন ?...তা' হলেই ত' এই শুক্‌নো ধরা চুম্বনের অমৃতরসে সিঞ্চিত হ'য়ে বাসোপযোগী হতো।"

স্পষ্টভাষী

—"নিরমল কাঁদিল মুকুলিতার মুখের ঝাঁঝে ; মুকুলিতা কাঁচা পেঁয়াজ চিবাইয়া আসিয়াছিল।"

গল্প ও গান

—"নিরমল কাঁদ্‌লে চুমুর শেষ ফল ভেবে। সংসার বড় কঠোর স্থান ; চুম্বন তার মর্ম্মের বাণী নয়। চুম্বনে চির-কিশোর পৃথিবীর কেন্দ্রগত মহানন্দধ্বনি শিরায় শিরায় অনুরণিত হলেও সে সুখ বড় ক্ষণস্থায়ী ; বিবাহের পরই "পুত্র কন্যা আসে যেন প্রবল বন্যা।"

শিল্প ও কলা

-নিরমল ভেবেছিল, মুকুলিতার গালের রং বুঝি পাকা ; নয় দেখে সে কেঁদে ফেল্‌লে

সঙ্কলক—জুনিয়ার্ জলধর

প্রভাতবাবুর গল্প

শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু গত ভাদ্র মাসের 'কল্লোল' পত্রিকায় একটি সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কোন্ কোন্ লেখকের গল্প সাহিত্য-ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব লাভ করিবে তাহার একটি ফর্দ্দ দিয়া তিনি এই সংশয়ব্যঞ্জক উক্তি করিয়াছেন যে, প্রভাতবাবুর গল্পগুলি "কালের নিকষমণিতে কতদিন পর্য্যন্ত টিঁকিতে পারিবে তাহা অনুমান করা শক্ত।" তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, সেগুলি "সুখপাঠ্য।"

গল্প লেখকদের মধ্যে "প্রভাত মুখুজ্জে"ই যখন সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, এখনকার মত তখনকার লোকে গল্পের আর্ট বুঝিতেন না বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও তাঁহারা রসাস্বাদনে কম পটু ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। এমন অনেক লোক এখনো আছেন, অবশ্য তরুণ গণের মধ্যে, যাঁহারা প্রভাতবাবুর গল্প পড়িতে ভাল বাসেন। আধুনিক গল্প লেখকগণের লেখা লইয়া যেমন

তুমুল আন্দোলন চলিতেছে, তাঁহার লেখা লইয়া তেমনটি কখনো হয় নাই; রুচিবাগীশ কি কোনো বাগীশ শঙ্কিত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার গল্পের রুচি বা আর্টের উদ্দেশে গদাচালনা করেন নাই।

আর্ট বলিতে আজকাল যাহা বুঝাইতেছে, প্রভাতবাবুর গল্পে পরিপূর্ণ মাত্রায় তাহা আছে কি না তাহার বিচার করিতে না বসিয়াও যে-কেহ নির্ব্বিঘ্নে বলিতে পারেন যে, তাঁহার গল্পগুলিতে যে শান্তশ্রী এবং সরসতা আছে তাহা চিরকাল রসগ্রাহীর উপভোগ্য হইয়া থাকিবে। আজকালকার গল্পে ভাষার এবং ভাবের উগ্রতা অনর্থক এত বেশী থাকে যে, শুধু অকৃত্রিম শান্ত আত্মবিনোদন তাহাদের দ্বারা সম্ভব নয়। আধুনিক যুগের অনেক লোক আত্মবিনোদনের প্রবল তৃষ্ণা লইয়া ঘুরিতেছেন; তাঁহারা প্রভাতবাবুকে ভুলিতে পারিবেন না; পরবর্ত্তী যুগেও তেমন লোকের যাতায়াত সমাপ্ত হইয়া যাইবে না; তাঁহারাও প্রভাতবাবুকে চাহিবেন। শুধু অহেতুকী উগ্রতায় তৃপ্ত হইবে না এমন মানুষ চিরকাল থাকিবে।—

গভীর উদ্দেশ্য লইয়া, নিজেকে বিশ্বসাহিত্যের সহিত সংশ্লিষ্ট মনে করিয়া কিংবা কোনো অন্তরগত কি ব্যবহারগত সমস্যা লইয়া তিনি অকুতোভয়ে গল্প লেখেন নাই; মানুষের স্বাভাবিক আত্মস্থ অবস্থাটা যাহা চায় তাহাই তিনি তার মনের পাত্র পূর্ণ করিয়া দিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। বিশ্বসাহিত্য হইতে দান গ্রহণের সার্থকতা আছে; কিন্তু তাহার ভাণ্ডারে দান করিতেছি মনে করিয়া লেখনী চালনার কোনো সার্থকতা নাই। বিশ্বসাহিত্য অন্ধ নহে; যেখানকার যে-সৃষ্টি তাহার অংশ সে তাহাকে নিজেই টানিয়া লইবে; দান আনিয়াছি বলিয়া তাহার দুয়ারে দাঁড়াইবার দরকার নাই।—

নরনারীর যৌনসমস্যা যে স্বল্পক্ষেত্রেও এত জটিল এবং পাত্রপাত্রীর দৈহিক সম্পর্ক যে এত ঘনিষ্ঠ ও বিবাহ-নিরপেক্ষ তাহা, তখনকার দিনে প্রভাতবাবু কল্পলোকে ফুটিতে দেখেন নাই, অথবা দেখিলেও দেখান আবশ্যক মনে করেন নাই। ঐ অপরাধে যদি তাঁহাকে বাংলার সাহিত্য-রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবার প্রস্তাব কেহ কখনো করেন তবে সাহিত্যের প্রতিই নিদারুণ অবিচার করা হইবে। ইহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করেন না যে, "সুখপাঠ্য" রচনা সাহিত্যে সুলভ এবং অবহেলার জিনিষ নহে।—

প্রভাতবাবুর গল্পগুলিতে অবাধ স্রোত আছে, স্বচ্ছন্দ গতি আছে, কৌতুকরসের সুরসাল ফল্গুধারা আছে, আদিতে ও সমাপ্তিতে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য আছে, তাহাদের ছন্দালঙ্কার আর সুরঝঙ্কার আছে, সেগুলি পড়িতে পড়িতে ক্লান্তি আসে না, ঔৎসুক্য পঙ্গু হইয়া পড়ে না; এবং তাঁহার মানুষগুলি অসাধারণ না হইলেও জীবন্ত। ঐগুলির একত্র সমাবেশেও যদি শিল্পপরিপুষ্টি না হইয়া থাকে এবং গল্পগুলি "কালের নিকষ মণিতে টিঁকিয়া" থাকিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া না থাকে তবে কিসের দ্বারা তাহা সম্ভব বলিতে পারি না।

বুদ্ধদেববাবু নিজে কবিতা ছাড়া গল্পও লিখিয়া থাকেন, তৎসত্ত্বেও কি কি গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া গল্প টিঁকিয়া থাকে তাহা তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই।

বসু-মহাশয়ের লেখনী অক্ষয় হোক্, কিন্তু প্রভাতবাবুর গল্পগুলিকে ভুলিবার কথা তিনি যেন আর না বলেন।

শ্রী জগদীশ গুপ্ত

পুঁথি-পত্র

বধূদাহ—শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তত্ত্ব-বিনোদ। দাম, এক টাকা।

লেখক সংসারে থাকিয়া মানুষের জীবনের যত কিছু জটিলতা দেখিয়াছেন তাহারই সূত্র ধরিয়া গল্পচ্ছলে এই বইখানি লিখিয়াছেন।

আমাদের দেশে মেয়েরা যে নানারূপে লাঞ্ছিত হইতেছেন, তাহারই বহু বিবরণ ইহাতে আছে, এবং সেই সব হইতে পরিত্রাণের উপায়ও গ্রন্থকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বইখানিকে সহজ-পাঠ্য করিবার জন্যই বোধকরি গ্রন্থকার ইহাকে উপন্যাসের ছাঁচে ঢালিয়াছেন, কিন্তু সে দিক্ দিয়া তাঁর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে না।

বঙ্কিম চিত্র—শ্রী রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী। দাম, এক টাকা ছয় আনা। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল।

বঙ্কিম-সৃষ্ট চরিত্রের তুলনামূলক সমালোচনা সামান্যই দেখিয়াছি। বঙ্কিম-চিত্রে শাস্ত্রী-মহাশয় এই চেষ্টা করিয়াছেন। নায়িকাগণের নামের অর্থ হইতে তাঁহাদের চরিত্র বিশ্লেষণের যে পদ্ধতি শাস্ত্রী-মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সুন্দর হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র সমাজের পক্ষে যা মঙ্গল বলিয়া জানিয়াছিলেন, সাহিত্যে তার আভাস দিয়াছিলেন। এজন্য সেকালে ব্রাহ্মণপণ্ডিত-সমাজে তাঁর অখ্যাতি জন্মিয়াছিল। ক্রমে উহার পরিবর্ত্তন ঘটে। রসবস্তু শাস্ত্রানুযায়ী না হইতেও পারে। শাস্ত্রী-মহাশয় স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আসনে বসিয়া রসবস্তু হইতে "পাপের ক্ষয় ও পুণ্যের জয়ে"র ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এজন্য বঙ্কিম চিত্র পাঠে মন মাঝে মাঝে পীড়িত হয়।

প্রাচীন চিত্র—শ্রী রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী। দাম, দশ আনা।

গ্রন্থখানি তিনখানি প্রাচীন সুবিখ্যাত সংস্কৃত কাব্যের (কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, বাণভট্টের কাদম্বরী ও ভবভূতির উত্তররামচরিতম্) সমালোচনা। প্রাম দুইখানি অপেক্ষা তৃতীয়খানি বিস্তৃত ভাবে সমালোচিত। নাটক দুইখানির সমালোচনা পূর্ব্বেও দুই চারিজন করিয়াছেন, গদ্যকাব্যখানির সমালোচনা বিরল। গ্রন্থকার অভিনব পন্থা অবলম্বনে গ্রন্থবিষয়ের ভাব ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং মনে হয় তাঁর সে চেষ্টা সফলও হইয়াছে

র

বিচিত্রা
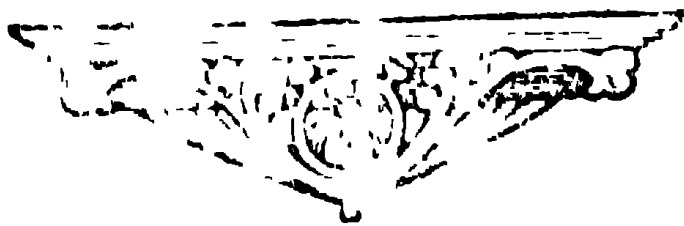
এবারের কংগ্রেস যে নানাদিক দিয়া বিশিষ্ট হইয়া উঠিবে, এই কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম। কংগ্রেসের কর্ম্ম-পদ্ধতির এবং নীতিরও পরিবর্ত্তন সম্ভব এমন সম্ভাবনার কথাও আমরা বলিয়াছিলাম। সাইমন কমিশন বর্জ্জন প্রস্তাব ত কংগ্রেসে গ্রাহ্য হইবেই, কাউন্সিল বর্জ্জন-প্রস্তাবও অনেকে সমর্থন করিবেন, এমন আশাও আমরা করিয়াছিলাম।

এবারকার কংগ্রেসের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য ভারতের তরুণ-শক্তির প্রভাব। তরুণের স্বাধীনতার তপস্যা ধীরে ধীরে ভারতবাসীর উপর যে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল তাহারই ফলে কংগ্রেসে এবারে স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

আমরা স্বাধীনতাকে পূর্ণ স্বাধীনতা বলিয়াই জানিয়া আসিয়াছি। স্বাধীনতার রহস্য যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই জানেন স্বাধীনতার পূর্ব্বে 'পূর্ণ' বিশেষণটি বাহুল্য মাত্র, স্বাধীনতা পরিপূর্ণ মুক্তির মধ্যেই আছে, আর কোথাও নাই।

যাহাই হউক এই স্বাধীনতা-প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হইয়াছে বলিয়াই কিছু আমরা রাতারাতি স্বাধীন হইয়া যাইব না, কিন্তু এই প্রস্তাব গ্রহণ দ্বারা যে আমাদের দেশের রাজনীতিকদের মতিগতি রাতারাতি বদলাইয়া যাওয়া সম্ভব—ইহাই স্বাধীনতা-প্রস্তাবের বৈশিষ্ট্য।

কংগ্রেসের সৃষ্টি হইতে এ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের রাজনীতিকরা ইংরেজবর্জ্জিত ভারতবর্ষ ত কল্পনা করিতে পারেনই নাই—এমন কি ইংরেজের দান হিসাবে ছাড়া আর কোনও সূত্রে যে রাষ্ট্রনীতিক মুক্তি সম্ভব, এ কথাও তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। ইংরেজনিরপেক্ষ হইয়া এদেশের রাজনীতিকরা এ যাবৎ চলিতে পারেন নাই। অসহযোগ ঘরে ফিরিবার আহ্বান সত্যই—তবু সেই আন্দোলনের demonstration ব্রিটিশ জাতির মনে to createan impressionএর দৈন্যেই পঙ্গু ছিল।

এই স্বাধীনতার প্রস্তাব দ্বারাই কংগ্রেসের রাজনীতিকরা ইংরেজ-নিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীনতার সংগ্রামে শক্তি সঞ্চয় করিয়া যাইবার আত্ম-বিশ্বাস ও কর্ম্ম-কুশলতা দেখাইতে পারিবেন কি না তাহা ভবিষ্যৎ জানে;—তবে স্বাধীনতা লাভই যাহাদের আদর্শ, ইংরেজের সহিত কোন রাষ্ট্রিক

সম্পর্ক না রাখাই যাহাদের আদর্শ, তাহাদের ইংরেজ-নিরপেক্ষ হইয়াই—ইংরেজের দিকে কোন ভরসা বা নির্ভরসা না রাখিয়াই, নিজের শক্তির উপরে ভরসা জাগাইয়া রাষ্ট্রীয় মুক্তির সাধনার পথে পা ফেলিতে হইবে—পা টলিলে চলিবে না

এদেশে বাংলার যুবকেরা স্বাধীনতার কথা কল্পনা করিতে পারিয়াছিল—সেই কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিতে তাহাদের বুদ্ধি-বিবেচনামত পথে তাহারা চলিয়াছিল—সেই পথের ভালমন্দের কথার বিচার এখানে থাকুক, কিন্তু ইহা সত্য যে জাতির রাষ্ট্রীয় মুক্তির আদর্শ যে স্বাধীনতা ইহা তাহারা সত্য বলিয়াই, একমাত্র সত্য বলিয়াই, জানিয়াছিল ; এই আদর্শের সঙ্গে রফা করা যে চলে না ইহাও তাহারা বুঝিয়াছিল

পরবশ্যতার গুরুভারে এদেশের রাজনীতিকরা তাহাদের সমগ্র রাজনীতিক দাবী প্রার্থনার দৈন্য দিয়াই ভারাক্রান্ত ও কদর্য্য করিয়া চলিয়াছিল—স্বাধীনতা তাহাদের কল্পনার বস্তু হয় নাই। কিন্তু বাংলার বিপ্লবপন্থীরা আত্ম-অবিশ্বাস ও সর্ব্বপ্রকার পরানুগ্রহের দুরাশা ত্যাগ করিয়া অন্ততঃ স্বাধীনতার কল্পনাও করিতে পারিয়াছিল। দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে না পারি স্বাধীনতার চেষ্টায় আত্ম-বিসর্জ্জন ত করিতে পারিব—এই কথাই তাহাদের কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিতে প্রেরণা জোগাইয়াছিল। —যাক্ সে কথা।

আজ কংগ্রেস স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। কংগ্রেসের আদর্শ হইল ইংরেজের কোন প্রকার প্রভাব বা সম্পর্কের মধ্যে না থাকিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। আজ আর স্বরাজের হেঁয়ালী নাই, এক মাসে ছ'মাসে এখানে সেখানে স্বরাজ পাওয়ার স্বপ্ন দেখার উপায় নাই,—স্বরাজ পাইয়াছি কি এখনো পাই নাই, এ সমস্যা পূরণের জন্য কোন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের আবশ্যক নাই। আজ যে স্বাধিকার আছে বলিয়া জার্ম্মান জাতি স্বাধীন—ফরাসী স্বাধীন—ভারতবর্ষ সেই স্বাধিকার লাভ করিলেই স্বাধীন হইবে

এই স্বাধিকারের পথে যাত্রা করিলে ব্রিটিশ রাজশক্তির সঙ্গে কোন্ খানে গিয়া দেখা হইবে, আঁচ্ করা শক্ত নহে।

সাইমন কমিশন উপলক্ষে রাজনীতিক্ষেত্রে মধ্যপন্থীরাও (স্বাধীনতার মাপকাঠিতে অনেকেই মধ্যপন্থী) জহরলালের স্বাধীনতা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। এই স্বাধীনতা যদি তাঁহারা কেবল মাত্র সাইমন কমিশনের জন্যই গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে তাঁহাদের এই গ্রহণের মূল্য কিছুই নাই। এই উপলক্ষে যদি তাঁহারা বুঝিয়া থাকেন যে, ইংরেজের দিকে কোন সূত্রে তাকানোই চলিবে না, সম্পূর্ণ নিজেদের শক্তি সামর্থ্যেই ইংরেজবর্জ্জিত ভারতবর্ষ গড়িয়া তুলিতে হইবে, অন্যথায় জাতীয় মান-মর্য্যাদা, জাতীয় সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি, জাতীয় জীবন—কোন পথেই সার্থকতা লাভ করিতে পারিবে না—তবেই এই প্রস্তাব গ্রহণের ফলে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা হইবে। এই স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণে to create an impression, to show united front প্রভৃতি দাস-মনোবৃত্তিসুলভ ফাঁকি আর চতুরতা যেন না দেখা দেয়। স্বাধীনতা-পথের যে তপস্যা—ঐকান্তিক নিষ্ঠা এই পথের যাত্রীদের জয়ী করে আমাদের রাজনীতিকরা জীবনে সেই তপস্যা ও নিষ্ঠা আশ্রয় করিবেন—অতঃপর এই আশা আমরা করি।

হিন্দুমুসলমানমিলন সম্পর্কে কংগ্রেস সত্য কথা বলিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর আপোষ-প্রস্তাব সঙ্গত ও

স্বাধীনতার অনুকূল। আমরা বহুবার বলিয়াছি, বাজনা বাজাইবার অধিকার হিন্দুর আছে—মুসলমানেরও গরু-কাটার অধিকার আছে। তবে সেই অধিকার আছে বলিয়াই মুসলমানের কানের কাছে হিন্দু রাতদিন ঢাক পিটাইবে না,—আর মুসলমানেরও সেই অধিকার আছে বলিয়া কেবলি হিন্দুর নাকের কাছে গরু জবাই করিবে না।

প্রত্যেক স্বাধীন দেশের প্রত্যেক নাগরিকের যে অধিকার আছে, ভারতের হিন্দু এবং মুসলমানের সেই অধিকার চরমরূপে স্বীকার করিয়া নেওয়াই কংগ্রেসের কর্ত্তব্য। আজ পরাধীন ভারতে ইংরেজ যে আইনই করুক—স্বাধীন ভারতে এই নাগরিক অধিকার কেমন করিয়া স্বীকৃত হইবে তাহাই আমাদের নির্দ্দেশ করা চাই, এবং সেই নির্দ্দেশ অনুযায়ীই মানুষ পরমতসহিষ্ণুতা শিক্ষা করিবে। মানুষের রাস্তায় চলার অধিকার আছে, তাই বলিয়া মানুষ কিছু রাস্তায় ঠোকাঠুকি করিয়া মরে না—উভয়েই উভয়কে রাস্তা ছাড়িয়া দেয়। পরস্পর পরস্পরের অধিকারকে স্বীকার করিলে তবেই স্বাভাবিক ভাবে পরমতসহিষ্ণুতা দেখা দেয়। হিন্দু ও মুসলমানের অধিকারকে স্বীকার করিলেই তবে, হিন্দু মুসলমানের উপাসনায় আঘাত না করিয়া বাজনা বাজাইবে, মুসলমানও হিন্দুর মনে আঘাত না দিয়া গরু কাটিবে। মানুষের গরু কাটা ও বাজনা বাজান ছাড়াও অন্য সমস্যা আছে।

তারপর মিশ্র-নির্ব্বাচন ও স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্ব। এই প্রস্তাবটি মন্দের ভাল হইলেও—এই প্রস্তাব স্বাধীন ভারতে স্থান পাইতে পারে না। আজ শুধু স্বাধীনতার প্রস্তাবটুকুই গৃহীত হইয়াছে, তাই এই স্বাধীনতার প্রস্তাবের প্রতিকূল প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাবও কংগ্রেসে গৃহীত হইল, কিন্তু যেদিন সত্যই ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে সেদিন এই সব সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব 'সেকেলে বাঁদরামী' বলিয়াই গণ্য হইবে।

* * *

কাউন্সিলে এসেমব্লিতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবে হিন্দু মুসলমান মিশ্রিত ভাবে। একথা বুঝি। কিন্তু সম্প্রদায় হিসাবে যে প্রতিনিধিত্ব নির্দ্দেশ করিয়া রাখা, ইহাই সমর্থন করা চলে না। বলিয়াছি স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের সঙ্গে মিশ্র-নির্ব্বাচন মন্দের ভাল, কিন্তু ইহা ভারতের জাতীয়তার বিরোধী—সুতরাং স্বাধীনভারতের বিরোধী। আজ অসম্ভব হইলেও কাল ইহা বর্জ্জন করিতেই হইবে। সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের মধ্য দিয়া অসাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বে যাওয়া সহজ হইবে কিনা, বলা শক্ত, কিন্তু একটু ব্যভিচারের ঝুঁকি লইয়াও অসাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ঘোষণা করাই সঙ্গত ছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে অর্থাৎ ইংরেজ-বর্জ্জিত হইলে, কোন কোন শ্রেণী যেমন মনে করেন তাঁহাদের ক্ষতি হইবে, এবং তাহা সত্ত্বেও যেমন আমরা স্বাধীনতাই আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছি, এবং তাঁহাদের সমূলক বা অমূলক সন্দেহ সত্ত্বেও এখনই স্বাধীনতা চাই, তেমনি কোন সম্প্রদায়ের আশঙ্কা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব না চাওয়াই সঙ্গত ছিল, তবেই অসাম্প্রদায়িক চেতনায় আজ না হইলেও কাল নিশ্চিতই প্রতিনিধিরা উদ্বুদ্ধ হইতেন। ভারতীয়ত্বের চেতনাই যদি আমাদের উদ্বুদ্ধ না করে স্বাধীনতার প্রস্তাবের ধারক বাহক আমরা নহি—বড় জোর শ্রোতাই থাকিব।

কলিকাতায় মোসলেম লীগের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় মোসলেম লীগ বসিয়াছিল—লাহোরেও মোসলেম লীগ নামে আর একটি অধিবেশন হয়। কোন্‌টায় সত্যকার মুসলেম মতিগতি প্রকাশ পাইয়াছে, বুঝিতেছি না। তাহা কার্য্যে দেখা যাইবে

কলিকাতায় মুসলেম লীগ অনেকাংশে মান্দ্রাজ

কংগ্রেসেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছে। জানি না এই প্রতিধ্বনি বাংলার মুসলমানদেরও কি না। কলিকাতার এই অধিবেশনে ভারতের নানা প্রদেশ হইতে মুসলমান নেতারা আসিয়াছিলেন, ভারত-বিখ্যাত প্রায় সবাই যোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু যোগ দেন নাই স্যার আবদার রহিম, ডাঃ সারওয়ার্দ্দী, মৌলবী ফজলুল্ হক প্রভৃতি। গজনবী সাহেব ত লাহোরেই গিয়াছিলেন। সুতরাং কমিশন বয়কট, এবং হিন্দু-মুসলমান মিলন-প্রস্তাবে বাংলার মুসলমান সমাজের কতটা সায় আছে বা নাই, বুঝিতেছি না। সমগ্র ভারত যখন ঐক্যের পথে, মুসলমান নেতারা সে-সময় লাহোরে আর একটি মুসলেম লীগ বসাইলেন। যাহাই হউক—বাংলার মুসলমানসমাজ কলিকাতার মোসলেম লীগের প্রস্তাব কার্য্যে স্বীকার করিয়া নিবেন কিনা জানিবার জন্য দেশ উৎসুক হইয়া আছে। স্যার আবদার প্রভৃতির যোগ না দেওয়ায় নানা কথাই মনে আসা স্বাভাবিক।

সাইমন কমিশন বর্জ্জন আজ আর বড় কথা নহে, আজ বড় কথা হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যপ্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা এবং স্বাধীনতার প্রস্তাব কায্যে পরিণত করিবার জন্য অসাম্প্রদায়িক জাতীয় চেতনায় সমগ্র বিচ্ছিন্ন শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া শক্তি সংগ্রহের সাধনা করা। হিন্দু মহাসভার তরফ হইতে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য জাতীয়তার ও স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন—বাংলার হিন্দুমাত্রেই এই স্বাধীনতার বাণীকে আঁকড়াইয়া ধরিবে; হিন্দুমুসলমান মিলনপ্রস্তাব স্বীকার করিবে; বাংলার মুসলমান সমাজ তাহা স্বীকার করিবে কিনা, ভবিতব্য জানেন। মোসলেম লীগে কতিপয় বাংলার মুসলমান সভ্য যোগ দিয়াছেন বটে, কিন্তু অনেকে যোগ দেন নাই, এবং দল হিসাবে তাঁহাদের শক্তি নগণ্য নহে। ইঁহারা মুসলেম লীগের প্রস্তাবের বিরোধিতা করিলে, ভারতের এই অগ্রগতির পথে তাঁহারা মুসলমান সমাজের একাংশ লইয়া বিরোধে দাঁড়াইবেন। জানি না কি হইবে, তবে ইহা জানি, স্বাধীনতার মর্য্যাদা—জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যাহারা দাঁড়াইবে, এই পথের বাধায় তাহাদের অগ্রগতি থামিবে না।

* * *

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম এবারের কংগ্রেসে যে কেবল সাইমন কমিশন বয়কট প্রস্তাবই গ্রাহ্য হইবে তাহা নহে, কাউন্সিল ত্যাগ করিয়া আসিবার প্রস্তাবও উঠিবে। কাউন্সিল ত্যাগের প্রস্তাব উঠিয়াছিল। তবে সাইমন কমিশন বয়কট ও সেই সঙ্গে স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণের পরে কাউন্সিল ও এসেমব্লি সম্পর্কে কংগ্রেসের মতামত দৃঢ় নহে, সুতরাং সুস্পষ্টও নহে।

স্বাধীনতার প্রস্তাব দ্বারা কংগ্রেস ইহাই জাতিকে নির্দ্দেশ করিতে চাহেন যে, ব্রিটিশ জাতির কাছে কিছু আশা করার নাই, জাতিকে নিজের পায়ে দাঁড়াইবার সর্ব্ববিধ শক্তি সঞ্চয় করিয়া মুক্তি অর্জ্জনের বৃহত্তর পরীক্ষার জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে।

আমাদের সর্ব্ববিধ ও সর্ব্বব্যাপী পরবশ্যতায় আহত জাতীয় আত্মমর্য্যাদা সাইমন কমিশনের মুখে এমন দীন-হীনরূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে, ঐ কমিশনকে বর্জ্জন না করিয়া অধিকতর জাতীয় দৈন্য ও লজ্জার হাত হইতে জাতিকে পরিত্রাণ করিবার আর কোনও পথই ছিল না। জাতির এই ক্ষুণ্ণ আত্মমর্য্যাদা আজ যে সাইমন কমিশনেই প্রথম তাহার স্বরূপে দেখা দিল তাহা নহে, জাতির সর্ব্ববিধ বশ্যতা ও পরমুখাপেক্ষিতা জাতীয় মর্য্যাদা বহুদিন ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। আজ জাতির একমাত্র সাধনা ইংরেজ নিরপেক্ষ হইয়া, সে দিকের সকল ভরসাকে নিঃশেষ করিয়া জাতিকে শক্তি-সাধনার পথে আগাইয়া

লইয়া যাওয়া। ভারতের রাজনীতিকদের কাছে আর কোন সহজ পথ নাই, জটিল পথও নাই।

* *
*

আমাদের রাজনীতিক নেতারা বর্ত্তমানে জাতিকে শক্তি-সন্ধান দিতে কোন্ প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন সেই হিসাব দিতে হইলে হিসাবের খাতায় অঙ্ক বসিবে না। আর কর্ম্মকুশলতার দ্বারা জাতির স্বাভাবিক নেতৃত্ব সাব্যস্ত হয়, কিন্তু আমাদের নেতাদের অনেকের তাহা নাই—এবং সেজন্য কংগ্রেস জাতিকে কোন বৃহত্তর পরীক্ষার জন্য তেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে পারিতেছে না। কংগ্রেসের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিই এখন কাউন্সিল এসেমব্লিতে যাওয়ার জন্য বহু শক্তি ব্যয় করেন, সময় ব্যয় করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাবেন যে ইহাই তাঁহাদের চরম দেশ-সেবা। কাউন্সিল বা এসেমব্লিতে যাওয়া যদি সম্ভব না হইত, তবে হয় ত তাঁহাদের কংগ্রেসের অন্য সব কার্য্য-পদ্ধতি সার্থক করিতে চেষ্টা করিতে হইত, অর্থ ব্যয়ও করিতে হইত; অন্যথায় দেশের শক্তি-বৃদ্ধির জন্য তথা যথার্থ এবং প্রয়োজনীয় দেশসেবার জন্য কিছুই করিতে পারিতেছেন না বলিয়া নিজেরা মনেও করিতেন, এবং সে-ক্ষেত্রে কর্ম্মের স্পৃহা থাকিলে কর্ম্ম করিতেন, কর্ম্মগুণে নেতৃত্ব বজায় রাখিতেন, অথবা কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িতে বাধ্য হইতেন।

* *
*

কাউন্সিলে যখন আর বিন্দুমাত্র বিশ্বাসও নাই, তখন আর ওখানে সময় নষ্ট করা কেন, বিশেষ স্বাধীনতার প্রস্তাবের পর ও-খেলা আর মানাইবে না। তারপর কাউন্সিলে গেলেও কোন রকম ক্ষতির মাত্রা কাউন্সিলাররা কমাইতে পারিবেন, ইহা সত্য নহে। জনসাধারণের চৈতন্য সম্পাদনের কথাও বাজে,—স্বাধীনতার কথা, বয়কট, হিন্দু-মুসলমান মিলন, বিলাতীবর্জ্জন লইয়াই জনসাধারণের অধিক চৈতন্য উৎপাদন সম্ভব। শুধু তাহাদের ভুল ভাঙ্গাইতে আমরা রাজ্যসুদ্ধ লোক যে রকম কাউন্সিল ব্যাপার লইয়া মাতিয়া থাকি, তারপর যে রকম ভাবে তাহারই বিবরণে কাগজের কলেবর পূর্ণ করি, তাহাতে জনসাধারণ ইহাই ভাবে, যদি কিছু কাজের জিনিষ থাকে তবে সে ঐ কাউন্সিল!

* *

তবে কংগ্রেসও স্থির করিয়াছেন যে, কাউন্সিল হইতে আসিতে হইবে এবং কাউন্সিলের 'সিট্' যাহাতে নষ্ট না হয়, তজ্জন্য সময় সময় যাইতে হইবে। আর দেশের ক্ষতিকর যে সব আইন হইবে তাহা বাধা দিতে কাউন্সিলে যাইতে হইবে। তা' ছাড়া খয়ের-খাঁ গোছের লোক গিয়া যাতে ক্ষতি না করে, তজ্জন্য 'সিট্' বজায় রাখিতে হইবে।

* *

কংগ্রেস দেশবাসীর ভাল-মন্দের জন্য দেশবাসীর প্রতিই দেশবাসীর আস্থা বৃদ্ধির বড় কথাটা এখানে স্মরণ করিতে পারেন নাই। তা' ছাড়া এ সকল যুক্তি তেমন টেকসইও নহে। প্রথম, বাংলা ও সি, পি, ছাড়া প্রায় কোন প্রদেশই মন্ত্রী-বেতনও নাকচ করিতে পারে না। দ্বিতীয়, যে প্রস্তাবে দেশের ক্ষতি হইবে, সরকার ইচ্ছা করিলে, তেমন প্রস্তাব গ্রাহ্য করাইয়া লইবার মাল-মশলা তাদের তাঁবে আছে, কংগ্রেসের পক্ষে সাধ্য নাই তাহাতে বাধা দেয়। ভোটে না পারিলে, আরো কত অস্ত্র আছে! মন্ত্রীত্ব নাকচ করিলে স্বয়ং গবর্ণর ত আছেনই। মন্ত্রীমণ্ডল বাদ দিয়া গবর্ণরের সকল বিভাগের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণে লজ্জার সম্ভাবনা নাই। ভারতবাসীকে বাদ দিয়া যাঁহারা সাইমন কমিশন বসাইতে পারেন তাঁহারা বারবার মন্ত্রীমণ্ডল নাকচ করিয়াও রাজ্য চালাইতে পারেন। তারপর, পাছে খয়ের-খাঁরা কাউন্সিলাদিতে যায়। এই ভয়ও মূল্যহীন। আমরা ত ধরিয়াই লইয়াছি, আমাদের সবটুকু বাঁচার

কলকাটি জনসাধারণের হাতেই, আর কোথাও কোন ভরসা নাই। ক্ষতি যদি কেহ করে, অন্য দিক দিয়া সেই ক্ষতিই আমাদের সম্পদের সন্ধান দিবে। পাছে খয়ের খাঁরা যায় এই জন্য যদি অন্যায় জানিয়াও কাউন্সিলে যাইতে হয়, তবে পাছে খয়ের-খাঁরা সাইমন কমিশনের কাছে (খয়ের-খাঁরা যাইবেই) যা' তা' বলে, দেশের ক্ষতিকর কথা বলে, সেই অজুহাতে সাইমন কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিতে যাওয়া ও সেখানে গিয়া খাঁটি কথা শুনাইয়া আসাও ত সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু এ-সব যুক্তি একেবারেই মূল্যহীন বলিয়া দেশবাসী মনে করে। কংগ্রেস এই সম্পর্কে শক্তি-সাধনার মর্য্যাদা, স্বাধীনতার মর্য্যাদা রাখিয়া জাতিকে তথা কংগ্রেস-কাউন্সিলারদের পথ নির্দ্দেশ করেন নাই—কিন্তু করাই উচিত ছিল।

দেশের অহিতকর প্রস্তাব কোনটা ইহা লইয়াও মতভেদ সম্ভব—স্বপ্রদেশে ও ভিন্ন প্রদেশে নানা মুনির নানা মত থাকিবারই কথা। দলের বাঁধনও মতভেদের ফাঁকে ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। আমরা আশা করি, বাংলার কাউন্সিলাররা কাউন্সিল সম্পর্কটাকে 'কিছু নয়' বলিয়াই মনে করিবেন, এবং কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি অচিরে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য জাতির দ্বারে দ্বারে বাহির হইয়া পড়িবেন, শক্তিসামর্থ্য অর্থ ঐ-শক্তি সঞ্চয়ের জন্যই ব্যয় করিবেন, মুক্তির সংগ্রামে জাতির নেতৃত্ব গ্রহণে উদ্যোগী হইবেন।

* * *
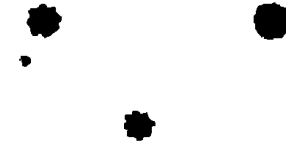
বাংলার কংগ্রেস কমিটি বিদেশী বর্জ্জন সম্পর্কে কিছু করিবার চেষ্টা করিবেন শোনা গিয়াছিল। সাইমন কমিশন বয়কটের সঙ্গে বিলাতী বস্ত্র প্রভৃতির ব্যবহার বন্ধ করিবার চেষ্টা বাংলা করুক,—বিলাতী প্রচলন যথেষ্ট বাড়িয়া চলিয়াছে। বিলাতী বর্জ্জন চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শিল্পের প্রচার বাড়িতে থাকে—ইহা বরাবরই দেখা গিয়াছে।

শ্রীনলিনীকিশোর গুহ

শিশিরকুমার নিয়োগী কর্ত্তৃক, ১এ, রামকিষণ দাসের লেন, নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস হইতে মুদ্রিত ও বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

টমাস হার্ডি

বই কিনিবার সময় তিনটী বিষয় লক্ষ্য রাখিবেন

কালি-কলম

২য় বর্ষ] মাঘ, ১৩৩৪ [১০ম সংখ্যা

গীত-সুধা

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১

তিন বন্ধু একসঙ্গেই পড়তো। তপন, নবগোপাল আর ললিত।

তিনজনের না ছিল মতের মিল, না ছিল অবস্থার মিল, না ছিল কোন বিষয়েই মিল ; তবু তারা বন্ধু ! তারা এক সঙ্গে বসতো, এক সঙ্গে ছুটি হ'লে গল্প করতে করতে বাড়ি চ'লে যেত। সন্ধ্যা বেলায় তর্ক করতে করতে বাড়ির কাছাকাছি তে-মাথার মোড় থেকে তফাৎ হয়ে যে যার পথে চলে যেত।

আবার সকাল সাড়ে ন'টায় তিনজনে বই হাতে ক'রে মিলতো সেই তে-মাথায়। তিনজনে এক ট্রামে চ'ড়ে চ'লে যেত, একই কলেজে।

২

হাতীর দাঁতের বাঁটের ওপর পাকা ইস্পাতের ঝকঝকে ধারালো ফলার ছুরিটির মতই ছিল তপন। কথা-বার্ত্তায় সাজে-পোষাকে, চেহারা-চলনে কোথাও এতটুকু খুঁত নেই।

ললিত ছিল, পালিশ-পাথর দেওয়ার আগে, সেক্‌রার দোকানের গহনার মত ; পাথরের জায়গাগুলো বেবাক্ ফাঁক ;—ডায়মণ্ড কাটবার জায়গাগুলো ম্যাড়-মেড়ে।

আর নবগোপাল ?

সে ছিল ধনুকটির মত বেঁকা। দুটি বন্ধু, তপন আর ললিত যেন ছিলের দুটো মুখ ; যোগ যা ঐটুকুতেই,—বাকি সব জায়গায় আলগোছে, আড়ষ্ট হয়ে নিজেকে তফাৎ ক'রে রেখেছে সে !

কিন্তু মজা এই যে, নবগোপাল নইলে তপন যেন ললিতকে চেনে না, ললিত যেন তপনের সঙ্গ পর্য্যন্ত সহ্য করতে পারে না !

ভোজের খাবারের এক তরফা লুচি-মাংস, আর অন্য তরফের পায়েস-মিষ্টান্নের মধ্যেকার পাপর—যেন নবগোপাল। মানুষটা অমনিই যেন ঝিল্-ঝিলে, হালুকা,

হজমী; কিন্তু ডাকে, গন্ধে, সবাইকে যেন ছাপিয়ে ওঠে!

৩

তিনজনে বি-এ একজামিন দিয়ে কে কোথায় চ'লে গেল।

তপন গেল বিলেত।

বিধাতার বদ্-নাম, তেলা মাথায় তেল দেওয়া; তপনদের টাকার নেই শেষ; সেই টাকার সমুদ্রে টাকার বাণ ডাকিয়ে তোলার জন্যেই যেন সে গেল ব্যারিষ্টার হ'তে।

ললিত কাজ-খালির বিজ্ঞাপন দেখে দেখে ঝাড়তে লাগলো দরখাস্তের পর দরখাস্ত—আন্ধার লাঠি লাগলো গিয়ে এক পাড়াগাঁয়ের মড়ুঞ্চে ইস্কুলে।

ললিত সেই বন-গাঁয়ের শেয়াল-রাজা হ'য়ে বস্‌লো গিয়ে এক সাতশো পচ্চড়-মারা মাষ্টারির বত্রিশ-সিংহাসনে।

আর আমাদের নবগোপাল?

সাড়ে তিনটাকা দিয়ে একখানা বেয়ালা কিনে দাদারা আপিস বেরিয়ে যেতে না যেতে কাঁধের ওপর বেঁকিয়ে ধ'রে বাজাতো, কোঁ-কোঁ-কোঁ; ক্যাঁকোঁর ক্যাঁ কোঁ।

বাড়ির লোকরা তো ঝালা-ফালা।

সে-বাজনা সুরু হ'লে রাগে সাম্‌নের বাড়ির কাচের জান্‌লা বন্ধ ক'রে একটি আটাশ বছরের মেয়ে কট্‌মট্ ক'রে তাকিয়ে চ'লে গেলে নবগোপাল ভাবতো, ঠিক বলেছেন কবি সেক্ষপীর:

প্রেমের খাদ্যই তো সুর, বাজিয়ে যাও—

নবর মন বলতো, সবুরে মেওয়া ফল্‌বেই ফল্‌বে।

বেয়ালার সাধন সাঙ্গ ক'রে, নীচে নেমে এসে ফরাস-ঢাকা চৌকির তলা থেকে টেনে বার করতো ডুগ্‌গি তব্‌লা।

তারপর,

কৎ তে, তাধিন্ তাধিন্ তা,
ধিন্ ধিন্ তা,
তিন্ তিন্ তা॥

বিকেলে সে অলিতে গলিতে হয়তো বা রূপ, না হয় সুরের সন্ধানে ফিরতো—ঘুরতো।

৪

জিদ্দির মতই সিদ্ধি।

বছর চারেক পরে তপন ফিরলো একদম সায়েব হ'য়ে। নাকে টেপা-চশমা! গোঁফজোড়া চেঁচেছুলে, নাকের নীচে দেখালো যেন কালো বেরালের এক জোড়া থাবা; মক্কেল-মুষিকের দিকে নিরন্তর উদ্যত!

ললিত বি-এ পাশ করেছিলো; কিন্তু তার ফাঁকে ফাঁকে চুনি পান্না বসলো না; তার জীবনে ডায়মণ্ড কাটবার ফুরসৎ করে উঠতে পারলেন না, বিধাতা পুরুষ!

বি-এ ফেল ক'রে নবগোপাল সঙ্গীতচর্চ্চার ফলে বিবাহোন্মুখ কুমারীদের গান শিখিয়ে পকেট খরচা চালাতে লাগলো!

৫

নবগোপাল কিন্তু তপনকে ছাড়ে নি। তার দামী চুরুটের এক আধটা—লালপানির এক আধ চুমুক,—যথা-লাভ।

ললিতটা হাবাতে তাই তার ফাঁক অপূর্ণই থেকে গেল। শুধু তাই নয়, পঞ্চাশ ষাটে এক গোষ্টি অপগণ্ডের দল, বিধবা মা, বিধবা বোন, নিজের আণ্ডা-বাচ্ছা!

কিন্তু কবে কোন্ মাষ্টার তার বেশী পেয়েছিল?

পাড়া-গাঁ বলেই চলছিল ললিতের। মা লক্ষ্মীর দরজায় মাথা কোটাকুটি না করলে তিনি মানুষকে ঠিকে গাড়ির ঘোড়ার মত ঘিয়ে ভাজাই করে রাখেন।

৬

হঠাৎ এদিকে নবগোপালের বরাৎ ফিরে গেল;

কিন্তু সে ভারি গোপনীয় কথা। তপন ছাড়া আর কেউ জান্‌লে না।

এ দেশের সেকেলে বড় মানুষদের ঘোড়া রোগটা অকারণেই কেমন তপনকে পেয়ে বসলো।

তাই কোন্ ফাঁকে তার ফুর্ত্তির প্রাণ ধাঁ ক'রে যে কোথায় ভেগে পড়ে কেউ ঠাহর করতে পারে না; এমন কি তপনের অঙ্ক-লক্ষ্মীও না।

কিন্তু কে এড়াবে নবগোপালের শ্যেন দৃষ্টি?

মোটা দক্ষিণেতে নবগোপালের গার্জ্জেনি জুটলো সেই অতি গোপনীয় স্থানটিতে।

কাজ কিছুই না, দুচার খানা কাব্যের বই পড়ানো, দুচার খানা প্রেমসঙ্গীত আর সায়েবের সঙ্গে ভাঙ্গা ইংরিজিতে কথা কইতে পারা।

ও পাড়ায় তপনকে সায়েব বলা হতো।

৭

পাড়াগাঁয়ে আর কিছু না হোক ললিতের ছেলে মেয়ের মধ্যে পীলে-লিভারের চাষ আবাদ ভালই চল্‌ছিল।

কেঁপে জ্বর আসে—তখন তারা ভাল্লুকের মত হি হি করতে থাকে; আবার জ্বর ছাড়লে, মুড়ির চাকৃতি, এঁদো পুকুরে স্নান কিছুই বাদ যায় না।

ডাক্তারের ভিজিট আর ওষুধের দাম দিতে দিতে ললিতের হাড় কাবা-কাবা।

মা বলেন, তার চাইতে বোতল কয়েক ডি গুপ্ত আন্‌তো গিয়ে কলকেতা থেকে...

ললিত বলে, আস্‌চে মাসে মা, এ মাসে যে হাত একেবারে খালি।

কত মাস এলো গেল, আস্‌চে মাস আর আসে না!

৮

চুপি চুপি পঙ্ক বলে, ওগো, শুন্‌চো?

হ্যাঁ, বল না—বলে ললিত পাশ ফেরে কি?

খোকাটা যে দিন-দিন গ'লে যাচ্চে...

তাতো...ললিতের গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না।

এক কাজ কর না···

কি বলতো?

আমার হাতের চুড়িটা···

হুঁ···

জোড় কেটে গেছে...কি হবে আর ওতে?...ওটা বেচে, মার এক জোড়া কাপড় আর তিন বোতল ডি গুপ্ত আনো গিয়ে...কাল শনিবার...না হয় সোমবারটা ছুটি নেও।

ললিত বল্লে, ছুটি নিতে হবে না, সোমবারে যে ছুটি আছে এবার...

ভালই তো; ব'লে পঙ্ক একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

ললিত বলে, যেতে আসতে পাঁচ সিকে পাঁচ সিকে আড়াই টাকা...একেবারে অপব্যয়···

তা হোক্‌গে, অত ভাবলে চলে না।

পঙ্কর আঙ্গুলগুলো ললিত আস্তে আস্তে মোট্‌কে দেয়।

৯

চুড়িটা নেকড়া জড়িয়ে বুক-পকেটে নিয়ে ললিত বেরিয়ে গেল।

গাড়িতে টিপে টিপে সে দেখে, চুরি গেলেই চক্ষু চড়ক গাছ!

সেকরা বলে, পিতুলে সোনা, দশ টাকার বেশী হবে না, না হয় অন্য কোথাও যান্ গিয়ে...

ললিত ব'সে ব'সে মনে মনে জোড়ে, মার কাপড়, ডি গুপ্ত, তিন বোতল না হয় দুবোতল, আর ফেরবার পাঁচসিকে...

দশটাকা নিয়ে ছুট্‌চে ললিত, আজই তা হ'লে ফিরতে পারি, এই সে মনে মনে বলে।..

১০

কেনা-কাটা ক'রে তিনটে টাকা বাঁচলো।

এক টাকায় পঙ্কর জন্যে কি নেওয়া যায় তাই ভাবতে ভাবতে চলেছে ললিত, পুরোনো চেনা পথ দিয়ে ; ডু-ধারী পুরোনো বই ছড়ান ; ভারি ইচ্ছা হয় ডু' একটা কিনে নিতে।

একটা দোকানের সাম্‌নে সে দাঁড়িয়ে প'ড়লো।

কি চান্ বাবু ?

বাবু এদিকে আসুন, এদিকে...

একজন নাকের কাছে তুলে ধরে বল্লে, বাবু এই নিন্ ফাউণ্টেন পেন, আস্‌লি সোনার নিব্...নিন না মুশোয়, পাঁচ-শুকি, আপনাকে ষোল আনায় দিবো......

ললিত ভাবচে, পঙ্ক কি ভালবাসে!

ললিত সত্যিই জানে না, তার সুখ-দুঃখের চিরসঙ্গিনী কি যে ভালবাসে!

বাবু নিয়ে যান্ একটাকায় তিন্‌টে গেঞ্জি...

একটা টাকা দিয়ে তিনটে ছোট ছেলেমেয়ের গেঞ্জি কিনে—ললিত যেন বাঁচলো হাঁফ ছেড়ে!

এমন সময় নবগোপাল পাশে দাঁড়িয়ে তার কাঁধে হাত দিয়ে সস্নেহে বল্লে, কবে এলিরে ললিত ?

১১

নবগোপাল বল্লে, হেঃ আজ এসে আজই ফিরে যাবি ? তাই কি হয় ? রাত জেগে এসেচিস্—আজ ঘুমিয়ে কাল যাস্...চল্ আজ তোকে এমন সব গান্ শুনিয়ে দেবো···মন তর্ হয়ে যাবে···

তোর নিজের ? ললিত জিজ্ঞাসা করলে।

হ্যাঁ, একরকম আমার নিজেরই..... চল্ না তুই...

ডুজনে পথ হাঁট্‌তে লাগ্‌লো।

কতদূর, ভাই ললিত ?

এই যে, আর মিনিট পাঁচেক!

বাড়িখানা দেখলে কোন ভাল ধারণাই মনে আসে না ; পাড়াটাও কেমন-কেমন, তাই ললিত ভাবলে, তারা বোধ হয় গরীব।

দরজায় ঢুকে খানিকটা অন্ধকার গলি, তার পর আদের আলো দেখতে পাওয়া গেল।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে একটা লম্বা বারান্দা, তাতে টবের ওপর রজনী-গন্ধা ফুটে আছে।

নবগোপাল ডাক্‌লে কৈগো, বেণু রাণী কৈ ?

একটি লম্বা ছিপ-ছিপে মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বল্লে, আসুন ; কিন্তু ডু' জন দেখে অপ্রস্তুতের মত দাঁড়িয়ে পড়লো।

নবগোপাল তা বুঝে বল্লে, লজ্জার কিছু নেই বেণু, এটি আমাদের ছেলেবেলার বন্ধু ললিত, তোমার গান শুন্‌তে এসেছেন।

বেণু মাথা নীচু করে যেন নমস্কার ক'রে বল্লে, ভেতরে আসুন······

১২

গা-আলমারিতে বাসন সাজান। বিছানার গদি আর বালিশ অতিরিক্ত উঁচু আর মোটা। ধপ্‌ধপে চাদর।

ঘরে ঢুকে ললিতের কেমন যেন ভাল লাগে না।

একটা চেয়ারের ওপর ব'সে নজর পড়লো একখানা মোটা ফ্রেম দেওয়া বড় ছবিতে। ডুখানা মুখ তাতে পরস্পরকে দেখে হাস্‌চে। একটি তো বেণু-রাণীর, আর ওটি ? ললিত চিনেও তাকে চিন্‌তে পারে না!

নবগোপাল চটুল হেসে বল্লে, চিন্‌তে পারছ না ?

ললিত কথা না ক'য়ে সেই ছবির দিকে ঠায় চেয়ে রইল।

তপন হে, তপন! কি আশ্চর্য্যি, যা হোক্, এমনিই হয় মানুষের বয়স হ'লে!

ললিতের জীবনে এই অভিযান প্রথম। তার বুকের মধ্যে যেন সব রক্ত জমাট হ'য়ে যাবে। সে পাথরের মত স্তব্ধ মৌন হ'য়ে চেয়ে রইল নবগোপালের চশমা আর বিপুল গোঁফজোড়ার দিকে।

নবগোপাল বুঝলে যে দেরি করলে ফল মন্দ হ'তে

পারে। তাই তাড়াতাড়ি উঠে পাশের দামী অর্গানটায় ঝঙ্কার দিয়ে একটা ইংরিজি গৎ বাজাতে লাগলো।

১৩

বেণু গাইলে

জীবন যখন শুকায়ে যায়

গীত-সুধা রসে এসো...

তার গলাটি মন্দ নয়; আর গানটি অনবদ্য।

কেমন ললিত? খুশী হ'লে? এরকম গান শুনেছিলে কোন দিন?

ললিত মাথা নেড়ে জানালে, না।

নবগোপাল একান্ত স্নেহভরে বেণুর পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বল্লে, বেণুবাণী, আর একটা···

বেণু ঘড়ির দিকে নজর ক'রে বল্লে, আটটা বাজে, ওঁর আসার সময় হচ্ছে...আজকাল একটু সকাল সকালই যে...

আচ্ছা তবে থাক্—ব'লতেই বেণু বল্লে, আপনারা একটু বসুন, এক মিনিটে আস্‌চি, বলেই সে দ্রুত পদে বার হ'য়ে গেল।

নব বল্লে, কি সুন্দর ম্যানার্স, দেখেচিস্?...এক কাজ করিস্, যাবার সময় দুটো টাকা দিয়ে যাস্—বুঝলি কিনা?

ললিতের পেটের মধ্যে যেন কি ঘুলিয়ে ওঠে! হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে উঠে বলে, চল্ চল্···

পিছন থেকে বেণু বল্লে, তাই কি হয়? একটু মিষ্টি-মুখ করুন...

নবগোপাল বিনা বাক্যব্যয়ে একখানা থালা হাতে করে গবাগব্ খেতে লেগে গেল।

ললিত খাবার স্পর্শ করে না দেখে, বেণু বল্লে, একি! আপনি খান?

ইচ্ছে নেই···শরীর···

ওঃ অল্ দোজ্ থ্রাইস্ টোল্ড টেলস্—ব'লে নবগোপাল তারও থালা নিয়ে নিঃশেষে খেয়ে ফেল্লে।

তার কাণ্ড দেখে বেণুও অবাক হ'য়ে রইল।

পথে বেরিয়ে নবগোপাল বল্লে, ছ্যাঃ, তুই একদম ন্যাদামারা হ'য়ে গেছিস্। টাকা দিলিনে কেমনটা...

ললিত শান্ত-অবসন্ন কণ্ঠে বল্লে, নাঃ, দু'টাকাতো টেবিলের ওপর রেখে এসেছি...

তাই নাকি রে? আচ্ছা, আচ্ছা তুই এগো, আমি আস্‌চি,—ব'লে নবগোপাল চ'লে গেল।

১৪

হেদোর বেঞ্চের ওপর কাৎ হ'য়ে পড়ে থেকে ললিতের সেই গহন-দুঃখ-রাতি কেটে গেল।
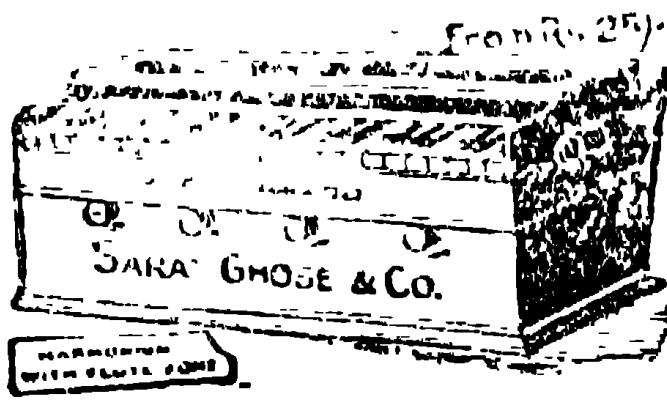
বিদায়-বাণী

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

এতদিনের আনাগোনা,
এতদিনের জানাশোনা
আজ্‌কে গেল চুকে' ;
দুয়ার ধরে' থাক্‌ব না আর
নামটি ধরে' ডাক্‌ব না আর,
চাইব না আর মুখে।
তোমার ব্যথা তোমারি থাক্‌,
চাই না আমি—চাইব না ভাগ,
থাকুক তোমার বুকে ;

ভুল করেছি—ভুলে' যেও,
আমার কথা শুধায় কেহ,
বোলো—'চিনি নাকো'।
ভুলে যেও—ভোলো যেমন
ভোরের বেলায় নিশার স্বপন
কেঁদে যখন জাগো।
আমি গেলাম—গেলাম সরে'
আশিস্‌ করে' প্রাণটি ভরে'—
'মনে নাহি রাখো'।

চিত্রবহা

শ্রী সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

—পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর—

৩৬

ভামিনীরঞ্জন

বন্ধুদের সঙ্গে আর ভ্রমণে যাওয়া হইল না—তল্পিতল্পা বাঁধিয়া সেই দিনই সন্ধ্যার পর অমর পুরী যাত্রা করিল

পরদিন প্রভাতে বাড়ির বারান্দায় দাড়াইয়া মাধুরী ধরণীর পাদমূলে সমুদ্রের অধীর ও অশান্ত আত্মনিবেদন-লীলা দেখিতেছিল, এমন সময় অমর গিয়া উপস্থিত।

এই অপ্রত্যাশিত আনন্দের জন্য মাধুরী প্রস্তুত ছিল না। প্রফুল্ল হাস্যে তাহাকে অভিনন্দিত করিয়া সে বলিল, এ কি? আপনি যে! আসবার খবর পাইনি ত!

অমর বলিল, খবর দেবার সময় হয়নি। ভালো আছ ত? বিহারীবাবু কেমন?

মাধুরীর মুখ ম্লান হইল। কহিল, ভালো আর কৈ? তেমনিই আছেন।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় মাধুরীকে নিভৃতে পাইয়া অমর বলিল, এমন হঠাৎ কেন এলুম জানো?

মাধুরী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, কেন?

অমর বলিল, তোমায় কিছু বলতে চাই—অবশ্য তুমি যদি অনুমতি দাও।

অমরের মুখে এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া আধেক ভয়ে আধেক বিস্ময়ে মাধুরীর বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে কহিল, ও আবার কি কথা! বলুন না কি বলবেন।

অমর বলিল, নিজের ভার বয়ে বয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আর পারি না! তুমি যদি নাও, সে-ভার তোমার হাতে তুলে দিতে চাই। নেবে কি?

মাধুরী নতনেত্রে নীরব রহিল। অমরের কথাগুলি সঙ্গীতের মত তার কানে বাজিতে লাগিল—সে যে কতক্ষণ তার ধারণাই রহিল না।

তাহাকে নির্ব্বাক দেখিয়া অমর বলিল, মনে যদি দ্বিধা থাকে তবে ভেবেচিন্তে এরপর বোলো। তাড়াতাড়ি নেই।

মাধুরী এবার মুখ তুলিল। ধীরকণ্ঠে বলিল, দ্বিধা? আমার কাছে এর বাড়া সুখ আর নেই, তা কি আপনি জানেন না?

বিহারীবাবুর অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতেছে দেখিয়া একদিন অমর তাঁর কাছে তার প্রার্থনা নিবেদন করিল। কন্যারও সম্মতি আছে শুনিয়া তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। মাধুরীকে নিকটে ডাকিয়া তিনি সানন্দে এবং সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিলেন—তাহাদের প্রেম যেন সত্য হয়!

মৃত্যু যেন ইহারই জন্য অপেক্ষা করিয়া ছিল। দুই দিন পরে বিহারীবাবু সজ্ঞানে এবং স্বচ্ছন্দমনে পরলোকে প্রয়াণ করিলেন। কন্যার অনিশ্চয় ভবিষ্যতের চিন্তা জীবনে তাঁহাকে শান্তি দেয় নাই—সে-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া তিনি মরণে শান্তি পাইলেন।

এই সংবাদে চন্দ্রবাবু যতটা ব্যথিত হইলেন, মাধুরী তাঁর

পুত্রবধূ হইবে শুনিয়া তার চেয়ে ঢের বেশি সুখী হইলেন। অনেকদিন হইতে এই ইচ্ছা তিনি মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন। কাত্যায়নীও প্রকাশ্যে কোনো অসন্তোষ প্রকাশ করিল না। সবচেয়ে আনন্দ লীলার ও চন্দ্রবাবুর। তাঁদের মুখে মুখে সংবাদটা চারিদিকে প্রচার হইয়া গেল। আত্মীয় ও বন্ধুমহলে চন্দ্রবাবু সগর্ব্বে বলিতে লাগিলেন, দেখবে একবার কেমন বৌ করি! তেমন মেয়ে তোমরা কখনো দেখনি!

বোর্ডিংএ থাকিয়া মাধুরী কলেজের পড়াশুনা সুরু করিল। চন্দ্রবাবুর উৎসাহের সীমা নাই! মাধুরীকে অন্তত বি-এ পাশ করিতে হইবে ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা!

বৎসরাধিক পরের কথা। মাধুরীর সহিত অমরের বিবাহ সবেমাত্র সম্পন্ন হইয়াছে।

বৌ-ভাতের পরদিন চন্দ্রবাবু অমরকে একান্তে ডাকিয়া কহিলেন, ঠাকুরপুত্তুর আর ত্রিলোচন-খুড়োকে গাড়ি-ভাড়া দিয়ে বিদায় করে' দিলুম! আজই ওদের যেতে বলেছি

তাঁহাদের আরও কয়েকদিন থাকার কথা ছিল, তাই অমর জিজ্ঞাসা করিল, কেন? ওঁদের ত আজ যাওয়ার কথা নয়!

চন্দ্রবাবু রাগতভাবে কহিলেন, আমার বাড়িতে বসে' আমার বৌয়ের সম্বন্ধে আলোচনা করবার অধিকার কারও নেই! মুখ্যু-দুটো বৌমার নিন্দে করছিল!

হাঙ্গামা চুকিলে চন্দ্রবাবু মাধুরীর শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। কহিলেন, কলেজে গিয়া আর কাজ নাই, বাড়িতে পড়িয়া প্রাইভেট পরীক্ষা দিলেই চলিবে।

অমরের ইচ্ছা ছিল মাধুরী কলেজেই পড়া শুনা করে, তবুও সে আপত্তি করিল না। ভাবিল, শিক্ষা লইয়া যখন কথা তখন তা বাড়িতে বা কলেজে যেখানে হোক একই কথা!

সঙ্গীতের জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া তার পাঠের শিক্ষকতার ভার লইলেন চন্দ্রবাবু নিজে। সময় পাইলেই তিনি মাধুরীর সঙ্গে নানাবিধ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। মাধুরী কি খাইবে, কি পরিবে, কখন কি করিবে, এই সমস্ত ব্যাপার লইয়া তিনি অষ্টপ্রহর এত বেশি মাথা ঘামাইতেন যে মাধুরীর লজ্জা করিত। সে যখন বাড়ির মেয়ে, দুদিনের অতিথি নয়, তখন এতটা না করিলেও ত চলে! শেষটা এমন হইল, শ্বশুরের স্নেহাতিশয্য মাধুরীর বিশ্রাম ও নিদ্রারও ব্যাঘাত ঘটাইতে লাগিল।

দেখিয়া শুনিয়া কাত্যায়নী মনে মনে চটিতে লাগিল কিন্তু মুখে কিছু বলিল না। স্বামী ছেলে মেয়ে, বাড়ি-সুদ্ধ সবাই, একজন মেয়েকে লইয়া এতটা করিবে ইহা তার মতে অত্যন্ত অশোভন, অসঙ্গত এবং অন্যায়। কৈ, তার নিজের বিবাহের পর ত সে এমন আদর যত্ন পায় নাই! পতির উপর দিনে দিনে তার রাগ অভিমান ও বিরক্তি বাড়িয়া চলিল। কোথাকার কে একটা মেয়ে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল, আর সে বাড়ির গৃহিণী, সে-ই বাতিল হইতে বসিল! মাধুরী আসাতেই এমনটি ঘটিল, ইহাই বারবার তার মনে হইতে লাগিল! একটি নোলকপরা কচিখুকি নিরক্ষর বৌ আনিতে পারিলে ইহা সম্ভব হইত না! অতএব মাধুরীই যত নষ্টের মূল!

এই ধারণা যতই মনে বদ্ধমূল হইতে লাগিল ততই কাত্যায়নী বধূর বাক্যে ও ব্যবহারে তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিবার একটা চেষ্টা দেখিতে লাগিল। তার মনে ক্রমশ দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিতে লাগিল মাধুরী লেখাপড়া জানে বলিয়া নিশ্চয়ই অশিক্ষিতা শাশুড়ীকে অবজ্ঞা করে, নহিলে অষ্টপ্রহর সে শ্বশুরের সঙ্গেই বা কথা কয় কেন? সে কি মাধুরীর সঙ্গে দুটা কথা কহিবারও যোগ্য নয়?

কাত্যায়নীর পিত্রালয় ভবানীপুরে একদিন মধ্যাহ্নে অন্তঃপুরিকাদের একটি সভা বসিয়াছিল। সে-সভায় কাত্যায়নী ছাড়া তার মাতা ও ভ্রাতৃজায়া উপস্থিত

ছিলেন। কাত্যায়নীর মাতা একসময় কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তা কাতু, লীলা ত ডাগর হল, এখন তার বিয়ে-থাওয়া দাও, আর কি এমনি করে' রাখা ভালো দেখায়!

কাত্যায়নী একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, আমার কি অমত্ মা? কি করবো বলো, 'ওঁদের' কি আর মাথার ঠিক আচে! মেয়েকে মেম করে' তুলচেন!

কাত্যায়নীর মাতা বলিলেন, তা তোমার কি ঢিল দিলে চলে বাপু! এই যে অমরের বিয়ে দিলে, ওকি একটা দেখতে-শুনতে ভালো হল? আমাদের হিঁদুর ঘরে অমন সোমত্ত মেয়ে বৌ করলে যে নানান্ জনে নানা কথা বলে। এখনো কি বল্‌চে না মনে করচো?

কাত্যায়নী মাতাকে সমর্থন করিয়া বলিল, তা আর বলচেনা! কেন বলবেনা বলো? আমার মত্ নিয়ে কোন্ কাজটা আর হচ্চে! আমি বাড়ির এক কোণে পড়ে' আছি, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোর মত। বাড়িসুদ্ধু নোক ত বৌ নিয়ে ক্ষেপে উঠেচেন।

এমন সময় কাত্যায়নীর ছোট ভাই ভামিনীরঞ্জন একমুখ পান চিবাইতে চিবাইতে তার অনাবৃত বিপুল দেহ ও প্রকাণ্ড ভুঁড়ি দুলাইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া তার পত্নী মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিল।

ভামিনীর সহিত সরস্বতীর চিরকেলে বিবাদ। সে অনেক কষ্টে স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া সেখানেই আটক পড়ে—একাধিক বার চেষ্টা করিয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। সে-সব পুরানো আলোচনায় ফল নাই। এই বলিলেই যথেষ্ট, সম্প্রতি সে কমলার কৃপালাভ করিয়া সরস্বতীকে অত্যন্ত অবজ্ঞার চোখে দেখিয়া থাকে। লেখাপড়ার নামে সে জ্বলিয়া উঠে—লেখাপড়া করিয়া কে কবে হাতীঘোড়া চড়িয়াছে?

ভামিনী একজন পাকা কনট্রাক্টর। সে যে বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করে, তা তার কথাবার্ত্তা এবং তার স্ত্রীর গুরুভার গহনা দেখিয়া অনুমান করা কঠিন নয়। কিছুক্ষণ আলোচনাটা সে চুপ করিয়া শুনিল। মুখের পান কতকটা গলাধঃকরণ করিবার পর কথা বলা সম্ভব হইলে বলিল, কিছু মনে কোরোনা দিদি, কিন্তু আমার ঐ ধিঙ্গি বৌটিকে কোত্থেকে আমদানী করলে? দেশে কি আর মেয়ে পেলে না? বৌভাতের দিন আমায় এমন ধাক্কা মারলে, পড়ে' মরিনি এই খুব ভাগ্যি!

কাত্যায়নী চোখ কপালে তুলিয়া সবিস্ময়ে বলিল, ওমা কি ঘেন্নার কথা! তুমি হলে শ্বশুর, তোমায় ধাক্কা মারলে, বলো কি?

ভামিনী গম্ভীর হইয়া বলিল, মারবে না কেন বলো? দুপাতা ইংরিজি পড়েচে, পাশ দিয়েচে, আর রক্ষে আছে! দেমাকে মাটিতে পা পড়চে না! লেকাপড়া মেয়েমানুষের সইবে কেন? শাস্তরেই ত পইপই করে' মানা করে' গেচে ও কাজ কোরো না কোরো না কোরো না!—হ্যাঁ, তাও বুঝতুম তেমন লেকাপড়া করেচে তাহলেও হোতো...পাশ দিলেই কিছু লেকাপড়া হয় না। আমরা ত পাশটাশ করিনি, তা বলে' কি আমরা অশিক্ষিত, আমরা যা পড়েচি তার সিকির-সিকি ও জানে? হুঁঃ, সাধ্যি কি! আজকালই নয় কাজের ভিড়ে পড়াশুনো হয়ে ওঠে না, কিন্তু এককালে কি না পড়েচি...হেম-নবীন-গিরিশ কিছু আর বাকি রাখিনি! হেমবাবুর পলাশীর যুদ্ধ, গিরিশ ঘোষের মেঘনাদবধ, নবীনের সীতার বনবাস গড়গড় করে' মুখস্ত বলে' যেতুম! সে একদিন গেছে···এখন সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই···এখন দু পাতা পড়তে শিখলেই দুটো পাশ দিলেই লোকে ভাবে শিক্ষিত হয়েচি! আরে, এখন আর আছে কি? হেম গেল নবীন গেল এখন কেবল এক রবি-ঠাকুর টিমটিম করচে।

ভামিনী দম লইবার জন্য থামিল। তারপর বিজয়-গর্ব্বে একবার মেয়েদের পানে চাহিল। মেয়েরা তার অদ্ভুত বিদ্যাবত্তার পরিচয়ে বোধ করি বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছিল, কারণ তাহারা হাঁ না কিছুই বলিল না।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর কাত্যায়নী ভ্রাতাকে

জিজ্ঞাসা করিল, তা তোমার ধাক্কা মারলে কি করে'? হাত দিয়ে না কি [illegible]

[illegible] না না, হাত দিয়ে কেন। লুচির চ্যাঙারি নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠচি, বৌমা হুড়মুড় করে' একেবারে আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে নীচে নেবে গেল। লজ্জা নেই সরম নেই মাথায় এতটুকু কাপড় নেই, বাপের জন্মে ত এমন মেয়েমানুষ দেখিনি!

কাত্যায়নী গালে হাত দিয়া বলিল, দ্যাখো একবার! নেকাপড়া শিখলে আর কি হবে? ভদ্দরনোকের ঘরে কি করে' চলতে হয় তা কি ওকে কেউ শিখিয়েচে? তার পর সরোষে কহিল, আজই বাড়ি ফিরে বলচি ওঁদের গুণধর বৌয়ের কীর্ত্তি!

শুনিয়া ভামিনী তৎপরতার সহিত বলিল, না না তার আর দরকার নেই! চুকেবুকে গেছে, সে-কথা নিয়ে আর...

আসলে ভামিনী ভগ্নীপতিকে ভয় করিত। সে বেশ জানিত তাঁর জেরার মুখে তার জলজ্যান্ত মিথ্যা কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

৩৭

বিদ্রোহ

পিত্রালয় হইতে ফিরিবার পর বধূর উপর কাত্যায়নীর বিদ্বেষ শতগুণ বাড়িয়া গেল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, তার প্রতিষ্ঠা ধূলিসাৎ না করিয়া ছাড়িবে না। উঠিতে বসিতে সময় পাইলেই সে পতির কাছে মাধুরীর শতবিধ দোষত্রুটির কথা উল্লেখ করিতে লাগিল। সেগুলা এত তুচ্ছ ও হাস্যকর যে চন্দ্রবাবু প্রথম প্রথম সে-কথা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নাই, কিন্তু অবিরাম একই কথা শুনিতে থাকিলে অনেক অসম্ভব কথাও যেমন আমরা ক্রমশ বিশ্বাস করিয়া বসি, এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। কিছুকাল পরে চন্দ্রবাবুর মনে হইল হয়ত বা মাধুরীরই দোষ, হয় ত তিনি তাহাকে ঠিক বুঝিতে পারেন নাই, হয়ত তাহার চরিত্রে এমন একটা দিক আছে যেটা প্রশংসার যোগ্য নহে। ভাবিতে ভাবিতে ক্রমশ তাঁর অজ্ঞাতসারে তাঁর বিচারবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা কমিয়া আসিল, পত্নীর ঘেনর-ঘেনর শুনিতে শুনিতে মন তিতিবিরক্ত হইয়া উঠিল, নিরন্তর ছোট কথার আলোচনা শুনিয়া তাঁর মনও ছোট হইয়া পড়িল, শেষে এমন এক সময় উপস্থিত হইল যখন বধূর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় স্নেহ গভীর ও নিত্যস্থায়ী বিরাগে পরিণত হইল।

একদিন অমর শুনিল সঙ্গীত-শিক্ষকের জবাব হইয়াছে। মাধুরীকে কারণ জিজ্ঞাসা করায়, জানিনা বলিয়া সে কথাটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তার ভাব দেখিয়া মনে হইল ভিতরে ভিতরে কি একটা কাণ্ড ঘটিয়াছে। অতঃপর অমরের চক্ষুকর্ণ সজাগ হইয়া রহিল। দুচার দিনের মধ্যেই সে বুঝিতে পারিল তার পিতামাতা মাধুরীর উপর আর খুসি নহেন। সদাই ফুসফাস আলোচনা, অমরকে দেখিলেই তাহা বন্ধ হইয়া যায়। আহারের সময় আগেকার মত আর হাসিগল্প চলে না, এখন ভোজন-পর্ব্ব একরূপ নিঃশব্দে সমাধা হয়। চন্দ্রবাবু বধূকে পাশে বসাইয়া আর আহারের জন্য পীড়াপীড়ি করেন না, কেমন যেন উদাসীন ভাব। পাচক আহার পরিবেশন করে, কাত্যায়নী ভুলিয়াও কোনদিন মাধুরীকে কিছু প্রয়োজন আছে কি না জিজ্ঞাসা করেন না। বাড়ির বাতাসটা দিনে দিনে অসহনীয় হইয়া উঠিল। এমন করিয়া ত আর চলে না, একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার!

একদিন সকালবেলা মাধুরী মুখ ধুইয়া আসিয়া কাপড় ছাড়িয়া গৃহকর্ম্মে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে আর অমর একখানা বই খুলিয়া বসিয়াছে, এমন সময় একতালা হইতে কাত্যায়নীর উচ্চ কণ্ঠ বেশ স্পষ্ট শুনা গেল—বেলা এক পহর হয়ে গেল, বড়নোকের বেটির সাজগোজ এখনো শেষ হল না! ওপরে বসে' বসে' রঙ্গ করা হচ্ছে!

অমর ফিরিয়া মাধুরীর পানে চাহিতেই দেখিল তার

মুখ দুঃখে ও লজ্জায় পাংশুবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিতেই অমর খপ্ করিয়া তার হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল, এখানেই একটু বোসো আমি না ফেরা পর্য্যন্ত।

অমরের কণ্ঠস্বরে ভীত হইয়া মাধুরী তাহাকে বলিল, না না লক্ষ্মীটি, হাঙ্গামা কোরো না! ও-সব কথা অনেকদিন থেকেই চলছে—ও একরকম গা-সওয়া হয়ে এসেছে!

অমর বলিল, হাঙ্গামা করবো না, ভয় নেই। কিন্তু তোমায় এখানেই বসতে হবে আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত।

মাধুরী আর আপত্তি করিতে পারিল না। অমর নামিয়া গেল।

আহারের ঘরে কাত্যায়নী বসিয়া কুটনো কুটিবার উদ্যোগ করিতেছিল। নিকটেই একখানা আসনে চন্দ্রবাবু বসিয়া। তাঁর মুখ গম্ভীর—সম্মুখে খোলা খবরের কাগজ।

অমর ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, বাবা ব্যস্ত আছ কি? তোমার সঙ্গে আমার দু' চারটে কথা ছিল।

চন্দ্রবাবু কাগজ থেকে মুখ তুলিয়া বলিলেন, বোসো। আমারও কিছু বলবার আছে।

অমর পিতার সম্মুখে বসিয়া বলিল, কি, বলো। মাধুরীর সম্পর্কে কোনো কথা?

চন্দ্রবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, হ্যাঁ।

অতঃপর পিতা মাতা ও পুত্রের মধ্যে কি আলোচনা হইল তাহা বিবৃত করিয়া লাভ নাই। কাত্যায়নী বধূর বিরুদ্ধে যে চার্জশীট দাখিল করিল তাহা আদিকাল হইতে বাংলার অসংখ্য শাশুড়ী তাহাদের বধূর বিরুদ্ধে দাখিল করিয়া আসিতেছে। সমস্ত শুনিয়া অমর বলিল, তুচ্ছ কথা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। এখন তোমাদের ইচ্ছেটা কি?

চন্দ্রবাবু উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, তোমার কাছে ত এ সব তুচ্ছ হবেই! তোমরা এ যুগের ছেলে, বাপেদের তোমরা বিচার করতে শেখো, সেই হল তোমাদের কাছে সবার বাড়া! সীতাকে নির্বাসন দিয়েছিলেন বলে' রামচন্দ্রকেও তোমরা রেহাই দাও না!

অমর বলিল, নিশ্চয়ই! রামচন্দ্রকে যখন তোমরা আদর্শ বলে' খাড়া করো তখন দেখতে হবে বৈ কি তিনি সে সম্মানের যোগ্য কি না! শ্রদ্ধেয় মানুষকে আমরাও শ্রদ্ধা করতে জানি, তবে আমরা অন্ধের মত নির্ব্বিচারে কেবল নামের খাতিরে শ্রদ্ধা করি না।

তারপর সে বলিল, যার মত্ আমাদের সঙ্গে মিলবে এমন অন্যায় আশা আমি করিনি। তবে আমার ধারণা ছিল, তোমার মত্ আর আমাদের মতে বিশেষ কোনো তফাৎ নেই। এখন দেখছি ভুল বুঝেছিলুম। তারপর, তোমাদের একটা বিশিষ্ট মত্ থাকা যদি অপরাধ না হয় তাহলে আমাদেরও মত বলে' কিছু থাকতে পারে ই? তবে কি?

চন্দ্রবাবু কিন্তু গোঁ ছাড়িলেন না। চীৎকার করিয়া বলিলেন, এ বাড়িতে বাস করতে হলে আমাদের মতে চলতে হবে, না, তোমায় আলাদা থাকবার ব্যবস্থা করতে পারো!

অমর দাঁড়াইয়া উঠিয়া ধীরকণ্ঠে বলিল, বেশ তাই হবে! তারপর বাহির হইয়া গেল।

চন্দ্রবাবু সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। শৈশবের মুখচোরা অমর, যে সদাই তাঁর ভয়ে তটস্থ হইয়া থাকিত, তার মুখে এই বিদ্রোহের বাণী তাঁর কানে অদ্ভুত শুনাইল। অমরের সংকল্প শুনিয়াও তাহা বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি হইল না, নিশ্চয়ই সে রাগের মুখে কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছে, এর পর অনুতাপ করিয়া সে-কথা প্রত্যাহার করিবেই করিবে! আজন্ম সুখনীড়ে লালিত, নিঃসহায় স্বপ্নবিলাসী তাঁর পুত্র কোন্ সাহসে ধনী পিতার আশ্রয় ত্যাগ করিতে পারে সে-কথা কিছুতেই তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। শৈশবের অমর আর আজিকার অমর যে

এক ব্যক্তি নয় সে-কথা একবারও তাঁর মনে পড়িল না—কোন্ [illegible] বা পড়ে? এমন শান্ত সুমধুর যার প্রকৃতি, এমন [illegible] সুদর্শন যার আকৃতি, তার অন্তরের নিভৃতে যে পাতালশায়ী বহ্নির মত দুরন্ত বিদ্রোহের বীজ লুকানো ছিল চন্দ্রবাবু ঘুণাক্ষরেও সে-কথা জানিতেন না। তাই তাঁর বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

পিতৃমাতৃহীনা মাধুরী অনুরাগের আকর্ষণে অমরের কাছে আসিয়াছিল, কয় মাস লাঞ্ছনা ও অপমান ভোগ করিয়াও মুখ ফুটিয়া একটি কথা তাহাকে কখনো বলে নাই, পাছে সে মনে ব্যথা পায়—এই কথা ভাবিতে ভাবিতে মাধুরীর মহিমায় যে-পরিমাণে অমর মুগ্ধ হইল, ঠিক ততখানি আত্মগ্লানিতে তার অন্তর ভরিয়া উঠিল। অগ্নিসাক্ষী করিয়া যার সুখ ও দুঃখের ভার গ্রহণ করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিল তার মর্য্যাদা সে ত রক্ষা করিতে পারে নাই! স্বার্থপরের মত আত্মসুখ লইয়াই সে ব্যস্ত ছিল, পত্নীর ভালমন্দর খবর সে ত রাখে নাই! বিবাহ করিয়াছে অথচ পত্নীর ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিবার সামর্থ্য নাই; শুধু তাই নয়, সুস্থ সবল শিক্ষিত সে বসিয়া বসিয়া নির্ব্বিবাদে পিতৃঅন্ন ধ্বংস করিতেছিল, সেই পাপের শাস্তি ভোগ করিল নির্দ্দোষ মাধুরী, এ লজ্জা রাখিবার ঠাঁই কোথায়?

অমর পাগলের মত পথে বাহির হইয়া পড়িল। পাপের ভার আর সে বাড়াইবে না, একটা কিছু ব্যবস্থা এখনি করিতে হইবে! সে-ব্যবস্থা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তাহা ভাবিবার তার অবসর ছিল না।

ফুটপাত ধরিয়া সে একদিকে হনহন করিয়া চলিতে লাগিল। বেলা প্রায় দশটা। আপিসের বাবু আর ইস্কুলের ছেলেরা ব্যস্তভাবে একরকম ছুটিয়া চলিয়াছে, পথ ট্রাম মোটর আর গাড়ির শব্দে মুখরিত। অমরের কোনো দিকে দৃষ্টি নাই, সে অন্যমনে চলিয়াছে, আত্মঅক্ষমতার জ্বালা ভূতের মত ঘাড়ে ধরিয়া তাহাকে তাড়না করিতেছিল! স্থির হইয়া ভাবিবার তার ক্ষমতা নাই, মাথার মধ্যে সমস্তই যেন তালগোল পাকাইয়া গেছে।

হঠাৎ এক পথিকের সঙ্গে ধাক্কা লাগায় তার গতিরোধ হইল। লোকটি বিপরীত দিক হইতে আসিতেছিল, ধাক্কা খাইয়া সে-ও থামিয়া গেল। অমর মুখ তুলিয়া দেখিয়া লজ্জিত বিব্রতভাবে বলিল, দেখতে পাইনি ভাই! বেশি লাগেনি ত!

অমিয় ঈষৎ হাসিয়া বলিল, ও কিছু না! তা তুমি এত ব্যস্ত হয়ে চলেছ কোথায়? তারপর হঠাৎ অমরের মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিল, ও কি? তোমার হয়েছে কি?

অমর কতকটা সামলাইয়া লইয়া বলিল, ও কিছু না! হ্যাঁ, তোমায় দেখে মনে পড়লো! একটু উপকার করতে পারো ভাই—আমায় একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারো?

অমিয় বন্ধুর মুখের পানে ক্ষণকাল সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল, অমর রহস্য করিতেছে না ত? তারপর বলিল, ব্যাপার কি বলো দেখি? তুমি চাকরি করবে? কেন?

অমর বলিল, হ্যাঁ। যা হোক একটা চাকরি হলেই চলবে আপাতত! কিন্তু শীগগির চাই, সবুর সইবে না!

অমিয় একটু ভাবিয়া বলিল, একটা কাজ আছে আমাদের আপিসে, কিন্তু বড্ড খাটুনি। জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, সবই করতে হবে। প্রুফ দেখা, প্রবন্ধ বাছাই করা, চিঠিপত্র লেখা, এমন কি দরকার হলে লেবেল লেখা ও পার্শ্বেল বাঁধা। কাগজের আপিসের চাকরি, বুঝতেই পারছো! ছুটিছাঁটা বিশেষ কিছু নেই, দরকার হলে রবিবারও ছুটতে হবে। মাইনে টাকা পঞ্চাশ হতে পারে।

অমর যেন হাতে স্বর্গ পাইল। সোৎসাহে বলিল, পারবো, পারবো, সব পারবো! পারতেই হবে, না পারলে চলবে কেন বলো? তা তুমি ভাই একটু চেষ্টা করে' কাজটা

জোগাড় করে' দাও। খাটুনিকে আমি ভয় করি না। আমার গায়ে জোর আছে, মাথায় মগজও আছে! কিন্তু দেরী কোরোনা ভাই, ও-বাড়িতে আর চলচে না, বুঝতে পারছো বোধ হয়!

অমিয় বলিল, পারছি বৈ কি কতকটা। শেষ পর্য্যন্ত বনলো না তাহলে? কি করে' যে এতকাল বনছে সে-কথা অনেকদিন ভেবেছি। তেলে আর জলে কি কখনো মিশ খায় ভাই? আমাদের জাত যে আলাদা!

৩৮

চিন্তাহরণ

বিবিধ জটিল ও দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসক চিন্তাহরণ রুদ্র কোথায় এবং কবে চিকিৎসা-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিল তাহা জানিবার উপায় ছিল না, তবুও সে যে উক্তশাস্ত্রে সুপণ্ডিত তা তার তেতালা বাড়ি দেখিয়া কে অবিশ্বাস করিতে পারে? গলির মধ্যে হইলেও কলিকাতা শহরে তেতালা বাড়ি ভাড়া করিয়া থাকা বড় যে-সে লোকের কর্ম্ম নয়।

বাড়ির দ্বারে চিন্তাহরণের নাম দেখিয়া যদি কেহ বাড়িখানি তারই বলিয়া অনুমান করে তাহাকে ত দোষ দেওয়া যায় না! বাহির দেখিয়াই বাহিরের লোকে বিচার করে, ভিতরের কথা তাহারা কিরূপে জানিবে? কিন্তু ভিতরে একটু কথা ছিল—সেই কথাই বলিতেছি।

উৎকৃষ্ট তিনখানি ঘরে চিন্তাহরণ সপরিবারে বাস করে, বাকি ঘরগুলি সে ভাড়া দেয়। এই উপায়ে যা আয় হয় তাহাতে সমস্ত বাড়ির ভাড়া কুলাইয়াও বেশ কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। ফলে চিন্তাহরণ অতি সহজে কলিকাতা-হেন শহরের বাড়ি ভাড়া জোগাইবার কঠিন চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল।

দুঃখের বিষয়, এমন যার বুদ্ধি তার একখানির বেশি হাত ছিল না। ডানহাতখানি কিরূপে নষ্ট হইয়াছিল আমাদের জানা নাই, তবে চিন্তাহরণের তাহাতে বিশেষ অসুবিধা হইত না বলিয়াই মনে হয়। বাঁ হাত দিয়া রোগীর নাড়ী টিপিয়া, সে কোথায় কবে কাহাকে [illegible] রোগ হইতে নিরাময় করিয়াছিল, [illegible] মহারাজা তাহাকে হাজারটাকা-দামের শাল উপহার দিয়া তাহাকে তাঁর গৃহ-চিকিৎসক হইয়া থাকিবার জন্য সাধাসাধি করিয়াছিলেন, কিন্তু, জনসাধারণের সেবাই তার জীবনের মূলমন্ত্র হওয়ায় সে-প্রস্তাব সে ধন্যবাদের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, ইত্যাকার কাহিনী সবিস্তারে বর্ণন করিতে করিতে তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিত, তার পরম ভাগ্য সে কলিকাতার হাতুড়ে ডাক্তারদের খপ্পর এড়াইয়া তার মত বিচক্ষণ ডাক্তারের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, নহিলে কি যে হইত ভাবিতেও গা কাঁপিয়া উঠে! তারপর রোগীর ভ্রূর উপর খানিকটা কালো মলমের মত প্রলেপ লাগাইয়া দিয়া বলিত ইহাই চিকিৎসার সুরু, ক্রমশ অন্যান্য ঔষধ যথাসময়ে দেওয়া যাইবে। পেট ব্যথা হইতে যক্ষ্মা পর্য্যন্ত সকল ব্যাধিরই চিকিৎসা-প্রণালী একই রকম—ইহাই ছিল চিন্তাহরণের চিকিৎসার বিশেষত্ব।

সস্ত্রীক অমর যেদিন চিন্তাহরণের কাছে দোতালার দুখানি ঘর ও সিঁড়ির তলায় একটুখানি রাঁধিবার জায়গা মাসিক ষোলো টাকায় ভাড়া লইল, সেদিন সে ঘরদুখানির রূপ দেখিয়া তুষ্ট হইল না বটে, কিন্তু এত সত্বর নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিয়াছে ভাবিয়া তার আনন্দ ও গৌরবের সীমা রহিল না। হোক না ঘরগুলা অন্ধকার, হোকনা সেগুলা বায়ুবর্জ্জিত, হোক না তা তুচ্ছ দীনহীন—তবুও সেই ঘর তাহার স্বোপার্জ্জিত অর্থে ভাড়াকরা। তার মধ্যে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অভাব হয় ত ঘটিতে পারে, কিন্তু সেখানে আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই!

পঞ্চাশ টাকা মূলধনে অমর সংসার পাতিল। বিভিন্ন সময়ে বাংলা মাসিকে লিখিয়া যে সামান্য দক্ষিণা পাইয়াছিল

তাহা যে এমন দুঃসময়ে কাজে লাগিবে, সে কখনো কল্পনাও করে [illegible] বলে, যাকে রাখো সেই রাখে। যা না হইলে নয় [illegible] সব সাংসারিক খুঁটিনাটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র সেই টাকায় কেনা হইল। বিবাহের যৌতুক দুজনের কাপড়-চোপড় যা ছিল কিছুকাল তাহাতে বেশ চলিবে ভাবিয়া অমর নিশ্চিন্ত হইল।

প্রথম মাসের খরচের পর প্রায় দশ টাকা বাঁচিল দেখিয়া অমর হিসাব করিতে বসিল। অন্তত ঐ পরিমাণ অর্থ মাসে মাসে রাখিতে পারিলে বছরে জমিবে শতাধিক টাকা! অতএব বছরখানেক মাত্র মাধুরীকে কষ্ট করিয়া সংসারের কাজ চালাইতে হইবে, তারপর স্বচ্ছন্দে একজন ভৃত্য রাখা চলিবে! তখন মাধুরী আবার পড়াশুনায় মন দিতে পারিবে। তারপর, চিরকালই কিছু সামান্য বেতনে সে চাকরি করিবে না, আর ইতিমধ্যে একটা ভালো কাজ যে জুটিবে না তাই বা কে বলিল? মোটের উপর ভবিষ্যৎটা অমরের কাছে বেশ আশাপ্রদ বলিয়াই মনে হইল।

এমনিভাবে কিছুকাল কাটিবার পর শহরে ডেঙ্গুজ্বর দেখা দিল। ঘরে ঘরে লোকে জ্বরে পড়িতে লাগিল। অমর ও মাধুরীও বাদ গেল না। ডাক্তারের ভিজিট আর ঔষধপথ্যে সেভিংস্‌ব্যাঙ্কের খাতা দেখিতে দেখিতে শূন্য হইয়া গেল। অমর তখন আবিষ্কার করিল সংসারযাত্রায় যে-খরচটা সব চেয়ে বড় খরচ, সেই রোগের খরচটাই সে হিসাবের মধ্যে ধরিতে ভুলিয়াছিল। আর একটা কঠিন সত্য সে আবিষ্কার করিল এই যে, সামান্য আয়ের ভিতর হইতে কণাপরিমাণ করিয়া পুঁজি করিতে যতটা সময় লাগে অবস্থাবিশেষে খরচ হইতে তার শতাংশের একাংশ সময়ও লাগে না।

দুজনে সারিয়া উঠিল, কিন্তু কিছুকাল ধরিয়া শরীরে মোটেই বল পাইল না। ক্ষুধা জিনিসটা একরকম লোপ পাইল, দেহমন কেমন যেন বিকল হইয়া গেল। কিছু কাল বিশ্রাম করিতে পারিলে ভালো হয়, কিন্তু তার ত উপায় নাই! দিন দশ বারো কামাই, ইহাতেই মুনিবের মুখ পেচার মত গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। আরও ছুটি সে কোন্ সাহসে চাহিবে? মাধুরী সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে—তাহাকে একহাতে যে সংসার চালাইতে হয়! চাকর রাখিবার ত সঙ্গতি নাই! অতঃপর অমরের কাছে সংসারটা খুব রমণীয় বলিয়া বোধ হইল না, ভবিষ্যতের জলুসটাও অনেকখানি ম্লান হইয়া আসিল। জীবনতন্ত্রী যেন বেসুরা বাজিতে সুরু করিল।

অমর যে-কাগজের আপিসে কাজ করে তার নাম 'স্বাধীনতা'। স্বাধীনতায় মানুষের জন্মগত অধিকার, ইহাই প্রচার করা ছিল ঐ কাগজের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য অমর ও অমিয়, দুই বন্ধু, উদয়াস্ত যে-পরিমাণ খাটিত তাহা আদর্শ ক্রীতদাসের খাটুনি নয় কেহ বলিতে পারিবে না।

যে-কুঠরিতে বসিয়া তাহারা কাজ করে, তার মধ্যে দিনের বেলাও আলো জ্বালিতে হয়—ঘর এমনি অন্ধকার। সে-ঘর এত ছোট যে পায়রার খোপের সঙ্গে তার তুলনা করিলে খুব বেশি অত্যুক্তি করা হয় না, তাও আবার এমনি টেবিল-চেয়ার-আলমারি-কণ্টকিত যে হাত-পা মেলিবার পর্য্যন্ত ঠাঁই নাই। সেইখানে মোমবাতির স্তিমিত আলোয় দুই নিঃসম্বল স্বপ্নবিলাসী সারাদিন ধরিয়া হরেকরকমের টাইপে ছাপা প্রুফ সংশোধন করিতে থাকে। তাহাদের ঘাড় ব্যথা করে, চোখ টাটাইয়া উঠে, সেই অবসরে কখন যে মধ্যাহ্ন অপরাহ্নে এবং অপরাহ্ন সায়াহ্নে গড়াইয়া পড়ে তার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারে না। দিনের কাজ সাঙ্গ করিয়া ক্লান্ত চোখ ও মন লইয়া পথে বাহির হইয়া তাহারা দেখে গ্যাসের আলো জ্বালা হইয়াছে—স্বল্পালোকিত অন্ধকার হইতে তারা আলোকিত অন্ধকারে আসিয়া পৌঁছে। বাড়ি ফিরিয়া কিন্তু অমরের মনে হয়, আপিস ও বাড়ি এই দুই খোপের মধ্যে শেষেরটিই ভালো,

কারণ সেখানে মাধুরীর মধু আছে। প্রথমটির সমস্তই বিস্বাদ।

অমর বাড়ি ভাড়া লইয়াছিল শীতকালে, কাজেই একটুখানি ঘরে স্বল্পপরিসর শয্যায় দুজনে শুইতে কষ্ট ছিল না। কিন্তু শীতান্তে দিনে দিনে গ্রীষ্মাধিক্যের সঙ্গে সেই বায়ুবর্জ্জিত ঘরে বাস করা কষ্টকর হইয়া উঠিল। সেই ঘরের তলায় চিন্তাহরণের রান্নাঘর আর ওষুধের কারখানা, অষ্টপ্রহর সেখানে উনুন জলিতেছে, অমরের ঘর শীতল হইবার জো কি! তার উপর পোড়া রসুন এবং অন্যবিধ ভেষজের উগ্রগন্ধে শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়, মনে হয় ঘর ছাড়িয়া কোথাও পালাইতে পারিলে প্রাণ বাঁচে, কিন্তু যাইবারই কি ঠাঁই আছে! উপরের ছাদে সন্ধ্যা হইলেই তেতালার ভাড়াটেরা গড়া-গড়া শুইয়া পড়ে, রবাহুত সেখানে যাইতে সংকোচ বোধ হয়। অগত্যা অনেকদিনই বিনিদ্র-নয়নে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে বসিয়া বসিয়া তাহাদের রাত কাটাইতে হয়।

এমনি একদিন প্রায় মাঝরাতে ডাক্তারের রান্নাঘর হইতে নারীর আর্ত্তনাদ ধ্বনিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে শুনা গেল সপুত্র চিন্তাহরণের তর্জ্জন গর্জ্জন। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য দুজনে ঘরের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, ডাক্তারের যুবক পুত্র সুনীতিকে জুতা-পেটা করিতেছে এবং ডাক্তার নিকটে দাঁড়াইয়া তার এক-মাত্র হাত আস্ফালন করিয়া বিকট মুখভঙ্গীসহকারে সেই পাপকর্ম্মে পুত্রকে উৎসাহিত করিতেছে।

সুনীতি বিধবা। ডাক্তারের গ্রামেরই এক দীনহীন-সংসারের মেয়ে। বহুদিন হইতেই না কি ডাক্তার-পরি-বারের আশ্রয়ে আছে। তার মসীবর্ণ দেহ কঙ্কালসার, বহু-কালের অযত্নে এবং তৈলাভাবে মাথার চুল রুক্ষ ও জটপড়া, পরণে তেলকালিমাখা বহরে-ছোট এক খণ্ড ছিন্ন বাস—সে যেন দারিদ্র্য ও দুর্দ্দশার প্রতিমূর্ত্তি! সে একাধারে ডাক্তার-পরিবারের পাচিকা ও পরিচারিকা। কেবল খাটুনিতেই তার অধিকার—আর কিছুতে তার অধিকার নাই। উচ্ছিষ্ট খাইয়া সে প্রাণধারণ করে, [illegible] সে তার লজ্জা নিবারণ হয় না, অনুক্ষণ সে এ[illegible] একটা ফরমাশ খাটিতেছেই, কখন যে সে বিশ্রাম করে ভগবানই জানেন। অথচ তারই পুরস্কার এই অপমান আর অত্যাচার!

অমর ভাবিল, দূর ছাই এ নীচ সংস্পর্শে আর থাকা নয়! অন্য কোথাও উঠিয়া যাইব! কিন্তু ঘরে ফিরিয়া শান্তমনে যখন ভাবিয়া দেখিল তখন তার অতি দুঃখে হাসি পাইল। চালচুলো যার কিছুই নাই তাহাকে এই সস্তা বাড়িতেই থাকিয়া নারী-নির্য্যাতন দেখিতে হইবে বৈ কি! দরিদ্রের আবার ইচ্ছা অনিচ্ছা!

অমরের মন দমিয়া গেল। মনে পড়িল, প্রবাস-জীবনে নারী-নির্য্যাতন অসহ্য বোধ হওয়ায় সে বাড়ি বদল করিয়া-ছিল। কিন্তু তখন তার হাতে ছিল প্রচুর অর্থ। আজ সে-জিনিসটার বড়ই অভাব!

দিনের পর মাস, মাসের পর বছর কাটিয়া গেল। এক-দিন যুরোপের নরমেধ যজ্ঞ সুরু হইল। তার প্রচণ্ড ধাক্কা ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিল। আমদানী রপ্তানির কাজ অচল হইল বলিলেই চলে। সদাগরি বা সরকারি আপিস, সর্ব্বত্রই গরীব কেরানিকে কোপ মারিয়া ব্যয়-সংক্ষেপের চেষ্টা চলিতে লাগিল। জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য, সেই সুযোগে চিন্তাহরণ দুটাকা ভাড়া বাড়াইয়া দিল।

এতদিন কাপড়-চোপড় যা ছিল তাহাতেই চলিয়াছে, এখন সেগুলা শেষ হইয়াছে, অথচ কাপড় কেনা একপ্রকার অসম্ভব। অমর যা বেতন পায় তাহাতে কষ্টেসৃষ্টে খাই-খরচটা পর্য্যন্ত চলে, তার বেশি নয়। কালেভদ্রে দু'এক-দিন দুজনে বেড়াইতে বার হইত, তা-ও বন্ধ করিতে হইল সঙ্গতির অভাবে। জীবন একঘেয়ে নিরানন্দ হইয়া উঠিল। চিন্তাহরণের বাড়ি মাধুরীকে জেলখানার মত গ্রাস করিল।

আটা ও ঘিয়ের দাম বড় চড়া, অগত্যা দু'বেলাই ভাতের ব্যবস্থা হইল। অনভ্যাসবশত খাইতে দুজনেরই

কষ্ট [illegible] কিন্তু [illegible]বার সময় মাধুরী বলে, কিসের অসুবিধে, বেশ ত [illegible] অমর বলে, রুটিলুচি খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে' [illegible] এখন দেখলে গায়ে জ্বর আসে!

তবুও খরচে' কুলায় না, আরো ব্যয় সংক্ষেপ দরকার। ভাবিয়া চিন্তিয়া অমর মাধুরীর অগোচরে নিজের অপরাহ্নের জলযোগটা বন্ধ করিয়া দিল। দু'আনার কমে জলযোগ হয় না—মাসে যে অনেক পড়িয়া যায়!

প্রথম প্রথম ভারি কষ্ট হইত। নটার সময় ভাত খাইয়া সারাদিনের খাটুনির পর অপরাহ্নে সে ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িত। এক একদিন কিছুতেই থাকিতে না পারিয়া এক পয়সার মুড়ি বা চিনাবাদাম চিবাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করিত। পেট ত ভরিতই না, উপরন্তু অনুশোচনা হইত। মনে হইত, মাধুরীও ত জলখাবার খাইতে পায় না, তবে সে কেন স্বার্থপরের মত তাহাকে বঞ্চনা করিয়া এমন করে? ছি ছি এ যে মহাপাপ! শেষে অমর সেই একপয়সার জলযোগও বন্ধ করিয়া অনুশোচনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইল।

বেশভূষায় অমর ভারি সৌখীন ছিল। ময়লা বা ছেঁড়া কাপড় জামা বা জুতা পরিতে তার গা ঘিনঘিন করিত—কদাচ সেরূপ অবস্থায় কারো সম্মুখে পড়িলে সে ভারি লজ্জা ও সংকোচ বোধ করিত। আজকাল কিন্তু তার তালিদেওয়া জুতায় পালিশ পড়ে না, সপ্তাহে এক বারের বেশি ধোপদস্ত পোশাক পরা চলে না। অনেক সময় সে পচা পুরানো ছেঁড়া কাপড় নানা কসরত করিয়া সাবধানে পরিয়া ভয়ে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া চলাফেরা করে। সব চেয়ে কষ্ট হয়, যখন সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিয়া দেখে মাধুরীর নিরানন্দ শ্রান্ত মুখ আর তার মলিন বেশ। কাজকর্ম্ম সারিয়া দিনশেষে পরিবার মত তার একখানা ধোয়া শাড়ী পর্য্যন্ত নাই। কাজের ভিড়ে সবদিন তার চুল পর্য্যন্ত বাঁধা হইয়া উঠে না।

ঘরে ফিরিলেই অমরের মনে হয় চারিদিক হইতে অভাব ও অসচ্ছলতা কদর্য্য মুখ বাহির করিয়া তাহাকে যেন বিদ্রূপ করিতেছে। মেঝেয়-পাতা মলিন বিছানার উপর বসিয়া বসিয়া অবরুদ্ধ কক্ষের শূন্য দেয়ালের উপর তার দৃষ্টি আহত হইয়া ফিরিয়া আসে, বুকের ভিতরটা আইঢাই করিতে থাকে। মন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে, কোথায় গেল আমার কল্পনার বৃন্দাবন, কোথায় সে চাঁদের আলো ফুলের গন্ধ আর মুরলীর ধ্বনি? কোথায় গেল সে নিশ্চিন্ত অবসর, সে প্রানের প্রাচুর্য্য, হাসি গান গল্পের সেই অফুরন্ত উৎস? কোন্ পাপে কোন্ গুরু অপরাধে আজ আমি এই পশুর মত জীবন যাপন করিতেছি?

৩৯

বসন্তের বাঁশি

অমর ডাকিল, মধু!

মাধুরী আসিয়া ঘরে ঢুকিল। জিজ্ঞাসা করিল, ডাকচো?

অমর বলিল, হ্যাঁ। পত্নীর মুখের পানে চাহিয়া বলিল, বলছিলুম কি, আজ ত রবিবার, আজ সত্যিসত্যিই ছুটি নিলে কেমন হয়?

মাধুরী ঠিক বুঝিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, তার মানে?

অমর বলিল, চলো না আজ বেড়িয়ে আসা যাক! মাঠে খুব খানিকটা বেড়িয়ে বায়স্কোপ দেখে তার পর রেস্তরাঁতে···কি বলো!

অমরের আনন্দিত মুখের পানে চাহিয়া 'না' বলিতে মাধুরীর মন সরিল না। অথচ সে জানিত হাতে টাকা নাই। তাই ঈষৎ হাসিয়া একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বলিল, বেশ ত! কিন্তু এই টানাটানির সময়...

অমর বাধা দিয়া বলিল, তা হোক! আর কিন্তুটিন্তু নয়! টানাটানি চিরকালই থাকবে কিন্তু আজকের এই দিনটা আর না ফিরতেও পারে! শুনচো না বসন্তের বাঁশি বাজছে?

তবুও মাধুরীর দ্বিধা ঘুচে না। অবশেষে অমর বলিল,

টাকা আমার কাছে আছে, সে জন্যে ভেবনা। যাও তৈরি হয়ে নাও তাড়াতাড়ি!

মাধুরীর নড়িবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। অমরের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া তার কাঁধে এক খানা হাত রাখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, টাকা নয় হল, কিন্তু কি পরে যাবে শুনি?

অমর বলিল, তার আর কি? একটা টুইলের পাঞ্জাবি আর একখানা থানধুতি হলেই চলবে।

মাধুরী বলিল, ইস্! মোটেই না! আজকের দিনে অমন বিচ্ছিরি পোশাক পরে বুঝি?

অমর হাসিয়া বলিল, সুশ্রী পোশাক আর কোথা যে পরব? আমার কি আর দশ বিশটা আছে?

মাধুরী বলিল, পোশাক আমি দেব, পরতে হবে কিন্তু!

অমর বলিল, নিশ্চয়

পতির ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা দেখিয়া মাধুরী বলিল, বিশ্বাস হয় না বুঝি? দেখবে?

বলিয়া সে ঝড়ের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

অমর সেই দিকে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল। এ যেন সেই পুরাকালের প্রথম-দেখা মাধুরী—গিরি-নির্ঝরিণীর মত চঞ্চলা ও লীলাময়ী!

ক্ষণকাল পরে মাধুরী ফিরিয়া আসিল। তার হাতে মটকার একসুট বাংলা পোশাক আর লাল রঙের একজোড়া নাগরা। সেই পোশাকে অমর বিবাহ করিতে গিয়াছিল।

অমরের চোখের সামনে সেগুলি তুলিয়া ধরিয়া মাধুরী সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন মশাই? এবার কি?

অমর কথা কহিল না। শুধু নিষ্পলক নেত্রে তার পানে চাহিয়া রহিল। মনে হইল সে শুনিতেছে নহবতে সাহানা বাজিতেছে, পুরনারীরা শঙ্খ ও উলুধ্বনি করিতেছে! সে যেন এক উৎসব-রাত্রির মধ্যে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর তারই সম্মুখে চন্দনচর্চ্চিতা সালঙ্কৃতা মাধুরী ফুলের মালা লইয়া সলজ্জ আনন্দে তার চোখের পানে চাহিয়া আছে!

পতির স্বপ্নাবিষ্ট মুখের পানে চাহিয়া মাধুরী পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিল, কি? চুপ করে রইলে যে?

অমরের হুঁস হইল। সে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ সব কোথায় এতকাল লুকিয়ে রেখেছিলে? আমার ত মনেই ছিল না।

মাধুরী শুধু সংক্ষেপে বলিল, আমি ভুলিনি!

অমর হাত বাড়াইয়া পত্নীর কটিদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিল। তাহাকে কাছে টানিয়া কহিল, তাই ত তোমায় এত ভালবাসি!

সুখাবেশে কিছুক্ষণ দুজনে নির্ব্বাক হইয়া রহিল। অমর প্রথমে কথা কহিল। জিজ্ঞাসা করিল, আমার ত হল। তুমি কি পরবে?

মাধুরী বলিল, সে তখন দেখতে পাবে। এখন ছাড়ো, কাপড় কেচে আসি!

অমর বলিল, আচ্ছা। কিন্তু যাবার আগে...বলিয়া মুখটি উঁচু করিয়া ধরিল

আলগোছে তার উপর একটা চুমা খাইয়া হাসিতে হাসিতে মাধুরী ছুটিয়া পালাইল।

মনের সাধে নিখুঁত করিয়া মাধুরী সাজিল। মাথায় এলোখোঁপা বাঁধিয়া কপালে খয়েরের টিপ কাটিয়া অধর তাম্বূল-রাগে রঞ্জিত করিল

বাসন্তীরঙে-ছোপানো শাড়ী ও ব্লাউজ পরিপাটি করিয়া পরিল—সে পোশাক মাধুরী কবে কোন্ বিস্মৃত বসন্তে রং করিয়া রাখিয়াছিল এ পর্য্যন্ত পরিবার অবসর হয় নাই। অলঙ্কারগুলিও হাতবাক্সর গর্ভ হইতে বহুকাল পরে মুক্তিলাভ করিয়া মাধুরীর অঙ্গে উঠিল। তার কানে মুক্তার দুল দুলিল, চুড়িগুলি করপ্রকোষ্ঠে রিনিঠিনি করিয়া বাজিয়া উঠিল, সূক্ষ্ম হারছড়া কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া যেন আনন্দে হাসিতে লাগিল। এই বেশে পায়ে জরির নাগরা দিয়া বেলাশেষে সে অমরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

পতির মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া মাধুরীর লজ্জা করিতে লাগিল।

জিজ্ঞাসা করিল, অমন করে' দেখছো কি? একেবারে অবাক হয়ে গেলে যে!

অমর বলিল, কতকাল পরে তোমায় এ বেশে দেখছি! এই ত তোমার আসল রূপ—এই রূপ দেখতেই আমি ভালবাসি!

পতির প্রশংসায় সুখাবেশে মাধুরীর বুক দুলিতে লাগিল, তার চোখে জল আসিল। ক্ষণেক থামিয়া ঈষৎ হাসিয়া সে বলিল, ওদিকে যে বেলা যায়, তা খেয়াল আছে?

ওঃ বলিয়া অমর শশব্যস্তে দাঁড়াইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, কটা বেজেছে?

মাধুরী বলিল, প্রায় পাঁচটা।

অমর বলিল, তুমি এখেনেই বোসো। আমি ওঘর থেকে এলুম বলে'।

পাশের ঘরে পুরানো কাপড়ে ভর্ত্তি একটা অব্যবহার্য্য তোরঙ্গ ছিল। তারি নিভৃত তলদেশে অনেকদিন হইতে অমর সিকি দুআনি আনি যখন যাহা পারিত রাখিয়া দিত, মাধুরীর অগোচরে। কিছুদিন পূর্ব্বে সে হিসাব করিয়া দেখিয়াছিল প্রায় দশ টাকা জমিয়াছে। তাহাই লইয়া সে সেদিনের উৎসব সম্পন্ন করিবে স্থির করিয়াছিল।

তোরঙ্গের ডালা তুলিয়া কাপড়ের তলায় গুপ্তধন লইতে গিয়া অমর দেখে টাকা নাই। সে কি? টাকা গেল কোথায়? নিশ্চয়ই তোরঙ্গের মধ্যে আছে! ঘরটা এরি মধ্যে বেশ অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছিল, ভালো করিয়া দেখা যায় না। একখানি একখানি করিয়া কাপড় তুলিয়া তাহা ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া অমর তার হারানিধির সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে তোরঙ্গের সুমুখে কাপড়ের ডাঁই স্তূপাকার হইয়া, শেষে তোরঙ্গ একেবারে খালি হইয়া গেল, কিন্তু টাকা পাওয়া গেল না।

অমর আসে না দেখিয়া কৌতূহলী মাধুরী আর স্থির থাকিতে পারিল না, সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, ইতস্তত ছড়ানো কাপড়, মাঝে খোলা তোরঙ্গ, আর তারই শূন্য জঠরের মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া অমর ম্লানমুখে বসিয়া আছে

ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া সে ব্যগ্রকণ্ঠে শুধাইল, এ কি করছো? এমন করে' বসে' কেন? বেলা যে গেল!

অমর বলিল, গোটাদশেক টাকা ছিল এখানে; খুঁজে পাচ্ছি না ত!

মাধুরীর আনন্দিত মুখ মুহূর্ত্তে পাংশুবর্ণ হইয়া উঠিল। ব্যাপারটা বুঝিবার আর বাকি রহিল না। অপরাধীর মত কুণ্ঠিতকণ্ঠে সে বলিল, তা দিয়ে যে সেদিন গয়লার ধার শোধ করলুম!

মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া অমর বলিল, অ! ঐ টাকা নিয়েই আজ বেড়াতে বার হব ভেবেছিলুম!

কথাটা মাধুরীর বুকে শেলের মত গিয়া বাজিল। উদ্যত অশ্রু কষ্টে রোধ করিয়া সে পাষাণপ্রতিমার মত দাঁড়াইয়া রহিল। না বুঝিয়া না জানিয়া সে পতির এত সাধে বাদ সাধিয়াছে, সে-কথাটা বুঝাইয়া বলিবার মত, তার জন্য অনুতাপ প্রকাশ করিবার মত, ক্ষমা ভিক্ষা করিবার মত ভাষা সে খুঁজিয়া পাইল না।

বাহিরে তখন রাত্রি আসিয়া বিচিত্রবর্ণ আকাশের গায়ে ধীরে ধীরে অন্ধকারের প্রলেপ মাখাইয়া দিতেছিল।

—ক্রমশ

মাতৃ-হারা তরুণ

শ্রী নলিনীকিশোর গুহ

আজ আহ্বান আসিয়াছে, তরুণ কে?—বাংলার তরুণের জীবনের গতিপথে কি আছে বা নাই, সে কথা জানিতে হয়;—জানিতে চাহিলেই, মূলে যেখানে গলদ, সেখানেও দৃষ্টি পড়িবে।

জাতির তরুণ আজ বুভুক্ষায় মৃতবৎ। এই বুভুক্ষা এক মুষ্টি অন্নের নহে,—এই বুভুক্ষা তরুণের সকল জীবন-ধর্ম্মকে ব্যাপিয়া ক্লিষ্ট করিতেছে—পঙ্গু করিতেছে।

যেমন ব্যক্তিগত জীবনে তেমনি জাতীয় জীবনে; মাতৃত্বের যা' স্বাভাবিক গৌরব, মাতৃত্বের যা' চিরন্তন অভয়-মহিমা সন্তানের দুর্ভাগ্যে যখন তাহাই অন্তর্হিত হয়, তখন বিমাতার হিসেবী এক মুষ্টি অন্নে সন্তান কোন প্রকারে জীবনটির ভার বহন করিয়া চলিতে পারিলেও, তাহার জীবন-ধর্ম্মের বিকাশ—যাহা শুধু যৌবনের সচঞ্চল গতিভঙ্গিতেই সম্ভব হইতে পারে—কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? যৌবনের গতিশীলতা যদি চাঞ্চল্যের মধ্যে জন্ম-লাভ করিতে না পারিল তবে অকাল বার্দ্ধক্যে যৌবন যে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া হঠাৎ বিবেচক, ক্রমে প্রবীণ ও স্থাণুবৎ হইয়া পড়িবে—ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

যার যৌবনের উদ্যোগ-পর্ব্ব কেবল শাসনের বাঁধনে নিয়মিত হইল, লালনের রসে পুষ্ট হইয়া ভবিষ্যৎ জীবনের বিরাট পর্ব্বের জন্য বিপুল বিকাশের জন্য শক্তির বহুমুখী ও বিচিত্র রূপকে মুক্তির মধ্যে আপনার করিয়া লইতে পারিল না, তার যৌবন সহজেই বার্দ্ধক্যের কবলিত হইবে, আশ্চর্য্য কি?

মাতৃ-হারা শিশু। বাল্য ও কৈশোরের চাঞ্চল্য বিমাতার শাসনে হঠাৎ হাহাকার করিয়া থামিয়া গেল। বেপরোয়া জীবন কে যেন আসিয়া নির্ম্মম হস্তে টিপিয়া মারিয়া গেল;—আহারে বিহারে মায়ের অভয় রূপ যে তরুণকে অভীস্বরূপ করিয়া বিশ্বের আঙিনায় ছাড়িয়া দিয়াছিল—যার সবল-পদ-বিক্ষেপে যৌবন-জীবনের সহস্র দলগুলি একে একে বিকশিত হইয়া সত্য-শিব ও সুন্দরের রূপ লইয়া মানবতাকে আনন্দিত করিতেছিল—বিমাতার লালনের হৃদয়হীনতা এবং নির্ম্মম ও বহির্মুখীন শাসনে তা নিঃশেষে শেষ হইয়া গেল। পদে পদে শাসনের নিষেধে বিব্রত হইয়া যৌবনের সহজ স্বরটি সে হারাইয়া বসিল—যা' রহিল তা' যৌবন নহে, যৌবনের নাম রূপের মধ্যে বৃদ্ধের দীন হীন কদর্য্য প্রাণ।

যে যৌবন বেপরোয়া চলিতে পাইল না, ঘোড়ায় চড়িল, আবার পড়িল, আবার উঠিল করিয়া যৌবনের শক্তি ও সত্যের সন্ধান করিতে পারিল না,—একেবারে 'শেষপাঠ' অভিভাবকেরা একদিনে শিখাইয়া দিল, সে তরুণ যে হঠাৎ বিবেচক হইয়া দেহ ও মনে বার্দ্ধক্যকেই চরম রূপে বরণ করিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? বিমাতার দেওয়া একমুষ্টি অন্নে মাতৃহারার দেহে আজও জীবন হয়ত আছে, কিন্তু তাহার যৌবনের গতিপ্রবণতা যে নির্ম্মম শাসনের প্রাবল্যে ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার যৌবনের সবল জীবন-ধর্ম্ম ত সে মার হইতে আর উদ্ধার পাইল না।

স্বাধীন জাতির দেশমাতৃকা মায়ের পূর্ণ গৌরবে গরীয়সী—মাতৃত্বের অভয় রূপ তাহাকে অভীস্বরূপ করিয়াছে। তার তরুণের কাছে সমস্ত বিশ্বের দ্বার উন্মুক্ত, অন্ততঃ মায়ের গৃহপ্রাঙ্গণ—মায়ের অঙ্গন তলে সে আদুরে দুলাল—আদুরে গোপাল;—বাধা নাই, বন্ধন নাই, ভয় নাই, ভাবনাও নাই,—তার বেপরোয়া জীবন সস্নেহ লালনে দিনে দিনে চঞ্চল;—দিক হইতে দিগন্তে—কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে তার গতি ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও মানা নাই; স্বাধীনতার সঞ্জীবনী সুধায় যৌবন কাণায়

কাণায় ভরিয়া উঠিয়াছে, নূতনকে জানিতে, নূতনকে পাইতে, নূতনকে সৃজন করিতে তার যৌবন-জীবন সদা চঞ্চল,—আর পরাধীন জাতির দেশ-মাতৃকা মায়ের গৌরবে গরীয়সী নহেন—হৃত-সর্ব্বস্বা জননী সন্তানের ভাগ্যে কর্ম্ম-ফলে মাতৃত্বের অভয়রূপ হারাইয়া—বিমাতা! এ দুঃখের থৈ নাই, উপমা নাই! দেশমাতার অঙ্গন তলে সে আজ আর আদুরে গোপাল নয়। কিন্তু যে আদুরে গোপাল ব্রজের বেপরোয়া জীবন কাটাইতে পারে ভবিষ্যতের কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ ত তাহাতেই সম্ভব।

আজ স্বাধীন জাতির শিশুর মত তাহার গতি অবাধ নহে। তাহারই মায়ের অঙ্গনমূলে বাহিরের লোক আসিয়া যেমন যদৃচ্ছা চলিতে পারে সে তাহাও পারে না, সে প্রতি পদক্ষেপে ভাবিয়া মরে, এই বুঝি গণ্ডি কাটিয়া গেল—শাসনের জুজু তাহার যৌবনের গতিবেগকে এমনি পাষাণ ভারে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যেমন ব্যক্তিগত জীবনে তেমনি জাতীয় জীবনে, এক মুষ্টি অন্ন পাইলেই তরুণ বাঁচে না। তরুণ বাঁচে যদি তার কৈশোর মাতৃত্বের অভয় অঙ্গনে সতত ক্রিয়াশীল, গতিশীল হইয়া জীবনের বিচিত্র রূপকে বিকশিত করিতে পারে। যৌবনের দেহ-মনে আত্মায় যে ক্ষুধা তরুণকে চঞ্চল করিয়া তোলে এক মুষ্টি অন্নে কি সেই বুভুক্ষা মেটে? মেটে না। মেটে না বলিয়াই ত আজ পরবশ জাতির যুবজন সকল দিক দিয়াই তারুণ্য-ধর্ম্ম-হারা, গতিহীন, উন্মাদনাহীন। নূতনকে বরণ করিবার সৃজন করিবার মত প্রাণবান সে আজ নহে।

বাংলার তরুণদের ইহাও জানিবার কথা, কেন আমাদের প্রাণ এমন নিরস হইল? কেন যৌবনোচিত কর্ম্ম-প্রবণতা, চাঞ্চল্য দেখা দিল না? কিসে আমাদের বিবেচক, অতিমাত্রায় হিসেবী, সুতরাং স্বার্থপর হীনপ্রাণ করিল? বৃহতের প্রেরণায় কেন আমাদের চিত্ত সাড়া দেয় না? বৃহৎকে বৃহৎ বলিয়া জানিয়াও আমাদের যৌবন কেন যৌবনোচিত গরিমায় বৃহতের জন্য ক্ষুদ্রকে অসত্যকে নির্ম্মম ভাবে ত্যাগ করিতে পারিল না? মুক্তির মহিমাকে স্বীকার করিয়াও কেন আমাদের যৌবন বার্দ্ধক্যেরই মত শত হিসেবী বুদ্ধিতে শত স্বার্থের খুঁটিতে আপনার কর্ম্ম-প্রবণতাকে বাঁধিয়া পঙ্গু করিয়া রাখে?

যৌবনের যাহা স্বাভাবিক ও সহজ ধর্ম্ম তাহা জাতি হিসাবে আমরা যে আজ খোয়াইয়াছি—তাহাতে আমাদের মায়ের বন্দিনী দশা—আমাদের সর্ব্বব্যাপী পরবশ্যতা যে কতটা কাজ করিয়াছে তাহাও আজ তরুণ—আমাদেরই জানিতে হইবে। কারণ দৈন্য ও ব্যাধির সবগুলি রূপই আজ আমাদের জ্ঞানে রাখা চাই

দুনিয়ার প্রায় সর্ব্বত্রই তরুণদের অগ্রগতিকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য দেশের রাষ্ট্রশক্তি কম বেশী উন্মুখ হইয়া থাকে। যুবকশক্তি তাহাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টায় রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য লাভ করে। কিন্তু তরুণ বাংলা রাষ্ট্রশক্তির তরফ হইতে কোন সাহায্যই পায় নাই—পাইবেও না; বরং নির্ম্মম বিরোধিতা পথের বাধাকে পর্ব্বত প্রমাণ করিয়া তুলিয়াছে, তুলিবেও। কিন্তু তা' সত্ত্বেও তরুণ-বাংলা কথঞ্চিৎ যৌবনের সচল-জীবন-ভঙ্গির পরিচয় দিয়াছে, অদূর ও দূর ভবিষ্যতে আরো—আরো দিবে।

রাষ্ট্রনীতিক অস্বাভাবিক ব্যবস্থায় দেশমাতৃকা হৃত-সর্ব্বস্বা, মাতৃত্বের অভয় রূপ সন্তানের চোখে আজ ধরা দেয় না—তবু তরুণ-বাংলা সত্যের অভয় মন্ত্রের সন্ধান করিতে পারিয়াছে, তাহার অভীস্বরূপ হইবার সাধনা—অপূর্ব্ব; সমস্ত দুঃখ, দৈন্য, ব্যর্থতা লইয়াও তাহা অনন্য সাধারণ। তরুণ বাংলাকে তাহা জানিতে হইবে। তরুণকে আত্মশ্লাঘা করিতে বলি না, কিন্তু তরুণ যেন আত্মসম্বিৎ না হারায়।

মাতৃত্বের অভয় মহিমা আজ বাংলার তরুণের সম্পদ স্বরূপে নাই, তরুণকে এ কথা স্মরণ রাখিয়াই মায়ের সন্ধানে দুর্গম পথে যাত্রা করিতে হইবে;—মুক্তিসাধনার মধ্যেই মাতৃত্ব পরিপূর্ণ রূপে আত্মপ্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করিবে।

হাসি-কান্না

বিরূপাক্ষ শর্ম্মা

আমাদের সান্ধ্য বৈঠকে গল্প এবং গুজব দুয়ের প্রভাবই প্রবল, কারণ সেটি রীতিমত Representative character এর—অর্থাৎ রকমসই। ব্যবসাদার, কেরাণী, স্কুলমাষ্টার, পুলিশের লোক—সব রকমই আছেন।

আগের দিনে কমিসেরিয়াটের পেন্সনপ্রাপ্ত বড়বাবু রাম মিত্র সেনাবিভাগের জনৈক মেজরের মেম তার সাহেবকে অত্যধিক মদ্যপানের জন্য কি রকম জব্দ করেছিল তাঁর বিবরণ এ রকম উজ্জ্বল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেছিলেন যে, তা' শুনে হাসতে হাসতে আমাদের পেটে ব্যথা ধরে গিয়েছিল।

উপসংহারে রামবাবু বলেছিলেন, "সাহেব মদ খেয়ে এসে কাঁচের জিনিষপত্র যা হাতের কাছে পেত তাই ছুড়ে ভাঙ্‌ত। চা খেলে, খেয়ে বাটি আর ডিশ্ দিলে উপর দিকে ছুড়ে—সশব্দে সেগুলি মাটিতে পড়ে চুরমার হ'য়ে গেল। মাতাল অবস্থায় ভাঙ্গা কাঁচের ঝন্ ঝন্ আওয়াজ সাহেবের নাকি অত্যন্ত মিঠে লাগ্‌ত। তাই মেমের কাছ থেকে অনেক তিরস্কার লাঞ্ছনা লাভ করলেও এ অভ্যাস কিছুতেই সে ছাড়তে পারত না। অবশেষে মেম একদিন চটে বেপরোয়া হ'য়ে সেই বিপুলকায় মেজর সাহেবকে ল্যাঙ মেরে ফেলে দিয়ে তার ভুঁড়ির ওপর উঠ্‌বস্ সুরু করে দিলে। ঘণ্টাখানেক এই রকম পালোয়ানী প্রক্রিয়ার পর সাহেবের নেশা ছুটল এবং সেই অবস্থায় শুয়ে শুয়ে সে একটি মুচ্‌লেকায় সই করে দিলে যে ভবিষ্যতে কোনদিন যদি সে এই রকম জিনিষ নষ্ট করে তাহ'লে তার মেম তাকে তালাক্ দেবে। তবে তার মুক্তি হয়।"

রামবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আপনি কি এই স্বামী-দলন-নাট্যের একজন দ্রষ্টা ছিলেন না কি?"

রামবাবু একটু হেসে বলেছিলেন, "ভায়া বোধ হয় কথাটা অবিশ্বাস করছ? কিন্তু অবিশ্বাস করবার জো নেই ভায়া, কথাটি খোদ মেজর সাহেবের সর্দ্দার চাপরাশীর কাছ থেকে সকর্ণে শোনা।"

তাই সেদিন আমি প্রথমেই বল্‌লাম, "কাল গুজবের চর্চ্চা অনেক হ'য়েছে, আজ একটু গল্প হোক্। হরিবাবু কিছু বলুন, শুনি।"

হরিগুপ্ত স্থানীয় সেন্ট্‌মেরী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড্‌মাষ্টার। তিনি বল্‌লেন, "গল্প শুন্‌বে? আচ্ছা —আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার খাতা উল্টে দু' এক পাতা তোমাদের শোনাই। যা' বল্‌ব তা নিছক সত্য, তবে তা' শুন্‌তে এবং বল্‌তে গুজবের মতই অদ্ভুত

বলে তিনি গল্প সুরু করলেন:—

"তখন সবে হেড মাষ্টার হয়ে এসেছি এখানে। মাস তিনেক পরেই বাৎসরিক পরীক্ষার পরে ক্লাশ প্রমোশন হ'ল। সবে মসনদে বসেছি তা ছাড়া বয়সেও নবীন। সেই জন্যে ন্যায় বিচারের দিকে লক্ষ্য রেখে বেশ বিবেক সম্মত ভাবেই সব প্রমোশন দিয়েছি। হায়রে, স্কুলমাষ্টারের আবার বিবেক! বিবেক তো নয় বি-ভেক!"

পুলিশের দারোগা শ্যামবাবু বাধা দিয়ে বল্‌লেন,— 'বি-ভেক জিনিষটা কি মশায়?"

হরিবাবু সহাস্যে বল্‌লেন, "বিশিষ্ট ভেক আর কি! সুবিধা মত ব্যবহার করতে হয়; অসুবিধা দেখ্‌লে খুলে ফেলে আদিম স্বরূপ মূর্ত্তিতে প্রকাশ হ'তে হয়।"

শ্যামবাবু বল্‌লেন, "তাই না কি? আপনাদেরও দু'-

মূর্ত্তি আছে তাহ'লে! আমি ভাবতাম ও রকম Dual function (দ্বৈত ভাব) বুঝি পুলিশেরই একচেটে।"

রতন মল্লিক বড় ব্যবসাদার—সোণা রূপার কারবার আছে। তিনি বল্লেন, "শ্যামবাবু কিছু মনে করবেন না। পুলিশ তো বহুরূপী, তাও অকারণে, স্বেচ্ছায়। তবে ওই Dual function এর কথা যা' বল্লেন ওটা গোলামের জাতের এক চেটে। সকলকেই বোধ হয় করতে হয়, কম আর বেশী।"

শ্যামবাবু বল্লেন, "বিশেষতঃ মার কাণের মাকড়ী থেকেও সোণা সরায় বলে যাদের বিষয়ে প্রবাদ আছে তাদের তো করতে হয়ই, কি বলেন?" সকলেই হো হো ক'রে হেসে উঠ্লেন।

সওদাগরী আপিসের চাকুরে বেচারাম বল্লেন, "তা' যা' বলেছেন—কেরাণীর আত্মসম্মান যেমন। সব সময়ে তো নিজের অধিকারে নয়।"

রতনবাবু বল্লেন, "কি রকম?"

বেচারাম বল্লেন, "বাড়ীতে যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ স্বেচ্ছামত ব্যবহার করি। কিন্তু আপিসে ও জিনিষটি অচল। তাই আপিসে ঢোকবার সময় আত্মসম্মানটিকে মানে মানে দরোয়ানের হাতে জিম্মা রেখে যাই। বাড়ী ফিরবার সময় আবার তার হাত থেকে নিয়ে আসি।"

আসল কথাটা চাপা পড়ে' যায় দেখে আমি বল্লাম, "তারপর হরিবাবু, আপনার গল্পটা?"

হরিবাবু বল্লেন,—"হাঁ বলি। তার পরদিন দুপুরে আপিস-ঘরে একটি মোটা দোহারা চেহারার ভদ্রলোক ঢুকলেন। গায়ে বেশ দামী শাল, দুহাতে গোটা পাঁচেক আংটি। আমার সহকারী শিক্ষকদের মধ্যে যে কয়জন সে ঘরে ছিলেন সকলেই বেশ সন্ত্রস্ত ভাবে তাঁকে আহ্বান করলেন। তাঁদের মধ্যে একজন পরিচয় দিলেন—"মিঃ বি, বি, সোম, আমাদের সেকেণ্ড ক্লাসের নরেন সোমের ফাদার। তিনি আরও কি বল্তে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বাঙালীর এই ইংরাজী নাম পরিচয়ে আমি বিরক্ত হ'য়ে ছিলাম, তাই সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে' আগন্তুক ভদ্রলোককে নমস্কার করে' আমার সামনের চেয়ারে বসতে অনুরোধ করলাম। তিনি বসে নিজের শালের ভাঁজের উপর বার দুই হাত বুলিয়ে, দু' হাতের আংটিগুলোকে এক রকম আমার সামনে মেলে ধরে' বল্লেন,—এই নরেনের বিষয় আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি।

আমি বল্লাম, খুব আনন্দের কথা। আমি তো এই চাই। গার্জেনদের সঙ্গে শিক্ষকের 'কো-অপারেশন' না হ'লে শিক্ষাকার্য্য কখনও ভাল ভাবে চল্‌তেই পারে না। তা' দেখুন আপনার ছেলে যে খুব বোকা তা নয়, তবে অত্যন্ত কুঁড়ে ও ফাঁকিদার। আপনি যদি নিজে 'কেয়ার' নিয়ে ওকে একটু বাড়িতে খাটান তাহ'লে আসচে বারে ও অনায়াসে পাশ করবে।

মিঃ সোম বল্লেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়, 'কেয়ার' আমি খুব নেব। তাই বল্‌ছিলাম কি ওকে দিন একবারে তুলে। বয়স হ'য়েছে, ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে পড়তে ওর উৎসাহ হবে না।

আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বল্লাম, ও বিষয়ে আমায় অনুরোধ করবেন না। আমি একবার যা ঠিক করি তা' আর বদলায় না।

অদ্ভুত রকম বাজখাঁই আওয়াজের হাসি হেসে মিঃ সোম বল্লেন, আমরা সেকেলে লোক—কত হেড-মাষ্টার এল গেল দেখ্‌লুম, ও ঠিক ঠাকের অর্থ আমরা বুঝি, হেঁ হেঁ কি বলেন আপনারা?—বলে' তিনি সহকারী শিক্ষকদের দিকে ফিরে একটি চোখ বুজে ঘাড় নেড়ে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করলেন।

আমি রীতিমত অপমানিত বোধ করলাম।

নতুন হেডমাষ্টারের ভয়েই বোধ হয় অপর দিক থেকে কোন প্রত্যুত্তর এল না।

আমি একটু উষ্ণ স্বরেই বল্লাম, আপনার একথার মানে কি?

মানে? ওর মানে আপনিও বোঝেন, আমিও

বুঝি।—বলে'ই মিঃ সোমের আবার সেই রকম হাসি।

আমি তখন তীব্রকণ্ঠে বলে' ফেল্‌লাম, মানে আপনি হয় তো বোঝেন, কিন্তু আমি বুঝি না এবং আমার বোঝ-বার দরকারও নেই। আগেকার হেডমাষ্টাররা কি করে-ছেন না করেছেন সে নজীর আমার কাছে চল্‌বে না। আমি যা' ঠিক বুঝ্‌ব, তাই করব।

মিঃ সোম হঠাৎ এ রকমটি প্রত্যাশা করেন নি বোধ হয়। তাই আম্‌তা আম্‌তা করে' বল্‌লেন, তবে এই যে বল্‌লেন গার্জেনদের 'কো-অপারেশান' আপনি চান?

হ্যাঁ নিশ্চয়ই চাই, তবে সেটা "রেগুলার কো-অপারে-শান" "এ্যাব্‌নর্ম্যাল কো-অপারেশান" নয়। আর তাও ছেলেদের ভালর জন্যই চাই, ছেলেদের সর্ব্বনাশের জন্য নয়।

এতক্ষণে মিঃ সোম চটে উঠলেন। চেয়ার থেকে উঠে পড়ে এক প্রকার ধমক দিয়ে বল্‌লেন, তা হ'লে আমার কথা আপনি রাখ্‌বেন না?

আমি বল্‌লাম, আপনার অসঙ্গত অনুরোধ রাখ্‌তে একান্ত অক্ষম।

উত্তরে মিঃ সোম খালি বল্‌লেন, হুঁ। সেটা ঠিক হুঙ্কারের মতই শোনাল। তারপর গট্‌গট্‌ করে দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে একবার ফিরে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন, হরেনবাবু আমাকে উনি চেনেন না বোধ হয়, আমার পরিচয়টা ওঁকে ভাল করে' দিয়ে দেবেন।

হরেনবাবু সহকারী শিক্ষক, ইনিই মিঃ সোম বলে' অভ্যাগতের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে চাইলাম। আমার মুখ চোখের ভাব দেখে হরেন-বাবুর মুখে বিশেষ কথা ফুটল না। তিনি মাথা চুল্‌কুতে চুল্‌কুতে বল্‌লেন, উনি এখানকার একজন বিশেষ ইন্‌ফ্লুয়েন্সাল লোক, গত তিন বৎসর স্কুল কমিটির মেম্বার ছিলেন।

এই পরিচয় পেয়ে এবং মিঃ সোমের আগাগোড়া ব্যবহার মনে মনে আলোচনা করে, বিশেষতঃ তাঁর নাটকীয় প্রস্থানের কথা মনে পড়ায় আমার রাগ চলে গিয়ে হাসি পেতে লাগল। তাই একটু মুচকে হেসে বল্‌লাম, বুঝেছি—লক্ষ্মী-পেঁচা আর কি!

এর দিন দুই পরে স্কুলের মাঠে ছেলেদের একটা ক্রিকেট ম্যাচ ছিল। ম্যাচের আগের দিন মাঠে গিয়ে দেখি, মাঠের চারদিকে অনেক শিয়ালকাঁটা হ'য়ে আছে। সে কথা উল্লেখ করাতে হরেনবাবু বল্‌লেন, হ্যাঁ একটা মজুর লাগাতে হ'বে। আমি বল্‌লাম, সে কি মশাই, এর জন্যে আবার মজুর! ছেলেদের উৎসাহিত করে' তুল্‌লাম, নিজেও লেগে গেলাম। তখন বড় বড় আইডিয়ায় মগজ ভরপুর। ছেলেদের Dignity of Labour (শ্রমের মর্য্যাদা) শেখাব না? দেখতে দেখতে আধ ঘণ্টার মধ্যে মাঠ সাফ্‌।

ম্যাচ হ'য়ে গেল। তারপর দিন স্কুলে গিয়ে চিঠিপত্র দেখতে দেখতে একখানি চিঠি পেলাম। চিঠিটা অবশ্য ইংরাজীতে। লেখক লিখছেন যে তাঁর ছেলেকে দিয়ে Jackal thorn সাফ করান হ'য়েছে বলে' তিনি অত্যন্ত দুঃখিত এবং ছাত্রদের দিয়ে মুটে মজুরের কাজ করান হ'য়েছে কেন, এ বিষয়ে তিনি আমার কৈফিয়ৎ তলব করছেন। আর নিজের নামের তলায় সেণ্টমেরী স্কুল কমিটির ভূতপূর্ব্ব মেম্বার সেটা খুব বড় বড় অক্ষরে লিখে-ছেন, যা'তে পড়তে না ভুল হয়।

এর আর কোন উত্তর দিই নি। কিই বা দেব? তার পরদিন মিঃ সোম স্বয়ং এসে উপস্থিত। এসেই নির্ব্বিচারে চ্যালেঞ্জ—আমার চিঠিটার উত্তর দিলেন না যে?

ওর আর কি উত্তর দেব! নিজের কাজ নিজে করায় আমি অপমান বোধ করি না। আর শুধু ছেলেরা নয়, আমি নিজেও সে কাজ করেছি।

আপনার 'পজিসনে' বাধে না হয় তো, কিন্তু আমা-দের 'পজিসনে' বাধে।

তা' যদি বাধে আপনার ছেলেকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারেন্।

আবার সেই হুঙ্কারবাচক "হুঁ" এবং সশব্দে প্রস্থান।

পরদিন আমাদের সেক্রেটারি ওয়েবষ্টার সাহেবের কাছ থেকে ডাক এল। তিনি আমার হাতে একখানি ইংরাজী চিঠি দিলেন। চিঠিখানি তাঁকেই লেখা। চিঠিখানি এই মর্ম্মে—

আপনার হেডমাষ্টারের অনুরোধ অনুসারে আমি আমার ছেলেকে আপনার স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিতে চাই।

তার আগে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। নীচে নাম সই—বি, বি, সোম—ভূতপূর্ব্ব মেম্বার, সেণ্টমেরী স্কুল কমিটি।

চিঠিখানি পড়া হ'লে সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি?

আগাগোড়া সব ঘটনা বললাম। সব কথা শুনে সাহেব খুব হাসতে লাগলেন। শেষে আমাকে হাসতে হাসতে কয়েকটি উপদেশ দিলেন। তাঁর শেষ কথাটি এই:—

"দেখ 'নেটীভদের' মনোভাবের উন্নতির চেষ্টা করা বৃথা। কর্ত্তব্য অবশ্য করা চাই, কিন্তু সময়মত অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ। সাংসারিক ব্যাপারে কূটনীতিরই জয়জয়কার, একথা ভুলো না।

সাহেবের কথা শুনে লজ্জা ও অপমান বোধ করলাম। কিন্তু নিরুপায়, দানাপানি যার হাতে তার হাতের মার চোখ বুজেই খেতে হয়।"

রতন মল্লিক বললেন, "কিন্তু যাই বল মিঃ সোমের মত গার্জেন বেশী নেই।"

হরিবাবু বল্‌লেন, "এ বিষয়ে তুমি আমার কাছে নাবালক। আমার কাছে শোন, মিঃ সোমের মত গার্জেনের সংখ্যাই খুব বেশী। শুধু তাই নয়, আমি পরে খবর নিয়ে জেনেছিলাম যে এই সব পত্রবাণ-ছোঁড়ার ব্যাপারে সোমরূপ শিখণ্ডীর পিছনে একজন অর্জ্জুন ছিলেন। তিনি আমারই অধীনস্থ সহকারী-শিক্ষক হরেনবাবু।"

সবিস্ময়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন, তাঁর স্বার্থ?"

"তাঁর স্বার্থ? তিনি ছিলেন মিঃ সোমের ছেলের প্রাইভেট টিউটার।" ব'লে হরিবাবু চুপ করলেন।

এর আগের দিন মেজর সাহেবের গল্প শুনে যেমন হেসেছিলাম, আজ হরিবাবুর গল্প শুনে তেমনি দুঃখ হতে লাগল।

চয়নিকা
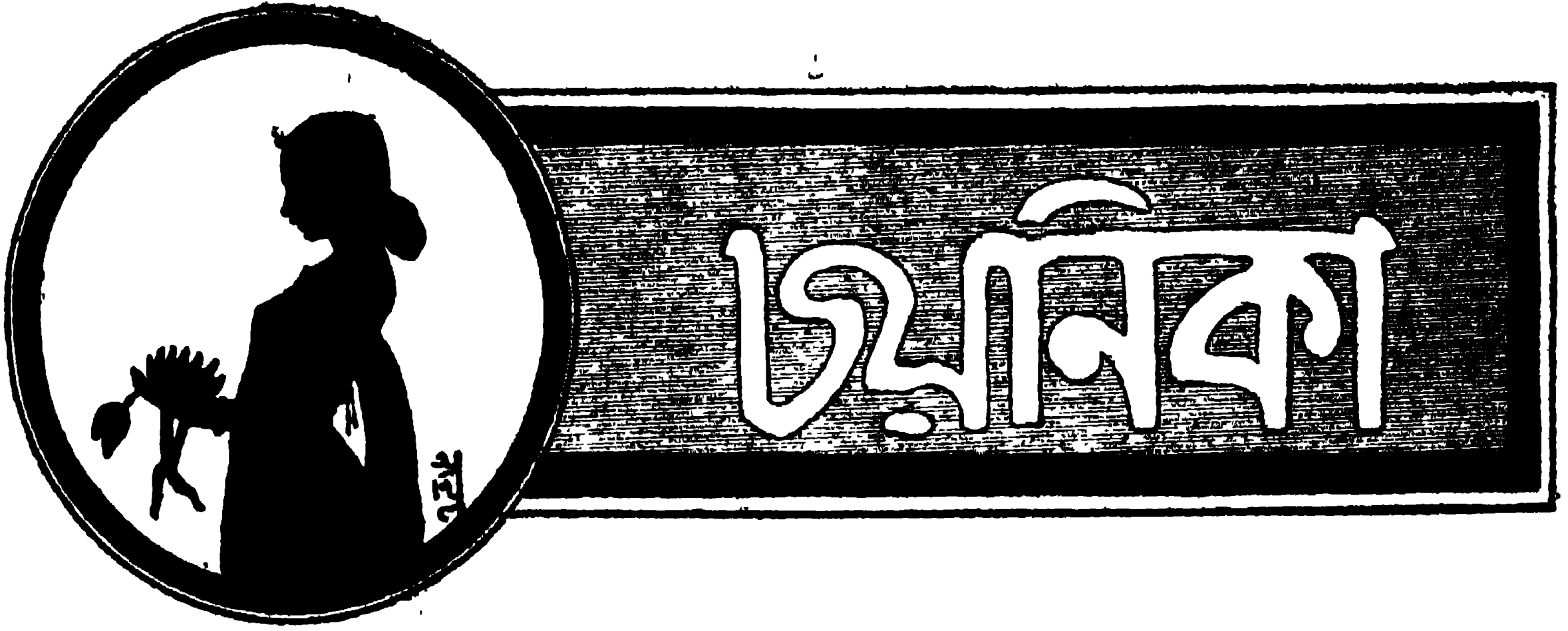
রস ও রুচি

পরশুরাম

ঋগ্বেদের ঋষি আধ-আধ ভাষায় বলিলেন—'কামস্তদগ্রে সমবর্তাধি'—অগ্রে যাহা উদয় হইল তাহা কাম। তারপর আমাদের আলঙ্কারিকগণ নবরসের ফর্দ্দ করিতে গিয়া প্রথমেই বসাইলেন আদিরস। অবশেষে ফ্রয়েড সদল-বলে আসিয়া সাফ-সাফ বলিয়া দিলেন—মানুষের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি, কমনীয় মনোবৃত্তি, তার অনেকেরই মূলে আছে কামের বহুমুখী প্রেরণা।

সেদিন কোনো এক মনোবিদ্যার বৈঠকে প্রবন্ধ শুনিয়া ছিলাম—রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সাইকো-এনালিসিস্। বক্তা পরম শ্রদ্ধাসহকারে রবীন্দ্র-সাহিত্যের হাড় মাস চামড়া চিরিয়া চিরিয়া দেখাইতেছিলেন—কবির প্রতিভার মূল উৎস কোথায়। কবি যদি সেই ভৈরবী-চক্রে উপস্থিত থাকিতেন তবে নিশ্চয়ই মূর্চ্ছা যাইতেন, এবং মূর্চ্ছান্তে ছুটিয়া গিয়া তাঁর শ্রুতিভূষণের শরণাপন্ন হইতেন।

কি ভয়ানক কথা! আমরা যা-কিছু স্পৃহণীয় বরেণ্য পরম উপভোগ্য মনে করি, তার অনেকেরই মূলে একটা হীন রিপু! ফ্রয়েডের দল খাতির করিয়া তার নাম দিয়াছেন—'লিবিডো'; কিন্তু বস্তুটি লালসারই একটি বিরাট সংস্করণ। তাও কি সোজাসুজি লালসা? তার শত জিহ্বা শতদিকে লকলক্ করিতেছে, সে দেবতার ভোগ শকুনির উচ্ছিষ্ট একসঙ্গেই চাটিতে চায়, তার পাত্র-অপাত্র কাল-অকাল জ্ঞান নাই। এই জঘন্য বৃত্তিই কি আমাদের রসজ্ঞানের প্রসূতি? 'পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ'—মনে করিতাম এই কথাটি ভগবানকে খুশী করিবার জন্য একটু অতিরঞ্জিত বিনয়-বচন মাত্র। আমরা যে এমন উৎকট পাপাত্মা তা এতদিন হুঁস হয় নাই। ভগবান আমাদের মারিয়া রাখিয়াছেন—আমাদের আবার সুরুচি-কুরুচি!

ছ'টা রিপুর মধ্যে প্রথমটারই অত প্রতিপত্তি হইল কেন? কাব্য, সাহিত্য, চৌষট্টি কলা, ভক্তি, প্রেম, স্নেহ—সমস্তই কামজ; অতি উত্তম কথা। কিন্তু ক্রোধ হইতে কিছু ভাল জিনিষ পাওয়া গেল না কেন?

গীতাকার কাম ক্রোধকে একাকার করিয়া বলিয়াছেন—'কাম এষ, ক্রোধ এষ।' লোভ মোহ প্রভৃতি অন্য রিপুও বোধ হয় তাঁর মতে কামেরই পরিণতি। ফ্রয়েডের শিষ্যগণ গীতার একটা সরল ব্যাখ্যা লিখিলে ভাল হয়।

আর একটি সংশয় আমাদের মত আনাড়িদের মনে উদয় হয়। বৈদিক ঋষি হইতে ফ্রয়েড-পন্থী পর্য্যন্ত সকলেই হয়ত একটা ভুল করিয়াছেন। আগে কাম, না আগে ক্ষুধা? ভোজন-রসই আদিরস নয় ত? কাম-কম্‌প্লেক্স যেমন নব নব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ফুটিয়া ওঠে, ভোজন কম্‌প্লেক্সেরও কি তেমন কোনো ক্ষমতা নাই?

আধুনিক 'মনোজ্ঞ'গণ বলেন—অতৃপ্তি বা নিগ্রহেই কামের রূপান্তরপ্রাপ্তি ঘটে, এবং তার ফল এই বিচিত্র মানব চরিত্র। ভোজনেরও অতৃপ্তি আছে, কিন্তু সে অতৃপ্তি তেমন তীব্র নয়, সেজন্য মানুষের মনে তার ক্রিয়া অতি অল্প। অর্থাৎ, উপবাস অপেক্ষা বিরহেরই সৃষ্টি-শক্তি বেশি। অবশ্য 'বিরহ' শব্দটির এখানে একটু ব্যাপক অর্থ ধরিতে হইবে; ন্যায্য অন্যায্য পবিত্র পাশবিক অস্বাভাবিক সমস্ত অতৃপ্তিই বিরহ, এবং তাহা মনের অগোচরেই নব-নব রূপে বিকশিত হয়।

ভোজন-কম্‌প্লেক্সের যে কিছুই সৃষ্টি করার ক্ষমতা নাই তা নয়। শোনা যায় সেকালে অনেকে খানা খাইবার জন্য ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেন,—অবশ্য তাঁরা অপরকে এবং নিজেকে আধ্যাত্মিক হেতুই দেখাইতেন। ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকার করিয়া গিয়াছেন তিনি তুচ্ছ পাঁউরুটির লোভে দিনকতক সনাতন সমাজ বর্জ্জন করিয়াছিলেন। এখনকার ভদ্র-হিন্দুধর্ম্ম অতি উদার—অন্ততঃ খাওয়া পরা সম্বন্ধে; সে জন্য লুব্ধ রসনা হইতে মনে আর ধর্ম্ম-রসের সঞ্চার হয় না। কিন্তু বিবাহের বাধা এখনো সমাজে ও উপন্যাসে অঘটন ঘটাইতেছে।

ভোজন-রস আধুনিক সাহিত্যে উপেক্ষিত হইয়াছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এ রসের প্রতি বিমুখ, আমরাও তাই বঞ্চিত হইয়াছি। কিন্তু তিনিও এর প্রভাব একবারে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কমলার উপর গাজিপুর-যাত্রী খুড়ামহাশয়ের হঠাৎ যে স্নেহ হইল, তার মূলে কিসের কম্‌প্লেক্স ছিল? খুড়ার বয়স হইয়াছে, কিন্তু ভোজন সম্বন্ধে তিনি নিস্পৃহ নন। ষ্টিমারের রন্ধনের সৌরভ পাইয়া বৃদ্ধ দীর্ঘনিঃশ্বাস টানিয়া বলিতেছেন—'চমৎকার গন্ধ বাহির হইয়াছে। ঘণ্টটা যা হইবে তা মুখে তুলিবার পূর্ব্বেই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু আমি অম্বলটা রাঁধিব মা।' তরুণ যেমন অপরিচিতা তরুণীর একটু হাসি একটু হাঁচি একটু কাশি অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবনের স্বপ্ন রচনা করে, এই বৃদ্ধও তেমনি কমলার ফোড়নের গন্ধে ভবিষ্যৎ ব্যঞ্জন-পরম্পরা প্রত্যক্ষ করিয়া অনাথা বালিকার স্নেহে বাঁধা পড়িয়াছিলেন। ফ্রয়েডের শিষ্য নিশ্চয় অন্য ব্যাখ্যা করিবেন, কিন্তু আমরা কানে আঙুল দিয়া রহিলাম।

ভোজন-রস এখন থাক,—যে রস মানুষের মনে প্রবলতম, তার কথাই হোক। কামের বিবর্ত্তনের ফলে যদি আমরা প্রেম ভক্তি স্নেহ কাব্য কলা প্রভৃতি ভাল ভাল জিনিষ পাইয়া থাকি, তবে কিসের খেদ? রসগ্রাহী ভদ্রজন ফুল চায়, ফল চায়, গাছের গোড়ায় কিসের সার আছে খোঁজ করে না। নীরস বৈজ্ঞানিক গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেখুক, সারের ব্যবস্থা করুক, আপত্তি নাই। পচা জৈবিক সারে গাছ সতেজ হয়—ইহা সার সত্য কথা; কিন্তু ফুল ফল উপভোগ করিবার সময় কেউ তাতে সার মাখায় না।

কিন্তু অতীব লজ্জা সহকারে স্বীকার করিতে হইবে যে কেবল ফুলে ফলে তৃপ্তি হয় না, গাছের গোড়ায় যে জৈবিক রস আছে তার আস্বাদও আমরা মাঝে-মাঝে কামনা করি। সামাজিক জীবনে যা পীড়াদায়ক বা ঘৃণ্য এমন অনেক বস্তু নিপুণ রসস্রষ্টার রচিত হইলে আমরা সাদরে উপভোগ করি। নতুবা শোক দুঃখ নিষ্ঠুরতা লালসা ব্যভিচার প্রভৃতির বর্ণনা কাব্যে উপন্যাসে চিত্রে স্থান পাইত না।

আসল কথা—আমাদের বহু কামনা নানা কারণে আমাদের অন্তরের গোপন কোণে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, এবং তাদের অনেকে উচ্চতর মনোবৃত্তিতে রূপান্তরিত হইয়া হৃদয় ফুঁড়িয়া বাহির হইয়াছে। ইহাতেই তাদের চরিতার্থতা। এই সকল বৃত্তি সমাজের পক্ষে হিতকর, তাই সমাজ তাদের সযত্নে পোষণ করে, এবং সাহিত্য কলায় অনবদ্য বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু যে-সব কামনা মাটি চাপা পড়িয়াছে, তারাও অহরহ ঠেলা দিতেছে। সমাজ বলিতেছে—খবরদার যদি ফুটিতেই চাও, তবে কমনীয় বেশে ফুটিয়া ওঠ। কিন্তু নিগৃহীত কামনা বলিতেছে—ছদ্মবেশে সুখ নাই, আমি স্বমূর্ত্তিতেই প্রকট হইতে চাই; আমি পাষাণ-কারা ভাঙিব, কিন্তু করুণা-ধারা ঢালা আমার কাজ নয়। সাবধানী রসস্রষ্টা স্নেহশীল পিতার ন্যায় তাদের বলেন—বাপু সব, তোমাদের একটু রৌদ্রে বেড়াইয়া আনিব, কিন্তু সাজ গোজ করিয়া ভদ্র বেশ ধরিয়া চল; আর বেশি দাপাদাপি করিও না। তৃষিত রসজ্ঞজন তাদের দেখিয়া বলেন—আহা, কাদের বাছা তোমরা? কি সুন্দর, কিন্তু কেউ কেউ একটু যেন বেশী দুরন্ত। তাদের স্রষ্টা বুঝাইয়া দেন—এরা তোমার নিতান্তই আপনার; ভয় নাই, এরা কিছুই নষ্ট করিবে না, আমি এদের সামলাইতে জানি; এদের যে বেশি দুরন্ত, তাকে আমি অবশেষে ঠেঙাইয়া দুরন্ত করিয়া দিব; যে কম দুরন্ত, তাকে অনুতপ্ত করিব; যে কিছুতেই মানিবে না, তাকেও নিবিড় রহস্যের জালে জড়িত করিয়া ছাড়িয়া দিব। দ্রষ্টার দল খুসী হইয়া বলেন—বাঃ, এই তো আর্ট। কিন্তু দু-একজন অরসিক এত সাবধানতা সত্ত্বেও শঙ্কিত হন।

আর একদল রসস্রষ্টা তাঁদের আত্মজের প্রতি অতি-মাত্রায় স্নেহশীল। তাঁরা এই সব নিগৃহীত কামনাকে বলেন—কিসের লজ্জা, কিসের ভয়? অত সাজ-গোজে দরকার কি,—যাও, উলঙ্গ হইয়া রং মাখিয়া খেলিয়া এস। জনকতক লোলুপ রসলিপ্সু তাদের সাদরে বরণ করিয়া বলিতেছেন—এই ত চরম আর্ট। কিন্তু সংযমী দ্রষ্টার দল বলেন—কখনই আর্ট নয়, আর্টে আবিলতা থাকিতে পারে না; আর্ট যদি হইবে তবে ওদের দেখিয়া আমাদের এতজনের অন্তরে এমন ঘৃণা জন্মায় কেন? সমাজপতিগণ কহেন—আর্ট ফার্ট বুঝি না; সমাজের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইতে দিব না; আমাদের সব বিধানই যে ভাল তা বলিনা—যদি উৎকৃষ্টতর বিধান কিছু দেখাইতে পার ত দেখাও; কিন্তু তা যদি না পার, তবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দোহাই দিয়া উদ্দাম প্রবৃত্তির চিত্র আঁকিয়া যে তোমরা সমাজকে উচ্ছৃঙ্খল করিবে—আমাদের ছেলে মেয়েদের বিগড়াইয়া দিবে, সেটি হইবে না। আমরা আছি, পুলিশও আছে।

এই দুই দল রসস্রষ্টার মাঝে কোনো গণ্ডি নাই—আছে কেবল মাত্রাভেদ ও সংযমের তারতম্য। ক্ষমতার কথা ধরিব না,—কারণ, অক্ষম শিল্পীর হাতে স্বর্গের চিত্রও নষ্ট হয়, গুণীর হাতে নরক বর্ণনাও মনোহর হয়। সুরুচির সীমা কে টানিবে? এক যুগ এক দল তার নিন্দা করিবে। কি নকল কি আসল যতদিন নির্দ্ধারিত না হয়, ততদিন আর্ট সম্বন্ধে সমাজ অনধিকার চর্চ্চা করিবেই।

বিধাতার রচনা জগৎ, মানুষের রচনা আর্ট। বিধাতা একা, তাই তাঁর সৃষ্টি নিয়মের রাজত্ব; মানুষ বহু, তাই তার সৃষ্টি লইয়া এত বিতণ্ডা। এই সৃষ্টির বীজ মানুষের মনে নিহিত আছে—তাহাই বোধ হয় প্রতীচ্য মনোবিদের 'লিবিডো', ঋষি-প্রোক্ত 'কাম'—

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্তাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বংধুমসতি নিরবিংদন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা॥

(ঋগ্বেদ, ১০ম ১২৯ সূ)

কামনার হ'ল উদয় অগ্রে, যা হ'ল প্রথম মনের বীজ।
মনীষা কবিরা পর্য্যালোচনা করিয়া করিয়া হৃদয় নিজ
নিরূপিলা সবে মনীষার বলে উভয়ের সংযোগের ভাব,
অসৎ হইতে হইল কেমনে সতের প্রথম আবির্ভাব।

(শৈলেন্দ্র লাহা কৃত অনুবাদ)

ঋষি অবশ্য বিশ্বসৃষ্টির কথাই বলিয়াছেন, এবং 'সৎ' ও

'অসৎ' শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থই ধরিতে হইবে। কিন্তু 'সৎ-অসৎ' এর বাংলা অর্থ ধরিলে এই সূক্তটি আর্ট সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। ফ্রয়েড-পন্থীর সিদ্ধান্ত অনুসারে অসদ্‌বস্তু কাম হইতে সদ্‌বস্তু আর্ট উৎপন্ন হইয়াছে। মনীষী কবিরা নিজ নিজ হৃদয় পর্য্যালোচনা করিয়া বোধ হয় আর্টের স্বরূপ আপন অন্তরে নিরূপিত করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু জনসাধারণের উপলব্ধি এখনো অস্ফুট। কি আর্ট আর কি আর্ট নয়—বিজ্ঞান আজও নিরূপিত করিতে পারে নাই, অতএব সুরুচি কুরুচি সুনীতি দুর্নীতির বিবাদ আপাতত চলিবেই। যদি কোনো কালে আর্টের সংজ্ঞা ভাষায় নির্দ্ধারিত হয়, তবে সমাজের শঙ্কা দূর হইবে; কারণ, আর্ট প্রচলিত সংস্কারের বিরোধী হইলেও কল্যাণের বিরোধী কখনো হইবে না।

রস কি তা আমরা বুঝি, কিন্তু বুঝাইতে পারি না। আর্টের প্রধান উপাদান রস, কিন্তু তার অন্য অঙ্গও হয়ত আছে—তাই আর্ট আরো জটিল। চিনি বিশুদ্ধ রসবস্তু, কিন্তু শুধু চিনি তুচ্ছ আর্ট। চিনির সহিত অন্যান্য রস-বস্তুর নিপুণ মিশ্রণই স্পৃহণীয়। কিন্তু যে-সব উপাদান আমরা হাতের কাছে পাই তার সবগুলিই অখণ্ড রসবস্তু নয়, অল্প-বিস্তর অবান্তর খাদও আছে। নির্ব্বাচনের দোষে মাত্রা জ্ঞানের অভাবে অতিরিক্ত আবর্জ্জনা আসিয়া পড়ে, অভীষ্ট স্বাদে বিবাদী স্বাদ উৎপন্ন হয়। তার উপর আবার ভোক্তার পূর্ব্ব অভ্যাস আছে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা আছে, ব্যক্তিগত রুচি আছে। এত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, ভোক্তার রুচি গঠিত করিয়া, কল্যাণের অন্তরায় না হইয়া যাঁর সৃষ্টি স্থায়ী হইবে, তিনিই শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা।

—বিচিত্রা, মাঘ '৩৩।

রূপের অভিশাপ

—পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর—

শ্রী নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

১২

লতিফ যাহা শুনিয়াছিল তাহা মিথ্যা নয়। ফকীরের সঙ্গে পরীর ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হইয়াছিল কাসিমের সর্ব্বনাশের সময়। যখন কাসিম দেউলিয়ার মামলায় জড়িত হইয়া হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে মারা গেল তখন পরী ফকীরকেই আশ্রয় করিয়া মামলা মোকদ্দমা চালাইতে লাগিল—কাজেই ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া চলিল।

এদিকে কাসিমের মৃত্যুর পর তার একজন পাওনাদার ভিন্নগ্রামের অলি বেপারী পরীর কাছে প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিল যে পরী যদি অলিকে বিবাহ করিতে সম্মত হয় তবেই সব গোল মিটিয়া যায়, মামলা মোকদ্দমায় অর্থ নষ্ট করিবার প্রয়োজন হয় না, কেন না এখন পরীর মামলা চলিতেছিল অলির সঙ্গে। অলি সম্পন্ন লোক, তার বয়সও চল্লিশের কাছাকাছি, সুতরাং যদিও তার প্রথম পক্ষের এক স্ত্রী এখনও বর্ত্তমান তথাপি পরী যে এ সুবিধাজনক প্রস্তাবে সম্মত হইবে না তাহা অলির মনে হয় নাই। কিন্তু পরীর উপর তখন ফকীরের আধিপত্য প্রবল। ফকীর যে নিঃস্বার্থভাবে তার জন্য এতখানি ত্যাগ স্বীকার করিয়া মামলা মোকদ্দমার তদ্বির করিতেছে সেজন্য তার প্রতি পরীর কৃতজ্ঞতা ও ঘনিষ্ঠতা অত্যন্ত গভীর হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই অলির প্রস্তাব তার মনঃপূত হইল না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ফকীর আসিলে পরী হাসিতে হাসিতে অলির প্রস্তাবের কথাটা তাকে জানাইল। কথা শুনিয়া ফকীরের মুখ কালো হইয়া গেল।

ফকীর জিজ্ঞাসা করিল, "তা তুমি কি জ'ব দিছ?"

"দেই নাই কিছু। তোমারে না জিগাইয়া কি কমু, কও? তা' তুমি কি কও'?"

ফকীর খানিকক্ষণ মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল, পরী তার মুখের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পর ফকীর বলিল, "নিকা কইরব্যা তুমি?"

"তুমি কইলে করুম, তুমি না কইলে কিছুতেই না।"

আবেগের সহিত ফকীর বলিল, "আমারে নিকা কেরবি পরী?"

এমন একটা প্রশ্নের সম্ভাবনা যে পরীর মনে কখনও উঠে নাই এমন নয়, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্ত্তে সে এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাই সে চমকাইয়া উঠিল—চট্ করিয়া কিছু বলিতে পারিল না।

ফকীর বলিল, "আমি তোমারে মুখ ফুইট্যা কিছু কই নাই পরী, কিন্তু তোমার লিগ্যা আমি পাগল হইছি—তোমার কথা মনে হইলে আর আমার কিছু ভাল লাগে না। আমার জান বাচাও পরী—আমারে নিক্যা কর, ওই বুড়ারে নিক্যা কইরো না।"

পরী মাথা নীচু করিয়া রহিল, কোনও কথা বলিতে পারিল না।

পরের দিন কিন্তু সে অলির কাছে তার ভাই রসুলকে পাঠাইয়া জানাইল যে তার বিবাহে মত নাই—মামলা চলিবে।

ফকীর তার পর রোজ আসে, রোজ কথাটা পাড়ে, পরী লজ্জায় কিছু বলিতে পারে না। কিন্তু শেষে তিন চার দিন পর সে হাসিয়া বলিল, "আইচ্ছা মুন্সী আইচ্ছা, তাই হইবো—তোমার কথা ঠেলনের সাধ্য আমার নাই।"

ফকীরের একথায় যে আনন্দ হইল তাহা সে গোপন করিতে পারিল না। গ্রামময় রটনা হইয়া গেল ফকীরের সঙ্গে পরীর বিবাহ ঠিক। সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে রটনাটা আগেই হইয়া গিয়াছিল। পরীর সঙ্গে ফকীরের ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া কথাটা অনেকটা কাণাঘুষা হইয়াছিল।

পরী ইহার পর একদিন ফকীরকে বলিল, "নিক্যা যে কইরবা আমারে, আমি কিন্তু তোমার ঘরে যামু না—সতীনের সাথে কথা কাটাকাটি কইরবার পারুম না।"

ফকীর বলিল, "তর যা হুকুম তাই হইবো পরী—আমি তর গোলাম। তুই যদি কস তবে ওয়ারে আমি তালাক দিমু।"

পরী বলিল, "না না, অমুন কামও কইরো না। সে ভাল মাইনসের মেয়ারে বিনা দোষে ক্যান তালাক দিবা? সে হইবো না।"

শেষে বন্দোবস্ত স্থির হইল যে ফকীরের বর্ত্তমান বাড়ীতে তার বর্ত্তমান স্ত্রী থাকিবে, পরী কাসিমের বাড়ীতেই থাকিবে।

সুতরাং লতিফ যে কথা শুনিয়াছিল তাহা সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্যটা সে বা গ্রামের কেহ জানিত না।

* * *

এদিকে রসুল যখন অলি বেপারীর কাছে ভগ্নীর পক্ষে দূত হইয়া গিয়াছিল তখন তার মনটা ভয়ে কাঁপিতেছিল। তার খবর শুনিয়া অলি বেপারীর খুসী হইবার কথা নয়।—অলির পক্ষে তাকে একটা গুরুতর রকম বেইজ্জত করাটা রসুল বিচিত্র মনে করিল না। কাজেই সে ভয়ে ভয়ে অলি বেপারীর কাছে নির্জ্জনে কথাটা বলিল, এবং নিজের পক্ষে অনেকটা টানিয়াই বলিল। রসুল যে পরীকে সমঝাইবার বহু চেষ্টা করিয়াছে এবং অলির হইয়া সে যে অনেক কথা বলিয়াছে সে কথা বিশেষ বাহুল্যের সহিত বলিল, এবং ভগ্নীর এই সিদ্ধান্তে যে ফকীরের অনেকটা হাত আছে তাহাও ইঙ্গিত করিল, ফকীরকেও গালিগালাজ করিতে ছাড়িল না।

অলি কথাটা গম্ভীর হইয়া শুনিল—রসুল খুসী হইয়া দেখিল যে তার খুন খারাবত করিবার রকম সকম নয়। কিন্তু যখন তারপর অলি তার সঙ্গে হাসিয়া কথা বলিল, এবং অশেষ সমাদর করিয়া তাকে খাইবার নিমন্ত্রণ করিল, তখন রসুল অবাক হইয়া গেল।

ক্রমে তার এতটা সমাদরের হেতু প্রকাশ হইল। অলির বিশ্বাস ছিল যে পরীর হাতে গোপনে অনেক টাকা আছে। সেই জন্য মোকদ্দমা জিতিয়া অন্য পাওনাদারদের সঙ্গে বাড়ীখানার ভাগের ভাগ পাইবার চেয়ে পরীকে হস্তগত করিবার উৎসাহ তার অনেক বেশী ছিল। তার সে আগ্রহ যে পরীর একটা মুখের কথায় মিলাইয়া যাইবে এমন সম্ভাবনা ছিল না। সে যখন পরীর উত্তরটা শুনিল তখন মনে মনে ফন্দী আঁটিল যে কোনও মতে পরীকে একবার হাতে পাইতে হইবে—এবং সে পক্ষে তার সহায় হইবে রসুল।

রসুল প্রথমে রাজী হয় নাই। কিন্তু নগদ পঞ্চাশ টাকা এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকটা আশা পাইয়া সে অলির প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল যে কোনও উপায়ে সে একবার পরীকে নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইবে, তারপর অলি বেপারী যাহা করিবার হয় করিবে। পঞ্চাশটা টাকা টেঁকে গুঁজিয়া রসুল সেখ অলি বেপারীকে সেলাম করিয়া হাসিমুখে উঠিয়া গেল।

ব্যাপারটা রসুল খুব সহজ মনে করে নাই, করিবার কোনও হেতুও ছিল না। কেননা পরী এখন ফকীরের কথায় ওঠে বসে, ফকীরের পরামর্শ ছাড়া তার এক পাও নড়িবার সম্ভাবনা অল্প। তা' ছাড়া তাকে পিত্রালয়ে লইবার ওজুহাত সৃষ্টি করাও কিছু কঠিন। কেন না কাসিমের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই রসুলেরা পরীর বাড়ীতেই কায়েমী ভাবে বাস করিতেছে, তাদের ভিটার সঙ্গে তাদের নিজের সম্পর্কই অল্প—সেখানে পরীকে লইবে

কি ওজুহাতে। সে ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু স্থির করিতে পারিল না। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, অলির সঙ্গে রসুল অনেকবার পরামর্শ করিল, কিন্তু কিছু হাসিল করিতে পারিল না। শেষে একদিন সে পরীর কাছে বলিল সে তার বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবে, তার ছোটভাই এখানে থাকিলেই পরীর কাজ চলিবে; সে বাড়ীতে না গেলে কাজকর্ম্মের অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে।

তখন পরী তার ঘরের উঁচু জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল। তার দৃষ্টি পড়িয়াছিল দূরের ঐ সুপারী গাছের ডগার উপর। জানালা দিয়া গাছের ডগা বই আর বিশেষ কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু ওই গাছের পাতা কটার সঙ্গে তার অনেক স্মৃতি জড়িত ছিল।

তার বিবাহের পর অনেক দিন সে হতাশ নয়নে ঐ গাছের দিকে চাহিয়াছে—সে জানিত ও গাছ লতিফের পৈতৃক ভিটায়। কাসিমকে বিবাহ করিয়া তার মনে লতিফের জন্য যে একটা ব্যগ্র আশা-শূন্য কামনা জাগিয়া উঠিয়াছিল, ও গাছের কটা পাতার দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনেক দিন তার মনে তার আগুন ধুক-ধুক করিয়া জ্বলিয়াছে। অনেক দিন সে ঐ দিকে চাহিয়া ভাবিয়াছে তার পিতার কথা।—গরীবুল্লা বলিয়াছিল কাসিম মরিয়া গেলে পরী যাকে খুসী বিবাহ করিতে পারিবে। তখন ঐ দিকে চাহিয়া চাহিয়া পরী ভাবিত, কাসিম যদি এখন মরে তবে তো সে তার বিপুল সম্পদ লইয়া লতিফকে বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারে।

তারপর যখন সে শুনিল লতিফ সর্ব্বস্বে বঞ্চিত হইয়া ধুবড়ী যাওয়া স্থির করিয়াছে, তখন সে ঐ গাছের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়াছে, মনে মনে বলিয়াছে যে আজ যদি কাসিম মরে তবে তো লতিফকে দেশত্যাগী হইতে হয় না, লতিফ যে সম্পত্তি হারাইয়াছে তা'র চেয়ে বেশী সম্পদ দিয়া পরী তাকে ধনী করিতে পারে—খোদা কি এমন করিবেন না।

কাসিম তখন মরিল না, লতিফ চলিয়া গেল। তার পর অনেক দিন সে ঐ পাতাগুলির দিকে চাহিয়া অশ্রু রোধ করিতে পারে নাই। ক্রমে সে শোক সে ভুলিয়া গিয়াছিল, অনেক দিন সে সেদিকে চায় নাই।

ফকীর যে দিন তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিল সেদিন পরীর একবার গরীবুল্লার কথাটা মনে হইয়াছিল— লতিফের কথাও একবার মনে পড়িয়াছিল। কিন্তু লতিফ দেশত্যাগী, অনেক দিন হয় তার খবর কেহ জানে না, সে বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াছে তাও কেহ জানে না! তাই সে কথা মনে হইয়া তার মনটায় একটু ছায়া পড়িলেও তাহা বিশেষ গুরুতর ভাবে পরীকে আঘাত করে নাই। কিন্তু যেদিন সে ফকীরকে কথা দিল, তার পরদিন সে অনেক দিন পর সেই সুপারী গাছের পাতার দিকে চাহিল। তার অন্তর তাকে তিরস্কার করিয়া উঠিল—বেইমানী! একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে নিজের কাছে নিজে বলিল, মেয়ে মানুষ সে, অসহায়, কি করিবে সে? একটা আশ্রয় তার চাই, ফকীরের মত আশ্রয় সে কোথায় পাইবে? তা' ছাড়া লতিফ কোথায় কে জানে? কিন্তু সাফাই সে যতই দিক, কথাটা তাকে খোঁচা দিতে লাগিল।

আজও সেই জানালা দিয়া সে সুপারী গাছের দিকে চাহিয়া সেই কথাই আপনাকে বুঝাইতেছিল। কিন্তু তার মন আজ ফিরিয়া গেল সেই অতীতের দিনে। সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল সেনবাড়ীর পুকুর পারে লতিফের কাছে পাওয়া তার প্রথম চুম্বনের। তার মনে হইল লতিফের সঙ্গে হাতে হাত ধরিয়া হারাণীর উদ্ধার-কাহিনী। মনে পড়িল তার বিবাহের কথা। সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল যে কাসিম যদি মাঝে পড়িয়া তাকে ছোঁ মারিয়া না আনিত, তবে সে লতিফকে হয় তো বিবাহ করিতে পারিত। বিবাহের দিন রাত্রেও যদি সে পরাণের মার সঙ্গে পলাইয়া যাইতে পারিত তবে—! অমনি তার মনে এক অপূর্ব্ব অভিসার অভিনয় হইয়া গেল,—লতিফের কমনীয় সুগঠিত দেহ, তার প্রেমময় দৃষ্টি সব যেন তার

মনের ভিতর একটা মাতামাতি লাগাইয়া দিল। সে স্বপ্নের সম্ভোগে সে আপনাহারা হইয়া গেল। ফকীর সুপুরুষ নয়—লতিফের তুলনায় সে যে কিছুই নয়।

রসুল আসিয়া যখন তার প্রস্তাব করিল তখন পরী এই চিন্তায় বিভোর সে মুখ ফিরাইয়া রসুলের দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিল, তার কথা ভাল করিয়া শুনিল না, বলিল, "আচ্ছা যা।"

তার পর রসুল পরীকে একদিন তার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিল—পরী বিরক্ত হইয়া বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা—তুই যা এখন।"

আশাতীত সফলতায় উৎফুল্ল হইয়া যখন রসুল চলিয়া গেল, তখন পরী আবার তার স্বপ্নের ছিন্ন সূত্রগুলি জড়ো করিয়া সেই মনোরম সম্ভোগের অনুভূতি ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু ছিন্ন সূত্রে জোড়া লাগিল না। পরী বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল।

সেদিন যখন ফকীর আসিল তখন পরীর তাকে ভাল লাগিল না। গোটা কয়েক কাজের কথায় সুধু "হাঁ" "না" গোছের জবাব দিয়া সে ফকীরকে বিদায় করিল। তার-পর তাকে ডাকিয়া বলিল, "শোন মুন্সী, আচ্ছা তোমার সে দোস্ত লতিফের কি হইছে জান কিছু?"

প্রশ্নটায় ফকীর সমস্ত অন্তরের ভিতর একটা অস্পষ্ট কম্পন অনুভব করিল। পরীকে বিবাহ করিতে অগ্রসর হইয়া লতিফের কথা তারও মনে হইয়াছিল। লতিফ যে পরীকে কি ভালবাসিয়াছিল তা জগতে জানিত সুধু ফকীর, আর সেই ফকীর আজ সব কথা জানিয়া তার বন্ধুর একান্ত আকাঙ্ক্ষিতকে হস্তগত করিতে যাইতেছে। ইহাতে তার মনের ভিতরও একটু খোঁচা দিতেছিল। পরীর রূপ গুণ, তার সঙ্গে গোপন সম্ভাষণ, গুপ্ত-মন্ত্রণা সব মিলিয়া ফকীরের মনটা এমন নাচাইয়া দিয়াছিল যে তার কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। সে বহ্নিমুখ পতঙ্গের মত ছুটিয়া চলিয়াছিল পরীর রূপ-শিখার দিকে—মোটেই গ্রাহ্য করে নাই তার বিবেকের ক্ষীণ দংশন।

যখন সফলতা তার করায়ত্ত হইল, পরী যখন সত্য সত্যই তাকে স্বামীরূপে বরণ করিতে সম্মত হইল তখন কিছুক্ষণ তার আর কোনও জ্ঞান রহিল না। কিন্তু তার পর প্রাপ্তির প্রসন্নতা ও শান্তি যখন তার অন্তরে স্থাপিত হইল তখনই তার অন্তর তাকে বলিল "বেইমান!"

তার বিবেককে ঠাণ্ডা করিবার জন্য অনেক ফকীর খাড়া করিয়াছিল। সে আপনাকে বুঝাইয়াছিল যে লতিফ তো পরীকে ছাড়িয়াই গিয়াছে। ধুবড়ী গিয়া সে একটা বিবাহ করিয়া অনেক জমী জমা পাইয়াছে—তার এখন পরীকে কোনও প্রয়োজন নাই, সে হয় তো পরীর কথা ভাবেও না; না হইলে গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে সে একখানা চিঠিও লিখিতে পারিত। আর যাই হোক, সে বিদেশে—বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াছে তারও ঠিকানা নাই। ফকীর যদি পরীকে ছাড়িয়াই দেয় তবু লতিফের তার সঙ্গে বিবাহ হইবার কোনও আশু সম্ভাবনা নাই। পক্ষান্তরে অলি বেপারী নিকটে আছে, পরী হয় তো তাকেই ইতি-মধ্যে বিবাহ করিয়া ফেলিবে ইত্যাদি।

এ সব যুক্তি সে যতই খাড়া করুক সব যুক্তিরই তলায় যে প্রকাণ্ড ফাঁক ছিল তাহা ফকীর কোনও মতেই ভরিতে পারিতেছিল না। পাঁচ বছর আগে লতিফ তাকে চিঠি লিখিয়াছিল—লতিফের ঠিকানা ফকীরের আছে। ফকীর তাকে অনায়াসে কাসিমের মৃত্যুর খবরটা দিতে পারিত, তার পর লতিফের আসা না আসা তার হাত। না আসিলে ফকীরকে দোষ দেওয়া যাইত না। আর লতিফ যে বিবাহ করিয়াছে সেটা যে কত দুর্ব্বল যুক্তি তাহা ফকীর যথেষ্টই অনুভব করিতেছিল, কেন না তার নিজের ঘরেও এখন এক যুবতী স্ত্রী বর্ত্তমান।

তাই এ কয়দিন ফকীর নিজের মনের সঙ্গে লুকোচুরী খেলিতেছিল। এই সঙ্গীন সমস্যাটার সম্মুখীন হইতে সে ভয় পায়, ইহাকে সে এড়াইয়া বেড়ায়। সুতরাং পরী যখন তাকে এই কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল তখন সে তার মনে একটা তীব্র কম্পন অনুভব করিল।

কিন্তু সে সামলাইয়া হাসিমুখে বলিল, "জানি না? সে সেখানে বিয়্যা সাদী কইর‍্যা দিব্য জমাইয়া বসছে—বিয়্যা কইর‍্যা সে নাকি কুড়ি খাদা জমীন পাইছে—বাড়ী পাইছে, আরও কত কিছু! বিয়্যার পর সে এক খান চিঠি লেখ-চিল তার পর আর তার শব্দই নাই।"

একথা শুনিয়া মনটা হাল্কা হইল, কিন্তু পরক্ষণেই মনটা অযথা ভার হইয়া গেল। লতিফ যে বিবাহ করিয়া সুখে সংসার করিতেছে ইহাতে দুঃখ করিবার কোনও অধিকার পরীর নাই—বিশেষ এখন যখন সে ফকীরকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। তবু মনটা অযথা লতিফের উপুর চটিয়া উঠিল।

ইহার পর ফকীর যেদিন বিবাহের দিন স্থির করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিল, তখন সে মনের ভিতর কোনও উৎসাহ অনুভব করিল না, সুধু বলিল, পরে দেখা যাইবে। আর কিছুই বলিল না।

১৩

সেই দিনই ফকীর বাড়ী ফিরিয়া দেখিল লতিফ তার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। তাদের পরস্পরকে চিনিতে বিলম্ব হইল না। লতিফকে চিনিবা-মাত্র ফকীরের মন ভয়ানক সঙ্কুচিত হইয়া গেল, সে তাকে ডাকিয়া সম্ভাষণ করিতে পারিল না। যেন চিনিতে পারে নাই এমনি ভাব করিয়া সে পাশ কাটাইয়া যাইতে গেল। কিন্তু লতিফ আসিয়া বাঘের মত তার উপর পড়িয়া তাব ঘাড় চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "বেইমান!"

ভয়ে ফকীরের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। ভয়ের যথেষ্ট হেতুও ছিল। একে তো তার অন্তরের অপরাধবোধ তা'কে কাবু করিয়া ফেলিয়াছিল, তাতে লতিফ ছিল ভয়ানক শক্তিমান। আর ফকীর মামলা মোকদ্দমায় যে পরিমাণ সুচতুর, শারীরিক শক্তিতে ছিল ঠিক সেই পরিমাণে দুর্ব্বল। ফকীর অনেক দাঙ্গার মোকদ্দমা তদ্বির করিয়াছে, আবশ্যক মত সাক্ষ্যও দিয়াছে, কিন্তু কোনও দিন কোনও দাঙ্গা হাঙ্গামার ধারে কাছেও তাকে দেখা যায় নাই। কাজেই এই নির্জ্জন স্থানে লতিফের হাতে আক্রান্ত হইয়া তার ভয় পাইবারই কথা। কিন্তু তা ছাড়া লতিফের চেহারা দেখিয়া তার আরও ভয় হইল। লতিফের চুল-গুলি উস্কোখুস্কো, দীর্ঘ পথ-পর্য্যটনে রুক্ষ ও শ্রীহীন তার মূর্ত্তি—রাগে তার চক্ষু দুটি অস্বাভাবিক তীব্রতার সহিত জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে—দেখিলে মনে হয় লতিফ পাগল হইয়া গিয়াছে। একে লতিফ শক্তিমান, তায় তার হাতে আছে প্রকাণ্ড বংশদণ্ড, তার উপর সে পাগল। ভয়ে ফকীর মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল।

শুধু তার তীক্ষ্ণ উপস্থিত বুদ্ধির বলে ফকীর সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল। সে বলিল, "আরে কে?—ছাড়্ ছাড়্—লতিফ নাকি—দেহযে, ভালা বিপদ—ছাড়্ না কথা শুন্—কি হইচে ক' তারপর—ছাড়্ ছাড়্ আমার গর্দ্দানটা যে ভাইঙ্গা পইলো—ছাড়্—"

গর্জ্জন করিয়া বলিল, "শালা বেইমান, তর গর্দ্দানটারে এই এক টিপিতে কবরে দিয়া তবে ছাড়ুম্। শালা—নিকা করবি—নিকার সাধ মিটামু তর এই লাঠি দিয়া।" বলিয়া এক ধাক্কা দিয়া তাকে মাটিতে ফেলিয়া লাঠি উঁচাইয়া ধরিল।

ভূমি হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া ফকীর একেবারে হাত জোড় করিয়া বলিল, "দোহাই লতিফ, মিছা কথা, খোদা কসম মিছা কথা—আমি তরে বোঝাইয়া কই শোন্।"

আপাততঃ লাঠিটা নামাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া লতিফ বলিল, "কি মিছা—পরীরে নিকা করস নাই?"

"আল্লা কসম, না।"

"না ক'রচস্, করবি তো?"

"আল্লা কসম না, তর গাও ছুইয়া কই—মিছা কথা।"

লতিফের বিশ্বাস হইল না। সে বলিল, "তবে যে সবাই কয়।"

চট্ করিয়া ফকীর বলিল, "কয় ক্যান তারা জানে—আমি কি পারি তর সেই পরীরে নিকা করতে?"

তারপর সে অনেক বক্তৃতা করিয়া লতিফকে বুঝাইল যে ব্যাপারটা এই যে অলি বেপারী পরীকে বিবাহ করিবার চেষ্টা করিতেছে, তার টাকা কড়ি ফাঁকি দিয়া লইবার জন্য। সে প্রস্তাবে বাধা দিয়াছে শুধু লতিফের জন্য। এই আজই লতিফকে সে চিঠি লিখিতে যাইতেছিল। এখন লতিফ আসিয়া পড়িয়াছে ভালই হইয়াছে। ফকীরের নিজে বিবাহ করিবার প্রস্তাব একেবারে মিথ্যা, অলি বেপারীর রচা কথা!

লতিফ যদিও একথায় বিশ্বাস করিল না, তবু সে তখনকার মত ফকীরকে মুক্তি দিয়া চলিল পরীর সন্ধানে। সে চক্ষের অন্তরাল হইবামাত্র ফকীর কাপড়চোপড় ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর একটু চিন্তা করিয়া সে ছুটিল রসুলের কাছে।

পরীর বাড়ীতে পৌঁছিয়া লতিফ সোজা অন্দরে গিয়া হাজির হইল।

পরী তখন স্নান আহার করিয়া উঠিয়া উঠানে চুল শুকাইতেছিল।—লতিফ চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। অপরূপ রূপরাশি পরীর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া তার পুষ্ট সুস্থ দেহের সর্ব্বাঙ্গ অশেষ লাবণ্যে ভরিয়া দিয়াছে। মাথাটা কাৎ করিয়া সে একধার দিয়া তার দীর্ঘ ঘন কেশ রাশি ছড়াইয়া তার ভিতর আঙ্গুল চালাইয়া সেগুলি বারবার চারিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে লাবণ্য যেন লহরে লহরে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। লতিফের বুকের ভিতর রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল—সে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া সে রূপরাশি উপভোগ করিতে লাগিল।

পরীর যখন সেদিকে চোখ পড়িল তখন সে প্রথমে একজন অপরিচিত পুরুষকে তার দিকে অমনি করিয়া চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল। একপলক মাত্র তার দিকে চাহিয়া সে ত্রস্তভাবে মাথার কাপড় টানিয়া ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া পড়িল। উঠিয়া আবার সে কি ভাবিয়া ফিরিয়া চাহিল, ঘোমটার ভিতর হইতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া রহিল। তারপর মুখ ফিরাইয়া ধীরে ধীরে ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

লতিফ গম্ভীর ভাবে অগ্রসর হইয়া ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন সেখানে কেউ ছিল না যে তাকে বারণ করে।

দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া লতিফ বলিল, "আমারে চিনলিই না পরী—এত পর আমি? আমি যে লতিফ।"

এমনি একটা সন্দেহ করিয়াই পরী দাওয়ার উপর উঠিয়া ফিরিয়া চাহিয়াছিল। এখন সে সন্দেহ নিশ্চয়তায় পরিণত হওয়ায় সে সুখী হইল কি দুঃখিত হইল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তার অন্তর কাঁপিতে লাগিল,—সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।

এ কয় বছরে পরদাটা পরীর খুব রপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাই সে লতিফের পরিচয় পাইয়াও তার সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিল না। দুয়ারের আড়ালেই ঘোমটা টানিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার চিত্তের বর্ত্তমান উত্তেজিত অবস্থায় এই পরদার আড়ালটায় সে বেশ আরাম বোধ করিল। মনের ভিতর তার যে ঝড় বহিতেছিল সেটার উপর যতটা আবরণ থাকে ততই ভাল।

লতিফ বলিল, "তুই নাকি নিকা করবি পরী? কারে? ফকীররে না অলি বেপারীরে?" তার কথার সুরের ভিতর একটা তীব্র বিষ ছিল, তাহা পরীর অন্তর ভেদ করিয়া গেল।

এ কথার কি জবাব দিবে পরী? সে চুপ করিয়া রহিল। তার নীরবতা লতিফকে উত্তেজিত করিল। পরীর রূপের আভা লতিফের ক্ষিপ্ত অন্তরে যে ক্ষণিক প্রশান্ততা আনিয়াছিল তাহা চুরমার হইয়া গেল। লতিফ উত্তেজিত হইয়া কহিল,

"এই কি তোর ধর্ম্ম হইল পরী? তোর লিগ্যা আমি দ্যাশ ছাড়চি, ঘর চাড়চি, সব ছাইড়া গিয়্যা, বনের মধ্যে পইরা আছি। আর তুই আজ নিকা করবি ঐ বেইমান ফকীররে?"

পরী আত্মরক্ষার জন্য যুক্তি খুঁজিতেছিল, যে কথাটা তার মনের গোড়ায় আসিল তাই সে বলিয়া বসিল, "তুমি না বোলে সেখানে নিকা করছ?"

"আরে সে কি একটা নিকা না ছাই। সে বউ এক বুড়ী, খাইতে পরতে দেয় তাই তারে লইয়া থাকি। তরে না পাইয়া আমি বাউরা হইয়া গেছিলাম তাই যা পাইছি তাই করচি। তার লিগ্যা তুই আমারে এমনি শাস্তি দিবি? আর তাও কই, আমি নিকা করছি—ফকীর করে নাই? অলির তো আরও দুইডা বউ আছে।"

তাড়াতাড়ি পরী বলিল, "না, না, আমি তো কাবেও নিকা করুম কই নাই।

তখন লতিফ আকুল হইয়া পরীকে সাধ্যসাধনা করিতে লাগিল।

আকুলতা তার কোনও সীমা মানিল না, সে পাগলের মত হাত পা নাড়িয়া নানা ছন্দে আবেদন করিল।

পরী সুধু দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল।

তারপর লতিফ দাঁড়াইয়া উঠিল। লাঠিখানা শক্ত করিয়া ধরিয়া সে চক্ষু গরম করিয়া বলিল, "আর ইয়াও কই তরে, আমি জানের ডর রাখি না। তরে যদি না পাই, তবে ফাঁসী যাই সেও কবুল, তবু যে তরে বিয়া করবো তারে আমি খুন করুম।"

তারপর অগ্রসর হইয়া ধপ্ করিয়া পরীর পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া সে খপ্ করিয়া তার হাতখানা ধরিয়া ফেলিল, আকুল কণ্ঠে বলিল, "ক' পরী, ক', তর একটা মুখের কথায় আমার মরণ বাচন, ক' তুই আমারে নিকা করবি?"

পরী নিশ্চল প্রস্তর মূর্তির মত এতক্ষণ দাঁডাইয়া ছিল, এখন সে সুধু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

লতিফ তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। "তবে খোদাতালার দোহাই পরী আজ হইতে আমি তর খসম আর তুই আমার কবিলা—কেমুন?"

পরী কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "হ।"

সফলতার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া লতিফ পরীর হাত ধরিয়া তাকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া বাহিরে আনিল। ঠিক সেই সময় পরীর ভাই রহিম সেখানে উপস্থিত হইল। লতিফ হাসিয়া বলিল, "আরে কেরে রহিম? তুই এত বড় হইচস্! "বলিয়া আনন্দে তার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "আমি লতিফ।"

রহিম বলিল, "ও, লতিফ ভাই, ধুবড়ী থিক্যা কবে আইলা?"

"এই অখনি—আরে ও আবদুল্লা ভাই!"

আবদুল্লা কাসিমের বাড়ী গোমস্তার কাজ করিত, তার পাটের কারবার দেখিত শুনিত—তাকে দেখিতে পাইয়া লতিফ তাকে ডাকিল। তার হাঁকা হাঁকি চেঁচামেচিতে বাড়ীর আরও সব লোকজন আসিয়া জুটিল।

লতিফ বলিল, "আবদুল্লা ভাই, আজ রাইতে কিছু খানাপিনার আয়োজন কর। গ্রামের সকলটিরে নিমন্ত্রণ করুম, ট্যাহা যা লাগে আমি দিমু।"

আবদুল্লা বলিল, "তা ইয়া আর শক্তডা কি? এহনি হাটে যাইবার লইচি, ট্যাহা দেও, আদ ফরের মইধ্যে সব আইন্যা ফালাইমুনি।"

হাসিয়া লতিফ বলিল, "ক্যান তা নি জান?"

"ক্যান?"

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া লতিফ জানাইল পরীর সহিত তার বিবাহ—খোদার নাম করিয়া তারা আজ হইতে সাদী করিয়াছে। "কও সাচা কিনা পরী?" বলিয়া সে পরীর দিকে চাহিল। পরী ঘোমটার ভিতর হইতে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিল।

হাসিয়া লতিফ বলিল, "শুনল্যা ভাই, তোমরা গওয়া রইলা।"

তারপর সে তার গাঁজিয়া হইতে কুড়িটি টাকা বাহির করিয়া আবদুল্লাকে দিল, আবদুল্লা মহা উৎসাহে বাজারে ছুটিল। লতিফ গেল অছির মোল্লার খোঁজ করিতে, সন্ধ্যা বেলায় খানাপিনার সঙ্গে সঙ্গে মোল্লা সাহেবকে দিয়া সে বিবাহটা পাকা করিয়া লইবে।

লতিফ চলিয়া গেলে পরী অবসাদে দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িল। একটা ঝড়ের মত এই যে কাণ্ডটা হইয়া গেল, তার স্বরূপ সে এতক্ষণে স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিল। বিবাহে সম্মতি দিয়া সে অসুখী হয় নাই—সম্মতি সে দিয়াছিল বরং আনন্দেরই সহিত। কিন্তু তার এখন মনে হইল যে এত তাড়াতাড়ি কাজটা না করিলেই হইত, আর এতটা জানাজানিরও কোনও প্রয়োজন ছিল না। অলি বেপারীর মামলাটা আছে, তার তদ্বিরের ভার ষোল আনা ফকীরের উপর। অথচ ফকীর যে ইহার পর তার শত্রুতা ছাড়া উপকার করিতে আসিবে না, তাহা সে বুঝিল। তাই সে শঙ্কিত হইল। কিন্তু ভাল করিয়া সে কোনও কথা ভাবিতে পারিল না; কেবল একটা অপূর্ব্ব আনন্দের সঙ্গে একটা অস্পষ্ট কিন্তু তীব্র ভীতি তার মনের ভিতর লুকোচুরী খেলিতে লাগিল।

রহিম তখন পরীকে বলিল, যে রসুল আজ একবার পরীকে লইয়া রসুলের বাড়ী যাইতে বলিয়াছে, তার শরীরটা ভাল নাই।

পরী অবসন্ন ও অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, "কি হইছে তার?"

"কি জানি কি হইছে, আমি তো দেইখলাম ঘরের মধ্যে সে লেপ মুরী দিয়া পইরা আছে!"

"চল দেইখ্যা আসি"—বলিয়া পরী উঠিয়া চলিল।

—ক্রমশ

মক্ষি-রাণী

শ্রী হেমচন্দ্র বাগচী

মধু-সন্ধানী জীবন খুঁজিছে
হৃদয়-সাথী ;—
তোমারে ঘিরিয়া গুঞ্জন তাই
দিবস-রাতি ।
শুধু ঘুরে মরি—গান গেয়ে যাই
পথের 'পরে।
কোমল-কমল-পিয়াসী পরাণ
দহিয়া মরে !

কহ' কহ' মোরে মৌন-আননা,
কি ভাষা মনে ?
বিবশ দিবস রসহীন বৃথা
অন্বেষণে !
যে ছবি হেরিব নয়নে তোমার
আবেশ-ভরা ;—
দুগ্ধ-সরিতে স্নান-শেষে যেন
হাসিবে ধরা !—

তা'রে নাহি পাই—বৃথা গান গাই
জীবন ভরি' !
ভাবি মনে হায় কবে হ'বে শেষ
এ শর্ব্বরী !

শুধু দিশাহারা অমানিশা জাগে
তৃষার সাথে ;
তরুণ জীবন-অরুণ উঠে না
মধুর প্রাতে ।

ভাবি মনে তুমি অর্পণা কিগো,
তাপসী, কৃশা—
ধুতুরার ফুলে গিরিরাজ-সুতা
পেয়েছে দিশা !
সারা প্রাণ ভরি' শুধু গৈরিক
সে উদাসিনী—
তপোমোহঘোরে ভুলে সে কামনা ;-
তাহারে চিনি ।

চির দিবসের গুণ্ঠন মাঝে
পলক লাগি'
চাহ' চাহ' ওগো করুণআননা
সহসা জাগি' ;
সে আঁখি হেরিয়া জীবনে আমার
ঘনা'বে মায়া—
ধূসর ঊষর মরুরে ঘিরিবে
মেঘের ছায়া !

আমার মানস-শতদল-তলে
মক্ষি-রাণী,
কি ধূপ-দহনে উঠিবে জাগিয়া
জানি গো জানি ।

মক্ষি-রাণী

যে দীপ-শিখারে জ্বালায়ে ধরিব
পরাণ-পণে।
শিরায় জাগিবে শিহর তাহার
পরম ক্ষণে।

সারা বিশ্বের কলভাষা পশে
শ্রবণে তব।
কত ধূপ দহে কত কামনায়
কেমনে ক'ব ?
কত সঙ্গীত কত না মালিকা
হ'য়েছে গাঁথা—
একটি গোপন মরমে তোমার
আসন পাতা।

কত জীবনের কত মধুধারা
মিলেছে এসে ;
কত উন্মন উদাসী মিলেছে
উদয়-বেশে—
সোণার গোধূলি কহিছে যেথায়
দূরের বাণী—
মহিমায় সেথা বিরাজিছ মোর
মক্ষি-রাণী !

নবকৃষ্ণের কাহিনী

জুনিয়ার্ জলধর

গা দুলাইয়া রাস্তা চলিতেছিলাম—

পশ্চাদ্দিক হইতে মিনতির সুরে আহ্বান আসিল,—বাবু মশাই, দু'টি পয়সা পেতে পারি কি?

মুখ ফিরাইয়া যাজ্ঞাকারীর মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিতেই সে করতলদুটি একত্রিত করিয়া বুকের সোজা-সুজি মাথা নোয়াইয়া নমস্কার করিল—

আমিও ফিরিয়া দাঁড়াইয়া প্রতিনমস্কার করিতে করিতে লোকটির আপাদমস্তক পরীক্ষা করিয়া লইলাম... গায়ে ময়লা একটা ছিটের কোট, পরণে ময়লা ধুতি—কোঁচা করিয়া পরা, পা নগ্ন ..মুখেচোখে এমন একটা অসহায় কাতরতার ভাব ব্যাপ্ত হইয়া আছে যাহা দেখিয়াই মনে হয়, এ ভাগ্যলক্ষীর ত্যাজ্যপুত্র...কিন্তু নিরালম্ব কুণ্ঠিত ভিক্ষালিপির মধ্যে আজন্ম অভ্যস্ত দৈন্যের ইতরতার রেখা নাই!...

'তুমি' কি 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিব সহসা তাহা স্থির করিতে না পারিয়া দুটিকেই পরিহার করিয়া মধ্যপথ অবলম্বন করিলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম,—কি চাই?

—দুটি পয়সা চাই, তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে।

কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়াই প্রশ্ন করিলাম,—জল না গাঁজা খাওয়া হবে?

স্পষ্ট দেখিলাম, লোকটার ম্লান চক্ষু ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াই নিবিয়া গেল।...অতিশয় শান্তকণ্ঠে বলিল,—নেশা কখনো করিনি। আমায় দেখে কি নেশাখোর মনে হয়!—

প্রশ্ন করিল না—

বিস্ময় প্রকাশ করিল—

তারপর যেন আপন মনেই বলিতে লাগিল,—আমি কি এমন হয়ে গেছি যে, লোকে চেহারা দেখে আমায় নেশাখোর মনে করে।

মনে মনে একটু হাসিলাম···কত ভাণ ভণিতা দুরস্ত করিয়া লইয়া তবে ঠক্ ঠকাইতে বাহির হয়।

কণ্ঠস্বর তিক্ত করিয়া বলিলাম,—কলে ত ঢের জল আছে, পেট ভরে' খেয়ে ঘড়া ভরে' বাড়ী নিয়ে গেলেও পয়সা লাগবে না।

সে বলিল,—খালি পেটে শুধু জল দাঁড়াবে না, বাবু। উঠে যাবে।

হঠাৎ কি ঘটিয়া গেল—

গায়ে কাঁটা দিয়া মনে হইল, এই অবস্থায় যদি আমায় কখনো পড়িতে হয়...

তখন যদি কেহ আমার যথার্থ ক্ষুধার তাড়নাকে নেশার দায় মনে করিয়া এম্‌নি বক্রস্বরে বিদ্রূপ করে···

কণ্ঠস্বর মোলায়েম করিয়া কহিলাম,—লেখাপড়া শেখা হয়েছিল কিছু?

—যৎসামান্য।

—তবে চাক্‌রী—

—কেউ দেয় না; সবাই বলে, কে চেনে তোমায়? জামিন্ দিতে পার? সার্টিফিকেট্ আছে? আমার যে সে সব কিছুই নেই বাবু! নিঃসহায়ের সহায় কেউ হ'তে চায় না!

কিন্তু আমার ভাগ্যে বিড়ম্বনা ছিল—

বিজ্ঞভাবে বলিলাম,—কিন্তু ভিক্ষায় যে বড় লজ্জা।

মিনিট্‌খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া ভিক্ষার্থী ব্যক্তি

পরিষ্কার অবাধকণ্ঠে আর বিশুদ্ধ উচ্চারণে হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—

কান্তাচঞ্চুপুটাঞ্চলস্থিত বিসগ্রাস গ্রহেঽপ্যক্ষমঃ।
সোঽয়ং সম্প্রতি হংসকো বিধিবশাৎ কাষ্ঠং তৃণং যাচতে॥

...সর্ব্বনাশ—সংস্কৃত যে!—

পাগলের হাতে পড়িয়াছি মনে করিয়া টানিয়া তিনবার পা ফেলিয়াই তাহাকে সাতহাত পিছনে ফেলিলাম...

কিন্তু লোকটা হতাশকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—মশাই, শুনুন শুনুন। আপনি যা' ভেবেছেন, আমি তা' নই; পাগল আমি নই; এখনো ততদূর অগ্রসর হতে পারিনি।

এ কাকুতি আমি ঠেলিতে পারিলাম না—

দাঁড়াইলাম।...

আমার পাশে আসিয়া সে বলিল,—পয়সা দিন্ বা না দিন্, দয়া করে' আমার কাহিনীটা শুন্‌তে আপনার আপত্তি আছে? বলিয়া যেন অতিশয় আশান্বিত হইয়া সে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

কাহিনী অপরূপ বা অশ্রুতপূর্ব্ব হইবে এ আশা আমি নিশ্চয়ই করি নাই—

তৈরী একটা গল্পে নিজের ভাগ্য পরিবর্ত্তনের হেতুটা কোনো কাল্পনিক একটা শঠ এবং দুর্ব্বৃত্তের স্কন্ধে চাপাইবে—

অথবা এই রকমই যা হোক্ একটা মামুলি কিছু—

কতজনকে সে-গল্পটা সে শুনাইয়াছে তার সংখ্যা নাই—

এতদিনে আমি আসিয়া তার কবলে পড়িয়াছি—

কাহিনী শুনিবার জন্য ভিতর হইতে কিছুমাত্র উৎসাহের সাড়া পাইলাম না—

পরন্তু পয়সা দিয়া কাহিনী শুনিবার দায় হইতে মুক্তি পাইবারই লোভ জন্মিল—

তথাপি না বলা চলিল না—

এই কারণে যে, প্রথমতঃ তাহাকে নেশাখোর অপবাদ দিয়া অন্যায় করিয়াছি; দ্বিতীয় অপরাধ—তাহাকে পাগল মনে করিয়াছিলাম, এবং তাহা সে টের পাইয়াছে।

অস্বীকার করিতে তাই লজ্জা করিল; বলিলাম,—নেই।

শুনিয়া তার চেহারাই বদ্‌লাইয়া গেল; তার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল; তাহার কাহিনী শুনিতে আমার আপত্তি নাই শুনিয়া রক্তে যেন নেশা ঢুকিয়া সে মজবুত হইয়া দাঁড়াইল; বলিল,—নেই। থাক্‌তেই পারে না।...আপনি জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেন, আমার এ দশা কেন?—(আমি কিন্তু জিজ্ঞাসা করি নাই)।—একথার কি জবাব দেব বলুন।...ভবিতব্য। জানেনই ত—

ভবিতব্যং ভবত্যেব নারিকেলফলাম্বুবৎ।
গন্তব্যং গতামিত্যাহুর্গজভুক্ত কপিত্থবৎ॥

আবার সংস্কৃত বল্‌ছি!...আপনি আমাকে পাগল মনে করেছিলেন, নয়?

—অস্থানে অপ্রত্যাশিত কথা শুনে ঐ রকমই মনে হয়েছিল।

—তার ওপর আবার আমার এই বেশ।—বলিয়া সে বুকের উপর দিয়া বাঁহাতখানা অলসগতিতে টানিয়া লইয়া গেল।

—কিন্তু কাহিনী?

—বলব। নব-রসায়নের নাম শুনেছেন বা শুনেছিলেন কখনো?

স্বীকার করিতেই হইল, কখন শুনি নাই।

লোকটা বিস্মিত হইয়া বলিল,—শোনেন নি?...... ভারতবর্ষের সদর মফঃস্বলে এমন স্থান নেই যেখানে তার হ্যাণ্ডবিল বিলি হয়নি, এমন ভাষার এমন কাগজ নেই

৬

যাতে নব-রসায়নের বিজ্ঞাপন ছাপা হয়নি।......একটি অতিকায় মহাবলিষ্ঠ পুরুষ দুই হাতে দু'টি গণ্ডারের পিঠের চামড়া টেনে ধরে' শূন্যে তুলে' গণ্ডার দুটোর মাথায় মাথায় ঠুকে দিচ্ছে...তার নীচে লেখা—

সৌন্দর্য্য ও বিলাসলালসাতুর চিরযৌবনপ্রয়াসী
. যুবক যুবতী, বিগতশ্রী বৃদ্ধ বৃদ্ধা
আসুন।
চিরজীবনের বাঞ্ছিতধনে চিরসঞ্চিত আশাপূর্ণ
করুন !!
মর্ত্তে অমরার অমরত্ব, স্বর্গের ভোগবিলাস,
দেবদুর্ল্লভ কান্তি গ্রহণ করিবেন—
আসুন !!!

আপনি দেখেন নি নিশ্চয়ই; দেখ্‌লে মনে থাকত। ...আমিই তার আবিষ্কর্ত্তা। অধীনের নাম শ্রীনবকৃষ্ণ দত্ত।

বলিয়া নবকৃষ্ণ চুপ করিল......

এবং আমার মুখের দিকে হা করিয়া চাহিয়া রহিল—

আমিও তার মুখের দিকে হা করিয়া চাহিয়া রহিলাম—

তাহার ক্ষৌরকর্ম্মাভাবে হতশ্রী মুখমণ্ডলে আমি কোনো ভাবই স্পষ্ট দেখিলাম না; সে আমার মুখে কি ভাবের রেখা দেখিল তাহা সেই জানে।—

নব-রসায়নের আবিষ্কর্ত্তার মুখখানি খানিক নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করিয়া প্রশ্ন করিলাম,—তারপর?

নবকৃষ্ণ বলিল,—শুনেছেন কখনো, Ruined by success in business?

ইংরেজিও বলে!—

ভাবিলাম, আজকাল এক শ্রেণীর ভিক্ষুকের আবির্ভাব হইয়াছে, যাহারা ফর্ ফর্ করিয়া ইংরেজি বলে, পলিটিক্সেও দখল আছে, ইণ্ডিয়া অফিসের খবর রাখে, এবং সমসাময়িক অন্যান্য জটিল সমস্যার এক একটি সরল সমাধান তাহারা বহুপূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছে, সব বিষয়েই তাহারা চিন্তা করে—

একটি বাদে—

নিজের উদরপূর্ত্তি কি উপায়ে হইবে সেইটি তাহারা আজন্ম ভাবিয়া দেখে নাই—

নবকৃষ্ণ তাহাদেরই একজন।—

নবকৃষ্ণ তাহার প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া বলিল,—আপনাকে বোধ হয় বিরক্ত কর্‌ছি?

আমি তাড়াতাড়ি করিয়া বলিলাম,—না না, মোটেই নয়। Ruined by success in business—একটা নতুন কথা বটে। কি করে এই অসম্ভব ঘটনা ঘটেছিল?

—দুনিয়ায় কি কিছু অসম্ভব আছে? জানেনই ত—বলিয়া বোধ হয় সংস্কৃত নজির দেখাইতেই উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু আমার ভ্রূকুটি দেখিয়া সে মহা অপ্রতিভ ভাবে থামিয়া ঢোক গিলিয়া বলিল,—মাপ করবেন, মনে ছিল না; সংস্কৃত আর আওড়াব না।...তবে শুনুন আমার কাহিনী।—

শিশি লেবেল কর্ক বিজ্ঞাপনে আমার স্বল্প পুঁজির শেষ কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত বার করে' দিয়ে যখন আমি রসায়নের কারখানা খুল্‌লাম, তখন ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারিনি যে আমায় ভিক্ষায় বেরুতে হবে।—বলিয়া নবকৃষ্ণ চুপ করিয়া যেন রোদনাবেগ সাম্‌লাইয়া লইল—

চক্ষু নত করিয়াছিল—

তুলিয়া বলিল,—দারিদ্র্যাৎ মরণমেব বরম্—বলিয়াই সে দাঁতে জিব্ কাটিল; কিন্তু আমি হাসিলাম না, ভ্রূভঙ্গীও করিলাম না।

দেখিয়া নবকৃষ্ণ খুশী হইল; বলিতে লাগিল,—শিশির কথা বলেছি না? শিশি আমায় যে কষ্ট দিয়েছে—বল্‌লে আপনি তা' বিশ্বাস কর্‌বেন কি না জানিনে।

—কি রকম?

—বলি।...পুরণো শিশি বোতল সংগ্রহ করে' সে-গুলো সাফ্ করতে বসেই বুঝলাম, লোকে কাজটাকে যত সহজ মনে করে তত সহজ সে নয়।...বিশেষ করে' ওষুদ আর তেলের শিশি—

সাবানের জল দিন্, সোডা আর জল দিন্, ভিনিগার আর জল দিন্, নুন আর জল দিন্, বালি আর জল দেন, সুরকিকুচি আর জল দিন্, ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রাণপণে ঝাঁকতে থাকুন, ভিতরে ন্যাকড়া পুরে' কাঠি দিয়ে মুছে আনুন, তারপর গরম জলে বেশ করে' ধুয়ে, আর একবার মুছে নাক ঢুকিয়ে শুঁকে দেখুন—ওষুদের এক ফোঁটা আছেই।...তারপর লেবেল।—মনে হয়, জলে ভিজ্‌লেই ত' লেবেল আপ্‌নি উঠে আস্‌বে; কিন্তু আসলে তা নয় ...শেষ পর্য্যন্ত এক টুক্‌রো শিশির গায়ে সেঁটে থাক্‌বেই; জিব্ দিয়ে চেটে তুলে না দিলে সে উঠ্‌বে না।..তারপর ছিপি।...শিশির ভেতর থেকে ছিপি বার করা যে কি পর্ব্ব তা' যিনি কোনোদিন চেষ্টা করেছেন তিনিই জানেন। সুতোর বেড় তৈরী করে' একটা শিশির ভেতর থেকে কর্ক বা'র কর্‌তে আমায় একবার তিনদিন গলদ্‌ঘর্ম্ম হ'তে হয়েছিল।···দেখুন কি কষ্টটা!—

ঘাড় হেঁট করিয়া স্বীকার করিলাম যে, শিশি এবং তন্মধ্যবর্ত্তী কর্কের জন্য তাহাকে বহু শ্রম এবং কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—নব-রসায়নের কারখানা খোল-বার পর কি হ'ল?

নবকৃষ্ণ বলিতে লাগিল,—On S.T. is the best polly, see—লিখে মনে মনে চীৎকার করে' ডাক্‌তে লাগলাম—কে আছ অশক্ত বৃদ্ধ, অকালবৃদ্ধ, আমার কাছে এস; বার্দ্ধক্যের লক্ষণ—লোল চর্ম্ম, টাক প্রভৃতি সমস্ত দূর করিয়া দিব।...কে আছ জীর্ণদেহ, রোগগ্রস্ত, ক্ষীণতনু —এস; রোগমুক্ত করিয়া তোমায় সুস্থ সবল চিরযৌবন দান করিব।...পৃথিবীতে চির-বসন্তের যৌবনমদ বণ্টন করিতেছি; কে লইবে এস।...বিজ্ঞাপনের আকর্ষণেই হোক্ কি আমার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই হোক্—সর্ব্ব-প্রথমে দেখা দিলেন এক পক্ককেশ প্রৌঢ়।

বলিতে বলিতে নব-রসায়নের প্রসঙ্গ একেবারে ছাড়িয়া দিয়া নবকৃষ্ণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি কি কাজে বেরিয়েছিলেন? আপনাকে বোধ করি আমি আটকে রেখেছি।

আমি তাহার গুরুত্বের গাম্ভীর্য্য দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলাম; বলিলাম,—না না, আমি কোনো কাজে বেরোই নি। বেশ লাগছে; বলে' যা—

"ও" কি "ন" দিয়া কথাটা শেষ করিতাম জানি না—

আমাকে শেষ করিবার মুহূর্ত্তার্দ্ধ অবসর না দিয়াই নবকৃষ্ণ বলিয়া উঠিল,—আমাকে আপনি তুমি তুমি করেই কথা কইবেন; আমি ত' ভিখিরী।

ভিখিরী ত বটেই—

কিন্তু আমি বিস্মিতই হইলাম—

আমি যে তাহাকে সমকক্ষভাবে তুমি তুমি করিতেছি না, সম্ভ্রমসূচক "আপনি" "আজ্ঞা" ও করিতেছি না, তাহা যে এই দুর্ভিক্ষের প্রতিমূর্ত্তি লক্ষ্য করিবে তাহা আমি মনের কোণেও ভাবি নাই...

অপ্রতিভও হইলাম—

এবং অপ্রতিভের মত একটু হাসিলামও।—

—"তারপর শুনে' যান্"—বলিয়া নবকৃষ্ণ বলিতে লাগিল,—প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বল্‌লেন, আমার স্ত্রী বলেন—বয়স হিসেবে আমায় না কি বেশী বুড়ো দেখায়। তিনি তা' পছন্দ করেন না। কোনো উপায় করতে পারেন কি যাতে—

রুগী পেয়ে আনন্দে আমার পূব পশ্চিম জ্ঞান ছিল না; বল্‌লাম, বিলক্ষণ!...ঐ ত' আমার কাজ।...আপনার স্ত্রী-কি তৃতীয় পক্ষের?...ভদ্রলোকটি মহাবিরক্ত হ'য়ে বল্‌লেন, সে খবরটির কি বিশেষ দরকার? ··নিজের আল্‌গা জিবটাকে একটা ধমক্ দিয়ে আমি লজ্জিত ভাবে বল্‌লাম, অনুগ্রহ করে আপনি বসুন ত' ভাল হ'য়ে, আমার দিকে

পিঠ করে, ঐ আয়নার দিকে মুখ করে।...তিনি বস্‌লেন। ...আমি তুলিতে নব-রসায়ন মাখিয়ে নিয়ে ঘাড়ের ঠিক্ ওপর থেকে সুরু করে আস্তে আস্তে বুলিয়ে বুলিয়ে তাঁর সমস্ত চুলে লাগিয়ে দিলাম—একটি পোঁচ...দেখতে দেখতে চুল লাল্‌চে হয়ে উঠল.. কাঁচা জামের মত। তখন আর এক পোঁচ। দ্বিতীয় পোঁচ শুকিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই লাল্‌চে চুল, কাঁচা জামের মত লাল্‌চে চুল—আপনি বিশ্বাস করবেন কি না জানি নে—ঠিক্ কাক চক্ষুর মত কালো হ'য়ে গেল। এক শিশি নব-রসায়ন তাঁর হাতে দিয়ে বলে দিলাম, এই ওষুদ ব্যবহার করুন... পৃথিবীর সুখ হাতের ভেতর আপ্‌সে ধরা দেবে। আহা, ভদ্রলোক সে-দিন কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গিয়েছিল।

প্রথম দফা ইতি।—

দ্বিতীয় আগন্তুক এক বৃদ্ধা।—হাঁপাতে হাঁপাতে বৃদ্ধা বল্‌তে লাগল, আর বাঁচিনে বাবা; এই দেখ, এইখানটা কেমন কাঁপছে...বলে সে হাঁটু দেখালে। তারপর বললে, কতটুকুই বা রাস্তা, আধপো হয় ত' খুব...ঐ রাস্তাটুকু হেঁটে এসে নেতিয়ে পড়েছি। তোমার ওষুদ কি গতরে তাগদ্ দেবে, বাবা? আমি বল্‌লাম, নিশ্চয়ই; তাতে কোনো ভুল নেই। বলে রবারের চাদর দিয়ে বুড়ীকে ঢেকে বসিয়ে দিলাম। নব-রসায়নের বাষ্পের ভেতর তিন কোয়ার্টার বসে থেকে যখন বুড়ী চাদর ফেলে উঠে এল তখন তার—বল্‌লে বিশ্বাস করবেন কি না জানিনে—তার আম্‌শীর মত শুক্‌নো চাম্‌ড়া ঝক্‌ঝক্ করছে......ভাঁজে ভাঁজে কুঁচকে গিয়েছিল তার চিহ্নও নেই। এক শিশি নব-রসায়ন নিয়ে বুড়ী লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গেল।

দ্বিতীয় দফা ইতি।—

তৃতীয় ব্যক্তি এলেন মাথাজোড়া টাক্ নিয়ে।... বল্‌লেন, অনেক জোচ্চোরে আমায় ঠকিয়েছে, মশাই; চুল না ওঠা পর্য্যন্ত আমি একটি পয়সা দেব না। আমি বললাম, তথাস্তু, দেবেন না। বসুন ঐ আয়নার দিকে মুখ করে। বলে তাঁর টাকের ওপর আধভরিটাক্ নব-রসায়ন ঢেলে দিয়ে মালিশ করে' বসিয়ে দিতে লাগলাম। লোকটা ঘর্ষণে আরাম পেয়ে চোখ বুজে বসে' ছিল... আধ ঘণ্টা না যেতেই সে হঠাৎ চোখ খুলে চীৎকার করে চৌকি ছেড়ে উঠে পড়ল। বল্‌লে আপনি বিশ্বাস ক রবেন কি না জানিনে—প্রথম বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যেমন ধুলো ঢেকে ঘাস গজায়, তেমনি যেন লাফিয়ে গজিয়ে উঠল তার চুল। এক মাথা টাক নিয়ে সে এসেছিল, এক মাথা চুল নিয়ে সে ডবল ফিস্ দিয়ে চলে গেল।

তৃতীয় দফা ইতি।—

তিনটি দৃষ্টান্ত দিলাম; এতেই বুঝতে পারছেন,—আমার নব-রসায়ন কি আশ্চর্য্য শক্তিসম্পন্ন জিনিষ ছিল। একদিনে সাত সাতটি লোককে যৌবন, কেশ, শ্মশ্রু, ত্বক্ দান করে যখন সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরলাম তখন মাটিতে আমার পা পড়েছিল কি না মনে নেই। কিন্তু—

করতলগতমপিনশ্যতি যস্য হি ভবিতব্যতা নাস্তি।... আমার কাজে ব্যবহারে সততার কোনো অভাব ছিল?... যে যা' আকাঙ্খা করে' এসেছিল, আমি কি তাকে তা-ই দেই নি? কিন্তু দেখুন, বাবু, বিধাতার নিষ্ঠুরতা!... আপনি আমাকে পাগল মনে করেছিলেন—আমি কেন যে পাগল হয়ে যাই নি তা' যিনি আমাকে পথের ভিখিরী করেছেন তিনিই জানেন।...যাক্।

বলিয়া নবকৃষ্ণ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিয়া নীরব হইল।...নবকৃষ্ণর মারফতে বিকালটা বেশ কাটিল ভাবিয়া আমিও নীরব রহিলাম।

অনতিকাল পরেই আর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিয়া নবকৃষ্ণ বলিতে লাগিল,—লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখছি, এমন সময় একদিন কারখানার সাম্‌নে এসে শ' দু'শো লোক দাঁড়িয়ে গেল।...উৎসাহে আনন্দে ফুস্‌ফুসের সমস্ত বাতাস বার করে দিয়ে চীৎকার করে বল্‌লাম, ভদ্রবৃন্দ, জননিগণ, একে একে।...

সর্ব্ব প্রথমে প্রবেশ করলেন একটি যুবক; নাভিকুণ্ড পর্য্যন্ত তাঁর দাড়ি গোঁফ লতিয়ে পড়েছে।...বহু সমাদর করে বল্‌লাম, বস্‌তে আজ্ঞা হোক্।—তিনি বল্‌লেন, আমার কথা দাঁড়িয়েই হবে। বলি চিন্‌তে পারছেন কি?...ঘাড় নেড়ে জানালাম যে চিন্‌তে পারছিনে।—তিনি বল্‌লেন, এখন ত চিন্‌তে পারবেন না; পয়সা নিয়ে সর্ব্বনাশ করবার বেলা বেশ চিন্‌তে পেরেছিলেন। এই দেখুন দাড়ি, এই দেখুন গোঁফ।—বলে তিনি যথা ক্রমে দাড়ি আর গোঁফ দেখিয়ে দিলেন; বল্‌তে লাগলেন, দু' দিন আগে এদের চিহ্নমাত্রও ছিল না; আপনার রসায়নের কৃপায় এরা দিনে চার আঙ্গুল করে বাড়ছে; দিনে দুবার ছেঁটেও সামাল দিতে পারছিনে; যারা আগে মাকুন্দ বলে' আমার মুখ দেখতে চাইত না, তারাই এখন যো পেলেই টেনে দেখছে, সত্যিই গজিয়েছে, না কৃত্রিম। মুখ দেখতে না চাওয়াই যে ছিল ভাল; যন্ত্রণায় ক্ষেপে উঠেছি, মশাই।...যদি ভাল চান্, দাড়ি গোঁফের বাড় থামিয়ে দিন্।—আমি হতাশভাবে বল্‌লাম, মাপ করবেন, রসায়নের উপকার দর্শাবেই...আমার আর হাত নেই।—হাত নেই, বটে? ঐ হাত যদি এই পা না ধরে তবে আমার নাম···বল্‌তে বল্‌তে তিনি একটা আগুনের গোলার মত বেরিয়ে গেলেন।...

প্রথম দফা ইতি।—

দ্বিতীয় ব্যক্তি ঘরে ঢুকেই বল্‌লেন, আসুন ত মশায়, বলুন ত এখন যাই কোথা?—আমি অত্যন্ত ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন, কি হয়েছে? আমি আপনার কোনো কাজে লাগতে পারি কি? তিনি বল্‌লেন, তা, পারেন; তবে বিশেষ কিছুই হয় নি...কেবল আমার স্ত্রী আমায় চিন্‌তে পারছে না, জোচ্চোর বলে তাড়িয়ে দিয়েছে, পুলিশে যেতে যেতে বেঁচে গেছি; বাড়ীতে আমার রাতদিন কান্নাকাটি—আমাকে তারা খুঁজে পাচ্ছে না···আমাকে আমার ছেলে মনে করে লোকে টাকার তাগিদ দিচ্ছে; তার এয়ারেরা আমায় টেনে ওবেলা মদ খাওয়ায় আর কি!···আফিস থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, বলে, আমরা ছোক্‌রা ম্যানেজার রাখিনে।···এই, আর বিশেষ কিছু হয় নি; তবে উপায় কিছু আছে? শুনে হাসি পেল; তাঁর কথার ভেতর ঢের গলদ, ছিল, তার ওপর একটা তর্ক তুল্‌তে পারতাম; কিন্তু হাসলাম না, তর্কও তুল্‌লাম না; তর্কের চেয়ে বিনয়ে কাজ বেশী হবে মনে করে' অত্যন্ত বিনীত ভাবে বল্‌লাম, প্রতিকারের একটি উপায় যা আছে তা আপনাকে বল্‌ছি। রাত জাগুন, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করুন, যতদূর সম্ভব দুশ্চিন্তার ভেতর ডুবে থাকুন,—কিন্তু প্রতিকারের উপায়টা শেষ করে বল্‌বার আগেই তিনি অগ্নিমূর্ত্তি হ'য়ে বলে উঠলেন, আর তুমি জাহান্নমের ভেতর তলিয়ে যেতে থাক। প্রবঞ্চক আমায় সাবধান করে দেওনি কেন? যেমন ছিলাম তেম্‌নি আবার হতে আমি চাই—আছে কোনো উপায়? ঘাড় হেঁট করে বল্‌লাম, যা বল্‌ছিলাম তা' ছাড়া—তিনি আঙ্গুল তুলে শাসিয়ে রেখে প্রস্থান করলেন।

দ্বিতীয় দফা ইতি।—

তৃতীয় আগন্তুক এক রমণী। ঘোমটা টেনে ভেতরে ঢুকে আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বল্‌তে লাগল, বয়সে যা করেছি তারি আপশোষে দিনরাত কেঁদে মরছি, তার ওপর তুমি আবার কি সর্ব্বনাশ ঘটালে! বিস্মিত হবার অবকাশ আমার ছিল না; বল্‌লাম, কি সর্ব্বনাশ করেছি, মা?···কি করেছ? এই দেখ—বলে সে ঘোমটা তুলে ধরল; দেখলাম, এক অপূর্ব্ব রূপসী তরুণী। রমণী বল্‌তে লাগল, হরিনাম জপ্‌তাম আর পান বেচে খেতাম; তোমার ঐ পোড়া রসায়ন খেয়ে অবধি আমি দোকানে বস্‌তে পারি নি, ছেলে বুড়োয় ইয়ারকি দিতে আসে; বলে, ওলো তোর সেই আমি কোথা! আমি পরামর্শ দিলাম, আজ থেকে ঝাঁটা নিয়ে বসে থেকো; সুযোগ মত ঝেড়ে দিও; ভূতের উৎপাত থেমে যাবে। পরামর্শ দিলাম বটে, কিন্তু কাজে এল না; রমণী বল্‌লে, ঝাঁটা

দিয়ে ঝাড়ব আমি পোড়ারমুখো মিন্‌সে তোমাকে। আমি ভয় পেয়ে বল্‌লাম, আমার কি অপরাধ মা? তার উত্তরে রমণী যা' বল্‌লে তা অশ্রাব্য। তার সেই মৌলিক গালগুলো আমায় কাঠের পুতুলের মত বসে শুন্‌তে হ'ল।

তৃতীয় দফা ইতি।—

তারপর একজন এলেন; তাঁর নালিশ, পেন্‌সন বন্ধ হয়েছে। কার তিনি সরকার ছিলেন; গৃহকর্ত্তা পুরণো চাকরকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করতেন; আমার রসায়নের গুণে তাঁর সেই আয়ের পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

ইতি চতুর্থ—

কিন্তু আমি ততক্ষণে মাথার চুল ছিঁড়তে সুরু করে দিয়েছি।...ভেবে দেখুন, শ' দুশো লোক, সবাই ক্রুদ্ধ, যার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে মারমুখো হয়ে, তার মনের অবস্থাটা কেমন হয়।...কারখানা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে প্রাণপণে হে দুর্গা হে দুর্গা করছি এমন সময় চট্‌ করে পালাবার একটা উপায় পাওয়া গেল।...রসায়নের বড় বোতলের পুরো এক বোতল ঢক্‌ ঢক্‌ করে খেয়ে ফেলে, দরজা খুলে ভিড় ফুঁড়ে সটান বেরিয়ে গেলাম...লোকে ভাবলে, বুঝি কারখানার বালক ভৃত্য।...তারপর—

কিন্তু আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না।

প্রাচীন আসামী হইতে—

শ্রী প্রমথনাথ বিশী

সে অঞ্চলভঙ্গীখানি থাকিয়া থাকিয়া
হৃদয়-সীমান্তে আজো উঠিছে কাঁপিয়া
ঝড়ের মেঘের প্রান্তে তীব্র বিদ্যুতের
করুণ রেখার মত; স্খলিত চুলের
মদির অধীর গন্ধ আর্ত্ত অলি প্রায়
কাঁদিয়া ফিরিছে আজো তারে ঘিরে হায়!
শুক্তি-পাণ্ডু কপোলেতে ওঠে দ্যুতি ভেসে
অতি গুপ্ত বাসনার ক্ষণিক আবেশে।

অতীতের কশাঘাতে আমি যে পাগল
লুণ্ঠিতে লেগেছি আজ স্মৃতির প্রাসাদ।
মুক্তা ভ্রমে লই যত শিশিরের জল,
সম্ভব হয় যে মনে সুদুর্ল্লভ সাধ।
সেই যে উন্মুখ গণ্ড, কবরী চঞ্চল,
হায় সেই গন্ধ আর হায় সেই স্বাদ!

পত্র

ছোটগল্প

কল্যাণীয়াসু,

প্রচলিত প্রথা অনুসারে মাসিক পত্রে গল্প দিতেই হয়; এদিকে আবার শুনি, ভাল-গল্প মেলে না! তাই ছোট গল্প নিয়ে মাসিক পত্রগুলোর একটা মহা সমস্যা দাঁড়াচ্চে।

সেদিন, একজন সম্পাদকের সঙ্গে খানিকটা সওয়াল-জবাব হয়েছিল। এর কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি যা উত্তর দিলেন সে কথা গুলি বেশ।

তিনি বলেন:—

ছোট গল্প নৈলে মাসিক কাগজ চালান কঠিন; কেননা, পাঠক কাগজ কেনার সময় দুটো জিনিষ দেখে নেন:—

(১) ক'খানা রঙিন্ ছবি আছে

(২) ক'টা গল্প আছে।

ছবির কথায় তিনি আরো বল্লেন, ছবি না দিলে কাগজ হকারেরা নিতে চায় না; তারা বলে, বাবু, দুঠো একটা মজাদার ছবি তো দিজিয়ে তো দেখিয়ে লেবেন কাগোজ কি রোকোম্ কাট্‌বে।...

মজাদার ছবির কি অর্থ তা' বাংলার সর্ব্ব-সাধারণেই জানেন। অনেক মাসিকের কর্ত্তৃপক্ষ এই জ্ঞানটিকে কাজে লাগিয়ে তাঁদের ব্যবসা ভালই চালাচ্চেন।.........আর যাঁদের শুচিবায়ু আছে তাঁদের কতকটা বিপদ; তবুও বুদ্ধি আর উদ্ভাবনী শক্তির সু-প্রয়োগে কাগজকে মজাদার ক'রে তোলার কষ্ট-কল্পনা—তা সে, তথাকথিত অভিজাত......যাক্ যাক্।

সম্পাদক-ভায়া পর-চর্চ্চা ভাল বাসেন না, তাই চুপ হ'য়ে গেলেন।

বল্লুম, যাক্ সে-ছবির কথা চুলোয়, ভায়া, গল্প সম্বন্ধে সমস্যা-পূরণের উপায় কি?

সম্পাদক গম্ভীর মুখে বল্‌তে লাগলেন, সেদিন গত হ'য়েছে যেদিন লেখক শুধু সুখ্যাতিতেই তুষ্ট হ'তেন।... এখন লেখকের মর্য্যাদা বস্তুটা রজত মূল্য দিয়ে ক্রয় করতে হয়......সেদিন, একান্ত গরীব লেখকদের দিন চালাবার জন্যে যৎকিঞ্চিৎ দিতে হ'তো—তাও অতি সংগোপনে...

কিন্তু এখন?

সম্পাদক দু' চোখ ডাগর করে বল্লেন, বড় বড় লেখকের বড় বড় পেট...আর দুই শূণ্যিতে চলে না, তিনে পা দিতে হ'য়েছে!

বল্লুম, সে তো ভালই, গ্রাহকেরা মূল্য দেন, তার ওপর আছে বিজ্ঞাপনের আয়; মোটের মাথায় চালাতে পাল্লে আজকাল তো ওটা একটা লাভের ব্যাপার; লেখকেরা যদি দক্ষিণার দাবী করেন তো—সেটাই বা কি অন্যায়? শুনেছি কোন কোন কাগজের মালিকেরা মাসে-মাসে বেশ মোটা টাকাই হাত খরচ বাবদে পেয়ে থাকেন।

সম্পাদক-ভায়া মাথা নেড়ে বল্লেন, তা' আশ্চর্য্য নয়।

তবে? বাদ কেবল লেখক সম্প্রদায়?

নাঃ তা আর কেমন করে হয়।...তবে গল্পের ভেতর একটু গোল আছে...

সে আবার কি?

ছোট-গল্পের ভবিষ্যৎ নেই; প্রকাশকেরা বলেন, ছোট-গল্পের বই কাটেনা, সে যতই কেন ভাল হোক্; কিন্তু একটা উপন্যাস ভাল না হ'লেও এমন কেটে যায় যাতে প্রকাশকের খরচটা উঠে যায়।......

তারপর ?

সে কথা না বলাই ভাল। সম্পাদক-ভায়া ম্লান হাসি হাস্‌লেন।

সম্পাদক-ভায়ার কথা থেকে বেশ বোঝা যায় যে মাসিক পত্রে ছোট-গল্প আজকাল পাদপূরণের কাজ করছে।

ছোট-গল্প যাঁরা লিখতে পারেন তাঁরা লেখেন না; যাঁরা সাহিত্যে হাত-পাকাতে চান্—তাঁরাই ওতে হাত দেন। তাই ছোট-গল্পের এত দুর্দ্দশা।

জিজ্ঞাসা করলুম, যদি দক্ষিণা মোটা হয়তো ছোট গল্প উন্নতি করতে পারে না ?

পারে বৈ কি।

তবে তার ব্যবস্থা হয় না কেন ?

কাগজের মালিকেরা তা চান্ না, বোধ হয়

আপনারা ?

সম্পাদক কাষ্ঠ-হাসি হাস্‌লেন।

এ একটা অদ্ভুত যুগ চ'লেছে সাহিত্যের !

এখনো সাহিত্যের বলদেরাই বেঁটে নিচ্চেন এর চিনির ভাগটুকু নিজেদের মধ্যে। বাকি সকলে তাঁদের চিনির বলদ হ'য়েই রয়েছেন !

কিন্তু সম্পাদক-ভায়ার দুর্ব্বলতার দিকে আর অগ্রসর হওয়া চল্লোনা; বল্লুম, আচ্ছা আজকাল ছোট-গল্পগুলো নিতান্ত একঘেয়ে হয়ে যাচ্চে না ? কি মনে হয় ?

সম্পাদক বল্লেন, তার কারণও আছে; আমাদের জীবনটা খুব সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে যেন শেষ ধুক্-ধুক্ করচে—ঠিক মরার আগের অবস্থা······

অর্থাৎ আমাদের জীবনের বৈচিত্র্যটা ক'মে আস্‌চে ?

তাই বটে।

বল্লুম, সেটাকে ঈষৎ মেরামৎ ক'রে খাড়া করে তোলা শক্ত; অন্ততঃ সাহিত্যের অজুহাতে তা হতেই পারবে না। মানুষের অন্ন চিন্তা, অভাব, দৈন্য মানুষের নূতন কর্ম্মের পথে, নূতন অভিজ্ঞতা উপলব্ধির মধ্যে নিয়ে যাবে। সাহিত্যের জন্যই মানুষ—কিছু একদিনে কর্ম্ম-কুশল হ'য়ে উঠবে না।······

আচ্ছা, বেশীর ভাগ গল্পের থিম্‌টা চাকুরি খুঁজে বেড়ান নয় কি ?

সম্পাদক সম্মতি জানিয়ে বল্লেন, উপায় কি ? লেখকদের মধ্যে অনেকেই দিবালোকে ঐ কর্ম্ম ক'রে থাকেন, আর রাতে পেটে ক্ষুধা আর মনে হতাশা নিয়ে কলম ধরেন।·····

কিন্তু, বল্লুম, ও জিনিষ কম-বেশী সব মানুষেরই তো আছে; ও অভিজ্ঞতাকে সাধারণের ভূমি থেকে সাহিত্যের ভূমিতে না তুল্‌তে পারলে—অর্থাৎ তাতে রস-যোজনা না করতে পারলে যে সবটাই পণ্ডশ্রম হয়।

সম্পাদক বল্লেন, রসের ব্যাপারটা আজকাল আর একদিক দিয়ে সমাধা হয়—সেটা সেক্স সমস্যার অপ্রাসঙ্গিক এবং আকস্মিক অবতারণায়।

বল্লুম, সে কথা একেবারে মিথ্যা নয়; তাই বোধ করি এর ওপর কেউ-কেউ খড়্গহস্ত হয়েছেন। ঠিকইতো; অপ্রাসঙ্গিক ভাবে সেক্সের অবতারণা শুধু সাহিত্যকে কটু করে না, তার একটা একান্ত কুৎসিৎ দিক অযথা খুলে দিয়ে রসটাকে গেঁজিয়ে দেয়

সম্পাদক বল্লেন, আরো একটা অনুযোগ আছে; মনুষ্য চরিত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা—যার ধার আমরা সত্যি করে একটুও ধারিনে; সেটি ইয়োরোপ থেকে আমদানি—একদম "র-মেটিরিয়াল"।

বল্লুম, ও কথাও সত্য; কিন্তু মনে হয় লেখকেরা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করচেন বল্লেও তাঁদের পাওনার অতিরিক্ত তাঁদের দেওয়া হয়।

বিস্মিত হ'য়ে সম্পাদক বল্লেন, কেন ?

কারণ, আমাদের সাহিত্যের কি গল্প, কি উপন্যাসগুলির কাঠামো, একশোর মধ্যে আশিভ বটেই—বিদিশী গল্প-উপন্যাসের—হয় অনুকরণ, নয় ধার, না হয় চুরি !

বাকিটা? সম্পাদক জিজ্ঞাসা করলেন।

বাকি থাকে কুড়ি—তার পনর—সেও দু'একজন সত্যিকার লেখকের ভেঙ্‌চানি কি কপ্‌চানি......

কি রকম তা বলি শুনুন।

একদল ছেলেকে মাষ্টার ঘোড়ার 'এসে' লিখতে দিয়েছিলেন। মাষ্টার ব'লে দিলেন—বই টুকিস্ না, নিজের নিজের চোখে যা দেখবি, লিখবি,—বুঝেচিস্?

ছেলের দল চতুর্দ্দিকে সহস্র ঘোড়া থাকৃতেও লিখলে পেয়ারিচরণের ফার্ষ্ট-বুকের ঘোড়ার ছবি দেখে এসে।

সকলের 'এসে'ই প্রায় এক রকম; সবাই লিখলে চার পা, রং কাল, ঘাড় উঁচু ইত্যাদি

মাষ্টার অবাক হ'য়ে বল্লেন, সবাই কি এক ঘোড়া দেখে লিখলি রে?

না, না, না, এক ছবি!

আমরাও তেমনি, মানুষ দেখে মানুষ আঁকিনে—মানুষের ছবি থেকে 'কপি' করি!

তাই বলি যে, এ যুগে সত্যিকার লেখক মাত্র যা দু'-এক জনই হ'য়ে রইলেন—বাকিরা ছাঁকা কপি ক'রে লেখক-জীবনের পাপক্ষয় করছেন।

২০শে মাঘ ১৩৩৪

সম্পাদক-ভায়া এবার বিষম চিন্তিত হ'য়ে প'ড়লেন; ভাবটা, এই যদি অবস্থা, তবে কাগজ কি ক'রে চল্‌বে?

চলবে দাদা, চল্‌বে—এ জগতে কেউ অচল নয়, খোঁড়াও চলে, অন্ধও চলে, বি-পদও চলে।

কিন্তু একেবারে হতাশ হবার দরকার নেই—এর মধ্যেও দু' একটা করে এমন লেখা বার হচ্চে যাতে খুবই আশা হয় যে নকলের দিকটা বন্ধ হ'য়ে যাবে।

সম্পাদক জিজ্ঞাসা করলেন, যথা?

'বিচিত্রা' পৌষের সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের 'জমা-খরচ' পড়েছেন?

জমা-খরচ? নামটা জানা মনে হচ্চে—তা' প'ড়ে থাক্‌বো।

বল্লুম, এই গল্পটি একটি আস্ত-আসল প্রাণ-পূর্ণ লেখা; পড়ে মনে হয় যে লেখকের চোখ আছে দেখার, মানুষ আঁকার হাত আছে, মনে রং আছে।...

এ নকল নয়, ব্যর্থ অনুকরণ নয়।

এটি সত্যিকার ছোট-গল্প; কোন নভেলের চেয়ে খাটো নয়...

সম্পাদক বাধা দিয়ে বল্লেন, তাই নাকি? তবে তো আর একবার প'ড়ে দেখতে হবে!

মণিবন্ধ ভারতী
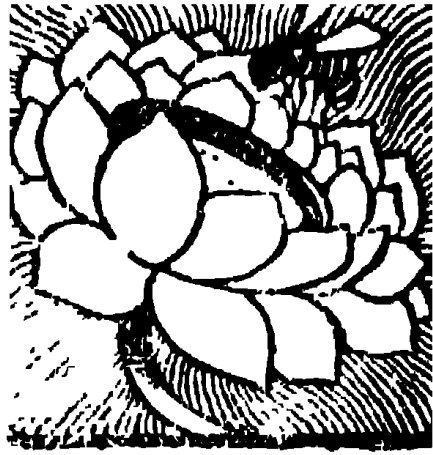
সরস্বতী-পূজা

শ্রী নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

উৎসবের বাঁশী বেজে উঠেছে—বাঙ্গলার আঙ্গিনায় আঙ্গিনায় আজ আনন্দ কলরোল—আজ সরস্বতী-পূজা! এ উৎসবের আনন্দ কলতানে স্বর মিলিয়ে আমায় আজ গাইতে হবে, এ সভার উদ্যোগীগণের এই দাবী। কিন্তু প্রাণ যে কান্নায় ভরে ওঠে; যে স্বর গলায় ফোটে সে যে হতাশের আর্ত্তনাদের মত, পীড়িতের হাহাকারের মত। এ স্বরে কি গান গাইব উৎসবে?

কত যুগ বয়ে গেছে সেদিন থেকে যেদিন প্রাচীন ভারতের ঋষি সরস্বতীর ছল ছল জলের দিকে চেয়ে আনন্দে বিশ্ববিধাতার গৌরব-গাথা রচনা ক'রেছিলেন। আপনার সৃষ্টিতে আপনি অবাক হ'য়ে বুঝেছিলেন যে এ সৃষ্টি তাঁর নিজের নয়—কে যেন তাঁর ভিতর সে গান গেয়ে গেছে—তিনি সুধু যন্ত্রের মত তার অনুবাদ ক'রেছেন। অবাক হ'য়ে ঋষি দেখলেন চেয়ে কলনাদিনী সরস্বতীর পানে, শুনলেন কানে তার কল-কল্লোল। দিব্য দৃষ্টিতে সেই জলরাশির ভেতর দেখতে পেলেন বেদমাতার নিত্য মূর্ত্তি, ভক্তিতে প্রণত হ'য়ে গাইলেন তাঁর স্তব গান।

তারপর কত যুগ চ'লে গেছে। সে ঋষির জাত ভারতে আর নেই,—সে সরস্বতী এমন হ'য়ে লুপ্ত হ'য়ে গেছে যে আজ তার সন্ধান করতে প্রত্নতত্ত্ব হিমসিম খেয়ে যায়। কিন্তু বাঙ্গলা আজও পূজা করে সরস্বতীর। ঋষির মানস মূর্ত্তিকে মাটিতে গড়ে ফুল চন্দনে তার সেবা করে, তার পায়ের তলায় লুটিয়ে প'ড়ে নিবেদন করে তার ভক্তি।

বেদের ঋষি যে পরিপূর্ণ আনন্দে তাঁর স্তোত্র রচনা ক'রেছিলেন, যে আনন্দ তাঁর অন্তর বাহির নিঃশেষে পুলকিত উদ্ভাসিত ক'রেছিল, সে আনন্দ আজ নেই, তবু বাঙ্গালী আজ আনন্দ উৎসব ক'রে দেবীর অর্চ্চনা করে। দুঃখিনী বাঙ্গলা বুকভরা দুঃখ, মুখভরা ছায়া তার ছিন্ন অঞ্চলে কোনও মতে চেপে রেখে আনন্দের মুখোস প'রে কোলাহল ক'রে ফেরে। যেকী আনন্দের সুগভীর বেদনায় তার অন্তর চুর হ'য়ে যায় না কি?

আমি একবার সেকালের বাঙ্গালীকে কূপমণ্ডুকের সঙ্গে তুলনা ক'রেছিলাম। তাতে অনেক পেট্রিয়টের মনে আমার ওপর নিদারুণ ক্রোধ গজিয়ে উঠেছিল। কিন্তু সুধু সেকাল কেন, আজকার বাঙ্গালী জাতটাও কি ঠিক কূপমণ্ডুকের মতই নয়? আমরা আমাদের সঙ্কীর্ণ সমাজকেই সৃষ্টির শেষ বলে জেনে পরম সার্থকতার সঙ্গে নিজেদের গৌরব স্মরণ ক'রে ফুলে উঠছি—বিশ্বের বিরাট সাগরের বুকে যে সব বিশাল তরঙ্গ বিক্ষোভ হ'চ্ছে তার খবর রাখা আমরা আবশ্যক মনে করি না। যদি করতাম তবে কি এই নিদারুণ তমোময়ী তুষ্টির অবসাদ আমাদের জীবনকে এমন নিঃশেষে অসার ক'রে ফেলতে পারতো? বিশ্বের বিরাট মানদণ্ড নিয়ে যদি আমরা আমাদের ভাল-মন্দের তৌল ক'রতে ব'সতাম, তবে তাদের ওজন দেখে আজ আমরা আনন্দ উৎসব ক'রতাম না। দুঃখিনী বাঙ্গলার হৃদয়বেদনা আপনার অন্তরে অনুভব ক'রে বাগ্দেবীর চরণ স্পর্শ ক'রে আজ বাঙ্গালী এক কঠিন শপথ ক'রে ছুটতো বাণীর প্রকৃত পূজায়। উৎসবে নয়, কর্ম্মে দেবীর এমন অর্চ্চনা ক'রতো যাতে মৃন্ময়ী মূর্ত্তির কোনও বিকৃতি হ'ক বা না হ'ক বিশ্বজননী ভারতীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতো।

আমরা আজ ভারতীর পূজা ক'রছি ফুল-চন্দনে—কিন্তু বিশ্ববাসী আজ সেই পূজা ক'রছে হৃদয়ের রক্ত দিয়ে, জীবনব্যাপী নিষ্ঠা ও সাধনা দিয়ে। তাই সারাবিশ্বে

বাণীর ভাণ্ডার নিত্য নূতন জ্ঞানে পরিপূরিত হ'য়ে উঠছে, নিত্য নূতন উৎসাহে মত্ত হ'য়ে এ যুগের ঋষির দল এক অশ্রান্ত চেষ্টায় ছুটে চলেছে অসীম সত্যের সীমায় পৌঁছুবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। বাণীর এই সেবকদলের মধ্যে আমাদের বাঙ্গালীর—ভারতবাসীর—স্থান কোথায়? বিশ্ববিজ্ঞানের সামান্য একটা খণ্ডের সংবাদ যে রাখে সেও জানে যে ভারতীর দখিত সন্তানের এই দলে আমাদের স্থান আজ নেই বল্লেই চলে। জগদীশ বা প্রফুল্লচন্দ্র বা মেঘনাদ বা আর কেহ সে পুণ্য মন্দিরের এক কোণায় স্থান পেয়েছেন ব'লে আমাদের সেখানে অধিকারের মাত্রাটা আমরা চোখে মাইক্রস্কোপ লাগিয়ে খুব বড় ক'রে দেখতে পারি। কিন্তু সে কেবল আমাদের মন ভুলান হ'বে। সে কথা নিয়ে আমরা যতটা বাড়াবাড়ি ক'রবো ততই আমাদের অন্ধতা, আমাদের অসংযত আত্মতুষ্টির পরিচয় দেওয়া হ'বে; বিশ্বভারতীর দরবারে আমাদের স্থান তাতে এতটুকুও বাড়বে না। জগতের প্রাচীন ইতিহাসে যে ভারত বিশ্ববিজ্ঞানপীঠের শিক্ষাগুরুর আসন থেকে জ্ঞান বিতরণ করেছিল, আজ বিশ্ববাণীর পাদপীঠের এক কোণায় একটু ধূলিমলিন স্থান সংগ্রহ করে যদি সে গর্ব্বিত হয়, তবে তার সে লজ্জা রাখবার যে ঠাঁই নেই।

গ্রীস দেশের পুরাণে প্রমিথিয়ুস দেবতার মত পূজা পেয়েছেন—তিনি স্বর্গ থেকে আগুন এনেছিলেন ব'লে। আগুন মানুষকে পোড়ায়, জ্বালায়, তবু সে অন্ধকারের মাঝে আলো দেয়, তাই তার এ সমাদর। জ্ঞানের অগ্নিও সন্তাপ দূর করে না, হয় তো বা বৃদ্ধি করে, কিন্তু তবু সে আলো দেয়, তাই, সারা বিশ্ব আজও সে আগুন মাথার মণি ক'রে রেখেছে। আমাদের ঘরে আমাদের পিতৃপিতা-মহগণ যে উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বেলেছিলেন তার একটা অপচীয়-মান ক্ষীণ শিখা কোনও মতে জ্বালিয়ে কুটীরের সঙ্কীর্ণ আয়তনে একটু আলো ছড়িয়ে পরিতৃপ্ত আমরা, কিন্তু বিশ্বের অগ্নিহোত্রীর দল সে অগ্নি প্রদীপ্ত উজ্জ্বল ক'রে রেখেছে, ইন্ধনে হব্যে তাকে নিত্য সেবা ক'রে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর ক'রে তুলেছে; যেখানে ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলছিল সেখানে হাজার বাতির ইলেক্‌ট্রিক লাইট জ্বেলেছে—সারা দেশময় অন্ধকারকে শিকার ক'রে বেড়াচ্ছে সে আলো, সার্চ্চলাইট হ'য়ে প্রবেশ ক'রছে গভীরতম গহ্বরের ভেতর, নিঃশেষে উজাড় ক'রে দিতে চায় সে অজ্ঞানের শেষ গুঁড়াটুকু পর্য্যন্ত। ধনীর ঘরে আমাদের ঢাকঢোল বাজিয়ে সরস্বতীর পূজা হ'চ্ছে, তার সঙ্কীর্ণ অঙ্গনের বাইরে যে বিরাট জন-সমাগম, তাদের সে পূজায় কোনও ভাগ নেই, ভাগ দিতে আমরা চাইনে, দেবার কোনও চেষ্টা আমাদের নেই। অজ্ঞানের বিরাট জমাট তমিস্রের ভেতর সোণার রঙিন হাঁড়িতে আমাদের ছোট্ট প্রদীপখানি জ্বালিয়েই আমরা পরিতৃপ্ত, তার বাইরে আলো দেবার কোনও প্রয়োজনই আমরা অনুভব করি না। কিন্তু বিশ্বে আজ চলছে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন—বিশ্ববাণীর যে প্রকাণ্ড মহোৎসব, তাতে ডাক পড়েছে ভারতীর দীনতম সন্তানের। অন্য দেশের কথা নাই ব'ল্লাম—চীন, তুর্কী মিশর, আফগানিস্তান সকলে উঠে পড়ে লেগেছে দীন ও অন্ত্যজের যুগযুগান্তরের অবজ্ঞার ধূলি-মলিন বুক থেকে উপড়ে ফেলতে অজ্ঞানের মূল। আর আমরা—যারা আজ ঘরে ঘরে সরস্বতীর পূজা ক'রছি—আমরা সেই দীন দরিদ্রের শিক্ষার জন্য সামান্য কিছু ট্যাক্স দিতে সম্মত হব কি না, ব্যবস্থাপক সভায় সে বিষয় নিয়ে অনেক মাথা ঘামান হ'চ্ছে!

যে দিকে চাই সেই দিকে দেখি লক্ষ্মীছাড়া সরস্বতীর এই নিদারুণ লাঞ্ছনা। রেশমী পোষাকে নিত্য নূতন জৌলুস ছড়িয়ে সরস্বতী যখন আবির্ভূত হন তখন আমরা তাঁর সমাদর ক'রতে কুণ্ঠিত নই। এমন সব মূর্ত্ত সরস্বতীর বাড়ীতে আমরা হাঁটাহাঁটি ক'রে জুতোর তলি ক্ষইয়ে ফেলি। বিচিত্র শোভায় সজ্জিত কবির প্রাসাদের পাপোষের ঝাড়া ধূলোর গুঁড়োকে মূর্ত্তিমান আর্ট ব'লে মাথায় তুলে নিয়ে মাদুলীতে ভরে' তার পূজা করি। কিন্তু সরস্বতী যখন আমাদের দ্বারে দীন ভিখারীর বেশে জীর্ণ-

চীরে আপনার মলিন দেহ আবৃত ক'রে উপস্থিত হন তখন তাঁকে আমরা যা দিয়ে সম্ভাষণ করি তার নাম শত-মুখী। তার কারণ বোধ হয় এই যে দারিদ্র্য কাঁকরের মত রসধর্ম্মের পরিপন্থী—তার ভেতর শোভা নেই আরাম নেই। কথাটা বড় বিষাক্ত, কিন্তু বড় দুঃখে আমার এ-কথা বলতে হ'চ্ছে। সাহিত্যের বাজারে সামান্য কারবারী আমি, এত বড় প্রতিষ্ঠা আমার নেই যাতে আমি অবজ্ঞার সঙ্গে বলিতে পারি যে যার-তার লেখা পড়বার অবসর আমার নেই। অনেক লেখাই আমি পড়ি—প'ড়ে অনেক স্থানেই প্রতিভার ভাস্বর দীপ্তি দেখে মুগ্ধ হই—লেখকের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য অন্বেষণ করি। অন্বেষণ ক'রে অনেক স্থলে যা' দেখতে পাই তাতে অন্তর হাহাকার করে ওঠে। দেখতে পাই যে লোকাতীত প্রতিভা নিয়ে যে জন্মেছে, বাগ্দেবীর বরপুত্র যে, তার যদি লক্ষ্মীর তকমা না থাকে তবে কেউ তাকে চেনেও না। বুকের রক্ত ঢেলে সে হয় তো বাণীর সেবা করে, প্রাণের সব রস দিয়ে অমৃত-গ্রাস রচনা ক'রে দেবীর প্রখ্যাত ভক্তদের কাছে পরিবেশন করে—বিনিময়ে পায় সে স্বধু অবহেলা, অবজ্ঞা, এবং হয় তো লাঞ্ছনা। আমাদের দেশে এমন দুর্ভাগ্য একটি নয় বহু আছে—অপূর্ব্ব সৃষ্টিশক্তি নিয়ে, দেবদত্ত কবি-প্রতিভা নিয়ে যারা নিষ্ঠার সঙ্গে বাণীর সেবা ক'রছে কিন্তু উদরান্নের জন্যে যাদের দেশত্যাগী হ'য়ে সস্তা জায়গা বেছে সামান্য কাজে জীবন ক্ষয় ক'রতে হ'চ্ছে। বাণীর বরপুত্রের যেখানে এই সমাদর সেখানে আড়ম্বর করে বাগ্দেবীর পূজা একটা নিষ্ঠুর বিড়ম্বনা!

রংচঙে সরস্বতীর কাছে ফুল-চন্দন নিবেদন ক'রে আমরা বাগ্দেবীর ভক্ত ব'লে পরিচিত হ'তে চাই, প্রাসাদ-বাসী লক্ষ্মীর দুলাল কবির পদচুম্বন ক'রে মনে করি বাণীর উপাসনা ক'রছি, না বুঝে সবার সঙ্গে গোলে হরিবোল দিয়ে রসজ্ঞের প্রতিপত্তি কেড়ে নিতে চাই—আমরা কি সরস্বতী পূজার অধিকারী?

যে দেবীকে আমরা পূজার পীঠে বসিয়ে দূর থেকে নৈবেদ্য দিচ্ছি তাঁকে অন্তরের ভেতর বরণ ক'রে নেবার অধিকার কি প্রবৃত্তি আছে কি আমাদের? যদি থাকতো তবে দেখতে পেতাম যে আমাদের পূজা বাণীকে ছাড়িয়ে তাঁর সাধ্য যে সত্য শিব ও সুন্দর তাকে আশ্রয় ক'রে একনিষ্ঠ ভাবে তার সাধনা ক'রছে। কিন্তু সত্যকে স্বীকার ক'রতে আমরা কুণ্ঠিত—যুগযুগান্তের মরচে পড়া ছাঁকনির ভেতর দিয়ে যেটুকু সত্য চুইয়ে আসে তার বেশী গ্রহণ ক'রতে আমরা ভয় পাই, তাকে কোথাও হঠাৎ দেখলে অন্ধকারের হাজার পরদা দিয়ে তাকে ঢাকা দিতে চাই। যে শিব আমরা পূজা করি সে একটা কৃত্রিম প্রতীক, তাকেই আমরা সোণার মন্দিরে প্রতিষ্ঠা ক'রে সাড়ম্বরে পূজা করি,—আসল দেবতা অবজ্ঞাত হ'য়ে প'ড়ে থাকে পাশের ইন্দারার ভেতর অন্ধকারে, অতি কুতূহলী কদাচিৎ তার ভিতর মসালের আলো জ্বেলে তার অস্পষ্ট মূর্ত্তি এক মুহূর্ত্তের জন্য দেখে নেয়—তারপর আবার অন্ধকার দিয়ে তাকে চাপা দেয়। সুন্দর আমরা দেখতে জানি নে, সে চোখ আমাদের নেই, তাই কানে শুনে পরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুন্দর অসুন্দরকে নির্ব্বিচারে বাহবা দিয়ে যাই, অপরূপ রূপরাশিকেও তেমনি নির্ব্বিচারে আঁস্তাকুড়ে বর্জ্জন করি।

এই ভারত একদিন ছিল বাগ্দেবীর পুণ্যপীঠ, এই বাঙ্গলা ছিল বাণীর পুণ্যপ্রসাদ রসের আকর। সত্য ছিল ভারতের সোম তার উন্মাদনা, তাই ছিল তার যজ্ঞ। লক্ষ্মীর প্রসাদ অনায়াসে তুচ্ছ ক'রে বেদের ঋষি বাণীর সেবা ক'রতেন ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে। শিবের সাধনায় তাঁরা সীমা স্বীকার ক'রতেন না, কুণ্ঠা তাঁদের ছিল না, আপাতদৃষ্ট সহজ মঙ্গলকে তুচ্ছ ক'রে তাঁরা তাঁদের দৃষ্টি নিয়োগ ক'রেছিলেন চরম মঙ্গলের সন্ধানে—সত্য শিবের এই সঙ্কোচহীন অনুশীলনে কোনও বাধা, কোনও অন্তরায় তাঁরা স্বীকার করেন নি। যজ্ঞের ধূমে যখন ভারতের আকাশ অন্ধকার, তখনই সাংখ্যের ঋষি ব'লেছিলেন, "অবিশুদ্ধি ক্ষয়াতিশায় যুক্ত।" পশুর রক্তে যখন গৃহস্থের

যজ্ঞাগার পূর্ণ তখন ঋষি ব'লেছিলেন, "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি"। ইন্দ্রাদি দেবতাই যখন ছিল একমাত্র উপাস্য তখনই ঋষি সাহসের সঙ্গে ব'লেছিলেন যে একমাত্র পরব্রহ্ম যিনি তিনি "নেদং যদিদমুপাসতে"। প্রচলিত উপাসনা পদ্ধতিকে লক্ষ্য ক'রে ব'লেছিলেন—

"অবিদ্যায়া অন্তরে বর্ত্তমানা
স্বয়ং ধোরা পণ্ডিতং মন্যমানা
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়াঃ
অন্ধেনৈব নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ।"

এই তীব্র সত্যনিষ্ঠা, এই অপরিমিত সাহস বাগ্দেবীর বরপুত্রের নিত্যলক্ষণ—বাণীর সেবার প্রথম ও প্রধান মন্ত্র। সেই মন্ত্র ছেড়ে আজ কি শুধু ভৌতিক উপচারে মৃন্ময়ী দেবীর পূজা ক'রে আমরা সার্থকতা লাভ করব ?

আর সুন্দর! এই ভারত, এই বাঙ্গলা ছিল সুন্দরের মুগ্ধ উপাসক। আমাদের কবি আমাদের কলাশিল্পী সুন্দরের অখণ্ড মূর্ত্তি সম্মুখে রেখে বাণীর সেবা ক'রতেন, সুন্দর দেখলে তাকে স্বীকার করতে তাঁরা কোনও কুণ্ঠা বোধ করেন নি। সুন্দরের অভিনন্দন ক'রতে গিয়ে তাঁরা আশে-পাশে চেয়ে নানা উপাধি সংযোগ ক'রতে জানতেন না। তাই তাঁরা সৃষ্টি ক'রেছিলেন নানা অপূর্ব্ব রস. আনন্দে ভরে দিয়েছিলেন ভারতবাসীর অন্তর। সে রসের উৎস আজ জমাট বেঁধে গেছে, তার কঠিন তুষার মূর্ত্তির পায় নৈবেদ্য বিসর্জ্জন ক'রে আজ আমরা রস-সম্ভোগ ক'রছি ব'লে আমাদের মন ভোলাচ্ছি।

এমন বিড়ম্বনা কি আর আছে ? প্রিয়তম সন্তানের মৃতদেহ আগলে ব'সে যেমন মুগ্ধ পিতা পুত্রের সান্নিধ্য উপভোগ ক'রতে চায় আমাদের সমগ্র জাতটা বাগ্দেবীকে হারিয়ে তার প্রাণহীন প্রতীক নিয়ে তেমনি ছেলে-খেলা ক'রছে—মিথ্যার ওপর মিথ্যা চাপিয়ে সত্যকে লাভ ক'রবার ব্যর্থ প্রয়াস ক'রছে—পায় পায় পিছু হেঁটে অগ্রসর হবার স্বপ্ন দেখছে।

অনেক দিন কেটেছে এ মোহসম্ভোগে—জাগবার সময় এসেছে, জাগরণের চঞ্চলতার প্রথম সাড়া বুঝিবা পাওয়া যাচ্ছে।

ঘুমঘোর যদি ভেঙ্গে থাকে তবে বাণীর পূজা ক'রতে গিয়ে একথা ভুললে চলবে না যে বিদ্যা সত্যের সেবধি—বাগ্দেবীর পূজা সেই ক'রতে অধিকারী যে সত্যকে নিঃশেষে আশ্রয় করে। অন্তরে বাহিরে সত্যনিষ্ঠ হ'য়ে সত্যশিবসুন্দরকে আমরা উপাসনা ক'রবো, দেবীর মন্দিরের সঙ্কীর্ণ প্রাচীর চুরমার ক'রে তাঁর আয়তন প্রতিষ্ঠা করবো, বিশাল আকাশের চন্দ্রাতপতলে, দীনতম মানুষের অন্তর-অঙ্গনে। যে সত্যের প্রদীপ আমরা জ্বালাবো তাঁর পাদপীঠে, তার জ্যোতিতে হেসে উঠবে নিখিল বিশ্বের সর্ব্বলোক, তার অমৃত ধারায় বঞ্চিত হ'বে না কেউ, ছায়ায় পড়ে রইবে না, অন্ধকারে অন্ধের মত হাতড়ে মরবে না কেউ, তা হোক না সে দীন হোক না সে ভিখারী। লক্ষ্মীর মুখোস খুলে ফেলে আমরা দেবীর স্বরূপের দিকে চোখ মেলে চাইব, কোনও মেকী রূপের জৌলুসে চোখ অন্ধ ক'রে রাখবো না। সুন্দরের সেবা ক'রতে গিয়ে অসুন্দরের হাজার ঢাকনায় তাকে অন্ধকার ক'রে আমরা আপনাকে বঞ্চিত করবো না। আমরা হব বাণীর সত্য সেবক—দেবতা হবে আমাদের সত্যশিব-সুন্দর—আর কোনও দেবতা আমরা মানবো না।

তা' যদি আমরা ক'রতে পারি তবে আমাদের পূজা সার্থক হবে। নইলে ব্যর্থ আমাদের ষোড়শোপচার, ব্যর্থ আমাদের শঙ্খঘণ্টা—হবে না ঐ মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, ব্যর্থ হবে আমাদের পূজার আয়োজন; আর, মেকী উৎসবের কলকোলাহলের ভেতর কেঁদে উঠবে পীড়িত ভারতীর করুণ আর্ত্তনাদ।

বিচিত্রা

ভারতবাসী চাউক বা না চাউক, ভারতবাসীর টাকায় সাইমন কমিশন এদেশে আসিয়া নামিয়াছেন। ইচ্ছা থাক্ বা না থাক্ ভারতবাসীকে যেমন ইংরেজ-শাসনকে সহ্য করিতে হইতেছে, তেমনি এই সাইমন কমিশনকে সহ্য করিতেও সে বাধ্য। তবে ইংরেজ-শাসন আমরা কামনা করি একথা যেমন ভারতবর্ষের কোন মানুষ বলিতে পারে না, তেমনি সাইমন কমিশনকেও ভারতবর্ষের কোন মানুষ আজ অভ্যর্থনা করিতে পারে না, কামনা করিতে পারে না, স্বীকার করিতে পারে না। ভারতবর্ষের 'মানুষ' বলিলাম ইচ্ছা করিয়াই, কারণ সে পরাধীন। ইংরেজ-শাসনকে কাম্য মনে করে এমন অমানুষ যেমন কেহ কেহ এদেশে আছে, তেমনি সাইমন কমিশনকে অভ্যর্থনা করিবার মত জাতীয়তা ও মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত নামে-মানুষও এদেশে কেহ কেহ আছেন।

*　*

*

সাইমন কমিশনকে বর্জ্জন করিবার হেতু আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। এই সম্পর্কে আর কিছু বলা অনাবশ্যক। সাইমন কমিশন যেদিন বোম্বাইয়ে নামে সেদিন সমগ্র ভারতে হরতাল হয়। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকই এই হরতালে যোগ দিয়াছে। জননেতাদের অনুরোধ দেশবাসী রক্ষা করিয়াছে। যাহারা করে নাই—যাহাদের করার পক্ষে বাধা ছিল—যাহারা করা সঙ্গত মনে করে নাই তাহাদের সকলের সম্মিলিত সংখ্যা খুবই কম। কোন কাজ করা ভাল কি মন্দ, তাহা কেবলমাত্র সংখ্যাবাহুল্য দ্বারা প্রমাণ করা সব সময় নিরাপদ নহে—ইহা আমাদের মত। কিন্তু এই হরতালে যোগ না দেওয়ার পক্ষে যতগুলি যুক্তি সরকার ও সরকারপন্থীরা দেখাইতে পারিয়াছেন তাহার একটিও টেকসই নহে। সেগুলি জাতীয় মুক্তি-সাধনার কষ্টিপাথরে একটিও দাগ কাটিতে পারে নাই।

*　*

*

সাইমন কমিশন হইতে জাতিকে দূরে রাখিবার পক্ষপাতী আমারা এই জন্য যে, জাতি এমন করিয়াই জনসাধারণের নিকটতর হইবে। আত্মশক্তির দ্বারা যাহাদের আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে, তাহাদের কোন কমিশনের প্রতি বিন্দুমাত্র ভরসা রাখাও চলিবে না। অথচ যাহারা কমিশনের পক্ষপাতী তাহারা বিনাইয়া বিনাইয়া ঐ দিকে একান্ত ভরসার কথাই কহেন। এই পরানুগ্রহস্পৃহাই মানুষের শক্তিকে পঙ্গু করে। হরতাল করিয়া ফেলিয়া আমারা স্বাধীনতার পথে অনেক দূর আগাইয়া

গিয়াছি—এই ভুল করিবার মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি তরুণ বাঙ্গালীর হইবে বলিয়া মনে হয় না।

এই হরতাল করায় জাতীয় গৌরব যত না আছে না করিতে পারিলে ততোধিক লজ্জা ছিল। এই হরতাল করিয়া ইংরেজকে একটা মস্ত demonstration দ্বারা আমাদের ক্ষোভ জানাইলাম, ইত্যাদি কথার অত্যধিক আলোচনা ও আস্ফালনে আমাদের দৈন্যই প্রকাশ পাইবে। এবং এই দীন মনোবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া এখনো যে সেই সেকেলে আবেদন-নিবেদনেরই পর-সংস্করণ রহিয়াছে তাহা প্রমাণিত হইবে। যে তরুণ-ভারত ইংরেজ নিরপেক্ষ হইয়াই রাষ্ট্রীয় মুক্তি জাতীয় শক্তিসমৃদ্ধিতে অর্জ্জন করিতে চাহে—তুচ্ছ সাইমন কমিশন বর্জ্জনের সাফল্য লইয়া অত্যধিক মাতিয়া ভবিষ্যতের দুর্গম পথের গুরু দুঃখ বহনের পক্ষে তাহার শক্তিহীনতা সে দেখাইবে কেন? যে তরুণ-ভারত স্বাধীনতার দাবী করিতে যাইতেছে—পরাধীনতার সমুদ্র যাহাকে পাড়ি দিতে হইবে, হরতালের গোষ্পদ ডিঙ্গাইবে সে—এত সামান্যই কথা। ও কথা থাকুক। আর থাকুক সাইমন কমিশন সম্পর্কে আর সব কথা। বয়কট করা সার্থক হয়, যদি ভারতের কোন দেশীয় কাগজে কমিশনের সংবাদ না বাহির হয়। কাউন্সিল বর্জ্জন করিয়াও যেমন কাউন্সিল কথায় এককালে কাগজ পূর্ণ করা হইত, তেমনি কমিশন বর্জ্জন করিয়াও যদি কমিশন কথায় সংবাদপত্রের কলেবর পূর্ণ করিতে আমরা বসি, তবে মনের দৈন্য ঘুচিবে না। যে জাতির মনেই দৈন্য বাহিরের হার-জিতে তার কি হইবে?

* *
*

কলিকাতার হরতাল উপলক্ষে মারধর হইয়াছে। কংগ্রেস হইতে দেশবাসীকে হরতাল পালন করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে, স্বেচ্ছাসেবকগণ অনুরোধই করিতেছিল—পুলিশ তাহা সহ্য করিতে পারে নাই। বহু লোক মার খাইয়াছে—গ্রেপ্তারও হইয়াছে।

জনতা হইতে ঢিল ছোড়ার সংবাদও আসিয়াছে। কংগ্রেসের সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাহারা ঢিল ছুড়িয়াছে, তাহারা কে, জানি না; তবে অনেকে বলেন তাহারা দুষ্ট লোক—গোলমাল বাধাইতেই আসিয়াছিল। সে যাহাই হউক, পুলিশ চিরন্তন রীতি অনুযায়ী এ সকল দুষ্ট লোকদের ধরেন নাই—মারেনও নাই। ধরিয়াছেন তাঁহাদের যাঁহারা নির্দ্দোষী কংগ্রেস-সেবক।

* *
*

কলিকাতার কলাবাগান-বস্তি যে কারণে প্রসিদ্ধ তাহা সহরবাসী জানেন। হরতালের দিন দেখা গেল ঐ বস্তির মোড়ে লাল কাপড়ে সাইমন কমিশনকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য লেখা হইয়াছে "Welcome Simon Commission"। কলিকাতায় হরতালের দিন যে রকম গুণ্ডা-রাজের legalised নমুনা পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে কলিকাতার মধ্যে গুণ্ডাদের জন্য বিখ্যাত কলাবাগানে সাইমন কমিশন অভ্যর্থনা দ্রষ্টব্য বটে—বুঝিবারও বটে।

* *
*

কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে হরতাল উপলক্ষে গোলমাল হইয়াছে। প্রকাশ বহু শ্বেতাঙ্গ সার্জ্জন কলেজে প্রবেশ করিয়া ছাত্রদের মারধর করিয়াছে।

কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ ষ্টেপেল্টনকে আমরা প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পক্ষে যোগ্য ব্যক্তি মনে করি না। তাঁহার অযথা সরকার-প্রীতি ও নেটিভ-বিদ্বেষ শিক্ষা-বিভাগের পক্ষে লজ্জাজনক। তাঁহার হঠকারিতায়ই নাকি পুলিশ কলেজ-প্রাঙ্গনে ঢোকে। এ জন্য তাঁহাকে জবাবদিহি করার কর্ত্তা আছেন জানি; কিন্তু কেহ জবাবদিহি করিবেন কি না তাহা জানি না।

সাইমন কমিশন আগমন দিবসে হরতাল করা ছাত্রদের অপরাধ নহে। রাজনীতি বলিয়া আর সব যেমন বর্জ্জনীয় নয় ইহাও তেমনি। Empire Dayতে ছাত্রদের ছুটি দেওয়া হয়। ঐ ব্রিটিশ রাজনীতি ব্যাপারে ছাত্রদের সম্মতি থাকুক বা না থাকুক তাহাদের পড়া সেদিন বন্ধ। সুতরাং রাজনীতির অজুহাতে ছাত্রদের বলা যায় না যে, এই হরতালে যোগ দিও না। সরকারের বাঞ্ছিত রাজনীতিতে যদি দোষ না থাকে, তবে সরকারের অবাঞ্ছিত রাজনীতিতেও ছাত্ররা দোষ না দেখিতে পারে। তবে পরাধীন জাতির সমগ্র জীবনই যেমন নীতির ব্যতিক্রমে চলে, এ ক্ষেত্রেও তাই চলিবে।—

ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজে হরতাল-ঘোষণাকারীদের নামে মামলার হুমকি দেখান হইয়াছে। হরতাল করিতে বলা দোষের নহে, হরতালের জন্য পিকেট করা অপরাধ নহে—তবে পরাধীন বলিয়া আমাদের দেশের স্বদেশপ্রেম যখন crime—অপরাধ—তখন যতদিন জোর, যা ইচ্ছা করিতে পার। বেশী কথা থাকুক। Established by law—এই বস্তুটিই যখন মূলে, তোমরাও জান আমরাও জানি, Established by force—এবং যতকাল সম্ভব রাখিবে ঐ forceএরই দৌলতে—তখন যা হয় কর, আমরা ততক্ষণ নিজেদের চিনি, নিজেদের ঘরের খোঁজ করি, নিজেদের ঘর ছাইয়া ফেলি; তারপর দেনা-পাওনা যখন মিটাইতে বসিব তখন দেনা যেমন মিটাইব, পাওনাও তেমনি একতিলও ছাড়িব না।

শ্রী নলিনীকিশোর গুহ

টমাস্ হার্ডি

টমাস্ হার্ডির মৃত্যুর সঙ্গে একটা যুগের অবসান হইয়া গেল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁহার জন্ম হয় তখন ভিক্টোরিয়া-রাজত্বের উজ্জ্বল প্রভাতবেলা। হার্ডি যখন লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন তখন জর্জ্জ ইলিয়াটের গৌরব-সূর্য্য মধ্যাহ্ন গগনে, ডিকেন্স ও থ্যাকারে তখন অবিশ্রান্ত রচনায় নিরত, ব্রাউনিংয়ের প্রতিভা তখন কুয়াশা কাটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। এমনি সময় মেরেডিথের সঙ্গে সঙ্গে হার্ডি আপনার প্রতিভা লইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে দেখা দিলেন, এবং আজ বিদায় লইবার বেলায় তিনি একান্তই একেলা।

হার্ডির মত সুদীর্ঘ জীবন লাভ করা অনেক কবি বা সাহিত্যিকের ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্তু সাহিত্য-জগতে সৃষ্টির দিক দিয়া তাঁহার জীবনের শেষ অংশ অল্লাধিক পরিমাণে নিরর্থক। Time's Laughingstock and other Verses বাদ দিলে নেপোলিয়ানিক যুদ্ধের আখ্যান-ভাগ লইয়া রচিত সুবৃহৎ নাট্য-মহাকাব্য The Dynasts (১৯০৪—০৬) গ্রন্থই তাঁহার শেষ বৃহৎ সৃষ্টি। কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে, তাঁহার সুদীর্ঘকালব্যাপী উপন্যাস রচনার অবসানে, আবার প্রথম যৌবনের যে পরিপূর্ণ উদ্যম ও কাব্য-প্রেরণা ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছিল তাহা কম বিস্ময়কর ব্যাপার নহে।

প্রথম বয়সে কাব্য ও প্রবন্ধ রচনার সঙ্গে সঙ্গে হার্ডি স্থপতিবিদ্যার দিকে মন দিয়াছিলেন, এবং সুযশ লাভ করিয়াছিলেন। Coloured Brick ও Terrcotta Architecture সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি Royal Institute of British Architects দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন। এই সময় তিনি প্রচুর কবিতা লিখিতেন এবং 'চেম্বার্স জর্ণালে' তাঁহার প্রথম ছোট গল্প প্রকাশিত হয়। কিন্তু তখন তাঁহার মনের অবস্থা গভীর সংশয়ে দোল খাইতেছে;—কোন্ পথে চলিলে আত্মপ্রকাশের রহস্য-কাঠির সন্ধান মিলিবে তাহা লইয়া মনে তখন প্রবল চাঞ্চল্য। স্থপতিবিদ্যায় যে সফলতা ও যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহার আকর্ষণ কম নহে, কিন্তু যে রহস্যময়ী কাব্যলক্ষ্মী তাঁহার অন্তরে পিপাসা জাগাইয়া হাতছানি দিয়া ডাকিতেছিলেন, যিনি সকল দেশের সকল কবিকে কেবল মুগ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু স্নিগ্ধ করেন নাই, তাঁহার কাছে হার্ডি বোধ হয় নিজের অগোচরে নিজকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এবং সেই জন্য মনে হয়, নগরের কুৎসিত কোলাহল হইতে সরিয়া গিয়া যে ওয়েসেক্সকে তিনি তাঁহার সাহিত্যে জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছেন তাহার অন্তরে—তাঁহার জন্মভূমি ডরচেষ্টারে—আবাস লইয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেখানেই কাটাইয়া গেলেন।

"ডেস্পারেট রেমেডিজ্" (১৮৭১) হইতে আরম্ভ করিয়া "জুড্ দি অব্স্কিওর" (১৮৯৫) পর্য্যন্ত সময়টাকে হার্ডির জীবনের উপন্যাস-যুগ বলা যাইতে পারে। তাঁহার প্রথম রচনার মধ্যে পরবর্ত্তী কালের প্রতিভার সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় নাই। তিনি ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে ক্ষুদ্রতর গৌরব হইতে বৃহত্তর গৌরবের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। "আণ্ডার দি গ্রীন উড্ ট্রি" হইতে যে যশের সূত্রপাত হইয়াছিল "ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড্"-এ সে যশ ব্যাপকতা লাভ করিয়া "টেস্"-এ জনসাধারণের চিত্ত হরণ করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু যাঁহারা জহুরী তাঁহারা বহু পূর্ব্বেই তাঁহার শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন। "ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড্" (১৮৭৪) যখন বেনামীতে বাহির হয় তখন অনেকেই উহা ইলিয়টের লেখা বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন। "দি রিটার্ণ অব্ দি নেটিভ"-এ হার্ডির বিশেষ

শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এবং উহা বিশেষ ভাবে হার্ডি-মনের গাম্ভীর্য্য দ্বারা আচ্ছন্ন। 'জুড' তাঁহার শেষ উপন্যাস। ইহা পরিণত জীবনের অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। 'জুডে', মনে হয়, হার্ডির চিন্তাশীলতার চরম অভিব্যক্তি হইয়াছে এবং সেই জন্য বোধ করি জনসাধারণের কাছে উহা তেমন আদর লাভ করে নাই। যৌন-সম্বন্ধের নিবিড় জটিলতার খুব নির্ব্বিকার আলোচনায় 'জুডে'র মহিমা বাড়িয়াছে। এখানে হার্ডি যৌন-সম্বন্ধের আলোচনা করিতে যাইয়া আবেগে বা বাসনার পাঁকে নিজেকে জড়াইয়া ফেলেন নাই। ঔৎসুক্যের স্তর অতিক্রম করিবার প্রয়াস ইহাতে নাই। তাই অনেকের ধারণা 'জুডে' হার্ডি যে অধ্যায় শেষ করিয়া গেলেন, তার পরবর্ত্তী ঔপন্যাসিকেরা সেই সূত্র ধরিয়া আজ বিংশ শতাব্দীতে যৌন-সম্বন্ধের 'বে-আব্রু' আলোচনায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

একজন বিশিষ্ট ইংরেজ সমালোচক হার্ডির ক্রম-বিকাশের ইতিহাসকে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, দুইজনেই ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া চলিয়াছেন, কাহারো অতর্কিত আবির্ভাবে পাঠকসমাজ চঞ্চল হয় নাই। শুধু পার্থক্য এই যে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রথম জীবনের লেখাগুলি তাঁহার জন্য পরবর্ত্তী যুগে যশ আহরণ করিয়া আনিয়াছে, কিন্তু হার্ডির বেলায় তাহার বিপরীত।

দুঃখবাদ হার্ডি শোপেনহাওয়ারের কাছে পাইয়াছিলেন কি না জানি না, তবে তিনি ইহা স্থির বুঝিয়াছিলেন যে, মানুষ যাহা কিছু করে বা করে না, তাহাতে তাহার হাত নাই। এই নিষ্ঠুর অন্ধ নিয়তিশাসিত জগতে মানুষ নিতান্তই অসহায়, নিতান্তই কোনও এক অন্ধ শক্তির হাতে ক্ষুদ্র একটি খেলার পুতুল। সংসারের এই রঙ্গমঞ্চে মানুষ ক্ষণিকের জন্য তাহার বীরত্ব সাহস ও দম্ভ দেখাইয়া যন্ত্ররূপী নিয়তির হাতে গুঁড়া গুঁড়া হইয়া ধূলায় মিশাইয়া যায়। তবু মানুষ সংগ্রাম করে, সংগ্রাম করিয়া সত্য ও ধর্ম্মের মাপকাঠি সৃষ্টি করিতে চায়। কিন্তু দু'দিনেই তো সব ভাঙ্গিয়া যায়। প্রকৃতি তাহার অপরাজেয় খাম্-খেয়াল, তাহার অপরিমেয় শক্তি লইয়া নিঃশব্দ গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে—তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিবার শক্তি কাহারও নাই। এই শয়তানী খাম্-খেয়ালীর কাছে ক্ষুদ্র মানুষ নিতান্তই নিরুপায়, তবু তাহার একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, দুঃখ সহিবার প্রবল শক্তি লইয়া সে সংসারে আসে। মানুষ যুদ্ধ জয় করে, সাম্রাজ্য বিস্তার করে, কিন্তু তবু সে অন্তরে অন্তরে জানে যে—

"He is the sport of
The dreaming, dark, dumb Thing,
That turns the handle of this idle show."

গদ্য ছাড়িয়া শেষ জীবনে হার্ডি আবার পদ্যের দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। কিন্তু কি গদ্যে কি পদ্যে তাঁহার জীবনের যে মূল সুর—যে বিশেষ দর্শন-বাদে তিনি বিশ্বাস করিতেন, তাহা চিরদিন সমভাবে কাজ করিয়াছে।

জগৎময় দুঃখ ছড়াইয়া আছে। এ দুঃখের আর শেষ নাই। এই অশেষ অফুরন্ত দুঃখ-সমুদ্রে মানুষ দিন-রাত্রি ডুবিতেছে উঠিতেছে। ইহাই হার্ডিকে অত্যন্ত পীড়া দিত। তিনি স্থির বিশ্বাস করিতেন যে, এই দুঃখের দয়াহীন কঠোর নিষ্পেষণ হইতে মানুষের নিষ্কৃতি নাই। তাই লোকে তাঁহাকে অদৃষ্টবাদী বলে। তাঁর এই

ওয়েসেক্সের গল্পই হোক আর নেপোলিয়নের যুদ্ধই হোক, অথবা দুইটি প্রণয়ীর প্রেম কাহিনীই হোক, হার্ডি কিন্তু তাঁহার দুঃখবাদের বিষাদ সুর লইয়া সর্ব্বত্রই উপস্থিত আছেন। টেস্ যখন আইনের আদেশে প্রাণদান করে তখন হার্ডি বলিতেছেন, "Justice was done, and the President of the Immortals had finished his sport with Tess"। এই একই কথা অল্পাধিক পরিমাণে তাঁহার সমস্ত সৃষ্ট নরনারীর মধ্যে ধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু দুঃখবাদের উপর অতিরিক্ত ঝোঁক দিতে যাইয়া হার্ডি তাঁহার নরনারীকে স্থানে স্থানে

অস্বাভাবিক করিয়া গড়িয়াছেন। ঘটনার গতিতে যেখানে তাহাদের দুঃখ পাইবার কথা নয় সেখানেও তাহারা দুঃখের ভারে পীড়িত হইতেছে।

নারীকে হার্ডি শুধু পুরুষের দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছেন। পুরুষের উপর নারীর প্রভাব জীবন্ত, কিন্তু ব্যাঘাত জন্মাইতেও সে অদ্বিতীয়। ভালো মন্দ মিশিয়া একটা বে-পরোয়া ভাবে সে মগ্ন আছে। তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করা চলে না। তাহাকে বিশ্বাস করাও কঠিন। হার্ডির নারীর মধ্যে মুগ্ধ হইবার উপকরণও আছে। পুরুষ তাহাকে ভালোবাসিতে পারে, ভালোবাসিয়া অনুতপ্তও হইতে পারে। হার্ডি তাঁহার নারীকে বাঁচাইবার জন্য, সমর্থন করিবার জন্য তাহার পাশে দাঁড়াইতে পারেন, কিন্তু মনে মনে জানেন তাহাকে যত ভালো বলিয়া প্রচার করিতেছি তত ভাল সে নহে। নারী নিষ্ঠুর,—সে সহ্য করিতে জানে না।

উপন্যাসে হার্ডি বিশেষ বিশেষ চরিত্র সৃষ্টির দিকে মন দেন নাই। জীবনের কতকগুলি আদিসূত্র কতকগুলি গভীর অনুভূতি লইয়া তিনি নাড়া-চাড়া করিয়াছেন। সহর ও সভ্যতা হইতে দূরে যাইয়া বাহ্য-প্রকৃতি, ছোটো-খাটো পল্লী, কৃষকমণ্ডলীর সহজ অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রা, দিগন্ত প্রসারিত শস্যক্ষেত্র ও কোলাহলহীন পল্লীপথের উপর দিয়া সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে রং ও রূপের ধারা বহিয়া যায় তাহার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের মধ্যে তিনি আপনার পাথেয় খুঁজিয়া বেড়াইতেন। কোলাহল-কুৎসিত ভিড়ের মধ্যে যেখানে জীবন-সংগ্রামের ফেনিল গরল নিরন্তর আবর্ত্তিত হইতেছে সেখানে হার্ডির স্থান নহে। মূক ধরণীর অভ্যন্তরে অন্তহীন বিরাট নিস্তব্ধতা জমাট বাঁধিয়া আছে,—ধরণীর সেই মৌনতা দূর করিয়া কৃষক যেখানে তাঁহারি মত নিঃশব্দে গভীর তলদেশ হইতে শ্যামল হাসি জননী বসুমতীর মুখে ফুটাইয়া তুলিতেছে হার্ডি সেখানে সান্ত্বনা পাইয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি চরিত্র-সৃষ্টি হার্ডি করেন নাই, কেননা হার্ডির যে দর্শনবাদ তাঁহার গদ্য-পদ্যের মধ্যে কাজ করিয়াছে তাহাই চরিত্র-সৃষ্টির বৃহৎ অন্তরায়। মানুষের নিজের যদি ভালোমন্দ কিছুই করিবার না থাকে, সে যদি তাহার নিজের নিয়ন্তা নিজে না হয়, নির্ম্মম অন্ধ নিয়তির তাড়নায় দুর্নিবার ঘটনার স্রোতে কেবলি ভাসিয়া যাইতে থাকে তবে সে বৃহৎ ও মহৎ হইবার উৎসাহ পাইবে কোথায়? কিন্তু এই দিক দিয়া যে অভাব বা ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে অন্যদিকে তাহার পূরণ হইয়াছে। যে সব ঘটনা বা শক্তির খেলা হার্ডি তাঁহার চরিত্রের উপর খেলাইয়াছেন তাহার মহত্ত্ব প্রকৃতই মহৎ।

দুঃখবাদ মানুষের আর যে অপকারই করুক একটা মহৎ উপকার এই করে যে, মানুষের মনে একটা গম্ভীর প্রশান্তি, একটা গভীর স্থৈর্য্য আনিয়া চিত্তকে সমাহিত ও আত্মস্থ করে। হার্ডি আত্ম-সমাহিত ছিলেন, এবং গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনায় ইংরেজী সাহিত্যে তিনি যে দান করিয়া গেলেন তাহার মূল্য নিন্দা-প্রশংসা দ্বারা ছোট বা বড় হইবার নহে।

শ্রী সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু

শ্রী শিশিরকুমার নিয়োগী কর্ত্তৃক, ১এ, রামকিষণ দাসের লেন, নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস হইতে মুদ্রিত ও বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

পদক ও পুরস্কার

বর্ত্তমান ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কার দেওয়া হইবে।

পদক

	পদক	প্রবন্ধ
১।	হেমচন্দ্র সুবর্ণপদক	নারী-চরিত্রে কবি হেমচন্দ্র।
২।	হরপ্রসাদ সুবর্ণপদক	হিন্দু-রাজত্বে রাঢ়।
৩।	ভবলাসুন্দরী সুবর্ণপদক	বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গত ২৫ বৎসরের মধ্যে কি কাজ করিয়াছেন, তাহার ইতিহাস।
৪।	রামগোপাল রৌপ্যপদক	'এষা' কাব্য সমালোচনা।
৫।	অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্যপদক (ক)	'কনকাঞ্জলি'র বিশেষত্ব।
৬।	অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্যপদক (খ)	অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে নারী-চরিত্র।
৭।	জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী রৌপ্যপদক	মাইকেলের ছন্দ।
৮।	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রৌপ্যপদক	মাসিক-সাহিত্য সমালোচনার ধারা।

পুরস্কার

১।	আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-পুরস্কার (১০০৲)	শতপথ, গোপথ ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যানসমূহের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা।
২।	গগনচন্দ্র পুরস্কার (৫০৲)	স্কন্দপুরাণে ঐতিহাসিক তত্ত্ব।

দ্রষ্টব্য—প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা ও বিচারশক্তির পরিচয় থাকা আবশ্যক। কেবল ৬ষ্ঠ বিষয় মহিলাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। অন্যান্য প্রবন্ধ সাধারণে লিখিতে পারিবেন। প্রবন্ধগুলি ২৯এ ফাল্গুন (১৩ই মার্চ্চ, ১৯২৮) তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে।

বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, ২৬এ পৌষ,
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সম্পাদক।

আশা
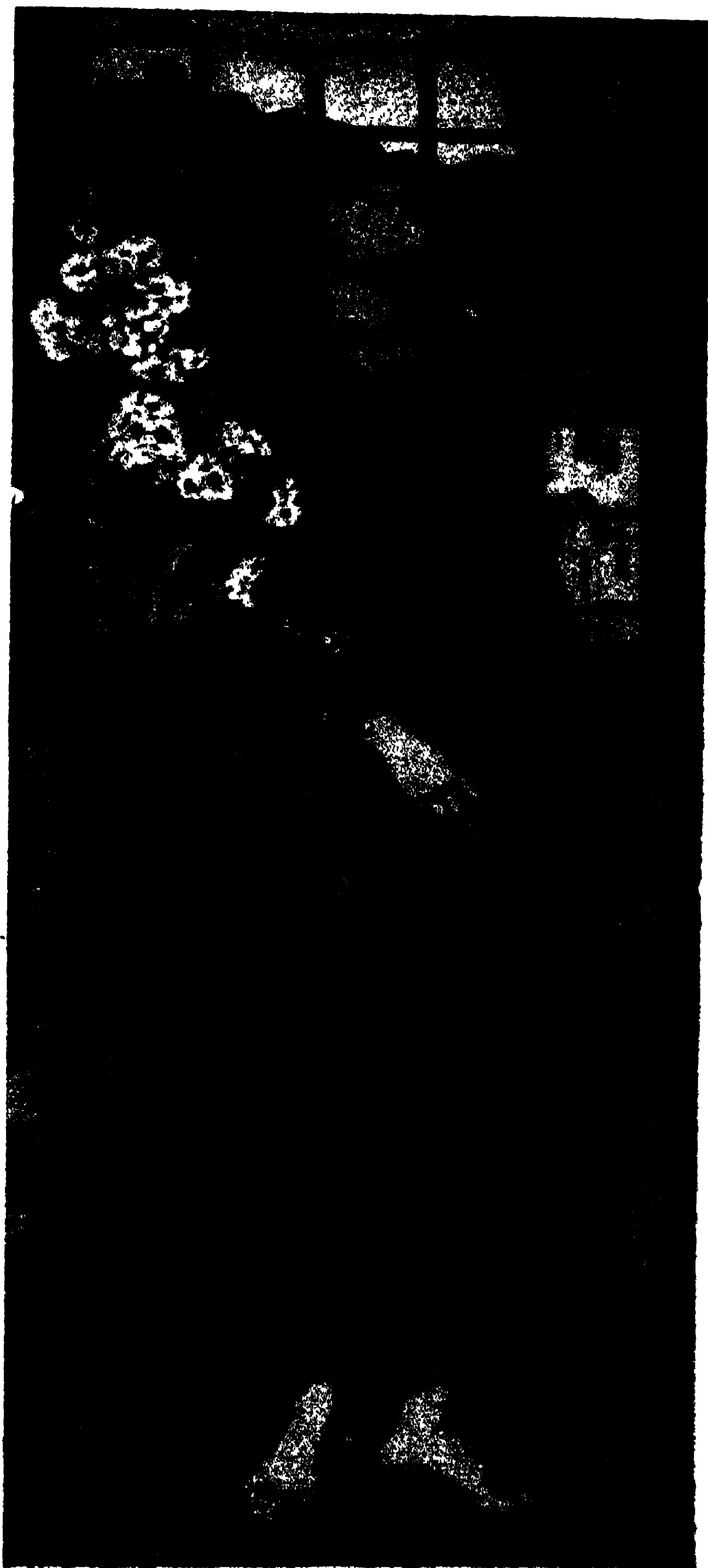
চিত্রকর —স্যর এডওয়ার্ড বার্ণ-জোন্স

কালি-কলম
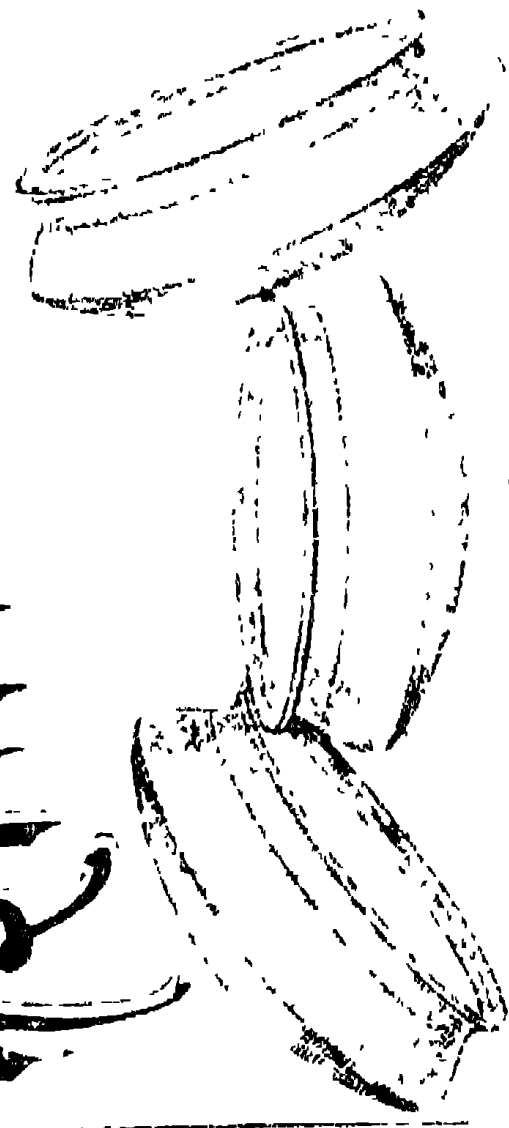
২য় বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩৩৪ [১১শ সংখ্যা

কবি ভবভূতি

শ্রী হেমচন্দ্র বাগচী

জাতূকর্ণীর অমর তনয়, সুদূর দিনের কবি,
ওগো ভবভূতি, বেদনা তোমার ফুটালো করুণ ছবি।
শ্যাম কান্তার-প্রান্তর-পারে ঘন নীল গিরিমায়া ;—
তা'রি মাঝে কাঁদে মানব রাঘব ; ঘনায় বিরহ-ছায়া।
অতি-মানুষের আনন এঁকেছ আতুর আঁখির জলে ;
স্মৃতির সে ব্যথা-নিপীড়ন হেরি পঞ্চবটীর তলে ॥

নব শল্লকী-পল্লবদলে করি-করভক সাথে,
কিশোরী বধূটি খেলিত তাহার কমল কোরক মাথে ;
বনের চপল হরিণ-হরিণী লালিত সীতার করে।
সুখী শিখীদল-কলঝঙ্কারে তা'রি ভাষা মনে পড়ে।
হেরি, সে দহনে কঠোর রাঘব সকলি গিয়াছে ভুলি' ;
অতি-মানুষের বেদনা এঁকেছে মানুষ-কবির তুলি ॥

সুচির কোমল মানব-মরমে একটি রসের ধারা—
যুগ-যুগ ধরি' বহি' চলি' যায় ; দুই তীরে জাগে সাড়া।

কত গুঞ্জন কত না ভাষণ ঘন আবর্ত্তে চলে।
সে রস গভীর চিরসুকরুণ—উপজে অশ্রুজলে।
এ বাণী তোমার করেছ প্রচার—ধন্য ধরার ধূলি ;
অতি-মানুষের বেদনা এঁকেছে মানুষ-কবির তূলি ॥

ললিত-মধুর কবিতা তোমার কভু গম্ভীর কায়া।
কভু নির্ঝর-ঝর-ঝর ভাষা কভু বা বনের মায়া—
প্রেমিক হৃদয়-জড়িত ব্যথারে ঘিরিয়া ঘিরিয়া জাগে ;
মরমে ধরিয়া শিশুর অমিয়া নব নব অনুরাগে।
প্রিয়ার লাবণি মূর্ত্তি ধরেছে ধ্যান-সুষমার মাঝে ;
সংসার-পথে নব নব সুরে প্রেমের বীণাটি বাজে ॥

সমাজে তোমার পাওনি আসন সুদূর দিনের কবি,
আজি মানুষের মরমে তোমার বেদনা ধরিছে ছবি।
নিরবধি কাল, পৃথ্বী বিপুল ; সমানধর্ম্মা আসে ;
অটুট সাধনা-শতদল তব কালের সাগরে ভাসে ॥

উপলাহত প্রবাহ

শ্রী জগদীশ গুপ্ত

মোকর্দ্দমা তরমিম্ ডিক্রী হইয়া গেল।

নালিশ এই—

প্রতিবাদী বাদীর কর্ম্মচারী থাকা কালে ১৩২৭ সালের ২৪শে মাঘ তারিখে বাদীর জমা খরচে ২৬৫৲ টাকা খরচ লিখিয়া লইয়া ১৩০৲ টাকা মাত্র বাদীর দেয় বাবদে খরচ করিয়া বাকি ১৩৫৲ টাকা আত্মসাৎ করায় মায় ক্ষতিপূরণ ২৬৫৷৵৫ টাকা প্রতিবাদীর নিকট বাদীর পাওনা।—

এবং ঘটনা এই যে, প্রতিবাদী নবীন আর বাদী কৃষ্ণলাল সম্পর্কে ভায়রা-ভাই ও মণিব-চাকর।...মানভূম জেলার কাট্রাস্‌গড় কয়লার খনিতে ব্যবসাসূত্রে কৃষ্ণলাল হামেসা থাকে, আর তার বাড়ী-ঘর-দুয়ার-জমি-জিরাৎ ও স্ত্রী থাকে স্বগ্রামে, নবীনের খবরদারিতে—

নবীন এই খবরদারির পারিশ্রমিক পায় মাসিক পনর' টাকা।...এই ব্যবস্থায় উভয়েরই সুশৃঙ্খল সুরাহায় এবং সম্ভাবে দিন চলিতেছিল—

হিসাবে গোল হয় নাই—

কিন্তু দেবতা একদিন পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিলেন—গোল বাধিল।

বাদী কৃষ্ণলাল বাস্তবাটীতে একটি পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ করাইতে সুরু করিয়া দিল; কিন্তু পত্তনীদারের বিনা অনুমতিতে তাহার ইষ্টকালয় "নির্ম্মাণ করিবার অধিকার না থাকা কথিতে" মহালের পত্তনীদার সংবাদ পাইয়া নির্ম্মাণকার্য্য বন্ধ করিয়া দিলেন।...নবীন কৃষ্ণলালকে সংবাদ দিল যে, খরিদা বাস্তবাটীর খারিজ দাখিলের নজরানা বাবৎ ও পাকা বাড়ী নির্ম্মাণের অনুমতি বাবৎ পত্তনীদারকে ৩০০৲ টাকা এবং তাঁহাদের আম্‌লাগণকে ৫৲ টাকা, একুনে ৩০৫৲ টাকা দিতে হইবে।...কৃষ্ণলাল তাহাতেই সম্মত হইয়া উক্ত টাকা পত্তনীদারকে দিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইল।

...কিন্তু পরে, ১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে দেখা গেল যে, ১৩২৭ সালের ২৪শে মাঘ তারিখে নবীন ২৬৫৲ টাকা খরচ লিখিয়া মাত্র ১৩০৲ টাকা পত্তনীদারের সেরেস্তায় জমা দিয়া বক্রী ১৩৫৲ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে।—

প্রতিবাদী নবীন বাদী কৃষ্ণলালের উক্তির প্রত্যুত্তরে ইহাই বলিয়া তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইল যে, বাদী কৃষ্ণলাল কয়লার কুঠিতে কার্য্য করিবার কালে সে তাহার কর্ম্মচারী হিসাবে "কার্য্য" করিত বটে, কিন্তু সে-কার্য্যের ব্যয়ভার সে নিজে বহন করিত।...তারপর, বাদীর কয়লার কারবার বন্ধ হইয়া গেলে বাদী বাড়ীতে আসে; তখন হিসাব দেখাইয়া টাকা চাহিলে বাদী নানা অজুহাত দেখাইয়া টাকা দিতে অস্বীকার করে...পরে গ্রামস্থ কুলোকের এবং বিবাদীর শত্রুপক্ষের সহায়তায় ও পরামর্শে এই মিথ্যা মাম্‌লা রুজু করিয়াছে।...

নবীন আরো বলিল যে, বর্ত্তমান মোকর্দ্দমা একেবারে ভিত্তিহীন এবং অচল; এবং এই কারণেই মোকর্দ্দমা আদৌ টিকিতে পারে না যে, যে হিসাবের "খাতামূলে" এই মোকর্দ্দমা আনা হইয়াছে সেই খাতাই জাল খাতা—

সে আর বাদী উভয়ে একত্র হইয়া আয়করকে ফাঁকি দিবার অভিপ্রায়ে এই খাতা প্রস্তুত করিয়াছিল।...

বাদী বাড়ী প্রস্তুত করিতেছেন ইহা ঠিকই—

কিন্তু পত্তনীদারকে দেয় টাকা, সর্ব্বসমেত ২৬৫৲ টাকা সে বাদীর উকিল, অধুনা মৃত, পাঁচকড়িবাবুর কাছে গচ্ছিত রাখিয়া আসিয়াছিল; নিজে যাইয়া সে জমা দিয়া আসে নাই—

পত্তনীদারের সঙ্গে যাবতীয় কথাবার্ত্তা পাঁচকড়িবাবুই করিয়াছিলেন; অতএব সে বাদীর দাবির জন্য দায়ী হইতেই পারে না...ইত্যাদি, ইত্যাদি।—

কিন্তু বিচারক চিঠিপত্র ও খাতাপত্র দৃষ্টে উভয় পক্ষেরই বাদ প্রতিবাদ কিছু কিছু বাদছাদ দিয়া বিশ্বাস করিয়া পূরা ডিক্রী না দিয়া আংশিক ডিক্রী দিলেন, এবং বাদীর সুদের দাবি একেবারেই অগ্রাহ্য না করিয়া থোকে কুড়িটি টাকা বাদীর প্রাপ্য বলিয়া রায় দিয়া বিচারকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া দিলেন—

কিন্তু উভয় পক্ষকেই হার মানাইয়া হাকিম উভয়েরই কোথাও এমন মর্ম্মদাহ ধরাইয়া দিলেন যে, সে দাহ শীতল হইতে যে-কাণ্ডটা ঘটিয়া গেল তাহা যেমন অপ্রত্যাশিত, তেম্‌নি লোমহর্ষক।—

নবীন ছোট, দরিদ্র—

কৃষ্ণলাল বড়, অবস্থাপন্ন।

ভায়রা-ভাইয়ের অন্নসঙ্কটে কৃষ্ণলাল প্রাণপণে সাহায্য করিয়াছে...সে-সব ত' সেদিনকার কথা—

নিজের বাড়ীর খানিকটার স্বত্ব লেখাপড়া করিয়া ত্যাগ করিয়া তাহাকে সে ভিন্নগ্রাম হইতে আনিয়া বসাইয়াছে—

তারপর যে ক্ষুদ্র বৃহৎ কত অনুগ্রহ আর দরদী বন্ধুর কর্ত্তব্য সে করিয়াছে তাহার গণনাই নাই।·· নবীন সেই অনাহুত উপকারের প্রতিফল দিল ভালই!—

কৃষ্ণলাল আদালত হইতে বাড়ী ফিরিয়া ধূলা পায়েই দাওয়ার ধারিতে ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িয়া হুঙ্কার ছাড়িতে লাগিল,—নেমক্‌হারাম, বেইমান আর বজ্জাত; ওর মুখ দেখলে মানুষের সাতপুরুষ নরকস্থ হয়।...দুধ খাইয়ে সাপ পুষেছিলাম; ছুব্‌লেছে বেশ!—বলিয়া কৃষ্ণলাল বিষে নীল না হইয়া ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল। বলিতে লাগিল,—আমার হিসেবের খাতা জাল জোচ্চোরি কাণ্ড···সরকারকে আমি ফাঁকি দিচ্ছি...এই কথা ও বলে' এল হাকিমের সুমুখে হলপ্‌ করে'! আমায় ও জেলে দেবে—তোমরা দেখে নিও।...জেরবার আমায় নিজে করলে; তাতেও ওর পরিতোষ হ'ল না···এখন আমায় জেলে দেবার ইচ্ছে ওর। ভগবান কি নেই ভেবেছে ও?

কিন্তু আর্ত্তরক্ষার জন্য ভগবান সর্ব্বদাই প্রস্তুত ইহা জানিয়াও কৃষ্ণলাল স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, ইনকাম-টাক্স দারোগা তাহাকে খাতাপত্রসহ সদরে তলব করিয়াছে—

আর ক্যাঁচ ক্যাঁচ্‌ শব্দ করিয়া একটা ঘানি ঘুরিতেছে—

ঘুরাইতেছে সে!

বেলা পড়িয়া আসিতেছিল।

কৃষ্ণলালের স্ত্রী চন্দ্রমুখী জলের ঘটি হাতে করিয়া স্বামীর সম্মুখে আসিয়া তাহার হাঁটু পর্য্যন্ত এবং চোখে মুখে অপর্য্যাপ্ত ধুলা দেখিয়া বলিল,—হাত-মুখ ধুয়ে সুস্থ হ'য়ে বস'। যা' হবার তা' হয়েছে।···চেঁচালে ত' হাকিমের হুকুম ফিরবে না; মানুষের স্বভাবও বদ্‌লাবে না। বলিয়া অতীতের অনেক কথাই স্মরণ করিয়া চন্দ্রমুখী নিঃশব্দে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

স্ত্রীর কথায় কৃষ্ণলালের চৈতন্যোদয় হইল—

চেঁচাইয়া কে কবে দুষ্টকে দমন করিতে পারিয়াছে!··· যদি তাহা সম্ভব হইত তবে মেঘের ডাকে ভূতের বাসা ভাঙ্গিয়া বাতাস এতদিন পরিষ্কার হইয়া যাইত—

আর, অকৃতজ্ঞ দুষ্ট ব্যক্তিকে সুমতি দিতে স্বয়ং ভগবানও অক্ষম; তাহা যদি না হইত তবে দুর্য্যোধন সম্বন্ধে একেবারে হা'ল ছাড়িয়া দিতেন না

স্ত্রীর সেবায় এবং প্রবোধবাক্যে মানসিক জ্বালা যন্ত্রণার সাময়িক উপশম হইলেও, হাত-পা ধুইয়া, একটু জলযোগ সারিয়া তামাক টানিতে বসিয়াই কৃষ্ণলালের মনে হইল, চীৎকার করিয়া পৃথিবী ফাটাইয়া সে বলিয়া বেড়ায়—দেখে যাও জগৎবাসি, কৃতঘ্ন খলের নির্য্যাতন।...চন্দ্রসূর্য্য, গো-ব্রাহ্মণ, সাধু-সজ্জন সাক্ষী থাকুন, সে নির্দ্দোষী···ভগবান যেন ইহার প্রতিবিধান করেন—

যেন ভগবান, চন্দ্র-সূয্য, গো-ব্রাহ্মণ আর সাধু সজ্জনের সাক্ষ্য লইয়া কৃতঘ্ন খলের উচিত সাজা দিয়া থাকেন।······

কলিকায় তামাকের মত তার প্রাণও জ্বলন্ত অনলে পুড়িতে লাগিল—

পুড়িতে পুড়িতে হঠাৎ সে কাঁদিয়া উঠিল,—এরি জন্যে এত করেছিলাম!......

কান্নার শব্দ শুনিয়া ও-বাড়ীতে নবীনের স্ত্রী শিহরিয়া চোখ বুজিয়া আঁচলে মুখ লুকাইল।

এত রেষারেষি আর উত্তপ্ত কোলাহলের ঘূর্ণীর মধ্যেও বড় চন্দ্রমুখী আর ছোট রাসমণি কেবল যে পরস্পরের কাছে স্বামীর দুর্ব্বুদ্ধির নিন্দা আর দুর্মতির দরুণ আপশোষ করিয়া তাহাদিগকে ধিক্কার দিয়াছে তাহা নয়—

উভয়েই স্বামীকে নিরস্ত করিতেও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে।

কিন্তু টাকা যখন ঘটনার মূল—

আর আদালত যখন এক মাইলের মধ্যেই—

আর, উস্কাইবার লোক যখন বন্ধুর বেশে দিবারাত্র হাতের কাছেই মজুত—

তখন স্ত্রীর অনুনয়ে বাদী প্রতিবাদী কেহই কর্ণপাতও করিল না—

কাপুরুষ তারা নয়।

···মাম্‌লা রুজু করিয়া আসিয়া দু' তিনবার মুলতুবীর পরই দু'জনের কি যে ঝোঁক চাপিয়া গেল—

যেন রজ্জুবদ্ধ বলীবর্দ্ধ দু'টি মুক্তির জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছিল—

দৈবাৎ তারা ছাড়া পাইয়াছে—

ছুটিতে ছুটিতে পাষাণ-প্রাচীরে ঠোক্কর খাইয়া চূর্ণ ধূলিসাৎ হইবার পূর্ব্বে তাহারা থামিবে না।

নবীন আসিয়া চেঁচাইল না—

আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল,—ফিরেছে নাকি?

বলিয়া মাথা নাড়িয়া কৃষ্ণলালের বাড়ীর দিকটা দেখাইয়া দিল।

ইঙ্গিতটা বাহুল্য।

রাসমণি বলিল,—ফিরেছে। আজকে শেষ করে' এসেছ ত?

মোকর্দ্দমায় প্রকারান্তরে নবীনেরই জয় হইয়াছিল; হাসিয়া বলিল,—শেষ হ'ল আজ। কি বল্‌ছিল?

কামু বলিয়া উঠিল,—খুব চেঁচাচ্ছিল; নয়, মা? বলিয়া সে একবার মায়ের একবার বাপের মুখের দিকে চাহিল—

খুব সজ্ঞান দৃষ্টিতে!

আশ্চর্য্য এই যে, নবীনের ছ'বছরের মেয়েটি ঈর্ষার ইসারা বুঝিতে আর ইসারা কুটিল করিয়া বিদ্বেষ বুঝাইতে শিখিয়াছে—

দোষ তাহার নয়, রাসমণিরও নয়; রাসমণির অক্লান্ত হিতার্থিনীরা দল বাঁধিয়া আসিয়া এই শিক্ষাটা তাহাকে দিনের পর দিন দিয়া গেছে।...পাঁচটি মাসের মধ্যে কত চরম ঘোরালো হইয়া কত কটু কথা, কত চর্চ্চা, কত ক্রূর ভঙ্গী, কত ব্যঙ্গোক্তির সৃষ্টি করিয়াছে—

রাসমণি নিজে কথাগুলিতে তেমন কান দেয় নাই—

কিন্তু ছ' বছরের শিশু কামু তাহাদের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিয়া সম্বিতের ভিতর ধরিয়া রাখিয়াছে।—

নবীনের প্রশ্নের উত্তরে রাসমণি বলিল,—চেঁচাচ্ছিল খুব; শেষে কেঁদে ফেল্‌লে; বল্‌লে, আমায় জেলে দেবার মতলব করেছে ও।—বলিয়া রাসমণি স্বামীর চোখের সাম্‌নেই বিরক্তির একটা ভ্রূভঙ্গী করিল।...

নবীন লজ্জা পাইয়া চোখ নামাইল;—

সে দোষী—

স্ত্রীর সম্মুখে তার অপরাধটা যেন নগ্ন হইয়া দিবা-লোকের মাঝে ফুটিয়া ওঠে।

রাসমণি আজ পর্য্যন্ত এই গৃহবিবাদের কথাতে স্বামীর সঙ্গে গা গড়াইয়া দেয় নাই—

তবে স্বামী গুরুজন—

তাঁহাকে লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই—

তাই পাতিব্রত্যের বাধ্যবাধকতার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে এবং স্বামীকে সন্তুষ্ট করিতে বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতি যতটা বিরুদ্ধ ভাব দেখান দরকার তাহাই সে দেখাইয়াছে—তাহাও চোরের মত সসঙ্কোচে...যেন নিজের কাছেও শশব্যস্তে লুকাইয়া।...

পুরুষে পুরুষে বিবাদ—

তাহারা পরস্পর পর; অনৈক্য তাদের সবখানে।

কিন্তু উহারা যে মায়ের পেটের বোন্ দুটি—

একই রক্তের দুটি বুদ্বুদ—

আবার আরো গুরুতর কথা ইহাই যে, নবীন সত্য সত্যই অতিশয় ঘৃণ্য কৃতঘ্নতার কাজই করিয়াছে—

রাসমণি চন্দ্রমুখীর কাছে মুখ দেখাইতেও কুণ্ঠায় লজ্জায় এতটুকু হইয়া যায়।

কিন্তু বাহিরের এত আলোড়ন দুই ভগিনীর অন্তরের গভীরতম সুকোমল স্থলটি স্পর্শ করিতে পারে নাই—

উপরে ফেণমুখী অস্থির ঢেউ; কিন্তু ভিতরে স্থির প্রবাহটি একটানা বহিয়া চলিয়াছে,—তাহার অঙ্গে উতরোল ঢেউয়ের আঘাত লাগে নাই।—

কৃষ্ণলালের স্ত্রী চন্দ্রমুখী সন্তানহীনা—

রাসমণির ঐ একটি কন্যা, কামু।

কামুকে উপলক্ষ্য করিয়া যে স্থানটিতে দু' ভগিনীর হৃদয়ের মিলন হইত সে স্থানটা অক্ষত আছে।—

দু' জনাই আনন্দে গদগদ হইয়া যাইত।

চন্দ্রমুখী বলিত,—কামু আমার মেয়ে।

রাসমণি বলিত,—ও তোমারই।

কেমন বর আসিবে এবং বিবাহের সময় কি কি অলঙ্কার সে পরিবে, চন্দ্রমুখীর মুখে তাহার ফর্দ্দ শুনিয়া শুনিয়া কামুর তাহা কণ্ঠস্থ হইয়া গেছে।

"কেমন বর আসবে রে তোর?"—জিজ্ঞাসা করিলেই কামু বলে,—"রাঙা"।

"কি কি গয়না পর্‌বি?"—

কামু বলিয়া যায়,—হার, অনন্ত, বাজু, বালা, দুল, মল, ফুল, চিরুণী ব্রেস্‌লেট।—বলিতে বলিতে অলঙ্কার পরিবার স্থানগুলিও সে যথাক্রমে দ্রুতবেগে দেখাইয়া যায়।

চন্দ্রমুখী হাসিয়া বলে,—পাকা মেয়ে।

কামুর নাক আর কান বিঁধাইবার দিন এমন ঘটা হইয়াছিল যে কামুরও তাহা মনে পড়ে—

সানাই বাজিয়াছিল, আর লোক খাইয়াছিল শ' দেড়েক...

সব চন্দ্রমুখীর খরচে।

রাত্রে কামু তার মায়ের কাছে শুইবে কি মাসীর কাছে শুইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই—যেখানে সন্ধ্যা হয় সেই খানেই রাত্রিটার মত সে থাকিয়া যায়।

কামুর একবার জ্বর হইয়াছিল—

জ্বর সাতদিন ত্যাগ পায় নাই।...এই সাতদিন চন্দ্র

মুখীর বাড়ীতে রান্না চাপে নাই—শুধু এই কারণে যে মেয়ে কখনো তার মাকে কখনো তার মাসীকে কাছে চাহিতেছে; যদি মাসীকে চাহিয়া তখনই তাহাকে না পায় তবে মেয়ে যে কাঁদিয়া রোগ বাড়াইয়া ফেলিবে!—

মোকর্দ্দমা বাধিয়া উঠিল—

কিন্তু তাহার মর্ম্ম কি বিবরণ দুই ভগিনীর কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল না; নিজের কাছে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে কাহারো আগ্রহও ছিল না।

বাহিরে হিতাকাঙ্ক্ষী প্রতিবেশিগণের অবিরাম আনাগোনা—

অন্তঃপুরেও তাই..

বন্ধুরা আসে, বসে, নিজেদের মনের গরল বসিয়া বসিয়া উদ্গিরণ করিতে থাকে...চোখ মট্‌কাইয়া, ঠোঁট বাঁকাইয়া, ফিস্‌ফিস্ করিয়া কত কথা বলে...যেন তাহাদেরই বাজিয়াছে বেশী।

বন্ধুদের কথায় রাসমণি অনিচ্ছার সহিত যোগ দেয়—

মন তার খিট্‌খিট্ করিয়া পিছে হাঁটিতে থাকে—

বুক দুরু দুরু করে, পাছে দিদি শুনিয়া ফেলে—

তবু চক্ষুলজ্জায় বাধ্য হইয়া হিতৈষিনীদের সেই শত্রুচর্চ্চায় তাহাকে যোগদান করিতে হয়।...

কিন্তু দিনের পর দিন নিরন্তর একই প্রসঙ্গে নিমগ্ন থাকিয়া অল্পে অল্পে ঘুণ দেখা দিল—

কখনো জালাতন বোধ করিয়া, কখনো নিজের স্বামীর উপর তিক্ত বিরক্ত হইয়া ঈর্ষা, বিদ্বেষ, আক্রোশ, ক্রোধের দু'টি একটি কথা রাসমণির মুখ দিয়া বাহির হইতে লাগিল। ধরিতে গেলে, সে-কথার কোনো মূল্য নাই, মানে নাই—চল্‌তি পথের কথার মত, মনের দিক্ দিয়া, স্বল্পজীবী সে-কথার গুরুত্ব নাই।

কিন্তু কানু তাহারই দু'চারিটি গৎ শিখিয়া ফেলিয়া মাসীর সম্মুখেই একদিন তাহা উচ্চারণ করিয়া আসিল—

শুনিয়া চন্দ্রমুখীর বুকে বেদনা রাখিবার আর স্থান রহিল না।—

চন্দ্রমুখী রাসমণির উঠানে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল।

রাসমণি চোখের সাম্‌নে ছিল না—

তুলসীমঞ্চের মূলে একটা খঞ্জন নৃত্য করিতেছিল; সেইদিকে চন্দ্রমুখী নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া রহিল।...

রাসমণি আসিয়াই কি বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু দিদির মুখের দিকে চাহিয়া সে থম্‌কিয়া গেল...মুখখানা খুব গম্ভীর; এক পলক দেখিয়াই রাসমণির বুঝিতে বাকি রহিল না যে, সেই গাম্ভীর্য্যের অন্তরালে ক্রোধ নাই—দুরন্ত অভিমান আর মনোবেদনা যেন ফুঁপাইতেছে।

চন্দ্রমুখী নিঃস্পৃহ চক্ষে কানুর দিকে চাহিয়া রহিল;...বলিল,—রাস, আমি নাকি তোদের ভাসাতে বসেছি!

রাসমণির মুখ দিয়া অমন অসম্ভব কথা উচ্চারিত হওয়া দূরে থাক্, তার মনেও কখনো উদয় হয় নাই।

রাসমণি দাঁতে জিব্ কাটিয়া বলিল,—সে কি, দিদি?

রাসমণির সন্দেহ জন্মিল, হিতৈষিণীদের কেহ দু'-পক্ষেরই হিতৈষিণী; তাহাদেরই কেহ মক্ষিকার মত ব্রণবিষ মুখে করিয়া দুই বাড়ীর অন্তঃপুরেই যাতায়াত করিতেছে।......কাহার দ্বারা এমন নির্ম্মম অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে, দিদির মুখের দিকে চাহিয়া রাসমণি কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিল—

কিন্তু রাসমণির চোখের নয়, মুখের নয়, সর্ব্বহৃদয়ের এই অপার বিস্ময় আর ব্যথা চন্দ্রমুখী লক্ষ্যও করিল না; বলিল,—অমন কথা তুই মুখে আন্‌লি কি করে, রাস? বলিতে বলিতে তার দু'চোখ্ ভরিয়া জল উথলিয়া উঠিল; বলিল,—তোদের আমি ভাসাতে বসেছি! অন্তর্য্যামী জানেন—

অন্তর্য্যামীই জানেন, সে এই কলহে কত ব্যথা পাইয়াছে।......স্বামীকে হাতে ধরিয়া নিবৃত্ত করিতে যাইয়া সে বারম্বার কি নিদারুণ অপমান হইয়া আসিয়াছে ...হৃদয়বিদারক সেই শল্যের জ্বালা এখনো তার বুকে তেম্‌নি তাজা তেম্‌নি দুঃসহ।—

চন্দ্রমুখী কাঁদিতে লাগিল।

কিন্তু ইষ্টদেবতার নামে কঠিন একটা শপথ মনে মনে আবৃত্তি করা ছাড়া রাসমণির মুখে কিছু বলিবার রহিল না।...এ অভিযোগ যে একেবারে অসত্য তাহা বুঝাইবার কি উপায় তাহার আছে!......সে কেবল একটি কথা বলিতে পারে, না।...মনের কথা মন জানে—কিন্তু ঘটনা-চক্র যে অস্বাভাবিক পথ গ্রহণ করিয়া চারিদিক্ শব্দে উচ্চকিত আর ধোঁয়ায় বাষ্পে আঁধার করিয়া ছুটিতেছে, তাহার ভিতর হইতে তাহার অতটুকু ক্ষীণ প্রতিবাদ কে শুনিতে চাহিবে!—

আঁচলে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া রাসমণি বলিল,—না, দিদি, আমি ত' অমন কথা কোনোদিন বলিনি। তুমি যে কি তা' ত' আমি জানি।

—তবে কানু কেন আমায় বলে' এল!—বলিয়া চন্দ্রমুখী ফিরিতেছিল; কিন্তু রাসমণি ছুটিয়া যাইয়া কানুর পিঠে ঘা কতক চড় বসাইয়া দিতেই কানুকে কাড়িয়া লইয়া সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

মোকর্দ্দমা আপীলে জেলায় গিয়াছে—

আংশিক জয়ে সন্তুষ্ট না হইয়া উভয় পক্ষই একযোগে আপীল দায়ের করিয়াছে—

দোহনকার্য্য পূর্ণ পরাক্রমে চলিয়াছে—

উকিল হইতে পদাতিক পর্য্যন্ত রৌপ্যসর দোহন করিয়া উভয় পক্ষকেই শুষ্ক বিবর্ণ করিয়া তুলিয়াছে···

কিন্তু তাহাতে তাহাদের ভ্রূক্ষেপও নাই···

গহনাপত্র ক্ষেতখামার ধানকলাই ঘরে বাহিরে যাহা কিছু ছিল সবই রৌপ্যরসে রূপান্তরিত হইয়া জজ আদালতের অনন্ত উদরে প্রবেশ করিতে লাগিল।

হঠাৎ একটা আপোষের কথা উঠিয়া পড়িল জজ্ আদালতের সম্মুখস্থ বটবৃক্ষের তলাতেই। কম্বল ও সতরঞ্চ বিছাইয়া দাস দত্ত খুড়ো জ্যাঠার দল হুঁকা আর হাইয়ের মাঝে দোল খাইতেছিল—

তাহার ভিতর হইতে দলের জ্যাঠা-ই হুঁকা নামাইয়া উঠিয়া পড়িলেন

দুই পক্ষই পরস্পর প্রেমের পাত্র, সুতরাং ক্ষমার্হ; আর, এই মামলার উদরে যে-পরিমাণ অর্থ ঢালা হইতেছে তাহাতে কেবল পক্ষদ্বয়েরই সমূহ সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত নহে—

ধর্ম্মভীরু, সুবোধ ও সাধু ব্যক্তিগণের বাস যে গ্রামে সেই গ্রামের উপরেই তাহারা দুরপনেয় কলঙ্ক আর দুর্ণামের ছাপ মারিয়া দিতেছে—

ঘরের টাকা পরকে দিয়া নির্ব্বুদ্ধির এ লড়াই কিসের জন্য?...

এই কথাটাই গ্রামের এক মুরুব্বি অতিশয় সতেজ কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়া উপবীতবেষ্টিত অঙ্গুলি কৃষ্ণলাল আর নবীনের মাথার উপর তুলিয়া ধরিলেন—

বলিলেন,—মিটিয়ে-ফেল্ বাবা, আর কেন! উচ্ছন্নে যাবার ত' আর বাকি নেই।

কি ক্ষণে কথা উচ্চারিত হইল কে জানে—

দু'জনেই রাজি হইয়া গেল...

তৎক্ষণাৎ সোলেনামা লেখা হইল এই মর্ম্মে যে, উভয় পক্ষই তাঁহাদের দাবি-দাওয়া ত্যাগ করিলেন, "খরচা নিজ নিজ জিম্মা হইল"-ইত্যাদি।

সে-রাত্রি জেলারই এক হোটেলে কাটাইয়া সকাল-বেলা সদলবলে সাক্ষি-সাবুদসহ নবীন আর কৃষ্ণলাল বাড়ীর দিকে রওনা হইল—

যাত্রাকালে জ্যাঠা-ই সকলের হইয়া দুর্গা দুর্গা বলিয়া শুভক্ষণে সর্ব্বাগ্রে পা বাড়াইলেন।

তিন দিন তারা বাড়ীতে ছিল না—

এই তিন দিন দু'ভগ্নির যে কেমন করিয়া কাটিয়াছে তাহা তাহারাই জানে।

মাম্‌লার ধান্দা লইয়া তাহারা আগে মাথা ঘামায় নাই—

কিন্তু যে অন্ধকার জটিল গহ্বরটি আবর্ত্তে আবর্ত্তে অতল রসাতলের দিকে নামিয়া গেছে, একে একে সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া সেই গহ্বরটির প্রান্তে আসিয়াই রাসমণির যেন চমক্ ভাঙ্গিল—

সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ অভিসম্পাতে তাতিয়া উঠিয়া চোখে অক্ষমার অশ্রু দেখা দিল...

দেবতা যেন এই চোখের জল বিষের জ্বালায় ভরিয়া উহার জীবনে ঢালিয়া দেন।...

কিন্তু বুক ফাটিতে লাগিল চন্দ্রমুখীরই বেশী—

রাসমণিকে সে বুকে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে... শুধু স্তন্য দেয় নাই···মায়ের আর সব কাজ সে করিয়াছে। —সে-ই উদ্যোগী হইয়া নবীনের সঙ্গে তার বিবাহ দিয়াছিল; স্বামীকে বলিয়া কহিয়া নবীনকে সে পাশে আনিয়া বসাইয়াছে।—প্রাণের প্রিয় দৌলত বলিতে যাহা কিছু বুঝায় তা' রক্ষার ভার সেই নবীনের উপর দিয়া বিশ্বাসী সরলপ্রাণ স্বামী বিদেশে গিয়াছিলেন—

সেই নবীন বিশ্বাসঘাতক, প্রবঞ্চক!

চন্দ্রমুখী তাহাকে শাপিল না—

মনটা ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় ক্ষোভে ক্লান্তিতে একান্ত বিমুখ হইয়াই সেখান হইতে উঠিয়া আসিতেছিল; তাহাকে বসাইয়া রাখিতেও তার চেষ্টা আসিল না।—

চন্দ্রমুখী ভাবিত, পুরুষে পুরুষে করুক ষাঁড়ের লড়াই ···তাহাতে তাহাদের কি!··বোনে বোনে আমাদের মনান্তর নাই, মতান্তর গরমিলও নাই।...অকপট ইষ্টাকাঙ্খার বিনিময়, আর কামুকে মাঝে রাখিয়া দুই ভগিনীর কৌতুক ও প্রাণের প্রীতির খেলা চলিতে চলিতে উভয়ের মাঝখানে বিচ্ছেদের একটা কঠিন রেখাপাত হইয়াছিল সেদিনকার কামুর সেই কথায়।—

রাসমণি দিদির পা ছুঁইয়া শপথ করিয়াছিল, সে-কথা সে বলে নাই. প্রতিবেশিনীরা তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে...তাহাদেরই কাহারো মুখের কথা কামু লুফিয়া লইয়াছিল; এবং তাহাই সে বলিয়াছে···

কিন্তু চন্দ্রমুখী সে-কথা যেন দু' হাত দিয়া ঠেলিয়া ঠেলিয়া দিয়াছে—বিশ্বাস করে নাই।

সে আপ্‌শোষটা অনেকদিন পর্য্যন্ত সবল থাকিয়া রাসমণিকেও পীড়া দিয়াছে অনেক—

দিদি কথাটা বিশ্বাস করিল না!···মিছিমিছি রাগ করিয়া সে ভাল করিয়া খায় না, কথাবার্ত্তা ভাল করিয়া কয় না···

কিন্তু যেদিন নিজের শেষ অলঙ্কারখানি মহাজনের সিন্দুকে উঠিয়া গেল, সেইদিন রাসমণির সর্ব্বপ্রথম মনে হইল, কামু মিথ্যা কহে নাই, দিদিই তাহাকে ভাসাইতে বসিয়াছে।...দুর্দ্দিনে উহারা হিত করিয়াছিল বটে; কিন্তু সে ত' বহুদিন অবনত অনুগত থাকিয়া কৃতজ্ঞতার ঋণ নিঃশেষে পরিশোধ করিয়াছে।···দাবির আজ শেষ হইল—সে এখন মুক্ত।

··ভাবিতে ভাবিতে কেমন একটা কঠিন উল্লাসের অদম্য চাঞ্চল্য জাগিয়া তাহার মনে হইল, দিদিকে এই কথাটা না শুনাইয়া দিলে তার বুকে যে তীরের ফলাটা বিঁধিয়া আছে সেটা আর কিছুতেই খসিবে না।—

"উপকারের ঋণ, দিদি, ভাল করিয়াই শেষ করিয়া

নিলে"—এই কথাটাই মনে মগজে ঠাসিয়া লইয়া রাসমণি দিদির বাড়ীতে আসিল—

কিন্তু ঠিক্ সে-কথাটা তার বলা হইল না—

কথা অন্যদিকে ফিরিয়া গেল।

সে চন্দ্রমুখীর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইতেই কানু দৌড়াইয়া আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—মা, মাসী কথা কইছে না।

শুনিয়া এক মুহূর্ত্তেই রাসমণির বেঠিক্ মাথা আরো বেঠিক্ হইয়া গেল—

চোখের সাম্‌নে তার দিগন্ত পর্য্যন্ত যেন ঘুরিয়া দুলাইয়া উঠিল—

কি বলিতেছে সে-জ্ঞানও তাহার রহিল না—

মেয়েকে কাঁখে তুলিয়া লইয়া যাইতে যাইতে সে বলিয়া গেল,—আঁটকুড়ি ছেলের স্বাদ বুঝ্‌বে কি!...

বিষদাঁত যথাস্থানে যাইয়া বিদ্ধ হইল—

চন্দ্রমুখীর আপাদমস্তক একবার কেবল নড়িয়া উঠিল।...

একটিমাত্র নিমেষে তার জীবনের সম্বিৎ যে কত লোকলোকান্তরব্যাপী গরলসমুদ্র ভেদ করিয়া উত্থিত হইল তাহা সে বুঝিতেও পারিল না—

অচেতন পরমাত্মা তার তারপর চোখ মেলিয়া যেন মৃত্যুর দ্বারে ধুঁকিতে লাগিল।...তাহার স্পন্দহীন দেহের দু'কান ভরিয়া, বুকের গহ্বর ভরিয়া, মস্তিষ্কের রন্ধ্র ভরিয়া বাজিতে লাগিল একটি শব্দ—আঁটকুড়ি।

...বেলা ডুবিয়া গেল—

সন্ধ্যা ঘনাইল—

পৃথিবীর সমুদয় শব্দ-কাকলী আচ্ছন্ন করিয়া একটি শব্দ ধ্বনিত হইতে লাগিল—আঁটকুড়ি।

...রাত্রি গভীর হইতে লাগিল—

অন্ধকারে গর্ভ হইতে কেবলি সেই একটি শব্দ উঠিতে লাগিল—দানবীর নিরবচ্ছিন্ন ফুফু ফুৎকারপ্রসূত স্ফুলিঙ্গ-স্রোতের মত...

সাগর-তরঙ্গের মত গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করিয়া সে-শব্দ গড়াইতে লাগিল।...

সেই একই স্থানে বসিয়া চন্দ্রমুখী শুনিতে লাগিল সেই শব্দটি—

আর অসাড়ে অনুভব করিতে লাগিল—লক্ষ লক্ষ ক্ষমাহীন নিষ্পলক চক্ষু তাহারই ব্যর্থ গর্ভের দিকে চাহিয়া চাহিয়া হাসিতেছে।...

প্রভাত যখন হইল তখনো চন্দ্রমুখী ঠিক্ তেমনই বসিয়া আছে...

..."বৌ কই গো?" বলিয়া হাঁক দিয়া প্রতিবেশিনী যমুনা আসিয়া দাঁড়াইয়াই চম্‌কিয়া দু'পা পিছাইয়া গেল।

চন্দ্রমুখী চোখ তোলে নাই, সাড়া দেয় নাই—

কিন্তু তাহার দিকে চোখ্ পড়িতেই যমুনার বুক ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল; সম্মুখে যাহাকে সে দেখিতেছে, সে যেন সে-মানুষ নয়—

সেই অবয়বে আর কেহ।

খুঁটির গায়ে মাথা রাখিয়া খুঁটিটাকেই একহাতে জড়াইয়া ধরিয়া চন্দ্রমুখী বসিয়া আছে—

মুখাবয়বের খানিকটা দেখা যাইতেছে—

পা দু'খানা দাওয়া ঘেসিয়া এলাইয়া পড়িয়াছে—

দেখিয়াই যমুনার মনে হইল, প্রকৃতিস্থ সজীব মানুষ অমন করিয়া বসিয়া থাকে না—

কোথাও যেন তার বাঁধন নাই, ইচ্ছা নাই, সামর্থ্য নাই।...চন্দ্রমুখীর বুকখানা সে লক্ষ্য করিল—

ওঠা-নামা করিতেছে।

ডাকিল,—বৌ?

—এ্যাঁ।...বলিয়াই চন্দ্রমুখী চট্ করিয়া নামিয়া দাঁড়াইল; সোজা যমুনার দিকে চাহিয়া বলিল,—কি বল্‌ছ?

—না, বলিনি কিছু। বলিয়া যমুনা শিহরিয়া উঠিয়া দ্রুতপদেই অপসৃত হইয়া গেল।...

সংবাদ রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না যে, কৃষ্ণলালের স্ত্রী চন্দ্রমুখী কেমন যেন করিতেছে।

লোক আসিয়া জড়ো হইল—

দেখিল, চন্দ্রমুখীর চোখের চেহারা স্বাভাবিক ত' নহেই, তার পলকহীন রক্তচক্ষুর অভিভূত দৃষ্টি বড় ভয়ঙ্কর।...তার চোখ দেখিয়া যমুনার যে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইবে তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।—

শুশ্রূষায় চন্দ্রমুখী কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল।—

লোকে বলিল,—রক্ত মাথায় উঠে' গেছে।

কথাটা ঠিক্‌ই; রক্তের চাপ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাইয়াই ঐ রোগের উৎপত্তি হয়।

রক্তোত্তেজনার কারণও যে বড় অসামান্য—

রাসমণি তাহাকে বলিল—আঁটকুড়ি!

নিজের চিন্তায় নয়, রাসমণিরই চিন্তায় যখন সে অন্যমনস্ক ছিল, তখন কানু তাহার আদরলাভে বঞ্চিত হইয়া অভিমান করিয়াছিল......

কিন্তু রাসমণি ত' জানে তার দিদির অন্তরের কথাটা, তার তীক্ষ্ণ ব্যথাটা—

গর্ভে একটি সন্তান হইল না বলিয়া পাড়াপড়শীর আক্ষেপের উত্তরে সে কানুকেই দেখাইয়া দিত; বলিত,—ঐ ত' আমার মেয়ে।......কথাটা শুধু নির্জ্জীব কণ্ঠে সে উচ্চারণ করিত না...বুকের শূন্যতা পূর্ণ করিয়া একটা নিরেট নিটোল অনুভূতি সত্যই জীবন্ত হইয়া উঠিত।...

রাসমণি তাহা জানে—

তবু সে তাহাকে গা'ল দিয়া গেল—আঁটকুড়ি!

...কানু যখন হয় নাই, তখনো তার সন্তান-ক্ষুধাটা বিশ্বের শিশুলোকের উপর ছড়াইয়া পড়ে নাই—

একান্ত নিবাশ্বাসে নিজের অভ্যন্তরে তাহা গুটাইয়াও যায় নাই; কেবলি সে প্রাণান্তকর ব্যাকুল প্রত্যাশায় চাহিয়া থাকিত রাসমণির দিকে—

তার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি জগদীশ্বর রাসমণির গর্ভেই প্রেরণ করিবেন।

কানু যখন রাসের পেটে আসিল, তখন চন্দ্রমুখীর সে কি আনন্দ—

মুহুর্মুহুঃ সে কি রোমাঞ্চের জাগরণ—

যেন তাহারই নারীজীবনের পূর্ণাঙ্গ সার্থকতা কোরক আকারে দেখা দিয়াছে......রাসমণি কেবল বৃন্তের মত তাহা উর্দ্ধে ধারণ করিয়া আছে—

কিন্তু মা সে-ই—

সঞ্জীবনী রস, আদি মূল, তাহারই বুকের ভিতর।

...অসংখ্যবার সে দাবি করিত,—যে আস্‌ছে সে কিন্তু আমার, রাস।

রাস হাসিয়া বলিত,—নিও।

আবার কখনো বলিত,—দিলে ত'!

চন্দ্রমুখী বলিত,—দিবিনে আবার! কেড়ে নেব।

গর্ভের সন্তানটিকে লইয়া এম্‌নি কাড়াকাড়ি প্রত্যহ চলিত।......

সেই কানুকে সে একটিবার মাত্র দৈবাৎ বিমুখ করিয়াছে; সেই অপরাধে রাস তাহাকে বলিল,—আঁটকুড়ি!

চন্দ্রমুখীর চোখের লাল কাটিয়া গেছে—

আর, রাসমণি অনুতাপে পুড়িতে পুড়িতে ছট্‌ফট্ করিয়া দিদির পায়ে ধরিয়া সহস্রবার ক্ষমা চাহিয়া গেছে—তার

পায়ের তলায় উপুড় হইয়া পড়িয়া রাসমণি দু'হাতে মাথার চুল ছিঁড়িয়াছে—

কিন্তু চন্দ্রমুখী চাহিয়া দেখে নাই, কথা কহে নাই।

সে খায় দায়, নিঃশব্দে ঘোরে ফেরে···যেন পৃথিবীর সঙ্গে তার সম্পর্ক চুকিয়া গেছে; কাহাকেও কিছু বলিবার নাই, কাহারো কাছে কোনো কথা শুনিবার নাই।...সময় সময় জ্বলন্ত নির্ণিমেষ চক্ষে রাসমণিদের বাড়ীর দিকে সে চাহিয়া থাকে; কি যেন ভাবে······

সন্ধ্যা হইলে বাড়ীর বাহির হইয়া যায়—

অন্ধকারে একা একা পথে পথে প্রেতের মত বিচরণ করে।......

সুখবর আসিয়াছে যে, মাম্‌লা মিটিয়া গেছে; ভায়রাদের মধ্যে আবার সদ্ভাব হইয়াছে; তাহারা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাড়ী ফিরিবে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে কৃষ্ণলাল বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, চন্দ্রমুখী ঘরে নাই; আটচালার দরজা খোলা; শৃগাল একটা সেই ঘরে ঢুকিয়াছিল—মানুষের সাড়া পাইয়া সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

...পাড়ায় গিয়াছে এখনি আসিবে।...ভাবিয়া কৃষ্ণলাল সঙ্গীদের লইয়া বারান্দায় বসিল।

ও-বাড়ী হইতে নবীন চেঁচাইয়া বলিল,—দাদা, কামু ওখানে আছে?

—না। বৌ-ও বাড়ীতে নেই দেখ্‌ছি; কামুকে নিয়ে বুঝি পাড়ায় বেরিয়েছে। বলিয়া কৃষ্ণলাল নিশ্চিন্ত হইল।

কৃষ্ণলাল লোক মন্দ নয়—

মোকর্দ্দমা মিটিয়া যাওয়ায়, আগে কেন মিটিল না এই ক্লেশটা ছাড়া আর সব গ্লানি মুছিয়া যাইয়া সে বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করিতেছিল।...খুব কলরব করিয়া জেলার বাজারের গল্প, উকিলের গলাবাজির গল্প, আদালতের আম্‌লাদের চক্ষুলজ্জার অভাবের গল্প করিতে করিতে হঠাৎ এক সময় তার হুঁস্ হইল যে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেছে—

এবং যেখানেই যাক্ চন্দ্রমুখীর এতক্ষণ ফেরা উচিত ছিল।

বলিল,—নবীন, দেখ্‌ত বেরিয়ে ওরা গেল কোথায়?

স্ত্রীর সঙ্গে নবীনের 'ওদের' কথাই হইতেছিল—

সরল ক্রূর অনেক কথাই—

সেটা বন্ধ করিয়া নবীন বাহির হইল; কিন্তু সন্ধান পাইল না···

গ্রাম তেমন বড় নয়—

কোনো বাড়ীতেই চন্দ্রমুখী কি কামু নাই।

···তখন লণ্ঠন জ্বালিয়া ছুটাছুটি হাঁকাহাঁকি সুরু হইয়া গেল...কিন্তু চন্দ্রমুখী আর কামুর দেখা মিলিল না।—

পুরুষের ব্যবহারে মর্ম্মাহত আর বীতস্পৃহ হইয়া চন্দ্রমুখী কামুকে লইয়া কোথাও লুকাইয়া আছে—

ইহাতে কেহ বিস্মিত হইল না—

সে যে কত বিরূপ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল এখন তা সবাই জানে।

কিন্তু দেখা পাইলেই যে তাহাকে জানান' যায়—মাম্‌লা বিরোধ মিটিয়া গেছে।—

গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়ীর প্রত্যেকটি ঘরের অভ্যন্তর আর তার আনাচ কানাচ পিঁজিয়া পিঁজিয়া তল্লাসের পর লোক ছুটিল ঘাটে মাঠে—

এবং মাঠেরই একধারে একজনকে পাওয়া গেল—

দূর হইতে লক্ষ্য হইল, সাদা মত কি একটা স্তূপাকার জিনিষ আ'ল-বরাবর পড়িয়া আছে—

তাড়াতাড়ি লণ্ঠন লইয়া তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া নবীন দেখিল, তাহারই মেয়ে কামু—

কিন্তু মৃত—

আর তার কণ্ঠের ত্বকের উপর আঙুলের দাগ।......

চিত্রবহা

শ্রী সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

—পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর—

৪০

স্বাধীনতার মূল্য

নিত্য নূতন অভাবের তাড়নায় সংসার অচল হইতে চলিয়াছে—মোটা ভাত কাপড় জোটাই দায়। অমরের চাকরি হইল কম দিন নয়, কিন্তু বেতন বাড়ে নাই। উপরন্তু য়ুরোপের যুদ্ধের মারাত্মকতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্র দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। অমর ভাবে, জগতে সবই সচল পরিবর্ত্তনশীল, কেবল তার বেতনের পরিমাণ ছাড়া।

এতকাল ঋণকরা অমর পাপ বলিয়া মনে করিত, এখন দায়ে ঠেকিয়া সে নিজেই তাহা করিতে সুরু করিল। মাসের শেষদিকে হাত খালি হইয়া যায়, তখন মুদির কাছে ধার করা ছাড়া উপায় থাকে না। বেতন পাইয়াই সেই ঋণ পরিশোধ করে বটে, কিন্তু মাসের শেষে অবস্থা আবার যে-কে-সেই। এইরূপে মাসে মাসে ঋণের পরিমাণ বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার শেষ কোথায় ভাবিতে সে শিহরিয়া উঠে।

খবরের কাগজ হাতে পড়িলেই সে মনোযোগের সহিত কর্ম্মখালি-সংবাদ পড়ে এবং পঞ্চাশ মুদ্রার অধিক বেতনের কর্ম্মের সন্ধান পাইলেই গোপনে একখানি আবেদন পত্র পাঠাইয়া দেয়। তারপর দিনকত আশানিরাশার দ্বন্দ্বের মাঝে দোল খাইয়া ব্যর্থকাম হইয়া আবার শান্তচিত্তে খাটিয়া চলে যতদিন না ঐরূপ আর একটা বিজ্ঞাপন দেখিতে পায়। বড় বড় লটারির বিজ্ঞাপন চোখে পড়িলেই ধাঁ করিয়া সে একখানা টিকিট কিনিয়া ফেলে, অথচ সে-ই এককালে ঐ কর্ম্মকে জুয়াখেলা বলিয়া কত না ঘৃণা করিয়াছে। সামান্য আয় হইতে যখন লটারির টিকিটের মূল্য পাঠায়, তখন মনকে প্রবোধ দেয় এই বলিয়া যে, ধরিয়া নাও টাকাটা চুরি গিয়াছে বা হারাইয়া গেছে! অবশ্য জিতিবার সম্ভাবনা খুব অল্পলোকেরই, কিন্তু সেই অল্প কয়েকজনের মধ্যে সে যে একজন হইবে না, তা কে বলিতে পারে? আর যদি হয়?...অমর আর ভাবিতে পারিত না।

লটারির টিকিট কিনিয়া তার ফল বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত তার কল্পনা উধাও হইয়া ছুটিত। সে কল্পনা করিত, সে-ই প্রথম পুরস্কার পাইয়াছে! অমনি ধনী হইয়া সে যে কি কি করিবে মনে মনে তার একটা ফর্দ্দ আওড়াইতে সুরু করিত। মাধুরীকে সঙ্গে লইয়া সে তখন মানুষের বিচিত্র জীবনধারা অনুসরণ করিয়া প্রকৃতির নব নব রূপের পরিচয় লইতে লইতে সাগর-ভূধর-মরুপ্রান্তরের রহস্যের মাঝে দিশা হারাইয়া ফেলিবে! পদে পদে নিখিল বিশ্বের বিস্ময় অনুভব করিয়া জানা-অজানার দ্বন্দ্বের মাঝে দোল খাইবে! জীবন তখন আর স্রোতোহীন পল্বলের মত অচল পঙ্গু হইয়া রহিবে না।

শহরের সেরা পল্লীতে সে তখন বাড়ি তৈরি করাইবে! ভারতীয় স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ আদর্শে নির্ম্মিত সেই বাড়ির নাম রাখিবে স্বপ্নসৌধ! শ্বেতপাথরের বাড়ি—তার মধ্যে গজদন্তের আসবাব! তার লাইব্রেরি জগতের শ্রেষ্ঠ আর্ট ও সাহিত্যের আধার হইয়া নয়নমনের নিত্য নূতন খোরাক জোগাইবে—স্বপ্নসৌধের নিভৃত নিরালায় অমরের মানসী মূর্ত্তিলাভ করিবে!

বাড়ির চারিদিকে বিস্তীর্ণ উদ্যান, সে-উদ্যানে অসংখ্য ফল আর ফুলের গাছ! গাছে গাছে রংবেরঙের কত পাখী, তাদের কাকলিকূজনে উদ্যান মুখরিত! এক প্রান্তে বৃহৎ সরোবর, তার স্বচ্ছ জলে অসংখ্য নীলপদ্ম, আর তারই আশেপাশে মরাল-মিথুন আনন্দে ভাসমান! সরোবরের শষ্পশ্যামল তীরে নারিকেল ও তালগাছের তলে তলে ময়ূরের প্রসারিত পুচ্ছের ইন্দ্রধনুচ্ছটা, হরিণের আয়ত নেত্রের মাধুরী, আর সারসের উল্লসিত ক্রীড়া-কৌতুক! অদূরে নহবতের মনোরম মঞ্চ—সমস্ত মিলিয়া মিশিয়া যেন একখানি পটে-আঁকা ছবি!

লটারির ফল বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত নিত্যই এমনি কত স্বপ্ন দেখা চলিত। তারপর…ব্যঞ্জনের অভাবে ভাত যখন আর গলা দিয়া নামিতে চাহিত না তখন বাস্তবের কঠিন আঘাতে অমরের কল্পনার স্বর্গ চূর্ণ হইয়া যাইত! মন তখন স্বতঃই বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। এমনি সময়ে সে যেন শুনিতে পাইত কে বলিতেছে, এ পথে ত স্বেচ্ছায় আসিয়াছ, নিজের পথ নিজেই বাছিয়া লইয়াছ! আমার দোষ দাও কেন—আমি ত তোমায় জোর করিয়া এ পথে নামাই নাই! চাহিবে চিন্তার স্বাধীনতা-চাহিবে কর্ম্মের স্বাধীনতা, অথচ তার মূল্য দিবে না—বেশ লোক ত হে তুমি! শুনিয়া অমরের মনে হয়, ঠিকই ত! ছি ছি! অনুযোগ করা ত আমার সাজে না! নিজের দুর্ব্বলতাকে সে তখন ধিক্কার দিতে থাকে এবং কঠিনতম দুঃখ নীরবে বহন করিবে বলিয়া মনে মনে পণ করে।

দিন কাটিতে লাগিল। মাধুরীর শরীর ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম। তার মুখের পাণ্ডুরতা, পরিশ্রান্ত নির্জ্জীব গতিভঙ্গী, আহারে অরুচি ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া অমর বিশেষ উদ্বিগ্ন হইল। মাধুরীর নানা ভয়াবহ ব্যাধির কল্পনা করিয়া সে অশান্ত অস্থির হইয়া উঠিল।

ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিল, থাইসিস্! দেহে রক্ত নাই! দুশ্চিন্তায়, অতি-পরিশ্রমে, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে এরূপ ঘটিয়াছে! সম্পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন, কলিকাতা ত্যাগ করা চাই-ই, নহিলে বাঁচিবার আশা কম!

ডাক্তারের কথায় বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু বিশ্বাস না করিয়াই বা উপায় কি? মাধুরীকে ত চোখের সুমুখে দেখিতেছে। কিছুকাল হইতে তার ঘুসঘুসে জ্বর চলিতেছে—সে-কথা সে অমরকে জানায় নাই।

অমর ভাবিতে বসিল। কলিকাতা ছাড়া অসম্ভব—টাকা কোথায়? তার চিকিৎসা ও বিশ্রামের ব্যবস্থার জন্যও অর্থের প্রয়োজন। আপাতত শতাবধি টাকা না হইলে নয়। কিন্তু তা-ই বা আসে কোথা থেকে? বন্ধু-মহলে কেহ কেহ স্বচ্ছন্দে এবং সানন্দে ঐ টাকা দিতে পারে, সে কথা অমর জানিত; তবুও তাহাদের কাছে হাত পাতে কিরূপে? তাহাতে যে বন্ধুত্বের মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হইবার সম্ভাবনা! তাহাতে তার আত্মার তৃপ্তি হইবে না ত!

একদিকে মাধুরী, অন্যদিকে তার আত্মমর্য্যাদা—অমর বিষম ফাঁপরে পড়িয়া গেল।

তার মনের দ্বন্দ্ব মাধুরী বোধ করি টের পাইয়াছিল। সে কহিল, বালাজোড়া বিক্রি করে' দাও! তোলাই ত রয়েছে!

যাহাকে গহনা ত দূরের কথা, একখানা পোশাকী শাড়ী পর্য্যন্ত কখনো কিনিয়া দিবার সামর্থ্য হইল না, তারই সম্পত্তি বিক্রি করিয়া সংসার চালাইতে হইবে? আর্ত্তকণ্ঠে সে কহিল, না না, সে কি কথা! বালা বেচতে যাবো কেন? ও-বালা কি আমি দিয়েছি?

মাধুরী আহত হইল। বলিল, এখনো তোমার-আমার ভেদ ঘোচেনি? যা আছে তা কি আমাদের

দুজনের নয়? তা যদি না হয় তাহলে তোমার অর্থেও ত আমার অধিকার থাকে না, তা হলে ত এ বাড়িতে আমার অন্নগ্রহণ করাও অনুচিত!

কষ্টের আতিশয্যে না ভাবিয়া অমর কথাটা বলিয়াছিল কিন্তু সেটা বলা যে অসঙ্গত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে তার বিলম্ব হইল না।

সে কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিল, কথাটা বলা আমার অন্যায় হয়েছে মধু! কিছু মনে কোরোনা, আমায় মাপ করো! তুমি যা বলছো তা-ই করবো!

মাধুরী বিষম লজ্জিত হইল। কহিল, ছি-ছি! আমার কাছে মাপ চেয়ে আমায় অপরাধী কোরো না! আমি বলছি, এখন বালাটা বিক্রি করলেই বা! তাতে তোমার দুঃখ্যু কেন? তোমার টাকা হলে আরো বেশিদামের গয়না আদায় করে' নেব'খন—কেমন! বলিয়া সে একটু হাসিবার চেষ্টা করিল কিন্তু অমরের চোখে জল দেখিয়া সে-হাসি তার মুখেই মিলাইয়া গেল।

বালাজোড়া পোদ্দারের হাতে সঁপিয়া দিতে খুব কষ্ট হইয়াছিল বটে কিন্তু যখন তার ফলে অমর একজন পাচিকা-পরিচারিকা নিযুক্ত করিতে পারিল এবং বহুকাল পরে মাধুরীর বিশ্রামের অবসর ঘটিল, তখন কষ্ট অনেকটা লাঘব হইয়া আসিল। অমর ভাবিল, হাজার হোক বালাজোড়ার কিছু আর মাধুরীর প্রাণের চেয়ে বেশি দাম নয়! মাধুরী বাঁচিলে সবই বাঁচিবে!

কালচক্র ঘুরিতে লাগিল। দুশ্চিন্তা হইতে কতকটা নিষ্কৃতি পাইয়া অমর একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

বালাবেচা টাকা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাধুরীর জ্বর বাড়িয়া গেল, কাশি দেখা দিল। সে শয্যার আশ্রয় লইল। প্রথমে খুকখুক করিয়া কখনো-সখনো কাশি হইত, ক্রমে তাহাই ঘনঘন হইতে সুরু করিল, তার বেগও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, শেষে একদিন সেই কাশি মৃত্যুর নিষ্ঠুর রক্তলিপি বহন করিয়া আনিল।

অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল। এক একটা কাশির ধাক্কা আসে মাধুরী ছটফট করে, মনে হয় তার জীর্ণ ভঙ্গুর দেহ এখনি চূর্ণ হইয়া পড়িবে। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া মাঝে মাঝে সে শিশুর মত ভেউভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠে, বলে, আর ত পারি না, হয় আমায় ভালো করো নয় মেরে ফেলো—আমায় মুক্তি দাও! সে না পারে বসিতে, না পারে শুইয়া থাকিতে, না পারে ঘুমাইতে! প্রতিমুহূর্ত্ত মৃত্যু তাহাকে বিকট উল্লাসে দংশন করিতে লাগিল হিংস্রজন্তুর মত।

মাধুরীর পানে আর চাওয়া যায় না। দেহে এককণা রক্ত নাই—দিনে দিনে সে যেন ছায়ায় পরিণত হইতেছে। তার শীর্ণ মুখের উপর চোখদুটি মস্ত বড় দেখায়, দৃষ্টির অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় ব্যর্থ জীবনের মনস্তাপ যেন ঠিকরিয়া পড়ে—অমরের মনে হয় সে-দৃষ্টি যেন নীরবে তাহাকেই ভর্ৎসনা করিতেছে। বলিতেছে, এর জন্য তুমিই দায়ী! যোগ্যতা নাই, অথচ বিবাহ করিয়াছিলে, তার ফলে আজ আমার প্রাণ যাইতেছে!

মাধুরী ছাড়া জীবন অমর কল্পনা করিতে পারে না। তবুও মাঝে মাঝে মনে হয়, এত কষ্ট মাধুরীর, এ কষ্টের অবসান যদি মৃত্যুতে হয় তবে তাও ভালো! যন্ত্রচালিতের মত আপিসের কাজকর্ম্ম সারিয়া সে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিয়া আসে, তারপর পত্নীর শীর্ণ হাতখানি হাতে লইয়া স্তব্ধ হইয়া বিছানার পাশে বসিয়া থাকে। মৃত্যুপথযাত্রী নারীটিকে অনেক কথা বলিবার সাধ হয়, যে-সব কথা এরপর হয় ত বলিবার অবসর ঘটিবে না। কিন্তু মাধুরীর বেশি কথা শুনিবার শক্তি নাই, বলিবারও নাই, তাই মনের ইচ্ছা মনের মাঝেই গুমরিয়া মরে। মাধুরী অধিকাংশ সময় আচ্ছন্নের মত পড়িয়া থাকে, কখনো কখনো দু' একটা কথা জিজ্ঞাসা করে, অমর তার জবাব

দেয় কিন্তু মাধুরী ঠিক তাহা শুনিল কি না অনেক সময় বুঝিতে পারে না।

রাত্রে নামমাত্র আহার করিয়া ঘরের এককোণে মাদুর বিছাইয়া স্থানাভাবে জড়সড়ো হইয়া সে শুইয়া পড়ে, কিন্তু ঘুম তার চোখে আসে না। কত কথাই তার মনে পড়ে। আজন্ম সুখে লালিত ধনীর সন্তান সে, অথচ এখন তার অবস্থা দীনদুঃখী ভিখারীর মত। পিতামাতা ভাইবোন সবাই তাহাকে ছাড়িয়াছে, ভুলিয়াও কেহ একবার খোঁজ লয় না। লীলাকে সে কত ভালবাসিত, হাতে করিয়া তাহাকে মানুষ করিতেছিল, কত আশা করিয়াছিল মনের মত করিয়া তাহাকে গড়িবে—সে সব কিছুই হইল না। গৃহত্যাগের পরই লীলার বিবাহ হইয়া গেল, তার সঙ্গে আর দেখা হয় নাই। তার বিবাহে অমর উপস্থিত ছিল না, কারণ নিমন্ত্রণ হয় নাই। তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু লীলাকে ভারি দেখিবার ইচ্ছা হয়, সে আজকাল কেমন হইয়াছে। আজও কি সে তার গরিব দাদাকে ভালবাসে, না বাড়ির সকলের মত সে-ও তাহাকে ভুলিয়া গেছে? মাধুরীর সঙ্গে তার পরিচয় সে-ই ত ঘটাইয়াছিল, সেই তার কত আদরের মাধুরী-দি যে আজ মরিতে বসিয়াছে সে কি তার খবর রাখে? সুকুমারীও কি তাহাকে ভুলিয়াছে? না না, তা কখনো সম্ভব নয়! শৈশবের সুখদুঃখের সঙ্গিনী, সে নিশ্চয়ই তাহাকে ভুলে নাই! অমরের খোঁজখবর লওয়া নিশ্চয়ই তার অনিচ্ছা নয় কিন্তু কিই বা করিবে সে, তার কি একতিল স্বাধীনতা আছে?

এই সব চিন্তার মাঝে হঠাৎ অমর শঙ্কিতমুখে দাঁড়াইয়া উঠে, নিদ্রিতা পত্নীর নাকের কাছে হাত রাখিয়া তার শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতেছে কি না অনুভব করে, তারপর আবার শুইয়া পড়িয়া কান পাতিয়া থাকে, কখন মাধুরী কি প্রয়োজনে তাহাকে হয় ত ডাকিবে—এমনি করিয়া বিনিদ্র রজনী কাটিয়া যায়।

ঔষধপথ্যে ও ডাক্তারের ভিজিটে টাকা জলের মত খরচ হইতে লাগিল। অধুনা বড়বাজার সোনাপটিতে অমরের আনাগোনার শেষ নাই। চুপিচুপি একদিন গিয়া সে তার সোনার বোতাম আর বিবাহের আংটি বেচিয়া আসিল। তারপর ক্রমে ক্রমে মাধুরীর হার চুড়ি দুল পিন ছোট বড় অলঙ্কার একে একে সমস্তই পোদ্দারের সিন্দুকজাত হইয়া গেল। সেগুলি হস্তান্তর করিতে অমরের তেমন ক্লেশবোধ হইল না। অধুনা সে যেন মরিআ হইয়া উঠিয়াছিল। মাধুরীই যখন যাইতে বসিয়াছে তখন আর কি রহিল কি গেল তাহাতে কি-ই বা আসে যায়! পত্নীর আসন্ন মৃত্যুর করাল ছায়ায় তার সমস্ত মন আচ্ছন্ন হইয়া ছিল, আর কোনো ভাবনার সেখানে ঠাঁই ছিল না।

সেদিন রথযাত্রা। আষাঢ়ের দীর্ঘ দিনের সঙ্গে মাধুরীর আয়ুও শেষ হইয়া আসিতেছে। সকালে ডাক্তার জবাব দিয়া গেছে। পাছে কোনো অসতর্ক মুহূর্ত্তে পত্নীর শেষ নিশ্বাস বাহির হইয়া যায় সেই ভয়ে অমর দুদিন প্রায় সমস্ত ক্ষণই তার কাছে কাছে রহিয়াছে। মুদিতনেত্র মাধুরীর ঠোঁট নড়িয়াউঠিলেই অমর তার মুখে একটু করিয়া জল ঢালিয়া দিতেছে। তার সামান্যই সে গিলিতেছে, বেশির ভাগ ঠোঁট বাহিয়া বাহিরে গড়াইয়া পড়িতেছে। পথ দিয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কাঁসর ঘণ্টা বাজাইয়া কলরব করিতে করিতে তাহাদের খেলার রথ টানিয়া লইয়া গেল। অমরের মনে পড়িল আজ রথযাত্রা। তারপর মনে পড়িল জগন্নাথের কথা, সেই চিন্তা অনুসরণ করিয়া মনে পড়িল পুরীর কথা। অমনি পুরীর সমুদ্র-সৈকতে মাধুরীর সঙ্গে ভ্রমণের কথা, জলঝড়ের মধ্যে দুজনের পথহারানোর কথা, তারপর আরও কত কি মধুর স্মৃতি মনের মাঝে আনাগোনা করিতে লাগিল। ক্ষণকালের জন্য অমর ভুলিয়াই গেল সেই মাধুরীর মৃত্যু-শয্যার পাশে সে বসিয়া আছে।

হঠাৎ মাধুরীর ঘনঘন নিশ্বাসের শব্দে চমকিয়া উঠিয়া

অমর দেখিল সে বিস্ফারিত চোখে তার পানে চাহিয়া আছে। তার ঠোঁট নড়িতেছে, মনে হইল সে যেন কিছু বলিতে চায়। অমর তাহাকে পাখার বাতাস দিয়া সস্নেহে তার মাথায় ও কপালে হাত বুলাইয়া দিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, অমন করছো কেন? কিছু বলবে কি আমায়?

আনন্দের উত্তেজনায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে মাধুরী বলিতে লাগিল, ওগো ছাখো…আমি এখনি দেখলুম… জানলার পাশ দিয়ে রথ যাচ্ছে…তার ওপর জগন্নাথ দাঁড়িয়ে…গলায় ফুলের মালা…হাতে বাঁশি…সে এমন সুন্দর চেহারা…আমায় বল্লেন…কিছু ভেবনা…তুমি ভালো হবে.. সেরে উঠবে…কোনো ভয় নেই তোমার…

কঙ্কালের মত হাত দিয়া অমরের জামার আস্তীনটা চাপিয়া ধরিয়া দীপ্তচোখে তার মুখের পানে চাহিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, বল না গো, তাহলে আমি ভালো হবো? সেরে যাবো? আবার উঠতে পারবো?

অমর বলিল, নিশ্চয়। ভালো হবে বৈ কি! আজ ত তুমি বেশ ভালো আছ!

মিথ্যা আশ্বাস দিতে গিয়া তার গলা কাঁপিয়া গেল। চোখের জল লুকাইবার জন্ম সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল

মাধুরী আশ্বস্ত হইয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, হ্যা, আমারও তাই মনে হচ্ছে! তারপর তার শ্রান্ত চোখদুটি আবার মুদিত হইল।

ক্ষণেক পরে চোখ মেলিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, বেলা কত হল? আপিস যাবে না?

অমর বলিল, এখন যে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। তারপর বলিল, আর কথা কোয়ো না। এখন একটু ঘুমোও।

মাধুরী চোখ বুজিল। সময় যায়। হঠাৎ সে চমকিয়া উঠিয়া অমরের মুখের পানে ভীতি-বিহ্বল চোখে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? তুমি কে?

অমর বলিল, ভয় কি? এ যে আমি—আমি অমর! আমায় চিনতে পারছো না মধু?

কিছুক্ষণ অমরকে নিরীক্ষণ করিয়া মাধুরী বলিল, অ তুমি!

তার মুখ হইতে ভয়ের ভাবটা কাটিয়া গেল। সে আবার চোখ বুজিল

অমর উঠিয়া আলোটা বাড়াইয়া দিল। তারপর মাধুরীর হাতখানি মুঠার মধ্যে ধরিয়া আনত দৃষ্টি তার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া স্থির হইয়া বসিল। নিস্তব্ধ ঘরে কেবল ঘড়িটাই সশব্দে চলিতে লাগিল।

৪১

পিতাপুত্র

মাধুরীর মৃত্যুর পর অমর মেসে আসিয়া উঠিল। বাড়িখানি হ্যারিসন রোডের উপর, পটলডাঙার মোড়ের কাছাকাছি। তেতালায় একখানি মাত্র ঘর ছিল, একটু বড়োসড়ো, দুজনে থাকিবার উপযুক্ত। নিরিবিলি থাকিতে পারিবে বলিয়া দুই সীটের ভাড়া দিয়া অমর সেই ঘরখানি দখল করিল।

কেরাণীর মেস। বলা বাহুল্য তাঁদের জগৎ আর অমরের জগতে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। অতএব জলের মাছ ডাঙায় উঠিলে তার যেমন অবস্থা হয় এখানে আসিয়া অমরের অবস্থাও প্রায় তেমনি হইল। কারও সঙ্গে তার মিশ খাইল না—সে একঘরে হইয়া রহিল।

বাবুদের আলোচনার বিষয় ছিল হয় আপিসের বড়বাবু নয় সেখানকার বড় ছোট বা মাঝারি সাহেব, তাঁদের অবসর-বিনোদনের উপায় ছিল তাস দাবা নয় সঙ্গীত। শেষেরটিই ছিল ভয়াবহ ব্যাপার। কারণ তার আরম্ভ ছিল কিন্তু শেষ ছিল না, অর্থাৎ একটার পর একটা গান চলিতে থাকিত একেবারে অবিরাম। গায়ক ওস্তাদ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ সে সকল গানই নিজস্ব সুরে গায় এবং সেই নিজস্ব সুরেও অবিরাম পরিবর্তন হইতে থাকে। সব চেয়ে অসহ্য হইত যেদিন রবিবাবুর সুর ও কথার শ্রাদ্ধ চলিত। অমরের তখন ইচ্ছা

৩

হইতে ছুটিয়া গিয়া গায়কের গলা টিপিয়া ধরে এবং আছাড় মারিয়া হার্মনিয়মের বীভৎস আওয়াজ বন্ধ করিয়া দেয়।

অসুবিধা অনেক, তবুও মেসের বাড়ি চিন্তাহরণের খাঁচার চেয়ে ঢের ভালো। এখানে কলরব আছে কিন্তু কলহ নাই। এখানে ঘরের কোলে খোলা ছাদের উপর রাত্রে ফুটফুটে জ্যোৎস্না আসিয়া পড়ে, জানালার ভিতর দিয়া চোখ মেলিলেই উদার মুক্ত আকাশের আত্মীয়তা অনুভব করা যায়। বাতাসের অভাবে এখানে বিনিদ্র বসিয়া রাত কাটাইতে হয় না, দক্ষিণ পবন অনুচরের মত নিয়ত বীজন করিয়া ফেরে। ঘুমকে এখন আর সাধিতে হয় না, অনাহূত আসিয়াই সে তার কোলে টানিয়া লয়।

শোকের দাহ এখনো শীতল হয় নাই সত্য, স্মৃতির কাঁটা তেমনি তীক্ষ্ণ রহিয়াছে, বুকের ভিতরটা থাকিয়া থাকিয়া হাহাকার করিয়া ওঠে, কিন্তু দুশ্চিন্তা আর নাই—ভয়ভাবনাও দূর হইয়াছে। সংসারে যে একা, তার কিসের ভাবনা? একলা মানুষ গাছের তলায় অনাহারে মরিলেও কাহারও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। ভাবনা ছিল যখন মাধুরী বাঁচিয়া ছিল। এখন মাধুরীও নাই ভাবনাও নাই। এখন আর সংসারের পথে ভাবিয়া চিন্তিয়া পা ফেলার প্রয়োজন নাই, এখন হইতে তার বাধাবন্ধহীন মুক্ত জীবন, এক মুহূর্তে ফুৎকারে ধূলার মত যাহা উড়াইয়া দেওয়া যায়! ভাবিতে ভাবিতে মুক্তির আনন্দে অমরের চিত্ত নাচিয়া ওঠে, স্বাধীনতার বিকট উল্লাস তার শোককে পরাভূত করিবার উপক্রম করে।

সেদিন সকালবেলা অমর চা খাইয়া সবে খবরের কাগজ খুলিয়া বসিয়াছে এমন সময় চন্দ্রবাবু আসিয়া উপস্থিত। তাঁর অপ্রত্যাশিত আগমনে সে যতটা না বিস্মিত হইল তার চেয়ে বেশি বিব্রত হইল। আপনার লোক যখন পর হইয়া যায় তখন তাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার মত অস্বস্তিকর ব্যাপার আর নাই। পিতা ও পুত্র, কিন্তু দুজনার অন্তরের মাঝে কী অসীম ব্যবধান!

চন্দ্রবাবুকে কি বলিবে অমর ঠিক করিতে পারিল না। ভালো আছ ত?—এ কথা ত তাঁকে বলা চলে না, নিতান্ত যেন মামুলি হইয়া পড়ে! অথচ কিই বা বলিবার আছে? চন্দ্রবাবুও দু' একবার কি বলিতে গিয়া বলিতে পারিলেন না। দুজনেই কুণ্ঠিতমুখে পরস্পরের দৃষ্টি এড়াইয়া পাশাপাশি বসিয়া রহিল। প্রত্যেকেই আশা করিতে লাগিল অপরজন কিছু একটা বলিয়া বাক্যালাপ সুরু করিবে, ফলে অনেকক্ষণ কাহারও কিছু বলা হইল না।

শেষে প্রাণপণ চেষ্টায় চন্দ্রবাবু নীরবতা ভঙ্গ করিলেন। বলিলেন, মাঝে মাঝে সময়মত তোমার মার সঙ্গে দেখা করলে পারো! প্রায়ই তোমার কথা বলেন!

অমর মুখে কিছু বলিল না। মনে মনে বলিল, এখন মাধুরী মরেছে তাই বুঝি আমার জন্যে মার স্নেহ উথলে উঠেছে?

তিনি আবার বলিলেন, লীলা প্রতি চিঠিতেই তোমার কথা জিজ্ঞেস করে।

অমর আর উদাসীন থাকিতে পারিল না। লীলার প্রতি তার স্নেহের একটুও লাঘব হয় নাই, আগে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় আছে?

চন্দ্রবাবু বলিলেন, বেরিলী।

এখন আসবে না?

না। গত বছর এসেছিল।

অমর সংক্ষেপে বলিল, অ!

তারপর কিছুক্ষণ পিতাপুত্রে আর কোনো কথাবার্তা হইল না। দুজনেই চুপ করিয়া রহিল।

আবার চন্দ্রবাবুই প্রথমে কথা কহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে কি থাকবার সুবিধে হয়?

অমর তৎপরতার সহিত বলিল, বেশ আছি! কোনো অসুবিধে নেই!

সসঙ্কোচে চন্দ্রবাবু বলিলেন, তোমার মা বলছিলেন, মেসের খাওয়া বোধ হয় ভালো নয়! রবিবারে বা ছুটির দিনে বাড়িতে খেলে পারো!

বাড়ি! দপ্ করিয়া অমরের মাথায় যেন আগুন ধরিয়া গেল। ইচ্ছা হইল চীৎকার করিয়া বলে, আমি কুকুর না কি? খুসি হলেই লাথি মেরে তাড়াবে আবার তু করে' ডাকলেই ফিরে যাবো? মনে পড়িয়া গেল, তার বাবা মাধুরীকেও একদিন এমনি অপমান করিয়াছিলেন। মাধুরীর শরীর তখন খুব খারাপ, সে শুইয়া ছিল। দুপুর বেলা চন্দ্রবাবু আসিয়াছিলেন, তখন অমর বাড়ি থাকিবে না নিশ্চয় তা জানিতেন! তিনি আসিয়া মাধুরীর পাশে বসিলেন। কথার অবসরে একসময় একখানা একশো টাকার নোট বার করিয়া বলিলেন, অসুখে পড়ে' আছ, খরচ-পত্তর হচ্ছে, নোটখানা রাখো বৌমা! মাধুরী অবশ্য রাখে নাই, তার সেটুকু আত্মমর্য্যাদা ছিল। কিন্তু যদি রাখিত, অমর তাহাকে জীবনে ক্ষমা করিতে পারিত না! যে গরিব সে যে ভিক্ষুক না-ও হইতে পারে এই কথাটা বড় মানুষদের মাথায় কিছুতেই ঢোকে না!

রাগে সে কিছুক্ষণ কথা কহিতে পারিল না। কতকটা প্রকৃতিস্থ হইবার পর বলিল, ছুটির দিন কোথায় থাকি তার কিছু ঠিক নেই!

চন্দ্রবাবু আড়চোখে পুত্রের মুখের ভাবটা দেখিয়া লইলেন। প্রসঙ্গটা আর উত্থাপন করিবার সাহস হইল না।

কিছুক্ষণ যায়। তিনি বলিলেন, বৌমার খবর শুনে লীলা ভারি কেঁদেছিল। বৌমাকে ভারি ভালবাসতো! অমর কিছু বলিল না, কিন্তু কথাটা শুনিয়া তার মনের উত্তাপ অনেকটা কমিয়া আসিল

চন্দ্রবাবু উঠিলেন। বলিলেন, আসি তাহলে! তোমার মাকে বলবো'খন!

অমরও উঠিল। চন্দ্রবাবুর দাঁড়াইয়া উঠার ভঙ্গীটি তার দৃষ্টি এড়ায় নাই। এটুকু পরিশ্রমও তাঁর পক্ষে কষ্টকর,ইহা সে বুঝিতে পারিল। পিতার মুখের পানে সে লক্ষ্য করিয়া দেখিল জরার প্রভাব সেখানে পরিস্ফুট। তাঁর উজ্জল গৌরকান্তি পাণ্ডুর হইয়াছে, মাথায় অনেকটা স্থান জুড়িয়া টাক পড়িয়াছে, চুল যা আছে সমস্তই সাদা। তাঁর শিথিল চর্ম্ম, কপালের সুস্পষ্ট বলিরেখা, তাঁর সঙ্কুচিত দৃষ্টি—কোথাও সে তার চিরপরিচিত দৃঢ়মনা জেদী পিতার চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পাইল না। এ যেন এক প্রচণ্ড ঝড়ের পর বিশাল বনস্পতির ধ্বংসাবশেষ।

জরাগ্রস্ত পিতার মলিন মুখের পানে চাহিয়া অমরের বুকের ভিতরটা কেমন করিতে লাগিল। সে তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করিয়াছে, অথচ তার কোনো ন্যায্য কারণ নাই, এই কথাটা বারম্বার মনে হওয়ায় সে অত্যন্ত ক্লেশ বোধ করিল। এই দুর্ব্বল শরীর লইয়া তার সঙ্গে অনাহূত দেখা করিতে আসায় পিতার স্নেহের পরিচয়ই পাওয়া যায়—তিনি ত কোনো স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আসেন নাই! সংসারে সকলের মতের মিল হয় না, তাঁর সঙ্গেও অমরের মতানৈক্য ঘটিয়াছিল—তিনি অসহিষ্ণু হইয়া এক সময় পুত্রের সহিত অন্যায় কঠিন ব্যবহার করিয়াছিলেন, একথাও সত্য, কিন্তু, অমর না ভাবিয়া পারিল না যে তিনি তার পিতা। আশৈশব তার জন্য তিনি যা করিয়াছেন তার মধ্যে কি কৃতজ্ঞ হইবার মত কিছু নাই? স্নেহের নিদর্শন কি কোথাও মেলে না? অমরের মন বলিল, আছে আছে অনেক আছে! নাই বলিলে যে মিথ্যা বলা হয়!

পিতার পাশে দাঁড়াইয়া অমর স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, আর একটু বোসো না বাবা! এখনো তো বেশি বেলা হয়নি!

চন্দ্রবাবু অবাক হইয়া অমরের মুখের পানে চাহিলেন বলিলেন, বসবো? তোমার আবার আপিসের বেলা হচ্ছে!

অমর বলিল, এখনো দেরী আছে। বোসো তুমি, বলিয়া পিতার হাত ধরিয়া তক্তপোষের উপর বসাইল।

তারপর বলিল, একটু চা করে' দিইনা বাবা? খাবে?

পিতার প্রতি রূঢ়তা প্রকাশ করিয়া যে-অপরাধ

করিয়াছিল, কোনোরকমে তাঁর পরিচর্য্যা করিয়া সেটুকু শুধরাইয়া লইবার জন্য অমরের মন ব্যাকুল হইয়াছিল। চা'য়ের প্রতি চন্দ্রবাবুর আসক্তির কথা সে জানিত, তাই তিনি 'না' বলাতে সে মনে বড় আঘাত পাইল।

পুত্রকে জিজ্ঞাসুনয়নে তাঁর মুখের পানে চাহিতে দেখিয়া চন্দ্রবাবু বলিলেন, চা-খাওয়া বারণ। অর্শতে ভুগছি কি না!

অমর একথা জানিত না। জিজ্ঞাসা করিল, তাই না কি? কবে থেকে?

চন্দ্রবাবু বলিলেন, বছরখানেক হ'তে চল্লো, মাঝে একেবারে শয্যাগত ছিলুম ক'মাস। বৌমার শেষ সময়ে একবার দেখতে যেতেও পারিনি!

অমর ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বলিল, তাহলে ত তোমার এতক্ষণ বসে' থাকা ঠিক হয়নি। বিছানা পেতে দিচ্ছি, তুমি একটু শুয়ে পড়ো।

পুত্রের আগ্রহ দেখিয়া চন্দ্রবাবুর মুখের ভাব প্রসন্ন হইয়া উঠিল। বলিলেন, না একটু বসেই থাকি। শুয়ে শুয়ে আর ভালো লাগে না।

অমর কিন্তু শুনিল না। বিছানা পাতিয়া চন্দ্রবাবুকে শোয়াইয়া তবে ছাড়িল। তারপর তাকের উপর হইতে মিছরি বার করিয়া জলের কুঁজা ও গেলাশ লইয়া বসিল।

চন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ও কি?

অমর বলিল, চা ত আর খাবে না। একটু মিছরির পানা তৈরি করে' দিই!

অনেকক্ষণ পরে হাত ধরিয়া পিতাকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া অমর বলিল, আমার সঙ্গে দেখা করতে আর এখানে এস না। সিঁড়ি ভেঙে ওঠা তোমার পক্ষে ঠিক নয়।

চন্দ্রবাবু বলিলেন, কি করি, দেখতে ইচ্ছে হয়! বাড়িতে একলা থাকি, একটা কথা কওয়ারও লোক নেই।

পিতার পদধূলি লইয়া অমর বলিল, তার আর কি! ছুটিছাঁটার দিন আমিই যাব'খন। মাকে বলে' দিয়ো।

গাড়ি চলিতে সুরু করিল। পিতার মুখে খুসির আভাস দেখিয়া অমরের চোখের জল আর বাধা মানিল না।

৭২

নরকের দ্বারে

জীবসৃষ্টির মূলে যে-কামনা, যে-কামনা আমাদের রক্তের অণু-পরমাণুর মধ্যে জড়াইয়া আছে, তার প্রভাব কখনো গোচর কখনো অগোচর, কখনো উগ্র কখনো ক্ষীণ, কিন্তু সে-প্রভাব যেমনতরোই হোক তাহা এড়াইবার জো নাই। রোগ শোক চিন্তা বা কাজের ভিড়ে হয়ত কিছু কালের জন্য চাপা পড়িয়া থাকে, কিন্তু সুযোগ পাইলেই উহা এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করে যে কিছুতেই তাহাকে আর বাগ মানানো যায় না। তখন তার তীক্ষ্ণ শায়কে মানুষ জাগরণে ও নিদ্রায় ক্ষতবিক্ষত হইয়া পাগল হইয়া ওঠে—সে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে।

অমর যেদিন মাধুরীর হাত ধরিয়া অচেনা ও উদ্দাম সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিল সেদিন সেই সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার চিন্তাই তাহার সমস্ত মন আচ্ছন্ন করিয়া ছিল। সেই অসম যুদ্ধে জয়ী হইবার উপায় আবিষ্কারের জন্য তার মন এমনি ব্যাপৃত হইয়া থাকিত যে সম্ভোগ-চিন্তা মনের সীমানার মধ্যেও আসিবার অবসর পাইত না। অভাব ও মৃত্যুর করাল ছায়ায় বসিয়া তার রক্তের ক্ষুধা শুম্ভিত হইয়া গিয়াছিল।

আজ দুর্ভাবনার অন্তে নিশ্চিন্ত অবসরের মধ্যে সেই ক্ষুধা তার অগোচরে ধীরে ধীরে মাথা তুলিতে লাগিল। অনেক দিনের সঞ্চিত অবরুদ্ধ কামনা একদিন অতর্কিতে নিদ্রার অবসরে অমরের আলিঙ্গনের মধ্যে আপনাকে সঁপিয়া দিল। সুখশিহরণে ঘুম ভাঙিয়া গেলে অমর যখন বুঝিতে পারিল স্বপ্ন তাহাকে ছলনা করিয়াছে তখন তার মন বিরক্তি ও অতৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। স্বপ্ন না

হইয়া সত্য হইলে কত সুখের হইত একথা সে না ভাবিয়া পারিল না। কিন্তু তবুও অমরের কেমন ভয়-ভয় করিতে লাগিল, যে-রক্ত এতদিন শান্ত শীতল ছিল আজ তাহা তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, সে-কথা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আহার-নিদ্রার ব্যবস্থা হওয়া তবুও সহজ, কিন্তু জীবের অপরিহার্য্য তৃতীয় প্রয়োজনটি ত তেমন সহজে মিটাইবার নয়! অথচ তার তাগিদ অতি প্রচণ্ড, দুর্দ্দমনীয়।

সে-রাত্রে অমরের চোখে আর ঘুম আসিল না। কিছুক্ষণ বিছানায় এপাশ-ওপাশ করিয়া শেষে বিরক্ত হইয়া সে ছাদে বাহির হইয়া পড়িল। আশেপাশে চারিদিকে অসংখ্য গৃহচূড়া, ঐ সব বাড়িতে কত লোকেই থাকে, সকলেই [illegible] তার মত নিঃসঙ্গ নয়, শয্যার সঙ্গিনী নিশ্চয়ই অনেকের আছে, ভাবিয়া অমরের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই স্বপ্নের মাঝে সেই ক্ষণস্থায়ী অলীক আলিঙ্গনের মাদকতার স্মৃতি তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল।

এমনি করিয়া রাত কাটিল, প্রভাত হইল, জগৎ জাগিয়া উঠিল। তরুণ অরুণালোক দিকে দিকে সোনার মায়া সৃজন করিল। তখন গতরাত্রের কথা একটা দুঃস্বপ্নের মত মনে হইল—একটা আকস্মিক ক্ষণিক দুর্ব্বলতা ছাড়া আর কিছু নয়। তারপর মধ্যাহ্নে আপিসের ছোট কুঠরির মাঝে বসিয়া কাজের ভিড়ে অমরের সে-কথা আর মনেই রহিল না।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিয়া বিশ্রামান্তে সে কাব্য খুলিয়া বসিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পড়ার পর অনুভব করিল তার চোখ বইয়ের উপর থাকিলেও তার মন অন্যত্র বিচরণ করিতেছে। সে সভয়ে আবিষ্কার করিল আবার সেই চিন্তায় ধীরে ধীরে তার মন আচ্ছন্ন হইতেছে। তাড়াতাড়ি বই মুড়িয়া অমর ছাদে বাহির হইয়া গেল। সেখানে দ্রুতগতি চলিয়া চলিয়া আপনাকে শ্রান্ত করিয়া তুলিল, তবু সেই চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি পাইল না। উল্টা তার ধমনীর আঁকেবাঁকে সরীসৃপের মত গড়াইয়া চলিতে লাগিল।

অনেক রাত্রে আহার সারিয়া বিছানার উপর চোখ বুজিয়া বুজিয়া তার মনে হইল, জীবনের পথে এ-পর্য্যন্ত যে-সব নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, তারা যেন সব অতীতের যবনিকা সরাইয়া একে একে তার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। কেহ তার পানে লালসার দৃষ্টি হানিল, কেহ মৃদু হাসিয়া হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিল, কেহ বাহু মেলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিল, আবার কেহবা সজলনয়নে নিষ্ঠুর বলিয়া তাহাকে ধিক্কার দিয়া ফিরিয়া গেল। কেহ কবরীর মালা খুলিয়া তার গলায় পরাইল, কেহ সুগন্ধি কেশপাশে তার পা মুছাইয়া দিল, কেহবা তার মুখের পানে অধর বাড়াইয়া দিয়া ভিখারিনীর মত সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিল! যেদিকে চায় সেখানেই যেন কামনা লেলিহ জিহ্বা মেলিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত। অস্থির হইয়া অমর উঠিয়া বসিল। তারপর শান্তির জন্য দাঁড়াইয়া হাঁটিয়া শুইয়া বসিয়া কতরকমেই চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই স্বস্তি পাইল না।

প্রভাতের আলো যখন অমরের মুখের উপর আসিয়া পড়িল, তখন সে হাসিল। গতরাত্রে সে কি পাগল হইয়াছিল? ছি ছি, নিজের মনের উপর কি তার এতটুকুও দখল নাই? সে সংকল্প করিল আজ হইতে সে মনের লাগাম কষিয়া টানিয়া রাখিবে!

কিন্তু নিশীথ রাত্রির নির্জ্জনতায় সে-সংকল্প কোথায় যে ভাসিয়া গেল অমর টেরও পাইল না। আবার রক্তের মাতন সুরু হইল। অন্ধকারে মনে হইল চারিদিকে কাহারা যেন ঘুরিয়া ফিরিতেছে। প্রাণপণ বলে বালিস আঁকড়াইয়া বিছানার উপর স্থির হইয়া সে পড়িয়া রহিল—কিছুতেই নড়িবে না! চোখ বুজিয়া সে যেন অভিসারিকাদের চাপা হাসি, তাদের আঁচলের খসখস শব্দ, তাদের চুড়িচাবির রিনিঠিনি শুনিতে পাইল—তারা

যেন তার সংকল্পকে উপহাস করিতেছে! অমরের রাগ হইল, দেখাই যাক না ব্যাপার কি? কেহ নাই নিশ্চয়ই, কিন্তু যদি থাকে?...ভাবিতে ভাবিতে তার হৃৎপিণ্ড দ্রুততালে ওঠাপড়া করিতে লাগিল, তার সারা দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া পড়িল, স্বপ্নাবিষ্টের মত হাত বাড়াইয়া অন্ধকার ঘরের কোণে কোণে ঘুরিতে লাগিল, ছাদের আনাচে-কানাচে অনুসন্ধান করিল, কতক্ষণ, তা তার নিজেরই ধারণা রহিল না। শেষে শ্রান্ত হইয়া শেষরাত্রে ঘুমাইয়া পড়িল।

এমনি করিয়া দিনে দিনে অমরের দেহ শুষ্ক শীর্ণ শ্রান্ত হইতে লাগিল। সারাক্ষণ একটা অবসাদ তার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। ক্ষুধা, আহারে রুচি, পরিপাক-শক্তি সমস্তই লোপ পাইতে বসিয়াছে। লোকের সঙ্গ অসহ্য, কাজকর্ম্মে মন নাই। অতি তুচ্ছ কারণে সে বিরক্ত হইয়া ওঠে, কথায় কথায় রাগিয়া যায়। এমনতরো স্বভাব তার কখনো ছিল না।

লালসাক্লিষ্ট মনকে সংযত করিবার জন্য অমরের চেষ্টার অবধি নাই। অবসর পাইলেই সে বই খুলিয়া বসে বা রচনায় মনোনিবেশ করে, কখনো বা রেলে ষ্টীমারে বা পদব্রজে ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়ে, থিয়েটার বায়স্কোপ সভাসমিতিতে যাতায়াত করে। তাহাতেও বিশেষ কিছু সুবিধা হয় না—দু এক দিনের জন্য নিস্তার পায় মাত্র, আবার যে কে সেই। শেষে নাচার হইয়া সে একে একে সমস্ত পুষ্টিকর খাদ্য বর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহাতে শরীর হয় ত দুর্ব্বল হইল, কিন্তু মন বাগ মানিল না।

একদিন সন্ধ্যায় এমনি এক নিরুদ্দেশ ভ্রমণে অমর বার হইয়া পড়িল। পথে বাতাসের লেশ মাত্র নাই, সমস্ত শহরটার উপর ধোঁয়ার দুর্ভেদ্য আবরণ। সম্মুখে হাত পাঁচ ছয় দূরের মানুষ চেনা যায় না, গ্যাশের আলো লালচে আর অস্পষ্ট দেখাইতেছে, নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট বোধ হয়। অমর শ্রান্ত পদে চলিতেছিল, আশপাশ দিয়া নগরীর জীবনস্রোত বহিয়া চলিয়াছে, সে দিকে তার দৃষ্টি নাই।

অনেকক্ষণ পরে তার খেয়াল হইল সে একটা নোংরা সরু গলির মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। গলির দু' ধারে দ্বারে দ্বারে নানা বয়সের এবং নানা আকারের স্ত্রীলোকেরা দেহের পসরা লইয়া বসিয়া আছে। ধোঁয়ায় তাদের মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না, কিন্তু তাদের হাসিমস্করা গল্প-গুজবের শব্দ কিছু কিছু অমরের কানে পৌঁছিতেছিল।

মেয়েদের মুখ পরখ করিবার লোভ হইলেও লজ্জা তার পা-দুটাকে থামিতে দিল না। একরকম কোনো দিকে না চাহিয়াই অমর গলির প্রান্তে গিয়া পৌঁছিল। সেখানে দাঁড়াইয়া সে ভাবিতে লাগিল, এমন করিয়া অনর্থক ঘুরিয়া ঘুরিয়া কি লাভ? তৃষ্ণায় যখন ছটফট করিতেছি তখন জলের কিনারে পৌঁছিয়া জলপান করায় বাধা কি? পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ কেন?

সে আবার মুখ ফিরাইয়া গলির মধ্যে ঢুকিল। এবার সে গলির পাশ ঘেঁসিয়া চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে তার চোখদুটা ধোঁয়ার আবরণ ভেদ করিয়া সুন্দরী যুবতী নারীর সন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু সকলেই কুশ্রী, সুশ্রী মুখ একটিও চোখে পড়ে না। হতাশ ও কতকটা বিরক্ত হইয়া সে আবার গলির প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল।

মনের কুণ্ঠা ক্রমশ ঘুচিয়া যাইতেছে, কামনাও বাড়িয়া চলিয়াছে। সে আবার ফিরিল। এবার গলির অপর পাশ ঘেঁসিয়া চলিতে লাগিল। এক জায়গায় জন চার পাঁচ স্ত্রীলোক বসিয়া জটলা করিতেছিল। তাদের মধ্যে একখানি শ্যামল মুখ তাহাকে আকৃষ্ট করিল। প্রাণপণ বলে পা-দুটাকে থামাইয়া দিয়া মেয়েটির মুখের উপর সে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

শ্যামলা কথা কহিল না। তার এক সঙ্গিনী বলিল, কি মশাই, বসবেন? পাঁচ টাকা লাগবে!

অমরের মাথামগজের ঠিক ছিল না—হঠাৎ তার রাগ চড়িয়া গেল।

বলে কি? পাঁচ টাকা? রাস্তায় দাঁড়াইয়া যারা লোক ডাকে, এই আঁস্তাকুড়ের মাঝে যাদের বাস, তাদের দর পাঁচ টাকা? এ কি আমার সঙ্গে রসিকতা না কি? সে পট্ করিয়া বলিয়া বসিল, একটাকায় হয় ত দেখ!

সঙ্গিনী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। শ্যামলাকে একটা ঠেলা মারিয়া বলিল, শোন্ লো শোন্! তারপর অমরের পানে ফিরিয়া বলিল, দিন না একটাকা, পান খাব'খন আমরা!

অদূরে এক আধা-বুড়ী স্ত্রীলোক বসিয়া ছিল। সে বলিল, নে নে ন্যাক্‌রা রাখ্! আর হাসতে হবে না! তারপর অমরের উদ্দেশে মুখ ঝামড়া দিয়া বলিল, যাও যাও পথ দ্যাখো বাপু! ট্যাঁকে নেই পয়সা, এয়েচেন মেয়েমানুষ করতে!

অমরের পিঠে যেন চাবুক পড়িল। নিমেষের মধ্যে পকেটে হাত পুরিয়া দিয়া একটা টাকা বার করিয়া এই নাও বলিয়া সে হাত বাড়াইয়া দিল। ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত, মুহূর্ত্তকালের জন্য কারও মুখে কথা সরিল না। পরক্ষণে, পাঁচ টাকা যে দর হাঁকিয়াছিল, সে বলিল, দিন বাবু, আমায় দিন! বলিয়া হাত পাতিল।

অমর বলিল, তোমায় দেব কেন? ওকে দিতে পারি, ও যদি চায়!

স্ত্রীলোকটা তখন শ্যামলাকে বলিল, নে না লো! হাত পাত! বাবু দিতে চাইচেন, তোর আবার লজ্জা কিসের?

শ্যামলা কথা কহিল না হাত গুটাইয়া নতমুখে বসিয়া রহিল।

তার রকম দেখিয়া আধা-বুড়ী রাগিয়া খুন। বলিল, মরণ আর কি! নে নে, হাত পাত বলছি!

শ্যামলা সহসা মুখ তুলিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া বসিল, কেন নোব? আমি কি ভিকিরি?

অমর আর দাঁড়াইল না, দ্রুতপদে গলি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। তার পুরুষত্বের বা দৈহিক সৌন্দর্য্যের অভিমানে—কিসে আঘাত লাগিয়াছিল ঠিক বলা যায় না, কিন্তু তার ফলে তার জিদ বাড়িয়াই চলিল, যেমন করিয়া হোক সে তার কামনা চরিতার্থ করিবেই! হনহন করিয়া সে একদিকে চলিতে সুরু করিল।

বহুক্ষণ এমনিভাবে চলিয়া চলিয়া তার গলা শুকাইয়া গেল, গায়ে ঘাম দিল, মুখ দুর্গন্ধ হইয়া উঠিল। তবুও তার চলার বিরাম নাই।

পথের বাঁকের মাথায় এক জায়গায় হঠাৎ লক্ষ্য করিল ওপারের ফুটপাতে একটা মাটকোঠার দ্বারের সুমুখে এক না ই'। দূর হইতে তার মুখ দেখিতে না পাইলেও সে যে কৃশাঙ্গী নয় এটুকু বুঝিতে পারিল। পর মুহূর্ত্তেই সে যেন উড়িয়া মাঝের পথটুকু অতিক্রম করিয়া স্ত্রীলোক-টার গা ঘেঁসিয়া দ্বারের ভিতর দিয়া সটান ঢুকিয়া পড়িল।

স্ত্রীলোকটা দাঁড়াইয়া উঠিল। ভিতরে অগ্রসর হইয়া আসুন বলিয়া একটা সরু কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। অমর তার অনুগমন করিল। পলকা কাঠের সিঁড়ি দুজনার ভারে ক্যাঁচক্যাঁচ করিয়া সশব্দে দুলিয়া উঠিল।

কয়েকটা মাত্র ধাপ উঠিয়াই একটা রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে দুজনে থামিল। অমরের বুক অসম্ভব দ্রুততালে ঢিপঢিপ করিতেছিল, সংকোচে সে মুখ তুলিতে পারিল না, নত-নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল।

আঁচলের চাবি দিয়া তালা খুলিয়া স্ত্রীলোকটা ঘরে ঢুকিল। তার পশ্চাতে অমরও প্রবেশ করিল।

মাটির দেয়ালের গায়ে কেরাসিনের আলোটা বাড়াইয়া দিয়া সে মুখ ফিরাইয়া অমরের পানে চাহিয়া ফিক্ করিয়া হাসিতেই তার আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল। সে দেখিল, জীবন্ত একটা বিরাট মাংসপিণ্ড! নাক মুখ চোখের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই বলিলেই হয়—এমনি মাংসাধিক্য!

বয়সে প্রৌঢ়া, বেঁটেখাটো চেহারা। থুঁতনির তলায়, কনুয়ের উপর, কাঁধের কাছে থোলো থোলো মাংস ঝুলিতেছে। পরণে মলিন তালিদেওয়া নীলাম্বরী, গায়ে ততোধিক মলিন একটা কাঁচুলি। সব চেয়ে ভয়ানক তার খড়িমাখানো মুখ আর রংমাখানো ঠোঁট, আর কয়লার মত কালো দাঁত বিকশিত করিয়া তার সেই বিকট হাসি।

লালসার দৃষ্টি দিয়া অমরের আপাদমস্তক লেহন করিতে করিতে হস্তিনী তার কাঁচুলি খুলিয়া ফেলিল। তারপর দ্রুতপদে মাটির-মেঝেয়-পাতা বিছানার উপর গিয়া দাঁড়াইয়াই কোমরের কাপড় খসাইয়া দিল। চোখের ইঙ্গিতে অমরকে ডাকিয়া মুখে সে বলিল, আসুন আসুন আর দেরী করবেন না! আমার আবার নোক আসবে!

পঙ্কিল পাপের পতাকা সেই শয্যা, তার উপর সেই স্ত্রীলোকের বীভৎস নগ্নমূর্ত্তি দেখিয়া অমরের সারা দেহ অপরিসীম ঘৃণায় শুকাইয়া উঠিল, একটা কঠিন ধাক্কায় তার আচ্ছন্ন ভাবটা এক মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল। হঠাৎ তার মনে হইল, এ আমি কোথায় আসিয়াছি? কেন আসিয়াছি? এখানে কি করিতেছি?

দ্বারের দিকে সে তীরের মত অগ্রসর হইল। শিকার পালায় দেখিয়া স্ত্রীলোকটা তদবস্থায় দুই হাত বাড়াইয়া তার অনুসরণ করিয়া বলিতে লাগিল, ও কি? কোথা যান? কেমন ধারা নোক আপনি? এমন ত কখনো দেখিনি বাপু!

অমর আর ফিরিল না। পকেট থেকে একটা টাকা বার করিয়া পিছনপানে ছুড়িয়া দিয়া একরকম দৌড়িয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া সে পথে গিয়া পড়িল। তারপর রুদ্ধ নিশ্বাসে বাড়িমুখো ছুটিয়া চলিল।

—ক্রমশ

ক্ষীরোদপ্রসাদ

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় মহা-প্রয়াণ করিয়াছেন।

তিনি কবি ছিলেন; বাংলার নাট্যসাহিত্যে তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষয় হইবে; কথা-সাহিত্যেও তাঁহার প্রয়াস ব্যর্থ হইবে না বলিয়াই মনে হয়।

প্রায় বৎসর দুই পূর্ব্বে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার সুযোগ হইয়াছিল; সেই সময় মানুষটিকে যেরূপ পাইয়াছিলাম, তাহাই বলিতেছি।

তিনি ভাগলপুরে আসিয়াছিলেন হাওয়া-বদল করিতে। ছিলেন, খুবই কাছাকাছি একটি বাড়িতে।

•

তখনো আমার সহিত পরিচয় হয় নাই; কয়েকটি যুবক আসিয়া ধরিল যে তাহাদের হাতে-লিখা একখানি মাসিকে কিছু লিখিতে হইবে।

উত্তরে তাহাদের বলিলাম, তোমাদের হাতে-লেখা কাগজে, তোমাদের লেখাই থাকবে; এ কাগজ তোমাদের গ'ড়ে তোলার জন্য, এতে বুড়োদের নিয়ে টানা-টানি করা ঠিক হয় না......

যুবকেরা হাসিয়া উত্তর করিল, ক্ষীরোদবাবু একটি লেখা দিয়েছেন, তিনি তো আপনার চেয়ে......

তখন নিরুপায় হইয়া লেখা দিবার কথা মানিয়া লইলাম। আমার অবস্থা বুঝিয়া তাহারাও হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

সেই দিন অপরাহ্নে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম।

দেখিয়াই মনে হইল মানুষটি রসিক। প্রথম পরিচয়ের পর বলিলেন, বুড়োই জিতেছে; টান্‌ছিলুম আপনাকে, দেখ্‌ছিলুম, আপনিই আসেন, না, আমাকেই যেতে হয়।

হাসিয়া বলিলাম, ঠিক্ এমনটি জান্‌লে কি করতুম জানিনে......

তিনি খুব খানিকটা হাসিয়া বলিলেন, সেটা কি ঠিক হ'তো, এই ভাল হয়েছে, আমি বুড়ো, আপনাদের দেশে আগন্তুক একজন......

অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিলাম, আপনি প্রবীণ, সকল বিষয়ে আমার মাননীয়, বহুপূর্ব্বেই আমার উচিত ছিল আসা......

তিনি বলিলেন, ও কথাও যে আমার মনে হয়নি তা নয়; তবে মানুষের সম্বন্ধে আর অত সহজে কিছু বিচার করিনে; এইটুকু বয়সের মূলধন।

সাহিত্য-আলোচনা আরম্ভ হইয়া গেল

তিনি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এমন-সব প্রশ্ন করিতে লাগিলেন যাহাতে তাঁহার পুস্তকগুলির সম্বন্ধে একটা মতামত দিতেই হয়।

তখন বলিলাম, এখন ঠিক বুঝতে পারছি কেন আপনার কাছে এতদিন আসিনি।

কেন? কেন?

ভয়ে।

খুব একচোট হাসিয়া বলিলেন, ভয় করবার লোক কি আর পৃথিবীতে পান নি?......নখদন্তহীন বৃদ্ধকে ভয়?

বলিলাম, ভয়ের কারণ আপনি নন, আমার ভিতরের দুর্ব্বলতা, এখন আর উপায় নেই, স্বীকার করতে হচ্চে যে, আপনার কোন বই আমি পড়িনি। আপনি লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ......আমার ত্রুটি মার্জ্জনা ক'রবেন।......ধরা পড়ার ভয়েই বোধ হয় আস্‌তে সাহস হয়নি।......আর লুকো-চুরিতে কাজ নেই

এ-কথা শুনে কেহই খুসী হইতে পারে না। ব্যাপারটা সাম্‌লাইবার জন্য তিনি বলিলেন, আমার কোন বইএর অভিনয়ও দেখেন নি?

উত্তরে বলিলাম, তাও খুব কম, আসল কথা বাংলা ভাষার নাটক পড়তে আমার কেমন ভাল লাগে না।......আর অত বড় একটা থিয়েটার দেখার উৎসাহও যেন আমার নেই।

তিনি জানিতে চাহিলে বলিলাম যে তাঁহার আলিবাবা এবং বভ্রুবাহনের অভিনয় দেখিয়াছি।

বলিলাম, বভ্রুবাহন আমার খুব ভাল লেগে-ছিল.

আর আলিবাবা? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।

বলিলাম, ও-খানির কথা বল্‌তে হবে কেন? এত বড় পপুলার নাটক বোধ হয়-হয়নি; কিন্তু বইখানিতে আপনার কৃতিত্ব কতখানি আছে বলা শক্ত।

কেন?

নাচ-গানই বইখানির প্রাণ; তা আপনি কি রকম নাচেন তা এখনো প্রত্যক্ষ করিনি, শুনেছি আপনাকে রাগিয়ে দিতে পারলে আপনি ভালই নাচেন। আপনার নাচের দু'-একটা খবর আমাদের জানা আছে।......আর গানগুলি মনে হয় সব আপনার রচনা নয়।

তিনি অবাক হইয়া খানিকক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন, স্বীকার করি, আপনার সাহস আছে, এ যে বেয়ার্ডিং দি অথর ইন্ হিজ্ ওন ডেন!

উত্তরে বলিলাম, উপায় কি? আপনি আমাকে ছাড়বেন না, তাই মরীয়া হয়ে কথা কইচি।

তখন যেন উভয়ের মধ্যে একটা মিটমাট হইয়া গেল। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, না, না; গানগুলো সব আমারই রচনা, তবে দু'-একটা হিন্দি-উর্দ্দু কথার জন্য হয়ত কারুর কাছে ঋণ করেছি।......বুঝেছেন কি না? গান আমি ভাল লিখি, নিজে গাইতে পারলে, আরো চমৎকার হ'তো, নিশ্চয়। তবে কি না, আমার যে একেবারে সুর-বোধ নেই, তাও নয়

তারপর আমরা বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রসঙ্গে উপনীত হইলাম। অনেক কথা হইল যাহা ব্যক্তিগত মতামত; ভাল-লাগা মন্দ-লাগার ব্যাপার। সেই সকল হইতে এই বুঝিয়াছিলাম যে তাঁহার মতামত রক্ষণশীল। গতিশীল তথা-কথিত আধুনিক সাহিত্যের প্রতি তাঁহার কোন মমতা ছিল না।

অনেক কথার পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা নাটক তো আপনি অনেক লিখ্‌লেন; হয়তো আরো লিখ্‌বেন, আপনার কাছে একটা কথা শিখেনি; নাটক-লেখকের সব চেয়ে বড় গুণ কি?

মাথা নাড়িয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, প্রশ্নটি ভালো, সহজও বটে; এর উত্তর আমাদের অলঙ্কার-শাস্ত্রে আছে; আত্ম-গোপন; নাটক-লেখক নিজেকে যদি সকল সময়ে প্রচ্ছন্ন না রাখতে পারেন তো সব মাটি হ'য়ে যায়···

বলিলাম, বাস্তবিক এ-কথা খুব সত্য। আমাদের কোন কোন লেখকের এই দোষটা এত মারাত্মক যে তাঁদের দু'-একখানা বই পড়ার পর তাঁরা যেন পাঠকের কাছে ফুরিয়ে যান।

তিনি হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, দেখুন বড়-বড় নাটক প'ড়ে; কি কালিদাস, কি সেক্সপীয়র; তাঁদের কোন পরিচয় নাটকের মধ্যে পাবেন না। লোকে এক-দিন মনে ক'রেছে বেকনই সেক্সপীয়র; কিন্তু নাটক প'ড়ে এ-কথা কিছুতেই বলার উপায় নেই। চাষার কথা বলার সময় সেক্সপীয়র একেবারে চাষা। আবার রাজা আঁক্‌বার সময় যেন সত্যিকার রাজা!......মনের এত বড় প্রসার নৈলে নাটক লেখাই বিড়ম্বনা।

বলিলাম, শুনেছি বঙ্কিম মনে করতেন যে আমাদের ভাষায় নাটক লেখার সময় হয়নি। এ সম্বন্ধে আপনার মত কি?

তিনি বলিলেন, আমিতো নাটক লিখেছি; ও-কথা মান্‌লে কি নাটক লেখা চ'ল্‌তো?····· দেখুন, ভাষার জন্য কারুর কোথায় আট্‌কেছে ব'লে তো আমার মনে হয় না। বল্‌বার সত্যিকার কিছু থাক্‌লে তার ভাষা আপনিই এসে পড়ে। তবে একটা জিনিষ আমি খুব মানি; এক-এক জনের মনের গঠন এক-এক রকম; তাই কারুর পক্ষে কাব্য লেখা সহজ; কারুর পক্ষে আবার উপন্যাস; তেমনি আবার আমার কাছে নাটকটাই হ'লো সহজ। উপন্যাস লেখার সময় এই কথা যেন আমি ভাল ক'রেই উপলব্ধি ক'রেছিলুম। আর একখানা উপন্যাস লেখার ইচ্ছাও ছিল; কিন্তু এই কথা মনে হওয়াতে নিরস্ত হয়েছি। যদি কোনদিন তেমন তাগিদ পাই তো লিখ্‌বো।

বলিলাম, কিন্তু বঙ্কিমের বইগুলোর মধ্যে নাটকের আর্ট নেই, এ কথা তো বলা চলে না। আর তাঁর বইগুলো নাটকে রূপান্তরিত হ'য়েও খুব মন্দ দাঁড়ায়নি।

তিনি বলিলেন, ও সব মতামতের কথা; তর্কে কোন ফল হয় না।

হঠাৎ তিনি বলিলেন, একটা কথাতো জেনে নেওয়া হ'লো না; আমি নাচ্‌তে জানি, এ কি ক'রে আপনি জান্‌লেন?

বলিলাম, দুবারের কথা জানি।

কিছুদিন আগে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন থেকে আপনি নাকি নাচ্‌তে নাচ্‌তে বেরিয়ে গিয়েছিলেন; কারণ কোন প্রবন্ধপাঠক নাকি আপনাকে আর শরৎচন্দ্রকে লেখক-শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করেন নি।......

উচ্চ-হাস্য করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ বলিলেন, ঠিক্ ঠিক্; সেটা বুঝি হয়েছিল ভাল্লুক নাচ?

বলিলাম, চোখে তো দেখিনি, কেমন করে বলি, বলুন?

আর একটা?

বলিলাম, তখন আমাদের পাঠ্যাবস্থা; আপনি অধ্যাপক; সবে বভ্রুবাহন খানা লিখেছেন।

একদিন কলেজে একটা এক্‌সপেরিমেণ্ট খুব সুন্দর করাতে ছেলেরা হাততালি দিয়ে বলেছিলো—ব্র্যাভো বভ্রুবাহন!

সেদিন আপনি তাণ্ডব দেখিয়ে রেগে-মেগে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

তিনি খানিকটা খুব মন খোলা হাসি হাসিলেন। শেষে বলিলেন, যখন বুঝলুম যে নাটক লিখ্‌লে অধ্যাপকতা করা চল্‌বে না, তখন কাজ ছেড়ে দিলুম।

[আগামীবারে সমাপ্য]

মনের দাসত্ব

। নলিনীকিশোর গুহ

বাংলার তরুণদের আজ বিশ্বের যৌবন-রাজ্যের সকল খানি সংবাদ লইতে হইবে। দুনিয়ার যেখানে যেখানে মিথ্যার বিরুদ্ধে, অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে যৌবন-শক্তি সত্যের নূতন বাণী ঘোষণা করিয়াছে, সাম্য ও স্বাধীনতার নবরূপকে জীবনে বরণ করিয়া লইতে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে—বাংলার তরুণকে তাহার সকলখানি সংবাদই লইতে হইবে।

প্রাচ্যের স্থানে স্থানে এবং পাশ্চাত্যের সর্ব্বত্র আজ যৌবন-শক্তি চঞ্চল—নবসৃষ্টির প্রেরণায় প্রাচীন সমাজ, ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে তাহারা কোথাও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে উদ্যত, কোথাও নূতন করিয়া গড়িতে ব্যস্ত। প্রাচীন সকল দেশেই মৃত,—ঐ মৃতভার জাতির সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম্মের বুকে চাপিয়া বসিয়া তাহাকে পঙ্গু করিয়া রাখিতে চাহে। জাতির যৌবন জীবনের প্রাচুর্য্যে সেই পাষাণভার ছিট্‌কাইয়া ফেলিয়াই তবে জয়-যাত্রা করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তরুণ সেই পথেই চলিবে—চলিয়াছে।

ইউরোপের আজিকার সভ্যতা আমাদের কাছে নূতন ঠেকিলেও সেই দেশেই, ইতিমধ্যেই, ঐ সভ্যতা যে আজিকার তরুণের কাছে সেকেলে, বর্জ্জনীয় হইয়া পড়িয়াছে,—তরুণ ইউরোপ সেই সভ্যতাকে যে জীর্ণ পরিচ্ছদের মতই পরিত্যাগ করিয়া নব পরিচ্ছদ সংগ্রহে জাগ্রত ও উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে—এ সকল সংবাদও আমাদের বাংলার তরুণদের লইতে হইবে। কারণ বিশ্বের কোথায় কোন্ সত্য, কোন্ পরীক্ষার কষ্টিপাথরে উৎরাইয়া গিয়া খাঁটি হইয়াছে তাহাও যেমন জানিতে হইবে—তেমনি বিশ্বের উত্থান-পতন ভাঙ্গা-গড়ার প্রভাব হইতে আপনাকে একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন করার উপায় যে নাই—ইহাও বুঝিতে হইবে। বিশ্বের জীবন-ধারা যে গতিবেগে ও গতিভঙ্গীতে প্রবাহিত হইয়া সার্থকতা লাভ করিবে, আমার দেশের জীবন-ধারা তাহার সহিত কোন প্রকারের সাদৃশ্য না রাখিয়া, কোন প্রকারের যোগ না রাখিয়া, বিমুখ হইয়া, কোনও এক আজগুবী সনাতন

বিশিষ্টতার দৌলতে,—অচিন্ত্যনীয় রূপে সার্থকতা লাভ করিবে, বিশ্বরাজের বিধানে জীবনের সার্থকতার এমন উল্টা ব্যবস্থা নাই। বহু বিচিত্র রূপের মধ্যে যেমন এক পরম রূপ নিত্য বিরাজ করিয়া যোগ-সূত্রকে অক্ষুন্ন রাখিয়াছে—তেমনি এই বহু বিচিত্র জাতি ও দেশের জীবন-ধারার মধ্যেও এক পরম সত্য নিত্য বহিয়া চলিয়াছে, তাহাকে অস্বীকার করিয়া কোন মিথ্যা বৈশিষ্ট্যের জোরে কোন দেশের জীবন-ধারা অনন্ত-প্রবাহের পথে সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং বিভিন্ন জাতির বাঁচা-মরার সংবাদ রাখিয়া নিজের বাঁচা-মরার তথ্য ষোল-আনা রকমে তরুণ আমাদেরই একান্ত করিয়া পাইতে হইবে।

কিন্তু এই বাঁচা-মরার কথায়ও গোল উঠিবে। মৃত্যুর কালিমা যাহাকে অদূরে কালো করিয়া দিবার জন্যই অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে, মদ-মাতালের সেই ক্ষণিক মাতামাতিকে প্রাণশক্তি বলিয়া ভুল করার মত স্থূল দৃষ্টি লইয়াও তো জাতির বাঁচা-মরার তথ্য খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না! যে প্রজ্ঞা আজিকার পরে কালিকার কথাও কথঞ্চিৎ ভাবিতে পারে, বাঁচা-মরার বড় কথা তাহারই বুঝিবার।

বাহিরের কথা সকলখানিই জানিব, কারণ—ঘরের কথা আজ যথার্থরূপে জানিতে হইবে।—ঘরের কথা না জানা যেমন অমার্জ্জনীয় অপরাধ, বাহিরের কথার খোঁজ না রাখাও তেমনি অজ্ঞতা, আহাম্মুকী। কারণ, আপনাকে জানিতে পারি কেবল পরের সঙ্গে তুলনায়। বাহিরের বাইবেল মাত্র পড়িয়া বাড়ীর বেদ-বেদান্তে শ্রদ্ধাহীন হওয়া যেমন দাস-মনোভাবের পরিচায়ক, তেমনি বাহিরের বাইবেল না পড়িয়া ঘরের বেদ-বেদান্তকে চরম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বড়াই করা দাসত্বেরই নামান্তর। সংস্কৃতের দাসত্ব যেমন হেয়, ইংরেজী-দাসত্বও তেমনি ঘৃণ্য। ঘরের কথা না জানিয়া—জানিতে চেষ্টা না করিয়া—পাশ্চাত্যের সবই ভাল বলিয়া, নির্ব্বিচারে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করায় যেমন অগৌরব—তেমনি পাশ্চাত্যের কথা না জানিয়া বা জানিতে চেষ্টা না করিয়া, "আমাদের যা' সবই ভাল, ও শ্রেষ্ঠ"—বলিয়া আত্মবঞ্চনা করাও তেমনি আত্মঘাতী দাসত্বের পরিচায়ক।

কিন্তু এই জানিতে যাওয়ার মধ্যেও মনের দাসত্বের পঙ্গুতা সত্যকে বুঝিতে বাধা দেয়। দেখা গিয়াছে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিও পাশ্চাত্য দেশের সকল কিছুই কদর্য্য দেখেন এবং নির্ব্বিচারে প্রাচ্যের টিকি ও ফোঁটার মধ্যে বিশিষ্ট সভ্যতার সন্ধান পান! মনের দাসত্বই ইঁহাদের কখনো পাশ্চাত্যের, কখনো প্রাচ্যের ভক্ত করিয়া ফেলে। যে নির্ব্বিচারে 'সেকেলে' সংস্কৃত পণ্ডিতের অথবা 'একেলে' বোলশেভী পণ্ডিতের মন্ত্র-শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে পারিল, তাহার চাইতে আর হেয় জীব কে? ঐ মনের দাসত্ব লইয়া সে রাজতন্ত্রেরই সেবা করুক, আর সমাজতন্ত্রেরই সেবা করুক তার গোলামী তো আর ঘুচিবে না। মনের দাসত্ব লইয়া বা পরের শিখান বুলি আওড়াইয়া প্রাচীনই হই, আর নবীনই হই, তরুণ যৌবন আমার জাগিবে না। শেখা কথায় বড় জোর যাদু করা চলে—সৃষ্টি করা তো চলে না। অথচ তরুণের যৌবনের কাজই সৃজন। দাসত্বই তো সনাতন সেকেলে, কদর্য্য। তা' সে কালিকারই হউক কি আজিকারই হউক, প্রাচীনই হউক কি আধুনিকই হউক। তাই বাংলার তরুণকে ঘরের কথা ও বাহিরের কথা জানিতে নিজের প্রভু-বুদ্ধিকে সদা সচেতন করিয়া রাখিতে হইবে। সংস্কৃত পুঁথি হইতে একটি শ্লোক বাহির করিতে পারিলেই তাহা আজিকার আমার নিজস্ব হইবে না, যদি তাহা বিচারে নিজস্ব করিয়া না লই,—ইংরেজী পাতা উল্টাইলেও তাহা নিজস্ব হইবে না, যদি নির্ব্বিচারে তাহা গিলিয়া বসি। যে তাজা মন, স্বাধীন সত্তা তরুণকে জীবনের মহিমায় বরণীয় করিয়াছে সেই তাজা মন ও স্বাধীন সত্তা দ্বারাই সকল (সেকেলে ও একেলে) জানাকে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে নিজস্ব করিয়া লইতে হইবে। যে তরুণ সৃজন করিবে, তাহাকে পরের মুখে ঝাল খাইলে চলিবে না; ধারে আর

যাহার চলুক বাংলার তরুণের চলিবে না। বাংলার তরুণ আজ নবসৃষ্টির প্রেরণায় চঞ্চল, জাতিকে নবরূপে সৃষ্টি করিতে সে যেন একালের বা সেকালের কোন দাসত্বকেই সম্বল না করে। বাংলার তরুণ যেন না ভোলে, দাসত্ব আধুনিকই হউক বা প্রাচীনই হউক, তাহা তারুণ্য-বিরোধী সেকেলে, অর্থাৎ প্রাণহীন ও কদর্য্য। এখানে বলা ভাল, যাহা হাজার বছর পূর্ব্বেকার কথা, তাহাই কিছু সেকেলে হইতে বাধ্য নহে। একখানা জীর্ণ পুঁথিতেও সত্য বাণী চির উজ্জ্বল হইয়া থাকিতে পারে, আবার অতি মাত্রায় আন্‌কোরা ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে বইয়ের পাতায় যে কথা থাকে, তাহাও পদ্মপত্রের জলের মতই ক্ষণস্থায়ী, মিথ্যা হইতে পারে। বাংলার তরুণকে আজ বিশেষ করিয়াই এ কথাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। যাহা ইউরোপের তাহাই কিছু পরম সত্য নয়, আর যাহা আমাদের এই দেশের তাহাই কিছু দারুণ মিথ্যা হইতে বাধ্য নহে। দেশকালের অতীত সত্য যেমন আছে, দেশ ও কালের পক্ষে বিচিত্র সত্যও তেমনি আছে। ইউরোপের যাহা সমস্যা আমার সমস্যা সত্যই তাহা কিনা, তাহাও দেশ কালের দিক দিয়া আমাকে বিচার করিতে হইবে। ইউরোপের মাটিতে যাহা গজাইয়াছে আমার এ মাটিতে যদি তাহা না গজায়, তবে, আমার এই মাটির মল্লিকা মালতীকে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া অমনি বিলাতী 'হাস্নু-হানা' সেখানে পুঁতিতে হইবে, অন্যথায় আমার এ মাটি আর কোন কাজেই লাগিবে না, এমনই বা কি কথা আছে? তবে মাটিতে যতই বৈচিত্র্য থাকুক, মাটির রস-ধারায় পুষ্ট হইয়া যদি ইউরোপের গাছ বাঁচে, তবে আমাকেও ঐ মাটির রস-ধারা হইতেই আপনার লালনের রস সংগ্রহ করিতে হইবে, কোন বিশিষ্টতার মোহেও জীবনের এই পরম সঙ্গতিকে অবহেলা করা চলিবে না। ইউরোপ মৃত্তিকার রস খাইয়া বাঁচে, আমি কাঁকর খাইয়া আমার বিশিষ্টতা রক্ষা করিব, এত বড় মিথ্যা উক্তিকে দেশকালের সাধ্য নাই সত্য করিয়া তোলে।

বলিয়াছি, প্রাচীন যাহা তাহাই মিথ্যা নহে। তবে প্রাচীনকে যুগে যুগে নূতনের কষ্টিপাথরের পরীক্ষার মধ্য দিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়, নূতনরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে হয়। সূর্য্য প্রাচীন, কিন্তু মিথ্যা তো নহে। তবে নূতন রূপে তাহাকে আত্মপ্রকাশ করিয়া যুগ-যাত্রার যাত্রী হইতে হইয়াছে—অতীতের বস্তুটি হইয়া পড়িবার উপায় নাই।

বাংলার তরুণের কাছে সেদিনের ইউরোপ ও নূতন ইউরোপ যদি তাহার বাণী লইয়া আসিয়া তাহাকে নিজ সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাহীন করিয়া ফেলিতে চাহে, তবে ইউরোপের বাণীকে চরমরূপে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তরুণ বাংলাকে বিশ বার করিয়া নিজের সভ্যতার বিচার, বিশ্লেষণ করিতে হইবে। তরুণ বাংলা যদি আত্মবিস্মৃত হয়, আত্মপ্রতিষ্ঠা তাহার দ্বারা হইবে না। নিজের গলদ যে জানে না, জানিতে চাহে না, সে যেমন মরণকেই আগ বাড়াইয়া আনে, নিজের সম্পদের সংবাদ যে রাখে না, রাখিতে চাহে না, তাহার মত কৃপার পাত্র আর কে? জাতীয় মৃত্যু তো তাহার আরম্ভ হইয়াছে। তরুণ বাংলাকে তাই আজ দাসত্বের মোহ কাটাইয়া ঘরের ও বাহিরের যথার্থ রূপকে চিনিতে হইবে, পাওনা দেনা মিটাইতে হইবে, সত্য-মিথ্যা যাচাই করিতে হইবে, সম্পদ-বিপদ বুঝিতে হইবে, বাঁচা-মরার, ভাল-মন্দের কথা হিসাব করিতে হইবে; একদেশদর্শিতার অন্ধতা মানুষকে জাতীয় জীবনের পরম সম্পদের সন্ধান দিতে পারে না, এই কথা জানিয়া ঘরের ও বাহিরের ব্যাপারে দাস-বুদ্ধি বর্জ্জন করিতে হইবে। এই মনোবৃত্তির সাধনাই জাতীয় শক্তিসাধনার প্রথম স্তর,—প্রধানও বটে।

আর একটা কথা তরুণ বাংলাকে বুঝিতে হইবে। যাহাকে অনেকে জড়বাদী ইউরোপ বলে, সে ইউরোপ কেবল জড়বাদের উপাসনা করে নাই, ধ্বংসের হাতিয়ারই কেবল গড়ে নাই, সৃজনের—অমৃতের সন্ধানও সেখানে আছে। যে ইউরোপ 'নোবেল প্রাইজ' সৃষ্টি করে তাহা গণনায় আনিব না, এমন অন্ধ হইলে তরুণ বাংলার

চলিবে না। এদিকে তেমনি আজিকার ভারতের দৈন্তকেই বড় করিয়া দেখিব, আর ভারতের উপনিষৎ, দর্শন, সংহিতা, অর্থশাস্ত্র, শ্রীকৃষ্ণ, পার্থ, বুদ্ধ, চৈতন্ত, চাণক্য, চন্দ্রগুপ্ত ও চার্ব্বাক সবই ভুলিয়া যাইব, ভারতে মরণের কথাই শুধু আছে, জীবনের কথা নাই—এমন মিথ্যা ধারণাকে অবলম্বন করিয়াও তো তরুণ বাংলার চলিবে না। অতীত ভারতের সত্য ও সম্পদকে বাদ দিয়া বর্ত্তমান ভারতকে যে বুঝিতে চাহে, তেমন অন্ধের দ্বারা ভবিষ্যৎ ভারতের রূপ দর্শন সম্ভব নহে। 'অতীত ভারত' 'বর্ত্তমান ভারতে' কেমন করিয়া আসিল, ইহার সকলখানি দিক ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেই, বুঝিব, বর্ত্তমানের কোন্ ত্রুটি-বিচ্যুতি, কোন্ মিথ্যা ও অজ্ঞতাকে দূর করিলে, কোন্ সম্পদ শক্তি, কোন্ সত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করিলে ভবিষ্যৎ ভারতকে গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে।

তুমি দীন আমি ধনী। সুতরাং আমার মত জীবন যাপন কর, বলিলেই দীন অমনি কিছু ধনী হইবে না; দীনের পথে কোন্ অন্তরায় কেমন করিয়া এবং কেন দাঁড়াইয়া আছে, সেই তথ্য না জানিলে মাত্র ধনীর জীবনের অনুকরণে দীনের ধনী হওয়া সম্ভব হয় না। তার পর, একজন যে-পথে ধনী হইয়াছে, আর একজনের সে পথে ধনী হওয়া সম্ভব না হইতে পারে, যদি না এই আর একজনের বাধাবিঘ্ন, পারিপার্শ্বিক অবস্থান, স্বতন্ত্র সত্তা ঐ একজনেরই অনুরূপ হয়। কাজেই পাশ্চাত্যের ঐশ্বর্য্য, সুখ-সম্ভোগ বা নূতনত্বের প্রতি লুব্ধতামাত্র দ্বারাই আমাদের দুঃখ-দৈন্যের সমস্যার সমাধান হইবে না, তার পরেরও যাহা জ্ঞাতব্য ও করণীয় তাহা জানিতে হইবে, করিতে হইবে।

বলিয়াছি পাশ্চাত্যের কোন কথা আধুনিক বলিয়াই তাহা অপাংক্তেয় নহে; সত্য কথা অনেকই আধুনিক রূপেই দেখা দেয়।—সত্য আধুনিক হইলেও তাহাকে গ্রহণ করিবার মত তাজা মন যেন তরুণ বাংলার থাকে। তবে পরবশ জাতির সহজ ও সুলভ প্রকৃতিই না কি ঘরের ঠাকুরকে তুচ্ছ করিয়া পরের কুকুরকে বড় করিয়া দেখা,—তাই তরুণকে সাবধান হইতে হইবে। 'এই মনোবৃত্তিই কখনো তাহাকে পরের ভক্ত করে, কখনো বা তাহাকে ঘরের আবর্জ্জনার প্রতিও গোঁড়া করিয়া তোলে, এই দাসত্বেরই একদিকে ঘরের ঠাকুরকে তুচ্ছ করিয়া পরের কুকুরকে বড় করিয়া দেখায়, আবার এক দিকে পরের ঠাকুরকে তুচ্ছ করিয়া ঘরের কুকুরকে মাথায় করিয়া রাখিতে দুর্ব্বুদ্ধি যোগায়। যে শুভ বুদ্ধি, স্বাধীন বুদ্ধি ঘরের ও পরের ঠাকুরকে ঠাকুর আর কুকুরকে কুকুর বলিয়াই চিনিয়া লইতে পারে, তরুণ বাংলা যেন সেই শুভ ও স্বাধীন বুদ্ধি দ্বারাই প্রবুদ্ধ হয়। এই শুভ ও স্বাধীন বুদ্ধি দ্বারাই বাংলার তরুণকে এ যুগের বহু সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে। এই সাম্যবাদের কথাই একটু তোলা যাক্। সাম্য চাই। কিন্তু মানুষ সমান, এ অনুভূতি মানুষ কোথা হইতে পাইবে? Men are equally born এ কথার ভিত্তি একেবারেই কাঁচা, কারণ born মানুষ নিশ্চিতই unequal—তাহা আমরা জানি। অথচ সমাজের সকলে সমান, এই অনুভূতি মানুষের চাই। সমাজের ব্যষ্টির মধ্যে বৈচিত্র্য আছে এ যেমন সত্য, মূলতঃ সমাজের প্রত্যেকের মধ্যেই একটা সাম্য আছে, একত্ব আছে ইহাও তেমনি সত্য; আর তাহা আছে বলিয়াই সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছে। সমাজের মূলে সেই যে সাম্যের চেতনা আছে, community consciousness আছে, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই সমাজের সাম্যবাদ ক্রমে গড়িয়া উঠিতে পারে। কিন্তু সাম্যসিদ্ধির পক্ষে যে দার্শনিক অনুভূতির প্রয়োজন তাহা ইউরোপ আমেরিকার সামাজিক গোষ্ঠিচেতনার মধ্যেই সম্ভব অথবা আমাদের মধ্যে সম্ভব, সে কথাও তরুণ বাংলাকেই আজ ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এ-দেশের দার্শনিক অনুভূতির মধ্যে সাম্যের সন্ধান নাই; কিন্তু এই সমাজে যদি অ-সাম্য বড় হইয়া উঠিয়া থাকে তবে আজ খোঁজ নিতে হইবে, দার্শনিক অনুভূতি এমন অন্ধ হইয়া সমাজে ব্যর্থ হইল কেন? ধন-

সাম্যই সাম্যবাদের চরম কথা নহে, মানুষ যে সমান, এ সত্য কেবল ধন-সমতার মধ্য দিয়াই সাব্যস্ত করা যাইবে না, আরও কিছু চাই। সেই কিছু সমাজ-তন্ত্রবাদের বা সমানাধিকারবাদের চরম কথায়ও যদি আজ প্রকাশ না পাইয়া থাকে, ইউরোপ ও ভারতের সম্মিলিত, সামঞ্জসীভূত পরম সত্যের বাণীর মধ্য দিয়া তরুণ বাংলাই একদিন তাহা প্রকাশ করিবে, এই বিশ্বাস আমাদের আছে। *

* আর্য্য সাহিত্য-ভবন কর্ত্তৃক যন্ত্রস্থ 'তরুণ বাংলা' হইতে গৃহীত।

বেদনাময়ী

শ্রী সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বনারীর ব্যথা বুকে নিয়ে নারী,
বিজন পথের আলোক অন্ধকারে,
যা'র সন্ধানে ফের তারে বলিহারি'
তোমারে অনাথা করিয়াছে সংসারে

আপনার মনে গাঁথিয়া ফুলের মালা
গন্ধে বিভোর নব ফাল্গুন-বনে,
কাঁটা বেছে তুমি বুকে নিলে তার জ্বালা,
নয়নের জলে পূজিলে পরাণ-ধনে।

প্রাণ ঢেলে দিলে প্রেম দিলে অকাতরে
অপরূপ রূপ-লাবণ্য-উপচার
হৃদয় নিঙাড়ি' রচি' অনুরাগ ভরে
দয়িত পূজার আরতির দীপাধার।

জ্বালাইলে তুমি মঙ্গল উষাকালে,
দিবস অন্তে সুখময়ী সন্ধ্যায়,

আলোক তাহার ঠিকরিয়া পড়ে ভালে
চরণ ধরিতে সব তনুমন ধায়।

ধূপ সম দহি' গন্ধ বিলালে যা'রে
ধোঁয়ার আড়ালে সতত কম্পমান,
দুখের বাসরে বুকের আড়ালে তারে
আগুর ছানিয়া করালে অমৃত পান,—

তারি তরে তুমি ফিরিতেছ দ্বারে দ্বারে
পথের ধূলায় ধূসর সকল দেহ,
ব্যথিত বক্ষে কর হানি বারে বারে
বাহিরিলে পথে খুঁজিতে তাহারি গেহ ?

হায়রে কপাল ঝরিল সন্ধ্যামণি,
বৃথা ফোটা তার, ব্যর্থ সে পরিমল ;
ফাগুন কাটিল দখিনার দিন গণি
হাসি দিয়ে তুমি কিনিলে চোখের জল !

দেবতার ধ্যানে কারে ধ্যান কর দেবী,
সাজি ভরা ফুলে কার হাসি ভরি ওঠে ?
চিরজীবনের ব্যথার দেবতা সেবি'
মরমে তোমার রক্ত-করবী ফোটে !

রূপের অভিশাপ

—পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর—

শ্রী নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

১৪

কাশিমের বিধবা হইয়া পরীর পক্ষে হাঁটিয়া ভাইয়ের বাড়ী যাওয়া অসম্ভব, অথচ পাল্কীতে যাইবার পয়সা তার এখন নাই, কাজেই পরী চলিয়াছিল ডুলিতে চড়িয়া। ছোট্ট ডুলিখানা, কোনওমতে কায়ক্লেশে একজন বসিতে পারে, তার মধ্যে কোনও মতে আপনাকে গুঁজিয়া বসিয়াছিল পরী, তাকে একখানা পুরু কাপড় দিয়া চারিদিক ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

পরী তন্ময় হইয়া ভাবিতেছিল সেদিনকার সকল ঘটনার কথা। কেমন করিয়া হুড়মুড় করিয়া কাণ্ডটা ঘটিয়া গেল, তা ভাবিয়া দেখিবার অবসর তখন পায় নাই। এখন সে যতই ভাবিতে লাগিল ততই ভয় ও অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। ইহার শেষ যে কোথায় হইবে তা ভাবিয়া সে কূল কিনারা পাইল না।

অনেকক্ষণ পর পরীর হঠাৎ হুঁস হইল যে সে বহুক্ষণ হইল ডুলি চড়িয়াছে, তার ভাইয়ের বাড়ী যাইতে এতক্ষণ সময় লাগিবার কথা নয়। সে কাপড়ের এক পাশে একটু ফাঁক করিয়া দেখিল—দেখিয়া অবাক হইল যে সে গ্রাম ছাড়িয়া অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে।

ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পরী তার ভাইকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল তাহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে।

সে বলিল, রসুল বাড়ীতে নাই কুসুমদিয়া গিয়াছিল, সেখানে গিয়া অসুখে পড়িয়াছে, সেখানেই পরীকে যাইতে হইবে।

পরী বলিল, "কুসুমদিয়া! তা তো আমারে কস্ নাই? তা কাইনলে আমি আইতাম না।"

"কিন্তু তুমি তো জিগাও নাই যে ক'নে যাওন্ লাইগবো।"

"জিগামু কি? ভাইর জ্বর হইছে দেইখবার যামু, তা সে যে ঘরে নাই তা কেম্‌তে জানুম? যা' আমার গিয়া কাম নাই, ঘরে ফিরা চল্।"

"হ' এত রাস্তা আইয়া পরছি—ওই তো সুমকে কুসুমদিয়া। এহনে ফিরব্যা কিয়্যারে?"

পরী জেদ করিল ফিরিতে হইবে। রহিম সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া পথ চলিতে লাগিল। পরীর কণ্ঠ ক্রমে উত্তেজিত হইয়া চড়িতে লাগিল, রহিম তাতে ভগ্নীকে ধম্‌কাইল। শেষে শাসাইল যে গোলমাল করিলে বিপত্তি হইবে।

পরী তখন ভয়ে দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিল। সে চীৎকার করিয়া গলা ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল ও ভাইকে গালাগালি দিতে লাগিল। শূণ্য মাঠের মাঝখানে অসহায় নারীর সে আর্ত্ত ক্রন্দন কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিল না।

কিছুক্ষণ পর একটা বড় বাড়ীর আঙ্গিনায় আসিয়া ডুলি নামিল। তখন পরী কাঠ হইয়া ডুলির ভিতর বসিয়া রহিল, নামিতে চাহিল না। তার স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল যে রসুলের অসুখটা একটা ছল; তাকে রহিম কোনও দুরভিসন্ধি পূর্ণ করিবার জন্য এ বাড়ীতে আনিয়াছে। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ জানিয়াও পরী চুপ করিয়া শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল।

ফকীর তখন আসিয়া পরীকে বুঝাইল যে তাকে মিথ্যা ছল করিয়া আনা হইয়াছে সত্য কিন্তু সে কেবল

পরীর নিজের মঙ্গলের জন্য। এমনি করিয়া তাহাকে না আনিলে আজ তার সমূহ বিপদ ছিল।

ফকীর বাকপটু, কথাটা যেমন করিয়া গুছাইয়া বলিল তাতে পরীর একটু বিশ্বাস হইল। অনেক প্রশ্নোত্তরের পর শেষে পরী নামিল। ফকীর বলিল যে সম্পূর্ণ নিরিবিলিতে না হইলে সব কথা খুলিয়া বলা যায় না, ঘরের ভিতর না গেলে প্রকৃত অবস্থা সে পরীকে জানাইতে পারিবে না।

ভয়ে বিস্ময়ে কৌতূহলে পরী কম্পিত পদে নামিয়া পড়িল। ফকীর ও রসুল তাকে লইয়া একটা ঘরের ভিতর গেল। এ বাড়ী ও ঘর পরীর সম্পূর্ণ অপরিচিত।

ঘরে গিয়া ফকীর পরীকে জানাইল যে লতিফ ফিরিয়া আসিয়াছে।

পরী বলিল যে সে-সংবাদ সে অবগত আছে।

ফকীর বলিল, লতিফ একেবারে পাগল হইয়া গিয়াছে।

চমকিত হইয়া পরী মাথা খাড়া করিয়া বলিল, "কও কি? আমি না এক দণ্ড আগে তার সাথে কথা কইছি।"

ফকীর তখন জিজ্ঞাসা করিল, কি কথা তাদের হইয়াছে?

পরী সব কথা খুলিয়া ফকীরকে বলিতে সঙ্কুচিত হইল। সে সংক্ষেপে বলিল, "সে কইল যে সে আমারে নিকা কইরব্যার চায়।"

ফকীর রসুলের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কইছি না?"—রসুল ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল—। ফকীর বলিল, "কথা ওয়াই। তরে নিকা করনের লিগ্যাই ও খেইপ্যা উঠছে। এমনে কথা কয় দিব্য, কিন্তু—এক্কিবারে পাগল হইয়া গিছে! তা তুই কি কইচস্ তারে?"

পরী বলিল, "আমি কিচ্ছু কই নাই তারে।"

ফকীরের বুঝিতে কষ্ট হইল না যে এ বিষয়ে পরী মিথ্যা বলিতেছে। সে আর একটু চাপিয়া ধরিতেই পরীকে শেষে বলিতে হইল, "তা আমি কি করুম কও, একা মানুষ বাড়ীতে আছিলাম—কি করি—কইলাম তা হইবার পারে।"

ফকীর বলিল, "তেই তো কাম সারচস্, এখন তো তারে ঠেকান দায়।" তারপর খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সে রসুলকে জিজ্ঞাসা করিল, "তা এহন কি করন যায় কও চে রসুল?"

রসুল বিজ্ঞের মত নানারকম অঙ্গভঙ্গী করিয়া জানাইল যে এ সমস্যা তার পক্ষে অসমাধেয়।

ফকীর তখন বলিল, "এমনি একটা হইবো ভাইব্যাই আমি তরে আইনবার পাঠাইছিলাম। জানস্ই তো লতিফ আমার কত বড় দোস্ত। সে আইজ আমার বাড়ী আইতেই আমি তারে আদর কইরা বইবার কইল্যাম—আর সে ভাইর‍্যার ভাইর‍্যা না কইরলো কি, আমারে ধইর‍্যা ফালাইয়া এই মাইর। আর বিড়্ বিড়্ কইর‍্যা বইকবার লাগলো। আমি বুইঝল্যাম ইতো এক্কিবারে পাগল হইয়া গিছে গা। আমি উইঠ্যা ছুইট্টা পলাইলাম। সে সেইখানে দাড়াইয়া হাসতে লাগলো কান্দতে লাগলো—শেষে চীক্কুর দিয়া কইলো কি—আমি পরীরে নিকা করুম—সাদী নি কইর‍্যা হালীরে আমি গলা টিপ্যা মারুম—হালী যে গেছিল কাসিমরে সাদী কইরব্যার।"

পরী শিহরিয়া উঠিল। এখন তার মনে হইল যে কথাটা বোধ হয় মিথ্যা নয়। লতিফের রকম-সকম ও তার চেহারা খুব বেশী অস্বাভাবিক বলিয়াই তার মনে হইয়াছিল। এ সব কথা শুনিয়া তার বোধ হইল সে সত্য সত্যই পাগল হইয়াছে—আর তার খেয়াল হইয়াছে যে পরীকে বিবাহ করিয়া সে তারপর তাকে খুন করিবে। ভাবিতে তার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। সে কোনও কথা বলিতে পারিল না, কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া ফকীরের দিকে চাহিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ গম্ভীরভাবে ভাবিয়া লতিফ বলিল, "এহনে ইয়ার উপায় করন যায় কি?"

বলা বাহুল্য, পরী বা রসুল ইহার কোনও উপায় বলিতে পারিল না—এবং তারা যে সত্য সত্যই কোনও উপায় বলিবে এরূপ কোনও কল্পনা বা অভিসন্ধি ফকীরের মনের আশে পাশে কোথাও ছিল না। বিশেষত উপায় ফকীরের স্থির করাই ছিল এবং লতিফের কাছে প্রহার খাইবার পর উপায় স্থির করিয়াই সে এতখানি করিয়াছিল।

সে তখনি গিয়া রসুলকে তার মনগড়া একটা বৃত্তান্ত জানাইয়া তাকে ষড়যন্ত্রের মধ্যে টানিয়া লইয়াছিল। রসুলের অসুখ করিয়াছে এই মিথ্যা অছিলায় পরীকে ভুলাইয়া আনিতে হইবে ইহা স্থির হইল। কিন্তু তাকে লইয়ে কোথায়? রসুলের এ বিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিয়াছিল অলি বেপারী, তাই সে বলিল যে আপাতত অলি বেপারীর বাড়ীতে লইয়া গেলেই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হওয়া যায়। রসুলের এ চালটার তাৎপর্য্য ফকীর বুঝিল না। এ কথাও প্রথমে তার মনঃপূত হইল না। অলি বেপারীর কাছে পরীকে লইয়া হাজির করিলে পরীকে তার নিজের পাওয়া যে অসম্ভব হইবে তাহা অনুমান করিয়া সে এ প্রস্তাব নামঞ্জুর করিল। কিন্তু রসুল বুঝাইল যে আপাতত অলিকে বিবাহের আশা দিয়া দলে টানিলে তার সাহায্যে লতিফকে পরাস্ত করা যাইবে, তারপর অলিকে ফাঁকী দেওয়া যাইতে পারে। অন্ত কোনও শ্রেষ্ঠ উপায় কল্পনা করিতে না পারিয়া ফকীর অবশেষে এই পরামর্শই গ্রহণ করিল।

তারপর ডুলির সঙ্গে রহিমকে পাঠাইয়া রসুল ও ফকীর কুসুমদিয়ায় অলি বেপারীর কাছে গিয়া তাকে বুঝাইল। পরীকে লাভ করিবার আশু সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া অলি ফকীরের সমগ্র প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়াছিল, এবং তাহারই পরামর্শে আপাতত গা-ঢাকা দিয়া ছিল।

রসুল অনেকক্ষণ পর বলিল যে যদি পরীর একটা নিকা অবিলম্বে ঘটাইয়া দেওয়া যায় তবে এ বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় হয়।

এ প্রস্তাব শুনিয়াই পরী খুব জোর করিয়া বলিল, "না আমি নিকা বসুম না।"

পরীর মনের ভাবের আভাস পাইয়া ফকীর তখন চট্ করিয়া বলিল যে ইহা মোটেই সৎ পরামর্শ নয়। কেন না নিকা হইলেই যে পাগলের হাতে তারা রক্ষা পাইবে তার কোনও সম্ভাবনা নাই।

এ কথা শুনিয়া পরীর মনে যে একটু সন্দেহের ছায়া ছিল তাহা মিলাইয়া গেল—সে ফকীরকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিল।

রসুল তার পর বলিল যে লতিফকে পাগল বলিয়া পুলিশে ধরাইয়া দিলে সুব্যবস্থা হইতে পারে।

ইহা "পোলাপানের কথা" বলিয়া ফকীর উড়াইয়া দিল; পুলিশ পাগলকে ধরে না বলিয়া প্রকাশ করিল।

এমনি করিয়া অনেকক্ষণ গবেষণা ও আলোচনার অভিনয় করিয়া শেষে ফকীর তার অভিসন্ধি প্রকাশ করিল। সে বলিল যে এ অবস্থায় একমাত্র উপায় অবিলম্বে মহকুমায় গিয়া লতিফের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করান। হয় তো গ্রেপ্তার হইয়া কিছুদিন হাজতে থাকিলে ফকীরের মাথার ব্যয়রাম সারিয়া যাইতে পারে। তখন মোকদ্দমা উঠাইয়া লইলে চলিবে। আর যদি লতিফ না সারিয়া উঠে তবেও তার ইহাতে সাজা হইবে না, পাগল বলিয়া সে পাগলা গারদে আবদ্ধ থাকিবে মাত্র।

ফকীর অনুমান করিয়াছিল যে পরী লতিফের অনুকূল এবং সে, ভয়ে নয়, স্বেচ্ছায়ই লতিফের সঙ্গে বিবাহে সম্মতি দিয়াছে। সুতরাং লতিফের পক্ষে হানিকর কোনও প্রস্তাব করিলে পরীর চট্ করিয়া বাঁকিয়া বসা বিচিত্র নহে। তাই সে লতিফের পরম বন্ধু সাজিয়া এই রূপ প্রস্তাব করিল এবং বুঝাইল যে লতিফের কোনও অনিষ্ট হয় বা পরী লতিফ ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করে তাহা তার অভিপ্রেত নয়।

ফকীরের এ কূটবুদ্ধি পূর্ণ মাত্রায় সফল হইল। পরী

তার চক্রান্ত ভেদ করিতে পারিল না। প্রথমে সে ফকীরের প্রস্তাবে ভয় পাইয়া অসম্মতি প্রকাশ করিলেও, ফকীর যখন বিস্তারিত করিয়া তার প্রস্তাবের হিতকারিতা এবং অন্য কোনও পন্থার নিশ্চিত অপকারিতা তাকে বুঝাইয়া দিল তখন সে বাধ্য হইয়া স্বীকৃত হইল।

কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফকীর ও রসুল পরীকে ডুলিতে চড়াইয়া অদূরবর্ত্তী মহকুমায় যাত্রা করিল। পাছে পরী হাতছাড়া হইয়া যায় এই আশঙ্কা করিয়া অলি বেপারী পথে পরীর রক্ষার্থ কয়েকজন বলিষ্ঠ সর্দ্দার তাদের সঙ্গে দিল। খরচার জন্য কিছু টাকা অলির নিকট আদায় করিতেও তাদের বেগ পাইতে হইল না। কিন্তু এ ব্যাপারের সঙ্গে অলির কোনও সংস্রব আছে পরী তাহা জানিতে পারিল না।

যখন তাহারা মহকুমায় গিয়া পৌছিল তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। শেষ কাছারীতে মোক্তার পরীর দরখাস্ত পেশ করিলেন, পরীর জবানবন্দী গ্রহণ করা হইল—হাকিম তাকে অনেক রকম প্রশ্ন করিলেন, এবং পরিশেষে সমস্ত শুনিয়া লতিফের বিরুদ্ধে শান্তিরক্ষার জন্য ১০৭ ধারা মতে একটা সমন দিলেন।

ফকীর ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। ১০৭ ধারার মোকদ্দমায় লতিফকে হাজতে রাখা বা কয়েদ রাখা সম্ভব হইবে না, কেন না লতিফ এখন সম্পন্ন, তার পক্ষে জামিন মুচলেকা দেওয়া কঠিন নয়। একটা সঙ্গীন ফৌজদারী মোকদ্দমা না বাঁধাইতে পারিলে লতিফকে আটকান দায়।

তা ছাড়া এখন ফকীরের আর একটা চিন্তা হইল। অলি তাহাদের সঙ্গে যে সর্দ্দারগুলি দিয়াছিল তাহারা সঙ্গেই ছিল। তাহারা এখন পরীকে অলির বাড়ীতেই ফিরাইয়া লইবে, ফকীর বা রসুলের সাধ্য হইবে না যে তাদের ইচ্ছায় কোনও বাধা দেয়। ইহাও ফকীরের অভিপ্রেত ছিল না। আজ রাত্রে যদি অলি ইহাকে নিজের বাড়ীতে পায় তবে কাল প্রত্যূষের পূর্ব্বে নিকা সমাধা না করিয়া ছাড়িয়া দিবে না ইহা নিশ্চয়। তাহাতে বাধা দিবার শক্তি ফকীরের হইবে না।

আর যদি বা কোনও ক্রমে অলির বাড়ীতে না যাওয়া সম্ভবপর হয় তবু পরীকে লইয়া সে নিরাপদে রাখিবে কোথায়? গ্রামে ফিরিয়া গেলে আজ রাত্রে লতিফকে ঠেকান দায় হইবে।

এই সব নানা কথা ফকীর মোক্তারবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ঘণ্টা খানেক পরে হাকিমের কাছে আর এক দরখাস্ত লইয়া উপস্থিত হইল। দরখাস্তের মর্ম্ম এই যে তাহাদের বাড়ী ফিরিতে সন্ধ্যা হইবে, পথে লতিফ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরীকে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে পারে। তাহা ছাড়া মোকদ্দমার বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত অসহায়া বিধবার পক্ষে গ্রামে বাস করা নিরাপদ নহে। অতএব হাকিমের কাছে প্রার্থনা করা হইল যে থানা হইতে তাহাদিগকে চারজন কনষ্টেবল দিয়া পরীকে তার বাড়ী পৌছাইয়া দিতে এবং পরীর বাড়ী পাহারা দিবার আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়।

হাকিম থানার ইনস্পেক্টারের উপর আদেশ দিলেন যে ইহাদের সঙ্গে একজন কনষ্টেবল দেওয়া হউক এবং প্রেসিডেণ্টকে আদেশ দিলেন যে গ্রামের চৌকীদার দ্বারা পরীর বাড়ী পাহারা দিবার বন্দোবস্ত করা হউক।

উর্দ্দীপরা কনষ্টেবল সঙ্গে থাকিতে অলির সর্দ্দারেরা আর কোনও উৎপাত করিতে পারিবে না ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া উৎফুল্ল অন্তরে ফকীর পরীকে লইয়া গ্রামে চলিল।

পথের মাঝখানে লতিফ আসিয়া পরীকে ছিনাইয়া লইতে পারে এ আশঙ্কার কথা ছিল সম্পূর্ণ কাল্পনিক। ফকীর এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনে করে নাই যে পথে কোথাও লতিফের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। লতিফ যে আজ রাত্রি পরীর বাড়ীতে বিবাহ-উৎসবের আয়োজন করিয়াছে এবং সেখানেই সে থাকিবে এ কথাও ফকীরের জানা ছিল না। কাজেই ফকীর লতিফ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্নই ছিল।

পরী জানিত না যে এখন তাকে কোথায় লইয়া যাওয়া হইতেছে। সে মোটেই নিরুদ্বিগ্ন ছিল না, ডুলির ভিতর বসিয়া সে মহাশঙ্কিত চিত্তে আজকার সমস্ত দিনকার ব্যাপার মনে মনে আলোচনা করিতেছিল ও নানারূপ সম্ভব ও অসম্ভব আশঙ্কায় তার চিত্ত উদ্বেলিত হইতেছিল।

গ্রামের কাছাকাছি একটা খেয়াঘাটে ডুলি নামাইলে পরী সে স্থান চিনিয়া রসুলকে জিজ্ঞাসা করিল, এখন কোথায় যাওয়া হইবে?

তার নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া হইবে শুনিয়া পরী শঙ্কিত হইয়া বলিল, "কস্ কি? সে যে সেখানেই আছে আইজ। ডাক্ মুন্সীরে।"

ফকীর কাছে আসিলে পরী জানাইল যে তার বাড়ীতে যাওয়া কিছুতেই হইতে পারে না, কেন না লতিফ সেখানে আছে।

ফকীর আকাশ হইতে পড়িল। সে বলিল, "লতিফ সেখানে? ক্যান? সে কি করে সেখানে?"

পরীর তখন বলিতে হইল যে আজ রাত্রে মোল্লার সম্মুখে তাদের নিকা হইবার কথা আছে এবং সেজন্য খাওয়া দাওয়া হইবে। লতিফ তার আয়োজন করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে।

ফকীরের চক্ষু স্থির হইয়া গেল। সারাদিন এত কষ্ট করিয়া এবং এত বুদ্ধি খাটাইয়া অবশেষে সে তবে পরীকে তার বিবাহ-বাসরে লইয়া চলিয়াছে! তার কোনও সন্দেহ রহিল না যে পরী যদি আজ রাত্রে তার বাড়ীতে যায় তবে ফকীরের সযত্নরচিত প্রাসাদ ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। লতিফকে পাগল বানাইয়া ফকীর পরীর মন ফিরাইয়াছে—বাড়ী ফিরিয়া গেলে এখনই সে সমস্ত কথা বুঝিতে পারিবে। বিশেষত সমস্ত গ্রামবাসী এখন সেখানে উপস্থিত—তাদের কাছে এ রচা কথা এক মুহূর্তও টিঁকিবার সম্ভাবনা নাই। পরী যদি একবার জানিতে পারে যে লতিফের ক্ষেপিয়া যাওয়ার কথা মিথ্যা এবং ফকীর এই মিথ্যার জাল রচনা করিয়া তাকে জড়াইয়াছে তবে সে অবিলম্বে লতিফের কণ্ঠলগ্ন হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ফকীর পরীর উপর ভয়ানক চটিয়া গেল। মেয়েমানুষের উপর বিশ্বাস করিয়া যে কাজ করে সে মূর্খ—একথা পরী এতক্ষণ পেটের মধ্যে গুঁজিয়া রাখিয়া কি ঘোর অনিষ্ট করিয়াছে—ইত্যাদি নানা প্রকার অভিযোগ ও তার উত্তর প্রত্যুত্তরে কথা বাড়িয়া গেল, ফকীরের বুদ্ধি গুলাইয়া গেল, সময় বহিয়া গেল।

ফকীর শেষে প্রস্তাব করিল যে এখানে না গিয়া ভিন্ন গ্রামে—কুসুমদিয়ায় যাইবে। কনেষ্টবল পরীর সঙ্গে ফকীরের বাগবিতণ্ডা শুনিয়া বেশ ওয়াকিবহাল হইয়াছিল—সে ঘাড় নাড়িল, বলিল, তার উপর হুকুম এ ঔরতকে তার বাড়ীতে পৌঁছাইবার, সে অন্য কোথাও যাইতে পারে না। ফকীর ইহার উত্তরে ইহার অমোঘ ঔষধ রৌপ্যখণ্ড না ছাড়িয়া কনেষ্টবলের সঙ্গে তর্ক জুড়িয়া দিল—তার মেজাজটা বড় চড়িয়া গিয়াছিল।

খেয়া নৌকা অপর পার হইতে ধীরে ধীরে আসিয়া তীরে লাগিল। তখন ডুলি নৌকায় উঠান হইবে কি হইবে না ইহা লইয়া ফকীর ও কনেষ্টবলের মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছে। মাঝি তাড়া দিতে লাগিল। সময় বহিতে লাগিল। কনেষ্টবল রীতিমত উত্তেজিত হইয়া হুকুম করিল, হাকিমের আদেশ ডুলি নৌকায় উঠাইতে হইবে।

পরী ডুলি হইতে বাহির হইয়া দাঁড়াইল—সে জোর গলায় বলিল, "আমি নায় উঠুম না

ঠিক সেই সময় তিন চার জন পারের যাত্রী দূর হইতে ঘাটমাঝিকে সাড়া দিতে দিতে ছুটিয়া আসিল। সবার আগে যে আসিল সে পরীর কথা শুনিয়া কৌতূহলী হইয়া অগ্রসর হইল। পরীর পাশে লণ্ঠন হাতে রসুল দাঁড়াইয়া ছিল, আগন্তুক লণ্ঠনটা তার হাত হইতে লইয়া তুলিয়া ধরিল।

"পরী! রসুল! তরা ইখানে?—ফকীর—বেইমানের

বাচ্ছা, শয়তান, দুষমণ!" বলিয়া লতিফ লাঠি বাগাইয়া ফকীরকে এক ঘা লাগাইল।

ঘা খাইবার পূর্ব্বে ফকীর একবার চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল, "কনেষ্টবল এই আসামী!"

কনেষ্টবল হাত তুলিয়া বলিল, "সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের দোহাই, থাম।"

লতিফ পাগলের মত লাঠিটা ঘুরাইয়া কনেষ্টবলের মাথায় লাগাইল, তার পাগড়ী মাটিতে গড়াইয়া পড়িল।

পরী চীৎকার করিয়া ছুটিয়া পাটনীর ঘরে লুকাইল, লতিফ সেদিকে ছুটিয়া যাইতে পাটনীর লোক তাকে ধরিয়া ফেলিল।

লতিফের সঙ্গে যারা আসিয়াছিল তারা তার উদ্ধারের চেষ্টা করিল। আর কিছুক্ষণ মারপিট চলিল, তারপর তাহারা চারজন গ্রেপ্তার হইয়া কনেষ্টবলের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের গৃহে গেল। ফকীর তার ভাঙ্গা হাত ও ফাটা মাথা কোনও মতে সামলাইয়া পরীর ডুলিতে চড়িয়া তার বাড়ীতে গেল।

বিবাহের ভোজের বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ করিয়া লতিফ প্রথমে সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়া সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া অছির মোল্লার সন্ধানে গ্রামান্তর গিয়াছিল। অছির মোল্লা বাড়ী ছিল না, দূরবর্ত্তী একটা গ্রামে হাট করিতে গিয়াছিল, তার ফিরিতে অনেক বিলম্ব হইল। তখন লতিফ আর দুই একটা গ্রাম ঘুরিয়া তার দুই চারিটি কুটুম্বকে নিমন্ত্রণ করিয়া সন্ধ্যায় সময় অছির মোল্লার বাড়ীতে ফিরিল।

তারপর অছির ও আর দুইজন নিমন্ত্রিত বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া লতিফ বিবাহের জন্ত বাড়ী ফিরিতেছিল। ঘাটে আসিয়া ফকীরের সঙ্গে পরীকে দেখিয়া তার মাথায় খুন চাপিয়া গেল, তাই এ কাণ্ডটা ঘটিয়া গেল।

কনেষ্টবল তার চার বন্দীকে হাত পা বাঁধিয়া চৌকীদার পাহারা রাখিয়া সেরাত্রি প্রেসিডেন্টের বাড়ীতে কাটাইল, তার পরদিন প্রত্যূষে সে বন্দীদিগকে লইয়া মহকুমায় ফিরিয়া গেল। ফকীর ও পরীও দুইখানা ডুলি করিয়া একটু পরে সেখানে গেল। ফকীর হাঁসপাতালে গেল, পরী রসুলের সঙ্গে একটা হোটেলে উঠিল।

ফকীরের এজাহারে প্রকাশ পাইল যে তাহারা যখন পরীকে লইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল সেই সময় আসামীরা দশ পোনেরোজন লোক তাহাদিগকে আক্রমণ করে এবং সম্রাটের দোহাই অগ্রাহ্য করিয়া মারপিট করিয়া ছিনাইয়া লইয়া যায়, তার পর কয়েকজন শ্রমিক ব্যক্তি পরীকে উদ্ধার করিয়া আসামী চারজনকে গ্রেপ্তার করে। আসামীর মধ্যে উপস্থিত চারজন ছাড়া আরও ফকীরের পাঁচজন শত্রুলোকের নাম করা হইল।

১৫

লতিফের মোকদ্দমা মুলতবী আছে। লতিফ হাজতে, কেন না তার পক্ষে জামিনের জন্ত কোনও তদ্বির কেহ করে নাই।

লতিফের বিরুদ্ধে এজাহার হইবার পর হইতেই পরী ভয়ানক উন্মনা হইয়া আছে। ব্যাপারটা যে রকম হইয়া গড়াইল তাহাতে সে প্রথমে একেবারে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। তার আর এখন সন্দেহ ছিল না যে লতিফের পাগল হওয়াটা একেবারে মিথ্যা কথা, এবং সম্পূর্ণ ফকীরের রচনা, অথচ সেই মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করিয়া সে কি না কাণ্ড করিয়া বসিয়াছে! ব্যাপারটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া আলোচনা করিতে গিয়া কেবল দুইটি কথা পরীর স্পষ্ট করিয়া মনে হইল। সে দিন সে কতকগুলি লোকের সম্মুখে লতিফকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল এবং সে প্রস্তাবে সে সুখী হইয়াছিল। আর আজ লতিফ হাজতে, হয় তো দুই দিবস বাদে ফাটকে যাইবে—

ইহা তারই কৃতকর্ম। আর কোনও কথা সে স্পষ্ট করিয়া ভাবিতে পারিল না। একরাশ ব্যথাভরা চিন্তা ঝড়ের মত তার চিত্তকে তোলপাড় করিতে লাগিল।

তিন দিন সে এমনি করিয়া দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় কাটাইল। তিন রাত্রি বিনিদ্র নয়নে সে কাঁদিয়া বালিস ভিজাইল।

চতুর্থ দিন প্রত্যূষে উঠিয়া সে ক্লান্ত হইয়া তার শুইবার ঘরের দাওয়ায় বসিয়া আবার অবসন্ন মনে ভাবিতে বসিল। তার একটা ছেলে কাছে আসিয়াছিল, পরী তাকে চট-পট দু'ঘা লাগাইয়া দিল, ছেলেটা কাঁদিতে কাঁদিতে পলাইল। কুড়ানী কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিল, সে একটা দারুণ মুখঝামটা খাইয়া ভ্রূকুটি করিয়া বিড়্ বিড়্ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

ফকীর আসিয়া উঠানে দাঁড়াইতেই পরী একবার তার দিকে চাহিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অন্যদিকে চাহিয়া রহিল।

ফকীর একটু সঙ্কুচিত ভাবে অগ্রসর হইল। গত তিন দিন পরীর ব্যবহারে সে স্পষ্ট বুঝিয়াছিল যে তার সঙ্গে বাক্যালাপ করা এমন পরীর মনঃপূত নয়।

কাছে আসিয়া ফকীর বলিল, "হাইকোর্ঠে আমরা জিত্‌চি—তার আইচে।"

পরী একবার মুখ তুলিয়া চাহিল। কিছুক্ষণ অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া শেষে বলিল, "বেশ।" তার পর আবার মুখ ফিরাইল। অলি বেপারীর সঙ্গে মোকদ্দমায় হার জিতে তার এতখানি ঔদাসীন্য কেন ফকীর বুঝিতে পারিল।

ফকীর একটু ইতস্ততঃ করিয়া দাওয়ার একপাশে পরীর কাছাকাছি বসিয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া সে বলিল, "পরশু তো লতিফের মোকদ্দমার তারিখ।"

পরী কোনও কথা কহিল না, মুখও ফিরাইল না।

ফকীর আবার বলিল, "কাইল তো জাওন লাগে তোমার মোক্তারের কাছে—সাক্ষী দেওন লাইগবো তো"—

পরী মুখ ফিরাইয়াই একটা ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "দিমু না সাক্ষী।"

ফকীর কহিল, "পাগলের কথা কও, এহন সাক্ষী না দিলে কি উপায় আছে? তুমি না গেলে হাকিম তোমাকে ওয়ারেণ্ট দিয়া ধইরা লইবো। মিছামিছি বেইজ্জত হওনের কি কাম?"

পরী সুধু বলিল, "নেয় নিবো। আমি যামু না।"

ফকীর বলিল, "সুদা নেওন না, শেষে ফাটকেও দিবার পারে।"

"পারুকগা—আমি যামু না।"

ফকীর নানা মতে কথা বিনাইয়া পরীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল। একবার অনুনয় করিল, একবার ভয় দেখাইল। বলিল যে লতিফ বলিবে যে পরীর সঙ্গে তার সাদী হইয়া গিয়াছে—সেই কথা প্রমাণ করিয়া যদি সে খালাস হয় তবে তার পর সে পরীকে লইয়া যাইবে। আর এখন এই বিড়ম্বনার পর যদি সে একবার পরীকে হাতে পায় তবে পরীর লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না। ফল কথা তারা দুইজনে পাঁকে এত জড়াইয়া পড়িয়াছে যে এখন হাত পা ছুড়িয়া কোনও লাভ নাই, বরং হাত পা ছাড়িয়া গড়াইয়া যাওয়াই সুযুক্তি।

অনেকক্ষণ ফকীরের বক্তৃতা শুনিয়া পরী শেষে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ফকীরের দিকে চাহিয়া সে তীব্র কণ্ঠে বলিল, "যামু না আমি। আর যাই-ই যদি তবে কইয়া থুইলাম, আমি গিয়া কমু যে লতিফের সাতে আমার নিকা হইয়া গিচে।"

বলিয়া সে ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

ফকীর ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া কিছুক্ষণ দরজার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর দরজার কাছে গিয়া নানা রকম অনুনয় করিল—তার পর হতাশ হইয়া মাথায় হাত দিয়া চলিয়া গেল।

ফকীর চলিয়া গেলে অনেকক্ষণ পর পরী দুয়ার খুলিয়া বাহির হইল।

সেদিন, সমস্ত দিন পরী এই কথাটাই মনের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। সে যদি সত্য সত্য গিয়া সাক্ষ্য দেয় যে লতিফ তাকে নিকা করিয়াছে, তবে কেমন হয়? ফকীরের কথায় সে বুঝিয়াছিল যে এই কথা প্রমাণ হইলে লতিফ মুক্তি পাইবে। তার পর—অমনি চট্ করিয়া রাশি রাশি মনোরম স্বপ্ন গড়িয়া উঠিয়া তার শরীর মন পুলকিত করিয়া তুলিল। কিন্তু—সে কি লজ্জার মাথা খাইয়া এই কথাটা বলিতে পারিবে? আদালতে সাক্ষী দেওয়া যে কি ব্যাপার তার কতকটা অভিজ্ঞতা তার হইয়াছিল। সেখানে কাটগড়ায় উঠিলে বুক দুড় দুড় করিয়া কাঁপে—কি বলিতে কি বলিয়া ফেলে তার ঠিকানা নাই।—বাপ্, অমন কাজ মানুষে করে?

কিন্তু যদি সে সাক্ষ্য না দেয় তবে লতিফের কি উপায় হইবে? সে কি সত্য সত্যই ফাটকে যাইবে? ভাবিতে ভয়ে সমস্ত শরীর তার কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কি সর্ব্বনাশ!—তার জন্য লতিফ দেশান্তরী, আবার তার জন্য সে ফাটকে যাইবে!—এমন "ছাই-কপালী" সে!

অতীতের কথা তিল তিল করিয়া মনে হইল। কত দিন সে কত ভুল করিয়াছে—লতিফ তাকে কতবার ডাকিয়াছে, তার ডাক সে অগ্রাহ্য করিয়াছে—সেনেদের পুকুরের ধারে তার উদ্দাম প্রেমের প্রথম দুঃসাহসে ভয় পাইয়া পরা পলাইয়াছে—সব মনে পড়িল—মনে হইল এই সব ভুলের জন্যই তার জীবনটা মাটি হইয়া গেল। হস্তগত স্বর্গ সে পায় ঠেলিয়াছিল। তারপর যখন সে কাসিমের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব শুনিল তখনি সে যদি ছুটিয়া পলাইত, তবে—দূর ছাই—এ সব ভাবিয়া কোনও ফল নাই। খোদা মারিয়াছেন তাকে, তাই তার এমনি পদে পদে ভুল হইয়াছে, নহিলে লতিফ আজ—আবার এক লহর মনোজ্ঞ স্বপ্ন—যাহা হইতে পারিত কিন্তু হয় নাই—সেই সুমধুর অবলুপ্ত অবসরের স্বপ্ন তার মন ভরিয়া দিল।

স্নানআহার সংসারের কাজকর্ম্মের ভিতর এমনি করিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া পরী সেদিনের বেশীর ভাগ কাটাইয়া দিল। কোনও মীমাংসা বা সিদ্ধান্ত সে করিল না, কেবল কতকগুলি সম্ভাবনার স্বপ্ন—অনাগত অতীতের ও অভাবী ভবিষ্যতের স্বপ্ন রচিয়া গেল। স্বপ্নের ঘোরে সে কাজের মাঝে হাত তুলিয়া বিভোর হইয়া বসিয়া থাকিল, খাইতে বসিয়া মুখে গ্রাস তুলিতে ভুলিয়া গেল, তার বাড়ী ঘর আবেষ্টন সব ভুলিয়া গেল,—আবার চমকিত হইয়া জাগিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অসমাপ্ত কার্য্য সারিয়া ফেলিল। এমনি করিয়া দিন কাটিল।

পরীর গরুগুলি তার বাড়ীর পাশেই খুঁটায় বাঁধা হইয়া ঘাস খাইতেছিল;—অপরাহ্নে সেগুলিকে সে নিজেই গোয়ালঘরে তুলিয়া আনিল, এখন তার গরুর চাকর রাখিবার তো সঙ্গতি নাই। তাদের জাবনা দিতে দিতে মনে পড়িল একদিন এমনি জাবনা দিতে গিয়াই তার লতিফের সঙ্গে এক অদ্ভুত প্রেমসম্ভাষণ হইয়াছিল। মনে হইল সে দিন যদি সে ভয় না পাইয়া লতিফের সঙ্গে পলাইয়া যাইত—হাতের কাজ পড়িয়া রহিল—দুই চোখ দিয়া তার জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সেই অদ্ভুত অতীতের জন্য সে কাঁদিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া কোনও মতে জাবনা দেওয়া শেষ করিয়া সে ঘরে চলিল। তখন বেলা প্রায় গড়াইয়া পড়িয়াছে। একটি স্ত্রীলোক সেই সময় বাহির হইতে প্রবেশ করিয়া উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ইতস্তত চাহিতেছিল। তাকে দেখিয়া পরীর মনটা একটু কাঁপিয়া উঠিল, মনে হইল এ নারী বড় হিংস্র।

পরীকে দেখিতে পাইয়া সে, রমণী জিজ্ঞাসা করিল, "তর নাম পরী?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পরী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ক্যারা?"

"আমি? আমারে চিনবা না। কও তুমি পরী নাকি?"

"হ; ক্যান কি চাই তোমার?"

"চাই, তর ওই মাথাখান চাই ভাইজ্যা খাইবার, ওই চক্ষু দুইডা চাই গাইল্যা দিবার, তর ওই খবী সুরতখান চাই পুড়াইয়া ছাই কইরবার। ছাই-কপালী আবাগী—রাক্ষসী—তুই এমনি কইরা আমার লতিফেরে মাইরবার বইছস্"—

ইত্যাদি নানাবিধ আভিধানিক ও অনভিধানিক, সার্থক ও অর্থহীন ভাষায় বিবিধ ভঙ্গী সহকারে সেই নারী তীব্র চীৎকার করিয়া দীর্ঘকাল অশ্রান্ত বক্তৃতা করিয়া গেল। ক্রমেই সে অধিক উত্তেজিত হইয়া উঠিল, ক্রমেই তার ভাষা অভিধানকে বেশী করিয়া অতিক্রম করিয়া চলিল। তার ভ্রূভঙ্গী ক্রমেই অধিক তীব্র হইয়া উঠিল। পরীর মুখের কাছে তার হাত দুইখানা অত্যন্ত ভয়াবহ ভাবে নাড়া চাড়া করিল। শেষে সে বলিল, "মর্—মর্—মর্ আবাগী তুই মর—আমার হাতেই তুই মরবি—আমি তরে মাইরা থুইয়া কবর দিয়া তবে যামু—আয়!" এবং হাত মুখ খিঁচাইয়া সে পরীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে গেল।

পরী গোড়া হইতেই ভয় পাইয়া পিছু হটিয়া গিয়াছিল। ইহার কোনও কথার জবাব দিবার অবসর তার হয় নাই, তবু সঙ্গে সঙ্গে সে দুই একটা কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া ছিল। কিন্তু প্রধানত সে ইহার সান্নিধ্য হইতে সরিয়াই যাইতেছিল—এই নারীও প্রতিবারেই অধিকতর তীব্রতার সহিত তার দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

এই শেষ কথায় ও আক্রমণে সে একেবারে তিন লাফ মারিয়া পিছাইয়া দাওয়ায় উঠিল।

কুড়ানী ছুটিয়া আসিয়াছিল। সেও নেকজানের সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু নেকজান তাহাকে গ্রাহ্য করে নাই।

দাওয়ায় উঠিয়া পরী ছুটিয়া ঘরে গিয়া দুয়ার বন্ধ করিল।

নেকজান অনেকক্ষণ দ্বারে হত্যা দিয়া বসিয়া রহিল। তার পর দ্বার খুলিবার কোনও সম্ভাবনা না দেখিয়া সে চলিয়া গেল। বাহিরে ডুলি লইয়া একটি লোক বসিয়া ছিল, নেকজান চীৎকার করিয়া পরীকে শাপিতে শাপিতে ডুলিতে গিয়া বসিল,—প্রতিবেশী মেয়ে ও ছেলের পাল হাঁ করিয়া তার দিকে চাহিয়া রহিল।

নেকজান আসিয়া পরীর বাড়ীতে মহা উৎপাতের সৃষ্টি করিয়াছে, এ সংবাদ অতি সত্বরেই ফকীরের কাছে পৌছিয়াছিল। সে তখন সারাদিনের পরিশ্রমের পর দাওয়ার উপর পাটি পাতিয়া একটু গড়াইতেছিল। তার স্ত্রী পাশে বসিয়া তামাক সাজিতেছিল।

সংবাদ শুনিয়াই ফকীর তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল এবং এক গাছা লাঠি লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইল। তার স্ত্রী বলিল, "তামুক খাইয়া যাও।"

ফকীর গ্রাহ্য করিল না।

তার স্ত্রী ক্ষেপিয়া উঠিল। সে ফকীরকে বকিল, পরীর উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য গালিগালাজ করিতে লাগিল, ফকীরের রক্ত উত্তেজিত হইয়া ছিল—সে একটা অশ্লীল গালি দিয়া স্ত্রীর পিঠে লাঠির এক ঘা বসাইয়া দিল। স্ত্রী আর্তনাদ করিতে লাগিল, ফকীর ছুটিয়া গেল।

ফকীর যখন পরীর বাড়ীতে পৌছিল তখন নেকজান চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু পরী দুয়ার খোলে নাই।

ফকীর ডাকিলে পরী দুয়ার খুলিয়া দিল। সে তখন ভয়ে শুষ্ক হইয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে, ব্যাঘ্রীর হাতে আসন্ন মৃত্যু হইতে যেন সে মুক্ত হইয়াছে।

ফকীর বিনা বাক্যব্যয়ে পরীকে বাহুবেষ্টনে ধরিয়া নানাপ্রকারে সান্ত্বনা দিল। পরীর তাহাতে কোনও বাধা দিবার ইচ্ছা হইল না। বরং সে একটা নির্ভর ও আশ্রয়ের স্থান পাইয়া বাঁচিয়া গেল।

সাহস পাইয়া ফকীর তার বুকের ভিতর চাপা মুখখানি তুলিয়া চুম্বন করিল—পরীও তাহাকে দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিল।

ঘণ্টাখানেক পর ফকীর পরীকে লইয়া টাঙ্গাইলে গেল।

লতিফের সঙ্গে বিবাহের যে সুখস্বপ্ন পরী দেখিয়াছিল নেকজান আসিয়া তাহা একেবারে চুরমার করিয়া দিয়াছিল।

—ক্রমশ

জানি জানি হে বসন্ত—

শ্রী প্রমথনাথ বিশী

জানি জানি হে বসন্ত, বারে বারে পড়িয়াছ ধরা
শিশির-বিশীর্ণ মাসে। বন-পুষ্পদলে
দেখিয়াছি তোমার আভিয়া।
শীতের শাসনে যবে চতুর্দ্দিক মৌনতায় ভরা,
দেখিয়াছি হাস্য তব নিভৃতে বিরলে
স্তব্ধতার দাড়িম্ব ভাঙিয়া।
এ কী লীলা পথিকের ল'য়ে নিজ ঐশ্বর্য্য পসরা
ফিরে ফিরে বারে বারে আস নানা ছলে,
ঋতুরাজ, কাহারে যাচিয়া!

অবশেষে একদিন মাধবীর ছায়াকুঞ্জতলে
সহসা উথলি' উঠে স্মৃতির পয়োধি
সৌরভের নীরব ইঙ্গিতে;
উপরে চাহিয়া একি যেন কার মায়ামন্ত্রবলে
মাধবীর মূল হ'তে কেশাগ্র অবধি
পরিপূর্ণ কুসুম-ভঙ্গীতে;
মাঘের সহস্র স্বপ্ন ছুটে এসে মহা কৌতূহলে
সহসা সমুখে হেরি বিশ্ব-মহোদধি
ফেটে পড়ে একটি সঙ্গীতে।

শীতের শর্ব্বরী-শেষে চমকিয়া জাগিয়া ধরণী
বুকের উপরে তুলি দেয় সন্তর্পণে
খসে-পড়া কোমল অঞ্চল;
স্বপ্নলীন সরমের ব্যথাটুকু মনে মনে গণি'

জানি জানি হে বসন্ত—

লজ্জার মাধুরী জাগে বনে উপবনে;—
—কৃষ্ণচূড়া কিংশুকের দল,
দিগন্ত-শিথান-প্রান্তে এখনোরে ঘোচেনি রজনী,
চাঁদের প্রদীপ আছে পশ্চিম গগনে,
কেশে তার শিশিরের জল।

যেদিন আসিলে তুমি তপোতীব্র স্তব্ধ তপোবনে
দৈত্য হ'তে মনে করি স্বর্গের উদ্ধার—
ভুলি নাই সেদিনের কথা!
সেদিন কি আশা ভয় জেগেছিল দেবতার মনে!
অকস্মাৎ কোথা হ'তে লভিল আকার
অপর্ণার চিত্তে মদিরতা!
যেন সে দেখিতে পে'ল বসুন্ধরা পীড়িত যৌবনে!
খসে গেল হাত হ'তে মালাখানি তার!
বুক হ'তে বল্কলের ব্যথা!

সেই হ'তে ঋতুরাজ, এ কী লীলা, জগতে জগতে,
মানবের ঘরে ঘরে এ কী তব ডাক,
দেশে দেশে এ কী অভিযান!
তোমার চরণ-স্পর্শে অনন্তের খিন্ন দেহ হ'তে,
ক্লান্তিঘন বরষের ধীরে খসে যাক্,
মলিন নির্ম্মোক একখান্—
ভুলাও ভুলাও তুমি, ক্ষণতরে স্বর্গে ও মরতে,—
প্রেমে প্রণয়ীর মাঝে জাগে যে নির্ব্বাক্,
অশ্রুময় তীব্র ব্যবধান।

হে বসন্ত পারিবে কি মিটাইতে তৃষ্ণা মানবের
বিরহ-বিলীন বক্ষে গাঢ় অশ্রু-নীর?
আনো তবে পুষ্পের বিভূতি!

শালের পল্লবে আর নবোদ্গমে তরুণ তালের
ঢেকে দাও চিহ্ন যত সুদীর্ঘ ক্ষতির
বুলাইয়া ভ্রমরের স্তুতি !
প্রথম মুকুলখানি এ বর্ষের আম্র-কাননের,
প্রথম মঞ্জরীখানি স্নিগ্ধা মাধবীর
দুঃখ-সুখে দিক্ অনুভূতি !

রসের কথা

শ্রী নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

একরাশ জঞ্জাল স্তূপের মত পড়িয়া আছে—তার পাশ দিয়া লোকে আসে যায়, ফিরিয়া চায় না, চাহিলেও তাতে দেখিবার মত কিছু পায় না। চারুশিল্পী তার ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করে বিচিত্র সুন্দর মূর্ত্তি—লোকে অবাক হইয়া চাহিয়া দেখে যে তাদের চিরদিনের অশ্রদ্ধার এই তুচ্ছ স্তূপ সুধু রাশিকৃত রূপের সমষ্টি।

এমনি একটা স্তূপ মানবজীবন। হাজার হাজার মানুষ দিনের পর দিন এই জীবনের মাঝখানে বাস করিয়া যায়, তার ভিতর বিচিত্র কিছু খুঁজিয়া পায় না। . কবি ও ঔপন্যাসিক এই জীবন হইতে খুঁটিয়া বাছিয়া রসের উপাদান সংগ্রহ করিয়া গুছাইয়া বাহির করেন তার রসমূর্ত্তি। মুগ্ধ জগৎ কবি ও ঔপন্যাসিকেব সৃষ্ট রূপের প্রশংসায় বিভোর হইয়া যায়।

জীবন ও জগৎপ্রবাহ কতকগুলি পরস্পরসম্বদ্ধ, পরস্পরের ভিতর ওতপ্রোত ভাবে অনুপ্রবিষ্ট বস্তুর (fact) সমষ্টি। বস্তুরূপে তার সত্তা ছাড়া তার ভিতর আছে তত্ত্ব, তাহা দর্শন বিজ্ঞানের জ্ঞানসাপেক্ষ। আর তার আর একটা রূপ আছে,—সে তার রসরূপ। সে-রূপে সে আমাদের রূপবোধকে তৃপ্ত করে, আমাদিগকে একটা বিশিষ্টরূপ আনন্দ দান করে। কবি ও ঔপন্যাসিক জীবনের এই রূপ প্রকট করেন।

সক্রেটিস একটা রূপক ব্যবহার করিতেন, তাহা এ সম্পর্কে ব্যবহার করা যাইতে পারে। নিপুণ তক্ষণশিল্পী পাথরের কুঁদার ভিতর একটা মূর্ত্তির সত্তা প্রত্যক্ষ করেন, তাঁর কাজ হয় সেই কুঁদা হইতে সেই মূর্ত্তির অতিরিক্ত সব অংশ ছাঁটিয়া ফেলিয়া তার স্বরূপ প্রকট করা। তেমনি সাহিত্যিক জীবনের ভিতর রসমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাকে অপ্রাসঙ্গিক আবেষ্টন হইতে বিমুক্ত করিয়া তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন।

সুধু এই একটা রূপক দিয়া জীবন সম্বন্ধে কবির কাজ নিঃশেষ করিয়া প্রকাশ করা যায় না। তাঁর কাজের আরও কতকগুলি দিক আছে। পৃথিবীতে এমন অনেক ছোট ছোট জিনিষ আছে যা সাদা চোখে দেখায় সাধারণ অথবা অসুন্দর, কিন্তু একটা মাইক্রস্কোপ দিয়া তাকে দেখিলে দেখা যায় তার ভিতর অপরূপ বর্ণ-বৈচিত্র্য, অদ্ভুত সূক্ষ্ম কারুকার্য্য—যেন সে এক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন

চিত্রকরের তুলিকায় আঁকা একখানা ছবি। কবি অনেক সময় তেমনি জীবনের অনেক তুচ্ছ জিনিষ তাঁর সূক্ষ্ম অণুবীক্ষণের ভিতর দিয়া দেখিয়া তার অপূর্ব্ব রসরূপ ফুটাইয়া তোলেন।

আবার অনেক সময় আমাদের চোখে রূপ ধরা পড়ে না, আমাদের দৃষ্টির খর্ব্বতায়। একটা প্রকাণ্ড গাছের খুব কাছে দাঁড়াইলে দেখা যায় সুধু তার কাণ্ডের উপর খস্‌খসে ছাল, হয় তো তার এঁকাবেঁকা কদর্য্য ত্রুটী অঙ্গ। আমাদের দৃষ্টিটা পড়িয়া থাকে তার ছোট-খাট অংশের উপর, তাকে আমরা সমগ্রভাবে দেখিতে পাই না। খুব দূর হইতে যখন আমরা সেই গাছটাকে সমগ্রভাবে দেখিতে পাই তখন দেখিতে পাই সে সুন্দর। তেমনি মাঠ ঘাট, বন, পর্ব্বত প্রভৃতির ভিতর যে সৌন্দর্য্য আছে, খুব নিকট হইতে দেখিলে তাহা আমাদের চোখে পড়ে না— তাকে দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে হয়। যখন তার ছোট ছোট খণ্ড আমাদের দৃষ্টি হইতে দূর হইয়া যায় আর তার সমগ্র রূপ আমরা দেখিতে পাই তখনই তার রূপ আমাদের চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে কবি ও ঔপন্যাসিককে এমনি জীবনকে সমগ্রভাবে দেখিয়া তার রূপ ফুটাইয়া তুলিতে হয়।

এমনি নানা বিচিত্র ভাবে জীবনকে দেখিয়া কবি ও কথাকার জীবনের রসমূর্ত্তি দেখিতে পান, আর তাঁর নিপুণ লেখনীমুখে এমন করিয়া ফুটাইয়া তোলেন সে রসমূর্ত্তি, যাতে তাঁর মত দিব্য দৃষ্টি যার নাই তারও চোখে তা ফুটিয়া উঠিতে পারে।

কথার পর কথা গাঁথিয়া গেলে কাব্য হয় না। ঘটনার পর ঘটনা বসাইয়া গেলেও উপন্যাস হয় না। কাব্য ও উপন্যাস সার্থক হয় যখন সে জীবনের একটা রসমূর্ত্তি ফুটাইয়া তোলে।

যে রস কাব্য ও সাহিত্যের জীবন, তার আকৃতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিবার বহু চেষ্টা হইয়াছে, তার অপরিহার্য্য উপাদান ও তার কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে সূত্র গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে। সাহিত্যের জন্মকাল হইতে কবি এ রস উপভোগ করিয়াছেন, ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁদের সৃষ্ট বস্তু যে রস সেটা বুঝিতে প্রকৃত রসিকের কখনও কোনও বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই। কিন্তু বিপদ হইয়াছে যখন আলঙ্কারিক বা কবি এই রসকে বিশ্লেষণ করিয়া তার প্রকৃতি স্বরূপ ও প্রণালী নির্দ্ধারণ করিতে গিয়াছেন। অনেক সময় দেখা যায় যে এরূপ স্থলে কবি বা সমালোচক রস-রচনার এমন একটা দিকের উপর তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যাহা তার রস-বিচারে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। কখনও বা এমন সব লক্ষণ অপরিহার্য্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন যাহা আলোচ্য রচনার ভিতর প্রাসঙ্গিক হইলেও, সাধারণ ভাবে অপরিহার্য্য নহে। সামান্য বলিয়া তাঁহারা যাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা একটা বিশেষ লক্ষণ মাত্র। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিয়া আমার কথাটা বুঝাইব।

আরিষ্টফেনিস তাঁর বহু রচনায় ইউরিপিডিস ও ইস্কাইলাসের তুলনা করিয়া নাট্যকার হিসাবে ইস্কাইলাসের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং ইউরিপিডিসকে বিদ্রূপে জর্জ্জরিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বিচারে যে যে বিষয় আশ্রয় করিয়া ইস্কাইলাসকে বড় করিয়াছেন সেগুলি রসের বিচারে একেবারে অবান্তর। আরিষ্টফেনিস নিজে একজন উচ্চঅঙ্গের রস-স্রষ্টা ছিলেন, অথচ রসের অঙ্গ ও লক্ষণ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এত অবান্তর বিষয় আশ্রয় করিয়াছিল!

কবির প্রাধান্যের হেতু নির্দ্দেশ করিতে গিয়া আরিষ্টফেনিস বলিয়াছেন—

"The improvement of morals, the progress of mankind,
When a poet by skill and invention
Can render his audience virtuous and wise."

* * * *

"The bard is a master of manhood and youth
Bound to instruct them in virtue and truth."

এই হেতু ও লক্ষণের বলে তিনি নাট্যকার হিসাবে ইস্কাইলাসের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইউরিপিডিসের রচনায় নাট্যকলার দিক হইতে যে শ্রেষ্ঠত্ব পরবর্ত্তীযুগে অবিসম্বাদীরূপে স্বীকৃত হইয়াছে তাহা আরিষ্টফেনিসের চক্ষে তুচ্ছ ও অশ্রদ্ধেয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

মহাকাব্যের লক্ষণ বিচার করিতে গিয়া প্রাচীন যুগের আলঙ্কারিকেরা স্থির করিয়া দিয়াছিলেন যে তাব বিষয়-গৌরব থাকা চাই। যে কোনও তুচ্ছ লোক বা তুচ্ছ বিষয় লইয়া মহাকাব্য রচনা হয় না। তার নায়ক হইবে দেবতা বা লোকোত্তর পুরুষ, বিষয় হইবে তাদের গৌরব-কাহিনী। হোমার হইতে মিল্টন এবং ব্যাসদেব হইতে নবীনচন্দ্র মহাকাব্যের এই লক্ষণ স্বীকার করিয়া মহাকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। কাব্যের বিষয়গৌরবের জন্য যে নায়কের খুব বড় কিছু হওয়া দরকার ইহা কেবল মহাকাব্যে নয়, নাটকেও সাধারণ ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। ইস্কাইলাস তাঁর নাটক লিখিয়াছিলেন হোমারের মহাবীরদের লইয়া, কালিদাস লিখিয়াছেন রাজরাজড়া লইয়া। এক মৃচ্ছকটিক ভিন্ন সংস্কৃত নাটকের রাজকূলবহির্ভূত নায়ক আমার জানা নাই।

কিন্তু এই শ্রেণীর রচনার বিষয়গৌরবের জন্য এখন আর নায়কের আভিজাত্য আশ্রয় করিতে হয় না। রাজকূল ও দেবযোনী ছাড়াও মহীয়ান চরিত্র কল্পনা করা যে অসম্ভব নয় তাহা বর্ত্তমান যুগের আবিষ্কার। বিষয়-গৌরব যে এক শ্রেণীর রচনায় আবশ্যক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু তার জন্য যে নায়কের আভিজাত্য অপরিহার্য্য এ লক্ষণটি তাঁদের ভ্রান্ত। ইহা মহাকাব্য শ্রেণীর রচনার সামান্য লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

রসসৃষ্টির কোনও অপরিবর্ত্তনীয় ধারা নাই, আর রসের এমন কোনও শাশ্বত ~ নাই যাকে নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ দিয়া ধরিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যায়। তাই দেখিতে পাই সুকুমার কলার সকল দিককার ইতিহাসে পণ্ডিতদের নির্দ্দিষ্ট আর্টের লক্ষণ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া লোকাতীত প্রতিভাশালী বহু মনীষী এমন সব রস-রচনা করিয়া গিয়াছেন যাহা সম-সাময়িকদের হয় তো ক্ষুব্ধ ও বিচলিত করিয়াছে, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে যার মাধুর্য্য অবিসম্বাদীরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। Rembrandt যখন পূর্ব্ববর্ত্তীদের পন্থা হইতে বহু পরিমাণে স্বতন্ত্র প্রণালীতে ছবি আঁকিয়াছিলেন তখন তাঁর সমসাময়িক পূর্ব্বপন্থীদের অনেকেই তাঁর ছবির আর্টকে ছোট করিয়া দেখিয়াছিলেন। কিন্তু আজ কেহ তাঁর চিত্রের অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

আর এ কথাও ঠিক নয় যে সমসাময়িক লোকে স্বীকার না করিলেই রস একেবারে বাতিল হইয়া যাইবে। রসের আকৃতি প্রকৃতি ধারা, কালভেদে দেশভেদে ও সংস্কার-ভেদে ভিন্ন হয়। সংস্কারে আমাদের রসবোধের চারিধারে প্রায়ই বড় বড় গণ্ডী টানিয়া দেয়—অনেকের পক্ষেই সে গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তার চিরন্তন সংস্কারবিরোধী রস-মূর্ত্তি গ্রহণ করা অসম্ভব হয়। যখন হ্যাভেল ও অবনীন্দ্র-নাথ হঠাৎ আমাদের চক্ষের সামনে প্রাচ্য-কলার নিদর্শন প্রথম উপস্থিত করিয়াছিলেন তখন আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোক পাশ্চাত্য কলার নিকৃষ্ট আদর্শের সংস্কারের গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল—সে ছবির কদর খুব তাড়াতাড়ি লোকে বুঝিতে পারে নাই। আমাদের দেশের সঙ্গীত রসিক হঠাৎ বিলাতী সঙ্গীত শুনিয়া বিরক্ত হইয়া উঠে, আর বিলাতী লোকেরা আমাদের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শুনিয়া অবিচলিত হইয়া থাকে। ইহাদের উভয়ের সঙ্গীতরসবোধ তাদের রসঘটিত সংস্কারের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলিয়া পরস্পর পরস্পরকে বুঝিতে বা আদর করিতে পারে না। অলোক-সামান্য সংস্কারাতীত রসবোধ কিম্বা সাধনা ভিন্ন এই সংস্কারের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া নূতন ধারার রস উপভোগ করা সম্ভব হয় না।

যাহাদিগকে আমরা বলি বর্ব্বর তাদের ভিতর যে সব

গান বাজনা বা নাচ দেখিতে পাই তার বীভৎসতাই আমাদের চোখে বেশী করিয়া লাগে। কিন্তু সে বর্ব্বরের চিত্তে তাহা আনন্দ জাগাইয়া তোলে তার একটা বিশিষ্ট রসমূর্ত্তি আছে বলিয়া। আমাদের সুকুমারতর রসবোধের কাছে যে সব বীভৎসতা অসহ্য তাহা তাহাদিগকে পীড়া দেয় না, তাহা অতিক্রম করিয়া কিম্বা তাহারই ভিতর দিয়া তারা উপভোগ করে তার ভিতরকার রস। পাশ্চাত্য জগতে আজ সংস্কারের গণ্ডী চারিদিক দিয়া ভাঙ্গিয়া রসবোধ ক্রমেই বেশী ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে। তাই সেখানে দেখিতে পাই সভ্য সমাজের একাধিক রসজ্ঞ এই সব বর্ব্বরদিগের বীভৎস নৃত্যগীতের ভিতর প্রকৃত সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইতেছেন, এবং সেই রসের কণাগুলি আহরণ করিয়া তাদের পীড়াপ্রদ আবেষ্টন হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে পাংক্তেয় করিয়া লইবার একাধিক চেষ্টা করিতেছেন।

সুতরাং রস যে কোনও একটা শাশ্বত অপরিবর্ত্তনীয় স্থিরলক্ষণযুক্ত বস্তু নয়, দেশকালসংস্কার ভেদে যে তার পরিবর্ত্তন হয় শুধু তাই নয়, অনেক সময় সংস্কার প্রকৃত রসবোধের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। প্রকৃত রসলিপ্সু যে তাকে এই সংস্কারের বন্ধন অতিক্রম করিয়া নিরুপাধিক রসক্ষেত্র আশ্রয় করিবার জন্য সাধনা করিতে হইবে। এ সাধনায় যত অধিক সিদ্ধিলাভ হইবে রস-সংগ্রহের ক্ষেত্র তত বিস্তার লাভ করিবে, রসবোধের তৃপ্তির উপাদান তখন বহু অসংশয়িতরসমূর্ত্তি বস্তুর ভিতর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে

রসসৃষ্টির উৎকর্ষের একটা প্রধান মূল সূত্র তার মৌলিকতা। অভ্যাসে রসের মাধুর্য্য ক্ষয় হয়। শকুন্তলার সমস্ত গুণসম্পন্ন দ্বিতীয় শকুন্তলা ঠিক কালিদাসের শকুন্তলার মত আনন্দ দিতে পারে না। মেঘদূতের অনুকরণে বহুকাব্য রচিত হইয়াছে, তাদের অনেকের মধ্যে প্রচুর কবিত্ব আছে, ভাষাসম্পদও অনেকের তুচ্ছ নয়। কিন্তু যদি তাদের ভাব ও ভাষার সমৃদ্ধি হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ হইয়া মেঘদূতের তুল্যমূল্য হইত তবু কালিদাসের মেঘদূতের যে মাধুর্য্য তাহা এই অনুকরণে লোকে পাইত না। নবত্ববোধ ও তজ্জনিত একটা বিস্ময় রসের আনন্দদায়িনী শক্তির একটা প্রধান উপকরণ।

রসিক যে সে উপভোগের এই নূতনত্ব সর্ব্বদা অন্বেষণ করে। খুব বেশী নূতন কিছু উপভোগের পথে সংস্কার একটা প্রকাণ্ড অন্তরায় হইয়া থাকে, কিন্তু তবু অতিবড় রক্ষণশীল রসগ্রাহীও জীর্ণোদ্গার সহ্য করিতে পারে না। তার সংস্কারের আবেষ্টনের ভিতর নূতনত্বের আকাঙ্ক্ষা সে করে। তাই জগতে এমন কোনও কবি বা সাহিত্যিক স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই যার নিজস্ব নূতন কিছু বড় জিনিষ নাই। রসের কোনও নূতন উৎস না পাইয়া, রসের কোনও নূতন প্রণালী আবিষ্কার না করিয়া কেহ কখনও প্রকৃত রসজ্ঞের তৃপ্তি সম্পাদন করিতে পারেন নাই। রসের দরবারে একঘেঁয়ে হওয়ার শাস্তি—মৃত্যু।

বঙ্গ-সাহিত্যের আধুনিক যুগে রসের কারবারে দীর্ঘ জীবন ভরিয়া স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ! কি কাব্যে কি কথায় তাঁর এই বিপুল প্রতিষ্ঠার হেতু তাঁর লোকাতীত প্রতিভা—কিন্তু সে প্রতিভার যে বিশেষত্ব তাঁর দীর্ঘ সাহিত্য-জীবনের প্রতিষ্ঠা অক্ষয় ও উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে তাহা তাঁর চির নবীনত্ব। তাঁর ভিতরকার রসের বিরাট সমুদ্র জীবনের প্রভাতেই সংস্কারের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া নানা অসংশয়িত নূতন পথে ছুটিয়া বাহির হইয়াছিল। আর সেই প্রবাহ আপনাকে নিজের অভ্যাসের রচিত কোনও বাঁধা খাতও কোনও দিন স্বীকার করে নাই। রসের জগতের দশদিকে তাঁর চক্ষু কর্ণ চিরদিন সজাগ রহিয়াছে এবং নিত্য নূতন বিচিত্র ধারায় রসসৃষ্টি করিয়া তিনি জগৎকে বিস্মিত করিয়া চলিয়াছেন। তাঁর কোনও দুইটি রচনার ভিতর অবিচিত্রতা নাই একথা বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে। কিন্তু একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে এক

রসরূপের পুনরাবৃত্তি তাঁর রচনায় যত অল্প আছে এত কম জগতে খুব অল্প রসস্রষ্টার ভিতর দেখা যায়। ইহা যে শুধু তাঁর প্রতিষ্ঠার হেতু তাই নয়, ইহা রসস্রষ্টা হিসাবে তাঁর উৎকর্ষের একটা প্রধান উপাদান।

শনিবারের চিঠি

'শনিবারের চিঠি' নামে একখানি মাসিকের কয়েক সংখ্যা দেখেছি।

এখানি নিজের শক্তি কি নিজের প্রেরণায় চলে না; ফেউ-জাতীয়। পরের ছিদ্রানুসন্ধান এর পেশা।

জীবনে এই অকিঞ্চিৎকর কাজটিকে অবলম্বন করলে মানুষের মনটা যেমন অনুর্ব্বর হয়—কাঁটা গাছের উৎপাতে ভ'রে ওঠে, তেমনি এই কাগজেরও আত্ম সম্পদ কিছুই নেই; এখানে কেবল কাঁটারই চাষ-আবাদ।

অন্যকে কঠিন এবং নির্দ্দয় ভাষায় গালাগালি দেবার ক্ষমতাকে যদি কোন মূল্য দিতে হয় তো সে-হিসাবে 'শনিবারের চিঠি'র কিছু দাম আছে।

কবি এর তারিফ করেছেন। তার কারণ বোধহয় কবিকে এখনো এর আবিলতা স্পর্শ করেনি। কবির সঙ্গে এখন এঁদের বন্ধুত্ব চ'লেছে—যে হেতু সেটা এই কাগজের কর্ত্তৃপক্ষের স্বার্থ! কোটালেরা ত চিরকাল নিজেদের রাজার শ্যালক ব'লেই পরিচয় দিয়ে থাকে!

নবীন লেখকদের সুখ্যাতিতে ঈর্ষা-জর্জ্জর এর লেখকবৃন্দ কাজের অভাবে যদি একদিন জ্যেঠার গঙ্গা-যাত্রায় প্রবৃত্ত হয় ত সেদিন মনে করব যে একান্ত সম্ভব যেটা সেইটেই ঘটলো।

• 'শনিবারের চিঠি'র ইঙ্গিত যে, আমাদের সাহিত্য, কয়েকজন দুর্ব্বৃত্ত কবি এবং লেখকদের লেখায় রসাতলে চলেছে, সাহিত্যকে সেই নিরয় থেকে উদ্ধার করা চাই।

সকল সমাজেই প্রায় সাধু-উদ্দেশ্যের মুখোস-পরা গুণ্ডা-প্রকৃতির জনকয়েক লোক, সমাজকে নিরয়ের পথ থেকে উদ্ধার করার কাজে লেগে সমাজের ক্ষতিই ক'রে থাকে, তার প্রমাণ ইতিহাসে পর্ব্বত-প্রমাণ।

রাজদ্বার রক্ষার জন্য দু'চারজন গুণ্ডা-প্রকৃতি লোকের দরকার হ'তে পারে; কিন্তু দেশময় গুণ্ডা হ'লে রাজা-প্রজা উভয়েরই বিপদ।

সাহিত্যে ব্যঙ্গের চাটনি মন্দ নয়;—তাই দু-এক জন মুখোস-পরা ভাঁড়ের দরকার। কিন্তু ভাঁড়ের দল বেড়ে উঠলে সাহিত্যকে বিধ্বস্ত করে।

'শনিবারের চিঠি'-গুলি ভাল করে পড়ে যাঁরা দেখবেন তাঁরা বুঝতে পারবেন যে, সাহিত্য-উদ্ধারের চেষ্টা এই কাগজের অন্তরের সত্য-চেষ্টা নয়; এটি মৌখিক।

অভিনিবেশ স˳কারে প'ড়ে দেখলে বুঝতে পারা যায় যে, এই কাগজের প্রাণশক্তি ব্যক্তিগত কলহ, ঈর্ষ্যা এবং পরশ্রীকাতরতা থেকে জন্মলাভ করেছে।

এই কাগজের লেখকেরা সত্যকেই জীবনের অবলম্বন করেন নি; তাই তাঁরা নির্ভীক নন্; সময়ে সময়ে 'মরীয়া' হ'য়ে যে সকল কথা বলেন তাকে তাঁদের সাহস ব'লে সাধারণের ভ্রান্তি হতে পারে।

সত্য এবং ন্যায়কে যদি এঁদের পথ-প্রদর্শক করতেন তা' হ'লে লোকের কাছে সার্টিফিকেটের উমেদারী করতে হ'তো না।

'শনিবারের চিঠি'র জন্ম দেখছি, 'প্রবাসী'র আস্তাকুঁড়ে। সাহিত্য এবং সমাজ-সংস্কারের কাজ 'প্রবাসী'র প্রবীণ সম্পাদক প্রায় আজীবন ক'রে আস্‌চেন। যেদিন সত্যকার প্রয়োজন তিনি বুঝেছেন সেদিন আলোচনার জন্য 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠা তিনি উন্মুক্ত করেই দিয়েছেন।

'প্রবাসী'র পৃষ্ঠাতে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'র সমালোচনা করেছিলেন, মনে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি সম্পাদকের শ্রদ্ধা অচল একথা বাংলা দেশের কে না জানে? তবুও তিনি এই সমালোচনা পত্রস্থ করে সেই শ্রদ্ধাকে পূত ক'রেছিলেন।

'প্রবাসী'র জঠরে 'শনিবারের চিঠি'র মত দু' পাঁচখানা কাগজ থাকতে পারে। প্রয়োজন সত্য হ'লে তার একটা প্রকোষ্ঠে শনি-মণ্ডল নিশ্চয়ই স্থান পেতেন।

তা' হ'লে তাঁদের আর এমন করে উল্কা-বাহন হ'তে হতো না।

'শনিবারের চিঠির' শনি-মণ্ডল নিশ্চয়ই শিশু-মণ্ডল নন্; তাঁরা কবির নীচেকার কথাগুলি বোঝেন না, এমন কথা মনে করলে তাঁদের ওপর অবিচার করা হবে ব'লে মনে হয়।

"আমার নিজের বিশ্বাস 'শনিবারের চিঠি'র শাসনের দ্বারা অপর পক্ষে সাহিত্যের বিকৃতি উত্তেজনা পাচ্চে। যে সব লেখা উৎকট ভঙ্গীর দ্বারা নিজের সৃষ্টিছাড়া বিশেষত্বে ধাক্কা মেরে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সমালোচনার খোঁচা তাদের সেই ধাক্কা মারাকেই সাহায্য করে। সম্ভবত ক্ষণজীবীর আয়ু এতে বেড়েই যায়। তাও যদি না হয়, তবু সম্ভবত এ'তে বিশেষ কিছু ফল হয় না।..."

অতএব রবীন্দ্রনাথ ত' পরিষ্কার বলেন যে 'শনিবারের চিঠি' যে উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করচে তাতে সাহিত্যের সুফল হবে না।

ফল যে হবে না, তা' তাঁরাও বোধকরি বোঝেন। মানুষকে ফেরাতে হলে ভালবেসে ফেরাতে হয়। গালাগালির অগ্নিবাণে মানুষের জিদ্ বেড়ে যায়। একথা কি শনি-মণ্ডলের কবি এবং লেখকগণ বোঝেন না, না জানেন না?

কিন্তু 'শনিবারের চিঠি'র যদি প্রকৃত উদ্দেশ্য গালাগালি বিক্রি ক'রে টাকা রোজগার করা হয়ত' কারো কিছুই বলবার নেই। এ ব্যবসা বাংলা সাহিত্যে একেবারে নূতন নয়। শুনেছি, এতে দু'-পয়সা পাওয়াও যায়।

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ফিলজফির বুদ্বুদ

কোথাও কোথাও ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য দাঁড়াইয়াছে ইহাই যে তাহার মানুষগুলি চমৎকার গা-আল্গা বেপরোয়াভাবে দুনিয়ার গতিক লক্ষ্য করিয়া চলে ফেরে; সবাই তারা ফিলজফার। সত্যিকার ফিলজফারের কি লক্ষণ কে জানে, কিন্তু ইহারা আপনা আপ্নির ভিতর খুব জ্ঞানীর মত কথা কয়; সেই জ্ঞানের কথায় করুণরস এমন ভাবে মিশ্রিত থাকে যে কথাগুলি যেমন দমে ভারি তেমনি আর্দ্র হইয়া খামোকা পাঠকের মনের উপর হাঁটু দিয়া চাপিয়া পড়ে।

এই ফিলজফিকে নির্জ্জীবতার কৈফিয়ৎ স্বরূপে যদি গ্রহণ করা যায় তবে তাহার একটা মানে দাঁড়ায় বটে, কিন্তু কোনোদিকেই প্রেরণা অনুভূত হয় না।—জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা না করিয়া তাহাকে দানে সার্থক করিবার আশা যেমন ভুল তেমনি অহৈতুকী; কারণ আক্রোশ করিয়া খাপছাড়া হইয়া উঠিলে নূতনত্বের সাময়িক একটা মোহ ঘটাইতে হয়তো পারা যায়; কিন্তু বস্তুরূপের বাহিরে যে অন্তরলোক, তাহাকেও জাগতিক মাধ্যাকর্ষণের বাহিরে লওয়া যায় না।—কেবলি কেন্দ্রের দিকে টান পড়িতেছে; একটু উঁচুতে উঠিলেই দশজনের নজরে পড়ে; কিন্তু নামিয়া পড়িতেও দেরী হয় না; অর্থাৎ স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া সৃষ্টির চেষ্টা ব্যর্থ হইবেই।—

উত্তরে হয়তো বলা যায়, যে-সৃষ্টি কেবল মাটিকেই চেনে, আর মাটির সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচাইবার সাহস যার নাই, তাহার মাটি হইয়া যাইবার পক্ষে কোনো বাধাই নাই। আমরা তাই কল্পলোকে বাগিচা কেয়ারী করিতে বসিয়াছি। যদি জগতের মন এতই অবোধ আর ইতর হয় যে, তাহাকে টানিয়া নামাইতে হাত বাড়ায় তবে জগতকেই কৃপার চক্ষে দেখা ছাড়া আমাদের কিছু বলিবার নাই। জগত আত্মঘাতী হইতে পারে; তাই বলিয়া আমরা কেন আকাশের আলোবায়ুউত্তাপের মাঝে জীবনের রস খুঁজিয়া অমর হইয়া থাকিতে চাহিব না!

উত্তম। ইহা জীবনের ফিলজফির উচ্চ আদর্শ হইতে পারে; গল্প-সাহিত্যের নহে। গল্প-সাহিত্যেরও ফিলজফি আছে, কিন্তু আকাশস্থ নিরালম্ব হইয়া নাই। বহুউর্দ্ধে ফুল ফুটিয়া আছে দেখিয়া আনন্দ বা আমোদ পাইলে আপত্তির কিছু নাই; কিন্তু, যে-মূল বহুনিম্নে নামিয়া যাইয়া ফুলটির দলে দলে তার ক্ষুদ্রতম পরাগে পর্য্যন্ত রসধারা অবিরাম প্রেরণ করিতেছে তাহাকে ভুলিলে ঠকিতে হইবে। অর্থাৎ গল্প-সাহিত্যে এমন কিছু না থাকাই উচিত যাহা বাস্তবজীবনের রসের দ্বারা পুষ্ট নহে।

ফিলজফির প্রধান দোষ এই যে, গল্পে প্রবেশ করিলে সে কথাবস্তুকে আবৃত করিয়া চলিতে থাকে, এবং তাহার পায়ের ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু কথার অবয়বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ততটুকুই বহনক্লেশে যেন ক্লান্ত আর বিমর্ষ।

মেঘ্লা দিনের অপার দুর্ভাগ্যে কেবল মুখ আঁধার করিয়া থাকিলে মানুষের জীবন কত নিঃস্পৃহ হইয়া নিজের ভারেই তলাইয়া যাইতে থাকে তাহা কল্পনা করা কঠিন নয়। দৈন্যের ফিলজফি বিদেশ হইতে আসিয়াছে, এবং অতি সহজেই তাহা মনটাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে; আর ধরিয়াই আছে কেবল এই কারণে যে, নানাদিক্ দিয়া জীবনের স্বাদগ্রহণের ক্ষমতা দেশ হারাইয়া ফেলিয়াছে। বিদেশে যে ফিলজফি জীবনের উপলব্ধির ভিতর সত্য হইয়া উঠিয়াছে এখানে তাহা হয় নাই—অনুভূতির

প্রখরতা নাই বলিয়া, আর অভিজ্ঞতার অভাবে; এবং ঐ জিনিষটা তাই এখানকার আবহাওয়ার মাটির জিনিষ না হইয়া ফুসফুসের ফুৎকারে বুদ্বুদের মত আকাশময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।—

শ্রী জগদীশ গুপ্ত

পত্র

মনুষ্য-ধর্ম্ম

কল্যাণীয়াসু,

বর্ত্তমান সমাজে পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবহার সভ্যতার একটা অভ্রান্ত নিদর্শন। তার কাট্‌-ছাঁট্, রং-ঢং নিয়ে কতলোক কত মাথাই না ঘামাচ্ছে! কত আর্ট!

কিন্তু পোষাকের উৎপত্তির মূলে একটি তথাকথিত "হীন রিপু"র কীর্ত্তি নিহিত।

পণ্ডিতেরা বলেন যে, আদিম যুগের মানুষের পোষাকের বালাই ছিল না। অঙ্গবিশেষকে মনোলোভা ক'রে সজ্জিত ক'রে তোলার প্রচেষ্টা থেকেই নাকি পোষাক-পরিচ্ছদের উদ্ভব। অপরের দৃষ্টি-মনকে প্রলুব্ধ করে তোলাই ছিল তার নিহিত উদ্দেশ্য।

এখন পোষাক যে-কাজেই লাগুক না কেন, আদিতে তার সঙ্গে তথাকথিত কু-মতলব জড়িত ছিল, একথা অস্বীকার করার উপায় দেখিনে।

সেদিনের কথা কিন্তু সভ্য-মানুষ ভুলেছে; আজ পোষাক নৈলে আর "আব্রু" রক্ষা হয় না।

এমন নীতিবাগীশ কেউ আছেন কি, যিনি পোষাকের আদি-জন্মের নোংরা কাহিনী শুনে বস্ত্র ত্যাগ ক'রে বনে যাবেন?

রুচি নীতি ইত্যাদি যা-কিছু-সব আর্টের প্রাণস্বরূপ সেগুলি কিরকম বদলে যায় তা দেখাবার জন্যেই এই পোষাক-প্রসঙ্গ।

কাজে কাজেই আর্টও গতিশীল।

তাই মনে হয়, এই সমূহ-পরিবর্ত্তনশীল জগত-ব্যাপারকে বাঁধা-বাধির মধ্যে আর্টকে রাখার চেষ্টা বাতুলতা।

আর্ট, রস-বোধ কি সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি ইত্যাদির দোহাই দিয়ে **আজ** যা বলচি,—তা থেকে স'রে দাঁড়াতে **কাল** একটু দ্বিধা কি বিলম্বও হবে না আমাদের!

আর্ট বল, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি বল, এ-সব কিছুই মানুষকে বাদ দিয়ে নয়।

মানুষই তার স্রষ্টা, মানুষই তার সম্ভোগ কর্ত্তা, মানুষই তার সংহার-কর্ত্তা।

সাহিত্য-সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা।

যদি কেউ বলেন যে সাহিত্য-ধর্ম্ম মানুষকে অতিক্রম ক'রে চলে তো সে কথাকে কেমন করে মানুষ গ্রাহ্য করে?

কবি কি বলেন নি—

"তোমার সৃষ্টির চেয়ে তুমি যে মহৎ?"

এখন দেখা যাক্, কোন্ বুদ্ধি থেকে, কিসেরই বা উদ্দেশ্যে মানুষ এই সৃষ্টির কাজে প্রবৃত্ত হয়।

মানুষের সকল চেষ্টাকে (activity) স্থূলভাবে দুটো ভাগে ফেলা যেতে পারে ; যথা :—

(১) নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা। যাকে য়ুরোপের পণ্ডিতেরা বলেছেন :—activities for the preservation of the self.

(২) বংশকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা। যাকে ওঁরা বলেছেন :—activities for the preservation of the race.

বলা বাহুল্য যে সাধারণের মধ্যে প্রথম জাতীয় চেষ্টা প্রবল। কিন্তু মানুষের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই দ্বিতীয় জাতের চেষ্টাগুলো পরিস্ফুট হ'তে থাকে।

য়ুরোপের পণ্ডিতেরা মানুষের নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা ছাড়া আর সকল চেষ্টাকেই sex-activity নামে অভিহিত করেছেন।

এই "সেক্স" কথাটিই আমাদের সকল নষ্টের মূলে।

য়ুরোপের পণ্ডিতেরা বলেন, ধর্ম্মও মানুষের sex-activity ; এমন কি ছোট শিশুটি যে আঙ্গুল চোষে তাও তাই।

১০ই ফাল্গুন ১৩৩৪

এই কথার ভীষণ বিবৃতি থেকে জন্মলাভ করেছে আমাদের আক্রুর লড়াই।

এখন সেক্সপীয়র অন্য নাম ধারণ করেছেন :—

"সেক্স-পীর"

একশো বছর পরে—আজকের সাহিত্যের এই নোংরা ঝগড়া দেখে—আমাদের বংশ-ধরেরা কি লজ্জাই না পাবে।

আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা যে আত্ম-অনাত্ম ভেদে মানুষের চেষ্টাগুলোকে ভাগ করেন নি তা নয়।

মহাপ্রভু ব'লেছেন :—আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা = কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা = প্রেম।

বলা বাহুল্য কাম মানে কামনা।

এখানে যদি কৃষ্ণ = আমি ছাড়া অপর, এই অর্থ ধরা যায় তা হ'লে য়ুরোপের পণ্ডিতদের sex-activity = প্রেম।

মনে হয় এই ব্যাখ্যা সমীচীন। কারণ মানুষের সমাজ সাহিত্য শিল্প ইত্যাদি সবই ত প্রেমের উপর, sex-activityর উপর প্রতিষ্ঠিত।
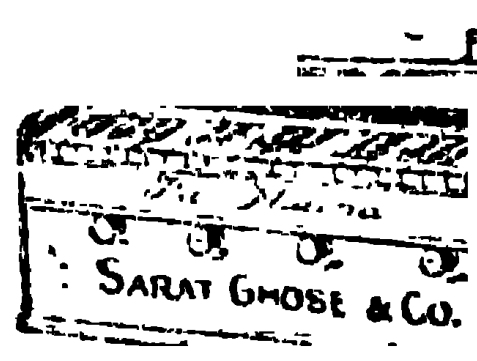
সেক্সকে যদি কেবল মাত্র যৌন-প্রবৃত্তি ব'লে ধরা হয়—তা হ'লে মানুষকে পশুই বলতে হয়।

কিন্তু মানুষ যে কেবল পশুই নয়, তা কি আর নূতন ক'রে প্রমাণ করতে হবে? ইতি—
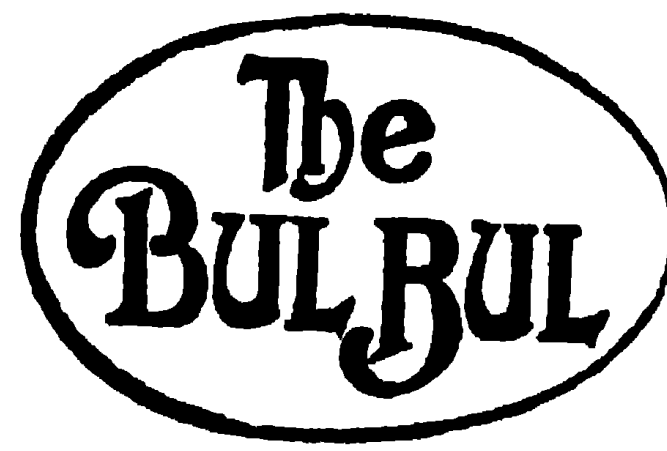
মণিবজ্র ভারতী

পুঁথি-পত্র

বিপ্লবের পথে—শ্রী নলিনীকিশোর গুহ। প্রকাশক—আর্য্য সাহিত্যভবন, দাম ১।০।

কোন সমাজ বা জাতির জীবন যখন দেউলিয়া হইয়া পড়ে, তখন যদি ঐ সমাজ বা জাতির বাঁচিয়া থাকিবার শক্তি থাকে তবে এই অবনতির কারণ অনুসন্ধানে প্রশ্নোত্তরের ভিড় লাগিয়া যায়। সনাতনপন্থীরা সনাতন প্রথার উপযোগীতা প্রদর্শনে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যান; নবীনপন্থীরা অতীতের সমাজকর্ত্তাদের ব্যবস্থার মধ্যে কোথায় ভুল ও কোথায় অসদ্ অভিপ্রায় ছিল তাহা লোকচক্ষে টানিয়া আনিয়া সনাতনকে অপদস্থ করিতে ব্যগ্র হন। এই হৈ-চৈ-এর পরিণতি দাঁড়ায় গিয়া একটা অস্বাভাবিক গোঁড়ামিতে,—একপক্ষ অন্ধভাবে রক্ষণশীলতার পূজায় মাতিয়া যান; অন্য পক্ষ ভাঙ্গিয়া চূরিয়া অনির্দ্দিষ্ট "নূতন কিছু" করার পথে—দেশকাল পাত্র ভুলিয়া—যাত্রা করেন। কোন দেশ ও সমাজ এই গোঁড়ামি ও অত্যুক্তির হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। ইহা দেখিয়া মনে হয়, যে বিশ্ববিধানে এই গোঁড়ামি ও অত্যুক্তির একটা স্থান আছে। দুই পক্ষের এই অত্যাচার সহ্য করিয়া ও ভুলিয়া গিয়াই সমাজ-জীবন গড়িয়া উঠে।

যখন এই কোলাহলে আকাশ বাতাস মুখর হইয়া উঠে, তখন যে ব্যর্থতা ও দুঃখের কারণ অনুসন্ধান হইতে এই কোলাহলের উৎপত্তি তার স্বরূপ মূর্ত্তিটি অনেক সময়ই আমাদের মনোজগত হইতে সরিয়া যায়। কখন কখন বা এই ব্যর্থতা ও দুঃখের একটা প্রকাশকেই তার সমগ্রের স্বরূপ বলিয়া আমরা ভুল করিয়া বসি। এই ভুল যাঁরা আমাদের ধরাইয়া দেন তাঁরা আমাদের কত বড় উপকার করেন তাহা আজ না বুঝিলেও একদিন আমাদের বুঝিতে হয়।

আজ আমাদের দেশে দুঃখ জমাট বাঁধিয়া বসিয়া আছে; সেই দুঃখের তাড়নায় আমরা অনেক সময়ই বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছি। রাষ্ট্রে, সমাজে, অর্থোপার্জ্জনের অব্যবস্থায় ও কুব্যবস্থায়, ধর্ম্ম-বিশ্বাসের বিকৃত গোঁড়ামিতে—কোন ক্ষেত্রেই আমরা সহজ ও শুভ বুদ্ধি লইয়া চলিতে পারিতেছি না। এই অস্বাভাবিকতার সম্পূর্ণ চিত্র সকলের চোখে ফুটিয়া উঠে না। নলিনী কিশোর গুহ-মহাশয় তাঁর "বিপ্লবের পথে" নামক পুস্তকে আমাদের সামনে আজ তাহা ধরিয়া তুলিয়াছেন। দুঃখদৈন্যের নানা মূর্ত্তির অঙ্কনে, কোন একটার উপরই তিনি তাঁর রংএর পাত্রটি নিঃশেষ করেন নাই, ইহা হয়ত সত্য। কিন্তু কৌশলী শিল্পীর ন্যায় তিনি প্রত্যেকটি চিত্রে যথোপযুক্ত রং ফলাইয়া সমগ্রের একটি পরিচয় আমাদের দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং দেশের যত সত্যাগ্রহী মন, কেহই আর এই স্বরূপটির সত্যতা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

শ

রেডিয়াম চিকিৎসা—ডাঃ সুবোধ মিত্র এম-ডি, এফ-আর-সি-এস, কর্ত্তৃক লিখিত ও চিত্তরঞ্জন সেবাসদন রেডিয়াম বিভাগ হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

একান্ত আনন্দের বিষয় যে ডাঃ সুবোধ মিত্র চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রথম পুস্তক লিখিলেন মাতৃভাষায়। বাঙলার রেডিয়াম চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে ডাঃ সুবোধ মিত্র অন্যতম। এদেশে রেডিয়াম চিকিৎসা এখনও বিশেষ

প্রসার লাভ করে নাই। সেইজন্য রেডিয়াম চিকিৎসার পরিচয় ও প্রসারকল্পে বিশেষজ্ঞের হাত হইতে এইরূপ একখানি পুস্তক বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে।

ক্যান্সার ও অন্যান্য দুরারোগ্য ব্যাধিতে রেডিয়াম চিকিৎসার ফলাফল এই পুস্তকে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ আছে। পুস্তকখানি সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত এবং একবর্ণ ও ত্রিবর্ণ অনেকগুলি চিত্র সম্বলিত। আমরা এই পুস্তকের সম্যক প্রচার কামনা করি।

স্ব

আর্টের আটচালা

দ্বারোদ্ঘাটন

"শনিবারের চিঠি" "আর্টের কোঠা" বানিয়ে ফেলেছেন। "প্রবাসীর" সমৃদ্ধির মাঝে বসে' সেটা অনায়াসেই সম্ভব। আমাদের অর্থ-সামর্থ্য কম। কোঠার খরচ কোথায় পাব? তাই একখানা "আর্টের আটচালা" তুল্‌ছি। অনেকে পরামর্শ দিচ্ছিলেন, "কবি-গুরুকে দিয়ে এর দ্বারোদ্ঘাটন করিয়ে নাও।" কিন্তু সেটা একেবারেই অসম্ভব। কারণ, কোঠা যত খারাপ মাল-মসলা দিয়েই তৈরি হোক্ না, তবু সে কোঠা, অতএব আভিজাত্যমণ্ডিত। আটচালার মধ্যে আর যাই থাক্, আভিজাত্য তো নেই।

'মেরেছ কলসীর কানা,
তা' বলে' কি প্রেম দেবো না?'

কবিগুরু "শনিবারের চিঠি"কে কোল দিয়েছেন। চৈতন্যদেব জগাই মাধাইকে কোল দেওয়ার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত পতিতোদ্ধারের এমন প্রাণমাতান উদাহরণ আর বোধকরি পাওয়া যায় নি। কিছুদিন পূর্ব্বেই "আত্মশক্তি"র মারফতে "শনিবারের চিঠি"র অন্যতম পাণ্ডা "অরসিক"রূপে 'রসের কলসীর' কানা ছুঁড়ে রবীন্দ্রনাথকে কি রকম আঘাত করেছিলেন সে-সংবাদ বোধ হয় অনেকেই জানেন। তারপরেও এই স্নেহের অভিব্যক্তি। এবারে তাঁর স্নেহের বন্যায় "সাহিত্য যে ডুবুডুবু, আর্ট ভেসে যায়!"

পথভ্রান্ত মেষপাল

মহাত্মা গান্ধী বাইবেলের অনেক নীতি অনুসরণ করেন বলে' যেমন প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তা' করেননি বটে, তবু তাঁর আচরণ থেকে অনেক সময়ে মনে হয় যে, সেদিকে তাঁর পক্ষপাতিত্ব কম নয়। কারণ, চিরদিন লক্ষ্য করা গেছে যে, অক্ষম এবং পথভ্রান্ত ভক্তদের প্রতিই তাঁর অসামান্য স্নেহ ও করুণা। তাই "বসন্ত প্রয়াণ" হ'ল বাংলাসাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ বই, "পঙ্কতিলকের" মত অপকৃষ্ট উপন্যাসের অপটু রচয়িতা পেলেন তিরস্কারের পরিবর্ত্তে একাধিক প্লট ও অফুরন্ত স্নেহের পুরস্কার, আর আজ "শনিবারের চিঠির" কপালে তিনি পরিয়ে দিলেন 'আর্টের' ফোঁটা! ততঃ কিম্?

পঞ্চভূত বনাম পাঁচভূত

সে বহুদিনের কথা। রবীন্দ্রনাথ রসসাহিত্য ও রঙ্গব্যঙ্গের 'আর্টের' স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর অপূর্ব্ব ব্যাখ্যান দিয়েছিলেন "পঞ্চভূতে"। সেটা পড়ে মনে হয়েছিল যে, এবিষয়ে তিনি একটা চরম ও চিরন্তনী বাণী উচ্চারণ করে গেলেন। আজ দেখছি তিনি তাঁর সেই মত বদ্‌লেছেন এবং

আমাদেরও বদলাতে বল্‌ছেন। 'আর্টের কোঠা' থেকে আজ "পঞ্চভূত" নির্ব্বাসিত, সেখানে স্থান পেল পাঁচভূতের কলকোলাহল ও গালাগালি। কলমের "অসাধারণ তীক্ষ্ণ ও তীব্র" অভিব্যক্তিই হ'ল "আর্ট"! অর্থাৎ কিনা প্রচুর লঙ্কা ও মরীচের ঝাল দিলেই তরকারি সুস্বাদু হ'বে। খুব সাধু এবং সহজ উপায়। কবিগুরুর নির্দ্দেশ অনুসারে তো তা' হ'লে "মিঠে কড়া", "আনন্দ বিদায়" এবং সমাজ-পতি মহাশয়ের অসামাজিক সাহিত্যালোচনাকে আর্টের কোঠায় ফিরে ডাক দিতে হয়।

সাহিত্য-জগতের গ্যালিলিও

কিছুদিন পূর্ব্বে "প্রগতি" আবিষ্কার করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের রচনাশক্তি মুমূর্ষু হয়ে পড়েছে। তাঁর আজকালকার ভাষা ও ভাব আল্‌গা এবং অসংলগ্ন; অনেক কথা বলেও তিনি যে ভাবটি সম্পূর্ণ ফুটিয়ে তুল্‌তে পারেন না, শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র-মহাশয় তাঁর সরস ও জীবন্ত ভাষার সাহায্যে দুচার কথাতেই তা' করে থাকেন।

সম্প্রতি শোনা গেল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই অভিনব আবিষ্কারের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করে চম্‌কে উঠেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত থেকে কলম খসে' গেছে। সে কলম নাকি তিনি আর কুড়িয়ে নিতে ইচ্ছা করেন না। এমন কি তিনি তাঁর কবিগুরুর আসন ছেড়ে দিতেও নাকি রাজী। (যদিও দুষ্টলোকে বলে তিনি সম্প্রতি কোন সভায় নাকি "আসন ছাড়ব না, ছাড়ব না" বলে' দৃঢ়ভাবে এই বিষয়ের প্রতিবাদ করেছিলেন।)

এখবর সত্যি হ'লে প্রেমেন্দ্র-ভক্তের জয়জয়কার। ভবিষ্যৎ কবিগুরুর কলম এবং আসন তা' হ'লে শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের পক্ষেই বাহাল হ'য়ে গেল।

পড় যাদু আত্মারাম

সেদিন জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি উচ্ছ্বসিত ভাবে বলছিলেন, আর্টের যে নব জাগরণ হয়েছে তার আর কোন সন্দেহই নেই। কারণ, শনিমণ্ডলের মধ্যে একজন কবির উদ্ভব হ'য়েছে যিনি ঘণ্টায় ৪টি করে 'প্যারডি' লিখতে পারেন।

শ্রোতাদের মধ্যে কে একজন বলে উঠল—প্যারডি অর্থাৎ প্যারটী তো (parroty)?

তার মানে?

তার মানে নিজের কিছু বলবার নেই। আর একজনের মৌলিক লেখা যখন এসে এঁর মনের গায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে বল্‌বে—পড় যাদু আত্মারাম তখনই উনি তাঁর বাঁধা বুলি কপচাবেন। ধ্বনির বিকৃত প্রতিধ্বনি করাই তাঁর কাজ। অবশ্য মানুষের মুখে কৃষ্ণ নামের চেয়ে, অনেক বিধবার নিজের পোষা ময়নার মুখে কৃষ্ণনাম শুন্‌তে বেশী ভাল লাগে। কিন্তু তাই বলে—

বক্তব্য শেষ হ'বার আগেই কবিবর নাকি সেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়

রবীন্দ্রনাথ নরেশচন্দ্রকে লিখিত পত্রের একস্থানে বলেছেন, "গল্প রচনায় যদি কিছুর প্রশংসা করিতে হয় তা নৈপুণ্যের ও কল্পনাশক্তির। সামাজিক দুঃসাহসিকতা গল্প-সাহিত্যের মুখ্য ও প্রশংসাযোগ্য পরিচয় হইতে পারে না।" কবিগুরুর উক্তির ব্যাপক অর্থ ধরলে মানতে হয় যে, সামাজিক দুঃসাহসিকতা গল্প-সাহিত্যের আসল বিচার্য্য ও আলোচ্য বস্তু নয়। তা' নিয়ে প্রশংসা বা নিন্দা করা চলে না। কিন্তু তাঁর আধুনিক ভক্তেরা দেখছি তাঁর কথার অর্দ্ধেকটা মেনে নিয়েছেন। তাঁরা প্রশংসা করতে নারাজ, কিন্তু তরুণদের গল্পসাহিত্যের দুঃসাহসিকতার নিন্দায় তাঁরা শতমুখ। তরুণদের রচনা ও কল্পনাশক্তির বিষয়ে তাঁরা দু এক কথা বলেন বটে, কিন্তু সেটা নিতান্ত গৌণতঃ। এই ভক্তদের মতে একেই বলে "বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়।"

ধরা পড়েছে জয়মিত্তির

শ্রীযুক্ত জলধর সেন-মহাশয় সাহিত্যিক-মহলে

বারোয়ারী 'দাদা'। তিনি বারবার তিনবার অন্ততঃ এই রকম দুঃসাহস দেখিয়েছেন। "বিশুদাদা" এবং অন্যান্য উপন্যাসে। চারুবাবু "পঙ্কতিলকে" এবং প্রেমাঙ্কুর আতর্থী মহাশয় "অচল পথের যাত্রীতে"। আরও অনেকে এই দলে আছেন। কিন্তু তাঁদের "ভাষা নৈপুণ্য, কল্পনাশক্তি বা সামাজিক দুঃসাহসিকতা" সম্বন্ধে একটি কথাও আজ পর্য্যন্ত সত্যসুন্দরের পূজারীর দলকে বল্‌তে শোনা গেল না। কিন্তু তরুণদের নিয়েই তাঁরা গলদ্‌ঘর্ম্ম। অথচ, তরুণদের লেখার তুলনায় পূর্ব্বোক্ত অগ্রজদের লেখার কাট্‌তি ও প্রসার অনেক বেশী। শোনা যাচ্ছে এঁদের মধ্যে নাকি একজন বৈজ্ঞানিক আছেন। তিনি এঁদের পরামর্শ দিয়েছেন "choose the line of least resistance".

বিরূপাক্ষ শর্ম্মা

শ্রী শিশিরকুমার নিয়োগী কর্ত্তৃক, ১এ, রামকিষণ দাসের লেন, নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস হইতে মুদ্রিত ও বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

বিশ্বাস

চিত্রকর — স্যর এডওয়ার্ড বার্ণ-জোন্স

কালি-কলম

২য় বর্ষ] চৈত্র, ১৩৩৪ [১২শ সংখ্যা

তমসার পথে

শ্রী জগদীশ গুপ্ত

সুরথ রক্ষিত ভূমিষ্ঠ হইয়া ধাইয়ের হাতের থাপ্পর খাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কোন্ যন্ত্র তার, ভিতরে ছিল কে জানে; আর, ধাইয়ের হাতের ঝাঁকানি খাইয়া কি কৌশলে তাহা 'সঠিক্' হইয়া টিক্ টিক্ করিয়া চলিতে সুরু করিল, তাহাই বা কে জানে; কিন্তু প্রতিবেশিনী মালতী ঠাকুরাণী আঁতুড় ঘরের দুয়ারে উৎকণ্ঠায় উবু হইয়া বসিয়া ছিলেন—

ছেলেকে কাঁদিতে শুনিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন।

কান্না সেই যে সুরু হইল, তারপর কবে সে কান্না থামিবে তাহারই কোনো উদ্দেশ না পাইয়া চরম উদ্বেগ আর অশান্তির ভিতর দিয়া রক্ষিত গোষ্ঠীর দিন কাটিতে লাগিল।...সুরথের নাম তখন সুরথ নয়, কিছুই নয়; কিন্তু সে ঘুমের ঘোরেও ফোঁপায়..... যেন রাগিয়া গেছে...... আপত্তি আর অসন্তোষ তার সব তাতেই।

তার অশ্রান্ত চীৎকারে গোঁসাইদাসের পাগল পাগল ঠেকে—

ভ্রূভঙ্গী করিয়া চোখ মুখ দিয়া সে রাগের বিষ ঝরায়—

পদ্মিনী সেই দিকে চাহিয়া ছেলেকে লইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া সরিয়া যায়।

সাতটি বছর কারণ অকারণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সুরথ কান্না থামাইল।...কিন্তু ঘরের কান্না ছিল ভাল, বাহিরের কান্নায় যে প্রাণ বাঁচে না।...কাঁদিতে সুরথ জানিত; দেখা গেল, কাঁদাইতেও সে জানে।

সুরথের বাপ গোঁসাইদাস এই কাঁদাইবার নালিশ শুনিতে শুনিতে জুতা লাঠি ছাতি কাঠ যাহা পায় তাহাই লইয়া ছুটিয়া যায়; কিন্তু সুরথের নাগাল পাওয়া কঠিন।

বাহিরে যাহারা কাঁদে তাহারা সুরথের সমবয়সী

খেলার সাথী। কিন্তু খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে সুরথের সখ্যতা প্রবল আর কঠিন দুইই—

সঙ্গীদের প্রায়ই তা' সহ্য হয় না।

সে এক অদ্ভুত ব্যাপার—যেন ভৌতিক জ্ঞান…

ঘ্রাণ পায় কি ছায়া দেখে কে জানে, কিন্তু যেখানেই লুকান' থাক, অমুকের মিছ্‌রির টুক্‌রাটি কি মার্‌বেলটির উপর যাইয়া সুরথের হাত পড়িবেই—

প্রথমেই যাইয়া জাপ্‌টাইয়া ধরে ঘাড়……

তারপর যা থাকে অদৃষ্টে—

মিনিট্‌খানেক লুণ্ঠন ও রক্ষার প্রাণপণ ধস্তাধস্তির পর কাঁদিতে কাঁদিতে খেলার সঙ্গিটি ঘরে ফেরে—

সুরথ বগল বাজায়; লুঠ্‌ লইয়া নাচিতে থাকে।…

সুরথের বাপ গোঁসাইদাস বলে,—এ সয়তানের ষষ্ঠী আমার ঘরে এল কোত্থেকে!…এমন চোর আর পাজি আমার রক্তে জন্ম নিয়েছে!…বলিয়া নিজের রক্ত-গৌরবে সে অবাক্ হইয়া থাকে।

সুরথের গর্ভধারিণী কথার ভাবার্থটা বোঝে—

অপরাধিনীর মত মুখ হেট করে, যত দোষ তার; দুর্বৃত্ততা মাতৃকুল হইতে ছেলের রক্তে নামিয়া আসিয়াছে…

প্রতিবাদ করে না; বলে,—সেরে যাবে।…তুমি অমন মুখ করে' ওকে ধম্‌ক' না ত'।…কতটুকু বয়েস ওর। এই বয়েসে ছেলেরা যদি দুষ্টুমি না কর্‌বে তবে কর্‌বে কবে? বলিয়া সুরথের মা পদ্মিনী মনে মনে ভালবাসার অগাধ হাসি হাসে, আর মুখ "হাঁড়িপানা" করিয়া অসন্তোষের ভাণ করে।…পাড়াপড়্‌শীরা যা-ই বলুক, সহ্য হয়, কিন্তু ঐ "গোম্‌রামুখো বুড়ো মিন্‌সের" আক্কেল দেখ—

কচির প্রতি ধাড়ির অকারণ নির্য্যাতনে পদ্মিনীর মাতৃ-ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিতে থাকে।

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর শয্যায় পড়িয়া গোঁসাই-দাসের একটু বিশ্রাম করিবার অভ্যাস বরাবরই আছে—

কোনোদিন বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটে নাই—

কিন্তু আজ ঘটিল।

গোঁসাইদাস বিছানায় উঠিয়া পদ্মনাভনাম স্মরণ করিতে করিতে চাদরটার ভাঁজ খুলিয়া পা ঢাকিয়া কোমর পর্য্যন্ত টানিয়া তুলিয়াই আর্ত্তনাদ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া কোন্ দিকে ছুটিবে প্রথমতঃ তাহারই দিশা পাইল না—

তারপর অধঃ উর্দ্ধ বাম ও দক্ষিণে চতুর্দ্দিকে হাত ঘুরাইয়া আত্মরক্ষা করিতে করিতে ছুটিয়া যাইয়া গোঁসাই উঠানে পড়িল—

কিন্তু ততক্ষণে সাত আটটি বোল্‌তা তার ঘাড় মুখ চোখের পাতা প্রভৃতি সুকোমল মাংসল স্থানে হুল বিদ্ধ করিয়াছে।

বলা বাহুল্য, চাদরের ভিতর বোল্‌তার বাসা সুরথই রাখিয়া দিয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে গোঁসাইদাসের মুখ ফুলিয়া ঢাকের চেয়েও ভীষণ হইয়া উঠিল—

চালে গোঁজা ছিল অকেজো অথচ মজবুত খড়ম এক-খানা—সেইখানাকেই টানিয়া লইয়া গোঁসাইদাস হুলের বিষে অন্ধ হইয়া যে-কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল তাহার বর্ণনা নাই……

সুরথের পিঠে তিন চার ঘা খড়ম পড়িতেই সুরথের মা পদ্মিনী দুই হাত তুলিয়া ছেলের আর ছেলের বাপের খড়মের মাঝখানে ঝাঁপাইয়া পড়িল—

তারপর খড়ম বিদ্যুদ্বেগে ওঠানামা করিতে লাগিল পদ্মিনীরই পিঠে—

এবং গোঁসাই তাহা জানে।

…প্রতিবেশীরা আসিয়া যখন গোঁসাইদাসের হাতে

খড়ম কাড়িয়া লইয়া তাহাকে গার্হস্থ্য কুরুক্ষেত্রের ভিতর হইতে টানিয়া তুলিল তখন স্ত্রীর পিঠের দিকে চাহিয়া তাহার মুখের কোথাও হাসি ফুটিল কি না তিলভাণ্ডেশ্বরের স্ফীতির ভিতর তাহা ঠিক বোঝা গেল না; কিন্তু অন্তর্যামী জানিলেন, বিষের জ্বালা যেন কিছু কম।

সুরথ ইস্কুলে যায়—

পদ্মিনী তাহার দিকে উৎফুল্ল চোখে চাহিয়া থাকে... "ধন" আমার বিদ্যা অর্জ্জন করিতেছে..শান্ত সুশীল সুবোধ হইবে......চাকুরী করিবে··টাকা আনিবে··মাকে খাওয়াইবে, পরাইবে···

আনন্দে জননী বিভোর হইয়া যায়—

যে-পথে ছেলে ইস্কুলে গিয়াছে, সেই পথের দিকে চাহিয়া থাকে; চোখের পাতা নড়ে না।

···সুরথের ইস্কুলের পথের প্রত্যেকটি জীবিত পদার্থ তাহাকে চেনে।—ছেলেমেয়েরা তাহাকে দেখিয়া ছিট্‌কাইয়া পালায়, বর্ষীয়সীরা পাশ কাটায় আর বিড়বিড় করে; পুরুষেরা দাঁতে দাঁত ঘষে······

বাবুলাল মিস্তিরীর কালো সাদা বিড়ালটা তড়্‌বড়্‌ করিয়া গাছে উঠিয়া যায়.. পাতার ভিতর হইতে নীচের দিকে ভয়ে ভয়ে চাহিয়া চাহিয়া দেখে।—

বেওয়ারিশ্‌ পথের কুকুরটা নড়িতে পারে না—

সুরথকে দেখিয়া সে চার পা আর গা লুটাইয়া কখনো লেজ নাড়ে, কখনো কেঁউ কেঁউ করে।

পথ এমন নিষ্কণ্টক পরিষ্কার তবু সুরথ ইস্কুলে যাইয়া কখন পৌছে তার ঠিক্‌ নাই।...তার দু' পকেট ভরা ঢিল থাকে—ছুড়িতে ছুড়িতে সুরথ আগাইতে থাকে—

গাঁছের ডালের পাখীটি, ফলটি; সুরথের ঢিলের শব্দে পাখী উড়িয়া পালায়, ফলটির গায়ে কখনো ঢিল লাগে, কখনো লাগে না।

······ফ্রৎ করিয়া কানের পাশ দিয়া এতটুকু একটি পাখী উড়িয়া যায়; সে-দিকে খানিক্‌ না চাহিয়া থাকিলে সুরথের চলে না—

যেন ঠিক্‌ পায়ের তলার মাটি ফুঁড়িয়া উঠিয়া খরগোস দিক্‌হারা হইয়া ছুটিতে থাকে...কিছুক্ষণ তাহার পশ্চাদ্ধাবন না করিলে সে-ই বা কি মনে করিবে!···সে যেন সুরথের সঙ্গেই খেলা চায়।

নিত্যই সব অপরিচিত নূতন মনে হয়—

ঐ দূরের গাছটা, ঝাপ্সা, ঘন; চেনা যায় না কি-গাছ; রোজই সুরথ তাহাকে প্রাণপণে নিরীক্ষণ করে।···বোধ হয় লক্ষ পাখী ঐ গাছটাতে বাস করে; ঝাঁকের ভিতর দিয়া একটা ঢিল পার করিয়া দিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত··· একটার ঠ্যাং ভাঙ্গেই—

সুরথের হাতের ঢিলটা ছুটি ছুটি করে।

···ঘরের জন্য কবে কে মাটি তুলিয়াছিল—

সেই গর্ত্তটায় একটুখানি জল আছে—নাম মাত্র, কিন্তু স্বচ্ছ।···ব্যাং কোথায় থাকে দেখা যায় না—হঠাৎ কিসে ভয় পাইয়া জলে পড়িয়া সে সাঁতরাইতে থাকে; বেকুবের মত নড়্‌বড়্‌ করিয়া পা নাড়ে, কদাকার চোখ দু'টা জলের উপর ভাসাইয়া তোলে···ব্যাঙের চূড়ান্ত অপটুত্ব দেখিয়া সুরথ খানিক সেখানেই দাঁড়াইয়া না হাসিয়া পারে না—

ডোবাটার কাছেই একটা ভাঙা পড়ো বাড়ী—লম্বা একখানা ঘর...গবাক্ষ দিয়া দেখা যায় কেবল তার ভিতরকার নিরেট অন্ধকারটা···অন্ধকারের ভিতর হইতে একটা শব্দ আসে—অনুচ্চ দীর্ঘ অফুরন্ত নিঃশ্বাসের মত ...জিঘাংসায় এমন কঠিন, যেন শব্দের হাড় আছে।

সুরথ ধীরে ধীরে অন্যদিকে চায়—

দু'টি ছাগলছানা খেলা করিতেছে—সম্মুখের দু'টি পা মাটি ছাড়িয়া তুলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করে—

তখনই ছুটিয়া দূরে যায়—

একটা শুক্‌নো পাতায় মুখ দেয়; আর একটা কোন্‌ দিকে চাহিয়া থাকে—যেন ওদের চেনা শোনাও নাই। সুরথ ভাবে:..পাঁঠা কি না!···

তারপর ঐ চাক্‌খানা—ঝুলিয়া পড়িয়া মাটির সঙ্গে ঠেক'ঠেক'—মাছিগুলি অবিশ্রান্ত নড়িতেছে···রোজই মনে হয় আজই ভাঙিয়া পড়িবে···কিন্তু ভাঙিয়া পড়ে না।

তাহাই ভাবিতে ভাবিতে ইস্কুলে পৌছিয়া সুরথ দেরীর জন্য "কানমুটি" খায়; কিন্তু সে দিকে তার চৈতন্যোদয় কবে হইবে তাহা দৈবজ্ঞ জানেন।

পড়ায় তার মন নাই—

কেবল আছে নির্ব্বোধের গোঁ, নির্য্যাতনে মতি, আর কাড়িয়া খাইবার চেষ্টা।—ছেলেরা ত্রাহি ত্রাহি ডাক্‌ ছাড়ে...

কিন্তু একদিন সুরথ বড় আহত হইয়া বাহকচতুষ্টয়ের হাতের উপর দেহ রাখিয়া ইস্কুল হইতে বাড়ী ফিরিল।

ইস্কুলের কাছেই একটা গাধা চরিত; কাদের গাধা সে-পরিচয় জানা নাই, কিন্তু বড় ভালমানুষ; মাঝে মাঝে খুব উচ্চৈঃস্বরে সে ডাকিত; শুনিয়া মনে হইত, বসুন্ধরার তৃণবৃদ্ধিতে সে খুশী।...ছেলেরা তার নাকে কাঠি দিয়া সুড়সুড়ি দিত···তার পিঠে চাপিত একসঙ্গে পাঁচ সাতজন; আর টানিয়া টানিয়া দেখিত, কান আরো লম্বা হয় কিনা···

কিন্তু কত সয় আর!

গাধা একদিন ক্ষেপিয়া গেল; এবং চাট্‌ ছুড়িয়া যে বাছুরটাকে সে জখম করিয়া ছাড়িয়া দিল, কোনো অপরাধই সে করে নাই।

বাছুর জখম করিয়া গাধার খুন চাপিয়া গেল—

তারপর আক্রমণ করিল মানুষকে—

এবং সেই মানুষই আমাদের সুরথ।...সুরথকে দেখিয়াই সে বড় বড় দাঁত মেলিয়া হাঁ করিয়া তাড়িয়া আসিল, এবং চক্ষের পলক না ফেলিতেই তার কাঁধ কামড়াইয়া ধরিয়া খানিকটা মাংস তুলিয়া লইল...

তারপর গাধাকে সে-মাঠে আর দেখা যায় নাই।

সুরথের কাঁধের ঘা শুকাইতে পুরা একটি মাস লাগিল; এবং তারপর আর সে ইস্কুলে যায় নাই।

* * * সুরথের মা পদ্মিনীর কেবল চোখের দু'টি পাতা এক করিবার অপেক্ষা—অমনি সে দেখিতে পায় সেই সুরথটাকে, যে বাপের ধাক্কায় মায়ের কোলে আসিয়া পড়িত···কখনো কাঁদিয়া ভাসাইত, কখনো আক্রোশে ফুলিত!...চোখ চাহিয়াও সুরথের মা বিস্ময়ে পুলকে আত্মহারা অবাক হইয়া থাকে—

সেদিনকার সুরথ—

আজ তার গোঁফের রেখা দেখা দিয়াছে!

···সুরথের যৌবনোদ্গমের সুপ্রচুর আয়োজন, তার সুস্থ সবল ভঙ্গীবেগ পদ্মিনীর দৃষ্টি ভরিয়া সুধা বৃষ্টি করিতে থাকে।

কিন্তু গোঁসাই কেবল গাঁক্‌ গাঁক্‌ আর মার্‌ মার্‌ করে; বলে,—অকর্ম্মা, ঢেঁকি...ওকে দূর করে দাও···নাম ডুবোলে আমার।...ও মরবে কবে!...

শুনিয়া পদ্মিনীর জ্ঞান থাকে না—

কথা যা তার ছুটিতে থাকে তাহা ভাষা আর ভয়কে ডিঙাইয়া কেবল ভাবরাজ্যে লাফাইতে থাকে; তারপর নামে 'গলদ্‌ ধারে' চোখের জল; আর নাকের ফোঁস-ফোঁসানি থামে সে ঘুমাইলে।

বাপের সম্মুখে সুরথ যায় না।

মাকে সে খাটাইয়া মারে, জ্বালাইয়া মারে·· যেন

তোয়াজ করিবার একমাত্র বস্তু হিসাবেই মা তাহাকে প্রসব করিয়াছিল।…

সুরথের সম্বোধন নীরস—

পরকে পিষিয়া সে নিজের আরাম আদায় করিতে চায়; তার কণ্ঠ কঠোর, ভঙ্গী ক্রূর—

জিজ্ঞাসা করে,—আমায় চাও কি চাও না?

প্রশ্নটা কানে বাজিয়া পদ্মিনী ছেলের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে—

সুরথ বলে,—ন্যাকা!…যদি আমায় চাও তবে যা' বলি তখনই তা' করবে। যদি না চাও স্পষ্ট বলো, চলে' যাচ্ছি;· ভাগাভাগি আমি চাইনে… আছি কি নেই ব্যস্।…কারু কেউ নই, অথচ ঘরে আছি—সে আমার দ্বারা চলবে না।

অপরাধ কিছুই হয় নাই—হয় তো সুরথের ডাকে তাহার দিকে মুখ তুলিতে পদ্মিনীর বিলম্ব হইয়াছিল।—

ব্যথায় পদ্মিনীর দু'চোখ আবিল হইয়া আসে—

বলে,—ও ম'লে' তুই মারবি আমায়।

কিন্তু ক্ষমা করে; মনে পড়িয়া যায়, ছেলে যে এখনো কচিটি।

গোঁসাইদাস হিসেবী লোক; কিন্তু ছেলের সম্বন্ধে হতাশ হইয়া সে ভুল করিয়াছিল—

বালকের ক্রীড়া কৌতুকে যে বৃত্তিটার অস্বাভাবিক অসংযত বৃদ্ধি দেখা গিয়াছিল, কর্মক্ষেত্রে তাহারও যে প্রয়োজন কতটা তাহার হিসাব গোঁসাইদাস করে নাই।

উচ্ছৃঙ্খলতাও কাজে লাগে।—কাজেকর্মে হুঁস বলিতে যে সূক্ষ্ম বস্তুটা বুঝায়, ছেলে বেলায় সুরথের তা ছিল না… দুর্ব্বলের হাতের খেলনা কাড়িয়া লইয়া আত্মসাৎ করিতে হইবে—এই ছিল তার একমাত্র পদ্ধতি।

সে খাইবে—

কিন্তু তার খাওয়াই পণ্ডশ্রম যদি এক পাল ছেলে মেয়ে জিহ্বায় অপর্য্যাপ্ত জল লইয়া তাহার সেই খাওয়ার দিকে চাহিয়া না থাকে!…ছেলেরা দল বাঁধিয়া বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে বিপদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া চার হাত পায়ে মার চালাইবার উদ্যমটাই তার দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিত—

পরাজয় গ্রহণ করিত সে বিস্ময়ের মত।—লোকোত্তর এই শিক্ষা আর অভ্যাস পরে বড় কাজে লাগিয়া গেল… পরস্ব লুঠিয়া আর কাড়িয়া খাইয়া সুরথের শ্রী ফিরিয়া গেল।…পৃথিবীর স্থূলবস্তুগুলি যেন লুণ্ঠিত হইবার জন্যই হা হুতাশ করিয়া মরিতেছিল…এম্‌নি ব্যগ্রভাবে তাহারা সুরথের হাতে আসিয়া পড়িতে লাগিল।—

সুরথের বিবাহ হইল যোগমায়া যে মেয়েটির নাম তাহারই সঙ্গে। গোঁসাইদাসের আর কিছু না থাক্, কৃপা করিবার উৎসাহ ছিল; অনাথা কন্যাটিকে সে তার ভঙ্গুর আশ্রয় হইতে স্থায়ী আশ্রয়ে তুলিল।

যোগমায়ার সর্ব্বাঙ্গে দিব্যি শ্রী, তার দিব্যি স্বভাব, সে দিব্যি ঠাণ্ডা, দিব্যি তার কথাবার্ত্তা, দিব্যি বুদ্ধি বিবেচনা।

কিন্তু মনের মত পুত্রবধূটিকে লইয়া কোনোদিন সাধ-আহ্লাদ করা গোঁসাইদাসের হইল না।

মরার আগে গোঁসাইদাস একটা সুবুদ্ধির কাজ করিয়া গেল—

যোগমায়াকে জিজ্ঞাসা করিল,—বৌমা, তোমার শাশুড়ী কোথা?

—ঘাটে গেছেন।

একটা চাবি সে যোগমায়ার হাতে দিল; বলিল,—খোলো আমার হাতবাক্সটা।…সাম্‌নেই এক তাড়া নোট আছে; নিয়ে রাখো; কাউকে বলো না, কেবল তোমাকেই দিলাম।

নোটের তাড়া তুলিয়া লইতে যোগমায়ার হাত কাঁপিতে লাগিল।

গোঁসাইদাস সুরথকে ত' চিনিতই—নিজের স্ত্রীকেও চিনিত।

গোঁসাইদাস গোপনে কিছু ঋণ করিয়াছিল, সেটা সে গোটাই রাখিয়া গেল; কিন্তু প্রকাশ করিয়া গেল।

বাপ ঋণ রাখিয়া পরকালের অন্ধকারে প্রবেশ করিতেছে এটা সুসংবাদ নিশ্চয়ই নয়, এবং সেই সংবাদে সুরথ বাপের মৃত্যুশয্যার পাশে বসিয়াই মুখভঙ্গী করিয়া বলিল,—বিটুকেল লোক।

গোঁসাইদাসের তখন হরিনামের প্রয়োজন—

কিন্তু ঋণের দায়িত্ব অকস্মাৎ স্কন্ধে পড়ায় সে দিকে সুরথের আর প্রবৃত্তিই রহিল না।—

পদ্মিনী চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতে লাগিল—

আজ তার প্রথম মনে হইল, সুরথের মত ছেলে না হইলেও ক্ষতি ছিল না।

পদ্মিনী বলে,—এই যে মেয়েটি দেখছ...আমার জীবন-কাঠি মরণ-কাঠি ওর হাতে...বলিতে বলিতে পদ্মিনীর ছেলের কথা মনে পড়িয়া যায়; একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে,—মাঝে মাঝে ভাবি বোন্, সুরথ কেন আমার পেটেই হ'ল; আবার ভাবি, হয়েছিল বলেই ত' এই বৌ পেয়েছি।...তারপর, বৌ ঠিক্ এমনটি না হইলে কতদিকে কত দুরবস্থা ঘটিতে পারিত তাহারই একটা কঠিন শৃঙ্খল তাহার মনে গড়িয়া ওঠে।

বোন্ বলে,—লক্ষ্মী বৌ।

চারিদিকে চাহিয়া পদ্মিনী বোনের কানের কাছে মুখ লইয়া বলে,—অমন বউকে ছেলে তুচ্ছ করে; ভাল করে' ওর পানে চায় না।

চোখে তার জল আসিয়া পড়ে—

আর কথা হয় না।

পদ্মিনীর বৈধব্যজীবন অসহ্য হইয়া উঠিত কিনা সে-বিষয়ে আর যারই সন্দেহ থাক্, পদ্মিনীর নিজের ধারণা, অসহ্যই হইত—

কিন্তু হয় নাই—

যোগমায়া তার অন্তরের আর সেবার মধু দিয়া তাহাকে ভরিয়া রাখিয়াছে।

পদ্মিনী বলে,—উপরে যিনি আছেন, তিনি খড়-কুটোতেও আছেন, মানুষ ত একটা জীব। তিনি আমায় দিয়েছেন এই মেয়েটিকে অন্ধের নড়ি। তাঁরই জীব তাঁরই জীবের জীবন। লোকে কেন বল্‌বে বোন, আমি নিজে জানি।

বোন্ যে সেখানে থাকে সে বলে,—মিছে নয় বোন; চোখের দিষ্টি হরণ করেন তিনি; আবার তিনিই এসে হাত বাড়িয়ে দেন—ধরে নিয়ে বেড়ান্। কিন্তু সে দিন কাল কি আর আছে দিদি! যা' করেন হরি বলে' এখন আর কেউ স্থির থাক্‌তে চায় না।

কথাটা সত্য—

সুরথ তার স্ত্রীকে ভালবাসে না; কিম্বা ইহাও হইতে পারে, ভালবাসা তার পক্ষে অসম্ভব।...সুরথের দেহ বাড়িয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু মনের পরিধি বাড়ে নাই. উঁচু দিকেও সে বাড়ে নাই; প্রকৃতি তার তেমনি দুরন্ত, আর অবোধ; কিন্তু সমর্থ—

কিন্তু সমর্থ সে কেবল এই হিসাবে যে, নিজের খেয়াল চরিতার্থ করিতে সে পারে; সেইদিকে অসাধারণ পাশবিক গোঁ। ছাড়া আর কোনো প্রচলিত কর্ম্ম-পদ্ধতির তোয়াক্কা সে রাখে না—

ইচ্ছা সে অপূর্ণ রাখে না—

পরের হাত তার সয় না।

স্বামীর গুরুত্ব সম্বন্ধে যোগমায়ার মনে কোনো প্রশ্ন কি আবছায়া ভাব নাই; স্বামী যে পরমগুরু তাহা সে

স্পষ্ট জানে ; স্বামী তুষ্ট হইলে নারায়ণ এবং যেখানে যত দেবতা আছেন সবাই তুষ্ট হইয়া তাহার সিঁথীর সিঁদুর আর হাতের "নোয়া" অক্ষয় রাখিবেন তাহাও সে না জানে এমন নয়।

স্বামীকে তুষ্ট করিতে তার আকুলিব্যাকুলির অন্ত নাই—

একেবারে নিখুঁৎ পতিসেবাই তার অহরহ কামনার জিনিষ—

কিন্তু অদৃষ্ট তার এম্‌নি যে, দেবতারাই যেন ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে তাহার নিজেরই মনের মত হইয়া উ‌ঠিতে দেন্ না—

তাঁহাদেরই ইচ্ছায় সুরথ যেন তার আঁত্ বাড়ীর ঘর দুয়ারে উঠানে আকাশে মাটিতে সর্ব্বত্র বিছাইয়া রাখিয়াছে, যোগমায়ার জোরে একটা নিঃশ্বাস পড়িলেও সুরথের সেই আঁতে যাইয়া ঘা লাগে—

সে ক্ষেপিয়া ওঠে—

যোগমায়া দাঁতে জিব কাটিয়া কোথায় মুখ লুকাইবে তাহারই দিশা পায় না।

...লুকাইবার চেষ্টাই যেখানে একজনকে সর্ব্বক্ষণ নাচাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে, সেখানে ভালবাসিবার যোগ্যতা আর অবসর ফুটিবার আয়োজনই হইল না।— যোগমায়া নিজের অযোগ্যতার লজ্জায় সারা হইয়া যায়।

তবু সে স্বামীর সম্পত্তি, মনে প্রাণে অখণ্ড আর নিষ্কলুষ।

সুরথ তাহাকে জানাইতে ভোলে নাই যে, তাহাকে সে চায়, কিন্তু তার "ন্যাকামি" তার বরদাস্ত হয় না।

...যোগমায়ার সুখ সুবিধা, আশা আকাঙ্ক্ষা, ভাব অভাব—সবই ন্যাকামি ; অকারণে কাছে আসিয়া দাঁড়ানও ঐ ন্যাকামিরই অন্তর্গত।

নতুন বিয়ের কনেরা বেড়াইতে আসে—

তারা গালের রঙে, ঠোঁটের কোণে, হাসির ছটায়, আঙুলের লীলায় সুখের মধু ভরিয়া আনে—

যোগমায়ার সম্মুখে তাহা উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া যায়...

যোগমায়া সেই অপরূপ রহস্যলোকের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে—এমন অসহায় চক্ষে, যেন সম্মুখেই তার মণিমুক্তার পুঞ্জ—কিন্তু হাত অবশ...

অবশ হাতে মালা গাঁথা তার সাধ্যাতীত।

.. গ্রথিত পূর্ণাঙ্গ মালাটির মূর্ত্তিই সে দেখে...নিমেষে নিমেষে তার গর্ভলোকে কত রং কত দ্যুতির আসা আর যাওয়া। ছবির পর ছবি চোখের সম্মুখে হাসিয়া ওঠে, জ্বলিতে থাকে—

যোগমায়ার চোখ ঝক্‌ঝক্ করে—

একটা নিঃশব্দ আর্ত্তনাদ দীর্ঘনিঃশ্বাসে কাঁপিতে কাঁপিতে থামিয়া থামিয়া বাহির হইতে থাকে।...

—বৌ, তোর কথা কিছু বল্‌লিনি যে ? বলিয়া একজন যোগমায়ার চোখের দিকে হা করিয়া চাহিয়া থাকে।

কিন্তু যোগমায়া শুনিতে পায়, তার বুকের ভিতর কেবল একটা চরম ক্লান্ত অসহ্য দ্রুত নিঃশ্বাসের শব্দ...যেন কে প্রাণের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া দীর্ঘ পথ দৌড়াইয়া আসিয়া হা হা করিয়া হাঁপাইতেছে।...যোগমায়া তদ্গতচিত্ত হইয়া কান পাতিয়া সেই শব্দটা শোনে—

কথা কয় না।

কিন্তু উহারা জানে, সুরথ তার সর্ব্বোচ্চ কেশাগ্র হইতে পদাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রাণের প্রাবল্যে অস্থির ; সে যে এমন কিছু করে না যাহা সহজে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইবার মত নয়, তাহা তাহারা বিশ্বাসই করে না—

অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়া যায়—

কিন্তু আবার আসে।—স্বামীর সোহাগের তৃপ্তির কথাগুলি একে একে স্মরণ করিয়া গোপনে সখীর কানে বলাও যে সম্ভোগ!

সুরথ সুস্থ সবল পুরুষ—

দীর্ঘায়তন দেহে তার যৌবনের রক্ত ফুটিতেছে—

কিন্তু উহারা জানে না যে, সে উত্তাপের স্পর্শ যোগমায়ার মনে লাগে নাই।...

অর্থে অলঙ্কারে রসে বিন্যাসসুষমায় অপূর্ব্ব কত কাহিনী নরনারীর বুকে বিরচিত হইয়া কণ্ঠে কণ্ঠে উদ্গীত হইতেছে ...মনে মনে তাদের কত ছন্দ, কত সঙ্গীত, কত নিবেদন, কত হর্ষ মুহুর্মুহুঃ উদ্গত উদ্বেলিত হইয়া বিলীন হইয়া যাইতেছে...

যোগমায়া ভাবে, তাহারা দু'জনে যেন জগৎব্যাপী শ্লোকসঙ্গীতের মাঝে অতিশয় শ্রুতিকটু অপটু পাদদ্বয়—

একেবারে বেমানান্—পদে পদে অর্থের গরমিল।

যোগমায়া সুপুরি কুচাইতেছিল—

প্রথমে সে মুখ ফিরাইয়া লইল—

তারপর জাঁতি ফেলিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল।

নিজের উপরে শ্রদ্ধা তার নাই; নিজের অপমান নিঃশব্দে গা পাতিয়া লইয়া যে নূতন একটি জীবনবহনের দায়িত্ব সে গ্রহণ করিয়াছে, সে দায়িত্বের প্রতি যেমন তার লেশমাত্র ক্ষমার ভাব নাই, তেমনি এই গুরুভার টানিয়া টানিয়া চলিবার স্পৃহাও তার নাই।...লাঞ্ছিত ভিক্ষা-মুষ্টির মূল্য ভিখারীর কাছে যতটুকু, তার নিগৃহীত নারীত্বের কাছে এই সন্তানবহনের মূল্য ততটুকুও নয়।...পৃথিবীর অন্তর্য্যামী দেবতার সম্মুখে ইহা তাহার একান্ত পরাজয়, অমার্জ্জনীয় অপরাধ।—

সুরথ স্ত্রীর মন বুঝিতে চাহে নাই—

গৃহে তার স্থান কোথায়, মর্য্যাদা তার আছে কি নাই, সেই ভাবনাই সুরথের মাথায় কোনোদিন আসে নাই।...যোগমায়ার ধ্যানের কিছু নাই, তাই বলিবার কিছু নাই—

চোখ বুজিলেই, মাঝখানকার অন্ধকার গহ্বরটি তার চোখে পড়ে—

স্ফুটতম রেখায় এই নিদারুণ সত্যটিই ফুটিয়া ওঠে—জীবন বৃথা।

যোগমায়ার মুখখানি অতি সুকুমার—সুকোমল চক্ষু দু'টি; সমস্ত মুখাবয়বে শিশুর লাবণ্য ঢল ঢল করিতেছে—

তারি উপর একটা বিশীর্ণ পাণ্ডুরতা অল্পে অল্পে ছড়াইয়া পড়িতেছে—

সময় সময় অসহায় ত্রাসে তার বুক হঠাৎ ধড়ফড় করিয়া ওঠে, গা ঘামে।...যে যন্ত্রণার দিন আসিতেছে তাহা দুস্তর পাথারের মত তাহার সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে; তাহা উত্তীর্ণ হইবার কোনো অবলম্বন বা শক্তি সে খুঁজিয়া পায় না—

মাতৃত্বের যে অগাধ উন্মথিত আনন্দের ফেনায় সব যন্ত্রণা আচ্ছন্ন হইয়া যায় তাহার উদ্দেশ তার স্বপ্নে জাগরণে কোথাও নাই।

মালতী ঠাকুরাণী তাঁর মালার থলেটির জন্য বিখ্যাত; থলের গায়ে অমন সীবন-শিল্পের বাহবা-বাহার আরো নামজাদা কৃষ্ণভক্তের গৃহেও দেখা যায় না।

মালতী আসিয়া বসিয়াছেন—

যোগমায়ার দিকে চাহিয়া চাহিয়া তিনি সন্দেহটা আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না; বলিলেন,—বউকে পাংশে দেখছি যে, পদি?

'পদ্মিনী বলিল,—ওমা, পোয়াতি যে! তিনমাস।

সুরথ আসে, গম্ভীর হইয়া থাকে—

কিন্তু নিজের কাছে সে স্বীকার করিতে না চাহিলেও ইহা সত্যই যে, সে স্ত্রীকে আজকাল কেমন একটু ভয় করে।

যোগমায়া তার কাছে আসে না—

কেবল দূর হইতে তাহার দিকে যেন কেমন করিয়া চাহিয়া থাকে—

চোখে চোখ পড়িলেই যোগমায়া দৃষ্টি টানিয়া লয়; কিন্তু স্পষ্ট একটা ছাপ রাখিয়া যায়। সুরথের তাহাতে রাগ হয় না, মমতা জন্মে না…ভয় হয়।…যে অকারণ প্রচণ্ডতা লইয়া সুরথ পৃথিবীময় দুপ দাপ্ করিয়া বেড়ায়, তাহার সে-পৃথিবী তাহার সম্মুখে গা গুটাইয়া কেবলি সরিয়া সরিয়া গেছে; তাহাতে সুবিধা হইয়াছে ঢের; কিন্তু মনে মনে তাহাকে সে ঘৃণা না করিয়া পারে নাই।

যোগমায়া যে দৃষ্টিতে দূর হইতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে, সুরথ অনুভব করে, তাহাতে ব্যথা নাই, বিদ্রোহ নাই, মিনতি নাই, প্রার্থনা নাই, দান নাই—

কিন্তু সে-দৃষ্টি ভদ্র, মানী, অসঙ্কোচ—

সে-দৃষ্টি কেবল সহিষ্ণু নীরবতায় অপার অক্ষমা সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছে…

অথচ যোগমায়া তেমনি বশীভূত, আজ্ঞার দাসী।

যোগমায়াকে সুরথ কাছে ডাকে—

যোগমায়া আসিয়া দাঁড়ায়—

সুরথ বলে,—তোমায় বড় মনমরা দেখি; হাসি খুশী দেখিনে; কেন?

যোগমায়া বলে,—হাসি খুশী কাকে নিয়ে করব?

সুরথ বোঝে, স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ নাই—

কিন্তু কেন এই চরম নিঃস্পৃহা তাহা সে তল্লাসও করে না—

কলস্বরে বলে,—আস্‌ছে, লোক আস্‌ছে।

যোগমায়া সরিয়া যায়—

কিন্তু সুরথের খচ্ করিয়া কোথায় একটু বাজে…সরিয়া ত যাইবেই; যদি একটু হাসিয়া যাইত! মুহূর্তের জন্য একটু অতৃপ্তি সাড়া দিয়া যায়।

তিনটি লোকের বেশী এ বাড়ীতে রাখা বিধাতা-পুরুষের যেন পোষায় না।

যোগমায়ার পুত্রটি ভূমিষ্ঠ হইলে, অল্প কিছুদিন তাহার প্রতি সুসতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া, পৌত্রের কথা ভাবিতে ভাবিতে পদ্মিনী তার ভগবানের পাদপদ্মে যাইয়া আশ্রয় লইল।

সুরথ অবুঝ নির্মম হইয়া তাহাকে যত ব্যথা দিয়াছে, মাতৃহৃদয় তাহা ক্ষমা করিয়াছে, ভুলিয়াছে; কিন্তু মুমূর্ষু পিতার পার্শ্বে বসিয়াই সুরথের সেই কটূক্তিটা পদ্মিনী ভুলিতে পারে নাই—

সেই কথাটি স্মরণ করিয়া সে ক্ষণে অক্ষণে চোখের জল ফেলিয়াছে—

এবং সেই ব্যথাটি লইয়াই সে মরিয়া বাঁচিল।

সুরথের মনে এতদিন তবু একটু গর্ব্বের একটু মোহের ছোঁয়াচ ছিল—যোগমায়া সুন্দরী; রূপযৌবনের বন্ধন সুরথের অন্তরের পশুটাকে কখনো কখনো রুখিত, ফিরাইত।…

কোনোদিন সে অবাক্ হইয়া থাকে নাই—

মনে মনে চারিদিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাহাকে সে দেখে নাই—

দূর হইতে কেমন দেখায়; আরো কাছে আসিলে… আরো কাছে…এম্‌নি করিয়া নিজের প্রণয়ী প্রাণের নানা রসে পূর্ণ, নানা ভঙ্গীতে বিচিত্র, নানা খণ্ডে বিভক্ত করিয়া তাহাকে সে দেখে নাই—

প্রেয়সীকে প্রেয়সী বলিয়া সে স্বীকার করে নাই।

তখনো যোগমায়ার বিরুদ্ধে যত অভিযোগ সব সত্য বলিয়াই সে বিশ্বাস করিত; কখনো রাগ করিত, কখনো গোল করিত; কখনো কেবল নিষ্ঠুরতম একটি প্রশ্নেই গগন বিদীর্ণ এবং জগতকে পরাভূত করিয়া সে মানিতে

চাহিত—এমন স্ত্রী দিয়া মানুষের কি প্রয়োজন?…তবু একটু মোহের ঘোর ছিল, স্ত্রী সুন্দরী।

পুত্রটি জন্মিবার পরই সেই ঘোর আর জোরটুকু কাটিয়া সুরথের বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চাহিবার রুচিই আর রহিল না—

খালি গোলমাল, আর খালি নোংরামি—

হাজার গর্জ্জন করিলেও তার খেয়ালের দাবি আর তাগিদ এখন এত বিলম্বে মেটে যে তাহাতে দিন চলা দুষ্কর।

বলে,—মা নেই যার সংসারে, সংসার তার অরণ্য। অরণ্যবাসের সময় আজো আমার আসে নি। বুঝলে?

যোগমায়া বলে,—কি করতে হবে বলো—

—দু'শোবার আমি বলেছি; আর বলব না। আমি চল্লাম। বলিয়া সুরথ বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

যোগমায়ার দুই কর্ণবিবর ভরিয়া বায়ুর আবর্ত্তের সোঁ সোঁ শব্দ বাজিতে থাকে—

কে যেন দুই হাতে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া হঠাৎ হাত খুলিয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে—

সে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের ভিতর দিয়া কক্ষচ্যুত উল্কার মত ছুটিয়া চলিয়াছে।

যোগমায়া ভাবে, কোথায় যাইয়া থাকিব, হে ভগবান, কেবল তুমিই তা' জানো।

পুত্রটিকে লইয়া যোগমায়ার দিন চলে না।

গোঁসাইদাস মৃত্যুর আগে যে টাকা কয়টি লুকাইয়া তাহাকে দিয়া গিয়াছিল তাহা অক্ষয় নহে বলিয়াই শেষ হইয়া গেছে।

সুরথ রোজগার করে ভালই—

জমিদারের বিরাট একটা বাগান কাছাকাছি কোথায় আছে একটি বাবু সেই বাগানের হাজার নারিকেল গাছ, তিন হাজার সুপারি গাছ, সাড়ে পাঁচশো আম আর চারশো কাঁঠাল গাছ আর তাদের ফলের খবরদারিতে নিযুক্ত আছেন—

সুরথ তাঁর সহকারী।

সেই বাগানের ভিতর বাড়ী আছে; সেই বাড়ীতে বাবুটির আর তাঁর সহকারীর মদে ভাঙে কাটে বেশ।

মরশুমী শাকসবজী ফলমূল সুরথের তত্ত্বাবধানে জন্মে; তাহারই মারফত খরিদ বিক্রয়ের লেনদেন হয়; বাজারে যায়; টাকার হিসাব সে-ই দেয়।—সুরথের বেতন মাসিক বার টাকা; কিন্তু বেতনটা ফাজিল—না পাইলেও ক্ষতি ছিল না।

তবু যোগমায়ার দিন চলে না।

যে শান্ত সরল স্বভাবের জন্য পাড়ার ত্রিকালজ্ঞ প্রবীণাগণ ত্রিভুবনে যোগমায়ার তুলনা খুঁজিয়া পাইতেন না, তাহাই এখন প্রচুর দোষের হইয়া দাঁড়াইল।

মালতী ঠাকুরাণী তাঁর অজর থলেটির ভিতর হাত ভরিয়া দিয়া আসিয়া বসেন; বলেন,—বৌ, তোর পানে চাইতে আমার বুক ফেটে যায়, কিন্তু তোকেও বলি শোন্; সুরথকে ডেকে পাঠাস্‌নে কেন?

কিন্তু ডাকিয়া সে বহুবার পাঠাইয়াছে।

মালতী বলিয়া যান,—অত চুপ করে থাকিস্‌নে; পেটের জ্বালায় মান অভিমান নিজের হাতে ভাসিয়ে দিতে হয়।

অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহাই বলিবেন।

তারপর মালতী প্রশ্ন করেন,—ডেকে পাঠিয়েছিলি?

যোগমায়া মাথা নাড়িয়া জানায়, ডাকিয়া সে পাঠাইয়াছিল।

—কবে?

—কাল, পরশু, তরশু, তার আগের দিন, তার আগের দিন…

—আসেনি ?

—না।

—কি খাচ্ছিস্ ?

যোগমায়া কথা কহে না।—

মালতী উঠিয়া যান্—

বোন্‌পোকে দিয়া চাল ডাল দুধ পাঠাইয়া দেন

কিন্তু সবাই মালতী নয়।

এ ও সে আরো কতজন আসে ; কেহ ইঙ্গিতে, কেহ স্পষ্টই বলে, স্বামীকে যে স্ববশে না রাখিতে পারিল, স্বামী যাহাকে অবহেলা করে, সে হতভাগিনী স্ত্রীসমাজে মুখ দেখায় কেমন করিয়া !...

স্বামীসোহাগিনীরা অবাক্ হইয়া যায়।...

যাহারা বধূকালে স্বামীর আদরের সংবাদ আর দৃষ্টান্ত চুপি চুপি তাহার কর্ণমূলে গুঞ্জন করিত, তাহারা এখন স্বামীর কর্ত্তব্যপরায়ণতার সংবাদ আর দৃষ্টান্ত পাল্লা দিয়া চেঁচাইয়া বলে...

স্বামী তাদের আঁচল ধরা—

কেমন করিয়া কাজ আদায় করিয়া লয় তাহাও বলে—

আরো বলে, মেনিমুখো মেয়েমানুষ দু'চক্ষে দেখতে পারিনে।...

যোগমায়া আদায় করিয়া লইতে কোনোদিন পারে না ; চাহিয়া লইতে তাহার মন সরে না ; দান বলিয়া অযাচিত ভাবে যাহা আসিয়াছে তাহাতেও সে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই—

সত্যিই সে "মেনিমুখো"—

একটু হাসিয়া বলে,—আমি ভাই, আজ অবধি কিছুই পারলাম না তোমাদের মত।...

যোগমায়ার ছেলেটি বড় চমৎকার হইয়াছে—

ফুটফুটে রং, কোঁকড়া কোঁকড়া একমাথা চুল...

কিন্তু ছেলের দিকে চাহিয়া তার হতাশা আর ক্লেশের অবধি থাকে না ; মনে হয়, ছেলেতে তার হৃদয়ের দান কিছু নাই—

হিংস্র মানুষ তাহার রক্ত মজ্জা জীবনরস আর আয়ু নিংড়াইয়া একটা সজীব ফল আদায় করিয়া লইয়াছে —

ভগবান নিষ্ঠুর, আর অদৃষ্ট নির্ম্মম—

তাই সে আজ মা।...

উনানে হাঁড়ি চাপে না—

চাল দিয়া জল পড়ে—

বস্ত্রে লজ্জানিবারণ আর বুঝি হয় না।

এমন সময় সুরথ একদিন অনেকগুলি টাকা আনিয়া তাহার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া টলিতে টলিতে যাইয়া বিছানায় পড়িয়াই অজ্ঞান হইয়া গেল।...

যমে মানুষে লড়াই বাধিয়া গেল—

কিন্তু যম হার মানিলেন না, সুরথকে লইয়া গেলেন।

...অসুখ হইয়া সুরথ মাত্র তিনদিন ছিল, গায়ের প্রচণ্ড উত্তাপ সেই তিনদিন তার এক মুহূর্ত্তের জন্যও একবিন্দুও কমে নাই—

আর কেবল সে প্রলাপ বকিয়াছে।

কিন্তু তাহার অজ্ঞাত এই আত্মসমর্পণে অনন্ত আকুলতা দুর্ভাবনা শঙ্কা আর দিশেহারা ব্যস্ততার মাঝেই যোগমায়ার হৃদয়ের একটি ক্ষুধা মিটিয়া গেল।

.. স্বামী একটি দিনের তরেও অসহায় হইয়া ধরা দেয় নাই, নির্ভর করে নাই—

ঠিক্ এম্‌নি শোচনীয় ভাবে স্বামীর আত্মসমর্পণ সে কল্পনাও করে নাই—

কিন্তু স্বামীকেও শিশুর মত লালন করিবার নারীর চিরজাগ্রত ক্ষুধাটাও তার অতৃপ্ত ছিল—

সেটা মিটিল।

এবং সুরথের মৃত্যু ঘটিতেই সন্তানমমতা সহসা উদগ্র হইয়া তাহাকে যেন ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল...

সঙ্গে সঙ্গে একটা চলিবার পথও তার চোখে পড়িল। শূন্য গৃহ তেমন ভয়ঙ্কর নহে—

এই আসিয়াছিল একজন...মুহূর্ত্তেকের বন্ধন মানাইয়া সে চলিয়া গেছে...আর আসিবে না···সেই শূন্যতা যেমন।—স্বামীকে হঠাৎ একদিন বুক ভরিয়া নয়, নিঃসঙ্গের সঙ্গীরূপে নয়, কল্যাণীরূপে সেবার দ্বারা সন্নিকটে সে পাইয়াছিল—

সে-স্মৃতি সুখময় নয়, অবলম্বনও নয়—

তবু একটি স্থান খালি করিয়া রাখিয়া যাইতেই শিশু পুত্রটি একটি নিমেষে, ভক্তের ভগবানের মত, সর্ব্বময় হইয়া যোগমায়ার হৃদয়ের চতুঃসীমা আচ্ছন্ন করিয়া বসিল।

সুরথের চিকিৎসায় আর পথ্যে বেশী ব্যয় হয় নাই ; টাকা কিছু ছিল ; কিন্তু ব্যয়সঙ্কোচের চূড়ান্ত করিয়াও একদিন যোগমায়াকে দেখিতে হইল, তার একটি কপর্দ্দকও অবশিষ্ট নাই।...দিনের পর দিন সেই ক্ষুদ্র সম্বলকে টানিয়া টানিয়া যত দীর্ঘ করা যাইতে পারে তাহা যোগমায়া করিয়াছে ; শুধু সেই শ্রমে আর ক্লেশেই যেন তার চক্ষু জ্যোতিঃহীন হইয়া কোটরে প্রবেশ করিয়াছে।... অরুচিকর অস্বাস্থ্যকর এবং অপ্রচুর খাবার দিয়া যোগমায়া ছেলের পেট টিপিয়া টিপিয়া দেখিয়াছে পেট ভরিয়াছে কি না।...

ছেলে কাৎরায়—

ক্ষুধায় কাঁদে—

তবু কেবল বাঁচিয়া থাকিবার জন্ত যেটুকু খাদ্য তাহার দরকার তাহার এক বিন্দু বেশী সে দেয় নাই।...

এত করিয়াও পুঁজি একদিন ফুরাইল।

বাড়ীর চারিদিক্‌কার দেয়াল পড়িয়া গেছে, কুলবধূর সরম সম্ভ্রম পথচার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া আছে।

যোগমায়া চোখের জল কোনোদিন ফেলিয়াছে কিনা কেহ জানে না—

কিন্তু হঠাৎ একদিন, যাহার কণ্ঠস্বর কখনো শুনিয়াছে বলিয়া বাহিরের লোকের মনে পড়ে না, তাহারই উচ্চ ক্রন্দনরোলে তার ভাঙা ঘরের দরজার সম্মুখে একহাট লোক জমিয়া গেল—

দোতালার ছাদ হইতে মতিবাবু নামিয়া আসিলেন, খামারবাড়ী হইতে রসিকবাবু ছুটিয়া আসিলেন—

লুচির থালাখানা হাতে করিয়াই কালিকান্তবাবু দৌড়াইয়া আসিলেন—

ছেলেবুড়োয় স্ত্রী-পুরুষে বৌ-ঝিতে বাড়ী পূর্ণ হইয়া গেল।...

সকলেই ভাবিয়াছিল, ছেলেটাই বুঝি···

কিন্তু তা' নয় ; ছেলে ভালই আছে।

পুরুষদের প্রশ্নের উত্তরে মেয়েরা বলিলেন,—মাধাই ভালই আছে।

—তবে ?

এ প্রশ্নের উত্তর কেহ দিতে পারিলেন না—

মেয়েদেরও জিজ্ঞাস্য তাই।

কিন্তু যোগমায়া লোক আসিতে দেখিয়াই, নিজের এই আকস্মিক উচ্ছ্বাসে আর আত্মসম্বরণের অক্ষমতায় আত্মগ্লানি জন্মিয়া শুব্ধ হইয়া গিয়াছিল—

কোনো জিজ্ঞাসারই সে জবাব দিল না।

মেয়েরা রোদনের কারণটা অবগত হইতে না পারিয়া ক্ষুন্ন হইয়া চলিয়া গেলেন·· কেহ মুখ বাঁকাইয়া গেলেন... কেহ কদাচারে বিরক্ত হইয়া গেলেন...কেহ বলিয়াই গেলেন,—মায়াকান্না গো মায়াকান্না।—

পুরুষেরা ভাবিলেন, মেয়েমানুষের কান্নাহাসির ভাব পাওয়া ভার।....

কান্নার শব্দে জপের মালা লইয়া মালতীও আসিয়াছিলেন; তিনি গেলেন সবার পরে—

আবার তখনই ফিরিয়া আসিলেন—

বলিলেন,—কান্নায় কাজ হবে না বাপু। তোমায় রোজ্‌গার কর্‌তে হবে।...মাধাইকে দে, আর উনুনে আঁচ্ দে। বলিয়া তিনি মাধাইকে লইয়া চলিয়া গেলেন; এবং চাল ডাল আর দু'টি গোল আলু পাঠাইয়া দিলেন।

সেইদিনই যোগমায়ার একটা শিক্ষা হইয়া গেল; আর সে চেঁচাইয়া কাঁদে নাই। কান্না চাপিতেও কষ্ট, কান্না ফাটিলেও কষ্ট—

সহস্র লোকের চক্ষু আসিয়া পড়ে।

সে-দিন সে কাঁদিয়াছিল ত্রাসে—

তন্দ্রার ঘোরে তাহার মনে হইয়াছিল, মাধাই কাছে নাই।...পৃথিবী তাহার মাধাইকে লইয়া নাগালের বাহিরে কত যোজন দূরে চলিয়া গেছে তাহার ঠিক নাই—

একটি বিরাট পুরুষের করধৃত সূচ্যগ্রের উপর আবর্ত্তিত হইয়া পৃথিবী আরও দূরে সরিয়া যাইতেছে...

মাধাই সেখানে হাসিতেছে, খেলিতেছে—

মাধাই ছাড়া আর সবই সেখানে অস্পষ্ট।

কুয়াশা নামিয়া আসিল—

ধীরে ধীরে মাধাই মিলাইয়া গেল—

তখনো মাধাই হাসিতেছে...

ছ্যাঁৎ করিয়া তন্দ্রা ভাঙিয়া মাধাইয়ের ক্ষুধাক্লিষ্ট মুখখানা সম্মুখে দেখিয়া তাহার মনে হইয়াছিল, মাধাই তাহার মায়া এম্‌নি করিয়াই কাটাইবে···সে যে পেট ভরিয়া খাইতে পায় না···সেখান হইতে হাসিয়া দেখাইবে, তোমার কাছে বড় দুঃখে ছিলাম, মা; এখানে আসিয়া আমি সুখে আছি।

তাই যোগমায়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল।

মতিবাবু বলিলেন,—মেয়েটা কাঁদলে কেন? ওর দিন চলে কি ক'রে?

রসিকবাবু বলিলেন,—বোধ হয় অনাহারে।

ঐ রকম একটা গুজব তাঁর কানে গিয়াছিল।

কালিকান্তবাবু বলিলেন,—যে দিনকাল পড়েছে; চারিদিকেই হাহাকার।

কথাটা মিথ্যা নয়—চারিদিকেই হাহাকার; তাই হাহাকারে কর্ণপাত করিতে গেলে কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া ঐ ব্যাপারেই ঝুলি ঝাড়িয়া বেড়াইতে হয়।—এই হাহাকারটা একেবারেই কানের কাছে বলিয়া মতিবাবুর দোতালার ছাদে পাশার আড্ডায় কথাটা উঠিল—

কিন্তু ওদিকে পাঁচ চার দান পড়িয়াছে—

পাকা ঘুঁটি বিপন্ন।

উড়িয়া পাণ্ডা যাত্রী সংগ্রহে আসিয়াছিল—

মালতী তাহার সঙ্গে তীর্থে বাহির হইয়াছেন; শ্রীক্ষেত্র, কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া আসিবেন।...যাইবার সময় থাকো ঝিকে কারবার করিয়া বলিয়া গেছেন—থাকো, দেখিস্ ওদের।

থাকো দেখিতে আসে—

এবং থাকোর দেখায় যোগমায়ার আর কোনো উপকার না হোক্, তার শাশুড়ীর এত সাধের পিতল কাঁসার বাসনগুলি বেশ অল্প দামে বিক্রয় হইতে লাগিল—

মতিবাবুর স্ত্রী রাগমঞ্জরী, রসিকবাবুর স্ত্রী সত্যভামা, এবং কালিকান্তবাবুর স্ত্রী প্রসন্নময়ী সাবেকী দবজ্ দবজ্ বাসনগুলি থাকোর মারফত ঘরে তুলিতে লাগিলেন—

আট টাকারটা দু'টাকায়।—

থাকো সেই দু'টাকার আট আনা দস্তরী কাটিয়া রাখিয়া দেড় টাকা যোগমায়াকে দেয়।...

বাসনও ফুরাইল।

হঠাৎ একটি ঘটনায় যোগমায়া নূতন করিয়া নিজের দিকে চাহিয়া দেখিল—

দেখিল, সেখানে দেবতা বলিয়া অর্ঘ্যপ্রার্থী কেহ নাই—

স্বামীর স্মৃতি বুকে আছে; কিন্তু সে নির্ব্বাক্।...সে-ই স্মৃতিকে ধারণ করিয়া আছে, স্মৃতি তাহাকে ধারণ করিয়া নাই···আবাহন নাই, আরতি নাই, নিত্যপূজা নাই... কেবল কবে হোমানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, অসময়ে নির্ব্বাপিত হইয়া তাহারই ভস্মস্তূপ পড়িয়া আছে—

স্থানটা শ্মশানের মত—

সে-দিকে চাহিতে মন প্রলুব্ধ হয় না; ভয় পাইয়া ফিরিয়া আসে।

হাঁ ও না—ইহাদের সীমা আছে; কিন্তু এ দু'টি আপোষে মিলিত হইয়া যে বস্তুটার সৃষ্টি হয় সেটা সর্ত্তের অধীন; প্রলাপের মত তা উচ্চ হইতে পারে, কিন্তু মাধুর্য্য-হীন আর দুর্ব্বোধ্য।—

যোগমায়ার স্বামীর সঙ্গে দান-প্রতিদান ভুলিয়াও ঘটে নাই; দানে অন্তর মুক্ত হয় নাই; গ্রহণে আত্মা তৃপ্ত হয় নাই—

স্বামীর স্মৃতিবিগ্রহ তাই তার কাছে কেবল অনুশাসন-বেষ্টিত একটি নির্জ্জীব পিণ্ডমাত্র; জীবনের সত্য সেখানে মাথা রাখিবার ঠাঁই পায় না।

স্বামী স্ত্রী দু'জনে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রপথে একা একা চলিতে চলিতে বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেছে; মাঝখানে মাধুর্য্যের সেতু নির্ম্মাণের উদ্যোগই হয় নাই—

মাধুর্য্য যোগমায়া পায় নাই।

জানালায় মুখ দিয়া যোগমায়া বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল—

গলার শব্দে চোখ ফিরাইয়া সে দেখিল, একটি সুদর্শন পুরুষ তাহার দিকে হা করিয়া চাহিয়া আছে···

পুরুষটি চট্ করিয়া সরিয়া গেল—

কিন্তু যোগমায়া সেইদিকে অসাড় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল...

থাকো আসিয়া দাঁড়াইল, এবং তাহার ডাকেই যোগমায়ার হুঁস্ ফিরিল।

···সব চেয়ে সার্থক, সত্য, আর রক্ষণীয় তার মাধাই—

মাধাই দু'দিন খায় নাই—

যোগমায়া তন্ময় হইয়া তাহাই ভাবিতেছিল।···

মতিবাবুর স্ত্রী রাগমঞ্জরী ইতিপূর্ব্বে থাকোর বেনামীতে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, আর বাসন আছে কি না?

তক্তপোষখানিও গেছে; আছে কেবল মৃৎপাত্র; কিন্তু তার মূল্য নাই।

পুরুষটি যে-স্থানে দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিতেছিল ঠিক্ সেই স্থানটার দিকে চাহিয়া যোগমায়া ঐ সব কথাই ভাবিতেছিল···

এমন সময় থাকোই আবার আসিয়া দাঁড়াইল; বলিল, —বৌ, মণিখুড়ী ডাকৃছে তোমায়।

মণিখুড়ী মতিবাবুর স্ত্রী।

কিন্তু থাকোর কথাটা মিথ্যা; মণিখুড়ী যোগমায়াকে ডাকেন নাই।—

থাকোর সঙ্গে যোগমায়া আসিয়া দাঁড়াইতেই মণিখুড়ীর জিহ্বার প্রান্ত পর্য্যন্ত শুকাইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি মনে করে যোগি?...তাঁহার ভয় হইয়াছিল, বাসনগুলিই বুঝি সে ফেরৎ চাহিয়া বসিবে; হয়তো চোখের জল ফেলিবে; ছেলেপিলে লইয়া ঘর; খামখা

কান্নাকাটিতে বড় অকল্যাণের ভয়।· প্রশ্ন করিয়া বাগমঞ্জরী কি করিয়া নির্ব্বিঘ্নে পাশ কাটাইবেন, যোগমায়াব মুখের দিকে চাহিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।···

যোগমায়া বলিল,—আমায় ডেকেছেন—

—কই, না।

থাকো বলিল,—আমি ডেকে এনেছি ওকে, তোমাব নাম করে, খুড়ি।

—কেন?

থাকো ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

যোগমায়া সসন্তান অনাহারে আছে, তাহা থাকো জানে; যোগমায়া কাহারো কাছে হাত পাতিবে না, তাহাও সে জানে। নিজেই সে মণিখুড়ী কিম্বা এম্নি কাহারো কাছে যোগমায়ার হইয়া ভিক্ষা চাহিতে পারিত, কিন্তু থাকো নিজেও জানে যে, তাহাকে কেহ বিশ্বাস করে না; জানা কথা যে, তাহার "হাতটান" আছে; দ্বিতীয়তঃ, দয়া নামক জিনিষটা এমন স্থিতিস্থাপক আর প্রকাশকুণ্ঠ যে, পরের হইয়া তাহাকে আদর করিতে গেলে সুফল কদাচিৎ ঘটে।

তাই থাকোর এই ছল চাতুরী কপট আয়োজন।—

যখন আর কোনো পথই নাই, তখন যোগমায়াকে ভিক্ষার পথেই দাঁড় করাইতে হয়।

খানিক্ ইতস্ততঃ করিয়া থাকো বলিল—দু'টো টাকা ওকে দাও, খুড়ি; ধার বলে' দাও, কিন্তু আশা ছেড়েই দাও।—বলিয়া নিবেদনের দুর্ব্বলতা বুঝিয়া থাকো একটু অপ্রস্তুতের হাসি হাসিল।

যোগমায়া বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানে না—

কিন্তু সমগ্র ব্যাপারটা যেন একটা ষড়যন্ত্রের মত—

মণিখুড়ী হয়তো মনে করিতেছেন, সে-ই থাকোকে দিয়া ভিক্ষা চাওয়াইতেছে···থাকোর কৈফিয়ৎ মণিখুড়ী বিশ্বাস করেন নাই, তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়াই বোঝা যাইতেছে।·· ভিক্ষার কথাটা যোগমায়ার মনে আসে নাই এমন নয়; কিন্তু সে এ-ভাবে নয়, স্পষ্ট চাওয়া, মারফতি চাওয়া নয়—

নিজেকে সে প্রস্তুতই করিতেছিল—

কিন্তু থাকোর এই হিতৈষিণা যেন সেই প্রস্তুতির সম্মুখেই হাত তুলিয়া বাধা দিয়া দাঁড়াইল।

অবাক্ হইয়া বলিল,—সে কি, থাকো? আমি ত' খুড়িমার কাছে টাকা চাইনি'।

থাকো বলিল,—চাওনি' তা' জানি। না চাইলে খাবে কি? ছেলেটা যে ম'ল।

যোগমায়া সে-কথা কানেও তুলিল না—

মণিখুড়ীর দিকে চাহিয়া বলিল,—না খুড়িমা, আমি টাকা চাইনে। বলিয়া তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া চলিয়া আসিল।

তারপর মণিখুড়ী থাকোকে সেখানে বসাইয়া এমন ভৎসনা করিয়া ছাড়িয়া দিলেন যে, থাকোর মুখে রা রহিল না।...তাঁহার ঘাড়ে এ-দায় চাপাইতে সে কোমর বাঁধিয়াছিল কেন?—

মাধাই খুব কাঁদে—ক্ষুধার জ্বালায়; কাঁদিতে কাঁদিতে তার স্বর দুর্ব্বলতার ভারে নিবিয়া আসে—

গলার ভিতর অস্ফুট শব্দ একটা সাঁ সাঁ করে—

যোগমায়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিঃশব্দে তাহার দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে।

পথ বাঁধিয়া দেওয়া আছে—

অভাব হইলে চাহিয়া লইবে; কিন্তু অন্যায় করিবে না।···

মানুষের মানুষ-বিচারক তাঁর আসনে ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি, আর হৃদয়খনির সোনা কষিবার কষ্টিপাথর লইয়া বসিয়া আছেন—

মানুষের এমন সাধ্য নাই যে তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টিকে সে ফাঁকি দেয় কি মেকি চালায়..:

কিন্তু সব সত্যই তাঁহারই দেওয়া শিরোপা লইয়া তাঁহারই তক্‌মা পড়িয়া বেড়াইতেছে না...কোথায় অদৃশ্য-স্থানে বিন্দু পরিমাণ ফাঁক রহিতেছে—

সেই ফাঁকে এই মহাসত্যটি তাঁর এড়াইয়া গেছে যে, প্রত্যেক সত্যই ততখানি সত্য যতখানি সে জীবনের কেন্দ্রভূমির আকর্ষণের বশীভূত—

তাহার বাহিরে সে অনির্দ্দেশ্য—

এবং অনির্দ্দেশ্য বলিয়াই স্থিতিশীল হইয়া অবলম্বন হইয়া উঠিতে পারে না।—

যোগমায়া ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে—

অকাতরে নয়, সকাতরে—

পথে নয়, প্রতিবেশীর গৃহে।

কিন্তু একেবারে গোণা পাঁচটি দিন পরেই দেখা গেল, ভিক্ষার্থিনীর নিঃশব্দতার করুণ বিরসতা যতই থাক, যাঁহাদের দানপ্রত্যাশী সে তাঁহাদের মুখমণ্ডলের বিরসতাও অল্প নয়।

যোগমায়া মুখ ফুটিয়া চাহে না—

কিন্তু সকলেই বোঝে...।

দানের হাত গুটাইয়া যাইতে যাইতে পাঁচদিনের দিন কোথাকার কঠিন আবরণের ভিতর যে সে-হাত লুকাইল তাহার উদ্দেশই পাওয়া গেল না।...সবাই যেন কাজে নিরতিশয় ব্যস্ত...

তাহাকে কেহ লক্ষ্যও করিল না...

মতিবাবুর স্ত্রী রাগমঞ্জরী একবার তাহার দিকে দৃষ্টি-পাত করিয়াই মুখ ঘুরাইয়া ঘরে ঢুকিয়া গেলেন—

ঘরের ভিতর হইতে শব্দ আসিল,—নিত্যি নিত্যি পারিনে বাপু।—

যোগমায়া শূন্যহস্তে ফিরিয়া আসিল।...কিন্তু ভিক্ষা তার আজ পাওয়াই চাই।

মাধাইয়ের অসুখ করিয়াছে—

মাধাইয়ের শয্যালগ্ন কঙ্কালসার দেহখানার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ তার মনে হইল—সে মানুষ নয়, রাক্ষসী...পৃথিবীর নরকঙ্কাল সে চিবাইয়া খাইতে পারে...শ্মশানের চিতাগ্নিতে সে মানুষের মেদ আহুতি দিতেছে.. দুর্গন্ধ নাকে যাইয়া উল্লাসে তার নাচিতে ইচ্ছা করিতেছে...

মাধাইয়ের বিছানার ধার হইতে সহসা ছিট্‌কাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াই যোগমায়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

মূর্চ্ছা যখন ভাঙিল বেলা তখন নাই—

থাকো তাহাকে ধাক্কা দিয়া দিয়া ডাকিতেছে।

যোগমায়া উঠিয়া বসিল—

থাকো বলিল,—বৌ দু'টি চাল ডাল এনেছি...বলিয়া ন্যাকড়ার পুঁটুলিটা আগাইয়া দিতেই যোগমায়া সেটা ছোঁ মারিয়া টানিয়া লইয়া দ্রুতপদে উঠানে নামিয়া আসিল—

বাঁধন খুলিয়া চাল ডাল মাটিতে ছিটাইয়া দিয়া তাহারই উপর পা ঘষিয়া ঘষিয়া যেন পরম শত্রুকেই সে একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া একাকার করিয়া ছাড়িয়া দিল ..

ভিক্ষার চালে তার প্রয়োজন নাই।

থাকো খানিক্ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা লাগিয়াছে।

কে যেন জানালায় আসিয়া দাঁড়াইল।...চম্‌কিয়া চোখ তুলিয়া যোগমায়া বলিল, ..এস।

কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে রহিল না, কা'কে সে কি বলিয়াছে; কিছু বলিয়াছে কি না।

সেইদিনকার. সেই পুরুষটি আসিয়া ঘরের ভিতর

দাঁড়াইল।…কিন্তু তিলমাত্র স্মরবোধ থাকিলে বোধ হয় সে আসিত না।…যোগমায়ার আহ্বানে প্রাণ ছিল না।

* * * * যোগমায়া টাকাটি হাতে করিয়া যখন বাহির হইল তখন সে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত; তার মনে কোনো গ্লানি নাই, উদ্দামতা নাই, ইচ্ছা অনিচ্ছা, সুখ দুঃখ, ভাল মন্দের কোনো জ্ঞান কোনো সঙ্কোচ নাই।

দোকানে গেল; বলিল, চার আনার চাল দাও, সাবু দু'পয়সার, মিছ্‌রি দু'পয়সার—

দোকানী টাকাটা হাতে লইয়া তার এ-পিঠ ও-পিঠ দেখিয়া বলিল, এ-টাকা তুমি কোথায় পেলে বাপু?

যোগমায়া বলিল, সে খোঁজে তোমার কি দরকার?

দোকানী বলিল, দরকার আছে। বলিয়া টাকাটা যোগমায়ার দিকে ছুড়িয়া দিয়া পুনরায় বলিল,—টাকা এ নয়; পারা-মাখান ডবল্‌-পয়সা।

রূপের অভিশাপ

—পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর—

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

লতিফ চলিয়া গেলে নেকজান দুনিয়া অন্ধকার দেখিল। দিন তার কাটে না, বুক বুঝি ফাটিয়া যায়। নয়নের মণি তার, যা'কে দিন রাত চোখে চোখে রাখিয়া আশ মিটে না, তিন দিন তাকে চোখে না দেখিয়া সে পাগল হইয়া উঠিল।

চতুর্থ দিবসে সে একজন চাকর ও একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে লতিফের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল।

নেকজানের বিশ্বাস হইয়াছিল যে লতিফের দেশ দেখিতে যাওয়া একটা ছুতা, বাস্তবিক সে নেকজানকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, আর আসিবে না। ইহার উপর সে টাঙ্গাইল অঞ্চল হইতে নবাগত এক ব্যক্তির কাছে সংবাদ পাইল যে কাসিম বেপারী কিছুকাল হইল ফৌত হইয়াছে। তখন আর তার সন্দেহ রহিল না যে লতিফ এই সংবাদ জানিয়াই পরীর সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষায় নেকজানকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। তাই সে আর পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া অবিলম্বে ছুটিয়া গেল।

পরীর হাত হইতে লতিফকে ছিনাইয়া আনিতে পারিবে এমন দুরাশা তার ছিল না। কেন না সে জানিত পরী যুবতী, রূপসী, এবং শুনিয়াছিল তার অনেক টাকা। সে গেল সুধু এই আশায় যে হয় তো সে সপত্নীসহ তার যুবক স্বামীকে আনিতে পারিবে। তবু দিনান্তে তাকে দেখিতে তো পাইবে।

গ্রামে আসিয়া নেকজান যাহা শুনিল তাতে তার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। লতিফকে পরী নালিস করিয়া হাজতে দিয়াছে এমনি সংবাদ শুনিয়া সে আর কালবিলম্ব না করিয়া পরীর কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। পরীকে যথ লাঞ্ছিত করিয়া সে গেল লতিফের বড় ভাইয়ের কাছে।

নেকজানের বুদ্ধিশুদ্ধি বিশেষ তীক্ষ্ণ ছিল না, কিন্তু তার টাকা ছিল। তার টাকার গন্ধ পাইয়া ভাইয়ের ভ্রাতৃস্নেহ উথলিয়া উঠিল, সে ভ্রাতৃবধুর সঙ্গে টাঙ্গাইল গিয়া মোকদ্দমার যথারীতি তদ্বির করিল।

মোকদ্দমার দিন নেকজান আদালতে গিয়া বসিয়া রহিল।

অন্যান্য সাক্ষীর পর পরী কাঠগড়ায় উঠিল। সে কাঁপিতে কাঁপিতে মাটির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হাকিম ও আদালতশুদ্ধ লোক তার রূপরাশির দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

মাটির দিকে চাহিয়া পরী ধীরে ধীরে প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তরে যেমন শিক্ষা পাইয়াছিল তেমনি করিয়া সাক্ষ্য দিয়া গেল। কিন্তু তার বুকের ভিতর অনেক কথা তোলপাড় করিতে লাগিল—হৃৎপিণ্ড ধুপধাপ করিয়া নাচিতে লাগিল।

তারপর আসামীর মোক্তার তাকে জেরা করিতে উঠিলেন। দুই একটা সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি ধমকাইয়া বলিলেন, "এটা তোমার ঘর নয়—আদালত, মুখ তুলে চাও—এই দিকে তাকাও—"

ধমকের চোটে পরী কাঁপিয়া উঠিয়া ভীতা হরিণীর মত তার আয়ত চক্ষু দুটি মোক্তারের দিকে ফিরাইল।

"আসামীকে চেয়ে দেখ—বল ওর নাম কি?"

পরী ভীত দৃষ্টিতে লতিফের দিকে চাহিল, লতিফের ব্যগ্র ক্লিষ্ট অবসন্ন চক্ষুর দিকে চাহিয়া তার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, মনের ভিতর তার এমন ঝড় বহিতে লাগিল যে

মুখের কথা বলিতে সে ভুলিয়া গেল। তার মন চলিয়া গেল উপস্থিত আবেষ্টন হইতে বহুদূরে ; সে চক্ষু নত করিল, কোনও উত্তর দিল না। লতিফের ক্ষণদৃষ্ট মুখখানি তার চোখে ভাসিয়া বুকের ভিতর বিঁধিয়া গিয়াছিল—তার মুখে কথা বাহির হইল না।

মোক্তার আবার ধমক দিয়া বলিলেন, "আমার কথার উত্তর দেও—ওর নাম কি ?"

কম্পিত অশ্রুভরা ক্ষীণকণ্ঠে পরী উত্তর করিল, "লতিফ।"

আর তুই একটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের পর মোক্তার আবার তাকে ধমক দিয়া মুখ তুলিয়া চাহিতে বলিলেন—সে চাহিতে পারিল না।

পুনরপি ধমকাইয়া মোক্তার বলিলেন, "ওর দিকে চাও—চেয়ে বল ওর সঙ্গে তোমার নিকা হ'য়েছে কিনা ?" চতুর মোক্তার বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে লতিফের মুখের দিকে চাহিয়া পরী তার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছে।

বার বার জিজ্ঞাসিত হইয়া পরী মুখ তুলিয়া চাহিয়া বিমূঢ় হইয়া গেল। ঠিক সেই সময় মোক্তার বলিলেন, "বও, নিকা হ'য়েছিল ?"

পরী লতিফের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল—তার বুকের ভিতর ছুরীর মত কি বিঁধিতেছিল।

যাহা সে শিখিয়াছিল সব সে ভুলিয়া গেল—লতিফের আসন্ন বিপদ তার চিত্তকে অবসন্ন করিয়া দিল। তার মনে হইল, কেন এমন হইল, কেন লতিফের সঙ্গে তার বিবাহ না হইয়া আজ সে লতিফের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে আসিয়াছে। বিবাহ হইলে কি আনন্দ হইত—আজ তার কি নিরানন্দ! তার কান্না পাইল।

ঠিক সেই সময় মোক্তার ধমক দিয়া আবার তাঁর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বপ্নোত্থিতের মত পরী কাতর নয়নে তাঁর দিকে চাহিল, আর কোনও কথা না বুঝিয়াই মোক্তারের মুখের কথা ধরিয়া বলিল, "নিকা হইছিল।"

লতিফের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইল। আনন্দের আতিশয্যে নেকজান উঠিয়া দাঁড়াইল। ফকীরের মুখ শুকাইয়া গেল, কিন্তু সে চট্ করিয়া একটা কৃত্রিম হাসিতে তার বিব্রত ভাব ঢাকিয়া ফেলিয়া তার মোক্তারের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল।

হাকিম ঠিক সেই সময় একখানা অন্য কাগজ লইয়া কি একটা লিখিতেছিলেন।

মোক্তার হাসিয়া বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার, সাক্ষীর একথাটা লেখা হউক।"

হাকিম ব্যগ্রভাবে পরীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি কথা ? আমি তো শুনতে পাই নি।"

মোক্তার আবার বলিলেন, "বল হুজুরকে বল ওর সঙ্গে নিকা হ'য়েছিল।"

ইত্যবসরে পরীর হুঁস হইয়াছিল যে কি কথা সে বলিয়া ফেলিয়াছে। জ্ঞান হইয়া প্রথমে তার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, সে ভাবিল ফকীর ইহার জন্য তাকে কাটিয়া ফেলিবে। তার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে একটা অনিবার্য্য আনন্দের ঢেউ খেলিয়া গেল। লতিফ ইহাতে মুক্ত হইবে—লতিফের সহিত তার বিবাহ হইবে—এই কল্পনায় তার শরীর মনে পুলকের ঢেউ বহিয়া গেল। কিন্তু হঠাৎ একবার মুখ তুলিতেই নেকজানের হাসিমুখ তার নজরে পড়িয়া গেল—তার সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। সে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

মোক্তার যখন তীব্র কণ্ঠে তাকে শাসাইলেন তখন পরী আর থাকিতে পারিল না, ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

পরীর কান্নায় হাকিমের মন গলিয়া গেল, তিনি মোক্তারকে তিরস্কার করিলেন। এমন করিয়া ধমকা-ধমকি করিবার তাঁর কোনও অধিকার নাই ইহা বুঝাইয়া দিলেন এবং অতঃপর এমন ভাবে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে দিবেন না বলিলেন। তারপর পরীকে অনেক সান্ত্বনার কথা বলিয়া বলিলেন, "কোনও ভয় নেই তোমার। বল, বিয়ে হয় নি তোমার লতিফের সঙ্গে ?"

অশ্রু কতকটা সংবরণ করিয়া মাটির দিকে চাহিয়াই তখন পরী বলিল, "না"।—আবার সে কাঁদিতে লাগিল।

ইহার পর আর মোক্তার কোনও জেরাই করিতে পারিলেন না। হাকিম তাঁকে পদে পদে বাধা দিতে লাগিলেন, প্রত্যেকটি প্রশ্নে আপত্তি করিলেন। মোক্তারের সকল আবেদন নিবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। শেষে মোক্তার সামান্য দুই চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ক্রুদ্ধ লইয়া বসিয়া পড়িলেন।

পরী কাঠগড়া হইতে নামিয়া গেলে লতিফ শক্ত হইয়া হইয়া দাঁড়াইল, ফকীর হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, পরী মাথা ঘুরিয়া পড়িতে পড়িতে কোনও মতে আপনাকে সামলাইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

দুই দিন ধরিয়া বিচার চলিল, পরিশেষে হাকিম লতিফকে ছয় মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন।

আর্ত্তনাদ করিয়া নেকজান আদালতগৃহ বিদীর্ণ করিল। সকলের মানা অস্বীকার করিয়া সে ছুটিয়া কাঠগড়ার কাছে আসিয়া লতিফকে জড়াইয়া ধরিল। তার জন্য প্রায় দশ মিনিটকাল আদালতের কাজ বন্ধ রহিল।

হাকিম ধমকাইয়া বলিলেন, "চুপ মাগী, তুই চেঁচাবি তো তোকেও ফাটকে দেব।"

নেকজান বলিল, "দেও বাবা দেও, আমারে ফাটকে দেও—আমি আর কেমতে বাইরে থাকুম—আমারে ফাটকে পাঠাইয়া দেও, আমার লতিফের সাথে আমারে ফাটকে দেও।"

কিন্তু হাকিম তাকে ফাটকে দিলেন না। পুলিসের লোক ঠেলাঠেলি করিয়া তাকে বাহিরে লইয়া গেল, কিন্তু দয়া করিয়া তারা তাকে কিছুক্ষণ লতিফের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে দিল।

নেকজান লতিফের বুকে মাথা রাখিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

পরী যে আসিয়া লতিফের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়া গেল ইহাতে লতিফের বুকের ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। প্রথমে তার হইয়াছিল দারুণ ক্রোধ, কিন্তু এখন অবশিষ্ট ছিল সুধু একটা নিদারুণ জ্বালা, ও সীমাহীন অন্ধকার অবসাদ। তার চাপে লতিফ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

রোরুদ্যমান নেকজানকে বুকের ভিতর চাপিয়া লতিফের অন্তরের জ্বালা অপরূপ শান্তিলাভ করিল। সে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তার প্রৌঢ়া প্রণয়িনীর দিকে চাহিয়া নানা মতে তাকে সান্ত্বনা দিল। তার মুখখানা দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া সে সোহাগ করিয়া বলিল, "কাইন্দোনা সোণা, হইচে কি? ছয়ডা মাস তো, দেইখতে দেইখতে চইল্যা যাইবো। তারপরে আমি আর তোমারে ছাইরা কোথাও যামু না।"

ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে নেকজান বলিল, "কিন্তু ই ছয় মাস আমি কেমতে বাচুম। ভাতের গরাস কেমতে মুখে তুলুম। তুমি ফাটক খাইটবা আর আমি ঘরে বইয়া শুইয়া কেমতে রমু।" সে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

ক্রমে লতিফ শুনিল যে তার অদর্শনে অস্থির হইয়া নেকজান ঘর বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে। তারপর সে অনেক অর্থব্যয় করিয়া লতিফের মোকদ্দমার তদ্বির করিয়াছে। শুনিয়া কৃতজ্ঞ মুগ্ধ লতিফ নেকজানকে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিল। অনেকক্ষণ পর সাশ্রু-লোচনে বলিল, "তুমি আমারে যা ভাল বাসছ বিবি, ইয়া আর কেউ কাউরে বাসে না। খোদার কসম, তোমার সাথে বেইমানী আমি কোনও দিন করুম না, আর যদি কোনও দিন কোনও মেয়া মাইনসের দিকে চাই তো—"

নেকজান বাধা দিয়া বলিল, "আইচ্ছা, আর কিরা করণ লাইগবো না। তোমার যা মন চায় কইরো, আমি তাতে কিছু কমু না। আমি তোমারে নিকা দিমু—এমন মেয়া আছুম পরী যার বান্দীর সামিল।"

লতিফ জেলে গেলে নেকজান অনেক পয়সা খরচ করিয়া হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মোশন করিল কিন্তু বড় বড় উকীল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়াও কোনও ফল পাইল না।

১৭

পরী বাড়ী ফিরিয়া অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িল। তার মনে হইল সে বাঁচিবে না। বাঁচিবার সাধও তার ছিল না। ওই কদাকার কাসিমের পুত্রগুলিকে মানুষ করিবার জন্য কিম্বা মিত্রদ্রোহী কুচক্রী মিথ্যাবাদী ফকীরের ঘরণী হইবার জন্য বাঁচিয়া থাকিবার তার কিছু মাত্র উৎসাহ ছিল না।

তার মন একটা হতাশাপূর্ণ বিষাদে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া ছিল। জীবনে তার একটিমাত্র সুখের আশা একমাত্র কামনার বিষয় ছিল লতিফ, সে আশা সে একেবারে নির্ম্মূল করিয়া উপড়াইয়া ফেলিয়াছে। তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবার সময়ই সে নিশ্চয় জানিয়াছিল যে ইহার পর আর লতিফ তার পানে চাহিবেও না। সে কথা স্থির জানিয়াই সে সাক্ষ্য দিয়াছিল, কেন না লতিফ যতই বাঞ্ছনীয় হউক তার পাশে আছে নেকজান! তার সেই একদিনকার কার্য্যের স্মৃতি তাকে পরীর কাছে এমন ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছিল যে এখনও তার কথা ভাবিতে তার শরীর শিহরিয়া উঠে,—মনে হয় খোদাতালা রক্ষা করিয়াছেন, নতুবা ঐ সপত্নীর সঙ্গে ঘর করিয়া পরীর একদিনও বাঁচা চলিত না।

লতিফের আশা নাই, আছে ফকীর!—তার চেয়ে হিন্দু মেয়েদের মত আজন্ম বৈধব্য ভাল। ফকীরকে পরীর আগে নেহাৎ মন্দ লাগে নাই। এবং পরীর মামলা মোকদ্দমার তদ্বিরে ফকীর যে উৎসাহ দেখাইয়াছিল তার নিঃস্বার্থতায় পরীকে কৃতজ্ঞ ও মুগ্ধ করিয়াছিল;—পরী জানিত না যে নিঃস্বার্থ ফকীর উকীল মোক্তারদের কাছে তার নিঃস্বার্থতার যথেষ্ট মূল্য আদায় করিয়া লইয়াছে। কিন্তু ফকীর যে মিথ্যায় ভুলাইয়া তাকে লতিফের বিরুদ্ধে এজাহার ও সাক্ষ্য দেওয়াইয়াছে সে জন্য পরী তাকে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিল না। লতিফ যে জেলে গিয়া অসহ্য দুঃখ ভোগ করিতেছে এ কথা ভাবিতে তার প্রাণের ভিতরটা মুচড়াইয়া উঠিতেছিল, আর যার জন্য লতিফের এ দুর্গতি তার কল্পনায় বিষে প্রাণ ভরিয়া উঠিতেছিল।

এতদিন সে যে স্বপ্ন দেখিত সে স্বপ্ন সে এখনও দেখে, কিন্তু সে আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন নয়। লতিফের সঙ্গে তার বিবাহ হইলে যে কত আনন্দে ভরিয়া যাইত তার জীবন তার স্বপ্ন সে বসিয়া বসিয়া রচনা করে, উপভোগ করে। কিন্তু যে সুখ হইলে হইতে পারিত আর এখন হইতে পারে না তার কল্পনায় সুধু মন ভরিয়া যাতনা উছলিয়া উঠে, জীবনে বিরাগ জন্মে।

তাই পরীর আর বাঁচিবার সাধ নাই। সে মরিবার জন্য তৈয়ার হইয়া শয্যা আশ্রয় করিল।

কিন্তু সে মরিল না। তিনমাস রোগ ভোগ করিয়া বাঁচিয়া উঠিল। তখন সে আরসীতে তার মুখখানা দেখিল—এ যেন সে পরীর সুধু একটা কঙ্কাল। আরসী খানা সে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। রূপের গর্ব্বে সে এতদিন মাথা খাড়া করিয়া ছিল—কোথায় সে রূপ! কর্পূরের মত সে যে উপিয়া গিয়াছে! পরী কাঁদিতে লাগিল।

কিন্তু এ দুঃখ পরীর বেশী দিন থাকিল না। দুইমাস না যাইতে তার রূপ আবার কুলে কুলে ভরিয়া উঠিল, বুঝিবা বাড়িয়া গেল। আরসীতে মুখ দেখিয়া পরী তৃপ্ত হইল, মনে হইল এত রূপ বুঝি তার কখনও ছিল না। এ রূপ যদি লতিফ দেখিত!—কিন্তু—কিন্তু কার জন্য এ রূপ?—কোন্ সুখের আশায় ইহার বোঝা বহিবে পরী?

নারী ভালবাসে আপনার রূপ, তা হ'ক না কেন সে হটেনটট্ সুন্দরী বা পরীস্তানের হুরী। কিন্তু সে রূপ সার্থক করিতে চায় সে। দয়িতের চোখে তাতে হাসি ফুটিয়া উঠিবে, প্রশংসায় তার চিত্ত ভরিয়া উঠিবে, তাই নারী চায় রূপ, তাই সে শত প্রসাধনে তাকে বাড়াইয়া তোলে। রূপ তার পূজার অর্ঘ্য—দেবতার পায় যদি তাকে নিবেদন করিতে না পায় সে তবে কিসের রূপ? কি তার সার্থকতা? যে সম্পদে পৃথিবীকে কিনিয়া লওয়া যায় সীমাহারা মরু-

ভূমির ভিতর সঙ্গীহীন পথিকের কাছে সে সুধু একটা বোঝা হয়; তেমনি মনে হইল পরীর কাছে তার এই রূপের অসহ্য ভার! আবার সে তার আরসী ছুঁড়িয়া ফেলিল—পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল।

ফকীর এখন রোজ আসে যায়। যতদিন পরী অসুস্থ হইয়া পড়িয়া ছিল ততদিন সে অক্লান্ত চেষ্টায় তার শুশ্রূষা করিয়াছে, রোগমুক্তির পরও সে নিত্য আসিয়া পরীর সেবা করিয়াছে—এখনও সে আসে। তাকে দেখিলে পরীর মন বিষাইয়া উঠে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া তাকে কোনও অস্নেহের কথা বলিতে পারে না, প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না। নেকজানের সঙ্গে সাক্ষাতের পর অধীর হইয়া সে মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় ফকীরকে যে অধিকার দিয়াছিল তাহা কাড়িয়া লইবার মত শক্তি তার জুটিল না।

ফকীরকে পরী ঘৃণা করে—তাকে দেখিলে বিরক্ত হয়, তার স্পর্শে আপনাকে কলুষিত মনে করে। তবু তার হাত ছাড়াইবার উপায় তার নাই। ফকীর তার মনের ভাব বোঝে না, বুঝিবার অবসর তার নাই, পরীর সঙ্গ সে পায়—তাতেই সে এত বিভোর হইয়া থাকে যে পরীর মনের ভিতর তলাইয়া দেখিবার অবসর তার হয় না।

ফকীর জানিত এখন আর পরীর সঙ্গে তার বিবাহে কোনও অন্তরায় নাই। তা' হ'ক সে বিবাহ দুই দিন পর, তাতে কিছু আসিয়া যায় না। পরী জানিত ফকীরকে সে কিছুতেই বিবাহ করিবে না। ফকীরের উন্মত্ত প্রেমকে ফিরাইবার শক্তি তার নাই, কিন্তু তার বন্ধনে সে ধরা দিবে না ইহা পরী স্থির করিয়াছিল। তাই তাদের বিবাহের জন্য বিশেষ তাড়া ছিল না।

পরীর শরীর একটু সারিলে ফকীর একবার বিবাহের কথা তুলিয়াছিল। এক মুহূর্ত্তে পরীর মুখ কালো হইয়া উঠিয়াছিল। কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া সে বলিয়াছিল, "না, থাক।" ফকীর বিবাহের জন্য অতিমাত্র ব্যস্ত ছিল না, সেও বলিল, "থাক।"

তাই ফকীর আসে যায়, পরীর কাজকর্ম্ম দেখাশুনা করে—সবাই জানে এ বাড়ীর কর্ত্তা সে। পরী ইহাতে রাগে ফুলিয়া উঠে, কিন্তু—মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে না। দিবসের বেশীর ভাগ প্রায় ফকীর এ বাড়ীতেই থাকে, লোকের বিশ্বাস সে রাত্রিতেও এখানে থাকে। এমনি করিয়া পরীর দিন যায়। সে বুঝিতে পারে একটা দারুণ নাগপাশে সে বাঁধা পড়িয়াছে, এক এক সময় সে ক্ষেপিয়া উঠে—কিন্তু ফকীর আসিয়া এমন সহজ ভাবে তার প্রভুত্ব গ্রহণ করে যে তার সামনাসামনি পরী কিছু বলিতে পারে না।

এদিকে গ্রামে ফকীর ও পরীকে লইয়া বড় গোলযোগ হইতে লাগিল। লতিফের মোকদ্দমার সময় হইতেই সবাই ইহাদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। তখন ফকীর কতক লোককে বাধ্য করিয়া তার পক্ষে লইয়াছিল। কিন্তু লতিফের যখন ছয় মাসের শাস্তি হইল তখন ফকীরের দলের লোকও কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। তার পর ফকীর প্রকাশ্যভাবে পরীর বাড়ীতে আনাগোনা করায় লোকে ভয়ানক ক্ষেপিয়া উঠিল। ইমু-ফকীর গোড়া হইতেই ফকীরের উপর বিরূপ ছিল। লতিফের মোকদ্দমার সময় সে যথাসাধ্য লতিফের সাহায্য করিয়াছিল। এখন সে একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। পাপিষ্ঠ ফকীর ও পরীর অনাচারে তার ধর্ম্মবুদ্ধি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইল। দিনের পর দিন সে তাদের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের উস্কাইতে লাগিল। তার এ অভিযানে সে সহজেই গ্রামবাসীর সহানুভূতি পাইল। ইমুর বক্তৃতায় যেখানে কাজ হইল না নেকজানের টাকায় সেখানে কার্য্যোদ্ধার হইল। নেকজান লতিফকে মাঝে মাঝে জেলে গিয়া দেখিবার আশায় এই গ্রামেই তার ভাসুরের বাড়ীতে ছিল—ধুবড়ী ফিরিয়া যায় নাই। সে পরীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে প্রাণপণ করিয়া যোগ দিয়াছিল। জুম্মাঘরে ও মণ্ডল-বাড়ীতে ইহাদের কথা লইয়া অনেকগুলি বৈঠক হইল, শেষ পর্য্যন্ত ইহাদিগকে 'একঘরে' করা সাব্যস্ত হইল।

ফকীর বড় বিপদে পড়িল। পরীকে সে আর একবার

বিবাহের কথা বলিয়াছিল, পরী আবার বলিয়াছিল, "থাক"। তাতে ফকীরের নিজের খুব বেশী আপত্তি ছিল না, তবু গ্রামবাসীদের চঞ্চলতায় সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু পরীকে কিছুতেই বিবাহের কথায় সম্মত করা গেল না।

পরীরও সামান্য অসুবিধা হয় নাই। তার চাকর বাকর যাহা অবশিষ্ট ছিল, তারা কাজ ছাড়িয়া দিল। একলা নিজ হাতে ফকীরের সাহায্যে তার গৃহকার্য্য করিতে হয়। তা' ছাড়া গ্রামের ভিতর পথে ঘাটে যেখানে যার সঙ্গে দেখা হয় তাদের কারও মুখ নাড়া কারও কুৎসিৎ ইঙ্গিত তাকে জ্বালাইয়া তুলিল।

তবু সে ফকীরকে স্বামীরূপে গ্রহণ করিতে মনকে কিছুতে বুঝাইতে পারিল না।

কিন্তু আর এক রকমের উপদ্রবে তাকে আরও বেশী অস্থির করিয়া তুলিল। তার রূপে গ্রামের সবাই মুগ্ধ ছিল, এখন তার কুচরিত্রের কথা রটনা হইতে সাহসী যুবকদের সাহস বাড়িয়া গেল। অনেকে তাকে স্পষ্ট করিয়া প্রেম নিবেদন করিল, কেউ কেউ দূত পাঠাইল। আবার কেউ কেউ পথে ঘাটে তাকে বেইজ্জত করিবার অবসর খুঁজিতে লাগিল। ঘাটে জল আনিতে গিয়া সে অনেক দিন বিপদে পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছে। অনেক দিন পর এক ছোকরা তার চাকরী করিতে রাজী হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু দু' দিন বাদে দেখা গেল যে চাকরীটা তার লক্ষ্য নয় উপলক্ষ্য মাত্র। একদিন বহু কষ্টে তার দৃঢ় বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরী ঘরে আসিয়া কাঁদিতে লাগিল। সেদিন ভাবিল, এমন করিয়া আর দিন চলে না।

ইহার পর দিন কয়েক সে অতি যত্নে সকল উপদ্রবের হাত এড়াইয়া কাটাইল। তারপর একদিন রাত্রে হঠাৎ একটা শব্দ শুনিয়া পরী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দেখিল ঘরে একটি পুরুষ। সে চীৎকার করিয়া উঠিল। তার চীৎকারে সে লোকটা পলাইয়া গেল। পরের দিন সে যখন লোককে তার এই দুঃখের কথা বলিয়া গেল তখন বর্ষীয়সীরা ভ্রূকুটি করিল, যুবতীরা মুচকি হাসি হাসিল, একজন ঠোঁটকাটা মেয়ে তাকে শুনাইয়া শুনাইয়াই অপর একজনকে বলিল যে, চুরী করিয়া ঘর ঢোকার কথা মিথ্যা—যে আসিয়াছিল সে নিমন্ত্রিত হইয়াই আসিয়াছিল, ধরা পড়িয়া পরী তাকে চোর সাজাইয়াছে।

শুনিয়া পরী কোনও মতে আত্মসংবরণ করিয়া ঘরে গেল, সেখানে ভূমিতে লুটাইয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

ফকীর যখন তার এই অবস্থায় আসিয়া তাকে কোলে তুলিয়া সোহাগ করিয়া তার অশ্রু মুছাইয়া দিল, তখন আর পরীর ভিতর বিদ্রোহের বিন্দুমাত্র শক্তি ছিল না। বিশেষতঃ ফকীর বলিল যে ইমু-ফকীর শাসাইয়া গিয়াছে যে যদি ফকীর সপ্তাহ মধ্যে পরীকে বিবাহ না করে তবে ইমু তার ঘর জ্বালাইয়া তাকে গ্রাম ছাড়া করিবে—এই সাধু উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য নেকজান হাজার টাকা কবুল করিয়াছে। ফকীরের মুখে একথা শুনিয়া পরী আর কোনও রকম আপত্তি করিতে পারিল না। স্থির হইল দুই দিন বাদে ফকীরের সহিত পরীর নিকা হইবে।

ইহার পর একটা দিন পরী অনেকটা শান্তভাবে কাটাইয়া দিল। সন্দেহ ও দ্বিধায় পীড়িত ব্যক্তি যখন ভাল হ'ক মন্দ হ'ক একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসে তখন সেই আন্তরিক বিরোধ নিবৃত্তি অবসাদে সে অনেকটা শান্তি লাভ করে। তাই একদিন পরী শুধু হাত পা ছাড়িয়া শুইয়া কাটাইল।

পরের দিন সকালে আবার সে বিচার করিতে লাগিল। ফকিরের সঙ্গে পরিণয়ের কল্পনাটা তার কাছে মোটেই মনোরম বোধ হইল না। যতই বেলা বাড়িতে লাগিল ততই তার বিরাগ বাড়িয়া চলিল। সন্ধ্যা ঘনাইলে সে কলসী লইয়া জল আনিতে গেল। সেনেদের পুকুরের ঘাটে তখন লোক ছিল না, পরী সেখানে একলা বসিয়া জলের ভিতর পা ছড়াইয়া দিয়া ভাবিতে লাগিল। কাসিমের গৃহিণী হইয়া সে এতদিন কাটাইয়াছে, সুখের মুখ কখনও দেখিতে পায় নাই। আর এখন—কালই

সকালে সে হইবে ফকীরের ঘরণী—তার অদৃষ্টের একটানা স্রোতের ভিতর ইহাতে কোনও তারতম্য সে লক্ষ্য করিল না। যেমন ছিল সে কাসিমের ঘরে, তেমনি থাকিবে ফকীরের ঘরে,—যাকে প্রাণ ভরিয়া সে ঘৃণা করে তারই শয্যাভাগিনী হইয়া, আর জগতে তার একমাত্র কাম্য পুরুষ নেকজানের সৌভাগ্য বর্দ্ধন করিবে! এই তার নসীব—এই খোদার বিচার!

জলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া লতিফের কথা মনে উঠিতে তার মন ছুটিয়া গেল অনেক দূরে—সেই দিনের দৃশ্য তার মনে পড়িল যে দিন এই পুকুরের পাড়ে লতিফ তাকে চুম্বন করিয়াছিল, এই ঘাটে তারা দুজনে ধরাধরি করিয়া শুশ্রূষা করিয়াছিল হারাণীর! ক্রমে তার মনটা বসিয়া গেল হারাণীর সেই জলমগ্ন দেহের স্মৃত মূর্ত্তির উপর। হারাণী ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল...

সেও তো জলে ডুবিয়া সকল জঞ্জাল মিটাইতে পারে।

ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া সে কলসী তার কোলের কাছে টানিয়া লইল। অর্দ্ধচেতন ভাবে তার কাপড়ের আঁচল অঙ্গ হইতে খুলিয়া কলসীর গলায় বাঁধিল—তার পর আঁচলের অবশিষ্ট অংশ হাতে নাড়া চাড়া করিতে লাগিল। তার ভরা যৌবন, তার রূপরাশি,—প্রাণ ভরা ভোগের কামনা তার মনকে বাধা দিল, আঁচলটা গলায় জড়াইতে গিয়া সে থমকিয়া গেল।

পিছন হইতে কে ডাকিল "পরী"—

পরীর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া দেখিল যে তার দেহ অনাবৃত, অঞ্চল বাঁধা আছে কলসীতে। ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া সে হাতপায়ের ভিতর আপনাকে গুঁজিয়া দিয়া কোনও মতে লজ্জা নিবারণ করিবার চেষ্টা করিল।

যে আসিয়াছিল সে বলিল "পরী, তুমি কি কইরবার লইছ?"

পরী কথা কহিল না, পিছন ফিরিয়া কোনও মতে কলসীর গলা হইতে অঞ্চল খুলিতে লাগিল।

আঁচল খুলিয়া গায় জড়াইয়া সে ফিরিয়া দেখিল—পরাণের মা।

ডুবিতে ডুবিতে জলের ভিতর একটা বড় কাঠ ভাসিতে দেখিলে যে আনন্দ হয় তেমনি আনন্দ হইল পরীর। চট করিয়া তার মনে হইল তার এই আসন্ন বিপদে মুক্তির সহজ পথ যদি কেউ দেখাইতে পারে তবে সে পরাণের মা। আবেগভরে সে পরাণের মার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পরাণের মা মনে মনে হাসিল। মুখে সে পরম স্নেহ-ভরে তাকে সান্ত্বনা দিয়া বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "কাদিস কেন? নিকার কথায়?"

পরী ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

"নিকা কইরবার চাস না তুই? তবে তুই কবুল করলি ক্যান?"

কাঁদিয়া পরী বলিল, "আমার পোড়া কপাল দিদি, তাই আমি কবুল হইছি। কিন্তু ইয়ার সাথে যদি আবার আমার নিকা হয় তবে আর আমি বাচুম না।"

"তাই বুঝি মইরবার লইচিলি?—ল,' এহন মরণ লাইগবো না,—ফকীরেরে নিকাও করণ লাইগবো না। ল' ঘরে ল'।"

ঘরে ফিরিয়া পরাণের মা গম্ভীর ভাবে সব কথা শুনিল। তার পর অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে পরামর্শ দিল যে এখন একমাত্র পলায়নই বিধেয়। স্থির হইল দ্বিপ্রহর রাত্রে পরাণের মা পাল্কী লইয়া আসিবে এবং পরীকে লইয়া এক জায়গায় লুকাইয়া রাখিবে। তারপর যে ব্যবস্থা হয় করা যাইবে।

গভীর রাত্রে পাল্কী আসিল। পরাণের মা সঙ্গে চলিল। পরীর ছেলে তিনটাকে পরাণের মা নিজের বাড়ীতে লইয়া রাখিল, তাদের ব্যবস্থা পরে হইবে। বাড়ীর সব ঘরে তালা পড়িল কিন্তু গহনা ও টাকাকড়ি যাহা ছিল তাহা পরী সঙ্গে লইয়া গেল।

অনেক রাস্তা পরাণের মা সঙ্গে সঙ্গে গেল। তারপর

আর তার গলা শোনা গেল না। পরী ডাকিল, সাড়া পাইল না। পাল্কীর দুয়ার একটু খুলিতে গিয়া দেখিল তাহা বাহির হইতে দড়ি দিয়া বাঁধা। সে আর্ত্তনাদ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

যখন পরীর জ্ঞান হইল তখন তার সামনে দাঁড়াইয়া ছিল অলি বেপারী।

অলি বেপারী পরীর আশা ছাড়ে নাই। প্রথমে তার লক্ষ্য ছিল পরীর টাকা। কিন্তু যেদিন ফকীর পরীকে ভুলাইয়া অলির বাড়ীতে লইয়া আসিয়াছিল সেদিন অলি আড়াল হইতে পরীকে দেখিয়াছিল। তখন হইতে পরীর টাকা হইতে পরীই তার কাছে বেশী বড় হইয়া উঠিয়াছিল। পরে যখন সে আবিষ্কার করিল যে ফকীর বেইমানি করিয়া তাহাকে ঠকাইয়াছে, বাস্তবিক পরীকে সে অলির হাতে দিতে চায় না, তখন তার রোখ আরও চড়িয়া গেল। রসুলকে বার বার পরীর কাছে পাঠাইয়া সে নানা প্রলোভন দিয়া পরীকে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, রসুল তার সব কথা পরীকে বলিতে সাহস না পাইলেও প্রস্তাবটা তার কাছে করিয়াছিল। কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। অবশেষে অলি পরাণের মার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

পরাণের মা অলির দেওয়া টাকা সিন্দুকে পুরিয়া পরীর সন্ধানে গেল, অলি তার বাড়ীতে বসিয়া রহিল।

পরীকে বাড়ীতে খুঁজিয়া পরাণের মা ঘাটে গেল। সেখানে গিয়া দেখিল তার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, পরী আপনি তার হাতে আত্মসমর্পণ করিল।

পরীকে পাল্কীতে চড়াইয়া সে মোটা পুরস্কার লইয়া অর্দ্ধপথ হইতে বাড়ী ফিরিল।

জ্ঞান হইয়া পরী দেখিল তার বিবাহের আয়োজন সম্পূর্ণ, সে অলির সম্পূর্ণ করায়ত্ত। তার যথাসর্ব্বস্ব যাহা সে সঙ্গে করিয়া আনিয়া ছিল তাহা অলি হস্তগত করিয়াছে। অস্বীকার করিলে সে এই গৃহে অলির হাতে বন্দিনী হইয়া থাকিবে।

নিষ্ঠুর নিয়তির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তখন সে শ্রান্ত—বিদ্রোহ করিবার কোনও চেষ্টাই সে করিল না। সেই রাত্রে অলির সঙ্গে তার বিবাহ হইয়া গেল।

তার অবসন্ন বিষাদক্লিষ্ট হৃদয়ে এই কথাটা ভাবিয়া একটা তীব্র জ্বালাময় তৃপ্তিবোধ হইল যে ফকীর ফাঁকি পড়িয়াছে।

১৮

জেল হইতে লতিফকে বাহির করিয়া নেকজান তাহাকে লইয়া গ্রামে আসিল। স্থির হইল পরের দিন তারা ধুবড়ী যাত্রা করিবে।

খুব ভোরে—তখনও অন্ধকার আছে—মাঠ হইতে ফিরিবার পথে লতিফের পথ রোধ হইল; একটা ঝোপের আড়াল হইতে একটি নারী আসিয়া তার পা দুইটা জোরে চাপিয়া ধরিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

আকুল কণ্ঠে পরী বলিল, "আমারে মাপ কর—আমারে নিয়ে চল—নইলে আমি বাচুম না।"

লতিফ ফিরিয়াছে সংবাদ পাইয়া পরী রাত্রে পলাইয়া একা আসিয়া লতিফের বাড়ীর কাছে এই ঝোপে লুকাইয়া ছিল।

লতিফ সবল বাহুতে পরীর বাহুবেষ্টন হইতে আপনার চরণ মুক্ত করিল, তারপর প্রবল বেগে পরীকে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল, "বেইমানী, শয়তানের বেটী—দূর হ।"

বলিয়া সে মুখ ফিরাইয়া চলিল।

কঠিন আঘাতে আহত হইয়া পরী এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর সে গা ঝাড়িয়া উঠিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ছুটিয়া আবার লতিফের পায় পড়িয়া বলিল,—

"আমারে ফালাইয়া যাইও না, মাইরা ফালাও আমারে সেও ভাল—রাইখ্যা যাইও না আমারে!"

এবার লতিফ তাকে আরও জোরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল,—

"দূর শালী—পেশাকার ক'নেকার"—বলিয়া তাড়াতাড়ি তার আঙ্গিনার দিকে ছুটিয়া গেল।

এবার আর পরীর উঠিবার শক্তি ছিল না। সে স্তূপের মত সেইখানে পড়িয়া কাতর হইয়া সুধু আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পর লতিফের কাছে খবর পাইয়া নেকজান ছুটিয়া সেখানে আসিল। নয়নে অগ্নিবর্ষণ করিয়া সে সুধু কিছুক্ষণ পরীর দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর পরীর মুখের উপর নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল।

* * *

এক ঘণ্টা পরে নেকজান আবার ফিরিয়া আসিল। কিন্তু পরী আর তখন সেখানে ছিল না।

আকুল কণ্ঠে নেকজান চীৎকার করিয়া তাকে ডাকিল। চারিদিকে তন্ন তন্ন করিয়া তাকে খুঁজিল, কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না।

নেকজানের মনে হইয়াছিল যে কাজটা ঠিক হয় নাই। সে ভাবিয়াছিল পরীকে ডাকিয়া ঘরে লইবে, নতুবা লতিফের জীবনে সুখ থাকিবে না—তাই সে ফিরিয়া আসিয়াছিল।

কিন্তু তখন পরী সেনেদের পুকুরের শীতল জলের তলায় শেষ শয্যায় শয়ন করিয়াছে—নেকজান বা লতিফ তার সন্ধান পাইল না।

সমাপ্ত
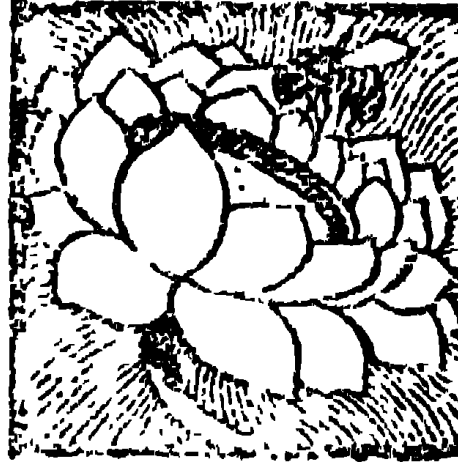
গজল-গান

(বিহারী—কাহারবা)

নজরুল ইস্‌লাম

পরদেশী বঁধুয়া ! এলে কি এতদিনে।
আসিলে এতদিনে কেমনে পথ চিনে ॥
কত গ্রহ তারা
হ'ল পথ-হারা,
কত মরু সাহারা ডুবিল গো তুহিনে ॥

তোমারে খুঁজিয়া কত রবি শশী
অন্ধ হইল প্রিয়, নিবিল তিমিরে !
তব আশে আকাশ তারা-দীপ জ্বালি'
জাগিয়াছে নিশি ঝুরিয়া শিশিরে।
শুকায়েছে স্বরগ, দেবতা, তোমা বিনে ॥

কত জনম ধরি'
ছিলে বল পাশরি',
এতদিনে বাঁশরী বাজিল কি বিপিনে ॥

নিতি ফুল-সনে ফুটিয়া কাননে
ঝরিয়াছি সাঁঝে নিরাশ হুতাশে।
নব নব গানে বেদনা-নিবেদন
করিয়াছে কবি প্রিয় তব পাশে।
এলে আজি উদাসী নিখিল-মন জিনে ॥

মরুশিখা

অলীকগঞ্জের হাটে কেনা কতকগুলো রঙীন পোষাক ও গয়না পরে কাব্যের দরবারে হাজির হওয়া সত্যের একটা রেওয়াজ হয়ে উঠেছিল। যুগে যুগে কবিরা পোষাকের রঙ বদলেছেন—গয়নার ফ্যাসান বদলেছেন—হাটের নতুন নতুন আমদানী সাজসজ্জায় নতুন ভাবে তাকে সাজিয়েছেন। লোকে পোষাকের বৈচিত্র্য ভাল বাসে, তাই যখনই বিচিত্রতা দেখেছে তখনই তারিফ করেছে। হঠাৎ খেয়ালী দুঃসাহসিক কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাকে একবারে চীরাবরণ নিরাভরণ রূপে এনে দরবারে হাজির করলেন,—এ-ও হোল একটা বৈচিত্র্য,—পোষাকী সত্য দেখে দেখে চোখ হয়েছিল ক্লান্ত, কাজেই এ-ও বেশ ভাল লেগে গেল। জানিনা এ বৈচিত্র্য আবার কতদিন ভাল লাগ্‌বে। আভরণে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা সহজ,—নিরাভরণতায় বৈচিত্র্য সৃষ্টি খুব কঠিন,—তাই ভয় হয় এ রেওয়াজ বেশী দিন চল্‌বেনা।—না চলুক, যতীন্দ্রনাথ অন্ততঃ এই নতুন ঢঙের জোরে এযুগে পাঠক-সমুদ্রের তরঙ্গরঙ্গে রঙ্গভরে তরে গেলেন।

যতীন্দ্রনাথের এই 'মরুশিখা' খানা পড়লে অনেক ধারণাই টলমল করে। আমরা জান্‌তাম ভণ্ডামিতেই কবিত্বের উৎসবটা জমে ভাল; 'মরুশিখা' পড়ে দেখছি ভণ্ডামির ভাণ্ড ভাঙাতে ধারণার দই ছড়িয়ে পড়ে বটে কিন্তু 'দধিমঙ্গল' উৎসবটা জমে বেশ।

কাব্যে এক রসের সঙ্গে আর এক রসের মিশ্রণ হলেই রসাভাস হয় বলে ধারণা ছিল,—যতীন্দ্রনাথ রসাভাস না ঘটিয়ে অদ্ভুত রসসঙ্কর ঘটিয়েছেন। এ প্রথা নতুন নয় বটে—কিন্তু এই ঘটকালীকে আগে কেউ ব্যবসা করে তোলে নি।

দুঃখে কান্না পায়,—তা সবাই জানে;—দুঃখে কান্না রোধ হয়ে স্তম্ভভাব জাগায়, তাও অনেকে জানে,—Too deep for tears বলে কবিরা কোন কোন দুঃখের পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু দুঃখে যে হাসি পায় তা' অনেকেই জানেন না। দুঃখে কেউ হেসে ফেল্লে লোকে বলে, 'পাগল হয়েছে—তাই হাস্‌ছে—মাথায় মধ্যমনারায়ণ তেল দাও।' কিন্তু সত্যই মনের অবস্থা এমন আসে—যখন মাথা ঠিক রেখেও লোকে গভীর দুঃখে হাস্‌তে পারে। সেই মনের অবস্থা নিয়ে কবি 'মরুশিখার' অনেক কবিতা লিখেছেন।

কবিতার প্যারডি অনেকে লিখেছেন—সে হচ্ছে ভাষার পরিবর্ত্তনে ভাবান্তর ঘটান। যতীন্দ্রনাথ কবির চিরকালকার স্বপ্নময়ী রসময়ী (?) দৃষ্টির ও শ্রুতির প্যারডি করেছেন। কোন্ দৃষ্টি কোন্ শ্রুতি যে ঠিক তা' কে জানে? পাখী যখন বনে চীৎকার করছে,—তুমি বলছ, পাখী কি মধুর গাচ্ছে—আমি বল্‌ছি, পাখীটা ক্ষুধায় কেঁদে সারা হলো। খেজুর গাছের গলা হতে রস ঝরছে,—তুমি বল্‌ছ, শুষ্ক খেজুর গাছ প্রাণ ভরে রসদান করছে;—আমি বলি, খেজুর গাছ অঝোরে কাঁদ্‌ছে। অস্তগামী সূর্য্যের রক্তরাগচ্ছটা দেখে—তুমি বল্‌ছ, সূর্য্য যাবার সময় বিশ্বে সোনা বিলিয়ে যাচ্ছে, আমি বলি,—"ছেঁড়া মেঘে পাতি মৃত্যুশয়ন রক্ত বমন করে।" কোন্‌টা সত্য তা' কে জানে? একদৃষ্টিতে দেখে যদি কেউ বাহাদুরী নিয়ে থাকে অন্যদৃষ্টিতে দেখেও আর একজন বাহাদুরী কেন নেবেনা?

সুধা জীবনদায়িনী সবাই জানে, বিষও যে রোগ বিশেষে জীবন দেয় তা' আর কেউ না জানুক রসায়নজ্ঞ বৈদ্যকবি তা জানেন। সুধা নিয়ে কারবার করবার লোকের অভাব নেই;—'মরুশিখার' কবির রসায়ন সৃষ্টি বিষ নিয়ে। কবির দেবতাটিও বিষকণ্ঠ।

রাঁধুনীর খুন্তি যার জাত মেরেছে কাব্যে তার ঠাঁই

কবি অত্যন্ত বেরসিক—আমরা যখন ধান ভানার অর্থ বার করবার জন্য গম্ভীর ভাবে ঢেঁকীর ধ্যান করি, অথবা—শ্রমিক ও কৃষকের ভাগ্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে বিনা লঙ্কা যোগেই অশ্রুপাত করি তখন কবি হেসে রসভঙ্গ ক'রে দেন। আবার আমরা যখন বনভোজনে খিঁচুড়ি খেতে খেতে হাস্যপরিহাস করি কবি তখন ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডের কথা তুলে রসভঙ্গ ক'রে বলে ওঠেন,

"এ খিঁচুড়ি নাহি হবে পরিপাক।"

ডি, এল, রায়ের 'শাহজাহানে' 'দিলদার' বলে একটা বিদূষক চরিত্র আছে—আমাদের কবিরাজ-পরিষদে ইনিও 'দিলদার'। প্রকাশ্যে হাস্‌বার যাদের সাহস নেই তাদের ইনি মনে মনে হাসান—আর বাদশাকেও ভাবান।

এই কবিটি রীতিমত অসভ্য, অভব্য (?), এঁর শিষ্টাচার নেই চক্ষুলজ্জা নেই—ভূমিকা করে কথা বলতে জানেন না—কাষ্ঠহাসি হেসে আপ্যায়ন করতে জানেন না—সবই অট্টহাসে উড়াতে চান। এই অসভ্য কবির চিত্র গুলো কি দিয়ে লেখা বা আঁকা কে জানে—Caveman এর গুহাচ্ছবির মতন ব'লেই মনে হচ্ছে—গুহাশায়ীদের গুহাচ্ছবিগুলো যেমন পাথুরে যুগ হতে পাথুরে কয়লার যুগ পর্য্যন্ত চলে এসেছে—এগুলোও তেমনি চিরস্থায়ী হবে বলেই আশঙ্কা হচ্ছে।

নেই এই ছিল আমাদের বিশ্বাস—'মরুশিখা' পড়ে দেখা যাচ্ছে—শুধু রাঁধুনীর খুন্তি কেন মজুরের খোন্তা, কাঠুরের কুড়ুল, চাষার লাঙ্গল কোদাল বিদে—কেউই কারো জাত মারতে পারে না। বাংলায় জাতের ভয় যেমন আছে, পতিতপাবনী গঙ্গাও তেমনি আছেন। রসের গঙ্গায় চুবিয়ে নিলে সবই কাব্যে চল্‌তে পারে।

Mathematical accuracy কাব্যে চলেনা এ ধারণা আমাদের বদ্ধমূল—কিন্তু তা' যে কাব্যে কতকটা সহায়তা করতে পারে—'মরুশিখা' পড়লেই তা' জানা যায়। কবি কম্পাসের কাঁটা দিয়ে কবিতাগুলো লিখেছেন। মাঝে মাঝে কাগজ একটু আধটু ছিঁড়েও গেছে। ফলে দাঁড়িয়েছে অন্যের কলমের লেখার অক্ষরগুলো ভাসা—আর এঁর অক্ষরগুলো সব ডোবা।

কবিতার জন্য বেশী বিদ্যার প্রয়োজন নেই এধারণা আমাদের ছিল—কিন্তু সেই সঙ্গে শাণিত বুদ্ধিরও প্রয়োজন নেই এরূপ একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মে গিয়েছিল। কবি বিদ্যে দিয়ে স্তম্ভ গড়েননি বটে, কিন্তু শাণিত বুদ্ধি দিয়ে রসের কুয়া খুঁড়েছেন।

আমরা কলিজার স্নেহে রেশমী পলতেতে দীপশিখা জ্বেলে ভদ্রকালীর পূজা করে আসছি। কিন্তু কবি মগজের ঘিএ মড়ার কাঁথার পল্‌তেতে যে 'মরুশিখা' জ্বেলেছেন তাই কি ব্যর্থ হবে? এতে রুদ্রকালীর পূজা হবে।

বেতালভট্ট

চিত্রবহা

শ্রী সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

—পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর—

মুক্তির দিশা

৪৩

জালিয়াঁবাগের বজ্রালোকে মহাত্মা গান্ধী ভারতের মুক্তিপথ স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। সে-পথ অসহযোগের পথ—অসত্য ও অন্যায়, ভোগ ও ভয়, হিংসা ও অধীনতার সঙ্গে অসহযোগ। সেই পথে চলিবার জন্য তাঁর আহ্বান দিকে দিকে বিঘোষিত হইলে অত্যাচার ও অপমান-ক্ষুব্ধ দেশ আসমুদ্রহিমাচল চঞ্চল হইয়া উঠিল। অমরও তার প্রকৃতিগত প্রাণাবেগের প্রেরণায় অধীর আগ্রহে সে-আন্দোলনের স্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

যেদিন সে একটা চরকা কিনিয়া আনিয়া সূতা কাটিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে বসিল সেদিন মেসে এক হুলস্থুল ব্যাপার! চরকা দেখিতে কি রকম তাই দেখিতে মেসের বাবুরা ঝুঁকিয়া পড়িল। অমরের অক্ষমতা দেখিয়া তাহাদের কৌতুকের আর অবধি রহিল না।

এই উদ্ভট যন্ত্রযোগে সূতা হইবে এবং সেই সূতায় কাপড় বুনিয়া পরা যাইবে—এমন অসম্ভব কথা অমর বিশ্বাস করিবে, এ তারা কল্পনাই করিতে পারে নাই! অমরের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর বাবুদের নাকি প্রচুর আস্থা ছিল! সেই ব্যক্তিকে এমনি ছেলেমানুষি করিতে দেখিয়া তাহাদের ত মর্ম্মাহত হইবারই কথা।

একাগ্র সাধনার ফলে চরকা আয়ত্ত করিতে অমরের বেশিদিন লাগে নাই। একদিন অবিশ্বাসীর দল সবিস্ময়ে দেখিল যথার্থ ই তুলার তাল হইতে মিহিসূতা অবলীলায় বাহির হইতেছে এবং অমরের চোখ চরকায় না থাকিলেও সেই কেঠো পদার্থ টা কলের মতই চলিতেছে। অগত্যা তারা এই দার্শনিক মত্ প্রচার করিল যে দুনিআ এক আজব কারখানা, সেখানে কিসে যে কি হয় তা বলা অত্যন্ত কঠিন!

মেসে দ্বিতীয় বিস্ময়ের সৃষ্টি হইল ইহারি অনতিকাল পরে—অমরের অঙ্গে যেদিন বিশুদ্ধ খাদির ধুতি ও পিরাণ উঠিল। যে-কাপড় গুণচটের মত মোটা আর খসখসে এবং এমনি খাটো যে একসঙ্গে কাছাকোঁচা রচনা করিবার জো নাই, সদাই হাঁটুর উপর উঠিয়া থাকে; যে-কাপড় কাচিতে লাগে অন্তত দু'জন জোয়ান আর শুকাইতে লাগে পুরা তিনটি দিন, তাহা পরিতে অমর-বাবুর মত শিক্ষিত সৌখীন ভদ্রলোকের একটু লজ্জাও হইল না? অমন সুন্দর সুপুরুষ, মখমলের মত গায়ের চামড়া—ও গুণচটের ঘষা লাগিয়া সে-চামড়া আর কদিন টিকিবে? কালশিটে দেখা দিল বলিয়া! পরিশেষে আর একবার দার্শনিক মত্ প্রচার করিয়া তারা মন্তব্য শেষ করিল—যাই হোক, নতুন ফ্যাশান্ ত বটে! লোকে বুঝুক আর নাই বুঝুক অন্তত একবার চেয়ে দেখবেই!

নিত্য নূতন বিস্ময় সৃষ্টি হইতে লাগিল। অমরের যে-শয্যার পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা মেসের বাবুদের ঈর্ষা উদ্রেক করিত সেই শয্যাই মায় তক্তপোষ একদিন বিদায় হইয়া গেল। মেঝের উপর কম্বল বিছাইয়া ছোট একটি বালিশ মাথায় দিয়া অমর শুইতে সুরু করিল।

দেখিয়া বাবুরা হাসিল। অমরের পশ্চাতে বলাবলি করিল, আর এক খেয়াল! আরো কত দেখবো!

বিপদের মুখে যে পালায় সে-ই বাঁচে—ইহাই না কি

বুদ্ধিমানের যুক্তি। কিন্তু যারা পালানো দূরে থাক, ইচ্ছা করিয়া বিপদ ডাকিয়া আনে, যারা আগুনের মাঝে অসঙ্কোচে হাত বাড়ায়, তারা নির্ব্বোধ ছাড়া আর কি? সুতা কাটো, চাঁদা তোলো, খদ্দর পরো, বেশ কথা! কিন্তু গভর্মেণ্ট যখন ভলেণ্টিয়ার-দল বাঁধা নিষেধ করিয়া দিল তখন সে-হুকুম অমান্য করিয়া জেলে যাইবার জন্য কোমর বাঁধিয়া দাঁড়ানো, যুবরাজের আগমনের দিন হরতাল ঘোষণা করিয়া ফেরা—এ যে মারাত্মক নির্ব্বুদ্ধিতা! এমন নির্ব্বুদ্ধিতার প্রশ্রয় বিজ্ঞলোকে কেমন করিয়া দিবেন? তবুও দেশের অনেক লোক সেই নির্ব্বুদ্ধিতা করিয়া বসিল।

সন্ধ্যার সময় কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিবার পথে একদিন অমর সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল রাস্তার মোড়ে মোড়ে বাংলা দৈনিক কিনিবার হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেছে। বহুকষ্টে একখানা কাগজ সংগ্রহ করিয়া সে পড়িল—মহিলা-ভলেণ্টিয়ারেরা হরতাল প্রচার করিতে গিয়া গ্রেপ্তার হইয়াছে!

গৌরবে ও আনন্দে তার বুক ফুলিয়া উঠিল। কিন্তু সঙ্গেসঙ্গেই সে না ভাবিয়া পারিল না, মেয়েরা যখন পুলিশের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে তখনো তার আপিস করার বিরাম নাই—কেবল চরকা ঘুরাইয়া, চাঁদা তুলিয়া, সৌখীন দেশ-সেবা করিয়া, সে নিশ্চিন্ত আছে! ঘরে যখন আগুন লাগে তখন সকলে সব কাজ ফেলিয়া সেই আগুন নিবানোর চেষ্টা করে, বসিয়া বসিয়া কাব্যালোচনা বা প্রবন্ধ-রচনা করে না! অথচ, সে ত তা-ই করিতেছে—ভাবিতে ভাবিতে ধিক্কারে তার মন ভরিয়া উঠিল। 'শুধু প্রাণধারণের শুধু দিনযাপনের গ্লানি' আর সহ্য হয় না!

মেসের সুমুখে পৌছিয়া অমর দেখিল দ্বারের কাছে বাবুরা জটলা করিতেছে। নিকটেই এক অচেনা যুবক এবং তার পাশে সম্ভবত তাঁরই জিনিসপত্র মাথায় লইয়া এক ঝাঁকা-মুটে। তাহাদের উপলক্ষ্য করিয়াই যে বাবুদের জল্পনা-কল্পনা, অমর কতকটা আন্দাজ করিতে পারিল।

যুবকের বেশভূষা এবং সম্পত্তি দুই-ই অমরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। পায়ে নাগরা, পরণে মোটা খদ্দরের ঢিলে পাঞ্জাবি আর পাজামা। মাথায় গান্ধি-টুপির আশপাশ দিয়া লম্বা ঝাঁকড়া চুল ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সম্পত্তির মধ্যে একটা ছোট তোরঙ্গ, একখানা কম্বল আর একটি চরকা।

অমর আসাতে বাবুরা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাহাকে নির্দ্দেশ করিয়া কয়েকজন সমস্বরে বলিয়া উঠিল, এই যে এসেছেন! বলুন মশাই ওঁকেই বলুন! ওঁর ঘর, ওঁর মর্জ্জিমতই হবে!

আগন্তুক একটু থাকিবার স্থান চায়। মেসের ম্যানেজার স্থান নাই বলিয়া হাঁকাইয়া দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু যুবকের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বলিতে বাধ্য হয়, অমরের ঘরে স্থান হয়ত হইতে পারে, যদি তার মত হয়।

যুবকের বয়স অল্পই মনে হইল, মুখে গোঁফদাড়ির চিহ্ন নাই। তার শীর্ণ পাণ্ডুর মুখের উপর একজোড়া উজ্জ্বল চোখ অমরের মুখের দিকে ফিরানো। সে-দৃষ্টির নীরব আকুতি অমর অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। কেমন তার মায়া হইল—মনে হইল, এই অচেনা মানুষটিও হয় ত তারই মত ভাগ্যহত নিঃসঙ্গ দরিদ্র! সে আর 'না' বলিতে পারিল না।

আগন্তুকের পানে ফিরিয়া বলিল, আসুন আমার সঙ্গে, আপনি আমার ঘরেই থাকবেন!

দুজনে বাড়ির ভিতর ঢুকিলে বাবুদের চোখে চোখে বিদ্রূপের হাসি খেলিয়া গেল।

একজন বলিল একটি ছিল, দুটি হল!

অপরজন কহিল, চরকা দেখেই মন গলেচে! রতনে রতন চেনে কি না!

৪৪

বি

তার নাম বিনয়ভূষণ বসু। রাত্রে কথাচ্ছলে নবাগতের এইটুকু পরিচয় অমর পাইল। পারিবারিক দু' একটা কথা জানিবার জন্য প্রশ্ন করায় বিনয় হাসিয়া বলিল, ক্রমশ সবই জানতে পারবেন। আপাতত এই-টুকু জেনে রাখুন, আমি মহাত্মার এক দীনহীন শিষ্য। বলিয়া সুতা কাটায় মন দিল।

অমর সে-প্রসঙ্গ আর তুলে নাই। বাস্তবিকই ক্ষণ-কালের পরিচয়ে কাহারো গোষ্ঠীর খবর জিজ্ঞাসা করা ত উচিত নয়।

অমরও চরকা লইয়া বসিল।

ঘর্ঘরধ্বনির অবকাশে আলাপ চলিতে লাগিল।

অমর কহিল, আপনি চমৎকার সুতো কাটেন। আমি এত চেষ্টা করি, কিছুতেই পারি না।

বিনয় হাসিয়া অমরের মুখের পানে চাহিল। তার হাসিটি ভারি মধুর।

বলিল, কেন, মন্দ কাটেন কি? ক্ষণেক থামিয়া কহিল, কবিমানুষ, দিনরাত মাথায় কল্পনার ঝড় বইচে! সমস্ত মন চরকায় দেবেন কি করে'?

অমর সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি আমাকে চেনেন?

বিনয় কহিল, স্বনামধন্য যাঁরা, তাঁদের কে না চেনে বলুন? আমাদের মত নগণ্য মানুষ ত নন!

সুতাকাটা চলিতে লাগিল। বিনয়ের পোশাকের দিকে চাহিয়া অমর বলিল, আপনার পোশাকটি বেশ! Very good idea! খদ্দর-ধুতি বেজায় খাটো, আবরু রক্ষা হয় না! এখনো আমার পরতে বাধো-বাধো ঠেকে!

বিনয় কহিল, আমারও তাই মত্। সেই জন্যেই এই পোশাক ধরেচি—যদিও একটু outlandish। তা ছাড়া আর এক সুবিধে, ঘোরাফেরা কাজকর্ম্ম করতে বাধে না। ধুতিটা দেখতে সুন্দর সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটা বৈঠকখানায় মানায় ভালো, দৌড়ঝাঁপের সময় নয়!

অমর খুসি হইয়া বলিল, Exactly।

কিছুকাল যায়। অমর জিজ্ঞাসা করিল, কংগ্রেসের মেম্বার হয়েছেন?

বিনয় কহিল, না।

অমর অবাক হইয়া গেল। বলিল, এখনো হননি? কেন?

বিনয় বলিল, এমনি। বিশেষ কোনো কারণ নেই।

অমর বলিল, তাহলে কাল সকালেই হতে হবে। আমাদের পাড়ায় কমিটি আছে। আমিই তার সেক্রেটারি।

বিনয় বলিল, বেশ ত! তা হবো।

অমর বলিল, আপনার মত লোকই আমাদের দরকার। আপনার সুতোকাটা দেখলে সকলেরই খুব উৎসাহ হবে। কেবল বক্তৃতায় হয় না, সামনে একটা living example চাই!

বিনয় হাসিয়া বলিল, আপনি আমার মাথা খাচ্ছেন। অত প্রশংসা করবেন না!

অমর কিছু বলিল না। অন্যমনা হইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে বলিল, দেখুন, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই, যদি কিছু মনে না করেন! কথাটা এখানকার কাউকে বলিনি। আপনাকে বলতে পারি, কারণ আপনি বুঝবেন।

বিনয় বলিল, বলুন না। বেশ ত। মনে আবার কি করবো!

অমর বলিল, কাল আমি ভলেণ্টিয়ার হয়ে জেলে যেতে চাই!

বিনয় চরকা থামাইল। মুহূর্ত্তকাল অমরের মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, জেলে যেতে চান?

অমর বলিল, হ্যাঁ। জেলের বাইরে থাকা বড়ো

কষ্ট, বড়ো লজ্জা, বড়ো অপমান! জেলে না গেলে আমার শান্তি নেই।

অশান্ত অমরের মনের বেদনা তার মুখের উপর ফুটিয়া উঠিল। বিনয় তাহাই দেখিতেছিল, কিছু বলিতে পারিল না।

অমর বলিতে লাগিল, এ-পাড়ার কমিটি নিজের হাতে গড়েছি। ভাবনা হচ্ছে, আমি গেলে তা বাঁচবে ত? যদি না বাঁচে তাহলে জেলে গিয়েও ত শান্তি পাব না! তাই ভাবছিলুম···

বিনয় কহিল, কি বলুন।

অমর কহিল, এই, যদি আপনি সে ভার নেন! আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত যদি কমিটিকে বাঁচিয়ে রাখেন!

বিনয় বলিল, তাই যদি আপনার ইচ্ছে হয় তবে চেষ্টা করবো!

নিমেষে অমরের মুখ নিশ্চিন্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে সে বলিল, করবেন? করবেন? উঃ বাঁচালেন! ভারি উপকার করলেন! কত যে তা বলতে পারি না!

বিনয় বলিল, কিছু না! কি আর এমন উপকার! দেশের কাজে একটু যদি লাগি মন্দ কি?

বোশরাতে শোওয়ার দরুণ পরদিন ঘুম ভাঙিতে অমরের দেরী হইয়া গেল। বিনয় তখন সাজগোছ করিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল। লজ্জিতমুখে কম্বলখানা গুটাইতে গুটাইতে অমর বলিল, উঠতে দেরী হয়ে গেল! আপনি আমাকে কুড়ে ঠাউরেছেন নিশ্চয়!

বিনয় কাগজখানা মুড়িয়া ফেলিল। হাসিয়া বলিল, যদি ঠাওরাই, তাতেই বা কি? মানুষের মতামতকে এখনো ভয় করেন না কি?

অমরও হাসিয়া ফেলিল, জিজ্ঞাসা করিল, কি মনে হয়?

বিনয় বলিল, এক তিলও না!

অমর বলিল, কি দেখে বুঝলেন?

বিনয় বলিল, কবির রচনা থেকে কবিকে অনেকটা চেনা যায়। আমিও তেমনি করেই চিনেছি!

আবার আত্মপ্রশংসার অবতারণায় অমর লজ্জিত হইল। প্রসঙ্গটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে তাড়াতাড়ি চায়ের সরঞ্জাম ও ষ্টোভ বাহির করিয়া ফেলিল। ষ্টোভ জ্বালিতে যাইতেছিল, বিনয় বাধা দিয়া বলিল, আপনি যান। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন। চা আমি করছি। এখনি ত আবার বেরুতে হবে?

অমর বলিল, নিশ্চয়। আচ্ছা আপনিই চা করুন। আমি এলুম বলে।

সে নীচে নামিয়া গেল এবং অনতিকালের মধ্যেই হাতে একটা কাগজের ঠোঙা লইয়া ফিরিয়া আসিল।

মেঝের উপর বসিয়া ঠোঙাটা আগাইয়া ধরিয়া সে বলিল, সুরু করে' দিন। মুড়ি আর চা মন্দ লাগে না, কি বলেন?

বিনয়ের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, মুড়ি আপনার চলবে ত? তাড়াতাড়িতে জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেলুম!

একমুঠি মুড়ি মুখে দিয়া বিনয় বলিল, খুব চলে! মুড়ি কি ফেল্‌না জিনিস?

অমর চা'য়ে চুমুক দিয়া বলিল, চমৎকার! আপনার হাতে সব জিনিসই খাসা ওতরায়—চরকার সুতোও যেমন চা-ও তেমনি!

বিনয় বলিল, থাক, আর লজ্জা দেবেন না!

কংগ্রেস-কমিটির আপিসে বিনয়কে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করাইয়া প্রধান কর্ম্মীদের সঙ্গে অমর তার পরিচয় করাইয়া দিল। অমরের অনুরোধে সুতা কাটিয়া বিনয় সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করিল। তারপর অনেক বাদানুবাদের পর অমরের জেলে যাওয়া যখন কমিটি অনুমোদন করিল তখন বেলা অনেক।

অনেকক্ষণ বকিয়া অমর শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বিনয়ের মুখও প্রফুল্ল বোধ হইতেছিল না। মেসের সুমুখে উপস্থিত হইয়া অমর বলিল, বেলা হয়ে গেল! ছুটোর সময় থেকে ভলেন্টিয়ার বার হবে। আপনি খাওয়া-দাওয়া করুন গে। আমি চলি।

বিনয় থমকিয়া দাঁড়াইল। অমরের পানে চাহিয়া বলিল, না, তা হবে না!

তার গাম্ভীর্য্য লক্ষ্য করিয়া অমর হাসিয়া ফেলিল। বলিল, কি রকম? কি হবে না?

বিনয় বলিল, না খেয়ে যাওয়া হবে না। স্নানাহার করে' তবে যেতে পাবেন!

অমর আবার হাসিল। পরিহাস করিয়া বলিল, হুকুম না কি?

বিনয় তেমনি গম্ভীরমুখে বলিল, কাল রাত থেকে এ পর্য্যন্ত যত হুকুম আমায় করলেন সে-সব যদি মাথা পেতে মেনে নিতে পারি, তবে আমার একটা হুকুম মানতে আপনার আপত্তি কেন?

অমর আর দ্বিরুক্তি করিল না।

আহারাদির পর যাত্রাকালে বিদায়-নমস্কার করিয়া অমর কহিল, চলি তাহলে!

বিনয় কহিল, চলুন। আমিও যাবো আপনার সঙ্গে।

তার মানে?

তার মানে, আমিও ভলেন্টিয়ার হয়ে আপনার সঙ্গে জেলে যাবো!

নির্ব্বাক বিস্ময়ে অমর ক্ষণকাল বিনয়ের মুখপানে চাহিয়া রহিল! পরে বলিল, সে কি? ঠাট্টা করছেন না কি?

বিনয়ের মুখ গম্ভীর। সে বলিল, এটা কি ঠাট্টার সময়? আমি যথার্থই বলছি!

অমর বিরক্ত হইল। কঠিনকণ্ঠে বলিল, তাই যদি, তবে আমায় কথা দিলেন কেন? আপনার মতিগতির কিছু ঠিক নেই দেখছি!

বিনয় সংক্ষেপে বলিল, ভালো লাগে না থাকতে!

অমরের বিরক্তি বাড়িয়া গেল। কহিল, ভালো না লাগে, থাকবেন না! আমি ত আপনাকে বেঁধে রাখিনি!

বিনয় অমরের কঠিন মুখের পানে চাহিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল, থাকগে। আমি যাবো না। যাবার সময় আর মন খারাপ করবেন না!

বলিয়া সে মুখ ফিরাইয়া লইল।

আর কালক্ষেপ না করিয়া অমর দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পথ চলার পর তার মনে হইল, বিনয়ের ইচ্ছায় বাধা দেওয়া তার উচিত হয় নাই! ইহাও মনে হইল যে, বিদায়কালে সে তার প্রতি বাক্যে ও ব্যবহারে অনাবশ্যক রূঢ়তা প্রকাশ করিয়াছে, সেরূপ করিবার তার কোনো অধিকার ছিল না! মহাত্মার শিষ্যের পক্ষে এরূপ আচরণ অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে সন্দেহ নাই! তার অহমিকা এখনো উগ্র হইয়া আছে, তাহাকে খর্ব্ব করা প্রয়োজন!

অমরের মনটা খারাপ হইয়া গেল। রহিয়া রহিয়া বিনয়ের বিমর্ষ মুখখানি মনে পড়িতে লাগিল। একবার ভাবিল ফিরিয়া গিয়া ক্ষমা চাহিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিবে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, তার আর সময় নাই, এমনিই যথেষ্ট বিলম্ব হইয়াছে।

অমরের আর ফেরা হইল না।

চকমিলানো বাড়ির সানবাঁধানো উঠানের উপর একখানা টেবিল পড়িয়াছে। তাহাই ঘিরিয়া জনকত লোক বসিয়া আছে। টেবিলের উপর খাতাপত্র ও লিখিবার সরঞ্জাম। একধারে স্তূপাকার খদ্দরের ফালি। ইহাই কংগ্রেসের কেল্লা—ভলেন্টিয়ার-আপিস।

উঠানে ও তার চারিপাশের বারান্দায় লোকের ভিড়। ছেলে বুড়ো, হিন্দু মুসলমান। স্কুল-কলেজের ছেলেরা অনেকে বই হাতে আসিয়াছে।

ভলেন্টিয়ার ছাড়িবার সময় উপস্থিত। টেবিলের ধার থেকে একজন হাঁকিল, তিন হিন্দু, দুই মুসলমান!

পাঁচজন লোক টেবিলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের নাম ধাম বয়স পেশা প্রভৃতি লেখা হইল। কি তাহাদের কর্ত্তব্য সে-কথা বুঝাইয়া দিয়া প্রত্যেককে এক এক ফালি খদ্দর দেওয়া হইল। উহাই তাহাদের 'ব্যাজ' —হাতে লইয়া বা কাঁধে ফেলিয়া চলিতে হইবে।

এইবার কর্ম্মকর্ত্তা হাঁকিল, 'গাইড'!

একজন ভলেন্টিয়ার আসিয়া দাঁড়াইল। তার নাম ধাম ইত্যাদি লেখা হইল। তারপর সে একখানি কার্ড পাইল। তার উপর লেখা—১। অর্থাৎ সেদিনকার প্রথম দলের সে গাইড বা পথ-প্রদর্শক।

কর্ম্মকর্ত্তার আদেশে প্রথম দলের পাঁচজন ভলেন্টিয়ার গাইডকে চিনিয়া লইল। তারপর চলার পথ কর্ম্মকর্ত্তার কাছে বুঝিয়া লইয়া মহাত্মার জয়ধ্বনি করিয়া দলবলসহ গাইড যাত্রা করিল।

দুই দল ভলেন্টিয়ার রওনা হইবার পর অমর আসিয়া উপস্থিত। তার পরণে সাদা ধবধবে খদ্দর, পায়ে মাদ্রাজি চটি। বলিষ্ঠ সুগঠিত গৌরমূর্ত্তি, দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী স্বপ্ন-জড়িত, মুখে মনীষার বিভা—তরুণ তাপসের মত সে সৌম্যদর্শন।

এত যে মানুষ ছিল সেই একটি মানুষের আবির্ভাবে সবাই যেন মুছিয়া গেল। চিনিতে পারিয়া কেহ কেহ তাহাকে অভ্যর্থনা করিল। যারা চিনিল না তারা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কে এ? কি করে? কি নাম?

কর্ম্মকর্ত্তা হাঁকিল, দুই হিন্দু তিন মুসলমান!

অমর নাম লিখাইবার জন্য তাড়াতাড়ি টেবিলের দিকে অগ্রসর হইল। ঠিক সেই সময়ে একজন গাইড ছুটিয়া প্রবেশ করিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে যাহা বলিল তার মর্ম্ম এইরূপ—

হ্যারিসন-রোড ও চিৎপুরের চৌমাথায় দুজন সার্জ্জেণ্ট ভলেন্টিয়ারদের নির্দ্দয়ভাবে রুলপেটা করিয়াছে। মাথা ফাটিয়া রক্তে জামা ভাসিয়া গেছে তবুও তারা নড়ে নাই, নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া মহাত্মার জয়ধ্বনি করিতেছে। এ দৃশ্য দেখিয়া দর্শকেরা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। এখনি তাদের ঠাণ্ডা করা দরকার, নহিলে অনর্থ ঘটিতে পারে।

কর্ত্তৃপক্ষেরা মহা ফাঁপরে পড়িলেন। উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় কোথা? তাঁহারা চারিদিকে ব্যাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া অমর কহিল, সে যাইতে প্রস্তুত, কেবল সঙ্গে একদল ভলেন্টিয়ার চাই।

পথে পড়িয়াই বিনয়ের সঙ্গে দেখা। সে বিপরীত দিক হইতে আসিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া অমরের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আবেগের সহিত তার হাত-দুখানা চাপিয়া ধরিয়া সে বলিল, এই যে এসেছেন! বেশ করেছেন! এখন চলুন আমার সঙ্গে, জরুরি কাজ আছে!

জরুরি কাজটা বিনয়কে বুঝাইয়া দিতে দিতে দ্রুতপদে অমর চলিতে লাগিল। হঠাৎ কাঁধে একটা চাপড় খাইয়া সে চমকিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল একটা ফিরিঙ্গি মৃদু-মৃদু হাসিতেছে।

অমরের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। লোকটার ধৃষ্টতা ত কম নয়! What the devil...বলিয়াই সে থামিয়া গেল। তারপর হো-হো করিয়া সে কি হাসি!

হাসির ধমক থামিলে কহিল, আপনি যে! সাধু সাধু! একেবারে খাঁটি হিন্দুর পোশাক! টিকির সঙ্গে মানিয়েছে ভালো!

বৈদ্যনাথ কহিল, না হে না, ঠাট্টা রাখো! এ দিকে চলেছো কোথা?

অমরের সঙ্গীদের উপর চোখ বুলাইয়া লইয়া বলিল, অ! গান্ধীর দলে ভিড়েছো বুঝি? কাজটা ভালো করোনি হে! বেজায় ধরপাকড় চলছে!

বৈদ্যনাথের কথা অমরের কানে গেল না। সে তার

অদ্ভুত বেশ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। মাথায় একটা বিবর্ণ তেল-চটচটে ফেল্ট্-হ্যাট্, গায়ে আঁজিকাটা ছিটের সুট। কোটের ঝুল কোমরের চার ইঞ্চি নীচে পর্য্যন্ত আর ইজেরের ঝুল জুতার ইঞ্চি চারেক উপর পর্য্যন্ত। সু-জুতা ধূলিধূসরিত, তার ছেঁড়া ফিতায় গিরো বাঁধা! নোংরা সূতির মোজা গোড়ালির দিকে হাঁ করিয়া আছে। ময়লা টুইল-সার্টের উল্টানো কলারের মধ্যে টাইয়ের বালাই নাই।

সহসা অমরের মনে পড়িল কি কাজে চলিয়াছে।

আসি তবে—বলিয়া চলিবার উপক্রম করিতেই বৈদ্য-নাথ বলিল, ওহে শোনো শোনো! একটা কথা আছে।

অমর বলিল, কি?

বৈদ্যনাথ বলিল, ২৪ তারিখে ত সব বন্ধ—হরতাল হবে শুনছি! ২৬ তারিখে ট্রাম চলবে ত?

অমর জিজ্ঞাসা করিল, কেন? ২৬ তারিখে কি?

বৈদ্যনাথ বলিল, জানো না? ভাইসরয়েস্-কাপ্-রেস্!

অমর স্তব্ধ হইয়া মুহূর্ত্তকাল বৈদ্যনাথের মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর দ্রুতপদে চলিয়া অগ্রগামী সঙ্গীদের ধরিয়া ফেলিল।

সনাতনী বৈদ্যনাথ রেসে যাইবার জন্য 'সাহেবী' পোশাকে রপ্ত হইতেছে ভাবিয়া অমর আপনমনে হাসি-তেছিল।

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, হাসছেন যে? লোকটি কে?

অমর বলিল, উনি আমার ভগ্নীপতি বৈদ্যনাথ-বাবু।

শুনিয়া বিনয় নিরুত্তরে চলার বেগ বাড়াইয়া দিল।

গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া অমর স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ কি ব্যাপার! পথের চারিধারে, বাড়ির ছাদে ছাদে, অসংখ্য মানুষ—কত যে তা বলা অসম্ভব। পথের মাঝে গাড়িতে ঘোড়াতে মোটরে মানুষে ট্রামে তালগোল পাকাইয়া সমস্ত একাকার হইয়া আছে—কোনো দিকে অগ্রসর হইবার জো নাই। চৌমাথার এক কোণে সশস্ত্র মিলিটারি ফৌজ এবং পদাতিক ও অশ্বারোহী সার্জ্জেণ্টের দল। নিকটে একখানা বন্দীবাহন জালেঘেরা লরি অপেক্ষা করিতেছে।

সহচরদিগকে কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিয়া অমর তাহাদিগকে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে বলিল। বিনয়কে সে সঙ্গে রাখিল।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাতজোড় করিয়া জনে জনে বুঝাইতে লাগিল, আপনারা বাড়ি যান! ভিড় বাড়াবেন না! দোহাই আপনাদের!

অরণ্যে রোদন। কে কার কথা শুনে! বাড়ি কেহই গেল না। উপরন্তু দু'একজন অমরকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, উপদেশটা নিজে পালন করলেই পারেন!

চারিদিকে কঠিন মন্তব্য ও কটুকথার খৈ ফুটিতে লাগিল। কেহ বলিল, এগুলো মানুষ না ভেড়া! ঠুঁটো জগন্নাথের মত দাঁড়িয়ে আছে! চোখের সামনে নির্দ্দোষীর রক্তপাত হচ্ছে—তা একটা সাড়াশব্দ নেই! সবাই মিলে থুতু ফেল্লে যে ব্যাটারা ডুবে যায়!

একজন বলিল, রগ টিপ্ করে' খানকত থান ইট ঝাড়ো ত দাদা! আর দেখতে শুনতে হবে না! ঐ হল আমাদের অস্ত্র!

ঝড় যে আসন্ন অমরের তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না।

সহসা তুমুল জয়ধ্বনি হইল। অমর চাহিয়া দেখিল অদূরে একদল ভলেণ্টিয়ার দেখা দিয়াছে। তাহাদের দেখিবার জন্য ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি পড়িয়া গেল।

হঠাৎ কে একজন বলিল, ঐ দেখ! আবার মারছে! উঃ রক্তে ভেসে গেল!

পাশ থেকে একজন বলিল, বেটারা চামার! জানোয়ার!

সমস্বরে কয়েকজন বলিয়া উঠিল, মারো শালাদের!

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা ইটপাটকেল সার্জ্জেণ্টদের দিকে পড়িল।

তারপর কোথা দিয়া কি হইল কিছুই বোঝা গেল না কিন্তু নিমেষের মাঝে বারুদের গাদায় যেন আগুন পড়িল। ছাতা ছড়ি জুতা সোডার বোতল পাথর খোয়া হাতের কাছে যে যাহা পাইল কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া তাহাই ছুড়িতে সুরু করিল। নকল গোলাগুলিতে আকাশ ভরিয়া উঠিল।

ওধারে বন্দুক বাগাইয়া সারি দিয়া ফৌজের দল দাঁড়াইয়া গেল। অমর ও বিনয় চীৎকার করিয়া সকলকে নিবৃত্ত হইবার জন্য মিনতি করিতে লাগিল কিন্তু মত্ত মানুষের কানে তাহা পৌঁছিল না।

বিনয়ের হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইবার, উপক্রম করিতেই একযোগে কয়েকটা বন্দুকের আওয়াজ হইল। সভয়ে অমর দেখিল বিনয় হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া যাইতেছে। দুই হাতে ধরিয়া তাহাকে কাঁধের উপর তুলিয়া সে ক্ষিপ্রপদে ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইল।

চারিদিকে মানুষ প্রাণভয়ে পালাইতেছে। কোনো দিকে কারও দৃক্‌পাত নাই। মানুষ উঠিতেছে, পড়িতেছে, আহত হইতেছে। আর জামা কাপড় জুতা ছিঁড়িয়া ধাক্কাধাক্কি করিয়া কোনোগতিকে যারা বাঁচিতে চায় তাহাদের তাড়া করিয়া ঘোড়সওয়ার সার্জ্জেন্টের দল দিকে দিকে বিভীষিকার মত ছুটিয়া ফিরিতে লাগিল।

একটু ফাঁকা জায়গায় পৌঁছিয়া আহত বিনয়কে বুকে লইয়া একটা ট্যাক্সির মধ্যে অমর উঠিয়া বসিল। চালককে হাসপাতালের দিকে যাইতে বলিয়া সে বন্ধুর পানে তাকাইল। তার চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে, মাথাটা কাত হইয়া পড়িয়াছে, বুকের উপরে জামাটা রক্তে ভিজিয়া গেছে।

অমর শিহরিয়া উঠিল। গুলি বুকে বিঁধিয়াছে। বোতামগুলো পটপট করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে বুকের পানে তাকাইয়াই তড়িতাহতের মত চমকিয়া অমর হাত সরাইয়া লইল। বিস্ফারিত-চোখে বন্ধুর মুখের পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে আপনি ?

বিনয়ের মৃত্যুপাণ্ডুর অধর নড়িয়া উঠিল। ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, চিনতে পারো না ?

অমর নীরবে মাথা নাড়িল।

মরণাহত লোকটি বলিল, আমি করুণা !

৪৫

অশেষ

নীড়হারা পাখী এক রাত্রের জন্য নীড়ে ফিরিয়াছিল, কিন্তু নীড় তাহাকে বাঁধিতে পারিল না। কূল হারানোই যার ললাটের লিপি সে আবার অকূলে পাড়ি দিল।

করুণা বাঁচিল না।

মরণের আগে যে-কয়েকটা কথা সে অমরকে বলিয়াছিল তা সংক্ষেপে এইরূপ—

জীবনে সে একটি পুরুষকে ভালবাসিয়াছিল—সে অমর। সেই তার প্রথম এবং শেষ ভালবাসা।

সে-ই তার মনে অতৃপ্তির বীজ রোপন করিয়াছিল, অধীনতায় লজ্জা ও ক্লেশবোধ করিতে সে-ই তাহাকে শিখাইয়াছিল।

তাহারি ফলে ঘরের বাঁধন সহ্য হইল না, সে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে ছুটিল। বাহির যে কেমন তা তখন জানিত না।

ঘরে থাকিবার মূল্য দিতে দিতে সে অতিষ্ঠ হইয়াছিল, বাহিরে থাকিবার মূল্যও তার পক্ষে কম নিদারুণ হয় নাই। শান্তি সে পাইল না।

ভালবাসা যেখানে নাই দেহ-দান সেখানে ব্যভিচার মাত্র, অথচ সামাজিক জীবনে একভোগ্যারূপে এবং সমাজ-বহির্ভূত জীবনে এক বা বহুভোগ্যারূপে কত স্ত্রীলোককেই সেই পাপে লিপ্ত থাকিতে হয় কেবল পেটের দায়ে! নারীর জীবনে ইহাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক ট্র্যাজেডি আর নাই!

তার আশ্রয়দাতার সহৃদয়তার জন্য সে বিশেষ কৃতজ্ঞ—তাঁর সাহায্য ব্যতিরেকে সে কিছুতেই বাঁচিতে পারিত না। তিনি তার কোনো সাধ অপূর্ণ রাখেন নাই। তাঁহার কল্যাণেই সে সর্ব্ববিধ শিক্ষার সুযোগ পাইয়াছিল। সেই

শিক্ষাই তাহাকে শ্রেয়ের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছে, কঠিনতম দুঃখে তাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছে।

মহাত্মার মন্ত্রবলে একদিন নবজীবনের পথের সন্ধান পাইয়া ভোগের আবেষ্টন হইতে সে অনায়াসে মুক্তিলাভ করিল।

কেশপাশ কাটিয়া আভরণ দূরে ফেলিয়া নিরামিষাশী একাহারী ব্রহ্মচারিণীর জীবন সে গ্রহণ করিল। তার আশ্রয়দাতা ভাবিল, সে পাগল হইয়াছে।

পাঠে ও চরকায় তার সময় কাটে। একদিন অমরের লেখা একখানি বই তার হাতে পড়িল। সুখশান্তির আর সীমা রহিল না।

তদবধি মাসিকের পাতায় অমরের লেখার সন্ধান করা একটা নেশার মত হইয়া উঠিল। সন্ধান প্রায়ই ব্যর্থ হইত না। লেখার ভিতর দিয়া অমর যেন তার সঙ্গে কথা কহিত! যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই অমরকে আর একবার দেখিবার জন্য, ক্ষণকালের জন্যও তাহাকে নিকটে পাইবার জন্য তার ব্যাকুলতা বাড়িয়া চলিল।

সে-ব্যাকুলতা অন্তর্যামী বুঝি টের পাইলেন। নতুবা তার অভাবিত দেখা সে পাইবে কেন? পথ দিয়া গানের দল লইয়া অমর দেশের জন্য ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিল, অলক্ষ্যে থাকিয়া করুণা তাহাকে দেখিল।

না জানিয়াও সে তার প্রিয়তমের পথই অনুসরণ করিতেছে বুঝিয়া গৌরবে তার হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। অমরের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিল, সে তার যোগ্য হইবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিবে!

তারপর মাসিকপত্র-আপিসে চিঠি দিয়া অমরের ঠিকানা-সংগ্রহ, দর্জ্জিকে ঘুষ দিয়া খাদির পুরুষ-সজ্জা তৈরি করানো, গঙ্গাস্নানে যাইবার অছিলায় গাড়ি চড়িয়া পলায়ন। গাড়ির মধ্যে ছদ্মবেশ ধারণ, শালমুড়ি দিয়া গাড়ি পরিত্যাগ। তারপর পুরুষবেশে বাজার হইতে চরকা, কম্বল ও টিনের তোরঙ্গ সংগ্রহ করিয়া পুরাপুরি গান্ধীর চেলায় পরিণতি!

অসহযোগ-আন্দোলন যখন জোয়ারের নদীর মত প্রচণ্ড বেগবান ছিল তখন তাহা অমরকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। কারণ তখন উহার সঙ্গে তার নিজের প্রাণাবেগের সঙ্গতি ছিল—নিরস্ত্র হইলেও উহা ছিল যুদ্ধ। কিন্তু কালক্রমে সেই নদীতে যখন ভাঁটা পড়িল, যখন তাহা পঙ্ক-পল্বলের মত স্থির হইয়া উঠিল, তখন সে আর তার মধ্যে স্বস্তি পাইল না—তার মন বিরূপ হইয়া উঠিল। মহাত্মার সহিত তার মতের ঐক্য রহিল না—চরকাকে সে ভারতের স্বাধীনতার প্রধান উপায় বলিয়া স্বীকার করিতে অপারক হইল। চরকাকে জ্ঞানালোচনা, আর্ট, সাহিত্য বা শক্তি-চর্চ্চার উপরে স্থান দিতে তার মন সরিল না। জপমালা-ঘুরানোর মত চরকা-ঘুরানোর আত্মঘাতী নিষ্ক্রিয়তার সে অনুমোদন করে কেমন করিয়া? অহিংসার মুখোস পরিয়া কাপুরুষতার প্রশ্রয় দিতে সে অনিচ্ছুক, অতীতে ফিরিয়া যাওয়া তার ধর্ম্ম নয়—তার ধর্ম্ম আগে চলা, অবিরাম চলা। শান্তি তার কাম্য বটে, কিন্তু তাহা মৃত্যুর শান্তি নয়। যে-গুরুবাদের চোরাবালিতে দেশের শুভবুদ্ধি যুগে যুগে ডুবিয়া মরিয়াছে, তাহাই যখন মহাত্মাকে আশ্রয় করিয়া স্বাধীনতার সংগ্রামের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিল; খাদির ভেক লইয়া লোকে যখন দেশভক্তির নামে দেশের অগ্রগতিকে পদে পদে বাধা দিতে লাগিল, যখন তারা পশ্চিমের বিদ্যাবুদ্ধিকে পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিবার প্রস্তাব করিয়া বসিল, তখন সে দুঃখে লজ্জায় অভিমানে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

বাংলার এক নিভৃত নির্জ্জন নদীতীরে অমর তার স্বপ্ন-সহচরীর সহিত সংসার পাতিয়াছে।

সেখানে জলের উপর সকাল-সন্ধ্যায় আলো-আঁধারের লুকোচুরি, দিগন্ত-প্রসারিত নীলাকাশে সূর্য্য-চন্দ্র-জ্যোতি-

ক্ষের উদয়াস্ত, মেঘমালার নিরুদ্দেশ ভ্রমণ। মহাশূন্যে বজ্রের হুঙ্কার, ঝড়ের ঝঙ্কার, মাটির উপর ফোটা ফুল আর ঝরা পাতার মেলা—ঋতুর পশ্চাতে ঋতু ছুটিয়া চলিয়াছে, কতই না তাদের রঙ্গ!

জীবনের যে-পথ সে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে তাহারি পানে সে মাঝে মাঝে ফিরিয়া তাকায়। সে-পথে কত অভাবিত ঘটনা ঘটিল, কত অজানার সহিত পরিচয় হইল, কত পর হইল পরমাত্মীয়, আর কত আত্মীয় প্রীতির প্রতিদানে কেবল হিংসাই উদ্গার করিল। সে-পথের আদি-অন্তে অমৃত ও গরলে মাখামাখি, দুঃখ-সুখে বিরহ-মিলনে কোলাকুলি। কত প্রীতির পরশ কত শোকের দহন কত আশার ছলনা, কত কামনার আগুন কত ত্যাগের আহ্বান কত স্বপ্নের মহিমা—কী বিচিত্র সেই পথ!

কখনো কখনো অজানা আনন্দে তার হৃদয় ভরিয়া ওঠে, আবার কখনো হতাশার ভারে মন ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হয়। কিন্তু সুখ দুঃখ যাহাই আসুক তার আত্মার আগুন প্রচণ্ড তেজে জ্বলিতেই থাকে—সেই অনির্ব্বাণ অগ্নিশিখা প্রাত্যহিক জীবনের সকল তুচ্ছতাকে এড়াইয়া ঊর্দ্ধে অসীম আকাশকে স্পর্শ করে।

মাঝে মাঝে ওহানার কথা মনে পড়ে।

স্বপ্নে বিদায় লইবার সময় সে অঙ্গীকার করিয়াছিল আবার দেখা দিবে।

অমর ভাবে, সে কবে—কোন্ যুগে?

সমাপ্ত

ভৈরব মুখুজ্জিয়া

বরযাত্রীরা আসিয়া বসিয়াছেন বহির্ব্বাটির আঙ্গিনায়, প্রশস্ত চন্দ্রাতপের নীচে ; আসর সরগরম……

আনন্দ এত যে যিনি ধার করিয়া রেশমী পাঞ্জাবী পরিয়া আসিয়াছেন তাঁহারও সে-কথাটা মনে নাই।

বাহিরের আঙ্গিনাটা প্রশস্ত, কিন্তু ভিতরেরটা 'খাঁচা-পারা' ; অথচ বিবাহকর্ম্মটি সমাধা হইবে সেই অন্দরেই—সেখানে এত লোক আঁটে না।

কন্যাকর্ত্তা খোট্টা দারোয়ানকে বলিয়া দিয়াছেন,—বাজে লোককো মত্ ছোড়ো, পাঁড়ে। বর্কা দাদা, খুড়ো, জ্যাঠা, পিসে, মেসো এই সব লোক্‌কো পুছ্‌কে পুছ্‌কে অন্দরমে যানে দেনা। বুঝা ?

—হাঁ হুজুর, বুঝা। বলিয়া পাঁড়ে তৈরী হইয়া রহিল।……

বরপক্ষে ভৈরব মুখোপাধ্যায় নামে পরিপক্ক এবং অত্যন্ত নিরীহ এক ব্যক্তি ছিলেন—বয়সে প্রবীণ, হাতে হুঁকা এবং মাথায় নামাবলী।—

বরের দাদা, খুড়ো, পিসে প্রভৃতি স্ব-স্ব পরিচয় দিয়া বিবাহের আসরে যাইয়া বসিয়াছেন……

বরের কেউ নয়—তাহারাও দু' চারজন ঢুকিয়া গেছে। বাজে লোক তারা নয়…শাল, পাঞ্জাবী, হীরার আংটি দেখিয়া পাঁড়ের প্রশ্ন করিতেই জুয়ায় নাই।—

বহির্ব্বাটির মজ্‌লিসে বসিয়া বিবাহ-সম্পর্কীয় আলাপ-চারী করিতে করিতে ভৈরব মুখোপাধ্যায়ের মনে হইল, সম্প্রদানটা দেখা দরকার……

তিনি জানিতেন না যে দরজায় দারোয়ান আছে—

হুঁকা সমেত হন্ হন্ করিয়া দুয়ারে পৌঁছিতেই পাঁড়ে গোঁফ বাড়াইয়া বলিল,—ঠারিয়ে। আপ বর্কা কোন্ লাগে ?

ভৈরব মুখোপাধ্যায়ের নামাবলী ছাড়া মাথায় উপস্থিত বুদ্ধিও ছিল—

থমকিয়া দাঁড়াইয়া দারোয়ানের গোঁফের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—হাম্ বর্কা ? হাম বর্কা ভৈরব মুখুজ্জে।

—ভৈরব মুখুজ্জিয়া ? আচ্ছা তব্ যাইয়ে।……

এটা বিবাহের আসর নহে, মা সরস্বতীর দরবার। মা হুকুম দিয়াছেন কি না জানি না, কিন্তু—"খাড়া রও" —বলিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া দারোয়ান দরবারের প্রবেশ দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহারা সিল্ক্-পাঞ্জাবী রেশমী রুমাল হীরার আংটি দেখাইতে পারিয়াছেন তাঁহারা যাইয়া দরবারে বসিয়াছেন—

আপনার লোকের ত' কথাই নাই।

জ্যাঠা কতকগুলি ভৈরব মুখুজ্জের।…

কন্যাকর্ত্তার দ্বারবানের সঙ্গে মা সরস্বতীর দ্বারবানের বিস্তর প্রভেদ…দণ্ড আর দাড়িধারী পাঁড়ে যাহা বুঝিতে পারে নাই, কলমধারী এ দারোয়ান তাহা অক্লেশে বুঝিয়া ফেলিয়াছে—

বলিয়া দিয়াছে,—ওহে, ধাপ্পা এখানে চলিবে না।

কাজেই ভৈরব মুখুজ্জেগুলি দরবারের গেটে দাঁড়াইয়া ভিতরের দিকে হা করিয়া চাহিয়া আছে।

তাদের মাথায় নামাবলী নাই, আর চুলে তেল নাই, তাদের মুখ দেখিয়া মনে হয়, তারা পেট ভরিয়া দু'বেলা

খাইতে পায় না ; আর তাদের স্তুতির পোষাক দেখিয়া মনে হয়, দাড়ি আর দু' ইঞ্চি বাড়িলেই তারা বিষ্ণুপাদ-পদ্মে যাইয়া পৌঁছিবে।—

কিন্তু লজ্জায় তাদের মাথা হেঁট হইয়া গেছে—

মায়ের দরবারে একি ব্যাপার !···যার তার সেখানে প্রবেশাধিকার নাই, ইহা অতি উত্তম ব্যবস্থা ; কিন্তু যাঁহারা সেখানে ঢুকিয়া নানারঙ্গের অভিনেতা সাজিয়া বসিয়া গেছেন তাঁদের এ কি আচরণ !...আরশোলোর হাটে চীনেরাও ত এত গোল করে না !···

ভৈরব মুখুজ্জের দল একেবারে বিধ্বস্ত !—

আমরা ভৈরব মুখুজ্জে নই, দরবারের মুরুব্বি ত' নই-ই, গোমস্তাও নই।···কিন্তু এই ব্যাপারে আক্কেল হইল অনেক। যথা :—

১। দরিদ্রের সাহিত্য-রোগ ভাল নয়।

২। দেউড়িতে দ্বারবান থাকিবেই।

৩। জয়মাল্য পাইতে হইলে হতজ্ঞান হইয়া খেউড় গাহিতে হইবে।

৪। কুক্কুট কৃমিভোজন এবং কুড়ের মটকা ছাড়িয়া কবিগুরুর পতাকায় আরোহণ করিয়া ইন্দ্রধনু গিলিতে উদ্যত।

৫। সন ১৩৩৪ সালে ঢেঁকির মাথায় বুদ্ধির শিকড় গজাইয়াছে, যাহার ফলে মাসিক 'শনিবারের চিঠি'।

৬। উদারতা সহৃদয়তা বলিয়া কোনো সম্পদ সমাজ-ধুরন্ধর পাণ্ডিত্যাভিমানী সাহিত্যিকদের থাকিতে পারে না।—

আর একটি গল্প মনে পড়িয়া গেল :—

বিবাহের প্রাথমিক প্রশ্নটার সমাধান হইয়া গেছে।···টাকার পর কনে' ; তাহাও পছন্দ হইয়াছে।...তারপর পাত্রের পিতা কন্যার পিতাকে পত্র লিখিলেন :—

"মহাশয়, শ্রীমান্ রজনী বাড়ীতে আগমন করিয়াছে ; অতএব অবিলম্বে ঘটকচূড়ামণিকে পাঠাইয়া দিবেন।"—

পত্র পাইয়া কন্যার পিতা বাজার হইতে আনীত দু'টি দ্রব্যসহ একখানা পত্র লিখিয়া লোক পাঠাইয়া দিলেন ; পত্রে লিখিলেন :—

"মহাশয়ের আদেশ মত লোক মারফত ঘট এবং কচু পাঠাইলাম ; কিন্তু ড়ামণি পাইলাম না।"

মনীষী যাঁরা তাঁরা কপালকুণ্ডলা হইতে কমলাকান্তের দপ্তর প্রভৃতি ঘট সাজাইয়া মাঙ্গলিকী করিয়াছেন—

"পথিক-বন্ধু" প্রভৃতি অতরুণ কচু দিয়া কেহ কেহ কাঙ্গালী-ভোজন নিষ্পন্ন করিয়াছেন।...

গোল বাধিয়াছে ড়ামণি লইয়া।—

যাঁরা পুরাতন এবং নব—এই উভয় পর্য্যায়েই পবিত্র কুঁকড়োকে মাথায় চড়াইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন ড়ামনি তাঁদের না এদের ?

জুনিয়ার্ জলধর

শীর্ণ শুভ্র পথ-রেখা

শ্রী হেমচন্দ্র বাগচী

শীর্ণ শুভ্র পথরেখা গ্রামপ্রান্তে আম্রবীথি সাথে
মিশে যায় ;—তৃণহীন ধূসর প্রান্তর ;
উদাসীনা দক্ষিণার বীণা বাজে বাসন্তী-প্রভাতে
মুকুল-উৎসব শেষে বিদায়-বাসর।

যতদূর আগে যাই ব্যগ্র মন ফিরে ততদূর।
—ধূলিকক্ষ পল্লীপথ তুলিছে অঙ্গুলি।
স্নিগ্ধশ্যাম বটচ্ছায়ে বাজে বাঁশী ক্লান্ত মেঠোসুর
মনেরি রাগিণী উঠে ব্যথারে আকুলি'!

সে গান বাজিছে আজো রিক্তপত্র বেণুবন ঘিরে ;
বেজে যায় রৌদ্রদগ্ধ ক্লান্ত নভতলে।
অন্তর-কম্পনে তোর সে গান কি বাজে সখি ধীরে,
রাগরক্ত হয়ে উঠে নেত্রশতদলে!

বিনোদিনী

শ্রীযুক্ত জগদীশ গুপ্ত পল্লীবাসী নিভৃতবিলাসী সাহিত্য-সেবী। পল্লী-জীবনের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাঁর এই 'বিনোদিনী'র গল্পগুলি রচিত।

এ গল্পগুলি পল্লীচিত্র বটে কিন্তু ফোটোগ্রাফ নয়। এ চিত্রগুলিতে লেখকের নিজস্ব পরিকল্পনা আছে, যথেষ্ট বর্ণ বৈচিত্র্য আছে, অথচ এমন কোন জ্বলন্ত রঙের ছড়াছড়ি নেই যাতে চোখ ঝল্সে যায়।

পল্লীজীবনের আবহাওয়ায় জীবন মরণের এক একটি সমস্যাকে বৃন্তস্বরূপ অবলম্বন করে গল্পগুলি নিজস্ব রস-সৌন্দর্য্যে ফুটে উঠেছে।

লেখকের অদ্ভুত সামঞ্জস্যবোধ ও অনুপাতের জ্ঞান আছে ; এইটাই শ্রেষ্ঠ শিল্পীর লক্ষণ। রসের সঙ্গে রূপের, ভাবের সঙ্গে ভাষার, চিত্রের সঙ্গে বৈচিত্র্যের, ধীর সঙ্গে শ্রীর, বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার এমন একটি সংযত সংহত সামঞ্জস্য এই গল্পগুলিতে আছে—যা' সচরাচর আজকালকার গল্পে দেখা যায় না। কোথাও বাগবাহুল্য নেই, অস্বাভাবিক

উত্তেজনা, নাটকীয় আস্ফালন বা তত্ত্বগত বিতণ্ডা বা মন্তব্য কোথাও নেই। ঝরঝরে তরতরে স্বচ্ছ প্রবাহে রচনাগুলি স্বাভাবিক গতিতে চলেছে।

জগদীশবাবু irony-র খুব অনুরাগী। সমস্ত লেখার মধ্যে বেশ একটা চাপা irony আছে, সেজন্য রচনা-ভঙ্গির মধ্যে একটা নিষ্ঠুর কৌতুকধারা বয়ে যাচ্ছে। এমন কি irony of fate জিনিসটাকেও তিনি গল্পের একটি প্রধান অঙ্গ মনে করেন।

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ঘটনার ঘোটনায় লেখক বিস্ময়ানন্দ সৃষ্টি করতে পারেন খুব। এই রকম ঘটনা একটি ঘটাবার আগে তিনি নিঃশব্দে আয়োজনও করেন—এমন অবস্থায় প্লটটিকে দাঁড় করান—যে অবস্থায় পাঠকের মন অন্যদিকে সরে যায়—পরবর্ত্তী ঘটনার জন্য আদৌ প্রস্তুত থাকে না—সেজন্য সহসা একটা অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ানন্দের সঞ্চার হয়। লেখক মানবমনের দুর্ব্বলতাগুলির বড় বেশী সন্ধান রাখেন। সেই দুর্ব্বলতাগুলিকে যখন হাসতে হাসতে প্রকাশ করে দেন তখন অনেক মনেই আত্মপরীক্ষা সুরু হয়। এ প্রথা নতুন নয় বটে, তবে জগদীশবাবুর এ বিষয়ে কৃতিত্ব খুব বেশী।

বর্ত্তমান কথা-সাহিত্যের বিরুদ্ধে যে অপবাদ আজ কাল লোকের মুখে মুখে—মাসিকের পাতায় পাতায়—জগদীশবাবুর এই বইখানিতে তার রেখামাত্র নেই। এ কথা বলার প্রয়োজন আছে। যাঁরা ভাবেন নরনারীর দূষিত যৌনসম্পর্কের কথা ছাড়া আজকালকার লেখকদের লেখায় আর কিছু নেই—তাঁরা জগদীশবাবুর বইখানি পড়ে দেখতে পারেন। ইন্দ্রিয়গত দুর্ব্বলতা কথা-সাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে কি না এখানে আমার সে আলোচনা উদ্দেশ্য নয়। জগদীশবাবু মানবপ্রকৃতির অন্যান্য দুর্ব্বলতা অবলম্বন করে এ গল্পগুলি লিখেছেন—ইন্দ্রিয়গত দুর্ব্বলতার কথা এ গুলিতে নেই।

বরঞ্চ—একটা উচ্চশ্রেণীর নৈতিক আদর্শই গল্পগুলিকে গোড়ায় প্রেরণা দিয়েছে। সে আদর্শ অবশ্য সাম্প্রদায়িক নয়—বিশ্বজনীন। আর এই আদর্শের প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট।

গল্পের প্লটের জন্য এমন চমৎকার আবহাওয়াসৃষ্টি অতি অল্প লেখকের লেখাতেই দেখি। অকৃত্রিম আবহাওয়ার জন্য গল্পগুলি একবার পড়লে আর ভুলবার উপায় নেই। গল্প পড়ে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গোচরের ফল পাওয়া যায়—এমনি জীবন্ত চরিত্রগুলি এমনি স্ফুটোজ্জ্বল চিত্রগুলি।

অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণের ফল কবির তত্ত্ববোধকে রসবোধের মতই শাণিত করেছে। গল্পগুলির মধ্যে তার আভাস ছড়ানো আছে। কোন কোন স্থলে তা' সংহতও হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ তোলা যেতে পারে—

"যে বহুকাল রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া শয্যায় শুইয়া ক্রমে ক্রমে তিল তিল করিয়া ক্ষয় হইয়া প্রাণত্যাগ করে তাহার মৃত্যুতে তাহার অধিকৃত স্থানটিই কেবল শূন্য হইয়া যায়—সে যেন নিশ্চিত এবং নিঃশেষ অনুপস্থিতি; কিন্তু যে মানুষ এই ছিল এই নাই সে কাছে না থাকিয়াও কোথায় যেন থাকে; তার অভাবে গৃহের প্রত্যেক কক্ষ, প্রত্যেক অঙ্গন, প্রত্যেক দ্বার, প্রত্যেক মোড়, প্রত্যেক অংশ—গৃহের সমগ্র মর্ম্মস্থলটিই শূন্য হইয়া হা হা করিতে থাকে, ঠিক সেই কারণেই আবার জীবিতের সচকিত ভীতির অন্ত থাকে না,—ঐ বুঝি সে আসনে বসিয়া, ঐ বুঝি সে দুয়ারে দাঁড়াইয়া, ঐ বুঝি তার কণ্ঠস্বর—এমনি ভুল সহস্রবার ঘটিয়া মনোরাজ্যের সীমা ছাড়াইয়া মৃতের দৈহিক অস্তিত্বের মৃণালটুকুর নিশ্চিহ্ন রূপে ও নিঃশেষে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইতে বহু বিলম্ব ঘটে।....."

লেখকের কৈফিয়তে বেশ বৈচিত্র্য আছে। বইখানির 'বিনোদিনী' নাম সার্থক।

শ্রী কালিদাস রায়

সমর্পণ

শ্রী সুবোধ রায়

বহুদিন প্রতীক্ষার পরে
এলে তুমি স্মিতহাস্যে উজলিয়া আমার অন্তরে।
বঙ্কিম কপোল আর লাজনম্র-কম্প্র-নেত্রপাতে
দুরু দুরু গুরু হিয়া দিলে তুলি' মোর দুটি হাতে,
সহজ আনন্দভরে ধরা দিলে ব্যাকুল বন্ধনে,
সম্মিলিত দুটি প্রাণ পূর্ণ হ'ল অনন্ত-স্পন্দনে।
সে নিমেষে তব চোখে হেরিলাম যেই মুগ্ধছবি
তাহারে বর্ণিতে পারি ভাষা কোথা আমি দীন কবি?
দেহ-মন-প্রাণ তব ছলছল কম আঁখি দিয়া
সলজ্জ আবেশে যেন ধীরে ধীরে আসি' বাহিরিয়া
বুলাইল মোর চোখে আনন্দের সম্মোহন-তুলি,
অপরূপ রূপ নিয়ে সারা বিশ্ব উঠে দুলি' দুলি'।
অন্তর-সমুদ্রে মোর সে কি নৃত্য, সে কি কলরোল,
চন্দ্র-সূর্য্য-তারারাজি এক সাথে দোলে বিশ্বদোল,
লুপ্ত হ'ল চরাচর। বন্ধনের মাঝে মুক্তিকামী
সে অনন্তব্যাপ্তিমাঝে মগ্ন শুধু তুমি আর আমি।

আজি পড়ে মনে
প্রথম তোমার ছবি জাগে যবে আমার নয়নে।
সলজ্জ হাসিতে ভরা মুকুলিতা সরলা কিশোরী,
আধ-আলো-অন্ধকার উষসীর মল্লিকা-মঞ্জরী।
কোন্ ছবি, কি সে আলো, কি যে স্বপ্ন নয়নাভিরাম,
তব মুখে, তব চোখে সেই দিন আমি হেরিলাম
জানি না কিছুই; শুধু মনে পড়ে এতদিন পরে
বিপুল পুলক এক জেগেছিল আমার অন্তরে।

মনে হ'ল, যাহারে খুঁজেছি আমি জাগ্রতে স্বপনে,
তারি ছায়া দোলে যেন তোমার ও দুটি আঁখি কোণে।
প্রাণ মোর গৃহছাড়া প্রিয়হারা উদাসী বৈরাগী
অন্তর-সমুদ্রমন্থ দেবভোগ্য যে সুধার লাগি'
লোকচক্ষু অন্তরালে নিষ্কলুষ তব মর্ম্মমাঝে,
শুক্তি মাঝে মুক্তাসম সে সুধার এক বিন্দু রাজে।
থমকি থামিয়া গেনু, চলা মোর হ'ল হেন শেষ
নিরুদ্দেশ গৃহহারা পেল যেন আপন উদ্দেশ।

সেই হ'তে প্রিয়া
আশার প্রদীপ জ্বালি' অশান্ত-উদ্বেল হিয়া নিয়া
তব লাগি রাত্রি জাগি; প্রতীক্ষার দীর্ঘ পথ বাহি'
এতদিনে এলে তুমি যৌবনের স্বপ্নে অবগাহি'!
সেদিনের কিশোরী যে আজিকার যৌবন-সঙ্গিনী,
মধুর আবেশ-ভরা জীবনের লীলা-তরঙ্গিনী!
এতদিনে শুনিলে কি অন্তরের ব্যাকুল আহ্বান?
এতদিনে বুঝিলে কি মোর বীণে কার জয়গান
গাহিয়াছি দিবানিশি, করিয়াছি কুসুম চয়ন,
হৃদয়-আগারে মোর রচিয়াছি নিভৃত শয়ন?
এতদিনে সেই কথা বুঝিলে কি হে নিঠুরা বালা?
তাই মোর গলে দিলে পঞ্চদশ বসন্তের মালা?

কি ভাবিলে মনে,
মোর কাছে দিলে ধরা অন্তরের কোন্ প্রয়োজনে?
পরাণের শতদলে সুচির-সঞ্চিত প্রেম-মধু
এ অধরে দিলে তুলি' হ'লে তুমি মোর মর্ম্ম-বঁধু!
কেবা জানে তব কথা, হে গোপন-রহস্যচারিণী,
বিশ্বের রমণী তুমি হ'লে মোর মানসবাসিনী!

বিশ্বের সবারে ফেলি' মোরে কেন করিলে বরণ ?
দেহ-মন-প্রাণ-ফুলে মোরে কেন করিলে অর্চ্চন ?

এ ধরার শান্ত এক কোণে
ক্ষ্যাপার মতন আমি যাপি' দিন আপনার মনে।
গৌরবের, বৈভবের কোলাহল হ'তে বহুদূরে
সান্ত্বনার শান্তিনীড় রচিয়াছি হৃদি-অন্তঃপুরে।
মদমত্ত জনসঙ্ঘ ধেয়ে চলে আত্ম-অভিমানে
ভুলিয়া চাহে না কেহ এই নিঃস্ব উদাসীর পানে।
সে ক্ষ্যাপারে শিব করি' তুমি হায় হ'লে তার সতী,
দেহ-পঞ্চ-প্রদীপেতে তুমি তার করিলে আরতি!

কি দিব তোমারে ?
তোমারে দিবার মত কিছু নাই দীনের আগারে।
লহ মোর হাসি-অশ্রু, বসন্তের বাঁশীর সঙ্গীত,
ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, বাণী আর প্রাণের ইঙ্গিত,
লহ মোর স্বপ্ন-সাধ, সত্য-মিথ্যা, বাসনা-কামনা,
সাধনা-হোমাগ্নিপূত লহ মোর প্রেম-আরাধনা,
তার সাথে লহ মোরে, লহ মোর প্রাণের আরতি,
তোমারে সঁপিয়া দিনু জীবনের সব লাভ, সর্ব্বশেষ ক্ষতি।

ক্ষীরোদপ্রসাদ

—পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর—

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

দ্বিতীয় দিন সাক্ষাতের পর ক্ষীরোদবাবু বলিলেন, আপনার সম্পর্কে আমার একটা মস্ত অনুযোগ আছে।

কি সেটা?

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন, আপনি সেদিন একটা সত্য গোপন ক'রেছেন......

অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

তিনি বলিলেন, শরৎচন্দ্র যে আপনার আত্মীয় সেটা একেবারেই বলেন নি..... দেখুন তো মুস্কিল। হয়তো কি যা-তা কথা ব'লে আপনাদের মনে কষ্ট দিয়েছি।

বলিলাম, মনে তো বিশেষ কিছু পড়ে না যে আপনি কোন যা-তা কথা ব'লেছেন......সেদিন আমাদের আলোচনা মোটা-মুটি নাটক আর বঙ্কিম সম্বন্ধেই হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কেমন ক'রে জানিনে, আমি যেন বুঝেছিলুম যে আপান অনেকখানি অসহিষ্ণু, তাই সে প্রসঙ্গ যথাসম্ভব বাদ দেবার চেষ্টাই ক'রেছিলাম।

ক্ষীরোদবাবু হাসিয়া বলিলেন, ও আন্দাজ আপনার ঠিক......ভারি মেয়েলি ধরণ, না? ও আমার সহ্য হয় না।......

বলিলাম, রাগ না করেন তো একটা কথা বলি...

আরে বলুন, বলুন—বুড়ো বামুনের রাগ—তাল পাতার আগুন......

বলিলাম, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আপনার প্রি-কন্‌সেপ্‌শন আছে।......এটা কিন্তু জ্ঞানের পরম শত্রু।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া তিনি বলিলেন, বলুন তারপর, পরে একটা গল্প ব'লবো—গল্প নয় সত্য ঘটনা, আমারই জীবনে ঘটেচে ..

বলিলাম, থাক্ রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ...আপনি গল্পটা বলুন...আমি আপনার কাছে এসেছি শুন্‌তে...

কাগজ পেন্‌সিল নিয়ে আসেন্‌নি তো?

হাসিয়া বলিলাম, না, না, সে ভয় নেই ..

ক্ষীরোদবাবু হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, দেখুন যদি কিছু লেখেন তো বুড়োর দেহরক্ষার পরেই যেন...

বলিলাম, কে আগে রাখে তার তো স্থির নেই...

তিনি শিশুর মত হাসিয়া বলিলেন, ভুলে যাবেন না যে আমি একজন বৈজ্ঞানিক...জগতের রহস্যগুলোর অর্থ অন্বেষণ করাও আমার একদিন কাজ ছিল...বল্‌ছি শুনুন, দেহ আমিই আগে রাখবো...

বলিলাম, এটা একেবারে অ-কবির মত কথা হ'লো... আপনি ত' অমর...

তিনি হাসিয়া বলিলেন, সে আমার লেখা, এই পচা দেহ নয়.....

তাহার পর বলিলেন, বলুন, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কি বল্‌ছিলেন?

বলিলাম, সে কথা বলার আগে একটা কথা জান্‌তে চাই, কবিকে কি কোন দিন শ্রদ্ধা সহকারে মনের মধ্যে আহ্বান করেছিলেন? বলেছিলেন কি, এখানে স্থির অধিষ্ঠিত হও কবি, আমি তোমাকে পূজো করতে চাই?...

ক্ষীরোদবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

বলিলাম, আর একদিনের একটা কথা মনে হচ্চে— বলি? ধৈর্য্যচ্যুতি হবে না তো?

নিশ্চয় বল্‌বেন...

এখেনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একটা শাখা আছে...

শুনেছি তা।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এখেনকারই। তাঁদের বাড়ি এখেন থেকে এক মিনিটের পথও নয়...

সে বছর তিনি ভাগলপুর এসেছিলেন;...সাহিত্য-পরিষদ থেকে তাঁকে সম্মান দেখাবার জন্য একটি সভা হয়।

পাঁচকড়িবাবু সেই সভাতে ব'সে সাহিত্যের আলাপ করতে করতে বল্লেন...রবিবাবুর লেখা বাংলা সাহিত্যের চিরস্থায়ী সম্পদ ত নয়ই...

এমন একদিন ছিল যখন এ কথা ব'লে মানুষ পার পেত;...কিন্তু এখন সেদিন আর নেই।

পাঁচকড়িবাবুকে চারিদিক থেকে যুবকেরা ছেঁকে ধরলে; সাহিত্য মানে কি? রবিবাবুর লেখা কেন সাহিত্যের মধ্যে গণ্য হবে না?...ইত্যাদি ইত্যাদি...

সেদিন সাহিত্যের স্বরূপ বোঝাতে ব'সে পাঁচকড়িবাবু একটি মজার কথা ব'লেছিলেন;—

তিনি বল্লেন, বাংলাদেশের চারজন চাষাকে ডেকে এনে ঐ কবিতা পড়াও—তারা এক বর্ণও বুঝবে না,...

একজন যুবক বল্লে, কালিদাসের মেঘদূত কি তখনকার চাষারা বুঝতো? এত বড় পণ্ডিত মল্লীনাথ তিনিই বল্লেন, মোঘে মাঘে গতং বয়ঃ...

পাঁচকড়িবাবু যেন একটু ফাঁপরে পড়লেন...

তখন আর একজন বল্লেন, একটা কথা কি জান্তে পারি?

কি?

আপনি কি যত্ন ক'রে রবিবাবুর কাব্য প'ড়েছেন?

পাঁচকড়িবাবু প্রায় চ'টেই গেলেন।

কিন্তু আপনি তো জানেন, আজকালকার ছেলেরা কেমন যেন একটু উদ্ধত হয়েছে...ছেলেটি বল্লে, আপনি যদি রবিবাবুর সমগ্র কাব্যগ্রন্থের মধ্যে যে কোন তিনটি কবিতা এখুনি আবৃত্তি করে শোনাতে পারেন তো আমি আপনার পায়ে ধরে মার্জ্জনা চাইবো।

পাঁচকড়িবাবুর স্মৃতিশক্তি ভালই ছিল; কিন্তু কি জানি কেন তিনি 'গগনে গরজে মেঘে'র ও কয়েক ছত্র মাত্র আবৃত্তি করে আর পারলেন না।

প্রায় আগুন জ্বলে আর কি...এমন সময় সর্ব্বদুঃখহরা সরবৎ এনে সেদিনের গোলমালটা ছেলেরাই মিটিয়ে দিল...

ক্ষীরোদবাবু বলিলেন, যাক্ শিখে রাখলুম, ও রকম বিপদে বোধ হয় আর পড়বো না।...বলে দিন তো কোন্‌টা কোন্‌টা মুখস্থ করি...ছেলেরা বল্‌ছিল যে পরিষদে মিটিং করবে...

বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, বাস্তবিক এ দোষটা আমাদের ভয়ঙ্কর...ঠিক বটে আমি সত্যিকারের চেষ্টা কিছুই করিনি ওদিক দিয়ে...

প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনের জন্য বলিলাম, বৈজ্ঞানিককে কবিরূপে পাওয়া কঠিন...কিন্তু সেটা আপনার মধ্যে সম্ভবপর হয়েছে...আচ্ছা, একটা গুজব শুনেছিলাম যে আপনি নাকি সোনা করতে পারেন?

পারি বৈকি।

তবে?

তবে কি? যা' পারি তাই করতে হবে? এমন কত কাজ তো পারি, অনায়াসেই পারি; করিনে তো?

বলিলাম, তা ঠিক...কিন্তু আমি অন্য স্পীরিটে এটা জিজ্ঞাসা করেছিলাম...

কি?

বলিলাম, অনেক দেশের অনেক মানুষ অনেক কাল থেকেই এ চেষ্টা করে আস্‌চেন। শুনেছি আমাদের দেশে কোন কোন সন্ন্যাসী নাকি তামা থেকে সোনা করতে

জানেনও। কিন্তু তাঁদের কথা আর আপনার কথা স্বতন্ত্র—আপনি যদি ক'রে থাকেন ত' সেটা কোন একটা বৈজ্ঞানিক উপায়ে…

তিনি মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, আমার মেথড্ বৈজ্ঞানিক নয়…আমারও…বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

বলিলাম, যদি আপত্তি না থাকে তো বলুন ব্যাপারটা কি?

তিনি বলিলেন, আপত্তি নেই, তবে এতে আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণার এক বিন্দুও কৃতিত্ব নেই…বলিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন;

আমার সোনা দেখতে সোনার মত বটে; কিন্তু কাজে সোনা নয়.. কেন না স্পেসিফিক্ গ্রাভিটি—সোনার নয়, আর নাইট্রিক্ এসিডের অগ্নি-পরীক্ষাও উত্তীর্ণ নয়।…

দিক কতক ও নিয়ে অনেক পাগলাম করে—ছেড়ে দিয়েছি।…কিছু পয়সা হয়তো আসতো;…কিন্তু কি জানি কেন মন চাইলে না।

একান্ত নিবিষ্ট মনে তাঁর কথা শুনিতেছি দেখিয়া বলিলেন,—তা' হ'লে বলি সবটা :—

বাঁকুড়োতে আমার বাড়ির কিছু দূরে—শুনলুম একজন সন্ন্যাসী এসেছেন যিনি সোনা করতে পারেন।

গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করলুম। তিনি রাজি হ'লেন দেখাতে, কিন্তু বল্লেন, কোন মতেই গৃহীকে সে বিদ্যে শেখাবেন না…

আচ্ছা দেখাতো যাক্…তার পর হবে এখন বিদ্যে শেখা…

তার পর দিন গিয়ে উপস্থিত,—বাবাজি কাজে লেগে গেলেন…খানিক পরে অবাক কাণ্ড, তাইতো এ যে সোনাই…

বাবাজিকে একটা পাতার রস ব্যবহার করতে দেখেছিলুম…ছিব্‌ড়েগুলো তিনি ফেলে দিলে কুড়িয়ে নিয়ে শুঁকে মনে হ'লো খুব পরিচিত গন্ধ—কাছাকাছি কোন গাছের পাতার হবে…

বাবাজির সোনা নিয়ে ফিরলুম, পরীক্ষা করবো… আর পথের দুধারে তীক্ষ্ণ নজর, কোনও গাছের সূক্ষ্ম ডাল-পালা ভাঙ্গা হয়েছে কিনা…দেখে চ'লেছি…হঠাৎ একটা গাছ সন্দেহ হলো…তা' থেকে একটা ডাল ভাঙ্গা হয়েছে—কিন্তু ডালটা প'ড়ে আছে, সেখেনে—তার পাতাগুলো নেওয়া হ'য়েছে। পাতা ছিঁড়ে শুঁকে দেখি একই গন্ধ…কিছু পাতা সংগ্রহ ক'রে চল্লাম বাড়ি…

বাড়ী গিয়ে সোনা পরীক্ষা না করে তামা গালিয়ে সেই পাতার রস দিতেই দেখি যে আমার তামাও সোনা!!

আনন্দে নাচতে লাগলুম—মনে হলো কে পায় আর আমাকে…

সোনা পরীক্ষা করে দেখি, ওই দোষ…বাবাজিকে গিয়ে বল্লুম, বাবাজি বল্লেন, তা বেশ, কিন্তু আপনাকে বল্‌ছি, পয়সার লোভে যদি ও কাজ করেন তো তার ফল হাতে হাতে পাবেন।

তাহার পর তিনি বলিলেন, কাল যাবো গৈবীনাথ দেখতে;—যাবেন?

বলিলাম, যেহেতু কাল রবিবার কোন আপত্তি নেই…

তিনি বলিলেন, সে ভারি চমৎকার হবে…সকাল ছটার সময় গাড়ি…আর ফিরবো বিকেল ছ'টায়।

দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা?

দেখাই যাক্ না একদিন বাবা গৈবীনাথের গেষ্ট্ হ'য়ে?

সে বেশ কথা, বলিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

ভাগলপুরের পশ্চিমে তৃতীয় ষ্টেশন সুলতানগঞ্জ। গৈবীনাথ দেখিতে হইলে এইখানে নামিয়া গঙ্গার দিকে আধক্রোশ যাইলে ঘাটে পৌছান যায়। সেখান হইতে

মন্দিরের নৌকায় যাইতে হয়। গঙ্গাবক্ষে পাহাড়ের উপর গৈবীনাথ। কেহ কেহ এইটিকেই জহ্নুমুণির আশ্রম বলেন।

আমরা কিন্তু প্রথমে মন্দিরের দিকে না গিয়া থানার দিকে চলিলাম। উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ চা-পান। সঙ্গে চা চিনি ছিল—অগ্নি জল এবং দুগ্ধের ব্যবস্থা কোটালেরা করিয়া দিলেন।

চা পান করিয়া ঘাটে পৌঁছিতে দেখা গেল থানার লোকে ওপার হইতে নৌকা আনাইয়া প্রস্তুত রাখিয়াছে। পুলিশকে মিত্ররূপে মিলিলে জীবন-যাত্রার ব্যাপারটা একান্ত সুগম হয়, সে বিষয়ে সেদিন আমাদের কোন সন্দেহ রহিল না।

গৈবীনাথের মন্দির বর্ষাকালে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করে। গঙ্গার বুকে কয়েকখানি পাথরের উপর মন্দিরটি দেখিলে কার না আনন্দ হয়! ক্ষীরোদবাবু এক রকম নাচিতে লাগিলেন।

বলিলাম, দেখবেন আপনার নাচ আবার গতিশীল, সাঁতার জানেন তো?

তিনি বলিলেন, দেখিয়ে দেব বিদ্যেখানা?

মন্দিরেও পুলিশের খবর গিয়াছিল তাই আহ্বান অভ্যর্থনা স্বতন্ত্র প্রকারের হইল। ইন্-চার্জ্জ সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাদের উপর অলক্ষ্যে সর্ব্বদাই কঠিন কৃপাদৃষ্টি রাখিতেছিলেন বলিয়া দেখা গেল।

স্নানাদি সমাপন করিয়া সাহিত্য-চর্চ্চায় মনোযোগ দিবার উপক্রম করিতেছি—এমন সময় উপরে ডাক পড়িল, খোদ কর্ত্তার ডাক।

বাবাকো পূজা চড়াইয়ে…

বিনা বাক্যব্যয়ে সুশীল বালকের মত আমরা বাবার মস্তকে ফুল-জল বিল্বপত্র চড়াইয়া দিলাম...চারিদিকে ঘণ্টা ধ্বনি এবং অবিরত বম্ বম্ শব্দ।

বুঝিলাম আমাদের আতিথ্য-স্বীকার বাবা গৈবীনাথ এবং তাঁহার লেফ্‌টেনাণ্ট মঞ্জুর করিয়াছেন।

ফল মূল খাইয়া বিশ্রামের জন্য একতালার পশ্চিমের দিকের একটি দালানে নীত হইলাম। সেখানকার বন্দোবস্ত ছিল ভালই।

সেখানে বসিয়া অকস্মাৎ একটা কথা মনে পড়ায় আমি হাসিতে লাগিলাম। আমার অকারণ হাসি দেখিয়া বিদ্যাবিনোদ-মহাশয় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, ব্যাপার কি? ব্যাপার কি?

বলিলেন, একদিনের একটা ঘটনা মনে হওয়াতে হাসি আর সামলে রাখতে পারছিনে।

হাসির বোধহয় ছোয়াচ আছে, তিনি বিষয়টি অবগত না হইয়া একটু একটু হাসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার বিশেষ অনুরোধে বিষয়টি তাঁহাকে বলিতে হইয়াছিল।

বলিলাম, সে বেশী দিনের কথা নয়, গত বছরে, শীতকালে…আমরা এখেনে এসেছিলুম, সঙ্গে ছিলেন হাওড়ার একজন উকিল, বাংলা সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ এক-জন সাহিত্যিক—আর ছিলেন আমাদের এক বন্ধু—এঁর সাহিত্যের ওপর অগাধ ভালবাসা—তবে বিশেষ কিছু লেখেন না।

সে দিন মন্দিরের কর্তৃপক্ষ আমাদের বিশেষ কিছু রিস্পেপ্‌শন দেন নি। আমরা এদিক ওদিক ঘুরে বিশ্রামের জন্য আসি এই জায়গাটায়; কিন্তু তখন এটা খালি ছিল না—এখানে বিরাজ করছিলেন এক উর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসীকে আমরা নানা প্রশ্ন করলাম—হাতে ব্যথা হয় কিনা? কত বছর হাত উঁচু করে আছ...ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাহিত্যিক-বন্ধু প্রশ্ন করলেন, বাবাজি তুমি এক হাতে গাঁজা খাও কি করে?

বাবাজি বল্লেন, সে বিষয়ে কোন অসুবিধা নেই…

একবার খেয়ে দেখাতে পার?

তুম্ পিয়েগা?

তা, পারি, যদি তুমি রাজি হও, বলে তিনি চাইলেন আমাদের সাহিত্য-প্রাণ বন্ধুটির প্রতি···কি বল? চল্‌বে?

সাহিত্য-প্রাণ বল্লেন, যদি আপনার চ'লে যায় তো...এই অধমের...সুত্রস্থেব যে গতিঃ···মহাজন যেন...

তখন বাবাজি এক হাতে গাঁজা সেজে পুরো দম দিয়ে "বঙ্গবাণীর বয়াটে"র হাতে দিলেন—তিনি অম্লান বদনে পুরো দম দিয়ে সাহিত্য-প্রাণকে দিলেন···মহাজন যে পথে গেছেন—তিনিও পুরো দম দিয়ে ··একটা গোঁ-গোঁ শব্দ করে ধরণী-তলে পপাৎ—আর ভূমানন্দ তাঁর দেহের নবদ্বারে পুলকের হাততালি দিতে লাগলেন ··অর্থাৎ শরীরের হাঁচি কাশি হেঁচকি ঢেকুর ইত্যাদি করে যত রকম উৎপাৎ আছে সে গুলো সব এক সঙ্গে এসে নিজেদের বাহাদুরি দেখাতে লাগলো—

খানিকক্ষণের জন্ম মনে হলো সাহিত্য-প্রাণের প্রাণ-বায়ু বুঝিবা পটল তোলে—

মাথায় জল দিয়ে হাওয়া করে'...তার পর আমাদের হাসি; সে কি থামে!

ক্ষীরোদবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, উঃ এখনো যে থামে না··পেটে খিল ধরে গেল!

তিনি বলিলেন, কে সে লোকটি মশাই?

বলিলাম, চিনিয়ে দেব পরিষদের মিটিংএর দিন, তিনিই এখন একজন পাণ্ডা।

ফিরিতে ফিরিতে ক্ষীরোদবাবু বলিলেন, শুনুন তবে আমার সেই সে দিনের গল্পটা—

বলুন।···

তখন তিনি আরম্ভ করিলেন,...তখন শরৎবাবুর চারদিকে যশটা বেশ ছড়িয়ে প'ড়েছে; কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা কথাও আমাদের কাণে এসে পৌচচ্ছিল; সেটা আর কিছুই নয়, রামচন্দ্রের মত তিনি পতিতাদের উদ্ধার করতে চান ··কি এত বড় স্পর্দ্ধা!

সাহিত্য-ক্ষেত্রে আগন্তুকের সমাগমে একদিকে যেমন আনন্দও আছে, অন্যদিকে সাহিত্য-জ্যোতিষ্কদের মনে যে একটা অস্বস্তির ভাব আসে না;—তাও নয়।...যতক্ষণ না তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় করেছেন ততক্ষণ চারিদিক দিয়ে তাকে উড়িয়ে দেওয়ার ফুৎকার ..যথা, নাঃ ও কিছু নয়···ইত্যাদি চ'লেও থাকে।...

আর কে কি করেছিল জানিনে। কিন্তু আমি, শরৎ বাবুর নাম শোনামাত্র কাণে আঙ্গুল দিয়ে বলতুম, আরে ছিঃ, ছিঃ, দিলে দেশটাকে ব্যাভিচারের পঙ্কে ডুবিয়ে... কিন্তু কোনদিন তাঁর কোন বইএর একপাতা উল্টে পড়ার কথা মনেও আস্‌তো না।...

একদিন এক ছোক্‌রা এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে—তার হাতে দেখি, শরৎবাবুর দু'খানা বই!

অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠলুম—বল্লুম ছোকরাকে, অধঃপতনের পথে যাবার তোমার এই মতলব?

ছেলেটি অম্লান বদনে মাথা পেতে আমার গালমন্দ শুনে বল্লে, আপনি পড়েছেন? না শুনে বলছেন?

দেখুন, তার ধৃষ্টতা!

কিন্তু অবশেষে স্বীকার করতে হ'লো যে লোকের মুখের ঝাল খেয়েই আমার সকল উষ্মা!··

ছেলেটি বই দুখানা রেখে চ'লে গেল। যাবার সময় ব'লে গেল, আপনি পড়ুন, তারপর ইচ্ছা হয় পায়ের জুতো খুলে মারবেন, তাও সইব।

প'ড়বো? দিন দুই ত' কাটলো;—কেমন কিন্তু আস্তে আস্তে মন গেল, পড়েই দেখিনা কেন, অত ক'রে ব'লে গেল ছোক্‌রাটি···

পড়তে ব'সে আর ছাড়তে পারিনে। ধন্য পাঠকের মনকে আকর্ষণ করার শক্তি! বই শেষ করে বুঝলুম, ইনি যে-সে লেখক নন্...প্রথম শ্রেণী···প্রথম শ্রেণী···

পথ চলিতে চলিতে তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,

খুব উপকার পেয়েছি ··অমন ব্রিলিয়েণ্ট কন্‌ভার্‌সেশন—বোধ হয় আমাদের আর কোন লেখকের নেই···আমি শিখছি...'

বলিলাম, তা হ'লে শরতের একলব্য আপনি...

তিনি বলিলেন, না পাপক্ষালন করে এসেছি এক-দিন গুরুসন্নিধানে নিজে গিয়ে . প্রাণখুলে সকল কথা ব'লে···

এই ঘটনাটির উল্লেখ অনেক ইতস্ততঃ করিয়াই করিলাম। শরৎচন্দ্রের আত্মীয় হইয়া এইরূপ করার মধ্যে অশোভনতা আছে, স্বীকার করি; কিন্তু ক্ষীরোদবাবুকে সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত করিবার লোভ সম্বরণ করাও কঠিন। অপিচ, এইরূপ মনে হইয়াছে যে, তাঁহার সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া ইহার উল্লেখ না করিলে কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয়।

কর্ত্তব্য বোধে যাহা করিতে হইল তাহার ভিতরকার এই অপরিবর্জ্জনীয় ত্রুটির জন্য পাঠকের নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করি।

তাঁহার বিদায়ের দিনের শান্তোজ্জ্বল মূর্ত্তিটি কোন দিন বিস্মৃত হইবার নহে।

অতি-প্রত্যূষে তিনি গঙ্গা-বায়ু সেবন করিয়া সেদিন আমাদের বাড়িতেই চা-পান করিতে করিতে বলিলেন, আজ যে চল্‌তি—

বলিলাম, অনেক বেয়াদপি ক'রেছি, নিজগুণে ক্ষমা করবেন—

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, এই বলাটার অপেক্ষায় এতদিন মুলতুবি রেখেছিলুম—আজ সাফ্‌—

আমার কাছে সুন্দর মান্দ্রাজি ধূপ ছিল, তিনি ঘরে আসিলে তাহা জ্বালাইয়া দিতাম—সেদিন জ্বালানর পর তিনি বলিলেন, আমায় কয়েকটা দেবেন? এর গন্ধটি ভারি চমৎকার—

কয়েকটি পকেটে পুরিতে পুরিতে বলিলেন, বামুন কিনা? যথা লাভ, অল্পে তুষ্টি—

জিজ্ঞাসা করিলাম, সব সময়ে?

দুই জনেই হাসিতে লাগিলাম।

ক্ষীরোদবাবু বলিলেন, আজ একটা এমন জিনিষ আপনাকে দিতে এসেছি—যা' আপনার অনেক দিন মনে থাক্‌বে—

বলিলাম, "অযাচিত"কে আমি কিন্তু ভয় করি, যাচ্ঞা করলে তার পরিমাণ যাচকের মনে থাকে—কিন্তু অযাচিতের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অনেক সময়ে তুমুল হ'য়ে ওঠে—

ভয় নেই···বিপদগ্রস্ত হবেন না ··আমি আমার শেষ-লেখা নাটকটি আপনাকে প'ড়ে শোনাতে এসেছি ··

ঘরের দোর বন্ধ করিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা তাঁহার পাঠ শ্রবণ করিলাম!

সেই দিনটি সত্যই আমার জীবনের এক অপূর্ব্ব সৌভাগ্যের। মন্ত্রমুগ্ধের মত দুই ঘণ্টা অশ্রু-হাসির, ব্যথা-আনন্দের পবিত্র জলে স্নান করিয়া আমার চিত্ত যেন নবীন হইয়া উঠিল।

সমাপ্ত

আর্টের আটচালা

সামাজিক ডিসপেপ্‌সিয়ার মহৌষধ

কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে নিম্নলিখিত তালিকা পাওয়া গেছে। তখনকার দিনে শিক্ষিত নরনারীর মধ্যে দু' একটি গ্রন্থের পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা ছিল প্রায় এইরূপ :—

বিদ্যাসুন্দর—শতকরা ৯০ ;

মায়াবী মায়াবিনী প্রভৃতি উপন্যাস ও দামোদর গ্রন্থাবলী—শতকরা ৯৫ ;

হরিদাসের গুপ্তকথা—শতকরা ৯৯।

এর পরেও দেশ ও সমাজ কোন রকমে টেঁকে ছিল। এখন কল্লোল কালিকলম শতকরা ২৫ জন পড়ছে, কিন্তু তাইতেই দেশ টলমল। দেশ ও সমাজ নাকি রসাতলে যায়। কথাটা হয়তো সত্যি। কারণ পুরাণো চাল শুধু যে ভাতে বাড়ে তাই নয়, অত্যন্ত সুপাচ্য। এই অজীর্ণ রোগগ্রস্ত দেশে নতুন চালের সাহিত্য লোকের সইছে না—খেয়ে লোকের পেট ফাঁপছে ও চোঁয়া ঢেঁকুর মারছে। এই ডিসপেপ্‌সিয়া নিবারণের একমাত্র উপায় দেশের মাটিতে নতুন বিদ্যাবুদ্ধির চাষআবাদ একেবারে বন্ধ করে দেওয়া। প্রাচীন পুরাণো চাল—হোক্ না সে বোকৃড়া, পোকাখেগো, তা' খেয়ে মগজ না পুরুক পৈতৃক প্রাণটা তো রক্ষা হবে!

সাহিত্যিক পদিপিসী (পুং)

পল্লীগ্রামে একদল বর্ষীয়সী আছেন যাঁরা রাস্তা চল্‌বার সময় ডান হাতে কাপড়টি হাঁটু পর্য্যন্ত গুটিয়ে বাঁ হাতে আঁচলটি নাকে চাপা দিয়ে মুর্গীর মত ডিঙ্গি মেরে চলেন। তাঁদের মনে হয় রাস্তায় সর্ব্বত্রই নোংরা। আজকাল বাংলা দেশে এইরকম কতকগুলি সাহিত্যিক পদিপিসীর আবির্ভাব হয়েছে। এঁদের শুচিবায়ুগ্রস্ত মন বাঙলা সাহিত্যের পাকাসড়কে, অলিতে গলিতে কেবলই জঞ্জাল দেখছে, নোংরা দেখছে। তাই অনন্যোপায় হ'য়ে এঁরা এই সব রাস্তা নিজেদের বুদ্ধির গোময় লেপনে পরিশুদ্ধ করতে লেগে গেছেন। শোনা যাচ্ছে এরপর সাহিত্যের গোময়লিপ্ত এই পরিশুদ্ধ ক্ষেত্রে এঁরা উপন্যাস, নাটক, গল্প, গান সব বন্ধ করে' দিয়ে অষ্টপ্রহর নাম-সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করবেন।

"অহো! সেদিন কবে বা হ'বে?"

অথ পিসী ভ্রাতুষ্পুত্র সংবাদ

কয়েকমাস পূর্ব্বে কবি মোহিতলাল 'আত্মশক্তি'তে প্রায় নবরসের অবতারণা করে' একটি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন। তার এক জায়গায় তিনি এই বলে' শাসিয়েছিলেন যে তাঁর দু' একটি এমন কাল্‌চার্ড বন্ধু আছেন যাঁদের কাল্‌চারের পরিচয় পেলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র স্তম্ভিত হয়ে যাবেন। শোনা যাচ্ছে উক্ত কালচার্ড বন্ধু নাকি 'শনিবারের চিঠি'কে আশ্রয় করেছেন। এঁর লেখা পড়ে' রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র স্তম্ভিত হয়েছেন কিনা সে খবর আমরা পাইনি, তবে আমরা তো "চিঠির" কোন লেখার মধ্যে অনন্যসাধারণ কিছু পেলাম না।

এই প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ছে। জনৈকা পিসী তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের বুদ্ধির প্রশংসায় পাড়ার লোককে অতিষ্ঠ করে' তুলেছিলেন। পাড়ার লোকেরা একদিন তাঁর কথার প্রতিবাদ করায় পিসী চোখে কাপড় দিয়ে বলেছিলেন কাঁদতে কাঁদতে—"তোমরা বল কিগো বল কি? ও ছেলে কি বাঁচতে এয়েছে, ও জগতে ঘোষণা রাখতে এয়েছে! কুড়ি কুড়ি বছরের ছেলে, মিউ মিউ করে' মুড়ির কলসী দেখিয়ে দেয়, আহা, ও ছেলে কি বাঁচে! মাকে বলে 'মা', বাবাকে বলে 'বাবা' আর—আর আমি

যে আবাগী পিসী আমাকে বলে কিনা 'পিসী-মা-আ-আ' ! আহা—ও ছেলে কি বাঁচবে গা।"

ভূত ভগবান ও ভালবাসার মাখামাখি

চৈত্রের 'কল্লোল' শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর "অতি আধুনিক বাঙলা সাহিত্য" সম্বন্ধে একটি দ্বাদশ পৃষ্ঠাব্যাপী রচনা সযত্নে উদ্ধার করেছেন। এঁর এই সুদীর্ঘ 'ভাষণ' পড়ে চাণক্যের একটা বিশিষ্ট শ্লোক কেবলই মনে পড়তে লাগল।

রচনার একস্থানে আছে—"যদি কেউ কষ্ট করে Statistics নিয়ে দেখেন তা'হ'লে এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, ভগবান, ভূত ও ভালবাসা—এ তিনটি জিনিষের ওপর আমাদের প্রাক্তন বিশ্বাস আমরা হারিয়েছি।"

বড়ই দুঃখের বিষয় যে, ১৯৩১ সালের সেন্সসের আগে ঐই সুবিপুল Statistics সংগ্রহের কোন উপায়ই নেই। ইতিমধ্যে প্রশ্ন হচ্ছে—"ভগবান, ভূত ও ভালবাসা এক পর্য্যায়ে পড়ল কি করে? অতি-আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের ব্যাকরণ অনুসারে কি আগুক্ষর অনুযায়ী কথার শ্রেণীগত সাম্য নিরূপিত হবে? তা' হলে তো সং ও সমালোচক এক পর্য্যায়েই পড়ে।

ভূত ও ভগবান দুটিই পারলৌকিক জীব (?)! এদের বাদ দিলে বিশেষ কিছুই হয়তো এসে যায় না। কিন্তু ভালবাসা? ওটা যে নিতান্তই ইহলৌকিক। ওটা বাদ দিয়ে সংসারে ও সমাজে বসবাসটা কি খুব বাঞ্ছনীয় হবে? আমাদের অতি-আধুনিক সাহিত্যিক বন্ধুরা কি বলেন?

কুমীরের চোখে সাঁতার পানি

পরের মুখের কথা শুনে লেখা আর নিজের মন থেকে ভেবে লেখা এক ব্যাপার নয়। 'পুরাতন প্রসঙ্গ' লিখলেই সাহিত্য-প্রসঙ্গ লেখবার অধিকার জন্মে না। এই বয়সে অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয় যদি এটুকু না বোঝেন তা'হলে তিনি প্রাচীন না অর্ব্বাচীন, এ প্রশ্ন নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু এতেই 'শনিমণ্ডল' অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেছেন।

যাঁরা শরৎচন্দ্রকে শৃগাল উপাধিতে ভূষিত করেছেন, নরেশচন্দ্রকে আলুপটল-বেচা বেচারামে পরিণত করেছেন, দৈত্য হিরণ্যকশিপুর দন্তবিকাশ দ্বারা কবিগুরু এবং শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীকে সম্মানিত করেছেন, 'অর্ব্বাচীন' কথায় তাঁদের আপত্তি দেখে হাসি পায়। বাংলা দেশের লোক এঁদের শিষ্টাচারের বালাই নিয়ে মরুক্।

নবযুগের ইউক্লিড

এতদিন বাংলার রসিক-সমাজ জান্‌ত কাব্যেই মোহিতলালের অধিকার আছে, কিন্তু গণিতেও যে তাঁর এমন অক্ষুণ্ণ অধিকার চৈত্রের 'চিঠি'তে তিনি তা' প্রমাণ করেছেন। মণিবজ্র ভারতীর একটা কথা থেকে এক থিওরেম গড়ে তুলে তিনি তার উপর Q. E. Dর শীল-মোহর মেরে দিয়েছেন।

ইউক্লিড জ্যামিতিশাস্ত্রের অনেক কিছু জানলেও সরল রেখাকে কি করে বৃত্তে পরিণত করতে হয় তা' বোধ হয় জান্‌তেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচান্সেলর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের দৃষ্টি আমরা এই অভিনব 'থিওরেমটি'র প্রতি আকর্ষণ করি। ছেলেদের পাঠ্যপুস্তকে এটি স্থান পেলে মোহিতবাবুর আর বিগত দিনের অবহেলার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর অভিযোগ করবার কিছুই থাকবে না।

ডাক্তারের নাড়ীজ্ঞান

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যিক ডাক্তার, কিন্তু তাঁর সাহিত্যের কি অপূর্ব্ব নাড়ীজ্ঞান নিম্ন-লিখিত উদ্ধৃত অংশ থেকে তা' স্পষ্ট বোঝা যাবে। হিলিতে যুবকসমিতির সভাপতি হ'য়ে সুনীতিবাবু এই বক্তৃতাটি পাঠ করেছিলেন এবং সুবিজ্ঞ প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় তাঁর সম্পাদকীয় মন্তব্যের মধ্যে এটি সযত্নে উদ্ধার করেছেন। বস্তুগত ও ভাবগত বিষয় হিসাবে

রাস্তায় কেরোসিন কাঠের বাক্সে চড়ে যাঁরা বাঙলার যুবকবৃন্দকে "অন্ধকার থেকে আলোকে" নিয়ে যেতে চান তাঁদের বক্তৃতার সঙ্গে এর জ্ঞাতিত্ব আছে, তবে তাঁরাও বোধ হয় এর চেয়ে ভাল বাঙলা বলেন।

বক্তৃতার অংশটি এই :—

"আমাদের দেশের বড়ো বড়ো সমস্যা পড়ে র'য়েছে; সেইসব সমস্যা ছেড়ে দিয়ে সাহিত্যে যারা আর্টের, মনস্তত্ত্বের আর বস্তুতান্ত্রিকতার দোহাই দিয়ে Art for Art's sake এই আপত্তিযোগ্য সূত্রের অজুহাত দেখিয়ে, আর ইউরোপীয় কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের বদ-হজমের ফলে, যৌনসমস্যার আমদানী করছে দেশের আর স্বসমাজের সমস্যার সমাধান যাদের দ্বারায় মৃতপ্রায়, নেতৃহীন, বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের দ্বারা পরিত্যক্ত সমাজ কঙ্কালের প্রতি কেবল গালি বর্ষণ ক'রেই আর কতকগুলি মস্ত মস্ত বচন আওড়েই হয়, 'তরুণ' আর 'রুচি' নামে খ্যাত abnormal mentalityর সেই সমস্ত 'ছদ্মবেশী পাপ'—তাদের কাছে আমার বক্তব্য বল্‌ছি না।"

উত্তম। সব চেয়ে মজার কথা এই যে যুবকদের শম, দম, অপ্রমাদ বিষয়ে উপদেশ দিতে গিয়ে মিশনারী মহোদয় উক্ত কথাগুলি বলেছিলেন। কিন্তু উপদেষ্টার কি অপ্রমত্ত ভাব! উপদেষ্টা বোধ হয় নেপথ্যে যুবকদের বলেছিলেন—"যা বলি তা' কোরো, যা' করি তা কোরো না।"

কাকে ফেলে কাকে দেখি?

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের 'নীহারিকা' নামে একখানি নূতন কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে। তাতে 'হিমালয়' শীর্ষক কয়েকটি চতুর্দ্দশপদী কবিতা আছে। সেই কবিতার প্রথম পৃষ্ঠার পাদটীকায় এই কয়টি কথা আছে :—

"হিমালয় সম্বন্ধে এই কয়েকটি কবিতা রচনার সহিত আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের সাহচর্য্যস্মৃতি অতি মধুরভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। একত্র হিমালয়দর্শনের যে সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল, সে সৌভাগ্য অর্জ্জনের তিনিই ছিলেন প্রধান সহায়ক।"

"যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ"। হিমালয় বড় পাহাড়, শরৎবাবুও বড় লোক। আমরাও কবির সুরে সুর মিলিয়ে শরৎবাবুকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি সঙ্গে না থাকলে বঙ্গ-ভারতী এই অমূল্য সনেট-মালা হ'তে বঞ্চিত হতেন।

কবি বোধ হয় মনে করেছিলেন যে, এই পাদটীকার সাহায্যে পাঠকের পক্ষে তাঁর কবিতার মর্ম্ম উপলব্ধি করা সহজ হবে। কিন্তু আমাদের তো মনে হয় ফল উল্টা হয়েছে। তিনি তাঁর এই বন্ধুপ্রীতি এমন আর্টিষ্টিক ভাবে ও ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন যে, আমরা তারই তারিফ করব কি তাঁর কবিতার তারিফ করব তা' ভেবে ঠিক করতে পারিনি।

দ্বাপরের অবতারের অবতরণিকা

চাণক্য বলেছিলেন 'সাধবো নহি সর্ব্বত্র।' এখন কিন্তু সে নীতি উল্টে গেছে। সাধু ছেড়ে গ্রামে গ্রামে এখন অবতার বা জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব হয়েছে। এই রকম কোন এক অবতারের দুই চ্যালা সেদিন জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের কাছে এসে হাজির—তাঁদের বাৎসরিক উৎসবে তাঁকে সভাপতিত্ব করতে নিয়ে যাবার জন্য। বলে রাখা ভাল দুজন যুবকই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। তাঁদের মধ্যে যে কথোপকথন হ'য়েছিল আমরা তা নিয়ে উদ্ধৃত করলাম—

সা। আপনাদের ওখানে গিয়ে কি করতে হবে?

যু। চার রকম যুগ আছে জানেন তো?

সা। জানি না, তবে শুনেছি এবং ছোটবেলায় ধারাপাতে পড়েছি বটে।

যু। হ্যাঁ, এই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। তা' কলিযুগ শেষ হয়ে গেছে জানেন তো?

সা। কই না, এতবড় খবরটা তো জানতাম না!

এ্যাঁ, বলেন কি ? কলিযুগ শেষ হ'য়ে গেছে ? তা কবে থেকে হ'ল ?

চট করে' সাহিত্যিকের টেবিল থেকে একখণ্ড কাগজ নিয়ে একজন যুবক তাতে অঙ্ক কষতে লেগে গেলেন—৩০০০ × ৫০০০ × ৭ ইত্যাদি। শেষ হ'লে অঙ্কটা সাহিত্যিকের বিস্ময়বিস্ফারিত চোখের সামনে তিনি ধরলেন।

সা। না, এটুকু বুঝতে পারলে আমি অনায়াসে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করতে পারতাম। পরীক্ষায় অঙ্কেতেই ফেল করেছিলাম।

যুবকটি দমবার পাত্র নন। তিনি আবার একটা অঙ্ক কষে — ৪৮ গুণফল বার করে' বল্লেন :—

কলির পর কোন যুগ হবে বলুন তো ? Cyclic orderএ আবার সত্য যুগ হবার কথা তো ? কিন্তু তা হবে না। কলির ঘোর পাপের পর সত্যের পুণ্য সহ্য হবে না কিনা—

সা। খুব গরম ঘর থেকে একেবারে ঠাণ্ডায় বেরিয়ে এলে যেমন নিউমোনিয়া হবার সম্ভাবনা ! বুঝেছি।

যু। হ্যাঁ, অনেকটা সেই রকম। তাই ফেরবার সময় cyclic orderটা উল্টে যাবে—কলি, দ্বাপর, ত্রেতা, সত্য। অতএব কলি যে শুধু শেষ হ'য়ে গেছে তাই নয়, এই যে —৪৮ দেখ্ছেন এই ৪৮ বছর আমরা দ্বাপরে ঢুকে গেছি।

সা। বটে, বটে। এতো মহাচিন্তার কথা। তা'-হ'লে এখন কি করা যায় ?

যু। দ্বাপরের একটা নিয়ম হ'চ্ছে এই যে, দ্বাপরের যিনি অবতার তাঁকে প্রাণভরে' ডাকলেই তিনি নেমে আসেন। আমাদের এখন দ্বাপরের সেই অবতারকে প্রাণভরে' ডাকতে হবে। এই ডাকার কাজে আপনাকে অধিনায়কত্ব করতে হবে।

সা। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) আচ্ছা, আপনারা এগিয়ে ডাকুন গে, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

শোনা যায় যুবক দুটি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে ভ্যাবাচাকা খেয়ে তখন প্রস্থান করেছিলেন। কিন্তু আশ্রমে গিয়ে মগজে বুদ্ধি থিতুলে সাহিত্যিকের শেষ বক্তব্যের মর্ম্ম গ্রহণ করে উক্ত সাহিত্যিককে একখানি রজস্তমোভাবোদ্দীপক চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন।

বিরূপাক্ষ শর্ম্মা

বিচিত্রা

বাংলা কাউন্সিলে মন্ত্রী-বেতন মঞ্জুর হইয়াছে, বেতন-না-মঞ্জুর-প্রস্তাব টিকে নাই। মন্ত্রীদের প্রতি অনাস্থা-প্রস্তাবও তেমনি বাতিল হইয়াছে।

এই প্রস্তাব দুইটার জয়-পরাজয়ের মধ্যে সত্যই দেশের জয়-পরাজয় বিন্দুমাত্রও নূতন হইয়া দেখা দেয় নাই—ইহা লইয়া আমাদের আপশোষ করার কিছুই নাই।

* * *

যেখানে এই কাউন্সিল-ব্যাপারটাকেই মানিয়া লওয়া য় না, সেখানে কাউন্সিলের একটা দুইটা প্রস্তাবের মূল্য র কতটুকু?

জনমত কি, তাহা ইংরেজ-রাজপুরুষকে দেখাইবার দি কোন আবশ্যকতা থাকে তাহা পূর্ব্বেই একাধিকবার খানো হইয়াছে।

অবশ্য জনমত কি, তাহা আমাদের নিজেদের বুঝিবার এবং তাহা বুঝা হইয়াছেও।

বাংলার কাউন্সিলের যে গঠনপ্রণালী—ইহাতে জনমতের জয় না হইলে অস্বাভাবিক হইবে না—বরং তাহাই হইবে স্বাভাবিক। যেখানকার গোড়ার গঠনই—প্রতিনিধিত্বের ধারাই—মনোনীতের পদ্ধতিই—আমরা অন্যায় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছি, সেখানে জনমতের জয় না হইলে আমাদের সত্যকার রাজনৈতিক প্রচেষ্টার কোন মহাভারত অশুদ্ধ হইবে না।

কাউন্সিলের এই অন্যায় গঠনপ্রণালীর জন্যই জনমতের সত্যবাণীকে সেখানে জয়ী করিতে মিথ্যার সঙ্গে কতবার পোষ করিতে যাইতে হইয়াছে। ঐ পথে জনমতকে য়ী করার দুর্গতিভোগ কংগ্রেসকে যদি ভবিষ্যতে আর না বিতে হয়—তবেই জনমত সসম্মানে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে রিবে।

* * *

তারপর বড় কথা এই যে, যেখানে সংস্কার-আইনের nstitutionকে মানিতেই মাথা কাটা যায়, সেখানে এই ন্সিলের দুই-একটা তুচ্ছ জয়-পরাজয়কে বড় করিয়া নিজেদের দৈন্যকে আরো বড় করিয়া তুলি কেন?

কংগ্রেসে স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর—ন কমিশন বর্জ্জন-ব্যবস্থা পরিগৃহীত হইবার পর—গ্রস-কর্ম্মীদের কাউন্সিলে যে কারণে যাওয়া চলে এই মন্ত্রী- না-মঞ্জুর ও অনাস্থা-প্রস্তাব-উত্থাপন তাহার । কংগ্রেস-কর্ম্মীরা কাউন্সিলে বাধাদানের সংকল্প লইয়াই যাইতে পারে—অন্য কোন কারণে নহে। কংগ্রেস-কর্ম্মীরা সেই সংকল্প লইয়াই সেখানে গিয়াছেন। আর অপরে তেমন নহে। এর মধ্যে কেহ কেহ মন্ত্রী-বেতন না-মঞ্জুর ও অনাস্থা-প্রস্তাবে কংগ্রেস তথা স্বরাজ্য-দলের সঙ্গে ভোট দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টি বিভিন্ন দিকে। ইহাতে এক-আধটি প্রস্তাব জেতাই সম্ভব হউক, কি হারাই সম্ভব হউক—যে ব্যাপার লইয়া আমাদের লড়াই তাহা বড়ই এলোমেলো হইয়া যায়।

জনসাধারণের শিক্ষার একটা দিক অবশ্য এদিকে আছে—কিন্তু আমরা কংগ্রেসের তরফ হইতেও যদি আজ এদিকে কাল সেদিকে—এবং আমাদের যাহা চাই তাহার বিরোধীদেরই দলে টানিয়া আনিতে সাময়িক চেষ্টা করি, তাহা হইলে জনসাধারণ একটা প্রস্তাবের জয়-পরাজয়কেই বড় করিয়া দেখিবে—আদর্শকে ধরিতেই পারিবে না।

রায় যতুনাথ মজুমদার বাহাদুরের মায়া ত্যাগ করার মূল্য একটা প্রস্তাব পাশ করার চাইতেও ঢের বেশী। স্যর আবদার রহিম, ফজলুল হক্‌ বা নাটোর-রাজ যা চাহেন আমরা কংগ্রেসের দল তাহা চাহি না। এটা যতই বড় হইয়া উঠে ততই ভাল—আর এটা যতই গুলাইয়া যাইবে, জনসাধারণের চাওয়ার আদর্শও তেমনি গুলাইয়া যাইবে। সংখ্যার চাইতে এই দুর্দ্দিনে আমাদের শক্তির উপরেই ভরসা রাখিতে হইবে। কংগ্রেস-সদস্যরা যে কয়জন খাঁটি আছেন তাঁহারা যদি সংঘবদ্ধ থাকেন তবেই তাঁহাদের যথার্থ প্রভাব দেশে বাড়িবে—কিন্তু সংখ্যার স্বল্পতার অসুবিধা এড়াইবার জন্য যদি তাঁহারাও মিথ্যা সংখ্যার দিকে তাকাইতে যান—গোঁজামিল দিয়া সংখ্যা বাড়াইতে যান—তবে ঐ মিথ্যা সংখ্যার ফাঁকেই তাঁহাদের প্রভাব কমিবে। রায় বাহাদুর প্রভৃতিকে বাদ দিয়া সংখ্যায় ন্যূন থাকিলেও দেশের মুখ তাঁহারাই উজ্জ্বল রাখিতে পারিবেন, মন্ত্রীর বেতন মঞ্জুর হইলেও পারিবেন।

মন্ত্রী-বেতন-না-মঞ্জুর-প্রস্তাব অধিক ভোটে পাশ হইলে বলা হইবে জনমত জয়ী হইল—আবার ভোটের জোরে প্রস্তাব বাতিল হইলে বলা হইবে, betray করিয়াছে—সরকারী সাহায্য প্রভৃতি মিলিয়া এ কাজ করিয়াছে। কিন্তু কথা ত তাহা নহে।

এই কাউন্সিলই আজ জনমতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া আছে। উহাই যেখানে অসিদ্ধ, সেখানে হঠাৎ কোন কারণে একটা প্রস্তাব পাশ হইলেই কি আর জনমতের জয় সাব্যস্ত হয়? জনমতের জয় বলিয়া গৌরব লইতে হইলে দৈন্যকেও স্বীকার করিয়া লইতে হয়। কিন্তু তাহা নহে। আমরা বলি জাতি আজ গোড়ার দৈন্যকেই মানিয়া নিয়াছে, অর্থাৎ জনমতকে পদে পদে দলিত করিয়া এই রাজ্যশাসন চলিয়াছে—চলিতে পারিয়াছে, ইহাই আমাদের দৈন্য। এক-আধটা প্রস্তাব উপলক্ষ করিয়া আমাদের জয়ও নাই পরাজয়ও নাই।

মিথ্যা জয় লইয়া মিথ্যা আস্ফালন করিতে যাই বলিয়াই, আজ দেশের ও জাতির দুর্ভাগ্য ও দুর্গতির সুযোগ ও সুবিধা লইয়া মন্ত্রীগিরিতে কায়েম হইয়া, আমলাতন্ত্রের সং মন্ত্রীদের মত ক্ষীণজীবীদেরও আর উল্লাসের অন্ত নাই!

বাংলায় বয়কট-আন্দোলন যথেষ্ট প্রসারতা লাভ করে নাই। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র শারীরিক অসুস্থতা অগ্রাহ্য করিয়া বয়কট আন্দোলন সফল করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু একা সুভাষচন্দ্রের বা একা কংগ্রেসের চেষ্টায় বয়কট আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। দেশব্যাপী নিরুদ্যম দূর করিতেও যেমন এই আন্দোলনের আবশ্যকতা আছে, বয়কটের সঙ্গে যে স্বদেশী প্রচার হইবে তাহাতে দেশাত্মবোধবুদ্ধিরও তেমনি যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।—এই ব্যাপারে কংগ্রেসের চেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সকলের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। জেলায় জেলায় কংগ্রেসের শাখাগুলিতে যদি প্রাণের পরিচয় দেখা যায় সমগ্র দেশের প্রাণও জাগিয়া উঠিবে।

কলিকাতার ছাত্রেরা এই সম্পর্কে অনেক-কিছু করিতে পারেন। স্বদেশীব্রত তাঁহারা গ্রহণ করুন। শুধু কাপড় নহে—অন্যান্য বিলাতী জিনিসও তাঁহারা বর্জ্জন করিয়া চলুন। ছাত্রদের মধ্যে বিলাসদ্রব্য কম প্রচলিত নয়, তাঁহারা সে-সবও বর্জ্জন করিতে পারেন—নিজেদের সমাজে কেহ ব্যবহার না করে তাহা দেখিতে পারেন। ছাত্ররা যে ঢেউ তুলিবে, তাহা যুবকপ্রৌঢ়বৃদ্ধদের বিচলিত করিবে, ইহা আমাদের বিশ্বাস। এই সম্পর্কে কংগ্রেস হইতে কিছু চেষ্টা চলিতেছে—কিন্তু প্রয়োজন হিসাবে তাহা পর্য্যাপ্ত নয়। সকলের কর্ত্তব্য কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দিয়া এই আন্দোলনকে সফল করিয়া তোলা।

সুরমা সাহিত্য সম্মেলনে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত হওয়ার বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব ছিল। সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রস্তাবটিতে রাজনৈতিক সম্পর্ক আছে বলিয়া উহা সভায় উঠিতে দেন নাই। ইহা লইয়া কাগজে খুব আলোচনা হইয়াছে।

আমাদের প্রথম কথা—প্রস্তাবটি যদি এই নিমিত্ত হয় যে, গবর্ণমেণ্ট বিনা বিচারে—অর্থাৎ কোন বিশিষ্ট বিচারক দ্বারা তাহা বিচার তথা প্রমাণ না করিয়া—পুস্তকটি বাজেয়াপ্ত করিয়া অন্যায় করিয়াছেন, তবে কেবল 'পথের দাবী' নয়, আরো অনেক 'ছোটখাট' লেখকের লেখা বই গবর্ণমেণ্ট বিনা দোষে (যেহেতু আদালতে দোষ প্রমাণিত হয় নাই—আমরা সকলের লেখাই নির্দ্দোষ ধরিয়া লইলাম।) বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।—প্রস্তাবে তাঁহাদের নাম করা কর্ত্তব্য ছিল।

কারণ, প্রস্তাবের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, এই রকম

আন্দোলন করিলে সরকার ভবিষ্যতে সাবধান হইবেন, তবে প্রস্তাব শুধু 'পথের দাবী'র জন্য না হইয়া সকল বাজেয়াপ্ত বইয়ের জন্যই হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় শরৎচন্দ্রের বইয়ের জন্য (যেহেতু এজন্য আন্দোলন হয়) ভবিষ্যতে যেমন সরকার সাবধান হইবেন—অপরের বেলায় (যেহেতু কোন আন্দোলন হয় না) তেমনি বেপরোয়া হইবেন।

অন্য দিকে প্রস্তাবের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, সরকারী অন্যায়ের নিষ্কামভাবে নিন্দা করা, তাহা হইলেও সকল লেখকের বাজেয়াপ্ত পুস্তকের জন্যই তাহা করা উচিত—কারণ, 'পথের দাবী'তেও যে অন্যায় 'শতবর্ষের বাংলা'য়ও সেই অন্যায়, 'রক্তলেখা,' 'ভাঙ্গার গান' ও 'বিষের বাঁশী'তেও তাই। আর যদি প্রস্তাবের উদ্দেশ্য এই হয় যে, লেখকের প্রতি সহানুভূতি দেখান, তাহা হইলেও সকলের প্রতিই তাহা দেখানো কর্ত্তব্য। কারণ সুস্পষ্ট।

• •

•

এখন কথা এই—সাহিত্যিকদের লেখার উপরে সরকারী অন্যায়ের প্রতিবাদ করা সাহিত্য-সম্মিলনীর এলাকার মধ্যে আসে কিনা—এতটুকু রাজনীতি সাহিত্য-বৈঠকে চলিবে কিনা? আদৌ ইহা রাজনীতি কিনা সেই আলোচনা আপাততঃ থাকুক। ধরিয়া লওয়া যাক্ সরকারী কোন কার্য্যের (তাহা সাহিত্য লইয়া হইলেও) প্রতিবাদ যখন তখন ইহা রাজনীতি। রামানন্দবাবুর ব্যক্তিগত কোনও আপত্তি যে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে নাই তাহা তাঁহার কথাতেই প্রকাশ।—সরকারের এই ধরণের জুলুমে যে সাহিত্যের স্বাভাবিক সমৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হয় ইহাও তিনি মানেন। তাঁহার কথা এই যে, সাহিত্যসভায় সরকারী কর্ম্মচারীরাও যোগ দেন, সুতরাং রাজনীতি সাহিত্যের বৈঠকে আনিলে তাঁহাদের থাকা চলে না, তাঁহারা গেলে লাভ নাই, লোকসান আছে।

আমাদের মনে হয়, এই ধরণের প্রস্তাবে রাজনীতি তেমন কিছু নাই। সাহিত্যের সম্পর্কে সরকারের যতটুকু কার্য্য তাহার প্রশংসা বা নিন্দা (প্রশংসা হইলে রাজনীতি বলিয়া বর্জ্জিত হইত কিনা তাহা অবশ্যই বুঝিবার অবসর নাই) সাহিত্যিক সম্মিলনীতে চলিবে কিনা? আমাদের মনে হয়, চলা উচিত।

চলা উচিত কিনা, সভাপতি হিসাবে রামানন্দবাবু সেই বিষয়ে সভার মতামত লইলে বোধ হয় ভাল করিতেন। সরকারী কর্ম্মচারীরা রাজনীতিসম্পর্কিত কোন সাহিত্যকে ও পছন্দ করিতে না পারেন—বা কোন সাহিত্য-সভায় তাহার মান দিতে আপত্তি করিতে পারেন। তখন সাহিত্যের মুখ চাহিয়াই—বড়লোক সত্ত্বেও—তাহাদের মায়া ত্যাগ করা ভিন্ন উপায় কি?

সাহিত্য-সম্মিলনীতে সাহিত্যের উপরে সরকারী অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রস্তাব আসিতে পারে; আমাদের মনে হয় আসা উচিত। সে ক্ষেত্রে সরকারী কর্ম্মচারীরা প্রস্তাবের উত্থাপনের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াও নিজেদের মুক্ত রাখিতে পারেন—রাজ-কর্ম্মচারী যাঁরা নহেন (সেই সংখ্যাই অধিক) তাঁহাদেরও সাহিত্য-বৈঠক ঠিক ঠিক চলে।

সাহিত্যক্ষেত্রে রাজ-কর্ম্মচারীর সংখ্যা বেশী নহে—তুলনায় নিশ্চয়ই কম। সুতরাং শুধু ইঁহাদের সভায় পাইবার জন্য একটা বৃহত্তর প্রয়োজন উপেক্ষা করা যায় না। তা' ছাড়া সাহিত্য বাদ দিয়া রাজনীতি, রাজনীতি বাদ দিয়া সাহিত্য গড়ার চেষ্টা যদি এদেশে চলে, আর সে চেষ্টা সফল হয়, তবে তাহাতে সাহিত্য ও রাজনীতি দুইয়েরই ক্ষতি করিবে। সে যাক্। সাহিত্য সরকারী ব্যবস্থায় পীড়িত হইতেছে ইহা যদি সত্য হয়, তবে সেই সম্বন্ধে ভাবী কর্ত্তব্য নির্ণয় সাহিত্য-সম্মিলনীর অন্যতম কর্ত্তব্য হওয়া উচিত।

যাহা বিচারে বিদ্বেষমূলক—রাজদ্রোহমূলক সাব্যস্ত হইয়াছে সেই সম্পর্কেও বর্ত্তমানে এই অভিযোগ নহে; এই অভিযোগ—শুধু বিচার না করিয়া যে পুস্তক

বাজেয়াপ্ত করা হয়, তাহারই বিরুদ্ধে মাত্র। এই অপরাধে যদি রাজ-কর্ম্মচারী সাহিত্যিকগণ সাধারণ সাহিত্যিকদের সম্পর্কে না আসিতে চাহেন—তাঁহাদের ধরিয়া রাখিবার এমন সোজা পথও ত পথ বলিয়া মানা যায় না।

সুভাষচন্দ্র কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র হইতে পারেন নাই। সুভাষচন্দ্রের দেশ-সেবার অকৃত্রিম ইচ্ছা, অনলস কর্ম্মনিষ্ঠা যে তাঁহাকে মেয়র হইবার যোগ্য করিয়াছে ইহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। সুভাষ-চন্দ্রের এই পরাজয় অর্থে কংগ্রেস দলের তথা স্বরাজ্য-দলের পরাজয় সূচিত হইয়াছে, অনেকে এমন কথা বলি-তেছেন, কিন্তু আমরা একথা সত্য বলিয়া মনে করি না।

দেশের লোক কংগ্রেসকে যতখানি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিবে কংগ্রেসের জয় ততখানিই। কোন একদিন কোন কারণে জয় বা পরাজয়ে তাহার হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না বলিয়াই মনে করি। এখন কথা হইতেছে, যে সব প্রতিনিধি ঐখানে গিয়াছেন তাঁহাদের লইয়া। সকলেই সেখানে কিছু উদার সেবাপরায়ণ মতিগতি লইয়াই যান নাই; নানা রকমের স্বার্থও সেখানে কাজ করিয়া চলিয়াছে।

অনেক সদস্য এমনও আছেন, যাঁহাদের কলে-কৌ হাতে রাখিতে পারিলে কাজ হয়, অন্যথায় হয় এঁদের এক কালের 'না'ও যেমন মূল্যহীন, অন্য কা 'হাঁ'ও তেমনি মূল্যহীন—অন্ততঃ কোন ব্যক্তির বা বিশেষের সত্যকার জয়-পরাজয় তথা শক্তি ও ৈ তাহাতে করিয়া সাব্যস্ত হয় না।

মুসলমান সদস্যরা কি চাহিয়া কি পান নাই, আ জানি না; কিন্তু এই চাওয়া ও দেওয়ার কথা করপোরেশনের ব্যাপারেও সত্য হয়, সুভাষচন্দ্রের ৽ তেমন পরাজয় অগৌরবের নহে। এই সব মিথ্যার ঃ আপোষ করিয়া তাঁদের তুষ্ট করিয়া জয় যে সত্যিক পরাজয় একথা যথার্থ শক্তি সাধককে স্বীকার করিে হইবে।

কলিকাতা করপোরেশনের মতিগতি এ কয় বা অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাই কংগ্রেস ও স্বরাজ্য-দলের করপোরেশনের গৌরবের কথা। এই ধ যদি দিন দিন বাড়িতে না থাকে, বর্ত্তমানের কর্ম্মকর্ত্তাে হাতে পড়িয়া যদি ইহার ব্যতিক্রম হয়, সহরবাসী তাঃ সহ্য করিবে না।

শ্রী নলিনীকিশোর গুহ

শ্রী শিশিরকুমার নিয়োগী কর্ত্তৃক, ১এ, রামকিষণ দাসের লেন, নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস হইতে মুদ্রিত ও বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।